

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদক

আবদুল আজিজ মুহাম্মাদুল মুহাম্মাদ মুহীউদ্দীন আবদুলকাদের আলমগীর (র)

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদক

বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরংগজেব আলমগীর (র)

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (চতুর্থ খণ্ড)

[উন্নয়ন প্রকল্প]

সম্পাদক : বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরংগজেব আলমগীর (র)

গ্রন্থস্বত্ব : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকাল

অগ্রহায়ণ : ১৪১০

শাওয়াল : ১৪২৪

ডিসেম্বর : ২০০৩

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ২৩৫

ইফাবা প্রকাশনা : ২১৪১

ইফাবা গ্রন্থাগার : ৩৪০.৫৯

ISBN : 984-06-0784-7

প্রকাশক

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বর্ণবিন্যাস

মেসার্স তাওয়াক্কাল প্রেস

৮৭/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মেসার্স আল আমিন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স

৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা

মূল্য- ৬৫০.০০ (ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

FATAWA-E ALAMGIREE (4th volum) (A Commentary on the Islamic Laws):
 Edited by Badshah Abul Muzaffar Muhammad Maheeuiddin Awrongzeb
 Alamgeer (Rh) in Arabic, Translated & Edited by a board Sponsored by
 Islamic Foundation Bangladesh. Published by Director Translation &
 Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh. Agargaon, Sher-e Bangla
 Nagar, Dhaka-1207
 December : 2003

মহাপরিচালকের কথা

মুঘল সম্রাট আওরংজেব 'বাদশাহ আলমগীর' নামে খ্যাত। তিনি ১৬৫৮ খৃস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে এই বিশাল সাম্রাজ্যের কল্যাণ সাধনে মনোনিবেশ করেন। তখনকার দিনে জাতীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তা রোধ করে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে, সমাজ জীবনে অনাবিল ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে তিনি ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মানুষের জীবনে করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসে যে সব বিধি-বিধান ও আইন-কানুন বিধৃত হয়েছে, সময়ের আবর্তনের ফলে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সমাধান সে আলোকে প্রদানের জন্য বাদশাহ আলমগীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরাম ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমন্বয়ে ১৬৬৩ খৃস্টাব্দে একটি 'ফিকহ বোর্ড' গঠন করেন। দীর্ঘ আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে উক্ত বোর্ডের দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরাম সুবহৎ ছয়টি খণ্ডে গ্রন্থখানি সংকলন করেন। এই গ্রন্থই জগদ্বিখ্যাত 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' বা 'ফাতাওয়ায়ে হিন্দ' যা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

বাংলার জনগণকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হতে রক্ষাকল্পে, নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত চিরশান্তি ও কল্যাণের ধর্ম ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ফিকহ ও ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশই আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় রচিত ও সংকলিত। এ অবস্থায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগই মূলত এ সব মূল্যবান ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করে এ দেশের মানুষকে ইসলাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, এবার প্রকাশিত হলো চতুর্থ খণ্ডের বঙ্গানুবাদ। এটি আমাদের জন্য এক পরম আনন্দ ও গৌরবের ব্যাপার। এ জন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া। মুবারকবাদ জানাই বিজ্ঞ অনুবাদকদের, যারা মেধা ও শ্রম ব্যয়ে স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করে গ্রন্থখানিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই প্রাজ্ঞ সম্পাদককে। আমি ধন্যবাদ জানাই অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে। গ্রন্থখানির মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রকাশনার সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রতিও রইল আমার শুভেচ্ছা আর এদের সবার জন্য রইল আমার আন্তরিক দু'আ। বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে বইটি গ্রহণযোগ্য হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব। আমীন!!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ফাতাওয়া হচ্ছে মুসলিম জীবনে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কোন বিষয়ের উপর উত্থাপিত প্রশ্নের ফায়সালা। 'ফাতাওয়া' শব্দটির উৎপত্তি 'ফাতা' শব্দ থেকে, যার শাব্দিক অর্থ স্পষ্টকরণ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি। পরিভাষা হিসেবে এর অর্থ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট রায়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পবিত্র কুরআন ও সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীস গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ছাড়াও সীরাত, তাফসীর, ফিক্হ এবং মাসআলা-মাসাইল সংক্রান্ত বিশ্ব-বিখ্যাত আকর গ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ করে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করছে।

বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী অন্যতম। এটি হানাফী মায়হাবের একটি সুবৃহৎ, নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ফাতাওয়া গ্রন্থ। এতে ইসলামের বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও মানুষের জীবনে দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সমাধান পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দিক-নির্দেশনা দানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ইসলামী আইনের একটি প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল গ্রন্থ হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও নন্দিত। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে সুশৃঙ্খল সমাজ কাঠামো বিনির্মাণেও এ গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহকে নানা সংকটে দিক-নির্দেশনা দান করে আসছে।

বিশ্বনন্দিত এ গ্রন্থের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। গ্রন্থখানির এ খণ্ডের অনুবাদ করেছেন মাওলানা ইসহাক ফরিদী, মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ও মাওলানা হাসান রহমতী এবং সম্পাদনা করেছেন মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সেই সাথে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মীদের জানাই ধন্যবাদ।

গ্রন্থখানি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে মুদ্রণের চেষ্টায় আমাদের কোন ক্রটি হয়নি। তবুও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরূপ কোন ক্রটি-বিচ্যুতি বা মুদ্রণ প্রমাদ সুধীজনের নজরে এলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা পরিমার্জনের ব্যবস্থা করব ইনশা আল্লাহ্।

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম

পরিচালক

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

পৃষ্ঠক কবিতাশতক

পৃষ্ঠক কবিতাশতক
পৃষ্ঠক কবিতাশতক
পৃষ্ঠক কবিতাশতক

পৃষ্ঠক কবিতাশতক
পৃষ্ঠক কবিতাশতক
পৃষ্ঠক কবিতাশতক

পৃষ্ঠক কবিতাশতক
পৃষ্ঠক কবিতাশতক
পৃষ্ঠক কবিতাশতক

পৃষ্ঠক কবিতাশতক
পৃষ্ঠক কবিতাশতক
পৃষ্ঠক কবিতাশতক

পৃষ্ঠক কবিতাশতক
পৃষ্ঠক কবিতাশতক
পৃষ্ঠক কবিতাশতক

পৃষ্ঠক কবিতাশতক

পৃষ্ঠক কবিতাশতক

পৃষ্ঠক কবিতাশতক

পৃষ্ঠক কবিতাশতক

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
২. মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী
৩. মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের মেসবাহ

ভূমিকা



সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি শরীআতের বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তনে একক ও অদ্বিতীয়, যিনি হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী তথা বিধানাবলী সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্ষমতাবান সত্তা এবং যিনি উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে দিরায়াতে তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে দৈনন্দিন জীবনে ঘটমান বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁরা লোকদেরকে পদস্থলনের অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে এবং হিদায়াতের পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞার আলোকরশ্মিতে রিওয়ায়াতের চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন।

সালাত ও সালাম ঐ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি, যিনি রিসালাতের ময়দানে সর্বশেষে আবির্ভূত হয়েছেন বটে, কিন্তু মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে সকলের উর্ধ্বে, যিনি হিদায়াতের পথের অন্তরায় প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করেছেন এবং যিনি উন্মোচিত করেছেন নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাকে। অর্থাৎ তাঁকে উসীলা করে আশ্বিয়ায়ে কিরামকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করার ধারা সূচনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁরই মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। আর রহমত বর্ষিত হোক সেই মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি।

বস্তুত ফিকাহ হচ্ছে হিদায়াত ও ওমরাহীর মধ্যে এক বিশেষ পার্থক্য-রেখা এবং আমলের গুদ্বাওদ্ধি নিরূপণের এক সঠিক মানদণ্ড। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উদ্ভূত সমস্যাসমূহের গতিময়তা কখনও স্থির থাকে না এবং এর পর্বতশৃঙ্গ এত উর্ধ্বে যা চোখের দৃষ্টিতে ধরা যায় না। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যত গ্রন্থ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাতে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ হচ্ছে না এবং হচ্ছে না পরিতৃপ্ত এতে পিপাসার্ত মন। কারণ কোন কোন গ্রন্থে পূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা না করে কেবল বিশেষ কোন মাসআলা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আবার কোন গ্রন্থে বিরোধপূর্ণ বর্ণনাসমূহ এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলে প্রমাণ তালাশকারী ব্যক্তি এমনভাবে বিতর্কে

জড়িয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে যেমন তারকাবিহীন অন্ধকার রজনীতে পানিহীন মরু বিয়াবানে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির তালাশে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অনুরূপ যারা ইসলামের বিধি-বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে বেপরোয়া, তারা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী বিষয়াদি গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে সংকীর্ণমনা, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রাতের আঁধারে নিজের সামান হারিয়ে এর তালাশে হন্যে দিক-বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। এমনি করে তাদের অধিকাংশই সুনাহর আলো ছেড়ে রাতকানা খাহিশাতের অগ্নির দিকে ছুটে চলে এবং ধাবমান হয় বিদআত ও বাতুলতার অকল্যাণকর পথের দিকে। ফলে পার্থক্য করতে পারে না তারা সত্য-মিথ্যা এবং হক ও না-হকের মাঝে। আরো ধেয়ে চলে তারা এক ময়দানে তীহের পর আরেক ময়দানে তীহের দিকে। ফলে খুঁজে পায় না তারা গন্তব্য পথের কোন সঠিক পথ-প্রদর্শক। পায় কেবল এক নির্বোধের পর আরেক নির্বোধকে।

এহেন নাজুক অবস্থায় মহান আল্লাহ তা'আলা দানবীর, রণকুশলী, মহাবীর, অপরাজিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বাতিলের আতংক, আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন, গভীর জ্ঞানের অধিকারী, মহাপণ্ডিত, আল্লাহুভীতি, পরহেযগারী ও দুনিয়াবিমুখতার মূর্তপ্রতীক, আমীরুল মু'মিনীন, রঈসুল মুসলিমীন, ইমামুল মুজাহিদ্দীন মহান রাষ্ট্রনায়ক আবুল মুজাফ্ফর মুহীউদ্দীন বাহাদুর ওরফে বাদশাহ্ আওরংগজেব আলমগীর গায়ীর মাধ্যমে এই উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ করেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করেন। তাঁর অনুগ্রহকে সকল সৃষ্টির প্রতি ব্যাপক করে দেন এবং হিসাবের দিন তিনি তাঁর ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা তাঁদের স্বজনদের নিকট ফিরে যাবে প্রফুল্লচিত্তে; আর সংরক্ষণ করেন আল্লাহ তাঁকে ঐ সমস্ত লোক থেকে, যারা পশ্চাৎদিকে ফিরে যাবে নিন্দিত ও ধিক্কৃত অবস্থায়। এরপর আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ্ আলমগীর (র)-এর হৃদয়ে এমন একটি বিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব সংকলনের বিষয় ইলহাম করেন যাতে এমন দীর্ঘ বর্ণনার অবতারণা হবে না যা হবে বিরজিকর; বরং এতে থাকবে সহীহ বর্ণনাসমূহ ও অখণ্ডনীয় যুক্তিমালা। আর এতে স্পষ্ট বলে দেওয়া হবে দুর্বল ও সঠিক অভিমতসমূহ, যাতে লাজীন (কর্তিত পাতা) ও লুজায়ন (রৌপ্য) এবং হিজান (দ্রুতগামী উট) ও হুজায়ন (কমীনা)-এর মধ্যে কোনরূপ সংশয় না থাকে। বস্তুত এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে সব ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এতো কেবল এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং যার নিকট হিদায়াত ও গুমরাহীর পথ স্পষ্ট।

এতদুদ্দেশ্যে বাদশাহ্ আলমগীর (র) এই বিষয়ে ব্যাপ্তিসম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামকে একত্রিত করেন এবং সংগ্রহ করেন এ বিষয়ে লিখিত বড় বড় গ্রন্থসমূহ। তারপর তিনি তাঁদেরকে এসব কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ সংকলন করার প্রতি ইঙ্গিত করে এবং বলেন, এমন একটি কিতাব প্রণয়ন করতে যাতে থাকবে যাহিরী রিওয়ায়াতসমূহ যে সব রিওয়ায়াতের ব্যাপারে আলিমগণ সকলেই একমত এবং যার ভিত্তিতে ফকীহগণ ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। আর তিনি তাদেরকে এমন নাদির-দুর্লভ বর্ণনাসমূহও জমা করার আদেশ করেন যা আলিমগণ বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করে নিয়েছেন, যাতে আমলের ক্ষেত্রে সাবধানতা ও পরহেযগারী হাতছাড়া না হয় এবং যাতে এ ক্ষেত্রে বিঘ্নতা ও পদস্থলন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বাদশাহের নির্দেশে উলামায়ে কিরাম ফিকাহশাজের খাযানা থেকে মণি-মুজা ও মোতিসমূহ

কুড়িয়ে একত্রিত করতে এবং বিক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ জমা করতে আরম্ভ করলেন আর এমনভাবে মাসআলা সংকলন করলেন যে, কোন্ কাজটি শুদ্ধ ও কোন্টি অশুদ্ধ, কোন্টি সওয়াবের কাজ ও কোন্টি পাপের কাজ, তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দিলেন এবং সুন্দর ও সুসজ্জিতভাবে গ্রথিত করলেন ফিকাহ-এর ছড়ানো-ছিটানো মাসআলাগুলোকে। বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁরা 'হিদায়া' গ্রন্থ প্রণেতার অনুসরণ করেছেন এবং স্পষ্টভাষায় মাসআলাসমূহের বিবরণ পেশ করতে তাঁরা আশ্রয় চেষ্টি করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কিতাবে যে পুনরুক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়েছে, তা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন এবং উপেক্ষা করেছেন দলীল বর্ণনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ-সূত্রিতার। উল্লেখ্য যে, সংকলনকারী ফকীহগণ মাসআলা বর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাহিরী রিওয়ায়াতের মাসআলাসমূহই উল্লেখ করেছেন। নাদির^১ রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের প্রতি তারা বেশি মনোনিবেশ করেননি। তবে কোথাও যাহিরী রিওয়ায়াত মাসআলার সঠিক সমাধান না পাওয়া গেলে অথবা নাদির রিওয়ায়াত-“এর উপর ফাতাওয়া” বা এ জাতীয় কথা সংযুক্ত থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে নাদির রিওয়ায়াতও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কিতাব সংকলকবৃন্দ প্রতিটি মাসআলা মূল কিতাবের ইবারত বরাতসহ উল্লেখ করেছেন। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কোথাও মূল কিতাবের ইবারতে কোনরূপ রদবদল করা হয়নি। তবে যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে ১৫৯ আর যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়নি সে ক্ষেত্রে ১৫ শব্দ ব্যবহার করে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হয়েছে। কোন মাসআলার ক্ষেত্রে একাধিক সমাধান থাকলে এবং এর প্রত্যেকটির সাথে ‘এর উপর ফাতাওয়া’ বা এ জাতীয় কথা উল্লেখ থাকলে বা প্রাধান্য দেওয়ার কারণ বর্ণিত থাকলে কিংবা প্রাধান্য দেওয়ার কোন কারণ কোন মাসআলার সাথেই না থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে সংকলকবৃন্দ উভয় মতকেই এ কিতাবে হুবহু রেখে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তা'আলাই সঠিক পথ প্রদর্শক।

والله الموفق للصواب

১. ইমাম মুহাম্মদ কর্তৃক সংকলিত ১. মাবসূত, ২. যিদায়াত, ৩. সিয়ারে সাগীর, ৪. সিয়ারে কাবীর, ৫. জামে সাগীর, ৬. জামে কাবীর, এই ছয়টি কিতাবকে একত্রে ‘যাহিরী রিওয়ায়াত’ (ظاهر الرواية) বলা হয়।
২. উপরোক্ত ছয়খানা গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য ফিকাহ গ্রন্থের বর্ণনাসমূহকে ‘নাদির রিওয়ায়াত’ বলা হয়।

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
অধ্যায় : জিহাদ	১৯-৭০
নবম পরিচ্ছেদ : মুরতাদের বিধি-বিধান	২১
অনুচ্ছেদ : কুফর সাব্যস্তকারী বিষয়সমূহ কয়েক প্রকার।	২৯
এক. ঈমান ও ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি	"
দুই. আল্লাহর সত্তা ও তার গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি	৩১
তিন. নবী-রাসূলগণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি	৩৮
চার. কুরআন মাজীদেবের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি	৪৩
পাঁচ. নামায, রোযা ও যাকাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি	৪৫
ছয়. ইল্ম ও আলিম সম্পর্কিত বিষয়াদি	৪৮
সাত. হালাল, হারাম বা ফাসিক-ফাজির লোকদের কথাবার্তা ইত্যাদি	৫০
সম্পর্কিত বিষয়াদি	৫৩
আট. কিয়ামত ও কিয়ামত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	৫৩
নয়. স্পষ্টভাবে বা ইশারার মাধ্যমে কাউকে কুফরীর জন্য প্ররোচিত করা;	
ধর্ম ত্যাগ করার জন্য আদেশ দেওয়া বা কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বন	
করা ইত্যাদি।	৫৫
দশম পরিচ্ছেদ : বাগী অর্থাৎ বিদ্রোহীদের বিবরণ	৬৬
অধ্যায় : লকীত (হারানোপ্রাপ্ত সন্তান)-এর বিবরণ	৭১-৯৩
অনুচ্ছেদ : লুকাতা (হারানোপ্রাপ্ত মাল)-এর বিবরণ	৮১
অধ্যায় : পলাতক গোলামের মাসাইল	৯৪-১০৪
অধ্যায় : নিরুদ্দেশ ও নিখোঁজ ব্যক্তির মাসাইল	১০৫-১১০
অধ্যায় : যৌথ মালিকানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য	১১১-১৯৮
প্রথম পরিচ্ছেদ : যৌথ মালিকানা ও ব্যবসা বাণিজ্য-এর প্রকারভেদ; রুকন,	
শর্ত, বিধি-বিধান ইত্যাদির বিবরণ	১১৩
প্রথম অনুচ্ছেদ : শিরকত (যৌথ মালিকানা ও ব্যবসা বাণিজ্য) এর প্রকারভেদ	১১৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : যে যে শব্দ দ্বারা শিরকত সহীহ হয় আর যে যে শব্দ দ্বারা	
শিরকত সহীহ হয় না	১১৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : যে যে জিনিস মূলধন হতে পারে এবং যে যে জিনিস	
মূলধন হতে পারে না	১২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিরকাতে মুফাওয়াযার মাসাইল	১২৬
প্রথম অনুচ্ছেদ : শিরকাতে মুফাওয়াযার ব্যাখ্যা, পরিচিতি ও শর্তাবলী	১২৬

শিরোনাম

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শিরকাতে মুফাওয়াযার বিধি-বিধান	১২৮
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শিরকাতে মুফাওয়াযার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের	
দায়-দায়িত্ব	১২৯
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : যে যে কারণে শিরকাতে মুফাওয়াযা বাতিল হয় এবং	
যে যে কারণে বাতিল হয় না	১৩৩
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের কোন একজনের	
مال مفاوضه তথা মূলধনের তাসাররুফ ও হস্তক্ষেপ করার বিবরণ	১৩৪
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ দুই শরীকের কোন একজনের	
লেন-দেনের ব্যাপারে অপর জনের হস্তক্ষেপ করার বিবরণ	১৩৯
সপ্তম অনুচ্ছেদ : শিরকাতে 'মুফাওয়ায' শরীকদের মধ্যে মত পার্থক্য হলে	১৪১
অষ্টম অনুচ্ছেদ : শিরকাতুল মুফাওয়াযার যে যে ক্ষেত্রে অংশীদারদের উপর	
ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়	১৪৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিরকাতুল ইনান এর বিবরণ	১৫১
প্রথম অনুচ্ছেদ : শিরকাতুল ইনান এর সংজ্ঞা পরিচিতি শর্ত এবং	
বিধি-বিধান	১৫১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শিরকাতুল, ইনান এর চুক্তিকালে লাভ-লোকসানের শর্ত	
আরোপ করার মাসাইল	১৫২
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শিরকাতে ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ অংশীদারদের শরীকী	
মালের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এবং তাদের কারো পক্ষ হতে নতুন করে	
কোন চুক্তি করা ও সে চুক্তির ভিত্তিতে অপরজনের উপর আবর্তিত বিধি-	
বিধান সম্পর্কিত মাসাইল	১৫৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শিরকাতে উজুহ এবং শিরকাতে আমালের বিবরণ	১৬৩
প্রথম অনুচ্ছেদ : শিরকাতে উজুহ এর পরিচিতি ও হুকুম	১৬৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শিরকাতে আমালের ব্যাখ্যা, পরিচিতি ও হুকুম	১৬৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ফাসিদ শিরকাতেবের বিবরণ	১৭০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিবিধ মাসআলা	১৭৭
অধ্যায় : ওয়াকফের বিবরণ	১৯৯-৩৮২
প্রথম পরিচ্ছেদ : ওয়াকফের সংজ্ঞা, রুকন, কারণ, বিধান, শর্তাবলী এবং যে সকল বাক্যে	
ওয়াকফ পূর্ণ হয়, কিংবা হয় না সেগুলোর বিবরণ	২০১
অনুচ্ছেদ : যে সব বাক্যে ওয়াকফ করা পূর্ণ হয় এবং যেসব বাক্যে ওয়াকফ	
করা পূর্ণ হয় না তার বিবরণ	২১১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যা ওয়াক্ফ করা জায়েয ও যা ওয়াক্ফ করা জায়েয নয় এবং ইজমালী সম্পত্তি ওয়াক্ফ করার বিবরণ	২১৫
অনুচ্ছেদ : মুশা বা যৌথ সম্পদ ওয়াক্ফ করার বিবরণ	২২০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ব্যয়ের খাতসমূহের বিবরণ	২২৪
প্রথম অনুচ্ছেদ : কোন অবস্থায় ওয়াক্ফের মাসরাফ হবে এবং কোন ব্যক্তি হতে পারে। যার জন্য ওয়াক্ফ করা শুদ্ধ হবে আর কোন ব্যক্তি মাসরাফ হতে পারবে না, যার জন্য ওয়াক্ফ করা শুদ্ধ হবে না, তার বিবরণ	২২৪
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : নিজের নিজ সন্তানদের এবং নিজ বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ	২২৯
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ওয়াক্ফ এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিচয়	২৩৮
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : গরীব আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ	২৪৫
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীদের জন্য ওয়াক্ফ	২৫৪
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : আহলে বায়ত, আল, জিনস ও 'আকিব-এর জন্য ওয়াক্ফ	২৫৬
সপ্তম অনুচ্ছেদ : মাওলা, মুদাব্বার, উম্মু ওয়ালাদের জন্য ওয়াক্ফ	২৫৮
অষ্টম অনুচ্ছেদ : গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করার পর ওয়াক্ফদাতা নিজে বা তার কোন সন্তান কিংবা আত্মীয় গরীব হয়ে গেলে	২৬২
অষ্টম অনুচ্ছেদের পরিশিষ্ট	২৬৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শর্তযুক্ত-ওয়াক্ফ ও শর্তাবলীর ব্যাখ্যা	২৬৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধান, মুতাওয়ালীর ক্ষমতা, আয় বন্টন ইত্যাদি ওয়াক্ফের আয় বন্টনের নিয়ম কেউ যদি গ্রহণ করে এবং কেউ না করে কিংবা কেউ যদি মারা যায় এবং কেউ জীবিত থাকে তখন করণীয়	২৮২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : দাবী ও সাক্ষ্য প্রসংগে	৩১০
প্রথম অনুচ্ছেদ : দাবী প্রসংগে	৩১৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সাক্ষ্য প্রসঙ্গ	৩১৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরিশিষ্ট	৩২০
সপ্তম পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফের দলীল প্রসংগে	৩২৭
অষ্টম পরিচ্ছেদ : স্বীকারোক্তি প্রসংগে	৩৩০
নবম পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফ-সম্পত্তির জবর দখল প্রসংগে	৩৩২
দশম পরিচ্ছেদ : মুমূর্ষ ব্যক্তির ওয়াক্ফ	৩৩৯
	৩৪৪

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
একাদশ পরিচ্ছেদ : মসজিদ ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে	৩৪৯
প্রথম অনুচ্ছেদ : মসজিদ যেভাবে হয় এবং এর বিস্তারিত বিধি-বিধান	৩৪৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ এবং তাতে মুতাওয়ালীর ক্ষমতা প্রসংগে	৩৫৬
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : চৌকি, কবরস্থান, সরাইখানা, রাস্তা ও জলাধারের জন্য ওয়াক্ফ এবং কবরস্থান ও ওয়াক্ফ ভূমির গাছপালা সংক্রান্ত মাসাইল	৩৬৩
কবরস্থান ও ওয়াক্ফ-ভূমির গাছ-পালা সংক্রান্ত মাসাইল	৩৬৯
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : যে সব ওয়াক্ফের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, যে ওয়াক্ফের ফসল অন্যথাতো ব্যয় করা যায় কাফিরদের ওয়াক্ফ	৩৭২
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : বিবিধ মাসাইল	৩৭৫
অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়	৩৮৩-৮৫৬
প্রথম পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা, রুকুন, শর্ত, হুকুম এবং প্রকারভেদ সমূহের বিবরণ	৩৮৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের শব্দমালা এবং ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কবজাকৃত মালের হুকুম-আহকামের বিবরণ	৩৯০
প্রথম অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের শব্দমালা	৩৯০
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কজা করে নেওয়া মালের বিধি-বিধান	৪০৭
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিক্রয় পণ্য এবং বিক্রয় মূল্যের সংজ্ঞা ও পরিচিতি এবং কবজার পূর্বে এগুলো ব্যবহার করার বিধান	৪১২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইজাব ও কবুলের মধ্যে মতভেদ হওয়ার বিবরণ	৪১৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মূল্যের জন্য বিক্রিত বস্তু আটকিয়ে রাখা এবং বিক্রেতার অনুমতিক্রমে ও তার অনুমতি ছাড়া বিক্রিত বস্তু কবজা করা ইত্যাদির বিবরণ	৪১৯
প্রথম অনুচ্ছেদ : মূল্যের জন্য বিক্রিত বস্তু আটক রাখা	৪১৯
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করা এবং কোন বস্তু কবজা হওয়া ও না হওয়ার বিবরণ	৪২২
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া বিক্রিত বস্তু কবজা করার বিবরণ	৪৩৪
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : যে কবজা ক্রয়ের কবযীয স্থলাভিষিক্ত হয় এবং স্থলাভিষিক্ত হয় না	৪৩৬
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : অন্য দ্রব্যের সাথে বিক্রয় দ্রব্যের মিশ্রণ এবং বিক্রয় দ্রব্যের ক্ষতি-সাধন করার বিবরণ	৪৪০

শিরোনাম

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : পণ্য ও মূল্য হস্তান্তরে ক্রেতা ও বিক্রেতার খরচ বহনের বিবরণ	
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিক্রয় চুক্তিতে যা কিছু পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় কিংবা হয় না	
প্রথম অনুচ্ছেদ : বাড়ি-ঘর বিক্রয়ের মধ্যে যা কিছু পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে	
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জমি এবং [দেয়াল পরিবেষ্টিত] আগুর বাগান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পরোক্ষ অন্তর্ভুক্তির বিবরণ	
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : স্থানান্তরযোগ্য বস্তু বিক্রয়কালে উল্লেখ ছাড়াও যা কিছু বিক্রয়ভুক্ত হয়	
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : খিয়ারে শর্তের বিবরণ	
প্রথম অনুচ্ছেদ : যে যে অবস্থায় খিয়ারে শর্ত সহীহ হয় এবং যে যে অবস্থায় তা সহীহ হয় না, এর বিবরণ	
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : খিয়ারের কার্যকারিতা এবং এর হকুমের বিবরণ	
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হওয়া না হওয়া এবং বাতিল হওয়া না হওয়ার আর বিবরণ	
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে খিয়ারে শর্তের ব্যাপারে মতানৈক্য হলে, এর বিবরণ	
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : বিক্রিত বস্তুর অংশবিশেষের ক্ষেত্রে খিয়ারের শর্ত আরোপ করা এবং আকদকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির জন্য খিয়ার সাবস্ত্য করার মাসাইল	
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : খিয়ারে তা'ঈন বা নির্ধারণের ইচ্ছাধিকারের বিবরণ	
সপ্তম অনুচ্ছেদ : খিয়ারে শর্তের খরিদা বস্তু রদ করার সময়, তা নির্ধারণে মতানৈক্য এবং খিয়ারের শর্তে বিক্রিত দাসের অপরাধ প্রসঙ্গ	
সপ্তম পরিচ্ছেদ : দেখার ইচ্ছাধিকার সম্পর্কিত মাসাইল	
প্রথম অনুচ্ছেদ : খিয়ারে রুয়ত সাব্যস্ত হওয়ার ধরণ এবং এর বিধি-বিধানের বিবরণ	
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : খিয়ার বাতিল করার ক্ষেত্রে যেসব বস্তু আংশিক দেখা পূর্ণ বলে গণ্য বা তার বিবরণ	
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : অন্ধ, উকীল এবং প্রতিনিধি কর্তৃক মালামাল ক্রয় করার মাসাইল	
অষ্টম পরিচ্ছেদ : খিয়ারে আয়েবেব বিবরণ	
প্রথম অনুচ্ছেদ : খিয়ারে আয়েব সাব্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া; এর হকুম, শর্ত এবং আয়েব চিনবার বিবরণ	

সতের

শিরোনাম

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জীব-জন্তুর আয়েব বোঝার উপায় এবং এর বিবরণ	৫৪৭
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : কোন দোষ ফেরত দেয়া যায় এবং যায় না অদ্রুপ ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায় বা যায় না	৫৫৩
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : আয়েবেবের দাবী এবং এ ব্যাপারে বিবাদ সাক্ষ্য উপস্থাপন	৫৮০
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : আয়েব হতে দায়মুক্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করা এবং আয়েবেবের কারণে জামানত দেওয়ার বিবরণ	৬০২
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : আয়েবেবের ব্যাপারে আপোষ নিষ্পত্তি করার বিবরণ	৬০৭
সপ্তম অনুচ্ছেদ : ওসী, উকীল এবং রুগ্ন ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি-বিধান	৬১৩
নবম পরিচ্ছেদ : যে সব বিষয় বেচাকেনা জায়েয এবং যা জায়েয নয়	৬২১
প্রথম অনুচ্ছেদ : دين (অনির্দিষ্ট বস্তু)-এর বদলে دين বেচাকেনা, ثمن (মূল্যদ্রব্য) তথা স্বর্ণ রৌপ্য এবং দিরহাম ও দিনার, বেচা কেনা করা এবং উভয় বিনিময় দ্রব্য হস্তগত করার কারণে চুক্তি বাতিল হওয়া প্রসঙ্গ	৬২১
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ফল, আগুর-গুচ্ছ, গাছের পাতা, তরমুজ ক্ষেত্র, ফসল এবং তাজা ও শুক ঘাস বিক্রি প্রসঙ্গে	৬৩০
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বন্ধকী বস্তু, ভাড়ায় প্রদত্ত সামগ্রী, জধরদখলী মালামাল, পলাতক গোলাম, জায়গীর সম্পত্তি, পতিত ভূমি ও বর্গা জমি বিক্রি প্রসঙ্গ	৬৩৮
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : জীব-জন্তু বিক্রি প্রসঙ্গ	৬৪৭
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : মুহরিম কর্তৃক শিকার বিক্রি এবং নিষিদ্ধ বস্তু সামগ্রী বিক্রি প্রসঙ্গ	৬৫০
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : 'রিবা'-এর ব্যাখ্যা ও বিধি-বিধান	৬৫৫
সপ্তম অনুচ্ছেদ : পানি ও বরফ বিক্রি প্রসঙ্গ	৬৬৬
অষ্টম অনুচ্ছেদ : পণ্য বা মূল্য অজ্ঞাত থাকা প্রসঙ্গ	৬৬৭
নবম অনুচ্ছেদ : অন্য জিনিসের সাথে সংযুক্ত দ্রব্য বিক্রি করা এবং যে বিক্রিতে অংশ বিশেষ বাদ দেয়া হয় সে প্রসঙ্গে	৬৮২
দশম অনুচ্ছেদ : এমন দুইটি পণ্য বিক্রি, যার একটি বিক্রি জায়েয নয় এবং কোন দ্রব্য বিক্রি করার পর বিক্রি মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় প্রসঙ্গ	৬৮৮
দশম পরিচ্ছেদ : যেসব শর্তের কারণে বিক্রি ফাসিদ হয় এবং যেসব শর্তের কারণে বিক্রি ফাসিদ হয় না	৬৯৩
একাদশ পরিচ্ছেদ : নাজায়েয বিক্রির বিধি-বিধান	৭২১
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : স্থগিত বিক্রি ও দুই শরীকের এক শরীক কর্তৃক বিক্রির বিধি-বিধান	৭৩১

শিরোনাম	৭৪০
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : ইকাল (ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিক্রি রহিতকরণ) প্রসঙ্গ	৭৪৭
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : মুরাবাহা, তাওলিয়া ও ওয়াযীআ	৭৫৮
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : হক প্রমাণিত হওয়া প্রসঙ্গে	
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ : বিক্রয় দ্রব্য এবং বিক্রয় মূল্যে অতিরিক্ত সংযোজন, মূল্য থেকে বিয়োজন, এবং মূল্য হতে অব্যাহতি দান	৭৬৮
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : পিতা ও ওয়াসী কর্তৃক নাবালকের মাল বেচাকেনা প্রসঙ্গ	৭৭৪
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : বায়উস-সালাম (দাদন বিক্রয়)	৭৮৩
প্রথম অনুচ্ছেদ : 'বায়উস-সালাম'-এর ব্যাখ্যা, এর রুকন, শর্তাবলী ও হকুম সম্পর্কে	৭৮৩
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : কোন দ্রব্য বায়উস-সালাম জায়েয এবং কোন দ্রব্য জায়েয নয়	৭৮৮
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : রাসুল-মাল (বিনিময় মূল) ও মুসলাম ফীহি (পণ্য) কবজা সংক্রান্ত মাসাইল	৭৯৭
চতুর্থ অনুচ্ছেদ : রাক্বুস-সালাম ও মুসলাম-ইলায়হির মধ্যকার বিরোধ প্রসঙ্গ	৮০৬
পঞ্চম অনুচ্ছেদ : বায়উস-সালামের ইকাল (রহিতকরণ), অন্য কিছু	
বিনিময়ে আপোষরফা ও দোষজনিত ইখতিয়ার	৮১৫
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : বায়উস-সালামের ক্ষেত্রে উকীল (প্রতিনিধি)নিয়োগ প্রসঙ্গ	৮২০
উনবিংশ পরিচ্ছেদ : ঋণ দান ও গ্রহণ এবং অর্ডারে মাল তৈরি প্রসঙ্গ	৮২৬
বিশতম পরিচ্ছেদ : মাকরুহ বেচাকেনা ও নাজায়েয মুনাফা প্রসঙ্গ	৮৩৯
অনুচ্ছেদ : মজুদদারী প্রসঙ্গ	৮৪৯

كتاب الجهاد

অধ্যায় : জিহাদ



অধ্যায় : জিহাদ

[অবশিষ্টাংশ]

নবম পরিচ্ছেদ : মুরতাদের বিধি-বিধান

১. মাসআলা : ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগকারী ব্যক্তিকে শরীআতের পরিভাষায় মুরতাদ^১ (مرتد) বলা হয় (আনুনাহরুল ফায়িক)। রিদ্দত (ردة) মূলকথা হল, ঈমান আনার পর মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করা। রিদ্দত (মুরতাদ হওয়া) ধর্তব্য হওয়ার জন্য শর্ত হল; সুস্থ মস্তিষ্ক ও জ্ঞানবান (عقل) হওয়া। সুতরাং পাগল এবং উন্মাদ ব্যক্তির মুরতাদ হওয়া ধর্তব্য নয়। তদ্রূপ যে বালক জ্ঞানবান নয় তার মুরতাদ হওয়া ধর্তব্য হবে না। আর যে ব্যক্তি কখনো পাগল থাকে আবার কখনো সুস্থ থাকে; সে যদি পাগল অবস্থায় মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার ইরতিদাদ ধর্তব্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি সুস্থ থাকা অবস্থায় মুরতাদ হয় তাহলে তার ইরতিদাদ ধর্তব্য হবে। মাতাল ব্যক্তি যার হৃশ-জ্ঞান বিলুপ্ত তার রিদ্দতও ধর্তব্য হবে না। রিদ্দত ধর্তব্য হওয়ার জন্য বালিগ হওয়া বা পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। ইরতিদাদ ধর্তব্য হওয়ার জন্য স্বতঃস্ফূর্ততার বিষয়টি অন্যতম শর্ত। সুতরাং চাপ প্রয়োগকৃত ব্যক্তির রিদ্দত সহীহ হবে না (আল-বাহরুর রায়িক বাদায়ে এর সূত্রে)। যে বালক এ কথা বুঝে এবং জানে যে, ইসলাম জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির উপায় এবং যে হালাল হারামের পার্থক্য বুঝে আর যে মিঠা ও তিতার মধ্যে পরখ করতে পারে তাকে জ্ঞানবান বালক বলে গণ্য করা হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)। ফাভওয়ায়ে কারিইল হিদায়া গ্রন্থে আছে যে, এ জাতীয় সমঝদার হওয়ার জন্য নূন্যতম পক্ষে সাত বছর বয়সী হওয়া আবশ্যিক (আনুনাহরুল ফায়িক)।^২ বরসাম রোগের কারণে অথবা কোন কিছু খাওয়ার কারণে যদি কেউ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যায় এবং প্রলাপ বকতে বকতে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার ইরতিদাদ ধর্তব্য হবে না। এমনিভাবে মতিভ্রম; ওয়াস ওয়াসা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি একে অকল-জ্ঞান শূন্য ব্যক্তি (তা যে কোন কারণেই হোক না কেন)- এর মুরতাদ হওয়ার বিষয়টিও ধর্তব্য হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)।

১. (مصدر) অর্থ দিয়ে (ارتداد) (ক্রিয়মূল)। অর্থ স্বধর্মত্যাগী। اسم فاعل শব্দটি مرتد যাওয়া, ধর্ম ত্যাগ করা। আর ردة হল, ارتدة এর اسم (বিশেষ্য)।

২. এক প্রকার ব্যাধি; ভিন্ন মতে বক্ষ ব্যাধি বা ফুসফুসে পানি জমে যাওয়া।

২. মাসআলা : কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) তাহলে তার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হবে। তার মনে কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হলে এবং তা প্রকাশ করলে তা দূর করে দেওয়া হবে। তবে আমাদের মাশায়িখে কিরাম বলেছেন যে, মুরতাদ ব্যক্তির সামনে পুনরায় ইসলামের দাওয়াত পেশ করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব (ফাতহুল কাদীর)। পুরুষ মুরতাদকে তিন দিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হবে। যদি এ সময়ের মধ্যে সে মুসলমান হয়ে যায় তবে ভাল। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। উল্লেখ্য যে, এই তিন দিন সময় তখনই তাকে দেওয়া হবে-যদি সে সময় চায়। সময় না চাইলে তৎক্ষণাৎই তাকে হত্যা করা হবে। উপরোক্ত বিধানের ক্ষেত্রে আযাদ ও গোলাম উভয়ই সমান। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (মুহীত)।

মুরতাদ ব্যক্তির মুসলমান হওয়ার নিয়ম হলো, সে মুখে কালেমায়ে শাহাদত উচ্চারণ করবে এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্মাদেশ এবং বিশেষভাবে সে যে ধর্ম অবলম্বন করেছে তা থেকে নিজের সম্পর্ক হীনতার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করবে (মুহীত)। ফকীহ নাতিফী (র) হাসান (র)-এর “কিতাবুল ইরতিদাদ” এর সূত্রে “আজনাস” নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, যদি মুরতাদ ব্যক্তি তওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে; তারপর আবার কুফরীর দিকে ফিরে যায়; সে যদি এভাবে তিনবার করে এবং প্রতিবারই রাষ্ট্র প্রধানের নিকট সময় চায় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তাকে প্রতিবারে তিন দিন করে সময় দিবেন। তারপর সে যদি চতুর্থবার আবার কুফরীর দিকে ফিরে যায় তাকে আর সময় দেওয়া হবে না। এমতাবস্থায় সে যদি তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যায় তবে ভাল। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম কারখী (র) তার মুখতাসার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, তৃতীয়বারের পরও সে যদি ইসলাম থেকে ফিরে যায় এবং তাকে রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট ধরে আনা হয় তাহলে এমতাবস্থায়ও তাকে তওবা করার জন্য আহ্বান করা হবে। যদি তওবা না করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি তওবা করে তবে তাকে শক্তভাবে প্রহার করা হবে। তবে এ প্রহার যেন দণ্ড (۱۱) পর্যায়ে না যায়, এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এরপর তাকে বন্দী করে রাখা হবে। কয়েদখানা থেকে তাকে বের করা হবে না, যতক্ষণ না তার মধ্যে তওবার প্রতিক্রিয়া তথা বিনয় ইত্যাদি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং যাবত না তার অবস্থা একজন মুসলিম মানুষের অবস্থার অনুরূপ হয়। যখন তার অবস্থা অনুরূপ হবে। তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এরপর পুনরায় সে যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার সাথে সর্বদা পূর্ববৎ আচরণ করা হবে- যাবত না সে ইসলামের দিকে ফিরে আসবে। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ না করা পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হবে না। আবুল হাসান কারখী (র) বলেন, এটিই আমাদের সকল ইমামের অভিমত যে, সব সময়ই মুরতাদ ব্যক্তিকে তওবা করার জন্য আহ্বান করা হবে (গায়াতুল বয়ান)।

৩. মাসআলা : মুরতাদ ব্যক্তির সামনে পুনরায় ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পূর্বে তাকে হত্যা করা বা তার কোন অঙ্গ কর্তন করা মাকরুহ তানযীহী (ফাতহুল কাদীর)। তবে এতে হত্যাকারী বা কর্তনকারীর উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। অবশ্য রাষ্ট্রপ্রধানের হুকুম ছাড়া

এরূপ করা হলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে (গায়াতুল বয়ান)। জ্ঞানবান কোন বালক যদি মুরতাদ হয়ে যায় তবে, ইমাম আবু হানীফা এবং মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার ইরতিদাদ ধর্তব্য হবে। তাকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্য করা হবে, কিন্তু হত্যা করা হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সের কোন বালক ধর্ম ত্যাগ করলে একই হুকুম (মুহীত : আস-সারাকসী)।

৪. মাসআলা : কোন মহিলা যদি মুরতাদ হয়ে যায় তবে তাকে হত্যা করা হবে না। বরং তাকে কয়েদ করে রাখা হবে-যাবত না পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। আর প্রতি তিন দিন অন্তর অন্তর তাকে প্রহার করা হবে-ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে। কেউ যদি এ জাতীয় মহিলাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে এখানে যেহেতু সন্দেহ (شبهة) রয়েছে। তাই হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কোন দাসী যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তার উপর চাপ প্রয়োগ করার দায়িত্ব মুনীবের। কেননা মুনীবের দুই ধরনের অধিকার রয়েছে। (১) মুনীবের বাড়িকে ঐ মুরতাদ মহিলার জন্য কয়েদখানা বানিয়ে দেওয়া হবে (২) এবং তাকে সাজা দেওয়ার দায়িত্বও মুনীবের উপরই থাকবে। এ অবস্থায়ও মুনীব তার থেকে খিদমত গ্রহণ করতে পারবে। “আসল” গ্রন্থে আছে যে, মুনীবের প্রয়োজন হলেই কেবল দাসীকে তার নিকট ন্যস্ত করা হবে। কিন্তু সহীহ অভিমত হল মুনীবের প্রয়োজন হোক বা না হোক; সে তাকে কামনা করুক বা না করুক সর্বাবস্থায়ই দাসীকে মুনীবের হাওয়ালা করা হবে (তাবয়ীন)। তবে মুনীব তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। মুরতাদ বালিকা যদি বুদ্ধিমতি হয় তবে তার হুকুম বয়ঃপ্রাপ্ত মহিলার হুকুমের অনুরূপ হবে। হিজড়া মানুষের হুকুম মহিলার অনুরূপ হবে (আনু নাহরুল ফায়িক)।

৫. মাসআলা : আযাদ মহিলা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর যতদিন পর্যন্ত সে দারুল ইসলাম থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাকে দাসী বানানো যাবে না। অবশ্য সে যদি দারুল হরবে চলে যায় আর তাকে ধৈর্যতার করে আনা হয়, তাহলে তাকে দাসী বানানো যাবে। নাওয়ারদির গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, আযাদ মুরতাদ মহিলাকে দারুল ইসলামে থাকা অবস্থায়ও দাসী বানানো যাবে। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, এই বর্ণনার ভিত্তিতে ফাতওয়া প্রদান করা হলে দোষের কিছু নেই। মহিলার যদি স্বামী বর্তমান থাকে তাহলে স্বামীর উচিত হবে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে তাকে খরিদ করে নেওয়া অথবা তার অনুকূলে তাকে রাষ্ট্রপ্রধান হিবা করে দিবে। যদি সে এর যথাযথ খাত (مصرف) হয়ে থাকে। তখন সে ঐ মুরতাদ মহিলার মালিক হয়ে যাবে। এহেন অবস্থায় সে যেন পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে এ জন্য স্বামী তাকে কয়েদ করতে এবং প্রহার করতে পারবে (ফাতহুল কাদীর)। বিশর ইবন ওয়ালীদ (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যদি কোন মুরতাদ ব্যক্তি নিজের মুরতাদ হওয়ার কথা অস্বীকার করে, তাওহীদ ও রিসালাতের কথা স্বীকার করে এবং দীন ইসলামের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে তাহলে এটি তার পক্ষ থেকে তওবা হিসাবে গণ্য হবে (মুহীত)।

৬. মাসআলা : মুরতাদ হওয়ার কারণে মুরতাদ ব্যক্তির মালের মালিকানা (موقوفه) (স্থগিত) হয়ে যায়। তারপর সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করলে তার মালিকানা বহাল হয়ে যায়। যদি মুরতাদ অবস্থায় সে মারা যায় বা নিহত হয় তবে ইসলামের অবস্থায় সে যা উপার্জন করেছে এর দ্বারা ঋণ পরিশোধ করার পর (যদি ঋণ থাকে) যা উদ্ধৃত থাকবে এর মালিক হবে তার মুসলমান ওয়ারিসগণ। আর মুরতাদ অবস্থায়ই যা কামাই করেছে এর দ্বারা ঋণ পরিশোধ করার পর যা উদ্ধৃত থাকবে তা ফায় (فی) হিসাবে গণ্য হবে। এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। আর সাহেবাইনের মতে মুরতাদ হওয়ার পর মাল থেকে তার মালিকানা রহিত হবে না। যে ব্যক্তি মুরতাদ থেকে মীরাসপ্রাপ্ত হবে তার ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র)- হতে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুরতাদ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় বা তার হত্যার সময় কিংবা তার (মুরতাদের) হরবীদের সাথে মিলিত হয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়ার সময় যে তার ওয়ারিস হবে সে-ই তার ওয়ারিস বলে গণ্য হবে এবং তার থেকে মিরাস প্রাপ্ত হবে। এটিই বিতর্কিত অভিমত। মুরতাদ ব্যক্তির মারা যাওয়া বা নিহত হওয়া কিংবা তার উপর দারুল হরবে গিয়ে হরবীদের সাথে মিলিত হওয়ার হুকুম দেওয়ার সময় তার স্ত্রী যদি ইদ্দতের অবস্থায় থাকে তবে এ মুসলিম মহিলাও তার থেকে মিরাস প্রাপ্ত হবে। কেননা সে মুরতাদ হয়ে পলায়ন করতে চাচ্ছে।^১ কারণ রিদ্দতের বিষয়টি অসুস্থ হওয়ার মতই। স্বামী তার মুরতাদ স্ত্রীর পরিত্যাজ্য সম্পদ থেকে মিরাস পাবে না। কিন্তু যদি উক্ত মহিলা রুগ্ন হয় তবে মীরাস পাবে। এ জাতীয় মহিলার থেকে যারা যারা মীরাসের হকদার এ পর্যায়ের সমস্ত আত্মীয়-স্বজনই তার থেকে মিরাস প্রাপ্ত হবে। এমনকি মুরতাদ অবস্থায় সে যা কামাই করেছে তারা এর থেকেও হিস্যা পাবে (তাবয়ীন)।

৭. মাসআলা : যদি মুরতাদ ব্যক্তি ইরতিদাদের অবস্থায় দারুল হরবে চলে যায় অথবা শাসক যদি দারুল হরবে গমনের ঘোষণা দিয়ে দেয় তাহলে তার মুদাঙ্গার ও উম্মু ওয়ালাদ সবই আযাদ হয়ে যাবে এবং তার যাবতীয় মেয়াদী ঋণ তৎক্ষণাৎ আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর সে মুসলমান অবস্থায় যে মাল কামাই করেছে তা তার মুসলমান ওয়ারিসদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে আমাদের ফকীহদের একমত। আর মুসলমান অবস্থায় সে যা ওসীয়াত করেছে মাবসূত ও অন্যান্য গ্রন্থের যাহিরী রিওয়াযাত অনুসারে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। চাই সে ওসীয়াত কোন সওয়াবের বিষয়ে হোক বা না হোক, এতে কোন পার্থক্য নেই এবং এতে কারো দ্বিমতও নেই (ফাতহুল কাদীর)। মুরতাদ ব্যক্তি সন্দেহহীন অবস্থায় যতদিন অবস্থান করে ততদিন বিচারক উপরোক্ত বিধানসমূহের কোন বিধান তার উপর জারী করবেন না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : যদি ইরতিদাদের অবস্থায় মুরতাদ ব্যক্তির কোন (تصوف) বা পদক্ষেপ চার প্রকার হতে পারে। (১) এমন কাজ যা সমস্ত ইমামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্যকরী হয়ে থাকে। যেমন হাদিয়া কবুল করা এবং দাসীর গর্ভে বাচ্চা জন্ম দেওয়া।

১. অর্থাৎ সে তার স্ত্রীকে তার মীরাসে শরীক করতে চাচ্ছে, এ কারণেই সে রিদ্দত অবলম্বন করেছে।

সুতরাং যদি দাসীর গর্ভ হতে কোন বাচ্চা প্রসবিত হয় এবং সে এই বাচ্চার নসবের দাবী করে তবে তার থেকে এ বাচ্চার নকব সাব্যস্ত হবে। ফলে অপরাপর ওয়ারিসদের সাথে সেও তার পরিত্যাজ্য সম্পদের মীরাসপ্রাপ্ত হবে এবং এই দাসী তার উম্মু ওয়ালাদ বলে গণ্য হবে। এমনভাবে যদি মুরতাদ ব্যক্তি তার প্রাপ্য ওফআ ক্রেতার অনুকূলে হস্তান্তর করে তবে তা সহীহ ও কার্যকরী হবে এবং ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া গোলামের উপরও যদি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তবে তাও কার্যকরী হবে। (২) এমন কাজ যা ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে বাতিল। যেমন মুরতাদ ব্যক্তির বিবাহ-শাদী করা। সুতরাং মুরতাদ ব্যক্তির জন্য জাইয হবে না কোন মুসলমান, মুরতাদ বা যিম্মী মহিলাকে বিবাহ করা। চাই সে আযাদী রমণী হোক বা দাসী হোক। তার যবাহকৃত পশু হারাম এবং কুকুর, বাজ ইত্যাদি পশু-পাখী দ্বারা তার শিকারকৃত পশু খাওয়াও হারাম। এমনভাবে তীর বর্শা নিক্ষেপ করে ত শিকারকৃত পশুও বৈধ নয়। (৩) এমন কাজ যা ইমামগণের সকলের নিকটেই (موقوف) স্থগিত বলে গণ্য হবে। যেমন তার শিরকতে মুফাওয়াযা করা। অতএব সে যদি কে মুসলমানের 'মুফাওয়াযার' ভিত্তিতে অংশীদারি কারবার করে তবে তা সমস্ত ইমামগণের মতে স্থগিত বলে গণ্য হবে। অবশ্য পুনরায় মুসলমান হওয়ার পর তা আবার কার্যকরী হবে। যদি মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় বা তাকে হত্যা করা হয় কিংবা বিচারক তার সম্পর্কে হরবীদের সাথে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে ফায়সালা দেয় তাহলে তার সম্পাদিত শিরকতে মুফাওয়াযা বাতিল হ যাবে এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা শিরকতে ইনানে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা মূলতই বাতিল হয়ে যাবে। (৪) এ কাজ যা (موقوف) (স্থগিত) থাকবে কি থাকবে না সে ব্যাপারে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। যেমন তার বেচাকেনা, ইজারা, দাস মুক্ত করা, সাধারণ দাস-দাসীকে মুদাঙ্গার ও মুকাত বানানো, ওসীয়াত করা বা পাওনা হস্তগত করা ইত্যাদি। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ জাতীয় কর্মকাণ্ড স্থগিত থাকবে। যদি সে পুনরায় মুসলমান হয় তবে তা কার্যকরী হবে। যদি সে লোক মারা যায় বা তাকে হত্যা করা হয় কিংবা বিচারক তার সম্পর্কে হরবীদের সাথে মিলিত হওয়ার ফায়সালা দেয় তাহলে উক্ত আক্দ্দসমূহ বাতিল হয়ে যাবে। মুকাত ব্যক্তি যদি দারুল হরবে গিয়ে ইরতিদাদের অবস্থায় চুক্তি জাতীয় কোন কাজ করে তা ইমামগণের সকলের মতেই তার এ কাজ কার্যকরী হবে (মাবসূত)।

৯. মাসআলা : যদি মুরতাদ ব্যক্তি তওবা করে দারুল ইসলাম ফিরে আসে এবং তার ফিরে আসার বিষয়টি যদি বিচারক কর্তৃক তার সম্পর্কে দারুল হরব গিয়ে হরবীদের সাথে মিলিত হওয়ার ফায়সালা দেওয়ার আগে হয়ে থাকে তাহলে তার ধন-সম্পদের ব্যাপারে রিদ্দতের হুকুম বাতিল বলে গণ্য হবে। যেন সে সর্বদা ইসলামের উপরই বহাল ছিল কাজেই তার উম্মু ওয়ালাদ এবং মুদাঙ্গার দাস-দাসীরা আযাদ হবে না। আর যদি বিচারক ফায়সালার পর সে তওবা করে ফিরে আসে তবে যে সব মালামাল সে তার ওয়ারিসদের হাতে (কাছে) মওজুদ পাবে সেগুলো নিয়ে নিবে। আর ওয়ারিসগণ যে সব মালামাল হস্তান্তর করে ফেলেছে সেগুলো সে আর ফিরে পাবে না। চাই এ সব মালামাল فسخ (বাতিল বা র

যোগ্য কোন বিষয় হোক যেমন; বেচাকেনা, হিবা ইত্যাদি; অথবা فسخ যোগ্য বিষয় না হোক যেমন দাস মুক্ত করা, মুদাববার বা উম্মু ওয়ালাদ বানানো ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে এহেন অবস্থায় ওয়ারিসদের উপর কোন ক্ষতিপূরণও ওয়াজিব হবে না (গায়াতুল বয়ান)।

১০. মাসআলা : মুরতাদ ব্যক্তি তার ঐ খৃস্টান দাসীর সাথে সঙ্গম করল যে ইসলামের অবস্থায় তার অধিকারভুক্ত ছিল। তারপর তার মুরতাদ হওয়ার সময় হতে ছয় মাসের অধিক পর সে দাসী সন্তান প্রসব করে এবং সে ঐ সন্তানের নসব দাবী করে তাহলে ঐ দাসী তার উম্মু ওয়ালাদ হবে এবং সন্তান তার পুত্র হিসাবে গণ্য হবে। আর সে আযাদ মানুষ হিসাবে বিবেচিত হবে (হিদায়া)। তারপর যদি ঐ মুরতাদ মারা যায় বা তাকে হত্যা করা হয় তাহলে তার সন্তান তার ওয়ারিস হবে না। দাসী যদি মুসলমান হয় তবে সন্তান তার মীরাসপ্রাপ্ত হবে। চাই সে রিদ্দতের অবস্থায় মারা যাক অথবা দারুল হরবে চলে যাক। মুরতাদ যদি নিজের মাল-সামানা দারুল হরব চলে যায়; আর মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে ঐ মাল হস্তগত করে নেয় তবে তা (فی) হিসাবে গণ্য হবে। এ মালের ব্যাপাবে তার ওয়ারিসদের কোন অধিকার থাকবে না। যদি মুরতাদ ব্যক্তি দারুল হরব চলে যায় তারপর দারুল ইসলামে এসে নিজের মাল-সামান নিয়ে পুনরায় দারুল হরব চলে যায়; এরপর মুসলিম বাহিনী জয়যুক্ত হয়ে ঐ মাল হস্তগত করে নেয় তাহলে এ মাল তার ওয়ারিসদের নিকট (যারা দারুল ইসলামে আছে) ফেরত দেওয়া হবে। বন্টনের পরে হলে মূল্যের বিনিময়ে হরব চলে যায় এবং দারুল ইসলামে তার কোন গোলাম থেকে যায় তাহলে তার সন্তান ঐ গোলামের মালিক হবে। তারপর পুত্র ঐ গোলামের মুকাতাব করে নেওয়ার পর মুরতাদ পিতা যদি তওবা করে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে তাহলে কিতাবাত বহাল থাকবে। তবে মুকাতাবা এবং ওয়ালা (৫৭)-এর হকদার ঐ ব্যক্তিই হবে যে তওবা করে মুসলমান হয়ে ফিরে এসেছে (কাফী)। পক্ষান্তরে সে যদি ঐ মুকাতাব গোলামকে আযাদ করার পর ফিরে আসে তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। কেননা এক্ষেত্রে সন্তানই (৫৮) এর হকদার হবে (নিহায়া)।

১১. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মদ (র) জামে সগীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন মুরতাদ ব্যক্তি ভুলক্রমে কাউকে হত্যা করে দারুল হরব চলে যায় এবং রিদ্দতের অবস্থায় মারা যায় বা তাকে হত্যা করা হয় অথবা সে যদি দারুল ইসলামে জীবিত অবস্থায় থাকে তাহলে ফকীহগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে মুরতাদ ব্যক্তির মাল থেকে এর দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করা হবে। সে যদি শুধু ইসলামের অবস্থায় অথবা রিদ্দতের অবস্থায় মাল কামাই করে থাকে তবে এর দ্বারাই পূর্ণ দিয়াত আদায় করা হবে। আর সে যদি উভয় অবস্থায় মাল কামাই করে থাকে তবে উভয় প্রকার কামাই দ্বারাই দিয়াত পরিশোধ করা হবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে ইসলামের অবস্থায় সে যা উপার্জন করেছে প্রথমে এর দ্বারা দিয়াত পরিশোধ করার চেষ্টা করা হবে। তারপর যদি কিছু অনাদায় থেকে যায় তবে তা ইরতিদাদের অবস্থায় কামাইকৃত মাল থেকে পরিশোধ করা হবে (মুহীত)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মুরতাদ ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হওয়ার আগে মারা যায় বা তাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু যদি সে মুসলমান হওয়ার পর মারা যায় অথবা মারা যায়নি তবে ফকীহদের

সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হতে উভয় অবস্থায় কামাই দ্বারাই উক্ত দিয়াত পরিশোধ করা হবে (তাবয়ীন)।

১২. মাসআলা : মুরতাদ যদি কোন মাল গসব করে নিয়ে আসে বা কোন মাল নষ্ট করে ফেলে তাহলে সকল ইমামের মতে তার মাল থেকেই এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে। আর এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি গসব করা বা মাল নষ্ট করার বিষয়টি সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে মুরতাদ ব্যক্তির স্বীকারোক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হলে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উভয় অবস্থায় কামাই থেকেই এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হবে। আর আবু হানীফা (র)-এর মতে ক্ষতিপূরণ রিদ্দতের অবস্থায় উপার্জন থেকে পরিশোধ করা হবে। শায়খুল ইসলাম (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মুরতাদ ব্যক্তি অপরাধী হয়। পক্ষান্তরে যদি মুরতাদ মজলুম হয়, যেমন মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর কেউ তার হাত বা পা কেটে দিল, তাহলে তার সমাধান সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র) 'আসল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হাত পা কর্তনকারী ব্যক্তির উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। চাই এই কর্তনের কারণে সে লোক মুরতাদ অবস্থায় মারা যাক অথবা মুসলমান অবস্থায় মারা যাক। উল্লেখ্য যে, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মুরতাদ অবস্থায় অপর কোন মুসলমান ভুলে বা ইচ্ছায় কারো হাত-পা কর্তন করার পর হাত-পা কর্তিত ব্যক্তি যদি মুরতাদ হয়ে যায় এবং এই কর্তনের কারণে মুরতাদ অবস্থায় সে মারা যায় তাহলে কর্তনকারী ব্যক্তির উপর হাতের দিয়াত প্রদান করা ওয়াজিব হবে চাই ইচ্ছাকৃতভাবে কর্তন করুক বা ভুলক্রমে কর্তন করুক। এক্ষেত্রে নফসের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কর্তন করে থাকে তাহলে কর্তনকারী ব্যক্তির মাল থেকে এর দিয়াত পরিশোধ করতে হবে। আর ভুলে কর্তন করে থাকলে কর্তনকারী ব্যক্তির আকিলা (أقلا) অর্থাৎ নিকটাত্মীয়ের উপর এর দিয়াত ওয়াজিব হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি এ কর্তনের কারণে মুরতাদ অবস্থায়ই সে মারা যায়। পক্ষান্তরে সে যদি পুনরায় মুসলমান হয় এবং এ কর্তনের কারণে মুসলমান অবস্থায় সে মারা যায় এবং সে যদি রিদ্দতের অবস্থায় দারুল হরব না গিয়ে থাকে অথবা যাওয়ার পর আক্রান্ত ঘোষণা জারী হওয়ার আগেই ফিরে আসে তবে ইসতিহসানের ভিত্তিতে তার উপর এক নফসের দিয়াত ওয়াজিব হবে। চাই সে ভুলে হত্যা করুক বা ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করুক। তবে ভুলে হত্যা করে থাকলে তার আকিলা তথা নিকটাত্মীয়ের উপরে এর দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করে থাকলে এ দিয়াত তার মাল থেকেই পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম ইউসুফ (র) ও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন (মুহীত)। যদি মুরতাদ ব্যক্তি দারুল হরবে চলে যায় এবং বিচারকের পক্ষে থেকেও এ সম্পর্কে ফায়সালা দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর সে মুসলমান হয়ে ইসলামে ফিরে আসে এবং এ কর্তনের কারণে মারা যায় তাহলে কর্তনকারী ব্যক্তির উপর অর্ধেক দিয়াত ওয়াজিব হবে (গায়াতুল বয়ান)। যে ব্যক্তির হাত কাটা হয়েছে সে ইসলামের উপর বাকী আছে এবং হত্যাকারী ব্যক্তি যদি মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। তারপর মুরতাদ হওয়ার কারণে তাকে হত্যা

করার পর হাত কর্তিত ব্যক্তি যদি মারা যায় তবে "আসল" গ্রন্থের বর্ণনা মতে এ কথা দেখতে হবে যে, সে ইচ্ছাকৃত ভাবে তার হাত কর্তন করেছে না ভুলক্রমে কর্তন করেছে। যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে কর্তন করে থাকে এবং উক্ত (কর্তিত) ব্যক্তির যখন যদি অসম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার নিকট আত্মীয়ের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর সে লোক যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে তার নিকটাত্মীয়দের উপর নফসের দিয়াত ওয়াজিব হবে।

১৩. মাসআলা : মুদাব্বার বা উম্মু ওয়ালাদ, দাসী মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যাওয়ার পর তার মুনীব দারুল ইসলামে মারা গেছে। এরপর তাদেরকে কয়েদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হয়েছে তাহলে সে (ف) হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু কোন দাসী যদি মুনীবের মালিকানা থেকে হরবীদের হাতে চলে যায়; তারপর সে বন্দী হয়ে দারুল ইসলামে আসে তাহলে তাকে মুনীবের নিকট ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে (মুহীত)। কোন মুকাতাব গোলাম মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেছে এবং সেখানে কিছু টাকা-পয়সা উপার্জন করেছে। তারপর মালামালসহ তাকে বন্দী করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হয়েছে। তারপর ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পর সে তাতে অস্বীকৃতি ব্যক্ত করায় তাকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। এহেন অবস্থায় তার মাল দ্বারা তার মুনীবের বদলে কিতাবাত আদায় করা হবে। এরপর যা বাকী থাকবে তা তার ওয়ারিসদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে (হিদায়া)। আর তার পরিত্যাজ্য সম্পদ দ্বারা যদি বদলে কিতাবাত আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদ যা আছে তা সবটা মুনীবের বলেই গণ্য হবে (কাফী)।

১৪. মাসআলা : কোন এক গোলাম নিজ মুনীবসহ মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেল। তারপর মুনীব সেখানেই মারা গেল এবং গোলামকে দারুল হরবে থেকে বন্দী করে দারুল ইসলাম নিয়ে আসা হল, তাহলে এই গোলাম (ف) হিসেবে গণ্য হবে। যদি সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। যদি কোন গোলাম মুরতাদ হয়ে মুনীবের মাল নিয়ে দারুল হরবে চলে যায় এবং পরে তাকে পাকড়াও করে মালসহ দারুল ইসলামে আনা হয় তবে সে (ف) হিসেবে গণ্য হবে না। বরং তাকে মুনীবের নিকট ফেরত দেওয়া হবে। যদি মুসলমানদের একটি দল মুরতাদ হয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াই করে তাদের কোন শহরের উপর জয়যুক্ত হয় এবং সে শহরটি যদি দারুল হরবে হয়; আর তাদের সাথে যদি তাদের সন্তানাদি ও স্ত্রীগণও থাকে; তারপর যদি মুসলিম বাহিনী তাদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহলে তাদের পুরুষ লোকদের হত্যা করা হবে এবং মহিলা ও বাচ্চাদেরকে বন্দী করে রাখা হবে (মাবসুত)।

১৫. মাসআলা : যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়; তারপর মহিলা গর্ভবতী হয় এবং তার বাচ্চা পয়দা হয়; এরপর এই বাচ্চা বড় হয় এবং তার থেকেও বাচ্চা পয়দা হয়; তৎপর মুসলিম বাহিনী তাদের উপর জয়যুক্ত হয়, তাহলে এই বাচ্চারা সকলেই (ف) হিসেবে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে প্রথম বাচ্চাটিকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু বাচ্চার বাচ্চাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা যাবে

না। যদি উক্ত মহিলা দারুল ইসলামে থাকা অবস্থায় গর্ভবতী হয়, তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ববৎ বিধান প্রযোজ্য হবে (কাফী)। নাওয়াদির গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মুরতাদ হয়ে নিজেদের ছোট বাচ্চাসহ ইসলাম থেকে দারুল হরবে চলে যায়, তারপর এ বাচ্চা বড় হয় এবং তার থেকেও সন্তান পয়দা হয়, এরপর এই বাচ্চার বাচ্চার উপর মুসলিম বাহিনী জয়যুক্ত হয়; তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে তাকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে (মুহীত)। যে বাচ্চার ইসলাম পিতা-মাতার অধীন (تابع) সে যদি মুরতাদ অবস্থায় বালিগ হয় তবে কিয়াসের দৃষ্টিতে তাকে হত্যা করা যাবে। কিন্তু ইসতিহসানের দৃষ্টিতে তাকে হত্যা করা যাবে না। নাবালিগ অবস্থায় কেউ মুসলমান হয়েছিল তারপর মুরতাদ অবস্থায় সে বালিগ হয়েছে তাহলে কিয়াসের দৃষ্টিতে মুরতাদ অবস্থায় তাকে হত্যা করা হবে না। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে যাকে বাধ্য করা হয়েছে সে যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে ইসতিহসানের দৃষ্টিতে তাকে হত্যা করা হবে না। উপরোক্ত তিন অবস্থায় তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্য করা হবে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই কেউ যদি তাকে হত্যা করে তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। দারুল ইসলামে যে সন্তানটিকে পাওয়া গেছে তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা হবে। আর সে যদি কাফির অবস্থায় বালিগ হয় তবে তাকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বাধ্য করা হবে। কিন্তু হত্যা করা যাবে না (ফাতহুল কাদীর)।

অনুচ্ছেদ : কুফর সাব্যস্তকারী বিষয়সমূহ কয়েক প্রকার

এক. ঈমান ও ইসলামের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি

১. মাসআলা : কেউ যদি বলে জানি না আমার ঈমান সहीহ আছে কিনা, তবে তা গুরুতর ভ্রষ্টতা বলে গণ্য হবে। তবে সে যদি এর দ্বারা সন্দেহ না থাকা বুঝাতে চায় তাহলে ভিন্ন কথা। কেউ যদি নিজের ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে যে, আমি ঈমানদার ইনশাআল্লাহ তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি ব্যাখ্যা দিয়ে বলে যে, আমি দুনিয়া থেকে ঈমানদার অবস্থায় যেতে পারব কিনা, তা আমার জানা নেই; তাই আমি এ কথা বলছি। তাহলে সে কাফির হবে না। কেউ যদি কুরআন মজীদ সম্পর্কে বলে যে, এটি মাখলুক তবে সে কাফির হয়ে যাবে। এমনিভাবে ঈমান মাখলুক বললেও কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, ঈমান এবং কুফর একই তাহলে কাফির বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি ঈমানের উপর রাযী নয় সে কাফির বলে গণ্য হবে (যখীর)।

২. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি নিজের কুফরীর উপর রাযী থাকে তবে সে তো কাফির হবেই। কিন্তু অপরের কুফরীর উপর রাযী থাকলে সে কাফির হবে কিনা, এ সম্পর্কে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কিতাবুত তাখরীর গ্রন্থে কুফরী শব্দাবলীর আলোচনায় বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি অপরের কুফরীর ব্যাপারে রাযী থাকে যেন সে চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করে তবে সে কাফির হবে না। আর যদি অন্যের কুফরীর ব্যাপারে এ জন্য রাযী থাকে যাতে সে আল্লাহ ও তাঁর সিফাত সম্বন্ধে অশোভন কথা বলে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। এর উপরই ফাতাওয়া (আত-তাতার খানিয়া)।

৩. মাসআলা : কেউ যদি বলে যে, ইসলামের গুণ ও বৈশিষ্ট্য আমি জানি না তবে সে কাফির হয়ে যাবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ামী (র) এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, এ ধরনের মানুষের না কোন দীন আছে; না নামায-রোযা, ইবাদত-বন্দেগী আছে এবং না আছে তার কোন বিবাহ-শাদী। সুতরাং তার সন্তান-সন্ততি সবই হবে হারামযাদা। জামে গ্রন্থে আছে, কোন মুসলমান পুরুষ নাবালিগ কোন খৃস্টান কন্যাকে বিবাহ করেছে। তার বাবা মাও খৃস্টান। এরপর ঐ কন্যা বড় হয়েছে। কিন্তু ধর্মান্দর্শ সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নেই এবং এ সম্পর্কে সে কিছু বলতেও পারবে না। অথচ সে মতিভ্রমও নয় তাহলে সে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। জামে সগীর গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উদ্ধৃত বক্তব্য “ধর্মান্দর্শ সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নেই” অর্থ তার হৃদয়ে এ সম্বন্ধে কোন মারিফাত নেই (জানা-গুনা নেই) এবং “সে এ সম্পর্কে কিছু বলতেও পারে না” এর মানে হল, মুখে উচ্চারণ করে সে এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারে না। এমনিভাবে যদি কোন নাবালিগ মুসলিম কন্যা কোন পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়; তারপর সে বালিগ হয় এমন অবস্থায় যে ধর্ম সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নেই; ইসলাম কি তা সে জানে না এবং এ সম্বন্ধে কিছু বলতেও পারে না। অথচ সে মতিভ্রমও নয় তাহলে স্বামীর থেকে তার বিবাহও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ফাতাওয়ায়ে নাসাফীতে উল্লেখ আছে যে, এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হল যে, তুমি তাওহীদ (একত্ববাদ) সম্পর্কে জান কি? জবাবে সে বলল, আমি জানি না। একথার দ্বারা তার উদ্দেশ্য যদি এরূপ হয় যে, মজবে বাচ্চারা যেভাবে মুখস্ত বলে, ঐভাবে আমি জানি না তাহলে এতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি সে এরূপ নিয়্যত করে যে, সে মূলতঃই আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে কিছুই জানে না তাহলে উক্ত মহিলা ঈমানদার হিসেবে গণ্য হবে না। কাজেই তার বিবাহও সহীহ হবে না। হাম্মাদ ইব্ন আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে; কেউ যদি এ অবস্থায় মারা যায় যে, সে জানে না, তার একজন স্রষ্টা আছে এবং তিনি এ জগত ছাড়াও আরেকটি জগত সৃষ্টি করে রেখেছেন, আর সে এ কথাও জানে না যে, জুলুম করা হারাম। তাহলে সে ঈমানদার বলে গণ্য হবে না (মুহীত)।

৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি গুনাহ করে বেড়াচ্ছে আর মুসলমানী যাহির করা চাই, তাহলে তাকে কাফির গণ্য করা হবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট বলল, আমি মুসলমান। এ কথা শুনে সে বলল, তোমার উপর এবং তোমার মুসলমানীর উপর লা'নত হোক, তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে (খুলাসা)। জনৈক খৃস্টান ব্যক্তি মুসলমান হল, তারপর তার পিতা মারা গেল। এরপর সে বলল; হায়! এ সময় পর্যন্ত আমি যদি মুসলমান না হতাম, তাহলে তো আমি আমার পিতার মীরাসপ্রাপ্ত হতাম; তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে (আল্-ফুসুলুল ইমাদিয়া)। জনৈক খৃস্টান ব্যক্তি কোন মুসলমানের কাছে এসে বলল, আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন, আমি আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করব। এরপর সে বলল, অমুক আলিমের কাছে যাও, সে তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। তার হাতে মুসলমান হও। এ জাতীয় কথা যদি কেউ বলে তবে তার ব্যাপারে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে, ফকীহ আবু জাফর (র)-এর মতে এ বক্তব্যের কারণে উক্ত ব্যক্তি কাফির হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। জনৈক কাফির ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর অপর এক ব্যক্তি তাকে বলল, তোমার নিজের ধর্মে এমন কি

বিপদ দেখতে পেলে যে, তা পরিত্যাগ করলে, তাহলে এরূপ উজ্জিকারী ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে (খুলাসা)।

দুই. আল্লাহর সত্তা ও তার গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি

১. মাসআলা : কেউ যদি আল্লাহ তা'আলাকে এমন বিশেষণে ভূষিত করে যা তার শানের খিলাফ অথবা আল্লাহর নাম বা তার কোন হুকুম সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, অথবা তার আদেশ-নিষেধকে অস্বীকার করে কিংবা তার সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করে, বা তার জন্য সন্তান বা স্ত্রী-পুত্র সাব্যস্ত করে অথবা আল্লাহর দিকে অজ্ঞতা অপারগতা এবং ক্রটির গিবত করে সে কাফির বলে গণ্য হবে। কেউ যদি বলে, আল্লাহ্. এমন কাজও করেন যাতে কোন হিকমত ও সারবত্তা নেই; তাকে কাফির গণ্য করা হবে। কেউ যদি এরূপ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা কুফরীর উপর রাযী থাকেন তবে সে কাফির হয়ে যাবে (আল্ বাহরুর রাযিক)। কোন ব্যক্তি যদি বলে, যদি স্বয়ং আল্লাহও আমাকে এই কাজ করতে বলেন তাহলেও আমি তা করব না, তবে সে কুফরী করল (কাফী)।

২. মাসআলা : তাখরীর গ্রন্থে আছে যে, কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলার শানে (১) (হাত) (৫৯) (চেহারা) ইত্যাদি যে সব শব্দ রয়েছে যার দ্বারা যাহিরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্দেশ্য নয়; এসব শব্দের ফারসী (বা বাংলা) অর্থ আল্লাহর শানে ব্যবহার করা জাইয কিনা? এ সম্বন্ধে কোন কোন ফকীহ বলেন যে, যদি এর দ্বারা যাহিরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্দেশ্য না করা হয় তাহলে আল্লাহর শানে এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা জাইয হবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ এর মতে আল্লাহর শানে এ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা সহীহ নয়। এটিই নির্ভরযোগ্য অভিমত (তাতার খানিয়া)। কেউ যদি বলেন, আল্লাহর চোখে ইয়াহুদী যেমন এই লোকটিও আমার চোখে ঠিক খানিয়া)। কেউ যদি বলেন, আল্লাহর চোখে ইয়াহুদী যেমন এই লোকটিও আমার চোখে ঠিক তেমন, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। জমহুর মাশাইখে কিরাম তাই বলেন। কেউ কেউ বলেন, সে যদি এর দ্বারা তার কাজের নিকৃষ্টতা বুঝানোর উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে কাফির হবে না (আল্ ফুসুলুল ইমাদিয়া)। কোন মানুষ মারা যাওয়ার পর কেউ যদি বলে, আল্লাহর জন্য এটি করা উচিত ছিল তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে (খুলাসা)। কেউ যদি বলে এ কাজটি আল্লাহর জন্যই সংঘটিত হয়েছে তাহলে সে কাফির হবে না। কিন্তু এটি খুবই গুরুতর কথা (খাযানাতুল মুফতিয়ান)।

৩. মাসআলা : কেউ যদি তার সাথে প্রতিপক্ষকে বলে যে, আমি আল্লাহর হুকুমেরই তোমার সাথে এরূপ করছি; আর প্রতিপক্ষ বলল, আমি আল্লাহর হুকুম জানি না অথবা বলল, এখানে কোন (আল্লাহর) হুকুম চলবে না অথবা বলল, আল্লাহ হুকুমদাতা হতে পারেন না অথবা বলল, এখানে শয়তানের হুকুম চলবে তাহলে এসব কথায় সে কাফির হয়ে যাবে। হাকিম আবদুর রহমান (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি রসম (রেওয়াজ) অনুসারে কাজ করছি, (আল্লাহর) হুকুম অনুসারে নয়; তবে একথা কুফরী হবে কিনা? তিনি বললেন, যদি তার উদ্দেশ্য হয় মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং শরীআত বিমুখতা এবং রসম প্রীতির কথা বুঝানো; আল্লাহর হুকুমকে রদ করা না, তাহলে এতে কুফরী হবে না (মুহীত)।

৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি নিজের কাপড় এক স্থানে রেখে বলল, আমি এটিকে আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করলাম। অন্য ব্যক্তি বলল, তুমি তো তা এমন সত্তার কাছে ন্যস্ত করেছো যে চোরকে চুরি করা হতে নিবৃত্ত রাখতে পারে না, এ ব্যক্তি সম্বন্ধে ফকীহ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র) বলেন, এতে সে কাফির হবে না। কোন ব্যক্তি বলল, আমি যদি মিথ্যা বলি, তবে আল্লাহও মিথ্যা বলেন, তাহলে সে কাফির হবে না। এক ব্যক্তি রাগের অবস্থায় তার স্ত্রীকে বলল, ঐ ব্যভিচারিণী মহিলা যে তোকে জন্ম দিয়েছে, ঐ হিজড়া যে তোমাকে কর্ষণ করেছে এবং ঐ আল্লাহ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কোন কোন ফকীহ-এর মতে সে কাফির হয়ে যাবে। ফকীহ আবু নাসর দাবুসী (র)-কে এ মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি কয়েক দিন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে চিন্তা করেও কোন জবাব দেননি। গ্রন্থকার (র) বলেন, প্রকাশিত বর্ণনা মতে সে কাফির হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা : কেউ যদি কারো সম্বন্ধে বলে যে, এই লোক অসুস্থ হতে পারে না। এটি আল্লাহর ভুল, তাহলে কোন কোন ফকীহের মতে এটি কুফরী কথা হিসেবে গণ্য হবে। আর এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। যদি কোন ব্যক্তি বলে, তোমার যবানের মুকাবিলায় আল্লাহই যথেষ্ট নয়, আমি যথেষ্ট হবো কিভাবে? তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আল্লাহর থেকেও আমার কাছে অধিক প্রিয় তাহলে কাফির হয়ে যাবে (খুলাসা)। কেউ যদি আবার কোন ব্যক্তিকে বলে, এটি আমার মন্দ তাকদীরের ফল, তাহলে একথা মারাত্মক ভ্রান্তি বলে গণ্য হবে (মুহীত)। কেউ যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে বলে, আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, কাজেই তুমিও লোকদের প্রতি অনুগ্রহ কর-যেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। একথা শুনে সে বলল, যাও, আল্লাহ কেন আমাকে এ সম্পদ দিয়েছেন, এর জন্য তুমি আল্লাহর সাথে লড়াই কর। তাহলে বিশুদ্ধতম মতানুসারে সে কাফির হবে না (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)।

৬. মাসআলা : দুই ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া আছে, এমতাবস্থায় তাদের একজন যদি অপরজনকে বলে, যাও; আকাশে আরোহণ করে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ কর; তাহলে অধিকাংশ ফকীহ-এর মতে এটি কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। জামে সগীরের গ্রন্থকার বলেছেন, আমাদের মাযহাব মতে এটিই সহীহ অভিমত। খানিয়া গ্রন্থে আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া (তাতার খানিয়া)। কেউ যদি বলে, আকাশে যাও এবং আল্লাহর সাথে লড়াই কর তাহলে কোন কোন ফকীহের মতে এটি কুফরী কথা হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শায়খুল ইমামের মতে এ অবস্থায় সতর্কতা হিসাবে বিবাহ দুহরিয়ে নেওয়াই উত্তম (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা : কেউ যদি আল্লাহ তা'আলার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে বলে যে, তিনি অমুক স্থানে আছে তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। যদি বলে যে, কোন জায়গাই আল্লাহ থেকে মুক্ত নয় তবে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। যদি বলে, আল্লাহ আসমানে আছেন এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য যদি কুরআন হাদীসে বর্ণিত শব্দের উদ্ভূতি দেওয়া হয় তাহলে তাকে

কাফির বলা যাবে না। আর যদি তার উদ্দেশ্য এরূপ হয় যে, আসমানে তার নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান রয়েছে তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। আর যদি তার কোন নিয়্যাতই না থাকে তবে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে সে কাফির হয়ে যাবে। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত এবং এর উপরই ফাতওয়া। কেউ যদি বলে, আল্লাহ তা'আলা ইনসাফ করার জন্য বসেছেন বা দাঁড়িয়ে আছেন তাহলে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। কেননা সে আল্লাহ তা'আলাকে উপর ও নীচের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছে (অথচ তিনি এর থেকে উর্ধ্বে) (আল্ বাহরুর বায়িক)।

৮. মাসআলা : কেউ যদি বলে, আমার জন্য আসমানে আল্লাহ আছেন আর যমীতে অমুক ব্যক্তি আছেন তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি যদি বলে, আল্লাহ আসমান থেকে বা আরশ থেকে দেখছেন তাহলে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আরবীতে বলে তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। যদি বলে, আল্লাহ আরশের উপর থেকে জানছেন তাহলে তা কুফরী হবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে, আল্লাহ আরশের নীচ থেকে জানছেন তাহলে তা কুফরী হবে। কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহকে জান্নাতে দেখছি তাহলে একথা কুফরী হবে। কিন্তু যদি (فی الجنة) না বলে (من الجنة) বলে তবে তা কুফরী হবে না (মুহীত)। আবু হাফস (র) বলেন, কেউ যদি আল্লাহর দিকে জুলুমের নিয়্যাত করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে (আল-ফুসুল ইমাদিয়া)।

৯. মাসআলা : কোন ব্যক্তি বলল, হে আমার প্রতিপালক! এই জুলুমকে পসন্দ করো না তাহলে কোন কোন ফকীহ-এর মতে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মতে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না। কেউ যদি বলে, তুমি আমার প্রতি যেরূপ জুলুম করেছো, আল্লাহ তোমার প্রতি অনুরূপ জুলুম করবেন, তাহলে বিশুদ্ধতম মতে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না। কোন ব্যক্তি বলল, যদি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ইনসাফ করেন তাহলে আমিও তোমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিব তাহলে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। কিন্তু যদি (لو)-এর স্থলে (إلا) শব্দ ব্যবহার করে তবে সে কাফির হবে না (যহীরিয়া)। কোন ব্যক্তি যদি বলে, যদি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন হক ও ইনসাফের সাথে ফায়সালা করেন তবে আমি আমার হকের ব্যাপারে তোমাকে পাকড়াও করব, তাহলে এ কথা কুফরী বলে গণ্য হবে (মুহীত)। শায়খ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, এটি এমন জায়গা যে জায়গায় আল্লাহ-রাসূল কেউ নেই। একথার দ্বারা তার উদ্দেশ্য যদি এমন হয় যে, এটি এমন জায়গা যে জায়গায় আল্লাহর হুকুমের উপর আমল করা যায় না এবং রাসূলের হুকুমের উপরও আমল করা যায় না। একথা যদি এমন জায়গার ব্যাপারে বলা হয় যেখানকার লোকজন যাহিদ ও পরহেযগার এবং তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশের উপর সর্বদা আমল করে। যেমন নামায-রোযা ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও বক্তা যদি একে দীন মনে না করে তাহলে কাফির গণ্য করা হবে (ইয়াতীমা)।

১০. মাসআলা : কেউ যদি কাউকে জুলুম করতে দেখে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি এই জুলুমকে কবুল করবেন না। যদি আপনি এই জুলুমকে কবুলও করেন তথাপিও আমি কবুল করব না, এ জাতীয় কথা বলা কুফরী। কেননা সে যেন এ কথা বলেছে যে, তুমি আমায় কবুল করব না, এ জাতীয় কথা বলা কুফরী। কোন ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার জীবিকা রাখী থাকলেও আমি রাখী থাকব না (খুলাসা)। কোন ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার প্রতি জুলুম করবেন না প্রশস্ত করে দিন, আমার ব্যবসা চালু করার মাধ্যমে অথবা আমার প্রতি জুলুম করবেন না তাহলে ফকীহ আবু নসর দাবুসী (র)-এর মতে এতে সে কাফির হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, মিথ্যা বল না, একথা শুনে সে বলল, মিথ্যা কিসের জন্য, মিথ্যা তো বলার জন্যই তাহলে সে তৎক্ষণাৎ কাফির হয়ে যাবে। কাউকে বলা হল, আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ কর। একথা শুনে সে বলল, আমার তার সন্তুষ্টির দরকার নেই অথবা বলল, আল্লাহ যদি আমাকে জান্নাতে দাখিল করেন তাহলে আমি সেখানে লুটতরাজ করব তা কুফরী বলে গণ্য হবে। যদি কাউকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাফারমানী করবে না, যদি কর তাহলে তিনি তোমাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। একথা শুনে সে বলল, আমি জাহান্নামের ভয় করি না অথবা কাউকে বলা হল, বেশী আহা করবে না, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পসন্দ করবেন না। উত্তরে সে বলল, আল্লাহ আমাকে বন্ধু ভাবুন বা শত্রু, আমি বেশীই আহা করব তাহলে এ সব কথা কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে। কাউকে বলা হল, বেশী হাসবে না বা বেশী ঘুমাবে না, একথা শুনে সে বলল, যে পরিমাণ মনে চায় খাব; ঘুমাবো বেশী হাসবে না বা বেশী ঘুমাবে না, একথা শুনে সে বলল, যে পরিমাণ মনে চায় খাব; ঘুমাবো এবং হাসবো তাহলে এতে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, গুনাহ করবে না, কেননা আল্লাহর আযাব অনেক। একথা শুনে সে বলল, আমি এক হাত দ্বারাই সব আযাব সরিয়ে দিতে সক্ষম, তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। কাউকে বলা হল; পিতা-মাতাকে বশ্ট দিবে না, জবাবে সে বলল, আমার উপর তাদের কোন হক নেই, তাহলে সে কাফির হবে না। বরং সে মারাত্মক পাপী বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি বলল, হে শয়তান; তুই আমার কাজ করে দে, তাহলে তুই যা কিছু বলবি আমি করে দিব, পিতা-মাতাকে কষ্ট দিব আর তুমি যা বলবে না আমি করব না তাহলেও সে কাফির বলে গণ্য হবে (তাতার খানিয়া-তাখরীরের সূত্রে)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি যদি উভয় জাহানের খোদাও হয়ে যাও তারপরও আমি তোমার থেকে হক আদায় করে নিব। তাহলে এজাতীয় ব্যক্তিকে কাফির বলে গণ্য করা হবে (খুলাসা)।

১১. মাসআলা : জনৈক ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলার পর অপর এক ব্যক্তি তা শুনে বলল, আল্লাহ তা'আলা তোমার এ মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে দিবেন অথবা বলল, আল্লাহ তা'আলা তোমার এ মিথ্যার মধ্যে বরকত দিয়ে দিবেন, তাহলে কোন কোন ফকীহ এর মতে এটি কুফরীর কাছাকাছি কথা। মিসবাহ গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি মিথ্যা বলার পর অপর জনে বলল, তোমার এ মিথ্যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেন তাহলে এটি কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে। ফকীহ নাজমুদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, অমুক ব্যক্তি তোমার সাথে সঠিকভাবে চলবে না। একথা শুনে সে বলল, তাহলে আল্লাহও তার সাথে সঠিকভাবে চলবে না, তাহলে কি সে কাফির হয়ে যাবে? জবাবে

তিনি বললেন, হাঁ এতে সে কাফির হয়ে যাবে। তাখরীর গ্রন্থে আছে যে, আমি সদরুল ইসলাম জামালুদ্দীন (র) কে জিজ্ঞেস করলাম, যদি কোন ব্যক্তি বলে, আল্লাহ স্বর্ণকে খুবই ভালবাসেন; তাই তিনি আমাকে তা দেননি, তাহলে তার সম্পর্কে বলা হয় যে, যদি এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহর দিকে কৃপণতার নিসবত করা তাহলে তাকে কাফির গণ্য করা হবে। আর যদি এরূপ উদ্দেশ্য না হয় তবে “আল্লাহ স্বর্ণকে খুবই ভালবাসেন” বলার দ্বারা সে কাফির হবে না (তাতার খানিয়া)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, ইনশা আল্লাহ তুমি এই কাজ করবে। একথা শুনে সে বলল, ইনশা আল্লাহ ছাড়া আমি এ কাজ করব, তাকে কাফির গণ্য করা হবে (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)।

১২. মাসআলা : এক জালিম ব্যক্তি কারো প্রতি জুলুম করল। তখন মজলুম ব্যক্তি বলল, আল্লাহ আমার তাকদীরে এরূপ রেখেছেন তাই তুমি আমার প্রতি এরূপ আচরণ করছো। একথা শুনে জালিম ব্যক্তি বলল, আমি আল্লাহর তাকদীর (নিয়তির সিদ্ধান্ত) ছাড়াই এরূপ করছি তাহলে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)। কেউ যদি বলে, হে আল্লাহ আমার প্রতি রহম করার ব্যাপারে আপনি কার্পণ্য করবেন না তাহলে এ বক্তব্য কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে (সিরাজিয়া)।

১৩. মাসআলা : স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘ ঝগড়ার এক পর্যায়ে স্বামী স্ত্রীকে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। আর স্ত্রী বলল আমি তাকে ভয় করি না, এ সম্পর্কে ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র) বলেন, স্বামী যদি তাকে তার বাহ্যিক নাফরমানীর ব্যাপারে ভৎসনা করেন এবং তাকে আল্লাহর ভয় দেখাতে চান আর সে জবাবে এই কথা বলে তাহলে এ মহিলা মুরতাদ হয়ে যাবে এবং তার বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর স্বামী যদি তাকে এমন বিষয়ে ভৎসনা করেন যে বিষয়ে আল্লাহর থেকে ভয় করার কিছুই নেই, তাহলে সে কাফির হবে না। তবে এ দ্বারা আল্লাহর প্রতি তচ্ছিল্য প্রদর্শন করা যদি তার উদ্দেশ্য হয় তবে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে প্রহর করার ইচ্ছা করার পর অপর ব্যক্তি বলল, তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? জবাবে সে বলল, না এ ব্যক্তি সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এতে সে কাফির হবে না। কেননা তার জন্য একথা বলার সুযোগ রয়েছে যে, আমি যা করছি এতেই তাকওয়া রয়েছে। কেউ যদি কাউকে গুনাহের কাজ করতে দেখে বলে, ওহে তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? জবাবে সে বলল, না; তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা এতে তাবীলের (ব্যাখ্যার) অবকাশ রয়েছে। কাউকে বলা হল, তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? একথা শুনে ক্রোধের অবস্থায় সে বলল, না তাহলে কাফির হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা : কেউ যদি বলে, আমরা যতদিন পর্যন্ত অসৎকর্মপরায়ণ থাকব আল্লাহও অসৎকর্মপরায়ণ (নাউযুবিল্লাহ) থাকবেন এবং আমরা যতদিন পর্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ থাকব আল্লাহও ততদিন পর্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ থাকবেন তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে (খুলাসা)। ইতিবিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অথবা শরীআতের হুকুম আমি পসন্দ করি না। যেমন আল্লাহ তা'আলা চারজন মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ করেছেন, আমি এ

হুকুমকে পসন্দ করি না তাহলে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে (তাতার খানিয়া)। কোন মহিলা তার পুত্রকে বলল, তুমি কেন এ কাজ করলে? জবাবে সে বলল, আল্লাহর কসম আমি এরূপ করিনি, একথা শুনে মা রাগত স্বরে বলল, থাক আল্লাহর কসম! তুমি থাম তাহলে সে কাফির হবে কিনা, এ সম্বন্ধে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে (মুহীত)। কেউ যদি বলে, আল্লাহই বাকী (خدای عزوجل باشد و هیچ چیز ند نباشد) থাকবেন, আর কোন জিনিসই বাকী থাকবে না (যহীরিয়া)। আমার যত কল্যাণ সাধিত হয়েছে তা তাহলে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে (যহীরিয়া)। আমার যত কল্যাণ হয়েছে, সবই হয়েছে আমার নিজের থেকে, সবই করেছেন আল্লাহ, আর যত অকল্যাণ হয়েছে, সবই হয়েছে আমার নিজের থেকে, তাহলে একথাও কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে? কাউকে বলা হল, তুমি কোন মহিলার উপরই সক্ষম নও; একথা শুনে সে বলল, আল্লাহও তার উপর সক্ষম নয়; আমি কিভাবে তার উপর সক্ষম হবো? তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে (গিয়াসিয়া)।

১৫. মাসআলা : কেউ যদি বলে এ কাজটি আল্লাহ ও তোমার সহায়তায় হয়েছে বলে আমি মনে করি অথবা বলে, আমি আল্লাহ ও তোমার থেকে আশারাদী তবে তা মারাত্মক খারাপ কথা হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু তাতে কুফরী হবে না। কেউ যদি বলে, এ কাজটি আল্লাহর সাহায্যে হয়েছে বলে আমি মনে করি এবং তোমাকে শুধুমাত্র বাহ্যিক সাবাব (سبب) মনে করি, তবে খুবই সুন্দর কথা হিসাবে বিবেচিত হবে (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। কেউ তার প্রতিপক্ষকে কসম করতে বললে সে বলল, আমি আল্লাহর নামে কসম করছি। এ কথা শুনে সে বলল, আল্লাহর নামে শপথ করা আমি চাই না। আমি চাই তুমি তালাক বা দায়-মুক্ত করা সম্বন্ধে কসম কর; তাহলে আমাদের কোন কোন ফকীহ- এর মতে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে সে কাফির হবে না। তাজনীমুন নাসিরীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। কেউ যদি বলে, তোমার কসম গাধার 'পাদের' মত তাহলে একথা কুফরী কালাম হিসেবে গণ্য হবে। কেউ যদি আবার কাউকে বলে, আল্লাহ জানেন, আমি সর্বদাই তোমাকে দু'আর মধ্যে স্মরণ করি তাহলে তার কুফরীর ব্যাপারে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ যদি ঠাট্টাচ্ছিলে বলে যে, আমিই আল্লাহ তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে (তাতার খানিয়া)।

১৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি কি প্রতিবেশীর হক আদায় করতে চাও না? সে বলল না, তারপর স্বামী বলল, তুমি কি স্বামীর হক আদায় করতে চাও না? সে বলল, না। এরপর স্বামী বলল, তুমি কি আল্লাহর হক আদায় করতে চাও না? সে বলল, না তাহলে একথা কুফরী কালাম হিসেবে গণ্য হবে। এক ব্যক্তি তার অসুস্থতা ও অস্বচ্ছলতা অবস্থায় বলল, হায়! আমি যদি জানতে পারতাম যে, আল্লাহ কেন আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি তো দুনিয়ার কোন মজাই পাচ্ছি না। তাহলে সে এতে কাফির হবে না। কিন্তু এতে তার মারাত্মক

১. এ মাসআলায় আপত্তি রয়েছে। কেননা কুরআন মজীদে উল্লেখ রয়েছে (كل من عليها فان وليقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে; বাকী থাকবে কেবল প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব (৫৫ : ২৬-২৭)

২. এ মাসআলায়ও ফুকাহায়ে কিরামের দ্বিমত রয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

পাপ হবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তোমার পাপের কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে সাজা দিবেন, তখন অপর ব্যক্তি বলল, তুমি কি আল্লাহকে তার আসনে সমাসীন করেছো যে, তুমি যা বলবে তাই তিনি শুনবেন? এতে সে কাফির হয়ে যাবে (মুহীত)।

১৭. মাসআলা : তাখয়ীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ বলে, আল্লাহ কি করতে পারেন? তিনি (পরকালে) জাহান্নামে দাখিল করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না। তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি একটি নিকৃষ্টমানের পশু দেখে বলল, এমন পশু সৃষ্টি করা ছাড়া আল্লাহর কি কোন কাজ ছিল না? তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। জনৈক ফকীর দরিদ্রক্লিষ্ট হয়ে বলল, হে আল্লাহ! অমুক আপনার বান্দা, সে অজস্র নিআমতে ডুবে আছে, আমিও আপনার বান্দা। হাজার দুঃখ, দুর্দশায় আমি আক্রান্ত, একি ইনসাফের কথা হল? এ জাতীয় বক্তব্য কুফরী বাক্য হিসেবে গণ্য। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আল্লাহকে ভয় কর। সে বলল, আল্লাহ কোথায় আছেন? এতে সে কাফির হয়ে যাবে। এমনিভাবে কেউ যদি বলে, পয়গাম্বর (আ) কবরে সমাহিত নেই অথবা আল্লাহর ইলম চিরন্তন নয়, অথবা (معدوم) (অস্তিত্বহীন) বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত নন তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে (তাতার খানিয়া)।

১৮. মাসআলা : আবদুল্লাহ নামক কোন ব্যক্তিকে আহবান করার সময় যদি (الله) শব্দের শেষে (كاف تصغير) সংযুক্ত করা হয় এবং আহবানকারী আলিম হয় তাহলে বিশুদ্ধতম মতে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। যদি ইচ্ছা করে কোন আলিম ব্যক্তি (خالق) (খালিক) শব্দকে (مضعز) করে (خوليق) বলে তবে তাকেও কাফির আখ্যায়িত করা হবে (আল-বাহরুর রাযিক)। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, আল্লাহ তোমার দিলে রহম করুন, আমার দিলে নয়। একথার দ্বারা যদি আল্লাহর রহমত হতে মুখাপেক্ষীহীনতা প্রকাশ করা তার উদ্দেশ্য হয় তবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি তার উদ্দেশ্য এরূপ হয় যে, আল্লাহ যেহেতু আমার হৃদয়কে অবিচল রেখেছেন, তাই তা অবিচলিত আছে। এতে কোনরূপ অস্থিরতা নেই তাহলে সে কাফির হবে না। একজন বালক কেঁদে কেঁদে তার পিতাকে ডাকছিল। অথচ তখন তার পিতা সালাত আদায় করছিল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি ঐ বালককে বলল, হে বালক! তুমি থাম; তোমার পিতা আল্লাহ, আল্লাহ করছেন, তাহলে একথা কুফরী কালাম হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা এর অর্থ হল, তোমার পিতা আল্লাহর খিদমত করছে (মুহীত)। জনৈক ব্যক্তি কোন এক অন্ধ বা রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখে বলল, আল্লাহ তোমাকে এবং আমাকেই দেখেছেন। তোমাকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন তাহলে আমার কি অপরাধ? একথার দ্বারা সহীহ মতে সে কাফির হবে না। (খুলাসা)। কেউ যদি বলে, আল্লাহর কসম এবং আপনার পায়ের ধুলার কসম তাহলে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। কেউ যদি বলে, আল্লাহর কসম! এবং তোমার জান ও মাথার কসম আমি এরূপ করবই তাহলে সে কাফির হবে কিনা, এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে (যহীরী)।

১. মাসআলা : কেউ যদি এক নবীকে স্বীকার না করে অথবা নবী-রাসূলগণের কোন একটি সুনাতকে পসন্দ না করে তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। ফকীহ ইব্ন মুকাতিল (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, হযরত খিযির ও হযরত যুলকিফ্ল (আ)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে তবে তার হুকুম কি? জবাবে তিনি বলেছিলেন, যে বুয়ুর্গের নবুওয়াতের ব্যাপারে উম্মাতের সকল মানুষ একমত নয় তার নবুওয়াতকে অস্বীকার করা হলে এতে কোন ক্ষতি নেই। যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি নবী হলে আমি তার উপর ঈমান আনতাম। তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে (মুহীত)। কেউ যদি নবী-রাসূলগণের প্রতি অশ্লীল তথা যিনা, ব্যাভিচার ইত্যাদি কোন কাজের নিসবত করে, যেমন- হাশবিয়া (حشوي) সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে এ জাতীয় উক্তি করে তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। কেননা এটা মারাত্মক ধরনের গালি এবং নবী-রাসূলগণের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের শামিল। হযরত আবু যার গিফরী (রা) বলেন, যারা বলে, প্রত্যেক ঞনাহের কাজই কুফরী। এতদসত্ত্বেও তারা বলে যে, নবীগণ পাপ করেছেন, তাহলে এ কথা কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে। কেননা এটিও গালি। কেউ যদি বলে, নবীগণ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ঞনাহ করেন নি তো বটেই; এমনি ভাবে নবুওয়াত প্রাপ্তির আগেও তাঁরা ঞনাহ করেনি, তাহলে সে কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে। কেননা এটি নস (কুরআন ও হাদীস) পরিপন্থী কথা। লেখক বলেন, আমি মাশায়িখ কিরামের কোন

কাজেই আদম (আ)-এর ফল খাওয়ার উপরোক্ত ঘটনাকে পাপ বা মানসিয়ত বলা যায় না। তবে যাহিরী সুবতর উচ্চ মর্যাদার অনুপাতে একে (عصى) বলা হয়েছে। মূলতঃ এখানে ব্যবহৃত (عصى) শব্দটি نفسى এর অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। لان القرآن يفسر بعضه بعضا অর্থাৎ কুরআন মাজীদেব এর আয়াত অপর আয়াতের ব্যাখ্যা।

গুনাহে সগীরা তাহলে এতে সে কাফির হবে না। কেউ যদি বলে, ইচ্ছাকৃতভাবে যে গুনাহ করা হয় তা কবীরা এবং যে এই জাতীয় গুনাহর কাজ করবে সে ফাসিক। এহেন অবস্থায় সে যদি এ কথাও বলে যে, নবীদের গুনাহ ছিল ইচ্ছাকৃত গুনাহ তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। কেননা এটাও এক প্রকার গালি। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, নবীগণের গুনাহ ইচ্ছাকৃত ছিল না তাহলে এতে সে কাফির হবে না (ইয়াতীমা)।

৪. মাসআলা : যদি কোন রাফিয়ী ব্যক্তি আবু বকর ও উমর (রা)-কে গালি দেয় এবং তাদেরকে লা'নত করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি হযরত আবু বকর (রা)-এর উপর হযরত আলী (রা)-কে প্রাধান্য দেয় তবে সে বিদআতী বলে গণ্য হবে। কিন্তু সে যদি আল্লাহর দীদারকে অসম্ভব বলে তাহলে কাফির বলে গণ্য হবে (খুলাসা)। যদি কেউ হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর উপর যিনার অপবাদ দেয় তবে সে কাফির হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমস্ত স্ত্রীগণের উপর যিনার অপবাদ দেয় তবে সে কাফির হিসাবে পরিগণিত হবে না। কিন্তু লা'নতের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। যদি কেউ বলে, হযরত উমর, উসমান ও আলী (রা) সাহাবী ছিলেন না তাহলে সে লা'নতযোগ্য হবে, কিন্তু কাফির হবে না (খাযানাতুল ফিকহ)। কেউ যদি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইমামত ও খিলাফতকে অস্বীকার করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। কোন কোন ফকীহ এর মতে সে বিদআতী বলে গণ্য হবে, কাফির হবে না। কিন্তু সহীহ মতে সে কাফির বলে গণ্য হবে। এমনি ভাবে কেউ যদি হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকে অস্বীকার করে তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে (যহীরিয়া)।

৫. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি হযরত উসমান, আলী, তালহা, যুযায়র, আইশা প্রমুখ সাহাবীকে কাফির বলে, তাহলে তাকেও কাফির সাব্যস্ত করা ওয়াজিব হবে। ইমামগণের মতে যায়াদিয়া সম্প্রদায়ের লোকদেরকে কাফির আখ্যায়িত করা ওয়াজিব। তাদের বিশ্বাস অনারব দেশ থেকে এক নবীর আবির্ভাব হবে এবং সে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর দীনকে রহিত করে দিবে (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)। রাফিয়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা যেহেতু মৃত লোকদের দুনিয়াতে পুনঃপ্রত্যাবর্তনে বিশ্বাসী, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, আল্লাহর রুহ ইমামগণের মাঝে ফিরে আসা মতবাদে বিশ্বাসী এবং তারা যেহেতু এ কথা বলে যে, অচিরেই বাতিনী ইমামের আবির্ভাব হবে, তার আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত যত বিধি-বিধান আছে সবই অকার্যকরী থাকবে। আর তারা এও বলে যে, জিবরাঈল (আ) ওহী হযরত আলী (রা)-এর নিকট না পৌঁছিয়ে তিনি পৌঁছিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট, কাজেই তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করা ওয়াজিব। মূলত তারা ইসলাম থেকে খারিজ। তাদের হুকুম মুরতাদ ব্যক্তিদের হুকুমের অনুরূপ হবে (যহীরিয়া)।

৬. মাসআলা : আমল (اصل) গ্রন্থের اكره অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয় মুহাম্মাদ (সা)-কে গালি দেওয়ার জন্য তাহলে এর তিন অবস্থা হতে পারে। (১) যদি গালিদাতা ব্যক্তি বলে যে, আমার মনে কিছুই ছিল না। তারা বাধ্য করেছে তাই আমি গালি দিয়েছি। অথচ এ ব্যাপারে আমি রাযী ছিলাম না, তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না।

যেমন-কেউ যদি মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করে অথচ তার হৃদয় ঈমানে অবিচলিত তাহলে তাকে কাফির বলা যায় না। (২) যদি গালিদাতা ব্যক্তি বলে যে, মুহাম্মাদ নামক এক খৃষ্টানের কথা আমার মনের মধ্যে ছিল, তাকেই আমি গালি দিয়েছি। এ অবস্থায়ও তাকে কাফির বলা যাবে না। (৩) যদি সে বলে যে, মুহাম্মাদ নামক এক খৃষ্টান ব্যক্তির কথা আমার মনের মধ্যে ছিল, তবে সে ব্যক্তিকে আমি গালি দেয়নি আমি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কেই গালি দিয়েছি তাহলে আইন ও নৈতিকতা উভয় দিক থেকেই তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। কেউ যদি বলে, নবী করীম (সা) পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সে বলে, নবী করীম (সা) বেহুশ হয়ে গিয়েছিলেন তাহলে সে কাফির হবে না (মুহীত)।

৭. মাসআলা : কেউ যদি বলে, আদম (আ) যদি গন্দম না খেতেন তাহলে আমাদের এ দুর্ভোগ হত না, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে (খুলাসা)। কেউ যদি হাদীসে মুতাওয়াতিরকে অস্বীকার করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর কেউ হাদীসে মাশহুরকে অস্বীকার করলে কোন কোন ফকীহ এর মতে সেও কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু ঈসা ইবন আবান (র) বলেন, সে পথভ্রষ্ট বলে গণ্য হবে, কাফির হবে না। এটিই সহীহ অভিমত। খবরে ওয়াহিদকে অস্বীকার করলে কাফির হবে না। কিন্তু সে হাদীস গ্রহণ না করার কারণে পাপী বলে গণ্য হবে (যহীরিয়া)। কেউ যদি কোন নবী সম্পর্কে বলে যে, “যদি অমুক নবী হতেন” আর এ কথার দ্বারা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে সে কাফির হবে না। পক্ষান্তরে নবীর প্রতি তাচ্ছিল্য দুষমনী প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে সে কাফির হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি বলে, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-يارجیل (তাসগীরের সীগার সাথে) বললে, আমি তাকে ছাড় দিব না, তাহলে সে কাফির হবে না। আর যদি বলে, আমাকে বললে আমিও অনুরূপ বলব, তাহলেও সে কাফির হবে না।

৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট বলল, রাসূলুল্লাহ (সা) অমুক বস্তু পসন্দ করতেন। যেমন- তিনি লাউ পসন্দ করতেন বলল। এ কথা শুনে সে বলল, আমি তা পসন্দ করি না, তবে এ কথা কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। পরবর্তীকালের ফকীহদের কেউ কেউ বলেছেন, এ কথা সে যদি হেয়তার উদ্দেশ্যে বলে থাকে তবে তা কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি এরূপ নিয়্যত না থাকে তবে কুফরী হবে না। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট বলল, হযরত আদম (আ) কাপড় বয়ন করেছেন, এই হিসাবে তো আমরা সবাই তাতির বংশধর, তাহলে এ কথা কুফরী হিসাবে গণ্য হবে। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সামনে বলল, খানা খাওয়ার শেষে তিন আঙ্গুল চেষ্টে খেতেন। এ কথা শুনে অপর ব্যক্তি বলল, এতো অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও অশালীন কাজ তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। এক ব্যক্তি বলল, কৃষকদের কাজ আমি পসন্দ করি না, তারা খানা খায় কিন্তু হাত ধুয়ে নেয় না। এ কথার দ্বারা সুন্নাতের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন যদি তার উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, “গোফ” ছাটা এবং গর্দানের নীচে তায়লাসান চাদর লটকিয়ে দেওয়া, এটি কেমন অভ্যাস এবং এ কথা সে যদি সুন্নাতের প্রতি বিদ্রূপ করার নিয়্যতে বলে, সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে (মুহীত)। কেউ

অপর কোন ব্যক্তিকে আশুরার দিন বলল, আমি আজ চোখে সুরমা ব্যবহার করব। এ কথা শুনে সে বলল, এতো মহিলা এবং হিজড়া লোকের কাজ তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে।

৯. মাসআলা : তাখয়ীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদি কেউ বলে, তারা নবীও হলেও মিথ্যা বলবে, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, নবী হলেও আমি তার কথা বিশ্বাস করি না তাহলেও সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, নবী হলেও সে ভারী স্বভাবের অথবা যদি বলে, প্রেরিত পয়গাম্বর হলেও বা নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হলেও সে ভারী স্বভাবের তাহলে এতে সে তৎক্ষণাৎ কাফির হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তির গোলামকে প্রহার করার ইচ্ছা করলে অপর ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি তাকে প্রহার করবে না। তখন মুনীর ব্যক্তি বলল, যদি মুহাম্মাদ (সা)ও বলে যে, তাকে প্রহার করবে না অথবা যদি আসমান থেকেও এ মর্মে আওয়াজ আসে যে, তুমি তাকে প্রহার করবে না তাহলেও আমি তাকে প্রহার করবই, এতে সে কাফির হয়ে যাবে। শায়খ (র) বলেন, একদা আমি সদরুশ শহীদ জামালুদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর হাদীস পাঠ করার পর তা শুনে কেউ যদি বলে যে, প্রত্যেক দিন সে এ ফাতনার কথাই পড়ছে, তাহলে দেখতে হবে, যদি সে এ কথার নিসবতকারী তথা পাঠকের দিকে করে, নবী করীম (সা)-এর দিকে না করে উক্ত বক্তব্য যদি দীন এবং শরীআতের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্কিত কোন কিছু না হয় তাহলে এতে সে কাফির হবে না। এহেন অবস্থায় তার এ বক্তব্যের মর্ম হবে, এটি ব্যতীত অন্য কিছু পড়া উত্তম। যদি কেউ বলে, “বিহরমাতি আরবী বালক” অর্থাৎ নবী করীম (সা) তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি নবী করীম (সা) সম্পর্কে বলে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা) এক সময় নবী ছিলেন, আরেক সময় নবী ছিলেন না অথবা যদি বলে, তিনি কবরের মধ্যে মুমিন হিসাবে আছেন, না কাফির হিসাবে আছেন, তা জানি না, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। গারারুল মাআনী (غرار المعاني) নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কেউ তার স্ত্রীকে বলল, বিপরীত কথা বলবে না। এ কথা শুনে সে বলল, নবী-রাসূলগণও বিপরীত কথা বলেছেন, তাহলে এটি কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে। তাই তার উপর তওবা করা ওয়াজিব এবং তার বিবাহও দোহরাতে হবে (তাতার খানিয়া)।

১০. মাসআলা : কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তোমাকে দেখা আর মালাকুল মাউত ফেরেশতাকে দেখা একই সমান তাহলে এ কথা শুনাহে কবীরী বলে গণ্য হবে। এ জাতীয় ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে কিনা, এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, সে কাফির হয়ে যাবে কিন্তু অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে সে কাফির হবে না (মুহীত)। খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, সে যদি উক্ত কথা মালাকুল মাউতের প্রতি শত্রুতাবশত বলে, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু মৃত্যুকে অপসন্দ করে এ কথা বলে তাহলে কাফির হবে না। কেউ যদি বলে, অমুককে দেখা আমি দুশমনী মনে করি। যেমন- মালাকুল মাউতকে আমি দুশমনী মনে করি, তাহলে অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মতে সে কাফির বলে গণ্য হবে। তাখয়ীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কেউ যদি বলে, আমি অমুকের সাক্ষ্য শুনবো না যদিও সে জিবরাঈল ও মিকাইল ফেরেশতা হয়, তাহলে

সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি কোন ফেরেশতাকে দোষী সাব্যস্ত করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, “আমাকে এক হাজার দিরহাম দাও” আমি মালাকুল মাউত ফেরেশতাকে প্রেরণ করব অমুকের জান কবজ করার জন্য, তাহলে সে কাফির হবে কি-না? এ সম্বন্ধে শায়খ (র) বলেন, হযরত আবু যার (রা) বলেছেন, কোন ফেরেশতার প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করা কুফরী। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমার ফেরেশতা, অমুক স্থানে তোমার কাজে আমি তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করব, তাহলে কোন কোন ফকীহ এর মতে এতে সে কাফির হবে না। আর কেউ যদি সাধারণভাবে বলে যে, আমি ফেরেশতা তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু “আমি নবী” বললে এর হুকুম ভিন্নতর হবে (তাতার খানিয়া)। এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করল, কিন্তু এতে কোন সাক্ষী ছিল না। এ কারণে বিবাহকারী ব্যক্তি বলল, আমি এ বিবাহে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাক্ষী রেখেছি বা সাক্ষী বানিয়েছি অথবা বলল, আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমি সাক্ষী বানিয়েছি তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। কেউ যদি বলে, আমি আমার ডান হাতের ফেরেশতা ও বাম হাতের ফেরেশতাকে সাক্ষী রাখলাম, তাহলে সে কাফির হবে না (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়া)।

চার. কুরআন মাজীদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি

১. মাসআলা : কেউ যদি বলে, কুরআন মাখলুক (সৃষ্ট) তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়া)। কেউ যদি কুরআন মাজীদের কোন আয়াতকে অস্বীকার করে বা কুরআন মাজীদের কোন আয়াতের ব্যাপারে বিদ্রূপ করে তবে সে কাফির বলে আখ্যায়িত হবে। খাযানা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি পুরা কুরআন মাজীদকে কিংবা কুরআন মাজীদের কোন আয়াতকে দোষারোপ করে তবুও সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে (তাতার খানিয়া)। যদি কোন ব্যক্তি সূরা নাস এবং সূরা ফালাককে কুরআন মাজীদের অংশ বলে স্বীকার না করে তবে সে কাফির হবে না। কিন্তু মুতাআখখির ফকীহগণের কেউ কেউ বলেন যে, সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা সদরে আওয়াল তথা সাহাবায়ে কিরামের যামানায় এ কথার ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটিই বিবৃদ্ধ لان الجما المتأخر لا يرفع الاختلاف المتقدم-কেননা পরবর্তীকালের ইজমা পূর্ববর্তীকালের মতভেদকে নিঃশেষ করতে পারে না (যহীরিয়া)। কেউ যদি বাদ্যযন্ত্র ও বাগীরের সুরে কুরআন মাজীদ পাঠ করে তবে কুফরী হবে। এক ব্যক্তি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করছে। তার তিলাওয়াত শুনে কেউ যদি বলে, এ কি তুফানের মত আওয়াজ তবে কুফরী হবে (মুহীত)। কেউ যদি বলে, তুমি কুরআন তো বহু পড়ছো, কিন্তু আমাদের থেকে অপরাধ এবং পাপকে তো দূর করতে পারছো না এ ধরনের বলা কুফরী হবে (খুলাসা)।

২. মাসআলা: কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি তো قل هو الله احد-এর খাল ছিলে ফেলেছো অথবা বলে, তুমি তো الم نشرح لك-এর আঁচল টেনে ধরেছো অথবা কোন

অসুস্থ ব্যক্তির সামনে যে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করছে, তাকে কেউ বলল, মৃত ব্যক্তির মুখের উপর সূরা ইয়াসীনকে রাখবে না অথবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, হে ان اعطيناك থেকেও অধিক বেটে ব্যক্তি! অথবা কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তি যার একটি শব্দও স্মরণে আসছে না তাকে বলল, والتفت لساق با لساق কিংবা পেয়ালা ভরে কোন ব্যক্তির কাছে কিছু এনে বলল, فكانت سرايا কাছাকাছলে বলল, واذا كالوهم اووزنوهم الخسرون অথবা কেউ অপর কোন পরিমাপের কৌতুকের সাথে বলল, وحشر বা বলল, والنازعات অথবা এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি الم نسرح এর পাগড়ী বেঁধেছো অর্থাৎ তুমি নিজ ইল্মকে যাহির করেছো অথবা কোন জায়গায় লোকদেরকে জমা করে কেউ বলল, فجمعنا هم جمعا বা বলল, وحشر والنازعات অথবা এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি النزعات অথবা এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি পড়, আমি তোমাকে গাল-মন্দ করব। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন : لا بل زان অথবা কাউকে জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য ডাকা হলে সে বলল, আমি একাই সালাত আদায় করব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : ان الصلوة تنهى অথবা কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, نفثيله يجوز (হীনবল হওয়া জায়েয) কেননা এটি বাতাসের সাথে উড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন : ونذهب ربحكم উপরোক্ত অবস্থাসমূহে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলেই কাফির বলে গণ্য হবে। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে তুমি তোমার ঘরকে والسماء والطارق এর মত পরিচ্ছন্ন করেছো তাহলে কোন কোন ফকীহ এর মতে এ ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। ইমাম আবু বকর ইবন ইসহাক (র) বলেন, যদি উক্ত ব্যক্তি জাহিল এবং মূর্থ হয় তবে সে কাফির হবে না। কিন্তু আলিম হলে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, فاعا صفا فاسرة امت তাহলে এতে মারাত্মক ভয় রয়েছে। অর্থাৎ এতে কুফরীর আশংকা রয়েছে। যদি হাড়ি পাতিলের খুরচুন এবং অপরাপর বিষয়াদি সম্পর্কে বলে, رالباقیات الصالحان তাহলে এতেও মারাত্মক আশংকা রয়েছে। কেউ যদি বলে, কুরআন অনারব ভাষার গ্রন্থ, তাহলে কুফরী হবে। আর যদি বলে, কুরআন মাজীদে অনারব শব্দও আছে তাহলে সে কাফির হবে কিনা এ সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। মুফাস্সির আবুল কাসিম (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

৩. মাসআলা : খাযানাতুল ফিকহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তিকে তুমি কেন কুরআন পড়ছো না বলার পর সে যদি বলে, আমি কুরআনের উপর অসম্মত তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। 'সদরুস সুদূর (র) এবং প্রধান বিচারপতি কামালুল মিল্লাতি ওয়াদদীন (র)-এর রিসালা (গ্রন্থ) দ্বয়ে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি কুরআনের কোন সূরা মুখস্ত করছে এবং খুব বেশী বেশী করে তা পাঠ করছে, এ দেখে অপর কোন ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি তো এ সূরাটিকে দুর্বল করে ফেললে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে (তাতার খানিয়া)।

পাঁচ. নামায, রোযা ও যাকাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি

১. মাসআলা : কেউ কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে বলল, নামায পড়ে নাও। সে বলল, আমি আর কখনও নামায পড়ব না। তারপর সে আর কখনও নামায পড়ল না। এ অবস্থায় মারা গেল তাহলে বলা যাবে যে, সে কাফির অবস্থায় মারা গেছে। কেউ যদি لا اصلی (আমি নামায পড়ব না) বলে, তবে এতে চার ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (১) لا اصلی (আমি নামায পড়ব না) বলে, তবু এতে চার ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (২) لا اصلی (আমি নামায পড়ব না) বলে, তবু এতে চার ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (৩) لا اصلی (আমি নামায পড়ব না) বলে, তবু এতে চার ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (৪) لا اصلی (আমি নামায পড়ব না) বলে, তবু এতে চার ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (৫) لا اصلی (আমি নামায পড়ব না) বলে, তবু এতে চার ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (৬) لا اصلی (আমি নামায পড়ব না) বলে, তবু এতে চার ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (৭) لا اصلی (আমি নামায পড়ব না) বলে, তবু এতে চার ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (৮) لا اصلی (আমি নামায পড়ব না) বলে, তবু এতে চার ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (৯) لا اصلی (আমি নামায পড়ব না) বলে, তবু এতে চার ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (১০) لا اصلی (আমি নামায পড়ব না) বলে, তবু এতে চার ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে।

২. মাসআলা : একজন অন্যজনকে বলল, এসো, আমাদের হাজত পূরা হওয়ার জন্য আমরা নামায পড়ি। দ্বিতীয়জন বলল, আমি বহু নামায পড়েছি, কিন্তু এতে আমার কোন হাজতই পূরা হয়নি। যদি সে এ কথা তাচ্ছিল্যের নিয়্যতে বলে থাকে তবে সে কাফির হয়ে যাবে (তাতার খানিয়া)। যদি নামাযী লোকদেরকে কোন ফাসিক ব্যক্তি পাপের মজলিসের দিকে ইশারা করে বলে, নামায না পড়া ভাল কাজ তবে তা কুফরী হবে। কেউ কোন ব্যক্তিকে বলল, নামায পড়, তাহলে ইবাদতের স্বাদ পাবে। আর সে বলল, তুমি বেনামাযী হয়ে যাও, বেনামাযী হওয়ার স্বাদ পাবে। তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কোন গোলামকে নামায পড় বলার পর সে বলল, আমি নামায পড়ব না, কেননা আমার নামাযের সওয়াব তো মুনীবের হবে, তাহলেও সে কাফির হয়ে যাবে। কাউকে নামায পড়তে বলা হল, আর সে বলল, আল্লাহ আমার মাল কমিয়ে দিয়েছেন, আমিও তার হুকুমিয়ে দিব, তাহলে সে কাফির হবে। কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র রমাযান মাসে নামায পড়ে, অন্য সময়ে নামায পড়ে না এবং বলে, এই নামাযই অনেক বা বেশী। কেননা রমাযানের এক নামায সত্তর নামাযের সমান এতে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে গায়ের কিবলাহর দিক হয়ে নামায পড়ে, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেটিই কিবলাহর দিক হয়ে যায় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে কাফির হয়ে যাবে। ফকীহ আবুল লাইস (র)ও এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। এমনি ভাবে কেউ যদি তাহারাত ব্যতিরেকে নামায পড়ে বা নাপাক

কাপড় নিয়ে নামায পড়ে তবে এটি কুফরী কাজ বলে গণ্য হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়ূ ছাড়া নামায পড়া কুফরী। সদরুশ শহীদ (র) বলেন, আমরা এ অভিমতটিই গ্রহণ করেছি।

৩. মাসআলা : তাহাররী অধ্যায়ে আছে যে, কেউ তাহাররী (কিবলাহু নিরূপণের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা) করল। তারপর কোন এক দিকের ব্যাপারে তার প্রবল ধারণা হল যে, এটিই কিবলাহুর দিক হবে। এরপর সে ঐ দিক বাদ দিয়ে অন্য দিকে মুখ করে নামায আদায় করল, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার ব্যাপারে কুফরীর আশংকা রয়েছে। কেননা সে কিবলাহুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তবে তার কুফরীর ব্যাপারে মাসাইথে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কেউ যদি ঠাট্টা করে তাচ্ছিল্যের সাথে কিবলাহুর দিক বাদ দিয়ে অন্য দিকে মুখ করে নামায আদায় করে তবে এতে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ যদি ঠেকাবশত অনন্যোপায় হয়ে এরূপ কাজ করে যেমন— কোন ব্যক্তি জামাআতে নামায আদায় করছে, এমতাবস্থায় তার ওয়ূ ভেঙ্গে গেল। এখন সে লজ্জায় পড়ে বিনা ওয়ূতেই নামায সমাধা করল অথবা শত্রুর সামনে আছে তাই সে অপবিত্র অবস্থায়ই দাঁড়িয়ে নামায আদায় করল। তাহলে কোন কোন ফকীহ এর মতে এতে সে কাফির হবে না। কেননা শরীআতের প্রতি বিদ্রূপ বা ভৎসনা করা তার উদ্দেশ্য নয়। যদি কোন ব্যক্তি ঠেকাবশত বা অনন্যোপায় হয়ে এ জাতীয় কোন কাজ করে তবে তার উচিত কিরামের অবস্থায় নামাযের কিরামের ইচ্ছা না করা। আর এ অবস্থায় সে কিরাআতও পড়বে না। এমনি ভাবে রুকু সিজদার হালাতে রুকু সিজদার নিয়্যত করবে না এবং তাসবীহও পড়বে না। তাহলে সে ফকীহদের সর্বসম্মত রায় (اجماع) অনুসারে কাফির হিসাবে গণ্য হবে না। কেউ যদি নাপাক কাপড় পধান করে নামায পড়ে তবে সে কোন কোন ফকীহ এর মতে কাফির হিসাবে গণ্য হবে না। কেউ যদি কোন নাবালিগ, পাগল, মহিলা, জুনবী বা ওয়ূহীন ব্যক্তির পিছনে নামাযের ইজ্জদা করে অথবা কাযা নামায যিম্মায় থাকা অবস্থায় ওয়াজিয়া নামায পড়ে, তাহলে কোন ইমামের মতেই সে কাফির হবে না (মুহীত)

৪. মাসআলা : কেউ যদি বলে, নামায ফরয, কিন্তু এর রুকু সিজদা ফরয নয় তাহলে তাকে কাফির কলা যাবে না। কেননা তার এ কথায় তাবীল (ব্যাত্যা) আছে। পক্ষান্তরে সে যদি مطلقاً (সর্বোত্তমভাবে) রুকু সিজদার ফরযিয়াকে অস্বীকার করে তাহলে কাফির হয়ে যাবে। এমনকি দ্বিতীয় সিজদার ফরযিয়াকে অস্বীকার করলেও কাফির হয়ে যাবে। কেননা সে ইজমা ও তাওয়াতুরকে (تواتر) প্রত্যাখ্যান করেছে। কেউ কা'বা তথা বায়তুল্লাহ শরীফ কিবলাহু না হয়ে বায়তুল মুকাদাস কিবলাহু হলে আমি বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়েই নামায আদায় করতাম, বায়তুল মুকাদাসের দিকে ফিরে নয় অথবা (যেমন তায়নীসুল মুলতাকিত গ্রন্থে আছে) বলল যে, যদি অমুক ব্যক্তি কিবলাহু সাব্যস্ত হয় তাহলে আমি তার দিকে মুখ করে নামায আদায় করতাম না অথবা বলে, যদি অমুক ব্যক্তি কিবলাহুর দিক সাব্যস্ত হয় তাহলে আমি ঐ দিকে মুখ করে নামায আদায় করব না অথবা (যেমন তাখরীর গ্রন্থে আছে) বলল যে, কিবলাহু দুটি (১) বায়তুল্লাহ (২) বায়তুল মুকাদাস তাহলে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে (আল্ ইয়ানাবী)।

৫. মাসআলা : ফকীহ ইবরাহীম ইবন ইউসুফ (র) বলেন, কেউ যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে তবে এতে তার কোন সওয়াব হবে না। বরং উল্টা গুনাহ হবে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, কুফরী হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, গুনাহও হবে না সওয়াবও হবে না। তার অবস্থা হবে যেন সে কোন নামাযই পড়ে নি। মিসবাহুদ্দীন গ্রন্থে আছে, ফকীহ আবু হাফস কবীর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যদি কোন ব্যক্তি মুশরিক লোকদের কাছে গমন করে দুই ওয়াজ বা তিন ওয়াজ নামায ছেড়ে দেয় তাহলে তার হুকুম কি হবে? জবাবে তিনি বলেছেন, যদি সে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের লক্ষ্যে এরূপ করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং এ অবস্থায় তার উপর কাযা ওয়াজিবও হবে না। আর যদি ফিসকের কারণে তরক করে তবে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না এবং তাকে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা পড়ে নিতে হবে। ইয়াতীমা গ্রন্থে আছে, একদা শায়খ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যদি কোন অমুসলিম ব্যক্তি দারুল ইসলামে অবস্থান করা অবস্থায় মুসলমান হয়, তারপর ছয় মাস পর নামায সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় এবং জবাবে সে বলে যে, আমার উপর নামায ফরয হয়েছে বলে, আমি জানি না, তাহলে তার হুকুম কি হবে? জবাবে তিনি বলেছেন, তাকে কাফির বলা যাবে। কিন্তু সে যদি মাত্র কয়েকদিন আগে মুসলমান হয়ে থাকে তবে তার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না (তাতার খানিয়া)।

৬. মাসআলা : মুআযযিন আযান দিতে ছিল। এমতাবস্থায় আযান শুনে কেউ যদি তাকে বলে, তুমি মিথ্যা কথা বলছো তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তাখরীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মুআযযিন আযান দেওয়ার পর কেউ বলল, এটি এক চিৎকারের আওয়াজ এ কথা সে যদি অস্বীকারের নিয়্যতের সাথে বলে, তবে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। ফুসূল গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আযান শুনার পর কেউ যদি বলে, এটি ঘণ্টার আওয়াজ তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে (তাতার খানিয়া)।

৭. মাসআলা : কাউকে বলা হল যাকাত দিয়ে দাও। জবাবে সে বলল, আমি যাকাত দিব না তাহলে তাকে কাফির গণ্য করা হবে। কেউ বলেন, সে مطلقاً কাফির হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ বলেন, اموال باطنية-এর ক্ষেত্রে সে কাফির হবে না। কিন্তু اموال ظهيرة-এর ক্ষেত্রে সে কাফির হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, যাকাতের ক্ষেত্রেও ঐ সব বক্তব্য প্রযোজ্য হবে, যা নামাযের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে (আল্ ফুসূলুল ইমাদিয়া)।

৮. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, রমায়ানের রোযা ফরয না হলে কত ভাল হত, তাহলে সে কাফির হবে কিনা এ সম্বন্ধে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক্ষেত্রে শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র) থেকে যা বর্ণিত রয়েছে তাই সর্বাধিক সঠিক। তিনি বলেন, এ বিষয়টি তার নিয়্যতের উপর নির্ভর করবে। যদি সে হক আদায় করে রোযা রাখা সম্ভব নয় মনে করে একথা বলে তাহলে সে কাফির হবে না। কেউ যদি রমায়ান মাস

১. যে মালের যাকাতদাতা নিজে গোপনভাবে আদায় করে।

২. যে মালের যাকাত রত্নপ্রধান কর্তৃক নিয়োজিত লোকজন গিয়ে উসূল করে আনে।

আসার সময় বলে, এক মারাত্মক মাস এসেছে বা বলে, এক ভারী মেহমান এসেছে তাহলে কুফরী হবে। কেউ যদি রজব মাস আসার পর বলে, এক আযাবের মধ্যে পতিত হলাম, আর একথার উদ্দেশ্য হলো একথা ফযীলতের মাসের প্রতি তাম্বিল প্রকাশ করা। তবে কাফির হয়ে যাবে কিন্তু রমায়ানের ক্রান্তির কথা মনে করে বললে কাফির হবে না। প্রথমোক্ত মাসআলার ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি বলে, রমায়ান মাসের রোযা খুব দ্রুত এসে যায় তবে কোন কোন ফকীহ- এর মতে একথা কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে। হাকিম আবদুর রহমান (র) বলেন, এতে কুফরী হবে না। যদি বলে, এইভাবে রোযা আর কতদিন রাখতে হবে; একেবারে তো অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম তবে তা কুফরী হবে। তাবীল বা ব্যাখ্যার সাপেক্ষে কেউ যদি বলে, আল্লাহ তা'আলা এসব ইবাদত আমাদের উপর আযাবস্বরূপ ধার্য করেছেন তাহলে কুফরী হবে না। যদি বলে, আল্লাহ আমাদের উপর এসব ইবাদত ফরয না করলে আমাদের জন্য ভাল হত, ব্যাখ্যা সাপেক্ষে একথা বললে কুফরী হবে না (মুহীত)। কেউ যদি বলে, আমার জন্য নামায ঠিক নয় অথবা বলে, হালাল-হারাম আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় অথবা বলে, আমার তো স্ত্রী, সন্তান কিছুই নেই; আমি নামায পড়ব কিসের জন্য অথবা বলে, নামাযকে আমি তাকের উপর রেখে দিয়েছি, তাহলে সে কাফির হবে (খায়ানাতুল মুফতিয়ীন)।

ছয়. ইল্ম ও আলিম সম্পর্কিত বিষয়াদি

১. মাসআলা : নিসাব নামক গ্রন্থে আছে যে, যাহিরী কোন কারণ ব্যতীত কেউ যদি কোন আলিমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তাহলে তার ব্যাপারে কুফরীর আশংকা রয়েছে। কেউ যদি কোন সৎ মানুষ সম্পর্কে বলে, তার সাথে সাক্ষাত করা এবং শূকরের সাথে সাক্ষাৎ করা একই কথা, তবে তার কাফির হওয়ার আশংকা রয়েছে (খুলাসা)। বিনা কারণে কেউ যদি কোন আলিম বা ফকীহকে গালি দেয় তবে তার কুফরীর ব্যাপারে আশংকা রয়েছে। কেউ যদি কোন আলিমকে বলে; তোমার ইলমের পশ্চাদ্দেশে গাধার যৌনাঙ্গ এখানে ইল্ম দ্বারা ইলমে দীন উদ্দেশ্য হলে এটা কুফরী কালাম হবে (আল-বাহরুর রায়িক)। কোন মূর্থ ব্যক্তি যদি বলে, তারা যে ইল্ম শিখেছে তা কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয় অথবা বলে, তারা যা বলে তা হচ্ছে বাতাস কিংবা বলে যে, তারা যা বলছে তা শুধু ধোঁকা কিংবা বলে যে, আমি হীলা (কৌশল) সংক্রান্ত ইল্মকে স্বীকার করি না তাহলে এসব কথা কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে (মুহীত)।

২. মাসআলা : কোন ব্যক্তি উঁচু স্থানে বসে আছে এমতাবস্থায় লোকজন নীচু স্থানে বসে ঠাট্টাচ্ছিলে তার নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করছে; তারপর তারা বালিশের উপর হাত মারছে এবং হাসাহাসি করছে, এতে তারা সকলে কাফির হিসাবে গণ্য হবে। উঁচু জায়গায় না বসা অবস্থায়ও কেউ যদি এরূপ করে তাহলেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কোন ব্যক্তি ইল্মী মজলিস থেকে আসার পর অপর কোন ব্যক্তি যদি তাকে বলে তুমি গির্জা থেকে এসেছো তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, ইল্মী মজলিসে আমার কী কাজ অথবা বলে, তারা যে কথা বলছে, তা কে করতে পারে? তাহলে সে কাফির হবে (খুলাসা)। কেউ

যদি বলে, ইল্ম দ্বারা তো খলে ভরবে না। যদি বলে, ইল্ম দ্বারা কি করব আমার তো দরকার টাকা তাহলে কাফির হয়ে যাবে (ইতাবিয়া)।

৩. মাসআলা : কেউ যদি বলে, আমার স্ত্রী-পুত্র রয়েছে, ইল্মী মজলিসে যাওয়ার আমার সুযোগ নেই। যদি ইলমের প্রতি তাম্বিলের নিয়তে সে একথা বলে থাকে তবে তার ব্যাপারে বড়ই আশংকা রয়েছে। মাজমুউন নাওয়াযিল গ্রন্থে আছে যে, কেউ যদি কোন আলিমকে বলে যাও; তুমি তোমার ইল্ম বস্তায় ভরে রাখো তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। ফকীহ ব্যক্তি ইল্মী কথা আলোচনা করছে বা কোন হাদীস উদ্ধৃত করছে। তা শুনে সে যদি বলে, এগুলোর কোন একটিও গ্রামে নেই কিংবা বলে, ইল্ম কোন কাজে আসবে-আমার টাকার দরকার যা বর্তমানে মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশী দামী, তবে তা কুফরী কালাম হবে। ফাসাদ সৃষ্টি করা তথা শরীআতের বরখিলাফ কাজ করা আলিম হওয়া থেকে উত্তম বলা কুফরী। কোন মহিলা যদি আলিম স্বামীর উপর লা'নত করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, আলিমের কাজ কাফিরের কাজের মতই তাহলে তা কুফরী হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সকল কাজের ক্ষেত্রে তুলনা করা তার উদ্দেশ্য হয়। কেননা তখন হক ও বাতিলকে সমপর্যায়ভুক্ত গণ্য করা হয়। কোন বিষয়ে শরীআতের ব্যাখ্যায় ও প্রমাণ তুলে ধরেন, এরপর কেউ যদি বলে যে এরূপ ইল্ম যাহির করো না, এ ইল্ম কোন কাজে আসবে না তাহলে তার কুফরীর ব্যাপারে আশংকা রয়েছে। কেউ যদি কোন ফকীহ ব্যক্তি আলিম ও ফকীহ ব্যক্তিকে (یا عولیم) অথবা (یا علیوی) বলে এবং এর দ্বারা দীনকে খাটো করা তার উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে তবে কুফরী হবে না। বর্ণিত আছে যে, জনৈক ফকীহ ব্যক্তি তার একখানা কিতাব কোন ব্যক্তির দোকানে রেখে চলে যান। তারপর তিনি নিজের কাজ সেরে ঐ দোকানের সম্মুখ দিয়ে যেতে লাগলে দোকানদার তাকে বলল, ওহে! আপনি তো ভুলবশত আপনার কাপ্তে আমার দোকানে রেখে যাচ্ছেন। আমি তোমার দোকানে কিতাব রেখেছি। কাপ্তে তো রাখি নি। একথা শুনে দোকানদার বলল, কৃষক লোকেরা কাপ্তে দ্বারা ঘাস কাটে আর আপনারা কিতাব দ্বারা মানুষের গলা কাটেন। তারপর ঐ ফকীহ ইমাম আবু বকর মুহম্মাদ ইব্ন ফযল (র)- এর নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন (মুহীত)।

৪. মাসআলা : ফকীহ আবদুল করীম ও আবু আলী সাগদী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর প্রতি রাগ করে তাকে আল্লাহর ফরমাবরদারী করা এবং ওনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য উপদেশ দিচ্ছিল। তখন সে মহিলা তাকে বলল, আমি আল্লাহকে কি করে জানব এবং ইলমের কথা কি করে বুঝবো; এসব কিছু আমি জানি না এবং বুঝি না, আমি তো আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা সাব্যস্ত করেছি, এহেন অবস্থায় এ ব্যক্তির হুকুম কি হবে? জবাবে ফকীহদ্বয় বলেন, সে কাফির হয়ে যাবে (আল ফুসুলুল ইমাদিয়া)। এক ব্যক্তির সামনে বলা হল যে, তালিবে ইল্মগণ ফেরেশতার ডানার উপর চলে। একথা শুনে সে বলল, এটি মিথ্যা কথা, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর কিয়াস হক নয়, তাহলে এটি কুফরী কথা হিসাবে গণ্য হবে (তাতার খানিয়া)। কেউ যদি বলে, এক পিয়াল ছরীদ (এক প্রকারের খাদ্য) ইল্ম থেকে অনেক ভাল, তবে এটি কুফরী বাক্য

হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু **خير من الله** না বলে **خير من العلم** (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

৫. মাসআলা : একজন তার প্রতিপক্ষকে বলল; ফায়সালার জন্য সঙ্গে (আদালতে) চল আর সে বলল, আমি স্বেচ্ছায় যাব না। আমাকে নিতে হলে পেয়াদা নিয়ে এসো। তবে কুফরী বলে গণ্য হবে। কেননা তার কথার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, দীন ও শরীআতের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। কিছু আমার সাথে বিচারকের নিকট চল, বলার পর সে যদি পূর্ববৎ জবাব দেয় তাহলে কুফরী হবে না। কেউ যদি বলে, আমার সাথে শরীআত এবং এই হীলা কোন উপকার আসবে না অথবা বলে, আমার জন্য দায়ুস নির্ধারিত আছে, আমি শরীআত দিয়ে কি করব তাহলে এতে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, যখন তুমি টাকা পয়সা (ঘুষ) নিয়েছ তখন শরীআত এবং বিচারক কোথায় ছিল? তবে তা কুফরী কালাম বলে গণ্য হবে, মুতাআখখির ফকীহগণের কেউ কেউ বলেছেন যে, বিচারক বলে যদি শহরের বিচারককে বুঝান উদ্দেশ্য হয় তবে কুফরী হবে না। কেউ যদি অপর কাউকে বলে যে, এ ব্যাপারে শরীআতের হুকুম এরূপ। একথা শুনার পর সে যদি বলে, আমি প্রচলিত রেওয়াজ অনুসারে চি শরীআতের ধার-ধারি না তবে কোন কোন ফিক্‌হবিদের মতে সে কাফির বলে গণ্য হবে মাজমুউন নাওয়াফিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, শরীআতের হুকুম সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? এ প্রশ্ন শুনে সে দীর্ঘ শ্বাস নিয়ে বলল, এই শরীআতের কথা বলছো, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং স্বামী থেকে তার বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে (মুহীত)।

৬. মাসআলা : কোন ব্যক্তির সামনে তার প্রতিপক্ষ ইমামগণের ফাতাওয়া পেশ করার পর সে যদি তা প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, তুমি যে ফরমান পেশ করছো, তা আবার ধরনের ফাতওয়া, তাহলে কারো কারো মতে এ কথা কুফরী বাক্য হিসাবে গণ্য হবে। কেননা সে শরীআতের বিধানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এমনিভাবে সে যদি মুখে কোন কথা না বলে ফাতওয়া খানা মাটিতে ছুড়ে মারে এবং বলে এটি কি ধরনের শরীআত তা হলেও তা কুফরী কালাম বলে গণ্য হবে। এক ব্যক্তি কোন মুফতীর নিকট গিয়ে তার স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করল (ঘটনার) বিবরণ শুনে মুফতী সাহেব তালাকের ফাতওয়া দিলেন, আর লোকটি বলল, আমি তালাক-মালাক বুঝি না। আমার সন্তানের জননীকে আমার ঘরে রাখতে হবে; এটা বুঝি, এহেন অবস্থায় ফকীহ আলী মাগদী (র)-এর মতে সে কাফির হয়ে যাবে (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)। বাদী ও বিবাদীর কোন এক পক্ষ ইমামগণের ফাতওয়া উপস্থাপন করার পর অপর পক্ষ বলল, তারা যেভাবে ফাতওয়া দিয়েছেন বিষয়টি আসলে এরূপ নয় অথবা বলল, আমি এই ফাতওয়া উপর আমল করব না তাহলে তার উপর তা'ফীর (সাধারণ সাজা) ওয়াজিব হবে (যখীরা)।

সাত. হালাল, হারাম বা ফাসিক-ফাজির লোকদের কথাবার্তা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়াদি

১. মাসআলা : কেউ যদি হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম মনে করে তবে সে কাফির হবে। কেউ যদি বাজারে চালু করার জন্য নিজের হারাম মালকে হালাল বলে অথবা অজ্ঞতা

বশত কোন হারামকে হালাল বলে তবে সে কাফির হবে না। যে হারামকে হালাল জানে কাফির হয়ে যায়। তার হরমত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে এবং তা **حرام لعينه** (নিজস্ব সন্তাগতভাবে হারাম) হতে হবে। পক্ষান্তরে যে জিনিসের হরমত **لغيره** (বা সন্তা বর্হিত্বৃত কারণে) এবং যার হরমত **خبر احو** দ্বারা প্রমাণিত একে হালাল জানলে কাফির হবে না' (খুলাসা)।

কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হল, এক হালাল তোমার নিকট উত্তম না দুই হারাম? জবাবে সে বলল, যেটি দ্রুত পাওয়া সম্ভব সেটিই আমার নিকট উত্তম, তাহলে তার কুফরীর ব্যাপারে আশংকা রয়েছে। কেউ যদি বলে, আমার টাকার দরকার, চাই তা হালাল হোক বা হারাম হোক তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। কেউ যদি বলে, হারাম মাল পাওয়া পর্যন্ত আমি হালালের দিকে যাব না তাহলে সে কাফির হবে না। কেউ যদি সওয়াবের আশায় কোন ফকীরকে হারাম মাল দান করে তাহলে তা কুফরী বলে গণ্য হবে। একথা জানা সত্ত্বেও ফকীর ব্যক্তি যদি তার জন্য দু'আ করে এবং দাতা ব্যক্তি তাতে আমীন বলে তবে এ কাজও কুফরী বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তিকে বলা হল, এই মাল সবই হালাল, সে বলল, আমার কাছে হারামই অধিক প্রিয় তাহলে তার এ কথা কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে। উক্ত বক্তব্যের পর উপস্থিত ব্যক্তি যদি বলে, এই দুনিয়াতে কোন হালালখোর আছে নাকি, যদি থাকে তবে তাকে নিয়ে এসো, আমি তাকে সিজদা করব তা হলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, এগুলো সবই হালাল। তারপর সে লোক বলল, আমার হারাম দরকার তা হলে তা কুফরী বাক্য বলে পরিগণিত হবে (মুহীত)।

২. মাসআলা : যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি সন্তান শরাব পান করে এবং এর জন্য তার আত্মীয়-স্বজনগণ টাকা-পয়সার যোগান দেয় তবে এ কাজ কুফরী বলে গণ্য হবে। যদি তারা টাকা-পয়সার যোগান না দিয়ে শুধুমাত্র তাকে মুবারকবাদ প্রদান করে তবুও তা কুফরী কাজ হিসাবে গণ্য হবে। কেউ যদি বলে, মদ পান করার হরমত (হারাম হওয়ার বিষয়টি) কুরআন দ্বারা প্রমাণিত নয় তাহলে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি বলল আমি মদ পান করা থেকে তওবা করেছি। এরপরও সে তা পানি করছে। তারপর তাকে বলা হল, তুমি কেন মদ পান করা থেকে তওবা করছো না। জবাবে সে বলল, কেউ কি মৃত্যু দুখ না খেয়ে সবার করতে পারে? তাহলে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না। কেননা এটি হয়তো একটি প্রশ্নবোধক বাক্য হিসাবে গণ্য হবে অথবা এ কথার মানে হবে; চাহিদার দিক থেকে মদ এবং মাতৃ দুখ উভয়ই সমান। ইমাম সারাখসী (র)-এর কিতাবুল হায়যে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি ঋতুমতী মহিলার সাথে সহবাস করাকে হালাল মনে করে তবে তা কুফরী হবে। এমনিভাবে মহিলার গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করাকে বৈধ মনে করলেও অনুরূপ হুকুম হবে। নাওয়াদির গ্রন্থে ইমাম

১. হারাম বস্তু মৌল পদার্থের দিকে থেকে দুই প্রকারের হয়ে থাকে, (১) এমন বস্তু যা মূলতঃই হারাম। যেমন কুকুর, শূকর ইত্যাদি। (২) এমন বস্তু যা মূলতঃই হারাম নয়, বরং অন্য কারণে হারাম। এমনিভাবে হারাম হওয়ার দিক থেকেও হারাম বস্তু দুই প্রকারের। (১) এমন বস্তু যার হরমত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। (২) এমন বস্তু যার হরমত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মুহাম্মাদ (র) থেকে উল্লেখ আছে যে, উপরোক্ত দুই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে না। এটিই সহীহ অভিমত। এক ব্যক্তি শরাব পান করে বলল, খুশী তারই জন্য যে আমার খুশীতে খুশী এবং নাখুশী ও লোকমান তারই জন্য যে আমার খুশীতে নাখোস তবে একথা কুফরী হিসাবে গণ্য হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা : কেউ যদি গুনাহের কাজ আরম্ভ করে নিজের সঙ্গী-সাথীদেরকে বলে, এসো আমরা আমোদ স্মৃতি করি তাহলে একথা কুফরী কালাম বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি শরাব পান করা শুরু করে বলল, মুসলমানী যাহির করছি অথবা বলল, মুসলমানী যাহির হয়ে গেছে তাহলে তাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা হবে। কোন ফাসিক ব্যক্তি বলল, যদি শরাবের একটি ফোটাও মাটিতে পড়ে তবে জিবরাইল (আ) নিজ পাখা দ্বারা তা তুলে দিবেন, তাহলে এ ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। কোন ফাসিক ব্যক্তিকে বলা হল, তুমি প্রত্যহ সকালে আল্লাহকে এবং তার সৃষ্টি জীবকে কষ্ট দিচ্ছ। জবাবে সে বলল, (এরূপ করে) আমি ভাল করছি তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি শরীআতের খেলাফ গুনাহের কাজ করে বেড়ায় এবং বলে যে, এটিও একটি তরীকা এবং এটিও একটি মাযহাব তাহলে একথা কুফরী কালাম বলে গণ্য হবে (মুহীত)। নাতিফী (র)-এর তাজনীম নামক গ্রন্থে আছে যে, বিগততম মতে সে কাফির হবে না (তাতার খানিয়া) কোন ব্যক্তি সগীরা গুনাহের কাজ করার পর তাকে তওবা করতে বলা হলে সে বলল, আমি কি করেছি যে আমাকে তওবা করতে হবে? এতে সে কাফির হয়ে যাবে (মুহীত)।

৪. মাসআলা : কেউ যদি হারাম খাদ্য বিসমিল্লাহ বলে খায় তবে ইমাম খাহারযাদা (র)-এর মতে সে কাফির হয়ে যাবে। হারাম খানা খাওয়ার পর কেউ যদি “আলহামদুলিল্লাহ” বলে তবে মুতাআখখির আলিমগণের কারো কারো মতে সে কাফির হবে না। কেউ যদি মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে “বিসমিল্লাহ” বলে তা পান করে তবে ফকীহদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে সে কাফির হয়ে যাবে। এমনভাবে যদি যিনা করার সময় বা জুয়ার গুটি হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে এসব কিছু শুরু করে তবে এ কাজও কুফরী বলে গণ্য হবে (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)। দুই ব্যক্তিকে পরস্পর ঝগড়া করতে দেখে এক ব্যক্তি لا حول ولا قوة الا بالله বললে অপর ব্যক্তি বলল, কোন কাজে আসবে না অথবা বলল, এর দ্বারা আমি কি করব? অথবা বলল لا حول ولا قوة الا بالله দ্বারা তো আর পেট ভরবে না অথবা বলল, لا حول ولا قوة দিয়ে কি রুটি খাওয়া যাবে? তাহলে এসব বাক্যের কারণে উক্ত ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে (যহীরিয়া) তাসবীহ তাহলীলের ক্ষেত্রে এ জাতীয় কথা বললে সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ হকুম প্রযোজ্য হবে। এমনভাবে কোন ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ বলার পর যদি অপর কোন ব্যক্তি বলে যে, তুমি সুবহানাল্লাহ এর সৌন্দর্য নষ্ট করে দিয়েছো অথবা বলে, তুমি সুবহানাল্লাহর চামড়া ছিলে ফেলেছো তা হলে এ কথা কুফরী বলে গণ্য হবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বল, একথা শুনে সে বলল, আমি তা বলব না তাহলে কোন কোন ফকীহ এর মতে সে কাফির বলে গণ্য হবে। কিন্তু কোন কোন ফকীহ বলেন, এ কথার দ্বারা তার উদ্দেশ্য যদি এরূপ হয় যে, আমি তোমার হকুমে “লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ” কালেমা পড়ব না তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না। অবশ্য কোন কোন ফকীহ এর মতে তাকে مطلقا কাফির আখ্যায়িত করা যাবে। কেউ যদি বলে, এই কালেমা পড়ে তুমি কি করেছো, কতখানি মর্তবা লাভ করেছো তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি কয়েকবার হাঁচি দিলে অপর এক ব্যক্তি তার এই হাঁচির পর প্রত্যেক বারই الله یرحمك বলেছে। এরপর সে লোক পুনরায় হাঁচি দেওয়ার পর সে আবাবারو الله یرحمك বলল। এতে সে ব্যক্তি বলল, তোমার الله یرحمك শুনে আমার নাকে দম এসে গেছে অথবা বলল, এতে আমার সীনা সংকীর্ণ হয়ে গেছে অথবা বলল, এতে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি; তাহলে সে কাফির হবে কিনা, এ সম্পর্কে সহীহ জবাব হল যে, সে কাফির হবে না (মুহীত)। রাষ্ট্রপ্রধান হাঁচি দেওয়ার পর এক ব্যক্তি বলল, الله یرحمك। এটি শুনে অপর এক ব্যক্তি বলল, রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য الله یرحمك বলবে না। তাহলে এ ব্যক্তি কাফির হিসাবে গণ্য হবে না (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

আট. কিয়ামত ও কিয়ামত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

১. মাসআলা : কেউ যদি কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, মীযান, পুলসিরাত বা আমলনামা ইত্যাদি বিষয়কে অস্বীকার করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কেউ কবর হতে পুনরুত্থিত হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে তবে সেও কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির পুনরুত্থিত হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে তবে তাকে কাফির বলা যাবে না। শায়খ যাহিদ আবু ইসহাক কিলাবায়ী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (যহীরিয়া)। ইবন সালাম (র) বলেন, কেউ যদি বলে, ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের পুনরুত্থানের পর জাহান্নামের অগ্নিতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে কিনা, তা আমি জানি না তাহলে আমাদের এবং বলখের মাশাইখে কিরামের মতে সে কাফির বলে গণ্য হবে (ইতাবিয়া)। জান্নাতে দাখিল হওয়ার পর মুমিনের আল্লাহর দীদার লাভের বিষয়টিকে অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। এমনভাবে যে ব্যক্তি কবরের আযাব এবং হাশর-নশরের বিষয়কে অস্বীকার করবে সেও কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বলবে, সওয়াব ও আযাব শুধু মাত্র আত্মার উপর হবে তবে সে কাফির হবে না (আল-বাহরুর রায়িক)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, গুনাহ কর না, অপর এক জগত আছে। এ কথা শুনে সে যদি বলে, সে জগত সম্পর্কে তোমার খবর আছে কি? তবে সে কাফির হয়ে যাবে। ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতাকে বলল, যদি এখন না দাও তবে কিয়ামতের দিন অবশ্যই দিতে হবে, একথা শুনে ঋণগ্রহীতা বলল, কিয়ামত কি হবে? কিয়ামতের প্রতি তাচ্ছিল্যের নিয়্যতে সে যদি এ কথা বলে থাকে তাহলে কুফরী করা হবে। মজলুম ব্যক্তি জালিমকে বলল, ঠিক আছে কিয়ামত তো আছেই একথা শুনে জালিম ব্যক্তি বলল, কিয়ামতে অমুক গাধা হবে তা হলে এটা কুফরী কালাম হবে (তাতার খানিয়া)।

২. মাসআলা : পাওনাদার ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বলল, দুনিয়াতেই আমার দিরহামগুলো দিয়ে দাও। কেননা কিয়ামতের দিন কোন দিরহাম থাকবে না। একথা শুনে ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি বলল, আমাকে আরো দশ দিরহাম হাওলাদ দাও এবং তুমি তা দুনিয়াতেই চেয়ে নিবে বা আমি নিজেই তা পরিশোধ করে দিব তাহলে তা কুফরী বলে গণ্য হবে। শায়খ ফযলী (র) এবং আমাদের বহু মাশাইখে কিরাম এভাবে ফায়সালা দিয়েছেন। এটিই বিগততম অভিমত।

যদি বলে, হাশরের সাথে আমার কি সম্পর্ক অথবা বলে, কিয়ামতকে আমি ভয় করি না তাহলে কুফরী হবে (খুলাসা)। কেউ যদি তার প্রতিপক্ষ বলে, হাশরের ময়দানে তোমার থেকে আমি আমার হক উসুল করে নিব। একথা শুনে প্রতিপক্ষ বলল, হাশরের ময়দানে সেই জনসমাবেশে তুমি আমাকে কোথায় খুঁজে পাবে? তাহলে এই ব্যক্তি কাফির কিনা, এ সম্বন্ধে মাশাইখে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ফকীহ আবুল লাইস (র)-এর ফাতাওয়া এন্তে উল্লেখ আছে যে, এতে সে কাফির হবে না (মুহীত)। কেউ যদি বলে, দুনিয়াতেই নেকীর দরকার। কিন্তু আখিরাতে যেভাবে ইচ্ছা থাকবে তাতে কোন অসুবিধা নেই তা হলে এ কথাও কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়া)।

৩. মাসআলা : কেউ যদি কোন পরহেযগারকে বলে যে, ভাল করে বস জান্নাত থেকে আবার পড়ে যেও না তাহলে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে এ কথা কুফরী বাক্য হিসাবে পরিগণিত হবে। কোন ব্যক্তিকে বলা হল, আখিরাতে সফলতার উদ্দেশ্যে দুনিয়াকে ছেড়ে দাও। একথা শুনে সে বলল, আমি নগদকে বাকী লাভের জন্য ছেড়ে দিতে পারি না তাহলে তা কুফরী বলে গণ্য হবে। ফকীহ আল হাজওয়ানী (র)-এর কপিতে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি বলল, যে ব্যক্তি এই জগতে বে-আক্কেল হবে পরকালে সে ঐ ব্যক্তির অনুরূপ হবে যার থলে কেটে নেওয়া হয়েছে। এজাতীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র) বলেন, এ বক্তব্য আখিরাতে উপর বিদ্রূপ করার শামিল। কাজেই উক্ত ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে (মুহীত)। কেউ যদি বলে, আমি তোমার সাথে দোযখে যাব, তবে ভিতরে ঢুকবো না। তাহলে তার একথা কুফরী বলে গণ্য হবে (খুলাসা)। কেউ যদি বলে, কিয়ামতের দিন যদি রিয়ওয়ান ফেরেশতার জন্য কিছু না পাঠাও তবে তিনি বেহেশতের দরজা খুলবেন না তাহলে এই লোক কাফির হয়ে যাবে (ইতাবিয়া)।

৪. মাসআলা : সৎকাজের আদেশদানকারী ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তি বলল, এই কীসের চিৎকার? সে যদি প্রত্যাখানের নিয়্যতে এই কথা বলে থাকে তবে তার কুফরীর ব্যাপারে আশংকা রয়েছে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, অমুক ব্যক্তির বাড়িতে যাও এবং তাকে সৎকাজের আদেশ দাও। একথা শুনে সে ব্যক্তি বলল, সে আমার কি করেছে, অথবা বলল, সে আমাকে কি কষ্ট দিয়েছে অথবা বলল, আমি শান্তি ও নিরাপত্তা চাই, এই বেহুদা কাজ করার আমার কি প্রয়োজন? এ জাতীয় বাক্যসমূহের সবগুলোই কুফরী বাক্য হিসাবে গণ্য করা হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়া)। যদি কোন ব্যক্তি বলে, অমুক ব্যক্তিকে মুসীবত গ্রাস করে নিয়েছে অথবা বলে, তোমাকে মহা মুসীবত গ্রাস করে নিয়েছে তাহলে বলখের কোন কোন ফকীহ এর মতে এহেন ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে। কিন্তু অপরপাশ ফকীহদের মতে একথায় কুফরী হবে না। তবে মারাত্মক ধরনের গুনাহ হবে। কিন্তু কারো কারো মতে এতে কুফরীও হবে না এবং কোন গুনাহও হবে না। হাকিম আবদুর রহমান এবং কাযী আবু আলী নাসাফী (র)-এই অভিমতের প্রতিই ধাবিত হয়েছেন। আর ফাতাওয়াও এর উপরই। কেউ যদি বিলাপকারী কোন ব্যক্তিকে বলে, তার হায়াত যে পরিমাণ কমেছে তোমার হায়াত যেন সে পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে এহেন ব্যক্তির ব্যাপারে কুফরীর আশংকা রয়েছে। আর

যদি বলে এ পরিমাণ হায়াত যেন তার বাড়িয়ে দেন তাহলে এতে গুনাহ হবে এবং মূর্খতা সুলভ বক্তব্য হিসাবে পরিগণিত হবে। এমনিভাবে কেউ যদি বলে, অমকের হায়াত থেকে যে পরিমাণ কমেছে তা যেন তোমার হায়াতের সাথে সংযোজিত হয়ে যায়, এমনিভাবে যদি কেউ বলে, অমুক মারা গেছে এবং তার আত্মাকে তোমার কাছে সোপর্দ করে গেছে তাহলে তার একথা কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি রোগ থেকে সুস্থ হওয়ার পর অপর ব্যক্তিকে বলল, *فلان خرج باز فرستاد* (অমুক পুনরায় গাধা প্রেরণ করুক) তাহলে এই কথাও কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার পর মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ল এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হল। রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে রোগী ব্যক্তি বলল, ইচ্ছা করলে আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও আর ইচ্ছা করলে আমাকে কাফির অবস্থায় মৃত্যু দাও তাহলে সে আল্লাহকে অস্বীকারকারী এবং দীন থেকে মুরতাদ বলে পরিগণিত হবে। কেউ বহুমুখী বিপদে আক্রান্ত হওয়ার পর যদি বলে, (হে আল্লাহ) তুমি আমার মাল নিয়ে গেলে, সন্তান নিয়ে গেলে এবং অমুক অমুক জিনিস নিয়ে গেলে, এখন আর তুমি কি নিবে; কি আর বাকী আছে ইত্যাদি। তাহলে এসব কথা কুফরী কালাম হিসাবে গণ্য হবে (আল-মুহীত)।

নয়. স্পষ্টভাবে বা ইশারার মাধ্যমে কাউকে কুফরীর জন্য প্ররোচিত করা; ধর্ম ত্যাগ করার জন্য আদেশ দেওয়া বা কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা ইত্যাদি।

১. মাসআলা : কেউ যদি কাউকে কুফরীর ব্যাপারে প্ররোচিত করে তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। কৌতুকবশত এরূপ করলেও একই হুকুম হবে। কেউ যদি কারো স্ত্রীকে মুরতাদ(ধর্মত্যাগী) হয়ে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য প্ররোচিত করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি অন্যকে কাফির হওয়ার জন্য হুকুম করে সে নিজে কাফির হয়ে যায়। চাই আদিষ্ট ব্যক্তি কাফির হোক বা না হোক। ফকীহ আবুল লাইস (র) বলেন, কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে কালেমায়ে কুফর শিক্ষা দেয় তবে শিক্ষাদাতা ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। যদি সে শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাকে মুরতাদ হওয়ার জন্যও হুকুম করে। এমনিভাবে কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে কুফরী কালাম শিক্ষা দেয় এবং তাকে মুরতাদ হওয়ার জন্য বলে তবে এ ক্ষেত্রেও আদেশদাতা ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি কাউকে মৃত্যু বা এ জাতীয় কিছু ভয় দেখিয়ে কুফরী কথা বলার জন্য বাধ্য করা হয় এবং সেও অনন্যোপায় হয়ে কুফরী কথা উচ্চারণ করে তবে এর কয়েক অবস্থা হতে পারে। (১) এক ব্যক্তি যে মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করেছে কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত এবং যে কুফরীর ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা হয়েছে তা ছাড়া তার দিলে আর কোন ধরনের কুফরী নেই। এহেন অবস্থায় তাকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না। আইন ও নৈতিকতা কোন দৃষ্টিতেই তাকে কাফির বলা যাবে না। (২) কোন ব্যক্তি বলল, আমার মনে আসছে যে, আমি অতীত কালের কোন কুফরী কাজ

সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ দিব, তবে এর দ্বারা ভবিষ্যতে কুফরী করা বা কুফরী কালাম করার আমার কোন সংকল্প নেই, এহেন অবস্থায় আইনের দৃষ্টিতে উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বলা যাবে এবং এর ফলে তার স্ত্রীর সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক হিন্ন হয়ে যাবে। (৩) কোন ব্যক্তি বলল, আমার মনে উদ্বেক হয়েছে যে, আমি অতীতকালের কোন কুফরী কাজ বা কুফরী কালাম সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ দিব এবং এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অতীতকালের কোন কুফরী বিষয়ের সংবাদ দেওয়াই নয় বরং এর দ্বারা আমার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমার কুফরী কাজ বা কুফরী কালামের কথা ব্যক্ত করা তাহলে আইন ও নৈতিকতা উভয় দিক থেকেই তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। ক্রুশের দিকে মুখ করে নামায পড়ার ব্যাপারে কাউকে বাধ্য করার পর সে যদি ঐ দিকে ফিরেই নামায আদায় করে তবে তা তিন ধরনের হতে পারে। (ক) যদি বলে, আমার দিলে কিছুই ছিল না। বাধ্য হয়েই আমি কেবলমাত্র ক্রুশের দিকে মুখ করে নামায আদায় করেছি তাহলে আইন ও নৈতিকতা কোন দিক থেকেই তাকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না। (খ) যদি সে বলে, আমার মনে সংকল্প ছিল যে, আমি আল্লাহর জন্যই নামায আদায় করব, ক্রুশের উদ্দেশ্যে নয়। এমতাবস্থায়ও তাকে কাফির বলা যাবে না। আইন ও নৈতিকতা কোন দিক থেকেই নয়। (গ) যদি বলে, আমার মনে সংকল্প ছিল যে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করব। কিন্তু পরে সে উদ্দেশ্য ত্যাগ করে আমি ক্রুশের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করেছি, তাহলে আইন ও নৈতিকতা উভয় দিক থেকেই সে কাফির হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : কোন মুসলমানকে বলা হল, বাদশাহকে সিজদা কর, অন্যথায় আমরা তোমাকে হত্যা করব। এ অবস্থায় সিজদা না করাই তার জন্য উত্তম (আল ফুসলুল ইমাদিয়া)। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে কিন্তু তার ইতিকাদ (বিশ্বাস) দুরূস্ত থাকে তাহলে আমাদের কোন কোন ফকীহ এর মতে সে কাফির হবে না। কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, সে কাফির হয়ে যাবে। এটিই আমার নিকট বিগত অভিমত (আল-বাহরুর রায়িক)। কেউ যদি না জেনে কুফরী কথা স্বেচ্ছায় উচ্চারণ করে, তাহলে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে সে কাফির বলে গণ্য হবে। কিন্তু কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন। এ ক্ষেত্রে জাহালত ও অজ্ঞতা ওয়র হিসাবে গণ্য হবে না (খুলাসা)। কেউ যদি ঠাট্টাচ্ছিলে ও তাচ্ছিল্যের নির্যাত্তে কুফরী কথা উচ্চারণ করে তবে সমস্ত ফকীহগণের মতে সে কাফির বলে গণ্য হবে। যদি তার ইতিকাদ এর থেকে বিপরীত অর্থাৎ দুরূস্ত থাকে। যদি ভুলবশত কারো মুখ দিয়ে কুফরী কথা বের হয়ে যায়; কিন্তু কুফরী কথা বলা তার ইচ্ছা ছিল না তাহলে কোন ফকীহর মতেই সে কাফির হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা : অগ্নিপূজকদের টুপী মাথায় ব্যবহার করা বিগত মতানুসারে কুফরী। কিন্তু যদি প্রয়োজনে ব্যবহার করে যেমন গরম বা শীত নিবারণের জন্য তা ব্যবহার করল তাহলে কুফরী হবে না। এমনিভাবে কোমরের পৈতা ব্যবহার করাও কুফরী। কিন্তু অমুসলিমদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বা গোপন তথ্য উদ্ঘাটনের নিমিত্তে এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করলে তা কুফরী হবে না। কেউ যদি বলে, আমাদের (মুসলমানদের) কাজ-কর্ম থেকে অগ্নিপূজকরা ভাল অথবা

বলে, মাজসিয়াত থেকে নাসবানিয়াত ভাল তবে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। কিন্তু কেউ যদি বলে, মাজসিয়াত-নাসবানিয়াত থেকে খারাপ তবে সে কাফির হবে না। কেউ যদি বলে, নাকবানিয়াত (খৃস্টান ধর্ম) ইয়াহুদিয়াত (ইয়াহুদী ধর্ম) থেকে উত্তম তবে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। কেউ যদি কোন (عالم)-কে বলে, তুমি যা করছো এর থেকে কুফর উত্তম তাহলে কোন কোন ফকীহ এর মতে বিনা শর্তে সে কাফির হয়ে যাবে। ফকীহ আবুল লাইস (র)-এর মতে কুফরী তাহসীন (সুনাম গাওয়া) করলে সে কাফির হবে। কিন্তু যদি তাদের কর্মের দোষ বর্ণনা করা তার উদ্দেশ্য হয় তবে সে কাফির হবে না। যেদিন অগ্নিপূজকদের নওরোযা সেদিনের উৎসবে কোন মুসলমান যদি তাদের সাথে শরীক হয় তবে সে কাফির হয়ে যাবে। এ দিনের উৎসবে তাদের কর্ম-কাণ্ডের সাথে মুওয়াফাকাত করা এবং তাল মিলিয়ে চলার কারণে, যদি কোন মুসলমান নওরোযা উৎযাপনের দিন এমন কোন বস্ত্র খরিদ করে যা সচরাচর সে খরিদ করে না, শুধুমাত্র নওরোযের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই খরিদ করে পনাহারের উদ্দেশ্যে নয় তবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। নওরোযের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্তে কেউ যদি কোন মুশরিক ব্যক্তিকে একটি ডিমও হাদিয়া দেয় তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি এমন কোন অগ্নিপূজকের দাওয়াত কবুল করে যে এই দিনে তার সন্তানের মাথা মুগুন করেছে তবে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা যাবে না। কেউ যদি কাফিরদের কর্ম-কাণ্ডের তাহসীন করে বা প্রশংসা করে তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে সে কাফির হয়ে যাবে। এমন কি মাশাইখে কিরাম এ কথাও বলেছেন যে, কেউ যদি বলে, খানা খাওয়ার সময় অগ্নিপূজারীদের কথা না বলার নীতিটি খুবই সুন্দর অথবা যদি বলে, হায়েযের সময় স্ত্রীর সাথে শয্যা ত্যাগ ব্যাপারে তাদের যে নীতি রয়েছে, এটি খুবই প্রশংসনীয় তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

৫. মাসআলা : খিলআত (পীর মুর্শিদ কর্তৃক প্রাপ্ত নসীহত বা ইজাযত) প্রাপ্তির সময় কোন মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে কেউ যদি কোন পণ্ড যবাহু করে অথবা হালুয়া ইত্যাদি বানায় তাহলে শায়খ আবু বরকর (র)-এর মতে এ কাজ কুফরী বলে গণ্য হবে। আর যবাহুকৃত পণ্ডটি মৃত জন্তু হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই তা খাওয়া যাবে না। শায়খ ইসমাইল যাহিদ (র) বলেন, হাজী বা গাযীদের আগমন উপলক্ষে রাস্তায় কেউ যদি উট, গরু, ইত্যাদি যবাহু করে তবে একদল আলিমের মতে এটি কুফরী কাজ হিসেবে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন মহিলা কোমরে রশি বেঁধে যদি বলে, এটি পৈতা তাহলে এটি কাজ হিসেবে গণ্য হবে (খুলাসা)। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি যে কাজ করছো এর থেকে মাজসিয়াত অনেক ভাল এবং এ কথার দ্বারা তার উদ্দেশ্য যদি ঐ কাজের প্রতি নিন্দাবাদ ব্যক্ত করা হয় তাহলে এতে কুফরী হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি বলল, খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করা অপেক্ষা কুফরী করা অনেক ভাল তবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে একথা কুফরী বাক্য হিসাবে গণ্য হবে (আল-মুহীত)। আবুল কাসিম সাফফার (র) এ মর্মে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন (খুলাসা)।

৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রহার করার পর সে (স্ত্রী) বলল, তুমি মুসলমান নও। একথা শুনে স্বামী বলল, ঠিক আছে, আমি মুসলমান নই। এহেন অবস্থায় শায়খ আবু

বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র) বলেন, এতে সে কাফির হবে না। আমাদের কোন কোন ফকীহ থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি কি মুসলমান নও? জবাবে সে বলল, না। তাহলে একথা কুফরী কালাম হিসেবে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন মহিলা তার স্বামীকে বলল, তোমার মধ্যে আত্মমর্যাদা এবং দীন ইসলাম বলতে কিছুই নেই। তুমি বেগানা পুরুষের সাথে আমার নির্জনবাসকে পসন্দ কর। একথা শুনে স্বামী বলল, হাঁ, আমার আত্মমর্যাদাবোধও নেই এবং ইসলামও নেই, তাহলে কোন কোন ফকীহ এর মতে সে কাফির হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হে কাফিরা, হে ইয়াহুদীয়া, হে মজসীয়া, বলে ডাক দেওয়ার পর সে বলল, আমি অনুরূপই, অথবা বলল, আমি এ রকমই। আমাকে তালাক দিয়ে দাও অথবা বলল, আমি অনুরূপ না হলে তোমার সাথে কেন থাকতাম অথবা বলল, আমি এ রকম না হলে তোমাকে সঙ্গ দিতাম না অথবা বলল, (তাহলে) তুমি আমাকে রেখ না। উক্ত অবস্থায় এই মহিলা কাফির হবে। আর যদি বলে, আমি এ রকম হলে, আমাকে রাখবে না তাহলে সে কাফির হবে না। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, কাফির হয়ে যাবে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটিই বিশুদ্ধতম। কাযী জামালুদ্দীন (র) অনুরূপ ফাতাওয়া প্রদান করতেন। এমনিভাবে কোন মহিলা তার স্বামীকে হে কাফির, হে ইয়াহুদী বা হে মজসী বলে ডাকার পর স্বামী যদি বলে, আমি এ রকমই। আমার নিকট থেকে চলে যাও অথবা বলে, আমি এরকম না হলে তোমাকে রাখতাম না তাহলে সে কাফির হবে। আর স্বামী যদি বলে, আমি এরূপ হলে তুমি আমার সাথে থাকতে পারবে না তাহলে তার কুফরী সম্বন্ধে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। সহীহ মতে সে কাফির হবে না। যদি বলে, ধরে নাও, আমি অনুরূপ; সুতরাং আমার সাথে থাকবে না তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, কাফির হবে না। কেউ কোন আজগবী বা অপরিচিত ব্যক্তিকে বলল, হে কাফির, হে ইয়াহুদী; একথা শুনে সে বলল, আমি অনুরূপই; সুতরাং তুমি আমার সাথে থাকবে না অথবা বলল, আমি এরূপ না হলে তোমাকে আমার সাথে রাখতাম না, ইত্যাদি তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। যেরূপ বিধান স্বামী-স্ত্রীর মাসআলার ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : কারো স্ত্রী তাকে বলল, যদি এই কাজ কর; তবে তুমি কাফির। এরপর সে তার কথার প্রতি অক্ষিপ না করে ঐ কাজ করল তাহলে সে কাফির হবে না। কেউ তার স্ত্রীকে কাফির বলার পর তার স্ত্রী বলল, না আমি নই বরং তুমি অথবা সে স্বামীকে বলল, বরং তুমি; তাহলে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে না। ফকীহ আবুল লাইস সমরকান্দী (র) তার ফাতাওয়া গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কোন মহিলা তার স্বামীকে বলল, অগ্নিপূজকের মত তোমার গিলাফ ভর্তি আছে। একথা শুনে স্বামী বলল, তুমিতো ঐ অগ্নিপূজকের সাথে দীর্ঘদিন ছিলে অথবা বলল, তুমি ঐ অগ্নিপূজকের সাথে থাকলে না কেন? তাহলে স্বামীর এ কথা কুফরী কালাম হবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে, হে অগ্নিপূজারিণী। এরপর স্ত্রী বলল, এই অগ্নিপূজারিণীকে দীর্ঘ দিন তোমার সাথে রাখলে অথবা বলল, তাহলে এই অগ্নিপূজারিণীকে তোমার সাথে রাখলে কেন? স্ত্রীর এ জাতীয় কথা কুফরী হবে। কেউ কোন অপরিচিত পুরুষ বা মহিলাকে বলল, হে কাফির! কিন্তু যাকে একথা বলা হল, সে কোন জবাব দিল না অথবা স্বামী

তার স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী-স্বামীকে হে কাফির! বলল, আর অপর জন কোন উত্তর দিল না। ফকীহ আবু বকর আমাশ বলখী (র)-এর মতে এ জাতীয় কথা বলনেওয়ালা ব্যক্তি কাফির হবে। কিন্তু বলখের অপরাপর মাশাইখে কিরামের মতে সে কাফির হবে না। এ ধরনের ক্ষেত্রে ফাতাওয়া দেওয়ার জন্য উত্তম পদ্ধতি হলো, যদি বলনেওয়ালা ব্যক্তির এ জাতীয় কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং মন্দ বলা, কাফির আখ্যায়িত নয় এবং সে তাকে কাফির মনেও করে না। তাহলে সে কাফির হবে না। আর সে যদি তাকে কাফির বলে বিশ্বাস করেই তাকে এভাবে সম্বোধন করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে (যখীরা)।

৮. মাসআলা : কোন মহিলা তার বাচ্চাকে বলল, হে অগ্নিপূজক মাজসীর পুত্র; অথবা বলল, হে কাফিরের পুত্র! অথবা বলল, হে ইয়াহুদীর বাচ্চা! অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে এতে সে কাফির হবে না। কেউ কেউ বলেন, এটিও কুফরী কালাম হবে। যদি নিজ সন্তানকে এ জাতীয় কথা বলে তবে তা কুফরী হবে কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে যদি সে ঐ শব্দ দ্বারা নিজেকে না বুঝিয়ে থাকে তবে সে কাফির হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি নিজ পুত্রকে লক্ষ্য করে বলে, اى كافر خداوند (হে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী) তাহলে ফুকাহায়ে কিরামের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত সে কাফির হবে না। কেউ যদি কাউকে হে কাফির! হে ইয়াহুদী! বা হে মজসী বলে ডাকে আর সে লাক্বাইক বলে সাড়া দেয় তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি বলে হাঁ, অনুরূপ ধরে নাও; তাহলেও সে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি বলে বরং তুমি নিজে এরপর কিছু না বলে চুপ থাকে তাহলে সে কাফির হবে না। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, আমার কাফির হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল অথবা বলে আমি কুফরীর আশংকা করছিলাম তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে না। কেউ যদি বলে, তুমি আমাকে বহু কষ্ট দিয়েছো, ফলে আমি কাফির হয়ে যাওয়ার সংকল্প করেছিলাম তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। জনৈক ব্যক্তি বলল, এখন ইসলাম নিয়ে থাকার সময় নয়, এখন কুফরী নিয়ে থাকার সময় তাহলে কারো কারো মতে তা কুফরী কালাম হবে। আল-মুহীত গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, আমার মতে এ কথা ঠিক নয়।

৯. মাসআলা : ফকীহ নাতিফী (র)-এর অকিআত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, এক মুসলমান ও এক ব্যক্তি অগ্নিপূজক একস্থানে ছিল। এ সময় তৃতীয় এক ব্যক্তি অগ্নিপূজককে হে মাজসী বলে ডাক দিল। এরপর মুসলমান এই ডাকে সাড়া দিল। তাহলে সে কাফির হবে কিনা, এ সম্বন্ধে শায়খ নাতিফী (র) বলেন, যদি ঐ দুই ব্যক্তি আহবানকারী ব্যক্তিরই কোন একটি কাজে নিয়োজিত থাকে এবং মুসলমান ব্যক্তি মনে করে যে, হয়তো ঐ কাজের ব্যাপারেই সে ওকে ডাকছে তাহলে এ অবস্থায় সে কাফির হবে না। আর তারা যদি একই কাজে মশগুল না থাকে তাহলে তার কুফরীর ব্যাপারে আশংকা রয়েছে। কোন মুসলমান যদি বলে, আমি মুলহিদ (বদ-দীন) তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি সে বলে, এতে যে কুফরী হয় আমি জানতাম না তাহলে তার এ ওয়র গ্রহণযোগ্য হবে না। এক ব্যক্তি কিছু কথা বলল, তার কথা শুনে লোকেরা মনে করল যে, কাফির হয়ে গেছে। অথচ মূলতঃ সে কাফির হয়নি, এতদসত্ত্বেও তাকে বলা হল যে, তুমি কাফির হয়ে গেছ এবং তোমার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। একথা শুনে

সে বলল, ধরে নাও যে, আমি কাফির হয়ে গেছি এবং আমার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে এবং তার স্ত্রীও তালাক হয়ে যাবে (আল ফুসূলুল ইমাদিয়া)। ইয়াতীমা গ্রন্থে উল্লেখ আছে লেখক বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি ফিরআওন বা আমি ইবলীস তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে (তাতার খানিয়া)।

১০. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন ফাসিক ব্যক্তিকে তওবা করার আহবান জানাল। আর সে বলল, এসব ওয়াযের পর এখন হতে অগ্নিপূজকদের টুপী আমি আমার মাথার উপর রাখব তাহলে এটি কুফরী বাক্য হিসাবে গণ্য হবে। কোন মহিলা তার স্বামীকে বলল, তোমার সাথে থাকার চেয়ে কাফির হওয়া অনেক ভাল, তবে তা কুফরী কালাম হবে। কোন ব্যক্তি বলল, যদি আমি একাজ করি তাহলে ইসলামের যে সব আমল আমি করেছি তা সবই কাফিরদেরকে দিয়ে দিলাম। তারপর সে ঐ কাজ করে তাহলে সে কাফির হবে না এবং তার উপর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কাফ্যারাও ওয়াজিব হবে না। কোন মহিলা বলল, যদি আমি একাজ করি তবে আমি কাফির হিসাবে গণ্য হব। তাহলে শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র) এতে সে কাফির হয়ে যাবে এবং সে তৎক্ষণাৎ তার স্বামীর বৈবাহিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কাযী আলী সাগদী (র) বলেন, এটি একটি প্রতিজ্ঞা। কাজেই এতে কুফরী হবে না। স্ত্রী যদি তার স্বামীকে বলে, তুমি যদি এরপর আমার প্রতি জুলুম কর বা তুমি আমাকে অমুক জিনিসটি খরিদ করে না দাও তবে আমি কাফির হয়ে যাব, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ কাফির হয়ে যাবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়া)। কোন ব্যক্তি বলল, আমি অগ্নিপূজক ছিলাম শুধুমাত্র উপমা স্বরূপ মুসলমান হয়েছি। ইসলামের উপর আমার কোন বিশ্বাস নেই তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ যদি কাউকে তাজীমের সিজদা করে তবে সে কাফির হিসাবে গণ্য হবে (সিরাজিয়া)।

১১. মাসআলা : খাযানা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কেউ যদি কান মুসলমানকে বলে তোমার থেকে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানী নিয়ে নিবেন। একথা শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তি আমীন বলল, তাহলে তারা উভয়ে কাফির হয়ে যাবে। একজন আরেকজনকে কষ্ট দেওয়ার পর দ্বিতীয় জন বলল, আমি মুসলমান, আমাকে কষ্ট দিবে না। আর কষ্ট দানকারী বলল, ইচ্ছা করলে মুসলমান থাক আর ইচ্ছা করলে কাফির হয়ে যাও, তাহলে কষ্টদাতা কাফির বলে গণ্য হবে। এমনভাবে যদি কেউ বলে, তুমি কাফির হলে, আমার ক্ষতি কি তাহলে তার কুফরী অপরিহার্য হবে (তাতার খানিয়া)। কোন কাফির ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর লোকেরা তাকে বহু মালামাল হাদিয়া দিল। এ দেখে এক মুসলমান বলল, আহা সে যদি কাফির হয়ে পুনরায় মুসলমান হত তাহলে তো লোকেরা তাকে পুনরায় বহু মালামাল হাদিয়া দিত। যদি এই লোক হৃদয় থেকে এই আকাঙ্ক্ষা করে তাহলে সে কাফির বলে আখ্যায়িত হবে। কোন কোন মাশাইখে কিরাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কেউ যদি এই আকাঙ্ক্ষা করে যে, আল্লাহ যদি মদ হারাম না করতেন তাহলে সে কাফির হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি আকাঙ্ক্ষা করে যে, আল্লাহ যদি জুলুম, যিনা এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হারাম না করতেন তাহলে তা কুফরী হবে। কেননা এসব কাজ কোন সময়ই হালাল এবং বৈধ ছিল না। প্রথমোক্ত

মাসআলায় تمنى ما ليس لمستحيل (যে জিনিস অসম্ভব নয় তা কামনা করা) হয়েছে। আর শেযোক্ত মাসআলায় تمنى ما هو مستحيل (যে জিনিস অসম্ভব তা কামনা করা) হয়েছে। কাজেই উভয় মাসআলায় পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করে যে, যদি ভাই-বোনের মধ্যকার বিবাহ-শাদী হারাম না হত, তাহলে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে না। কেননা এখানে এমন জিনিস কামনা করা হয়েছে যা অসম্ভব নয়। কেননা ভাই-বোনের বিবাহ প্রথম যুগে জায়েয ছিল। মোদাকথা হচ্ছে; যে জিনিস কোন একযুগে হালাল ছিল। কিন্তু পরে তা হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় বস্তু সম্বন্ধে যদি কামনা করা হয় যে হয়! এ জিনিস যদি হারাম না হত তাহলে এতে সে কাফির হবে না। কোন মুসলমান পুরুষ একজন মোটা-সোটা খৃস্টান মহিলাকে দেখে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলল, হায় আমি যদি খৃস্টান হতে পারতাম, তবে তো এই মহিলাকে বিবাহ করতে পারতাম তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, হকের ভিত্তিতে তুমি আমার সাহায্য কর। একথা শুনে সেই ব্যক্তি বলল, হকের ভিত্তিতেই একে অপরকে সাহায্য করে। আমি “না হকের” ভিত্তিতে তোমাকে সাহায্য করব তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়া)। এক ব্যক্তি তার সাথে ঝগড়াকারী কোন ব্যক্তিকে বলল, প্রত্যহ তুমি মাটি থেকে তোমার মত করে আরো দশটি বানাও। অথবা মাটি থেকে কথাটি বলেনি। যদি তোমার মত করে বলা দ্বারা সৃষ্টিগত দিক থেকে তুলনা করা উদ্দেশ্য হয় তবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি তোমার মত করে বলার দ্বারা তার দুর্বলতার সাথে তুলনা করা উদ্দেশ্য হয় তবে কাফির হবে না। আমাদের যামানায় এ জাতীয় ঘটনা বহু বিদ্যমান আছে। যেমন কৃষক বলে, خلقت هذه الشجرة (এ গাছটি আমি সৃষ্টি করেছি), এ অবস্থায় মুফতীগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হল এই যে, এতে এ লোক কাফির হবে না। কেননা এখানে সৃষ্টি করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, গাছের চারা রোপন করা বা বীজ বপন করা। অবশ্য প্রকৃত সৃষ্টি উদ্দেশ্য হলে সে লোক কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, কাজ করব গোলামের মত; খাব আযাদ মানুষের মত, তাহলে এটি ভুল কথা হল। কেননা এটি ঐ লোকের কথা যে মনে করে যে, তার উপার্জনের মাধ্যমেই তার রিযিকের ব্যবস্থা হচ্ছে। কেউ যদি বলে, যতদিন অমুক ব্যক্তি থাকবে অথবা বলে যতদিন ঐ সোনালী ফসল থাকবে, আমার রিযিক কমবে না তাহলে আমাদের কোন কোন মাশাইখে কিরামের মতে এতে সে কাফির হয়ে ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে না। কাযী আবু বকর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে স্বামীকে দাবা খেলতে দেখে তার স্ত্রী তাকে বলল, দাবা খেল না। আমি উলামায়ে কিরামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দাবা খেলে সে আল্লাহর শত্রু। একথা শুনে সে বলল, হে কমীনা মহিলা! আমি আল্লাহর শত্রুই। আমি এর থেকে সরব না। এহেন অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির হুকুম কি হবে? জবাবে শায়খ (র) প্রস্তাবকারী ব্যক্তিকে বললেন; আমাদের আলিমগণের অভিমত অনুসারে তার হুকুম বড়ই জটিল হবে। এই স্ত্রীর সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল হয়ে যাবে। তাই বিবাহ নবায়ন করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অপরাপর ইমামগণের মতে সে কাফির হবে না। শায়খ আবদুল করীম (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে

কোন এক ব্যক্তি এক দল মানুষের সাথে ঝগড়া করছে, এমতাবস্থায় সে বলল, আমি দশ জন অগ্নিপূজকের তুলনায়ও বেশী জালিম অথবা বলল, আমি দশ জন অগ্নিপূজক থেকেও বহু খারাপ; তাহলে সে কাফির হবে না। কিন্তু তার উপর তওবা ও ইসতিগফার ওয়াজিব হবে। এক ব্যক্তিকে বলা হল, মসজিদ নির্মাণ কাজের জন্য হয়তো টাকা-পয়সা দিবে অথবা নামায পড়ার জন্য মসজিদে উপস্থিত হবে। একথা শুনে সে লোক বলল, আমি মসজিদেও যাব না এবং টাকা-পয়সাও দিব না। মসজিদে আমার কি কাজ? সে একথার উপর খুবই মযবুত। এ জাতীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে কি সমাধান? জবাবে শায়খ (র) বললেন, সে কাফির হবে না। তাকে সাজা দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা : কেউ যদি চন্দ্রের চার পার্শ্বে কালবর্ণের বেটনী দেখে বলে যে, বৃষ্টি হবে, তবে ইলমে গায়বের দাবী করার কারণে সে কাফির হয়ে যাবে (আল-বাহরুর রায়িক)। কোন গণক বলে তোমার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে, বলার পর স্বামী যদি এ কথায় বিশ্বাস করে তবে তা কুফরী হবে (আল-ফুসুল ইমাদিয়া)। কোন পণ্ডর আওয়াজ শুনে কেউ যদি বলে, রোগী মারা যাবে অথবা, অমুক গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত ঘটবে অথবা কাকের আওয়াজ শুনে কেউ যদি সফর থেকে ফিরে আসে তবে তার কুফরীর ব্যাপারে মাশাইখে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে (খুলাসা)। ইমাম ফযলী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে; যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, يا احمر (হে লাল) এ ডাক শুনে সে বলল, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নাশপাতি ফলের ছাতু থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। আর মাটির বর্ণ এরূপ হয় না। এ অবস্থায় তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে কিনা? জবাবে তিনি বলেন, হা তাকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে। এক ব্যক্তি কোন গর্হিত কথা বলল, তা শুনে অপর ব্যক্তি বলল, আরে তুমি কি করছো! তোমার উপর তো কুফরী অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তখন সে বলল, তাহলে আমি কি করব? আমি তো কুফরী করে ফেলেছি। তাহলে তাকে কুফরীর ফাতওয়া দেওয়া যাবে কিনা? জবাবে শায়খ (র) বললেন, হাঁ; কুফরীর ফাতওয়া দেওয়া যাবে। কেউ اصحاب الجنة এর স্থলে اصحاب النار পড়ল অথবা زاء এর স্থলে صاد (সাদ) পড়ল, তাহলে তার ইমামত জায়েয হবে না। যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। “জামে আসগর” গ্রন্থে উল্লেখ আছে, শায়খ আলী রায়ী (র) বলেন, কেউ যদি “আমার জীবনের কসম” (حياتي) বা “তোমার জীবনের কসম” (وجيائك) বলে শপথ করে, তবে তার কুফরীর ব্যাপারে আমার আশংকা রয়েছে। কেউ যদি বলে, রিয়ক আল্লাহু দেন, কিন্তু বান্দার পক্ষ হতে চেষ্টা তো জরুরী, তাহলে এ কথা শিরক বলে গণ্য হবে। কেউ যদি বলে, আমি সাওয়াব ও শাস্তি থেকে বরী অর্থাৎ এর থেকে দায়মুক্ত তাহলে কারো কারো মতে এ কথা কুফরী বলে গণ্য হবে। নাওয়ামিল গ্রন্থে আছে, অমুক যা বলবে; আমি তা সবই করব যদি সে কুফরী কথা বলে তাহলেও; তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে ইসলামী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আমি অসম্মত তাহলে কোন কোন ফকীহ এর মতে সে কাফির হয়ে যাবে। খলীফা মামুনুর রশীদের যমানায় কোন এক ফকীহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যদি কেউ কোন তাতিকে হত্যা করে তবে এর বিনিময়ে কি ওয়াজিব হবে? জবাবে ঐ ফকীহ বললেন, দিয়াত (মুক্তিপণ) ওয়াজিব হবে। এ কথা শুনে খলীফা মামুনুর রশীদ ঐ ফকীহকে মারার জন্য আদেশ জারী করেন। ফলে সে মারা

গেল। কারণ হিসেবে তিনি বললেন, এটি শরীআতের প্রতি বিদ্রূপ করার নামান্তর। আর শরঈ হুকুম-আহকামের সাথে বিদ্রূপ করা হল কুফরী (কাজেই তাকে হত্যা করা বৈধ হয়েছে) (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : কেউ যদি কোন ফকীর লোককে বলে, এ কমলওয়ালী বদবখত ব্যক্তি তবে এটি কুফরী কথা বলে গণ্য হবে (ইতাবিয়া)। কেউ যদি বর্তমানকালের কোন রাজা-বাদশাহকে আদিল (عادل) ন্যায়পরায়ণ বলে, তাহলে সে আল্লাহর সাথে কুফরী করল। ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী (র) অনুরূপ বলেছেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, কুফরী হবে না। কেউ যদি কোন জালিম ব্যক্তিকে বলে, হে “ইলাহ” তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি “হে রব” বলে তাহলে অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মতে তাকে কাফির বলা যাবে না। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (খুলাসা)।

১৫. মাসআলা : উসুলুস সাফহার গ্রন্থে আছে, শায়খ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, জুমুআর খুতবায় খতীবগণ মিম্বরে বসে রাজা-বাদশাহদের শানে যে সব উপাধি ব্যবহার করে যেমন- ملك رقاب الامم - شهنشاه الاعظم - لسلطين العادل الاعظم - معين الخليفة - بلاد - যেমন- مالك رقاب الامم - شهنشاه الاعظم - لسلطين العادل الاعظم - معين الخليفة - بلاد - ইত্যাদি এগুলো জায়েয কি? তিনি বললেন, জায়েয নেই। কেননা উপরোক্ত শব্দসমূহের কিছু হচ্ছে কুফরী শব্দ; কিছু এমন যা বললে গুনাহ এবং কিছু মিথ্যা কথার অন্তর্ভুক্ত। الاعظم (আযম) ব্যতিরেকে শাহনশাহ (শাহনশাহ) শব্দটি তো আল্লাহর খাস নামসমূহের থেকে একটি। এই নামে কোন মানুষের নাম করণ জায়েয নয়। ملك رقاب الامم (উম্মতের গর্দানের মালিক) উপাধিটি সর্বৈভব একটি মিথ্যা কথা। এমনিভাবে سلطان ارض الله (আল্লাহর যমীনের বাদশাহ) এবং এ জাতীয় শব্দ গুলোও মিথ্যা বানোয়াট কথা (তাতার খানিয়া)।

১৬. মাসআলা : ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী (র) বলেন, কেউ যদি কারো সামনে মাটিতে চুম্বন করে, অথবা কেউ যদি কারো সামনে রুকু মত পিঠ বাকা করে অথবা কারো সামনে নিজের মাথা অবনমিত করে তাহলে তার প্রতি কুফরীর ফাতওয়া দেওয়া যাবে না। কেননা এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তার ইবাদত বা পূজা করা নয়। কিন্তু আমাদের অন্যান্য মাশাইখে কিরাম এ কথা বলেছেন যে, কেউ যদি উপরোক্ত জালিম লোকদের কাউকে সিজদা করে তাহলে তা কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য হবে। তবে সে কাফির হবে কিনা, এ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন যে, সে مطلقاً (শর্তহীনভাবে) কাফির হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মতে এ মাসআলার কয়েক অবস্থা হতে পারে। (১) ইবাদতের নিয়্যতে সিজদা করলে তবে নির্ঘাত সে কাফির হয়ে যাবে। (২) সম্মান প্রদর্শনের নিয়্যতে (ইবাদতের নিয়্যতে নয়) সিজদা করলে তাকে কাফির বলা যাবে না। কিন্তু এটি যে হারাম কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তার দিলে কুফরীর ইরাদা না থাকে। এটিই অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের অভিমত। যমীনের উপর চুম্বন

করার বিষয়টিও সিঁজদা করার মতই। তবে এটি যমীনে গাল ও কপাল রাখার গুনাহ থেকে কিছুটা হালকা (যহীরিয়া)।

১৭. মাসআলা : খারাজের মালিকানা বাদশাহর এ জাতীয় আকীদা পোষণ করা কুফরী (আল-বাহরুর রাযিক)। সদরুশ শহীদ (র)-এর এক পুস্তিকায় এ কথা উল্লেখ আছে যে, আমি জানি, এ দুর্ব্যবহার তোমার পক্ষ হতে অর্থাৎ তোমার কারণে হয়েছে; আল্লাহর হুকুমে নয়, তাহলে সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। ঐ পুস্তিকায় এ কথাও উল্লেখ আছে যে, মাজমুউন নাওয়ামিল গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি শাহী পোশাক পরিধান করে রাজা-বাদশাহর প্রতি মুবারকবাদ জ্ঞাপনের সময় তার সম্ভ্রটি অর্জনের আশায় কোন পণ্ড যবাহ করে তবে তা কুফরী কাজ হিসেবে গণ্য হবে। সর্বোপরি এ পণ্ডটি মৃত বলে গণ্য হবে। কাজেই এর গোশত খাওয়া কারো জন্য জায়েয হবে না। শায়খ (ব) বলেন, আমাদের যুগে একটি বদরসম খুবই প্রসিদ্ধ এবং বহু মুসলমান মহিলা এতে আক্রান্ত। তা হচ্ছে এই যে, বাচ্চাদের যখন বসন্ত হয় তখন বসন্ত দেবীর নামে তারা একটি মূর্তি তৈরি করে। এরপর এর পূজা করে এবং বাচ্চার রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করে। তাদের বিশ্বাস এই মূর্তিই বাচ্চাকে সুস্থ করে থাকে। এ জাতীয় কর্মকাণ্ড এবং আকীদা বিশ্বাসের কারণে ঐ মহিলাগণ কাফির বলে গণ্য হবে। আর এ জাতীয় কর্মকাণ্ড এবং আকীদা বিশ্বাসের উপর যেহেতু তাদের স্বামীরাও রাযী ছিল, তাই তারাও কাফির হবে। এছাড়াও আরো কিছু বদরসম মহিলাদের মধ্যে প্রচলিত আছে; তা হচ্ছে এই যে, তারা পানির ঝর্ণার কাছে আসে এর পূজা করে এবং এখানে এসে বকরী যবাহ করে আর মনে করে যে এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য পূরা হয়ে যাবে। পানির পূজাকারী এবং বকরী যবাহকারী এ জাতীয় মহিলাগণও কাফির। আর তাদের যবাহকৃত বকরী মৃত পণ্ড হিসেবে গণ্য হবে এবং তা খাওয়া জায়েয হবে না। প্রচলিত আরেকটি বদরসম এই যে, মহিলাগণ নিজ গৃহে কোন কিছুর প্রতিকৃতি তৈরি করে রাখে এবং অগ্নিপূজকদের ন্যায় এর পূজা করে। এরপর বাচ্চা পয়দা হওয়ার পর সিঁদুর দ্বারা এটিকে আরো চিত্রায়িত করা হয়। তারপর এর উপর যায়তুনের তৈল ঢালা হয়। তারপর তারা এর পূজা অর্চনা করতে থাকে। যেসব মহিলা এ জাতীয় কাজ করবে তারা কাফির বলে গণ্য হবে এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

১৮. মাসআলা : কেউ যদি বলে, এই যমানায় যতক্ষণ আমি খিয়ানত না করব এবং মিথ্যা না বলব, আমার দিনই অতিক্রান্ত হয় না অথবা যদি বলে, বেচাকেনায় মিথ্যা না বললে তুমি খাওয়ার জন্য রুটিও পাবে না অথবা কেউ যদি অপর কাউকে বলে, তুমি কেন খিয়ানত করছো বা মিথ্যা বলছো, উত্তরে সে বলল, আমার এগুলো দরকার তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কাউকে বলা হল, তুমি মিথ্যা বলবে না। আর সে বলল, এই বক্তব্য لا اله الا الله محمد رسول الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) কালিমা থেকেও অধিক সত্য, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি রাগের অবস্থায় আছে, তার সম্পর্কে কেউ বলল, কাফির হয়ে যাওয়া এর চেয়ে ভাল, তাহলে বলনেওয়ালা ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি শরীআতের নিষিদ্ধ কোন কথা বলল, তা শুনে অপর ব্যক্তি তাকে বলল, এ কথা বলো না। কেননা এতে

কুফরী হয়ে যাবে। জবাবে সে বলল, যদি কুফরীই হয়ে যায় তবে তুমি আর কি করবে? তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে (তাতার খানিয়া)।

১৯. মাসআলা : যদি কারো মনে এমন বিষয়ের জল্পনা-কল্পনা আসে যা উচ্চারণ করা কুফরী, অথচ সে নিজে একে অপসন্দ করছে তাহলে এটি (অপছন্দ করা) ঈমানের আলামত বলে পরিগণিত হবে। কেউ যদি এরূপ দৃঢ়ধারণা পোষণ করে যে, সে কুফরী করবেই তাহলে সে যদি ঐ কাজ একশ' বছর পরেও করে তবুও সে তৎক্ষণাৎ কাফির হয়ে যাবে (খুলাসা)। কেউ যদি স্বেচ্ছায় কুফরী কথা উচ্চারণ করে অথচ তার হৃদয় ঈমানে অবিকলিত তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহর নিকটে সে মু'মিন হিসাবে গণ্য হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। কোন কথা বা কাজে কুফরী হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে যদি ইমামগণের মতভেদ থাকে তবে এ জাতীয় কথা বা কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে হুকুম দেওয়া হবে যেন সে সতর্কতাবশত তার বিবাহ দুহরিয়ে নেয়, এর থেকে ফিরে আসে এবং পুনরায় এ জাতীয় কথা না বলা ও কাজ না করার ব্যাপারে তওবা করে নেয়। আর যে সব শব্দাবলী ও বাক্য সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে যে, এটি ভুল, ঠিক নয় গুনাহের এবং এতে কুফরী হবে না। এ জাতীয় শব্দাবলী কেউ যদি বলে, তবে সে পূর্ববৎ মু'মিন থাকবে এবং তাকে বিবাহ দুহরিয়ে নেওয়া ও তওবা করার জন্য আদেশ দেওয়া হবে না (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা : যদি কোন কথা বা কাজের মধ্যে কুফরী হওয়া এবং না হওয়া উভয়টির সম্ভাবনা থাকে এবং কুফরীর ব্যাপারে একাধিক যুক্তি ও সম্ভাবনা থাকে আর কুফরী না হওয়ার ব্যাপারে শুধুমাত্র একটি যুক্তি বা একটি সম্ভাবনা থাকে তাহলে মুফতীর জন্য উচিত কুফরী না হওয়ার যুক্তি বা সম্ভাবনাটিকে গ্রহণ করা (খুলাসা)। বায়যায়িয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কুফরী থেকে বাঁচার জন্য তাবীলী সূরত (صورة تاويلی) তখনই অবলম্বন করা যাবে, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কুফরীর পক্ষে স্পষ্টভাবে নিজের সংকল্পের কথা বলে দেয় যা কুফরীকে অপরিহার্য করে তাহলে এ ক্ষেত্রে তাবীল ও ব্যাখ্যা কোন কাজে আসবে না (আল-বাহরুর রাযিক)। যদি বক্তা ব্যক্তির নিয়্যতে এমন কোন বিষয় থাকে যা কাফির আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক তাহলে সে মুসলিম হিসাবেই বাকী থাকবে। আর যদি তার নিয়্যতের মধ্যে এমন কোন বিষয় থাকে যা কুফরীকে অপরিহার্য করে তাহলে এ ক্ষেত্রে মুফতীর ফাতাওয়া কোন কাজে আসবে না। এ পর্যায়ে তাকে এ জাতীয় চিন্তা ভাবনা ছেড়ে তওবা করার জন্য হুকুম করা হবে এবং বিবাহ দুহরিয়ে নেওয়ার জন্যও তাকে বলা হবে (আল-মুহীত)। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য উচিত প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নের দু'আটি অযীফা হিসাবে আদায় করা। কেননা এটি কুফরী কার্য ও কুফরী কালাম হতে রক্ষা পাওয়ার উপায়। নবী করীম (সা) ওয়াদা করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় এই অযীফা আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে কুফরী কাজ ও কুফরী কালাম হতে রক্ষা করবেন। দু'আটি এই اللهم انى اعوذبك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم - "হে আল্লাহ! জেনে-বুঝে আপনার সাথে কোন কিছুকে বা কাউকে শরীক করা থেকে আমি আপনার নিকট পানাহ চাই। আর যা আমি জানি না সে বিষয়ে আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি" (খুলাসা)।

দশম পরিচ্ছেদ : বাগী অর্থাৎ বিদ্রোহীদের বিবরণ

১. মাসআলা : এমন এক দল লোক যারা শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করে কোন তাবীলের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধভাবে আদিল ও সত্যনিষ্ঠ হুকুমতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং বলে যে, আমরাই হক পথে আছি। আর তারা 'বিলায়েতে আন্মা' অর্থাৎ দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের দাবী করে এ জাতীয় লোকদেরকেই বাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। যদি একদল চোর বা ডাকাত কোন শহরের নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার লোকদের সমুদয় মালামাল নিয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে বাগী বা বিদ্রোহী বলা যাবে না (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। যদি কোন কওম মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানের বশ্যতা অস্বীকারপূর্বক দেশের কোন শহর বা নগরী নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নেয় তাহলে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান প্রথমে তাদেরকে মুসলমানদের দলে ফিরে আসতে আহ্বান করবেন। আর তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সন্দেহ সৃষ্টি হলে তা দূর করে দিবেন এবং তাদেরকে তওবার আহ্বান জানাবেন (কাফী) এ আহ্বান রাষ্ট্রপ্রধান ও ইমামের উপর ওয়াজিব নয় (বরং মুস্তাহাব)। যদি ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট এ মর্মে সংবাদ আসে যে, তারা অস্ত্র-শস্ত্র ত্রয় করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হবে তাদেরকে পাকড়াও করে জেলখানায় আটক করে রাখা। যাতে তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য পরিহার করে তওবা করতঃ পুনরায় মুসলমানদের জামাআতে शामिल হয়ে যায় এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে যথাসম্ভব তাদের হীন ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করা (আল-হিদায়া)।

২. মাসআলা : বিদ্রোহীরা মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান ও মুসলিম রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ না করা সত্ত্বেও সত্যনিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা জায়েয আছে। এটিই আমাদের মাযহাব। যেহেতু শক্তি-সামর্থ্যবান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পন্ন বিদ্রোহীদেরকে হত্যা করা জায়েয যদিও তারা যুদ্ধে লিপ্ত না হয় সেহেতু যারা শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয়ে সচেষ্ট তাদেরকে হত্যা করাও জায়েয। বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত করার পর পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে হত্যা করা ন্যায়পরায়ণ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য জায়েয হবে না। তবে শর্ত এই যে, তাদের এমন কোন দল যেন বাকী না থাকে যাদের সাথে গিয়ে তাদের মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুত যদি তাদের এমন কোন দল বাকী থাকে যাদের সাথে গিয়ে ওদের মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে পরাজিত বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। বিদ্রোহীদের কাউকে কয়েদ করে আনা হলে তার অবস্থা যদি এমন হয় যে, তাকে হত্যা না করা হলেও সে শক্তি সম্পন্ন বিদ্রোহীদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে না তবে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য তাকে হত্যা করা জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে বিদ্রোহীদের শক্তিসম্পন্ন দলের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার আশংকা থাকলে রাষ্ট্রপ্রধান তাকে হত্যা করবেন (আল-মুহীত)। ইচ্ছা করলে বন্দী করেও রাখতে পারবেন (আল-হিদায়া)।

৩. মাসআলা : যদি বিদ্রোহীদের শক্তিশালী কোন দল বাকী না থাকে ; এ অবস্থায় তাদের থেকে যারা আহত ও যখম হয়েছে তাদের শরীরে যখম ও ক্ষত আরো বাড়িয়ে দেওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয হবে না। অবশ্য ঐ রকমের বিদ্রোহী দল বাকী থাকলে আহত ও ক্ষত লোকদের আরো ক্ষত বাড়িয়ে দেওয়া জায়েয হবে। বাগীদের সন্তানাদি এবং স্ত্রীকে বন্দী করে দাস-দাসী বানানো যাবে না এবং তাদের মালামাল হস্তগত হলে এতে মালিকানাও প্রতিষ্ঠিত হবে না। বিদ্রোহীদের কুরআ (ع۱ر) অর্থাৎ ঘোড়া, খচ্চর, গাধা এবং হাতিয়ার ইত্যাদি যদি হক পথে প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের হস্তগত হয় তাহলে এগুলো তৎক্ষণাৎ তাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে না। যদি হকপন্থী মুসলমানগণ তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এসব কুরআ (ع۱ر) এবং হাতিয়ারের মুখাপেক্ষী হয় তাহলে এগুলো ব্যবহার করতে পারবে। তারপর হাতিয়ারসমূহ অন্যান্য মালামালের ন্যায় যথাস্থানে রেখে দেওয়া হবে। কিন্তু কুরআ তথা ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি বিক্রি করে সে পয়সা আটকে রাখা হবে। কেননা রাষ্ট্র প্রধানের এ জাতীয় টাকা পয়সার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু বায়তুল মাল থেকে এ জাতীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাবে না। আর এতেই বিদ্রোহীদের প্রতি অনুগ্রহ নিহিত রয়েছে। আর রাষ্ট্রপ্রধান যদি এ জাতীয় ব্যয় বায়তুল মাল থেকে নির্বাহ করে তবে ব্যয়িত টাকা পয়সা বাগীদের উপর ঋণ হিসাবে গণ্য হবে। তারপর যখন বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাবে তখন তাদের যাবতীয় মালামাল তাদের নিকট হস্তান্তর করা হবে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিদ্রোহীদের হাতে আমাদের জান-মাল নষ্ট হয়ে থাকলে তাদেরকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যদি তারা বিদ্রোহ ত্যাগ করে খালিস দিলে তওবা করে নেয়। এমনিভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় মুরতাদ লোকদের হাতে আমাদের জান-মালের ক্ষতি হয়ে থাকলে তাদেরকেও এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যদি তারা পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। যুদ্ধের পূর্বে তারা আমাদের জান-মালের ক্ষতি সাধন করে থাকলে যদি তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে তাহলে তাদেরকে এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে না। কিন্তু কোন মালামাল পূর্বের অবস্থায় হবহ অক্ষুণ্ণ থাকলে তা এর মালিকের নিকট ফেরত দিয়ে দিতে হবে, যখন তারা তওবা করবে তখন। যদিও তারা তাদের প্রাপ্ত তাবীলের ভিত্তিতে এ মালের মালিকানার ইতিকাদ করে নিয়েছিল। আর এই ভ্রান্ত তাবীলের সাথে প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয়টিও মিলিত হয়েছিল। এমনিভাবে হকপন্থী মুসলমানদের হাতে বিদ্রোহীদের জান-মালের ক্ষতি হয়ে থাকলে মুসলমানদেরকে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে না (যখীরা)। কিন্তু যদি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই মুসলমানদের হাতে তাদের কোন ক্ষতি হয়ে থাকে তবে তাদেরকে এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে (নিহায়া)।

৪. মাসআলা : আহলে কিবলা তথা কিবলার অনুসারী মুসলমানদের কোন জামাআত যদি নতুন কোন মতামত প্রকাশ করে; এর প্রতি লোকদেরকে আহ্বান জানায় এবং এ নিয়ে লড়াই করে শক্তি সামর্থ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করে; আর বাদশাহর হুকুমের কারণে তারা যদি এ মত গ্রহণ করে থাকে তাহলে বাদশাহ আর তাদের প্রতি জুলুম করতে পারবে না। বাদশাহ যদি জুলুম থেকে নিবৃত্ত না থাকে এবং তাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখে তাহলে বাদশাহ ও বিদ্রোহী কারো সাহায্য করাই মুসলিম জনসাধারণের জন্য উচিত হবে না। আর তাদের বিদ্রোহ

যদি বাদশাহর জুলুমের কারণে না হয়ে অন্য কোন কারণে হয় এবং বিদ্রোহীরা যদি এ কথা বলে যে, আমরাই হকের উপর আছি এবং তারা যদি দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের দাবী করে তবে বাদশাহর জন্য জায়েয হবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্যও উচিত হবে বিদ্রোহ দমনে বাদশাহকে সাহায্য করা (সিরাজিয়া)। হবরীদের বিরুদ্ধে যে যে অস্ত্র ব্যবহার করা জায়েয বিদ্রোহীদের দমনেও সেগুলো ব্যবহার করা জায়েয। যেমন তাদের প্রতি তীর বা মিনজানিক (কামান জাতীয় অস্ত্র) নিক্ষেপ করা; তাদের বিরুদ্ধে আগুন, পানি ব্যবহার করা এবং রাত্রিকালে তাদের উপর আক্রমণ করা (নিহায়া)।

৫. মাসআলা : তাজরীদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে ; যদি বিদ্রোহীদের সন্তানাদি, স্ত্রী, বৃদ্ধ ও অন্ধ মানুষকে হত্যা করা যাবে না। যদি বিদ্রোহীদের গোলাম তার মুনীবের সাথে মিলে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি শুধুমাত্র খিদমতের কাজ আঞ্জাম দেয় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। কিন্তু তাকে বন্দী করে রাখা হবে যতক্ষণ না তাদের বিদ্রোহ শেষ হয়। যদি বিদ্রোহীদের স্ত্রীগণও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তবে তাদেরকে হত্যা করা হবে (তাতারা খানিয়া)। আহলে হক রাষ্ট্রপ্রধানের কোন নিকটাত্মীয় (ذو رحم) যদি বিদ্রোহ করে লড়াই করার জন্য আসে তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান নিজে তাকে হত্যা করবে না। অবশ্য সে নিজে রাষ্ট্রপ্রধানের উপর আক্রমণ করলে আত্মরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান তাকে হত্যা করতে পারে। রাষ্ট্রপ্রধানের নিকটাত্মীয় ব্যক্তির পশু হত্যা করা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য জায়েয হবে। যাতে সে অচল হয়ে পড়ে এবং অন্য ব্যক্তি এসে তাকে হত্যা করতে পারে (সিরাজিয়া)।

৬. মাসআলা : যদি বিদ্রোহী সম্প্রদায় আসহাবে আদল তথা রাষ্ট্রের যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যিম্মীদের সহযোগিতা চায় এবং যিম্মীরা তাদের সাথে মিলে ইসলামী রাষ্ট্রের যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে এ কাজ যিম্মীদের পক্ষ হতে “চুক্তি ভঙ্গ করার মধ্যে গণ্য হবে না”। এ যুদ্ধে যদি যিম্মীদের হাতে মুসলমানদের জান-মালের কোন ক্ষতি সাধিত হয় অর্থাৎ কেউ মারা যায় বা আহত হয় অথবা আমাদের দ্বারা যদি তাদের জান-মালের কোন ক্ষতি সাধিত হয় তবে এক্ষেত্রে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না- যেমন বিদ্রোহীদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধের অবস্থায় হয় না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আসহাবে আদল অর্থাৎ যথাযথ বৈধ কর্তৃপক্ষের সেনাসদস্যদের মধ্যে বিদ্রোহীদের কোন লোক থাকে এবং তাকে কেউ হত্যা করে ফেলে তাহলে হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে সগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যদি বিদ্রোহীরা মুসলমানদের কোন শহর দখল করে নেয়ার পর তাদের কেউ যদি শহরের কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করে; তারপর আসহাবে আদল মুসলমানগণ ঐ শহর পুনরায় নিজেদের কবজায় নিয়ে নেয় তাহলে হত্যাকারী ব্যক্তির থেকে তার কিসাস গ্রহণ করা হবে। উক্ত মাসআলার মর্ম হল বিদ্রোহী লোকেরা কোন শহরের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করার পর যেখানে তাদের শাসনকার্য জারী করার আগেই যদি ঐ শহরের ইমাম বা গভর্নর তাদেরকে প্রতিহত করে তাদের থেকে শহরকে পুনরুদ্ধার করে নেয় তাহলে এ ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে।

পক্ষান্তরে কোন শহর কবজা করার পর সেখানে বিদ্রোহীরা যদি নিজেদের শাসনকার্যও জারী করে নিতে সক্ষম হয় তাহলে আসহাবে আদল মুসলমানদের কর্তৃত্ব সে শহর থেকে খতম হয়ে যাবে। তাদের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি সেখানে আর চলবে না। কাজেই এ অবস্থায় কোন শহরবাসীকে হত্যা করা হলে হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (রা)-এর জামে সগীর গ্রন্থে আরো আছে যে, যদি হকপন্থী কোন মুসলমান কোন বিদ্রোহী হত্যা করে এবং হত্যাকারী তার ওয়ারিশ হয় তবে সে তার মীরাস পাবে। পক্ষান্তরে কোন বিদ্রোহী যদি কোন হকপন্থীকে হত্যা করে এবং সে একথা বলে যে, তাকে হত্যা করার সময়ও আমি হকের উপর ছিলাম, এখনও হকের উপর আছি তাহলে সেও মীরাস পাবে। আর যদি বলে যে, হত্যা করার সময় আমি আমার ধারণা মতে বাতিলের উপর ছিলাম তাহলে মীরাস পাবে না (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : নিহত বিদ্রোহীকে গোসল দেওয়া হবে না এবং তার জানাযাও পড়া হবে না। আর আসহাবে আদল মুসলমানদের কেউ নিহত হলে শহীদ মুসলমানের সাথে যা করা হয় তার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তার হুকুম শহীদের হুকুমের অনুরূপ হবে (শরহুত তাহবী)। যদি বিদ্রোহী লোকেরা আসহাবে আদল মুসলমানদের থেকে উশর বা খারাজ আদায় করে নিয়ে যায় তাহলে তাদের থেকে পুনরায় আবার উশর ও খারাজ উসুল করা হবে না। তারপর তারা যদি উশর ও খারাজ বাবদ উসুলকৃত মালামাল যথাযথ খাতে ব্যয় করে থাকে তাহলে আইনের দৃষ্টিতে (قضاء) তা আবার পুনরায় আদায় করতে হবে না। কিন্তু (ديانة) অর্থাৎ নৈতিকতার দৃষ্টিতে মালদার ভূমি মালিক ব্যক্তিদেরকে এ মর্মে ফাচ্ছিয়া প্রদান করা হবে যে, তারা যেন উশর বা খারাজ পুনরায় পরিশোধ করে দেয়। কিন্তু আমাদের মাশাইখে কিরাম এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, খারাজের ক্ষেত্রে ديانة ও পুনরায় তা আদায় করতে হবে না। এমনিভাবে যদি বিদ্রোহী লোকেরা ফকীর ধরনের মানুষ হয় তবে উশরের ক্ষেত্রেও পুনরায় তা আদায় করতে হবে না (গায়াতুল বয়ান অরাজকতা ও ফিতনা সৃষ্টিকারী লোকদের সেনা সদস্যদের নিকট হাতিয়ার বিক্রি করা আসহাবে আদল মুসলমানদের জন্য মাকরুহ। তবে যারা ফিতনা সৃষ্টিকারী বলে জানা নেই যেমন কৃষাবাসী মন্সুফ তাদের নিকট হাতিয়ার বিক্রি করতে কোন দোষ নেই। এতো হল হাতিয়ার ক্রয়-বিক্রয় কর সংক্রান্ত মাসআলা। কিন্তু যে সব জিনিস ইঞ্জিনিয়ার বা কামারের শিল্পকর্ম ব্যতিরেকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার সম্ভব নয় তা বেচাকেনা করতে কোন দোষ নেই। যেমন লোহা ইত্যাদি (কস্বী)।

অধ্যায় : লকীত (হারানো প্রাপ্ত সন্তান)-এর বিবরণ

অধ্যায় : লকীত (হারানো প্রাপ্ত সন্তান)-এর বিবরণ

অধ্যায় : লকীত (হারানোপ্রাপ্ত সন্তান)-এর বিবরণ

১. মাসআলা : লকীত (হারানোপ্রাপ্ত সন্তান) শরীআতের পরিভাষায় এমন নবজাতক জীবিত শিশুকে বলা হয়, যাকে তার পরিবারের লোকেরা লালন-পালনের ভয়ে বা যিনার অপবাদের আশংকার কারণে কোথাও ফেলে দিয়েছে। এটা গুরুতর পাপ আর হিদায়াত করার জন্য ঐ শিশুকে তুলে নেওয়া অনেক সাওয়াবের কাজ। সাধারণ অবস্থায় পতিত শিশুকে কুড়িয়ে নেওয়া মুস্তাহাব। যদি কারো প্রবল ধারণা হয় যে, শিশুটি মারা যাবে, যেমন কেউ তাকে পানিতে কিংবা হিংস্র প্রাণীর সামনে পড়া অবস্থায় পেল তাহলে এ অবস্থায় তাকে তুলে নেওয়া ওয়াজিব। হারানোপ্রাপ্ত শিশু আযাদ মানুষ হিসাবে গণ্য হবে এবং রাষ্ট্রপ্রধান হবে তার ওলী বা অভিভাবক। অতএব (ملقط) (মূলতাকিত) যদি কোন মহিলার সাথে তার বিবাহ সম্পাদন করে দেয় অথবা তাকে যদি কোন পুরুষের বিবাহে সমর্পণ করে (কন্যা হলে) তবে তা জায়েয হবে না (খাযালাতুল মুফতিয়ীন)। এই শিশুকে কোন ব্যক্তি (ملقط)-এর নিকট থেকে নিয়ে নিতে পারবেনা। অবশ্য যে নিজেকে যদি একে কারো হাতে সমর্পণ করে তাহলে সে আর একে তার নিকট হতে ফেরত নিতে পারবে না (তাবয়ীন) তার খোরপোষ এবং সে অপরাধ করলে এর জরিমানা বায়তুল মাল থেকে প্রদান করা হবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : যদি লকীত তথা হারানোপ্রাপ্ত কোন শিশুর গায়ে কোন মালামাল বাঁধা অবস্থায় থাকে তবে লকীতই এই মালের মালিক হবে। এমনভাবে লকীত (শিশু) সে সওয়ারীর উপর থাকবে এর উপর যে মালামাল থাকবে লকীতই এই মালের মালিক বলে গণ্য হবে যদি লকীতের নিকটে কোন মালামাল পাওয়া যায় তবে লকীত এ মালের মালিক বলে গণ্য হবে না। বরং এ মাল লুকাতা (হারানোপ্রাপ্ত মাল) হিসাবে গণ্য হবে। যদি লকীতকে কোন সওয়ারীর উপর পাওয়া যায় তবে এটি তার সওয়ারী বলেই গণ্য হবে (আল-জাওহারাতুন নায়্যারা) লকীতের খোরপোষ তখনই এ মাল থেকে নির্বাহ করা যাবে যদি বিচারক এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করে যে, ملقط এ মাল থেকে তার ব্যয় নির্বাহ করবে। কোন কোন ফকীহ বলেন যে, বিচারকের নির্দেশ ছাড়াও ملقط এ মাল থেকে ব্যয় করতে পারবে। এ ধরনের পতিত শিশুর ক্ষেত্রে সাধারণত যে পরিমাণ ব্যয় হয় সে পরিমাণ ব্যয়ের ক্ষেত্রে (ملقط) এর করা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)। আর তার ولا বায়তুল মালে জমা হয়ে যাবে। সুতরাং

১. কাজেই গোলাম হিসাবে গণ্য হবে না আর যে তাকে তুলে নিবে তাকে (ملقط) বলা হবে।

সে যদি মারা যায় আর তার কোন ওয়ারিস এবং মাওলাল মুওয়ালাত (مولى الموالاة) ও না থাকে তাহলে তার পরিত্যাজ্য অর্থ-সম্পদ বায়তুল মালে জমা হবে (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)।

৩. মাসআলা : যে ব্যক্তি হারানোপ্রাপ্ত শিশুকে পেয়েছে (ملقط) সে যদি ঐ শিশুকে নিয়ে বিচারকের নিকট এসে বলে যে, এ শিশুকে আমার থেকে নিয়ে নিন তাহলে সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া বিচারক ইচ্ছা করলে তার কথা অবিশ্বাসও করতে পারবে না। কেননা সে (ملقط) তো এ আবেদনের মাধ্যমে বায়তুল মাল থেকে এ শিশুর খোরপোষ কামনা করছে। (কাজেই বিচারকের ইখতিয়ার থাকবে) পক্ষান্তরে সে যদি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তাহলে বিচারক বিবাদীর উপস্থিতি ছাড়াও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবেন। বিচারক কর্তৃক তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার পর বিচারক ইচ্ছা করলে কুড়ানো শিশুকে নিজ হিফায়তে নিয়ে নিতে পারবেন। আবার ইচ্ছা করলে তাকে নিজ কবজায় না নিয়ে কাউকে তার ওলী (অভিভাবক) বানিয়ে দিতে পারবেন। এরূপ অবস্থায় বিচারক ঐ অভিভাবককে বলবেন আপনি তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কি? এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি হারানো প্রাপ্ত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ এবং খোরপোষ প্রদানের ব্যাপারে মূলতাকিত ব্যক্তি অক্ষম কিনা এ কথাটি বিচারকের জানা না থাকে। পক্ষান্তরে যদি এ বিষয়টি বিচারকের জানা থাকে তাহলে বিচারকের জন্য বাঞ্ছনীয় হবে, এ শিশুকে মূলতাকিত ব্যক্তির হাত থেকে নিয়ে তাকে অন্য কারো হাতে সোপর্দ করা। কিন্তু যদি মূলতাকিত ব্যক্তি বিচারকের নিকট এসে শিশুটিকে তার নিকট পুনরায় ফেরত প্রদানের জন্য আবেদন জানায় তাহলে বিচারকের ইখতিয়ার থাকবে; তিনি ইচ্ছা করলে ফেরত দিতে পারবেন, আবার ইচ্ছা তাকে নাও দিতে পারবেন। কিন্তু কেউ যদি হারানো শিশু পায়; এরপর আবার কোন ব্যক্তি যদি তার হাত থেকে ঐ শিশুকে ছিনিয়ে নেয়, তারপর উভয় ব্যক্তি বিচারকের নিকট এসে তাকে পাওয়ার জন্য আবেদন জানায়, তাহলে বিচারক ঐ ব্যক্তির নিকটই তাকে হস্তান্তর করবে যে তাকে পেয়েছে। কোন গোলাম যদি হারিয়ে যাওয়া কোন শিশুকে পায় এবং এ পাওয়ার কথাটি শুধুমাত্র তার বক্তব্যের মাধ্যমেই জানা যায়, অথচ মুনীর বিষয়টিকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, তুমি মিথ্যা বলছো। বরং এ আমারই গোলাম। এহেন অবস্থায় দেখতে হবে যে, প্রাপক গোলামটি 'গোলামে মাহজুর' (عالم محجور) (এমন গোলাম যাকে মুনীরের পক্ষ হতে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি) কিনা? যদি গোলামে মাহজুর হয় তবে এ অবস্থায় মুনীরের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি গোলামে মায়ুন তথা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হয় তাহলে গোলামের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (যহীরিয়া) যদি হারানোপ্রাপ্ত শিশু এ কথা স্বীকার করে যে, সে অমুকের গোলাম আর অমুক ব্যক্তি তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে সে আযাদ হিসাবে গণ্য হবে। আর ঐ ব্যক্তি যদি তার কথা সত্যায়ন করে এবং তার উপর যদি আযাদ মানুষের বিধি-বিধান জারী না হয়ে থাকে, যেমন তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং তার প্রতি অপবাদ আরোপকারীকে প্রহার করা ইত্যাদি; তাহলে তার স্বীকারোক্তি সহীহ হবে। অন্যথায় সহীহ হবে না (সিরাজিয়া)।

৪. মাসআলা : কেউ পতিত শিশুকে কুড়িয়ে নিলো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে শিশুটির বংশ সম্পর্ক দাবী করলো না এমতাবস্থায় অন্য কেউ যদি তার বংশ সম্পর্ক দাবী করে তাহলে ঐ ব্যক্তি থেকে তার নসব সাব্যস্ত হবে। কেনন কোন ফকীহ বলেন; নসবের ক্ষেত্রে তো তার দাবী সহীহ হবে, কিন্তু যে তাকে পেয়েছে তার কবজা বাতিল করার ব্যাপারে তার দাবী সহীহ হবে না। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটি বিতর্কিত। যদি প্রাপক এবং অপর কোন ব্যক্তি উভয়েই ঐ শিশুর নসবের দাবী করে তবে যে পেয়েছে তার দাবীই অগ্রগণ্য, যদিও প্রথম ব্যক্তি যিম্মী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি মুসলমান হয় (তাবয়ীন)। যিম্মী ব্যক্তি নসবের দাবী করার প্রেক্ষিতে হারানোপ্রাপ্ত শিশুটি তার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও সে মুসলমান বলে গণ্য হবে। যদি হারানোপ্রাপ্ত শিশুর ব্যাপারে মুসলমান ও যিম্মী দুই ব্যক্তিই নসবের দাবী করে তবে মুসলমান ব্যক্তির অনুকূলে ফায়সালা প্রদান করা হবে। যদি দাবীকারী উভয় ব্যক্তিই মুসলমান হয় তবে যে ব্যক্তির তার দাবীর অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারবে তার পক্ষেই রায় প্রদান করা হবে। যদি উভয় দাবীকারীই সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তবে তাকে উভয়ের সন্তান বলে রায় দেওয়া হবে। তারা সাক্ষ্য পেশ করতে সক্ষম হয়নি, এমতাবস্থায় যদি তাদের কোন একজনে তার শরীরের গঠন আকৃতি (না দেখেই) ঠিক ঠিক ভাবে বলে দিতে পারে কিন্তু অপরজন এভাবে বলতে না পারে তাহলে একে ঐ ব্যক্তির পুত্র বলেই রায় দেওয়া হবে- যে ঠিক ঠিক ভাবে তার গঠন-আকৃতি বলতে সক্ষম হয়েছে (সিরাজিয়া)। যদি তাদের কেউই তার শরীরের গঠন-আকৃতি বলতে না পারে তবে সে তাদের উভয়ের পুত্র হিসাবে গণ্য হবে (গাযাতুল বয়ান)। যদি দাবীকারীদের একজনে তার শরীরের গঠন আকৃতি বর্ণনা করে এবং আংশিক ঠিক এবং আংশিক বেঠিক বলে তাহলেও সে তাদের উভয়ের পুত্র হিসাবে গণ্য হবে। যদি দুই ব্যক্তিই তার শরীরের আকার-আকৃতি বর্ণনা করে এবং একজনে ঠিক বলে আর অপরজনে বে-ঠিক বলে, তাহলে সে ঐ ব্যক্তির পুত্র বলে গণ্য হবে যে ঠিক বর্ণনা করেছে। এমনিভাবে যদি দুই ব্যক্তির একজনে বলে সে দাস এবং অপরজনে বলে, সে দাসী তাহলে যে ঠিক বলেছে তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে। যদি হারানোপ্রাপ্ত শিশুর ব্যাপারে কোন এক দাবীকারী ব্যক্তি বলে যে, সে দাস অথচ প্রকৃতপক্ষে সে হচ্ছে দাসী অথবা দাবীকারী বলল যে, সে দাসী, অথচ বাস্তবে দেখা গেল যে, সে দাস তাহলে তার পক্ষে আদৌ কোন রায় দেওয়া হবে না (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : হারানোপ্রাপ্ত কোন শিশুর ব্যাপারে দুই ব্যক্তি দাবী করল। একজনে বলল, সে আমার পুত্র। অপরজনে বলল, সে আমার কন্যা। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, সে হচ্ছে নপুংসক। এহেন অবস্থায় তার ব্যাপারে কোন দিকেই ফায়সালা দেওয়া যদি দুষ্কর হয়ে পড়ে তবে তাকে উভয়ের পুত্র বলে ফায়সালা দেওয়া হবে। আর যদি তদ্বিষয়টি দুষ্কর না হয়; তাকে পুত্র বলে ফায়সালা দেওয়া যায় তবে সে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসাবে গণ্য হবে- যে পুত্র হওয়ার দাবী করেছে (তাতার খানিয়া)। নসবদাবীকারীর সংখ্যা যদি দুই এর অধিক হয় তাহলে ইমাম

আবু হানীফা (র)-এর মতে এ দাবী পাঁচজন পর্যন্ত জায়েয হবে (সিরাজিয়া)। কোন মহিলা দাবী করল যে, ঐ (হারানোপ্রাপ্ত) শিশুটি আমার পুত্র। এহেন অবস্থায় তার স্বামী যদি তার এ কথা সত্যায়ন করে কিংবা ধাত্রী মহিলা তার অনুকূলে সাক্ষ্য দেয় অথবা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তার দাবী সহীহ হবে। অন্যথায় তার দাবী সহীহ হবে না ধাত্রী মহিলার সাক্ষ্য তখনই যথেষ্ট হবে যদি দাবীদার মহিলার স্বামী থাকে এবং সে এই বাচ্চার জন্মের বিষয়টিকে অস্বীকার করে। প্রকৃতপক্ষে যদি মহিলার কোন স্বামীই না থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষের সাক্ষ্য আবশ্যিক (আল-বাহরুর রায়িক)। কোন মহিলা যদি হারানো প্রাপ্ত শিশুর ব্যাপারে এ দাবী করে যে, এ আমার যিনার সন্তান তবে তার পক্ষে ফায়সালা প্রদান করা হবে (সিরাজিয়া)।

৬. মাসআলা : হারানোপ্রাপ্ত শিশুর ব্যাপারে যদি দুই মহিলা নসবের দাবী করে তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তাদের কারো থেকেই এ শিশুর নসব সাব্যস্ত না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতানুসারে উভয় মহিলা থেকেই তার নসব সাব্যস্ত হবে। তবে সংঘাত (تعارض)-এর সময় সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। আবু হাফস (র)-এর বর্ণনা মতে একজন মহিলার সাক্ষ্যই প্রামাণ্য দলীল হিসাবে যথেষ্ট হবে। আর আবু সুলায়মান (র)-এর বর্ণনা মতে প্রামাণ্য দলীলের জন্য দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষী আবশ্যিক যদি উভয় দাবীদার মহিলাই নিজ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে দেয় তাহলে তাদের উভয়ের থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। অন্যথায় হবে না। খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যদি এক মহিলা দুজন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করে এবং অপরজনে দুজন মহিলাকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করে তবে এই শিশু ঐ মহিলার বলে সাব্যস্ত হবে যার পক্ষে দুজন পুরুষ সাক্ষ্য দিয়েছে। শরহত তাহাবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যদি এক মহিলা সাক্ষী পেশ করে এবং অপরজনে সাক্ষী পেশ করতে না পারে তাহলে এ সন্তান ঐ মহিলার বলে গণ্য হবে, যে তার নিজের দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয়েছে। যদি দুই মহিলা হারানো প্রাপ্ত শিশুর মা হওয়ার দাবী করে এবং তাদের প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের মাধ্যমে বাচ্চা জন্ম দানের কথা বলে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উক্ত দুই মহিলা থেকেই এই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। সাহেবাইনের মতে এ দুই মহিলা উক্ত সন্তানের মা হবে না এবং পুরুষ দুজনও তাদের পিতা হিসাবে গণ্য হবে না (তাতার খানিয়া)।

৭. মাসআলা : কেউ যদি কুড়ানো শিশুকে নিজের সন্তান বলে দাবী করে এবং কোন স্বাধীন নারীর গর্ভজাত আর অন্য কেউ শিশুটিকে তার গোলাম বলে দাবী করে। তারপর তারা উভয়ে প্রমাণ পেশ করে তাহলে পিতৃত্বের দাবীদারের পক্ষে ফায়সালা দেওয়া হবে। যদি দাবীদার দু'জনের একজনে বলে যে, এই শিশুটি আমার সন্তান এবং এই আযাদ মহিলার ঔরসে তার জন্ম। আর অপর জনে বলে যে, এই শিশু আমার সন্তান এবং এই দাসীর ঔরসে তার জন্ম, তাহলে যে ব্যক্তি আযাদ মহিলার ঔরসে জন্মের দাবী করবে তার পক্ষে ফায়সালা প্রদান করা হবে। যদি দুই দাবীদার ব্যক্তির প্রত্যেকেই এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, এই শিশু

আমার সন্তান এবং অমুক অমুক আযাদ মহিলার ঔরসে তার জন্ম তাহলে এই শিশু তাদের উভয়ের সন্তান বলে ফায়সালা দেওয়া হবে। তবে তাদের উভয়ের থেকে নসব সাব্যস্ত হবে কিনা, এ সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত হল তাদের উভয়ের থেকে নসব সাব্যস্ত হবে। কিন্তু সাহেবাইনের থেকে নসব সাব্যস্ত হবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : দু'ব্যক্তি হারানোপ্রাপ্ত শিশুর নসব দাবী করল এবং তাদের উভয়েই সাক্ষী প্রমাণও পেশ করল। তারপর প্রত্যেক পক্ষের সাক্ষীগণ শিশুর জন্ম তারিখও বর্ণনা করল। এহেন অবস্থায় শিশুর বয়স যে তারিখের প্রতি সমর্থন করবে তার পক্ষে ফায়সালা করা হবে। আর যদি শিশুর বয়স এমন সন্দেহযুক্ত হয় যে, তা কারো বর্ণিত তারিখের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না, তাহলে সাহেবাইনের মতানুসারে তারিখের বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। তাই এ শিশু তাদের উভয়ের সন্তান বলে ফায়সালা দেওয়া হবে। খাহারযাদা (র)-ইমাম আবু হাফস (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ শিশু তাদের উভয়ের সন্তান বলে ফায়সালা দেওয়া হবে। আর আবু সুলায়মান (র)-এর বর্ণনা মতে যার বর্ণিত তারিখটি আগের হবে তার পক্ষে ফায়সালা দেওয়া হবে (তাতার খানিয়া) গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, অধিকাংশ বর্ণনা অনুসারে শিশুটিকে উভয়ের সন্তান বলে ফায়সালা দেওয়া হবে। এটিই সহীহ মতামত (আল-বাহরুর রায়িক)। মুহিত গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৯. মাসআলা : কুড়ানো শিশুটিকে নিজের হিফায়ত থাকা অবস্থায় কেউ যদি নিজের সন্তান বলে দাবী করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করে। এহেন অবস্থায় অন্য কেউ একই দাবী ও প্রমাণ পেশ করে তাহলে শিশুটি যার হাতে আছে তার পুত্র বলেই তাকে ফায়সালা দেওয়া হবে। কুড়ানো শিশু কোন মহিলার হাতে থাকা অবস্থান সে এবং অন্য একজন মাতৃত্ব দাবী করল এবং উভয় সাক্ষ্য-প্রমাণও করল। তাহলে এ শিশু যার হাতে আছে তাকে তার পুত্র বলেই ফায়সালা দেওয়া হবে। প্রাপ্ত শিশু যার নিকটেই আছে তার পক্ষে যদি এক মহিলা সাক্ষ্য দেয় এবং যার হাতে নেই তার পক্ষে যদি দুজন পুরুষ সাক্ষ্য দেয় তবে যার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে তার অনুকূলেই ফায়সালা প্রদান করা হবে। হারানো প্রাপ্ত এক বালক কোন পুরুষের হাতে আছে। আর অপর এক আযাদ পুরুষের বিবাহধীনে রয়েছে এক আযাদ রমণী। এমনভাবে ঐ পুরুষ যদি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার এই স্ত্রীর ঔরসজাত সন্তান। এমনভাবে বাচ্চাটি যার নিকটে রয়েছে সেও যদি এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার পুত্র। তবে এর মায়ের কথা বর্ণনা না করে (যে, সে আমার অমুক স্ত্রীর ঔরসজাত সন্তান) তবে শিশুটি বাদী ব্যক্তির বলে ফায়সালা দেওয়া হবে।

১০. মাসআলা : কোন যিম্মী যদি কুড়ানো শিশুর নসব দাবী করে তবে তা সাব্যস্ত হবে। কিন্তু শিশুটি মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে। যদি তাকে যিম্মীদের এলাকায় না পাওয়া যায়। এটি ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কiyাসের কথা (তাবয়ীন)। যিম্মী যদি কুড়ানো শিশুটিকে নিজের পুত্র বলে দাবী করে তবে সে তখনই মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে যদি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা তার পুত্র হওয়ার বিষয়টিকে প্রমাণিত না করে। যদি মুসলমানদের সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায় তবে তাকে এই যিম্মী ব্যক্তির পুত্র বলে ফায়সালা দেওয়া হবে এবং ধর্মীয়

দিক থেকে সে তার অধীন বলে বিবেচিত হবে (অর্থাৎ তখন আর সে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে না)। কিন্তু যিম্মী ব্যক্তিদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সে যিম্মী হিসেবে গণ্য হবে না (আল-বাহরুর রাযিক)। মুসলমান বা যিম্মী হিসেবে গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে স্থান এবং জায়গায় বিষয়টির ধর্তব্য হবে। আর এ ব্যাপারে মাশাইখে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বস্তুত এই মাসআলাটির মধ্যে চার অবস্থা হতে পারে (১) কোন মুসলমান কোন শিশুটিকে মুসলমানদের এলাকার মধ্যে পেল। যেমন মসজিদ, মুসলিম জনপদ বা মুসলমানদের শহর ইত্যাদি। এ অবস্থায় শিশুটি মুসলমান বলে গণ্য হবে (২) কোন কাফির কোন শিশুকে কাফিরদের এলাকার মধ্যে পেল। যেমন গির্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় কিংবা কাফিরদের কোন জনপদ ইত্যাদি। এ অবস্থায় হারানোপ্রাপ্ত শিশুটি কাফির বলে গণ্য হবে (৩) কাফির ব্যক্তি কোন শিশুকে মুসলমানদের এলাকার মধ্যে পেল (৪) অথবা মুসলমান ব্যক্তি শিশুটিকে কাফিরদের এলাকার মধ্যে পেল। শেষোক্ত দুই অবস্থায় ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। লকীত অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, এক্ষেত্রে জায়গা ও স্থানের বিষয়টি ধর্তব্য হবে (তাবয়ীন)। কুদুরী গ্রন্থেও এভাবেই বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। আর এটিই যাহিরী রিওয়াযাত (আন্-নাহরুল ফায়িক)।

১১. মাসআলা : যদি লকীতকে কুফরী অবস্থায় পাওয়া যায় এবং মূলতাকিত তাকে যদি মুসলমানের কোন শহরে পায় তাহলে তাকে বন্দী করা রাখা হবে এবং ইসলাম গ্রহণের বাধ্য করা হবে। এটিই সহীহ্ অভিমত (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, হারানোপ্রাপ্ত যে শিশুর উপর **نفس** মুসলমান হওয়ার হুকুম দেওয়া হয় সে যদি কুফরী অবস্থায় বালিগ হয় তাহলে তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে। কিন্তু তাকে কতল করা যাবে না। এটি ইসতিহসানের কথা (মুহীত)। কোন গোলাম যদি লকীতের নসবের দাবী করে তবে তার থেকে তার নসব সাব্যস্ত হবে এবং এ সন্তান আযাদ হিসেবে গণ্য হবে। লকীত সম্পর্কে কোন গোলাম যদি বলে, সে আমার স্ত্রীর ঔরসজাত পুত্র এবং তার স্ত্রী যদি দাসী হয় আর তার মুনীবও তার কথাকে সত্যায়ন করে তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার থেকে এ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে এবং এ সন্তান আযাদ হিসেবে গণ্য হবে। লকীতের নসবের ব্যাপারে যদি মুসলমান ও যিম্মী বিবাদে লিপ্ত হয় তবে মুসলমান ব্যক্তিই তার ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। যদি সে আযাদ ব্যক্তি হয়। পক্ষান্তরে সে যদি গোলাম হয় তাহলে যিম্মী ব্যক্তিই লকীতের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। লকীত শিশুকে গোলাম গণ্য করা হবে না। অবশ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে গোলাম গণ্য হবে। তবে সাক্ষীদের মুসলমান হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু যিম্মীদের এলাকায় পাওয়া যাওয়ার কারণে শিশুই যিম্মী হিসেবে গণ্য হলে এ শর্তে প্রযোজ্য হবে না। কেউ যদি কুড়ানো শিশুটিকে নিজের গোলাম বলে দাবী করে আর শিশুটি বালিগ হওয়ার পূর্বে এ দাবীর সত্যায়ন করে তবে তার সত্যায়ন গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে লকীত যদি নাবালিগ অবস্থায় কোন পুরুষ ব্যক্তির নিকটে থাকে এবং সে তাকে নিজের গোলাম বলে দাবী করে আর লকীত তার সত্যায়ন করে তাহলে সে তার গোলাম বলে গণ্য হবে। যদিও তখনো সে নাবালিগ। যদি বালিগ হওয়ার পর লকীত তার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানায় এবং তার উপর আযাদ মানুষের হুকুম জারী হওয়া, যেমন তার প্রতি সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া, তার অপবাদ

আরোপকারী উপর দণ্ড প্রয়োগ করা ইত্যাদির পর যদি সে এই সমর্থন ব্যক্ত করে তাহলে গোলামীর ব্যাপারে তার এ স্বীকারোক্তি সহীহ্ হবে না (তাবয়ীন)।

১২. মাসআলা : লকীত যদি কন্যা সন্তান হয় এবং সে কারো দাসী হওয়ার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে, আর ঐ ব্যক্তিও তার স্বীকারোক্তির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে তাহলে সে তার দাসী হিসেবেই গণ্য হবে। কিন্তু সে যদি কোন পুরুষের বিবাহধীন থাকে তাহলে বিবাহ বাতিল করার ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে ঐ কন্যা সন্তান যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, আমি আমার স্বামীর পিতার কন্যা এবং স্বামীর পিতাও কথাটি বিশ্বাস করে স্বীকার করে নেয় তাহলে তার থেকে তার নসব সাব্যস্ত হবে এবং ঐ ব্যক্তির সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। যদি **مقرله** (যার দাসী হওয়ার কথা সে স্বীকার করেছে) তাকে আযাদ করে দেয় এবং সে কোন স্বামীর বিবাহধীন তাহলে তার 'খিয়ারে ইত্ক' (**خيار عتق**) হাসিল হবে না। স্বামী তাকে এক তালাক দেওয়ার পর সে যদি দাসী হওয়ার কথা স্বীকার করে তবে তার এক তালাক দুই তালাকে পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং এরপর তার স্বামী তাকে আর মাত্র এক তালাক দিতে পারবে। স্বামী তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী যদি তার দাসী হওয়ার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাহলে এ অবস্থায়, স্বামী তাকে মাত্র এক তালাক দিতে পারবে। আর ইচ্ছা করলে তাকে ফেরতও নিতে পারবে। এমনিভাবে ইন্দতের অবস্থায়ও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ মহিলা যদি দুই হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার দাসী হওয়ার কথা স্বীকার করে তাহলে তার স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে তৃতীয় হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে **রুজু** তথা ফেরত নিয়ে নিতে পারবে। লকীতপ্রাপ্ত শিশু হিসেবে জানা-গুনা হয়ে যাওয়ার পর মূলতাকিত যদি বলে যে, সে আমার গোলাম তাহলে দলীল-প্রমাণ ছাড়া তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। লকীত সম্পদ রেখে মারা যাক বা সম্পদ ছাড়া, এ অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি দাবী করে যে, সে তার পুত্র তাহলে দলীল-প্রমাণ ছাড়া তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা : কুড়ানো শিশু কোন এক ব্যক্তির হিফযতে আছে এবং সে তার নসবের ব্যাপারেও কোন দাবী করছে না। এমতাবস্থায় কোন মহিলা তার পিতার নাম উল্লেখ না করে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে বলে যে, সে তাকে জন্ম দিয়েছে। ইত্যবসরে ঐ ব্যক্তিও যদি এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার পুত্র, তার বিছানায়ই এর জন্ম হয়েছে। কিন্তু মায়ের নাম উল্লেখ না করে তাহলে তাকে (লকীতকে) এই মহিলার ঔরসে জন্মলাভ করা এই বাদী পুরুষের পুত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। আর এ কথা ধরে নেওয়া হবে যে, এই মহিলা তার বিছানায় এই সন্তানকে জন্ম দিয়েছে। এমনিভাবে হারানোপ্রাপ্ত শিশু যদি এই দাবীকারী পুরুষ বা মহিলার কবজায় থাকে এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলেও তাকে তাদের উভয়ের সন্তান হিসেবে গণ্য করা হবে। এ ক্ষেত্রে **ترجیح بالبر** তথা কবজার কারণে অধিকার দেওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। হারানোপ্রাপ্ত বালক কোন যিম্মী ব্যক্তির কবজায় আছে এবং সে তাকে পুত্র বলে দাবী করছে তারপর কোন মুসলমান তার সপক্ষে মুসলিম সাক্ষী বা যিম্মী সাক্ষী পেশ করলো। এরপর যিম্মী ব্যক্তি তার সপক্ষে মুসলিম সাক্ষী পেশ করলো, এ অবস্থায়

মুসলমান ব্যক্তির উপর যিম্মী ব্যক্তির দাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেননা দখল তার। কাজেই তার পক্ষেই ফায়সালা দেওয়া হবে (তাতার খানিয়া)।

১৪. মাসআলা : হারানোপ্রাপ্ত শিশু বালিগ হওয়ার পর যদি কারো সাথে مولات তথা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তবে তার এ মৈত্রী চুক্তি জায়েয হবে। মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার আগে সে কোন অপরাধ করে থাকলে তার জরিমানা বায়তুল মাল থেকে পরিশোধ করা হবে। এরপর যদি কারো সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তবে তার চুক্তি (ولاة) জায়েয হবে না। লকীত চাই পুত্র সন্তান হোক বা কন্যা সন্তান, মূলতাকিত তার ব্যাপারে বেচাকেনা, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি ধরনের কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। সে শুধুমাত্র তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। এমনকি সে তাকে খাতনাও করতে পারবে না। যদি খাতনা করায় এবং এতে তার জীবন বিপন্ন হয়ে যায় তাহলে তাকে এর জরিমানা পরিশোধ করতে হবে। মূলতাকিত লকীত শিশুকে যেখানে ইচ্ছা স্থানান্তরিত করতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। লকীতে শিশুকে ইজারা দেওয়া মূলতাকিতের জন্য জায়েয নেই। কারাহিয়াত অধ্যায়ে এ কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (তাতার খানিয়া)।

১৫. মাসআলা : লকীতের কাছে কিছু মাল পাওয়া গেছে এবং বিচারক এ মাল থেকে ব্যয় নির্বাহ করার জন্য মূলতাকিতকে হুকুম দিয়েছে। এ অবস্থায় মূলতাকিত যদি এ মাল দ্বারা তার খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ খরিদ করে তবে তা জায়েয হবে। যদি ভুলক্রমে লকীতকে হত্যা করা হয় তবে তার রক্তপণ হত্যাকারীর আকিলা তথা নিকটাত্মীয়ের উপর ওয়াজিব হবে। তারপর প্রদত্ত রক্তপণ বায়তুল মালে জমা হবে। লকীতকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার যার রাষ্ট্রপ্রধান যদি দিয়াতের (রক্তপণ) ভিত্তিতে হত্যাকারীর সাথে আপোষ-মীমাংসা করে নেয় তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেওয়া জায়েয নয়। রাষ্ট্রপ্রধান যদি কিসাসের ভিত্তিতে হত্যাকারীকে হত্যা করার ইচ্ছা করে তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয আছে। মূলতাকিত যদি লকীতের জন্য নিজের মাল থেকে খরচ করে এবং এ ব্যয় যদি বিচারকের নির্দেশ ছাড়া করে তবে এটি নফল হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি বিচারকের আদেশে করে এবং বিচারক যদি তাকে এ কথা বলে থাকে যে, তুমি ব্যয় কর এবং এ ব্যয় তার উপর ঋণ হিসেবে থাকবে এহেন অবস্থায় যদি লকীতের পিতার সন্ধান পাওয়া যায় তবে মূলতাকিত তার পিতার নিকট থেকে তার ব্যাহত অর্থ উসূল করতে পারবে। আর পিতার সন্ধান না পাওয়া গেলে লকীত বালিগ হওয়ার পর তার থেকে উসূল করতে পারবে। পক্ষান্তরে বিচারক যদি তাকে লকীতের জন্য অর্থ ব্যয় করার হুকুম করে কিন্তু এ অর্থ তার উপর ঋণ হিসেবে থাকবে; এ কথা না বলে, তবে শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, যাহিরী রিওয়াযাতে অনুসারে মূলতাকিত তার ব্যয়িত এ অর্থ লকীতের থেকে ফেরত নিতে পারবে না। যাহিরী রিওয়াযাতে যা বর্ণিত হয়েছে তাই বিশুদ্ধতম অভিমত (আল-মুহীত)। হারানোপ্রাপ্ত শিশু বালিগ হওয়ার পর সে যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে, তারপর সে এ স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, সে অমুকের গোলাম এবং তার উপর তার স্ত্রীর মহর পাওনা রয়েছে

অধ্যায় : লকীত (হারানোপ্রাপ্ত সন্তান)-এর বিবরণ

এ মহর পরিশোধ করা তার উপর অপরিহার্য হবে। কিন্তু মহর বাতিল করার ব্যাপারে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। এমনভাবে লকীত বালিগ হওয়ার পর কিংবা কারো নিকট বায়আত গ্রহণ করে কিংবা কারো যামিন হয় অথবা কাউকে কোন কিছু হিবা বা সাদাকা করে তা তার নিকট হস্তান্তর করে দেয় অথবা কোন গোলামকে মুকাতাব বা মুদাক্কর বানায় অথবা কোন গোলাম আযাদ করে, তারপর এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, সে অমুকের গোলাম, তাহলে এ সব চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

অনুচ্ছেদ : লুকাতা (হারানোপ্রাপ্ত মাল)-এর বিবরণ

১. মাসআলা : যে মাল রাস্তায় পাওয়া যায় এবং যার নির্দিষ্ট কোন মালিক জানা নেই একেই লুকাতা (কুড়ানো মাল) বলা হয় (কাফী)। লুকাতা কুড়িয়ে নেওয়ার বিষয়টি দু'ধরনের (১) যদি মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে তা কুড়িয়ে নেওয়া মাল আবশ্যিক (২) যদি পড়ে থাকা মাল নষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকে তাহলে কুড়িয়ে নেওয়া মুবাহ। এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তবে তা কুড়িয়ে নেওয়া উত্তম না ফেলে রাখা উত্তম এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। আমাদের ইমামগণের যাহিরী মাযহাব হচ্ছে, এ জাতীয় মাল কুড়িয়ে নেওয়া উত্তম (মুহিত)। চাই তা (হারানোপ্রাপ্ত মাল) দিরহাম হোক, দীনার হোক, কোন আসবাব সামগ্রী হোক, বকরী হোক, ঘোড়া হোক, উট হোক, গাধা হোক বা খচ্চর হোক। এতে কোন পার্থক্য নেই। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য যদি এ সব মালামাল ময়দানে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কোন জনপদে পাওয়া যায় তবে চতুষ্পদ জন্তু হলে তা পূর্বের অবস্থায় রেখে দেওয়াই উত্তম।

২. মাসআলা : হারানো মাল তুলে নেওয়ার পর এ সম্পর্কে ঘোষণা করানো আবশ্যিক। এ মর্মে ঘোষণা করতে হবে যে, আমি হারানো মাল পেয়েছি অথবা আমার কাছে কিছু কিছু মাল আছে, তোমরা যাদেরকে তা তালাশ করছে বলে শুনবে, আমার নিকট নিয়ে আসবে বা তাকে কথা বলবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যে ব্যক্তি হারানো মাল পেয়েছে সে বাজার এবং বড় রাস্তায় এ পরিমাণ সময় এ মালের সময় এ মালের ব্যাপারে ঘোষণা করবে বা করাবে যে, তার মনে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এই মালের মালিক এর তালাশে আর আসবে না। এটিই সহীহ মতামত (মাজমাউল বাহরায়েন)। হরম এবং হিল্ল উভয় এলাকার লুকাতার হুকুম একই (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় হারানো প্রাপ্ত মালের ব্যাপারে ঘোষণা দেওয়ার পর মূলতাকিত ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে তা আত্মাহুঁ ওয়াস্তে হিফায়ত করবে আবার ইচ্ছা করলে তা সাদাকাও করে দিতে পারবে। এরপর যদি মালের মালিক আসে এবং সাদাকাকে বহাল রাখে তবে সাদাকার সওয়াব সেই প্রাপ্ত হবে। আর সে যদি তা বহাল না রাখে তবে সে ইচ্ছা করলে মূলতাকিত বা মিসকীন ব্যক্তির নিকট থেকে এর জরিমানা আদায় করতে পারবে। যদি তা তাদের হাতে নষ্ট হয়ে যায়। মূলতাকিত জরিমানা আদায় করার পর জরিমানার এই অর্থ সে ফকীর ব্যক্তির নিকট হতে উসূল করে নিতে পারবে না, আর যদি ফকীর ব্যক্তি জরিমানা পরিশোধ করে তাহলে সেও মূলতাকিতের

নিকট হতে জরিমানার এ অর্থ উসুল করে নিতে পারবে না। যদি হারানো প্রাপ্তমাল মূলতাকিত বা মিসকীনের হাতে হব্ব বিদ্যমান থাকে তবে মালিক ব্যক্তি তার মাল তাদের থেকে নিয়ে নিবে (শরহে মাজমাউল বাহরায়ন)।

৩. মাসআলা : কোন হারানোপ্রাপ্ত মাল সম্পর্কে যদি এ কথা জানা যায় যে, এটা কোন যিম্মী ব্যক্তির তাহলে এ মাল সাদাকা করা সমীচীন হবে না। বরং এ মাল বায়তুল মালে জমা করা হবে এবং মুসলমানদের প্রয়োজনে তা ব্যয় করা হবে (সিরাজিয়া)। লুকাতা হিসেবে ব্যক্তির প্রাপ্ত মাল দুই প্রকার হতে পারে (১) এমন মাল যার সম্পর্কে এ কথা জানা আছে যে, এই মালের মালিক তা আর তালাশ করবে না, যেমন বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা খেজুরের আটি, আনারের ছিলকা ইত্যাদি। এ জাতীয় মালামাল উঠিয়ে নিয়ে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া মূলতাকিত ব্যক্তির জন্য জায়েয। কিন্তু মালের মালিক যদি এসব মালামাল জমা করার পর হাতে-নাতে তার নিকট পেয়ে যায় তাহলে তার জন্য জায়েয হবে এগুলো তার নিকট থেকে নিয়ে নেওয়া। শুধুমাত্র জমা করা এবং কুড়ানোর কারণে সে এর মালিক হবে না। 'শরহে কিতাবিল লুকাতা' এর শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা এবং শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুদুরী (র) ও তৎপ্রণীত শরহতে অনুরূপ মতামত বর্ণনা করেছেন (২) এমন মাল যা সম্বন্ধে জানা আছে যে, এর মালিক তা অবশ্যই তালাশ করবে। যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, বিভিন্ন আসবাবপত্র তা কুড়িয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করা এবং পরে ইলান করা জায়েয আছে যাতে তা যথাযথ মালিকের নিকট পৌঁছে যায়। আনারের সিলকা এবং খেজুরের আটি যদি একত্রিত থাকে তবে তাও শেষোক্ত মালের অন্তর্ভুক্ত হবে। নাওয়াযিল গ্রন্থের গসব অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, যদি কোথাও একটি আখরোট পাওয়া যায়, এরপর আবার একটি পাওয়া যায়, এমনি করে যদি আখরোটের সংখ্যা দশে পৌঁছে এবং অবস্থা এমন হয় যে, এর মূল্যও সাব্যস্ত হতে পারে তাহলে এর দুই অবস্থা হতে পারে। যদি আখরোটগুলো একই স্থানে পাওয়া যায় তাহলে তা শেষোক্ত প্রকার মালের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। আর যদি আখরোটগুলো বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় তবে এর হুকুম কি হবে, এ ব্যাপারে মাশাইখের কিরামের মতভেদ রয়েছে। সদরুশ শহীদ (র) বলেন, পসন্দনীয় মতানুসারে এগুলোও দ্বিতীয় প্রকার মালের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪. মাসআলা : সমরকন্দের মুফতীগণের ফাতাওয়া মতে পানিতে লাকড়ী পাওয়া গেলে মূল্যসম্পন্ন হলেও তা নিয়ে ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই। এমনিভাবে যদি প্রবাহমান কোন নদীতে আপেল ও পেয়ারা পাওয়া যায় তবে পরিমাণে বেশী হলে তা তুলে নিয়ে খাওয়াতেও কোন দোষ নেই। গ্রীষ্মকালে গাছের নীচ পড়ে থাকা ফল পাওয়া গেলে ফলের কয়েক অবস্থা হতে পারে (১) যদি গাছ-গাছালি এবং ফল-ফলাদি শহর এলাকার মাঝে হয় তবে তা খাওয়া জায়েয নয়। কিন্তু যদি স্পষ্টভাবে বা بالعداة তথা দেশ রেওয়াজের মাধ্যমে এ কথা জানা যায় যে, মালিক এ সব ফল-ফলাদি মানুষের জন্য মুবাহ করে দিয়েছে তবে তা খাওয়া জায়েয হবে। ফল-ফলাদি যদি দেয়াল বেষ্টিত কোন বাগানে থাকে এবং তা যদি পচনশীল না হয় বরং সংরক্ষণ করে রাখার মত হয়, যেমন আখরোট ইত্যাদি তবে তা কুড়িয়ে নেওয়া জায়েয হবে না

যতক্ষণ না জানা যায় যে, গাছের মালিক মানুষের জন্য এগুলোকে মুবাহ করে দিয়েছে। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, স্পষ্ট বা ইস্তিবাহ শব্দে ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা না জানা যাওয়া পর্যন্ত তা খাওয়াতে কোন দোষ নেই। এটিই পসন্দনীয় অভিমত। আর গাছ-গাছালি যদি গ্রাম্য এলাকার মধ্যে থাকে এবং ফলগুলো যদি পচনশীল না হয় বরং স্টকে রাখার মত হয় তবে এ জাতীয় ফল কুড়িয়ে আনা জায়েয হবে না। কিন্তু যদি মালিকের অনুমতি জানা থাকে তবে জায়েয হবে। আর ফলগুলো যদি সঞ্চয়ে জমা করে রাখার মত না হয় তাহলে তা কুড়িয়ে আনা জায়েয হবে। যাবত না নিষেধাজ্ঞা জানা যায়। এতে কারোই যদি ফলগুলো গাছের নীচে পতিত অবস্থায় থাকে। পক্ষান্তরে ফল গাছে থাকা অবস্থায় তা যে কোন স্থানেই হোক না কেন মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকেও সেটি ধরা কারো জন্যই জায়েয হবে না। কিন্তু যে স্থানে ফল-ফলাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং মানুষের এ কথা জানা থাকে যে, এখান থেকে সামান্য পরিমাণ ফল খেলে মালিকের কোন কষ্ট হবে না তাহলে এ জাতীয় স্থান থেকে কিছু খাওয়া জায়েয হবে। কিন্তু সাথে করে নিয়ে নিতে পারবে না (মুহিত)।

৫. মাসআলা : হারানোপ্রাপ্ত বস্তু যদি এমন হয় যা এক বা দুই দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর নষ্ট হয়ে যাবে যেমন আঙ্গুরের দানা ইত্যাদি। এ জাতীয় বস্তু যদি স্বল্প পরিমাণ হয় তাহলে তা তৎক্ষণাৎ খেয়ে ফেলবে। চাই মূলতাকিত ব্যক্তি ধনী হোক বা গরীব হোক। আর যদি এর পরিমাণ বেশী হয় তাহলে বিচারকের আদেশক্রমে এ সব বস্তু বিক্রি করে দিয়ে এর মূল্য সংরক্ষণ করে রাখবে। লুকাতা যদি এমন বস্তু হয় যার তত্ত্বাবধানের জন্য টাকা-পয়সা ব্যয় করা আবশ্যিক এহেন অবস্থায় প্রাপ্ত বস্তুটি যদি ইজারা যোগ্য বস্তু হয় তাহলে বিচারকের আদেশক্রমে তাকে ইজারা দিয়ে ইজারার পয়সা থেকে তার খোরপোষের ব্যবস্থা করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি হারানোপ্রাপ্ত বস্তুটি কোন উপকারী বস্তু না হয় এবং একে ইজারা দেওয়ার মত কোন মানুষও না পাওয়া যায়, সর্বোপরি এ আশংকা হয় যে, এর খোরপোষের জন্য যে পয়সা ব্যয় করা হবে তা এর মূল্যকে খেয়ে শেষ করে দিবে তাহলে বিচারক একে বিক্রি করে এর মূল্য হিফাযত করে রাখার জন্য মূলতাকিতকে আদেশ দিবেন (ফাতহুল কাদীর)। তারপর হারানোপ্রাপ্ত বস্তুর মালিক এসে যখন তা চাইবে তখন মূলতাকিত তাকে মানা করবে যাবত না সে ব্যয়িত খরচা তাকে পরিশোধ করে দিবে (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা : মূলতাকিত ব্যক্তি বিচারকের অনুমতি ছাড়া কুড়ানো বস্তুর সংরক্ষণের জন্য যা কিছু ব্যয় করবে তা নফল ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে (কাফী)। আর বিচারকের অনুমতিক্রমে ব্যয় করা হলে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। বিচারক কর্তৃক অনুমতি প্রদানের নিয়ম হল এই যে, তিনি মূলতাকিতকে বলবেন, তুমি খরচ কর; পরে এ টাকা নিয়ে নিবে। যদি বিচারক তাকে খরচের জন্য আদেশ করেন কিন্তু পরে নেওয়ার কথা না বলেন, তাহলে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে না। এটিই বিত্তমত অভিমত (আল-বাহরুর রায়িক)। হারানোপ্রাপ্ত বস্তুটি লুকাতা হওয়ার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ কায়েম না করা পর্যন্ত বিচারক তার খোরপোষ চালিয়ে যাওয়ার জন্য মূলতাকিতকে হুকুম করবেন না। এটিই সহীহ মতামত। যদি মূলতাকিত ব্যক্তি মালে লুকাতার ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হয় তবে

বিচারক মূলতাকিত ব্যক্তিকে শর্ত সাপেক্ষে ব্যয় করার জন্য আদেশ দিবেন। তিনি একদল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সামনে বলবেন, এই ব্যক্তি দাবী করছে যে, এটি হারানো প্রাপ্ত বস্তু। আমি জানি না, এ ব্যাপারে সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। সে আমাকে বলছে, আমি যেন তাকে ব্যয় করে যাওয়ার জন্য হুকুম করি। সুতরাং আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি তাকে এই শর্তে তার ব্যয় বা খোরপোষ চালিয়ে যাওয়ার হুকুম করছি, যদি সে সত্যিই লুকাতা হয়ে থাকে যেমন সে বলছে। তারপর বিচারক তাকে আদেশ দিবেন, যেন সে দুই তিন পর্যন্ত তার খরচাদি চালিয়ে যায় যাতে সময়ের ভেতর এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যদি তার মালিক থাকত তবে অবশ্যই সে বেরিয়ে আসত (তাবয়ীন)। যদি এ সময়ের ভেতর মালিক না পাওয়া যায় তাহলে মূলতাকিতকে হুকুম করা হবে তাকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। বিক্রি করার পর মূলতাকিত এই দুই তিন দিনে যা খরচ করেছে তা তাকে দিয়ে দেওয়া হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৭. মাসআলা : যদি বিচারক নিজে অথবা তার নির্দেশে মূলতাকিত লুকাতা বিক্রি করে ফেলে, তারপর মালিক হাযির হয়। তাহলে সে এর মূল্য ছাড়া আর কিছু পাবে না। আর বিচারকের আদেশ ছাড়াই মূলতাকিত হারানো বস্তুটি বিক্রি করে দেওয়ার পর যদি মালিক এসে হাযির হয় এবং ঐ বস্তুটি যদি ক্রেতার হাতে হুবহু বিদ্যমান থাকে তবে মালিকের ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে বেচাকেনার অনুমতি দিয়ে এর মূল্য নিয়ে নিতে থাকবে। আবার বেচাকেনাকে বাতিল করে মূল বস্তুটিও নিয়ে নিতে পারবে। যদি বিক্রিত বস্তুটিও নিয়ে নিতে পারবে। যদি বিক্রিত বস্তুটি হুবহু বিদ্যমান না থাকে তবে মালিকের ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে বিক্রিকারী ব্যক্তির নিকট থেকে এর জরিমানা উসূল করে নিতে পারবে। এ অবস্থায় যাহিরী রিওয়াযাত অনুসারে বেচাকেনা কার্যকরী হবে। আমাদের অধিকাংশ মাশাইখে কিরাম এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন (মুহীত)। এমতাবস্থায় মূলতাকিতের উপর অপরিহার্য হবে জরিমানা পরিশোধের পর যা অতিরিক্ত থাকবে তা সাদাকা করে দেওয়া (ফাতহুল কাদীর)। আর মালিক ইচ্ছা করলে ক্রেতার নিকট থেকেও জরিমানা উসূল করতে পারবে। তখন ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে মূল্য ফেরত নেবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি বকরী বা উট পেয়েছে। তারপর বিচারক তাকে প্রয়োজনীয় খরচে নির্দেশ দিয়েছেন এমতাবস্থায় পণ্ডটি মারা গেলে মূলতাকিত তার খরচ মালিকের নিকট থেকে নিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি মূলতাকিত অভাবী মানুষ হয় তাহলে ইলান বা ঘোষণা করার পর তার (মূলতাকিতের) জন্য ঐ মাল নিজের কাজে করা জায়েয (আল-মুহীত)। আর মূলতাকিত যদি ধনী মানুষ হয় তাহলে মূলতাকিত এমনি নিজের কাজে ব্যবহার করতে ব্যবহার করতে পারবে না, বরং সে তা কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে সাদাকা করে দিবে। অথবা তা নিজের পিতা-মাতা, সন্তান বা স্ত্রীকে সাদাকা করে দিবে যদি তারা ফকীর হয় (কাফী)। উপরোক্ত মুদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতিক্রমে ধনী মানুষের জন্য ও হারানো প্রাপ্ত মাল নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েয তবে তা তার উপর ঋণ হিসেবে থাকবে (গায়াতুল বয়ান)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি আসবাব সামগ্রী জাতীয় কোন বস্তু লুকাতা হিসেবে পায় কিন্তু এর মালিক খুঁজে না পায় আর সে নিজে খুব অভাবী লোক হয়, একারণে ঐ বস্তুটি বিক্রি করে এর মূল্য নিজের কাজে ব্যবহার করে; তারপর সে কিছু মালামাল প্রাপ্ত হয় তাহলে মুখতার অভিমত অনুসারে সে নিজের জন্য যা ব্যয় করেছে সে পরিমাণ সাদাকা করে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে না (যহীরিয়া)।

১০. মাসআলা : হারানো প্রাপ্ত মাল আমানত হিসেবে গণ্য হবে, যদি সে (মূলতাকিত) ঐ মাল এই উদ্দেশ্যে তুলে নেয় যে, সে তা সংরক্ষণ করে এর মালিক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। এমতাবস্থায় যদি ঐ মাল তার কোন হস্তক্ষেপ এবং তসরুফ ছাড়া অন্য কোন কারণে ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে মালিক যদি তার কথা আমি মালিকের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যই এ মাল তুলে নিয়েছে কে বিশ্বাস করে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। মূলতাকিত ব্যক্তি যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, সে তার নিজের ব্যবহারের জন্যই এ মাল কুড়িয়ে নিয়েছে তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে এ মালের জরিমানা আদায় করতে হবে (যদি সে তা ধ্বংস বা নষ্ট করে ফেলে)। হারানো প্রাপ্ত মাল তুলে নেওয়ার সময় মূলতাকিত যদি কাউকে সাক্ষী না রেখে এবং সে নিজে বলে যে, মালিকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই মাল আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, অথচ মালিক তার এ বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করছে তাহলে ইমাম আবু হানীফা এবং মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ অবস্থায়ও (ধ্বংসের পর) তাকে এর ক্ষতি পূরণ আদায় করতে হবে (ফাতহুল কাদীর)। হারানো প্রাপ্ত মাল কুড়িয়ে নেওয়ার সময় মূলতাকিত ব্যক্তি যদি কাউকে সাক্ষী রাখার মত না পায় অথবা তার যদি এরূপ আশংকা হয় যে, সাক্ষী রাখতে গেলে কোন জালিম ব্যক্তি হয়তো এটিকে নিয়ে যাবে, একারণে সে সাক্ষী বানানোর বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়েছে তাহলে (হালাকতের কারণে) তাকে এ মালের জরিমানা আদায় হবে না। সাক্ষী রাখার মত মানুষ পাওয়া সত্ত্বেও মূলতাকিত যদি কাউকে সাক্ষী না বানায়, ইত্যবসরে ঐ লোকটি চলে যায় তাহলেও তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কেননা সে সাক্ষী রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাক্ষী রাখার বিষয়টি বর্জন করেছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : কোন ব্যক্তি কাউকে সাক্ষী করে বলে বলল যে, আমি হারানো প্রাপ্ত মাল পেয়েছি, কিংবা একটি জীব পেয়েছি অথবা বলল যে, আমার কাছে হারানো প্রাপ্ত কিছু মালামাল আছে, যাকে তোমরা এসব তালাশ করতে ওনবে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে। তারপর মালের প্রকৃত মালিক যখন তার নিকট আসল তখন সে বলল, সেটি তো হালাক (ধ্বংস) হয়ে গেছে তাহলে তার কথা বিশ্বাস করা হবে এবং তার উপর কোন ক্ষতি পূরণ ওয়াজিব হবে না। কেউ দুটি বা তিনটি হারানো বস্তু পেয়েছে, তারপর সে লোকদেরকে বলল, তোমরা কাউকে হারানো প্রাপ্ত তালাশ করতে ওনতে পেলো আমার নিকটে পৌঁছে দিবে। এতেই সবগুলোর পক্ষ হতে ইলান হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় এ সব মালামালের সবগুলোই যদি তার নিকট ধ্বংস হয়ে যায় তাহলেও তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। সমরকন্দবাসী ফকীহগণের মতে কেউ যদি রাস্তায় বা মাঠ-ময়দানে হারানো প্রাপ্ত কোন কিছু পায় এবং তা কুড়িয়ে নেওয়ার সময়

কাউকে সাক্ষী রাখার মত না পায় তাহলে যখনই কাউকে সাক্ষী বানানোর মত পাবে তখনই তাকে সাক্ষী বানাবে। এরূপ করার পর তার উপর আর কোনরূপ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। মূলতাকিত ব্যক্তি যদি হারানোপ্রাপ্ত বস্তুর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে বা মালিক বা মালিক চাওয়ার পর সে যদি তা প্রত্যর্পণ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তারই কেবল তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা : কোন ব্যক্তি বলল, আমি হারানো বস্তু পেয়েছি। কিন্তু তা আমার হাতে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ মালিকের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্তেই আমি তা কুড়িয়ে নিয়েছিলাম এবং এটিকে যে লুকাতা এ ব্যাপারে আমি সাক্ষীও রেখেছিলাম। এদিকে মালের মালিক বলছে যে, এটি লুকাতা নয়। বরং আমি নিজেই এটি তার নিকট রেখেছি। ইচ্ছা ছিল, পরে এগুলো তার থেকে নিয়ে নিব। এরূপ অবস্থায় যে স্থানে ঐ বস্তুটি পাওয়া গেছে সে স্থানের প্রতি দেখতে হবে। যদি স্থানটি এমন হয় যে, ঐ স্থানের কাছে কোন মানুষ নেই অথবা সেটি একটি রাস্তা তাহলে মূলতাকিতের কথাই গ্রহণ যোগ্য হবে। যদি সে হলফ করে বলে যে, ঐ বস্তুটি তার নিকটেই নষ্ট হয়েছে। আর যদি মূল ঘটনাটি জানা না যায় তাহলে মূলতাকিত ব্যক্তিই এর যামানাত দিতে হবে। যদি মূলতাকিত বলে, আমি এটিকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছি, আর মালিক বলে, তুমি এটি আমার বাড়ি থেকে নিয়েছো তাহলেও মূলতাকিতকে এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)।

১৩. মাসআলা : মূলতাকিত যদি কারো বাড়িতে, দহলিজে অথবা কোন খালি ঘরে হারানো মাল পায় তাহলে সে এ মালের যামিন হবে, যদি এর মালিক বলে, আমি এ মাল এখানে রেখেছিলাম ফিরে এসে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আসল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি মালিক বলে, তুমি আমার মাল গসব করে নিয়ে গেছো। আর মূলতাকিত বলে, আমি এটিকে লুকাতা হিসাবে নিয়েছি এবং আপনার নিকট পৌঁছানোর উদ্দেশ্যেই নিয়েছি তাহলে কোনরূপ তফসিল ব্যতিরেক এ সম্বন্ধে বিধান হল, মূলতাকিত ব্যক্তি এ মালের যামিন বলে গণ্য হবে। হারানো প্রাপ্ত মাল কোন মুসলমানের হাতে আছে। এমতাবস্থায় আর কোন ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য-প্রমাণসহ মাল দাবী করে তাহলে মূলতাকিত বিষয়টি স্বীকার করুক বা নাকরুক তার এ কথা বলার অধিকার আছে যে, বিচারকের মাধ্যমে ছাড়া আমি এ মাল তোমার কাছে হস্তান্তর করব না। এ অবস্থায় ঐ মাল যদি মূলতাকিতের নিকট নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার উপর কোনরূপ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। হারানোপ্রাপ্ত মাল কোন মুসলমানের হাতে আছে। এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি এ মালের দাবী করে এবং এ ব্যাপারে দুজন কাফিরকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করে তাহলে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। হারানোপ্রাপ্ত মাল যদি কোন কাফিরের হাতে থাকে এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে কiyাসের দাবী অনুসারে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। কিন্তু ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি হারানো প্রাপ্ত মাল কাফির ও মুসলমানের হাতে থাকে তাহলে কiyাস অনুসারে তাদের (দুই কাফিরের) সাক্ষী ঐ দুই ব্যক্তির কারো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে কাফির ব্যক্তির উপর এ সাক্ষ্য প্রযোজ্য হবে। অতএব কাফিরের হাতে যে মাল রয়েছে সে মালের ব্যাপারে ফায়সালা দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : যাদদ স্বীকার করেছে যে, এই লুকাতা আমারের। কিন্তু খালিদ ভাব নিজের বলে পেশ করেছে। এ ক্ষেত্রে খালিদের পক্ষেই ফায়সালা দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি লুকাতার দাবী করেছে এবং সে মালের আলামতও বর্ণনা করেছে তাহলে মূলতাকিতের ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে সে কোন ব্যক্তিকে এর যামিন বানিয়ে তার মাল হস্তান্তর করে দিবে। আর ইচ্ছা করলে সে তার নিকট দলীল প্রমাণও দাবী করতে পারবে (সিরাজিয়া)। আলামত বর্ণনা করা পর মূলতাকিত যদি ঐ মাল উক্ত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় অপর কোন ব্যক্তি এসে যদি এ মালের দাবী করে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তাহলে হারানোপ্রাপ্ত মাল প্রথমোক্ত ব্যক্তির হতে হব্ব বাকী থাকলে মালিক তার থেকে এ মাল নিয়ে নিবে যদি সে ব্যাপারে সক্ষম হয়। এ অবস্থায় যে এ মাল উঠিয়ে নিয়েছে, তার উপর কোন দায় সাব্যস্ত হবে না। যদি প্রথম ব্যক্তির এ মাল নষ্ট হয়ে যায় অথবা মালিক যদি এ মাল মূলতাকিতের নিকট উসূল করে নিতে সক্ষম না হয় তাহলে মালিকের ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে সে মূলতাকিত ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ উসূল করতে পারবে। আর ইচ্ছা করলে প্রত্যর্পণকারীর নিকট থেকেও ক্ষতিপূরণ উসূল করতে পারবে। “আল কিতাব” গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদি মূলতাকিত ব্যক্তি বিচারকের ফায়সালা অনুসারে মালিকের নিকট মাল হস্তান্তর করে তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর ফায়সালা ব্যতিরেকে মাল হস্তান্তর করা হলে হস্তান্তরকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ উসূল করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা : মূলতাকিত যদি স্বীকার করে যে, এই লুকাতা অমুকের, তারপর বিচারকের ফায়সালা ছাড়াই তা দিয়ে দেয়, তারপর অন্য কেউ সাক্ষ্য-প্রমাণসহ তা নিজের বলে দাবী করে তাহলে মালিক তাদের দুজনের যে কোন একজনের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ উসূল করতে পারবে। আর যদি বিচারকের ফায়সালা সাপেক্ষে মাল হস্তান্তর করে তবে এক রিওয়াযাত মুতাবিক মালিক তার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না। কেউ কেউ বলেছেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। আর ফাতাওয়াও এর উপরই (সিরাজিয়া)।

১৬. মাসআলা : কোন ব্যক্তি হারানোপ্রাপ্ত মাল তুলে নিয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল, এ বিষয়ে ইলান করে তা প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। তারপর সে তা না করে ঐ মাল পুনরায় সেখানেই রেখে দিল যে স্থান থেকে সে নিয়েছিল। এমতাবস্থায় এর বিধান কি হবে এ সম্পর্কে “আল কিতাব” এর মাঝে উল্লেখ আছে যে, এই ব্যক্তির উপর কোনরূপ ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য হবে না। বরং সে এর থেকে মুক্ত থাকবে। তবে সে হারানোপ্রাপ্ত মালের স্থান ত্যাগ করে আবার পুনরায় সেখানে এসেছে, নাকি স্থান ত্যাগ না করে আবার সেখানে এসেছে, এ বিষয়ে এখানে তফসিল নেই। ফকীহ আবু জাফর (র) বলেন, স্থান ত্যাগ করার আগেই সে যদি ঐ স্থানে আসে তাহলে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ আবশ্যিক ন্যস্ত হবে না। আর যদি অন্যত্র চলে যাওয়ার পর আবার ঐ স্থানে ফিরে আসে তাহলে তার থেকে ক্ষতিপূরণ উসূল করা হবে। হাকিম শহীদ (র) ও তৎপ্রণীত মুখতাসার গ্রন্থে এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এ হুকুম তখনই

প্রযোজ্য হবে যদি ইলান করার উদ্দেশ্যে কেউ হারিয়ে যাওয়া মাল কুড়িয়ে নেয়। আর যদি খাওয়ার জন্য মাল কুড়িয়ে নেয় তবে সে ক্ষতিপূরণ আদায় করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না, যাবৎ না তা যথাযথ মালিকের নিকট হস্তান্তর করে দেয়। উপরোক্ত মাসআলার হুকুম ঠিক নিম্ন বর্ণিত মাসআলার হুকুমের অনুরূপই। যেমন কোন ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া একটি ঘোড়া প্রাপ্ত হয়ে এর উপর সওয়ার হন। তারপর সে এর থেকে নেমে গিয়ে সেটিকে আগের স্থানেই রেখে দিল, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে তাকে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। এমনভাবে কেউ যদি হারিয়ে যাওয়া কাপড়প্রাপ্ত হয়ে তা পরিধান করে এবং এরপর তা খুলে অপর পূর্বের জায়গায় রেখে দেয় তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কেউ কাপড় প্রাপ্ত হয়ে তা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরিধান করে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কোন কাপড় প্রাপ্ত হয়ে তা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ব্যবহার না করে যেমন কেউ একটি জামা পেল, তারপর তা কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখল তাহলে ক্ষতিপূরণের দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে না। আংটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ কেউ যদি কনিষ্ঠাস্থলিতে আংটি ব্যবহার করে চাই তা ডান হাতের হোক বা বাম হাতের হোক তারপর সে যদি তা খুলে পূর্বের স্থানে রেখে দেয় তবে এ অবস্থায়ও ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি প্রাপ্ত আংটি কনিষ্ঠাস্থলিতে ব্যবহার না করে অন্য আঙুলে ব্যবহার করে, এরপর সেটি খুলে আবার পূর্বের স্থানে রেখে দেয় তাহলে কোন ইমামের মতেই তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। কেউ যদি কনিষ্ঠাস্থলিতে একটি আংটির উপর প্রাপ্ত আংটিও ব্যবহার করে এবং এ লোকটি যদি তৎদুই আংটি ব্যবহার করা ব্যাপারে সমাজে সুপ্রসিদ্ধ হয় তবে এ ক্ষেত্রেও মতভেদ রয়েছে পক্ষান্তরে সে যদি এরূপ দুই আংটি ব্যবহার না করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ না হয় এবং যদি স্থান ত্যাগ না করেই তা আবার পূর্বের স্থানেই রেখে দেয় তবে কোন ইমামের মতেই তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। এমনভাবে কেউ যদি প্রাপ্ত তরবারিখানা শরীরে লটকায় এবং এরপর তা খুলে আবার পূর্বের স্থানে রেখে দেয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। কেউ যদি শরীরে একটি তরবারি ঝুলায় এবং পরে প্রাপ্ত তরবারিটিও সে স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই শরীরে ঝুলায়, তাহলে একে যথাযথ ব্যবহার বলে গণ্য করা হবে। আর যদি দুটি তরবারি লটকায়, তারপর প্রাপ্ত তরবারিটিও লটকায়, তারপর এটিকে পূর্বের স্থানে রেখে আসে তবে কোন ইমামের মতেই তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা : কবরস্থানে পড়ে থাকা জ্বালানি লাকড়ি কুড়িয়ে নেওয়া জায়েয আছে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তা শুকনা হয়। পক্ষান্তরে তাজা কাঠ হলে তা নিয়ে যাওয়া মাকরুহ। যে মৌসুমে রেশমের কাপড় তৈরি করা হয় সে মৌসুমে যদি রাস্তার মধ্যে তুত গাছের পাতা পড়ে থাকে তাহলে তা তুলে নেওয়া কারো জন্য জায়েয হবে না। নিলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা এটি এমন এক মালিকানা যার দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপকৃত হয়ে থাকে। আর গাছটি যদি এমন হয় যে, এর পাতা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না অর্থাৎ পাতা কাজে লাগানো যায় না। তাহলে এ জাতীয় পাতা উঠিয়ে নেওয়া জায়েয আছে। এক ব্যক্তি রাস্তায় একটি বকরী ফেলে দিল, আরেকজন এর পশম কেটে নিয়ে তা ব্যবহার করতে

পারে। তারপর যদি বকরীর মালিক চলে আসে তাহলে ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে এসব পশম নিয়ে যাওয়া তার জন্য জায়েয হবে। অপর কোন ব্যক্তি মরা বকরীর চামড়া ছিলে দাবাগত করার পর বকরীর মালিক যদি চলে আসে তাহলে তার ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে সে চামড়াটি নিয়ে নিবে এবং দাবাগাতের কারণে এর মূল্য যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা ঐ ব্যক্তিকে ফেরত দিয়ে দিবে (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)।

১৮. মাসআলা : তরমুজের ক্ষেত থেকে তরমুজ তুলে নেওয়া হয়েছে। তারপরও ক্ষেতে কিছু ক্ষেত ঝাড়া তরমুজ রয়ে গেছে। তারপর কেউ এসে এখান থেকে কিছু ক্ষেত ঝাড়া তরমুজ নিয়ে গেল। তাহলে ফকীহ আবু বকর (র)-এর মতে মালিক যদি এসব এ জন্য রেখে দেয় যে, এগুলো যার ইচ্ছা হয় নিয়ে যাক তবে এ জাতীয় তরমুজ নিয়ে যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই (তাতার খানিয়া)। একজন মাতাল মতিভ্রম ব্যক্তি রাস্তায় গুয়ে আছে। ইত্যবসরে তার কাপড় খসে গিয়ে তা রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। অমনি এক ব্যক্তি ঐ কাপড় হিফায়ত করার জন্য তা তুলে নিয়েছে তাহলে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা এটি লুকাতারই অনুরূপ। পক্ষান্তরে কেউ যদি ঐ (মাতাল) ব্যক্তির মাথার নীচে থেকে কাপড় টেনে নেয় অথবা তার হাত থেকে আংটি খসিয়ে নেয় অথবা তার কোমর থেকে ব্যাগ খুলে নেয় বা আস্তিন থেকে দিরহাম বা টাকা-পয়সা খুলে নেয়, উদ্দেশ্য হল, এগুলোর হিফায়ত করা কেননা এগুলো যদি তার কাছে থাকে তবে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে- তাহলে সে এ মালের যামিন হিসাবে গণ্য হবে। যে ঘরে আটা পেষণের যন্ত্র আছে, সে ঘরে চাক্কি ঘূর্ণ্যমান হওয়ার কারণে যদি আশে-পাশে আটা জমে থাকে তাহলে কোন কোন ফকীহ এর মতে মেশিন ঘরের মালিক এই আটার মালিক হিসাবে গণ্য হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, সে এই আটার মালিক হবে না। বরং যে আগে নিতে পারবে সেই এর মালিক হবে। এটিই উত্তম অভিমত।

১৯. মাসআলা : তেল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে সব পরিমাপ পাত্র ব্যবহার করা হয় সে সব পাত্র থেকে বিন্দু বিন্দু করে তেল পড়ে যে পরিমাণ তেল বিক্রেতার পাত্রে জমা হয়; তা দু'ধরনের হতে পারে। পরিমাপ পাত্রের বাইরের দিক থেকে যে তেল ঝরে পড়বে তা তেলী ব্যক্তির বলে গণ্য হবে। কেননা এ তেল বিক্রিত বস্তু নয়। আর তেল যদি পাত্রের ভেতরের দিক থেকে কিংবা ভেতর বাহির উভয় দিক থেকেই ঝরে পড়ে অথবা কোন দিক থেকে ঝরে পড়ছে তা জানা নেই তাহলে এর আবার দু' অবস্থা হতে পারে। যদি তেলী ব্যক্তি তেল মাপার পর সামান্য পরিমাণ তেল খরিদারকে বাড়িয়ে দেয় এবং প্রত্যেকের সাথেই সে এই আচরণ করে তাহলে সেই এর মালিক বলে গণ্য হবে। আর খরিদারদেরকে এভাবে সামান্য কিছু বাড়িয়ে না দেয় তবে এই তেল ব্যবহার করা তার জন্য জায়েয হবে না। সে এই তেল ব্যবহার করতে পারবে না। বরং তা সাদাকা করে দিবে। কিন্তু সে যদি অভাবী হয় তবে ব্যবহার করতে পারবে।

২০. মাসআলা : কেউ যদি গ্রামের রাস্তায় যবাহকৃত কোন উট প্রাপ্ত হয় এবং তাদের প্রবল ধারণা হয় যে, উটের মালিক এটিকে মানুষের মুবাহ করে দিয়েছে অর্থাৎ মানুষের নেওয়ার জন্যই এভাবে রাস্তায় রেখে দিয়েছে তাহলে এটিকে নেওয়া এবং এর গোশত ভক্ষণ করাতে

কোন দোষ নেই। কেউ যদি নিজের উট যবাহ করে তা লুটে নেওয়ার জন্য লোকদেরকে অনুমতি দেয় তবে তা জায়েয আছে। এক ব্যক্তি কিছু চিনি ছড়িয়ে মেরেছে। অমনি তা গিয়ে কোন ব্যক্তির কোলে গিয়ে পড়েছে। সেখান থেকে অপর কোন ব্যক্তি তা নিয়ে গেছে। তবে তা নেওয়া তার জন্য জায়েয হবে যদি সে ব্যক্তি এর জন্য কোল পেতে না থাকে। আর যদি সে এই চিনির জন্যই কোল পেতে থাকে এবং এ অবস্থায় অপর কোন ব্যক্তি তার কোল থেকে চিনি নিয়ে যায় তাহলে যে ব্যক্তি অন্যের কোল থেকে চিনি উঠিয়ে নিয়েছে সে এর মালিক হিসাবে গণ্য হবে না। কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে কিছু দিরহাম দিয়ে হুকুম করে যে, সে যেন এগুলো বিবাহ-শাদীতে ছড়িয়ে দেয়। তারপর সে তা ছড়িয়ে দিল তাহলে এখান থেকে দিরহাম তুলে নেওয়া তার জন্য জায়েয হবে না। যদি আদিষ্ট ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে এসব দিরহাম ছড়িয়ে বা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রদান করে তবে তার জন্য এরূপ করা বৈধ হবে না। এমনিভাবে এর থেকে কিছু নিজের জন্য আটকিয়ে রাখাও জায়েয হবে না। চিনির সুরতে আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য জায়েয আছে; তা নিজের জন্য রেখে দেওয়া। এমনিভাবে তার জন্য জায়েয আছে তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অন্যের নিকট স্থানান্তর করা। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিবে তখন আদিষ্ট ব্যক্তিও তা কুড়িয়ে নিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা : কোন ব্যক্তি ছাদের উপর একটি তশতরি রেখেছে। পরে বৃষ্টি হলে এতে কিছু পানি জমা হল। এক ব্যক্তি এসে সে পানি নিয়ে গেল। অমনি এই দুই ব্যক্তির মাঝে ঝগড়া বেধে গেল। এ অবস্থায় দেখতে হবে যদি তশতরির মালিক পানির জন্যই এটিকে রেখে থাকে তবে সেই এই পানির মালিক হবে। কেননা এ পানি সে-ই সংরক্ষণ করেছে। আর যদি সে এ উদ্দেশ্যে তশতরি না রেখে থাকে তবে যে ব্যক্তি পানি উঠিয়ে নিয়েছে সে-ই এই পানির মালিক হিসাবে গণ্য হবে। কেননা এটা এমন মুবাহ পানি যা সংরক্ষিত নয়। দুইব্যক্তির (যেমন রফিক ও ফারুক)। প্রত্যেকেরই একটি করে বরফ ঘর বা ফ্রিজ আছে। তাদের একজনে যদি অপরজনের বরফ ঘর থেকে বরফের একটি টুকরা নিয়ে নিজের বরফ ঘরে রেখে দেয় তাহলে দেখতে হবে; যদি **ماخوذ منه** (যার বরফ ঘর থেকে বরফ নেওয়া হয়েছে) অর্থাৎ রফিক যদি এ স্থানটি বরফ জমা হওয়ার জন্য বানিয়ে থাকে; এবং এ জায়গাটির অবস্থা এমন যে, এতে বরফ কায়দা করে জমা করার প্রয়োজন হয় না তাহলে **ماخوذ منه** এর জন্য জায়েয হবে **اخذ** অর্থাৎ ফারুকের থেকে তা নিয়ে নেওয়া। যদি **اخذ** ফারুক এ বরফকে অন্য বরফের সাথে মিলিয়ে না থাকে আর যদি অন্য বরফের সাথে মিশ্রিত করে ফেলে তাহলে মিশ্রিত করার দিন এর যা মূল্য ছিল ঐ মূল্য রফিক ফারুকের নিকট হতে নিয়ে নিবে। **ماخوذ منه** অর্থাৎ রফিক যদি এ স্থানটি বরফ জমা হওয়ার জন্য তৈরি করে না থাকে বরং এটি এমন একটি জায়গা যেখানে বরফ এমনিই জমা হয়ে যায় তাহলে বুঝা যায় যে, ফারুক রফিকের আওতাধীন এক স্থান থেকে বরফ নিয়েছে। কিন্তু তার বরফ ঘর হতে বরফ নেয় নি, অতএব, ফারুকই এই বরফের মালিক হবে। আর যদি বরফঘর থেকে নিয়ে থাকে তবে সে 'গাসিব' বলে গণ্য হবে এবং রফিকের বরফ হুবহু রফিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। যদি সে তার নিজের বরফের সাথে অন্যের বরফকে মিশ্রিত না করে থাকে। যদি মিশ্রিত করে ফেলে তাহলে মূল্য ফেরত দিবে (আল্-ফাতাওয়ায়াল কবুরা)।

২২. মাসআলা : কারো জমি থেকে গোবর কিংবা কাটাদার গাছ নেয়াতে কোন ক্ষতি নেই। তদ্রূপ কারো জমি থেকে ঘাস কেটে অথবা গম, বাজরা ইত্যাদি শস্যের শীষ কুড়িয়ে নেয়াতে অসুবিধা নেই, যদি মালিক তা এমনিই ফেলে রাখে। কেননা তার এভাবে ফেলে রাখাটা মুবাহ করে দেওয়ার দলীল। কেউ কেউ বলেন, যদি এ ভূমি ইয়াতীমদের হয় এবং অবস্থা এমন হয় যে, এসব জিনিস টোকানোর জন্য যদি কাউকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মজদুর নিয়োগ করা হয় এবং তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করার পরও কিছু পয়সা অবশিষ্ট থেকে যায় তাহলে এসব জিনিস জমিতে ফেলে জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে যদি শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ের পর কোন পয়সাই বাকী না থাকে অথবা এমন সামান্য বাকী থাকে যা দ্বারা মানুষ কোন কাজ করার সংকল্প করে না তাহলে এ জাতীয় জিনিস ফেলে রাখাতে কোন দোষ নেই এবং অপরের জন্য তা কুড়িয়ে নেওয়াতেও কোন অসুবিধা নেই। একটি খালি জমি-যাতে কোন ফসল এবং ইমারত নেই। এ জাতীয় জমিতে যদি জমির আশ-পাশের লোকের মাটি, গোবর ও বালি ফেলে রাখে এবং বিপুল পরিমাণে রাখে তাহলে দেখতে হবে যে, যদি এসব জিনিসের মালিকগণ এভাবেই এতে এসব কিছু ফেলে রাখে, আর জমির মালিকও এ কাজের জন্যই এই জমি তৈরি করে রাখে তাহলে ভূমির মালিকই এসবের মালিক বলে গণ্য হবে। আর ভূমির মালিক যদি এ কাজের জন্য ভূমিটি তৈরি না করে থাকে তাহলে যে ব্যক্তি আগে তা তুলে নিতে পারবে সেই এর মালিক হিসাবে গণ্য হবে।

২৩. মাসআলা : একটি বন্য কবুতর কোন ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশ করে সেখানে (বাসা বানিয়ে) বাচ্চা ফুটিয়েছে। তারপর অপর কোন ব্যক্তি এসে ঐ বাচ্চা নিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় দেখতে হবে; যদি বাড়ির মালিক বাড়ির দরজা এবং দেয়ালের ছিদ্র বন্ধ করে দিয়ে থাকে তবে বাড়ির মালিকই এর মালিক হিসাবে গণ্য হবে। যদি বাড়ির মালিক এসব ব্যবস্থা না করে তাহলে যে ব্যক্তি তা প্রথমে নিতে পারবে সেই এর মালিক বলে গণ্য হবে। যদি কারো নিকট একটি কবুতর থাকে, এরপর আরেকটি কবুতর এসে সেখানে বাচ্চা দেয় তাহলে মাদী কবুতরের মালিক এসব বাচ্চার মালিক হবে। মানুষের ক্ষতি করলে কবুতরকে আটকিয়ে রাখা জায়েয আছে। কেউ যদি কোন গ্রামে কবুতরের খামার করে তবে তার জন্য উচিত হবে এগুলোকে এখানেই সংরক্ষণ করা এবং এগুলোর দানা-পানির ব্যবস্থা করা। দানা-পানি ছাড়া এগুলোকে রাখা যাবে না। এতে অন্য মানুষের ক্ষতি হবে। যদি গৃহপালিত কবুতরের সাথে আরো কিছু কবুতর এসে মিলিত হয় তবে গৃহপালিত কবুতরের মালিকের জন্য উচিত হবে না, এগুলোকে ধরা। যদি ধরে তবে উচিত হবে এর মালিক তালাশ করে তার নিকট পৌঁছে দেওয়া। যদি না ধরে এবং এসব কবুতর তার নিকটে বাচ্চা দেয় আর ঐ মাদী কবুতরটি যদি অন্যের হয় তাহলে বাড়ির মালিক বাচ্চাগুলো ধর-পাকড় করতে পারবে না। কেননা এ বাচ্চাগুলো অন্যের, তার নয়। আর মাদী কবুতরটি যদি বাড়ির মালিকের হয় এবং নর কবুতরটি অন্যের হয় তাহলে বাচ্চাগুলো বাড়ির মালিকের বলে গণ্য হবে। কেননা মাদী কবুতর যার সে-ই ডিম এবং বাচ্চার মালিক হবে। যদি এ কথা জানা না থাকে যে, কবুতরের এ খামারে অপরের কোন নর কবুতর আছে তাহলে তার কোন গুনাহ হবে না (খায়ানাতুল মুফতিয়ীন)।

২৪. মাসআলা : গ্রাম বা শহরে কেউ কোন বাজ বা এ জাতীয় পাখি পাকড়াও করার পর সে তার পায়ে চামড়া, খোসা বা বুমুর দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল যে, এটি একটি গৃহপালিত পাখি তাহলে তার জন্য উচিত হবে। এ মর্মে ইলান করে, একে তার মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া। এমনভাবে কেউ যদি গলায় রশি বাধা কোন হরিণ পাকড়াও করে তবে সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (আল-মুহীত)। কেউ যদি নির্দিষ্ট কয়েক বছরের মেয়াদে একটি বাড়ি **عقد مقاطع**-এর ভিত্তিতে গ্রহণ করে, তারপর সে তাতে বসবাস করে এবং তাতে বহু গোবর জমা হয়, জমা করে **مقاطع** ব্যক্তি তাহলে শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র)-এর মতে এই গোবর ঐ ব্যক্তির বলে গণ্য হবে যে এই বাড়ি এই কাজের জন্য তৈরি করেছে। যদি সে বাড়িটিকে এ কাজের জন্য তৈরি না করে তবে যে অগ্রে তা নিতে পারবে সেই এর মালিক হিসাবে গণ্য হবে। কাযী আবু আলী সাগদী (র) বলেন, যে আগে নিতে পারবে সেই এর মালিক হবে যদিও সে বাড়িটিকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করেনি। এমনকি তিনি বলেছেন যে, যদি বেষ্টনী দেয়াল তৈরি করে এবং তার ভেতরে জীব-জানোয়ারের মল ত্যাগ করার ব্যবস্থা রাখে তবে যে ব্যক্তি ঐ গোবর নিতে পারবে সেই এর মালিক হবে।

২৫. মাসআলা : এক ব্যক্তির একটি বাড়ি আছে। সে তা ইজারা দিয়ে থাকে। তারপর এক ব্যক্তি উট নিয়ে এসে তা তার বাড়ির ভেতর বাঁধল। এতে তার বাড়ির ভেতর অনেক গোবর জমা হল। এ সম্বন্ধে ফকীহগণ বলেন; যদি বাড়ির মালিক এ কাজের জন্য তার বাড়িটিকে মুবাহ করে দেয় এবং নিজের জন্য গোবর জমা করার চিন্তা তার না থাকে তাহলে যে তা আগে নিতে পারবে সেই এসবের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। কেননা এগুলো তো মুবাহ জিনিস। আর যদি বাড়ির মালিকের মনে এরূপ খেয়াল থেকে থাকে যে, এখানে গোবর মল ইত্যাদি জমা হোক, তাহলে বাড়ির মালিকই এগুলোর ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। এক মহিলা কোন একস্থানে একটি চাদর বিছাল। তারপর আরেক মহিলা এসে সেস্থানে আরেকটি চাদর বিছাল। এরপর প্রথম মহিলা এসে দ্বিতীয় মহিলার চাদরটি তুলে নিয়ে গেল। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় মহিলার জন্য সমীচীন হবে না। প্রথম মহিলার চাদর দ্বারা কোনরূপ উপকৃত হওয়া। কেননা এরূপ করা অন্যের মালিকানাভুক্ত জিনিস ব্যবহার করার নামান্তর। অগত্যা সে যদি এর দ্বারা উপকৃত হতে চায় তাহলে সে এ চাদরটি সে তার কোন গরীব কন্যাকে এই নিয়্যতে সাদাকা করে দিবে যে, এ সাদাকার সওয়াব এর মালিক মহিলা পাবে যদি সে এ ব্যাপারে রাযী থাকে। এরপর তার কন্যা এ চাদরটি তার মাকে হিবা করে দিবে। তখন তার জন্য এর দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয হবে। কেননা তখন তা লুকাতা হিসাবে গণ্য হবে। আর সে যদি ধনী হয় তাহলে এ চাদর দ্বারা কোনভাবেই আর সে উপকৃত হতে পারবে না। অর্থাৎ ব্যবহার করতে পারবে না। এমনভাবে যদি কারো জুতা বদল হয়ে যায় এবং একজনে নিজের জুতা রেখে দিয়ে অন্যের জুতা নিয়ে চলে যায় তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে।

২৬. মাসআলা : কোন ব্যক্তি হারানো জিনিস পেয়েছে। তারপর তা তার নিকট থেকেও হারিয়ে গিয়েছে। এরপর মালিক তা অপর কারো হাতে দেখতে পেয়েছে। এমতাবস্থায় মালিক

এবং ঐ ব্যক্তির মাঝে কোন রূপ বিবাদ বৈধ হবে না। কোন মুসাফির ব্যক্তি এক অপরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে মারা গেছে। জানা-গুনা তার কোন ওয়ারিশও নেই। এহেন অবস্থায় সে যদি পাঁচ দিরহাম পরিমাণ মাল রেখে মারা যায় এবং বাড়িওয়ালা যদি গরীব মানুষ হয় তবে বাড়িওয়ালার জন্য জায়েয হবে না। তার নিজের এ মাল সাদাকা করে দেওয়া। কেননা এ মাল হারানোপ্রাপ্ত মালের অন্তর্ভুক্ত তার নিজের বাড়ি মেরামত করার জন্য অন্য কারো হাতে স্থানান্তর করল এবং এ কাজের জন্য সে তাকে কিছু টাকা পয়সাও প্রদান করল। ইত্যবসরে সে নিজে উধাও হয়ে গেল। এহেন অবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অধিকার (কর্তব্য) আছে এ মালের হিফায়ত করা। কিন্তু বিচারকের অনুমতি ছাড়া দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য জায়েয নেই এই মালামাল দ্বারা এই বাড়ির মেরামত করা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফকীহ আবুল লাইস সমরকান্দী (র) “উয়ুন” নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কোন ব্যক্তি তার একটি জানোয়ারকে সায়িবা সাব্যস্ত করার পর অপর এক ব্যক্তি এসে তা নিয়ে গেল এবং একে কিছুটা ইসলাহ করল। এরপর জানোয়ারটির মালিক আগমন করল। সায়িবা সাব্যস্ত করার সময় সে যদি বলে থাকে, “আমি এটিকে ঐ ব্যক্তির জন্যই ছাড়ি যে একে গ্রহণ করবে”। তাহলে এ পশুর ব্যাপারে মালিকের কোন অধিকার থাকবে না। আর যদি একথা না বলে থাকে তবে সে এটিকে নিয়ে নিতে পারবে। এমনভাবে শিকার পশু ছাড়ার ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আমাদের মাশায়িখদের কেউ কেউ একথা বর্ণনা করেছেন। যদি এক্ষেত্রে ছাড়নেওয়ালা এবং গ্রহণকারী এই দুজনের মধ্যে মতভেদ হয় তবে হলফের সাথে মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত : আস্-সারাখসী)।

অধ্যায় : পলাতক গোলামের মাসাইল

অধ্যায় : পলাতক গোলামের মাসাইল

১. মাসআলা : কেউ যদি পলাতক কোন গোলামকে ধরে আনতে সক্ষম হয়, তবে তাকে ধরে আনা বড়ই ভাল কাজ (সিরাজিয়া)। তারপর যে ধরে এনেছে, তার ইচ্ছাধিকার রয়েছে, সে নিজে তাকে হিফাযত করবে- যদি হিফাযত করতে সক্ষম হয়। আবার তাকে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছেও হস্তান্তর করতে পারবে। রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট হস্তান্তর করার সময় তিনি তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া গ্রহণ করবেন না। হস্তান্তরের পর রাষ্ট্রপ্রধান তাকে সাজা দেওয়ার নিমিত্তে কারাগারে বন্দী করে রাখবেন এবং বায়তুল মাল থেকে তার খোরপোষের ব্যবস্থা করবেন (তাবয়ীন)। পলাতক গোলামকে যে ব্যক্তি পেয়েছে, তার যেহেতু কতিপয় মাসাইয়ে কিরামের অভিমত অনুসারে ইখতিয়ার রয়েছে, সে ইখতিয়ারের ভিত্তিতে সে যদি তাকে বাদশাহর কাছে হস্তান্তর না করে নিজের কাছে রাখে এবং নিজের পক্ষ থেকে তার খোরপোষের ব্যবস্থা করে তাহলে সে মালিকের নিকট থেকে এর ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিতে পারবে- যদি সে বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুসারে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। অন্যথায় সে তার ব্যয়িত টাকা-পয়সা ফেরত নিতে পারবে না। এটিই পসন্দীয় অভিমত (গিয়াসিয়া)। পথভ্রান্ত বা পথভোলা গোলামের ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, তাকে ধরে আনা উত্তম। আবার কেউ বলেন, তাকে ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। এ জাতীয় গোলামকে ধরে আনার পর রাষ্ট্রপ্রধান তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখতে পারবে না। বরং যদি তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তাকে ইজারা দিয়ে, এ হিসাবে যা পাওয়া যাবে এর দ্বারা তার খোরপোষ চালিয়ে যাবেন (তাবয়ীন)। তাকে বিক্রি করতে পারবে না (খাযানাতুল মুফতিয়ীন) হাকিম শহীদ (র) কাফী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, পলাতক গোলামকে ধরে এনে বাদশাহর কাছে হস্তান্তর করার পর বাদশাহ যদি তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখে, এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি এসে তার দাবী করে এবং এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তার গোলাম তাহলে তিনি তার থেকে এ মর্মে হলফ নিবেন যে, সে তাকে বিক্রি করেনি এবং হিবাও করেনি। তারপর তাকে তার নিকট হস্তান্তর করবে। হাকিম শহীদ (র) বলেন, এ বিষয়ে কাউকে যামিন বানানো আমি পসন্দ করি না। তবে তার ব্যাপারে বিচারক যদি কাউকে যামিন সাব্যস্ত করেন তবে এতে তার কোন দোষ হবে না (গায়াতুল বয়ান)।

১. মুনীবের নিকট হতে গোলাম পালিয়ে যাওয়াকে ٱلْهَيْب বলা হয়। আর যে গোলাম পালিয়ে যায় তাকে পলাতক (ٱلْهَيْب) গোলাম বলা হয়।

২. মাসআলা : পলাতক গোলামকে পালিয়ে যাওয়ার আশংকায় ইজারা দেওয়া জায়েয নেই (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। বিচারকের নির্দেশ ব্যতিরেকেই শুধুমাত্র গোলামের স্বীকারোক্তি এবং আলামত বর্ণনা করার ভিত্তিতে দাবীদার ব্যক্তির নিকট গোলামকে প্রত্যর্পণ করার পর যদি এর কোন মালিক বেরিয়ে আসে তাহলে প্রত্যর্পণকারী (دافع) ব্যক্তিকে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। তারপর সে ۱۰ فروع অর্থাৎ যার নিকট প্রত্যর্পণ করেছে, তার নিকট হতে এ টাকা আদায় করে নিবে (তাতার খানিয়া)। পলাতক গোলামকে ধরে এনে যে ব্যক্তি তাকে তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিবে আমাদের মাযহাবে ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে সে ۱۰ جمل তথা পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে (কাফী)। মুদতে সফর তথা তিন দিনের দূরের পথ থেকে এসে কেউ যদি পলাতক গোলামকে তার মনীবের নিকট প্রত্যর্পণ করে তবে সে চল্লিশ দিরহাম পাবে। যদিও গোলামের মূল্য চল্লিশ দিরহাম থেকে কম হয়। এটি ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মাযহাব।

তাবয়ীন কেউ যদি শহর বা শহরতলী থেকে পলাতক গোলামকে পাকড়াও করে মুনীবের কাছে নিয়ে আসে এবং দূরত্ব যদি মুদতে সফর থেকে কম হয় তবে সে কষ্ট এবং স্থানের দূরত্বের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক পাবে। সহীহ্‌ অভিমত অনুসারে এ অবস্থায় رضى (স্বল্প পরিমাণের মজুদদারী) ওয়াজিব হবে (আল-ফাতাওয়াল গিয়াসিয়া)। رضى ওয়াজিব হওয়া অবস্থায় راد প্রত্যর্পণকারী) এবং مودوع عليه (যার কাছে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে) পরস্পর মিলে যদি কোন মালের উপর সন্ধি করে নেয় তবে راد-এর জন্য তা জায়েয আছে। যদি তারা উভয়ে বিচারকের নিকট মামলা দায়ের করে তবে বিচারক স্থানের দূরত্ব হিসাবে رضى

৩. মাসআলা : আসল গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেছেন, সফরের দূরত্বের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নাবালিগকে প্রত্যর্পণ করা এবং বালিগকে প্রত্যর্পণ উভয়ই সমান। অর্থাৎ বালিগ নাবালিগ যে কোন বয়সের পলাতক গোলামকে প্রত্যর্পণ করলেই উপরোক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে। কাজেই যদি তিন দিনের সফরের দূরবর্তী পথ থেকে এসে কোন গোলাম প্রত্যর্পণ করা হয় তবে প্রত্যর্পণকারী ব্যক্তি চল্লিশ দিরহাম পাবে। আর যদি তিন দিনের কম দূরবর্তী স্থান থেকে এসে গোলাম প্রত্যর্পণ করা হয় তাহলে وضخ পাবে। নাবালিগের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে বালিগের ক্ষেত্রে এর থেকে বেশী পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে। যদি বালিগ গোলামকে নিয়ে আসতে অধিক টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয়ে থাকে। উপরে না-বালিগের যে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, তা ঐ নাবালিগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি সে পলায়ন করার বিষয়টি বুঝে। পক্ষান্তরে নাবালিগ যদি এমন হয় যে, সে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি বুঝেই না তাহলে সে পথহারা (ضال) বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি কোন পথহারা ব্যক্তিকে তার মালিকের কাছে নিয়ে আসে সে কোন পারিশ্রমিকের অধিকারী হয় না। কাজেই এই ব্যক্তিও কোন পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হবে না। কেউ যদি পলাতক কোন দাসীকে তার সন্তানসহ প্রত্যর্পণ করে তবে সে একটি পারিশ্রমিকই প্রাপ্ত হবে। কেননা এ বাচ্চা তার মায়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং তার তাবে (تابع)। আর বাচ্চা যদি বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সী হয়ে থাকে তবে এ অবস্থায় আশি দিরহাম ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা : যদি দু' ব্যক্তির শরীকী গোলাম পলায়ন করে তবে দেয় পারিশ্রমিক তাদের হিস্যা অনুসারে তাদের উপর ওয়াজিব হবে। যদি দু'মুনীবের একজন উপস্থিত এবং অপরজন অনুপস্থিত থাকে তবে পূর্ণ পারিশ্রমিক পরিশোধ না করে হাযির ব্যক্তি ঐ গোলাম গ্রহণ করতে পারবে না। পূর্ণ পারিশ্রমিক পরিশোধ করা অবস্থায় সে ইহসানকারী (مطوع) বলে গণ্য হবে না। গোলাম এক ব্যক্তির, কিন্তু প্রত্যর্পণকারী হল দুই ব্যক্তি, তাহলে তারা সমান হারে পারিশ্রমিক পাবে (আল-মুহীত)। মুনীব একজন, কিন্তু পলাতক গোলামের সংখ্যা হল দুই তাহলে এ ক্ষেত্রে মুনীবের উপর দুটি পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে (শরহুত তাহাবী)।

৫. মাসআলা : পলাতক গোলাম বন্ধকের গোলাম হলে পারিশ্রমিক বন্ধকগ্রহীতার উপর ওয়াজিব হবে। বন্ধকদাতার জীবদ্দশায় এবং তার মৃত্যুর পর গোলাম প্রত্যর্পণ করা সবই সমান। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে; যদি গোলামের মূল্য ঋণের সম পরিমাণ বা কর্ম হয়। যদি গোলামের মূল্য ঋণের তুলনায় বেশী হয় তবে ঋণের আনুপাতিক হার অনুসারে পারিশ্রমিক বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতা যে পরিমাণ ঋণ দিয়েছে সে হিসাবে পারিশ্রমিকের বেশী পরিমাণ তার উপর বর্তাবে। আর যা বাকী থাকবে তা বর্তাবে বন্ধকদাতার উপর (হিদায়া)। গসবকৃত গোলাম যদি গাসিবের হাত থেকে কোথাও পালিয়ে যায় তবে পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে গাসিবের উপর। পলাতক গোলাম যদি এমন হয় যে, এর খিদমতের অধিকারী এক ব্যক্তি এবং যাতের মালিক অপর ব্যক্তি তাহলে খিদমতের অধিকারী ব্যক্তির উপর পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে। যদি খিদমতের মুদতের মধ্যে কোন রূপ কর্মী থাকে তবে খিদমতের অধিকারী ব্যক্তি গোলামের মালিক ব্যক্তির নিকট থেকে উক্ত পরিমাণ পাওনা আদায় করে নিবে। অথবা পারিশ্রমিকের অর্থ পরিশোধ করার লক্ষ্যে উক্ত গোলামকে বিক্রি করে দেওয়া হবে। পলাতক গোলামকে যে ব্যক্তি ধরে আনবে তার জন্য জায়েয আছে; এ গোলামকে আটক করে রাখা পারিশ্রমিক পুরাপুরিভাবে আদায় না হওয়া পর্যন্ত। “পারিশ্রমিক না দেওয়া পর্যন্ত পলাতক গোলামকে আটকিয়ে রাখার ব্যাপারে” বিচারক কর্তৃক ফায়সালা দেওয়ার পর এবং বিচারকের আদালতে এ বিষয়ে মুকাদ্দমা দায়ের করার পূর্বে উক্ত গোলাম যদি সে ব্যক্তির হাতে (যে তাকে ধরে এনেছে) মারা যায় তাহলে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না এবং কোন পারিশ্রমিক অপরিহার্য হবে না। যে ব্যক্তি পলাতক গোলামকে ধরে এনেছে সে যদি গোলামের মুনীবের সাথে বিশ দিরহাম পারিশ্রমিক দেওয়ার উপর পরস্পর আপোষ মীমাংসা করে তবে তা জায়েয আছে। যদি পঞ্চাশ দিরহামের উপর আপোষ মীমাংসা করে, অথচ সে এ কথা জানে না যে, সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক চল্লিশ দিরহাম হয়ে থাকে— তাহলে চল্লিশ দিরহাম পর্যন্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হবে। আর অতিরিক্ত দশ দিরহামের কথাটি বাতিল বলে গণ্য হবে (আল-মুহীত)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে একটি গোলাম হিবা করেছে। তারপর মোহুব-এর নিকট থেকে সে গোলাম পালিয়ে গিয়েছে। এরপর অপর কোন ব্যক্তি তাকে ধরে এনেছে তাহলে তার পারিশ্রমিক মোহুব-এর উপর ওয়াজিব হবে। যদিও মোহুব-এর নিকট গোলামকে প্রত্যর্পণ করার পর হিবাকারী ব্যক্তি হিবা থেকে রুজু করে তবুও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (কাফী)।

৬. মাসআলা : যদি মুদাববার বা উম্বু ওয়ালাদকে মুনীবের জীবদ্দশায়ই ধরে এসে প্রত্যর্পণ করা হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও পারিশ্রমিক প্রদান করা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি তারা মুনীবের নিকট পৌঁছার পূর্বেই মুনীব মারা যায় তাহলে পাকড়াও করে আনয়নকারী ব্যক্তির জন্য কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। ব্যবসায়ের জন্য অনুমতি প্রদত্ত গোলাম যদি পালিয়ে যায় এবং কেউ যদি তাকে ধরে এনে প্রত্যর্পণ করে তবে তাকেও পারিশ্রমিক দিতে হবে। মুকাতাব গোলাম পালিয়ে যাওয়ার পর কেউ যদি তাকে ধরে এনে তার মুনীবের নিকট হস্তান্তর করে তবে সে কিছুই পাবে না (আল-জাওহারা তুন নায্যার)। জামিউল জাওয়ামি

গ্রন্থে উল্লেখ আছে; দু' ব্যক্তি পলাতক কোন গোলামকে ধরে এনেছে। তারপর তাদের একজন এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করেছে যে, সে তাকে তিন দিন সফরের দূরবর্তীকাল থেকে ধরে এনেছে এবং অপরজন এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করেছে যে, সে তাকে দুই দিনের দূরবর্তী পথ থেকে ধরে এনেছে, এমতাবস্থায় মুনীবের উপর ওয়াজিব হবে তাদেরকে প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের পারিশ্রমিক পুরাপুরিভাবে প্রদান করা এবং এ পারিশ্রমিক তাদের মাঝে সমান হারে বন্টন করা হবে। আল-ইয়ানাবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে; গোলাম যদি কোন অপরাধ করে পলায়ন করে তবে এর ফায়সালার বিষয়টি মুনীবের ইখতিয়ারের উপর নির্ভরশীল হবে। মুনীব যদি মুক্তিপণ দেওয়া ইখতিয়ার করে তবে পারিশ্রমিক প্রদান করা তার উপরই ওয়াজিব হবে। আর মুনীব যদি অপরাধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে স্বয়ং গোলামকেই হস্তান্তর করে তবে পারিশ্রমিক ওলীয়ে জিনায়েত' এর উপর ওয়াজিব হবে।' গোলাম যদি ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত হয় অথচ সে তিজারতী ঋণে পূর্ণবেষ্টিত এবং একেবারে নিমজ্জিত তাহলে পারিশ্রমিক প্রদান করা মুনীবের উপর ওয়াজিব হবে। মুনীব যদি পারিশ্রমিক দিতে অস্বীকার করে তাহলে পারিশ্রমিক পরিশোধের নিমিত্তে এই গোলামকে বিক্রি করে দেওয়া হবে। বিক্রি করার পর যদি কিছু টাকা বেঁচে থাকে তবে তা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা হবে। জামে' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যায়দ তাঁর গোলামকে আমরের নিকট অদীআত (আমানত) রেখেছে তারপর ঐ গোলাম আমরের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছে। তারপর কোন ব্যক্তি তাকে ধরে এনে আমরের নিকট হস্তান্তর করলে সে তার পারিশ্রমিক আদায় করে দিল, তাহলে সে এ ব্যাপারে مذبذب তথা নফল সাদাকাকারী বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ টাকা সে আর যায়দের নিকট থেকে ফেরত পাবে না। জামে' গ্রন্থে একথাও উল্লেখ আছে যে, যদি গোলাম পালিয়ে গিয়ে কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে অথবা পালিয়ে যাওয়ার পর সে যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তারপর কেউ যদি তাকে ধরে নিয়ে আসে এবং তার নিকট থাকা অবস্থায়ই যদি তাকে হত্যা করা হয় তাহলে সে কোন পারিশ্রমিক পাবে না। জামে সাগীর গ্রন্থে এও বর্ণিত আছে, যদি পলাতক গোলাম খেফতারকারীর কবজায় থাকা অবস্থায় কোন জিনায়েত (অপরাধ) করে কিংবা কারো কোন মাল নষ্ট করে আর এ কারণে তাকে হত্যা করা হয় বা ওলীয়ে জিনায়েতের নিকট হস্তান্তর করা হয় কিংবা বিক্রি করে দেওয়া হয় তাহলে খেফতারকারী ব্যক্তি পারিশ্রমিকের হকদার হবে না। উক্ত গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, পলাতক গোলাম খেফতারকারীর ব্যক্তির নিকট থাকা অবস্থায় যদি ভুলক্রমে কাউকে হত্যা করে বা কারো মাল নষ্ট করে, তারপর মুনীব এ সম্বন্ধে জ্ঞাত না হয়ে খেফতারকারীকে পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দেয়, এরপর জিনায়েত বদলায় গোলামকেও হস্তান্তর করে দেয় তাহলে সে পরিশোধকৃত পারিশ্রমিক ফেরত নিয়ে নিবে যদি গোলামের মূল্য অপরাধের (জরিমানার) সমপরিমাণ হয়। পক্ষান্তরে যদি গোলামের মূল্য জরিমানার তুলনায় বেশী হয় তাহলে জিনায়েতের হিসাব অনুসারে পারিশ্রমিকের টাকা থেকে কিছু টাকা সে ফেরত নিয়ে নিবে চাই সে গোলামের মূল্য থেকে বা তার ঋণ থেকে বা জিনায়েতের টাকা থেকে এ পারিশ্রমিক পরিশোধ করুক। এতে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না (তাতার খানিয়া)।

১. যাকে হত্যা করেছে বা যার অঙ্গহানি ঘটিয়েছে তার ওলী বা অভিভাবককে ولي الجناية বলে।

কেউ যদি নিজ পিতা, ভাই বা কোন নিকটাত্মীর গোলামকে ধরে এনে তাকে তার মনীবে নিকট প্রত্যর্পণ করে এবং সে যদি গোলামের মনীবের পরিবার ভুক্ত মানুষ হয় তবে সে পারিশ্রমিকের হকদার হবে না। আর সে যদি গোলামের মনীবের পরিবারভুক্ত না হয় তাহলে সে পারিশ্রমিকের হকদার হবে। কিন্তু পুত্র যদি পিতার পলাতক গোলামকে পিতার নিকট প্রত্যর্পণ করে অথবা স্বামী-স্ত্রীর কোন একজনে যদি অপরজনের গোলামকে প্রত্যর্পণ করে তবে তাদের জন্য আদৌ কোন পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে ওলী যদি ইয়াতীমের কোন গোলামকে ইয়াতীমের নিকট প্রত্যর্পণ করে তবে সেও পারিশ্রমিকের হকদার হবে না (তাবয়ীন)।

৭. মাসআলা : বাদশাহ যদি পলাতক গোলামকে তিন দিনের দূরত্বের পথ থেকে ধরে এনে তাকে তার মনীবের নিকট হস্তান্তর করে তাহলে তিনি কোন পারিশ্রমিক পাবেন না। ফকীহ (র) বলেন; আমরা এ অভিযতটি গ্রহণ করে থাকি। এমনিভাবে চৌকিদার ও কোতওয়াল জাতীর লোকেরা যদি ডাকাত থেকে মালামাল কবজা করে কোন ওয়ারিস মালিকের নিকট পৌঁছিয়ে দেয় তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (গিয়াসিয়া)। তিন দিন সফরের দূরত্ব থেকে পলাতক গোলামকে ধরে আনার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। (১) হয়তো সে মনীবের পুত্র, (২) অথবা সে মনীবের পরিবারভুক্ত। (৩) অথবা সে তার পুত্র নয় এবং পরিবারভুক্তও নয়। যদি সে তার পুত্র বা পরিবারভুক্ত না হয় তাহলে এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত যে, যদি সে مور (যার দে ওয়ারিস)-এর জীবদশায় ঐ গোলামকে ধরে এনে এ অবস্থায়ই তার নিকট ফেরত দেয়। তাহলে তার জন্য পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে। আর সে যদি مور এর মৃত্যুর পর তাকে ধরে এনে হস্তান্তর করে তবে সে কোন পারিশ্রমিক পাবে না। পক্ষান্তরে সে যদি مور এর জীবদশায় তাকে পাকড়াও করে এবং তার জীবদশায়ই তাকে নিজ শহরে নিয়ে আসে, তারপর তার মৃত্যুর পর তাকে হস্তান্তর করা হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মৃত ব্যক্তি অংশীদারদের হিস্যাতে তার জন্য পারিশ্রমিক ওয়াজিব হবে। যদি প্রত্যর্পণকারী ব্যক্তি মনীবের পুত্র হয় অথবা পুত্র নয় কিন্তু তার পরিবারভুক্ত লোক তাহলে সে কোন অবস্থাতেই পারিশ্রমিক পাবে না (যহীরিয়া)।

৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমার গোলাম পালিয়ে গিয়েছে। যদি পাও তাহলে তাকে ধরে আনবে। এ কথা শুনে আদিষ্ট ব্যক্তি বলল, ঠিক আছে। তারপর সে তিন দিন সফরের দূরত্বের পথ থেকে তাকে ধরে মনীবের কাছে নিয়ে আসল তাহলে সে পারিশ্রমিক পাবে না। এক ব্যক্তি তিন দিন সফরের দূরবর্তী স্থান থেকে পলাতক গোলামকে ধরে আনল তার মনীবের নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তারপর তাকে নিয়ে শহরে প্রবেশ করার পর মনীবের নিকট পৌঁছার আগেই সে তার নিকট থেকেও পালিয়ে যায়। এরপর অপর এক ব্যক্তি শহরের ভেতর থেকে তাকে ধরে তার মনীবের নিকট নিয়ে আসে, তাহলে প্রথম ব্যক্তি কিছুই পাবে না। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি তার শ্রম অনুসারে (ضخ) পাবে। যদি দু' ব্যক্তি শহরের ভেতর থেকে ঐ গোলামকে ধরে আনে অথবা একদিন সফরের দূরত্ব থেকে কেউ যদি তাকে ধরে আনে তাহলে প্রথম ব্যক্তি পূর্ণ পারিশ্রমিকের

অর্ধেক পাবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তার কষ্ট ও শ্রম অনুসারে কিছু দেয়া হবে। মুনতাকাহ আছে, পলাতক গোলামকে মনীবের হাওয়ালা করার জন্য তিন দিনের দূরত্ব থেকে ধরে মুন ইত্যবসরে কোন গাসিব তাকে তার থেকে ছিনিয়ে এলে গোলামের মনীবের নিকট ছেঁ দিয়ে তার থেকে পারিশ্রমিক নিয়ে নেয়। তারপর প্রথমে পাকড়াওকারী ব্যক্তি সাক্ষী পেয়ে, সে তাকে তিন দিনের দূরত্ব থেকে ধরে এনেছিল, তাহলে সেও মনীবের নিকট হতে পারিশ্রমিক নিয়ে নিবে। তারপর মনীব গাসিবের নিকট থেকে এর সমপরিমাণ অর্থ নিবে। মুনতাকাহ গ্রন্থে আরো আছে যে, এক ব্যক্তি তিন দিনের দূরত্ব থেকে পলাতক গোলামকে ধরল এবং ধরার জন্য মনীবের হাওয়ালা দেওয়ার নিমিত্তে এক দিন পথ অতিক্রম করল। ইত্যবসরে গোলাম তার থেকেও পালিয়ে মনীবের শহরের দিকে একদিনের পথ অতিক্রম করল। অথচ তার কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা নেই। তারপর পাকড়াওকারী ব্যক্তি তাকে দ্বিতীয়বার পাকড়াও করে তৃতীয় দিনের পথ অতিক্রম করে তাকে মনীবের হাওয়ালা করলো তাহলে সে প্রথম ও তৃতীয় দিনের পারিশ্রমিক পাবে অর্থাৎ পূর্ণ পারিশ্রমিকের তৃতীয়াংশ পাবে। যদি উক্ত গোলাম ঐ ব্যক্তি থেকেও পালিয়ে যায় যে তাকে পাকড়াও করেছে; তারপর মনীব তাকে পেয়ে যায়, অমনি সে তাকে ধরেও নিয়ে যায় অথবা গোলাম পাকড়াওকারী ব্যক্তির নিকট হতে পালিয়ে যাওয়ার পর তার গুণ্ড বুদ্ধির উদয় ঘটে এবং নিজেই মনীবের কাছে ফিরে যায় তাহলে গ্রেফতারকারী ব্যক্তি কোন পারিশ্রমিক পাবে না। যদি গোলাম গ্রেফতারকারী ব্যক্তি থেকে আলাদা হয়ে মনীবের উদ্দেশ্যে রওনা করে; মনীব মনে পালানোর কোন সংকল্প না থাকে তবে প্রথম ব্যক্তি এক দিনের পারিশ্রমিক পাবে। উক্ত গ্রন্থে এ কথাও উল্লেখ আছে; কোন ব্যক্তি পলাতক গোলামকে পাকড়াও করে এবং অন্য কোন ব্যক্তির হাওয়ালা করে বলল, তুমি তাকে তার মালিকের নিকট পৌঁছিয়ে দাও এবং তার থেকে পারিশ্রমিক নিয়ে নিবে তাহলে গ্রেফতারকারী ব্যক্তিই এই পারিশ্রমিকের হকদার হবে।

৯. মাসআলা : 'আসল' গ্রন্থে আছে; জনৈক গোলাম পালিয়ে কোন শহরে চলে গেল। তারপর এক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করল এবং অপর এক ব্যক্তি তার থেকে একে কিনে নিল। তারপর সে এই গোলামকে নিয়ে তার মনীবের কাছে আসল তাহলে সে পারিশ্রমিক পাবে না। তবে খরিদ করার সময় সে যদি কাউকে এ মর্মে সাক্ষী রাখে যে, একে মনীবের হাওয়ালা করার জন্য খরিদ করেছে তাহলে সে পারিশ্রমিক পাবে। আর খরিদকার ব্যক্তি যে অর্থ দিয়ে এ গোলাম খরিদ করেছে সে তা মনীবের নিকট থেকে নিতে পারবে না। চাই তার দেওয়া মূল্যের পরিমাণ কম হোক বা বেশী হোক যে ব্যক্তি পলাতক গোলাম পাকড়াও করেছে সে যদি গোলামকে তার স্বার্থের অনুকূলে ওয়াজিব করা হয় অথবা সে যদি উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ গোলামপ্রাপ্ত হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের যে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এ জাতীয় ব্যক্তি পারিশ্রমিকের হকদার হবে না। জনৈক ব্যক্তি কোন পলায়নকারী গোলামকে গ্রেফতার করেছে। তারপর তাকে তার মনীবের নিকট প্রত্যর্পণ করার জন্য তার কাছে নিয়ে এল। তার উপর মনীবের নয়র পড়তেই মনীব তাকে আযাদ করে দিল। এরপর এই ব্যক্তি

খ্রেফতারকারী ব্যক্তির হাত থেকে পালিয়ে অন্যত্র চলে গেছে তাহলে সে পারিশ্রমিকের হকদার হবে না। মুনীব যদি উক্ত গোলামকে মুদাব্বার ঘোষণা করে এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে খ্রেফতারকারী ব্যক্তি পারিশ্রমিকের হকদার হবে না। খ্রেফতারকারী ব্যক্তি তাকে নিয়ে তিন দিন পথ চলে মুনীবের কাছে পৌঁছার পূর্বে উক্ত গোলাম যদি আবার পালিয়ে যায়, তারপর মুনীব তাকে আযাদ করে দেয় তবে মুনীব খ্রেফতারকারী ব্যক্তির হাত থেকে এই গোলামকে কবজা করেছে, তা সাব্যস্ত হবে না। খ্রেফতারকারী ব্যক্তি গোলামকে মুনীবের কাছে নিয়ে আসার পর সে তাকে তার হাত থেকে কবজা করেছে, এরপর মুনীব উক্ত গোলামকে খ্রেফতারকারী ব্যক্তির জন্য হিবা করে দিয়েছে, তাহলে মুনীবের উপর ওয়াজিব হবে তাকে পারিশ্রমিক প্রদান করা। মুনীব গোলামকে কবজা করার আগেই যদি খ্রেফতারকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হিবা করে দেয় তাহলে সে পারিশ্রমিকের হকদার হবে না। আর যদি কবজা করার পূর্বে মুনীব তাকে খ্রেফতারকারী ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দেয় তবে মুনীবের উপর ওয়াজিব হবে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করা। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, প্রত্যর্পণকারী ব্যক্তি তখনই পারিশ্রমিকের হকদার হবে যদি সে খ্রেফতারের সময় এ বিষয়ে কাউকে সাক্ষী রাখে যে, আমি তাকে তার মুনীবের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্যই খ্রেফতার করেছি। পক্ষান্তরে খ্রেফতারের সময় সে যদি কাউকে সাক্ষী না রাখে তাহলে খ্রেফতারকারী ব্যক্তি গোলামকে মুনীবের নিকট পৌঁছানো সত্ত্বেও পারিশ্রমিকের হকদার হবে না (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা : পলাতক গোলাম যদি পাকড়াওকারীর হিফাজতে মারা যায় অথবা মুনীবের হাওয়ালা করার আগেই পাকড়াওকারীর কাছ থেকে পালিয়ে যায়; এবং সে যদি পাকড়াও করার সময় এ মর্মে সাক্ষীও রাখে যে, মুনীবের হাওয়ালা করার জন্যই সে তাকে পাকড়াও করেছে তাহলে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। এমনভাবে যদি গোলামকে খ্রেফতার করার সময় খ্রেফতারকারী এ কথা বলে যে, এটি পলায়নকারী গোলাম। আমি তাকে পাকড়াও করেছি। তাকে তালাশ করছে, কেউ যদি এমন কোন লোকের সন্ধান পায় তাহলে সে যেন তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এটিও সাক্ষ্য বানানোর মতই। কাজেই এ অবস্থায়ও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, সাক্ষী বানানোর ক্ষেত্রে সাক্ষ্য বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করা শর্ত নয়। সাক্ষ্য বাক্য একবার উচ্চারণ করাই যথেষ্ট। এমনভাবে সাক্ষী বানাতে হবে, যাতে জিজ্ঞেস করার পর উক্ত ব্যক্তি আর এ কথা গোপন করতে না পারে। লুকাতার ক্ষেত্রেও হুকুম অনুরূপই সাক্ষী রাখা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি সাক্ষী না রাখে তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি এ কথা জানা থাকে এ একজন পলাতক গোলাম। পক্ষান্তরে যদি এ কথা জানা না থাকে যে সে একজন পলাতক গোলাম এবং মুনীবও যদি তার পলায়ন করার বিষয়টিকে অস্বীকার করে তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর খ্রেফতারকারী ব্যক্তি ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে এর যামিন হিসাবে গণ্য হবে (যখীরা)।

১১. মাসআলা : কেউ যদি পাকড়াওকারী ব্যক্তির কাছে এসে পলাতক গোলামের মালিকানা দাবী করে এবং গোলামও তা স্বীকার করে আর সে বিচারকের নির্দেশ ছাড়াই মালিকের নিকট গোলামটিকে হস্তান্তর করে। তারপর কথিত মালিকের নিকট গোলাম মারা যায় তারপর অন্য একজন সাক্ষীসহ গোলামের মালিকানা দাবী করে তাহলে এই ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে খ্রেফতারকারী ব্যক্তির থেকে জরিমানা উসূল করতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে গোলামের স্বীকৃত মালিকের থেকেও জরিমানা আদায় করতে পারবে। যদি মালিক খ্রেফতারকারী ব্যক্তির নিকট হতে জরিমানা উসূল করে তবে সে এ টাকা قابض (অর্থাৎ গোলামের স্বীকৃতির ভিত্তিতে যাকে এ গোলাম প্রদান করা হয়েছে তার) থেকে রুজু তথা উসূল করে নিবে। যদি খ্রেফতারকারী ব্যক্তি দাবীকারী প্রথম ব্যক্তিকে এ গোলাম হস্তান্তর না করে, তারপর দুইজন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এটি তারই গোলাম, তাই সে আদালতের নির্দেশ ছাড়াই এই ব্যক্তির নিকট গোলাম হস্তান্তর করে দেয়। তারপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি সাক্ষী-প্রমাণ সাপেক্ষ এ কথা প্রমাণ করে যে, এ গোলাম তার, তাহলে এই দ্বিতীয় জনের পক্ষেই ফায়সালা প্রদান করা হবে। যদি প্রথম ব্যক্তি পুনরায় সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তবে আদালতের হুকুম রদ হবে না। কেউ পলাতক কোন গোলামকে খ্রেফতার করে বিচারকের ফায়সালা ছাড়াই তাকে বিক্রি করে দিল। ফলে ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ হয়ে গেল। ইত্যবসরে ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় ঐ গোলাম মারা গেল। তারপর এক ব্যক্তি এসে এ গোলামের মালিকানা দাবী করল এবং এ মর্মে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করল যে, ইহা আমরা গোলাম, তাহলে منحق (যে ব্যক্তি পরে মালিকানা দাবী করেছে) ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে ক্রেতার নিকট থেকে জরিমানা উসূল করতে পারবে। এমতাবস্থায় ক্রেতা তার দেওয়া মূল্য বিক্রেতার নিকট থেকে আদায় করে নিবে। আর ইচ্ছা করলে বিক্রেতার নিকট থেকেও জরিমানা উসূল করতে পারবে। এমতাবস্থায় বিক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয় কার্যকরী হয়ে যাবে। আর ثمن (বিক্রিত মূল্য)-এর মালিক সেই হবে। আর যদি ثمن (বিক্রিত মূল্য)-এর পরিমাণ قیمت (বিক্রিত মূল্য)-এর মালিক বেশী হয়, তবে অতিরিক্ত পরিমাণ সাদাকা করে দিবে। যদি মুনীব গোলামের পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে তবে প্রত্যর্পণকারী ব্যক্তি কোন পারিশ্রমিক পাবে না। কিন্তু যদি সাক্ষীগণ এ মর্মে সাক্ষী প্রদান করে যে, সে তার মুনীবদের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছে অথবা সাক্ষীগণ যদি বলে যে, এই গোলামের মুনীব তার পালিয়ে যাওয়ার কথাটি স্বীকার করেছে তাহলে প্রত্যর্পণকারী ব্যক্তি পারিশ্রমিক পাবে। গোলাম যদি মুনীবের মাল নিয়ে পালিয়ে যায় তারপর অপর কোন ব্যক্তি তাকে ধরে নিয়ে আসে এবং বলে যে, আমি তার নিকট কোন কিছু পাইনি তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

১২. মাসআলা : পলাতক গোলামকে (পাকড়াও করার পর) কোন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট অথবা নিজের কোন নাবালিগ সন্তানের নিকট বিক্রি করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে গোলাম যে ব্যক্তির কবজায় আছে তার নিকট উক্ত গোলামকে বিক্রি করা জায়েয আছে। এমনি ভাবে পলাতক গোলামকে কোন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হিবা করা জায়েয নেই।

যদি কোন ব্যক্তি নিজের নাবালিগ সন্তানকে এ জাতীয় গোলাম হিবা করে এবং গোলাম যদি তখনো দারুল ইসলামের মধ্যেই থেকে থাকে তবে তা জায়েয হবে। গোলাম যদি গালিয়ে দারুল হরবে চলে যায় তবে এ ব্যাপারে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। হারামাইনের কাযী ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন যে, এরূপ করা জায়েয নয়। এ জাতীয় গোলামকে যিহারের কাফফারা হিসাবে প্রদান করা জায়েয আছে। মুনীব পলাতক গোলামকে তালাশ করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করল। তারপর উকীল তাকে পেয়ে গেল। এদিকে মুনীব সেই গোলামকে অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিল। অথচ ক্রেতা-বিক্রেতা কারোই এ কথা জানা নেই যে, উকীল তাকে পেয়ে গেছে। তাহলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে। যাবত না নিশ্চিতভাবে এ কথা জানা যাবে যে, উকীল তাকে পেয়ে গেছে। পলাতক গোলামকে পাকড়াও করে যদি খেফতারকারী ব্যক্তি যদি তাকে ইজারা দিয়ে দেয় তবে খেফতারকারী ব্যক্তিই উজরত তথা পারিশ্রমিক পাবে এবং সে তা সাদাকা করে দিবে। খেফতারকারী ব্যক্তি যদি গোলাম সহ পারিশ্রমিকের সমুদয় টাকা তার মুনীবের নিকট হস্তান্তর করে এবং বলে এটা আপনার গোলামেরই কামাই, আমি তা আপনার নিকট হস্তান্তর করে দিলাম' তবে মুনীবই তা পাবে। তবে কিয়াসের দৃষ্টিতে এ টাকা-পয়সা ভক্ষণ করা মুনীবের জন্য হালাল হবে না। কিন্তু ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে হালাল হবে (আল-মুহীত)।

অধ্যায় : নিরুদ্দেশ ও নিখোঁজ ব্যক্তির মাসাইল

অধ্যায় : নিরুদ্দেশ ও নিখোঁজ ব্যক্তির মাসাইল

১. মাসাআলা : নিখোঁজ এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তার পরিবার-পরিজন থেকে নিরুদ্দেশ্য হয়ে গেছে বা যাকে হরবীরা বন্দী করে নিয়ে গেছে সে জীবিত আছে না মারা গেছে তা জানা নেই এবং সে কোথায় আছে তাও জানা নেই, এ অবস্থায় এক দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই হিসাবে এ-ই ব্যক্তি 'নেই' (معدوم) বলে গণ্য হবে। নিখোঁজ ব্যক্তির হুকুম হল, সে (فی حق نفسه) (নিজের হক ব্যাপারে) জীবিত বলে গণ্য। সুতরাং তার স্ত্রী অন্য কারো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, তার মালামাল বন্টন করা যাবে না এবং তার দেওয়া ইজারা বাতিল হবে না। আর অপরের ক্ষেত্রে সে মৃত বলে গণ্য হবে। কাজেই তার নিখোঁজ অবস্থায় কেউ মারা গেলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিস হবে না (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)।

২. মাসাআলা : বিচারক নিখোঁজ ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে এমন কাউকে নিযুক্ত করবেন যে তার মালামাল হিফায়ত তত্ত্বাবধান করবে এবং তার জমির উৎপাদিত ফসল এবং ঐ পাওনাসমূহ উসুল করবে যার ব্যাপারে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিজের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করবে। তবে যে ঋণের ব্যাপারে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিজের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করবে না সে ঐ ঋণের ব্যাপারে তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে না। এমনি ভাবে তার যে সব আসবাব-সামগ্রী এবং জমি-জমা অন্যের কবজায় আছে এসবের ব্যাপারেও সে মানুষের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে না। কেননা সে এ সবের মালিক নয় এবং সে তার নাযিব (স্থলাভিষিক্ত) ও নয়। বরং সে তো বিচারকের পক্ষ হতে কবজার ব্যাপারে একজন উকীল মাত্র। আর এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত যে, উকীলের জন্য বিবাদে বা মামলায় লিপ্ত হওয়ার কোন অধিকার নেই। কেননা এটি নিখোঁজ ব্যক্তির উপর আদেশ জারী করার নামান্তর। আর নিখোঁজ ব্যক্তি উপর আদেশজারী করা আমাদের মাযহাবে জায়েয নেই। অবশ্য "যে বিচারকের মতে নিখোঁজ ব্যক্তির উপর আদেশ জারী করা জায়েয" তিনি তা জারী করলে তা জায়েয হবে। কেননা এটি একটি مختلف فيه মতবিরোধপূর্ণ বিষয়। তাই ইমামগণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত মতে এ ফায়সালা কার্যকরী হবে। উল্লেখ্য যে, বিচারক কর্তৃক নিযুক্ত উকীলের সম্পাদিত কোন চুক্তির কারণে যদি কারো উপর ঋণ অপরিহার্য হয় তবে এ ঋণের ব্যাপারে সে বিবাদে লিপ্ত হতে পারবে। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। এমনি ভাবে নিখোঁজ ব্যক্তির যে সব মালামাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সে মামলা-মকদ্দমা পরিচালনা করতে পারবে (তাবয়ীন)।

৩. মাসআলা : দ্রুত নষ্ট হয় না এমন জিনিস উকীল বিক্রি করতে পারবে না। খোরপোষের জন্যও নয় এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যেও নয়। চাই তা অস্থাবর সম্পত্তি হোক বা স্থাবর সম্পত্তি হোক (গায়তুল বয়ান)। নিখোঁজ ব্যক্তির উপস্থিতিতে যে সব আত্মীয়-স্বজনের খোরপোষ বিচারকের আদেশজারী করা ছাড়াই তার উপর ওয়াজিব তাদের খোরপোষ তার অনুপস্থিতি অবস্থায়ও উকীল ব্যক্তি তার মাল থেকে দিয়ে যাবে। যেমন স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতা। আর যারা তার উপস্থিতিতে বিচারকের আদেশ জারী করা ছাড়া খোরপোষের অধিকারী হয় না তাদের খোরপোষ তার মাল থেকে প্রদান করা হবে না। যেমন ভাই, বোন ইত্যাদি। তার মাল থেকে ‘উদ্দেশ্য হল তার নগদ টাকা-পয়সা (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)।

৪. মাসআলা : এ পর্যায়ে স্বর্ণ-রৌপ্য ও নগদ অর্থের পর্যায়ভুক্ত। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি এসব অর্থ-সম্পদ বিচারকের হাতে অর্থাৎ তার কবজায় থাকে। যদি তার টাকা পয়সা কারো নিকট আমানত বা পাওনা থাকে তবে সেখান থেকে তাদের জন্য ব্যয় করা হবে। যদি আমানত গ্রহীতা এবং কবজাদার ব্যক্তি আমানত, করজ, নসব ও নিকাহের বিষয়গুলোকে স্বীকার করে নেয়। এ শর্ত তখনই অপরিহার্য হবে যদি আমানত গৃহীতা ব্যক্তিদ্বয় বিচারকের জানা শুনা না হয়। যদি তারা জানা শুনা মানুষ হয় তবে স্বীকারোক্তির কোন প্রয়োজন নেই। যদি তাদের একজন জানা-শুনা হয় এবং অপরজন অজানা মানুষ হয় তবে সহীহ মতে যে ব্যক্তি জানা-শুনা নয়। তার পক্ষ হতে এ বিষয়ের স্বীকারোক্তি জরুরী। যদি আমানত গৃহীতা এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদ্বয় বিচারকের ফায়সালা ছাড়া নিজে নিজেই তাদের কে তার মালামাল আদায় প্রদান করে তাহলে আমানতগ্রহীতা ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে এবং করজদার ব্যক্তি করজ থেকে মুক্তি পাবে না। যদি আমানতগ্রহীতা এবং করজদার ব্যক্তি আমানত ও করজের বিষয়টিকে অস্বীকার করে অথবা তারা যদি বৈবাহিক সম্পর্ক এবং নসবের বিষয়টিকে অস্বীকার করে তাহলে খোরপোষের হকদার কোন ব্যক্তিই এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়াতে পারবে না।

৫. মাসআলা : নিখোঁজ ব্যক্তি এবং তার স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। নব্বই বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর সে মারা গেছে বলে হুকুম দেওয়া হবে। এর উপরই ফাতওয়া। যাহিরী রিওয়ায়েতে আছে যে, নিখোঁজ ব্যক্তির উপর মৃত্যুর হুকুম আরোপ করার বিষয়টি তার সমসাময়িক লোকদের হায়াত ও মওত এর সময় অনুসারে নিরূপিত হবে। অর্থাৎ এ বয়সী লোকেরা যত দিন পর্যন্ত সাধারণত জীবিত থাকে ততদিন পর্যন্ত তাকে জীবিত গণ্য করা হবে। এরপর হতে তাকে মৃত গণ্য করা হবে। আর সমসাময়িক বলতে তার শহরের (অঞ্চলের) সমসাময়িক লোকদের মারা যাওয়ার সময়টি ধর্তব্য হবে (কাফী)। পসন্দনীয় অভিমত অনুসারে এই বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধানের রায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা : নিখোঁজ ব্যক্তির উপর মওতের হুকুম জারী করার পর এই সময় থেকেই তার স্ত্রী বৈধব্যে ইদ্দতকাল পালন করবে। তারপর তার ওয়ারিসদের মধ্যে যারা জীবিত ও মওজুদ আছে তাদের মধ্যে মীরাস বন্টন করা হবে কিন্তু ‘এ’ হুকুম প্রদানের আগে তার যেমন আত্মীয় মারা ‘গেছে’ তারা তার থেকে মীরাস পাবে না (হিদায়া)। যদি উক্ত সময় অতিক্রান্ত

হওয়ার পর মহিলার নিখোঁজ স্বামী ফিরে আসে তাহলে সেই তার স্ত্রীর ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। আর যদি সে অন্য স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে তার উপর আর এই ব্যক্তির কোন অধিকার থাকবে না। মুদত পুরা হয়ে যাওয়ার দিন থেকে সে তার মালের ব্যাপারে মৃত বলে গণ্য হবে। আর অপরের মালের ক্ষেত্রে যে দিন হতে সে নিখোঁজ হয়েছে সেদিন থেকে মৃত বলে গণ্য হবে (তাতায় খানিয়া)।

৭. মাসআলা : নিখোঁজ ব্যক্তির নিরুদ্দেশ অবস্থায় তার কোন নিকটাত্মীয় মারা গেলে সে তার থেকে মীরাস পাবে না। এ কথা মানেন হল, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মালে নিখোঁজ ব্যক্তির প্রাপ্য অংশ ‘মওকুফ’ অর্থাৎ স্থগিত থাকবে। যদি তার জীবিত থাকা প্রকাশ পায় তবে সে এর হকদার হয়ে যাবে। আর অজানা অবস্থায় নব্বই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে নিখোঁজ ব্যক্তির জন্য স্থগিত রাখা সম্পদ মৃতের ঐ ওয়ারিসদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। যারা মৃত্যুর দিন তার ওয়ারিস ছিল (কাফী)। যদি কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পূর্বে নিখোঁজ ব্যক্তির অনুকূলে ওসীয়ত করে তবে ওসীয়তকৃত মাল তার মওতের ফায়সালা দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। মওতের ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর ওসীয়তের মাল ওসীয়তকারী ব্যক্তির ওয়ারিসদের নিকট ফেরত প্রদান করা হবে (তাবয়ীন)।

৮. মাসআলা : যদি কোন মুরতাদ ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে যায়, এবং সে দারুল হরব চলে গেছে কিনা তা জানা না থাকে তাহলে দারুল হরবে যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার মীরাস মওকুফ থাকবে। ‘মুরতাদ’ ব্যক্তির সন্তানদের থেকে যদি কেউ মারা যায় তবে তার মীরাস তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তবে উক্ত মৃত ব্যক্তির কোন মাল নিখোঁজ ব্যক্তির জন্য মওকুফ রাখা হবে না (যহীরিয়া)। যদি নিখোঁজ ব্যক্তির সাথে তার এমন কোন ওয়ারিস থাকে যে নিখোঁজ ব্যক্তির বিদ্যমান থাকার কারণে ঐ ব্যক্তি মীরাস থেকে মাহরুম তো হয় না বটে তবে তার অংশ কিছুটা হ্রাস পায় তাহলে এতদুভয় অংশের মধ্যে যেটি কম তাকে তা প্রদান করা হবে। এবং বাকী মাল স্থগিত রাখা হবে। পক্ষান্তরে নিখোঁজ ব্যক্তির সাথে সাথে যদি এমন কোন ওয়ারিস থাকে যে ব্যক্তি নিখোঁজ ব্যক্তির কারণে মাহরুম হয়ে যায় তাহলে তাকে মীরাসের অংশ থেকে কিছুই দেওয়া হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি দুই কন্যা, নিখোঁজ পুত্র, পুত্রের পুত্র এবং পুত্রের কন্যা রেখে মারা গেল। তখন তার মালামাল ছিল কোন অনাত্মীয় ব্যক্তির হাতে। এমতাবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের সকলেই যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি করে যে, মৃত ব্যক্তির পুত্র নিখোঁজ এবং কন্যাদের উভয়ে যদি মীরাস তলব করে তবে দুই হিস্যার মধ্যে যেটি কম অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ তাদেরকে প্রদান করা হবে। কিন্তু পুত্রের সন্তানকে কিছুই দেওয়া হবে না এবং অনাত্মীয় ব্যক্তির হাত থেকে মালামাল ছিনিয়েও আনা হবে না। কিন্তু যদি তার থেকে কোন খিয়ানত প্রকাশ পায় তবে তাকে আর বিশ্বাস করা হবে না। তারপর মুদত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে নিখোঁজ ব্যক্তির উপর মওতের আদেশ জারী করার পর কন্যা দু’জনকে পূর্ণ মালের আরো ৬ষ্ঠাংশ প্রদান করা হবে যাতে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তি পূর্ণ হয়। তারপর পুত্রের পুত্রকে বাকী অংশ প্রদান করা হবে। মৃত ব্যক্তির যে বাচ্চা মায়ের পেটে আছে; এখনো জন্ম গ্রহণ করে নি তার হুকুম নিখোঁজ ব্যক্তির হুকুমের অনুরূপ। অর্থাৎ এ

জাতীয় বাচ্চার জন্য এক পুত্রের অংশ রাখা হবে। ফাতওয়ার জন্য এটিই পসন্দনীয় অভিমত। যদি নিখোঁজ ব্যক্তির সাথে এমন কোন ওয়ারিস থাকে যার পাওয়া অংশ কখনো বাদ পড়ে না এবং হামলের কারণে তার অংশ পরিবর্তনও হয় না তাহলে তাকে তার অংশ পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে। আর যদি এমন ওয়ারিস থাকে যার হিস্যা হামলের কারণে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে এতদুভয় হিস্যার মধ্যে যেটি কম তাকে তা প্রদান করা হবে (কাফী)। যদি নিখোঁজ ব্যক্তি কোন মাঠে প্রাপ্তরে মারা যায় তবে তার সফর সংগীরা তার সওয়ারী ও মাল সামান বিক্রি করে টাকা-পয়সা তার পরিবার-পরিজনের নিকট পৌছিয়ে দিবে। যদি কোন ব্যক্তি নিখোঁজ ব্যক্তির উপর কোন হকের দাবী করে অর্থাৎ পাওনা বা আমানতের টাকা দাবী করে কিংবা তার জমিতে অংশীদার হওয়ার দাবী করে কিংবা তালাক ইত্যাক (দাস মুক্তকরণ) বা বিবাহের দাবী করে অথবা ক্রটির কারণে কোন মাল ফেরত দেওয়ার দাবী করে অথবা মালিকানার ভিত্তিতে কোন কিছু তলব করে তাহলে তার এসব দাবীর প্রতি কর্ণপাত করা হবে না এবং তার সাক্ষী প্রমাণও গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনভাবে আদালত কর্তৃক নিয়োজিত উকীল এবং মৃত ব্যক্তির কোন ওয়ারিস বাদীর প্রতিপক্ষ হতে পারবে না। যদি কোন বিচারকের মতে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর আদেশ জারী করা বৈধ হয় এবং এই ভিত্তিতে তিনি যদি সাক্ষী গুলে ফায়সালা দিয়ে দেন তবে ফকীহগণের ইজমা তথা সর্বসম্মত রায় অনুসারে এ ফায়সালা কার্যকারী হবে (তাতার খানিয়া)।

অধ্যায় : যৌথ মালিকানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য

অধ্যায় : যৌথ মালিকানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য

[এ অধ্যায়ের ছয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ : যৌথ মালিকানা ও ব্যবসা বাণিজ্য-এর প্রকারভেদ; রুকন, শর্ত, বিধি-বিধান ইত্যাদির বিবরণ।

[এ পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ : যৌথ মালিকানা ও ব্যবসা বাণিজ্য-এর প্রকারভেদ।

১. মাসআলা : যৌথ মালিকানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য দুই প্রকার। (১) শিরকাতুল মিল্ক (মালিকানায় অংশীদারিত্ব)। শিরকতের ব্যাপারে কোন রূপ চুক্তি ব্যতীত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কোন বস্তুতে মালিকানার ভিত্তিতে শরীক হওয়াকে শিরকাতুল মিল্ক বলে (তাহযীব)। (২) শিরকাতুল আকদ^১ (চুক্তি ভিত্তিক অংশীদারিত্ব) যেমন একজন অন্যজনকে বলল, আমি তোমাকে এই কাজে শরীক করলাম, তারপর অপর ব্যক্তি বলল, আমি কবুল করলাম (কানযুদ দাকায়িক)। শিরকাতুল মিল্ক তথা মালিকানায় অংশীদারিত্ব আবার দুই প্রকার : (১) শিরকাতুল জবর (বাধ্যতামূলক অংশীদারিত্ব) (২) শিরকাতুল ইখতিয়ার-(স্বেচ্ছাকৃত অংশীদারিত্ব)। শিরকাতুল জবর যেমন দুই (বা ততোধিক) ব্যক্তির মালামাল মালিকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া যে, এগুলোকে কোনভাবেই আর পৃথক করা যায় না, যেমন মালগুলো একই জাতীয় বস্তু অথবা খুব কষ্ট সাপেক্ষে পৃথক করা যায়, যেমন মিশ্রিত যব ও গম অথবা তারা উভয়ে মীরাস সূত্রে ঐ মালের মালিক হয়েছে। শিরকাতুল ইখতিয়ার (স্বেচ্ছাকৃত অংশীদারিত্ব) হল, যেমন দুই ব্যক্তিকে কোন মাল হিবা করা হল অথবা কাফিরদের উপর জয়যুক্ত হয়ে তারা কোন মালের মালিকানা লাভ করল অথবা তারা তাদের নিজেদের মাল নিজেরাই মিশ্রিত করে নিল (যখীরা)। অথবা ক্রয়সূত্রে তারা কোন মালের মালিক হল অথবা তাদেরকে কোন মাল সাদাকা করা হল (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অথবা তাদের জন্য কোন মালের ওসীয়াত করা হল, তারপর তারা তা কবুল করে নিল (ইখতিয়ার শরহিল মুখতার)।

১. চুক্তির মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মূলধন ও তা থেকে প্রাপ্ত মুনাফায় শরীক বা অংশীদার হওয়াকে শিরকাতুল আকদ বলা হয়।

২. মাসআলা : শিরকাতুল মিলক এর রুকন হল, শরীক ব্যক্তিদের অংশ একত্রিত ও মিশ্রিত অবস্থায় থাকা। এর হুকুম হল, যৌথ মালিকানাধীন মালে যদি মুনাফা হাসিল হয় তবে অংশীদারদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ অনুপাতে ঐ অতিরিক্ত অংশের মালিক হবে। শিরকাতুল মিলক এর ক্ষেত্রে দুই শরীকের কোন একজনের জন্য জায়েয নেই অপর জনের অনুমতি ছাড়া তার অংশে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা। শরীকদের প্রত্যেকেই অপরজনের অংশের ক্ষেত্রে অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবে। সর্বাবস্থায় দুই শরীকের প্রত্যেকের জন্য জায়েয আছে নিজের হিস্যা তার অপর শরীকের নিকট বিক্রি করা। এমনিভাবে অংশীদার ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকটও শরীক ব্যক্তির অনুমতি ব্যতিরেকে নিজের হিস্যা বিক্রি করা জায়েয। কিন্তু যদি উভয়ের মালামাল মিশ্রিত অবস্থায় থাকে তবে অপর শরীকের অনুমতি ব্যতিরেকে নিজের হিস্যা বিক্রি করা জায়েয হবে না (কাফী)।

৩. মাসআলা : শিরকাতুল উকূদ (আকূদ) তিন প্রকার : (১) শিরকাত বিল মাল (২) শিরকাত বিল উজুহ (৩) শিরকাত বিল আ'মাল। এই তিন প্রকারের প্রতিটি আবার দুই প্রকার। (১) শিরকাতে মুফাওয়াযা (২) শিরকাতে ইনান (যখীরা) শিরকাতুল উকূদ এর রুকন হল, ঈজার ও কবুল। যেমন- এক ব্যক্তি বলল, আমি তোমাকে অমুক মালে বা অমুক ব্যবসায় শরীক করে নিলাম, অপর ব্যক্তি বলল, আমি কবুল করে নিলাম, (কাফী)। এভাবে যৌথ ব্যবসার চুক্তি সম্পাদনকালে কাউকে সাক্ষী করে নেওয়া উত্তম (আন-নাহরুল ফায়িক)। এ জাতীয় শিরকাত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, যে আইটেমের উপর যৌথ ব্যবসায়ের চুক্তি সম্পাদিত হবে তা ওয়াকাল কবুল করার মত বস্ত্ত হতে হবে (আল-মুহীত)। অংশীদারগণের মুনাফার পরিমাণ জানা থাকতে হবে। মুনাফার হার অজ্ঞাত থাকলে অংশীদারি চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। মুনাফা আনুপাতিক হার হিসাবে বণ্টন করতে হবে। অংক নির্দিষ্ট করে মুনাফা বণ্টনের চুক্তি করা যাবে না। যেমন ১/২ বা ১/৩ ইত্যাদি। যদি মুনাফার টাকা সুনির্ধারিত করে নেওয়া হয় যেমন দশ টাকা, একশত টাকা ইত্যাদি, তাহলে শিরকাত চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে (বাদায়ে)। শিরকাতুল আকূদের হুকুম এই যে, معقود عليه অর্থাৎ যে আইটেমের উপর অংশীদারি চুক্তি সম্পাদিত হবে তা এবং এর দ্বারা যা অর্জিত হবে তা সবই অংশীদারদের মধ্যে مشترক থাকবে। অর্থাৎ তাদের শরীকানাধীন থাকবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। শিরকাত বিল মাল হল, দুই ব্যক্তি পরস্পর মিলে মূলধন সংগ্রহ করবে। তারপর তারা বলবে; আমরা এ পুঁজি দ্বারা যৌথ ব্যবসা করব এবং উভয়ে মিলে একত্রিতভাবে এর দ্বারা মালামাল খরিদ করব এবং বিক্রি করব অথবা ভিন্ন ভিন্নভাবে এর দ্বারা মালামাল খরিদ করব ও বিক্রি করব অথবা কিভাবে বেচাকেনা করবে তা কিছুই বলল না, এই শর্তে যে এ ব্যবসায় আল্লাহ আমাদেরকে যে মুনাফা দিবেন তা আমাদের মাঝে চুক্তি নামায় বর্ণিত শর্ত মূতাবিক বণ্টন করা হবে। অথবা অংশীদারদের একজনে এসব কথা বলল, আর অপর জনে এ ব্যাপারে নিজের সম্মতি ব্যক্ত করলে তাহলেও শিরকাত বিল মাল সহীহ হয়ে যাবে (বাদায়ে)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : যে যে শব্দের দ্বারা শিরকাত সহীহ হয় এবং যে যে শব্দের দ্বারা শিরকাত সহীহ হয় না।

১. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি দুই ব্যক্তি কোন রূপ আর্থিক লেনদেন ছাড়াই শুধুমাত্র এ কথার উপর চুক্তি করে যে, আজ আমরা যে মালামাল খরিদ করব এর বিনিময়ে আমাদের যা মুনাফা হবে তা আমরা ভাগ্নভাগি করে নিব। চাই এ চুক্তিতে মাল ও কাজের ধরন নাম করে বর্ণনা করা হোক বা না হোক; এভাবে যৌথ চুক্তি সম্পাদন করা জায়েয। এমনিভাবে যদি “আজ” শব্দের পরিবর্তে “এই মাসের মধ্যে” বলে তবুও শরীকানা কারবার জায়েয হবে। তদ্রূপ শিরকাত চুক্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ না থাকলেও তা জায়েয হবে। যেমন দুই ব্যক্তি যৌথ কারবার শুরু করল এই শর্তে যে, তারা মালামাল খরিদ করে যে ব্যবসা করবে। তাতে উভয়ের অংশীদারিত্ব থাকবে (মুহীত)। যদি শরীক দ্বারা সময় নির্দিষ্ট করে যৌথ কারবারের চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে তা সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হবে কিনা, এ সম্বন্ধে ফকীহ বিশুর (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ জাতীয় চুক্তি সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হবে। ইমাম তাম্বুতী (র) এ বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু অন্যান্য মাশাইখে কিরাম একে সহীহ বলেছেন। আর ইহাই সহীহ অভিমত। যদি চুক্তিতে “শিরকাত” শব্দ ব্যবহার না করে শরীকদ্বয়ের একজনে অপরজনকে শুধু একথা বলে যে, আজ আমি যে জিনিস খরিদ করব তা আমার ও তোমার অংশীদারিত্বে থাকবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাতে সম্মত হল। এমতাবস্থায় তা শিরকাত (যৌথ ব্যবসা) চুক্তি হিসাবে গণ্য হবে কিনা; এ সম্বন্ধে “আসল” গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) কিছু বলেন নি। অবশ্য আবু সুলায়মান (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ ধরনের চুক্তি জায়েয আছে এবং এতেও শিরকাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যদি অংশীদারদ্বয়ের উভয়ে শিরকাতের কথা উল্লেখ না করে শুধুমাত্র খরিদ সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহার করে তবুও শিরকাত জায়েয হবে। কেননা শিরকাত চুক্তির যে হুকুম তা এখানে উল্লেখিত হয়েছে। কাজেই পূর্ববর্তী মাসআলায়ও হুকুম প্রযোজ্য হবে। এটিই সহীহ অভিমত। এ জাতীয় শিরকাত ক্রয়ের ক্ষেত্রে জায়েয হবে। শরীকদ্বয়ের একজনের জন্য জায়েয হবে না অপর জনের খরিদা অংশ তার অনুমতি ছাড়া বিক্রি কল্প (গিয়াসিয়া)।

২. মাসআলা : যদি একজন অন্যজনকে বলে যে, আমি যা কিছু খরিদ করব তা আমার ও তোমার হবে অথবা আমাদের উভয়ের হবে, আর দ্বিতীয়জন শরীকদার হওয়ার নিয়তে বলে, হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এ কথা যৌথ কারবারের চুক্তি হিসাবে গণ্য হবে এবং খরিদকৃত বস্ত্তের ধরন, মূল্য ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা ছাড়াও এ শিরকাত চুক্তি সহীহ হয়ে যাবে। যেমন ক্রয় বিক্রয়ের কথা পরিষ্কারভাবে বলা হলে তা সহীহ হয়ে থাকে। আর যদি “হ্যাঁ ঠিক আছে” বলার দ্বারা উদ্দেশ্য এরূপ হয় যে, “খরিদকৃত এ নির্দিষ্ট পরিমাণ মালে আমাদের অংশীদারিত্ব থাকবে। তবে ব্যবসায়ী দুই অংশীদার ব্যক্তির মত নয়। বরং খরিদকৃত এ নির্দিষ্ট পরিমাণ মালে উভয়ের উভয়ের অংশীদারিত্ব থাকবে। যেমন ঐ দুই ব্যক্তি কোন মাল মীরাস হিসাবে পেল বা তাদেরকে কেউ কোন সম্পদ হিবা করল তাহলে

এ অবস্থায় উক্ত চুক্তি ওয়াকাল্লা হিসাবে গণ্য হবে। শিরকাত হিসাবে গণ্য হবে না। উল্লেখ্য যে, যদি এক্ষেত্রে ওয়াকাল্লা সহীহ হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায় তবেই কেবল ওয়াকালত সহীহ হবে। অন্যথায় সহীহ হবে না। আর ওয়াকালত দুইভাবে হয়ে থাকে। (১) وكالت عامة (ব্যাপক বিষয়ের ওয়াকালত)। (২) وكالت خاصة (খাস বিষয়ের ওয়াকালত)। খাস ও নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে ওয়াকালত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল, খরিদকৃত বস্তু কোন জাতীয় এবং কোন ধরনের তা বলে দেওয়া। এমনিভাবে মূল্যের পরিমাণ কত তাও স্পষ্টভাবে বলে দিতে হবে। আর ব্যাপক বিষয়ের ওয়াকালত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল, মুআক্কিল উকীলের নিকটে নিজের রায় সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করে দেওয়া।^১ এমনিভাবে সময়, মূল্য এবং পণ্য দ্রব্যের ধরন ইত্যাদিও বলে দিতে হবে (বাদায়ে)।

৩. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে আছে, ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে; যদি দুই ব্যক্তি ঘোষণা দেয় যে, আমরা তথা কিছু খরিদ করব তা আমাদের মাঝে আধাআধি ভাগ হবে, তবে তা জায়েয আছে। মুনতাকা গ্রন্থে আরো আছে, হাসান ইবন যিয়াদ (র) ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, আমি ব্যবসায়ের যেসব মালামাল খরিদ করব তা আপনার এবং আমার বলে গণ্য হবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এ প্রস্তাব কবুল করে নিল তাহলে তা জায়েয আছে। এমনিভাবে যদি “আজকের দিনে আমি যা খরিদ করব” বলে তাহলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অতএব সে দিন উক্ত ব্যক্তি যেসব জিনিস খরিদ করবে তা তাদের মাঝে আধাআধি ভাগ হবে। অনুরূপভাবে যদি এ জাতীয় কথা এক পক্ষ থেকে না হয়ে উভয়পক্ষ থেকে হয় এবং তারা যদি সময় নির্ধারণ না করে তাহলেও শিরকাত জায়েয হবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি যে আটা খরিদ করেছি, তা আমার এবং তোমার তাহলে এতেও শিরকাত জায়েয হবে। এ অবস্থায় উপরোক্ত দুই ব্যক্তির কোন একজনের জন্য জায়েয হবে না অপরের খরিদা হিস্যা তার অনুমতি ছাড়া বিক্রি করা। কেননা তারা যৌথ চুক্তি করেছে খরিদ করার ব্যাপারে বিক্রি করার ব্যাপারে নয় (মুহীত)।

৪. মাসআলা : যদি একজনে অপরজনকে বলে, যদি আমি গোলাম খরিদ করি তবে তা আমার ও তোমার উভয়ের গোলাম হবে, তাহলে এ চুক্তি ফাসিদ হবে। কিন্তু “গোলাম কোন দেশীয়” হবে তা যদি পরিষ্কার বলে দেয়, যেমন বলল, খুরাসানী, ইরানী তাহলে চুক্তি ফাসিদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি বলল, আমি যা কিছু খরিদ করব তা আমার ও তোমার বলে গণ্য হবে, এরূপ বলা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসূফ (র)ও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন (বাদায়ে)। মুনতাকা গ্রন্থে আছে; বিশ্র ইবনুল ওয়ালীদ (র) ইমাম আবু ইউসূফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আজ আমি যা কিছু খরিদ করব তা তোমার এবং

১. মূল গ্রন্থে ان لا يفوض “হস্তান্তর না করা” এর কথা বলা হয়েছে। মূলতঃ এখানে হস্তান্তর করা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আমার শরীকানাধীন হবে এরূপ বলা জায়েয আছে। এমনিভাবে যদি চুক্তির মেয়াদ এক বছর নির্ধারণ করে তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি চুক্তির ব্যাপারে কোন সময় নির্ধারণ না করে কিন্তু খরিদকৃত পণ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়, যেমন বলল, গম অত কেজি পর্যন্ত যত খরিদ করব তা তোমার এবং আমার হবে; এভাবে বলে চুক্তি সম্পাদন করা জায়েয আছে (যখীরা)।

৫. মাসআলা : কেউ যদি বলে, তোমার দিকে আমি যে জিনিস খরিদ করেছি তা তোমার এবং আমার। তারপর সে তার দিক হয়ে বাইরে চলে গেল অথবা যদি বলে, বসরায় আমি যা কিছু খরিদ করেছি” তাহলে তার এ কথা বাতিল বলে গণ্য হবে যাবৎ না পণ্যের ধরন, মূল্য অথবা দিন, কাল নির্ধারণ করা হয় (মুহীত)। একজন অন্যজনকে বললো, অমুক গোলামটিকে আমার এবং তোমার জন্য খরিদ কর, আর দ্বিতীয়জন বলল, ঠিক আছে। কিন্তু খরিদ করার সময় সে এক ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখল যে, সে এ গোলামটিকে নিজের জন্যই খরিদ করেছে। তাহলে তা শরীকী গোলাম হিসাবেই গণ্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। মুজাররাদ গ্রন্থে আছে, ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন; কাউকে গোলাম খরিদ করার হুকুম দেওয়ার পর সে যদি চুপ থাকে; হাঁ বা না কিছুই না বলে, তারপর খরিদ করার সময় বলে, আমার নিজের জন্যই আমি এ গোলাম খরিদ করেছি, তাহলে এ গোলাম তারই হবে। যদি খরিদদার ব্যক্তি বলে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি অমুকের জন্য এ গোলাম খরিদ করেছি যেহেতু সে আমাকে হুকুম করেছে। তারপর সে তাকে খরিদ করল তাহলে এ গোলাম আদেশ দাতা ব্যক্তিরই হবে (যখীরা)। যদি আদিষ্ট ব্যক্তি গোলাম খরিদ করার সময় চুপ থাকে এবং খরিদ করার পর বলে, আমি এই গোলাম অমুক আদেশ দাতার জন্য খরিদ করেছি তাহলে এই গোলাম অমুকেরই হবে— যদি গোলামটি ঐ সময় পর্যন্ত নিখুঁত থাকে। আর গোলাম খুঁত বিশিষ্ট হওয়ার পর বা মারা যাওয়ার পর সে যদি এই কথা বলে তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। হাঁ, যদি আদেশ দাতা ব্যক্তি তার কথা সত্যায়ন করে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (তাতার খানিয়া)।

৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, অমুকের গোলামটি খরিদ কর, এটি আমার এবং তোমার মধ্যে শরীকী গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। এ কথা শুনে সে বলল, ঠিক আছে। তারপর সে গোলাম খরিদ করার জন্য গেলে তাকে তৃতীয় আরেক ব্যক্তি বলল; আমার এবং তোমার জন্য অমুকের (পূর্বের ব্যক্তির) ঐ গোলামটি খরিদ কর। এবারও সে বলল, ঠিক আছে। তারপর সে ঐ গোলামটি খরিদ করল, তাহলে এই গোলাম আদেশ দাতা দুই ব্যক্তির গোলাম হিসাবেই গণ্য হবে (খুলাসা)। ফুকাহায়ে কিয়ামের মতে এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি আদিষ্ট ব্যক্তি প্রথম (আদেশদাতা) ব্যক্তির উপস্থিতি অর্থাৎ অবগতি ছাড়াই দ্বিতীয় ব্যক্তির ওয়াকালতকে কবুল করে নেয়। পক্ষান্তরে সে যদি প্রথম ব্যক্তির উপস্থিতিতেই দ্বিতীয় ব্যক্তির ওয়াকালতকে কবুল করে নেয় তাহলে এ গোলাম দ্বিতীয় আদেশদাতা ও আদিষ্ট ব্যক্তির মাঝে আধাআধি করে হবে (মুহীত)। যদি আদিষ্ট ব্যক্তির সাথে তৃতীয় অপর কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয় এবং সে ও তাকে এই একই গোলাম খরিদ করার জন্য হুকুম করে আর এই তিন ব্যক্তির

পক্ষ হতে আদিষ্ট হয়ে সে এই গোলাম খরিদ করে তাহলে প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়াই সে যদি তৃতীয় ব্যক্তিকে বলে, হাঁ, ঠিক আছে; তবে প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তিই শরীকীভাবে এই গোলামের মালিক হবে। তৃতীয় ব্যক্তি এর থেকে কিছুই পাবে না। এমনভাবে খরিদদার ব্যক্তিও এর মালিক হবে না। পক্ষান্তরে আদিষ্ট ব্যক্তি যদি প্রথমোক্ত দুই আদেশদাতা ব্যক্তির সামনে হ্যাঁ, ঠিক আছে বলে তাহলে তৃতীয় আদেশ দাতা ব্যক্তি এবং খরিদদার ব্যক্তি আধাআধি করে এই গোলামের মালিক হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৭. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে আছে; হিশাম (র) বলেন; আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম; যদি এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি অমুক বর্ণের কাপড়টি বিশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়ে এসে, টাকা আমি দিব এবং কাপড়টি আমাদের উভয় জনের হবে, তাহলে এভাবে কাপড় খরিদ করা জায়েয আছে কিনা? জবাবে তিনি বললেন; হ্যাঁ, জায়েয আছে এবং তারা উভয়ে এর মালিক। তবে শর্তটি বাতিল বলে গণ্য হবে। মুনতাকা গ্রন্থে এও উল্লেখ আছে যে, ফকীহ ইবরাহীম (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি অমুকের দাসীটি আমার এবং তোমার জন্য খরিদ করে নিয়ে এসো এই শর্তে যে, একে আমিই বিক্রি করতে পারব, এরূপ শর্তে শিরকাত চুক্তি করা হলে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে চুক্তি জায়েয হবে। কিন্তু শর্ত ফাসিদ বলে গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, শিরকাত চুক্তির মধ্যে যদি ফাসিদ শর্ত আরোপ করা হয় তবে শিরকাত চুক্তি তো জায়েয হবে। কিন্তু শর্ত ফাসিদ বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, যদি উক্ত ব্যক্তি বলে, এই শর্তে যে, আমরা এটিকে বিক্রি করতে পারব, তাহলে শিরকাত চুক্তি জায়েয হবে এবং গোলামটি তাদের উভয়ের মাঝে শরীকী গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। কাজেই তারা এটিকে নিজেদের ব্যবসা হিসাবে বিক্রি করতে পারবে (মুহীত)।

৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল; আমাদের দুজনের কেউ এই গোলামটি খরিদ করলে অপরজন তাতে অবশ্যই শরীক হবে। এভাবে চুক্তি করা জায়েয। কাজেই উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের কেউ তাকে খরিদ করলে সে এর অর্ধেক নিজের জন্য এবং বাকী অর্ধেক তার সাথীর জন্য খরিদ করেছে বলে গণ্য হবে। অতএব (গোলামটিকে) তাদের একজনের কবজা করাই উভয় জনের কবজা করার নামান্তর। সুতরাং গোলাম যদি মারা যায় তবে তাদের উভয়ের মাল থেকে এই ক্ষতি ধর্তব্য হবে। যদি তারা উভয়ে গোলামটিকে এক সাথে খরিদ করে অথবা প্রথমে একজনে অর্ধেক খরিদ করে তারপর অপর জনে বাকী অর্ধেক খরিদ করে তাহলেও এটি শরীকী গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। এহেন অবস্থায় যদি তাদের একজনে অপর জনের অনুমতি ছাড়াই পূর্ণ মূল্য আদায় করে দেয় তাহলে সে তার অপর সাথীর নিকট থেকে অর্ধমূল্য উসূল করে নিবে (ফাতহুল কাদীর)। শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই অপরজনকে গোলামটি বিক্রি করে দেওয়ার অনুমতি প্রদানের পর কোন একজনে যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট একে এই শর্তে বিক্রি করে যে, সে এই গোলামের অর্ধেকের মালিক তাহলে সে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে অপর শরীকের অংশ বিক্রয় করেছে বলে গণ্য হবে। আর সে যদি অর্ধেক استثناء করে অর্থাৎ বাদ দিয়ে এই গোলাম বিক্রি করে তবে পূর্ণ মূল্য এবং অর্ধেক গোলাম আধাআধি করে তাদের উভয়ের শরীকানাভুক্ত হিসাবে ধর্তব্য হবে। এটি ইমাম

আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে বেচাকেনা বিক্রয়কারী ব্যক্তির অংশের উপর প্রযোজ্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। মুনতাকা গ্রন্থে আছে, হিশাম (র) বলেন, আমি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-কে বলতে শুনেছি, যদি কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সাহীন অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, আমার নিকট দশ হাজার দিরহাম আছে; তা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নিয়ে নাও তাহলে এরূপ অংশীদারি চুক্তি জায়েয হবে এবং লাভ-লোকসান তাদের উভয়ের উপর বর্তাবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি গোলাম খরিদ করে তাকে কবজা করে নিয়েছে। তারপর অপর এক ব্যক্তি তাতে শরীক থাকার জন্য আবেদন করল এবং এই আবেদনের প্রেক্ষিতে সে তাকে শরীকও করে নিল। তাহলে খরিদদার ব্যক্তি যে মূল্যের বিনিময়ে এ গোলাম খরিদ করেছে এর অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করার মাধ্যমে আবেদনকারী ব্যক্তি এ গোলামের অর্ধেকের মালিক হবে। কেননা শিরকাত সমান হারে ভাগভাগিকে চায়। অবশ্য যদি স্পষ্টভাবে এ কথা বলে দেওয়া হয় যে, সমান হারে ভাগভাগি হবে না তাহলে শিরকাত বর্ণনা অনুসারেই সাব্যস্ত হবে (ফাতহুল কাদীর)। এমনভাবে যদি শরীকী দুই ব্যক্তি কোন বস্তুতে তৃতীয় অপর কোন ব্যক্তিকে শরীক করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে এবং উক্ত বস্তুটি তিন ভাগ করে তাদের মাঝে বন্টন করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক ব্যক্তি কোন গোলাম খরিদ করার পর তাকে সে কবজাও করে নিল। তারপর অন্য এক ব্যক্তি “আমাকেও এতে শরীক করে নাও বললে” সে তাকেও শরীক করে নিল। এরপর আরেক ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাতের পর সেও তাকে অনুরূপ বলল, এহেন অবস্থায় যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মুশারাকাতের কথা জানা সত্ত্বেও এরূপ আবেদন করে তাহলে সে গোলামের এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তার যদি বিষয়টি জানা না থাকে তবে প্রথম ব্যক্তি গোলামের অর্ধেকের হকদার হবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিও অর্ধেকের হকদার হবে। আর ত্রেতা ব্যক্তি তাদের মাঝ থেকে খারিজ হয়ে যাবে (মুহীত)। এমনভাবে এক ব্যক্তি গোলাম খরিদ করার পর অপর ব্যক্তি তাকে বলল, আমাকেও এতে শরীক করে নাও। তারপর সে তাতে একে শরীক করে নিল। তারপর কোন ব্যক্তি উক্ত গোলামের অর্ধাংশ মালিকানার ভিত্তিতে নিয়ে গেল। তাহলে শরীক ব্যক্তি গোলামের অবশিষ্ট অর্ধাংশের মালিক হবে। আর ত্রেতা ব্যক্তি তাদের মাঝ থেকে খারিজ হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১০. মাসআলা : কেউ কোন গোলামের অর্ধাংশ খরিদ করার পর যদি অপর কোন ব্যক্তি তাকে বলে যে, আমাকে এতে শরীক করে নাও। তার ধারণা ছিল যে, ত্রেতা ব্যক্তিটি পুরা গোলামকেই খরিদ করে নিয়েছে। তাহলে ত্রেতা ব্যক্তি গোলামের যে অর্ধাংশ খরিদ করেছে সে এই পুরা অর্ধাংশেরই হকদার হবে। আর তার যদি এ কাজ জানা যে, এই পুরা অর্ধাংশেরই হকদার হবে। আর তার যদি এ কথা জানা থাকে যে, ঐ ব্যক্তি গোলামের অর্ধাংশ খরিদ করেছে তাহলে সে অর্ধ গোলামের অর্ধেক পাবে (মুহীত)। এক ব্যক্তি কোন কিছু খরিদ করার পর অপর ব্যক্তি তাকে বলল, এতে আমাকে শরীক করে নাও। তারপর সে তাকে এতে শরীক করে নিল, তাহলে এটিও বিক্রয়ের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। যদি খরিদকৃত বস্তু কবজা করার আগে এমনটি হয় তবে শিরকাত সহীহ হবে না। মালামাল কবজা করার পর ত্রেতা ব্যক্তি

তাকে যদি উক্ত বস্তুতে শরীক করে এবং শরীকী বস্তু উক্ত ব্যক্তির নিকট স্থানান্তর করার পূর্বেই যদি তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মূল্য পরিশোধ করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। জ্ঞাতব্য যে, ক্রেতা ব্যক্তি কর্তৃক আবেদনকারীকে উক্ত মালে শরীক করে নেওয়ার পর আবেদনকারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে তা কবুল করে নেওয়া আবশ্যিক। কেননা اشركتك "আমি তোমাকে শরীক করে নিলাম" কথাটি বিক্রয়ের জন্য ইজাব (প্রস্তাব) মাত্র (তাই এর জন্য কবুল আবশ্যিক)। (ফাতহুল কাদীর)।

১১. মাসআলা : মুনতাকা গ্রহে উল্লেখ আছে, ক্রেতা গোলামের অর্ধেক কবজা করেছে এবং বাকী অর্ধেক কবজা করেনি, এমতাবস্থায় সে যদি কাউকে مقبوض (কবজাকৃত) এবং غير مقبوض (যা কবজা করা হয়নি) অভিজ্ঞ মালের মধ্যে অন্য কাউকে শরীক করে নেয় তাহলে কবজাকৃত মালে তার শিরকাত সহীহ হবে। আর تفرق صفقة (কবজার ভিন্নতা) এর কারণে শরীক ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে এই মাল নিতে পারবে, ইচ্ছা করলে প্রত্যাখ্যানও করতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১২. মাসআলা : কারো ঘরে কিছু আছে এবং সে দাবী করছে যে, এগুলো সবই আমার। তারপর সে অর্ধেক পরিমাণ গমের ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করল। কিন্তু এখনো সে তা কবজা করেনি। ইতিমধ্যে অর্ধেক পরিমাণ গম জ্বলে গেছে, তাহলে শরীক ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে এই অর্ধেক গম নিয়ে নিতে পারবে; আবার ইচ্ছা করলে শিরকাত প্রত্যাখ্যানও করে নিতে পারবে। মালামাল বিক্রি করার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সূরতে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত গম সমূহের থেকে অর্ধেকের মালিকানা দাবী করে তা নিয়ে যায় তাহলে শিরকাত ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হবে। অর্থাৎ বেচাকেনার অবস্থায় অবশিষ্ট অর্ধেকের ক্ষেত্রে তা বহাল থাকবে। আর শিরকাতের অবস্থায় অবশিষ্ট অর্ধেকের মধ্যে তারা উভয়েই শরীক থাকবে। তবে শরীক ব্যক্তির জন্য এ মালামাল গ্রহণ করা ও না করার ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহাজ)।

১৩. মাসআলা : দুই ব্যক্তি কোন গোলাম খরিদ করার পর তারা যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে এতে শরীক করে এবং তারা (ক্রেতা ব্যক্তিদ্বয়) যদি তাকে পর্যায়ক্রমে (অর্থাৎ আগে একজনে, এরপর অপর জনে) তাকে শরীক করে তাহলে শরীক ব্যক্তি অর্ধেক গোলাম পাবে এবং ক্রেতাদ্বয় পাবে অর্ধেক গোলাম (মুহীত : আস-সারাখসী)। আর তারা যদি উভয়ে একসাথে এই গোলামের মালিকানায় তাকে অংশীদার বানায় যেমন তারা উভয়ে একসাথে একত্রে বলল; আমরা তোমাকে এই গোলামের মধ্যে শরীক বানালাম তাহলে ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে ঐ শরীক ব্যক্তি গোলামের এক-তৃতীয়াংশ পাবে (মুহীত)। যদি ক্রেতাদ্বয়ের এক ব্যক্তি তাকে নিজ অংশ এবং অপর জনের অংশের অংশীদার বানায়, তারপর অপর ব্যক্তি এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে অংশীদার ব্যক্তি পাবে অর্ধেক গোলাম এবং ক্রেতাদ্বয় পাবে অর্ধেক গোলাম (মুহীত : আস-সারাখসী)।

আর অপর জনে যদি অনুমতি না দেয় তবে অংশীদার ব্যক্তি যে তাকে অংশীদার বানিয়েছে তার অংশের অর্ধেক পাবে। অর্থাৎ সে ঐ গোলামের এক চতুর্থাংশে হকদার হবে (মুহীত)। যদি ক্রেতাদ্বয়ের একজনে অপর জনের অনুমতি ক্রমে তাকে শরীক বানায় তাহলে এ গোলামকে তাদের মাঝে সমান-সমান হারে তিন ভাগ করা হবে (মাবসূত)।

১৪. মাসআলা : দুই ব্যক্তি গোলাম খরিদ করার পর তৃতীয় কেউ তাদের একজনকে বলল, আমাকে এই গোলামের মধ্যে তোমাদের উভয়ের অংশীদার বানিয়ে নাও। আর সে তাই করল। এখন দ্বিতীয়জন সম্মত হলে তৃতীয়জন গোলামের এক-তৃতীয়াংশ পাবে। আর সম্মত না হলে তৃতীয় জন ষষ্ঠাংশ পাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি ক্রেতাদ্বয়ের একজনে বলে, আমি তোমাকে এই গোলামের অর্ধেকের মধ্যে শরীক করলাম, তাহলে এর হুকুম কি হবে; এ সম্বন্ধে ইবন সিমআ (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এ বক্তব্যের দ্বারা সে (হবু) অংশীদার ব্যক্তিকে তার খরিদকৃত হিস্যার পূর্ণ অংশের মালিক বানিয়ে দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, قد اشركتك في نصف هذا العبد (আমি তোমাকে এই গোলামের অর্ধেকের মধ্যে শরীক করলাম) বাক্যটি بنصف (আমি তোমাকে এর অর্ধেকের শরীক বানালাম) বাক্যের অনুরূপই। এ কারণেই দেখা যায় যে, ক্রেতা একজন হওয়া অবস্থায় সে যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, اشركتك في نصفه (আমি তোমাকে এই গোলামের অর্ধেকের মধ্যে শরীক বানালাম) তবে এতে সে অর্ধেক গোলাম পেয়ে যাবে। যেমন اشركتك بيمينه (আমি তোমাকে এর অর্ধেকের শরীক করলাম) বললে উক্ত ব্যক্তি গোলামের অর্ধেকের হকদার হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে, اشركتك في نصيبي (আমি তোমাকে আমার হিস্যায় অংশীদার বানালাম) তাহলে এতে সে ঐ ব্যক্তিকে তার পূর্ণ অংশের মালিক বানাতে পারবে না। কেননা بنصبي (আমার হিস্যার) এর স্থলে نصيبي (আমার হিস্যার মধ্যে) বলেছে। কোন ব্যক্তি যদি اشركتك بنصيبي (আমি তোমাকে আমার সাথে আমার হিস্যার শরীক বানালাম) তাহলে একথা বাতিল বলে গণ্য হবে। সুতরাং শরীক ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির অংশের অর্ধেক পাবে, যে তাকে শরীক বানিয়েছে (ফাতহুল কাদীর)।

১৫. মাসআলা : কেউ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে গোলাম খরিদ করল এবং কবজাও করল তারপর অন্য একজনকে বলল; আমি তোমাকে এতে শরীক করে নিলাম, কিন্তু সে কোন উত্তর করল না। এরপর সে তৃতীয় একজনকে একই কথা বললো। এরপর তারা উভয়েই বলল; আমরা কবুল করে নিলাম। তাহলে এই দুই ব্যক্তি আধাআধি করে গোলামের হকদার হবে এবং ক্রেতা ব্যক্তি তাদের মাঝ থেকে খারিজ হয়ে যাবে (মুহীত)। গোলাম খরিদ করার পর ক্রেতাকে কেউ বলল, আমাকে এতে শরীক করে নাও। তারপর সে তাকে শরীক করে নিলাম বলল। কিন্তু সে "আমি কবুল করে নিলাম" বলল না। এরপর ক্রেতা অপর এক ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমাকে এতে শরীক করে নিলাম। তারপর তারা উভয়ে ক্রেতার প্রস্তাবকে কবুল করে নিল, তাহলে

১. মূল কিতাবে كان له العبد (সে পুরা গোলাম পেয়ে যাবে) বাক্য থেকে সম্ভবতঃ কোন শব্দ বাদ পড়ে গেছে। আসলে হবে كان لم نصف العبد (সে গোলামের অর্ধেক পাবে) তাই অনুবাদ এভাবে করা হয়েছে।

প্রথমোক্ত ব্যক্তি কিছুই পাবে না। বরং শেষোক্ত ব্যক্তি গোলামের অর্ধেক পাবে। এমনিভাবে যদি ক্রেতা ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, আমি তোমাকে এতে শরীক করে নিলাম। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও সে অনুরূপ বলল। তারপর তৃতীয় ব্যক্তিকেও সে অনুরূপ বলল। অথচ তাদের কেউই তার প্রস্তাবকে কবুল করল না। যদি কেউ কবুল করে তাহলে এই গোলাম তার এবং ক্রেতা ব্যক্তির মাঝে শরীকী গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। ক্রেতা যদি তাদের সবাইকে সম্বোধন করে বলে, আমি তোমাদের সকলকে এই গোলামের মধ্যে শরীক করে নিলাম, উক্ত প্রস্তাবের পর যদি তাদের কোন একজনে এই প্রস্তাব কবুল করে নেয় তবে সে গোলামের এক-চতুর্থাংশের হকদার হবে (মুহীত : আস সারাখসী)।

১৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমার কাছে দশ দীনার (স্বর্ণমুদা) আছে, তুমি আমাকে কিছু স্বর্ণ দাও; আমি এই সবগুলোর দ্বারা যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে কিছু মাল-সামান খরিদ করব। কিন্তু সে এর কোন পরিমাণ নির্ধারিত করল না। তারপর সে তাকে পাঁচ দীনার প্রদান করল। তারপর পনের দীনার দ্বারা সে কিছু সামান খরিদ করল। তাহলে এ সামান তাদের মাঝে তিন ভাগে ভাগ করা হবে। যেন সে বলেছিল যে, আমি পনের দীনার দ্বারা যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে কিছু সামান খরিদ করব। কাজেই এ কথা বললে যেভাবে সামান তিনভাগে ভাগ করা হয় অনুরূপভাবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত সামান তিনভাগে ভাগ করা হবে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখিত শিরকাত শব্দের মধ্যে শিরকাতুল আমলাকেরও সম্ভাবনা রয়েছে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি যাচঞাকারী ব্যক্তি সামানের জিন্স (কোন জাতীয় সামান) তা স্পষ্টভাবে বলে দেয়। যেমন গম, যব ইত্যাদি। কোন জাতীয় সামান এ কথা যদি স্পষ্টভাবে না বলে তবে পুরা সামান ক্রেতারই প্রাপ্য হবে। আর অজ্ঞতার কারণে উকীল নিয়োগ করা সহীহ না হওয়ার কারণে ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে ঐ ব্যক্তিকে তার দেওয়া পাঁচ দীনার ফেরত দিয়ে দেওয়া (আল কিনয়া)। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলে যে, এ গোলামটি খরিদ করে এতে আমাকেও শরীক রাখবে, এ কথা শুনে সে বলে, হাঁ ঠিক আছে; তারপর ঐ ব্যক্তি গোলামটি খরিদ করে তাহলে তারা সমান ভাবে এ গোলামের হকদার হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এটিই ইসতিহাসানের দাবী (মুহীত)।

১৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি দশ দীনারের বিনিময়ে একটি গাভী খরিদ করল এবং তা হস্তগতও করে নিল। তারপর কোন ব্যক্তিকে বলল, দুই দীনারের বিনিময়ে আমি তোমাকে এতে শরীক করে নিলাম। তারপর শরীক ব্যক্তি তা কবুলও করে নিল। তাহলে এই শরীক ব্যক্তি গাভীর এক পঞ্চমাংশ পাবে (মুহীত : আস সারাখসী)। এক ব্যক্তি পঞ্চাশ দীনারের বিনিময়ে সাদা তামা বিক্রি করে ক্রেতাকে বলল, এতে আমিও তোমার সাথে শরীক থাকব। ক্রেতা বলল, ঠিক আছে। একথার উপর তারা উভয়ে খামোশ হয়ে গেল। তারপর বিক্রেতা তাতে করে তরমুজ ফল কিনে আনত এবং ক্রেতা তা বাজারে নিয়ে বিক্রি করত। এভাবে বিক্রি করতে করতে যদি তরমুজ সব শেষ হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতা এতে শরীক হবে না। বরং তার সমস্ত শ্রম নিষ্ফল হয়ে যাবে (কিনয়া)। এক ব্যক্তি গম খরিদ করে তা পিষার জন্য এক দিরহাম দিল এবং রুটি বানানোর জন্যও একজনকে এক দিরহাম দিল তারপর ক্রেতা ব্যক্তি এই রুটির মধ্যে আরেক ব্যক্তিকে শরীক করে নিল তাহলে শরীক ব্যক্তি

ক্রেতাকে গমের মূল্য এবং খরচার অর্ধেক প্রদান করবে। এমনিভাবে তুলা ক্রয় করা, তুলা দিয়ে সুতা কাটা এবং এর দ্বারা কাপড় বয়ন করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। অনুরূপভাবে তিল খরিদ করে এর দ্বারা তেল ভাঙ্গানোর ক্ষেত্রেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা ব্যক্তি নিজে আটা পিষে, রুটি তৈরি করে; সুতা কাটে এবং নিজে কাপড় বয়ন করে এবং কাউকে কোন পারিশ্রমিক প্রদান না করে আর মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে শরীক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে খরিদকৃত বস্তুর অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করা। এ ছাড়া আর অন্য কিছু তার উপর ওয়াজিব হবে না (মুহীত)।

১৮. মাসআলা : ক্রেতা ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তি বলল, তুমি আজ যা খরিদ করবে তা তোমার এবং আমার হবে। জবাবে সে বলল, হাঁ ঠিক আছে। তারপর ক্রেতাকে অন্য এক ব্যক্তি বলল, আমার জন্য এ গোলামটি খরিদ কর। এটি আমার এবং তোমার হবে। এবারও সে বলল, হাঁ, ঠিক আছে। এরপর সে ঐ গোলামটি খরিদ করল, তাহলে অর্ধেক গোলামের মালিক হবে শেষোক্ত ব্যক্তি এবং অবশিষ্ট অর্ধেকের মালিক হবে ক্রেতা এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি। আর যদি প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলে, আমার জন্য এ গোলামটি খরিদ কর। এটি আমার ও তোমার হবে। তারপর অপর ব্যক্তি বলল, তুমি যা খরিদ করবে তা আমাদের উভয়ের মাঝে সমানভাবে ভাগাভাগি হবে। এরপর সে ঐ গোলামটি খরিদ করল তাহলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অর্ধেক গোলামের হকদার হবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেকের মালিক হবে ক্রেতা এবং শেষোক্ত ব্যক্তি (মুহীত : আস-সারাখসী)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : যে যে জিনিস মূলধন হতে পারে এবং যে যে জিনিস মূলধন হতে পারে না

১. মাসআলা : শিরকাত বিল মাল (অর্থাৎ দুই বা ততোধিক পক্ষের সকলের মূলধনের ভিত্তিতে অংশীদারি চুক্তি) হলে এ ক্ষেত্রে শিরকাতে ইলান বা শিরকাতে মুফাওয়াযা তখনই জায়েয হবে যদি তাদের মূলধন এমন মূল্য সম্পন্ন বস্তু হয় যা عقود المبادلات (বিনিময় চুক্তি) এর মধ্যে متعین (সুনির্ধারিত) হয় না, যেমন- দিরহাম, দীনার, টাকা-পয়সা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব জিনিস عقود المبادلات তথা বিনিময় চুক্তির মধ্যে متعین অর্থাৎ সুনির্ধারিত, যেমন মাল-সামান, জীব-জানোয়ার ইত্যাদি। এসবের ভিত্তিতে শিরকাত চুক্তি সহীহ হবে না। চাই উভয়ের মূলধন এ জাতীয় বস্তু হোক বা কোন একজনের মূলধন এ জাতীয় বস্তু হোক। উভয় অবস্থাতেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত)। শিরকাত চুক্তি সম্পাদনের সময় অথবা শিরকাত চুক্তির ভিত্তিতে মাল খরিদ করার সময় টাকা-পয়সা হাযির থাকা আবশ্যিক (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। ফাতাওয়ায়ে কাযীখানেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। অতএব কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে বলে, তুমিও অনুরূপ পরিমাণ দিরহাম (টাকা-পয়সা) নিয়ে এর দ্বারা মাল খরিদ কর এবং পরে তা বিক্রি করে দাও। তারপর সে তার কথা মত দিরহাম নিয়ে এর দ্বারা মাল খরিদ করল, তাহলে শিরকাত সহীহ হবে (সুগরা)। অনুপস্থিত অর্থ এবং পাওনা টাকার ভিত্তিতে অংশীদারি ব্যবসার চুক্তি করা হলে দুই অবস্থার কোন অবস্থাতেই শিরকাত সহীহ হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা : চুক্তি সম্পাদনের সময় মূলধনের পরিমাণ সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকা আমাদের মাযহাবে শর্ত নয় (বাদায়ে)। চুক্তি সম্পাদনের মজলিসে উভয় পক্ষের মূলধন হস্তান্তর করা এবং তা একত্রে জমা ও মিশ্রিত করাও শর্ত নয় (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। যদি একজনের এক হাজার দিরহাম এবং অপর জনের একশ দীনার, অথবা একজনের সাদা দিরহাম এবং অপর জনের কালো দিরহাম দ্বারা যৌথ ব্যবসায়ের চুক্তি করা হয় তাহলে এ শিরকাত চুক্তি জায়েয হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের টুকরা মাল-সামানের পর্যায়ভুক্ত। কাজেই এগুলো যৌথ ব্যবসায়ের মূলধন হতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বিগুন মতানুসারে যে দেশে এসবের লেনদেন মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে সে দেশে স্বর্ণ-রৌপ্যের টুকরা মূলধন হতে পারবে। আর যে দেশে এসবের লেনদেন চালু নেই সে দেশে এসবের ভিত্তিতে লেনদেন করা জায়েয হবে না (তাহযীব)। সোনা-রূপার অলংকার সকল বর্ণনা অনুসারে মাল-সামানের পর্যায়ভুক্ত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অচল ও অকেজো পয়সা দ্বারা শিরকাত ও মুযারাবা করা জায়েয হবে না। কেননা এগুলো মাল-সামানের অন্তর্ভুক্ত। আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মশহুর বর্ণনা অনুসারে চালু পয়সা দ্বারাও শিরকাত এবং মুযারাবা সহীহ নয়। অবশ্য ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা জায়েয আছে (বাদায়ে)। এর উপরই ফাতওয়া (সিরাজিয়া ও মুযমারাত)। মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সহীহ মতে চালু পয়সা দ্বারা যৌথ ব্যবসা করা সকল ইমামের মতেই জায়েয (কাফী)।

৩. মাসআলা : পরিমাপ যোগ্য বস্তু এবং ওজন যোগ্য বস্তু একই জাতীয় মাল হলে মিশ্রণের আগে আর দুই ধরনের মাল হলে মিশ্রণের আগে বা পরে কোন অবস্থাতেই এর ভিত্তিতে শিরকাত জায়েয হবে না। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত (মুহীত)। এতদসত্ত্বেও যদি এগুলোকে মূলধন ধরে শরীকানা ব্যবসার চুক্তি করা হয় তবে (চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে) এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ মাল-সামান পেয়ে যাবে। আর এতে লাভ-লোকসান যা হবে, প্রত্যেকের লাভ-লোকসান নিজের উপরই বর্তাবে। অন্যের উপর নয় (কাফী)। যদি এক জাতীয় মাল হয় এবং তা মিশিয়ে ফেলা হয় তাহলে শিরকাতুল আকুদ ফাসিদ হয়ে যাবে এবং এ শিরকাত শিরকাতুল মিলক হিসাবে গণ্য হবে এবং লাভ-লোকসান হারাহারি ভাবে উভয়ের উপর বর্তাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। এটিই যাহিরী রিওয়ায়েত (কাফী)। যদি ভিন্ন জাতীয় বস্তু একত্রে মিশিয়ে উভয়ে মিলে বিক্রি করে তবে মাল মিশ্রিত করণের দিন প্রত্যেকের মালের যে মূল্য ছিল সে মূল্য হারেই তাদের মাঝে বিক্রিত মূল্য বন্টন করা হবে (মাবসূত)। অধিকাংশ মাশাইখে কিরাম বলেন, বিগুন মতে বিক্রয়ের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি কারো মালের অবস্থা এমন হয় যে, মিশানোর কারণে এর মূল্য বেড়ে যায় তাহলে অমিশ্রিত অবস্থায় মূল্য অনুপাতেই তাকে বিক্রিত মূল্য হতে প্রদান করা হবে (মুহীত)। ফাতহুল কাদীর গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৪. মাসআলা : দুই ব্যক্তি মিলে এক সের গম এবং এক সের যবের বিনিময়ে কোন সামান খরিদ করল, একজনে গম মেপে দিল এবং অপর জনে যব মেপে দিল। তারপর তারা উভয়ে

মিলে ঐ (খরিদকৃত) সামানটি বিক্রি করে দিল। তাহলে বিক্রিত মালের মূল্য তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে এবং গম ও যবের বন্টন দিনের মূল্য অনুপাতেই বন্টন করা হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। শরীক ব্যক্তিদ্বয়ের মূলধনের যে অংশের ক্ষেত্রে লাভের শর্ত আরোপ করা হয়েছে, শিরকাত চুক্তির সময় সে অংশের যে মূল্য ছিল ঐ মূল্যই ধর্তব্য হবে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্রয়ের সময় মূলধনের যে মূল্য ছিল তা ধর্তব্য হবে। আর তাদের উভয়ের হিস্যায় বা কোন একজনের হিস্যায় লাভলাভ প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে বন্টনের সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মূলধনের বিষয়টি স্পষ্ট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত লাভের বিষয়টিও স্পষ্ট হবে না (কিনয়া)।

৫. মাসআলা : মাল-সামান এবং যেসব বস্তু নির্দিষ্ট করণের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়, এসবের ভিত্তিতে শিরকাত চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। কৌশলটি হল, শরীকদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মালের অর্ধেক অপর শরীকের মালের অর্ধাংশের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। ফলে তাদের দুজনের প্রত্যেকেই অপরজনের অংশের অর্ধেকের মালিক হয়ে যাবে। এতে এ শিরকাত শিরকাতে মিলক বলে গণ্য হবে। তারপর তারা উভয়ে শিরকাতে আকদের চুক্তি সম্পাদন করবে। তাহলে এই শিরকাত জায়েয হয়ে যাবে। এতে কারো দ্বিমত নেই (বাদায়ে)। যদি উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের সামানের মধ্যে ব্যবধান থাকে, যেমন একজনের মালের মূল্য একশ টাকা এবং অপর জনের মালের মূল্য চারশ টাকা তাহলে যার মালের মূল্য কম সে তার মালের চার-পঞ্চমাংশ অপর জনের মালের এক-পঞ্চমাংশের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। ফলে এই সামান তাদের মাঝে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হবে। অর্থাৎ যার মালের মূল্য কম সে পাবে এক পঞ্চমাংশ এবং অপর জন পাবে চার-পঞ্চমাংশ (কাফী)। তদ্রূপ যদি শরীকদ্বয়ের একজনের দিরহাম আর অপর জনের মাল-সামান থাকে তাহলে সামানের মালিক তার মালের অর্ধেক অপর জনের নিকট তার দিরহামের অর্ধেক পরিমাণের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে এবং এরপর তারা তাদের নিজ নিজ অংশ হস্তগতও করে নিবে। তারপর এদিকে তারা তাদের ইচ্ছামত শিরকাতে মুফাওয়াযা বা শিরকাতে হিসাবে সাব্যস্ত করতে পারবে (মুহীত)।

৬. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে আছে, হিলাম (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, দুই ব্যক্তির প্রত্যেকের নিকটই কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে। তারা এগুলোকে একত্রে মিশিয়ে নিজেরা শিরকাত চুক্তি করল। অথচ তাদের একজনের খাদ্য দ্রব্য অপরজনের খাদ্য-সামগ্রী থেকে উন্নত। তাহলে এই শিরকাত চুক্তি জায়েয হবে এবং এগুলো বিক্রি করার পর এর মূল্য তাদের মাঝে সম হারে বন্টন করা হবে। কেননা শরীকানার ভিত্তিতে এগুলোকে মিশিয়ে নেওয়ার পর তা ক্রয়-বিক্রয়ের মতই হয়ে গেছে। উক্ত কিতাবের অন্য এক স্থানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, বিক্রিত মালের মূল্য তাদের মাঝে বন্টন করা হবে। তবে যে দিন তারা ঐ মাল বিক্রি করেছে সেদিন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মালের কি মূল্য ছিল সে মূল্য অনুপাতে এ বন্টন কর্ম সম্পাদন করা হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। দ্বিতীয় অভিমতটি উসূলে ফিকহ এর কানুনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (আন্ নাহরুল ফায়িক)। উপরোক্ত মাসাইল সম্বন্ধে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিরকাতে মুফাওয়াযার মাসাইল

[এ পরিচ্ছেদে আটটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ : শিরকাতে মুফাওয়াযার ব্যাখ্যা, পরিচিতি ও শর্তাবলী

১. মাসআলা : শিরকাতে মুফাওয়াযা অর্থ সম-অংশীদারি কারবার। অর্থাৎ যদি দুই (বা ততোধিক) অংশীদার এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা মূলধন, লাভ-লোকসান, কর্ম ও পদক্ষেপ এবং দায়-দেনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সম-অংশীদার হবে। এরূপ শরীকানা ব্যবসায় শরীকদের প্রত্যেকেই অন্যের খরিদকৃত মালের দায়-দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে যামিন ও কফীল, যেমনি ভাবে তাদের প্রত্যেকেই একে অপরের উকীল (ফাতহুল কাদীর)। আযাদ, বালিগ দুই ব্যক্তির মাঝে শিরকাতে মুফাওয়াযা জায়েয হবে। চাই তারা উভয়ে মুসলমান হোক বা যিম্মী হোক (হিদায়া)। একজন কিতাবী এবং অপরজন অগ্নিপূজক হলেও তাদের জন্য সম-অংশীদারি কারবার জায়েয হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। আযাদ ও দাস, এমনিভাবে বালিগ ও নাবালিগের মধ্যে শিরকাতে মুফাওয়াযা জায়েয নেই (আন-নাফি)। অনুরূপভাবে আযাদ ও মুকাতাব এই দুব্যক্তি মিলে যদি সম-অংশীদারি ব্যবসার চুক্তি করে তবে এ শিরকাতে মুফাওয়াযা জায়েয হবে না (আল-জাওহরাতুন নায্যারা)। পাগল ও জ্ঞানবান ব্যক্তির মাঝে শিরকাতে মুফাওয়াযা সহীহ নয় (আয়নী শরহুল কানযা)। দুই গোলাম, দুই নাবালিগ এবং দুই মুফাতাবের মাঝে শিরকাতে মুফাওয়াযা সহীহ নয় (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। যদি আযাদ মুসলমান কোন মুরতাদ পুরুষ বা মুরতাদ মহিলা বা কোন যিম্মীর সাথে সম-অংশীদারি কারবারের চুক্তি করে তাহলে শিরকাতে মুফাওয়াযা সহীহ হবে না। পক্ষান্তরে ঐ মুরতাদ ব্যক্তির উপর হরবীদের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার হুকুম দেওয়ার আগেই যদি সে মুসলমান হয়ে যায় তবে ঐ শিরকাতে মুফাওয়াযা সহীহ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা : যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির শিরকাতে মুফাওয়াযা করার সূরত এই যে, প্রথমে তারা চুক্তিবদ্ধ হবে এবং বলবে আমরা শিরকাতে মুফাওয়াযা (সম-অংশীদারি কারবার) করলাম। চাই আমাদের মাল কম হোক বা বেশী হোক। এই শর্তে যে, আমরা উভয়ে মিলে বা পৃথকভাবে নগদ কিংবা বাকীতে যেভাবে স্বাধীন মত মালামাল খরিদ করব এবং বিক্রি করব। তারপর আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসায় কিছু মুনাফা দেয় তাহলে আমরা তা সমান হারে ভাগ করে নিব। আর লোকসান হলে এ ক্ষেত্রেও আমরা উভয়ে এর দায়-দায়িত্ব বহন করব। সদরুল ইসলাম (র) কর্তৃক প্রণীত মাবসূত গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে (মুযমারাত)।

৩. মাসআলা : শিরকাতে মুফাওয়াযা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল, (১) চুক্তি সম্পাদন কালে মুফাওয়াযা (সম-অংশীদারি কারবার) কথাটি উল্লেখ করা (মুহীত)। মুফাওয়াযার অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞাত এমন কোন ব্যক্তি যদি মুফাওয়াযা শব্দ উচ্চারণ ব্যতিরেকে চুক্তি সম্পাদন করে এবং এতে যদি মুফাওয়াযার অর্থ পুরাপুরি এসে যায় তাহলেও মুফাওয়াযা সহীহ হয়ে যাবে (মুযমারাত)। (২) শিরকাতে মুফাওয়াযার অংশীদারদের প্রত্যেকেই কাফালা তথা যামিন হওয়ার উপযুক্ততা সম্পন্ন হতে হবে। যেমন তাদের বালিগ, আযাদ, জ্ঞানবান হওয়া এবং দীনী দিক থেকে তাদের একই ধর্মাদর্শের অনুসারী হওয়া (যখীরা)। আম (ব্যাপক) অর্থাৎ সর্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সম-অংশীদারি চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে (মুহীত)। (৪) অংশীদারদের মূলধন চাই এক জাতীয় ও এক ধরনের হোক কিংবা দুই জাতীয় হোক যেমন দিরহাম ও দীনার অথবা কেবল এক জাতীয় হোক সর্বাবস্থায় তাদের প্রত্যেকের মূলধন সম-পরিমাণের হতে হবে। কিন্তু মূলধনের نوع বা ধরন যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমন ভাংতি দিরহাম ও সহীহ দিরহাম তাহলে এ ক্ষেত্রে মূল্যের দিক থেকেও অংশীদারদের মূলধন সমান-সমান হওয়া জরুরী (যখীরা)। (৫) সম-অংশীদার কারবারের সূচনা এবং শেষ অবস্থায় অংশীদারদের কারো নিকটই উক্ত মূলধন ব্যতীত অন্য এমন কোন মূলধন থাকতে পারবে না যার মাঝে আকদে শিরকাত জায়েয হয় (আল-মুহীত)। শিরকাত চুক্তি সম্পাদনকালে শরীক ব্যক্তিদের সকলের মালের পরিমাণ সমান ছিল এ কারণে শিরকাত ও সহীহ হয়েছিল। তারপর তাদের মূলধন দ্বারা মালামাল খরিদ করার পূর্বে কোন একজনের অংশ কিছুটা বেড়ে গেল যেমন মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনের পর মাল খরিদ করার আগে কোন একজনের মুদ্রার মূল্য বেড়ে গেল তাহলে মুফাওয়াযা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং তা শিরকাতে ইনানে পরিণত হবে। এমনিভাবে যদি শরীকদের কোন একজনের মুদ্রা দ্বারা মাল খরিদ করার কারণে তার মূলধনের দাম বেড়ে যায় তাহলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি শরীকদের সকলের মূলধন দ্বারা মালামাল খরিদের পর কোন একজনের মূলধন বেড়ে যায় তাহলে শিরকাতে মুফাওয়াযা বহাল থাকবে (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। যদি মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনের পর শরীকদ্বয়ের এমন মাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে মালের দ্বারা শিরকাত সহীহ হয় না-যেমন আসবাব সামগ্রী, জমি, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি তাহলে শিরকাতে মুফাওয়াযা জায়েয থাকবে। অনুপস্থিত মালেরও এই একই হুকুম (বাদায়ে)। এমনিভাবে যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজনের নগদ টাকা পয়সা অন্য কারো কাছে আমানত থাকে তাহলেও মুফাওয়াযা সহীহ হবে না। যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজনে তৃতীয় অপর কোন ব্যক্তির কাছে টাকা-পয়সা পাওনা থাকে তাহলে এ টাকা-পয়সা উসুল না হওয়া পর্যন্ত শিরকাত সহীহ হবে। কিন্তু উসুল হওয়ার পর শিরকাতে মুফাওয়াযা ফাসিদ হয়ে তা শিরকাতে ইনানে পরিণত হয়ে যাবে। এমনিভাবে মূলধনে تصرف (ব্যবহার ও হস্তক্ষেপ) করার ক্ষেত্রেও শরীকদ্বয়ের মধ্যে সমতা বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। কাজেই যদি তাদের কোন একজনের মূলধনে تصرف এর অধিকার থাকে এবং অপরজনের অধিকার না থাকে তাহলে সমতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শিরকাতে মুফাওয়াযার বিধি-বিধান

১. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই যা কিছু খরিদ করবে তা শরীকী বস্তু হিসাবেই গণ্য হবে। কিন্তু পরিবার পরিজনের খাদ্য দ্রব্য ও লেবাস-পোশাক, এমনি ভাবে তার নিজের লেবাস-পোশাক এ হুকুম হতে ব্যতিক্রম হবে। সালন ও তরকারির হুকুমও অনুরূপ। এটি ইস্তিহসানের কথা (হিদায়া)। মৃতআ এবং খোর-পোষের হুকুমও অনুরূপই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বসবাসের জন্য কোন বাড়ি-ঘর ইজারা নেওয়া এবং নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন যেমন হজ্জ ইত্যাদি কাজ সমাধা করার জন্য কোন সওয়ারী ইজারা নেওয়ার হুকুমও এরূপই (তাবয়ীন)। অর্থাৎ এসব বিষয় ক্রেতা ব্যক্তির সাথে খাস হবে। এতদসত্ত্বেও এসব বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে অপর অংশীদার ব্যক্তি তার পক্ষ হতে কফীল (যামিন) হিসাবে গণ্য হবে। কাজেই ক্রেতা ব্যক্তি তার নিজের জন্য এবং নিজের পরিবার-পরিজনের যেসব খাদ্য-দ্রব্য ও লেবাস-পোশাক খরিদ করবে এবং তাদের জন্য যে তরকারি খরিদ করবে এসবের ক্ষেত্রে বিক্রেতা দ্বিতীয় শরীক ব্যক্তির নিকটে এর মূল্য দাবী করতে পারবে। তারপর সে ক্রেতা ব্যক্তির হতে তার পরিশোধকৃত অর্থ উসূল করে নিবে (ফাতহুল কাদীর)। খরিদকৃত বস্তুর মূল্য ক্রেতা নিজেই যদি পরিশোধ করে তবে শরীক ব্যক্তি তার থেকে এর অর্ধেক মূল্য উসূল করে নিবে (মুহীত : আস সারাখসী)।

২. মাসআলা : শরীকদ্বয়ের কোন একজনের জন্য অপরজনের অনুমতি ছাড়া সহবাস ও খিদমতের জন্য দাসী খরিদ করা জায়েয নেই। অগত্যা যদি খরিদ করেই বসে তবে তার সাথে সহবাস করা কারো জন্যই জায়েয হবে না। ক্রেতার জন্যও নয় এবং শরীক ব্যক্তির জন্যও নয়; কেননা এই দাসী তাদের উভয়ের শরীকানায় এসে গেছে। কাজেই তাদের উভয়ের বলেই গণ্য হবে (বাদায়ে)। ক্রেতা যদি শরীক ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে সহবাসের উদ্দেশ্যে দাসী খরিদ করে তবে সে তার দামী বলেই গণ্য হবে। এহেন অবস্থায় বিক্রেতা তাদের দুজনের যে কাউকেই ধরতে পারবে। সাহেবাইনের মতে এরূপ অবস্থায় শরীক ব্যক্তি অর্ধেক মূল্য ক্রেতার নিকট থেকে উসূল করে নিতে পারবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে কিছুই পাবে না। জামে সগীর গ্রন্থে মাসআলাটি এভাবেই বর্ণিত রয়েছে (মুহীত : আস সারাখসী)। শরীক ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে সহবাসের জন্য কোন দাসী খরিদ করার পর যদি তার থেকে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হয় (এবং এতে সে উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যায়); এরপর কেউ যদি এ দাসীর মালিকানা দাবী করে তাকে নিয়ে নেয় তাহলে সহবাসকারী ব্যক্তির উপর উকর (পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করার জরিমানা) ওয়াজিব হবে। দাসীর ন্যায্য হকদার ব্যক্তি শরীকদ্বয়ের দুজনের যে কারো নিকট থেকে তা নিয়ে নিতে পারবে (বাদায়ে)।

৩. মাসআলা : সম-অংশীদারি কারবারে অংশীদারদের কেউ যদি মীরাস সূত্রে কোন সম্পদ প্রাপ্ত হয় তবে অপর ব্যক্তি এতে অংশীদার সাব্যস্ত হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি বাদশাহর পক্ষ থেকে কোন উপটোকন বা হিবা বাকত কিছু মালপ্রাপ্ত হয় বা অন্য কারো তরফ হতে কোন সাদাকা প্রাপ্ত হয় তবে অপর ব্যক্তি এতে অংশীদার সাব্যস্ত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

হাদিয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (মাবসূত)। উপরোক্ত সূত্রে শরীকানার ভিত্তিতে কোন মালে শরীকদ্বয়ের কোন একজনের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার পর অপরজন আর এতে অংশীদার সাব্যস্ত হতে পারবে না। যেমনিভাবে শরীকদ্বয়ের কোন একজনে বিক্রেতার খিয়ারের শর্তে গোলাম খরিদ করার পর ক্রেতা যদি অপর কারো সাথে শিরকাতে মুফাওয়াযার চুক্তি করে, তারপর খিয়ার রহিত করে দেয় তাহলে উক্ত গোলামের মধ্যে শরীক ব্যক্তির কোন শরীকানা থাকে না (কাফী)। যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজনের নিকটে কিছু মাল আমানত থাকে তবে তা উভয়ের নিকট রক্ষিত আমানত হিসাবে গণ্য হবে। আমানতের কথা কারো কাছে বলার আগেই যদি আমানত গ্রহীতা ব্যক্তি মারা যায় তাহলে উভয় শরীকের উপর অপরিহার্য হবে এ আমানত পরিশোধ করে দেওয়া। যদি জীবিত ব্যক্তি বলে যে, এই মাল আমানত গ্রহীতা ব্যক্তির হাতেই তার মারা যাওয়ার আগে নষ্ট হয়ে গেছে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি জীবিত ব্যক্তি নিজেই আমানত গ্রহীতা হয় তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (মাবসূত)। যদি আমানত গ্রহীতা ব্যক্তি বলে যে, আমার সাথীর মৃত্যুবরণের আগেই আমি এ বস্তু খেয়ে ফেলেছি তাহলে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। কিন্তু সে যদি তার বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে জরিমানা উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। শরীকদ্বয়ের কোন একজনের কাছে মুযারাবাতের মাল ছিল এবং এর দ্বারা সে লাভবানও হয় অথবা তাদের কারো নিকট আমানতের মাল ছিল, কিন্তু আমানতী মাল হওয়ার কারণে এর দ্বারা সে কোন রূপ লাভবান হতে পারেনি তাহলে লাভ উভয়ের মধ্যে হারাহারি করে ভাগ করে দেওয়া হবে (মাবসূত)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শিরকাতে মুফাওয়াযার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের দায়-দায়িত্ব

১. মাসআলা : শিরকাতুল মুফাওয়াযার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়ের কোন একজনে যদি এমন ব্যক্তির মালামালের দায়বদ্ধতার ব্যাপারে নিজের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যার সাক্ষ্য তার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য তাহলে এ কারণে অপর শরীক ব্যক্তিকেও ধরা যাবে। অর্থাৎ তার নিকটেও এই পাওনার ব্যাপারে তাগাদা করা যাবে। আর হকদার ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে; সে ইচ্ছা করলে তাদের উভয়ের উপস্থিতিতে ও এর তাগাদা করতে আবার পৃথক-পৃথক ভাবেও তাদের নিকট এর তাগাদা করতে পারবে (মুযমারাত)। শরীকদ্বয়ের কোন একজনে যদি এমন ব্যক্তির পাওনার ব্যাপারে স্বীয় স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যার সাক্ষ্য তার অনুকূলে গ্রহণযোগ্য নয় যেমন সে তার বাবা-মা, ভাই বা এ জাতীয় কারো পাওনার ব্যাপারে নিজের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করল তাহলে তার শরীকের ক্ষেত্রে এ স্বীকারোক্তি সহীহ হবে না। কাজেই এ ব্যাপারে তার শরীক ব্যক্তির নিকটে কোন তাগাদা করা যাবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত এবং এটিই স্পষ্ট কথা (আল-মুহীত)। এমনিভাবে নিজের বায়িন তালাক দেওয়া স্ত্রী যে ইদত পালনরত আছে তার জন্য যদি সে কোন কিছুর ইকরার করে তবে তা সহীহ হবে না (মাবসূত)। শরীকদ্বয়ের একজনে যদি কোন মহিলাকে ফাসিদ তরীকায় বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করে এবং সে তার কাছে মহরানার টাকা পাবে বলে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তবে

শরীক ব্যক্তির উপর তা অপরিহার্য হবে না। কিন্তু অন্যান্য ঋণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করলে তাদের উভয়ের উপর তা পরিশোধ করা অপরিহার্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা : শরীকদ্বয়ের কোন একজনে যদি তার কাছে তার স্ত্রী মা কিছু (টাকা-পয়সা) পাবে বলে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে অথবা স্ত্রীর এমন সন্তানের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে তার ঔরসজাত নয় তাহলে তা তাদের উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা এ স্বীকারোক্তি (اقرار) সাক্ষ্য شهادة প্রদানের মতই।^১

শিরকাতে মুফাওয়াযার ক্ষেত্রে কোন একজন শরীক যদি মহিলা হয় এবং সে যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, আমার স্বামী আমার নিকট কিছু টাকা পাওনা আছে তবে যেমনিভাবে স্ত্রীর সাক্ষ্য তার স্বামীর পক্ষে জায়েয নেই এমনিভাবে তার স্বামীর পক্ষে ঋণের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করাতে শরীক ব্যক্তির উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি অংশীদার মহিলা তার স্বামীর পিতা-মাতার জন্য এবং তার ঐ সন্তানের জন্য কোন কিছু স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে এই মহিলার ঔরসজাত নয় তাহলে তা জায়েয হবে এবং এই ঋণ পরিশোধ করা তার এবং শরীক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। যেমনিভাবে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া তার জন্য জায়েয, এখানেও ঠিক তদ্রূপই হবে (মাবসূত)।

৩. মাসআলা : কোন ব্যক্তি নিজের উম্মু ওয়ালাদকে আযাদ করে দেওয়ার পর যদি তার কোন পাওনার বিষয়ে সে স্বীয় স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাহলে তাদের উভয়ের উপর অপরিহার্য হবে এ ঋণ পরিশোধ করা। যদিও সে ইদতকাল পালনের অবস্থায় থাকে (মাবসূত : সারাখসী)। ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে যে ঋণ শরীকদ্বয়ের কোন একজনের উপর ওয়াজিব হয় সে ঋণের ক্ষেত্রে শরীক ব্যক্তি তার যামিন হিসাবে গণ্য হবে। যেমন বেচাকেনা, ইজারা এবং এতদুভয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন বিষয়, যেমন গযব, ইস্তিহলাক (কোন মাল ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করা), مكفول عنه (যার পক্ষ হতে যামিন হয়েছে) এর পক্ষ হতে তার নির্দেশে কোন মালের ব্যাপারে কাফালত তথা জামানত গ্রহণ করা, কোন বস্তু আরিয়ত প্রদান করা বা বন্ধক রাখা ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি مكفول عنه এর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন মালের কাফালত তথা দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে তার শরীক ব্যক্তিকে এ জন্য ধরা যাবে না। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত (কাফী)। ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (আল-মুহীত)। হকদার ব্যক্তির তার পাওনা দাবী করার ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে একত্রিতভাবে তাদের উভয়ের নিকট তাগাদা করতে পারবে-ইচ্ছা করলে তাদের থেকে পৃথকভাবেও তাগাদা করতে পারবে (মুযমারাত)। তবে এ জরিমানা ওয়াজিব হবে ঐ ব্যক্তির উপর যে এ কাজ করেছে। অতএব এ জরিমানা যদি শরীকী মাল থেকে আদায় করা হয়

১. অর্থাৎ যে ব্যক্তির সাক্ষ্য তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয় তার জন্য কোন কিছুর স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করলে এ স্বীকারোক্তি তার ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য হবে। শরীক ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হবে না। এরপর সাক্ষ্য তার ব্যাপারে বৈধ তার সম্পর্কে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করলে তা উভয়ের উপর প্রযোজ্য হবে।

তাহলে অংশীদার ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি থেকে তার অর্ধেক পাওনা উসূল করে নিবে (মাবসূত)। পক্ষান্তরে ফাসিদ তরীকায়ে মালামাল ক্রয় করার হুকুম এর থেকে ভিন্নতর। কেননা ফাসিদ তরীকায় মালামাল খরিদ করার অবস্থায় জরিমানা শুধুমাত্র ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে না। বরং উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজনে নফস তথা কোন ব্যক্তি কাফালা (দায়-দায়িত্ব) গ্রহণ করে তাহলে কোন ইগামের মতেই শরীক ব্যক্তির নিকট পাওনার ব্যাপারে তাগাদা করা যাবে না। মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী শরীকদ্বয়ের একজনে যদি কারো মহরের কাফালত গ্রহণ করে অথবা অপরাধের জরিমানা পরিশোধের কাফালত গ্রহণ করে তাহলে এর হুকুম كفالت بالدين অর্থাৎ ঋণের কাফালত গ্রহণের অনুরূপ বলেই গণ্য হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : শরীকদ্বয়ের কোন একজনে যদি খরিদকৃত দাসীর সাথে সহবাস করে (তাকে নিয়ে যায়) তবে হকদার ব্যক্তি শরীকদ্বয়ের যে কারো থেকে ইচ্ছা উকর (নর-নারীর সাথে যিনা করার জরিমানা) উসূল করতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)। যদি শরীকদ্বয়ের কারো উপর এমন জরিমানা ওয়াজিব হয় যা ব্যবসার জরিমানার অনুরূপ নয় তাহলে এ কারণে অংশীদার ব্যক্তিকে ধরা যাবে না। যেমন জিনায়াতের জরিমানা, মহর, স্ত্রীর খোরপোষ, অপরাধের বিনিময় (بدل الخلع) এবং কিসামের বিনিময়ে ধার্যকৃত অর্থ ইত্যাদি। উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে ফকীহগণ বলেছেন যে, যদি শরীক ব্যক্তি অপরাধী শরীক ব্যক্তির অপরাধের কথা অস্বীকার করে তবে তার অবগতির ব্যাপারে কসম গ্রহণ করতে পারবে না। রয়েছে) শরীক ব্যক্তির নিকট থেকে তার অবগতির ব্যাপারে কসম গ্রহণ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি শরীকদ্বয়ের কোন একজনের উপর খাদিম বিক্রি করার দাবী (অভিযোগ) করে এবং সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে তবে দাবীকারী (বাদী) বিবাদীর নিকট থেকে কসম গ্রহণ করতে পারবে এবং শরীক ব্যক্তির নিকট থেকেও তার অবগতির ব্যাপারে শপথ নিতে পারবে। কেননা তাদের প্রত্যেকের অবস্থাই এমন যে, তারা যদি বাদী ব্যক্তির অনুরূপ স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তবে তাদের প্রত্যেকের উপরই উক্ত দাবী পূরা করা অপরিহার্য হবে। কিন্তু যিনায়াতের বিষয়টি এর থেকে ভিন্নতর। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে একজনের স্বীকারোক্তির কারণে অন্যজনের উপর কিছু ওয়াজিব হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৫. মাসআলা : যেসব জিনিস আ'মালে তিজারত তথা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কিত এসব জিনিসের ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি শরীকদ্বয়ের কোন একজনের উপর দাবী করে, এরপর বিচারক বিবাদীর নিকট থেকে এ ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করে তাহলে বাদী ব্যক্তি দ্বিতীয় শরীক ব্যক্তির নিকট থেকে শপথ গ্রহণ করতে পারবে (আল-মুহীত)। যদি এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি শরীকদ্বয়ের উভয়ের উপর দাবী করে তাহলে সে (বাদী) তাদের উভয়ের নিকট থেকে অবশ্যই শপথ নিতে পারবে। তাদের কেউ শপথ করতে অস্বীকার করলে তাদের উভয়ের উপর তার দাবী কার্যকরী হয়ে যাবে। আর সে যদি শরীকদ্বয়ের একজনের উপর এ বিষয়ে দাবী করে, এ অবস্থায় সে যদি অনুপস্থিত থাকে তবে বাদী ইচ্ছা করলে উপস্থিত নিকট থেকে তার অবগতির ব্যাপারে শপথ নিতে পারবে। উপস্থিত ব্যক্তি শপথ করার

পর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি এসে হাযির থাকলে তাদের উভয়ের থেকে শপথ গ্রহণ করতে পারে (মাবসূত)। সম-অংশীদারি চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের কোন একজনে যদি আমালে তিজারতের ব্যাপারে অপর কোন ব্যক্তির উপর কোন কিছু দাবী করে এবং বিবাদী বিষয়টি অস্বীকার করে, তারপর বিচারক তাকে শপথ করায়, এরপর দ্বিতীয় শরীক ব্যক্তি তার থেকে শপথ গ্রহণ করতে চাইলে সে তার থেকে শপথ গ্রহণ করতে পারবে না (আল-মুহীত)। যদি কোন ব্যক্তি শরীকদ্বয়ের কোন একজনের উপর কাফালার মালের দাবী করে এবং এ ব্যাপারে তার থেকে শপথ গ্রহণ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতানুসারে বাদী এ বিষয়ে অপর শরীক থেকেও শপথ গ্রহণ করতে পারবে (মাবসূত)।

৬. মাসআলা : মুফাওয়াযার চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের কোন একজনে যদি কিছু মাল বিক্রি করে কিংবা কারো নিকটে বাকীতে কোন মাল বিক্রি করে অথবা তার পক্ষে যদি অপর কোন ব্যক্তি তার ঋণের কফীল হয় অথবা তার থেকে যদি কেউ মাল গযব করে নিয়ে যায় তাহলে অপর শরীক ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে এসব মালের বিষয়ে তাগাদা করার (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শরীকদ্বয়ের কোন একজনে যদি গোলাম ইজারা দেয় তাহলে অপরজনে এর উজরত তথা বিনিময় উসূল করতে পারবে। আর ইজারা গ্রহীতা ব্যক্তিও তার নিকট গোলাম হস্তান্তরের দাবী করতে পারবে। পক্ষান্তরে ঐ শরীক ব্যক্তি যদি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গোলাম ইজারা দেয় অথবা তার নিজস্ব কোন জিনিস যদি সে ইজারা দেয় তবে অপর শরীক ব্যক্তি এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না এবং ইজারা গ্রহীতা ব্যক্তিও গোলাম হস্তান্তরের জন্য তার নিকট কোন দাবী করতে পারবে না (মাবসূত-সারাখসী)। এমনিভাবে যেসব জিনিস শরীকদ্বয়ের কোন একজনের খাস এ জাতীয় কোন জিনিস সে বিক্রি করলে শরীক ব্যক্তি এর মূল্যের ব্যাপারে কোন মুতালাবা (দাবী) করতে পারবে না এবং ক্রেতা ব্যক্তিও শরীক ব্যক্তির নিকট বিক্রিত পণ্য হস্তান্তরের ব্যাপারে কোন দাবী উত্থাপন করতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদন করে শরীকদ্বয় পৃথক হয়ে যাওয়ার পর যদি তাদের কোন একজনে বলে যে, শিরকাতের এই গোলামকে আমি পূর্বেই মুকাতাব সাব্যস্ত করেছিলাম তাহলে তার এই কথা শরীক ব্যক্তির হকের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু তার নিজের হকের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে। শরীক ব্যক্তির হকের ব্যাপারে এ কথা ধরে নেওয়া হবে যে, সে এই মুহূর্তে কিতাবাত চুক্তি সম্পন্ন করেছে। কাজেই শরীক ব্যক্তি এই কথাকে রদ করে দিতে পারবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী দুই শরীকের কোন একজনে যদি নিজেকে কোন কিছু হিফাযতের জন্য; কাপড় সেলাই করার জন্য অথবা অন্য কোন কাজ করার জন্য ইজারা দেয়, তাহলে এই কাজের পারিশ্রমিক উভয়েই প্রাপ্ত হবে। এমনিভাবে তাদের যে কেউ কোন কিছু উপার্জন করলে পারিশ্রমিক তাদের উভয়ের মধ্যে বন্টন করা হবে। কিন্তু তাদের কেউ যদি নিজেকে অপরের খিদমতের জন্য ইজারা দেয় তবে এ পারিশ্রমিক সে নিজে পাবে। অপর ব্যক্তি এতে অংশীদার হবেন (তাতার খানিয়া)। যদি দুই শরীকের একজনে কোন মজদূরকে ইজারায় গ্রহণ করে তবে ইজারাদাতা ব্যক্তি শরীকদ্বয়ের যে কারো নিকট পারিশ্রমিকের দাবী করতে পারবে। কিন্তু সে যদি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ইজারা গ্রহণ

করে অথবা যদি হজে যাওয়ার জন্য কোন সওয়ারী ইজারায় গ্রহণ করে এবং শরীক ব্যক্তি যদি এই ইজারার উজরত পরিশোধ করে তাহলে সে তার পরিশোধকৃত অর্থ উসূল করে নিতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : যে যে কারণে শিরকাতে মুফাওয়াযা বাতিল হয় এবং যে যে কারণে বাতিল হয় না।

১. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী দুই শরীকের কোন একজনে যদি মীরাস, হিবা, ওসীযত ইত্যাদি সূত্রে এমন মালামাল প্রাপ্ত হয় যাতে শিরকাত চুক্তি জায়েয নেই; এরপর এ মাল যদি তার হাতেও এসে যায় তাহলে মুফাওয়াযা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং তাদের শিরকাতে মুফাওয়াযা শিরকাতে ইনানে পরিণত হয়ে যাবে (সিরাজিয়া)। যদি অংশীদারদের কোন একজনে মীরাস সূত্রে কিছু সামান বা পাওনা প্রাপ্ত হয় তবে পাওনা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শিরকাতে মুফাওয়াযা বাতিল হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। জমা-জমির হকুমও অনুরূপই। দুই অংশীদারের কোন একজনের মাল দ্বারা যদি উভয়ে মিলে কিছু মাল খরিদ করে তবে কিয়াসের দাবী অনুসারে শিরকাতে মুফাওয়াযা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইস্তিহসানের দাবী অনুসারে তা বাতিল হবে না। শিরকাত চুক্তি সম্পাদনের সময় উভয়ের মূলধন সমান-সমান ছিল- যার ফলেই শিরকাত সহীহ হয়েছিল। তারপর উভয়ের মালামাল ক্রয় করার আগেই যদি কোন একজনের মূলধন বেড়ে যায় যেমন মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনের পর মূলধন দ্বারা কোন কিছু খরিদ করার পূর্বে শরীকদ্বয়ের কোন একজনের মুদ্রার দান বেড়ে গেল তাহলে মুফাওয়াযা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এমনিভাবে যদি উভয়ের থেকে কোন একজনের মূলধন দ্বারা কোন কিছু খরিদ করার পর অপরজনের মূলধনের মূল্য বেড়ে যায় তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হকুম হবে (আল-মুহীত)। দুই শরীকের কোন একজনে স্বীয় মূলধন দ্বারা কোন মাল খরিদ করার পর যদি কৃত মালের মূল্য বেড়ে যায় তবে কিয়াস অনুসারে শিরকাতে মুফাওয়াযা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইস্তিহসানের আলোকে বাতিল হবে না (মুযমারাত)। উভয়ের মূলধন দ্বারা মালামাল খরিদ করার পর যদি একজনের মূলধনের পরিমাণ বেড়ে যায় তবে শিরকাতে মুফাওয়াযা পূর্ববৎ বহাল থাকবে। এমনিভাবে একজনের মূলধন দিয়ে মাল খরিদ করার পর যদি এই অংশের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলেও মুফাওয়াযা বাতিল হবে না (যহীরিয়া)।

২. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী দুই শরীকের কোন একজনে তৃতীয় অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমাকে এক দিরহাম হিবা কর। তারপর সে তাকে এক দিরহাম হিবা করে তার নিকট তা হস্তান্তরও করে দিল তাহলে মুফাওয়াযা বাতিল হয়ে যাবে। যদিও শরীক ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে। যদি দুই শরীকের কোন একজনে অপরজনের অনুপস্থিতিতে মুফাওয়াযা চুক্তি ভঙ্গ করে দিতে চায় তাহলে তা ভঙ্গ করার এটিই কৌশল (যখীরা)। যদি দুই শরীকে কোন একজনে নিজের খাস গোলামকে কারো নিকট ইজারা দেয় বা তাকে বিক্রি করে দেয় তবে ইজারার উজরত (বিনিময়) কবজা না করা পর্যন্ত মুফাওয়াযা বাতিল হবে না (আল-মুহীত)। দুই শরীকের কোন একজনে যদি মুফাওয়াযা চুক্তিকে অস্বীকার করে তবে শিরকাতে

মুফাওয়াযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যত প্রকার যৌথ কারবার ব্যবসা আছে সকল ক্ষেত্রেই এই হুকুম হওয়া অপরিহার্য (যহীরিয়া)। যেসব কারণে শিরকাতে ইনান ফাসিদ হয়ে যায় সেসব কারণে শিরকাতে মুফাওয়াযাও ফাসিদ হয়ে যাবে (বাদায়ে)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের কোন একজনের مال مفوضه তথা মূলধনের তাসাররুফ ও হস্তক্ষেপ করার বিবরণ

১. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের জন্য জায়েয আছে তার হাতে যে মূলধন রয়েছে এর সম-জাতীয় মূলধনের বিনিময়ে পরিমাণযোগ্য এবং ওজনযোগ্য যে কোন জিনিস খরিদ করা। শরীকদ্বয়ের হাতে যে বস্তু আছে এর সম-জাতীয় বস্তুর বিনিময়ে কোন কিছু খরিদ করা হলে তা জায়েয হবে। আর তাদের হাতে যে বস্তু আছে এর সম-জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে মালামাল খরিদ না করে ভিন্ন জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে মালামাল খরিদ করা হলে খরিদকৃত বস্তু কেবলমাত্র খরিদার ব্যক্তির জন্য খাস হয়ে যাবে। যেমন তাদের কেউ দিরহাম বা দীনারের বিনিময়ে কোন কিছু খরিদ করল। অথচ তার হাতে দিরহাম বা দীনার কিছুই নেই। বরং অন্য কোন মাল আছে। শিরকাতে ভিত্তিতে এভাবে কোন বস্তু খরিদ করা জায়েয নেই। শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের জন্য জায়েয আছে, তাদের তিজারতের গোলামকে মুকাতাব সাব্যস্ত করা এবং তাকে তিজারতের জন্য বা আমদানী উসুলের জন্য অনুমতি প্রদান করা (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই তাদের তিজারতের দাসীকে অন্যের নিকট বিবাহ দিতে পারবে, কিন্তু গোলামকে বিয়ে করাতে পারবে না। এমনিভাবে গোলামকে মালের উপর আযাদও করতে পারবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের একজনে যদি তাদের তিজারতের দাস-দাসীকে পরস্পর বিবাহ করিয়ে দেয় তবে তা কিয়াসের আলোকে জায়েয হবে। কিন্তু ইস্তিহসানের আলোকে জায়েয হবে না। আমাদের ফকীহগণের অভিমত এটিই (যহীরিয়া)। শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের জন্যই জায়েয আছে নগদ এবং বাকীতে মালামাল বিক্রি করা (খুলাসা)। এমনিভাবে অল্প মূল্যে এবং বেশী মূল্যে বিক্রি করা জায়েয নয় যে পরিমাণের ক্ষেত্রে মানুষে সাধারণত ধোঁকা খায় না (বাদায়ে)। দুই শরীকের কোন একজন যদি মুফাওয়াযার মাল এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে যার সাক্ষ্য তার পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় না তবে ফকীহদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে এ বিক্রি মুফাওয়াযা হিসাবেই কার্যকরী হবে (যখীরা)। যদি তাদের দুজনের একজনে খাদ্য জাতীয় বস্তু বাকীতে খরিদ করে তবে মূল্য পরিশোধ করা উভয়ের উপরই ওয়াজিব হবে। কিন্তু শিরকাতুল ইনানের শরীকদ্বয়ের কোন একজনের কেনা-বেচার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। যদি দুই শরীকের কোন একজনে খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে 'বাইয়ে সালাম' (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়)-কে কবুল করে নেয় তবে তা অপর শরীকের ক্ষেত্রেও জায়েয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজনে বাইয়ে সালামের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য খরিদ করার নিমিত্তে অগ্রিম দিরহাম প্রদান করে তবে তা উভয়ের ক্ষেত্রেই জায়েয হবে। এমনিভাবে যদি দুই শরীকের কোন একজনে بيع العينة অর্থাৎ

বাকীতে কোন বস্তু বেশী দামে বিক্রি করে তাহলেও এ বিক্রি উভয়ের ক্ষেত্রে জায়েয হবে। বায়উল ইনা (بيع العينة) হল, কোন বস্তু নগদ বিক্রি করার উদ্দেশ্যে তা বাকীতে বেশী দামে ক্রয় করা যাতে তার কিছু অর্থ হাসিল হয় (মাবসূত)। এমনিভাবে শরীক ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি মুফাওয়াযার ঋণের পরিবর্তে অথবা নিজের খাস ঋণের পরিবর্তে মুফাওয়াযা চুক্তির মাল বন্ধক রাখতে পারবে। কেননা হুকুমের দিক থেকে (حكما) বন্ধক হচ্ছে - قضاء الدين (ঋণ আদায়ের) অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। আর শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই মুফাওয়াযার ঋণ বা নিজের খাস ঋণ যেমন মহর ইত্যাদি শরীক ব্যক্তির অনুমতি ছাড়াই পরিশোধ করার অধিকার রাখে। কাজেই তারা এ মাল বন্ধকও রাখতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। অতএব শরীক ব্যক্তি বন্ধকগ্রহীতার নিকট থেকে এ মাল ফেরত নিতে পারবে না (আল-মুহীত)। ঋণ যদি উভয়ের শরীকী ঋণ হয় তাহলে বন্ধকদাতা ব্যক্তির উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। আর তা যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তির নিজস্ব ঋণ হয় তাহলে শরীক ব্যক্তি থেকে ঋণ বাবদ প্রদত্ত মালামাল থেকে অর্ধেক ফেরত নিয়ে নিবে। যদি বন্ধকী মালের মূল্য ঋণের তুলনায় বেশী হয় তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণের কারণে তার উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না (মাবসূত)। এমনিভাবে যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজনে মুফাওয়াযার ঋণের পরিবর্তে নিজস্ব মাল বন্ধক রাখে তবে এটি তার পক্ষ হতে অনুমত বলে গণ্য হবে না। বরং সে অপর অংশীদার ব্যক্তির নিকট হতে ঋণের পরিবর্তে যে বস্তু দেওয়া হয়েছে এর অর্ধেক নিয়ে নিতে পারবে। যদিও বন্ধকী মাল বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির হাতে ধ্বংস হয়ে যায় (আল-মুহীত)। যদি দুই শরীকের কোন একজনে ব্যবসায়িক ঋণের পরিবর্তে বন্ধক রাখে তাহলে তা জায়েয আছে (মুহীত : আস-সারাখসী)। চাই যে ব্যক্তি বন্ধক রেখেছে সে-ই মাল বিক্রিকারী হোক বা বিক্রিকারী তার অপর সাথী হোক (মাবসূত)।

৩. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তিদ্বয়ের প্রত্যেকেই বন্ধক রাখা এবং বন্ধক গ্রহণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করতে পারবে। যদি তাদের কোন একজনে অপর শরীকের মারা যাওয়ার পর অথবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর বন্ধকের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাহলে এ স্বীকারোক্তি তার শরীকের উপর প্রযোজ্য হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। দুই শরীকের প্রত্যেকের জন্য জায়েয আছে; অন্য কারো নিকট মাল আমানত রাখা এবং হাওয়ালা (দায়িত্ব স্থানান্তরকরণকে) কবুল করা (বাদায়ে)। এমনিভাবে প্রত্যেকের জন্য জায়েয আছে মুফাওয়াযার মাল থেকে হাদিয়া প্রদান করা এবং এ মাল থেকে মেহমানী খানার ব্যবস্থা করা।

উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। সহীহ মতে কম-বেশী পরিমাণের বিষয়টি ওরফের উপর নির্ভরশীল থাকবে। অর্থাৎ হাদিয়া এবং মেহমান খানায় এই পরিমাণ ব্যয় করা যাবে যাকে ব্যবসায়ী লোকেরা অপচয় হিসাবে গণ্য করে না (গিয়াসিয়া)। মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ দুই শরীকের কারো হাদিয়া কবুল করা, তার দেওয়া খাদ্য ভক্ষণ করা; এবং তার থেকে কোন কিছু হাওলাদ গ্রহণ করা অপর শরীকের অনুমতি ছাড়াও জায়েয আছে। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি ভক্ষণ করেছে এবং যাকে সাদাকা দেওয়া হয়েছে- ইসতিহসানের

ভিত্তিতে তাদের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। (মুহীত : আস-সারাখসী)। উল্লেখ্য যে, মুফাবিয (مفاوض) ব্যক্তি ফল-ফলাদি এবং গোশত ও রুটি ধরনের খাদ্য জাতীয় বস্তু হাদিয়া দেওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য হাদিয়া দেওয়ার তার কোন ইখতিয়ার নেই (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী দুই শরীকের কোন একজনে যদি অপর কোন ব্যক্তিকে কাপড় পরিয়ে দেয় অথবা কোন সওয়ারী হিবা করে অথবা সোনা, রূপা, আসবাব-সামগ্রী ও শস্য জাতীয় বস্তু হিবা করে তাহলে তার অপর শরীকের ক্ষেত্রে এসব বিষয় জায়েয হবে না। এ জাতীয় হস্তক্ষেপ কেবল মাত্র ফল-ফলাদি; গোশত ও রুটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। দুই শরীকের প্রত্যেকের জন্য জায়েয আছে। অপর শরীকের অনুমতি ছাড়াই শিরকাতে মাল নিয়ে সফর করা। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সহীহ মাযহাব এটিই (যখীরা)। মুফাওয়াযার মাল নিয়ে সফরকরা কে যারা জায়েয বলে তাদের মতানুসারে শরীক ব্যক্তি যদি তাকে এ কাজের জন্য অনুমতি প্রদান করে তাহলে সে নিজের ভাড়া, খাদ্য ও তরি-তরকারির জন্য যৌথ মূলধন থেকে ব্যয় করতে পারবে। হাসান (র) ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ব্যবসায় যদি লাভ হয় তাহলে এ খরচা লভ্যাংশ থেকে কর্তন করা হবে। আর লাভ না হলে তা মূলধন থেকে কর্তিত হবে (যহীরিয়া)। শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই শিরকাতে মুফাওয়াযার মাল অন্য কোন ব্যক্তি মুদারাবা ব্যবসার জন্য দিতে পারবে (বাদায়ে)। এটি আসল গ্রন্থের বর্ণনা। এটিই বিশুদ্ধতম বর্ণনা (আন-নাহরুল ফায়িক-হিদায়া)। এমনিভাবে মুযারাবা ব্যবসায়ের জন্য অন্য কারো থেকে মাল গ্রহণ করাও শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের জন্য জায়েয আছে। এ ক্ষেত্রে লাভ কেবল মাত্র তারই হবে (বাদায়ে)। শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকে মুফাওয়াযার মাল অপর কোন ব্যক্তিকে بضاعة তথা পুঁজি হিসাবে ও দিতে পারবে (যহীরিয়া)। بضاعة বা পুঁজি হিসাবে কাউকে মুফাওয়াযার মাল প্রদান করার পর যদি শরীকদ্বয়ের উভয়ে পরস্পর একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে যায়, এরপর উক্ত ব্যক্তি এই পুঁজি দ্বারা কোন মাল খরিদ করে, এ অবস্থায় যদি পুঁজি গ্রহণকারী ব্যক্তি তাদের (শরীকী ব্যবসাকারীদের) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে। তাহলে সে যা কিছু খরিদ করবে তা আদেশদাতা ব্যক্তির জন্য হবে। আর যদি সে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্পর্কে না জানে তাহলে এর দুই অবস্থা হতে পারে। হয়তো পুঁজি (مستبضع) গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট মূল্য হস্তান্তর করে দেওয়া হবে অথবা হবে না। যদি মূল্য তার নিকট হস্তান্তর করা হয়ে যায় তাহলে আদেশ দাতা ও শরীক ব্যক্তি উভয়ের পক্ষে তার ক্রয় জায়েয হবে। আর যদি পুঁজি গ্রহণকারীর নিকট মূল্য হস্তান্তর না করা হয়ে থাকে তবে তার ক্রয় আদেশদাতা ব্যক্তির পক্ষ থেকে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা : যে ব্যক্তি পুঁজি প্রদান করেনি সে মারা যাওয়ার পর পুঁজি গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি ঐ পুঁজি দ্বারা মাল খরিদ করে তবে জীবিত ব্যক্তিই এ মালের হকদার হবে। যদি مستبضع (যাকে পুঁজি বা পণ্য প্রদান করা হয়েছে) তাকে দেওয়া মালের মূল্য নগদ আদায়

করে দেয় তবে মুফাবিয মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের ইখতিয়ার থাকবে। তারা ইচ্ছা করলে مبضع এর নিকট থেকে মূল্য জরিমানা স্বরূপ আদায় করে নিবে। ইচ্ছা করলে مستبضع (পুঁজি দাতা) ব্যক্তির নিকট হতে এর জরিমানা আদায় করে নিবে। যদি তারা পুঁজি গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট থেকে জরিমানা আদায় করে নেয় তাহলে সে পণ্য ক্রয়ের আদেশ দাতা ব্যক্তির নিকট থেকে এ অর্থ উসূল করে নিবে। এমনিভাবে যদি তারা বিক্রেতার নিকট হতে জরিমানা উসূল করে নেয়, তাহলে সে مستبضع এর নিকট এ অর্থ উসূল করে নিবে। তারপর مبضع (পুঁজিদাতা) এর নিকট হতে তা উসূল করে নিবে। এক ব্যক্তি শিরকাতে মুফাওয়াযা এবং শিরকাতে ইনান তথা দুই জাতীয় শিরকাতে সাথে জড়িত। শিরকাতে ইনানের সূত্রে তার ও (তার) অংশীদার ব্যক্তির মধ্যে এক হাজার দিরহাম আছে। এই এক হাজার যদি ঐ ব্যক্তি শিরকাতে ইনানের শরীক ব্যক্তির অনুমতি ক্রমে অপর কোন ব্যক্তিকে পণ্য হিসাবে দেয়-যাতে সে এর দ্বারা তাদের উভয়ের (শিরকাতে মুফাওয়াযার অংশীদারদ্বয়ের) জন্য সামান পত্র খরিদ করে, তারপর তাদের একজন মারা যায়। যদি مبضع (পুঁজিদাতা) মারা যায় এবং পরে مستبضع (পুঁজি গ্রহণকারী) ব্যক্তি সামান পত্র খরিদ করে তাহলে এই সামান ক্রেতার জন্য খাস হবে এবং তাকে ঐ মালের জরিমানা আদায়ে করতে হবে। সুতরাং এই সামানের অর্ধেক পাবে শিরকাতে ইনানের শরীক ব্যক্তি আর বাকী অর্ধেক পাবে জীবিত মুফাবিয (مفاوض) ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ। যদি শিরকাতে ইনানের শরীক ব্যক্তি মারা যায়, তারপর مستبضع ব্যক্তি সামান খরিদ করে তাহলে খরিদা সামান সবই মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী শরীকদ্বয় পাবে। এরপর (শিরকাতে ইনান সম্পাদনকারী) মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের ইখতিয়ার থাকবে। তারা ইচ্ছা করলে মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের যে কারো থেকে তাদের হিস্যা নিয়ে নিতে পারবে। ইচ্ছা করলে পুঁজি দাতা ব্যক্তির নিকট হতে তাদের অংশ নিয়ে নিতে পারবে। তারপর مستبضع তাদের দুজনের যে কারো থেকে তা উসূল করে নিবে। যে মুফাবিয (مفاوض) পুঁজি প্রদান করেনি। সে যদি মারা যায় তারপর مستبضع সামান খরিদ করে তাহলে এ সামানের অর্ধেক পাবে। আদেশদাতা ব্যক্তি আর বাকী অর্ধেক পাবে শিরকাতে ইনানের অপর অংশী দায় ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী জীবিত শরীক ব্যক্তি মৃতব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে তাদের অংশের জরিমানা আদায় করে দিবে। আর তারা ইচ্ছা করলে مستبضع এর নিকট থেকেও জরিমানা উসূল করতে পারবে। এরপর সে (مستبضع) তার প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ আদেশ দাতা ব্যক্তির নিকট থেকে উসূল করে নিবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৬. মাসআলা : সম-অংশীদারি কারবারের চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়ের কারো জন্যই জায়েয নেই; মুফাওয়াযার মাল কাউকে ঋণ দেওয়া। এটি যাহিরী রিওয়ায়েত এবং এটিই সহীহ অভিমত (যখীরা)। কিন্তু অপর শরীক ব্যক্তি যদি স্পষ্টভাবে তাকে ঋণ দেওয়ার জন্য অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে এই মালামাল থেকে ঋণ দেওয়া জায়েয হবে। কিন্তু “তুমি তোমার ইচ্ছা মাফিক কাজ কর” বলার ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া জায়েয হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

শরীকদ্বয়ের কোন একজনে যদি অপর জনের অনুমতি ছাড়া এখান থেকে কাউকে ধার দেয় তাহলে তাকে এর অর্ধেক মালের জরিমানা আদায় করতে হবে। তবে এতে মুফাওয়াযা চুক্তি ফাসিদ হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। ফকীহগণ বলেছেন, শরীকদ্বয়ের জন্য এমন মালামাল করজ দেওয়াই বৈধ হওয়া চাই যা করজ দেওয়াতে মানুষের কোন আশংকা থাকে না (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তিদ্বয়ের প্রত্যেকের জন্য জায়েয আছে, আংশিক কিছু মাল প্রদানের ভিত্তিতে অপর কোন ব্যক্তির সাথে শিরকাতে ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া (মাবসূত)। চাই তারা সম-অংশীদার চুক্তি সম্পাদনকালে এই শর্ত আরোপ করুক যে, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রায় অনুসারে কাজ করবে অথবা এ জাতীয় শর্ত আরোপ না করুক (যখীরা)। শিরকাতে ইনানের চুক্তি সম্পাদনের পর এ চুক্তি তার (সম্পাদনকারী) এবং সম-অংশীদার ব্যক্তি উভয়ের উপর জায়েয হবে অর্থাৎ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। চাই সে শরীক ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে শিরকাতে ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ হোক বা অনুমতি ছাড়া চুক্তি সম্পাদন করুক (আল-মুহীত)। শরীক ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে যদি কারো সাথে মুফাওয়াযা চুক্তি করা হয় তাহলে এ চুক্তি উভয় শরীকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও জায়েয হবে, যেমন উভয় শরীক মিলে তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাথে শিরকাতে মুফাওয়াযা করলে তা জায়েয হয়। যদি অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া শিরকাতে মুফাওয়াযা করে তবে মুফাওয়াযা হবে না। বরং শিরকাতে ইনান হবে এবং এতে উভয়ে সমান-সমান শরীক হিসাবে গণ্য হবে। যদিও ঐ ব্যক্তি যার সাথে শিরকাত চুক্তি করা হয়েছে সে তার পিতা বা পুত্র হয় অথবা অপরিচিত কোন ব্যক্তি হয় (মাবসূত)। মুনতাকা গ্রন্থে আছে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তিদ্বয়ের কোন একজনে যদি কারো সাথে গোলামের ব্যবসার ব্যাপারে শিরকাতে ইনানের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করে তবে তা জায়েয হবে এবং এই শরীক ব্যক্তি যে সব গোলাম খরিদ করবে এর অর্ধেক ক্রেতা পাবে, আর বাকী অর্ধেক মুফাওয়াযা চুক্তিকারী ব্যক্তিদ্বয় আধাআধি করে পাবে। শরীকদ্বয়ের থেকে যে ব্যক্তি শিরকাতে ইনান করেনি সে যদি কোন গোলাম খরিদ করে তবে ক্রেতা ব্যক্তি অর্ধেকের মালিক হবে এবং বাকী অর্ধেক পাবে মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তিদ্বয় (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের জন্য জায়েয আছে অংশীদারি কারবার পরিচালনা করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে কিছু মালামাল প্রদান করে তাকে এ মর্মে আদেশ দেওয়া যে, তুমি এ টাকা-পয়সা আমাদের যৌথ ব্যবসায়ের কাজে খরচ করবে। যদি অপর শরীক উক্ত উকীল ব্যক্তিকে ওয়াকালতের দায়িত্ব থেকে খারিজ 'বা' বহিস্কার করে দেয় তবে সে এ দায়িত্ব হতে বহিস্কৃত বলে গণ্য হবে। যদি তাকে বেচাকেনা এবং ইজারার ব্যাপারে উকীল নিয়োগ করা হয়ে থাকে (বাদায়ে)। আর যদি বাজারের বকেয়াটাকা উসূল করার জন্য তাকে উকীল নিয়োগ করা হয়ে থাকে তাহলে অপর ব্যক্তি তাকে উকালত থেকে বহিস্কার করতে পারবে না (আল-মুহীত)। ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে জায়েয আছে; মুফাবিয ব্যক্তি মুফাওয়াযার মাল তৃতীয় ব্যক্তিকে আরিয়ত (হাওলাদ) দিতে পারবে। সুতরাং সে যদি সম-অংশীদারি কারবারের কোন

সওয়ারী কাউকে হাওলাদ দেয় এবং তা হাওলাদ গ্রহণকারী ব্যক্তির হাতে মারা যায় তবে জরিমানা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। এটি ইস্তিহসানের কথা (যখীরা)। দুই শরীকের কোন একজনে যদি শিরকাতে সওয়ারী কাউকে হাওলাদ দেয় এবং সে তাতে সওয়ার হয়, আর এতে ঐ সওয়ারী মারা যায়, তারপর হাওলাদ গ্রহীতা ব্যক্তি যে স্থানে যাওয়ার পর সওয়ারীটি মারা গেছে সে স্থানের ব্যাপারে যদি উভয় শরীকের মধ্যে মতভেদ হয় তবে শরীকদ্বয়ের যে ব্যক্তি হাওলাদ গ্রহীতা ব্যক্তির কথার সত্যায়ন করবে তার জরিমানা আদায় করা থেকে হাওলাদ গ্রহীতা ব্যক্তি অব্যাহতি পেয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শিরকাতে ইনানের ক্ষেত্রে শরীকদ্বয় যে যে কাজ করতে পারে, শিরকাতে মুফাতয়াযার ক্ষেত্রেও তারা সে কাজ করতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ দুই শরীকের কোন একজনের লেনদেনের ব্যাপারে অপর জনের হস্তক্ষেপ করার বিবরণ

১. মাসআলা : শরীকদ্বয়ের একজনে কোন বস্তু বিক্রি করার পর অপর জনে যদি সে বিক্রিকে ভঙ্গ (الغش) করে দেয় তবে তা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে কোন একজনে যদি বাইয়ে সালামের চুক্তি করে আর অপর জনে তা ভেঙ্গে দেয় তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হকুম হবে (মুহীত)। শরীকদ্বয় কোন একজনে তাদের শরীকী তিজারতের কোন দাসী বাকীতে বিক্রি করার পর (এর) মূল্য উসূল করার আগে অন্যজনে একে উক্ত মূল্য হতে কম মূল্যে একে খরিদ করতে পারবেনা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সম-অংশীদারি কারবারের চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের কোন একজনে কোন বস্তু বাকীতে বিক্রি করার পর সে যদি মারা যায় তবে অপর শরীকের জন্য জায়েয হবে না এ ব্যাপারে কোন রূপ মামলা-মুকাদ্দমা করা। যদি খরিদদার ব্যক্তি তাকে অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করে দেয় তবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। দুই শরীকের একজনে কোন বস্তু বিক্রি করার পর সে যদি এর মূল্য ক্রেতাকে হিবা করে দেয় অথবা ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করা থেকে দায়মুক্ত করে দেয় তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে তা জায়েয হবে। কিন্তু তার সাথীর অংশের জন্য তাকে জামানত দিতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। একজন কোন বস্তু বিক্রি করার পর যদি অপর জনে এর মূল্য ক্রেতাকে হিবা করে দেয় বা ক্রেতাকে এর থেকে দায়মুক্ত করে দেয় তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তার নিজের অংশের ব্যাপারে এরূপ করা জায়েয হবে, কিন্তু তার সাথীর অংশের ব্যাপারে জায়েয হবে না (যহীরিয়া)। চাই এ ঋণ দ্বিতীয় ব্যক্তির আকদের কারণে ওয়াজিব হোক বা তার সাথীর আকদের ওয়াজিব হোক কিংবা তাদের উভয়ের আকদের কারণে ওয়াজিব হোক (যখীরা)।

২. মাসআলা : শরীকদ্বয়ের উপর কিছু মেয়াদী ঋণ ছিল। পরবর্তীতে দ্বিতীয় শরীক ব্যক্তি ঐ মেয়াদ বাতিল করে দিল তাহলে মেয়াদ বাতিল হয়ে যাবে এবং তাদের উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে উক্ত ঋণ তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করে দেওয়া। যদি উভয়ের কোন একজন মারা যায় তাহলে মৃত ব্যক্তির হিস্যা অনুসারে তার ঋণ তৎক্ষণাৎ আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব হবে। কিন্তু অপর

ব্যক্তির মেয়াদী ঋণ পূর্ববৎ বহাল থাকবে। তা তৎক্ষণাৎ আদায় করা ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ(র) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়ের কাছে যদি কারো পাওনা থাকে তারপর সে ব্যক্তি যদি তাদের কোন একজনের পাওনা থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়ে দেয় তাহলে তারা উভয়েই ঐ পাওনাদের পাওনা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : দুই শরীকের কোন এক জনে যদি হুকুমে আকদের متولى (দায়িত্বপ্রাপ্ত) হয় তবে এ দায়িত্ব অন্যজনের উপরও বর্তাবে। সুতরাং তাদের একজনে যদি কোন বস্তু বিক্রি করে তবে বিক্রিত বস্তু হস্তান্তরের ব্যাপারে (غير بائع) অর্থাৎ যে এ বস্তু বিক্রি করেনি তার প্রতিও চাপ সৃষ্টি করা যাবে। যেমনিভাবে বিক্রয়কারী ব্যক্তির প্রতি চাপ সৃষ্টি করা যায়। যে শরীক ব্যক্তি এ মাল বিক্রি করেনি সে যদি ক্রেতার নিকট এর মূল্য পরিশোধের দাবী করে তবে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধের জন্য বাধ্য করা যাবে। যেমনিভাবে বিক্রতার নিকট মূল্য হস্তান্তরে ক্রেতাকে বাধ্য করা যায় (তাতার খানিয়া)। যদি শরীকদ্বয়ের একজনে কোন বস্তু খরিদ করে তবে ক্রেতার ন্যায় অপর শরীককেও মূল্য হস্তান্তরের জন্য ধরা যাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। ক্রেতা যেমনিভাবে বিক্রিত পণ্য হস্তগত করে নিতে পারে, এমনিভাবে অপর শরীক ব্যক্তিও তা হস্তগত করে নিতে পারবে। ক্রেতা যদি বিক্রিত মালে কোন দোষ পায় তবে সে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকটও ঐ মাল ফেরত দিতে পারবে (বাদায়ে)। দুই শরীকের কোন একজনে যৌথ ব্যবসায়ের জন্য কিছু মাল খরিদ করেছে। তারপর অপর ব্যক্তি যদি তাতে কোন দোষ দেখতে পায় তাহলে সে এ মাল ফেরত দিয়ে দিতে পারবে (আল-মুহীত)। যদি বিক্রিত মালের কোন মালিক বেরিয়ে আসে তাহলে শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই বিক্রতার নিকট থেকে এর মূল্য উসূল করে নিতে পারবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। কেউ যদি দুই শরীকের একজনের নিকট হতে কোন মাল খরিদ করার পর তাতে কোন খুঁত দেখতে পায় তবে শরীকদ্বয়ের যার কাছে ইচ্ছা সে এ মাল ফেরত দিতে পারবে (যহীরিয়া)। যদি দুই শরীকের কেউ মালে খুঁত থাকার কথা অস্বীকার করে তাহলে সে নিজেই যদি এ মালের বিক্রতা হয়ে থাকে তবে তার থেকে অকাট্য কসম গ্রহণ করা হবে। আর যদি বিক্রতা না হয় তবে তার থেকে তার অবগতির ব্যাপারে কসম গ্রহণ করা হবে। যদি দুইজনের কোন একজনে দোষের কথা স্বীকার করে নেয় তাহলে এ স্বীকারোক্তি তার নিজের ব্যাপারে এবং অপর শরীকের ব্যাপারে কার্যকরী হবে। যদি শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই তাদের শরীকী মালের অর্ধেক বিক্রি করে এবং এরপর তাতে খুঁত পাওয়া যায় তাহলে ক্রেতা ব্যক্তি তাদের উভয়ের থেকে কসম গ্রহণ করতে পারবে। যে অর্ধেক সে নিজে বিক্রি করেছে এর ব্যাপারে অকাট্য কসম গ্রহণ করা হবে। আর যে অর্ধেক অপর শরীক বিক্রি করেছে সে ক্ষেত্রে তার অবগতির উপর কসম নেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এই দুই ধরনের কসম একই কসম বাক্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা যাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে প্রত্যেকের বিক্রিত অংশের ব্যাপারে তার থেকে অকাট্য কসম গ্রহণ করা হবে। এবং অবগতির ব্যাপারে কসম গ্রহণ করার বিষয়টি তাদের থেকে রহিত হয়ে যাবে (বাদায়ে)।

৪. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিদ্বয়ের কোন একজনে মুফাওয়াযার মাল বিক্রি করার পর তারা উভয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু ক্রেতা ব্যক্তি তাদের বিচ্ছিন্ন

হওয়ার কথা জানে না, তাহলে সে এ মালের পূর্ণ বিবরণ তাদের যে কারো কাছে ইচ্ছা প্রদান করতে পারবে (আল-মুহীত)। আর ক্রেতা যদি তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা জানে তাহলে বিক্রিত মালের মূল্য সে কেবলমাত্র আকদ সম্পাদনকারী ব্যক্তির নিকট দিতে পারবে। যদি অপর অংশীদারের নিকট দেয় তাহলে আকদ সম্পাদনকারী ব্যক্তির অংশ হতে সে দায় মুক্ত হতে পারবে না। এমনি ভাবে ক্রেতা যদি এ মালে কোন খুঁত বা দোষ দেখতে পায় তবে এ ব্যাপারে আকদ সম্পাদনকারী ব্যক্তিই একমাত্র মামলা-মকাদমা করতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখাসী)। বিক্রিত পণ্যে দোষ পাওয়া যাওয়ার কারণে ক্রেতা যদি এ মাল শরীকদ্বয়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই বিক্রয়কারী ব্যক্তির অপর শরীকের নিকট ফেরত দিয়ে দেয় এবং তাকে হুকুম দেওয়া হয় যে, তুমি প্রাপ্ত মূল্য ফেরত দিয়ে দাও অথবা মাল প্রত্যাহার করা অসম্ভব হওয়ায় শরীক ব্যক্তিকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, খুঁতজনিত কারণে মালের যে লোকসান হয়েছে, তুমি এর ক্ষতিপূরণ দিয়ে দাও, তাহলে এ অবস্থায় ক্রেতা শরীকদ্বয়ের যে কারো থেকেই এ ক্ষতিপূরণ বা মূল্য উসূল করে নিতে পারবে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : শরীকদ্বয়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যদি কেউ বিক্রিত এ গোলামের মালিকানার দাবী করে (তাকে নিয়ে যায়) অথচ তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যাওয়ার আগেই ক্রেতা এ গোলামের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছে, তাহলে ক্রেতা দুই শরীকের যে কোন ব্যক্তি থেকে প্রদত্ত মূল্য উসূল করে নিতে পারবে (যহীরিয়া)। মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনকারী শরীকদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর পাওনাদার ব্যক্তিগণ যার নিকট ইচ্ছা পূর্ণ পাওনার তাগাদা করতে পারবে। পাওনা পরিশোধ করার পর তাদের কেউ অপর শরীকের নিকট থেকে কিছুই ফেরত পাবে না যদি অর্ধেকের বেশী পরিশোধ না করে থাকে। অতিরিক্ত পরিশোধ করে থাকলে তা ফেরত নিয়ে নিবে (জামে'সগীর) শরীকদ্বয়ের একজনে অপর কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কোন দাসী খরিদ করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করার পর অপর শরীক যদি উকীল ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বাধা প্রদান করে তাহলে এ বাধা দেওয়া জায়েয হবে। বাধার পরও যদি উকীল ব্যক্তি ঐ দাসী খরিদ করে তবে সে এ দাসীকে তার নিজের জন্য খরিদ করেছে গণ্য হবে। আর যদি অপর শরীক তাকে এ ব্যাপারে বাধা না দেয় এবং সে দাসী খরিদ করে নেয় তাহলে এ দাসী উভয়ের বলে গণ্য হবে। কাজেই সে এর মূল্য শরীকদ্বয়ের যে কারো নিকট থেকে উসূল করে নিতে পারবে (আল-মুহীত)

সপ্তম অনুচ্ছেদ : 'শিরকাতে মুফাওয়াযা' শরীকদের মধ্যে মত পার্থক্য হলে

১. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উপর এ মর্মে দাবী করে যে, 'সে তাকে মুফাওয়াযার ভিত্তিতে যৌথ কারবারে' অংশীদার বানিয়েছে। এ অবস্থায় বিবাদী যদি বিষয়টিকে অস্বীকার করে এবং মালামাল তার হাতে থাকে তাহলে কসম সাপেক্ষে অস্বীকারকারী ব্যক্তির কথা 'গ্রহণযোগ্য' হবে। আর বাদীর উপর অপরিহার্য হবে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা (ফাতহুল কাদীর)। বাদী যদি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে এবং সাক্ষীরা তার দাবীর অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করে তবে এর কয়েক অবস্থা হতে পারে। (১) হয়তো তারা এ মর্মে

সাক্ষ্য দিবে যে, তারা শিরকাতে মুফাওয়াযার ভিত্তিতেই চুক্তি বন্ধ হয়েছিল, আর অমুকের হাতে যে মাল আছে তা তাদের উভয়ের মাল (২) অথবা তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা শিরকাতে মুফাওয়াযার ভিত্তিতেই চুক্তি বন্ধ হয়েছে। আর অস্বীকারকারী ব্যক্তির হাতে যে টাকা পয়সা আছে তা তাদের শরীকী টাকা পয়সা। উপরোক্ত দুই অবস্থায় বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং উক্ত মূলধন তাদের মধ্যে আধাআধি করে বন্টন করা হবে। (৩) অথবা তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, তাদের এই ব্যবসা চুক্তি শিরকাতে মুফাওয়াযার ভিত্তিতেই হয়েছে এবং মূলধন অস্বীকারকারী ব্যক্তির হাতেই রয়েছে। এ অবস্থায়ও মূলধন তাদের মধ্যে অর্ধেক করে বন্টনের ফায়সালা দেওয়া হবে। চাই তারা ঐ মজলিসেরই এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করুক যে মজলিসে বাদী শিরকাতে মুফাওয়াযার দাবী করেছে অথবা বাদী যে মজলিসে শিরকাতে মুফাওয়ার দাবী করেছে সে মজলিস থেকে উভয়ের পৃথক হয়ে যাওয়ার পর তারা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করুক। (৪) অথবা তারা কোন রূপ অতিরিক্ত কথা না বলে শুধু এ কথা বলে যে, তাদের ব্যবসায়িক চুক্তি মুফাওয়াযার ভিত্তিতেই হয়েছে। এ অবস্থার বিধান সম্পর্কে শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন; এ ক্ষেত্রেও বাদীর সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে এবং মালামাল তাদের মধ্যে আধাআধি হারে বন্টন করা হবে। “আল কিতাব” গ্রন্থে এ মাসআলা উল্লেখ করায় ইমাম মুহাম্মাদ(র) এ দিকেই ইংগিত করেছেন। শায়ফুল ইসলাম (র) বর্ণনা করেছেন যে, বাদী যে মজলিসে মুফাওয়াযার দাবী করেছে যদি সাক্ষিগণ সে মজলিসেই তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং মালামাল উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে বাদী যে মজলিসে মুফাওয়াযার দাবী করেছে, যদি সাক্ষিগণ সে মজলিসেই সাক্ষ্য না দিয়ে ভিন্ন কোন মজলিসে সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের গ্রহণযোগ্য হবে না। যাবৎ না তারা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, এ আধাআধি হাতে এ মূলধনের মালিক অথবা এ সাক্ষ্য দিবে যে এ মূলধন তাদের উভয়ের শরীকী মাল অথবা অস্বীকারকারী ব্যক্তি এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করবে যে, মাল বর্তমানে তার হাতেই আছে অথবা তার স্বীকারোক্তির ব্যাপারে সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রদান করবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : শিরকাতে মুফাওয়াযার ব্যাপারে দুই ব্যক্তির মাঝে মতভেদ হওয়ার পর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক তাদের উভয়ের মধ্যে মালামাল বন্টন করে দিয়েছে। এহেন অবস্থায় যার হাতে মাল আছে, সে যদি তার আয়ত্তাধীন কোন মালের ব্যাপারে বলে যে, এ মাল আমার একান্তই নিজস্ব মাল। আমি বাদী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির তরফ থেকে মীরাস, হিবা বা সাদাকা সূত্রে এ মালের মালিক হয়েছি তাহলে এ মাসআলারও কয়েক অবস্থা হতে পারে (১) হয়তো মুফাওয়াযার দাবীকারী ব্যক্তির সাক্ষিগণ এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, তাদের দুজনের মধ্যে মুফাওয়াযা চুক্তিই সম্পাদিত হয়েছিল এবং আধাআধি করে তারা উভয়েই এই মালের মালিক (২) অথবা তারা সাক্ষ্য দিবে যে, এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে তাদের দুজনের মধ্যে মুফাওয়াযা চুক্তিই সম্পাদিত হয়েছে এবং এ মূলধন তাদের শরীকী মাল। এ অবস্থায় বাদীর দাবী শূন্য যাবে না এবং তার সাক্ষ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে না (৩) পক্ষান্তরে মুফাওয়াযার দাবীকারী ব্যক্তির সাক্ষিগণ যদি এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা মুফাওয়াযা চুক্তিই এবং মাল অস্বীকারকারী ব্যক্তির হাতে আছে (৪) অথবা শুধু এ

মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, এই চুক্তি মুফাওয়াযার ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়েছে। এরপর কোন অতিরিক্ত কথা না বলে তাহলে তার দাবী শূন্য যাবে এবং তার সাক্ষ্য প্রমাণও গ্রহণযোগ্য হবে। এটি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অতিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ(র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। এক ব্যক্তি মুফাওয়াযাতের দাবী করেছে। এহেন অবস্থায় বিবাদী অর্থাৎ যার আয়ত্তাধীনে মালামাল আছে, সে যদি বাদীর পক্ষ হতে মালামাল তার হাতে আসার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাহলে উপরে যে যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এর সব কটিতেই বাদীর কথা শুনা যাবে এবং তার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে (যহীরিয়া)।

৩. মাসআলা : কোন ব্যক্তি দাবী করল যে, অমুক ব্যক্তি মুফাওয়াযার ভিত্তিতে তার অংশীদার। তারপর বিবাদী ও এ কথা স্বীকার করে নিল এবং সে ভিত্তিতে তার হাতে যে মাল আছে, এ মাল শরীকী মাল বলে ফায়সালা দেওয়া হল। এরপর বিবাদী তার নিয়ন্ত্রণাধীন মাল থেকে কোন মালের ব্যাপারে দাবী করল যে, এ মাল আমার একান্ত ব্যক্তিগত মাল। আমি মীরাস বা হিবা সূত্রে এ মালের মালিক হয়েছি। তারপর সে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণও পেশ করে তবে তার সাক্ষ্য প্রমাণ কবুল করা হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। দুই ব্যক্তির হাতে মাল এবং তারা উভয়েই একথা স্বীকার করেছে যে, এ মাল মুফাওয়াযার মাল। এমতাবস্থায় তাদের একজনে যদি কিছু মালের ব্যাপারে দাবী করে যে, এ মাল সে তার পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণও পেশ করে তাহলে তার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা : সম-অংশীদার চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের কোন একজনে যদি মারা যায় এবং জীবিত জনের হাতে মাল থাকে; এমতাবস্থায় যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ এ মালে শিরকাতে মুফাওয়াযার দাবী করে এবং জীবিত ব্যক্তি তা অস্বীকার করে। তারপর তারা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, এই ব্যক্তির সাথে তাদের পিতার শিরকাতে মুফাওয়াযার চুক্তি ছিল তাহলে জীবিত ব্যক্তির হাতে যে মালামাল রয়েছে। এই মালের ব্যাপারে কোন ফায়সালা করা যাবে না, যাবৎ না তারা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করবে যে, মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায়ও এ মাল তার (জীবিত ব্যক্তির) হাতেই ছিল অথবা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করবে যে, এ মাল তাদের উভয়ের শরীকানা মাল, তখনই কেবল ওয়ারিসদের জন্য ঐ মাল থেকে অর্ধেক মালের ফায়সালা দেওয়া হবে (মাবসূত)। জীবিত ব্যক্তির উপর হুকুমজারী করার পর সে যদি ঐ মালের ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে এ মাল সে তার পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে তাহলে এর দুই অবস্থা হতে পারে (১) যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের সাক্ষিগণ এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, এ মাল তাদের উভয়ের শরীকী মাল তাহলে বিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (২) আর যদি তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, শরীকী চুক্তি সম্পাদন কালেও এ মাল বিবাদীর কাছেই ছিল তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জীবিত ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। মাল যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের কবজায় থাকে এবং তারা শরীকানার বিষয়টিকে অস্বীকার করে; তারপর জীবিত ব্যক্তি শিরকাতে মুফাওয়াযা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টিকে সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে; এরপর তারাও (ওয়ারিসগণও)

এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, তাদের পিতা মীরাস হিসাবে এ মাল রেখে মারা গেছেন এবং এতে তাদের যৌথ কোন শরীকানা নেই তাহলে ওয়ারিসদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র)-এ অভিমতটিকে বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করে বলেন, এটি সকল ইমামের অভিমত। যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ একথা বলে যে, আমাদের দাদা মারা যাওয়ার পর আমার পিতার জন্য এই মাল মীরাস হিসাবে রেখে গেছেন। তারপর তারা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত তাদের সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৫. মাসআলা : যদি আসবাব সামগ্রী দুই শরীকের কোন একজনের হাতে থাকে এবং সে মুফাওয়াযা চুক্তিকে অস্বীকার করে তবে তার এ অস্বীকৃতির কারণে শিরকাতে মুফাওয়াযা ভেঙ্গে যাবে। তারপর মুফাওয়াযা চুক্তি সংঘটিত হওয়ার উপর যদি সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে অস্বীকারকারী ব্যক্তির হাতে যে সামান পত্র আছে, এর অর্ধেক সামানের জামানত আদায় করা তার উপর অপরিহার্য হবে। কেননা সে ছিল এ মালের আমানতদার। কাজেই অস্বীকার করলে তাকে এর জামানত দিতে হবে। যার হাতে মালামালা আছে তার মৃত্যুর পর যদি তার ওয়ারিস এ বিষয়টি অস্বীকার করে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। 'মুফাওয়াযা' চুক্তি সম্পাদনকারী শরীক ব্যক্তিদ্বয় যদি মারা যায় এবং মারা যাওয়ার আগে তারা প্রত্যেকে যদি একজন করে ওসী (ওসীয়াত রাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি) নিয়োগ করে যায় তাহলে প্রত্যেক ওসীর জন্য তার মূসী (ওসীয়াতকারী) যে ক্রয় বিক্রয় আঞ্জাম দিয়েছে এর দায়িত্বসমূহ পূরা করার ব্যাপারে তার পূর্ণ ইখতিয়ার থাকবে। যখন সে ঐ মাল কবজা করবে তখন তার উপায় এ ব্যাপারে কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। এমনি ভাবে ওয়ারিসদের উপরও কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তারা সকলে শিরকাতে মুফাওয়াযার ব্যাপারে পূর্ণ স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করবে। যেমনি ভাবে মূসী নিজে যদি এসব মালামাল কবজা করে এবং সে মুফাওয়াযার বিষয়টি স্বীকার করে তবে সে অপর ব্যক্তির অংশের ব্যাপারে আমীন (আমানতদার) বলে গণ্য হয় যামিন হয় না, (এ ক্ষেত্রেও মাসআলা ঠিক তদ্রূপই হবে (মাবসূত)।

৬. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ শরীক দ্বয়ের একজনে দাবী করল যে, আমার শরীক ব্যক্তি এই মালের মধ্যে এক তৃতীয়াংশের অংশীদার এবং বিবাদী দাবী করল; দুই-তৃতীয়াংশের। অথচ তারা উভয়েই মুফাওয়াযার কথা স্বীকার করে তাহলে তাদের সমুদয় মালামাল চাই তা ভূমি হোক বা অন্য কিছু তাদের মধ্যে আধা-আধি করে ভাগ করে দেওয়া হবে। মুফাওয়াযার হুকুমকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই এই বিধান দেওয়া হয়েছে। কিছু পরিধানের পোশাক; ঘরের মাল সামান, পরিবার-পরিজনের খাদ্যদ্রব্য কিংবা ঐ দাসী যার সাথে সে সহবাস করছে, এ সবার হুকুম এর থেকে ভিন্নতর। কেননা ইসতিহসানের দৃষ্টিতে এ সবার মালিক ঐ ব্যক্তিই হবে যার কবজায় এসব মালামাল রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি শরীকানা চুক্তি সম্পন্ন করে শরীকদ্বয় একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর এ জাতীয় মতভেদ সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে পরস্পর তারা একে অপরের থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগেই যদি তাদের কোন একজন মারা যায় এরপর জীবিত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে শরীকী মালের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয় তাহলে ক্ষেত্রে হুকুম ঠিক তদ্রূপই হবে যেমন তাদের পরস্পর একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর শরীকী মালের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করার অবস্থায় হয়ে থাকে (ফাতাওয়াযা কাযীখান)।

৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির ব্যাপারে এ মর্মে দাবী করল যে, সে অংশীদার এবং তার সাথে মুফাওয়াযা চুক্তি হয়েছে। আর তার হাতে যে মাল আছে তা ভাগে ভাগ হবে। দুই-তৃতীয়াংশ আমার এবং এক-তৃতীয়াংশ তার। এমতাবস্থায় যদি বিবাদী মুফাওয়াযার বিষয়টিকে অস্বীকার করে এবং বাদী তার দাবীর সাপেক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তাহলে কiyাসের দৃষ্টিতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু ইসতিহসানের দৃষ্টিতে মুফাওয়াযাতের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)। কোন ব্যক্তি মুফাওয়াযা দাবী করল এবং বলল, মাল তার ও মধ্যে আধাআধি করে অথচ সাক্ষিগণ বলে যে, মাল আধা আধি করে নয় বরং তিনভাগ করে তাদের মাঝে বণ্টিত হবে। এরপর বাদী বলল, বিষয়টি এমনই তাহলে ইসতিহসানের দৃষ্টিতে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদনের পর শরীকদ্বয়ের উভয়ে একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর তাদের কোন একজনে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করল যে, সমুদয় মাল তার (অপর অংশীদারের নিকটে ছিল। তারপর অমুক শহরের বিচারক (কাযী)। তার উপর হুকুম জারী করে ছিলেন এবং সাক্ষিগণও মালের নাম স্পষ্টভাবে বলে দিল এবং তারা এ কথাও বলল যে উপরোক্ত বিচারক সে মাল তাদের মধ্যে আধাআধি করে বণ্টন করে দিয়ে ছিলেন। এরপর যদি অপর পক্ষও অনুরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ এবং বিচারকের হুকুম জারী করার দাবী করে। এ হুকুম জারী করার বিষয়টি পূর্বের বিচারকের পক্ষ হতেও হতে পারে এবং অন্য কোন বিচারকের পক্ষ হতেও হতে পারে। যদি একই বিচারকের পক্ষ হতে একরূপ হয়ে থাকে এবং উভয় রাষ্ট্রে তারিখও জানা থাকে তাহলে শেষোক্ত রায়টি গ্রহণযোগ্য হবে। যদি তারিখ জানা না থাকে অথবা দুই বিচারকের পক্ষ হতে এ জাতীয় দুই ধরনের হুকুম জারী করা হয়ে থাকে তাহলে যার উপর যে হুকুম জারী করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে ঐ হুকুমই কার্যকরী হবে। কেননা বাহ্যিক তাদের উভয়ের কথাই সহীহ ও সঠিক। কাজেই বিবাদীর উপর যা বর্তাবে প্রত্যেক বাদী হিসাব করে তা কর্তন করে দিবে। আর অতিরিক্ত কিছু থাকলে তা ফেরত দিয়ে দিবে (ফাতহুল কাদীর)।

৮. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের উভয়ে মারা যাওয়ার পর তাদের ওয়ারিস তাদের পরিত্যাজ্য সম্পদ বণ্টন করে নেয়। তারপর যদি তারা আরো বহু মালামালে সন্ধান পায় এবং তাদের কোন এক পক্ষ বলে যে, এগুলো আমাদের অংশের মালামাল তাহলে দলীল প্রমাণ ছাড়া তাদের এ বক্তব্য বিশ্বাস করা যাবে না। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষের উপর কসম করা ওয়াজিব হবে। যদি তারা শপথ করে নেয় তাহলে শেষে প্রাপ্ত এ মালামাল তাদের উভয় দলের মধ্যে আধা-আধি করে বণ্টন করে দেওয়া হবে। যদি উক্ত মালামাল দাবীদার দেয়

হাতেই থাকে এবং তারা যদি পূর্বোক্ত মালামাল বন্টনের পর দ্বিতীয় “পক্ষের আর কোন দাবী নেই” এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করার উপর কোন সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে থাকে তাহলে তাদের কথা বিশ্বাস করা হবে। পক্ষান্তরে “দ্বিতীয় পক্ষের আর কোন দাবী নেই” স্বীকারোক্তির ব্যাপারে তারা যদি কোন সাক্ষী প্রমাণ না করে থাকে তবে তাদের থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে। তারা এ মর্মে শপথ করবে যে, এ মাল তাদের বন্টনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। দ্বিতীয় পক্ষের এভাবে কসম করার পর এ মাল উভয় পক্ষের মধ্যে সমান হারে বন্টন করে দেওয়া হবে (মাবসূত)। শেষে প্রাপ্ত মালামাল দাবীদারদের কবজায় আছে। এমতাবস্থায় তারা যদি বলে, এ আলমুফাওয়াযা চুক্তির আগেই আমাদের পিতার মালিকানাধীন ছিল এবং দ্বিতীয় পক্ষ বলে, এ আলমুফাওয়াযা চুক্তির আগেই আমাদের পিতার মালিকানাধীন ছিল এবং দ্বিতীয় পক্ষ তাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে এ মাল তাদের উভয় পক্ষের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে। যদিও শিরকাতের মালের ব্যাপারে দাবী না থাকার উপর তারা সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। আর যদি শিরকাত ইত্যাদির ব্যাপারেই তাদের কোন দাবী না থাকে, আর এ ব্যাপারে তাদের স্বীকারোক্তি থাকে এবং এ ব্যাপারে সাক্ষীও থাকে তবে এ মাল অপর পক্ষের জন্য খাস হয়ে যাবে। শেষে প্রাপ্ত মালামাল যদি শরীকদ্বয়ের নিকটে না থেকে অন্য কারো হাতে থাকে তবে এ মাল শরীকদ্বয়ের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। অবশ্য যদি বিপক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে, তবে এর হুকুম ভিন্ন হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা : দশ বছর যাবত মুফাওয়াযা চলছে এ স্বীকারোক্তির উপর যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রদান করে এবং বিচারক এ সাক্ষ্য কবুল করে নেন তাহলে দশ বছর এবং তৎপূর্ববর্তী সময় হতে মুফাওয়াযা সাব্যস্ত হয়েছে বলে ধরা হবে। সুতরাং তার হাতে যে মালামাল আছে এ সমুদয় মালামাল দশ বছর বা এর বেয়ে অধিক সময় হতে তাদের শরীকানায় আছে বলে ফায়সালা দেওয়া হবে এবং এ মালামাল তাদের মধ্যে আধা-আধি করে ভাগ করে দেওয়া হবে। যদি সাক্ষিগণ দশ বছর আগে মুফাওয়াযা চুক্তির সূচনা হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয় তবে দশ বছর আগে মুফাওয়াযা হয়েছে বলে ফায়সালা দেওয়া হবে। এর আগে মুফাওয়াযা হয়েছে বলে ফায়সালা দেওয়া হবে না। যদি কোন মালামালের ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে, এ মাল মুফাওয়াযা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আগে অমুক ব্যক্তির মালিকানায় ছিল তাহলে এ মাল খাস ভাবে তারই হবে। আর যে মালের অবস্থা নিশ্চিত জানা নেই, সন্দেহ আছে তা মুফাওয়াযার মাল হিসাবেই গণ্য হবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের কোন একজনে যদি অপর দুই ব্যক্তিকে আদেশ দেয়, তারা যেন তাদের (দুই ব্যক্তির) জন্য একটি গোলাম খরিদ করে এবং সে তাদেরকে গোলামের জিন্স (জাত) এবং মূল্যের কথাও বলে দেয়, তারপর তারা ঐ গোলামকে খরিদ করে, এরপর তারা শিরকাত চুক্তি থেকে আলাদা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আদেশদাতা ব্যক্তি যদি বলে, তারা তাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার পর ঐ গোলাম খরিদ করেছে, কাজেই ঐ গোলাম তার জন্যই খাস! আর অপরজন বলে, তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আগেই ঐ দুই ব্যক্তি ঐ গোলাম খরিদ করেছে, কাজেই ঐ গোলাম আমাদের উভয়ের হবে তাহলে শপথ সাপেক্ষে আদেশদাতা ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর তারা

উভয়ে যদি সাক্ষী প্রমাণ পেশ করে তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উকীলদ্বয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি অংশীদারদ্বয় একথা বলে যে, তারা কখন এ গোলাম খরিদ করেছে তা আমরা জানি না তাহলে আদেশদাতা ব্যক্তিই খাস করে এ গোলামের মালিক হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি আদেশদাতা ব্যক্তি বলে, আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার আগেই তারা এ গোলাম খরিদ করেছে আর অপর ব্যক্তি বলে, আমাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে তারা এ গোলাম খরিদ করেছে তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং আদেশদাতা ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তিতে এক শরীকদার যদি তাদের শরীকী গোলামকে আযাদ করে দেয় তবে *غير المفاوض* (যে ব্যক্তি মুফাওয়াযা চুক্তি করেনি)-এর ক্ষেত্রে যে ধরনের মতামত রয়েছে, এ ক্ষেত্রে ও অনুরূপ মতামত রয়েছে। মুফাওয়াযা চুক্তি বাতিল করার পর যদি একজনকে বলে যে, শরীকী চুক্তি বহাল থাকা অবস্থায় আমি ঐ গোলামকে মুকাতাব বানিয়েছি, তাহলে এ ব্যাপারে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তবে তার নিজের অংশের ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি সহীহ হবে। কিন্তু অপর অংশীদার ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে, সে নিজের ক্ষতিরোধ করার জন্য কিতাবাতের ঐ কথাকে নাকচ করে দিতে পারবে। তবে ঐ নাকচকরণের পূর্বে তার থেকে তার অবগতির বিষয়ে শপথ গ্রহণ করা হবে। এমনিভাবে সে ব্যক্তি যদি শিরকাতের অবস্থায় দানমুক্ত করার ব্যাপারে নিজের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তবে এ ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম হবে। অর্থাৎ তার নিজের অংশের ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি সহীহ হবে। কিন্তু এহেন অবস্থায় অপর শরীক থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু কিতাবাত (গোলামকে মুকাতাব বানানো) এর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম (মাবসূত)।

১২. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তি বাতিল করার পর প্রত্যেকেই অপরের বিপক্ষে ঐ সাক্ষী পেশ করল যে, প্রতিটি শিরকাত থেকে সে দায়মুক্ত। তারপর একজন বলল, শিরকাতের অবস্থায় আমি ঐ গোলামটিকে আযাদ করে দিয়েছিলাম সুতরাং এর অর্ধেক মূল্য তোমার থেকে আমার দায়মুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়নি। একথা শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তি গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে তার কথা তো বিশ্বাস করে নিল বটে। কিন্তু সাথে সাথেই বলল, তখন তো আমি গোলাম থেকে জরিমানা আদায় করার বিষয়টি ইখতিয়ার করে নিয়েছিলাম তাহলে কসম সাপেক্ষে ঐ ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে যে গোলাম আযাদ করেনি। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে গোলামের নিকট থেকে জরিমানা উসূল করতে পারবে। কিন্তু অপর অংশীদার ব্যক্তির নিকট থেকে জরিমানা উসূল করতে পারবে না। আর সে যদি বলে, আমি তোমার থেকে জরিমানা উসূল করার বিষয়টি ইখতিয়ার করে নিয়েছিলাম তাহলে সে দায়মুক্তির কারণে জরিমানা থেকেও দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর গোলামের উপরও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি উক্ত ব্যক্তি এ কথা বলে যে, আমি কোন কিছুই ইখতিয়ার করিনি তাহলে সে গোলামের নিকট হতে জরিমানা উসূল করতে পারবে। কিন্তু অংশীদার ব্যক্তির থেকে জরিমানা উসূল করতে পারবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৩. মাসআলা : যদি স্বীকারোক্তি ব্যক্তকারী (আযাদকারী) ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, সে তার থেকে জরিমানা আদায় করার বিষয়টি ইখতিয়ার করেছিল তাহলে الثابت بالبينه যে বিষয়টি দলীল প্রমাণ সাব্যস্ত একে الثابت بالمعينة অর্থাৎ চোখে প্রত্যক্ষ করার ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয়ের অনুরূপ বলে গণ্য করা হবে। সুতরাং مقرر স্বীকারোক্তি ব্যক্তকারী ব্যক্তি জরিমানা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং গোলামের উপরও কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি শরীক ব্যক্তি বলে যে, আলাদা হয়ে যাওয়ার পরই সে ঐ গোলাম আযাদ করেছে তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি আযাদকারী ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, সে শিরকাতে মুফাওয়াযার অবস্থায়ই গোলাম আযাদ করেছে এবং শরীক ব্যক্তি তার থেকে অর্ধেক মূল্যের জরিমানা উসুল করার বিষয়টি ইখতিয়ার করে নিয়েছিল, অপরদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, সে আলাদা হওয়ার পরই গোলাম আযাদ করেছে এবং সে سيابة العبد তথা গোলাম মেহনত করে তার পাওনা পরিশোধ করবে একে (সে) ইখতিয়ার করেছিল তাহলে আযাদকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। কাজেই সে এবং গোলাম অর্ধ মূল্য জরিমানা হিসাবে পরিশোধ করা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে (মাবসূত)।

১৪. মাসআলা : এক শরীকদার যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি করে যে, শিরকাতের গোলামকে সে এক হাজার টাকার বিনিময়ে মুকাতাব বানিয়েছে এবং ঐ টাকা সে তার থেকে হস্তগতও করে নিয়েছে, তারপর গোলাম মারা গেছে, তাই সে দায়মুক্ত হয়ে গেছে। অপরদিকে দ্বিতীয় অংশীদার বলছে যে, তুমি তাকে আলাদা হওয়ার পর মুকাতাব বানিয়েছিলে। তাহলে ঐ ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে যে তাকে মুকাতাব বানায়নি। যদি গোলাম মারা যাওয়ার সময় বেশ কিছু মাল রেখে যায় এবং মুকাতাব ব্যক্তি বলে, আমি তাকে আলাদা হওয়ার পর মুকাতাব বানিয়েছি ; কাজেই তার ওয়ারিস আমিই, অপরদিকে দ্বিতীয় শরীক ব্যক্তি বলে যে, তুমি তাকে শিরকাতে মুফাওয়াযার অবস্থায়ই মুকাতাব বানিয়েছো। কাজেই আমরা উভয়েই তার ওয়ারিস। এহেন অবস্থায় মুকাতাব গোলাম যদি বদলে কিতাবাত আদায় না করে থাকে তবে ঐ ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য হবে যে তাকে মুকাতাব বানায়নি (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৫. মাসআলা : মুফাওয়াযা চুক্তির শরীকদ্বয় তাদের মালামাল কোন ব্যক্তির নিকট আমানত রাখার পর যদি আমানতগ্রহীতা দাবী করে যে, আমানতের মাল তার (আমানতদাতার) নিকট অথবা তার সাথীর নিকট ফেরত দিয়েছে তাহলে কসম সাপেক্ষে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (মাবসূত)। যদি মাল ফেরত প্রাপ্তির কথা علىٰ مدعى বিবাদী অস্বীকার করে তাহলে আমানতকারী ব্যক্তির কথার কারণে ঐ (অস্বীকারকারী) ব্যক্তি অপর অংশীদার ব্যক্তির জন্য যামিন হবে না। তবে তাকে আল্লাহর নামে এ মর্মে শপথ করানো হবে যে, সে এ মাল হস্তগত করেনি (আল-মুহীত)। তদ্রূপ এক শরীকদার মারা যায় এবং আমানতগ্রহীতা ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নিকট ঐ মাল ফেরত দেওয়ার দাবী করে তাহলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের থেকে তাদের অবগতির উপর শপথ গ্রহণ করা হবে। তারা বলবে,

আল্লাহর কসম, আমাদের মুরিস এ মাল প্রাপ্ত হয়েছে বলে, আমরা জানি না। যদি আমানতগ্রহীতা ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের নিকট আমানতের মাল ফেরত দেওয়ার দাবী করে এরপর তারা এ মর্মে কসম করে যে, এ মাল তাদের হস্তগত হয়নি তাহলে আমানতগ্রহীতা ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির অংশের যামিন হবে। অর্থাৎ আমানতের মালের অর্ধেকের যামিন হবে। আর তা জীবিত অংশীদারও মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টিত হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি আমানত গ্রহীতা এ কথা বলে যে, যে ব্যক্তি আমার নিকট মাল আমানত রাখে নি তার মৃত্যুর পর আমি এই মাল ঐ ব্যক্তির কাছে ফেরত দিয়ে দিয়েছি এবং এ ব্যাপারে সে শপথও করে তাহলে সে জরিমানা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবে। জীবিত ব্যক্তির উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। যদি জীবিত অংশীদার ব্যক্তি এ মর্মে শপথ করে যে, সে এ মাল হস্তগত করেনি (মাবসূত)।

১৬. মাসআলা : আমানতকারী মারা যাওয়ার পর যদি আমানত গ্রহীতা বলে যে, আমি আমানতের অর্ধেক মাল জীবিত ব্যক্তির নিকট এবং বাকী অর্ধেক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের নিকট ফেরত দিয়ে দিয়েছি এবং এ ব্যাপারে সে শপথও করে তাহলে সে জরিমানা আদায় করা থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। যদি দু'পক্ষের একপক্ষ অর্ধেক মাল হস্তগত করার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করে তবে অপরপক্ষ এ মালে শরীক বলে গণ্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি উভয় শরীক জীবিত থাকে এবং আমানত গ্রহীতা ব্যক্তি বলে যে, আমি তাদের নিকট মাল ফেরত দিয়ে দিয়েছি, এমতাবস্থায় যদি একজন স্বীকার করে এবং অপরজন অস্বীকার করে তাহলে সে দায়মুক্ত হবে এবং তার উপর শপথ করাও ওয়াজিব হবে না। চুক্তি সম্পাদনের মজলিস থেকে তারা আলাদা হয়ে যাওয়ার পর যদি আমানতগ্রহীতা ব্যক্তি বলে যে, যে ব্যক্তি আমার নিকট আমানত রেখেছে আমি তার নিকট আমানতের মাল হস্তান্তর করে দিয়েছি। তাহলে সে এর থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর সে যদি বলে যে, আমি এ মাল শরীক ব্যক্তির নিকট ফেরত দিয়ে দিয়েছি এবং উক্ত ব্যক্তি তা অস্বীকার করে তাহলে সে আমানতকারী ব্যক্তির জন্য অর্ধেক মালের যামিন হবে। তারপর আমানতকারী যা পাবে তা উভয় শরীকের মাঝে সমান হারে ভাগ করা হবে। যদি শরীক ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাকে সত্যায়ন করে তাহলে আমানতকারী ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে শরীক ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে, ইচ্ছা করলে আমানত গ্রহীতার নিকট থেকেও ক্ষতিপূরণ উসুল করতে পারবে (মাবসূত)।

অষ্টম অনুচ্ছেদ : শিরকাতুল মুফাওয়াযার যে যে ক্ষেত্রে অংশীদারদের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়

১. মাসআলা : শিরকাতুল মুফাওয়াযার এক অংশীদার যদি একটি সওয়ারী নিদিষ্ট কোন স্থানে যাওয়ার জন্য হাওলাদ নেয়, তারপর যদি তাতে অন্য কোন অংশীদার সওয়ার হয় এবং এতে তা মারা যায় তাহলে তাদের উভয়েকেই এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে (আল-

মুহীত)। যদি কোন অংশীদার নিজস্ব (মালামাল)। খাদ্য-দ্রব্য বহন করার জন্য সওয়ারী হাওলাদ নেয় এবং তাতে যদি অপর কোন অংশীদার অনুরূপ পরিমাণ অথবা এর চেয়ে কম (খাদ্য-দ্রব্য) এর উপর উঠায় আর এতে উক্ত জানোয়ার মারা যায় তবে দ্বিতীয়জনের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। সওয়ার হওয়ায় এ মাসআলার ক্ষেত্রে উভয় অংশীদারের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়া অবস্থায় আরোহী ব্যক্তি যদি শরীকা মাল থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয় তাহলে অপর অংশীদার তার অর্ধাংশ ফেরত পাবে কিনা, এ সম্বন্ধে বিধান হল, যদি উক্ত আরোহী ব্যক্তি তাদের উভয়ের প্রয়োজনে এর উপর সওয়ার হয়ে থাকে তবে সে তার অর্ধাংশ ফেরত পাবে না। আর যদি সে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এর উপর সওয়ার হয়ে থাকে তবে সে তার অর্ধাংশ ফেরত পাবে। এ ক্ষেত্রে সওয়ারীর মালিক তাদের উভয়ের যে কারো নিকটই সওয়ারীর ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : শিরকাতুল মুফাওয়াযার এক শরীকদার যদি সওয়ারী হাওলাদ নেয় যুতী কাপড়ের (মোলায়েম কাপড়ের) গাঁঠুরি বহন করার জন্য এ অবস্থায় অপর শরীক ব্যক্তি যদি তাতে ঐ জাতীয় কাপড়ের গাঁঠুরি তুলে দেয় (আর এতে পশুটি মারা যায়) তবে দ্বিতীয় শরীকের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সে যদি তাতে তায়ালিমা (অর্থাৎ মোটা কাপড়ের কোন গাঁঠুরি উঠায় এবং এতে পশুটি মারা যায়) তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কেননা এগুলো ভিন্ন জাতীয় কাপড় এবং (দুই কাপড়ের) বোঝার ক্ষতির মাত্রাও ভিন্ন। যদি হাওলাদ গ্রহণকারী ব্যক্তিও এতে ভিন্ন জাতীয় কাপড়ের গাঁঠুরি উঠায় তাহলে তার উপরও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হত, কাজেই শরীক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ওয়াজিব হবে। কিন্তু এ মাল যদি তাদের উভয়ের অংশীদারি ব্যবসার মাল হয়ে থাকে তাহলে ক্ষতিপূরণ উভয়ের উপরই ওয়াজিব হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মাল উঠিয়ে এনেছে তার নিকটই যদি তাদের পুঁজি সংরক্ষিত থাকে তবে ক্ষতিপূরণ তাদের উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা যে বোঝা উঠিয়েছে সে তো হল গাসিব (গসবকারী) এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার পক্ষ হতে যামিন। তারপর শরীক ব্যক্তি বোঝা আনয়কারী ব্যক্তির নিকট থেকে তার অর্ধেক (পাওনা) উসূল করে নিবে। যদি সে শরীকী মাল থেকে জরিমানা আদায় করে থাকে (মাবসূত)।

৩. মাসআলা : এক অংশীদার কোন একজন সওয়ারী ধার নিয়েছিল দশ মন গম নেওয়ার জন্য। কিন্তু অপর অংশীদার তাতে করে দশ মন শরীকানা যব নিয়ে গেল (এতে সে পশুটি মারা গেল) তাহলে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। শিরকাতে ইনানের এক অংশীদার কোন কিছু ধার নিল, এ ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত মাসআলার বিধান এখানেও প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। দুই শরীকের একজন যদি অপরজনকে নির্দিষ্ট করে বলে, তুমি এর উপর সওয়ার হয়ে বুখারা (চট্টগ্রাম বা রংপুর) অতিক্রম করবে না। তা সত্ত্বেও সে যদি এর উপর সওয়ার হয়ে ঐ স্থানটি অতিক্রম করে এবং এতে পশুটি মারা যায় তাহলে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে (আস-সিরাজিয়া)। মুফাওয়াযা চুক্তিতে আবদ্ধ দুই শরীকের একজনের কাছে কিছু মাল ছিল, সেই মালের অবস্থা এবং ধরন বর্ণনা করার পর সে লোক মারা গেল, তাহলে মৃত ব্যক্তির উপর অংশীদারের অংশের ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না (ফাতহুল কাদীর)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিরকাতুল ইনান এর বিবরণ

[এ পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ : শিরকাতুল ইনান এর সংজ্ঞা পরিচিতি শর্ত এবং বিধি-বিধান।

১. মাসআলা : কাফালার কথা উল্লেখ করা ব্যতিরেকে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির একই ধরনের মালের ব্যবসা করা যেমন গম, খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদি অথবা সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে একে অপরের অংশীদার হওয়াকে শিরকাতে ইনান বলা হয় (ফাতহুল কাদীর)। শিরকাতে ইনান এর সুরত হল, দুই (বা ততোধিক) ব্যক্তি কোন বিশেষ ধরনের মালের ব্যবসা করার ব্যাপারে অথবা আম ব্যবসার ব্যাপারে পরস্পর একে অপরের অংশীদার হবে। এতে কাফালার কথা উল্লেখ করবে না। এমনিভাবে মুফাওয়াযার কথাও উল্লেখ করবে না। যাতে উকালতের অর্থও নিহিত আছে। এ জাতীয় অংশীদারিত্ব কারবার ব্যবসার উপযুক্ত যে কোন দুই (বা ততোধিক) ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হতে পারে (মুহীত : আস-সারাখসী)। এ জাতীয় অংশীদারি কারবার পুরুষ ও মহিলার মাঝে বালিগ ও ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত না বালিগের মাঝে এবং আযাদ ও অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের মাঝে, সংঘটিত হতে পারে। এমনিভাবে এ কারবার মুসলমান এবং কাফিরের মাঝেও হতে পারে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তাজরীদ গ্রন্থে আছে; মুকাতাব গোলামের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (তাহযীব)। কাফালার কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও যদি চুক্তিতে মুফাওয়াযার শর্ত পুরাপুরি পাওয়া যায় তাহলে এ অংশীদারি ব্যবসা মুফাওয়াযা হিসেবেই সংঘটিত হবে। আর যদি মুফাওয়াযার শর্ত পুরাপুরি পাওয়া না যায় তাহলে এ চুক্তি শিরকাতে ইনান হিসাবে সংঘটিত হবে (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা : শিরকাতে ইনান জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হল, চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে মূলধন উপস্থিত থাকা কমপক্ষে ঐ মাল এমন স্থানে থাকা যা ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়া যায়। শিরকাতে ইনানের ক্ষেত্রে মূলধন সমান হওয়া শর্ত নয়। আবার সমান লভ্যাংশের মধ্যে কম বেশী হতে পারে (মুহীত : আস-সারাখসী)। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, শিরকাতে ইনান এর চুক্তিনামা এভাবে সম্পাদন করবে যে, এটি শিরকাতে ইনান এর ভিত্তিতে পরিচালিতব্য অংশীদারি ব্যবসার একটি চুক্তি পত্র। এতে অমুক অমুক অংশীদার থাকবে। তারা এতে সততা, তাকওয়া এবং আমানতদারি রক্ষা করে চলবে। চুক্তিতে মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে এবং এতে একথাও উল্লেখ থাকবে যে, এ মূলধন তাদের উভয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তারা উভয়ে এর দ্বারা স্বাধীনভাবে ক্রয়-বিক্রয় করবে। একা এবং একত্রে এবং নগদে ও বাকীতে বেচাকেনা করতে পারবে। এতে যে লাভ হবে তা তাদের মূলধন অনুপাতে

ভাগাভাগি হবে। ব্যবসায় লোকসান হলে এই ক্ষতির দায়-দায়িত্ব উভয়ের উপরই বর্তাবে। লভ্যাংশ বন্টন এবং লোকসানের দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে কম-বেশী করতে চাইলে তা চুক্তি পত্রে লিখতে হবে। আর কোন তারিখে, কোন দিনে এ ব্যবসা আরম্ভ হল, তাও চুক্তিপত্রে লিখতে হবে (ফাতহুল কাদীর)। শিরকাতে ইনান এর হুকুম হল, যৌথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তারা পরস্পর একে অপরের উকীল (প্রতিনিধি) হিসাবে গণ্য হবে। তবে অপর অংশীদারের আকদের কারণে যা ওয়াজিব হয় তা উসূল করার জন্য শরীকদের একে অপরের উকীল হবে না (আল-মুহীত)। শরীকদ্বয় যদি চুক্তিতে কাফালার কথা উল্লেখ না করে তাহলে শিরকাতুল ইনান এর মধ্যে তারা একে অপরের কফীল (যামিন) হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শিরকাতুল, ইনান এর চুক্তিকালে লাভ-লোকসানের শর্ত আরোপ করার মাসাইল।

১. মাসআলা : শিরকাতুল ইনান এর ভিত্তিতে দুই ব্যক্তি অংশীদারি কারবার শুরু করল। কাজের দায়িত্ব রাখা হল শুধুমাত্র একজনের উপর। এ অবস্থায় তারা যদি এরূপ শর্ত করে যে, তারা তাদের মূলধন অনুপাতে মুনাফাপ্রাপ্ত হবে, তাহলে এভাবে শর্ত করা জায়েয হবে। এরূপ শর্ত করে ব্যবসা শুরু করার পর লাভ হলে তারা তাদের মূলধন অনুপাতে লভ্যাংশের হকদার হবে এবং লোকসান হলেও এই অনুপাতে এর দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে। যে ব্যক্তি সরাসরি ব্যবসা পরিচালনা করবে সে ব্যক্তির জন্য যদি তারা উভয়ে মিলে মূলধনের তুলনায় অধিক মুনাফা দানের শর্ত করে তবে তাও জায়েয হবে। তবে যে শুধুমাত্র মূলধন দিয়েছে তার মাল ব্যবসা পরিচালকের নিকট মুযারাবার মাল রূপে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মূলধন সরবরাহ করেছে তার জন্য এমন পরিমাণ লভ্যাংশের শর্ত করা হয় যা তার দেওয়া মূলধনের আনুপাতিক হারের চেয়েও অধিক তবে এ শর্ত সহীহ হবে না। এ অবস্থায় শুধু মূলধন সরবরাহকারী ব্যক্তির মাল ব্যবসা পরিচালকের নিকট পুঁজি হিসাবে গণ্য হবে। আর শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই নিজ নিজ হিস্যা অনুসারে লভ্যাংশের হকদার হবে (আস-সিয়াজিয়া)।

২. মাসআলা : শিরকাতে ইনানের অবস্থায় উভয় অংশীদার কাজ করবে বলে শর্ত করা হলে শিরকাত সহীহ হবে। শরীকদ্বয়ের একজনের মাল কম এবং অপরজনের মাল বেশি, এমতাবস্থায় যদি সমান হারে লভ্যাংশ বন্টনের শর্ত করা হয় বা কম বেশী হারে বন্টনের শর্ত করা হয় তাহলে লভ্যাংশ শর্ত মুতাবিক বন্টন করা হবে। আর লোকসান উভয়ের মূলধন অনুপাতে উভয়ের উপর বর্তাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। উভয়ে কাজ করবে বলে শর্ত আরোপ করা অবস্থায় যদি একজন কাজ করে এবং অপরজন কাজ না করে চাই তা ওয়রের কারণে হোক বা বিনা ওয়রে হোক তাহলে উভয়ে কাজ করলে যে ফায়সালা হতো, এ ক্ষেত্রেও সে ফায়সালা এবং হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুযমারাত) লভ্যাংশ পুরোটাই একজনের জন্য; এরূপ শর্ত আরোপ করা হলে তা জায়েয হবে না (আন নাহরুল ফায়িক)। দুই ব্যক্তির একজনে এক হাজার দিরহাম এবং অপরজনে দু'হাজার দিরহাম নিয়ে এসে

এই শর্তে যৌথ ব্যবসায় চুক্তি করল যে, লাভ-লোকসান তাদের আধাআধি বন্টন করা হবে। তাহলে চুক্তি জায়েয হবে। কিন্তু লোকসানের ক্ষেত্রে শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি তারা উভয়ে কাজ করে ব্যবসায় লাভবান হয় তাহলে লভ্যাংশ শর্ত মুতাবিক বন্টন করা হবে। আর লোকসান হলে তা তাদের মূলধন অনুপাতে উভয়ের উপর বর্তাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩. মাসআলা : শিরকাতে ইনানের ক্ষেত্রে শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের জন্য জায়েয আছে নিজের সমুদয় মাল হতে কিছু মাল দিয়ে যৌথ ব্যবসা শুরু করা (ইনায়্যা)। যদি শিরকাতের পুঁজি বিনিয়োগ করে মালামাল খরিদ করার আগেই সম্পূর্ণ পুঁজি ধ্বংস হয়ে যায় বা কোন একজনের পুঁজি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে শিরকাত চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে (হিদায়া)। পুঁজি দ্বারা মালামাল খরিদ করার আগে যে পুঁজিই নষ্ট হোক এতে মালিক ব্যক্তির মালই ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। চাই এ মাল তার মালিকের হাতে ধ্বংস হোক বা অংশীদার ব্যক্তির হাতে ধ্বংস হোক (আল-মুহীত)। যদি শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই এক হাজার টাকা করে এনে শরীকানা চুক্তি করে এবং পরে উভয়ের মালামাল একসাথে মিশিয়ে ফেলে, এমতাবস্থায় ঐ মিশ্রিত মাল থেকে যদি কিছু পরিমাণ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে যা ধ্বংস হয়েছে তা উভয়ের মাল থেকে ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে ; আর যা অবশিষ্ট আছে তা উভয়ের মাল থেকেই অবশিষ্ট আছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত মাল অমুকের মাল ছিল বা যা বাকী আছে তা অমুকের মাল, তাহলে যার মাল বলে চিহ্নিত হবে তা সেই পাবে এবং ধ্বংস প্রাপ্ত মাল যার মাল বলে চিহ্নিত হবে তা তার মাল থেকেই ধর্তব্য হবে (মাবসূত)। যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজনে তার পুঁজি দ্বারা কোন কিছু খরিদ করে নেয় এবং অপর জনের পুঁজি যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে খরিদকৃত মাল তাদের উভয়ের মাঝে শর্ত মুতাবিক বন্টন করা হবে (আল জাহারাতুন নায্যারা)। যদিও তারা শিরকাত চুক্তি সম্পাদনকালে ওয়াকালতের কথাটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেনি (মুযমারাত)। তারপর ক্রেতা ব্যক্তি অপর অংশীদার ব্যক্তির নিকট থেকে খরিদাবস্তুর মূল্য তার ভাগে যে পরিমাণ পড়ে সে পরিমাণ উসূল করে নিবে (ইখতিয়ার শরহিল মুখতার)। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে খরিদকৃত এই বস্তুর মধ্যে শিরকাত হবে শিরকাতে আকদ। কাজেই এই মালে তাদের উভয়েরই হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে (আন-নাহরুল ফায়িক)। এটিই সহীহ অভিমত (মুহীত : আস-সারাখসী)। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কোন একজনের পুঁজি দ্বারা মালামাল খরিদ করার পর অন্য জনের পুঁজি ধ্বংস হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যৌথ পুঁজি দ্বারা মালামাল খরিদ করার আগেই যদি কারো মাল ধ্বংস হয়ে যায়, তারপর অপর ব্যক্তি নিজ পুঁজি দ্বারা মাল খরিদ করে তাহলে দেখতে হবে-যদি তারা শিরকাত চুক্তি সম্পাদনকালে ওয়াকালতের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে থাকে তবে ওয়াকালতে মুফরাদার হুকুমের ভিত্তিতে খরিদকৃত এ মাল তাদের উভয়ের শরীকী মাল হিসাবে গণ্য হবে। কাজেই ক্রেতা ব্যক্তি অংশীদার ব্যক্তির নিকট থেকে তার পাওনা মূল্য উসূল করে নিবে। যদি চুক্তি সম্পাদনকালে শুধুমাত্র যৌথ কারবারের কথা বলে, ওয়াকালতের কথা উল্লেখ না করে তবে ক্রেতাই তার খরিদা মালের মালিক হবে (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা : নাওয়াদির গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে এই শর্তে এক হাজার দিরহাম প্রদান করে যে সে (যাকে দিরহাম দেওয়া হয়েছে) এগুলোকে কাজে লাগাবে (এর দ্বারা ব্যবসা করবে) এবং লাভ-লোকসান তারই হবে। এ অবস্থায় এই দিরহাম দ্বারা মালামাল খরিদ করার পূর্বেই যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে দিরহাম হস্তগতকারী ব্যক্তিকে এর যামিন হতে হবে। অর্থাৎ তার উপর ওয়াজিব হবে এসব দিরহামের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা। যদি দিরহাম প্রদানকারী ব্যক্তি সে ব্যক্তিকে বলে, তুমি এর দ্বারা আমাদের উভয়ের পক্ষ থেকে যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্য কর এবং এতে যা লাভ-লোকসান হবে তা আমাদের উভয়ের মাঝে সমান-সমান থাকবে। এহেন অবস্থায় এ মাল দ্বারা ব্যবসা করার পূর্বেই তা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে অর্ধেক মালের যামিন হবে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণই ওয়াজিব হবে না। আর যদি মাল খরিদ করার পর মূল্য হস্তান্তর করার পূর্বে ঐ পুঁজি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আদেশদাতা ব্যক্তির উপর অর্ধেক মালের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে এবং ক্রেতার উপর অর্ধেক ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : দুই ব্যক্তি মিলে পরস্পর শরীকানা ব্যবসা শুরু করেছে। তাদের একজনের পুঁজি হচ্ছে দিরহাম এবং অপর জনের পুঁজি হচ্ছে দীনার। দীনারের মূল্য দিরহামের মূল্যের সমান। তারপর দিরহামের মালিক দিরহাম দ্বারা গোলাম এবং দীনারের মালিক দীনার দ্বারা দাসী খরিদ করার পর যদি মূল্যও নগদ হস্তান্তর করে দেয় এবং এ ক্রয়-বিক্রয় পৃথক পৃথক ভাবে দুই মজলিসে হয়ে থাকে, এমতাবস্থায় গোলাম ও দাসী তাদের হাতে ধ্বংস হয়ে গেলে তাদের প্রত্যেকেই অপরজন থেকে নিজ মূলধনের অর্ধেক উসূল করে নিবে। আর যদি গোলাম ও দাসী খরিদ করার বিষয়টি একই মজলিসে হয়ে থাকে এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে তাদের কেউই অপরজন থেকে কিছু উসূল করতে পারবে না (যহীরিয়া)। যদি অংশীদারদ্বয় উভয়ে মিলে প্রথমে দিরহাম দ্বারা কিছু সামান খরিদ করে তারপর আবার দীনার দ্বারা কিছু সামান খরিদ করে তারপর তা বিক্রি করে একটাতে লোকসান হয় এবং অপরটিতে লাভ হয় তাহলে মালামাল খরিদ করার দিন তাতে তাদের যে পরিমাণ মালিকানা ছিল সে হিসাবে তাদের উপর লাভ-লোকসান বর্তাবে। এটিই সহীহ অভিমত (মুহীত : আস-সারাখসী ও মাবসূত)।

৬. মাসআলা : যদি আসবাব-সামগ্রী অথবা পরিমাণযোগ্য বস্তুর মাধ্যমে দুব্যক্তি শরীকী কারবার আরম্ভ করে এবং এসবের দ্বারা কোন মাল খরিদ করে তবে তাদের প্রত্যেকেই নিজ আসবাবের মূল্য অনুপাতে খরিদা বস্তুর মালিক হবে। যদি তারা এ মাল বিক্রি করে এর মূল্য বণ্টন করে নিতে চায় তাহলে দেখতে হবে, কি জাতীয় আসবাব সামগ্রীর ভিত্তিতে শরীকী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। যদি এমন বস্তুর মাধ্যমে শরীকী চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে যার কোন ১০ তথা অনুরূপ বস্তু নেই তাহলে ক্রয়ের দিন খরিদকৃত মালের যে মূল্য ছিল তা ধর্তব্য হবে। আর যদি শিরকাত চুক্তি এমন পরিমাণ (যোগ্য) বা ওজনযোগ্য অথবা এমন গণনাযোগ্য বস্তুর ভিত্তিতে হয় যার একটি অপরটির কাছাকাছি তাহলে আসল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এ পর্যায়ে বণ্টনের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। ইমাম কুদুরী (র) বলেন এটিই সহীহ অভিমত (যহীরিয়া)।

৭. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে শিরকাতে ইনানের ভিত্তিতে যারা অংশীদারি কারবার করে তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের শরীকী মালামাল নগদ-বাকী উভয়ভাবে বিক্রি করতে পারবে। এমনিভাবে তাদের জন্য উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সব রকমের মালামাল খরিদ করাই জায়েয আছে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। শিরকাতুল ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের জন্য জায়েয আছে। অংশীদারি কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়কে অন্যের হাওয়ালা করা বা হাওয়ালা কবুল করা বা এ জাতীয় বস্তু কারো নিকট ইজারা দেওয়া (তাহযীব)। যদি যৌথ ব্যবসায়ের চুক্তি সম্পাদনকালে প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে স্বীয় মতানুসারে কাজ করতে পারবে, শর্তটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করা হয়ে থাকে তবে শরীকদের কারো জন্যই জায়েয হবে না। এ ব্যবসায় অন্য কোন ব্যক্তিকে অংশীদার করা। এটিই সহীহ মতামত (যহীরী)। দুই শরীকের কোন একজনকে যদি অপর কোন ব্যক্তিকে তাদের অংশীদারি ব্যবসায় শরীক করে নেয় এবং এ অবস্থায় তৃতীয় ব্যক্তি যা কিছু খরিদ করবে, এর অর্ধেক ক্রেতা পাবে এবং বাকী অর্ধেক প্রথম দু'শরীক পাবে। আর যে শরীক তৃতীয় ব্যক্তিকে এ কারবারে অংশীদার বানায়নি সে যদি কোন বস্তু খরিদ করে তবে এ মাল ক্রেতা ও দ্বিতীয় শরীক ব্যক্তির মাঝে আধা-আধি করে বণ্টন করা হবে। তৃতীয় শরীক এর থেকে কিছুই পাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে, শিরকাতে ইনানের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনকারী শরীকদ্বয়ের কোন একজন যদি দ্বিতীয় অংশীদারের উপস্থিতিতে তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাথে মুফাওয়াযা চুক্তি করে তাহলে মুফাওয়াযা সহীহ হবে এবং প্রথম ব্যক্তির সাথে কৃত চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যদি দ্বিতীয় অংশীদারের উপস্থিতি ব্যতিরেকে সে ব্যক্তি এ কাজ করে তবে এই শিরকাতে মুফাওয়াযা সহীহ হবে না (যহীরিয়া)।

৮. মাসআলা : শিরকাতে ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের কারো জন্যই জায়েয নেই শিরকাতের কোন গোলামকে মুকাতাব বানানো। এ ব্যাপারে কারোই কোন দ্বিমত নেই (আল-মুহীত)। এমনিভাবে আর্থিক বিনিময়ের ভিত্তিতে কোন গোলাম আযাদ করাও জায়েয নেই। চাই সে শিরকাত চুক্তিতে “তুমি স্বাধীনভাবে কাজ কর” কথাটি বলুক অথবা না বলুক। অনুরূপভাবে তিজারতের কোন গোলামকে বিয়ে করানোও তার জন্য জায়েয নেই। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দাসীকে বিয়ে দেওয়াও তার জন্য জায়েয নেই (বাদায়ে)। যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজনে তার কবজায় শরীকী ব্যবসার যে দাসী আছে তার সম্বন্ধে এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, এটি অমুকের তাহলে তার এ স্বীকারোক্তি অংশীদার ব্যক্তির অংশের ব্যাপারে জায়েয (প্রযোজ্য) হবে না। যদিও তাকে তার অপর সাথী স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য বলে থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা : অংশীদারদের কারো নিজস্ব ব্যক্তিগত ঋণের জন্য শরীকী মাল অন্য কারো নিকট বন্ধক রাখা জায়েয নয়। অবশ্য অপর অংশীদার যদি অনুমতি দেয় তবে জায়েয হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। উভয়ের উপর ঋণের যে দায়-দায়িত্ব বর্তায় এ জাতীয় ঋণের কারণে যদি কোন এক অংশীদার শরীকানা মাল তৃতীয় কারো নিকট বন্ধক রাখে তবে তা জায়েয হবে না। এ অবস্থায় সে (বন্ধকদাতা) বন্ধকী মালের যামিন হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কিন্তু আকিদ (আক্দ্

সম্পাদনকারী) নিজেই যদি এই ঋণের কারণ হয়ে থাকে অথবা তার অংশীদার যদি এ ব্যাপারে তাকে আদেশ দিয়ে থাকে তবে এ ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ)। এমনিভাবে যদি শরীকী মাল থেকে ঋণ দিয়ে সে ঋণের পরিবর্তে করজদার ব্যক্তির নিকট থেকে বন্ধক রাখা হলে তা অপর অংশীদার ব্যক্তির হিস্যার ক্ষেত্রে জায়েয হবে না। কিন্তু যদি শরীক ব্যক্তি নিজেই এই আকদের ওলী (সম্পাদনকারী) হয় অথবা সে নিজে যদি আকদ সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে এর জন্য হুকুম করে তবে তা জায়েয হবে। যদি বন্ধকী মাল বন্ধকগ্রহীতার হাতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এই মালের মূল্যও ঋণের পরিমাণ সমান সমান হয় তাহলে অর্ধেক ঋণ অর্থাৎ সে অপর শরীক থেকেও তার পাওনা উসূল করে নিতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। শিরকাতে ইনানের চুক্তিতে অংশীদার ব্যক্তিদের কোন একজন যদি বন্ধক দেওয়া বা বন্ধক গ্রহণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে এবং সে নিজে যদি ওলীয়ে আকদ হয় তবে তা জায়েয হবে। আর সে যদি ওলীয়ে আকদ না হয় তবে তা জায়েয হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ)। শরীকদ্বয় শিরকাত চুক্তি ভঙ্গ করে দেওয়ার পর তাদের কোন একজন যদি বন্ধক দেওয়া বা গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাহলে তার এ স্বীকারোক্তি সহীহ হবে না, যদি অংশীদার ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা : শিরকাতে ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের কোন একজন যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কোন মাল হাওলাদ গ্রহণ করে তবে তা তাদের উভয়ের উপর বর্তাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, বাদায়ে, মুহীত : আস-সারাখসী)। শরহুল কুদুরীতে উল্লেখ আছে যে, যদি শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই অপরজনকে বলে, “তুমি তোমার ইচ্ছামত এর দ্বারা ব্যবসা কর” তাহলে তাদের উভয়ের জন্য জায়েয হবে ব্যবসার নিমিত্তে এর মাল বন্ধক রাখা, এর পরিবর্তে বন্ধক গ্রহণ করা, নিজের মালের সাথে তা মিশ্রিত করা বা শিরকাতে ভিত্তিতে অন্যের মালের সাথে একে মিলিয়ে নেওয়া ইত্যাদি। তবে শরীকী মাল থেকে হিবা করা ঋণ দেওয়া, কিংবা তা ধ্বংস হওয়ার মত কোন কাজ করা অথবা বিনিময় ছাড়া কাউকে এর মালিক বানিয়ে দেওয়া জায়েয নেই। কিন্তু যদি শরীক ব্যক্তি এসব বিষয়ে তাকে স্পষ্ট অনুমতি দেয় তাহলে তা জায়েয হবে। শরহুল কুদুরীতে একথাও উল্লেখ আছে যে, যদি শরীক ব্যক্তি তাকে এ কথা বলে যে, “তুমি এ মাল দ্বারা ইচ্ছামত ব্যবসা কর” তাহলে সে এ শরীকী মাল নিজের একান্ত ব্যক্তিগত মালের সাথে মিশাতে পারবে না (যখীরা)।

১১. মাসআলা : শিরকাতে ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ শরীক ব্যক্তি, পুঁজি গ্রহণকারী ব্যক্তি, আমানতগ্রহীতা ব্যক্তি এবং মুযারিব (মুযারাবার ভিত্তিতে ব্যবসাকারী ব্যক্তি)-এর জন্য জায়েয আছে মালামাল নিয়ে বাইরে সফর করা। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর এটিই সহীহ মায়হাব (খুলাসা)। যদি উভয় শরীকের শরীকী মালামাল একত্রে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে তবে শরীকদ্বয়ের কারো জন্যই জায়েয হবে না। আবার শরীকের অনুমতি ছাড়া এ মাল নিয়ে বাইরে সফরে যাওয়া। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি মাল নিয়ে সফর করে এবং তা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে যে, এ মালের পরিমাণ কেমন ছিল। যদি মাল এত বেশী হয় যে তা বহন করতে টাকা-পয়সার দরকার হয় তাহলে যার হাতে এ মাল নষ্ট হয়েছে তার উপর

ওয়াজিব হবে এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা। আর যদি এ মাল বহন করতে টাকা-পয়সার প্রয়োজন না হয় তাহলে এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজন শরীকী মাল নিয়ে বাইরে সফরে যায় এবং অংশীদার ব্যক্তিও এ সফরের ব্যাপারে তাকে অনুমতি দিয়ে থাকে অথবা তাকে বলে থাকে, “তুমি তোমার ইচ্ছামত এর দ্বারা ব্যবসা কর অথবা শিরকাত চুক্তির সময় এ বিষয়টিকে مطلق হয়েছিল তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত সহীহ রিওয়ায়েত মতে সফরকারী ব্যক্তিঃ জন্য জায়েয হবে। নিজের খরচা, যাতায়াত ভাড়া এবং খোরপোষ ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ব্যয় যৌথ মালিকানাধীন মূলধন হতে নির্বাহ করা। হাসান (র) ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে এই কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেছেন এটি ইসতিহসানের কথা (বাদায়ে)। ব্যবসায় যদি লাভ হয় তবে এ সব খরচা লভ্যাংশ থেকে কর্তন করা হবে। আর যদি লাভ না হয় তবে মূলধন থেকে কর্তন করা হবে (খাযানাতুল মুফতিয়ীন)। যদি সফরকারী শরীক ব্যক্তি সফর করে এমন স্থানে যায় যে স্থান ফেরত এসে নিজ বাড়িতে রাত্রি যাপন করা সম্ভব তাহলে তার খরচা শরীকী মাল থেকে ধর্তব্য হবে না অর্থাৎ এ মাল থেকে তা কাটা যাবে না (তাহযীব)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শিরকাতে ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ অংশীদারদের শরীকী মালের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এবং তাদের কারো পক্ষ হতে নতুন করে কোন চুক্তি করা ও সে চুক্তির ভিত্তিতে অপরজনের উপর আবর্তিত বিধি-বিধান সম্পর্কিত মাসাইল।

১. মাসআলা : শিরকাতে ইনানের শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের জন্য জায়েয আছে, বেচা-কেনা এবং ইজারা গ্রহণের জন্য অপর কাউকে উকীল নিয়োগ করা। এমনিভাবে অপর জনের জন্যও জায়েয আছে উক্ত উকীলকে তার ওয়াকালত হতে খারিজ করে দেওয়া। অবশ্য শরীকদ্বয়ের কেউ যদি বকেয়া পাওনার তাগাদা করার জন্য উকীল নিয়োগ করে তবে অপরজন তাকে বরখাস্ত করতে পারবে না (যহীরিয়া)। এক শরীকদার যদি বেচা-কেনা সম্পর্কিত কোন আকদ করে তবে সে খরিদকৃত মাল এবং বিক্রিত মালের মূল্য কবজা করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করতে পারে (বাদায়ে)। এ ছাড়া আর যত تصرفات (হস্তক্ষেপ বা কর্মকাণ্ড) আছে সে ক্ষেত্রে শিরকাতে ইনানের উভয় অংশীদার শিরকাতে মুফাওয়াযার অংশীদারদের অনুরূপ। শিরকাতে মুফাওয়াযা শরীকদ্বয়ের যে যে অধিকার আছে শিরকাতে ইনানের ক্ষেত্রেও শরীকদ্বয়ের সে সে অধিকার থাকবে (আল-মুহীত)। শিরকাতে ইনানের অংশীদারদের জন্য যে সব কর্মকাণ্ড জায়েয সে সব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে যদি অপর কোন অংশীদার তাকে বারণ করে তাহলে ঐ কাজ করা আর তার জন্য জায়েয হবে না। এতদসত্ত্বেও সে যদি তা করে তাহলে তাকে অংশীদারের অংশের জামানত ও ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে। এ কারণেই বলা হয় যে, যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজনে অপরজনকে বলে যে, তুমি দিময়াত (একটি শহরের নাম) পর্যন্ত যাবে। কিন্তু দিময়াত অতিক্রম করতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও সে যদি দিময়াত অতিক্রম করে আরো সামনে যায় এবং ঐ মাল ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তার উপর ওয়াজিব

হবে অপর অংশীদারের অংশের জরিমানা আদায় করা। এমনভাবে তাদের কেউ যদি অপর ব্যক্তিকে বাকীতে মালামাল বিক্রি করার অনুমতি প্রদানের পর আবার তাকে বাকীতে বিক্রি করতে নিষেধ করে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা : কুদূরী গ্রন্থে আছে, শরীকদ্বয়ের একজনে কোন কিছু বিক্রি করার পর অপর জনে যদি তা ভঙ্গ (الاف) করে দেয় তবে এ ইকাল (ভঙ্গ) জায়েয হবে (আল-মুহীত)। একজনে কিছু সামান্য বিক্রি করার পর যে কোন দোষের কারণে তা তার নিকট ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর বিচারকের ফায়সালা ছাড়াই সে তা কবুল করে নেয় তাহলে এ গ্রহণ করণ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এমনভাবে যদি দোষের কারণে সে কিছু মূল্য হ্রাস করে দেয় বা মূল্য পরিশোধের সময় কিছুটা বাড়িয়ে দেয় তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (খুলাসা)। যদি শরীকদ্বয়ের একজনে কোন কারণ ব্যতিরেকে বা অপর অংশীদারের আদেশ ছাড়াই মালের মূল্য হ্রাস করে দেয় তাহলে আশংকা আছে যে, এ হ্রাসকরণ তার অংশের ব্যাপারে তো জায়েয হবে, কিন্তু অপর অংশীদারের অংশের ক্ষেত্রে জায়েয হবে না (বাদায়ে)। এমনভাবে সে যদি ক্রেতাকে মূল্য হিবা করে দেয় তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। শরীকী সামানের ব্যাপারে যদি দুই শরীকের কোন একজন দোষের কথা স্বীকার করে তবে এ স্বীকারোক্তি তার এবং অপর অংশীদার উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সর্ব প্রকার ব্যবসার ব্যাপারে শিরকাতে ইনানের ভিত্তিতে যৌথ ব্যবসা করার জন্য দুই ব্যক্তি চুক্তি করেছিল। এমতাবস্থায় যদি তাদের একজনে অপর জনের সাথে এক কুরর (বিশেষ ধরনের একটি পরিমাপ পাত্র) গণের ব্যাপারে শিরকাতের ভিত্তিতে বায়য়ে সালামের চুক্তি করে তাহলে সালাম চুক্তি সহীহ হবে না (কিন্য়া)।

৩. মাসআলা : এক শরীকদার কোন মাল নগদ বিক্রি করেছিল। আর অপর জনে সেটির মেয়াদ বাড়িয়ে দেয় তাহলে এ মেয়াদ বর্ধিতকরণের বিষয়টি কারো অংশের ক্ষেত্রেই সহীহ হবে না। কিন্তু শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই যদি অপর জনকে বলে, “তোমার যা ইচ্ছা করতে পারো” তবে তা সহীহ হবে। এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিमत। কিন্তু সাহেবাইনের মতে নিজের অংশের ব্যাপারে তো মেয়াদ বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য হবে (কিন্তু অপর শরীকের অংশের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না)। পক্ষান্তরে যদি البیع الى অর্থাত্ বিক্রিকারী ব্যক্তি তাকে এভাবে সময় বাড়িয়ে দেয় তবে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে মেয়াদ বৃদ্ধি উভয়ের অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (মুযমারাত)। উভয় শরীক একত্রিত হয়ে বাকীতে মাল বিক্রি করেছিল, তারপর তাদের একজনে মূল্য পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিল তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মেয়াদ বর্ধিতকরণের এ বিষয়টি তার নিজের অংশের ক্ষেত্রে এবং অপর শরীকের অংশের ক্ষেত্রে কারো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে মেয়াদ বর্ধিত করণের এ বিষয়টি তার নিজের অংশের ক্ষেত্রে জায়েয হবে। কিন্তু শরীক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না। যদি দুই শরীকের কোন একজনে বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করে, তারপর এই আকিদ ব্যক্তিই যদি মূল্য পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয় তবে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার মেয়াদ বর্ধিতকরণের এ বিষয়টি উভয়ের অংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। এ বিষয়টি ইজমার দ্বারা প্রমাণিত

(মুযমারাত)। যে যে অবস্থায় মেয়াদ বর্ধিত করা সহীহ সে সে অবস্থায় (এ কারণে) উক্ত ব্যক্তির উপর জরিমানা ওয়াজিব হবেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা : এক শরীকদার যদি যৌথ কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ঋণের কথা স্বীকার করে এবং অপর জনে তা স্বীকার করে তবে ঋণের সম্পূর্ণ দায় স্বীকারোক্তিকারীর উপর বর্তাবে। এর জন্য শর্ত হল, যদি সে এ মর্মেও স্বীকারোক্তি করে যে, সেই হচ্ছে, ওলীয়ে আকদ। যেমন সে বলল, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট হতে এ গোলামটি এত দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করেছি (আল-মুহীত)। যৌথ কারবার সংক্রান্ত ঋণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যক্তি যদি এ কথা বলে যে আমরা উভয় শরীকই এ আকদের ওলী ছিলাম তাহলে স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যক্তির উপর ঋণের দায়-দায়িত্ব বর্তাবে। আর সে যদি এ কথা স্বীকার করে যে, আমার দ্বিতীয় অংশীদার ব্যক্তিই মূলতঃ এ আকদ সম্পাদন করেছে তাহলে اقرار (স্বীকারোক্তি) বিষয়ক সমস্ত ক্রিাবে এ কথা উল্লেখ আছে যে, তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। এটিই সহীহ অভিमत (যহীরিয়া)।

৫. মাসআলা : শিরকাতে ইনানে এক অংশীদার যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি করে যে, তাদের পাওনা ঋণ একমাস পর পরিশোধ যোগ্য তাহলে সমস্ত ইমামের মতে তার অংশের ব্যাপারে তার এ স্বীকারোক্তি সহীহ হু। এমনভাবে যদি কোন একজনে তার পাওনা থেকে পাওনাদার ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেয় অথবা তার অংশের ক্ষেত্রে এ মুক্তকরণ বা অব্যাহতি প্রদান সহীহ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শরীকদ্বয়ের কোন একজনের কাছে যৌথ ব্যবসায়ের কোন দাসী আছে ঐ দাসী সম্বন্ধে সে যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, এ দাসী অমুক ব্যক্তির তাহলে তার এ স্বীকারোক্তি শরীকদ্বয়ের অংশের ক্ষেত্রে জায়েয হবে না। কিন্তু তার অংশের ক্ষেত্রে জায়েয হবে (বাদায়ে)। শরীকদ্বয়ের কোন একজনে যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, সে তাদের ব্যবসার জন্য অমুক ব্যক্তির নিকট হতে এক হাজার দিরহাম হাওলাদ নিয়েছে তাহলে এ ঋণের দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে (আল-মুহীত)। উযূন গ্রন্থে আছে, কিন্তু সে যদি এ বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করে তাহলে এর হুকুম ভিন্ন হবে। এ অবস্থায় ঋণদাতা ঋণ গৃহীতা থেকে তার পাওনা উসুল করে নিবে। তারপর ঋণগৃহীতা অংশীদার ব্যক্তির নিকট থেকে হারাহাতিবে তার পাওনা উসুল করে নিবে (তাতার খানিয়া)। যদি শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকে একে অপরের তার বাবদ ঋণগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রদান করে থাকে তাহলে এ ঋণ শুধুমাত্র (ঋণগ্রহীতার) উপরই ওয়াজিব হবে। কাজেই ঋণদাতা ঋণগৃহীতার নিকট থেকে তার পাওনা উসুল করে নিবে। কিন্তু সে যদি তার অংশীদার ব্যক্তির নিকট হতে কিছুই প্রত্যাহার করে নিজেপারবে না। এটিই সহীহ অভিमत (মুযমারাত, আল-মুহীত, ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা : শরীকদ্বয়ের একজন যদি কোন চুক্তির ঋণ মুত্তাওয়ালী (অভিভাবক) হয় তাহলে এ চুক্তির হুকুম আকদ সম্পন্নকারী ব্যক্তির উপরই বর্তাবে। সুতরাং তাদের একজনে যদি কোন কিছু বিক্রি করে তবে অপর জনে এর মূল্য হস্তগত করতে পারবে না। এমনভাবে দুই শরীকের কোন একজনের চুক্তি সম্পাদনের কারণে যে ঋণ কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব

হয় এই জাতীয় ঋণ সে (ওলী) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কবজা করতে পারবে না। এমনিভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ও ইখতিয়ার থাকবে, সে এ ঋণ উক্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করা হতে বিরত থাকতে পারবে। যেমন কোন ব্যক্তি **وكيل بالبيع** (যে ব্যক্তি বিক্রয়ের উকীল) থেকে কোন কিছু খরিদ করেছে। সে মআকিলের নিকট মূল্য হস্তান্তর করা হতে বিরত থাকতে পারবে। এতদসত্ত্বেও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অংশীদার ব্যক্তির ঐ করযা হস্তান্তর করে দেয়, অথচ এ ক্ষেত্রে **وكيل** (অর্থাৎ একে অপরের উকীল বানানো) হয়নি তাহলে সে তার নিজের অংশের ব্যাপারে তো মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ঋণদাতা ব্যক্তির অংশ (পাওনা) থেকে মুক্ত হবে না। এটি ইসতিহাসানের কথা (বাদায়ে)। শরীকদ্বয়ের কোন একজনে তাদের যৌথ তিজারতের জন্য কোন জিনিস খরিদ করেছিল। তারপর সে তাতে কিছু খুঁত পেল, তাহলে এই খুঁতের কারণে অপর অংশীদার ব্যক্তি এ মাল ফেরত দিতে পারবে না (মাবসূত)। অনুরূপভাবে তাদের কোন একজনে যদি যৌথ ব্যবসার কোন মাল বিক্রি করে তবে ক্রেতা অপর জনের নিকট এ মাল ফেরত দিতে পারবে না (যহীরিয়া)।

৭. মাসআলা : দুই শরীকের কোন একজনে যদি বাকীতে মাল বিক্রি করে অথবা এইভাবেই মাল বিক্রি করে তবে এ ব্যাপারে অপর শরীকের মামলা মকদমা করার ইখতিয়ার থাকবে না। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি লেনদেন করবে সেই মকদমা দায়ের করতে পারবে। কেউ নালিশ করলে তা তার উপরই বর্তাবে। যে ব্যক্তি এ লেনদেন করেনি তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না, তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্যও গ্রহণ করা যাবে না এবং তার থেকে কোন হলফও গ্রহণ করা হবে না। এ ক্ষেত্রে সে এবং তৃতীয় অপর কোন ব্যক্তি উভয়ই সমান (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। শিরকাতে ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদের কোন একজনে যদি ইজারা গ্রহণ করে তবে ইজারাদাতা ব্যক্তি অংশীদার ব্যক্তির নিকট এর উজরত (পারিশ্রমিক) দাবী করতে পারবে না (আল-মুহীত)। যদি আকদ (চুক্তি) সম্পাদনকারী ব্যক্তি শিরকাতের মাল থেকে উজরত (পারিশ্রমিক) আদায় করে তাহলে শরীক ব্যক্তি তার নিকট থেকে তার পাওনা অর্থাৎ প্রদত্ত মালের অর্ধেক পরিশোধ করে নিবে। যদি সে একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ইজারা গ্রহণ করে থাকে। পক্ষান্তরে সে যদি তাদের যৌথ তিজারতের জন্য ইজারা গ্রহণ করে থাকে এবং একান্ত নিজস্ব মাল থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করে থাকে তাহলে দ্বিতীয় অংশীদার ব্যক্তির নিকট হতে সে অর্ধেক উজরত উসূল করে নিবে। যদি দুই ব্যক্তি কোন খাস মালের মধ্যে শরীক থাকে এবং এ শিরকাত যদি শিরকাতে মিল্ক হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি অপর অংশীদার থেকে কিছুই নিতে পারবে না (মাবসূত)। অনুরূপভাবে যদি দুই শরীকের কোন একজনে তাদের যৌথ ব্যবসার মাল থেকে কিছু মাল ইজারা দেয় তাহলে অপর শরীকের জন্য জায়েয হবে ইজারা গ্রহীতার নিকট এর উজরত (পারিশ্রমিক) দাবী করা (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : দুই ব্যক্তি তিজারতের কোন মালের ব্যাপারে এই শর্তে শিরকাতে ইনানের চুক্তি করল যে, তারা নগদ বাকী উভয় ভাবেই মালামাল বেচাকেনা করতে পারবে। এমতাবস্থায় এক শরীকদার যদি ব্যবসায়ের ঐ মাল ছাড়া ভিন্ন কোন মাল খরিদ করে তাহলে তা একান্তই নিজস্ব মাল হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তিজারতের যে মালের ব্যাপারে চুক্তি হয়েছে যদি সে

মালের লেনদেন না হয়ে ঐ শ্রেণীর (نوع) কোন মালের লেনদেন হয় তবে শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের নগদ বা বাকী বেচাকেনা করা অপরজনের উপর কার্যকরী হবে। কিন্তু যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজনে পরিমাণযোগ্য, ওজনযোগ্য বা নগদ মুদার বিনিময়ে কোন বাকী বস্তু খরিদ করে, এমতাবস্থায় তার হাতে যদি এ জাতীয় আরো শরীকী মাল থাকে তাহলে শিরকাতের ভিত্তিতে তার খরিদ করা জায়েয হবে। আর যদি এ জাতীয় মাল না থাকে তবে সে মাল তার নিজের জন্যই খরিদ করেছে বলে গণ্য হবে। যদি উক্ত ব্যক্তির হাতে দিরহাম জাতীয় শিরকাতের মাল থাকে এবং এর দ্বারা সে বাকীতে দীনার খরিদ করে তাহলে কিয়াস অনুসারে এ মাল সে নিজের জন্য খরিদ করেছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু ইসতিহাসানের দৃষ্টিতে এ মালও শরীকী মাল হিসেবে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা : শিরকাতে ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের কোন একজনে যদি নিজেকে এমন কাজের জন্য ইজারা দেয় যা উভয়ের ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট তাহলে তার উপার্জিত পারিশ্রমিক উভয়ের মাঝে বন্টন করা হবে। পক্ষান্তরে সে যদি তার নিজেকে এমন কাজের জন্য ইজারা দেয় যা তাদের ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত নয় অথবা উক্ত ব্যক্তি যদি নিজের গোলামকে ইজারা দেয় তবে এ কাজের পারিশ্রমিক সে নিজে একাই পাবে (যখীরা)। যদি দুই শরীকের কোন একজনে মুদারাবার ভিত্তিতে অপর কোন ব্যক্তি থেকে কিছু মাল গ্রহণ করে ব্যবসা করে তবে এ ব্যবসার লাভালাভ সে একাই পাবে। “আল কিতাব” গ্রন্থে মাসআলাটি এভাবেই (مطلقاً) ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর ব্যাখ্যাও আছে, তা হল, কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে মুদারাবার ভিত্তিতে কিছু টাকাপয়সা গ্রহণ করে, এর দ্বারা ব্যবসা করার জন্য যাতে তাদের যৌথ ব্যবসার কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে এ ব্যবসাতে যে লাভ হবে তা সে একাই পাবে। এমনিভাবে যদি শরীকদ্বয়ের কোন ব্যক্তি তার অংশীদার ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাদের যৌথ কারবারের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসার জন্য মুদারাবার মাল গ্রহণ করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হকুম হবে। পক্ষান্তরে সে যদি তাদের যৌথ কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসা করার জন্য মুদারাবার মাল গ্রহণ করে অথবা অপর শরীকের অনুপস্থিতিতে **مطلقاً** মুদারাবার মাল গ্রহণ করে (ব্যবসা করে) তাহলে এ ব্যবসার লাভালাভ তাদের উভয়ের মাঝে **مشارك** হবে। অর্থাৎ তা উভয়ের মধ্যে বন্টন করা হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১০. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে আছে, একজন অন্যজনকে বলল, এ বছর আমি যে গোলাম খরিদ করব তাতে আমি তোমাকে শরীক করে নিলাম। তারপর সে যিহারের কাফ্ফারা বা এ জাতীয় কোন কাজের জন্য গোলাম খরিদ করল এবং এ মর্মে সাক্ষীও রাখল, এরূপ করা জায়েয হবে না। বরং শরীক ব্যক্তি এই গোলামের অর্ধেকের হকদার হবে। কিন্তু শরীক ব্যক্তি যদি তাকে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তবে তা জায়েয হবে। এমনিভাবে খাদ্য-দ্রব্য খরিদ করার ব্যাপারে অপর কোন ব্যক্তিকে অংশীদার বানানোর পর সে ব্যক্তি যদি একান্ত নিজের জন্য কোন খাদ্য-দ্রব্য খরিদ করে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হকুম হবে (আল-মুহীত)। শরীকী মাল ছাড়া অন্য কোন মালের মধ্যে যদি তাদের কারো কোন ঘাটতি বা লোকসান হয় তবে তা একমাত্র তার উপরই বর্তাবে। উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, শরীকী ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত

নয় এমন কোন বিষয়ে এক শরীকদার অপর জনের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে (মাবসূত)।

১১. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, দুই ব্যক্তি সমান মূলধনে শিরকাতে ইনান করল এবং স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রায় অনুসারে কাজ করল। তাদের প্রত্যেকের এককভাবে বেচাকেনা করা তার এবং অপরের উপর কার্যকরী হচ্ছে। এহেন অবস্থায় যদি তাদের একজনে তার নিজের অংশের সামান বিক্রি করে এবং এ ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী রাখে তাহলে এ বিক্রয় তার ও অংশীদার উভয় ব্যক্তির হিস্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। অনুরূপ ভাবে সে যদি তার শরীক ব্যক্তির অংশ বিক্রি করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে (আল-মুহীত)। শরীকদ্বয়ের কোন একজনের হাতে শরীকী মাল নষ্ট হলে যার হাতে মাল নষ্ট হয়েছে তাকে অপর অংশীদারের হিস্যার জামানত দিতে হবে না। যার হাতে সমান নষ্ট হবে তার কথা শপথ সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে (বাদায়ে)। শিরকাতে ইনানের কোন অংশীদার যদি কোন মাল গসব করে (ছিনিয়ে আনে) অথবা কোন মাল নষ্ট করে দেয় তাহলে এ কারণে অপর অংশীদারকে ধরা যাবে না। অংশীদারদের একজনে কোন মাল ফাসিদ তরীকায় খরিদ করার পর তা যদি উক্ত ক্রেতার নিকট নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাকে এর ক্ষতি পূরণ পরিশোধ করতে হবে। তবে এর অর্ধেক সে অপর অংশীদার থেকে উসূল করে নিবে (মাবসূত)।

১২. মাসআলা : শিরকাতে ইনানের এক অংশীদার যদি মারা যায় এবং শিরকাতের মাল তার হাতে থাকে আর সে যদি বিষয়টি কারো কাছে না বলে যায় তাহলে তাকেই এর যামিন হতে হবে। কাজেই তার (মৃত ব্যক্তির) পরিত্যাজ্য সম্পদ থেকে এ জরিমানা উসূল করা হবে (আল-মুহীত)। শিরকাতে ইনানের চুক্তিতে আবদ্ধ শরীকদ্বয়ের একজনে কোন সওয়ারী হাওলাদ গ্রহণ করল তাতে নিজের খাদ্য জাতীয় নির্দিষ্ট মালামাল বহন করার জন্য। এরপর এতে অন্য অংশীদার অনুরূপ পরিমাণ বা এর চেয়েও কম মাল উঠিয়ে দিল, আর এতে সওয়ারীটি মারা গেল, তাহলে তাকে (অংশীদার) এর জামানত আদায় করতে হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। এক শরীকদার তাদের যৌথ ব্যবসার নির্দিষ্ট কোন মাল তাতে বহন করে নেওয়ার জন্য কোন সওয়ারী হাওলাদ নিল। তারপর দ্বিতীয় অংশীদার তাদের যৌথ ব্যবসায়ের অনুরূপ পরিমাণ কিছু মালামাল তাতে তুলে দিল এবং এতে ঐ সওয়ারীটি মারা গেল তাহলে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। মোদাকথা হল, শিরকাতে ইনানের শরীকদ্বয়ের কোন একজনের হাওলাদ গ্রহণের ফায়দা যদি কেবল মাত্র তারই হয় তবে এ হাওলাদ, হাওলাদ গ্রহীতার সাথেই খাস হবে। উভয়ের পক্ষ হতে হবে না। যদি উভয়ে হাওলাদ গ্রহণের ফায়দাভোগী হয় তাহলে এটা উভয়ের পক্ষ হতে হাওলাদ গ্রহণের অনুরূপ বলে গণ্য হবে (আল-মুহীত)। দুই ব্যক্তি শিরকাতে ইনানের ভিত্তিতে অংশীদারি চুক্তি করে তারা কিছু সমান ও খরিদ করেছে। এমতাবস্থায় তাদের একজনে যদি অপর জনকে বলে, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমি তোমার সাথে কাজ করব না। এ কথা বলেই সে উধাও হয়ে যায়। তারপর অপর ব্যক্তি ঐ মাল-সামান দিয়ে ব্যবসা করে। যদি এ ব্যবসায় কিছু লাভ হয় তাহলে ব্যবসাকারী ব্যক্তিই এই লাভালাভের মালিক হবে। আর উধাও হওয়া শরীকের অংশের যে মূল্য হবে সে এ মূল্যের যামিন হবে। অর্থাৎ এর ক্ষতিপূরণ আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শিরকাতে উজুহ এবং শিরকাতে আমালের বিবরণ।

[এ পরিচ্ছেদে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ : শিরকাতে উজুহ এর পরিচিতি ও হুকুম।

১. মাসআলা : শিরকাতে উজুহ (সুন্নাভিত্তিক অংশীদারি করাবার) দুব্যক্তির কোন মাল নেই, কিন্তু সুন্নাহ রয়েছে এমন দুব্যক্তি চুক্তি করে যে, আমরা দুজনে মিলে বাকীতে মাল ক্রয় করে তা নগদ বিক্রি করব। এতে আল্লাহ তা'আলা যে লাভ দিবেন তা আমরা এই শর্ত সাপেক্ষে বণ্টন করে নিব। এভাবে চুক্তি সম্পাদন করাকে শিরকাতে উজুহ বলা হয় (বাদায়ে মুযমারাত)। উক্ত শিরকাত শিরকাতে মুফাওয়াযা রূপে গণ্য হবে, যদি তারা উভয়ে কাফালতের উপযুক্ত হয়, খরিদকৃত বস্তু তাদের মাঝে আধা-আধি হারে বণ্টিত হয়, তাদের প্রত্যেকের উপর অর্ধেক মূল্য পরিশোধযোগ্য হয় এবং লভ্যাংশও তাদের মধ্যে আধা-আধি হারে বণ্টন করা হয়। চাই তারা চুক্তিতে মুফাওয়াযার কথা বলুক অথবা এমন শব্দ বলুক যা মুফাওয়াযার مقتضী (অর্থাৎ মুফাওয়াযার অনিবার্যদাবী)। এহেন অবস্থায় বিক্রিত পণ্য ও এর মূল্যের ব্যাপারে ওয়াকালতও কাফালত সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি শিরকাতে উজুহ এর মধ্যে উপরোক্ত বিষয়সমূহের কোন একটি অনুপস্থিত থাকে তবে তা শিরকাতে ইনান হিসাবে গণ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা : যদি শিরকাত চুক্তিকে مطلق রাখা হয় তবে তা ইনান হিসাবে গণ্য হবে (যহীরিয়া)। খরিদা বস্তুর মালিকানার মধ্যে কম-বেশী হওয়ার শর্ত আরোপ করা অবস্থায়ও দুই ব্যক্তির মধ্যে শিরকাতে ইনান হতে পারে। তবে খরিদা বস্তুর মালিকানার ব্যাপারে আরোপিত শর্তের পরিমাণ অনুসারে লভ্যাংশ বণ্টনের শর্ত আরোপ করা বাঞ্ছনীয় (অর্থাৎ মালিকানা ও লভ্যাংশ বণ্টনের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়)। অতএব খরিদা বস্তুর মালিকানায় কম-বেশী থাকা অবস্থায় যদি লভ্যাংশ বণ্টনের মধ্যে সমান হারে বণ্টনের শর্ত করা হয় অথবা খরিদা বস্তুতে মালিকানা সমান সমান থাকা অবস্থায় যদি লভ্যাংশ বণ্টনের মধ্যে কম-বেশী করার শর্ত আরোপ করা হয় তাহলে এ শর্ত জায়েয হবে না। বরং মালিকানায় আরোপিত শর্ত অনুসারে লভ্যাংশ বণ্টন করা হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দুই ব্যক্তি তাদের নিজেদের মাল এবং সুন্নাহের ভিত্তিতে শিরকাতে ইনানের চুক্তি করল। তারপর তাদের একজনে কিছু সামান খরিদ করার পর যে অংশীদারে সামান খরিদ করেনি সে বলল, এগুলো আমাদের শরীকানা মাল। কিন্তু ক্রেতা

বলল, এগুলো আমার নিজের জন্য আমার পয়সায় খরিদ করা মাল। আর ক্রেতা অংশীদারি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর মালামাল নিজের জন্য খরিদ করার দাবী করে এবং এ সামান যদি তাদের নিজস্ব মালের সম-জাতীয় বস্তু হয় তাহলে তা শিরকাতের ভিত্তিতে উভয়ের মাল হিসাবে গণ্য হবে। ক্রেতা যদি শিরকাত চুক্তির পূর্বে নিজের জন্য ঐ সামান খরিদ করার দাবী করে এবং অপরজন বলে যে, শিরকাত চুক্তির পর তুমি এ সামান খরিদ করেছো তবে চুক্তি সম্পাদন করার তারিখ ও সামান খরিদ করার তারিখ জানা থাকলে এবং খরিদ করার তারিখ অগ্রে হলে এ সামান ক্রেতার জন্য হবে। তবে এ পর্যায়ে তাকে আল্লাহর নামে কসম করে বলতে হবে যে, এ সামান আমাদের শরীকী সামান নয়। আর যদি চুক্তির তারিখ অগ্রে হয় তবে এ সামান ক্রেতার হবে। যদি সামান করার তারিখ জানা যায় যে, তা এই বিবাদের একমাস পূর্বে খরিদ করা হয়েছে এবং চুক্তির তারিখ জানা না যায় তবে এ সামান ক্রেতার হবে। পক্ষান্তরে যদি অংশীদারি চুক্তির তারিখ জানা যায় যে, এই চুক্তি চলমান বিবাদের একমাস পূর্বে সম্পাদিত হয়েছে এবং সামান খরিদের তারিখ আদৌ জানা না যায় তাহলে এ সামান শরীকী সামান হিসাবে গণ্য হবে। যদি শিরকাত চুক্তি ও সামান খরিদ করা সম্পাদিত কোন তারিখই জানা না যায় তাহলে কসম সাপেক্ষে এ সামান ক্রেতার মাল হিসাবে ধর্তব্য হবে। সে আল্লাহর নামে এভাবে কসম করবে যে, এ সামান আমাদের শরীকী সামান নয়। কারণ উভয়টির তারিখ যেহেতু অজ্ঞাত তাই ধরে নেওয়া হবে যে, চুক্তি এবং ক্রয় উভয় কাজ একত্রেই সংঘটিত হয়েছে। আর উভয় কাজ একত্রে সংঘটিত হওয়া অবস্থায় খরিদা সামান শরীকী সামান হিসাবে গণ্য হয় না (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : এক শরীকদার বলল, আমি কিছু সামান খরিদ করেছি। তোমাকে এর অর্ধেক মূল্য দিতে হবে। আর দ্বিতীয় অংশীদার তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তবে সামান বিদ্যমান থাকলে বাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনিভাবে যদি শরীক ব্যক্তি তার সামান খরিদ করার কথা স্বীকার করে, কিন্তু মালামাল হস্তগত করার কথা অস্বীকার করে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান হবে। কিন্তু শরীক ব্যক্তির থেকে তার অবগতির উপর কসম নেওয়া হবে। বাদী যদি মালামাল খরিদ করা ও তা হস্তগত করার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তবে তা কবুল করা হবে। আর যদি মালামাল ধ্বংস হয়ে যায় তবে শপথ সাপেক্ষে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। মুনতাকা গ্রন্থে আছে, দুই ব্যক্তি শিরকাতে মুফাওয়াযা করার ইচ্ছা করল। অথচ তাদের একজনের কিছুই নেই। আর অপর জনের আছে বাড়ি কিংবা খাদিম অথবা কিছু মালামাল। তারপর তারা এভাবে মুফাওয়াযা চুক্তি করল যে, তারা উভয়ে নিজ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি ও সুনামের ভিত্তিতে ব্যবসা চালিয়ে যাবে। কিন্তু শরীকদ্বয়ের কোন একজনের যে মালামাল আছে তা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হল না, তাহলে শিরকাত চুক্তি জায়েয হবে এবং এটি মুফাওয়াযা হিসাবে গণ্য হবে। আর দুইপক্ষের কোন এক পক্ষের যে সামানের কথা বলা হয়েছে তা তার মালিকের জন্যই খাস থাকবে। উল্লেখ্য যে, এ শিরকাত শিরকাতে উজুহ হিসাবে গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি একজনের নিকটে কাঁচা স্বর্ণের টুকরা থাকে যাতে মুদ্রার ছাপ দেওয়া হয়নি আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে (আল-মুহীত)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : শিরকাতে আমালের ব্যাখ্যা, পরিচিতি ও হুকুম

১. মাসআলা : শিরকাতে আমাল পেশাভিত্তিক অংশীদারি কারবার যেমন দুজন দরজী, দুজন রঙরেয (রঞ্জক) বা একজন দরজী ও অপরজন রঙরেয বা মুচী কোনরূপ আর্থিক লেনদেন ব্যতিরেকে এই শর্তে অংশীদারি চুক্তি করে যে, তারা উভয়ে মিলে কাজ নিবে এবং এতে যা অর্জিত হবে তা উভয়ের মাঝে সমান হারে বন্টন করা হবে। এ জাতীয় চুক্তি জায়েয এবং একেই শিরকাতে আমাল (বা পেশাভিত্তিক অংশীদারি কারবার) বলা হয় (মুযমারাত)। পেশাভিত্তিক অংশীদারি কারবারের হুকুম হলো কাজ নেওয়ার ব্যাপারে অংশীদারদের প্রত্যেকেই একজন অপরজনের উকীল (প্রতিনিধি) আর কাজ নেওয়ার ব্যাপারে ওয়াকালত জায়েয। চাই উকীল এ কাজ সুষ্ঠুভাবে আনজাম দিতে সক্ষম হোক বা না হোক (যহীরিয়া)।

২. মাসআলা : শিরকাতে আমাল দুই প্রকার হতে পারে (১) মুফাওয়াযা (২) ইনান। যদি শিরকাত চুক্তি সম্পাদনকালে মুফাওয়াযা বা মুফাওয়াযার অর্থবোধক কোন শব্দ উল্লেখ করা হয় তবে তা মুফাওয়াযা হবে। যেমন দুজন পেশাদার শিল্পী এ মর্মে শিরকাত চুক্তি করল যে, তারা উভয়ে কাজ নিবে, সমান ভাবে কাজের দায়-দায়িত্ব বহন করবে, লাভ-লোকসানও তারা সমানভাবে ভোগ করবে এবং শিরকাতের কারণে তারা পরস্পর একে অপরের কফীল হবে। তাহলে এই শিরকাত শিরকাতে মুফাওয়াযা বলে গণ্য হবে। আর তারা যদি কাজ ও পারিশ্রমিকের মধ্যে কম-বেশী হওয়ার শর্ত আরোপ করে, যেমন বলল, আমাদের একজনের দায়িত্বে থাকবে তিন ভাগের দু'ভাগ কাজ এবং অপরজনের দায়িত্বে থাকবে একভাগ কাজ। আর এই হিসাবেই লাভ-লোকসান আমাদের মধ্যে আবর্তিত হবে। তাহলে এটি শিরকাতে ইনান বলে গণ্য হবে। স্মর্তব্য যে, চুক্তিতে ইনান শব্দ উল্লেখ করলেও তা শিরকাতে ইনান হবে। এমনিভাবে যদি শিরকাতের বিষয়টিকে مطلق রাখা হয় তাহলেও তা শিরকাতে ইনান হিসাবে গণ্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩. মাসআলা : শরীকদ্বয় মুফাওয়াযা চুক্তির কথা বলেনি বরং مطلق চুক্তি করেছে তাহলে এ জাতীয় শিরকাত কোন কোন বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ইনান বলে গণ্য হবে। সুতরাং শরীকদের কেউ যদি সাবান, উশনান ইত্যাদি নষ্ট করার মূল্যবাবদ কোন ঋণের কথা স্বীকার করে অথবা কোন বোঝা বহনের কাজ কিংবা অন্য কোন মজদুরী অথবা কোন পারিশ্রমিক কিংবা কোন বাড়ি ভাড়ার কথা স্বীকার করে যার মুদত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাহলে শরীক ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে পারলে গ্রহণযোগ্য হবে। আর সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে না পারলে উপরোক্ত বিষয়াদি স্বীকারোক্তিকারীর জন্য খাস হবে। আর কোন কোন বিধানের ক্ষেত্রে এ চুক্তি শিরকাতে মুফাওয়াযা বলে গণ্য হবে। অতএব যদি কেউ তাদের একজনকে বা উভয়কে কোন কাজ দেয় তাহলে উভয়ের যাকে ইচ্ছা তাকে কাজের তাগাদা দেয়ার অধিকার কার্যাদেশদাতার থাকবে। এমনিভাবে শরীকদ্বয়ের, যে কেউ তার নিকট পারিশ্রমিক চাইতে পারবে। তাদের কোন একজনের কাছে পারিশ্রমিক আদায় করে দেওয়ার পর সে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। কাজের

ক্ষতিপূরণ শরীকদ্বয়ের যার উপরই ওয়াজিব হোক আদেশদাতা ব্যক্তি 'এ' ব্যাপারে অপর জনের নিকটও তাগাদা করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, এ সব বিধানের ক্ষেত্রে ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে শিরকাতে মুফাওয়াযা ধর্তব্য হয়েছে। যদিও যাহিরী রিওয়ায়েত মুতাবিক এই সূরত ব্যতীত অন্য কোন সূরতে মুফাওয়াযা ধর্তব্য হয়নি। ইমাম কুদুরী (র) তৎপ্রণীত শরাহ গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেনি (যহীরিয়া)।

৪. মাসআলা : যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজনের হাতে মাল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্ষতিপূরণ উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে। কাজের ওয়ার্ডারদাতা তাদের দুইজনের যে কারো নিকট এর ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে (মুহীত : মুনতাকার সূত্রে) শিরকাত চুক্তি ইনান হিসাবে সংঘটিত হয়ে থাকলে যার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে তার নিকটই এর দাবী করা যাবে। অন্য ব্যক্তির নিকট নয়। এ হুকুম কাযিয়্যায়ে ওয়াকালতের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে; কাফালতের ভিত্তিতে নয় (যহীরিয়া)। যদি দুই জনের একজনে কাজ করে, অপর জনে না করে তাহলে অর্জিত অর্থ উভয়ের মাঝে সমান হারে ভাগ করা হবে। চাই তা শিরকাতে ইনান হোক বা মুফাওয়াযা হোক। যদি কাজ গ্রহণের সময় তারা উভয়ে লভাংশে কম বেশী করার শর্ত করে তাহলে তা জায়েয হবে। যদিও একজনের কাজ অপর জনের তুলনায় বেশী হয়; তাহলে ও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে; যদি শরীকদ্বয়ের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা সফরে চলে যায় কিংবা বেকার সময় অতিবাহিত করে এবং অন্য জনে কাজ করে তাহলেও পারিশ্রমিক তাদের উভয়ের মাঝে বন্টন করা হবে এবং তাদের উভয়েই ওয়ার্ডার দাতার নিকট থেকে পারিশ্রমিকের টাকা গ্রহণ করতে পারবে। ওয়ার্ডারদাতা তাদের যায় নিকটই পারিশ্রমিকের টাকা পরিশোধ করুক সে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। যদিও তারা শিরকাতে মুফাওয়াযার চুক্তি না করে থাকে। এটি 'ইস্তিহসানের' কথা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এমনিভাবে শরীকদ্বয়ের কোন একজনে সফরের অবস্থায় যদি কোন কাজ করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা তাদের একজনে কোন কাজ নিলে তা সম্পাদন করা উভয়ের উপর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই দুই শরীকের এক জনে যদি একক ভাবে কোন কাজ করে তাহলে তাকে অপর জনের সাহায্যকারী বলে গণ্য করা হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)।

৫. মাসআলা : পিতা ও পুত্র যদি একই পেশায় নিয়োজিত থেকে অর্থ উপার্জন করে এবং তাদের কোন মাল না থাকে আর যদি পুত্রপিতার সাথে একক পরিবারে বসবাস করে। তাহলে পুত্রের উপার্জন পিতা পাবে। কেননা 'এ' অবস্থায় পুত্র পিতার সাহায্যকারী হিসাবে গণ্য হবে। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, পুত্র যদি কোন গাছ লাগায় তাহলে পিতা ঐ গাছের মালিক হয়। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কোন মাল না থাকে তারপর শ্রম বিনিয়োগের পর বহু প্রাচুর্য তাদের হস্তগত হয় তাহলে স্বামীই এর মালিক হবে এবং স্ত্রী তার সহযোগী বলে গণ্য হবে। কিন্তু স্ত্রীর যদি ভিন্ন কামাই থাকে তবে এ কামাই ও তার হবে (কিনুয়া)। স্ত্রী যদি স্বামীর তুলা দ্বারা সুতাকাটে এবং সে সুতা স্বামী কাপড় বুনে তাহলে স্বামীই এ কাপড়ের মালিক হবে। এতে ইমামগণ সকলেই একমত (আল-ফাতাওয়াল হাম্মাদিয়া)। যদি চুক্তির সময় এরূপ শর্ত করা হয় যে, কাজ আমরা আধা-আধি করে

করব, কিন্তু উপার্জন বন্টন হবে এক দুই হারে তবে তা ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে জায়েয হবে (আয়নী : শরহুল কানয, তাবয়ীন, হিদায়া, কাফী)। এটিই সহীহ অভিমত (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)। যে ব্যক্তি কাজে দুর্বল যদি তার জন্য অধিক লভাংশের শর্ত করা হয় তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে এরূপ শর্ত আরোপ করা জায়েয আছে (আন-নাহরুল ফায়িক, যহীরিয়া)।

৬. মাসআলা : দুই ব্যক্তি শিরকাত চুক্তি করল এবং শর্ত করল যে, তারা তাদের কামাই তিনভাগে ভাগ করে নিবে। কিন্তু তাদের কার কাজ কি হবে; তা বর্ণনা করল না তাহলেও 'এ' চুক্তি জায়েয হবে। আর লভাংশ বন্টনের ক্ষেত্রে কম বেশী করার কথাটি কাজের মধ্যেও কম বেশী হওয়ার উপর স্পষ্ট প্রমাণ বলে গণ্য হবে (মুযমারাত)। অবশ্য লোকসানের বিষয়টি তাদের দায়িত্ব অনুপাতেই তাদের উপর বর্তাবে (বাদায়ে)। যদি তারা এরূপ শর্ত করে যে, তারা যে কাজ নিবে এর দুইভাগ থাকবে অমুকের উপর আর একভাগ থাকবে দ্বিতীয় জনের উপর, কিন্তু ব্যবসায় লোকসান হলে তা তাদের উভয়ের উপর আধি-আধি করে বর্তাবে। এভাবে চুক্তি করা হলে শিরকাতে আমল তাদের শর্ত মুতাবিক হবে আর লোকসানের বিষয়ে যে শর্ত করা হয়েছে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। বরং তাদের কর্ম অনুপাতে তাদের উপর লোকসানের দায়-দায়িত্ব বর্তাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)।

৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি দরজিকে কোন কাপড় দিল; যেন সে নিজেই এ কাপড়টি সেলাই করে দেয়। এখন যদি দরজির আরো কোন মুফাওয়াযা চুক্তির শরীকদার থাকে তাহলে তাদের মাঝে মুফাওয়াযা চুক্তি বাকী থাকা পর্যন্ত কাপড়ের মালিক দরজি ও শরীকদার উভয়ের কাছে কাজের তাগাদা করতে পারবে। যদি তারা আলাদা হয়ে যায় অথবা যে কাপড় গ্রহণকারী যদি মারা যায় তাহলে এ কাজের ব্যাপারে অপর ব্যক্তিকে ধরা যাবে না (মাবসূত)। পক্ষান্তরে যদি উক্ত ব্যক্তির নিজ হাতে সেলাই করার শর্ত না করা হয়, আর এ অবস্থায় তারা আলাদা হয়ে যায় তাহলে প্রদত্ত কাপড় সেলাই করে দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও ধরা যাবে (যহীরিয়া)।

৮. মাসআলা : নাওয়াদির গ্রন্থে আছে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এক ব্যক্তি দুই শরীকের কোন একজনের নিকট কাপড়ের ব্যাপারে দাবী করল যা তাদের উভয়ের কাছে রাখা হয়েছে। তারপর একজনে এই দাবীকে মেনে নিল এবং অপর জনে তা অস্বীকার করল, তাহলে একজনের স্বীকারোক্তি অপর জনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কাজেই সে কাপড় দিয়ে উজরত নিয়ে নিবে। এটি ইস্তিহসানের কথা (মুহীত : আস-সারাখসী)। দরজির নিকট দেওয়ার পর কাপড় যদি ফেটে যায় এবং এক শরীকদার স্বীকার করে যে, কুন্দী করার কারণে কাপড়টি ফেটে গেছে এবং অপর শরীকদার তা অস্বীকার করে বলে যে, এ কাপড়টি তার নয় বরং আমাদের তাহলে স্বীকারকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি অস্বীকারকারী বলে যে, এ কাপড়টি (তার নয়) অমুকের, তাহলে কাপড়ের ব্যাপারে তার এ স্বীকারোক্তি প্রথম দাবীকারী ব্যক্তির পক্ষে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। কিন্তু অন্যজনের ব্যাপারে তার এ স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু তার নিজের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে তার এ স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। আর এ ব্যাপারে সে তার সাথীর নিকট হতে কোন কিছু করে নিতে পারবে না, যদি এক শরীকদার তাদের কর্মের দ্বারা কারো কাপড় নষ্ট হওয়ার কথা স্বীকার করে

এবং অপর জনে অস্বীকার করে তাহলে যে, স্বীকারোক্তিকারীর উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। এমনি ভাবে দুজনের কেউ নষ্টকৃত সাবান ও উশলানের মূল্য বাবদ ঋণ বা মজুরের পারিশ্রমিক' অথবা বাড়ি ভাড়া বাবদ ঋণের কথা স্বীকার করে যায় মুদত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাহলে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া তার কথা তার অপর শরীকের উপর প্রযোজ্য হবে না। সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারলে এ সবার ক্ষতিপূরণ শুধুমাত্র স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তির উপর অপরিহার্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ইজারার মুদত অতিক্রান্ত না হয় এবং বিক্রিতপণ্য ও ধ্বংস না হয় তাহলে উক্ত স্বীকারোক্তি উভয় শরীকের উপর প্রযোজ্য হবে। কিন্তু শরীক ব্যক্তি যদি এ মর্মে দাবী করে যে, খরিদ সূত্র ছাড়াই তারা এ মালের মালিক তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : দুই পাইকারী হাজীদের কিতাব বহন করার ব্যাপারে এ মর্মে অংশীদারি চুক্তি করল যে, এতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রিযিক হিসাবে কিছু দান করলে তা তারা আধাআধি করে বণ্টন করে নিবে। এভাবে অংশীদারি চুক্তি করা জায়েয আছে (কিনুয়া)। দুই জন শিক্ষক যদি বাচ্চাদের হিফাযত করার জন্য; তাদেরকে লেখা শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য অংশীদারি চুক্তি করে তবে সদরুস শহীদ (র) বলেন, পসন্দনীয় মতানুসারে এ ভাবে চুক্তি করা জায়েয আছে (খুলাসা)। এভাবে যদি ফিকাহ শিক্ষা দেওয়ার জন্য অংশীদারি চুক্তি করাও জায়েয আছে (আন্ নাহরুল ফায়িক)। যদি দুই ব্যক্তি হারাম কাজের ব্যাপারে অংশীদারি চুক্তি করে তবে তা সহীহ হবে না (খাযানাতুল ফাতওয়া)। দালালীর কাজে অংশীদারি চুক্তি করা জায়েয নেই। এমনি ভাবে মাহফিলে এবং শোকসভায় সমবেতভাবে কিছু পাঠ করার জন্য অংশীদারি চুক্তি করাও জায়েয নয় (কিনুয়া)।

১০. মাসআলা : ইবন সিমআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিন কয়াল এ মর্মে অংশীদারি চুক্তি করল যে, তারা মানুষের শস্য মেপে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, এতে তারা যে পারিশ্রমিক পাবে তা নিজেরা সমানভাবে বণ্টন করে নিবে। তারপর তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিছু মাল মেপে দেওয়ার জন্য গ্রহণ করল। ইত্যবসরে তাদের একজন অসুস্থ হয়ে গেল এবং অপর দুই জনে কাজ করল। তাহলে পারিশ্রমিক তাদের মাঝে তিন ভাগ করে বণ্টন করা হবে। পক্ষান্তরে সে অসুস্থ হওয়ার পর যদি অপর দুইজনে তার কাজ করে নেওয়াকে অপসন্দ করত তার উপস্থিতিতেই অংশীদারি চুক্তি বাতিল করে দেয় অথবা বলে যে, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা অংশীদারি চুক্তি নাকচ করে দিলাম। তারপর তারা তৎসমুদয় মালামাল মেপে দিল, তাহলে তারা পারিশ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। কিন্তু বাকী এক-তৃতীয়াংশ তারা পাবে না। বরং এ অংশ মেপে দেওয়া তাদের পক্ষ হতে নফল বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, ঐ অসুস্থ তৃতীয় ব্যক্তিও পারিশ্রমিকের মধ্যে তাদের অংশীদার হবে না। এমনিভাবে শরীকানা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ব্যতিরেকে তিন ব্যক্তি কারো থেকে একটি কাজ নিল। তারপর সে কাজ তাদের একজনে একক ভাবে আনজাম দিল, তাহলে সে পূর্ণ পারিশ্রমিক পাবে না। বরং পারিশ্রমিকের এক-তৃতীয়াংশ পাবে। আর বাকী দুই-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে সে নফলকারী বলে গণ্য হবে। এটি তার ইহসান হবে। এহেন অবস্থায় কাজের আদেশ দাতার জন্য জায়েয হবে না এই এক ব্যক্তির নিকট সমুদয় কাজের তাগাদা করা (যহীরিয়া)। শিরকাত চুক্তিতে আবদ্ধ নয়,

এমন তিন ব্যক্তি যদি কোন কাজ গ্রহণ করে, তারপর তাদের একজনে সে কাজ আনজাম দেয় তাহলে সে পূর্ণ পারিশ্রমিকের এক-তৃতীয়াংশ পাবে এবং আবশিষ্ট দুই জনে কিছুই পাবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১০. মাসআলা : কোন দরজি ও তার শিষ্য সেলাই কাজের ব্যাপারে এ মর্মে অংশীদারি চুক্তি করল যে, উসতাদ কাটিং এর কাজ করবে এবং শিষ্য সেলাইয়ের কাজ করবে এবং পারিশ্রমিক তারা আধা-আধি করে নিবে অথবা দুই ভাগে এ মর্মে অংশীদারি চুক্তি করল যে, তাদের একজনে সূতা কেটে দিবে এবং অপর জনে কাপড় বয়ন করবে। এ জাতীয় অংশীদারি চুক্তি বৈধ হওয়া বাঞ্ছনীয় যেমন এক দরজি ও একবংশের মিলে পরস্পর অংশীদারি চুক্তি করলে তা বৈধ হয়ে থাকে (কিনুয়া)। যদি কোন পেশাদার কারিগর ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে নিজ দোকানে বসায় এবং অর্ধ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাকে কাজ দেয় তাহলে তা ইস্তিহসানের ভিত্তিতে জায়েয হবে (খুলাসা)। এ মূলনীতির ভিত্তিতে মাশাইখে কিরাম বলেছেন যে, যদি শিষ্য কোন কাজ গ্রহণ করে তবে তাও জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে যদি দোকানদার নিজেও কাজ করে তবে তাও জায়েয হবে। কিন্তু যদি দোকানদার অপর ব্যক্তিকে বলে যে, আমিই কাজ গ্রহণ করব, তুমি গ্রহণ করবে না। এরপর আমি তোমাকে অধা-পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ দিব তবে তা জায়েয হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ফাসিদ শিরকাতের বিবরণ

১. মাসআলা : যে যে ক্ষেত্রে অংশীদারি চুক্তি সহীহ হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায় না সে সে ক্ষেত্রে শিরকাত তথা অংশীদারি কারবার সহীহ হবে না (বাদায়ে)। জ্বালানী কার্য সংগ্রহ করা; শিকার করা এবং নদী বা সমুদ্র থেকে পানি সংগ্রহ করার ব্যাপারে অংশীদারিত্বের চুক্তি সহীহ নয় (কাফী)। এমনিভাবে শুকনা ঘাস সংগ্রহ করা ও ভিক্ষা করার জন্য অংশীদারি চুক্তি করা সহীহ নয়। বরং এমন চুক্তির পর যে যা সংগ্রহ করবে সেটা তার একার হবে। অপর ব্যক্তি এর থেকে কিছুই পাবে না। এমনিভাবে শরীআতের দৃষ্টিতে যত মুবাহ বস্তু আছে এসবের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। কাজেই শুকনা ঘাস এবং পাহাড় থেকে আখরোট, আনজীর, পেসতা ইত্যাদি ফল-ফলাদি সংগ্রহ করার ব্যাপারে শিরকাত চুক্তি করা জায়েয নেই। সরকারি খাস জমি হতে মাটি তুলে তা বিক্রি করার ব্যাপারে শরীকানা ব্যবসার চুক্তি করা ঠিক নয়। এমনিভাবে চুনা, লবণ, বরফ, সুরমা এবং জাহিলী যুগের মাটিতে প্রোথিত সম্পদ হাসিলের জন্য অংশীদারি কারবারের চুক্তি করা জায়েয নেই। এমনিভাবে যদি দুই অংশীদারি চুক্তি করে এই শর্তের উপর যে, তারা মালিকানাহীন মাটি দ্বারা গৃহ নির্মাণ করবে অথবা কাদা মাটি দ্বারা পাকা ইট তৈরি করবে তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা : মাটি, চুনা, কাঠ ইত্যাদি যদি কারো মালিকানাধীন বস্তু হয় এবং এসবের ব্যাপারে দুই ব্যক্তি এ মর্মে চুক্তি করে যে, তারা এগুলো খরিদ করে তা পাকা করবে এবং পরে তা বিক্রি করবে তাহলে এ চুক্তি জায়েয হবে এবং এটি শিরকাতে উজুহ হিসাবে গণ্য হবে (খুলাসা)। মুবাহ (মালিকানাহীন) বস্তু যে লাভ করবে সেই এর বৈধ মালিক হিসাবে গণ্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি দুই শরীকদার একত্রে মিলে এ জাতীয় কোন বস্তু লাভ করে তবে তারা তা সমান ভাগ হবে। আর যদি এক ব্যক্তি চেষ্টা করে তা হাসিল করে এবং অপর জন কোন চেষ্টাই না করে তাহলে চেষ্টাকারীই এর মালিক হিসাবে বিবেচিত হবে (কাফী)। আর যদি একজন অপর জনকে কোন বস্তুর প্রাপ্তির ব্যাপারে সাহায্য সহায়তা করে তাহলে এ ব্যক্তি তার ন্যায্য পারিশ্রমিকের হকদার হবে। কিন্তু এ পারিশ্রমিক অর্জিত বস্তুর অর্ধেক মূল্য হতে অতিক্রম করতে পারবে না। এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে *اجر مثل* (ন্যায্য পারিশ্রমিক) নয় বরং *بالغامبلغ* (যত সম্ভব হতে পারে পরিমাণ পারিশ্রমিকের হকদার হবে (মুহীত : সারাখসী)। যদি শিকার করার ক্ষেত্রে জাল ইত্যাদির

১. উল্লেখ্য যে, এসব সম্পদ ও মাসআলা যদি সরকারি খাস ভূমিতে থাকে তবে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

দ্বারা একে অপরকে সহযোগিতা করে এবং এতে তথা কোন মূল্যমান পণ্ড প্রাপ্ত না হয় তাহলে এ জাতীয় কাজে সাধারণত যা মজুরী হয় সে পরিমাণ মজুরী সহযোগিতাকারী ব্যক্তি পাবে। এতে কারো দ্বিমত নেই (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

৩. মাসআলা : যদি অংশীদারগণ তাদের অর্জিত মালামাল মিশ্রিত করে ফেলে তাহলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এমাল তাদের মাঝে ভাগ হবে। আর যদি কোন কথার উপর তারা একমত না হয়ে থাকে তাহলে নিজ সাথীর দাবীর উপর তাদের প্রত্যেকের কথা কসম সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। তবে তাদের মতামত প্রাপ্ত পণ্ডের সর্বমোট মূল্যের অর্ধেক পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে (মুযমারাত)। যদি তারা তাদের অর্জিত বস্তু মিলিয়ে বিক্রি করে দেয় এবং ঐ বস্তু যদি পরিমাণ যোগ্য বা ওজন যোগ্য বস্তু হয় তাহলে প্রত্যেকে যে পরিমাণ (وزن) বা ওজন (وزن)-এর মালিক হয়েছে, সে অনুপাতে বিক্রিত মূল্য তাদের মাঝে বন্টন করা হবে। আর যদি ঐ বস্তু পরিমাণ ও ওজনযোগ্য বস্তু না হয়ে ভিন্ন জাতীয় বস্তু হয় তাহলে প্রত্যেকের অংশের মূল্য যে পরিমাণ হবে সে হিসাবে এ বস্তু তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে (আল-জাওহারা তুন নায়ারা)। যদি প্রাপ্ত বস্তুর পরিমাণ, ওজন বা মূল্য কিছুই জানা না যায় তবে অর্ধেক মূল্য কার্য ও অপর সাথীর ব্যাপারে তাদের প্রত্যেকের দাবী কসমসহ গ্রহণযোগ্য হবে (বাদায়ে)। দাবী যদি এর বেশী হয় তবে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া ঐ দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না (আন-নাহারুল ফায়িক)।

৪. মাসআলা : দুই ব্যক্তি শিকার করার ব্যাপারে অংশীদারি চুক্তি করেছে। তাদের একটি কুকুর আছে। সে কুকুরটি তারা শিকারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিয়েছে অথবা শিকারের উদ্দেশ্যে তারা জাল পেতেছে, এভাবে চেষ্টা করার পর তারা যদি কোন শিকার প্রাপ্ত হয় তবে তা তাদের উভয়ের মাঝে সমান হারে ভাগ করে দেওয়া হবে (আল-মুহীত)। কুকুরটি যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজনের হয় এবং তা তার কবজায়ই থাকে, এমতাবস্থায় তারা যদি শিকারের উদ্দেশ্যে এটিকে যৌথভাবে ছাড়ে তবে কুকুরের মালিকই প্রাপ্ত শিকারের হকদার হবে। কিন্তু কুকুরের মালিক যদি এর *منفعة* (ফায়দা ও উপকারিতা) অন্যের জন্য সাব্যস্ত করে দেয় যেমন কেউ তার কুকুরটি অপর কাউকে হাওলাদ দিল; তারপর ঐ কুকুর কোন পণ্ড শিকার করল তাহলে হাওলাদ গ্রহীতা ব্যক্তিই প্রাপ্ত শিকারের হকদার হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি দুই ব্যক্তির প্রত্যেকেরই একটি করে কুকুর থাকে এবং তারা এতদুভয়ের মাধ্যমে কোন পণ্ড শিকার করে তাহলে তারা তা আধাআধি করে ভাগ করে নিবে। যদি কুকুর দুটির প্রত্যেকটিই একটি করে শিকার করে তাহলে যার কুকুর যেটি শিকার করেছে সেই সেটির হকদার হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। একজনের কুকুর শিকার প্রাপ্ত হয়ে যদি একে জখম করে দেয়; তারপর অপরজনের কুকুর এসে একে সহায়তা করে তাহলে প্রথম প্রেরিত কুকুরের মালিকই প্রাপ্ত শিকারের হকদার হবে। আর প্রথম কুকুরটি যদি শিকার পণ্ডকে পাকড়াও করে একে জখম না করে; ইত্যবসরে অপর জনের কুকুরটি এসে যায় এবং উভয় কুকুর মিলে প্রাপ্ত শিকার জন্তুকে জখম করে দেয় তবে মালিকদ্বয় অর্ধেক হারে এই শিকার পণ্ডের হকদার হবে (মাবসূত)।

৫. মাসআলা : এক ব্যক্তির একটি খচ্চর আছে, আর অপর ব্যক্তির আছে পানির মশক। এখন তারা এ মর্মে চুক্তি করল যে, মশকে পানি ভরে তা খচ্চরের পিঠে বহন করে যা অর্জিত হবে তা আমরা উভয়ে ভাগাভাগি করে নিব, এভাবে অংশীদারি চুক্তি করা হলে তা সহীহ হবে না। বরং উপার্জন এককভাবে পানি বহনকারীর হবে মশকওয়ালা পাবে শুধু মশকের ভাগ এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি খচ্চরের মালিকই পানি আনয়ন করে। আর যদি মশকের মালিক পানি আনয়ন করে তবে অর্জিত কামাই সে পাবে। কিন্তু তার উপর হবে খচ্চর ব্যবহারের বিনিময় তার মালিককে দিয়ে দেওয়া (হিদায়)। এক ব্যক্তির একটি খচ্চর আছে; আর অপর ব্যক্তির আছে একটি উট। এই জাতীয় দুই ব্যক্তি যদি এই শর্তে অংশীদারি চুক্তি করে যে, তারা এগুলোকে ইজারা দিবে এবং এতে যা উপার্জন হবে তা তারা উভয়ে ভাগ করে নিবে। এভাবে অংশীদারি চুক্তি করা সহীহ নয়। এতদসত্ত্বেও তারা যদি এগুলোকে ইজারা দেয় তাহলে খচ্চর এবং উটের যে পরিমাণ পারিশ্রমিক হতে পারে সে অনুপাতে তা তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি শুধু মাত্র খচ্চরটি ইজারা দেওয়া হয় তবে ইজারার টাকা খচ্চরটি মালিকই পাবে, উটের মালিক পাবে না। আর যদি অপর ব্যক্তি মালামাল উঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইজারাদাতার সহায়তা করে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে সে তার ন্যায্য মজুরী পাবে। তবে যে টাকায় পশুটি ইজারা দেওয়া হয়েছে মজুরী এর অর্ধেক পরিমাণকে অতিক্রম করতে পারবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, তাকে যত বেশী সম্ভব পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ)।

৬. মাসআলা : দুই জনের পশুতো আছেই বটে যদি এর সাথে তারা নিজেদের কর্মের ব্যাপারেও শর্ত আরোপ করে যেমন পশু হাঁকিয়ে নেওয়া বা এর উপর মালামাল উঠিয়ে দেওয়া ইত্যাদি তাহলে সওয়ারী দু'টির ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং ব্যক্তিদ্বয়ের ন্যায্য পারিশ্রমিক অনুপাতে তাদের মধ্যে সেই অর্জিত কামাই বন্টন করা হবে (আল-মুহীত)। শরীকদ্বয়ের উভয়ে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু মাল নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময় কোথাও পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, কিন্তু খচ্চর ও উট ইজারা না দেয় তারপর তারা যদি ঐ খচ্চর ও উটের উপর বহন করে মাল পৌঁছিয়ে দেয় যে গুলোর দিকে শিরকাত চুক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে তাহলে পারিশ্রমিক তাদের উভয়ের মধ্যে সমান হারে বন্টন করা হবে। কেননা এখানে পারিশ্রমিক ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল, বোঝা পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা। আর এতে তারা উভয়ই সমান সমান। কাজেই পারিশ্রমিক তাদের মাঝে সমান হারে বন্টন হরা হবে। এ কারণেই যদি দুই ব্যক্তি কারো বোঝা পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং নিজেদের কাঁধে করে তা উক্ত স্থানে পৌঁছিয়ে দেয় তাহলে এ অবস্থায়ও তারা আধা-আধি করে পারিশ্রমিক পাবে। এ অবস্থায় ক্ষতিপূরণ হিসাবে اجر مثل ওয়াজিব হয় না। সুতরাং আলোচ্য মাসআলায়ও তা ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা : এক ব্যক্তির একটি সওয়ারী আছে এবং অপর জনের আছে বস্তা বোঝাই করার একটি গদি (পালান), এরা যদি এ মর্মে শরীকী চুক্তি করে যে, তারা

সওয়ারীটি ইজারা দিবে এবং এতে যে পারিশ্রমিক অর্জিত হবে তা উভয়ের মাঝে বন্টন করা হবে। এই শিরকাত ফাসিদ হবে (মাবসূত)। দুই ব্যক্তি খাদ্য জাতীয় বস্তু নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য কোন সওয়ারী ইজারা দিল তারপর কোন ভারবাহী আসবাবের দ্বারা ঐ মাল তারা নিজেরা বহন করে যথাস্থানে পৌঁছে দিল তাহলে সওয়ারী মালিকই এ পারিশ্রমিকের হকদার হবে। সওয়ারী এবং পালান তথা বস্তা বোঝাই করার গদি এর اجر مثل অর্থাৎ ন্যায্য পারিশ্রমিক হিসাবে উক্ত পারিশ্রমিক বন্টন করা হবে না। যদি খাদ্য জাতীয় মালামাল বহন করার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি এ মর্মে অংশীদারি চুক্তি করে যে, এই ব্যক্তি এই মাল ভার দ্বারা পৌঁছাবে আর সে পৌঁছাবে সওয়ারীর দ্বারা। তাহলে অর্জিত পারিশ্রমিক উক্ত দুই ব্যক্তির মাঝে আধা-আধি করে বন্টন করা হবে। কিন্তু সওয়ারী এবং ভারের জন্য কোন পারিশ্রমিক থাকবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : ইজারা দেওয়ার জন্য কেউ তার নিজস্ব সওয়ারী অপর কোন ব্যক্তিকে প্রদান করল এই শর্তে যে, অর্জিত পারিশ্রমিক তারা উভয়ে পাবে; তাহলে এই শিরকাত ফাসিদ 'শিরকাত' বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় যদি উক্ত ব্যক্তি সওয়ারীটি ইজারা প্রদান করে তবে সওয়ারীর মালিকই পূর্ণ পারিশ্রমিক পাবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি পাবে তার ন্যায্য মজুরী। সওয়ারীর উপর করে কাপড় এবং খাদ্য জাতীয় বস্তু এনে তা বিক্রি করার জন্য যদি এক ব্যক্তি তার নিজস্ব সওয়ারী অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করে এই শর্তে যে, লভ্যাংশ তারা উভয়ে পাবে, তাহলে شركة بالعروض (আসবাব সামগ্রীর ভিত্তিতে শিরকাত চুক্তি করা)-এর ন্যায্য এটিও ফাসিদ বলে গণ্য হবে। শিরকাত ফাসিদ হয়ে যাওয়ার পর খাদ্য ও কাপড়ের মালিক লভ্যাংশের হকদার হবে এবং সওয়ারী মালিক পাবে তার ন্যায্য মজুরী। এ পর্যায়ে নৌযান এবং বাড়ি ঘর সওয়ারীর মতই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এমনিভাবে মৎস শিকার করার জন্য কাউকে জাল প্রদান করা হয় এই শর্তে যে, প্রাপ্ত মাছ তারা উভয়ে ভাগাভাগি করে নিবে তাহলে মাছ পাবে শিকারী ব্যক্তি এবং জালওয়ালা ব্যক্তি পাবে তার জালের ন্যায্য পারিশ্রমিক (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা : ধোপার আছে কাপড় ধোলাই করার যাবতীয় আসবাব পত্র। আর অপর জনের আছে শুধু মাত্র একটি (দোকান) ঘর। এমতাবস্থায় তারা এ মর্মে অংশীদারি চুক্তি করল যে, তারা এই আসবাব দ্বারা এই ঘরে ধোলাই এর কাজ করে যা অর্জিত হবে তা তারা আধাআধি করে ভাগ করে নিবে। এভাবে চুক্তি করা জায়েয (আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ)। অন্য সকল পেশার ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি এক ব্যক্তি ধোপাদের আসবাব সরবরাহ করে এবং অপর ব্যক্তি কায়িক পরিশ্রম দেয় তাহলে এ শিরকাত ফাসিদ হবে এবং উপার্জন শ্রমদাতা পাবে এবং তাকে আসবাব সামগ্রীর ভাড়া পরিশোধ করতে হবে (খুলাসা)। ইয়াতীমা গছে আছে, ফকীহ আলী ইব্ন আহমদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে; যদি তিন বা পাঁচ জন কুলি এভাবে অংশীদারি চুক্তি করে যে, তাদের কেউ বস্তা ভরবে, কেউ বস্তার মুখ ধরবে আবার কেউ গম বহন করে তা ওর মালিকের বাড়িতে পৌঁছিয়ে

দিবে, এই শর্তে যে, এতে যে পরিমাণ বিনিময় পাওয়া যাবে তা তারা সমহারে ভাগ করে নিবে। এরূপ শর্ত করে অংশীদারি চুক্তি করলে তা সহীহ হবে কী? জবাবে তিনি বলেছেন, না সহীহ হবে না (তাতার খানিয়া)।

১০. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান (র) বলেন, যদি এক ব্যক্তি দেয় রেশমের পোকা এবং তৃত পাতা আর অপর ব্যক্তি দেয় কায়িক শ্রম এই শর্তে যে, এতে যে কাপড় তৈরি হবে তা তারা অর্ধেক করে অথবা কম-বেশী করে ভাগ করে নিবে তাহলে এই চুক্তি জায়েয হবে না। এমনভাবে উভয়ের পক্ষ হতে যদি শ্রম দেওয়ার শর্ত করা হয় তবে তাও জায়েয হবে না। কিন্তু যদি রেশম পোকার ডিম উভয়ে প্রদান করে এবং শ্রমও উভয়ের পক্ষ হতে দেওয়া হয় তবে তা জায়েয হবে। এহেন অবস্থায় যদি তৃত পাতা প্রদানকারী ব্যক্তি কোন কাজ না করে তবে এতে কোন ক্ষতি নেই (কিন্য়া)। ফাতাওয়া এহু আছে; এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে রেশম পোকার ডিম প্রদান করল যেন, সে এগুলোকে দেখাশুনা করে এবং তৃত পাতা এগুলোকে খাওয়ায় এই শর্তে যে, এতে যা অর্জিত হবে তা তারা উভয়ে ভাগভাগি করে নিবে। তারপর উক্ত ব্যক্তি সেগুলো দেখাশোনা করল। অবশেষে এর থেকে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করল, তাহলে যে ব্যক্তি ডিম দিয়েছে সে পাবে রেশম পোকা আর যে ব্যক্তি এর তত্ত্বাবধান করেছে সে পাবে তৃত পাতার মূল্য এবং তার ন্যায্য মজুরী (আল-মুহীত)। যদি এক ব্যক্তি ডিম ও তৃত পাতা প্রদান করে আর অপর ব্যক্তি এতে শ্রম দেয় তবে ডিমদাতা পাবে রেশমের পোকা এবং শ্রমদাতা পাবে তার ন্যায্য মজুরী (সিরাজিয়া)। যদি উভয় ব্যক্তির পক্ষ হতে শ্রম দেওয়া হয় তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। অর্থাৎ শিরকাত জায়েয হবে না। অবশ্য যদি ডিম এবং শ্রম উভয়ের পক্ষ হতে প্রদান করা হয় তবে এ শিরকাত জায়েয হবে। এহেন অবস্থায় পাতা দাতা যদিও কোন কাজ না করে তাহলে ও কোন ক্ষতি নেই। শায়খ খাজান্দী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (কিন্য়া)।

১১. মাসআলা : উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে ফকীহগণ বলেছেন, যদি গাভীর মালিক তার গাভীটি ঘাস পানি খাইয়ে প্রতিপালন করার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করে এই শর্তে যে, এর থেকে যা পয়দা হবে তা তারা আধা-আধি করে বন্টন করে নিবে। এভাবে অংশীদারি চুক্তি করা জায়েয নেই। সুতরাং বাছুর হলে গাভীর মালিকই তা পাবে এবং উক্ত ব্যক্তি পাবে ঘাস পানির ন্যায্য বিনিময় এবং তার শ্রমের ন্যায্য মজুরী। উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে ফকীহগণ এও বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি দানাপানি খাইয়ে প্রতিপালন করার জন্য তার মুরগীটি অন্য কোন ব্যক্তিকে এই শর্তে প্রদান করে যে এর থেকে যে ডিম হবে তা তারা অর্ধেক হারে ভাগ করে নিবে। তবে এ চুক্তিও জায়েয হবে না। উক্ত শরীকী চুক্তিতে জায়েয করার কৌশল হল গাভী মুরগী এবং রেশম পোকার ডিমের মালিক এগুলোর অর্ধেক নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিবে। এতে এসব বস্তু তাদের দু'জনের মাঝে শরীকী বস্তু রূপে পরিগণিত হবে। তারপর এ গুলোর থেকে যা কিছু পয়দা হবে তা তারা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভাগভাগি করে নিতে পারবে (যহীরিয়া)।

১২. মাসআলা : শিরকাত ফাসিদ হয়ে গেলে অংশীদারদের প্রত্যেকেই নিজেদের মূলধন অনুপাতে মুনাফার অধিকারী হবে। যেমন একজন একহাজার টাকা এবং অপরজন দুই হাজার টাকা দিয়ে অংশীদারি কারবার করলে মুনাফা তাদের মধ্যে তিনভাগে ভাগ হবে। যদিও তারা অর্ধেক করে মুনাফা বন্টনের শর্ত করে থাকে তবে এই শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি উভয় অংশীদারের মূলধন সম-পরিমাণের হয় এবং তারা মুনাফা তিনভাগে ভাগ করে নেওয়ার শর্ত করে থাকে তাহলে শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তারা আধা-আধি হারেই মুনাফার অধিকারী হবে। কেননা মুনাফা মূলধনের তাবে (تابع) হয়ে থাকে। অর্থাৎ মূলধন যে পরিমাণ হবে মুনাফাও সে অনুপাতে ভাগভাগি হবে (ফাতহুল কাদীর)।

১৩. মাসআলা : কোন কোন ফাসিদ শর্তের কারণে অংশীদারিত্ব কারবার ফাসিদ হয়ে যায়। আবার কোন কোন ফাসিদ শর্তের কাকারণে তা ফাসিদ হয়না। সুতরাং যদি অংশীদারদ্বয় পেশার মধ্যে কম বেশী হওয়ার শর্ত করে তবে শিরকাত চুক্তি বাতিল হবে না। কিন্তু যদি মুনাফা বন্টনের ক্ষেত্রে শরীকদ্বয়ের কোন একজনের জন্য অতিরিক্ত দশ দিরহামের শর্ত করা হয় তাহলে শরীকী কারবার বাতিল হয়ে যাবে। যদিও শর্ত দুটির উভয়টিই ফাসিদ শর্ত (যখীরা)। দুই অংশীদারের কোন একজন মারা গেলে অংশীদারি কারবার বাতিল হয়ে যাবে। মৃত্যুর বিষয়টি অপর অংশীদার জানুক বা না জানুক তাতে হুকুম ভিন্ন হবে না। মৃত্যু শব্দটি এই ক্ষেত্রে ঐ অবস্থাকেও শামিল করে যা হুকুমের দিক থেকে মৃত্যুর অনুরূপ। যেমন কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেছে এবং বিচারকের পক্ষ হতে তার চলে যাওয়ার ব্যাপারে আদেশও জারী করা হয়ে গেছে, তাহলে এ হুকুম মৃত্যুর অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে। আর যদি এখনো পর্যন্ত তার দারুল হরব চলে যাওয়ার ঘোষণা জারী না হয়ে থাকে তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় (ইজমা) অনুসারে তার শরীকানা কারবার ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিষয়টি মওকুফ থাকবে। যদি ঘোষণা জারীর আগে সে ফিরে আসে তাহলে তার শিরকাত বাকী থাকবে। পক্ষান্তরে সে যদি মারা যায় বা নিহত হয় তাহলে তার শরীকী চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে (আন-নাহরুল ফায়িক)। মুরতাদ হওয়ার পর সে যদি দারুল হরবে না গিয়ে থাকে তবে তার শিরকাতে মুফাওয়াযা মওকুফ থাকবে। সুতরাং বিচারক শিরকাত বাতিল হওয়ার হুকুম জারী করার পূর্বেই সে যদি পুণরায় মুসলমান হয়ে যায় তবে মুফাওয়াযা চুক্তি বহাল হবে। যদি এ (মওকুফ অবস্থায়) সে মারা যায় তাহলে মুরতাদ হওয়ার সময় থেকে তার মুফাওয়াযা চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। শিরকাতে মুফাওয়াযা মওকুফ হয়ে গেলে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা শিরকাতে ইনাম হিসাবে বাকী থাকবে না। সাহেবাইনের মতে তা শিরকাতে ইনাম হিসাবে বাকী থাকবে। ফকীহ ওয়াল ওয়ালিজী (র) বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন (ফাতহুল কাদীর)।

১৪. মাসআলা : এক শরীকদার যদি চুক্তি বাতিল করে দেয় কিন্তু অপর শরীকদার সে সম্পর্কে অবহিত না থাকে তাহলে শরীকী কারবার ভঙ্গ (বাতিল) হবে না। অবশ্য যদি এ সম্বন্ধে অপর অংশীদার জ্ঞাত থাকে এবং তাদের মূলধন দিরহাম বা দীনার হয় তাহলে শরীকী চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি চুক্তি ভঙ্গের সময় তাদের মূলধন আসবাব সামগ্রী জাতীয় বস্তু

হয়ে থাকে তাহলে ইমাম তাহাবী (র)-এর মতে চুক্তি ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, এ অবস্থায় তাদের শরীকী কারবার ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও তাদের মূলধন আসবার সামগ্রী জাতীয় বস্তু হয়। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (ফাতহুল কাদীর)।

১৫. মাসআলা : দুই অংশীদারের কোন একজন যদি অংশীদারি কারবারের বিষয়টি অস্বীকার করে এবং তাদের মালামাল যদি আসবাব পত্র জাতীয় বস্তু হয় তাহলে এতে শিরকাত বাতিল হয়ে যাবে (যহীরিয়া)। অংশীদারের সংখ্যা তিনজন। এমতাবস্থায় তাদের একজন মারা গেলে তার শরীকী কারবার বাতিল হয়ে গেলেও বাকীদের অংশীদারি ব্যবসা বাতিল হবে না (আল-মুহীত)। যদি দুই শরীকের কোন একজন অপর জনকে বলে, আমি তোমার সাথে অংশীদারি কারবার করব না, তাহলে তাদের অংশীদারি কারবার ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা “আমি তোমার সাথে অংশীদারি কারবার করব না” কথাটি “আমি তোমার সাথে অংশীদারি চুক্তিকে বাতিল করে দিলাম” কথার অনুরূপই (যখীরা)। শিরকাতে মুফাওয়াযায় তিন অংশীদারের একজন উধাও হয়ে যাওয়ায় যদি বাকী দুইজনে মুফাওয়াযা চুক্তি ভেঙ্গে ফেলতে চায় তবে ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তির উপস্থিতি ব্যতিরেকে তারা তা করতে পারবে না। মোদাকথা হচ্ছে, শরীকদের কেউ অপরের অনুপস্থিতিতে মুফাওয়াযা চুক্তি বাতিল করতে পারবে না (যহীরিয়া)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিবিধ মাসআলা

১. মাসআলা : দুই শরীকের একজন অপর জনের অনুমতি ছাড়া তার মালের যাকাত দিতে পারে না (আল-ইখতিয়ার)। আর যদি উভয়ের প্রত্যেকে অপর শরীকদারকে অনুমতি দান করে যে, আমার তরফ থেকে মালের যাকাত দিয়ে দিবে, তারপর উভয়ে একই সময় নিজ নিজ শরীকদারের যাকাত আদায় করে দেয়, তবে উভয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকে নিজ শরীকদারের অংশেব যামিন হবে। চাই সে অপর শরীকদারের আদায়ের কথা জানুক বা না জানুক। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত (আল-কাফী)। আর যদি উভয়ে আগে-পরে আদায় করে, তবে পরে আদায়কারী যামিন হবে, চাই সে তার শরীকদারের আদায় করার কথা জানুক বা না জানুক। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত (আন-নাহরুল ফায়িক)। কেউ যদি তার যাকাত কিংবা কাফ্ফারা আদায় করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে সেখানেও এরূপ মতভেদ রয়েছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তার যাকাত বা কাফ্ফারা আদায় করার জন্য কোন একজনকে উকীল নিযুক্ত করলো। তারপর মুয়াক্কিল ও উকীল একই সময় কিংবা মুয়াক্কিল আগে এবং উকীল পরে আদায় করলো। তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উকীল যামিন হবে। চাই সে মুয়াক্কিলের আদায়ের কথা জানুক বা না জানুক। এটা ইমাম সাহেবের মত (আত-তাবয়ীন)। কিন্তু যে ব্যক্তিকে ইহদার এর হক আদায় করার জন্য উকীল নিযুক্ত করা হল, আর ইহসার বা বাধা দূর হওয়ার পর এবং মুয়াক্কিলের হজ্জে নেয়ার পর উকীল দম আদায় করলো তাহলে সর্ব সম্মত মতেই সে যামিন হবে না। চাই সে এ ঘটনা জানুক বা না জানুক (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। দুই (শরীকদার) ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তির কাছে বস্ত্ত ও আইনত একই কারণে ঋণ পাওনা রয়েছে। এই ঋণ তাদের উভয়ের মাঝে শরীকানা সম্পদ হবে। সুতরাং তাদের একজনে যদি ঋণের অংশ বিশেষ উসূল করে, তবে অপরজন উসূলকৃত অংশে শরীক হতে পারবে (আল-মুহীত)। আর যখন কোন দুই ব্যক্তি যৌথভাবে কোন ব্যক্তির কাছে ঋণ পাওনা হবে, যেমন উভয়ে তাদের শরীকানা গোলাম তার কাছে বিক্রি করার মূল্য বাবদ উভয়ে শরীকানা এক হাজার দিরহাম তাকে ঋণ প্রদান বাবদ, অথবা ঐ ব্যক্তি কতক তাদের উভয়ের শরীকানা কাপড় নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ বাবদ কিংবা তার কাছে কোন ব্যক্তির ঋণ পাওনা ছিলো, এখন উভয়ে সেই ঋণের মীরাস হওয়া বাবদ, তারপর তাদের একজন ঐ ঋণ থেকে তার প্রাপ্য অংশ কিংবা প্রাপ্যের অংশ বিশেষ উসূল করে, তবে অপর জন ইচ্ছা করলে হুবহু উসূলকৃত মালের অর্ধেক গ্রহণ করতে পারে। চাই উসূলকৃত মাল ঋণের অনুরূপ হোক কিংবা তার চেয়ে ভাল হোক বা মন্দ হোক (আস-সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। আর যদি উসূলকারী তার শরীকদারকে উসূলকৃত মাল ছাড়া অন্য মাল দিতে চায়, তবে তা জায়েয হবে না। অবশ্য তার শরীকদার যদি তা নিতে রাযী হয় তবে জায়েয হবে। অনুরূপভাবে উক্ত শরীকদার যদি

উসুলকারীর নিকট থেকে উসুলকৃত অনুরূপ অন্য মাল নিতে চায়, তবে তাও জায়েয হবে না। তবে উসুলকারী রাযী হলে ভিন্ন কথা (আয-যাখীরাহ)। আর উসুল করেনি এমন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে উসুলকারীকে কিছু না বলে নিজের অংশের জন্য দেনাদারকে তাগাদা করতে পারে।

তবে তাগাদা করার পর পুনরায় উসুলকারীর নিকট আর উসুলকৃত মালের অর্ধেক দাবী করতে পারবে না। যে পর্যন্ত করযদারের নিকট যা অবশিষ্ট ছিল তা অবশিষ্ট থাকবে—খোয়া না যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। আর যদি করযদারের করয খোয়া যায় অর্থাৎ করযদার দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার দরুন করয পরিশোধে অক্ষম হয়, তবে সে তার শরীকদারের উসুলকৃত মালের অর্ধাংশ নিতে পারবে। কিন্তু যে মাল উসুল করা হয়েছিল হবহু সেই মালের অর্ধেক নেয়ার ইখতিয়ার তার থাকবে না। বরং উসুলকারীর এ ইখতিয়ার থাকবেন যে, তার অংশ পরিমাণ অন্য মাল থেকেও দিতে পারবে (আল-মুহীত)। আর যদি শরীকদার যা কিছু উসুল করেছে, তা তার কাছ থেকে বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে সেজন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে সে তার অংশ পুরাপুরি পেয়েছে বলে মনে করতে হবে। আর করযদারের কাছে যা পাওনা রয়েছে, তা তার শরীকদারের জন্য হবে (আল-কিন্যা)। অনুরূপভাবে যদি কেউ নিজের পাওনা উসুল করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে এবং উকীল উসুল করে, আর তা মুয়াক্কিলের হাতে নষ্ট হয়, তবে মুয়াক্কিলের অংশ যাবে। আর যদি তা বিদ্যমান থাকে, তবে অপর শরীকদারের তাতে শরীক হওয়ার ইখতিয়ার থাকবে (আয-যাখীরাহ)। আর যদি উসুলকারী উসুলকৃত মাল হাত ছাড়া করে ফেলে, যেমন কাউকে দান করলো, কিংবা ঋণ পরিশোধ করলো, কিংবা অন্য কোন ভাবে তা খরচ করল, তবে তার শরীকদার ইচ্ছা করলে অর্ধাংশের ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে কিন্তু ঐ মাল এখন যার হাতে বিদ্যমান রয়েছে, তার থেকে ফেরত নিতে পারবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। আর (দ্বিতীয়) শরীকদার উসুলকারী শরীকদারের কাছ থেকে যে পরিমাণ উসুল করেছে তা ঐ উসুলকারীর অনুকূলে দেনাদারের যিম্মায় পাওনা থাকবে। আর যা কিছু দেনাদারের যিম্মায় বাকী রয়েছে, তা উভয় শরীকদারের মধ্যে ঐ পরিমাণের হিসাবে যৌথভাবে পাওনা হবে। সুতরাং যদি দেনাদারের যিম্মায় উভয় শরীকদারের সমভাবে এক হাজার দিরহাম পাওনা থাকে এবং একজনে তা থেকে পাঁচশ' দিরহাম উসুল করে, তারপর অপর শরীকদার ঐ উসুলকারীর নিকট থেকে তার অর্ধাংশ দুইশ' পঞ্চাশ দিরহাম নিয়ে নেয়, তবে দেনাদারের যিম্মায় উসুলকারীর অনুকূলে উসুলকৃত মালের অর্ধেক অর্থাৎ দুইশ' পঞ্চাশ দিরহাম পাওনা থাকবে। আর অবশিষ্ট করযের মধ্যে অংশীদারিত্ব পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে (আল-বাদায়ে)।

২. মাসআলা : যদি বস্ত্রত ও আইনত ভিন্ন দুটি কারণে কিংবা বস্ত্রত ভিন্ন নয়, তবে আইনত ভিন্ন দুটি কারণে কোন দুই ব্যক্তির অনুকূলে (কারো যিম্মায়) কোন ঋণ পাওনা হয় তবে সেই পাওনা উভয়ের মাঝে শরীকানা বলে গণ্য হবে না। দুই জনের এক জন যদি দেনাদারের কাছ থেকে কিছু আদায় করে, তবে অপর ব্যক্তি অংশীদার হতে পারবে না (আল-মুহীত)। দুই ব্যক্তি যদি তাদের যৌথ মালিকানার একটি গোলাম নির্দিষ্ট মূল্যে কারো কাছে মিলিতভাবে বিক্রি করে দেয়, তারপর একজনে ক্রেতার কাছ থেকে কিছু অর্থ আদায় করে,

তবে অপর ব্যক্তি আদায়কৃত অর্থের শরীক হতে পারবে। আর যদি উভয়ে নিজ নিজ অংশের মূল্য আলাদাভাবে নির্ধারণ করে, তারপর একজনে কিছু মূল্য উসুল করে, তবে প্রকাশিত বর্ণনা মতে অপর ব্যক্তি তাতে শরীক হতে পারবে না (আয-যহীরিয়া)। দুই ব্যক্তি নিজ নিজ দাস-দাসী (একজনের কাছে একই সঙ্গে) এক হাজার দিরহামে বিক্রি করলো। তবে যা কিছু আদায় করবে, তাতে উভয়ে শরীক হবে (আস-সিরাজিয়া)। তবে দাস ও দাসীর মূল্য আলাদাভাবে নির্ধারণ করলে প্রকাশিত বর্ণনা মতে একজনের উসুলকৃত অংশ অপরজন শরীক হতে পারবে না (খাযানাতুল মুফতীন)। একটি দাসী খরিদ করে দেয়ার জন্য এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তিকে একই সঙ্গে উকীল নিযুক্ত করলো। তারপর তারা উভয়ে তার জন্য একটি দাসী ক্রয় করলো এবং তার মূল্য তারা তাদের যৌথ সম্পদ থেকে কিংবা ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে পরিশোধ করলো। তবে যা কিছু নির্দেশদাতা থেকে আদায় করবে, তাতে অপর ব্যক্তি শরীক হবে না (আল-মুহীত)। কেউ যদি কারো কাছে হাজার দিরহামের পাওনাদার হয়, আর দেনাদারের পক্ষে দুই ব্যক্তি যামিন হয় এবং উভয়ে দেনাদারের দেনা পরিশোধ করে দেয়। তারপর যামিনদ্বয়ের একজন দেনাদার থেকে কিছু উসুল করে তবে অপর যামিনদারের তাতে শরীক হওয়ার অধিকার থাকবে। যদি উভয় যামিনদার তাদের যৌথ সম্পদ থেকে দেনা পরিশোধ করে থাকে (খাযানাতুল মুফতীন ও আয-যহীরিয়া)। আর যদি দুই যামিনদারের একজনে নিজের প্রাপ্য অংশের বিনিময়ে (দেনাদারের কাছ থেকে) একটি কাপড় খরিদ করে, তবে শরীকদার (অর্থাৎ দ্বিতীয় যামিনদার) তার থেকে কাপড়ের অর্ধেক মূল্য উসুল করতে পারবে। কিন্তু কাপড়ের শরীকদার হতে পারবে না। অবশ্য উভয়ে শরীকানার বিষয়ে সম্মত হলে হতে পারে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। আর যদি সে তার অংশের বিনিময়ে কোন কাপড় খরিদ না করে, বরং কাপড়ের বিনিময়ে নিজের অংশ ত্যাগ করার বিষয়ে সমঝোতা করে এবং তা হস্তগত করে, আর অপর শরীক তা থেকে তার অংশ তলব করে, তবে উসুলকারীর ইচ্ছা, সে তাকে অর্ধেক কাপড় দিয়ে দিতে পারে আবার ঋণের প্রাপ্য অর্ধেকের সদৃশ প্রদান করতে পারে (আল-বাদায়ে)। আর যদি সে দেনাদার থেকে উসুলকৃত মালে অপরজনকে শরীক না করতে চায় তবে তার কৌশল এই যে, দেনাদার তাকে তার ঋণের প্রাপ্য পরিমাণ মাল হেবা করে দিবে, তারপর সে দেনাদারকে তার প্রাপ্য ঋণ মাফ করে দিবে। ফলে দান রূপে উসুলকৃত মালে অপর জনের শরীকানা থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আরেকটি কৌশল এই যে, এক ব্যক্তির কাছে দুই ব্যক্তির হাজার দিরহাম যৌথ ঋণ রয়েছে। আর এক ঋণদাতা উসুলকৃত মালে অপরজনকে শরীক করতে চায় না, এ ক্ষেত্রে ফকীহ নাসীর (র) বলেন যে, দেনাদার তাকে পাঁচশ দিরহাম হেবা করবে এবং সে তা কবজা করবে। তারপর সে দেনাদারকে তার অংশের ঋণ থেকে মুক্ত করে দিবে। আর ফকীহ আবু বকর (র) বলেন, ঋণী ব্যক্তির কাছে সে এক মুঠি কিশমিশ তার অংশের ঋণ পরিমাণ মূল্যে বিক্রি করে দিবে এবং কিশমিশ তার হাতে ন্যস্ত করে দিবে। তারপর তার অংশের ঋণ থেকে তাকে মুক্ত করে দিবে এবং উক্ত ঋণী ব্যক্তি থেকে তার কিশমিশের মূল্য তলব করবে—ঋণ তলব করবে না (আল-মুহীত)। আর যদি উভয়ের মধ্য থেকে একজনে ঋণী ব্যক্তিকে তার ঋণের অংশ হেবা করে দেয় কিংবা তা থেকে মুক্ত করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে এবং তার শরীকদারের জন্য সে কিছু যামিন হবে না। আর যদি উভয়ের মধ্য থেকে একজনে ঋণী ব্যক্তিকে একশ' দিরহাম থেকে মুক্ত করে দেয়, অথচ তার উপর উভয়ের এক

হাজার দিরহামের সমান সমান ঋণ রয়েছে। তারপর ঋণের মধ্য থেকে কিছু অংশ উসূল হয়। তবে তা উভয়ে নিজ নিজ ঋণ পরিমাণ বন্টন করে নিবে। অর্থাৎ উসূলকৃত পরিমাণকে নয় ভাগ করে নীরব ব্যক্তি পাঁচ ভাগ আর মুজ্জকারী চার ভাগ নিবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। আর আত-তাজরীদে লেখা আছে যে, অনুরূপ ভাবে যদি কিছু ঋণ উসূল করার পর এবং পরস্পরে তা বন্টন করে নেয়ার পূর্বে একজনে (একশ' দিরহাম থেকে) ঋণী ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেয়, তবু উসূলকৃত মালকে উপরোক্ত রূপে বন্টন করবে। আর যদি অর্ধেক অর্ধেক বন্টন করে নেয়ার পর উভয়ের মধ্য থেকে একজনে ঋণী ব্যক্তিকে কিছু দিরহাম থেকে মুক্ত করে দেয়, তবে পূর্বের বন্টন বহাল থাকবে- তা ভেঙ্গে যাবে না (আত-তাতার খানিয়া)। আর যদি উভয়ের মধ্য থেকে একজনে তার অংশ পরিশোধে ঋণী ব্যক্তিকে বিলম্ব করার সময় দান করে, তবে এক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে জায়েয নেই। আর তৎকর্তৃক তার শরীকদারের অংশ পরিশোধে ঋণী ব্যক্তিকে বিলম্ব করার সময় দান করা জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই (আল-বাদায়ে)। সাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি সে নিজের অংশ পরিশোধে ঋণী ব্যক্তিকে সময় দান করে থাকে, তবে তা জায়েয হবে। আর এর থেকেই এই মাসআলা বের হয় যে, যে শরীকদার সময় দান করেনি, সে যদি উসূল করে, তবে সময় দানকারী ঋণ পরিশোধে তার সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাতে শরীক হয়ে বন্টন করে নিতে পারবে না। তারপর যখন তার অংশের ঋণ পরিশোধের সময় আসবে, তখন সে তার উক্ত শরীকদার থেকে তার অংশ বন্টন করে নিবে- যদি উসূলকৃত মাল তার কাছে হবহ্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। আর সে যদি তা নষ্ট করে ফেলে, তবে তার থেকে সে তার অংশ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নিবে (আয-যহীরিয়া)।

৩. মাসআলা : আর যদি অপর শরীকদার কিছু উসূল না করে এমন কি সময় দানকারীর সময়ও পার হয়ে যায় এবং ঋণ পরিশোধের সময় এসে যায়, তবে সময় দানের পূর্বকার অবস্থাই পুনরায় ফিরে আসবে। সুতরাং উভয়ের মধ্য থেকে কেউ যদি কিছু উসূল করে, তবে অপর জন তাতে শরীক হবে (আল-বাদায়ে)। যদি ঋণী ব্যক্তি ঐ শরীকদারকে- যে তার নিজের অংশে সময় দান করেছে- তার অংশ থেকে একশ' দিরহাম সময়ের আগে প্রদান করে, তবে অপর শরীকদার (উসূলকৃত মালের অর্ধেক) পঞ্চাশ দিরহাম নিয়ে নিতে পারবে। এরপর উসূলকারী ঐ দেনাদার থেকে পঞ্চাশ দিরহাম পুনঃ উসূল করতে পারবে। আর তা হবে সময় না দেয়া শরীকদারের প্রাপ্য অংশ থেকে। যাতে একশ' দিরহাম অগ্রিম হয়ে যায় এদিক থেকে যে, যে শরীকদার সময় দান করেনি, সে যখন সময়দানকারী থেকে তার অর্ধাংশ নিয়ে নিয়েছে, তখন তার অংশ থেকে তার অনুরূপ সংখ্যক দিরহাম সময় দানকারীর জন্য হয়ে গেছে। তুমি কি দেখো না, যদি ঋণী ব্যক্তি সময় দানকারী ব্যক্তিকে তার সমুদয় প্রাপ্য পাঁচশ' দিরহাম অবিলম্বে দ্রুত প্রদান করে, তারপর যে সময় দান করেনি, সে যদি তা থেকে অর্ধেক নিয়ে নেয়, তবে জমা দানকারী ব্যক্তি তার থেকে নিয়ে নেয়া পরিমাণ মাল, অপর শরীকদারের অংশ থেকে কর্তন হিসাবে দেনাদার ব্যক্তি থেকে নিয়ে নিতে পারে। এখানেও ঠিক তদ্রূপই হয়েছে (আয-যখীরাহ)। তারপর যখন তা উসূল করলো, তখন সে ও তার শরীকদার উভয়ে তা দশ ভাগ করে নয় ভাগ তার শরীকদার নিবে এবং একভাগ সে নিবে (আয-যখীরিয়া)।

৪. মাসআলা : এক ব্যক্তির যিম্মায় দুই ব্যক্তির মেয়াদী (নির্ধারিত সময়সীমার) ঋণ রয়েছে। আর দেনাদার এক পাওনাদারের অংশ মেয়াদ শেষের আগেই পরিশোধ করলো এবং উভয় শরীকদার তা অর্ধা-অর্ধি বন্টন করে নিলো। তাহলে অবশিষ্ট ঋণ উভয় শরীকদার নির্ধারিত সময়ে পাবে (আস্-সিরাজিয়া)। আর যদি এক নারীর উপর দুই ব্যক্তির ঋণ থাকে আর তাদের একজনে তার অংশকে মহর সাব্যস্ত করে ঐ নারীকে বিবাহ করে, তবে তার শরীকদার তার নিকট থেকে কিছু নিতে পারবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি উক্ত শরীকদার উক্ত নারীকে শর্তহীনভাবে বিবাহ করে অর্থাৎ এ শর্ত না লাগায় যে, তোমার কাছে প্রাপ্য আমার অংশের পাঁচশ' দিরহামের মহরে তোমাকে বিবাহ করলাম, তবে শরীকদারের অধিকার থাকবে বিবাহকারীর নিকট থেকে তার অর্ধাংশ অর্থাৎ দুইশ' পঞ্চাশ দিরহাম নিয়ে নেয়ার (আল-মুহীত)। আর যদি দুই শরীকদারের মধ্য থেকে একজনে নিজের অংশের পরিবর্তে করযদারের নিকট থেকে কোন জিনিস ইজারা নেয়, তবে অপর অংশীদারের ইখতিয়ার থাকবে এই শরীকদার থেকে তার অংশ পরিমাণ ফেরত নেয়ার। আর এটা হচ্ছে সর্বসম্মত মত (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

৫. মাসআলা : যদি ঋণদানকারী দুই শরীকদারের একজনের উপর ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তির অনুকূলে কোন পাওনা সাব্যস্ত হয়। আর পাওনার কারণেই আলোচ্য ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়ে থাকে, আর উভয়ের পাওনা কাটাকাটি হয়ে যায়, তবে অপর শরীকদারের অধিকার থাকবে না এই শরীকদারের কাছে কোন অংশ দাবী করার। আর যদি এই ব্যক্তির পাওনার কারণে উভয় শরীকদারের ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পরে সংঘটিত হয় এবং তারপর উপরোক্ত রূপে কাটাকাটি হয়ে যায়, তবে অপর শরীকদারের ইখতিয়ার থাকবে তার উক্ত শরীকদার থেকে তার অংশ পরিমাণ নিয়ে নেয়ার (আয-যহীরিয়া)। আর যদি দুই শরীকদারের একজনে স্বীকার করে যে, এই লোকের উপর আমাদের ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেই আমার প্রাপ্য ঋণের অংশ পরিমাণ ঋণ আমার উপর সাব্যস্ত হয়ে আছে। তবে উক্ত ঋণী ব্যক্তি তার অংশ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তার শরীকদারও তার থেকে কিছু নিতে পারবে না। আর অনুরূপভাবে যদি এক শরীকদার ঋণী ব্যক্তির উপর এমন কোন অপরাধ সংঘটন করে, যার জরিমানা পাঁচশ' দিরহাম আর শরীকদারের ঋণের অংশও পাঁচশত দিরহাম হয় এবং তা কিসাসস্বরূপ কাটাকাটি হয়ে যায়, তবু তার শরীকদার তার কাছে কিছু পাবে না (মুহীত : আস্-সারাখসী)।

৬. মাসআলা : ফকীহ বাশার ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি দুই শরীকদার ঋণদাতার মধ্য থেকে একজনে ঋণী ব্যক্তির মাথা ও মুখমণ্ডলে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে যখম করে দেয় এবং তারপর সে তার ঋণের অংশের সাথে সন্ধি করে নেয়, তবে এজন্য তাকে তার শরীকদারকে কিছু দিতে হবে না। কেননা, সে এমন কিছু পায়নি, যাতে তার শরীকদারের শরীক হওয়া সম্ভবপর হতে পারে (আল্-বাদায়ে)।

কুদূরীতে উল্লেখ আছে, যদি এক শরীকদার করযদারের এমন মাল নষ্ট করে, যার মূল্য তার ঋণের অংশের অনুরূপ বলে অদল-বদল হয়ে যায়, তবে অপর শরীকদার এই শরীকদার থেকে

তার অংশ পরিমাণ নিয়ে নিতে পারবে। আর আল মুনতাকা কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি এক শরীকদার করযদাতা করযদারের কোন মাল নষ্ট করে কিংবা তার গোলামকে হত্যা করে, অথবা তার পশুর কুঁজ কেটে দেয়, তারপর যা কিছু তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হয়, তা তার ঋণের পরিমাণের সাথে অদলবদল হয়, তবে তার শরীকদার তার থেকে তার অংশ নিতে পারবে না (আল-মুহীত)। আর যদি উক্ত শরীকদার ঐ মাল এনে জ্বালিয়ে দেয় কিংবা গোলাম ছিনতাই করে, তবে এমতাবস্থায় সর্বসম্মত মতে অপর শরীকদার তার অংশ নিয়ে নিতে পারবে। আর অনুরূপভাবে যদি ফাসিদ ক্রয় রূপে মাল ক্রয় করে এবং তা কবজা করে কারো কাছে বিক্রি করে দেয় কিংবা গোলামকে আযাদ করে দেয় অথবা তার কাছে মারা যায়, কিংবা দুই শরীকদারের একজনে করযদারের নিকট থেকে তার অংশের পরিবর্তে কিছু বন্ধক নেয়ার পর তার কাছে তা নষ্ট হয়ে যায়, তবে এমতাবস্থায় অপর শরীকদার তার থেকে তার অংশ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। আর যদি জামানত হয় ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে ছিনতাইকারীর কাছে, কিংবা ফাসিদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার হাতে অথবা বন্ধকের অবস্থায় বন্ধক গ্রহীতার হাতে অর্থাৎ শরীকদার ঋণদাতার কাছে থাকা অবস্থায় যদি গোলামের একটি চক্ষু কোন আসমানী দুর্যোগের কারণে নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে তার শরীকদারের জন্য কোন কিছুর যামিন হবে না অর্থাৎ তাকে কিছু দিতে হবে না (আয-যাহীরিয়া)।

৭. মাসআলা : ইবন সামাআ তাঁর নাওয়াদির কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি দুই শরীকদার ঋণদাতার মধ্য থেকে একজনে ঋণী ব্যক্তির গোলামকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে এবং তার উপর কিসাস ওয়াজিব হয়, সুতরাং ঋণী ব্যক্তি ঐ হত্যাকারীর সাথে পাঁচশ' দিরহাম অর্থাৎ তার ঋণের অংশ পরিমাণে সন্ধি করে নেয়। তবে জায়েয হবে এবং উক্ত ঋণী ব্যক্তি ঐ হত্যাকারীর ঋণের অংশ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। অতএব, অপর শরীকদার যে হত্যাকারী নয়— হত্যাকারীর সাথে শরীক হয়ে তার থেকে ঐ পাঁচশ' দিরহামের অর্ধেক অর্থাৎ দুইশত পঞ্চাশ দিরহাম নিয়ে নিবে (আল-বাদায়ে)। আল-মুনতাকা কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি উভয় শরীকদারের মধ্য থেকে একজনে ঋণী ব্যক্তির জন্য তার ঋণী ব্যক্তির পক্ষ থেকে একজন যামিন বানিয়ে নেয়, তবে তার ঋণের অংশ ঐ যামানতের মধ্যে কিসাস হয়ে যাবে এবং তার অপর শরীকদারও তার সাথে শরীক হয়ে জামানত নিতে পারবে না। তারপর যদি ঐ যামিনদার যার যামিন হয়েছে তার থেকে যামানতের মাল— যা তার নির্দেশে তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করেছে— উসুল পায়, তবু তার শরীকদার তার কাছে এসে তাতে শরীক হতে পারবে না (আল-মুহীত)। আর যদি ঋণী ব্যক্তি এ শরীকদারকে তার অংশের পরিবর্তে কোন যামিনদার প্রদান করে কিংবা কারো উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে, তবে যা কিছু ঐ শরীকদার যামিনদার থেকে কিংবা দায়িত্ব গ্রহণকারী থেকে উসুল করতে পারবে, তাতে অপর শরীকদার তার সাথে শরীক হতে পারবে (আয-যাহীরিয়া)।

৮. মাসআলা : এক ব্যক্তির উপর দুই ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম ঋণ রয়েছে। তারপর উভয়ের একজনে ঋণী ব্যক্তির সাথে ঐ পূর্ণ হাজার দিরহামের পরিবর্তে একশ' দিরহামে

সন্ধি করলো এবং তা উসুল করে কবজা করলো। তারপর অপর শরীকদার তার এই সমুদয় কার্যকলাপ অনুমোদন করল। তবে তা জায়েয হবে এবং সে ঐ একশ' দিরহামের অর্ধেক পাবে। আর যদি উসুলকারী বলে যে, ঐ দিরহাম নষ্ট বা খরচ হয়ে গেছে, তবে সে আমানতদার বলে গণ্য হবে। তাই তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর ঋণী ব্যক্তিও মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি অপর শরীকদার শুধু সন্ধির অনুমতি দিয়ে দেয় আর এটা না বলে যে, সে যা কিছু করেছে আমি তার সবগুলোর অনুমতি দিয়ে দিলাম, তবে সে ইচ্ছা করলে ঋণী ব্যক্তি থেকে পঞ্চাশ দিরহাম উসুল করে নিতে পারবে। তারপর উক্ত ঋণী ব্যক্তি ঐ উসুলকারীর নিকট থেকে পঞ্চাশ দিরহাম ফেরত নিবে। আর এটা এ কারণে যে, সন্ধির অনুমতি দেয়া কবজা করার অনুমতি নয়। আর যদি কোন ব্যক্তির কবজায় দুই ব্যক্তির গোলাম কিংবা গৃহ থাকে এবং ঐ দুই ব্যক্তির মধ্য থেকে একজনে তার সাথে ঐ মাল থেকে একশ' দিরহামে সন্ধি করে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন যে, যদি তৃতীয় ব্যক্তি— যার কবজায় গোলাম রয়েছে— স্বীকার করে যে, ঐ দুজনই গোলামের মালিক, তবে অপর শরীকদার সন্ধিকারীর সাথে একশ' দিরহামে শরীক হবে না। আর যদি সে তা অস্বীকার করে, তবে শরীক হতে পারে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, উভয় অবস্থাই সমান। উভয় অবস্থায় সন্ধিকারীর সাথে ঐ বদল সন্ধিতে শরীক হতে পারবে না। তবে হাঁ, যদি উক্ত গোলাম হারাক হয়ে যায়, তবে শরীক হতে পারবে (আয-যাহীরিয়া)।

৯. মাসআলা : আল-মুনতাকা কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে, দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তি থেকে একটি দাসী ক্রয় করলো এইভাবে যে, একজনে অর্ধেক দাসী এক হাজার দিরহামে এবং অপর ব্যক্তি দাসীর অবশিষ্ট অর্ধেক এক হাজার দিরহামে ক্রয় করলো। তারপর উভয়ে তার মধ্যে দোষ পেয়ে উভয়ে তাকে ফেরত দিলো। তারপর একজনে তার মূল্য যা সে তার অংশ বাবদ দিয়েছিল উসুল করলো। এতে তার অপর সাথী অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। চাই শুরুতে তারা উভয়ে মূল্য একত্রে মিলিয়ে দিয়ে থাকুক কিংবা পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেকে দিয়ে থাকুক। আর অনুরূপভাবে যদি উক্ত দাসীকে কোন ব্যক্তি তার হক প্রমাণ করে নিয়ে নেয়, তবু এমতাবস্থায়ও একই বিধান। অর্থাৎ একজনে যখন তার নিজের অংশ উসুল করলো, তখন অপরজন তাতে অংশ পাবে না। আর যদি দেখা যায় যে, ঐ দাসীটি আযাদ ছিল, আর শুরুতে তারা উভয়ে একত্রে মিলিয়ে মূল্য প্রদান করে থাকে, তবে এমতাবস্থায় যা কিছু উসুলকারী উসুল করেছে তাতে অপর শরীকদার শরীক হতে পারবে। আল-মুনতাকায় ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি স্বীকার করলো যে, এই দুই ব্যক্তির কাছ থেকে আমি একটি দাসী খরিদ করেছি। তাই তার মূল্য বাবদ তারা আমার কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। এরপর ঐ দু'জনের একজনে বললো, তুমি সত্য বলেছো এবং অপর জন বললো যে, তুমি মিথ্যা বলেছো। বরং তুমি যে, পাঁচশ' দিরহামের কথা স্বীকার করেছো এই পাঁচশ দিরহাম আমি তোমার কাছে পাবো গমের মূল্য বাবদ, যা তুমি আমার কাছ থেকে খরিদ করেছো। তারপর ঋণী ব্যক্তি তার পাঁচশ দিরহাম পরিশোধ করলো। তবে তার অপর সাথী তার উসুলকৃত অর্থের অংশ পাবে না। আর ঋণী ব্যক্তির একথা বলা যে, এ মালের তারা উভয়ে যৌথভাবে মালিক— সত্য বলে গ্রহণ করা যাবে না (আল-মুহীত)।

তৃতীয় এক ব্যক্তির উপর দুই শরীকদারের এক হাজার দিরহাম ঋণ রয়েছে। ঐ উভয় ব্যক্তির মধ্য থেকে একজনে অপর শরীকদারের জন্য ঋণী ব্যক্তির পক্ষ থেকে জামানত করে নিলো। এই জামানত বাতিল হবে। আর যদি সে ঐ যামানতের উপর অপর শরীকদারকে আদায় করে দেয়, তবে রুজু করে তা ফেরত নিয়ে নিবে। আর যদি সে তার শরীকদারের জন্য কিছু জামানত না করে, কিন্তু জামানত ব্যতিরেকেই শরীকদারের অংশ শরীকদারকে আদায় করে দেয়, তবে এই আদায় করা শুদ্ধ হবে। আর যখন প্রত্যেক শরীকদারের পক্ষ থেকে অপর শরীকদারকে আদায় করে দেয়া শুদ্ধ হলো, তখন যা কিছু অপর শরীকদার আদায়কারীর নিকট থেকে উসূল পেল, তাতে উসূলকারী শরীক হতে পারবে না। তারপর যদি ঋণী ব্যক্তির কাছে যে ঋণ ছিল, তা ধ্বংস হয়ে যায়, তবে যা কিছু শরীকদার তার শরীকদারের আদায়ের মাধ্যমে উসূল করেছে তার প্রতি ঐ আদায়কারী শরীকদারের কোন পথ থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণী ব্যক্তি কিংবা আজানবী ব্যক্তি এক শরীকদারের অংশ তাকে আদায় করে দেয়, আর অপর শরীকদার তা বন্টন করে না নেয়, বরং তারই কাছে গচ্ছিত রাখে, তারপর যা কিছু ঋণী ব্যক্তির কাছে ছিল, তা ধ্বংস হয়ে যায়, তবে এই শরীকদার অপর শরীকদার যা উসূল পেয়েছে, তার প্রতি রুজু করে তার উসূলকৃত মাল থেকে তার অংশ বন্টন করে নিবে (আয-যাখীরাহ)।

আলী ইবনুল-জা'দ ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি ঋণী ব্যক্তি মারা যায় এবং ঋণদাতা উভয় শরীকদারের একজনে তার ওয়ারিস হয় আর ঐ মৃত ব্যক্তি এ পরিমাণ মাল না রেখে যায়, যার দ্বারা ঋণ আদায় পূর্ণ হতে পারে, তবে উভয়ে এই পরিত্যক্ত পরিমাণের মধ্যে অংশ মত শরীক হবে (আল-বাদায়ে)। আর যদি এক ব্যক্তির উপর তিন ব্যক্তির মিলিতভাবে ঋণ থাকে, তারপর তাদের মধ্য থেকে দুই ঋণদাতা মারা যায় এবং তৃতীয় ঋণদাতা উপস্থিত হয়, আর সে ঋণী ব্যক্তি থেকে তার ঋণের অংশ দাবী করে, তবে তার অংশ তাকে দেয়ার জন্য ঋণী ব্যক্তিকে বাধ্য করা হবে (আস-সুগরা)।

একটি উটের দুইজন শরীকদার ছিল। একজন অপর জনের অনুমতিক্রমে উটটির উপর বোঝা চাপিয়ে গ্রাম থেকে শহরে আসছিল। পথিমধ্যে উটটি ঘুরে পড়ে গেল। ফলে শরীকদার সেটি যবাহ করে ফেললো। যদি এমন হয় যে উটটির বাঁচার আশা ছিল তাহলে সে যামিন হবে। আর বাঁচার আশা না থেকে থাকলে যামিন হবে না। আর যদি উক্ত শরীকদার ছাড়া অন্য কেউ যবাহ করে থাকে, তবে বাঁচার আশা থাকা না থাকা উভয় অবস্থায় যামিন হবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত (মুহীত : আস-সারাখসী)। আর অনুরূপভাবে যদি গাভী কিংবা বকরী রাখাল গাভী কিংবা বকরী যবাহ করে ফেলে, বাঁচার আশা না থাকা অবস্থায় ইসতিহসান মতে যামিন হবে না। আর বাঁচার আশা থাকা অবস্থায় যামিন হবে। আর যদি রাখাল ব্যতীত অন্য কেউ যবাহ করে, তবে সর্বাবস্থায় যামিন হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

দুই ব্যক্তি একটি গৃহের যৌথ শরীকদার। তাদের একজন নিখোঁজ হয়ে গেল। তবে অপর শরীকদার তার শরীকদারের ভিত্তিতে পূর্ণ গৃহেই বসতি রাখতে পারবে। তদ্রূপ একটি গোলামের দুই শরীকদারের একজন নিখোঁজ হয়ে গেলে অপর জন খাদেমের শরীকদারের অংশ দ্বারাও

খিদমত নিতে পারবে (খাযানাতুল মুফতীন)। আর তার উপর শরীকদারের অংশ বাবত কোন মজুরী ওয়াজিব হবে না। যদি গোলামের পরিবর্তে এমন গৃহ হয়, যা ভাড়া দেয়ার জন্য রাখা হয়েছে, তবু শরীকদারের উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যদি যমীনের দুই জন শরীকদার হয়, তবে ফাতাওয়া অনুযায়ী সে পূর্ণ যমীনে চাষাবাদ করতে পারবে- যদি ঐ যমীনের ক্ষেত্রে চাষাবাদ লাভজনক হয়। তারপর যখন তার শরীকদার এসে যাবে, তখন সেও অতখানি সময় পর্যন্ত তাতে এককভাবে চাষাবাদ করবে। আর যদি তাতে চাষাবাদ করতে লোকসান হয়, কিংবা পতিত রেখে দেওয়াতে লাভ হয়, তবে সে পূর্ণ যমীনে চাষাবাদ করতে পারবে না (আল-বাহরুর রাযিক)।

আর যৌথ মালিকানার জম্মুর উপর শরীকদারের অনুমতি ব্যতীত আরোহণ করবে না। কেননা, আরোহীভেদে সওয়ারীর ক্ষতি বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। তবে হাঁ, আরোহণ করা ব্যতীত অন্য কাজ যেমন, হালচাষ করা, পানি সেচ দেওয়া প্রভৃতি কাজে বিনা অনুমতিতেও ব্যবহার করা যাবে। কেননা, এতে তফাৎ নেই (ইকদুল ফারাইদ)।

যদি একটি দাসীর দুজন শরীকদার হয়, তবে ফকীহগণ বলেন, একদিন একজনের খিদমত করবে এবং দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় জনের। আর যদি একজন অপরজন সম্পর্কে এই দাসীর ব্যাপারে খেয়ানতের আশংকা করে বিশ্বস্ত ব্যক্তির হিফায়তে রাখার দাবী জানায়, তবে তা গ্রহণ করা যাবে না (আন-নাহরুল ফায়িক)।

১০. মাসআলা : যদি আঙ্গুর বাগান ও যমীনের দুই ব্যক্তি শরীকদার হয় এবং তাদের মধ্য থেকে একজন উধাও হয়, কিংবা যমীনের একজন বালিগ ও একটি ইয়াতীম শিশু যৌথভাবে মালিক হয়, তবে বিষয়টি সে কাযীর দরবারে উত্থাপন করবে। যদি সে বিষয়টি কাযীর কাছে উত্থাপন না করে অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশের যমীনেও চাষাবাদ করে, তবে উৎপন্ন ফসল তার জন্য হালাল হবে। আর আঙ্গুর বাগানের উপস্থিত ব্যক্তি পরিচর্যা করবে। আর যখন ফল তৈরি হবে, তখন আঙ্গুর বিক্রি করে তার মূল্য থেকে নিজের অংশ নিয়ে নিবে এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির মূল্যের অংশ রেখে দিবে। কিন্তু যখন অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তখন সে ইচ্ছা করলে এই মূল্য নিতে পারবে কিংবা ইচ্ছা করলে নিজের অংশের মূল্যের জামানত নিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : আল-ফাতাওয়ার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, খাদ্যদ্রব্য বা দিরহামের যৌথ মালিকদ্বয়ের একজন লাপাত্তা হয়ে গেছে। আর উপস্থিত ব্যক্তি প্রয়োজনবশত তার অংশ নিয়ে নিয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমি আশা করি এতে কোন ক্ষতি নেই। ফকীহ আবুল লাইস (র) বলেন, আমরা এটাই গ্রহণ করেছি (আল-ফাতাওয়া আল-গিয়াছিয়া)। পরিমাপগত ও ওজনগত দ্রব্যের মধ্য থেকে এক শরীকদার অপর শরীকদারের অনুপস্থিতিতে নিজের অংশ নিয়ে নিতে পারবে। তাতে তার কোন দোষ হবে না- যদি অবশিষ্ট দ্রব্য অক্ষত থাকে। আর যদি অবশিষ্ট দ্রব্য বিনাশ হয়ে যায়, তবে তার বিনাশতা উভয়ের উপর বর্তাবে (আন-নাহরুল ফায়িক)।

১২. মাসআলা : একটি গৃহ দুজনের মধ্যে অধিগৃহীত এবং প্রত্যেকের অংশ পৃথক পৃথকভাবে বিভক্ত। আর তাদের মধ্য থেকে একজন উপস্থিত ও অপরজন অনুপস্থিত। তবে উভয়ের মধ্য থেকে কেউ অপর শরীকদের অংশে বসবাস করতে পারবে না। কাযীর নির্দেশ ব্যতীত অন্যের কাছে ইজারা দিতে পারবে না। হাঁ, কাযী যদি আশংকা করেন যে, তাতে কেউ বসবাস না করলে সেটি নষ্ট হয়ে যাবে, তবে তিনি সেটি ইজারা দিতে পারবেন। আর তার ভাড়া তার অনুপস্থিত মালিকের জন্য রেখে দিবেন (খাযানাতুল মুফতীন)। একটি গৃহের দুই ভ্রাতা ও তাদের দুই ভগ্নী অংশীদার। ভ্রাতাঘরের জীদ্বয় এবং ভগ্নীঘরের স্বামীদ্বয় বর্তমান রয়েছে। ভ্রাতাঘর ভগ্নীপতিদ্বয়কে ঐ গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করতে পারবেন। কেননা তাদের ভগ্নীপতিদ্বয় তাদের জীদ্বয়ের জন্য মাহরাম আত্মীয় নয়। তাই তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয হতে পারে না। আর যদি একটি গৃহের দু'ব্যক্তি যৌথ মালিক হয় এবং তাতে তারা উভয়ে বাস করে, তবে তাদের কেউ তার অপর সাথীকে ঐ গৃহের ছাদে আরোহণ করতে নিষেধ করতে পারবে না। কেননা, এটা হবে তার এমন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যার মধ্যে তার (অপর সাথীর) অধিকার রয়েছে (আল-কিনুয়া)।

১৩. মাসআলা : একটি বন্ধ গলির দশ ব্যক্তি শরীকদার। যাদের প্রত্যেকের ঐ গলিতে গৃহ রয়েছে। কিন্তু একজনের একটি গৃহ পার্শ্ববর্তী গলিতে রয়েছে। কিন্তু উভয় গলির মাঝে কোন সংযোগ নেই। তবে ঐ ব্যক্তি এ গলিতে আসার জন্য কোন দরজা খুলতে পারবে না। ফকীহ আবুল কাসিম, আবু জা'ফর ও আবুল লাইস (র) এর উপরই ফাতওয়া দিয়েছেন। আর এটাই বিস্তৃত মত (আল-ফাতাওয়া আল-গিয়াছিয়া)।

একটি চাক্কিগৃহের দুই ব্যক্তি শরীকদার। একজনে তার ইমারতে কিছু খরচ করেছে। তবে তা অনুগ্রহ স্বরূপ মুফত হবে না (বরং শরীকদার থেকে অর্ধেক খরচ নিয়ে নিবে)। এর বিপরীত যদি যৌথ মালিকানার গোলামকে এক শরীকদার নফকা বা খোরপোষ দেয় কিংবা যৌথ মালিকানার আগুর বাগানের একই শরীকদার খাজনা পরিশোধ করে, তবে সে অনুগ্রহকারী হবে (আস-সিরাজিয়া)।

১৪. মাসআলা : একটি গৃহের দুই ব্যক্তি শরীকদার। তাদের একজন অনুপস্থিত এবং অপরজন সেটি ভাড়া দিয়ে ভাড়া উসূল করেছে। তবে অনুপস্থিত ব্যক্তি ভাড়ায় অংশীদার হবে (আল-কিনুয়া)। ফকীহ আবুল কাসিম (র) বলেন, কয়েক ব্যক্তি একটি যমীনের যৌথ শরীকদার। তাদের একজন ঐ যমীনের কিছু অংশে নিজের বীজ বপন করলো এবং যৌথ শরীকানার পানি দ্বারাই সেচ দিল। আর সে তার শরীকদারের বিনা অনুমতিতে কয়েক বছর যমীনের ঐ অংশ পতিত রেখে দিল। তিনি বলেন, যদি যমীন ভাগ করার পর তার অংশে এই পরিমাণই পড়ে, আর ইতিপূর্বে তাদের ভাগ করে নেয়ার রেওয়াজ থেকে থাকে এবং ইতিপূর্বে সমস্ত শরীকদার পালাক্রমে এরূপ করে থাকে, তবে তার উপর কোন জামানত হবে না এবং যৌথ সম্পত্তিতে তার শরীকদারদের শরীকী হকও হাসিল হবে না (তাতার খানিয়া)। আর যা বন্ধকদাতার উপর ওয়াজিব হয়েছে, তা যদি বন্ধকদাতার বিনানুমতিতে বন্ধকগ্রহীতা পরিশোধ করে দেয়, তবে সে অনুগ্রহকারী হবে। অর্থাৎ মুফত অনুগ্রহকারী হবে। অনুরূপভাবে বন্ধকগ্রহীতার উপর যা ওয়াজিব হয়েছে, তা যদি

বন্ধকদাতা এইভাবে পরিশোধ করে দেয়, তারও বিধান এরূপ হবে। আর যদি তাদের একজন অপর জনের উপর যা ওয়াজিব হয়েছে, তা তার নির্দেশে কিংবা কাযীর নির্দেশে পরিশোধ করে দেয়, তবে তার থেকে তা নিয়ে নিতে পারবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে, যদি বন্ধকদাতা অনুপস্থিত থাকে এবং বন্ধকগ্রহীতা কাযীর নির্দেশে খরচ করে, তবে বন্ধকদাতা থেকে এই খরচ ফেরত নিয়ে নিবে। আর যদি বন্ধকদাতা উপস্থিত থাকে, তবে ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু ফাতাওয়া এর উপর যে, যদি বন্ধকদাতা উপস্থিত থাকে এবং সে খরচ দিতে অস্বীকার করে, তারপর কাযী বন্ধকগ্রহীতাকে খরচ করার জন্য নির্দেশ দেন, এরপর সে খরচ করে থাকে, তবে বন্ধকদাতা থেকে ফেরত নিতে পারবে। আর শরীকদার মাসআলা এই কিসাস অনুযায়ী হওয়া উচিত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা : জামে সাগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক ব্যক্তির যিম্মায় আর এক ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম ঋণ রয়েছে। আর দেনাদার দুই ব্যক্তিকে তার পক্ষ হতে ঐ পাওনা পরিশোধ করার আদেশ দিল। আর তারা উভয়ে তা পরিশোধ করলো। তারপর তাদের একজনে আদেশকারীর নিকট থেকে পাঁচশ' দিরহাম উসূল করলো। যদি তারা দু'জনে তাদের যৌথ সম্পদ থেকে পরিশোধ করে থাকে, তবে অপর শরীকদার উসূলকৃত অংশের শরীক হবে। আর যদি তারা দু'জনে তাদের যৌথ সম্পদ থেকে পরিশোধ না করে থাকে, বরং প্রত্যেকে তার নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে পরিশোধ করে থাকে এবং পরিশোধ করে থাকে উভয়ে একত্র হয়ে একই সাথে, তবে এমতাবস্থায় একজনে যা উসূল করেছে, তাতে অপরজন শরীক হতে পারবে না (আল-মুহীত)। অনুরূপ যদি উভয়ে একই সফকায় একজনে তার গোলাম এবং অপরজনে তার বাঁদী কারো কাছে বিক্রি করে কিংবা উভয়ে ইজারা দেয়, তবু একজনে যা উসূল করবে তাতে অপরজন শরীক হতে পারবে (আল-কাফী)।

১৬. মাসআলা : জামি কিতাবে আরো বর্ণিত আছে, যদি দুজন সাক্ষী এক ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার গোলাম দু'হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুকাতাব করেছে। এক বছরের মধ্যে সে কিতাবাতের মাল পরিশোধ করবে। আর গোলামের মূল্য এক হাজার দিরহাম। এরপর উভয় সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য থেকে ফিরে যায়। তবে মুনীবের ইখতিয়ার রয়েছে, সে ইচ্ছা করলে উভয় সাক্ষী থেকে গোলামের মূল্য এক হাজার দিরহাম এখনই নিয়ে নিবে। আর ইচ্ছা করলে ঐ মুকাতাব গোলাম থেকে কিতাবাতের বিনিময় গ্রহণ করবে। অর্থাৎ সে এক বছরের মধ্যে দুই হাজার দিরহাম তার থেকে নিয়ে নিবে। যদি সে সাক্ষীদ্বয় থেকে এক হাজার দিরহাম ফিলহাল নিয়ে নেয়, তবে উক্ত সাক্ষীদ্বয় মুনীবের স্থলবর্তী হবে কিতাবাতের বিনিময়ের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ মুনীবের পরিবর্তে সাক্ষীদ্বয়ের জন্য কিতাবাতের বদল দুই হাজার দিরহামের মালিকানা সাব্যস্ত হবে। এরপর সাক্ষীদ্বয় যদি মুকাতাব গোলাম থেকে দুই হাজার দিরহাম উসূল করে, তবে তার মধ্য থেকে এক হাজার দিরহাম তার জন্য হালাল হবে। আর অবশিষ্ট এক হাজার দিরহাম সাদাকা করে দিবে। আর মুকাতাব গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং তার ১/২ অর্থাৎ মীরাস পাবে মুনীব। আর যদি ঐ মুকাতাব গোলাম ঐ

সাক্ষীদ্বয়ের একজনকে এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করে, তবে সে আযাদ হবে না। আর যা কিছু সে উসুল করেছে তাতে অপর সাক্ষীর শরীক হওয়ারও ইখতিয়ার থাকবে না। চাই সাক্ষীদ্বয় মুনীবকে গোলামের যে মূল্য পরিশোধ করেছে, তা তাদের যৌথ সম্পদ থেকে পরিশোধ করুক কিংবা অযৌথ সম্পদ থেকে পরিশোধ করুক।

আর বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও এই একই বিধান কার্যকর। যেমন-দুজন সাক্ষী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার এই গোলামকে অমুকের নিকট এক বছর মেয়াদের শর্তে দু'হাজার দিরহামে বিক্রয় করেছে। আর গোলামের বাজার মূল্য এক হাজার দিরহাম। আর ক্রেতা তাই দাবী করে এবং বিক্রেতা তা অস্বীকার করে। আর সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যের উপর ফায়সালা দেয়া হয়। তারপর সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়। তবে মুনীবের এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে ক্রেতার নিকট থেকে এক বছরের মেয়াদসহ বিক্রয় মূল্য (দু'হাজার) গ্রহণ করবে আর ইচ্ছা করলে সাক্ষীদ্বয় থেকে বাজার মূল্য (এক হাজার দিরহাম) তৎক্ষণাৎ নিয়ে নিবে। যদি মুনীব সাক্ষীদ্বয় থেকে জামানত নেয়া ইখতিয়ার করে, তবে সাক্ষীদ্বয় মূল্যের মালিকানায়-গোলামের মালিকানায় নয়, মুনীবের স্থলবর্তী হবে। অতএব, ঐ দুই হাজার দিরহাম মূল্যের মধ্য থেকে এক হাজার দিরহাম তাদের জন্য হালাল হবে এবং অবশিষ্ট এক হাজার দিরহাম সাদাকা করে দিবে। তারপর যদি তার মধ্য থেকে একজন সাক্ষী ক্রেতার নিকট থেকে কিছু উসুল করে, তবে অপর সাক্ষীর তার সাথে শরীক হওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না (আল-মুহীত)। আর যদি উক্ত মুকাতাব তার কিতাবতের অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয় এবং কিতাবতের অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয় এবং কিতাবত বাতিল হয়ে যায় কিংবা বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়, তবে যা কিছু গোলামের মুনীব সাক্ষীদ্বয় থেকে জামানত স্বরূপ উসুল করেছে তা তাদেরকে ফেরত দিবে। আর যা কিছু সাক্ষীদ্বয় মুকাতাব থেকে উসুল করেছে, তা মুনীব তাদের থেকে ফেরত নিয়ে নিবে কিংবা সাক্ষীদ্বয় যে মূল্য উসুল করেছে, ক্রেতা তাদের থেকে তা ফেরত নিবে (আল-কাফী)।

দুই ব্যক্তির যৌথ মালিকানার দাসী কোন ছিনতাইকারী ছিনতাই করে বিক্রি করে দিল এবং ক্রেতা তাকে উসুল ওয়ালাদ বানালো। অর্থাৎ তার থেকে সন্তান জন্ম নিল। তারপর কাযী একসঙ্গে উভয় মালিকের অনুকূলে দাসী, তার দণ্ডমোহর (অনধিকার সহবাসের ফলে আরোপিত মোহর) ও সন্তানের মূল্য প্রাপ্তির ফায়সালা দিলেন। তাহলে উভয়ের যে কেউ যা কিছু উসুল করবে, তাতে অন্যজন শরীক হতে পারবে। আর যদি উভয়ের অনুকূলে পৃথক পৃথক ফায়সালা জারী হয়ে থাকে। তবে দাসীর মূল্য ও দণ্ডমোহরের ক্ষেত্রে একে অপরের শরীকদার হতে পারবে। কিন্তু সন্তানের মূল্যের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং যদি একজনে সন্তানের মূল্য থেকে নিজের অংশ উসুল করে, তবে তাতে অপরজন শরীকানা দাবী করতে পারবে না। আর যদি উভয়ের মধ্য থেকে একজনে বিক্রেতা অর্থাৎ ছিনতাইকারী থেকে জরিমানা নেয়া ইখতিয়ার করে এবং অপরজন ক্রেতা থেকে জামানত নেয়া পছন্দ করে, তবে একজনের কিছু উসুলকৃত মালে অপরজন শরীক হতে পারবে না। আর যদি একজনের জন্য সন্তানের অর্ধেক মূল্যের নির্দেশ দেয়া হয়, তারপর সন্তান মারা যায়, তারপর অপর শরীক হাযির হয়, তবে সে

কিছু পাবে না। আর যদি ক্রেতার হাতে দাসী মারা যায়, তবে মুনীবের ইখতিয়ার থাকবে- ইচ্ছা করলে সে বিক্রেতার নিকট থেকে দাসীর মূল্য জরিমানা নিবে। আর ইচ্ছা করলে ক্রেতার নিকট থেকে নিবে। আর উভয় অবস্থায় তার ইখতিয়ার থাকবে ক্রেতার নিকট থেকে আক্কার ও সন্তানের মূল্য জামানত স্বরূপ নেয়া। আর অনুরূপভাবে যদি কারো নিকট থেকে একটি বাড়ি খরিদ করে এবং তাতে কিছু ইমারত তৈরি করে। তারপর কেউ ঐ বাড়ির স্বত্ব প্রমাণ করে নিয়ে নেয়, তারপর উভয়ের জন্য বিক্রেতার উপর উক্ত ইমারতের মূল্য দানের নির্দেশ দেয়া হয়, তবে যা কিছু একজনে উসুল করবে, তাতে অপরজন শরীক হতে পারবে। আর যদি উভয়ের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক নির্দেশ দেয়া হয়, তবে একজনে উসুল করলে অপরজন তাতে শরীক হতে পারবে না (মুহীতঃ আস্-সারাখসী)।

১৭. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) তাঁর জামি কিতাবে বলেন, দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দিরহাম মূল্যের একটি গোলাম ছিনতাই করলো। তারপর তার মূল্য দুই হাজার দিরহাম হয়ে গেল। তারপর অন্য এক ব্যক্তি যদি ঐ দুজন থেকে এই গোলাম ছিনতাই করে এবং দ্বিতীয় ছিনতাইকারীর হাতে গোলাম মারা যায়, তারপর ঐ গোলামের মুনীব হাযির হয়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে- যদি চায় প্রথম দুই ছিনতাইকারী থেকে তার মূল্য এক হাজার দিরহাম জরিমানা নিয়ে নিবে। আর যদি চায় দ্বিতীয় ছিনতাইকারী থেকে দুই হাজার দিরহাম জরিমানা নিয়ে নিবে। সে যদি প্রথম দুই ছিনতাইকারী থেকে জরিমানা নেয়া ইখতিয়ার করে, তবে তারা উভয়ে দ্বিতীয় ছিনতাইকারী থেকে দুই হাজার দিরহাম নিয়ে নিবে। কিন্তু তার মধ্য থেকে এক হাজার দিরহাম তাদের হালাল হবে অবশিষ্ট এক হাজার দিরহাম সাদাকা করে দিবে। আর যদি দু'জনের মধ্য থেকে একজনে দ্বিতীয় ছিনতাইকারী থেকে এক হাজার দিরহাম উসুল করে তবে অপর জন তাতে তার সাথে শরীক হতে পারবে।

১৮. মাসআলা : জামি কিতাবে আরো বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি গোলাম ছিনতাই করে তা বিক্রি করলো। তারপর ক্রেতার কাছে গোলাম মারা গেল। এ ক্ষেত্রে মালিক ইচ্ছা করলে উভয় ছিনতাইকারীর উপর দায় আরোপ করবে। ইচ্ছা করলে ক্রেতার উপর দায় আরোপ করবে। প্রথম ক্ষেত্রে উভয়ের কৃত বিক্রয় বৈধতা লাভ করবে এবং বিক্রয় মূল্য তাদের হবে। এরপর যদি উভয়ের মধ্য থেকে একজনে ক্রেতা থেকে কিছু উসুল করে, তবে অপরজন তাতে শরীক হতে পারবে। আর যদি মুনীব উভয় ছিনতাইকারীর মধ্য থেকে একজনকে পেয়ে তার থেকে অর্ধেক মূল্য জরিমানা নিয়ে নেয়, তবে তার অংশের বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে। আর তার জন্য অর্ধেক হুম্ন ওয়াজিব হবে। তারপর ঐ ছিনতাইকারী যে অর্ধেক মূল্য জরিমানা পরিশোধ করেছে, সে যদি ক্রেতা থেকে কোন হুম্ন উসুল না করে এমনকি মালিক দ্বিতীয় ছিনতাইকারী থেকেও অর্ধেক মূল্য জরিমানা নিয়ে নেয়, যাতে তার অংশের বিক্রয়ও পূর্ণ হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয় জন চাইল যে, প্রথম জন যা কিছু উসুল করেছে, তাতে শরীক হবে, তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না। তারপর যখন প্রথম জনের উসুলকৃত মালে দ্বিতীয় জনের শরীক হওয়ার ইখতিয়ার থাকলো না, তখন দ্বিতীয় জনের এই ইখতিয়ার থাকবে যে, ক্রেতাকে ধরে তার অংশের হুম্ন উসুল করে নিবে। তারপর যখন উভয়ে উপরোক্ত পন্থায় নিজ নিজ

অংশের ছমন ক্রেতা থেকে উসুল করলো এবং প্রথম জনে যা উসুল করলো তা মেকী বা জাল বলে প্রতিপন্ন হলো, তখন তার ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে তার অংশের ছমনের জন্য ক্রেতাকে ধরবে, আর ইচ্ছা করলে দ্বিতীয়জন যা উসুল করেছে, তাতে শরীক হবে। তারপর অবশিষ্টের জন্য উভয়ে উক্ত ক্রেতাকে ধরবে। আর যদি প্রথমজন যা উসুল করেছে তা মেকী বা জাল হওয়ার দরুন ক্রেতাকে তা ফেরত দেয়, তবে দ্বিতীয়জন যা উসুল করেছে, তাতে শরীক হওয়ার ইখতিয়ার তার থাকবে না। বরং ক্রেতার নিকট থেকে নিবে। আর যদি দ্বিতীয়জনে যা উসুল করেছে, তা মেকী বা জাল হওয়ার দরুন ক্রেতাকে ফেরত দেয়, তবে সে প্রথমজনের উসুলকৃত মালে শরীক হতে পারবে না (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা : মুকাতাব যদি কাউকে ভুলক্রমে হত্যা করে আর নিহত ব্যক্তির দুজন ওয়ালী থাকে, তাদের একজন তাকে কাযীর কাছে উপস্থিত করে এবং সাক্ষী পেশ করে। আর কাযী পূর্ণ রক্তের ফায়সালা প্রদানপূর্বক উভয় ওয়ালীর অনুকূলে হত্যাকারীর মূল্য প্রাপ্তি ঘোষণা দেন তাহলে অনুপস্থিত ওয়ালী উপস্থিত ওয়ালীর উসুলকৃত মালে শরীক হবে। আর কাযী যদি উপস্থিত ওয়ালীর অনুকূলে অর্ধেক মূল্যের আদেশ করেন এবং সে হত্যাকারী থেকে মূল্যের অর্ধেক উসুল করে নেয়, তবে তাতে অপর ওয়ালী শরীক হবে না। আর নিহত ব্যক্তি যদি দুজন হয়, তবে দুই ওয়ালীর মধ্য থেকে একজনে যা উসুল করবে, তাতে অপরজন শরীক হবে না। চাই কাযীর আদেশ উভয়ের জন্য একই সাথে হয়ে থাকুক কিংবা পৃথক পৃথক ভাবে হয়ে থাকুক (মুহীত : আস-সারাখসী)।

আর যদি হত্যাকারী মুদাব্বার হয়, তাহলে একজনের উসুলকৃত মালে অপরজন শরীক হবে। চাই উভয়ের অনুকূলে কাযীর ফায়সালা এক সাথে হোক, কিংবা আলাদা আলাদা। আর যদি হত্যাকারী গোলাম হয়, আর নিহত ব্যক্তির দুজন ওয়ালী হয়, আর গোলামের মুনীব একজনকে অর্ধেক গোলাম দিয়ে দেয়, কিংবা তার মূল্যের অংশ ফিদিয়া হিসাবে প্রদান করে, তবে এটাই অপর ওয়ালীর ক্ষেত্রেও ইখতিয়ার করা হয়ে যাবে এবং উভয়ে এই একজনের উসুলকৃত মালে শরীক হবে। আর যদি সে দুই ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং মুনীব একজনের ওয়ালীকে অর্ধেক গোলাম প্রদান করে কিংবা তার অর্ধেক ফিদিয়া প্রদান করে, তবে দ্বিতীয়জন তাতে শরীক হবে না। আর যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং নিহত ব্যক্তির দুজন ওয়ালী থাকে, আর মুনীব ঐ দুই ওয়ালীর মধ্য থেকে একজনের সাথে এক হাজার দিরহামে সন্ধি করে নেয়, তবে তাতে দ্বিতীয়জন শরীক হবে না। কেননা, মূলত দুজনই কিসাসের অধিকারী। আর সন্ধির কারণে ঐ কিসাস হাজার দিরহামে পরিবর্তন হয়ে গেছে। আর এটা বিভিন্ন, এমনকি তারা উভয়ে যদি মিলিতভাবে হত্যাকারীর মুনীবের সাথে সন্ধি করে, তবে সন্ধির সূত্রে যা উসুল হবে, তাতে উভয়ে শরীক হতে পারবে (আল-কাফী)।

২০. মাসআলা : একটি গোলামের যদি দুই ব্যক্তি যৌথভাবে মালিক হয় এবং একজনে অপরজন থেকে তাকে ছিনতাই করে এবং এক হাজার দিরহামে তাকে বিক্রয় করে দেয়, তবে তার অংশে বিক্রয় জায়েয হবে। আর যদি মূল্য উসুল করার আগে অপর শরীকদার

তার বিক্রয় অনুমোদন করে, তবে বিক্রতার পক্ষে ক্রেতার কাছ থেকে সমুদয় মূল্য উসুল করা বৈধ হবে। আর মূল্যের অংশ বিশেষ উসুল করলে তা উভয়ের মধ্যে বন্টিত হবে। এমনকি উসুলকৃত মূল্য খোয়া গেলে মাল থেকে খোয়া যাবে। পক্ষান্তরে যদি উভয় শরীকদারের মধ্য থেকে একজনে যৌথ ঋণের মধ্য থেকে নিজ অংশ উসুল করে তবে তার নিজ অংশ কবজা করা শুদ্ধ হবে। এমনকি যদি অপর শরীকদারের তাতে শরীক হওয়ার পূর্বে তা কবজাকারীর হাতে খোয়া যায়, তবে করযাকারীর মাল যাবে। (আল-মুনতাকা থেকে আল-মুহীতে এমনই বর্ণিত হয়েছে)।

আর যদি এক গোলামের দুই মালিকের একজনের অংশ তৃতীয় কোন ব্যক্তি ছিনতাই করে এবং অপর শরীকদারের সাথে মিলে তাকে একই চুক্তিতে বিক্রয় করে, তারপর এ শরীকদারও বিক্রয় অনুমোদন করে একজনে যা কিছু উসুল করবে, তাতে অপর জন শরীক হতে পারবে। আর যদি শরীকদারের নিজ অংশ উসুল করার পর এই শরীকদার অনুমতি দেয়, তবে অপর শরীকদারের উসুলকৃত মালে সে শরীক হতে পারবে না (আল-কাফী)।

আর অনুরূপভাবে যদি দুই ব্যক্তি একটি গোলাম এই শর্তে বিক্রি করে যে, উভয়ের তিন দিন পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকবে। তারপর উভয়ের মধ্য থেকে একজনে বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে দেয়, এরপর দ্বিতীয় জন অনুমতি দেয়, এরপর উভয়ের মধ্য থেকে একজনে মূল্যের অংশ বিশেষ উসুল করে, তবে অপরজন তাতে শরীক হবে। আর যদি প্রথম যে অনুমতি দিয়েছে, সে তার অংশ উসুল করে ফেলে, এরপর অপরজন অনুমতি দেয়, তবে প্রথম জনের উসুলকৃত মালে সে শরীক হতে পারবে না (আল-মুহীত)।

নাওয়াযিল কিতাবে বর্ণিত আছে, ফকীহ আবুল কাসিম (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কিছু পুঁজি দিলো এই শর্তে যে, এর দ্বারা ব্যবসা করে যে মুনাফা হবে, তা দু'জনে সমান সমান পাবে। আর সে বলল যে, আমি এতে রাযী নই যে, তুমি আমার ছাড়া অপর কারো সাথে শরীকী কাজ করবে। আর যদি তুমি আমার ছাড়া অন্য কারো সাথে শরীকী কাজ করো, তবে আমিও তাতে মুনাফার অংশ চাই। উভয়ে এ ব্যাপারে সম্মত হলো, এরপর যাকে পুঁজি দেয়া হয়েছে, সে অন্য কারো সাথে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা করলো এবং মুনাফা অর্জন করলো। তিনি বললেন, রাব্বুল মাল অর্থাৎ প্রথম যে ব্যক্তি পুঁজি দিয়েছে, সে তার নিজের পুঁজি ছাড়া অন্য পুঁজির-যা দ্বিতীয় ব্যক্তি তার মুদারিবকে দিয়েছে-মুনাফায় শরীক হতে পারবে না (তাতার খানিয়া)।

আর যদি ওয়ারিসদের মধ্য থেকে কোন ওয়ারিস যৌথ তাজ্য সম্পত্তি কাজে লাগিয়ে মুনাফা অর্জন করে, তবে সে সমুদয় মুনাফা এককভাবে তার হবে (আল-ফাতাওয়া আল-গিয়াছিয়া)। আর যদি মুদারাবার দুই শরীকের একজনে এক ব্যক্তিকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং তাকে মূল্য প্রদান না করে, তারপর তারা উভয়ে মুফাওয়াযাতের চুক্তি বাতিল করে দেয় এবং তাদের প্রত্যেকে অপর এক ব্যক্তির সাথে মুফাওয়াযাত করে নেয়, তারপর উক্ত উকীল একটি গোলাম খরিদ

করে তাহলে উভয়ের মুফাওয়াযাতের বিষয়টি সে জ্ঞাত থাক বা না থাক, এই খরিদ শুধু মুয়াক্কিলের জন্য হবে। প্রথম শরীক তার মধ্য থেকে কিছু পাবে না। কেননা প্রথম শরীকদারের পক্ষ থেকে এ উকীলকে উকীল নিয়োগ করা মুফাওয়াযা চুক্তির কারণে পরোক্ষভাবে ছিল। যখন ঐ মুফাওয়াযা বাতিল হলো, তখন তা দ্বারা পরোক্ষভাবে সাব্যস্ত উকীল নিযুক্ত ও অবগতির শর্ত ছাড়াই বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, এটা হচ্ছে *عزل حكمي* বা কার্যত ব্যাখ্যাকরণ। আর মুয়াক্কিলের এখন যে শরীকদার আছে অর্থাৎ দ্বিতীয় মুফাবিয, সে এর মধ্য থেকে কিছু পাবে না। কেননা উক্ত মুয়াক্কিলের জন্য এই খরিদা জিনিস অর্থাৎ গোলামের মধ্য যে স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা মুফাওয়াযাত চুক্তির পূর্বে একটি কারণ অর্থাৎ তাওকীল বা উকীল নিয়োগের কারণে হয়েছে। এই উকীল না হলে উক্ত মুয়াক্কিলের স্বত্ব এই গোলামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হত না। আর নিয়ম এই যে, শরীকদারের একজনের জন্য শরীকানার পূর্বে সংঘটিত কোন জিনিসের স্বত্ব কারণ দ্বারা, তবে অপরজন তাতে শরীকদার হয় না। যেমন- কেউ যদি বিক্রেতার জন্য ইচ্ছাধিকারের শর্তসহ গোলাম খরিদ করে, তারপর ক্রেতা কারো সাথে মুফাওয়াযা করে, তারপর বিক্রেতা তার ইচ্ছাধিকার রহিত করে বিক্রয় অনুমোদন করে, তবে শরীকদারের জন্য এই গোলামে শরীকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। কিন্তু ওয়াকীলের ইখতিয়ার থাকবে অর্থাৎ মূল্য আদায় করার জন্য ইচ্ছা করলে সে মুয়াক্কিলের কাছে যাবে, আর ইচ্ছা করলে তার দ্বিতীয় শরীকদারের কাছে যাবে। তারপর শরীকদার তার উক্ত মুয়াক্কিল থেকে নিয়ে নিবে (আল-কাফী)।

আর যদি মুয়াক্কিল উকীলকে নির্দিষ্ট পরিমাণ গম দিয়ে বলে যে, এর বিনিময়ে আমার জন্য গোলাম খরিদ করবে আর মাসআলার অবশিষ্টাংশ উপরোক্ত রূপ হয়। তারপর উকীল ঐ পরিমাণ গমের অনুরূপে বিনিময়ে খরিদ করে, তবে কিসাস মতে সে খিলাফকারী হলো, পক্ষান্তরে ইসতিহসান অনুযায়ী খিলাফকারী হবে না। আর উকীল যদি উভয়ের মুফাওয়াযাত চুক্তি বাতিল সম্পর্কে অবহিত হয়ে খরিদ করে, তবে উক্ত গোলাম তার মুয়াক্কিল ও মুয়াক্কিলের প্রথম শরীকদার এ দুজনার হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

নাওয়াযিল কিতাবে আছে, ফকীহ আবুল কাসিম (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, দুই শরীকদার ব্যক্তির একজনে কাজ করলো এবং অপরজন অন্তর্হিত হয়ে গেল। তারপর সে উপস্থিত হলো। তখন উপস্থিত জন তাকে তার অংশ দিলো। তারপর উপস্থিত জন অন্তর্হিত হয়ে গেল এবং (পূর্ববর্তী) অন্তর্হিত ব্যক্তি যে এখন উপস্থিত আছে, সে কাজ করলো এবং মুনাফা অর্জন করলো এবং (পরবর্তী) অন্তর্হিত জনকে মুনাফা থেকে তার অংশ দিতে অস্বীকার করলো। তিনি (আবুল কাসিম) জবাবে বললেন, উভয়ের শরীকানা যদি শুদ্ধরূপে হয়ে থাকে এবং উভয়ে পরস্পরে কাজ করার শর্ত করে থাকে যে, একত্রে বা ভিন্ন ভিন্নরূপে কাজ করবে, তবে যে মুনাফা তাদের উভয়ের ব্যবসায়ে অর্জিত হবে, চাই উভয়ের একত্রে কাজ করার দরুন হোক কিংবা ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করার দরুন হোক, তা সব উভয়ের মধ্যে পরস্পারিক শর্ত অনুযায়ী বণ্টিত হবে।

২১. মাসআলা : আবুল কাসিম (র)-কে আরো জিজ্ঞেস করা হয় যে, দুই ব্যক্তি পরস্পর অংশীদারিত্বে ব্যবসা শুরু করলো এই শর্তে যে, উভয়ে খরিদ করবে এবং উভয়ে বিক্রি করবে। আর মুনাফা উভয়ের মধ্যে অর্ধাধি বণ্টিত হবে। আর এদের প্রত্যেকের জন্য এমন কিছু দিরহাম আছে যা এই ব্যবসা থেকে ভিন্ন। তারপর এক শরীকদার অপর শরীকদারকে বলল, আমরা মাল বণ্টন করবো এবং অংশীদারিত্ব ভেঙ্গে দিবো। কারণ আমার এতে কিছু লাভ হচ্ছে না। তারপর সে পণদ্রব্য বণ্টন করলো। তারপর উভয়ের একজনে তার অংশ পুরাপুরি অপরের কাছে বিক্রি করে দিলো এবং কিছু দিরহাম উসূল করে অন্য কারবার শুরু করলো। আর উভয়ে পরস্পরে একথা বললো না যে, আমরা দুজন ভিন্ন হয়ে গেলাম। জবাবে আবুল কাসিম (র) বললেন, আমরা অংশীদারিত্ব ভেঙ্গে দেবো প্রথমে একথা বলার দরুন পরবর্তী কারবারে অংশীদারিত্ব ভেঙ্গে যাবে (তাতার খানিয়া)।

দুই ব্যক্তি কাপড়ের সূতার মধ্যে এভাবে অংশীদার হলো যে, একজনের হবে তানা, অপর জনের হবে বানা। তারপর উভয়ে কাপড় বয়ন করলো। তবে এ কাপড়ের তানা-বানার মূল্য হিসাবে উভয়ের মধ্যে অংশীদারিত্ব হবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা : খাজান্দী (র) বলেন, পিতা এবং ওসীর ছোট শিশুর মাল নিজের মালের সাথে মিলিয়ে শরীকী ব্যবসা করতে পারে। যদি শিশুর মূলধন তাদের মূলধনের চেয়ে বেশী হয়, আর মুনাফার মধ্যে সমতা প্রভৃতি শর্ত করা হয় এবং তার উপর সাক্ষী পেশ করা হয়, তবে মুনাফা উভয়ের মধ্যে শর্ত অনুযায়ী বণ্টিত হবে। আর যদি সাক্ষী না থাকে ধর্মত (অর্থাৎ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার বিষয় হিসাবে) শর্তকৃত তাদের জন্য হালাল হবে। মুনাফায় কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং মুনাফা মূলধন অনুযায়ী সাব্যস্ত হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

আল-মুনতাকা কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুফাবিয যদি কাউকে হেবা করে, তবে তা জায়েয হবে না। তার শরীকদারের ইখতিয়ার থাকবে যাকে হেবা করা হয়েছে, তার থেকে হেবাকৃত অর্ধেক মাল ফেরত নিবে। যখন ফেরত নিবে, তখন এটা উভয় শরীকদারের মধ্যে অর্ধাধি হবে। আর যা অবশিষ্ট থাকলো তার হেবাও বাতিল হয়ে যাবে এবং উভয়ের কাছে অর্ধাধি ফেরত আসবে। আল-মুনতাকায় আরো বর্ণিত আছে, দুই ইনান *عنان* শরীকদারের একজনে বেচাকেনা করছিল। তখন সে কিছু ঋণ করলো। তারপর অপর শরীকদার অংশীদারিত্ব অর্ধেক পণ্য উসূল করে নিতে চাইলো এবং বললো, যখন তোমার থেকে ঋণ উসূল করা হবে, তখন তুমি আমার থেকে ফেরত নিবে। তার এ ইখতিয়ার নেই (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা : দুই শরীকদারের একজনে আসুর বাগানের ফল ক্রয় করলো। তারপর অপর শরীকদারকে বললো, আমি তোমাকে এতে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার করলাম। যদি ফল পোখত হওয়ার পূর্বে এরূপ করে, তবে অংশীদারিত্ব বাতিল হয়ে যাবে (আল-কিন্যা)। যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম করয দাও। সমান মুনাফার

শর্তে আমি তা দ্বারা ব্যবসা করবো। তারপর করয নিয়ে ব্যবসা করলো। এক্ষেত্রে সমুদয় মুনাফা করযদারের হবে। করযদাতা তাতে কোন অংশ পাবে না (আয-যখীরাহ)। আলী ইব্ন আহমদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তি থেকে একশ' দীনার করয নিলো। তারপর তা কবজা করে তাকে দিয়ে দিলো। তারপর করযদাতা আরো এক হাজার দীনার বের করলো এবং উভয় দীনার মিলিয়ে ফেললো। তারপর করযদাতা তাকে বলল, এই দীনার নিয়ে যাও এবং এর দ্বারা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা কর। সে তাই করলো এবং মুনাফা অর্জন করলো। তখন এর বিধান কি হবে? তিনি বললেন, এটা ক্রটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। অংশীদারিত্ব শুদ্ধ হওয়ার জন্য অধিক শর্ত লাগানো জরুরী। তাকে আরো জিজ্ঞেস করা হয়, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির কাছে গম গচ্ছিত রাখলো এবং বললো, এই গম তুমি তোমার গমের সাথে মিশিয়ে নাও এবং গোলাব মধ্য রেখে দাও। সে তাই করলো, তারপর তার থেকে দুই-তৃতীয়াংশ চুরি হয়ে গেল। এরপর গমের মালিক এলো এবং গোলাজাতকারী তাকে অবশিষ্ট গম দিয়ে দিল। এরপর সে দাবী করলো যে, এই গমের মধ্য থেকে আমাকে আমার অংশ দিয়ে দাও। এখন কি সে তা পাবে? তিনি বললেন, সে দাবী করতে পারে। কেননা, যখন গমের মালিকের নির্দেশে সে তার গমের সাথে মালিকের গম মিশিয়েছে, তারপর চুরি হয়েছে। এখন যে পরিমাণ গম চুরি গেছে, তা তাদের উভয়ের থেকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যাবে (তাতার খানিয়া-ইয়াতীমা থেকে)।

২৪. মাসআলা : দুই ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ গম ও যবের অংশীদার। আর তারা একে অন্যকে তা বিক্রি করার অনুমতি দেয়নি। এদিকে তাদের একজন গম বহন করে নেয়ার জন্য একটি বাহন জন্তু ধার নিলো। তারপর তার নির্দেশ ব্যতীত অপরজন তার উপর যব বহন করলো। তবে এই বহনকারী ঐ বহন জন্তু ও তার শরীকদারের যবের অংশের যামিন হবে। আর এটা শরীকে ইনান ও শরীকে মুফাবিয এর মত নয় (আল্ মাবসূত)। আল্ ফাতাওয়া কিতাবে আছে, আবু বকর (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, দুই শরীকদারের একজন পাগল হয়ে গেলো। দ্বিতীয় জন মাল দ্বারা ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করলো কিংবা লোকসান দিলো (এখন এর বিধান কি হবে?) তিনি বললেন তার পাগলত্ব অংশীদারিত্ব প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত কায়ম থাকবে। এরপর যখন তার উপর এ নির্দেশ দেয়া হবে, তখন অংশীদারিত্ব বাতিল হয়ে যাবে। তারপর যখন সে মাল দ্বারা কারবার করবে, তখন মুনাফা সম্পূর্ণ কারবারীর হবে এবং লোকসানও তারই বহন করতে হবে। আর এটা পাগলের মাল ছিনতাই করার অনুরূপ। সুতারাং উক্ত শরীকদারের জন্য তার অংশের মালের মুনাফা হালাল হবে। আর পাগলের মালের অংশের মুনাফা তার জন্য হালাল হবে না। তা সাদাকা করে দিবে (আল-মুহীত)।

আর যদি কবজাকারী শরীকদার তার শরীকদারের মৃত্যুর পর দাবী করে যে, আমি তাকে দিয়ে দিয়েছি। তবে বাহরুর রায়িক বলেন যে, ওয়াল-ওয়ালিজিয়ায় গ্রন্থ আল্ ওয়াকাল্লা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, তাতেও তদ্রূপ বিধান। আর বলেন যে, দুটি ঘটনা ঘটেছে। একটি এই যে, শরীকদারের নিষেধ সত্ত্বেও অপর শরীকদার বাকীতে বিক্রি করেছে। আমি তার জবাবে বললাম যে, বিক্রেতার অংশের বিক্রয় শুদ্ধ হবে। আর

শরীকদারের অংশের বিক্রয় স্বগিত থাকবে। সে অনুমোদন করলে মুনাফা উভয়ের মধ্যে বন্টিত হবে। দ্বিতীয়টি এই যে, শরীকদারের নিষেধ সত্ত্বেও অপর শরীকদার মাল বাইরে নিয়ে গিয়েছে এবং মুনাফা অর্জন করেছে। আমি জবাব দিলাম, বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে তার শরীকদারের অংশের ছিনতাইকারী সাব্যস্ত হয়েছে। সুতারাং উভয়ের মধ্যে শর্ত অনুযায়ী উক্ত মুনাফা হবে না। আর এর দাবী হচ্ছে অংশীদারিত্ব বাতিল হওয়া। আর এটাকেও শরীকদারের কবজাকে আমানত হওয়ার উপর কিয়াস করেছেন (ফাতাওয়ায়ে কারিউল হিদায়া)। তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, শরীকদার তার শরীকদার থেকে কিংবা মুযারিব থেকে বিক্রয়ের বা খরচের হিসাব তলব করেছে। সে বলল হিসাব আমার জানা নেই। উক্ত হিসাব দান কি তার উপর অনিবার্য করা হবে? তিনি জবাব দিলেন, লাভ-লোকসানের পরিমাণের ক্ষেত্রে কসমের সাথে শরীকদার ও মুযারিবের কথা গ্রহণ করা হবে। সব কিছু বিস্তারিত উল্লেখ করা তার জন্য অপরিহার্য হবে না। নষ্ট হওয়া ও শরীকদারকে ফেরত দেয়ার ক্ষেত্রেও তার কথা গ্রহণ করা হবে (নাহরুল ফায়িক)।

২৫. মাসআলা : শরীকদার বলল যে, আমি দশ দিরহাম মুনাফা অর্জন করেছি। তারপর বলল, না, আমি তিন দিরহাম মুনাফা অর্জন করেছি। এক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে তার থেকে কসম নেয়ার। সে কসম করবে যে, সে দশটি মুনাফা করেনি (কিন্য়া)।

নাতিফী (র) বর্ণনা করেন যে, সমস্ত আমানত বোকামির দরুন বিনা বর্ণনায় রেখে মারা গেলে জামানত বস্ততে পরিণত হয়- তিনটি অবস্থা ব্যতীত। প্রথম, মসজিদের মৃত্যুওয়ালী যদি মসজিদের আয় উসুল করেন এবং তার হিসাব না লিখে রেখে মারা যান, তবে তিনি যামিন হবেন না। দ্বিতীয়, যদি শাসক জিহাদের জন্য বের হন, এবং মুজাহিদগণ গনীমত লাভ করে, আর শাসক কিছু গনীমত কিছু মুজাহিদের কাছে গচ্ছিত রাখেন, তারপর তিনি মারা যান এবং কার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন তা বর্ণনা না করে যান, তবে তিনি যামিন হবেন না। তৃতীয়, কাযী যদি কোন ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণের জন্য নিয়ে অপর কারো কাছে গচ্ছিত রেখে মারা যান এবং কার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন তা বর্ণনা না করে যান, তবে তার উপর তার ক্ষতিপূরণ নেই। আর যদি মুফাবিযা অংশীদারিত্বের দুই অংশীদারের এক জনের কাছে অংশীদারিত্বের মাল থাকে এবং সে মারা যায়, আর মালের তাফসীল বর্ণনা না করে যায়, তবে কোন কোন ফকীহ বলেন, সে যামিন হবে না এবং তার মাবসূত গ্রন্থের অংশীদারিত্ব অধ্যায়ের বরাত দেন। অথচ তা ভুল। বরং সঠিক মতে, সে তার অংশীদারের অংশের যামিন হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান- কিতাবুল ওয়াক্ফ থেকে)। এ থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ফাতহুল কাদীর ও অন্যান্য ফাতওয়ার কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে, তা দুর্বল অভিমত। সঠিক অভিমত হলো, শরীকদার বর্ণনা ব্যতীত মারা গেলে যামিন হবে, তা ইনান অংশীদারিত্ব থেকে কিংবা মুফাবিযা অংশীদারিত্ব থেকে (আল্ বাহরুর রায়িক)। যদি শরীকদার মারা যায় এবং অংশীদারিত্বের মাল লোকদের কাছে করয থাকে এবং তা বর্ণনা না করে, বরং অজ্ঞাত

রেখে মারা যায়, তবে যিম্মাদার হবে, যে রূপ মজুদ মাল অজ্ঞাত রেখে মারা গেলে যামিন হয়ে থাকে (আল-কিন্য়া)।

যদি মুফাবিয শরীকদার এক ব্যক্তি থেকে একটি মাল এক হাজার দিরহামে খরিদ করে এবং তা কবজা না করতেই উক্ত বিক্রেতা ক্রেতার অপর শরীকদারের সাথে সাক্ষাৎ করে আর সে বিক্রেতা থেকে ঐ মালই দেড় হাজার দিরহামে খরিদ করে, তবে এই দ্বিতীয় খরিদই ধর্তব্য হবে এবং প্রথম খরিদ বাতিল হবে। কেননা, মুফাবিয অংশীদারিত্বের দুই শরীকদার এক ব্যক্তি সমতুল্য (আল-মুহীত)। দুই ব্যক্তি একটি গোলাম এক হাজার দিরহামে খরিদ করলো এবং উভয়ের প্রত্যেকে উভয়ের পক্ষ থেকে যামিন হলো। তবে যে পর্যন্ত উভয়ের মধ্য থেকে কেউ অর্ধেকের বেশী পরিশোধ না করবে, সে পর্যন্ত অপর শরীকদারের প্রতি রুজু করতে পারবে না।

দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে এই শর্তে মালের যামিন হয়েছে যে, উভয়ের প্রত্যেকে অপর ব্যক্তির যামিন, অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকে মূল যামিনপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পূর্ণ মালের যামিন হয়েছে। তারপর নিজ সাথী যিম্মাদারেরও যামিন হয়েছে। সুতরাং একজনে যা পরিশোধ করবে, তার অর্ধেক অপর যামিনদারের নিকট থেকে ফেরত নিতে পারবে। আর পরিশোধকারীর এ ইখতিয়ার থাকবে যে, সে যা কিছু পরিশোধ করেছে তার সম্পূর্ণটি আসীল থেকে নিয়ে নিবে। আর যদি রাব্বুল মাল অর্থাৎ মালের মালিক উভয়ের মধ্য থেকে একজনকে যামিনদারী থেকে মুক্ত করে দেয়, তবে দ্বিতীয় যামিনদার সম্পূর্ণ মালের জন্য ধৃত হবে। কেননা, আসীলের পক্ষ থেকে সেও যামিনদার হয়েছে।

২৬. মাসআলা : দুই মুকাতাব গোলাম, উভয়ে একই কিতাবতে মুকাতাব হয়েছে। এই উভয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকে অপরের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ মালের যামিন হয়েছে। তবে উভয়ের মধ্য থেকে একজনে যা কিছু পরিশোধ করবে, তার অর্ধেক অপরজন থেকে নিতে পারবে। তার যদি উভয়ে কিছু পরিশোধ না করে এমনকি মুনীব উভয়ের মধ্য থেকে একজনকে আযাদ করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। আর কিতাবতের অর্ধেক মাল থেকে উভয়ে মুক্ত হয়ে যাবে। আর অবশিষ্ট অংশের জন্য মুনীবের ইখতিয়ার থাকবে উভয়ের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পাকড়াও করবে। কেননা, মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামকে যামিন হওয়ার জন্য এবং অপর গোলামকে তার নিজের মূল অংশের জন্য পাকড়াও করতে পারবে। অতএব, মুনীব যদি মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম থেকে নিয়ে নেয়, তবে সে অপর গোলাম থেকে ফেরত নিবে। আর যদি মুনীব অপর গোলাম থেকে নিয়ে নেয়, তবে সে মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম থেকে কিছু নিতে পারবে না (জামি সাগীর)। যদি যৌথ মালিকানার জন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে, আর এক শরীকদারের অনুপস্থিতিতে পশু ডাক্তার বলে যে, তাকে দাগ দিতে হবে। সুতরাং উপস্থিত জন সেটিকে দাগ দেওয়ায়। তারপর তা মারা যায়, তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর যদি তাদের যৌথ পণ্য কোন বাহন জন্তর উপর বোঝাই করা থাকে এবং পথিমধ্যে এই জন্ত পড়ে যায়। তারপর একজনে আরেকজনের অনুপস্থিতিতে পণ্যদ্রব্য নষ্ট হওয়ার অশংকায় এক বাহন জন্ত ভাড়া করে তবে তা জায়েয হবে। আর ভাড়ার

অংশ শরীকদার থেকেও নিয়ে নিবে (আল-কিন্য়া)। এক শরীকদার বলল যে, আমি এই দাসীটিকে খাস করে নিজের জন্য খরিদ করতে চাই, আর অপর শরীকদার নীরব থাকল। তারপর সে ঐ দাসী খরিদ করে, তবে তা তার জন্য খাস হবে না- যতক্ষণ পর্যন্ত শরীকদার সম্মতি সূচক হাঁ না বলবে (আল-খুলাসা)।

আল-মুনাতাকায় আছে, দুই ব্যক্তি যদি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় এই শর্তে যে, তাদের মধ্যে একজনের জন্য মাসোহারা দশ দিরহাম হবে, যা অংশীদারিত্বের মাল নয়। তবে এই অংশীদারিত্ব বৈধ, কিন্তু শর্ত অবৈধ ও বাতিল (আল-মুহীত)। যদি মুফাবিযা অংশীদারিত্বের মধ্যে এক শরীকদারের জন্য কাজ করার শর্ত করা হয়, তবে অংশীদারিত্ব বাতিল হবে (আত-তাহযীব)। দুই ইনান শরীকদারের মধ্য থেকে যদি একজনে কোন ব্যক্তির উপর উভয়ের অংশীদারিত্বের কোন বস্তু দাবী করে এবং বিবাদী কসম করে, তবে অপর শরীকদারের বিবাদী থেকে পুনরায় কসম নেয়ার ইখতিয়ার থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উয়ূন কিতাবে আছে, ইব্ন সামাআ ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি এক মুফাবিয শরীকদার কারো কাছ থেকে একটি গোলাম এক হাজার দিরহামে খরিদ করে এবং তা কবজা না করতেই বিক্রেতা তার অপর শরীকদারের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার থেকে ঐ গোলাম দেড় হাজার দিরহামে ইজারা নেয়, তবে তা জায়েয হবে। আর প্রথম খরিদ বাতিল হয়ে যাবে। চাই গোলামকে শানাখ্ত করুক বা না করুক (তাতার খানিয়া)।

অধ্যায় : ওয়াকফের বিবরণ

অধ্যায় : ওয়াকফের বিবরণ

[এ অধ্যায়ে ১৪ টি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ : ওয়াকফের সংজ্ঞা, রুকন, কারণ, বিধান, শর্তাবলী এবং যে সকল বাক্যে ওয়াকফ পূর্ণ হয়, কিংবা হয়না সেগুলোর বিবরণ।

সংজ্ঞা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সম্পদ ওয়াকফকারীর মালিকানায় আবদ্ধ করা এবং তার মুনাফা শরীকদারকে কিংবা অন্য কোন সৎকাজে দান করাকে শরীআতে ওয়াকফ বলা হয়। এটা আরিয়াত দেয়ার পর্যায়ভুক্ত (আল-কাফী)। কাজেই এটা অপরিহার্য হবে না। ওয়াকফকারী ব্যক্তি তার ওয়াকফ প্রত্যাহার বা ওয়াকফকৃত সম্পদ বিক্রয় করে ফেলতে পারে (মুয়মারাত)। দুই অবস্থায় এটি লায়িম বা অপরিহার্য হয় (১) যদি কোন কাযী উক্ত ওয়াকফকে লায়িম হওয়ার নির্দেশ দেন (২) যদি ওয়াকফকারী এরূপ বলে যে, আমি এই গৃহের আয় ওয়াকফ করেছি। এই দুই অবস্থায় ওয়াকফ লায়িম হয়ে যায় (আন্-নিহায়া)। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ওয়াকফ হলো কোন সম্পদের স্বত্ব এভাবে আল্লাহর মালিকানায় আবদ্ধ করা যে, ঐ সম্পদের মুনাফা আল্লাহর বান্দাগণ ভোগ করবে। তাদের মতে ওয়াকফ করা মাত্র তা লায়িম হয়ে যায়, ফলে তা বিক্রয় বা হেবা করা যায় না এবং তাতে মীরাসও চলে না (আল্-হিদায়া)। উয়ূন ও ইয়াতীমা গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উক্তি অনুযায়ীই ফাতওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। শায়খ আবুল মাকারিম প্রণীত নিকায়াহ এর ভাষ্য গ্রন্থে এরূপ আছে।

১. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কাযীর ফায়সালা দ্বারা ওয়াকফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয়। এর পস্থা এই যে, ওয়াকফকারী ওয়াকফের সম্পত্তি মুতাওয়াল্লীর কাছে অর্পণ করবে। তারপর ওয়াকফ লায়িম না হওয়ার দাবী তুলে তা প্রত্যাহার করবে। কাযী তখন ওয়াকফ লায়িম হওয়ার ফায়সালার ফলে তা, তবে সর্বসম্মত লায়িম হয়ে যাবে। আর যদি ওয়াকফকারী ও মুতাওয়াল্লী কোন ব্যক্তিকে বিচারক মানেন এবং সে বিচারক ওয়াকফ লায়িম হওয়ার নির্দেশ দেন, তবে সহীহ ও বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এরূপ বিচারকের নির্দেশ দ্বারা ওয়াকফ লায়িম হওয়া না হওয়ার বিতর্ক মীমাংসা হবে না (আল-কাফী)। আর যদি ওয়াকফকারী তার

ওয়াক্ফ বাতিল হওয়ার আশংকা করে এবং আদালতের ফায়সালা গ্রহণের সুযোগ না থাকে, তবে ওয়াক্ফনামায় এরূপ লিখে দিবে যে, যদি এই ওয়াক্ফ কোন কাযী বা শাসক বাতিল করে দেয়, তবে এই ওয়াক্ফকৃত সমস্ত জমি ও তাতে যা কিছু আছে, আমার পক্ষ হতে ওসীয়াত করা হলো যে, তা বিক্রয় করে তার মূল্য যেন গরীবদের দান করা হয়। এমতাবস্থায় তার ওয়ারিসগণ কাযীর নিকট অভিযোগ করে ওয়াক্ফ বাতিল করিয়ে কোনরূপ লাভবান হবে না। ওসীয়াত কোন শর্তের সাথে সংযুক্ত হলে তা ফাসিদ হওয়ার অবকাশ থাকে না (আল-খুলাসা)। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, আমাদের যুগে যে প্রথা প্রচলিত আছে যে, লোকেরা ওয়াক্ফনামায় ওয়াক্ফকারীদের স্বীকারোক্তি এভাবে লিখে নেয় যে, কাযীদের মধ্য থেকে কোন কাযী এ ওয়াক্ফকে লায়িম হওয়ার নির্দেশ দান করেছেন- এটা কিছুই নয়। আর কোন কোন মুতাআখখিরীন মাশায়েখ বলেছেন যে, যখন ওয়াক্ফনামায় এরূপ লিখে নিয়েছে যে, এই ওয়াক্ফ শুদ্ধ হওয়া ও লায়িম হওয়ার জন্য ইসলামের কোন একজন কাযী নির্দেশ দান করেছেন এবং কোন কাযীর নাম উল্লেখ করে না থাকেন, তবে তা বৈধ হবে। রায়িয়াল্লাহু আনহু বলেন, শামসুল আইম্মা সারাখসীর উক্তিই বিশুদ্ধ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা : ওয়াক্ফকে মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত করলে বিশুদ্ধ মতে ওয়াক্ফকারীর মালিকানা লোপ পাবে না। তবে ঐ ওয়াক্ফ লায়িম হয়ে যাবে বলে ইজমা রয়েছে। তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ওয়াক্ফ সম্পত্তির স্বত্ব ওয়াক্ফকারী ও তার ওয়ারিসদের হাতে থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তাদের কারো স্বত্বই অটুট থাকে না। যেরূপ গোলাম আযাদ করা ও মসজিদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে (আল-কিফায়া)। আর কেউ যদি ওয়াক্ফকে তার মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত করে বলে যে, যখন আমার মৃত্যু হবে, তখন হতে আমি আমার এই গৃহটি অমুক নেক কাজের জন্য ওয়াক্ফ করলাম। তারপর সে মৃত্যুবরণ করলো। তবে এই ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে। যদি তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা পূর্ণ হয়, তবে তা লায়িম হবে। আর যদি তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে তা পূর্ণ না হয়, তবে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জায়েয হবে এবং অবশিষ্টটা এখন বাকী থাকবে- যে পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির অন্য কোন সম্পদ প্রকাশ পায় কিংবা ওয়ারিসগণ অনুমতি দেয়। আর যদি মৃত ব্যক্তির অন্য কোন সম্পদ প্রকাশ না পায় এবং ওয়ারিসগণও অনুমতি না দেয়, তবে তার সম্পদ তিনভাগে বিভক্ত হবে। তখন ওয়াক্ফকারীর পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ওয়াক্ফ হবে এবং দুই-তৃতীয়াংশ ওয়ারিসদের হবে। আর কেউ যদি এইভাবে মারযুল মাওত অর্থাৎ রোগের মধ্যে ওয়াক্ফ করে তবে তার বিধানও এরূপ হবে। আর কেউ যদি মৃত্যু-রোগের মধ্যে ওয়াক্ফ করে এবং তা মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত না করে, বরং এরূপ বলে যে, আমি এখনই এটা ওয়াক্ফ করলাম। তবে ইমাম তাহাবীর বর্ণনানুসারে তা মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত করারই অনুরূপ হবে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এই ওয়াক্ফ সুস্থ ব্যক্তির ওয়াক্ফের অনুরূপ। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এই ওয়াক্ফ লায়িম হবে না। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে ওয়াক্ফকারী তা প্রত্যাহার কিংবা হেবা ইত্যাদি করতে পারবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এক-তৃতীয়াংশে লায়িম হবে (তাবয়ীন)।

সাহেবাইন (র)-এর মতে ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হবে তবে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, ওয়াক্ফকারীর শুধু কথার দ্বারাই মালিকানা লোপ পাবে। আর এটাই তিন ইমামের মত। অধিকাংশ ফকীহ এই মতের সমর্থক। এছাড়া বলখের ফকীহগণও এই মত পোষণ করেন। আল-মুনিয়ায় বর্ণিত আছে যে, এর উপরই ফাতওয়া। ফাতহুল কাদীর ও আস-সিরাজুল ওয়াহহাজেও বলা হয়েছে যে, এর উপরই ফাতওয়া। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে তার হাতে অর্পণ না করা পর্যন্ত ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয় না। আর এর উপরই ফাতওয়া। আস-সিরাজিয়ায় এরূপ লিপিবদ্ধ আছে। আল খুলাসায় লিখিত আছে যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) এর উক্তির ফাতওয়া প্রদত্ত হবে। অতএব, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী ইজমালী বস্ত্ত বণ্টন না করে ওয়াক্ফ করা শুদ্ধ হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী শুদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ওয়াক্ফের মধ্যে ওয়াক্ফকারীর নিজের মুতাওয়াল্লী হওয়ার শর্ত করা শুদ্ধ এবং এটাই জাহিরী মত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এটা শুদ্ধ হবে না। এইভাবে ওয়াক্ফকারী যদি এরূপ শর্ত করে যে, ইচ্ছা করলে ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফকৃত জমি অন্য জমি দ্বারা এওয়াজ বদল করতে পারে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এটা ইসতিহসান বা সুস্থ কিয়াস অনুযায়ী তা জায়েয খুলাসায় এরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এর উপরই ফাতওয়া। আবুল মুকারিমকৃত শারহে নিকায়ারও এরূপ লিপিবদ্ধ আছে। আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর উক্তি অনুযায়ী কাযীর নির্দেশের পর, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী শুধু ওয়াক্ফকারীর মুখের কথার পর এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী ওয়াক্ফ করা ও মুতাওয়াল্লীকে সমর্পণ করার পর ওয়াক্ফকৃত বস্ত্তর মালিকানা ওয়াক্ফকারীর নিকট চলে গেলেও যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, তার মালিকানায় তা দাখিল হয় না। আল-কাফী কিতাবে এরূপ লিখিত আছে এবং এটাই মুখতার ও পসন্দনীয় মত (ফাতহুল কাদীর)। আর ওয়াক্ফের রুকন হলো সেই সমস্ত বিশেষ শব্দ, যা দ্বারা ওয়াক্ফ বুঝতে পারা যায় (বাহরুর রায়িক)। আর ওয়াক্ফের সবব বা কারণ হলো আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা (আল ইনায়া)। আর ওয়াক্ফের হুকুম (বা ফলশ্রুতি) সাহেবাইনের মতে এই যে, ওয়াক্ফের স্বত্ব ওয়াক্ফকারীর অধিকার থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত অধিকারে চলে যায়। আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ওয়াক্ফের সম্পত্তি ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় এমনভাবে আবদ্ধ হবে যে, তা যেন অন্যের মালিকানায় চলে যেতে না পারে।

কেউ যদি বলে যে, আমি আমার এই যমীন চির দিনের জন্য সাদাকায়ে মাওকুফাহ অর্থাৎ ওয়াক্ফ স্বরূপ দান করলাম, কিংবা আমি আমার মৃত্যুর পরের জন্য তার ওসীয়াত করলাম, তবে এরূপ ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে। এরপর সে ব্যক্তি ঐ যমীন বিক্রয় করতে পারবে না। আর ঐ সম্পত্তি মীরাসও হতে পারবে না। কিন্তু যদি তার ঐ ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি তার পরিত্যক্ত মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হয়, তবে তা জায়েয হবে। এক-তৃতীয়াংশের বেশী হলে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ সম্পত্তির ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। ওয়াক্ফের একটি শর্ত হলো ওয়াক্ফকারীকে আকল ও বোধ সম্পন্ন হতে হবে। অর্থাৎ এতটুকু বুঝ থাকতে হবে যে, ওয়াক্ফের ফলাফল এরূপ হয়। দ্বিতীয় শর্ত ওয়াক্ফকারীর বালিগ হওয়া। সুতরাং না বালিগ

ও বোধহীনের ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে না (আল-বাদায়ে)। যে বালকের লেনদেন করা নিষেধ, সে যদি নিজের যমীন ওয়াক্ফ করে, তবে ফকীহ আবু বকর (র)-এর মতে তা বাতিল হবে। হ্যাঁ, কাযীর অনুমতিক্রমে হলে তা বাতিল হবে না। কিন্তু ফকীহ আবুল কাসিম বলেন যে, নাবালিগের ওয়াক্ফ সর্বাবস্থায় বাতিল হবে। কাযী অনুমতি দেন বা না দেন। কেননা, ওয়াক্ফ হচ্ছে নিঃস্বার্থ দান (মুহীত)।

ওয়াক্ফের আরেকটি শর্ত হলো আযাদ বা স্বাধীন হওয়া। ওয়াক্ফকারীর মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। কোন যিম্মী যদি নিজের সন্তান ও বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং শেষে তাদের সাথে গরীব-মিসকীনদের কথাও যুক্ত করে, তবে তা মুসলমান মিসকীন ও যিম্মী মিসকীন উভয়কে দেয়াই জায়েয হবে। আর যদি সে ওয়াক্ফের মধ্যে কেবল যিম্মী মিসকীনকেই নির্দিষ্ট করে, তবে তা ইয়াহুদী, নাসারা, মাজুসী সব মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করা যাবে। তবে যদি ওয়াক্ফকারী কোন বিশেষ শ্রেণী বা জাতির মিসকীনদের নির্দিষ্ট করে, তাহলে শুধু সেই শ্রেণী বা জাতির মিসকীনদেরই দেয়া জায়েয হবে। বন্টনকারী তাদের পরিবর্তে অন্য কাউকে দিলে সে দায়ী থাকবে। যদিও আমরা বলে থাকি যে, কাফিরগণ সব এক জাতি। আর যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি তার সন্তান, তার বংশধর, তারপর গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং তাতে এরূপ শর্ত রাখে যে, তার যে সন্তান মুসলমান হয়ে যাবে, সে এই ওয়াক্ফের বহির্ভূত হবে, তবে তার এই শর্ত লায়িম ও অনিবার্য গণ্য হবে। অনুরূপ ওয়াক্ফকারী যদি বলে যে, কেউ খৃস্টানদের মধ্য হতে বের হয়ে যদি অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে, তবে সে ওয়াক্ফের সাদাকা থেকে বের হয়ে যাবে, তাহলেও ঐ শর্ত লায়িম ও অনিবার্য হবে। ইমাম খাস্‌সাফ (র) সুম্পষ্টরূপে এটা বর্ণনা করেছেন (ফাতহুল কাদীর)।

৩. মাসআলা : ফাতওয়া আবুল লাইস (র) এ বর্ণিত আছে যে, জনৈক খৃস্টান তার সন্তানদের ও সন্তানদের সন্তানদের জন্য বংশ পরম্পরায় চিরদিনের জন্য এবং শেষে প্রচলন অনুযায়ী গরীবদের তার যমীন ওয়াক্ফ করে। এরপর তার সন্তানদের মধ্য হতে কেউ কেউ মুসলমান হয়ে গেল। এমতাবস্থায় ঐ মুসলমান ব্যক্তিদেরকেও ঐ ওয়াক্ফের সম্পদ দেয়া যাবে। (কেননা, ওয়াক্ফকারী এখানে কোন শর্ত আরোপ করেনি) (আল-মুহীত)।

ওয়াক্ফের আরেকটি শর্ত হলো, ওয়াক্ফের ক্ষেত্রটি সত্তাগতভাবে এবং ওয়াক্ফ করার সময় সাওয়াবের কাজ হতে হবে। সুতরাং কোন মুসলমান কিংবা যিম্মীর পক্ষে ইয়াহুদী বা খৃস্টানদের উপাসনালয়ের জন্য কিংবা হরবী গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করা শুদ্ধ হবে না (আন-নাহরুল ফায়িক)। কোন যিম্মী যদি তার গৃহ ইয়াহুদী বা খৃস্টান অথবা অগ্নিপূজকদের উপাসনালয়ের জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে তা বাতিল হবে (আল-মুহীত)। যদি তার মেরামত বা অন্যান্য খরচের জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে তাও বাতিল। আর যদি সে বলে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসকে বাতি দান কিংবা তার মেরামতের জন্য ওয়াক্ফ করেছে, তবে তা জায়িয় হবে। আর যদি সে বলে যে, ওয়াক্ফকৃত সম্পদের আয় দ্বারা প্রতিবছর গোলাম ক্রয় করে আযাদ করা হবে, তবে তার শর্ত অনুযায়ী ওয়াক্ফ জায়িয় হবে (আল-হাবী)। আর যদি সে বলে যে, ওয়াক্ফকৃত যমীনের ফসল অমুক মন্দির বা গির্জার জন্য ব্যয় করা হবে। তারপর ঐ মন্দির বা গির্জা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে ঐ

ফসল গরীব-মিসকীনদের জন্য হয়ে যাবে, তবে তার আয় উৎপাদন গরীব-মিসকীনদের জন্যই ব্যয় হতে থাকবে এবং উক্ত মন্দির-গির্জার জন্য কিছুই ব্যয় করা হবে না (আল-মুহীত)। আর যদি বলে যে, আমি কোন উত্তম বিষয়ের জন্য ওয়াক্ফ করলাম এবং তার দৃষ্টিতে উত্তম বিষয় হচ্ছে ইয়াহুদী-খৃস্টান ও অগ্নিপূজকদের গির্জা ও মন্দির মেরামত এবং গরীব মিসকীনকে সাহায্য করা, তবে এ ক্ষেত্রে গরীব মিসকীনকে সাহায্য করা জারী থাকবে এবং অন্যান্য বিষয়গুলো বাতিল করা হবে (আল-হাবী)। আর যদি কোন যিম্মী বলে যে, আমার ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় আমার প্রতিবেশীদের মধ্যে বন্টন করা হবে এবং তার প্রতিবেশীর মধ্যে যদি মুসলমান, খৃস্টান, ইয়াহুদী, অগ্নিপূজক থাকে এবং শেষে গরীবদের জন্যও ওয়াক্ফ করা হয়, তবে তা প্রত্যেক মুসলমান, খৃস্টান প্রভৃতি সকলের মধ্যেই বন্টন করা হবে। আর যদি যিম্মী ব্যক্তি এরূপ বলে যে, ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় দ্বারা মৃতদের দাফন-কাফন কিংবা তাদের কবর খননের কাজ করা হবে, তবে তা জায়েয হবে এবং এ ক্ষেত্রে ঐ আয় গরীব যিম্মীদের কাফন-দাফন ও কবর খননের কাজে ব্যয় করা হবে (আল-মুহীত)।

কোন যিম্মী মসজিদের অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করে তা মুসলমানদের মসজিদ রূপে ওয়াক্ফ করে দেয়, এবং তার অনুমতিক্রমে পতে নামাযও শুরু হয়ে যায়, আর এরপর ঐ ব্যক্তি মারা যায়, তবে এই গৃহটি তার ওয়ারিসদের জন্য মীরাস হবে। সকল ইমামই এই মত পোষণ করেন (জাওয়া হিরুল আখলাতী)।

যিম্মীর নিজ গৃহকে গির্জা, মন্দির বা অগ্নিপূজকদের উপাসনালয়রূপে ওয়াক্ফ করারও একই হকুম। ইমাম খাস্‌সাফ (র) তার ওয়াক্ফের বিবরণে এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র) তার যিয়াদাত কিতাবে এরূপ বর্ণনা করেছেন (আল-মুহীত)।

যদি কোন হরবী ব্যক্তি আমান নিয়ে দারুল ইসলামে আসে এবং সেখানে এসে কোন কিছু ওয়াক্ফ করে, তবে তার ঐ সব ওয়াক্ফ জায়েয হবে-যিম্মীদের ক্ষেত্রে যা জায়েয হয়ে থাকে (আল-হাবী)।

ওয়াক্ফের আরেকটি শর্ত এই যে, ওয়াক্ফ করার সময়ে ওয়াক্ফ কৃত সম্পদে ওয়াক্ফকারীর মালিকানা ও স্বত্বাধিকার থাকতে হবে। এমনকি কেউ যদি কারো নিকট থেকে যমীন জবরদখল করে ওয়াক্ফ করে দেয় এবং পরে মূল্য দিয়ে ঐ যমীনের মালিক থেকে তা ক্রয় করে কিংবা কোন কিছু দিয়ে মালিকের সাথে সন্ধি বা আপোষ করে নেয়, তবে এ যমীন ওয়াক্ফ হবে না (আল-বাহরুর রায়িক)।

কেউ যদি অন্যের যমীন নির্দিষ্ট কোন উত্তম কাজের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং পরে তার মালিক হয়ে যায় তবে ওয়াক্ফ জায়েয হবে না। কিন্তু যমীনের মালিক ওয়াক্ফ অনুমোদন করলে আমাদের মাযহাব মতে ওয়াক্ফ জায়েয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

কারো জন্য কোন জমির ওসীয়ত করা হল, আর ওসীয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাথে সাথে তা ওয়াক্ফ করে দিল। তারপর ওসীয়তকারীর মৃত্যু হল। তবে ঐ ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৪. মাসআলা : বিক্রেতার অনুকূলে ইচ্ছাধিকারের শর্তসহ যদি কোন জমি খরিদ করে, তার বিক্রেতা বিক্রি অনুমোদন করে তবে ওয়াক্ফ করলে তা জায়েয হবে না। আর যদি এরূপ শর্তে যমীন ক্রয় করে ওয়াক্ফ করে যে, আমার এই ক্রয় প্রত্যাহার করার ইচ্ছাতির রইল এবং তারপর যে উক্ত ইচ্ছাতির বাতিল করে দেয়, তবে ঐ ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে। আর যদি কেউ কাউকে কোন যমীন হেবা (দান) করে এবং যাকে হেবা করে, সে তা কব্জা করার পূর্বেই ওয়াক্ফ করে, তারপর সে ঐ যমীন কব্জা করে, তবে এই ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

আর যদি কাউকে ফাসিদ হেবা রূপে কোন যমীন হেবা করা হয় এবং সে তা হস্তগত করে ওয়াক্ফ করে দেয়, তবে ঐ ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে এবং তার উপর তার মূল্য ওয়াজিব হবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

আর কেউ যদি ফাসিদ ক্রয়ের মাধ্যমে কোন গৃহ ক্রয় করে এবং তা হস্তগত করে গরীব-মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে তা জায়েয হবে এবং যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়, তাদের জন্য সে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে এবং ক্রয়কারীর উপর বিক্রেতাকে মূল্য দেয়া ওয়াজিব হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। আর যদি উল্লিখিত যমীন কব্জা করার পূর্বে তা ওয়াক্ফ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না (আল-মুহীত)।

কোন ব্যক্তি যদি জায়েয ক্রয়ের মাধ্যমে কোন যমীন ক্রয় করে এবং তা কব্জা করা ও তার নগদ মূল্য দেয়ার পূর্বে তা ওয়াক্ফ করে দেয়, তখন সে ওয়াক্ফ স্থগিত থাকবে। তারপর যখন ক্রয়কারী তার মূল্য পরিশোধ করে তা কব্জা করে নিবে, তখন ওয়াক্ফ জায়েয হবে। আর যদি ক্রেতা ঐ অবস্থায় মারা যায় এবং কোন সম্পদ না রেখে যায়, তখন ঐ যমীন বিক্রয় করা হবে এবং ঐ ওয়াক্ফ বাতিল করা হবে। ফকীহ আবুল লাইস (র) বলেন যে, আমরা এ মত গ্রহণ করেছি (আয-যখীরা)।

কেউ যদি কোন ওয়াক্ফকৃত সম্পদের উপর নিজের অধিকার প্রমাণ করতে পারে, তবে তার ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। যদি ক্রেতার ক্রয়কৃত যমীনের ওয়াক্ফের পর ঐ যমীনের কোন শফী অর্থাৎ শরীকী ব্যক্তি এসে তার শোফা বা শরীকী অধিকার দাবী করে, তবে ঐ ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে (আন-নাহরুল ফায়িক)।

ওয়াক্ফ করার সময় ওয়াক্ফ সম্পদের মালিক হওয়ার শর্ত সম্পর্কিত আরো কিছু মাসআলা নিম্নে বর্ণিত হলো।

কেউ যদি জাগীর তথা প্রশাসক কর্তৃক প্রাপ্ত যমীন ওয়াক্ফ করে, তবে তা জায়েয হবে না। কিন্তু যদি তা মৃত যমীন হয় কিংবা ওয়াক্ফকারীকে ঐ যমীনের পূর্ণ মালিক বানিয়ে দেয়া হয় এবং সে তা কাউকে দাগ করে, তবে তা জায়েয হবে। যদি ইমাম মসজিদ সংশ্লিষ্ট কোন হাউয়ের যমীন কাউকে ওয়াক্ফ করে, তবে তা জায়েয হবে না। কেননা, ইমাম তার মালিক নন। হাউয়ের যমীন বলা হয় ঐ যমীনকে, যার মালিক তার চাষবাস করতে এবং তার খায়না দিতে অক্ষম হয় আর সে তা ইমামকে দিয়ে দেয় যাতে তার মুনাফা ঐ খাজনার ক্ষতিপূরণ করে (আল-বাহরুর রায়িক)।

৬. মাসআলা : অনুরূপ ভাবে কোন মুরতাদ যদি তার মুরতাদ অবস্থায় তার অধিকৃত সম্পদ ওয়াক্ফ করে, তা জায়েয হবে না যদি মুরতাদ অবস্থায় সে নিহত হয় কিংবা মৃত্যুবরণ করে। কেননা, মুরতাদ হওয়ার ফলে তার মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল (আন-নাহরুল ফায়িক)। যদি সে দারুল হরবে চলে যায় এবং কাযী তাকে চলে যাবার নির্দেশ দেন, তাহলেও অনুরূপ বিধান (আল-মুহীত)।

মুরতাদ ব্যক্তি যদি পুনরায় মুসলমান হয়, তবে তার ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে (আল-বাহরুর রায়িক)। কোন মুসলমান মুরতাদ হয়ে গেল ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম খাস্‌সাফ (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন (আন-নাহরুল ফায়িক)। এবং সে সম্পত্তি মীরাস হয়ে যাবে। সে মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড লাভ করুক, কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুক কিংবা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করুক। হাঁ, মুসলমান হয়ে পুনঃওয়াক্ফ করলে জায়েয হবে। ইমাম খাস্‌সাফ (র) তাঁর কিতাবের উপসংহারে এরূপ বর্ণনা করেছেন। মুরতাদ নারীর ওয়াক্ফ শুদ্ধ। কেননা, নারীকে কতল করা হয় না (আল-বাহরুর রায়িক)।

কেউ যদি ওয়াক্ফ করে তার বংশধরের জন্য, তারপর গরীব মিসকীনের জন্য, তারপর সে মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তার ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, গরীব মিসকীনের দিকটি বাতিল হয়ে যাবে এবং তা তার বংশধরের জন্য সাদাকা হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা : কোন মেয়াদে জমি ইজারা দিল, এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার শর্তে ঐ জমি ওয়াক্ফ করল, এ ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকে ওয়াক্ফ কার্যকর হবে। অনুরূপ ভাবে কেউ যদি নিজের যমীন রেহেন বা বন্ধক রাখে এবং বন্ধক হতে মুক্ত করার পূর্বেই তা ওয়াক্ফ করে, তবে ওয়াক্ফ অনিবার্য হবে। কিন্তু তাতে তা বন্ধক মুক্ত হবে না। যদি কয়েক বছর পর্যন্ত তা বন্ধক গ্রহীতার নিকট থাকে, তারপর বন্ধকদাতা বন্ধকমুক্ত করে তা ফিরিয়ে আনে, তখন হতে তার উপর ওয়াক্ফের আদেশ জারী হবে। আর যদি বন্ধকদাতা বন্ধকমুক্ত করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত্যুকালে সে এ পরিমাণ সম্পদ রেখে যায়, যা দ্বারা ঐ সম্পদ বন্ধকমুক্ত করা যায়, তবে সেই সম্পদ দ্বারা তা বন্ধকমুক্ত করা হবে এবং তখন হতে তার উপর ওয়াক্ফের বিধান জারী হবে। আর যদি ঐ পরিমাণ সম্পদ না রেখে সে মৃত্যুবরণ করে, তবে ঐ যমীন বিক্রি করা হবে এবং ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। আর ইজারা দেয়া অবস্থায় যদি ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতার মধ্যে কোন একজন মারা যায়, তবে ইজারা বাতিল হয়ে গিয়ে ঐ যমীন ওয়াক্ফ হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)।

৮. মাসআলা : ওয়াক্ফের আরেকটি শর্ত হলো নির্বোধ হওয়া এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া কারণে ওয়াক্ফকারীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হওয়া। ইমাম খাস্‌সাফ (র) মোটামুটি এরূপই বর্ণনা করেছেন (আন-নাহরুল ফায়িক)। আর যদি নির্বোধ হওয়ার কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপের অবস্থায় ওয়াক্ফকারী তার নিজের পক্ষে এমন কোন নেক কাজের জন্য ওয়াক্ফ করে, যা সর্বদা জারী থাকে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে উক্ত ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে এবং মুহাক্কিকগণও এরূপ মত পোষণ করেন। আর কোন শাসক যদি এ ওয়াক্ফ শুদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন, তবে সকলই ইমামের মতেই তা শুদ্ধ হবে (ফাতহুল কাদীর)।

ওয়াক্ফের আরেকটি শর্ত হলো, ওয়াক্ফ করার সময় ওয়াক্ফ সম্পত্তি অজ্ঞাত না থাকা। সুতরাং কেউ যদি চৌহদ্দি ও পরিচয়, উল্লেখ না করে তার যমীন ওয়াক্ফ করে তবে ওয়াক্ফ বাতিল হবে। আর যদি কেউ কোন গৃহের তার নিজের সম্পূর্ণ অংশ ওয়াক্ফ করে এবং নিজের অংশের পরিমাণ উল্লেখ না করে, তবে তা ইস্তিহসান বা সূক্ষ্ম না মতে জায়েয হবে। আর কেউ যদি এরূপ বলে যে, আমি আমার এই যমীন বা এই যমীন ওয়াক্ফ করলাম এবং সে তার ওয়াক্ফকের উত্তম কারণসমূহও উল্লেখ করে, তবে ওয়াক্ফ বাতিল হবে (আল-বাহরুর রায়িক)। ইমাম খাস্‌সাফ (র) বলেন, যদি এরূপ ওয়াক্ফ করে যে, আমি আমার এই সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্তে চিরদিনের জন্য সাদাকায়ে মাওকুফাহ করে দিলাম কিংবা নিজের কারাবাতের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে ওয়াক্ফকারীর সন্দেহের কারণে ওয়াক্ফ বাতিল হবে। অনুরূপ ভাবে যদি সে বলে যে আমি তা আল্লাহর ওয়াস্তে চিরদিনের জন্য যায়দের উপর কিংবা আমার উপর এবং তারপর মিসকীনদের উপর সাদাকায়ে মাওকুফাহ করে দিলাম, তবে তাও বাতিল হবে (আল-মুহীত)। কেউ যদি কোন বৃক্ষপূর্ণ যমীন ওয়াক্ফ করে এবং তার বৃক্ষসমূহ ওয়াক্ফ থেকে বাদ রাখে, তবে এই ওয়াক্ফ বাতিল হবে। কেননা, বৃক্ষসমূহ ওয়াক্ফ মুক্ত রাখায় এই বৃক্ষ সংযুক্ত যমীনও ওয়াক্ফমুক্ত হয়ে যায়, যার দরুন ওয়াক্ফ কৃত যমীনের পরিমাণ অস্পষ্ট হয়ে যায় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

ওয়াক্ফের আরেক শর্ত হলো ওয়াক্ফকে কোন শর্তের সাথে যুক্ত না করা। সুতরাং কেউ যদি বলে যে, যদি আমার পুত্র আসে, তবে আমার এই গৃহ মিসকীনদের জন্য সাদাকায়ে মাওকুফাহ। তারপর তার পুত্র এলো। কিন্তু তাতে ওয়াক্ফ হবে না (ফাতহুল কাদীর)। ইমাম খাস্‌সাফ (র) তাঁর কিতাবের ওয়াক্ফ অধ্যায়ে লিখেন, কেউ যদি বলে যে, আগামী দিন এলে আমার এই যমীন সাদাকায়ে মাওকুফাহ হবে, তবে তা বাতিল হবে (আল-মুহীত)। অনুরূপ কেউ যদি বলে যে, আমার এই যমীন ওয়াক্ফ স্বরূপ সাদাকা যদি আমি চাই বা পসন্দ করি বা রাখী থাকি, তবে এই ওয়াক্ফ বাতিল হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

কেউ যদি বলে যে, আমার এই যমীন ওয়াক্ফ স্বরূপ সাদাকা যদি আমি চাই। তারপর বললো যে, আমি চাইলাম তবে ওয়াক্ফ বাতিল হবে। আর যদি বলে যে, আমি চাই এবং আমি তা সাদাকায়ে মাওকুফাহ করে দিলাম, তবে সাথে সাথে বলার দরুন এ ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি বলে যে, আমার এই যমীন সাদাকায়ে মাওকুফাহ যদি অমুক ব্যক্তি চায় এবং সেই ব্যক্তি বললো যে, আমি চাই, তবে ওয়াক্ফ বাতিল হবে (আল-মুহীত)।

কেউ যদি বলে যে, যদি এই গৃহে আমার অধিকার থাকে, তবে তা সাদাকায়ে মাওকুফাহ। তবে দেখতে হবে যে, যদি তার এই কথা বলার সময়ে এই গৃহে তার অধিকার থেকে থাকে, তবে তার ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

কোন ব্যক্তির কোন সম্পদ হারিয়ে গেল, তখন সে বললো, যদি আমি তা ফিরে পাই, তবে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার এই যমীন ওয়াক্ফ করে দেয়া আমার উপর ওয়াজিব হবে। তারপর সে

তার উক্ত হারানো সম্পদ ফিরে পেলো, তখন তার উপর তার এই যমীন এমন লোকদের জন্য ওয়াক্ফ করা ওয়াজিব হবে, যাদেরকে যাকাতের মাল দেয়া জায়েয। আর যদি তা এমন লোকদের জন্য ওয়াক্ফ করে, যাদেরকে যাকাতের মাল দেয়া জায়েয নয়, তবে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে কিন্তু তার মান্নত আদায় হবে না, বরং তার উপর তার মান্নত ওয়াজিব থেকে যাবে (আস সিরাজিয়া)।

কেউ যদি বলে যে, যখন অমুক ব্যক্তি আসবে, কিংবা যখন আমি অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলবো, তখন আমার এই যমীন ওয়াক্ফ স্বরূপ সাদাকা হবে। এ ক্ষেত্রে তা অনিবার্য হবে এবং তা কসম ও মান্নতের অনুরূপ হবে। শর্ত পাওয়া গেলে তার উপর এই যমীন সাদাকাহ করা ওয়াজিব হবে কিন্তু তা ওয়াক্ফ হবে না (আল-মুহীত)।

এক ব্যক্তি বললো, যদি আমি আমার এই রোগে মারা যাই, তবে আমি আমার এই যমীন ওয়াক্ফ করে গেলাম। এই ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে না। চাই সে মারা যাক বা আরোগ্য লাভ করুক। আর কেউ যদি বলে যে, যদি আমি আমার এই রোগে মৃত্যুবরণ করি, তবে তোমরা আমার এই যমীন ওয়াক্ফ করে দিবে, তা জায়েয হবে। এ দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য হলো, দ্বিতীয় অবস্থায় ওয়াক্ফ করার জন্য উকীল নিযুক্ত করা হয়েছে এবং মৃত্যুর সাথে উকীল নিযুক্তিকে শর্তযুক্ত করা জায়েয (আল-জাওহারা তুন নায়ারা)।

ওয়াক্ফের আরেক শর্ত হলো, ওয়াক্ফের সাথে ওয়াক্ফকৃত সম্পদ বিক্রয়ের এবং নিজের প্রয়োজনে তার মূল্য খরচ করার শর্ত আরোপ না করা। যদি তা করে তবে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে না। এটাই পসন্দনীয় মত। আল বায়যাযিয়া কিতাবে এরূপ বর্ণিত আছে (আন-নাহরুল ফায়িক)।

ওয়াক্ফের আরেক শর্ত হলো, ওয়াক্ফের সাথে ইচ্ছাধিকারের শর্ত সংযুক্ত না হওয়া। এরূপ শর্তে ওয়াক্ফ করলে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে না ইচ্ছাধিকারের মেয়াদ বা অজ্ঞাত যাই হোক। হিলাল (র)ও এই মত গ্রহণ করেছেন (আল-বাহরুর রায়িক)। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ওয়াক্ফকারীর জন্য তিন দিনের খিয়ার বৈধ। আবুল মুকারিম কৃত শরহে নিকায়্যা কিতাবে এরূপ লিখিত আছে।

কেউ যদি বলে যে, আমি আমার খিয়ার বাতিল করে দিলাম, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উক্ত ওয়াক্ফ বৈধতায় পরিবর্তিত হবে না। ইমাম হিলাল (র) তাঁর ওয়াক্ফের বিবরণ এরূপ উল্লেখ করেছে (আয-যখীরা)। আন নাওয়াযিল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, কেউ যদি মসজিদ বানিয়ে বলে যে, আমার তিন দিনের খিয়ার আছে, তবে মসজিদ হওয়া বৈধ হবে এবং খিয়ারের শর্ত বাতিল হয়ে যাবে (তাতার খানিয়া)।

ওয়াক্ফের আরেক শর্ত হলো, তা চিরদিনের জন্য হওয়া। এটি সর্বসম্মত শর্ত। তবে একথা ওয়াক্ফ করার সময় উল্লেখ করা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে শর্ত নয়। আর এটাই বিগত মত (আল-কাফী)।

১০. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার নিজ গৃহ একদিন বা এক মাস কিংবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওয়াক্ফ করলো এবং এর বেশী কিছু বললো না, তার ওয়াক্ফ বৈধ হবে এবং এ ওয়াক্ফ চিরদিনের জন্য হবে। কেউ যদি বলে যে, আমার এই যমীন এক মাসের জন্য ওয়াক্ফ করলাম। একমাস পর ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। এরূপ ওয়াক্ফ ইমাম হিলাল (র)-এর মতে ওয়াক্ফ করার সময়ই বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, চিরদিনের জন্য ওয়াক্ফ না করলে সে ওয়াক্ফ বৈধ হয় না। সুতরাং চিরদিনের জন্য হওয়া যখন ওয়াক্ফের অনিবার্য শর্ত, তখন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওয়াক্ফ করা বৈধ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : একজন বলল, আমার এই যমীন আমার মৃত্যুর পর একবছর পর্যন্ত ওয়াক্ফ স্বরূপ সাদাকা হবে, এর বেশী কিছু বলল না। তবে তা গরীবদের জন্য স্থায়ী ওয়াক্ফ হবে। কেননা, এর মধ্যে ওসিয়তের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে (মুহীত : আস-সারাখসী)। আর যদি বলে যে, আমার এই যমীন আমার মৃত্যুর পর অমুকের জন্য এক বছরের জন্য ওয়াক্ফ মাওকুফাহ থাকবে, এক বছর অতীত হওয়ার পর ওয়াক্ফ হয়ে যাবে, তবে ঐ যমীন তার মৃত্যুর পর ওসীয়ত হিসাবে এক বছর পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির নিকটে থাকবে এবং তারপর তা গরীব-মিসকীনদের জন্য ওসীয়ত হয়ে যাবে আর তার ফসল তাদের মধ্যে বন্টিত হবে। আর কেউ যদি বলে যে, আমরা এই যমীন আমার মৃত্যুর পর অমুকের উপর এক বছরের জন্য ওয়াক্ফ করা হলো এবং এর বেশী কিছু না বলে, তবে এক বছর ঐ যমীনের ফসল ঐ ব্যক্তির জন্য হবে এবং এক বছর অতীত হলে তা ওয়াক্ফকারী ব্যক্তির ওয়ারিসদের হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা : ওয়াক্ফের আরেক শর্ত হলো, ওয়াক্ফকৃত যমীনের ফসল ও আয় যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়, চিরদিন তারাই ভোগ করবে, তা কখনো বন্ধ হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এটি একটি শর্ত। সুতরাং এটি উল্লেখ না করলে তাঁদের মতে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এটি শর্ত নয়। সুতরাং এটি উল্লেখ না করলেও তাঁর মতে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে। বরং যে কথা দ্বারা ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে এবং ওয়াক্ফ বাতিল হওয়ার পর তা গরীবদের জন্য হয়ে যাবে যদিও ওয়াক্ফ করার সময় তাদের কথা উল্লেখ না করা হয়। কেননা, ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য হলো ওয়াক্ফকৃত বস্তুর আয় গরীবদের জন্য হওয়া যদিও তা উল্লেখ না করা হয়। মোট কথা, এ শর্তের উল্লেখ অবস্থা ও বিষয়ের দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় (আল-বাদায়ে)।

ওয়াক্ফের আরেক শর্ত হলো, তা স্থাবর সম্পত্তি (যমীন, গৃহ) হওয়া। কোন অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে না। তবে ঘোড়া, উট, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি বাহন জন্তু ও অস্ত্রশস্ত্র ওয়াক্ফ করা যাবে (আন-নিহায়া)।

অনুচ্ছেদ : যে সব বাক্যে ওয়াক্ফ করা পূর্ণ হয় এবং যেসব বাক্যে ওয়াক্ফ করা পূর্ণ হয় না তার বিবরণ।

১. মাসআলা : কেউ যদি বলে যে, আমার এই যমীন আমার জীবিতাবস্থায় ও আমার মৃত্যুর পর মুক্ত রূপে, স্থায়ী রূপে সাদাকা কিংবা যদি বলে যে, আমার এই যমীন আমার জীবিতাবস্থায় ও আমার মৃত্যুর পর ওয়াক্ফস্বরূপ, আবদ্ধস্বরূপ স্থায়ীরূপে সাদাকা সমস্ত ইমামের মতেই এ ওয়াক্ফ গরীবদের জন্য জায়েয ও লাযিম হবে (আল-মুহীত)। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঐ ব্যক্তি যত দিন জীবিত থাকবে, ততদিন তার উক্ত যমীনের আয় সাদাকা করার মান্নত হবে। কাজেই তা তার উপর পুরা করা ওয়াজিব হবে এবং ওসীয়তের মর্মানুযায়ী তা তার প্রত্যাহারের ইচ্ছার থাকবে। কেননা, তার উক্তি 'আমার মৃত্যুর পরে' দ্বারা ওসীয়ত বুঝা যায়। ওসীয়তকারী যদি তার ওসীয়ত প্রত্যাহার না করে, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা তা বৈধ হবে (আয-যহীরিয়া)।

২. মাসআলা : যদি কেউ বলে সাদাকার মাওকুফাহ মুয়াক্কাদাহ, তবে সাধারণ আলিমদের মতে তা জায়েয হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঐ যমীনের আয় সাদাকা করার মান্নত হবে এবং ওয়াক্ফকারীর মালিকানা স্বত্ব বহাল থাকবে। সুতরাং তার মৃত্যুর পর ঐ যমীন তার ওয়ারিসদের জন্য মীরাস হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

যদি কেউ বলে যে, আমার এই যমীন সাদাকায়ে মাওকুফাহ কিংবা সাদাকায়ে মাহবুসাহ অথবা সাদাকায়ে হাবীসাহ এবং মুয়াক্কাদাহ বা চিরদিনের জন্য না বলে, তবে সাধারণ আলিমদের মতে ওয়াক্ফ জায়েয হয়ে যাবে। কেননা, সাদাকা চিরদিনের জন্যই হয়ে থাকে। তা রহিত হওয়ার অবকাশ থাকে না। ইমাম খাস্‌সাফ (র) ও বস্‌রাবাসিগণ বলেন যে, এতে ওয়াক্ফ হবে না। কেননা, ওয়াক্ফ চিরদিনের স্থায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত। আর যদি কেউ বলে যে, আমার এই যমীন মিসকীনদের জন্য সাদাকায়ে মাওকুফাহ, তবে সর্বসম্মত ভাবে ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। কেননা, মিসকীনদের উল্লেখই চির-স্থায়িত্বের উল্লেখ বুঝা যায় (আল-মুহীত)। আর কেউ যদি বলে যে, আমার এই যমীন সাদাকায়ে মাওকুফাহ কোন পুণ্যের পথে কিংবা কল্যাণের পথে অথবা পুণ্য ও কল্যাণের পথে, তবে এ ওয়াক্ফ বৈধ হবে (আল-ওয়াজীয)।

৩. মাসআলা : কেউ যদি 'সাদাকা' শব্দটি উল্লেখ না করে কিন্তু 'ওয়াক্ফ' শব্দটি উল্লেখ করে এবং বলে যে, আমার এই যমীন ওয়াক্ফ, অথবা বলে যে, আমি আমার এই যমীন ওয়াক্ফ করে দিয়েছি, কিংবা বলে যে, আমার এই যমীন মাওকুফাহ বা ওয়াক্ফকৃত। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে গরীবদের জন্য তা ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। শায়খ সাদরে শহীদ (র) বলেন, বলখের শায়খগণ ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী ফাতওয়া দিয়ে থাকেন এবং আমরাও প্রচলন অনুযায়ী ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে ফাতওয়া দিয়ে থাকি। এটা তখন হয়, যখন ঐ ব্যক্তি 'ফকীর' বা 'গরীব' শব্দ উল্লেখ না করে। আর যদি

উল্লেখ করে এবং বলে যে, আমার এ যমীন ফকীরদের বা গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ বা মাওকুফাহ, অথবা আমি ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ওয়াক্ফ হবে। অনুরূপ ইমাম হিলাল (র)-এর মতেও ওয়াক্ফ হবে। কেননা, ফকীর বা গরীব শব্দটি উল্লেখ করার দরুন অন্য কিছু সম্ভাবনা থাকে না (আল-খুলাসা)। আর যদি বলে যে, আমার এই যমীন আল্লাহর ওয়াস্তে সর্বদার জন্য ওয়াক্ফকৃত, তবে তা জায়েয হবে। যদিও সাদাকা শব্দ উল্লেখ না করা হয় এবং এটা মিসকীনদের জন্য সাদাকা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর যদি শুধু ওয়াক্ফ শব্দ উল্লেখ করা হয় কিংবা তার সাথে হাবস বা আবদ্ধ শব্দও উল্লেখ করা হয়, তবে পসন্দনীয় মত অনুযায়ী তাতে ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। আর এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত (আল গিয়াছিয়া)। কেউ যদি বলে যে, আমি আমার এই যমীন হারাম করে দিয়েছি কিংবা আমার এই যমীন হারাম করা হয়েছে, তবে ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এ কথা মাওকুফাহ বলার অনুরূপ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা : আর যদি কেউ বলে যে, আমার এই যমীন মাওকুফাহ বা ওয়াক্ফকৃত অমুকের জন্য, কিংবা আমার সন্তানের জন্য, কিংবা আমার নিকটবর্তী গরীবদের জন্য, যাদের সংখ্যা সীমিত, অথবা আমার নিকটবর্তী ইয়াতীমদের জন্য এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য উক্ত যমীনকে আবদ্ধ করা নয়, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ওয়াক্ফ হবে না। কেননা, সে এমন ব্যক্তিদের জন্য ওয়াক্ফ করেছে, যারা শেষ হয়ে যাবে, চিরদিন থাকবে না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে। কেননা তাঁর মতে যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়, তার চিরদিন বিদ্যমান থাকা শর্ত নয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৫. মাসআলা : আর যদি বলে যে, আমার এই যমীন বা গৃহ সাদাকায়ে মাওকুফাহ অমুকের জন্য, কিংবা অমুকের সন্তানদের জন্য, তবে তার আয় যতদিন তারা জীবিত থাকবে, তাদের জন্যই হবে এবং তাদের মৃত্যুর পর ফকীরদের জন্য হবে (আল-ওয়াজীয : কারদারী)। আর যদি বলে যে, আমার এই যমীন আল্লাহর ওয়াস্তে সাদাকা কিংবা আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াক্ফকৃত কিংবা আল্লাহর ওয়াস্তে সাদাকায়ে মাওকুফাহ, তবে তা ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। চাই চিরদিনের জন্য কথাটি উল্লেখ করুক বা না করুক (মুহীত : আস-সারাখসী)।

অনুরূপভাবে যদি বলে যে, আল্লাহর জন্য এটি সাদাকায়ে মাওকুফাহ কিংবা আল্লাহর সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে এটি সাদাকায়ে মাওকুফাহ, তবে তার বিধানও উক্তরূপ (আয-যাখীরা)।

কেউ যদি বলে যে, আমার যমীন কল্যাণ ও নেকীর জন্য ওয়াক্ফকৃত, তবে তা জায়েয হবে কেননা, তার এ কথা আমার যমীন সাদাকায়ে মাওকুফাহ বলার অনুরূপ (আয-যহীরিয়া)।

৬. মাসআলা : আর যদি বলে যে, আমার এই যমীন রাস্তার জন্য, তবে এরূপ কথা যদি এমন শহরে হয়, যে খানকার লোকজন ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে এরূপ কথা ব্যবহার করে, তবে ঐ যমীন ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। আর যদি সেখানকার লোকজন ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে এরূপ কথা ব্যবহার না করে, তবে বজার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সে যদি ওয়াক্ফের নিয়্যত করে, তবে

ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। আর যদি সাদাকার নিয়্যত করে কিংবা কোন কিছুর নিয়্যত না করে, তবে তা মান্নত হবে। সুতরাং ঐ যমীন কিংবা তার মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে। অনুরূপ ভাবে যদি কেউ বলে যে, আমি আমার যমীন ফকীরদের জন্য নির্ধারণ করলাম, তবে দেখতে হবে যে, এরূপ কথা ঐ শহরের ওয়াক্ফ অর্থে ব্যবহৃত হয় কিনা। যদি ব্যবহৃত হয়, তবে ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। আর যদি ব্যবহৃত না হয়, তবে দেখতে হবে তার নিয়্যত কি ছিল। ওয়াক্ফের নিয়্যত করে থাকলে ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। আর সাদাকার নিয়্যত করলে কিংবা কোন কিছুর নিয়্যত না করলে সাদাকার মান্নত সাব্যস্ত হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। আর যদি বলে যে, আমার এ যমীন রাস্তা, তবে ওয়াক্ফ হবে না। কিন্তু বজা যদি এমন কোন শহরের অধিবাসী হয়, যেখানকার লোকগণ এরূপ কথার দ্বারা শর্তাবলীসহ স্থায়ী ওয়াক্ফের অর্থ গ্রহণ করে, তবে তাতে ওয়াক্ফ হবে (আস-সিরাজিয়া)।

৭. মাসআলা : আর যদি কেউ বলে যে, আমার এই গৃহ মসজিদের ইমামের জন্য। কিংবা নামায রোযার জন্য নির্ধারণ করলাম, তবে তাতে ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। যদিও তাতে নামায রোযা আদায় না হয় (আল-বাহরুর রাযিক)। আর যদি বলে যে, আমার এই গৃহ আমার মৃত্যুর পর অমুক মসজিদের রাস্তা হবে, তবে এতে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে। যদি তা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা হয় এবং মসজিদটি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। অন্যথায় নয় (আল-কিনুয়া)। আর যদি বলে যে, আমি আমার এই হুজরাটি মসজিদে বাতি জ্বালানোর তেলের জন্য নির্ধারণ করলাম এবং এর বেশী কিছু না বলে, তবে ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন, উক্ত হুজরা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ হয়ে যাবে যদি তা মুতাওয়াল্লীকে সমর্পণ করা হয় এবং এর উপরই ফাতওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

কোন ব্যক্তি যদি রুগ্ন অবস্থায় বলে যে, আমার এই গৃহের আয় দ্বারা প্রত্যেক মাসে দশ দিরহাম মূল্যের রুটি খরিদ করে মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করবে, তবে উক্ত গৃহ ওয়াক্ফ হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

আন-নাওয়াযিল কিতাবে লিখিত আছে, যদি কেউ বলে যে, আমি আমার এই চার দেয়াল বেষ্টিত আঙ্গুর বাগানটি ওয়াক্ফ করলাম, তবে তা ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। তখন ঐ বাগানে আঙ্গুর থাক বা না থাক। অনুরূপভাবে যদি বলে যে, আমি এর আয় ওয়াক্ফ সাব্যস্ত করলাম, তবে ওয়াক্ফ হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)।

আর যদি বলে যে, আমি এটি আমার মৃত্যুর পর ওয়াক্ফ করলাম, কিংবা ওসীয়ত করে যে, আমার মৃত্যুর পর ওয়াক্ফ করবে, তবে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে এবং এ ওয়াক্ফ হবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে (আত-তাহযীব)। হিলাল (র)-এর ওয়াক্ফের বিবরণে বর্ণিত আছে, যদি কেউ ওসীয়ত করে যে, তার মৃত্যুর পর তার এক-তৃতীয়াংশ যমীন আল্লাহর ওয়াস্তে চিরদিনের জন্য ওয়াক্ফ করে দিবে, তবে তার এই ওসীয়ত ফকীরদের জন্য ওয়াক্ফ হবে (আল-মুহীত)। আর যদি কেউ বলে যে, আমার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ ওয়াক্ফ এবং এর বেশী কিছু না বলে, তাহলে আবু নাসর (র) বলেন, তার সম্পদ যদি নগদ অর্থ হয়, তবে এ ওয়াক্ফ বাতিল হবে। আর যদি যমীন হয়, তবে ওয়াক্ফ ফকীরদের জন্য জায়েয হবে। কেউ কেউ

বলেন, ফাতাওয়া এর উপর যে, যদি মাসরাফ বা খরচের খাত বর্ণনা না করা হয়, তবে ওয়াক্ফ জায়েয হবে না (আল-ওয়াজীয)। আল ফাতাওয়া কিতাবে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি বললো যে, আমার এই যমীন সাদাকা। তার একথা তার যমীন সাদাকা করে দেয়ার মান্নত হবে। যদি এই মূল যমীন কিংবা এর মূল্য ফকীরদের সাদাকা করা হয়, তবে তা জায়েয হবে এবং তার মান্নত আদায় হবে (আল-খুলাসা)। আর যদি বলে যে, আমি আমার এই যমীন মিসকীনদের জন্য সাদাকা করেছি, তবে ওয়াক্ফ হবে না, বরং তা মান্নত হবে। মূল যমীন তার মূল্য সাদাকা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। সে যদি তা করে, তবে সে তার মান্নত থেকে মুক্ত হবে। অন্যথায় তা তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসদের জন্য মীরাস হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)। কাযী তাকে সাদাকা করার জন্য বাধ্য করবে না। কেননা, এটি মান্নতের অনুরূপ (আর মান্নত আদায়ের জন্য বাধ্য করা যায় না) (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

আর যদি বলে যে, আমার এই যমীন নেকী ও সাওয়াবের রাস্তায় সাদাকা তবে এটি ওয়াক্ফ হবে না। বরং মান্নত হবে (আয যাহীরিয়া)।

৮. মাসআলা : কোন ব্যক্তি বললো, আমি আমার এই গৃহের আয় মিসকীনদের জন্য নির্ধারণ করলাম। তবে এটা উক্ত গৃহের আয় মিসকীনদের জন্য সাদাকা করার মান্নত হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর যদি বলে যে, আমি আমার এই গৃহ মিসকীনদের জন্য নির্ধারণ করলাম, তবে পরিভাষায় এটা তার উক্ত গৃহ মিসকীনদের জন্য সাদাকা করার মান্নত হবে (আল ফাতাওয়া আস-সুগরা)।

আর যদি বলে যে, এটা সাদাকা, বিক্রি করা যাবে না, তবে এটা সাদাকার মান্নত হয় ওয়াক্ফ হবে না। আর যদি এর সাথে বাড়িয়ে বলে যে, হেবা করা যাবে না এবং মীরাস হবে না, তবে মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ হবে (আল-বাহরুর রাযিক)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যা ওয়াক্ফ করা জায়েয ও যা ওয়াক্ফ করা জায়েয নয় এবং ইজমালী সম্পত্তি ওয়াক্ফ করার বিবরণ

স্বাবর সম্পত্তি যেমন যমীন, বাড়ি ঘর ও দোকান ওয়াক্ফ করা জায়েয (আল-হাবী)। অনুরূপ যে সব অস্বাবর বস্তু স্বাবর সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত, তাও তার সাথে ওয়াক্ফ করা জায়েয। যেমন, কোন যমীনের সাথে যমীন চাষের শ্রমিক, বলদ, হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি ওয়াক্ফ করা হলে তা শুদ্ধ হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

ইমাম খাসসাফ (র) বলেন, যদি কেউ কোন যমীন ওয়াক্ফ করে এবং তার সাথে শ্রমিক থাকে, যারা ঐ যমীনে কাজ করে, তবে তাদের নাম ও সংখ্যাও উল্লেখ করতে হবে। অনুরূপ ভাবে ঐ যমীন চাষের যদি বলদ থাকে, তবে তাও উল্লেখ করবে এবং তার সংখ্যাও উল্লেখ করবে আর সাদাকার মধ্যে এরূপ শর্ত করবে যে, যমীনের শ্রমিক ও বলদ ইত্যাদির খরচ ঐ যমীনের আয় দ্বারা নির্বাহ করা হবে (আয-যাখীরা)।

১. মাসআলা : আল আসআফ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি তাদের ব্যয় নির্বাহ উক্ত যমীনের আয় দ্বারা করার শর্ত করা হয়, তার পর যদি তাদের মধ্যে কেউ রুগ্ন বা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে ঐ অবস্থায়ও সে ঐ যমীনের আয় থেকে তার ভরণ-পোষণ পাবে। এমন কি যতদিন সে জীবিত থাকবে, তার জন্য এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। আর যদি সে বলে যে, এই যমীনে সে কাজ করলে তার কাজের বিনিময়ে এই যমীনের আয় থেকে তার ভরণ-পোষণের খরচ পাবে এবং এমতাবস্থায় ঐ শ্রমিক উক্ত যমীনের কাজ না করে বেকার থাকে, তবে ঐ যমীনের আয় থেকে তার ভরণ-পোষণের খরচ পাবে না (আল-বাহরুর রাযিক)। আর যদি শ্রমিক (ভূমিদাস) দুর্বল হয়ে যমীনে কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে মুতাওয়াল্লীর ইখতিয়ার থাকবে যে, তাকে বিক্রয় করে সেই মূল্য দ্বারা অপর একটি ভূমিদাস ক্রয় করবে, যে তার স্থলে কাজ করবে। কিন্তু যদি ঐ মূল্যে অন্য কোন ভূমিদাস ক্রয় করা না যায় এবং তিনি চান যে, ঐ মূল্যের সাথে যমীনের আয় থেকে কিছু অর্থ পুরিয়ে অন্য ভূমিদাস খরিদ করবে, তাতে কোন দোষ হবে না। অনুরূপ যেসব জন্তু বা যন্ত্রপাতি যমীনের সাথে ওয়াক্ফ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যদি কোন কিছু অকেজো বা অকর্মা হয়ে যায়, তবে তার পরিবর্তে অন্য একটি নিয়োগ করার ক্ষেত্রেও একই বিধান কার্যকর হবে। ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী এরূপ করতে পারেন (আয-যাখীরা)। ওয়াক্ফকৃত ভূমিদাসদের মধ্যে যদি কেউ নিহত হয় এবং তার দিয়াত (মৃত্যুপণ) আদায় করা হয়, তবে মুতাওয়াল্লীর ইখতিয়ার থাকবে তা দ্বারা নিহত ভূমিদাসের স্থলে অন্য ভূমিদাস খরিদ করা (ফাতহুল কাদীর)।

আল-আস্‌আফ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ভূমিদাসদের মধ্যে কেউ যদি কোন অপরাধ করে এবং তার ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয়, তবে অপরাধী ভূমিদাসকে সমর্পণ করা কিংবা তার ফিদিয়া (উদ্ধার মূল্য) দেয়ার মধ্যে যেটি মুতায়ালী উত্তম মনে করবেন, সেটি তার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি তিনি ভূমিদাসের অপরাধের চেয়ে অধিক জরমিনা দেন, অতিরিক্তটুকু হবে অনুগ্রহ এবং তা তার নিজের সম্পদ থেকে দিবেন। আর যাদেরও জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, তারা যদি ভূমিদাসের অপরাধের ফিদিয়া নিজেদের পক্ষ থেকে প্রদান করে, তবে তা তাদের অনুগ্রহ হবে এবং ভূমিদাস পূর্বানুরূপ ওয়াক্ফ যমীনের শ্রমিক হিসাবে বহাল থাকবে (আল্-বাহরুর রায়িক)।

২. মাসআলা : অস্থাবর সম্পদের ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে দু'টি অবস্থা হতে পারে। যদি অস্থাবর সম্পদ বাহনজন্ত বা হাতিয়ার হয়, তবে ওয়াক্ফ জায়েয হবে। আর যদি ঐ সব ছাড়া অন্য বস্তু হয়, তবে তারও দু'টি অবস্থা হতে পারে। যদি এমন বস্তু হয়, যা ওয়াক্ফ করার প্রচলন নেই, যেমন- কাপড়-চোপড়, জীব-জন্তু, তবে আমাদের মতে তা ওয়াক্ফ করা জায়েয নয়। আর যেসব বস্তু ওয়াক্ফ করার প্রচলন আছে, যেমন- করাত, কুড়াল, জানাযার খাট, জানাযার কাপড়, এবং অন্যান্য এমন বস্তু যার প্রয়োজন হয়, যেমন, মাইয়েতকে গোসল করানোর পাত্র, ডেগ, পাঠ করার জন্য কুরআন শরীফ, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এসব বস্তুও ওয়াক্ফ করা জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয আছে। সাধারণ মাশায়েখ যাদের মধ্যে ইমাম সারাখসীও আছেন-এই মতই গ্রহণ করেছেন (আল্-খুলাসা)। আর এটাই পসন্দনীয় মত। ফাতাওয়াও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতের উপর। শামসুল আইম্মা আল্-হালওয়ানী এরূপই বলেছেন (মুখতারুল ফাতওয়া)।

আর যদি জানাযার খাট, মাইয়েতকে গোসল করানোর পত্র-যাকে ফরাসী ভাষায় 'হাওয়ে মাসীন' বলা হয়— কোন মহল্লায় ওয়াক্ফ করা হয়, তারপর যদি ঐ মহল্লাবাসী প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তা ওয়াক্ফকারীর ওয়ারিসদের নিকট ফেরত দেয়া যাবে না। বরং ঐ মহল্লার সর্বাধিক নিকটবর্তী মহল্লায় স্থানান্তর করা হবে (আল্-খুলাসা)। আর কুরআন মজীদ যদি কোন মসজিদের মুসল্লীদের পড়ার জন্য কিংবা হিফ্‌ করার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়, তা জায়েয হবে। আর যদি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে, তাও জায়েয হবে এবং ঐ মসজিদেই তা পড়া হবে। কিন্তু কোথাও কোথাও বর্ণিত আছে যে, যে মসজিদে ওয়াক্ফ করা হবে কেবল সেই মসজিদেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে না (আল-ওয়াজীয : কারদারী)।

৩. মাসআলা : কিতাব ওয়াক্ফ করার ব্যাপারে লোকেরা মতভেদ করেছেন। ফকীহ আবুল লাইস (র) তা জায়েয বলেছেন এবং এর উপরেই ফাতওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

কেউ যদি তার বাহন জন্তর পৃষ্ঠদেশ কোন আরোহীর জন্য ওয়াক্ফ করে কিংবা তার গোলামের উপার্জিত আয় মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে তা আমাদের আলিমদের মতে জায়েয নয় (আল-মুহীত)।

কোন ব্যক্তি একটি গাভী এই শর্তে ওয়াক্ফ করলো যে, তার দুধ, মাখন, ঘি, মিঠাই ইত্যাদি মুসাফিরদেরকে দেয়া হবে, এটা যদি এমন স্থানে হয়, যেখানকার লোকদের মধ্যে এরূপ করার

প্রচলন আছে, তবে তা জায়েয হবে। যেমন, পান পাত্রের পানির ক্ষেত্রে জায়েয আছে (আয-যাহীরিয়া)।

কেউ যদি ষাঁড় বা পাঠা ছাগল এই উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করে যে, তা দ্বারা গাভী বা বকরী গাভিন করাবে, তবে তা জায়েয হবে না (আল-কিন্য়া)। আল ওয়াক্ফাত কিতাবে বর্ণিত আছে যে, হিলাল বসরী (র) তাঁর ওয়াক্ফ নামক কিতাবে লিখেছেন যে, কেউ যদি কেবল দালান তার ভিত্তি ব্যতীত ওয়াক্ফ করে, তবে তা জায়েয হবে না এবং এটাই বিশুদ্ধ মত। অনুরূপ কেউ যদি তার গৃহ তার ভিত্তি ব্যতীত ওয়াক্ফ করে, তবে তা জায়েয হবে না এবং এটাই পসন্দনীয় মত (আল-মুহীত)।

ধার নেয়া বা ইজারা নেয়া যমীনে নির্মিত দালান ওয়াক্ফ করা জায়েয নয় (ফাতাওয়া কাযী খান)। ইমাম খাস্‌সাফ (র) বলেন, বাজারের দোকান ওয়াক্ফ করা জায়েয। তবে শর্ত হচ্ছে ইজারা নেয়া যমীন এমন লোকদের অধিকারে আছে, যারা ঐ দোকানসমূহ তৈরি করেছে এবং তাদের হাত থেকে শাসক তা নিয়ে নিতে পারে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যে, মাল গুদামজাত করার জন্য নির্মিত দালান (গোডাউন) ওয়াক্ফ করা জায়েয (আন্-নাহারুল ফায়িক)।

যদি ওয়াক্ফকৃত কোন ভূখণ্ডে কেউ কোন দালান নির্মাণ করে এবং তা ঐ ভূখণ্ডের সেই দিকে নির্মাণ করে যে দিকটি ওয়াক্ফকৃত আর তা ওয়াক্ফ করে, তবে তা কোন মতভেদ ছাড়াই জায়েয হবে। আর যদি ভূখণ্ডের যে দিকটি ওয়াক্ফকৃত নয়, সেদিকে দালান নির্মাণ করে তা ওয়াক্ফ করে, তবে তা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধতর মত হলো তা জায়েয নয় (আল্-গিয়াছিয়া)।

কেউ যদি কোন বৃক্ষ রোপণ করে তা ওয়াক্ফ করে দেয় এবং তা এমন যমীনে রোপণ করে, যা ওয়াক্ফকৃত নয় এবং ঐ বৃক্ষকে যদি তার অবস্থানের যমীনসহ ওয়াক্ফ করা হয় বা যতটুকু যমীনের উপর তা অবস্থিত, তবে সম্পূর্ণতার বিধান অনুসারে যমীনের সাথে এই বৃক্ষও ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। আর যদি শুধু বৃক্ষ তার অবস্থানের যমীন ব্যতীত ওয়াক্ফ করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না। আর যদি ওয়াক্ফের যমীনে বৃক্ষ রোপণ করে, তবে যদি ঐ দিকের উপর ওয়াক্ফ করে যার উপর এই যমীন ওয়াক্ফ, তবে জায়েয হবে—যে রূপ দালানের ক্ষেত্রে জায়েয ছিল। আর যদি ঐ দিক ব্যতীত অপর দিকের উপর ওয়াক্ফ করে, তবে সে ক্ষেত্রেও তদ্রূপ মতভেদ রয়েছে, যে রূপ দালানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছে (আয-যাহীরিয়া)।

সরাইখানার কাজকর্মের জন্য গোলাম-বন্দীদের ওয়াক্ফ করা জায়েয। শাসক যদি ঐ ওয়াক্ফের বন্দীকে বিবাহ দিয়ে দেন, তবে তা জায়েয। কিন্তু তার গোলামকে বিবাহ করানো জায়েয নয়। কেননা, গোলামের উপর মহর ও খোরপোষ ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি ওয়াক্ফের গোলামকে ওয়াক্ফের বন্দীর সাথে বিবাহ দেয়া হয়, তাও জায়েয নয় (আল্-ওয়াজীয : কারদারী)।

আর যেসব জিনিস ভাঙুর বা ব্যয় করা ব্যতীত তার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না, যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং পানাহারের বস্তু তা ওয়াক্ফ করা সাধারণ ফকীহদের মতে জায়েয নয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের অর্থ এখানে দিরহাম-দীনার-অলংকার নয় (ফাতহুল কাদীর)।

৫. মাসআলা : যদি কেউ দিরহাম বা মাপের জিনিস কিংবা কাপড় ওয়াক্ফ করে, তবে তা জায়েয নয়। কেউ বলেন, যেখানে এর প্রচলন আছে, সেখানে জায়েয হওয়ার ফাতওয়া দেয় যাবে। প্রশ্ন করা হয়েছে, তা কিরূপ হবে? জবাবে বলা হয়েছে যে, দিরহাম গরীবদেরকে করয দেয় হবে। তারপর আবার তার নিকট থেকে তা আদায় করা হবে। কিংবা মুদারাবার ভিত্তিতে দেয়া হবে এবং তার লভ্যাংশ সাদাকা করা হবে। গম দরিদ্রদের ঋণ দেয়া হবে যেন তা দ্বারা তারা কৃষি কাজ করে। তারপর আবার তার নিকট থেকে তা নিয়ে নেয়া হবে। কাপড় ও পোশাক গরীবদেরকে দেয়া হবে যেন প্রয়োজনের সময় তারা তা পরিধান করতে পারে। তারপর তা তাদের নিকট থেকে নিয়ে নেয়া হবে (আল্-ফাতাওয়া : আল্-ইতাবিয়া)।

ওষুধ ওয়াক্ফ করা জায়েয নয়। তবে যদি ওয়াক্ফকারী বলে যে, গরীব-ধনী সকলের জন্য ওয়াক্ফ, তবে জায়েয হবে। তখন ধনীরা গরীবদের সাথে দাখিল হয়ে যাবে (মিরাজুদ্ দিরায়া)।

নাতিফী (র) বলেন, মসজিদ সংস্কারের জন্য কোন সম্পদ ওয়াক্ফ করা হলে তা জায়েয হবে। আর যদি পুল তৈরি, রাস্তা মেরামত, কবর খনন, মুসলমানদের জন্য পান পাত্র ও সরাইখানা বানানো কিংবা মুসলমান মৃতদের জন্য কাফন ক্রয়ের নিমিত্ত কিছু ওয়াক্ফ করা হয়, তবে তা জায়েয নয়। কিন্তু ফাতওয়া জায়েয হওয়ার পক্ষে প্রদত্ত হয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

সংশ্লিষ্ট বিষয় : যা উল্লেখ ছাড়া অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং যা উল্লেখ ছাড়া অন্তর্ভুক্ত হয় না। ইমাম খাস্সাফ (র) তাঁর আল-ওয়াক্ফ কিতাবে লিখেছেন যে, কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র উল্লেখ করে এবং ঐগুলোর পরে ফকীর-মিসকীনদের জন্য তার যমীন ওয়াক্ফ করে তবে তখন যেসব দালান-কোঠা, খেজুর গাছও অন্যান্য গাছ-গাছালী ঐ যমীনের উপর থাকে, তা সবই ঐ ওয়াক্ফকের মধ্যে शामिल হবে (আল-মুহীত)। ইমাম খাস্সাফ (র) বলেন, বৃক্ষ ওয়াক্ফ করার সময় যে ফল ঐ বৃক্ষে থাকে, তা ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হয় না। অধিকাংশ মাশায়েখ এই মত পোষণ করেন এবং এটাই বিত্তমত (আল-গিয়াছিয়া)।

৬. মাসআলা : যদি কেউ বলে যে, আমি আমার এই যমীন তার অধিকার ও প্রাপ্যসমূহ এবং তার সাথে যা আছে, সবই ওয়াক্ফ করে দিলাম আর ওয়াক্ফ করার সময় ঐ যমীনের বৃক্ষসমূহে যদি ফল থাকে, তবে হিলাল (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হলো, সে যেন ঐ সমস্ত ফল ফকীর-মিসকীনদের নাম করে দেয়। এটা ওয়াক্ফের জন্য নয়, বরং মানতস্বরূপ দিবে। তারপর তাতে যে ফল উৎপন্ন হবে, তার বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ তা ওয়াক্ফের মধ্যে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

আর যদি বলে যে, আমার যমীন আমার মৃত্যুর পর ওয়াক্ফ, আল্লাহ তা'আলা এতে যে শাস্য উৎপাদন করাবেন, তা তার বান্দাদের জন্য। তারপর ওয়াক্ফকারী যদি মারা যায় এবং ঐ যমীনের বৃক্ষে ফল থাকে, তবে তা আল্লাহর বান্দাদের জন্য হবে না। কেননা, তাদের জন্য ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুর পর ওয়াক্ফ ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং এটা এরূপ হয়েছে যেন সে তার এমন একটি যমীন ওয়াক্ফ করেছে, যার বৃক্ষসমূহে ফল বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং ওয়াক্ফের ওসীয়াতের মধ্যে গাছের বিদ্যমান ফল शामिल হবে না। এরপর গ্রন্থকার বলেন, এ ক্ষেত্রে এই বিদ্যমান ফল কিয়াসের দলীল অনুযায়ী ওয়াক্ফকারীর ওয়ারিসদের জন্য হবে। আর ইস্তিহসান ও উত্তম পন্থা হচ্ছে তা ফকীর-মিসকীনদের দান করে দেয়া। আমরা এই পন্থাই গ্রহণ করছি।

ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন, যদি ওয়াক্ফকারীর বাক্য এই পরিমাণ হয়, যা আমরা উল্লেখ করেছি, তবে সাধারণ কিয়াস ও সক্ষম কিয়াস উভয় দিক দিয়েই উক্ত ফল ওয়াক্ফকারীর ওয়ারিসদের জন্য হবে। কেননা, সে তার মৃত্যুর পরে যমীন ওয়াক্ফ হওয়ার কথা বলেছে। সুতরাং ঐ যমীন তার জীবদ্দশায় ওয়াক্ফ হয়নি বিধায় তার মালিকানার মধ্যেই যমীনের গাছে ফল উৎপন্ন হয়েছে, তাই তার মালিক হবে তার ওয়ারিসগণ (আয-যহীরিয়া)। কেউ যদি ফসলে থাকা অবস্থায় তার যমীন ওয়াক্ফ করে তাহলে ঐ ফসলে ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে না। ঐ ফসলের কোনো মূল্য থাকুক বা না থাকুক (মুয্মারাত)। ফকীহ আবুল লাইস (র) বলেন, আমরা এই মত গ্রহণ করেছি (আয-যখীরা)। ইমাম খাস্সাফ (র) বলেন, যদি ঐ যমীনে তরি-তরকারি বা ফুল ইত্যাদি থাকে, তবে তা ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে না (আল-মুহীত)।

যদি ওয়াক্ফকৃত যমীনে বাঁশ, বন, বেতগাছ ইত্যাদি এমন বস্তু থাকে, যা প্রতি বছর কর্তন করা হয়, তবে তা ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে না। আর যদি তা দুই বছর কিংবা তিন বছর পর কর্তন করা হয়, তবে তা ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে (আল-মুহীত)। অনুরূপভাবে যেসব ফল পরবর্তীকালে উৎপন্ন হবে, তাও ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উৎপন্ন তাজা সবজি ওয়াক্ফকারীর হবে। কিন্তু তার মূল ও শিকড় থেকে যা বেরাবে তা ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে বেগুন ও তুলা ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু তুলা গাছ থেকে যদি প্রতিবছর তুলা পাড়া হয়, তবে তা ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে না (আয-যহীরিয়া)। পিয়াজ, রসুন ও যাফরান ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে না। আখ शामिल হবে না। গোলাপ, মালতী ইত্যাদি গাছ ওয়াক্ফের যমীনের অন্তর্ভুক্ত হবে (আয-যখীরাহ)। কিন্তু গোলাপ, মালতী ইত্যাদি ফুল এবং মেহেন্দী পাতা ওয়াক্ফকারীর হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

কেউ এমন যমীন ওয়াক্ফ করেছে, যার মধ্যে চাক্কি স্থাপন করা হয়েছে, তা ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে-তা পানি চাক্কি হোক বা হাত-চাক্কি। অনুরূপ কূপের চরকি शामिल হবে এবং চামড়ার বড় মশক शामिल হবে না (আল-মুহীত)।

কেউ যদি হাম্মামখানা ওয়াক্ফ করে, তবে তার মধ্যে ডেগসমূহ शामिल হবে এবং সেই স্থানও शामिल হবে, যেখানে তার গোবর, ছাই ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু পানি নিকাশনের নাল ও যাতায়াতের রাস্তা शामिल হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৭. মাসআলা : যদি কেউ বলে যে, আমি আমার যমীন ফকীর-মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, ঐ যমীনের প্রাপ্য পানি ও রাস্তার কথা উল্লেখ না করে তবে সূক্ষ্ম কিয়াস মতে ঐ পানি ও রাস্তা ওয়াক্ফে দাখিল হবে। কেননা, যমীন ওয়াক্ফ করার উদ্দেশ্য হল ফসল উৎপাদন, আর তা পানি ও রাস্তা ছাড়া সম্ভব নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর গৃহ ওয়াক্ফ করার সময় যদি এরূপ না বলে যে, আমি এই গৃহতার অল্প-বিস্তর যাবতীয় হকসহ ওয়াক্ফ করলাম, তবে ঐ গৃহের সকল হক ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে। যেমন গৃহ বিক্রয়কালে এ কথা উল্লেখ না করলেও তা বিক্রয়ের মধ্যে शामिल হয়। এইভাবে কোন দোকান ওয়াক্ফ করলে ঐ দোকানের সেই সব জিনিস ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে, যা ঐ দোকান বিক্রয় করলে বিক্রয়ের মধ্যে शामिल হয়ে থাকে। খেজুরের শীরা বা ঘন রস প্রস্তুতকারীদের মটকা এবং চামড়া শোধনকারীদের ডেগসমূহ ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে না-তা দালানে থাকুক বা না থাকুক (আয-যখীরা)।

৮. মাসআলা : শায়খ নাসর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি তার গৃহ ওয়াক্ফ করলো। তাতে এমন কতগুলো কবুতর আছে, যা উড়ে যায় আবার ফিরে আসে। তিনি বললেন, গৃহ পালিত কবুতরসমূহ গৃহের ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে (ফাতাওয়ায়ে আবুল লাইস (র))। ফাতাওয়ায়ে আবুল লাইস (র)-এ আরো আছে, তিনি বলেন, কবুতরের ঘর ওয়াক্ফ করা জায়েয হবে। কেননা, কবুতর যদিও অস্থাবর জিনিস, কিন্তু তা ওয়াক্ফকৃত ঘরের অন্তর্গত। তাই তা ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি বেলুন ও গোলামসহ যমীন ওয়াক্ফ করে, তবে ঐ বেলুন ও গোলামের ওয়াক্ফ জায়েয হবে। অনুরূপ ভাবে কেউ যদি এমন গৃহ ওয়াক্ফ করে যাতে মৌমাছি বাসা বেঁধেছে, তবে তা জায়েয হবে। কেননা, মৌমাছি গৃহ ও মধুর অন্তর্গত। এ মাসআলাটির ব্যাখ্যা এই যে, ঐ ব্যক্তি গৃহকে তার মধ্যস্থিত মৌমাছিসহ এবং কবুতরের ঘর তার মধ্যস্থিত কবুতরসহ ওয়াক্ফ করেছে। যেমনিভাবে যমীন তার বেলুন ও গোলামসহ ওয়াক্ফ করেছে (আল-মুহীত)।

অনুচ্ছেদ : মুশা বা যৌথ সম্পদ ওয়াক্ফ করার বিবরণ।

১. মাসআলা : অবিভাজন যোগ্য সম্পদের যৌথ মালিকানা, সকলের মতেই ওয়াক্ফকে বাধাগ্রস্ত করে না, যেমন, হাম্মামখানার অর্ধাংশ ওয়াক্ফ করা, তবে জায়েয, যদিও তা অবিভাজ্য শ্রেণীর বস্ত্র (আয-যাহীরিয়া)। কিন্তু বিভাজন যোগ্য যৌথ সম্পদ ওয়াক্ফ করা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয নয়। বুখারার মাসায়েখগণও এ মত গ্রহণ করেছেন এবং এর উপরই ফাতাওয়া (আস-সিরাজিয়া)। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয। মুতাআখখিরীন মাসায়েখগণ এ মতের উপর ফাতাওয়া দিয়েছেন এবং এটাই পসন্দনীয় মত (খাযানাতুল মুফতীন)। সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, অবিভক্ত যমীনকে মসজিদ কিংবা কবরস্তান বানিয়ে দেয়া আদৌ জায়েয নয়। তা অবিভাজ্য শ্রেণীর হোক কিংবা বিভাজ্য শ্রেণীর (ফাতহুল কাদীর)। আর যদি কোন কাযী অবিভক্ত কোন বস্তুর ওয়াক্ফ শুদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন তবে সে নির্দেশ জারী হয়ে যাবে এবং তা ঐকমত্যের ভিত্তিতে হবে। যেকোন অন্যান্য বিতর্কিত মাসআলার

ব্যাপারে বিধান রয়েছে। এটা আবুল মুকারিম প্রণীত শরহে নিকায়ী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আর যে সব বস্ত্র বিভাজ্য শ্রেণীর, কোন কাযী যদি তার ওয়াক্ফ শুদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন তারপর কোন শরীকদার তা বন্টন করে নেয়ার আবেদন করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বাটোয়ারা মন্যুর হবে না। বরং শরীকদারগণ পালা বন্টন করে নিবে। আর সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বন্টন করে দেয়া যাবে (আল-খুলাসা)। সমস্ত ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, যদি গোটা বস্ত্র ওয়াক্ফ করা হয় এবং কোন কোন অংশীদার বা সকল অংশীদার ভাগ বাটোয়ারার আবেদন করে, তবু তা বন্টন করা যাবে না এবং পালা নির্ধারণও করা যাবে না (ফাতহুল কাদীর)। আর যদি কোন স্থাবর তথা কোন যমীন বা গৃহের এক অংশীদার তার নিজের অংশ ওয়াক্ফ করে, তবে সে নিজেই তার শরীকদার থেকে নিজের অংশ বন্টন করে নিবে। আর যদি সে তা বন্টন করার পূর্বে মারা যায়, তখন তার শরীকদার হতে তার অংশ বন্টন করে নেয়ার তার তার ওসীর উপর বর্তাবে। আর যদি সে তার স্থাবর সম্পদের অর্ধেক ওয়াক্ফ করে দেয়, তবে তা বাটোয়ারা করার তার কাযী গ্রহণ করবেন। অথবা তার অবশিষ্ট অংশ অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দিবে। তখন ক্রেতা তার থেকে বাটোয়ারা করিয়ে নিবে। তারপর সে ঐ ক্রেতা থেকে তা ক্রয় করবে (আল-হিদায়া)। আর যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী কোন যমীন থাকে এবং তারা দু'জনেই নিজ নিজ অংশ একদল সরিজ্জাত লোকের জন্য ওয়াক্ফ করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে এবং এদের উভয়েরই ইখতিয়ার থাকবে যে, তারা পরস্পরের অংশ পরস্পর হতে বাটোয়ারা করে নিবে এবং প্রত্যেকে তার নিজ নিজ ওয়াক্ফকৃত অংশ পৃথক করে নিজ কব্জায় নিবে এবং তার মুতাওয়াল্লী স্বয়ং নিজে হবে (আয-যাহীরিয়া)। 'সমগ্র' কে ওয়াক্ফ করার পর যদি তাতে অংশীদারিত্ব প্রমাণিত হয়। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে অবশিষ্ট অংশের ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, ওয়াক্ফের সময় যৌথ মালিকানা বিদ্যমান ছিল। আর যদি নির্দিষ্ট অংশে স্বত্ব প্রমাণিত হয়, তবে অবশিষ্ট অংশের ওয়াক্ফ বাতিল হবে না (আল-হিদায়া), আর কেউ যদি তার সমুদয় যমীন ওয়াক্ফ করে দেয়, তারপর তার মধ্যে থেকে অনির্দিষ্ট অধিকাংশ যমীনে কারো স্বত্ব প্রমাণিত হয় এবং কাযী উক্ত স্বত্ববানের অনুকূলে অর্ধাংশের ফায়সালা প্রদান করেন, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে অবশিষ্ট অর্ধাংশের ওয়াক্ফ বহাল থাকবে এবং ওয়াক্ফকারীর এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে উক্ত স্বত্ববানের নিকট থেকে নিজের অংশের বাটোয়ারা করে নিবে (আল-মুহীত)। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে কোন যমীন যদি দু'জনের যৌথ মালিকানায় থাকে এবং তারা মিসকীনদের জন্য বা ওয়াক্ফ করা বৈধ এমন কোন উত্তম ক্ষেত্রের জন্য ওয়াক্ফ করে দেয় এবং উভয়ে তা নিযুক্ত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকের হাতে অর্পণ করে দেয় তবে তা জায়েয হবে। কেননা, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে যে যৌথ মালিকানা কব্জার সময় বিদ্যমান থাকে তাই ওয়াক্ফ জায়েয হওয়ার প্রতিবন্ধক। পক্ষান্তরে যে যৌথ মালিকানা ওয়াক্ফের সময় বিদ্যমান থাকে, তা ওয়াক্ফ জায়েয হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। আর এখানে এর কোনটিই বিদ্যমান নেই। কেননা, উভয়ে এক সাথে ওয়াক্ফ করেছে এবং এক সাথে সমর্পণ করেছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অনুরূপ

উভয়ে যদি নিজ নিজ অংশ পৃথকভাবে মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং উভয়ে একই ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে, আর মুতাওয়াল্লী উভয়ের অংশ একই সাথে কিংবা পৃথক পৃথকভাবে কব্জা করে তবে তা জায়েয হবে (মুহীত : আস-সারাখসী) অনুরূপ যদি উভয় ব্যক্তি একই সাথে দুজন লোক মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে, তবে তার ও একই বিধান (আল-ওয়াজীয) অনুরূপ যদি দুই ব্যক্তি কোন ইজমালী যমীনকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করে, যেমন এক ব্যক্তি নিজের বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ করে বলে যে, যখন এরা কেউ থাকবে না, তখন তা মিসকীনদের জন্য হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তা হজ্জের উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করে যে, প্রতি বছর ঐ যমীনের আয় দ্বারা মানুষকে হজ্জ করানো হবে। এরপর উভয়ে যদি একই ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে তার উপর ঐ যমীন সমর্পণ করে, তবে তা জায়েয হবে। অনুরূপ ওয়াক্ফকারী যদি এক ব্যক্তি হয় এবং সে উক্ত যমীনের অবিভক্ত অর্ধাংশ ফকীর-মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ করে অবশিষ্ট অর্ধাংশ অন্য কোন কাজের জন্য ওয়াক্ফ করে, তাও জায়েয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি যৌথ ওয়াক্ফকারীর একজনের অংশ কবজা করে এবং অন্য জনের অংশ কবজা না করে, তবে ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে না। বরং কবজাকৃত অংশ ফিরিয়ে নেয়ার এবং বিক্রি করার ইখতিয়ারও থাকবে (মুহীত : আস-সারাখসী) দুই শরীকদারের উভয়েই যদি অর্ধেক যমীন অবিভক্ত অবস্থায় ওয়াক্ফ করে দেয় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ওয়াক্ফের জন্য পৃথক দুই মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে, তবে তা জায়েয হবে না। কেননা ওয়াক্ফ করার সময় যৌথ মালিকানা ছিল। প্রত্যেকে পৃথক ভাবে ওয়াক্ফ করেছে এবং কবজা করার সময়ও যৌথ মালিকানা ছিল। প্রত্যেক মুতাওয়াল্লী ইজমালী অর্ধাংশ কবজা করেছেন। আর যদি উভয়ের প্রত্যেকে নিজ নিজ মুতাওয়াল্লীকে কবজা করার সময় বলে যে, তুমি আমার অংশ আমার শরীকদারের অংশের সাথে কবজা করো, তবে তা জায়েয হবে। এগুলো ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী উপরোক্ত সব অবস্থায়ই ওয়াক্ফ জায়েয। কেননা, তার মতে কবজা করা ব্যতীতই ওয়াক্ফ জায়েয। সুতরাং অবিভক্ত বস্তুর ওয়াক্ফও জায়েয (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

কেউ যদি তার গৃহ বা যমীন হতে এক হাজার গজ ওয়াক্ফ করে, তবে তা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয হবে। মাপার পর তা হাজার গজ বা তার কম হলে তা সবটুকুই ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। আর দুই হাজার গজ হলে তার অর্ধেক, আর দেড় হাজার গজ হলে তার দুই-তৃতীয়াংশ ওয়াক্ফ হবে। আর যদি তার কোন অংশে খেজুর ইত্যাদি বৃক্ষ থাকে এবং কোন অংশে তা না থাকে, তবে বৃক্ষ বিশিষ্ট অংশই ওয়াক্ফ হিসাবে গণ্য হবে (আল-মুহীত)। এক ব্যক্তি একটি যমীন থেকে অবিভক্ত এক জরীব ওয়াক্ফ করলো। তারপর ভাগ-বাটোয়ারা হলো এবং বাটোয়ারায় দেখা গেলো তার ভাগে এক জরীব থেকে কম পড়েছে। কেননা, তার ওয়াক্ফ কৃত যমীনের টুকরাটি উৎকৃষ্ট ছিল। এ জন্যে অপর অংশে যমীন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কিংবা এর বিপরীত হয়েছে। এটা জায়েয (আয-যহীরিয়া)।

৩. মাসআলা : আর যদি কেউ বলে যে, আমি এই গৃহের আমার অংশটি ওয়াক্ফ করলাম আর তা হচ্ছে গোটা গৃহের এক-তৃতীয়াংশ। তারপর দেখা গেল যে, তার অংশ এই গৃহের অর্ধেক কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ। তবে তার সমুদয় অংশই ওয়াক্ফ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কয়েকটি যমীন ও কয়েকটি গৃহ দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী হয় এবং তাদের একজন তার নিজের অংশ ওয়াক্ফ করে দেয়, তারপর সে ইচ্ছা করে যে, নিজের শরীকদার হতে বাটোয়ারা করে নিজের বিভিন্ন গৃহ ও বিভিন্ন যমীনের অংশসমূহ একটি যমীন বা একটি গৃহের মধ্যে একত্রিত করে দিবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও হিলাল (র)-এর কিয়াস অনুযায়ী তা জায়েয হবে (আয-যহীরিয়া)। দুই ব্যক্তির ইজমালী যমীন থেকে একজন তার নিজের অংশ ওয়াক্ফ করলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তা জায়েয হবে। তারপর ওয়াক্ফকারী যদি তার শরীকদার হতে বাটোয়ারা করার এবং বাটোয়ারার মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহাম শামিল করে, তবে তাতে দুই অবস্থা হতে পারে। যদি ওয়াক্ফকারী যমীনের এক টুকরা ঐ দিরহামসহ গ্রহণ করে, তবে তা জায়েয হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে সে ওয়াক্ফের মধ্যে থেকে কিছু দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয়কারী হবে। আর তা বাতিল ও অবৈধ। আর যদি ওয়াক্ফকারী দিরহাম প্রদান করে, তবে তা জায়েয। আর তা এরূপ হবে যেন সে তার ওয়াক্ফের অংশ নিয়েছে এবং তার সাথে তার শরীকদারের নিকট থেকে দিরহামের বিনিময়ে যমীনের আরো একটি টুকরা খরিদ করেছে। সুতরাং তা জায়েয হবে। এরপর ওয়াক্ফকারী টুকরাটি ওয়াক্ফ হয়ে যাবে এবং যে টুকরাটি সে দিরহামের বিনিময়ে নিয়েছে, তা তার মালিকানায় থাকবে অর্থাৎ তার মালিক সে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি ভাগ-বাটোয়ারার করার সময় কিছু দিরহাম বাড়ানো হয় এ কারণে যে, দুই-অংশের মধ্যে এক-অংশ যমীন উৎকৃষ্ট ছিল এবং অপর অংশ তার চেয়ে নিকৃষ্ট। তাই উৎকৃষ্টতার বিনিময়ে কিছু দিরহাম বাড়ানো হয়েছে। এখন ওয়াক্ফকারী যদি এই দিরহাম গ্রহণ করে, তবে জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে শরীকদার যদি দিরহাম গ্রহণ করে, তবে জায়েয হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৪. মাসআলা : দু'জনের ইজমালী দোকান থেকে একজন যদি তার অংশ ওয়াক্ফ করে এবং তার অংশের দরজার উপর তজা লাগাতে চায়, তাহলে অন্য শরীকদার তাতে বাধা দিতে পারে। অবশ্য কাযী যদি ওয়াক্ফের হিফায়তের জন্য তজা লাগাতে নির্দেশ দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। আমরা এ মাসআলা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী আনয়ন করেছি। বলখের মাশায়েখগণও এ মত গ্রহণ করেছেন (মুযমারাত)।

কোন এক গ্রামের কিছু অংশ ওয়াক্ফকৃত, কিছু অংশ সরকারের খাস যমীন এবং কিছু অংশ অন্যান্যের স্বত্ব। এরপর যদি তারা এর মধ্য থেকে কিছু অংশ যমীন বণ্টন করে তাতে কবরস্থান করতে চায়, তবে তা জায়েয হবে না। আর যদি সমস্ত যমীন বণ্টন করতে চায়, তবে তা জায়েয হবে (আল-ওয়াজীয)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ব্যয়ের খাতসমূহের বিবরণ

[এ পরিচ্ছেদে আটটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ : কোন অবস্থায় ওয়াক্ফের মাসরাফ হবে এবং কোন ব্যক্তি মাসরাফ হতে পারে। যার জন্য ওয়াক্ফ করা শুদ্ধ হবে আর কোন ব্যক্তি মাসরাফ হতে পারবে না, যার জন্য ওয়াক্ফ করা শুদ্ধ হবে না, তার বিবরণ।

১. মাসআলা : ওয়াক্ফের আয় সর্ব প্রথম ওয়াক্ফ সম্পত্তির সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজে ব্যয় করা হবে। ওয়াক্ফকারী এ শর্ত করুক বা না করুক। তারপর যে কাজ সংরক্ষণের অধিকতর নিকটবর্তী হবে এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির উপকারিতার ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপকতর হবে, তাতে ব্যয় করা হবে, মসজিদের জন্য তার ইমাম, মাদ্রাসার জন্য তার শিক্ষক। জীবন নির্বাহের জন্য যথেষ্ট হয় এ পরিমাণ তাঁদেরকে দেয়া হবে। তারপর বাতি, চাটাই, বিছানা প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা হবে। তারপর যেসব কাজ আগে করা দরকার তা আগে করবে এবং পরবর্তী কাজ পরে করবে। এটা ঐ সময়ের ব্যাপার, যখন ওয়াক্ফের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যয়ের স্থল উল্লেখ না থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট কোন বস্তুর জন্য ওয়াক্ফ সম্পদ ব্যয় করার কথা উল্লেখ থাকে, তবে সর্বপ্রথম ওয়াক্ফ বস্তুর সংস্কার ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের পর ঐ নির্দিষ্ট খাতের জন্য ব্যয় করবে (আল-হাবী আল-কুদসী)।

২. মাসআলা : আর কেউ যদি বলে যে, ওয়াক্ফ বস্তুর আয়-উপার্জন এক বছর বা দুই বছর পর্যন্ত অমুক ব্যক্তির জন্য থাকবে এবং এরপর তা ফকীর-মিসকীনদের জন্য হবে এবং সে যদি ওয়াক্ফের মধ্যে ওয়াক্ফ বস্তুর সংস্কার-সংরক্ষণ শর্ত করে দেয়, তবে এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির হকের চেয়ে ওয়াক্ফ বস্তু সংস্কার ইত্যাদি কার্য পরবর্তী পর্যায়ে নেয়া হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, সংস্কার ইত্যাদি কার্যে বিলম্ব করলে ওয়াক্ফ বস্তুর নিশ্চিত ক্ষতির আশংকা আছে, তবে সংস্কার কার্যই আগে করে নিবে (আল-হাবী)। যে সব কাজের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, ওয়াক্ফ বস্তুর সমুদয় আয় ঐ সব কাজের জন্য বিভক্ত করে দেয়া হবে। কিন্তু সংস্কার কার্জে বিলম্ব ঘটলে যদি নিশ্চিত ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে প্রথমে সংস্কার ইত্যাদি কার্য করা হবে। আর ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে নাযির বা ব্যবস্থাপকের যদি শর্ত করা হয়, তবে সেও ওয়াক্ফের হকদারের মধ্যে একজন হকদার গণ্য হবে। আর যদি তার জন্য কিছু শর্ত করা না হয়, তবে যখন যে কাজ করবে, তখন তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে। আর কাজ না করলে কোন কিছু পাবে না (ফাতহুল কাদীর)। যদি ওয়াক্ফ একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য হয় এবং শেষে ফকীরদের জন্য হয়, তবে এটা ওয়াক্ফকারীর সম্পদ থেকে হবে। ওয়াক্ফকারী তার

জীবদ্দশায় তার যে কোন সম্পদ থেকে তা দিয়ে দিবে। তারপর সে যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন ঐ মাল উক্ত ওয়াক্ফকৃত সম্পদের আয় থেকে দেয়া হবে। ওয়াক্ফকৃত বস্তুর সংস্কার ততটুকু করা জরুরী হবে, যতটুকু করলে তা পূর্বস্থায় ফিরে আসে। এর অধিক কিছু করা জরুরী নয়। সুতরাং ওয়াক্ফকারীর সম্মতি ব্যতীত মুতাওয়ালী এ ক্ষেত্রে অধিক ব্যয় করবে না। আর যদি ওয়াক্ফ ফকীর-মিসকীনদের জন্য হয়, তবে কারো কারো মতে মুতাওয়ালী কোন অবস্থায়ই পূর্বাপেক্ষা অধিক সংস্কার করার জন্য অধিক ব্যয় করবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত (ফাতহুল কাদীর)।

৩. মাসআলা : আপন সন্তানের বসবাসের জন্য গৃহ ওয়াক্ফ করলে বসবাসের অধিকার যার, সংস্কারের দায়ও তার। যদি তা না করে কিংবা দারিদ্রের কারণে সে তা করতে অসমর্থ হয়, তবে শাসক ঐ গৃহ ভাড়া দিয়ে ঐ ভাড়ার আয় দ্বারা উক্ত গৃহ সংস্কার করার নির্দেশ দিবে। যখন সংস্কার হয়ে যাবে, তখন যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছিল তাকে তা ফিরিয়ে দিবে। আর অস্বীকারকারীকে সংস্কার করতে বাধ্য করা যাবে না। আর ঐ গৃহে বসবাসের অধিকার ব্যক্ত তা ইজারা বা ভাড়া দিতে পারবে না (আল-হিদায়া)। আর যদি বসবাসের হকদার ব্যক্তি তার নিজস্ব অর্থ দ্বারা ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে ইমারত নির্মাণ করে এবং ঐ ইমারতের মধ্যে থেকে যদি কিছু স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়, তবে তা ঐ নির্মাণকারীর ওয়ারিসদের হবে। সুতরাং মূল ওয়াক্ফের কোন ক্ষতি না হলে তা নিয়ে যাওয়ার তাদের ইচ্ছা থাকবে (আল-হাবী)। আর ঐ ওয়ারিসদেরকে তাদের ইমারত অপসারণ করতে বলা হবে। প্রয়োজনে তাদেরকে তা অপসারণ করতে বাধ্য করা হবে। আর যদি তারা মূল্যের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তিকে ইমারতের মালিক বানিয়ে দিতে চায় যার জন্য তাদের উত্তরাধিকারকারীর পরে ওয়াক্ফ হবে তবে উভয় পক্ষের সম্মতিতে তা জায়েয হবে। কোন এক পক্ষ তাতে রাযী না হলে তাকে বাধ্য করা যাবে না (আল-মুহীত)। আর যদি ঐ ইমারতের মধ্য থেকে কিছু স্বয়ং সম্পূর্ণ না হয়, তবে নির্মাণকারীর ওয়ারিসগণ কিছুই পাবে না (আল-হাবী)। আর যদি ঐ ব্যক্তি যার জন্য বসবাস শর্ত করা হয়েছিল ওয়াক্ফকৃত গৃহের দেয়ালে পুকা ইট গেঁথে তার উপর চূনের পলস্তর করে কিংবা ঐ গৃহে কড়িকাঠ লাগায় কিংবা বর্গা ঢুকিয়ে দেয়, তারপর সে মৃত্যুবরণ করে এবং এ গুলোর মধ্য থেকে কোন কিছু ওয়াক্ফকৃত ইমারতের ক্ষতি না করে যদি পৃথক করা না যায়, তবে এগুলোর মধ্যে থেকে কোন কিছু তার ওয়ারিসদের পৃথক করে নেয়ার ইচ্ছা থাকবে না। কিন্তু ওয়াক্ফের শর্তের কারণে যে ব্যক্তির বসবাসের অধিকার জন্মেছে, তাকে এখন বলা হবে যে, ওয়ারিসদেরকে তাদের ইমারতের মূল্য দিয়ে দাও, এরপর তোমার বসবাসের অধিকার অর্জিত হবে। কিন্তু সে যদি মূল্য প্রদান করতে অস্বীকার করে, তবে উক্ত গৃহকে ইজারা দেয়া হবে এবং তার ভাড়া টাকা ঐ ওয়ারিসদেরকে তখন পর্যন্ত দেয়া হবে, যখন পর্যন্ত তাদের ইমারতের পূর্ণ মূল্য তারা পেয়ে যাবে। যখন তারা পূর্ণ মূল্য পেয়ে যাবে, তখন উক্ত গৃহ সেই ব্যক্তিকে দেয়া হবে, যার বসবাসের অধিকার অর্জিত হয়েছে। আর এমতাবস্থায় যার এখন বসবাসের অধিকার হাসিল হয়েছে, তার এ ইচ্ছা নেই যে, ঐ ওয়ারিসদের সাথে এ ব্যাপারে সম্মত হয় যে, তোমরা তোমাদের ইমারতটি খনন করে ভেঙ্গে নিয়ে যাও (আয-যহীরিয়া)। আর ওয়াক্ফকৃত ইমারতের মধ্য থেকে যা ধসে গেছে, ভেঙ্গে পড়েছে,

শাসক তাকে ওয়াক্ফকৃত ইমারতে ব্যয় করবে যদি ওয়াক্ফের মধ্যে তার প্রয়োজন হয়। অন্যথায় তা রেখে দিবে এবং যখন ওয়াক্ফের মধ্যে তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে, তখন তার ইমারতে ব্যয় করবে। আর যদি হুবহু তা ইমারতের কাজে লাগানো না যায়, তবে তা বিক্রি করে তার মূল্য মেরামতের কাজে ব্যয় করবে। ওয়াক্ফের হকদারদের মধ্যে তা বন্টন করা জায়েয নয় (আল-হিদায়া)।

৪. মাসআলা : যদি সরাইখানার ছাদ বা দেয়াল ধসে পড়ে, তাহলে ওয়াক্ফের হকদারগণ তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না সংস্কার করা সম্ভব না হলে এবং তারা অভাবগ্রস্ত হলে কারো কারো মতে তাদের জন্য তার অনুমতি রয়েছে। আর এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর কিয়াস অনুযায়ী জায়েয। আর কেউ কেউ বলেন, তা ওয়াক্ফকারীদের ওয়ারিসগণ পাবে। আর এটা পাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কিয়াস অনুযায়ী (আত-তাহযীব)। একটি সরাইখানার দরজার কাছে একটি বড় নহরের পুল রয়েছে। এই পুল পার না হয়ে ঐ সরাইখানা থেকে উপকৃত হওয়া যায় না। আর ঐ পুলের কোন আয়ও নেই। তবে সরাইখানার আয়ের দ্বারা ঐ পুল মেরামত করা জায়েয। যদি ওয়াক্ফকারী এই শর্ত দিয়ে থাকেন যে, ওয়াক্ফের আয় থেকে সরাইখানার জন্য কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা যাবে। আর যদি সে এরূপ শর্ত করে না দেয়, বরং শুধু সরাইখানা মেরামতের উল্লেখ করে থাকে, তবে জায়েয নয়। কেননা, পুল মেরামত সরাইখানা মেরামত নয়। অবশ্য যদি সরাইখানার অবস্থা এরূপ হয় যে, তার আয় দ্বারা পুল মেরামত না করলে সরাইখানা বিপন্ন হয়ে পড়বে। তবে এমতাবস্থায় ইস্তিহসান তথা জনকল্যাণের স্বার্থে আলিমগণ সরাইখানার আয় দ্বারা পুল মেরামত করা জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন (মুহীত : আস-সারাখসী)।

মুখতাসারুল ফাতাওয়া কিতাবের বর্ণনা মতে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্ফ করা জায়েয আছে। আর এর উপর সায়িদ ইমাম আবুল কাসিম ফাতওয়া দিয়েছেন (আস-সিরাজিয়া)। আর পসন্দনীয় মত এই যে, রাসুলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্ফ করা জায়েয (আল-গিয়াছিয়া)।

শুধু ধনী লোকদের জন্য ওয়াক্ফ করা জায়েয নয়। আর যদি ধনীদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয় এবং তারা সংখ্যায় অল্প হয়, তারপর গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে তা জায়েয। ওয়াক্ফের হক প্রথমে ধনীদের প্রাপ্য হবে, তারপর গরীবদের (মুহীত : আস-সারাখসী)।

মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্ফ করলে তা জায়েয হবে। কিন্তু তার গরীব মুসাফিরদের জন্য হতে হবে। ধনী মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্ফ করা জায়েয নয় (আল-খুলাসা)।

৫. মাসআলা : যদি এভাবে ওয়াক্ফ করা যায় যে, এর আয় দ্বারা প্রতি বছর তার পক্ষ হতে হজ্জ বা উমরা করা হবে, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করা হবে, আর যদি কেউ নেক কাজের জন্য ওয়াক্ফ করে যেমন ওয়াক্ফনামায় লেখা হলো যে, এর বাৎসরিক আয় দ্বারা মটকা ত্রয় করে (মানুষের ব্যবহারের জন্য) তাতে পানি ভরতি করে রাখা হবে। কিংবা তার আয় বিধবা স্ত্রীলোক ও ইয়াতীম বালক-বালিকাদের প্রয়োজনে খরচ করা হবে, কিংবা তা গরীবদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হবে, কিংবা আমার গোনাহের বদলে প্রতিবছর তা দ্বারা দান সাদাকা করা হবে। এ ওয়াক্ফ

জায়েয হবে। তবে শর্ত এই যে, তার শেষে গিয়ে এরূপ ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করতে হবে যাতে শেষ পর্যন্ত ঐ ওয়াক্ফ সর্বদা গরীব-মিসকীনদের জন্য হয়ে যায়।

৬. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি এই শর্তে তার যমীন ওয়াক্ফ করে যে, প্রতিবছর আমার পক্ষ থেকে যেন পাঁচ হাজার দিরহামে একটি পূর্ণ হজ্জ আদায় করা হয় আর যানবাহনসহ হজ্জ করার ব্যয় যদি মোট এক হাজার দিরহাম পড়ে, তবে তাতে ঐ হজ্জ জন্য একহাজার দিরহাম ব্যয় করে অবশিষ্ট চার হাজার দিরহাম গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে (আল-হাবী)। জিহাদ ও গাযীদের জন্য কিংবা মৃতের কাফন-দাফন কিংবা কবর খনন কিংবা এ জাতীয় কিছু জন্য যমীন ওয়াক্ফ করা জায়েয আল (আয-যখীর)। ইমাম খাস্সাফ (র) ওয়াক্ফ অধ্যায়ে বলেছেন, যে ওয়াক্ফ জায়েয নয় হজ্জ এই ভাবে বলা যে, আমার এই যমীন আল্লাহর ওয়াস্তে স্থায়ীভাবে মানুষের জন্য ওয়াক্ফ থাকবে। এধরনের ওয়াক্ফ বাতিল হবে। তদ্রূপ যদি বলে যে, আমার এই যমীন আদম সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ কিংবা বাগদাদবাসীর জন্য, আর তারা সব মারা গেলে গরীব-মিসকীনদের জন্য হবে। এরূপ ওয়াক্ফ বাতিল হবে। এভাবে কেউ যদি বলে যে আমার এ যমীন খোঁড়া ও অন্ধদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে তা বাতিল হবে।

ইমাম খাস্সাফ (র) অন্ধ ও খোঁড়াদের জন্য ওয়াক্ফের মাসআলাকেই অন্যস্থানে উল্লেখ করে বলেছেন যে, এটা সকল গরীব-মিসকীনের জন্য হবে-শুধু অন্ধ-খোঁড়াদের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে না। অনুরূপ কেউ যদি কুরআনের কারী (পাঠক) ও ফকীহদের জন্য ওয়াক্ফ করে তবে তাও বাতিল হবে। হিলাল (র) ওয়াক্ফের বর্ণনায় বলেছেন, খোঁড় ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ওয়াক্ফ করা শুদ্ধ। কিন্তু তার হকদার হবে গরীব প্রতিবন্ধিগণ-ধনী প্রতিবন্ধিগণ নয়। আমাদের মাসায়েখগণ বলেন, মসজিদের শিক্ষক, যারা মসজিদের বালকদের শিক্ষা দেন, তাদের জন্য ওয়াক্ফ করা জায়েয নয় তবে আমাদের কোন কোন মাসায়েখ বলেন, তা জায়েয। শাহ শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, কাযী ইমাম নাসাফী (র) বলতেন, এই কিতাবে ভিত্তিতে যদি অমুক অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন শহরের তালিবুল ইলমদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয় তবে তা জায়েয হবে যদিও তবে গরীব-মিসকীনের শর্ত না লাগানো হয়। আর শায়খ শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) কিতাবুল ওয়াক্ফের ভাষ্যে বর্ণনা করেন যে, এই শ্রেণীর মাসআলা মধ্যে মূলনীতি হচ্ছে যখন ওয়াক্ফকারী এরূপ মাসরাফ তথা ব্যয়ের খাত উল্লেখ করে যাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গরীব মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, তখন ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে। এই প্রকার লোকের সংখ্যা সীমিত হোক কিংবা অসীম। আর যখন ওয়াক্ফকারী এরূপ মাসরাফ উল্লেখ করে যে, তাতে ধনী-দারিদ্র এক সমান হয়, আর তারা যদি সীমিত সংখ্যক লোক হয়, তবে তাদের জন্য ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে। কেননা, এটা যেন প্রত্যেক নিম্ন ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেয়া। আর তারা সংখ্যায় অধিক হলে ওয়াক্ফ বাতিল হবে। তিনি বলেন, কিন্তু যদি তার শব্দের ব্যবহারিক অর্থ থেকে-শব্দের প্রকৃত অর্থ থেকে নয়-অভাবগ্রস্ত বুঝা যায়, অর্থাৎ সে যদি ইয়াতীম শব্দ ব্যবহার করে থাকে, তাহলে বুঝা যাবে যে, সে অন্ধ গ্রন্থ ও অসহায় লোককে দেয়ার কথা বলেছে। এমতাবস্থায় দেখতে হবে তাদের সংখ্যা কত

সীমিত হয়, তবে তাদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র সমান হবে। আর যদি তাদের সংখ্যা সীমিত না হয়, তবু ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে। কিন্তু তাদের মধ্যকার গরীবদেরকে ওয়াক্ফের সম্পদ দেয়া হবে এবং ধনীরা পাবে না (আয যহীরিয়া)।

কেউ যদি আসহাবে হাদীসের জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে সে ওয়াক্ফের মধ্যে শাফি মাযহাবের কেউ দাখিল হবে না, যদি সে হাদীস শিক্ষার্থী না হয়। আর হানাফী মাযহাবের কেউ যদি হাদীস শিক্ষার্থী হয়, তবে সে দাখিল হবে (আল-খুলাসা)।

৭. মাসআলা : কোন ব্যক্তি তার যমীন বা গৃহ কোন বিশেষ মসজিদে নিযুক্ত মুআযযিন বা ইমামের জন্য ওয়াক্ফ করলো। শায়খ ইসমাইল যাহিদ (র) বলেন, এরূপ ওয়াক্ফ জায়েয নয় যদি মুআযযিন গরীব হয়, তবু জায়েয হবে না। ওয়াক্ফ জায়েয হবে যদি ওয়াক্ফনামায় এরূপ লেখা হয়; আমি আমার এই গৃহ এই মসজিদ বা মহল্লার গরীব মুআযযিনের জন্য ওয়াক্ফ করলাম। তারপর যদি মসজিদ বিরল হয়ে যায় এবং মসজিদ মুসল্লীশূন্য হয়ে পড়ে, তখন এই গৃহের আয় মুসলমান গরীব ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। আর যদি বলে যে, আমি প্রত্যেক গরীব মুআযযিনের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে এটা হবে অজ্ঞাত (আয-যহীরিয়া)।

কেউ যদি এমন ব্যক্তির জন্য তার যমীন ওয়াক্ফ করে, যে তার কবরের কাছে বসে কুরআন তিলাওয়াত করবে, তবে তা শুদ্ধ হবে না (আল-কিন্য়া)। শায়খ আবু বকর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এক ব্যক্তি তার যমীন কুরআন মজীদেদের জন্য যা ওয়াক্ফকৃত এই শর্তে কাউকে ওয়াক্ফ করলো যে, সে কুরআন মজীদ থেকে যা শিখেছে, তা অপরকে শিখাবে এবং তার ওয়াক্ফকৃত যমীনের আয় থেকে তার ব্যয় নির্বাহ করা হবে। তিনি বললেন, এরূপ ওয়াক্ফ বাতিল হবে (আয-যাখীরা)।

যদি সূফী লোকদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়, তবে কেউ কেউ বলেন, তা জায়েয নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, তা জায়েয এবং তাদের মধ্যকার গরীবদের মধ্যে তা ব্যয় করা হবে। এটাই বিশুদ্ধতম (আল-কিন্য়া)। আল্লাহই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : নিজের জন্য, নিজের সন্তানদের জন্য এবং নিজের

বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ

১. মাসআলা : যদি বলে, আমার যমীন আমার জন্য ওয়াক্ফ তবে পসন্দনীয় মতে এ ওয়াক্ফ জায়েয হবে (খাযানাতুল মুফতীন)। আর যদি বলে যে, ওয়াক্ফ করলাম আমার জন্য এবং আমার পরে অমুক ব্যক্তির জন্য, তারপর গরীবদের জন্য, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এটা জায়েয হবে (আল-হাবী)। আর যদি বলে, আমার যমীন অমুকের জন্য ওয়াক্ফ এবং তারপর আমার জন্য কিংবা যদি বলে, আমার জন্য এবং অমুকের জন্য অথবা বলে যে, আমার গোলামের জন্য এবং অমুকের জন্য তবে পসন্দনীয় মতানুযায়ী তা শুদ্ধ হবে (আল-গিয়াহিয়া)।

যখন কোন ব্যক্তি তার যমীন তার সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং তারপর মিসকীনদের জন্য করে, তবে এই ওয়াক্ফের মধ্যে তার ঐ সন্তান দাখিল হবে যে ওয়াক্ফের আয়ের দিন বর্তমান থাকবে-ওয়াক্ফ করার সময় সে বর্তমান থাকুক কিংবা তারপর জন্মলাভ করুক। এটা শায়খ হিলাল (র)-এর মত। আর এ মতই বলখের মাসায়েখগণও গ্রহণ করেছেন (আল-মুহীত)। আর এটাই পসন্দনীর মত (আল-গিয়াহিয়া)। অনুরূপ কেউ যদি বলে যে, আমার সন্তানের জন্য এবং এই সন্তানের পর আমার যে সন্তান জন্ম লাভ করবে, তার জন্য, আর এদের মৃত্যুর পর মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবু এই বিধান (আল-মুহীত)।

নিঃসন্তান ব্যক্তি যদি বলে যে, এই যমীন আমার ভবিষ্যত সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে এ ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে এবং এর আয় গরীবদের হক হবে। তার সন্তান হলে পরবর্তী আয় আমৃত্যু এই সন্তানই পাবে, তারপর যখন তার কোন সন্তান থাকবে না, তখন তা আবার গরীব মিসকীনদের হক হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা : যদি কেউ বলে যে, আমি আমার সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে তাতে পুত্র, কন্যা ও হিজড়া সবই शामिल হবে। আর যদি বলে যে, আমি আমার পুত্রদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে কন্যা ও হিজড়া शामिल হবে না। আর যদি বলে যে, আমি আমার কন্যাদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে তাতে পুত্র ও হিজড়া দাখিল হবে না। হিজড়া দাখিল না হওয়ার কারণ, হিজড়া প্রকৃতপক্ষে পুত্র, না কন্যা, তা আমাদের জানা নেই। আর যদি বলে যে, আমি আমার পুত্র ও কন্যা সবার জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে হিজড়া তার মধ্যে দাখিল হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। তারপর যেখানে সন্তানদের জন্য হক প্রতিষ্ঠিত হবে,

সেখানে ঐ সব সন্তান शामिल হবে, যারা ওয়াক্কারীর বংশ ও ঔরসজাত বলে পরিচিত নয়, বরং ওয়াক্ফকারীর মৌখিক স্বীকারোক্তি দ্বারা জানা যায়, তারা ওয়াক্ফের হকের মধ্যে शामिल হবে না। যেমন কেউ যদি বলে যে, আমার এই যমীন আমার সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম। তারপর তার এক দাসী একটি সন্তান নিয়ে এলো, যে ওয়াক্ফকৃত যমীনের আয় আমার ছয় মাসের কম সময় পূর্বে জন্ম লাভ করেছে। তখন যদি ওয়াক্ফকারী ঐ সন্তানের নসব দাবী করে, অর্থাৎ তার ঔরসজাত বলে স্বীকার করে, তবে তার থেকে ঐ সন্তানের নসব প্রতিষ্ঠিত হবে বটে। কিন্তু ঐ সন্তান ওয়াক্ফকৃত যমীনের আয়ের অংশ পাবে না। আর যদি তার স্ত্রী বা উম্মু ওয়ালাদ থেকে ঐ সন্তান ওয়াক্ফকৃত যমীনের আয় আসার ছয় মাসের কম সময় পূর্বে জন্ম লাভ করে থাকে, তবে সে ঐ ওয়াক্ফের আয়ের অংশ পাবে (আল-হাবী)। আর যদি ছয় মাস কিংবা তার বেশী সময়ের মধ্যে জন্ম লাভ করে, তবে সে ওয়াক্ফকারীর সন্তানদের সাথে शामिल হবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : যদি ওয়াক্ফের আয় হাসিল হওয়ার সময় ওয়াক্ফকারী মারা যায়, তারপর তার স্ত্রী ঐ আয় উৎপাদনের দুই বছরের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে ঐ সন্তান পূর্বের সন্তানের সাথে আয়ের অংশ লাভে शामिल হবে। অনুরূপ যদি মৃত্যুর স্থলে বাইন তালাক হয়ে যায় এবং তালাকী মহিলা ইদত অতিবাহিত হওয়া স্বীকার না করে, তবে এ অবস্থায়ও এই বিধানই কার্যকর হবে। আর যদি তালাকে রাজস্ব হয়, তবে তাতেও সেই বিধানই কার্যকর হবে, যেসকল বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার অবস্থায় ছিল (আয-যহীরিয়া)। ওয়াক্ফকারী যদি ওয়াক্ফের আয় হাসিল হওয়ার পর স্ত্রী সহবাসের সক্ষম অবস্থায় জীবিত থাকে তারপর মারা যায় এবং আয় হাসিল হওয়ার সময় থেকে দুই বছর সময় কালের মধ্যে স্ত্রীর সন্তান জন্ম লাভ করে, তবে ঐ সন্তান ঐ আয়ের কোন অংশ পাবে না। কেননা, এখানে আয় হাসিল হওয়ার পর গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে; পক্ষান্তরে আয় হাসিলের ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে জন্ম লাভ করলে প্রথম সন্তানদের সাথে এ সন্তানও शामिल হবে। আর যদি আয় হাসিলের এক বা দুই দিন পূর্বে ওয়াক্ফকারী মারা যায়, তারপর তার স্ত্রী ওয়াক্ফের আয় হাসিলের দুই বছর সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে, তবে ঐ সন্তান ঐ আয়ের অংশ পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তারপর মাশায়েখগণ ঐ দিনের পরিচয়ের ক্ষেত্রে যে দিন আয়ের মধ্যে হক হাসিল ওয়াজিব হয়, মতভেদ করেছেন। শায়খ হিলাল (র) বলেন, সেটি হচ্ছে ঐ দিন, যে দিনে উৎপন্ন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তার কিছুটা মূল্য দাঁড়ায়। তাতে এমন কোন শর্ত নেই যে, সে মূল্য উৎপাদন খরচ থেকে কিছু বেশী হতে হবে। আর যদি হক লাভ এমন বিশেষণ দ্বারা হয়, যা দূর হয়ে যায় এবং পুনরায় ফিরে আসে, তবে আয়ের অংশ লাভের জন্য আয়ের সময় ঐ বিশেষণ থাকা ধর্তব্য হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : শুধু ছেলে সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করা হলে তাতে মেয়ে সন্তানরা দাখিল হবে না। কেননা, ওয়াক্ফকারী তার সন্তানদের জন্য এমন বিশেষণ বর্ণনা করেছে, যা দূর হতে পারে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

যদি বলে যে, আমার পুত্র সন্তানদের জন্য এবং আমার সন্তানের পুত্রদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে শর্ত অনুযায়ী ওয়াক্ফ করার দিন যারা এ বিশেষণে ভূষিত ছিল, তারা দাখিল হবে (আল-হাবী)। আর যদি বলে যে, আমার সন্তানদের মধ্যে যে মুসলমান হবে কিংবা আমার সন্তানদের মধ্যে যে বিবাহ করবে, তার জন্য ওয়াক্ফ করলাম। তবে সেই ব্যক্তি ঐ ওয়াক্ফের মধ্যে দাখিল হবে, যে ওয়াক্ফের পরে মুসলমান কিংবা যে ওয়াক্ফের পরে বিবাহ করবে এবং ঐ ব্যক্তি দাখিল হবে না, যে ওয়াক্ফের দিন মুসলমান ছিল (মুহীত : আস-সারাখসী)। আর যদি বলে যে, তার গরীব সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ এবং বেশি কিছু না বলে, তবে ওয়াক্ফের আয় আসার সময়ে যে সন্তান গরীব হবে, সে शामिल হবে (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা : যদি বলে যে, আমার যে সন্তান গরীব হয়ে গেছে তার জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যে সন্তান ধনী থাকার পর গরীব হয়েছে, সে शामिल হবে। অন্যান্য ইমামগণ বলেন, ওয়াক্ফের আয় আসার সময় যে সন্তান গরীব থাকবে, সে शामिल হবে। আগে ধনী থাকুক কিংবা গুরু থেকেই গরীব থাকুক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর এটাই বিদ্বান মত (ফাতহুল কাদীর)। আর যদি কেউ বলে যে, আমার সন্তানদের মধ্যে যে অভাবগ্রস্ত হবে, তার জন্য ওয়াক্ফ, তবে ওয়াক্ফের আয় আসার সময় যে অভাবগ্রস্ত হবে, সে शामिल হবে (আল-হাবী)। যদি তার ফকীহ সন্তানদের জন্য এবং সন্তানদের ফকীহ সন্তানদের জন্য যমীন ওয়াক্ফ করে, তারপর ওয়াক্ফকারী একটি নাবালিগ সন্তান রেখে মারা যায়, তবে সে ঐ গুণ অর্জন করার পূর্ব পর্যন্ত ঐ ওয়াক্ফের অংশ পাবে না (আল-কিন্য়া)। যদি বলে যে, এই যমীন আমার সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে তা তার ঔরসজাত সন্তানদের জন্য হবে। হোক সে পুত্র কিংবা কন্যা উভয় প্রকার। যতদিন তার ঔরসজাত একজন সন্তানও বর্তমান থাকবে, ততদিন ঐ ওয়াক্ফের আয় তারই হবে অন্য কেউ পাবে না। যখন তার ঔরসজাত একজন সন্তানও বর্তমান থাকবে ততদিন ঐ ওয়াক্ফের আর তারই হবে-অন্য কেউ পাবে না। যখন তার ঔরসজাত কোন সন্তান থাকবে না, তখন তা গরীবদের জন্য হবে। সন্তানের সন্তানদের জন্য তা ব্যয় করা যাবে না। আর যদি ওয়াক্ফ করার সময় ওয়াক্ফকারীর কোন ঔরসজাত সন্তান না থাকে, বরং তার পুত্রের সন্তান থাকে, তবে তা পুত্রের সন্তানই লাভ করবে। তার অধস্তন সন্তানগণ কিছু পাবে না। নিজের ঔরসজাত সন্তান না থাকার ক্ষেত্রে তার পুত্রের ঔরসজাত সন্তানগণই তার অনুরূপ হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার কন্যার সন্তানগণ যাহির রিওয়াযাত অনুযায়ী ওয়াক্ফের মধ্যে দাখিল হবে না। হিলাল (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন এবং যাহির রিওয়াযাতই বিদ্বান (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এরপর যদি তার ঔরসজাত কোন সন্তান জন্ম লাভ করে, তবে তার পরবর্তী আয় তাকে দেয়া হবে (আয-যখীরাহ)। আর যদি প্রথম পুরুষ ও দ্বিতীয় পুরুষ অস্তিত্বহীন হয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পাওয়া যায় আর তার অধস্তন পুরুষও বর্তমান থাকে, তবে তৃতীয় পুরুষ ও তার অধস্তন সব পুরুষই ঐ আয়ের মধ্যে शामिल হবে যদিও তারা সংখ্যায় অধিক হোক (আল-মুহীত)। আর যে বিধান নিজের সন্তানের ওয়াক্ফ ক্ষেত্রে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে, অনুরূপ যদি অমুকের সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে তার বিধানও উপরোক্ত তাফসীলের

অনুরূপ হবে (আয-যখীরা)। আর যদি কেউ বলে যে, এই যমীন আমার সন্তান এবং সন্তানের সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে তাতে তার ঔরসজাত সন্তানগণ এবং সন্তাদের সন্তানগণ যারা ওয়াক্ফের সময় বর্তমান আছে এবং যারা পরবর্তীতে জন্ম লাভ করবে সবাই দাখিল হবে। আর উভয় দুই পুরুষ ঐ আদায়ের মধ্যে शामिल হবে। আর যারা ঐ দুই পুরুষের অধস্তন, তারা তাদের সাথে शामिल হবে না। আর তার মধ্যে কন্যাদের সন্তানগণ যাহির রিওয়াযাত অনুযায়ী দাখিল হবে না। আর এর উপরই ফাতওয়া (মুহীত : আস-সারাখসী)। আর যদি বলে যে, আমার সন্তানের জন্য, আমার সন্তানের সন্তানের জন্য এবং আমার সন্তানের সন্তানের সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করলাম। অর্থাৎ ওয়াক্ফকারী যদি তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত উল্লেখ করে, তবে ওয়াক্ফের আয় সর্বদা ওয়াক্ফকারীর সন্তানদের জন্য বংশানুক্রমে বণ্টিত হবে, গরীব-মিসকীনদের জন্য ব্যয় করা হবে না যে পর্যন্ত ওয়াক্ফে উল্লেখিত এবং তার অধস্তন পুরুষের একজন লোকও অবশিষ্ট থাকবে। এবং এরূপ ক্ষেত্রে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবাই এক সমান। কিন্তু যদি ওয়াক্ফকারী এরূপ বলে যে, প্রথম নিকটবর্তী, তারপর তাদের নিকটবর্তীদের জন্য ওয়াক্ফ। কিংবা যদি বলে যে, আমার সন্তানের জন্য এবং তাদের পর আমার সন্তানের সন্তানের জন্য কিংবা যদি বলে যে, পুরুষানুক্রমে ওয়াক্ফ করলাম, তবে ওয়াক্ফকারী যে রূপ গুরু করেছে বণ্টনে সে রূপ গুরু করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর যদি বলে যে, এই যমীন আমার সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে প্রজন্ম পরম্পরা তা চলবে, কেননা সন্তানদের শব্দটি ব্যাপক। কিন্তু ওয়াক্ফের সমুদয় আয় প্রথমে প্রথম পুরুষের সন্তানেরা পাবে যে পর্যন্ত তাদের একজনও অবশিষ্ট থাকবে। তারা গত হওয়ার পর, দ্বিতীয় পুরুষের লোকগণ পাবে। তারা গত হলে তৃতীয় পুরুষ, চতুর্থ পুরুষ, পঞ্চম পুরুষ সবাই একসাথে পাবে। অর্থাৎ তৃতীয় পুরুষ থেকে আরম্ভ করে অবশিষ্ট সবাই সমান অংশ পাবে এবং এক্ষেত্রে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সবাই এক সমান (মুহীত : আস-সারাখসী)।

যদি বলে যে, আমার সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, অথচ ওয়াক্ফের আয় আসার সময় আছে শুধু একজন সন্তান, তবে অর্ধেক আয় সে পাবে এবং অর্ধেক আয় গরীব-মিসকীনরা পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি বলে যে, এই যমীন আমার এক সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করলাম আর যদি তার একটি মাত্র সন্তানই থাকে, তবে ওয়াক্ফের সমুদয় আয় সেই পাবে। আর যদি তার অনেক সন্তান থাকে, কিন্তু সব মারা এবং শুধু একজন অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই এক সন্তানই ঐ ওয়াক্ফের অধিকারী হবে (আল-হাবী)। আর যদি বলে যে, আমার এই যমীন আমার দুই সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তারপর যখন তার দুই সন্তান অতীত হবে, তখন তাদের সন্তানগণ এবং সন্তানের সন্তানগণ বংশানুক্রমিকভাবে ওয়াক্ফের আয় লাভ করতে থাকবে। এক্ষেত্রে তার দুই সন্তানের জন্য ওয়াক্ফের আয় খরচ করা হবে। তারপর যদি তাদের একজন মারা যায় এবং সে তার একজন সন্তান রেখে যায়, তবে ওয়াক্ফের আয় সে একাই পাবে আর অবশিষ্ট অর্ধেক গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে যে পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ না করবে। এরপর যদি সেও মৃত্যুবরণ করে, তবে ঐ উভয় সন্তানের সন্তানগণ এবং সন্তানগণের সন্তানগণের জন্য বংশানুক্রমে ওয়াক্ফ জারী থাকবে (আল-ওয়াকিয়াতে হুসামিয়া)। আর যদি

কেউ বলে যে, আমার এই যমীন আমার অভাবগ্রস্ত সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, কিন্তু তার সন্তানদের মধ্যে মাত্র একজন ব্যতীত আর কেউ অভাবগ্রস্ত নেই। তবে ওয়াক্ফের অর্ধেক আয় ঐ অভাবগ্রস্ত সন্তানকে দেয়া হবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক গরীবদেরকে দেয়া হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

যদি বলে যে, এই যমীন আমার পুত্রদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম এবং যদি তার একাধিক পুত্র থাকে, তবে ওয়াক্ফের আয় তাদের সকলের জন্য হবে। আর যদি ওয়াক্ফের আয় আসার সময় তার এক পুত্র থাকে, তবে অর্ধেক তার এবং বাকী অর্ধেক গরীবদের হবে। আর যদি ওয়াক্ফকারীর পুত্র ও কন্যা থাকে, তবে হিলাল (র) বলেন, ওয়াক্ফের আয় তারা সবাই সমান ভাবে পাবে এবং এটাই বিত্তমত। যেমন ভাই ও বোন থাকা অবস্থায় যদি বলে, এই যমীন আমার ভাইদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তাই সবাই সমান ভাবে পায় (আয-যহীরিয়া)।

আর যদি পুত্র ও কন্যাওয়ালা কোন ব্যক্তির পুত্রের জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াক্ফ অমুক ব্যক্তির পুত্রের জন্য হবে-কন্যার জন্য হবে না। আর ইউসুফ ইবন খালিদ সুন্নী (র) ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যা সকলেই शामिल হবে। আর যদি ঐ ব্যক্তির বহু সন্তান থাকে তাহলে সমস্ত বর্ণনার মর্ম অনুযায়ী এই ওয়াক্ফ পুত্র ও কন্যা সকলের জন্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। পুত্র নেই তবে কন্যা আছে, এমন ব্যক্তি যদি বলে যে, এই যমীন আমার পুত্রদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে ওয়াক্ফের সমুদয় আয় গরীবদের জন্য ব্যয় হবে। তদ্রূপ কন্যা আছে, পুত্র নেই, এমন ব্যক্তি যদি বলে যে, কন্যাদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে তা গরীবদের জন্য হবে। পুত্রগণ কিছুই পাবে না (আল-ওয়াজীয)।

৬. মাসআলা : কেউ যদি তার যমীন তার পুত্র ও তার সন্তানগণ এবং তাদের সন্তানগণের জন্য বংশানুক্রমিক ভাবে ওয়াক্ফ করে, তবে তাদের সকলের মধ্যে ওয়াক্ফের আয় বণ্টিত হবে। অর্থাৎ তার পুত্রের সন্তানগণের প্রত্যেকের মধ্যে ওয়াক্ফের আয় সমান ভাবে বণ্টিত হবে। এতে পুত্র ও কন্যা প্রত্যেকে সমান অংশ পাবে এবং কন্যার সন্তানগণ এতে शामिल হবে (খাযানাতুল মুফতীন আন্-নাওয়াযিল)।

কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেছে। কেউ যদি তার বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে তাতে পুত্রদের সন্তান ও কন্যাদের সন্তান তা নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী সকলেই এতে शामिल হবে। আর কেউ যদি তার (عزرت) ইতরাতের জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে ইবন আরাবী ও ছা'লাব বলেন, ইতরাত অর্থ زريت বা সন্তানাদি। আর আইনী عینی বলেন, ইতরাত অর্থ ইশরাত (عشرت) বা বংশ-গোত্র। আর যদি কেউ এমন ব্যক্তির জন্য ওয়াক্ফ করে যার নসব তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, তবে তাতে তার কন্যাদের সন্তান দাখিল হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

এক ব্যক্তি বলল, আমার যমীন ওয়াক্ফ করলাম আমার সন্তান ও আমার বংশের জন্য। এ ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে এবং তাতে তার সন্তান ও সন্তানের সন্তান, পুত্র ও কন্যাদের সন্তান

প্রত্যেকেই সমান ভাবে शामिल হবে। আযাদ হোক কিংবা গোলাম হোক। গোলামের অংশ পাবে তার মুনীব। অনুরূপ কেউ যদি বলে যে, আমার এই ওয়াক্ফ আমার সন্তানাদি ও বংশধরের জন্য। তবে তা জায়েয হবে। এর বিধান পূর্ববর্তী বিধানের অনুরূপ হবে (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা : আর যদি কেউ বলে যে, আমি ওয়াক্ফ করলাম আমার সন্তান ও বংশের জন্য এবং তার সন্তানের সন্তান থাকে, তারপর ওয়াক্ফের পরে তার ঔরসজাত সন্তান জন্ম লাভ করে, তবে সবাই ঐ ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে। অনুরূপ কেউ যদি বলে যে, আমার যেসব সন্তান জন্ম লাভ করেছে তাদের জন্য এবং আমার বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে তার ওয়াক্ফ করার পর জন্ম লাভকারী সন্তান বংশধর শব্দটি বলার কারণে ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর যদি বলে যে, এই যমীন ওয়াক্ফ করলাম আমার বর্তমান সন্তানদের জন্য, তবে তাতে তার বর্তমান সন্তানেরা এবং তাদের বংশধর शामिल হবে। তারা এখনই জন্মলাভ করুক বা না করুক। কিন্তু তার ভবিষ্যত সন্তানেরা এবং তাদের বংশধর ওয়াক্ফে शामिल হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। অনুরূপ কেউ যদি বলে যে, আমি ওয়াক্ফ করলাম আমার যেসব সন্তান জন্মলাভ করেছে, তাদের জন্য এবং তাদের সন্তানদের জন্য। তারপর যদি তার ঔরসজাত কোন সন্তান জন্মলাভ করে, তবে সে ওয়াক্ফ থেকে কোন অংশ পাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা : আর যদি বলে যে, আমি ওয়াক্ফ করলাম আমার যেসব সন্তান জন্ম লাভ করেছে তাদের জন্য এবং তাদের সন্তানদের সন্তানদের জন্য এবং তাদের বংশধরের জন্য, তবে তাতে তার যেসব সন্তান জন্ম লাভ করেছে, তারা এবং তাদের সন্তানগণ তাদের সন্তানের সন্তানগণ বংশানুক্রমিক ভাবে সর্বদা ওয়াক্ফের অংশ পেতে থাকবে। আর যদি বলে যে, আমার জন্ম লাভকারী সন্তানদের জন্য এবং তাদের সন্তানদের সন্তানদের জন্য এবং এরপর চূপ থাকে, তবে সন্তানের সন্তান কিছু পাবে না (আল-মুহীত)।

যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমার ওয়াক্ফ আমার ঐ সমস্ত সন্তানের জন্য, যারা জন্ম লাভ করেছে এবং তাদের বংশধরদের জন্য, আর আমার ঐ সমস্ত সন্তানের বংশধরদের জন্য, যারা পরে জন্ম লাভ করবে। তবে যারা তার ঔরসে পরে জন্মলাভ করবে, তারা ওয়াক্ফের মধ্যে দাখিল হবে না। অবশ্য সন্তানগণ দাখিল হবে। আর যদি বলে যে, আমি ওয়াক্ফ করলাম আমার সন্তানদের জন্য এবং তাদের সন্তানদের সন্তানদের জন্য যতদিন পর্যন্ত বংশধারা চলতে থাকবে। অথচ তার ওয়াক্ফ করার পূর্বে তার কিছু সংখ্যক সন্তান ছিল, যারা মারা গেছে এবং তাদের সন্তানদের রেখে গেছে। এসব সন্তান ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে না। আর যদি এরূপ বলে যে, আমার সন্তানের জন্য এবং আমার সন্তানের সন্তানের জন্য এবং তাদের সন্তানদের জন্য, তবে তারা ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে (আল-হাবী)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি তার সুস্থ অবস্থায় বলে যে, আমার এই যমীন আল্লাহর ওয়াস্তে চিরদিনের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলাম। আমার সন্তানের জন্য এবং আমার সন্তানের সন্তানের জন্য এবং তাদের সন্তানদের সন্তানদের জন্য এবং তাদের বংশধরদের জন্য যতদিন তাদের

বংশধারা চলতে থাকবে, তবে এরূপ ওয়াক্ফের আয়ের মধ্যে তার প্রত্যেক সন্তান যারা ওয়াক্ফ করার সময় বর্তমান ছিল এবং যারা ওয়াক্ফ করার পর ওয়াক্ফের আয় আসার পূর্বে জন্ম লাভ করে এবং সন্তানের সন্তান সর্বদা शामिल হবে। আর তাদের মধ্যে যে ওয়াক্ফের আয় আসার পূর্বে মারা যায়, তার অংশ রহিত হয়ে যাবে। আর যে আয় আসার পরে মারা যায়, সে তার অংশের অধিকারী হবে এবং তার ওয়ারিসগণ তা পাবে। আর এরূপ ওয়াক্ফ ক্ষেত্রে উপরের ও নীচের স্তরের সকলেই সমান অংশীদার হবে। তবে যদি ওয়াক্ফকারী তার ওয়াক্ফের মধ্যে এরূপ বলে যে, প্রথমে এই ওয়াক্ফ বন্টন উপরের স্তর থেকে শুরু করা হবে, তারপর পর্যায়ক্রমে যে স্তর তাদের সাথে সংযুক্ত তারা পাবে। তবে ঐ ভাবেই তারা ওয়াক্ফের মধ্যে शामिल হবে। আর যদি ঐ ভাবে বলার পর একজন ব্যক্তি উপরের স্তরের সকলেই মারা যায়, তবে ওয়াক্ফের সমুদয় আয় অবশিষ্ট ঐ একজন পাবে এবং পরবর্তী স্তরের কেউ কিছু পাবেনা। আর যদি বলে, উপরের স্তর থেকে বন্টন শুরু করতে হবে এবং তারা অতীত হওয়ার পর তাদের সংযুক্ত দ্বিতীয় স্তরের লোকদেরকে দেয়া হবে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে, তাদের প্রত্যেক পুরুষ লোক প্রত্যেক স্ত্রীলোকের চেয়ে দ্বিগুণ পাবে। তারপর দেখা গেল যে, ওয়াক্ফের আয় আসলো এবং উপরের স্তরের সকলেই পুরুষ লোক স্ত্রীলোক কেউ নেই, কিংবা সকলেই স্ত্রীলোক-পুরুষ কেউ নেই। এমতাবস্থায় ওয়াক্ফের সমুদয় আয় তাদের মধ্যে সমান ভাবে বন্টন হবে (আয-যাক্কাত ও আল-মুহীত)।

আর যদি ওয়াক্ফকারী বলে, আমি ওয়াক্ফ করলাম, আমার সন্তানের জন্য এবং আমার সন্তানের সন্তানের জন্য সর্বদা যে পর্যন্ত বংশধারা চলতে থাকে আর এ কথা না বলে যে, বংশ পরম্পরায়, কিন্তু এটা বলে যে, তাদের মধ্য থেকে যখন একজন মারা যাবে, তখন ওয়াক্ফের মূল আয় থেকে তার অংশ তার সন্তানের জন্য হবে, তবে তাদের মধ্য থেকে কেউ মারা যাওয়ার পূর্বে উপরোক্ত বিধানই কার্যকর হবে যে, ওয়াক্ফের আয় তার সমুদয় সন্তানের জন্য এবং তার সন্তানের সন্তানের জন্য এবং তার বংশধরদের জন্য সমভাবে বন্টন হবে। তারপর যদি ওয়াক্ফকারীর ঔরস হতে কোন সন্তান মারা যায় এবং কোন সন্তান রেখে যায়, তারপর ওয়াক্ফের আয় আসে, তবে ঐ সমুদয় সংখ্যকের জন্য অর্থাৎ সন্তান ও সন্তানের সন্তানের জন্য নীচের দিকেরই হোক না কেন এবং ঐ ঔরসজাত সন্তানের জন্য, যে মারা গেছে সকলের জন্য সমভাবে বন্টন হবে। আর যে অংশটি ঐ মৃত ঔরসজাত সন্তানের ভাগে পড়ে, তা তার সন্তানকে দেয়া হবে। সুতরাং ঐ মৃতের সন্তানের দুটো অংশ হলো। একটি তো এর নিজের অংশ যা ওয়াক্ফকারীর শর্তের জন্য সে পেয়েছে, আর দ্বিতীয়টি তার পিতার অংশ (আল-খুলাসা)।

১০. মাসআলা : আর যদি বলে সে যে, আমার সন্তানের জন্য এবং আমার সন্তানের সন্তানের জন্য এবং তাদের বংশধরদের জন্য এবং তাদের সন্তানদের জন্য সর্বদা যে পর্যন্ত বংশধারা চলতে থাকে, এ শর্তে যে, তাদের প্রথম স্তর থেকে দেয়া শুরু হবে, তারপর অতীত হওয়ার পর তাদের সংলগ্ন নীচের স্তরের লোকদেরকে দেয়া হবে। এরূপ বংশ পরম্পরায় বন্টন চলতে থাকবে। আর যখন তাদের মধ্যে থেকে কেউ মারা যাবে এবং সন্তান ও তার সন্তান রেখে যাবে, তবে ওয়াক্ফের আয়ের মৃত ব্যক্তির অংশ তার সন্তান ও তার সন্তানের সন্তান ও তার বংশধর সর্বদা যে পর্যন্ত তাদের বংশধারা চালু থাকে পেতে থাকবে এইভাবে যে, উপরের স্তরের আগে দেয়া হবে আর যখন তাদের মধ্য থেকে কেউ মারা যাবে এবং কোন সন্তান না রেখে যাবে এবং না

সন্তানের সন্তান এবং না বংশধর রেখে যাবে এবং না পশ্চাতে কাউকে রেখে যাবে, তখন ঐ ওয়াকফের আর থেকে তার অংশ ঐ ওয়াকফওয়ালাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং ওয়াকফের আয় কয়েক বছর পর্যন্ত উপরের স্তরের লোকদের মধ্যে বন্টন করা হয়। এরপর তাদের মধ্যে থেকে কেউ মারা গেল এবং সে তার সন্তান ও সন্তানের সন্তান রেখে যায়। তবে ওয়াকফের আয় ওয়াকফকারীর সন্তানদেরকে যারা ওয়াকফের সময় বর্তমান ছিল কিংবা তারপর জন্মলাভ করেছে সকলের মধ্যে বন্টন করা হবে। তখন যে পরিমাণ তাদের জীবিতগণ পাবে, তা তাদের হবে এবং তারা তা নিয়ে যাবে। আর যা কিছু মৃতদের ভাগে পড়েছে, তা ওয়াকফকারীর শর্ত অনুযায়ী তার সন্তানরা পাবে। কিন্তু তার সন্তান ও সন্তানের সন্তানের মধ্যে প্রথম স্তরকে আগে দেয়া হবে ওয়াকফকারীর শর্ত অনুযায়ী। আর যদি প্রথম স্তরের যে ব্যক্তি মারা গেছে, সে তার ঔরসজাত কোন সন্তান রেখে না যায়। বরং সন্তানের সন্তান রেখে যায়, ওয়াকফের আয় থেকে মৃত ব্যক্তির অংশ তার সন্তানের সন্তান পাবে, যে ওয়াকফকারীর সন্তানদের মধ্যে তৃতীয় স্তরের। আর অনুরূপ যদি তৃতীয় স্তরেও নীচে হয়, তবে সেও পাবে। কেননা, ওয়াকফকারী এরূপ শর্তটি বেঁধে দিয়েছে। আর যদি প্রথম স্তরের সংখ্যা দশ ব্যক্তি হয় এবং তাদের মধ্যে থেকে দুইজন মারা যায় এবং কোন সন্তান বা সন্তানের সন্তান রেখে মারা যায়, এরপর আরো দুজন মারা যায় এবং তাদের প্রত্যেকে সন্তান ও সন্তানের সন্তান রেখে মারা যায় তারপর ঐ দু'জনের পর আরো দুজন মারা যায় এবং তারা কোন সন্তান না রেখে যায় আর না সন্তানের সন্তান রেখে যায়, তারপর প্রথম স্তরের অবশিষ্ট চারজন ও মৃত দু'জনের সন্তানগণ ঝগড়া করে, তবে যখন ওয়াকফের আয় আসবে, তখন তা এভাবে বন্টন করা হবে যে, সমুদয় আয় ঐ অবশিষ্ট চারজন এবং ঐ দুই জনের মৃতের মধ্যে যারা— সন্তান রেখে মারা গেছে— ছয় ভাগ করে বন্টন করা হবে। ফলে অবশিষ্ট চারজনের ভাগে পড়বে, তা তারা নিয়ে যাবে। আর যা ঐ দুই মৃতের ভাগে পড়বে। যারা তাদের সন্তানদের রেখে গেছে, তা তাদের সন্তানরা পাবে। আর যে চারজন মৃত ব্যক্তি কোন সন্তান রেখে যায় নি, তাদের অংশ রহিত হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার যমীন তার সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করলো এবং শেষে তার আয় গরীবদের জন্য নির্ধারণ করলো। তারপর তার সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেল। হিলাল (র) বলেন, এরূপ অবস্থায় সমস্ত আয় অবশিষ্ট সন্তানদের মধ্যে খরচ করা হবে। এরপর যদি অবশিষ্ট সন্তানগণও মারা যায়, তখন ওয়াকফের আয় গরীবদের জন্য খরচ করা হবে। সন্তানের সন্তান কিছু পাবে না। আর যদি ওয়াকফকারী তার সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করে এবং প্রত্যেকের নাম উচ্চারণ করে বলে যে, অমূকের জন্য, অমূকের জন্য এবং শেষে গরীবদের জন্য ওয়াকফ করে। এরপর তাদের মধ্যে থেকে কেউ মারা যায়, তবে তার অংশ গরীবদের জন্য খরচ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

আর যদি এরূপ বলে যে, আবদুল্লাহ, যায়দ এবং আমর এবং তাদের বংশধরের জন্য ওয়াকফ করলাম, তবে আবদুল্লাহ, যায়দ, আমর ও তাদের বংশধারা যতদিন চলতে থাকবে, তারা ওয়াকফের মধ্যে সর্বদা দাখিল হবে। আর যদি বলে যে, আবদুল্লাহ, যায়দ, আমর ও তার বংশের জন্য ওয়াকফ করলাম, তবে আবদুল্লাহ, যায়দ, আমরও কেবলমাত্র আমরের বংশধরগণই

ওয়াকফের মধ্যে शामिल হবে। আর যদি বলে যে, আবদুল্লাহ, যায়দ, আমর ও ~~আমর~~ দু'জনের বংশধরদের জন্য ওয়াকফ করলাম, তবে আবদুল্লাহ, যায়দ, আমর এবং ~~আমর~~ বংশধরগণ ওয়াকফের মধ্যে शामिल হবে। আর যদি বলে যে, আবদুল্লাহর সন্তানের জন্য যায়দের সন্তানের জন্য ওয়াকফ করলাম, অথচ যায়দের কোন সন্তান নেই, তবে ওয়াকফের সমুদয় আয় আবদুল্লাহর সন্তানের জন্য হবে (আল-মুহীত)। যদি কেউ যায়দের ওয়াকফের জন্য ওয়াকফ করে অথচ যায়দ জীবিত ও বর্তমান থাকে, তবে তার ওয়ারিসরা কিছুই পাবে না এবং ওয়াকফের সমুদয় আয় গরীবদের জন্য হবে। এরপর যখন মারা যাবে, তখন ওয়াকফের আয় যায়দের ওয়ারিসগণের মধ্যে সংখ্যানুযায়ী বন্টন হবে। এতে পুরুষগণ ও স্ত্রীগণ সকলে সমান অংশ পাবে। এরপর যদি তাদের মধ্যে কেউ মারা যায়, তবে তার অংশ রহিত হয়ে যাবে যারা ওয়াকফের আয় আসার দিন জীবিত থাকবে, তাদের মধ্যে তা বন্টিত হবে। আর যদি তাদের মধ্যে থেকে একজন অবশিষ্ট থাকে, তবে আয়ের অর্ধাংশ তার হলেও বাকী অর্ধেক ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টিত হবে। আর যদি বলে যে, যায়দের ~~সন্তান~~র জন্য ওয়াকফ করলাম আর তারা হচ্ছে অমুক, অমুক এবং এইভাবে পাঁচজনের নাম ~~নাম~~ করে, তবে ঐ পাঁচজন ব্যতীত অন্য কেউ তারা ওয়াকফের সময় বর্তমান থাকুক বা ওয়াকফের পরে জন্মলাভ করুক, কিছুই করুক, কিছুই পাবে না (আল-হাবী)।

আর যদি কেউ বলে যে, আমার এই যমীন ওয়াকফকৃত মিসকীনদের জন্য ~~এই~~ শর্তে যে, প্রথমে আমার ঔরসজাত সন্তান থেকে ওয়াকফের আয় বন্টন শুরু হবে। সুতরাং ওয়াকফের আয় তাদের উপর জারী রাখা হবে। তারপর তাদের পরে তাদের সন্তানদের ও তাদের বংশধরদের উপর জারী রাখা হবে। তবে ওয়াকফের আয় তার ঔরসজাত সন্তানের জন্য এবং ~~সন্তান~~র সন্তানের জন্য হবে। আর এটা হবে ওয়াকফকারীর শর্ত অনুযায়ী। তারপর মিসকীনদের উপর বন্টিত হবে। অনুরূপভাবে যদি সে বলে যে, আমার এই ওয়াকফের আয় মিসকীনদের জন্য, তাদের থেকে খারিজ হবে না এবং এতদসত্ত্বেও সে বললো এবং এই শর্তে যে, ওয়াকফের আয় আমার আত্মীয়-স্বজনের উপর জারী রাখা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ~~একজন~~ লোকও অবশিষ্ট থাকবে। তবে ঐ ওয়াকফের আয় সর্বদা তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ~~বন্টিত~~ হবে তারপর যখন তাদের একজন লোকও অবশিষ্ট থাকবে না, তখন মিসকীনদের উপর ~~জারী~~ হয়ে যাবে। আর যদি সে বলে যে, এই শর্তে যে, ওয়াকফের আয় আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর যায়দের সন্তানদের সর্বদা যে পর্যন্ত তাদের একজনও অবশিষ্ট থাকবে। তারপর যখন তার সকলেই অতীত হবে, তখন তা মিসকীনদের জন্য। তবে ওয়াকফের আয় আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর ও যায়দের সন্তানদের মধ্যে বন্টন হবে। যায়দের সন্তান যদি পাঁচজন হয়, তবে ওয়াকফের আয় ছয় ভাগ হবে (আল-মুহীত)। আর যদি বলে যে, আমার এই যমীন আমার মৃত্যুর ~~আমর~~ আমার সন্তান ও আমার সন্তানের সন্তান ও তাদের বংশধরের জন্য ওয়াকফ করলাম, তারপর মারা যায়, তবে তার ঔরসজাত সন্তানের জন্য এই ওয়াকফ জায়েয হবে না। তার সন্তানদের সন্তানের জন্য ~~ভ~~ হবে। কিন্তু যে পর্যন্ত ঔরসজাত সন্তান জীবিত থাকবে, সে পর্যন্ত ওয়াকফ সম্পূর্ণ আয় তাদের জন্য হবে না। বরং ওয়াকফের আয় প্রতি বছর তার মাথা গুণতি অনুসারে বন্টিত

হবে। অর্থাৎ বাৎসরিক আয় সকলের সংখ্যা অনুসারে ভাগ করা হবে। সুতারাং সন্তানের সন্তানের ভাগ যা পড়বে, তা তাদের জন্য ওয়াক্ফ গণ্য হবে। আর যা ঔরসজাত সন্তানের ভাগে পড়বে, তা ওয়াক্ফকারীর ওয়ারিসদের জন্য মীরাস হবে। এমনকি তার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীও তাদের শরীক হবে, যেভাবে অন্যান্য ওয়ারিসগণ শরীক হবে। আর যদি ওয়াক্ফকারীর ঔরসজাত সন্তানদের কেউ মারা যায়, তবে উক্ত আয় তার অন্যান্য ঔরসজাত সন্তান ও তার সন্তানের সন্তানদের সংখ্যার মধ্যে বণ্টিত হবে। তারপর যা কিছু অন্যান্য ঔরসজাত সন্তানের ভাগে পড়বে, তা সমস্ত ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হবে-চাই এই ওয়ারিসগণ জীবিত থাক বা মারা যাক- যদি তারা ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুর সময় জীবিত থাকে (আল-খুলসা)।

১২. মাসআলা : আর হিলাল (র)-এর ওয়াক্ফ নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ তার কোন সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং তার ওয়াক্ফের মধ্যে উল্লেখ করে যে, এটা ওয়াক্ফ তার জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে। তবে তার এ কথা বলা যে, আমার মৃত্যুর পর-এটা কোন ফাসাদ ও অনর্থের কারণ হবে না। আর এটাই বিশুদ্ধতম মত। আর এটা ওয়ারিসদের জন্য ওসীয়াতও সাব্যস্ত হবে না। বরং বুঝা যাবে, এর দ্বারা ওয়াক্ফের চিরস্থায়িত্ব ও চিরকালীনতা বুঝানো হয়েছে (আল-ওয়াজীয)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ওয়াক্ফ এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিচয়

১. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আত্মীয়-স্বজন এখানে এমন ব্যক্তিকে বলা হবে, যে তার উর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ইসলামের ক্ষেত্রে। সেই উর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষ তার পিতার দিক থেকে হোক কিংবা মাতার দিক থেকে হোক। মাহরাম ও গায়রে মাহরাম, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী, বহুবচন ও একবচন এতে এক সমান। সুতারাং কেউ যদি তার আত্মীয়ের জন্য কিংবা আত্মীয়তার অধিকারীর জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে এই উভয় অবস্থায় ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ওয়াক্ফে উল্লেখিত সকলে ওয়াক্ফের মধ্যে শামিল হবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, ওয়াক্ফকারী যদি একবচনের শব্দ ব্যবহার করে, যেমন- সে বলল, আমি আমার আত্মীয়ের জন্য কিংবা আমার আত্মীয়তার অধিকারীর জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে ওয়াক্ফের মধ্যে তার সেই আত্মীয়ই দাখিল হবে, যে ওয়াক্ফকারীর সবচেয়ে নিকটবর্তী ও মাহরাম ব্যক্তি। আর যদি বহুবচনের শব্দ দ্বারা ওয়াক্ফ করে, যেমন-সে বলল, আমার আত্মীয়তার অধিকারীগণের জন্য কিংবা আমার আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে সবচেয়ে নিকটবর্তী ও মাহরাম হওয়া সত্ত্বেও এটাও ধর্তব্য হবে যে, তারা একাধিক ব্যক্তি। এমনকি উল্লেখিত বহুবচনের শব্দটি দ্বারা দুই বা ততোধিক বুঝাবে। আর মাশায়েখ (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর “ইসলামে তার উর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষ” কথাটির মর্ম সম্পর্কে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে তার উর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষ মুসলমান হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন, তার উর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষ ইসলামের যুগ পেয়েছে। চাই সে মুসলমান হোক বা না হোক। এই মতভেদের ফল প্রকাশিত হবে এক

আল্ভী ব্যক্তির ক্ষেত্রে (আল্ভী বলা হয় হযরত আলী (র)-এর আওলাদকে)। জনৈক আল্ভী ব্যক্তি তার তার আত্মীয়ের জন্য ওয়াক্ফ করেছে। দ্বিতীয় মতের ভিত্তিতে আকীল ইবন আবী তালিব ও জা'ফর ইবন আবী তালিব-এর আওলাদ ওয়াক্ফের মধ্যে শামিল হবে এবং প্রথমোক্ত মতের ভিত্তিতে কেবলমাত্র হযরত আলী (র)-এর আওলাদ শামিল হবে। আর যদি ওয়াক্ফকারীর দুই চাচা ও দুই মামা থাকে এবং সে বহুবচনের শব্দ দ্বারা ওয়াক্ফ করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতানুসারে ওয়াক্ফের আয় তার দুই চাচা লাভ করবে। কেননা, ইমাম আবু হানীফা (র) আত্মীয়তাকে ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে গুরুত্ব দেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উক্ত ওয়াক্ফের আয় দুই চাচা ও দুই মামার মধ্যে চার ভাগ হবে। কেননা, তাদের কাছে এ ক্ষেত্রে আত্মীয়তার কোন গুরুত্ব নেই। আর যদি ওয়াক্ফকারীর এক চাচা ও দুই মামা থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ওয়াক্ফের আয়ের অর্ধাংশ চাচা এবং অবশিষ্ট অর্ধাংশ দুই মামা সমান সমান পাবে (আল-মুহীত)। আত্মীয়তার হকের ক্ষেত্রে সব ইমামের মতে নারী ও পুরুষ, মুসলিম ও কাফির, আযাদ ও গোলাম সবাই এক সমান। কিন্তু ওয়াক্ফের আয় গোলাম যা পাবে, তা তার মুনীব লাভ করবে। ওয়াক্ফের আয় আসার সময় যে ব্যক্তি ঐ গোলামের মুনীব ছিল। তবে তার অংশ গ্রহণের ইচ্ছার ঐ গোলামের থাকবে- মুনীবের থাকবে না। আর গোলাম আযাদ হওয়ার পর তার অংশ তার নিজেরই হবে (আল-হাবী)। নিকটবর্তী লোকদের জন্য ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী লোকদের সংখ্যার উপর ওয়াক্ফের আয় বণ্টিত হবে। যাতে ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, গরীব-ধনী সবাই এক সমান থাকবে। কেননা, নিকটবর্তী লোক বলতে এদের সবাই তাতে শামিল (আল-ওয়াজীয)। আর ওয়াক্ফকারীর পিতা ও ঔরসজাত সন্তানগণ তাতে দাখিল হবে না। দাদার ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে দাখিল হবে এবং যাহির রিওয়াযাত মতে দাখিল হবে না (ফাতহুল কাদীর)। এক ব্যক্তি তার অভাবশ্রু নিকট আত্মীয়ের জন্য ওয়াক্ফ করলো এবং তারপর সে মারা গেলো। এমতাবস্থায় ওয়াক্ফকারী পৌত্র যদি অভাবশ্রু হয়, তবে তাকে ঐ ওয়াক্ফের আয় প্রদান করার ইচ্ছার মুতাওয়াল্লীর থাকবে কিনা? ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তা দেয়া যাবে না। কেননা, সন্তানের সন্তান তাদের মতে নিকটাত্মীয় নয় (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

যাবী কারাবাত অর্থাৎ আত্মীয়তার অধিকারী ব্যক্তিগণ এবং আকরিবা অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনগণ শব্দদ্বয় দ্বারা ওয়াক্ফ করার মধ্যে যে বিধান আমরা বর্ণনা করেছি, তাই নিজের আরহাম ও যাবী আরহাম এবং নিজের আনসাব ও যাবী আনসাব শব্দ দ্বারা ওয়াক্ফ করলে প্রযোজ্য হবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : আর যদি কেউ বলে যে, আমার যী-কারাবাত অর্থাৎ আমার আত্মীয়তার অধিকারীর জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে কিয়াস অনুযায়ী এই শব্দ এক ব্যক্তির জন্য হওয়া উচিত। এমনকি যদি তার এক চাচা ও দুই মামা থাকে, তবে ওয়াক্ফের আয় সম্পূর্ণ এক চাচাই পাবে। কেননা, যী-কারাবাত শব্দটি এক বচন। আর ইসতিহসান অনুযায়ী এরা সকলে সমান হবে।

কেননা, শব্দটি একবচন হলেও এর দ্বারা জাতি বা শ্রেণী বুঝানো হয়ে থাকে (আল-হাবী)। আর যদি যাবী কারাবাত বা আকরিবা কিংবা আনসাব অথবা আরহামের জন্য ওয়াক্ফ করা হয় এই শর্তে যে, সর্বপ্রথম অধিক নিকটবর্তীকে, তারপর ঐ ব্যক্তির পরবর্তীকে ওয়াক্ফ করা হবে। তবে নিকট আত্মীয়কে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী তার জন্য ওয়াক্ফ হবে-যদি ও সে একজন হয়। আর এতে বহুবচন শব্দ ধর্তব্য হবে না। এটা সর্ববাদী মত (আয-যখীরা)। আর যদি সে বলে যে, আমার যমীন আত্মীয়ের মধ্যে কিংবা আত্মীয়ের উপর ওয়াক্ফকৃত আর আমার আত্মীয় না বলে, তবে এই উভয় শব্দ একই রূপ হবে। সুতরাং তার আত্মীয়ের জন্য ওয়াক্ফ হবে। অনুরূপ কেউ যদি বলে যে, আকরিবের জন্য, কিংবা আনসাবের জন্য অথবা যাবিল আরহামের জন্য, আর নিজের সত্তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত না করে, তবে এ ওয়াক্ফ তার কারাবাত বা আত্মীয়ের জন্যই হবে। কেননা, এরূপ বলার প্রচলন আছে (আল-মুহীত)।

আর যদি কেউ বলে যে, মাতা ও পিতার দিক দিয়ে আমার আত্মীয়ের জন্য, অথবা মাতার দিক দিয়ে আমার আত্মীয়ের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে ওয়াক্ফকারীর কথা অনুযায়ী হবে এবং ওয়াক্ফের আয় আত্মীয়দের প্রত্যেকের জন্য সমান অংশে বণ্টিত হবে। আর যদি বলে যে, পিতা ও মাতার দিক দিয়ে আমার আত্মীয়ের জন্য এবং পিতার দিক দিয়ে আমার আত্মীয়ের জন্য কিংবা যদি বলে যে, পিতা ও মাতার দিক দিয়ে আমার আত্মীয়ের জন্য এবং মাতার দিক দিয়ে আমার আত্মীয়ের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে ওয়াক্ফের আয় সকলের জন্য সমান অংশে বণ্টিত হবে। আর এ ক্ষেত্রে মাতা ও পিতার দিক দিয়ে আত্মীয় এবং শুধু পিতার দিক দিয়ে আত্মীয় কিংবা শুধু মাতার দিক দিয়ে আত্মীয় উভয়ই সমান হবে। আর মাতা ও পিতা উভয়ের দিক দিয়ে আত্মীয়ের প্রাধান্য হবে না। আর যদি বলে যে, পিতার দিক দিয়ে আত্মীয়ের মধ্যে এবং আমার মাতার দিক দিয়ে আত্মীয়ের মধ্যে ওয়াক্ফ করলাম, তবে ওয়াক্ফের আয়ের অর্ধাংশ পিতার দিকের আত্মীয়ের জন্য হবে এবং অবশিষ্ট অর্ধাংশ মাতার দিকের আত্মীয়ের জন্য হবে (আয-যখীরা)। যদি কেউ বলে যে, আমার এই যমীন ওয়াক্ফ করলাম আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়ের জন্য, তারপর পরবর্তী সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়ের জন্য, তবে ওয়াক্ফের আয় তার সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়ের প্রাপ্য হবে। সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয় ব্যক্তি যদি একজন হয়, তবে সমুদয় আয় তার হবে - যদিও তা দুই শত দিরহামের অধিক হয়। আর যদি একদল হয়, তবে সমুদয় আয় তাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হবে এবং এতে নারী ও পুরুষ সমান হকদার হবে। তারপর যখন এরা সকলে অতীত হয়ে যাবে, তখন ঐ মৃতদের সাথে যারা সর্বাধিক সম্পর্ক যুক্ত, তারা ওয়াক্ফের আয় পাবে। এই ভাবে ওয়াক্ফের আয় বণ্টিত হতে হতে তা এমন লোক পর্যন্ত পৌঁছবে, যারা তাদের দূরবর্তী আত্মীয়। এটা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। হিলাল (র)ও এ মত গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, ওয়াক্ফকারী তার আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করলে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী আত্মীয় সবাই সমান হবে এবং ওয়াক্ফের আয় তারা সকলে সমান অংশে প্রাপ্য হবে। অনুরূপ ভাবে যদি সে বলে, আমার নিকটতম আত্মীয়ের জন্য তারপর নিকটতম আত্মীয়ের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে এ ক্ষেত্রেও এরূপ

মতভেদগত বিধান রয়েছে। এরপর কেউ যদি বলে যে, আমি তা গ্রহণ করছি না, তবে তার অংশ রহিত হয়ে যাবে। এবং ওয়াক্ফের আয় অবশিষ্টদের জন্য হবে (আল-হাবী)।

আর যদি কেউ বলে যে, আল্লাহ তা'আলা যা দান করেছেন, তার আয় নিকটতম আত্মীয়কে দেয়া হবে, তারপর নিকটতম আত্মীয়কে, তখন তার নিকটতম আত্মীয়কে ওয়াক্ফের সমুদয় আয় প্রদান করা হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : যখন কেউ তার আত্মীয়ের জন্য যমীন ওয়াক্ফ করে, তারপর কোন ব্যক্তি এসে দাবী করে যে, আমি তার আত্মীয়, তখন তাকে সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। আর তার সাক্ষী কবুল হবে না খসম (বিবাদী) ব্যতীত। খসম হবে ওয়াক্ফকারী যদি সে জীবিত থাকে। আর সে যদি মারা যায়, তবে যে ওসীর তত্ত্বাবধানে যমীন থাকবে, সে খসম হবে। আর ওসী যদি কারো সম্পর্কে স্বীকার করে যে, সে ওয়াক্ফকারীর আত্মীয়, তবে তার স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে না। কিন্তু সে দাবীদারের (বাদীর) পক্ষ থেকে সাক্ষী পেশ করার সময় শুধু খসম হতে পারে (আল-হাবী)। আর যদি ওয়াক্ফকারীর দু'জন ওসী হয় কিংবা তার অধিক হয়, তারপর দাবীদার তাদের মধ্য থেকে একজনের কাছে দাবী পেশ করে। তবে তা জায়য হবে। সমস্ত ওসীর একত্রিত হওয়া শর্ত নয় (আয-যখীরা)। আর ওয়াক্ফকারী মৃতের ওয়ারিস এ মুকাদ্দমায় খসম (বিবাদী) হবে না। তবে সে যদি মৃত্যুওয়ালী হয়, তবে খসম হতে পারে। অনুরূপ ভাবে যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, তারাও এ মুকাদ্দমায় দাবীদারের খসম হবে না (আল-মুহীত)। দাবীদার যদি মৃত্যুওয়ালীর সামনে এটা প্রমাণিত করে যে, সে ওয়াক্ফকারীর আত্মীয়, তবে শুধু এতটুকুতেই তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না যে পর্যন্ত সে দু'জন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত না করে যে, তার নসব সুনির্দিষ্ট। যেমন, মাতা-পিতা উভয়ের দিক থেকে কিংবা শুধু পিতার দিক থেকে অথবা শুধু মাতার দিক থেকে সে ওয়াক্ফকারীর মৃতের ভাই। যদি শুধু ভাই হওয়াকে প্রমাণিত করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপ যদি চাচা হওয়া প্রমাণিত করে, তাও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সাক্ষীগণ যদি বলে যে, আমরা এই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ওয়ারিস সম্পর্কে অবগত নই, তবে কাযী তাকে দিয়ে দিবে। আর সাক্ষীগণ যদি এরূপ না বলে, তবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাকে দিয়ে দিবে (আল-ওয়াজীয)। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে দেয়ার সময় তার পক্ষ থেকে কোন জামানতদার নেয়া হবে না, যে রূপ মীরাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে (আল-মুহীত)। আর যদি সাক্ষীগণ বলে যে, ওয়াক্ফকারীর আত্মীয়গণ অনুপস্থিত আছে, তবে কাযী তাদের অংশগুলো ভাগ করে আলাদা রেখে দিবে। আর সাক্ষীগণ যদি বলে যে, তারা কত জন আমরা তা জানি না, তবে তাদেরকে কাযীর বলা উচিত যে, তোমরা সাবধানতা অবলম্বন করো এবং যাদের সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিত, কেবল তাদের সম্পর্কেই সাক্ষ্যদান করো, বলো যে, আমরা অমুক অমুক ব্যতীত তার জন্য কোন আত্মীয় সম্পর্কে জ্ঞাত নই (আয-যখীরা)। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য পেশ করে যে, অমুক শহরের বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই ব্যক্তি ওয়াক্ফকারীর আত্মীয়, তবে এ সম্পর্কে হিলাল (র) বলেন, বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, সেটি কোন্ আত্মীয়তা যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে? তখন সে যদি এমন আত্মীয়তার কথা উল্লেখ করে যার দ্বারা ওয়াক্ফের অংশ পেতে পারে, তবে তাকে

দিবে, অন্যথায় দিবে না। আর যদি তার এরূপ আত্মীয়তা প্রকাশ করার পূর্বে সাক্ষী নিখোঁজ হয় বা মারা যায়, তবে ঐ দাবীদারের নিকট তার দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন সে যদি এরূপ প্রমাণাদিসহ তার দাবী পেশ করতে পারে, যাতে সে ওয়াকফের আয় পেতে পারে, তবে তাকে তা দেয়া যাবে। আর না পারলে দেয়া যাবে না। এরূপ না দেয়ার নির্দেশ দ্বারা প্রথম বিচারকের নির্দেশ ভঙ্গ করা হয় না। কেননা, প্রথম বিচারক শুধু এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ঐ ব্যক্তি ওয়াকফকারীর আত্মীয়। আর প্রত্যেক আত্মীয়ই ওয়াকফের আয়ের হকদার হয় না। হাঁ, যদি প্রথম বিচারক এরূপ নির্দেশ দিয়ে থাকেন যে, তাকে ওয়াকফের আয় দেয়া যাবে কিংবা তার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে, তবে এ বিচারকও এরূপ নির্দেশ জারী করবে এবং তাকে অংশ দিবে (আল-ওয়াজীয)। আর যদি দাবীদার আত্মীয়তার পরিচয় স্পষ্ট করে না দেয়, অথবা সে ছোট বালক হয়, তবে হিলাল (র) বলেন, কাযী তাকে ওয়াকফের আয় দিয়ে দিবে এবং প্রথম কাযীর নির্দেশ সঠিক বলে সাব্যস্ত করবে এবং মনে করবে যে, প্রথম কাযী তাকে এমন আত্মীয় প্রতিপন্ন করেছে, যে আত্মীয় ওয়াকফের হকদার হতে পারে (আল-মুহীত)। এক ব্যক্তি কাযীর সামনে তার আত্মীয়তা প্রমাণ করলো এবং কাযী তার অনুকূলে ফায়সালা দিলেন, তারপর আরেক ব্যক্তি এসে একই দাবী করল কিন্তু সে কাযীকে পেল না। তখন সে ইচ্ছা করলো, যার জন্য কাযী আত্মীয়তার নির্দেশ দিয়েছে, তার সাথে বিবাদ করবে। এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত দাবীদার যদি ওয়াকফের আয়ের কিছু অংশ নিয়ে থাকে, তবে সে দ্বিতীয় দাবীদারের প্রতিপক্ষ হবে। আর যদি না নিয়ে থাকে, তবে সে তার প্রতিপক্ষ হবে না। চাই প্রথম দাবীদারকে ঐ কাযীর সামনে উপস্থিত করা হোক, যে তার নামে নির্দেশ দিয়েছে কিংবা অন্য কোন কাযীর নিকট উপস্থিত করা হোক। এটাই ইসতিহসান। আর হিলাল (র) এটাই গ্রহণ করেছেন (আয-যখীরা)।

আর যদি আত্মীয়দের মধ্যে থেকে কেউ ওয়াকফকারীর সাথে তার আত্মীয়তা প্রমাণ করে, এর পর অন্য কেউ এসে সাক্ষ্য দেওয়ার যে, সে তার পুত্র, যে তার নিজের আত্মীয়তা প্রমাণ করেছে অথবা তার পৌত্র, তবে তার উপরই যথেষ্ট করা হবে। ওয়াকফকারীর সাথে তার আত্মীয়তা ব্যাখ্যা করতে হবে না যেহেতু প্রথম দাবীদারের এরূপ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়েছিল। আর অনুরূপ যদি সে সাক্ষী পেশ করে যে, এই ব্যক্তি তার মাতা ও পিতার দিক দিয়ে ভ্রাতা, তাহলেও উক্তরূপ বিধান হবে (আল-হাবী)। আর যার জন্য প্রথম নির্দেশ দেয় হয়েছে সে যদি স্ত্রীলোক হয় এবং অবশিষ্ট বিষয় পূর্বোক্তরূপ হয়, তবু এরূপ বিধান (আয-যখীরা)। আর যদি দ্বিতীয় দাবীদার সাক্ষ্য দেওয়ায় যে, সে প্রথম ব্যক্তির যার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে পিতার দিক থেকে ভ্রাতা এবং কাযী যদি প্রথম ব্যক্তির জন্য এই নির্দেশ দিয়ে থাকেন যে, সে ওয়াকফকারীর পিতার দিক থেকে ভ্রাতা, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্যও আত্মীয়তার নির্দেশ দিয়ে দিবে। আর যদি প্রথম ব্যক্তি সম্পর্কে ওয়াকফকারীর মাতার দিক থেকে ভ্রাতা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে দ্বিতীয় দাবীদার ওয়াকফ থেকে আজনবী হবে। আর এর ভিত্তিতেই এই শ্রেণীর মাসআলা বের হবে (আল-মুহীত)। ওয়াকফকারীর দুই পুত্র যদি এক দাবীদার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে আমাদের পিতার আত্মীয় এবং এই আত্মীয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে (আয-যখীরা)। আর যদি দুই ব্যক্তি (যায়দ ও আমর) দুই ব্যক্তির (খালিদ ও বাকর) জন্য

আত্মীয়তার সাক্ষ্য দেয় এবং এই দুই ব্যক্তি (খালিদ ও বাকর) ঐ দুই ব্যক্তির (যায়দ ও আমর) জন্য আত্মীয়তার সাক্ষ্য দেয়। অর্থাৎ একদল অপর দলের আত্মীয়তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-হাবী)। আর যদি কাযী প্রথম সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দাবীদারদ্বয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন, তারপর দাবীদারদ্বয় সাক্ষীদ্বয়ের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়, তবে দাবীদারদ্বয়ের সাক্ষ্য ঐ প্রথম সাক্ষীদ্বয়ের জন্য প্রথম সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য বহাল থাকবে (আয-যখীরা)।

আর যদি দুই জন আত্মীয় এক ব্যক্তির জন্য আত্মীয় হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তাহলে সাক্ষীদ্বয়ের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হলেও তাদের হাতে ওয়াকফের যে আয় থাকবে, তাতে ঐ ব্যক্তি शामिल হবে (আল-হাবী)। আর যদি কেউ তার যমীন তার আত্মীয়দের জন্য ওয়াকফ করে তারপর কোন ব্যক্তি এসে দাবী করে যে, আমি ওয়াকফকারীর আত্মীয়দের একজন, ওয়াকফকারীও তা স্বীকার করে এবং আত্মীয়তার বিবরণ দেয় আর বলে যে, হাঁ, যাদের জন্য আমি ওয়াকফ করেছি এই ব্যক্তিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি ওয়াকফকারী আত্মীয়তা প্রসিদ্ধ হয় এবং এই ব্যক্তি তাদের মধ্য থেকে না হয়, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ না হয়, তবে ওয়াকফকারীর স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে না। আর এটা তখন হবে, যখন ওয়াকফকারী ওয়াকফ করার পর এরূপ স্বীকারোক্তি করে। আর যদি সে ওয়াকফের মধ্যে এরূপ স্বীকারোক্তি করে এবং বলে যে, আমি যাদের জন্য ওয়াকফ করেছি এই ব্যক্তি তাদের একজন, তবে তার এই স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি ওয়াকফকারীর আত্মীয়গণ প্রসিদ্ধ লোক না হয়, তবে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)। আর যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়াকফকারী তাকে আত্মীয় বলে স্বীকার করেছে, অথচ ওয়াকফকারীর আত্মীয়গণ প্রসিদ্ধ লোক, তবে এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে আত্মীয়গণ প্রসিদ্ধ না হলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী আমার মতে তাকে ওয়াকফের আয় থেকে দেয়া হবে যদি সাক্ষীগণ আত্মীয়তার বিবরণসহ মৃতের স্বীকারোক্তির সাক্ষ্য দিয়ে থাকে (আল-হাবী)। কেউ যদি তার সন্তান ও বংশধরের জন্য ওয়াকফ করে তারপর যদি সে কোন এক ব্যক্তি সম্পর্কে স্বীকার করে যে, এ আমার পুত্র, তবে তার ওয়াকফের ইতিপূর্বকার আয়ের ক্ষেত্রে তার কথা সত্য বলে গ্রহণ করা যাবে না। বরং পরবর্তী আয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যাবে (আয-যখীরা)।

৪. মাসআলা : একজন তার আত্মীয়দের ওয়াকফ করল, এরপর এক ব্যক্তি এসে নিজেকে তার আত্মীয় বলে দাবী করল এবং এই মর্মে সাক্ষী পেশ করল যে, ওয়াকফকারী তার জীবদ্দশায় তার আত্মীয়দের সাথে এই ব্যক্তিকেও প্রতিবছর কিছু কিছু দিতো, তবে তাতে সে ওয়াকফের আয়ের হকদার হবে না। অনুরূপ ভাবে সাক্ষীগণ যদি এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক কাযীকে ওয়াকফকারীর আত্মীয়দের সাথে প্রতিবছর কিছু কিছু দিতো, তবু সে ওয়াকফের আয়ের হকদার গণ্য হবে না (আল-মুহীত)। আর যদি ওয়াকফ করে এমন লোকের জন্য, যে ওয়াকফকারীর আত্মীয়দের মধ্যে সর্বাধিক নিকটবর্তী, তারপর মিসকীনদের জন্য এবং তার পুত্র বা পিতা বর্তমান থাকে, তবে তারা ওয়াকফের মধ্যে शामिल হবে। আর যদি আত্মীয়দের মধ্যে সর্বাধিক নিকটবর্তী ব্যক্তির জন্য ওয়াকফ করে, তবে উক্ত উভয় ব্যক্তি

এক সাথে ওয়াকফের মধ্যে शामिल হবে না। আর যদি ওয়াকফকারীর পুত্র ও মাতা-পিতা থাকে, তবে ওয়াকফের আয় পুত্রের হবে। পুত্রের পরিবর্তে কন্যা থাকলেও একই হকুম। আর পুত্র বা কন্যা মৃত্যুর পর ওয়াকফের আয় মিসকীনদের হবে। পিতা-মাতার জন্য কিছু হবে না। আর যদি শুধু পিতা-মাতা থাকে, অন্য কেউ না থাকে, তবে ওয়াকফের আয় তাদের উভয়ের মধ্যে অর্ধাংশ-অর্ধি বন্টিত হবে। তারপর একজন মারা গেলে অন্য জনের জন্য অর্ধাংশ হবে এবং অবশিষ্ট অর্ধাংশ মিসকীনদের জন্য হবে। আর যদি তার সন্তানাদি থাকে, এবং তারা দশজন হয়, তারপর তাদের মধ্যে একজন মারা যায়, তবে তার অংশ মিসকীনদের জন্য হবে। আর যদি ওয়াকফকারীর মাতা ও ভ্রাতা থাকে, তবে ওয়াকফের আয় মাতার হবে ভ্রাতার হবে না। অনুরূপভাবে যদি ওয়াকফকারীর দাদা ও মাতা থাকে, মাতা দাদার চেয়ে অধিক নিকটবর্তী এবং ভ্রাতাদের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী আর পিতাও অধিক নিকটবর্তী। আর যদি দাদা অর্থাৎ পিতার পিতা এবং ভ্রাতা থাকে, তবে যে ইমামের মতে দাদা পিতা-স্থানীয়, তার মতে ওয়াকফের আয় দাদার হবে এবং অন্যদের মতে ভ্রাতাদের হবে-দাদার হবে না (আয-যখীরা)। যদি ওয়াকফকারীর দুই ভ্রাতা থাকে, একজন মা শরীক, বাপ শরীক, অন্য জন শুধু বাপ শরীক কিংবা মা শরীক প্রথম জনই অগ্রগণ্য হবে। অনুরূপভাবে ভ্রাতা-ভগ্নীর সন্তানগণ এবং চাচা, ফুফু, মামা, খালা ও তাদের সন্তানগণ যারা পিতা-মাতা উভয়ের দিক থেকে হবে এবং যারা শুধু পিতার দিক থেকে হবে কিংবা শুধু মাতার দিক থেকে হবে- তাদের চেয়ে উত্তম ও অগ্রগণ্য হবে। আর যদি ওয়াকফকারীর বিভিন্ন দিকের তিনজন মামা থাকে- অর্থাৎ একজন মাতা-পিতা থেকে, দ্বিতীয় জন শুধু পিতা থেকে এবং তৃতীয়জন শুধু মাতা থেকে এবং পিতার দিক থেকে একজন চাচা থাকে, তবে প্রথম ঐ মামা পাবে, যে পিতা-মাতা উভয়ের দিক থেকে হবে। আর যদি তার এক ভ্রাতা থাকে পিতার দিক থেকে এবং আরেক ভ্রাতা থাকে মাতার দিক থেকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর প্রথম মত অনুযায়ী পিতার দিকের ভ্রাতা অগ্রগণ্য হবে। আর দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী উভয় ভ্রাতা সমান হবে। তদ্রূপ আবু হানীফা (র)-এর মতে সমস্ত আত্মীয়ের ক্ষেত্রে পিতৃকূল মাতৃকূলের উপর অগ্রগণ্য হবে। আর তার দ্বিতীয় মত অনুযায়ী এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুযায়ী উভয়ে সমান হবে (আল-হাবী)। যদি ওয়াকফকারীর পিতা থাকে এবং পুত্রের পুত্র থাকে, তবে ওয়াকফের আয় পিতার হবে, পৌত্রের হবে না। আর যদি ওয়াকফকারীর এক ভ্রাতা পিতা ও মাতার দিক থেকে থাকে এবং পুত্রের পুত্র থাকে, তবে ওয়াকফের আয় পৌত্রের হবে। আর যদি তার কন্যার কন্যা থাকে এবং পুত্রের পুত্রের পুত্র অর্থাৎ উল্লিখিত কন্যার এক স্তর নীচে থাকে, তবে ওয়াকফের আয় কন্যার কন্যা পাবে। অনুরূপ ভাবে যদি ওয়াকফ না হয়ে ওসীয়াত হয়, তাহলেও এই সমুদয় অবস্থায় একই বিধান হবে। আর যদি পিতা ও মাতার দিক থেকে এক ভগ্নী থাকে এবং কন্যার কন্যার কন্যা থাকে, তবে কন্যার কন্যার কন্যা অগ্রগণ্য হকদার হবে (আল-মুহীত)। মোটকথা, প্রথম ওয়াকফকারীর সন্তান থেকে শুরু করা হবে, তার পর পিতার সন্তান থেকে, তারপর দাদার সন্তান থেকে শুরু করা হবে। আর যদি মাতার পিতা নানা থাকে এবং সহোদর ভ্রাতার কন্যা

কিংবা শুধু মাতার দিক থেকে ভ্রাতার কন্যা থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে নানা অগ্রগণ্য হবে এবং সাহেবাইন তথা ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ভ্রাতার কন্যা অগ্রগণ্য হবে। আর যদি ভ্রাতার কন্যার পরিবর্তে কন্যার কন্যা থাকে, তবে এই কন্যা সর্বসম্মত মতে অগ্রগণ্য হবে। আর যদি তার মাতা-পিতার দিক থেকে সহোদর ভ্রাতার পুত্র থাকে এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কিংবা বৈপিত্রেয় ভ্রাতা থাকে, তবে ওয়াকফের আয় পাওয়ার ব্যাপারে ভ্রাতা অগ্রগণ্য হবে (আয-যখীরা)। আর মাতার দিক থেকে ভ্রাতার পুত্র ওয়াকফের আয়ের হকদার হওয়ার ক্ষেত্রে পিতার দিক থেকে চাচার চেয়ে অগ্রগণ্য হবে (আল-হাবী)। যদি কেউ তার শহরে ব্যবসাকারী আত্মীয়দের জন্য ওয়াকফ করে, এবং শেষে ফকীরদের জন্য ওয়াকফ করে, আর তারা যদি সীমিত সংখ্যক হয়, তবে তারা যেখানেই যাক তাদের অংশ তাদের সাথে যাবে। আর তারা যদি অধিক সংখ্যক হয়, তবে তাদের মধ্য থেকে যে অন্য শহরে চলে যাবে, সে বঞ্চিত হবে। আর যদি তাদের কেউ অবশিষ্ট না থাকে, তখন ওয়াকফের আয় ফকীরদের জন্য ব্যয় করা হবে। এরপর যদি আবার কেউ পূর্বের শহরে ফিরে আসে, তবে পরবর্তী আয় সে পাবে, পূর্বের আয় পাবে না (ফাতাওয়ায়ে ইতাবিয়াহ)। কোন ব্যক্তি তার যমীন এই শর্তে ওয়াকফ করলো যে, ওয়াকফের আয় আমার আত্মীয়দের যথেষ্ট পরিমাণ দিতে হবে। আর অবস্থা এই যে, তার আত্মীয়গণ সংখ্যাতিত। এমতাবস্থায় সে যদি সন্তানের কথা উল্লেখ না করে, তবে আত্মীয়দের সন্তান এবং সন্তানের সন্তান সবাই দাখিল হবে। কেননা, তারাও ওয়াকফকারীর আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি সে সন্তানের কথা উল্লেখ করে এবং বলে যে, ঐ আত্মীয়দের পরে তাদের সন্তানগণ পাবে, তবে এই সন্তানগণ তাদের পিতাদের জীবদ্দশায় ওয়াকফের হকদার হবে না। আর যথেষ্ট হওয়ার পরিমাণ হচ্ছে, তার নিজকে, তার পরিবারবর্গকে এবং তার একজন খাদেমের প্রয়োজন পরিমাণ দেয়া হবে (মুয্মারাত)।

ওয়াকফ সম্পত্তি ওয়াকফকারীর নিজের অধিকারে রয়েছে এবং সে তার আয় নিজের আত্মীয়-স্বজন ও নিজের আবাদকৃত গোলামদের জন্য কম-বেশী হারে ব্যয় করছে এবং যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করছে। তারপর সে কাউকে ওসী নিযুক্ত করে মারা গেল। কিন্তু আয় বন্টনের ক্ষেত্রে তার অনুসৃত পদ্ধতির কথা বলে গেল না, এক্ষেত্রে ফকীহগণ বলেন যে, ওয়াকফকারী যাকে যাকে দিতো ওসীও তাদেরকে দিবে। আর যদি ওসী এ ব্যাপারটি সন্দেহপূর্ণ ও জটিল মনে করে যে, ওয়াকফকারী তার আত্মীয়গণ ও আবাদকৃত গোলামদের মধ্য থেকে যাকে অতিরিক্ত দিতেন, তবে সে অতিরিক্তটুকু গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : গরীব আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ

১. মাসআলা : যদি কেউ বলে, আমার এই জমি আমার গরীব আত্মীয়দের প্রতি সাদাকা, ওয়াকফ অথবা বলে, আমার গরীব সন্তানদের প্রতি এবং তাদের কেউ যখন জীবিত থাকবে না, তখন গরীব-মিসকীনদের প্রতি, তবে এতে ওয়াকফ সহীহ হবে এবং এ জমির ফসল কাটার সময় তাদের মধ্যে যারা গরীব থাকবে, তারাই সে ফসলের হকদার হবে।

এটা হিলাল (র)-এর অভিমত। আমরা এ মতই গ্রহণ করি (মুযমারাত)। আর এ মত অনুযায়ীই ফাতওয়া।

২. মাসআলা : যদি বলে, আমার জমি আমার আত্মীয়দের মধ্যে যারা গরীব বা আমার আত্মীয়দের মধ্যে যারা অভাবগ্রস্ত, তাদের প্রতি সাদাকা ওয়াক্ফ, তবে এটা আমার গরীব আত্মীয়দের প্রতি ওয়াক্ফ এবং সেই একই হুকুম এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যদি বলে, আমার জমি আমার গরীব আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ কিংবা বলে, আমার গরীব আত্মীয়দের মধ্যে ওয়াক্ফ, তবে এটাও আমার গরীব আত্মীয়দের প্রতি ওয়াক্ফ বলার মতই গণ্য হবে।

বস্ত্রত বাক্যের পদসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যে সব অব্যয় ব্যবহৃত হয় (যথা- প্রতি [على], জন্য [لِ], মধ্যে [فِي] প্রভৃতি) তা অনেক সময় একটি অন্যটির অর্থ প্রদান করে।

যদি বলে, আমার ইয়াতীম আত্মীয়দের প্রতি ওয়াক্ফ, সেটাও সহীহ। এক্ষেত্রে সে জমিতে ফসল আসার পর কোন শিশু বালগ হয়ে গেলে সে ফসলে তারও ভাগ থাকবে। এ ফসলে তারও অপরাপর হকদারদের মধ্যে যদি বিরোধ দেখা দেয় এবং তারা বলে, তুমি তো ফসল আসার আগেই বালগ হয়ে গেছ কাজেই এতে তুমি কোন অংশ পাবে না, আর তার দাবী হচ্ছে, সে বালগ হয়েছে ফসল আসার পরে তো সে ক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে, অবশ্য তাকে সে ব্যাপারে কসম করতে হবে।

ইয়াতীম মেয়ের ঋতুমতী তথা বলেগা হওয়ার ব্যাপারে অনুরূপ বিরোধ দেখা দিলে সেক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য।

৩. মাসআলা : ফসল আসার পর যদি কোন এক-আত্মীয় মারা যায় এবং তার ছোট ছোট সন্তান-সন্ততি থাকে, তবে এ ফসলে তার সে সন্তানদের কোন অংশ থাকবে না (কাযী খান)।

৪. মাসআলা : যদি গরীব আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং তাদের অবর্তমানে সাধারণ দরিদ্রদেরকে দেওয়ার কথা বলে, তারপর সে মারা যায় এবং তার একজন গরীব পুত্র থাকে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সে পুত্র 'আত্মীয়' নামের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটা সঠিক (আল-ফাতাওয়াল-আত-তাবিয়া)।

৫. মাসআলা : যদি বলে, আমার গরীব আত্মীয়দের মধ্যে যারা 'সালিহ' (সজ্জন বা সা-বাস্তি বহুবচনে সুলাহ) তাদের জন্য ওয়াক্ফ, তবে সেটা এমন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যার প্রতি অন্যায়-অপরাধের অভিযোগ নেই, চাল-চলন ভাল, আচার-আচরণ নির্দোষ, যে কাউকে কষ্ট দেয় না, যার দ্বারা অন্যের ক্ষতি কম হয়, যে কারও মানহানি ঘটায় না, কারও প্রতি অমূলক অভিযোগ উত্থাপন করে না, যে সতী-সাক্ষী নারীর প্রতি অপবাদ রটনাকারী নয় এবং নয় মিথ্যাচারী হিসাবে খ্যাত। এই যার চরিত্র সে ব্যক্তিই সালিহ।

যদি বলে, আমার আত্মীয়দের মধ্যে যারা চরিত্রবান (আহলুল-আফাফ) বা মহৎ (আহলুল খায়র) কিংবা গুণবান (আহলুল ফায়ল), তবে এসব সজ্জন (সালিহ)-এর অনুরূপ মত (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা : যদি ওয়াক্ফকারী তার গরীব আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করে আর তার বাসস্থান হতে ভিন্ন কোন অঞ্চলেও তার গরীব আত্মীয় থাকে, সে ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফের আয় ভিন্ন এলাকায় পাঠাবে না, বরং ওয়াক্ফকারীর নিজ এলাকায় অবস্থিত গরীবদের মধ্যেই বিতরণ করবে। অবশ্য মুতাওয়াল্লী যদি দূরের সে এলাকায় পাঠায় তবে তার জরিমানা দিতে হবে না (মুহীত)।

৭. মাসআলা : যদি বলে, 'আমার আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ' এবং সর্বাধিক নিকটাত্মীয় হতে বিতরণ শুরু করা হবে, তবে ফসল তোলার পর ওয়াক্ফকারীর সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়কে প্রথমে দেওয়া হবে। তাকে দেওয়া হবে দু'শ' দিরহাম পরিমাণ, তার বেশী নয়। তারপর দেওয়া হবে পরবর্তী নিকটতমকে এবং তাকেও দু'শ' দিরহাম। এভাবে পর্যায়ক্রমে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। আয়ের পরিমাণ যদি তিনশ' দিরহাম হয় তবে প্রথম ব্যক্তিকে দেওয়া হবে দু'শ' দিরহাম এবং তার পরের ব্যক্তিকে একশ' দিরহাম। কিছু ফসল নষ্ট হয়ে গেলে অবশিষ্ট ফসল প্রথম স্তরের আত্মীয়কে দেওয়া হবে এবং যা নষ্ট হবে সেটা পরবর্তী স্তরের আত্মীয়ের ভাগ থেকে যাবে (আল-হাবী)।

৮. মাসআলা : যদি প্রত্যেক আত্মীয়কে দু'শ' দিরহাম হারে দেওয়া হয় এবং কিছু ফসল অবশিষ্ট থাকে, তবে ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) অনুযায়ী তাদের মধ্যে তা সমান হারে বন্টন করা হবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : যদি বলে আমার গরীব আত্মীয়দের জন্য এই শর্তে ওয়াক্ফ যে তাদের সর্বনিকটতম হতে বন্টন শুরু হবে এবং তাকে সমুদয় আয় দেওয়া হবে। তাহলে নিকটজনকে সমুদয় আয় দান করা হবে (তার অবর্তমানে সমুদয় ফসল দেওয়া হবে পরবর্তী নিকটতমকে)।

১০. মাসআলা : যদি বলে, আমার দরিদ্র আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ এবং পর্যায়ক্রমে তাদের নিকটতমদের মধ্যে বন্টন করা হবে, তবে নিকটতমকে ছ'শ' দিরহাম পরিমাণ দেওয়া হবে। সমুদয় আয় নয় (আত-তাতার খানিয়া)।

'গরীব'-এর ব্যাখ্যা

১১. মাসআলা : ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকেই গরীব (ফকীর) গণ্য করা হবে, যাকে 'যাকাত'-এর ক্ষেত্রে গরীব মনে করা হয়। এটাই প্রসিদ্ধ মত (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা : যার 'বাসগৃহ' আছে, আর কিছু নেই, কিংবা বাসগৃহের সংগে একজন চাকরও (গোলাম) আছে, যাকাত ও ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে সে গরীব বটে। এতদসংগে তার যদি কোন রকম চলে যায়-এমন পোশাক থাকে তার বেশী কাপড় না থাকে, এমনভাবে তার সাথে গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও থাকে, তবু সে ফকীর (আব-যখীরা)।

১৩. মাসআলা : যদি তার কাছে দু'শ' দিরহাম থাকে কিংবা বিশ মিহকাল সোনা থাকে, তবে ওয়াকফের কোন অংশ সে পাবে না (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : গৃহের আসবাবপত্র বা কাপড়-চোপড় যদি অতিরিক্ত থাকে এবং তার মূল্য দু'শ' দিরহামের সমপরিমাণ হয় তবে সে ধনী, তার জন্য যাকাত ও ওয়াক্ফ গ্রহণ জায়েয নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা : যদি দুটি ঘর ও দুজন চাকর (গোলাম) থাকে এবং অতিরিক্ত ঘর ও অতিরিক্ত চাকর দু'শ' দিরহাম সমমূল্যের হয়, তবে যাকাত ও ওয়াক্ফ গ্রহণ হারাম হওয়ার ব্যাপারে সে ধনীদেব অন্তর্ভুক্ত; যদিও তার উপর যাকাত ফরয নয় এবং সেদিক থেকে সে ধনী নয়। এটাই আমাদের মাযহাবের ইমামগণের মত (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা : যদি কারও অতিরিক্ত কাপড়, অতিরিক্ত গৃহ-সামগ্রী এবং অতিরিক্ত ঘর থাকে, পৃথকভাবে যার প্রত্যেকটির মূল্য দু'শ' দিরহাম না হলেও সবগুলোর সমষ্টিগত মূল্য দু'শ' দিরহাম, তবে সে ধনী সাব্যস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা : যদি কারও দু'শ' দিরহাম মূল্যের জমি থাকে; কিন্তু জমির ফসলে তার সংসার চলে না, বিশুদ্ধ মত অনুসারে সেও ধনীদেব মধ্যে গণ্য (খাযানাতুল-মুফতীন)।

১৮. মাসআলা : যদি কারও প্রচুর সম্পদ থাকে, কিন্তু তা তার হাতে নেই অথবা অন্যদের কাছে তার প্রচুর অর্থ পাওনা থাকে, যা সে উসুল করতে সক্ষম নয়, তবে তাকে ওয়াক্ফ ও যাকাত দেওয়া যাবে। কেননা সে মুসাফিরদের মধ্যে গণ্য।

যদি কারও সম্পদ তার কাছে উপস্থিত না থাকে অথবা অন্য লোকের কাছে পাওনা থাকে, যা আদায় করতে সক্ষম নয়, তবে সে চাইলে কারও থেকে ঋণ নিতে পারে, সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে সাদাকা (যাকাত, ওয়াক্ফ ইত্যাদি) গ্রহণ অপেক্ষা ঋণ নেওয়াটাই শ্রেয়। তবে যাকাত গ্রহণ করাও দোষের না।

গরীব ব্যক্তি যদি কর্মক্ষম হয়, তবে তাকে ওয়াকফের অর্থ দিলে দোষ নেই, তবে তার জন্য যাকাত গ্রহণ করা মাকরুহ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা : যদি কারও এমন গরীবের কাছে পাওনা থাকে, যার পক্ষে তা পরিশোধ করা সম্ভব নয়, তবে সেও গরীব সাব্যস্ত হবে। যদি ধনী ব্যক্তির কাছে পাওনা থাকে, আর সে ব্যক্তি তা স্বীকারও করে তবে পাওনাদারকে ধনী মনে করা হবে। খাতক যদি তা স্বীকার না করে, কিন্তু পাওনাদারের সাক্ষী প্রমাণ থাকে সে ক্ষেত্রেও তাকে ধনী গণ্য করা হবে। হাঁ যদি সাক্ষী-প্রমাণও না থাকে, তখন সে ফকীরদের অন্তর্ভুক্ত হবে (আয-যাখীরা)।

২০. মাসআলা : কেউ তার গরীব পৌত্রদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করল। তার একজন পৌত্রের একটি ঘোড়া আছে। এখন দেখতে হবে সে ঘোড়াটি কি উদ্দেশ্যে রেখেছে? যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে রেখে থাকে, তবে তাকে ওয়াকফের অংশ দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে ঘোড়াটি যদি তার বিলাস-সামগ্রী হয় এবং তার মূল্য দু'শ' দিরহাম পরিমাণ হয়, ওদিকে সে

ঋণগ্রস্তও নয় এবং স্ত্রীর মোহরানাও বাকী নেই, তবে তাকে ওয়াক্ফ হতে অংশ দেওয়া হবে না (আল-মুযমারাত)।

২১. মাসআলা : যার ভরণ-পোষণ অন্যের অর্থ-সম্পদ দ্বারা নির্বাহ করা কর্তব্য এবং সেই ব্যক্তির সম্পদ হতে সে আদালতের রায় বা তার সম্মতি ছাড়াই নিজ ভরণ-পোষণের খরচ গ্রহণ করতে পারে, বিচারকও সেই ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ হতে ব্যয়ের ফায়সালা দিতে পারে এবং মালিকানার উপস্থিতিতে উভয়ের মধ্যে যৌথ, একরূপ ক্ষেত্রে খরচ নির্বাহকারীর মত পোষ্য ব্যক্তিকেও ওয়াক্ফ বিষয়ে ধনী মনে করা হবে। এর মধ্যে পড়ে পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও দাদা-দাদী।

যার ভরণ-পোষণ অন্যের অর্থের দ্বারা কেবল আদালতের রায়েই নির্বাহ হতে পারে, আদালতের রায় বা সেই ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া সে তার অর্থ ভোগ করতে পারে না, বিচারকও তার অনুপস্থিতিতে তার অর্থ হতে ব্যয়ের ফায়সালা দিতে পারে না এবং উভয়ের মালিকানার উপস্থিতিতে পৃথক, যদ্বাক্ষর একের পক্ষে অন্যের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়, একরূপ ক্ষেত্রে ভরণ-পোষণ দাতার সচ্ছলতার কারণে পোষ্য ব্যক্তি ওয়াক্ফ বিষয়ে সচ্ছল সাব্যস্ত হবে না। ভাই, বোন ও অপরাপর মাহরাম আত্মীয় এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ওয়াকফের মাসাইল এ মূলনীতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা : কেউ যদি তার গরীব আত্মীয়দের জন্য জমি ওয়াক্ফ করে আর তার এক আত্মীয় আছে বটে, কিন্তু সে ধনী, এখন সে ধনী আত্মীয়ের যদি গরীব সন্তান-সন্ততি থাকে এবং তারা ছোট হয়, অথবা মেয়ে বড় হলেও স্বামীহীনা কিংবা ছেলে বড় হলেও পঙ্গু বা উন্মাদ, তবে এরা কেউ সে ওয়াকফের অংশ পাবে না (যেহেতু সেই ধনী ব্যক্তিরই দায়িত্ব এদের লালন-পালন করা)। যদি সে ধনী আত্মীয়ের গরীব ভাই থাকে বা কর্মক্ষম বড় পুত্র থাকে, কিন্তু সে গরীব, তবে ওয়াকফে তাদের অংশ সংরক্ষিত থাকবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২৩. মাসআলা : গরীব নারীর স্বামী ধনী হলে ঐ নারীকে ওয়াকফের অংশ দেওয়া যাবে না (যেহেতু তার ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্ব)। পক্ষান্তরে ধনবতী স্ত্রীর গরীব স্বামীকে ওয়াকফের অংশ দেওয়া যাবে।

যদি তার ধনী আত্মীয়ের বড় কোন পুত্র থাকে, যে পঙ্গু নয়, কিন্তু গরীব আর সে গরীব পুত্রেরও গরীব সন্তান-সন্ততি থাকে, তবে পুত্রের সন্তান-সন্ততিকে ওয়াকফের কোন অংশ দেওয়া যাবে না। কেননা তাদের খরচাদি তাদের দাদার অর্থ হতেই নির্বাহ করা হবে। কিন্তু তাদের পিতা অর্থাৎ ধনী ব্যক্তির ঔরসজাত সন্তান ওয়াকফের অংশ লাভ করবে। কেননা তার খরচ বহন করা তার পিতার কর্তব্য নয়, যেহেতু সে বড় এবং পঙ্গু নয়। ধনী পুত্রের গরীব পিতাকে ওয়াকফের অংশ দেওয়া যাবে না (কারণ তার ভরণ-পোষণ তার পুত্রের কর্তব্য) (যখীরা)

২৪. মাসআলা : যদি কেউ বলে, আমার জমি আমার গরীব আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ আর তার আত্মীয়দের মধ্যে এক ব্যক্তি ফসল আসার দিনও গরীব ছিল, কিন্তু তার অংশ গ্রহণের

পূর্ব মুহূর্তেই তার অভাব ঘুচে গেল, তো সে ব্যক্তি ফসলের অংশ পাবে। যদি তার আত্মীয়দের মধ্যে কোন মহিলার জমিতে ফসল আসার পর তার বিবাহের ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই সন্তান প্রসব করে তবে এ ফসলে সে সন্তানের কোন অংশ থাকবে না (মুহীত)। পরবর্তী সকল ফসলে সে অংশ লাভ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা : যদি বলে, আমার জমি অমুকের বংশে বা তার পরিবারে কেউ গরীব হলে তার জন্য ওয়াক্ফ, আর সে ব্যক্তির বংশে বা পরিবারে মাত্র একজনই গরীব আছে, সে ক্ষেত্রে সে সমস্ত ফসলের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, অমুকের পরিবারের গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ তা হলে সে একা সমস্ত ফসল পাবে না (আজ-জাহীরিয়া)।

২৬. মাসআলা : আপন দুই ভাই তাদের গরীব আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করল তারপর তাদের আত্মীয়দের মধ্য হতে একজন গরীব লোক আসল, তো এক্ষেত্রে দেখা হবে যে, তারা কি তাদের যৌথ জমি হতে ওয়াক্ফ করেছিল, না প্রত্যেকের আলাদা জমি হতে। যদি যৌথ জমি ওয়াক্ফ করে থাকে, তবে তাকে একজনের খাবার পরিমাণ দেওয়া হবে আর পৃথক জমি হতে ওয়াক্ফ করলে তাকে প্রত্যেকের ওয়াক্ফ হতে পৃথকভাবে তার খাবার দিতে হবে।

২৭. মাসআলা : এ জাতীয় মাসাইলে আহার বা খোরাক (কৃত) বলতে এই পরিমাণ খাদ্য বুঝায়, যা না হলেই নয়। যদি জমি ওয়াক্ফ করা হয় তবে তা থেকে তাকে এক বছরের খোরাক দেওয়া হবে এবং তাতে প্রয়োজনের কমও দেওয়া যাবে না এবং বেশীও নয়। আর ওয়াক্ফ যদি কোন দোকান হয়, তবে তার খোরাক দেওয়া হবে মাসিক হারে (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা : যদি কেউ তার গরীব আত্মীয়দের জন্য জমি ওয়াক্ফ করে তারপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল যে সে গরীব এবং সে ওয়াক্ফ দাতার আত্মীয়ও বটে, তবে তাকে তার আত্মীয়তা ও দারিদ্র্য প্রমাণ করতে হবে। দারিদ্র্যের বিষয়টা যদিও প্রত্যেকের আসল অবস্থা এবং বাহ্যিক হাল দ্বারাই সেটা প্রমাণ হয়। কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা অন্যের দাবী প্রতিরোধই করা যায়, নিজ দাবী প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

যদি সে আত্মীয়তার পক্ষে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে সাক্ষীগণ যতক্ষণ না আত্মীয়তার ধরন ব্যাখ্যা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। অর্থাৎ তাদেরকে বলতে হবে যে, তার যাবিল আরহাম।

যদি দারিদ্র্য সম্পর্কে সাক্ষ্য পেশ করে তবে সাক্ষীদেরকে তার দারিদ্র্যের এই ব্যাখ্যা দিতে হবে যে, সে একজন নিঃস্ব-অসহায়। আমাদের জানা মতে তার অর্থ-সম্পদও নেই এবং এমন কোন অভিভাবক নেই, যে তার ভরণ-পোষণের ভার বহনে বাধ্য।

বিচারক যদি রায় দেয় যে, সে ঠিকই একজন নিঃস্ব ব্যক্তি, তবে এটা অপরের পাওনার ব্যাপারে তার নিঃস্বতা প্রমাণ করবে না। পক্ষান্তরে পাওনাদারদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচারক তার নিঃস্বতার পক্ষে রায় দেয় তারপর সে ওয়াক্ফের অংশ চাইতে আসে, তবে

(নতুন রায়ের দরকার নেই। ঋণ সংক্রান্ত রায়ের ভিত্তিতেই) তাকে ওয়াক্ফের হিস্যা দেওয়া যাবে। হিলাল (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৯. মাসআলা : কিন্তু ফকীহ আবু জাফর (র) বলেন, এতদসঙ্গে এটাও প্রমাণ হওয়া আবশ্যিক যে, তার ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য এমন কোন অভিভাবকও তার নেই। কেননা পাওনাদারদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তার দারিদ্র্যের যে ফায়সালা দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে এ বিষয়টি আসেনি। অথচ ওয়াক্ফের হকদার হওয়ার জন্য এটাও প্রমাণিত হওয়া অপরিহার্য (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩০. মাসআলা : যদি সে সাক্ষী-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে যে, সে এই ওয়াক্ফের মুখাপেক্ষী একজন গরীব এবং তার এমন কোন অভিভাবক নেই, যে তার ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য, তা হলে বিচারক তাকে ওয়াক্ফের তালিকাভুক্ত করবে। তবে ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস)-এর দৃষ্টিতে হিলাল বলেন, আদালত তাকে ওয়াক্ফের তালিকাভুক্ত করার আগে গোপনে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখবে। আমাদের মাযহাবের উলামায়ে কিরাম বলেন, এটাই উত্তম। হিলাল (র) আরো বলেন, সে ব্যক্তি যদি তার দারিদ্র্যের পক্ষে সাক্ষী-প্রমাণ হাযির করে এবং কাযীও গোপনে খোঁজ-খবর নেয় আর তার সে অনুসন্ধান সাক্ষীদের মতই সমর্থন করে যে, সে একজন গরীব লোক এবং তার ব্যয়ভার বহনে বাধ্য এমন কোন অভিভাবক তার নেই, তা হলে বিচারক প্রথমে তার কাছ থেকে এভাবে শপথ গ্রহণ করবে যে, তুমি আল্লাহর নামে কসম করে বল, তোমার কোন অর্থ সম্পদ নেই, তুমি একজন গরীব মানুষ। তারপর তার নাম ওয়াক্ফের তালিকায় দাখিল করবে। আমাদের মাযহাবের ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এটাও উত্তম। হিলাল (র)-এর মত অনুযায়ী তার কাছ থেকে এ মর্মেও শপথ নেওয়া হবে যে, আল্লাহর নামে কসম করে বল, তোমার এমন কোন অভিভাবক নেই, তোমার খরচ বহন যার কর্তব্য। এটাও উত্তম (আয-যাখীরা)।

৩১. মাসআলা : দাবীদার যদি নিজ দারিদ্র্য সম্পর্কে প্রমাণ হাযির করে, অপরদিকে দুজন সংবাদদাতা সংবাদ দেয় যে, সে সচ্ছল, তবে তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং ওয়াক্ফের খাত হিসেবে তাকে গণ্য করা যাবে না।

হিলাল (র) বলেন, ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে সংবাদ ও সাক্ষ্য একই পর্যায়ের। কেননা সাক্ষ্য এক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে সাক্ষ্য নয়, বরং এক রকমের সংবাদই। তারা যদি বলে, আমরা এমন কাউকে জানি না, যার উপর তার ভরণ-পোষণ অবশ্য কর্তব্য, তবে তাদের এতটুকু বলাই যথেষ্ট; নিশ্চিত করে বলা জরুরী নয় যে, তার খরচ বহনকারী অভিভাবক বলতে কেউ নেই, যেমন মীরাসের ক্ষেত্রে জরুরী হয়ে থাকে (আল-ওয়াজীয)।

৩২. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে তার সন্তানের আত্মীয়তা ও দারিদ্র্য প্রমাণ করতে চায়, তবে সন্তানটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে তা করতে পারবে। পক্ষান্তরে সন্তান যদি প্রাপ্ত বয়সের হয়, তবে তার সে অধিকার নেই। কেন না তখন তাদের দারিদ্র্য তাদের নিজেদেরকেই প্রমাণ করতে হবে।

এক্ষেত্রে পিতার নিযুক্ত ওসী (ট্রাষ্টি) পিতারই পর্যায়ভুক্ত। যদি সে শিশুদের পিতা বা পিতা-কর্তৃক নিযুক্ত ওসী না থাকে, কিন্তু তাদের মা, বড় ভাই, চাচা কিংবা মামা থাকে, তবে এ শিশুরা তাদের মধ্যে যার প্রতিপালনাধীন থাকবে, তারই দায়িত্ব হবে এদের আত্মীয়তা ও দারিদ্র্য প্রমাণ করা। এটা ইস্তিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস)- সম্মত সিদ্ধান্ত। তারপর মা, চাচা কিংবা ভাই যদি এমন উপযুক্ত বিবেচিত হয় যে, ওয়াকফের আয় তাদের হাতে ন্যস্ত করা যাবে, তবে শিশুর অংশ তাদের হাতে ন্যস্ত করা হবে এবং তাদেরকে আদেশ করা হবে, যেন এটা শিশুর প্রয়োজনে ব্যয় করে। আর তারা যদি সেরূপ উপযুক্ত বিবেচিত না হয়, তবে অপর কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হাতে রাখা হবে এবং শিশুর প্রয়োজনে তাকে তা খরচ করতে আদেশ করা হবে (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা : কেউ তার একখণ্ড জমি তার গরীব আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করল, তারপর তার আত্মীয়দের কারও সম্পর্কে অপর আত্মীয় দাবী করল যে, তার এই পরিমাণ সম্পদ আছে যাহারা সে ধনী সাব্যস্ত হয়, এ অবস্থায় বাদী যদি তার কাছ থেকে এই মর্মে শপথ নিতে চায় যে, সে আসলে ধনী নয়, তবে তার কাছ থেকে এরূপ শপথ নেওয়ার অধিকার তার থাকবে। যার সম্পর্কে ধনী হওয়ার দাবী, মুতাওয়াল্লী যদি তার পক্ষে কথা বলে এবং দাবীদার ব্যক্তি যদি তাকেও কসম করতে বলে যে, আপনি আল্লাহর নামে কসম করে বলুন যে, আপনার জানা মতে তারা ধনী নয়, তবে সে অধিকার তার নেই (আল-ওয়াকিআতুল-হুসামিয়া)।

৩৪. মাসআলা : বিচারকের কাছে কেউ যদি তার আত্মীয়তা ও দারিদ্র্যের বিষয়টা প্রমাণ করতে পারে, তারপর সে অপর কোন ওয়াকফের অংশ লাভের দাবী নিয়ে আসে, যে ওয়াক্ফ গরীব আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। তবে তাকে পুনরায় প্রমাণ পেশ করতে হবে না। কেননা যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ফে ফকীর সাব্যস্ত হয়েছে, সে অন্য সব ওয়াকফের ক্ষেত্রেও ফকীর বৈকি! এমনিভাবে সে যদি প্রমাণ করতে পারে যে, সে ওয়াক্ফদাতার আত্মীয় এবং বিচারকও সে অনুযায়ী রায় দেয়, তারপর সে এই দাবী নিয়ে আসে যে, ওয়াক্ফ দাতার আপন ভাই তার আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করেছে, আমি তার অংশ চাই, তবে এক্ষেত্রেও তাকে নতুন করে প্রমাণ পেশ করতে হবে না। বিচারক যে দাবীদার সম্পর্কে ফায়সালা দিল তার আপন ভাই যদি আত্মীয়তার দাবী নিয়ে আসে, তখনও নতুনভাবে প্রমাণ পেশের প্রয়োজন নেই (আল-ওয়াজীয)।

৩৫. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি বিচারকের কাছে প্রমাণ পেশ করে যে, তার পূর্ববর্তী বিচারক ইতোপূর্বে ওয়াক্ফ দাতার সংগে তার আত্মীয়তা ও তার দারিদ্র্যের পক্ষে রায় দিয়ে গেছেন, তা হলে সে ফসলে হকদার হবে, যদিও মধ্যবর্তী সময়টা সুদীর্ঘ হয়। এটা কিয়াস-সম্মত সিদ্ধান্ত। তবে আমরা ইস্তিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) অনুযায়ী বলি যে, সময়টা দীর্ঘ হলে বিচারক তাকে তার দারিদ্র্যের পক্ষে পুনরায় প্রমাণ পেশ করতে বলবে।

প্রতি বছর যখন ফসল ফলে সেই সময়ই দারিদ্র্য বিচার করা হবে। সুতরাং এর পূর্বে কেউ গরীব থাকলে এ ফসলে তার অধিকার থাকবে। যে ব্যক্তি এর পরে দরিদ্র হবে সে এতে ভাগ পাবে না। হাঁ এর পরের ফসলে তার হক থাকবে।

কাষী যদি কারও দারিদ্র্যের পক্ষে রায় দেয়, তারপর সে ফসলের ভাগ চাইতে আসে এবং তখন সে ধনী, তার দাবী হচ্ছে যে, আমি সচ্ছল হয়েছি ফসল ফলার পরে, কিন্তু অংশীদারের বক্তব্য, তুমি ফসল আসার আগেই ধনী হয়ে গেছ, এ ক্ষেত্রে কিয়াস অনুযায়ী তার কথাই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত, কিন্তু ইস্তিহসান অনুসারে শরীকদের কথা গ্রহণ করা হবে।

কাষী যদি তার দরিদ্রতা সম্পর্কে ফায়সালা না দিয়ে থাকে, এ অবস্থায় সে ফসলের দাবী নিয়ে আসে, অথচ তখন সে ধনী, আর তার বক্তব্য হচ্ছে, আমি ধনী হয়েছি ফসল আসার পরে। তাহলে এ ক্ষেত্রে তার কথা গৃহীত হবে না। কিয়াস অনুযায়ী তো বটেই, এটা ইস্তিহসানেরও অনুকূল।

যদি ফসলের দাবী নিয়ে আসে, আর নিজেকে গরীব বলে উল্লেখ করে, অন্যদিকে তার শরীকরা বলে, সে একজন গরীব, সেই সংগে তারা তার কাছ থেকে শপথও গ্রহণ করতে চায়, তবে তারা সেটা করতে পারবে। কাষী তার কাছ থেকে এই মর্মে শপথ নেবে-যে, আল্লাহ তা'আলার কসম সে বর্তমানে এমন ধনী নয় যে, শরীকদের সংগে এই ওয়াক্ফে দাখিল হতে এবং এর ফসল গ্রহণ করতে পারবে না।

সাক্ষিগণ যদি ফসল ফলার পরে তার দারিদ্র্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তবে সে ফসলে তার হক থাকবে না। পরবর্তী ফসলে সে অংশীদার হবে। অবশ্য সাক্ষিগণ যদি তার দারিদ্র্যের সময় নিরূপণ করে দেয়, এবং ফসল আসার আগে জমি ওয়াক্ফ করা হয়ে থাকে, তখন সেই ফসলেই তার হক প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা : আত্মীয়গণ যদি ওয়াকফের ক্ষেত্রে পরস্পরে একে অন্যের একে অন্যের দারিদ্র্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তবে তা গৃহীত হবে না। হাঁ সাক্ষিগণ যদি ধনী হয় এবং তাদের কোন এক আত্মীয়ের আত্মীয়তা ও দারিদ্র্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, আর এ সাক্ষ্য দ্বারা তারা নিজেদের কোন স্বার্থ উদ্ধার বা ক্ষতিরোধ না করে থাকে, তবে তাদের সে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম খাস্‌সাফ (র) “গরীব আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ” অধ্যায়ে এরূপ বলেছেন।

৩৭. মাসআলা : ইমাম খাস্‌সাফ (র) উপরোক্ত অধ্যায়ের ঠিক পূর্বের অধ্যায়ে বলেছেন যে, ওয়াক্ফদাতার সংগে আত্মীয়তা প্রমাণিত হয়েছে এমন দুই ব্যক্তি যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ওয়াক্ফদাতার আত্মীয় এবং কোন্ ধরনের আত্মীয় তাও ব্যাখ্যা করে দেয়, তবে সেটা জায়েয। যদি তাদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য না হয়, ফলে বিচারক তা প্রত্যাখ্যান করে তবে তারা যার সম্পর্কে ওয়াক্ফদাতার আত্মীয় হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছিল, তার এই অধিকার আছে যে সেই দুই ব্যক্তি ওয়াক্ফ হতে যতটুকু অংশ পেয়েছে তাতে সে शामिल হয়ে যাবে এবং তাতে তাদের অংশীদার হবে (আয-যাখীরা)।

৩৮. মাসআলা : হিলাল (র) তাঁর ওয়াক্ফ-বিষয়ক রচনায় বলেন, অনাত্মীয় দুজন লোক যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ওয়াক্ফদাতার আত্মীয় এবং দুজন আত্মীয় তার দারিদ্র্যের সাক্ষ্য দেয়, তবে তাদের সাক্ষ্য বিনা ব্যাখ্যায় গ্রহণযোগ্য হবে।

হিলাল (র) তার উপযুক্ত রচনায় আরও লেখেন যে, ওয়াক্ফকারীর কোনও আত্মীয় যদি নিজেকে ধনী বলে স্বীকার করে, তারপর সে ওয়াক্ফদারী নিয়ে আসে এবং দাবী করে আমি গরীব; ওয়াক্ফের জমিতে ফসল আসার আগেই গরীব হয়ে পড়েছি, তবে তার কথা গ্রহণ করা হবে না-যদিও তখন সে বাস্তবিকই গরীব হয়। যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয় যে, ফসল আসার আগে তার সমস্ত ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে, তাহলে অবশ্য ফসলের হকদার হবে সাক্ষীরা যদি বলে, তাকে তার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং কাযীর সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকে, তবে যে সম্পদ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে তার যদি তা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে এখন তাকে ওয়াক্ফের অংশীদার করা হবে না (আল-মুহীত)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : প্রতিবেশীদের জন্য ওয়াক্ফ

১. মাসআলা : প্রতিবেশীদের জন্য ওয়াক্ফ করলে কিয়াস অনুযায়ী ওয়াক্ফকারীর পার্শ্ব প্রতিবেশীরাই কেবল অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) অনুযায়ী ওয়াক্ফকারীর সাথে মহল্লার মসজিদে একত্রে সালাত আদায়কারী সকল প্রতিবেশী অন্তর্ভুক্ত হবে (আল-মুহীত)। এ মতই গ্রহণযোগ্য (আল-গিয়াছিয়া)।

২. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাবের প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিবেশী হওয়ার জন্য, কেবল 'বাস' করাটাই শর্ত, তাতে সে বাসিন্দা বাড়ির মালিক হোক বা নাই হোক। এটাই সহীহ (মুহীত)।

৩. মাসআলা : বাড়ির বাসিন্দা যদি মালিক না হয়, তবে ওয়াক্ফের হকদার মালিক নয়, বরং সেই বাসিন্দাই হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা : এরূপ ওয়াক্ফে মুসলিম, কাফির, পুরুষ, নারী, বড়, ছোট এবং স্বাধীন ও মুকাতাব(নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের চুক্তিতে আবদ্ধ গোলাম) -নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীই शामिल থাকবে। মাথা-পিছু হারে তাদের মধ্যে ওয়াক্ফের অর্থ বন্টন করা হবে। ওসী (ট্রাস্ট) যদি কাউকে বেশী দেয়, তবে তার জরিমানা দিতে হবে (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা : উম্মু ওয়ালাদ (যে ক্রীতদাসীর গর্ভে মুনীব সন্তান উৎপাদন করেছে), মুদাববার (যে গোলাম সম্পর্কে মুনীব ঘোষণা করেছে যে, সে তার মৃত্যুর পর স্বাধীন হয়ে যাবে) এবং সাধারণ গোলাম এরূপ ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না (আল-খুলাসা:)।

৬. মাসআলা : এমনিভাবে সেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিও নয়, যাকে ঋণের দায়ে তার মহল্লায় আটকে রাখা হয়েছে (আল-ওয়াজীয)। ওয়াক্ফদাতার পুত্র, পিতা, দাদা ও স্ত্রীও তার ওয়াক্ফের হিস্যাদার হবে না (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা : পৌত্র যদি প্রতিবেশী হয়। তবে সেও ইসতিহসান অনুযায়ী ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে না (খাযানাতুল-মুফতীন)।

৮. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতার ভাই, চাচা ও মামার জন্য ওয়াক্ফ প্রযোজ্য হবে (আজ-জাহীরিয়া ; আল-মুহীত)

৯. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতার যদি একাধিক প্রতিবেশী থাকে, তারপর তাদের কতিপয় তাদের ঘরবাড়ি বিক্রি করে অন্য মহল্লায় চলে যায় এবং জমিতে ফসল ফলার পর তা তোলার আগে আগেই অপর কিছু লোক এসে সে মহল্লায় বসবাস শুরু করে, তবে এক্ষেত্রে কেবল এটাই বিবেচ্য হবে যে, ফসল বন্টনের সময় কে কে প্রতিবেশী আছে, (ব্যস তাদের মধ্যেই তা বন্টন হবে)।-ফাতাওয়ায়ে কাযীখান।

১০. মাসআলা : যদি কেউ প্রতিবেশীদের জন্য ওয়াক্ফ করে, তারপর যে যে মহল্লায় বাড়ি ত্যাগ করে অন্য মহল্লায় চলে যায় এবং সেখানে বাড়ি ভাড়া করে বাস করতে থাকে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থাকে, তবে সেই দ্বিতীয় মহল্লার প্রতিবেশীরাই ফসলের অধিকারী হবে, যেই মহল্লায় গিয়ে সে মৃত্যু পর্যন্ত থাকল (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : কেউ তার প্রতিবেশীদের জন্য ওয়াক্ফ করার পর যদি পবিত্র মক্কায় চলে যায় এবং সেখানেই তার ইন্তিকাল হয়ে যায় তবে মক্কা মুকাররমায় যদি সে বাড়ি করে থাকে, তবে তার সেখানকার প্রতিবেশীদের মধ্যেই ফসল বন্টন হবে। আর যদি সে হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্যে গিয়ে থাকে, তবে তার দেশস্থ প্রতিবেশীরাই সে ফসলের অধিকারী হবে (আয-যাহীরিয়া)।

১২. মাসআলা : কারও যদি দুটো বাড়ি থাকে এবং সে তার একটিতে বাস করে এবং অন্যটি ভাড়া খাটায়, তবে যে বাড়িতে বাস করে তার আশেপাশে যারা বাস করে সেই প্রতিবেশীরাই ফসলের হকদার হবে (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা : যদি দুই বাড়িতে দুই স্ত্রী থাকে যে বাড়িতে তার মৃত্যু হোক উভয় বাড়ির প্রতিবেশীরা ওয়াক্ফের ফসল পাবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : এমনিভাবে তার এক বাড়ি বসরায় এবং অন্যটি কুফায় অবস্থিত হয় এবং উভয় বাড়িতেই এক একজন স্ত্রী থাকে সেক্ষেত্রেও উভয় স্থানের প্রতিবেশীরা ফসলের অধিকারী হবে (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা : কোন লোক যদি তার গরীব প্রতিবেশীদের জন্য ওয়াক্ফ করার পর মারা যায়, তারপর তার ওয়ারিসগণ সে বাড়ি বিক্রি করে অন্য এলাকায় চলে যায়, তবে তার মৃত্যুকালীন প্রতিবেশীরাই ওয়াক্ফের ফসল পাবে। ওয়ারিসদের সে বাড়ি বিক্রি করলে কিছু যায় আসে না (খাযানাতুল-মুফতীন, আল-হুমায়দীর বরাতে)।

১৬. মাসআলা : যদি কেউ গরীব প্রতিবেশীদের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং প্রতিবেশীদেরকে নিজের সংগে সম্পর্কযুক্ত না করে অর্থাৎ এরূপ বলল না যে আমার গরীব প্রতিবেশীদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম তবে সেটা আমার গরীব প্রতিবেশীদের জন্য বলার মতই (আজ-জাহীরিয়া)।

১৭. মাসআলা : কেউ যদি মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় তার পুত্র তাকে অন্য মহল্লায় বা অন্য পল্লীতে স্থানান্তরিত করে এবং তারপর মারা যায় তবে পূর্বের প্রতিবেশীরাই ওয়াক্ফের ফসল পাবে, এই স্থানান্তর ধর্তব্য হবে না (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা : কোন মহিলা একটি বাড়িতে বাস করত। সেখানে থাকা অবস্থায় সে প্রতিবেশীদের জন্য ওয়াক্ফ করেছিল। তারপর তার বিয়ে হল এবং স্বামীর বাড়িতে চলে গেল। তারপর সেখানেই তার মৃত্যু হল। এ অবস্থায় স্বামীর প্রতিবেশীরাই তার প্রতিবেশী গণ্য হবে। এমনিভাবে কেউ কোন নারীকে বিয়ে করার পর যদি স্ত্রীর বাড়িতেই বসবাস শুরু করে দেয় তবে তার প্রতিবেশীও বদলে যাবে (আজ-জাহীরিয়া)।

১৯. মাসআলা : ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, উপরিউক্ত অবস্থায় লোকটির মালপত্র যদি তার নিজ বাড়িতে থাকে তবে, আগের প্রতিবেশীরাই ফসলের অধিকারী হবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা : যদি সে সম্পূর্ণরূপে স্থান পরিবর্তন না করে, বরং স্ত্রীর বাড়িতে আসা-যাওয়া করে, তবে তার নিজ বাড়ির প্রতিবেশীরাই তার প্রতিবেশী গণ্য হবে, স্ত্রীর বাড়ির প্রতিবেশীরা নয় (আল-হাবী)।

২১. মাসআলা : কেউ যদি তার গরীব প্রতিবেশীদের জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে বিধবা প্রতিবেশীরা তার অন্তর্ভুক্ত হবে, সধবাগণ নয় (আজ-জাহীরিয়া)।

২২. মাসআলা : (ওয়াক্ফের পর যদি মারা যায় এবং) যদি জানা যায় যে, তার প্রতিবেশী কারা তবে যতক্ষণ না সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, কোন বাড়িতে থাকাকালে তার মৃত্যু হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফসল বন্টন করা যাবে না। যে বাড়িতে মৃত্যু প্রমাণিত হবে সেই বাড়িতে প্রতিবেশীদের মধ্যে তা বন্টন করা হবে।

যদি কোন প্রতিবেশী নিজেকে ফকীর বলে দাবী করে, তবে তাকে তার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে।

ওয়াক্ফদাতা বা তার ওসী (ট্রাস্টি) যদি বলে যে, আমি গরীব প্রতিবেশীদের মধ্যে ফসল বন্টন করে দিয়েছি, তবে কসমের সংগে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও প্রতিবেশীগণ তা অস্বীকার করে (আল-হাবী)।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : আহলে বায়ত, আল, জিনস ও 'আকিব-এর জন্য ওয়াক্ফ

১. মাসআলা : কেউ যদি আহলে বায়ত (জাতি/গোষ্ঠী)-এর জন্য জমি ওয়াক্ফ করে, তবে পিতৃপুরুষের দিক থেকে যারা তার সর্বোচ্চ মুসলিম পূর্বপুরুষের সংগে মিলিত হবে তারা সকলেই সে ওয়াক্ফের আওতায় পড়বে। এতে মুসলিম-অমুসলিম, নর-নারী, মাহরাম-গাইবে মাহরাম, নিকটাত্মীয়-দূর আত্মীয় সকলেই সমান। তবে সর্বোচ্চ পূর্ব-পুরুষ তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। ওয়াক্ফকারীর পুত্র ও পিতা তার অন্তর্ভুক্ত হবে। দৌহিত্র ও ভাগ্নেগণ অন্তর্ভুক্ত হবে না। এমনিভাবে অন্যান্য নারীদের সন্তান-সন্ততিও তাতে দাখিল হবে না, তবে সে নারীদের স্বামীগণ যদি ওয়াক্ফদাতার চাচতো ভাই সম্পর্কিত হয়, তবে তাদের সন্তান-সন্ততি ওয়াক্ফের হকদার হবে (আয-যাহীরিয়া)।

২. মাসআলা : 'আস-সিয়ারুল-কাবীর'-এর ভাষ্যে শামসুল-আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, 'ওয়াক্ফ' বা 'ওসীয়েতে' যদি 'আহলে বায়ত' বা ঘরের লোক শব্দ ব্যবহার করে,

তবে তার নিয়ত লক্ষ্য করা হবে। যদি বায়তুন-সুকনা' অর্থাৎ তার ঘরের বাসিন্দাদেরকে বুঝিয়ে থাকে, তবে ঘরের বাসিন্দাদের মধ্যে যাদের ভরণ-পোষণ সে নির্বাহ করে থাকে তারাই অন্তর্ভুক্ত হবে যদিও তাদের সংগে তার কোন আত্মীয়তা না থাকে। আর যদি 'বায়তুন-নাসাব' বংশের লোক বুঝিয়ে থাকে, তবে এমন সব লোককে বুঝাবে, যারা তার পিতার বংশধর হিসাবে পরিচিত।

কাযী ইমাম 'আলী আস-সুগদী (র) বলেন, ওয়াক্ফদাতার যদি 'আরবদের মত 'বায়তুন-নাসাব' থাকে, তবে তার 'আহলে বায়ত' বলতে তার পিতার সমস্ত আওলাদ ফারযন্দকে বুঝাবে, যদিও তারা তার প্রতিপালনাধীন (ইয়াল) হয়। আর যদি 'বায়তুন-নাসাব' না থাকে, তবে-তার 'আহলে বায়ত' হবে তার সেইসব পোষ্য যারা তার ঘরে বাস করে এবং যাদের খরচ সে বহন করে। অন্য কেউ এতে शामिल হবে না, যদিও তাদের সংগে কোনরূপ আত্মীয়তা থাকে। এটাই গ্রহণযোগ্য মত (আয-যাহীরিয়া)।

৩. মাসআলা : কেউ যদি তার 'আহলে বায়ত'-এর জন্য ওয়াক্ফ করে, তবে তার বংশের তখনকার জীবিত ব্যক্তিগণ এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরগণ তার অন্তর্ভুক্ত হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : 'আল'(বংশধর) ও জিনস (গোষ্ঠী)-এর জন্য ওয়াক্ফ করলে সেটা 'আহলে বায়ত'-এর জন্য ওয়াক্ফ করারই সমার্থবোধক। এর দ্বারা বিশেষভাবে গরীবদেরকে বুঝানো হবে না, যদি না সে বিশেষভাবে তাদের কথা বলে। যদি বলে, 'তাদের মধ্যে যারা গরীব' বা 'তাদের মধ্যে যারা গরীব হয়ে যাবে', তবে উভয়ের একই হুকুম হবে, কাজেই ফসলের সময় যারা গরীব থাকবে, তারা তার হকদার হবে, যদিও ওয়াক্ফ করার সময় তারা ধনী থেকে থাকে। যারা ধনী থাকার পর গরীব হয়ে যাবে বিশেষভাবে তাদেরকেই বুঝাবে না। এটাই সহীহ মত (ফাতহুল-কাদীর)।

৫. মাসআলা : যদি স্ত্রীলোক তার 'আহলে বায়ত'-এর জন্য ওয়াক্ফ করে, বা তার 'জিনস' (গোষ্ঠী)-এর জন্য, তবে তার 'মা' ও সন্তান তার আওতায় পড়বে না (খায়ানাতুল-মুফতীন)।

৬. মাসআলা : যদি কেউ বলে, আবদুল্লাহর আহল বা ঘর -এর জন্য ওয়াক্ফ করলাম তবে বিশেষভাবে আবদুল্লাহর স্ত্রীকে বুঝাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত, তবে হিলাল (র) বলেন, এক্ষেত্রে আমরা ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস)-এর অনুসরণ করব এবং সে হিসেবে আবদুল্লাহর গৃহ মধ্যে যারা স্বাধীন এবং তার পোষ্য, তারা এর অন্তর্ভুক্ত হবে (আল-হাবী)। এটাই গ্রহণযোগ্য (আল-গিয়াহিয়া)। তার কোন ক্রীতদাসের ক্ষেত্রে এ ওয়াক্ফ প্রযোজ্য হবে না (আল-মুহীত)। এমনিভাবে আবদুল্লাহ নিজে এবং সে অন্য গৃহে যাদের প্রতিপালন করে তারাও এর আওতায় আসবে না (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা : 'ইয়াল (পোষ্য) বলতে এমনসব লোককে বুঝায়, যারা কোন ব্যক্তির খরচে প্রতিপালিত হয়, তা তারা সেই ব্যক্তির গৃহে বাস করুক কিংবা অন্য গৃহে। 'হাশম' শব্দটিও 'ইয়াল'-এর পর্যায়ভুক্ত (খায়ানাতুল-মুফতীন)।

৮. মাসআলা : কেউ যদি কারও 'আকিব' (অধস্তন পুরুষ)-এর জন্য ওয়াক্ফ কবে, তবে কোন ব্যক্তির আকিব বলতে এমন সব লোককে বুঝাবে, যারা তাদের পিতৃ-পুরুষদের ধারায় সেই ব্যক্তির সংগে মিলিত হয়। কন্যাদের সন্তান-সন্ততি (দৌহিত্র-দৌহিত্রী) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যদি না সে কন্যাদের স্বামীগণ সেই ব্যক্তির বংশধর হয়। এমনিভাবে তাদের ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীলোকদের আওলাদও এ ওয়াক্ফের আওতায় আসবে না, যদি না তাদের স্বামীগণ সেই ব্যক্তির বংশধর হয়।

যদি কেউ যায়দ ও তার 'আকিব'-এর জন্য ওয়াক্ফ করে, এ ক্ষেত্রে যায়দের যদি সন্তান-সন্ততি থাকে এবং সে নিজে জীবিত থাকে, তবে তার সন্তান-সন্ততি কিছুই পাবে না। কেননা কোন ব্যক্তির জীবদ্দশায় তার আওলাদকে 'আকিব বলা হয় না। এটা বলা হয় ব্যক্তির মৃত্যুর পর (আল-মুহীত)।

সপ্তম অনুচ্ছেদ : মাওলা, মুদাক্বার, উম্মু ওয়ালাদের জন্য ওয়াক্ফ

১. মাসআলা : জন্মগত স্বাধীন ব্যক্তি যদি বলে, আমার এ জমি আমার সকল মাওলার জন্য ওয়াক্ফ, তারপর গরীবদের জন্য, এর বেশী কিছু সে বলল না, তো সে ব্যক্তির যদি একাধিক মাওলা, তথা আযাদকৃত গোলাম থাকে, তবে সমস্ত ফসল তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে আর তার সব রকমের আযাদপ্রাপ্ত গোলাম-বান্দী এর অন্তর্ভুক্ত হবে, তা তারা ওয়াক্ফের পূর্বে আযাদী লাভ করুক বা পরে এমনিভাবে তার উম্মু ওয়ালাদ বা মুদাক্বার হোক, যারা ওয়াক্ফদাতাদের মৃত্যুর পর স্বাধীন হয়ে গেছে। অনুরূপ যে গোলাম ওয়াক্ফদাতার ওসীয়াত অনুযায়ী তার মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে গেছে সেও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম এবং নর-নারী ও ভেদাভেদ নেই। মাওলা তথা আযাদপ্রাপ্তদের সন্তান-সন্ততি এর আওতায় আসবে, যেহেতু ওয়াক্ফদাতা ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই (আল-হাবী)।

২. মাসআলা : আযাদপ্রাপ্ত দাসীদের সন্তান-সন্ততি ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি তারা তাদের পিতৃ-পুরুষদের 'ওয়ালা' (আযাদীসূত্রে মুনীব-গোলামের মধ্যকার উত্তরাধিকার সম্পর্ক)-এর ভিত্তিতে ওয়াক্ফদাতার সংগে মিলিত হয়। কিন্তু তাদের পিতৃ-পুরুষের 'ওয়ালা' যদি অন্য বংশের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তবে তারা ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে না (খায়ানাতুল-মুফতীন)।

৩. মাসআলা : আযাদকৃত গোলাম (মাওলা) কতক যারা আযাদপ্রাপ্ত হয়, সেই মাওলাগণ ওয়াক্ফদাতার ওয়াক্ফে দাখিল হবে না। অবশ্য ওয়াক্ফদাতার মাওলা মারা গেলে ইসতিহসানের ভিত্তিতে ঐ মাওলার মাওলাদের মধ্যে ফসল বণ্টন করা হবে।

মাওলা একজন হলে সে ফসলের অর্ধেক পাবে। বাকি অর্ধেক গরীবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। মাওলার মাওলাগণ কিছুই পাবে না। মাওলা দুজন হলে তারা সমস্ত ফসলের অধিকারী হবে (আল-হাবী)।

৪. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতার পুরুষ ও নারী উভয় রকমের মাওলা থাকলে ফসল তাদের মধ্যে সমান হারে বণ্টন করা হবে। যদি কোন নারী মাওলা থাকে, তাদের সংগে কোন পুরুষ মাওলা না থাকে তবে সমস্ত ফসল নারী মাওলাগণই পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা : যদি কারও মাওলা 'আতাকা' (আযাদপ্রাপ্ত গোলাম) এবং মাওলা মুওয়ালাত' থাকে, তবে মাওলা 'আতাকা' ফসলের অধিকারী হবে। যদি কেবল মাওলা মুওয়ালাত থাকে, তবে ইসতিহসান অনুযায়ী তাদেরকে ফসল দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা : যদি কারও নিজের মাওলা থাকে এবং সেই সংগে পুত্রেরও মাওলা থাকে আর তারা তার পিতা হতে উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে, তবে ওয়াক্ফের ফসল তার নিজ মাওলাগণ পাবে, পুত্রের, মাওলাগণ কিছুই পাবে না। তবে মাওলা যদি কেবল পুত্রেরই থাকে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে পুত্রের মাওলাগণের মধ্যে ফসল বণ্টন করা হবে। এটাই হিলাল (র)-এর মত এবং এটা ইসতিহসানসম্মত (আয-যাহীরিয়া)।

৭. মাসআলা : যদি বলে আমার ও আমার পিতার মাওলাবৃন্দের জন্য ওয়াক্ফ করলাম তবে দাদার আযাদকৃত গোলাম তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি বলে আমার আহলে বায়তের মাওলাবৃন্দের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে স্ত্রীর মাওলাগণ কিছুই পাবে না। এমনিভাবে মামাদের মাওলাগণও তার অন্তর্ভুক্ত হবে না, তবে তারা যদি তার আহলে বায়তের লোক হয়ে থাকে, তবে ভিন্ন কথা। যদি বলে, 'আব্বাসের খানদানের মাওলাগণের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে তাদের মাওলাবৃন্দের মাওলাগণ কিছুই পাবে না (আল-হাবী)।

৮. মাসআলা : যদি বলে, আমার মাওলাবৃন্দ, তাদের সন্তান-সন্ততি এবং তাদের নসল (আওলাদের আওলাদ)-এর জন্য ওয়াক্ফ করলাম তবে তার মাওলাগণ, তাদের আওলাদ এবং তাদেরও আওলাদ-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই তার আওতায় পড়বে। মাওলার দৌহিত্র তার অন্তর্ভুক্ত হবে যদিও তাদের 'ওয়ালা' অন্য বংশের হয়। এমনিভাবে তার মা যদি ওয়াক্ফদাতার মাওলা এবং পিতা স্বাধীন আরবী হয়, তখনও সে ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে।

নসল (আওলাদ) বলতে পুত্র-কন্যা উভয়ের সন্তান-সন্ততিকে বুঝায়। যদি মাওলাবৃন্দের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক মারা যায় এবং তার এক পুত্র থাকে, এদিকে ওয়াক্ফকারীরও এমন কোন শর্ত ছিল না যে, তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার অংশ তার পুত্রের হাতে ফিরে আসবে, সে ক্ষেত্রে মৃত মাওলার অংশ অন্যসব মাওলার মধ্যে বণ্টন করা হবে। আবুল-কাসিম (র) এরূপ ফাতওয়া দিয়েছেন। যদি বলে, আমি ওয়াক্ফ করলাম আমার মাওলাবৃন্দ, তাদের আওলাদ ও তাদের নসলের সেই সব লোকের জন্য যাদের ওয়ালা আমার অধিকারভুক্ত তা হলে কন্যাদের আওলাদের মধ্যে যারা অন্য বংশের মাওলা তারা সে ওয়াক্ফের আওতায় আসবে না।

যদি বলে, আমি আমার যে সব গোলামকে আযাদ করব, বা আমার পক্ষ হতে যারা আযাদপ্রাপ্ত হবে, তা হলে ইতোপূর্বে যারা আযাদপ্রাপ্ত হয়ে গেছে তাদের সন্তান এর অন্তর্ভুক্ত হবে না (আল-হাবী)।

১. ব্যক্তি নিজেকে অন্য ব্যক্তির হাতে সপে দিয়ে বলে, আমি এই শর্তে আপনাকে আমার অভিভাবক বানালাম যে, আমি মারা গেলে আপনি আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন, এরূপ ব্যক্তিকে মাওলা মুওয়ালাত বলে (আল-বাহরুর-রায়িক : ৯/৩৮৪)।

কোন লোক তার বাড়ি বা জমি মাওলা ও মাওলার সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করল, তারপর কোন মাওলার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করল, তাই তার সে তার জন্মের আগে হয় মাসের অংশ পাবে। তার আগে যা বন্টন হয়েছে নবজাতক তাতে কোন অংশ পাবে না। আর জমির যে ফসল তার জন্মের আগে হয় মাসের কম সময়ের মধ্যে ফলেছে তাতে তার অংশ থাকবে (আল-ওয়াকিআতুল-হুসামিয়া)।

৯. মাসআলা : যদি বলে, আমার মাওলাবৃন্দের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, অথচ সে ও তার ভাই মিলে আবাদ করেছিল একটি গোলাম, তবে সে গোলাম ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি বলত, যার 'ওয়ালা'-আমার অধিকারে আসবে, তার জন্য ওয়াক্ফ করলাম, আর তার পিতা একটি গোলাম আবাদ করেছিল, যার উত্তরাধিকারী হয়েছে সে ও তার ভাই। এক্ষেত্রে সে গোলাম ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যদি বলে আমার ঐ সব মাওলার জন্য ওয়াক্ফ করলাম, যারা আমার পুত্রের সংগে জড়িত থাকবে। এক্ষেত্রে যারা তার সংগে ত্যাগ করবে, তারা কিছুই পাবে না। তবে আবার ফিরে আসলে তাদের হকও ফিরে আসবে (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা : যদি বলে, ওয়াক্ফ করলাম আমার মাওলাবৃন্দের জন্য, তাদের মাওলাবৃন্দের জন্য, এবং তাদেরও মাওলাবৃন্দের জন্য, তা হলে চতুর্থ স্তরের মাওলাগণও এতে शामिल থাকবে এবং তাদের পরবর্তী স্তরের যারা তারাও এটা ঠিক আওলাদ (সন্তান)-এর অনুরূপ (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : 'আল-ইয়াতীমা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী ইব্ন আহমদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেউ যদি তার মাওলাবৃন্দ ও প্রজন্ম পরম্পরায় তাদের মাওলাদের জন্য এবং কোনও ব্যক্তির আওলাদ ও তার আওলাদের আওলাদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করে এরপর অপর শ্রেণীর কোনও একজন মারা যায় এবং তার আওলাদ থাকে, তা হলে মৃত ব্যক্তির অংশ কে পাবে? তার আওলাদরা পাবে, না কি প্রথম স্তরের যারা জীবিত থাকবে তারা? উত্তরে তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির অংশ তার আওলাদের মধ্যে বিতরণ করাই উত্তম (আত-তাতার খানিয়া)।

১২. মাসআলা : যেই ব্যক্তির বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত তার সম্পর্কে যদি ওয়াক্ফদাতা স্বীকারোক্তি দেয় যে, সে তার মাওলা (আবাদকৃত গোলাম), আর সেই ব্যক্তিও তা সত্যায়ন করে, সেই সংগে তার যেমন বংশ-পরিচিতি নাই, তেমনি অন্য কারও সংগে 'ওয়ালা' (গোলামী সূত্রের উত্তরাধিকার)-এর সম্বন্ধ না থাকে, তা হলে তার জন্য ওয়াক্ফ প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা : উপরিউক্ত মাসআলা কেবল সেই মত ফসলের ক্ষেত্রে বর্তাবে, যা ওয়াক্ফ দানের পরে জন্মেছে। যে ফসল ওয়াক্ফ দানের পূর্বে বা উপরিউক্ত স্বীকারোক্তির পরে জন্মেছে তার জন্য উপযুক্ত জবাব প্রযোজ্য নয় (আল-মুহীত)।

ওয়াক্ফদাতার যদি দু'রকমের মাওলা থাকে তাকে যারা আবাদ করেছে সেই মাওলা এবং সে যাদেরকে আবাদ করেছে সেই রকমের মাওলা, তা হলে কোনও শ্রেণীর মাওলাই ওয়াক্ফের ফসল পাবে না, বরং তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : যদি বলে এই জমি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে আমার উম্মু ওয়ালাদ এবং মহিলা মুদাব্বরগণের জন্য স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ, তবে সে ওয়াক্ফ জায়েয, পক্ষান্তরে যদি অর্থের বিনিময়ে আবাদকৃত গোলাম বা মুকাতার-এর কথা বলে, তবে জায়েয হবে না। তা প্রথম অবস্থায় যখন ওয়াক্ফ জায়েয হল, তখন ফসলের অধিকারী হবে কেবল সেই সব মুদাব্বার ও উম্মু ওয়ালাদ, যারা ওয়াক্ফকারীর অধীনে থাকবে, যদিও সে তাদের বিবাহ দিয়ে দেয়। এই ওয়াক্ফের আগে সে তার জীবদশায় যে সব উম্মু ওয়ালাদকে আবাদ করে দিয়েছে তারা এতে অংশীদার হবে না। কেন না তারা ওয়ালা (গোলামী সূত্রের উত্তরাধিকারী)-এর কারণে ভিন্ন নামে পৃথক হয়ে গেছে। এখন তারা উম্মু ওয়ালাদ নয়, বরং 'মাওলা' হয়ে গেছে। কাজেই তারা এরূপ ওয়াক্ফের মধ্যে দাখিল হবে না, যাবত না ওয়াক্ফকর্তা স্পষ্টভাবে তাদের কথাও বলে দেয়' (আল-সিরাজুল-ওয়াহাজ)।

১৫. মাসআলা : যদি তার কেবল এরকম উম্মু ওয়ালাদই থাকে, যাকে সে জীবদশায় আবাদ করে দিয়েছে, তবে ওয়াক্ফের ফসলে তার অধিকার থাকবে (আল-হাবী)।

১৬. মাসআলা : যদি বলে, যাদের উম্মু ওয়ালাদগণের জন্য ও তার নারী মাওলাদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তা আর যাদের দু'রকমের উম্মু ওয়ালাদ আছে। কতককে সে আবাদ করে দিয়েছিল এবং কতককে আবাদ করেনি, তবে সে ফসল তার যে সব উম্মু ওয়ালাদকে আবাদ করেনি তাদের এবং নারী মাওলাদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যাদেরকে সে আবাদ করে দিয়েছিল তারা নারী মাওলাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা : যদি বলে, আমার জমি আমার মৃত্যুর পর আমার মাওলাদের জন্য ওয়াক্ফ তবে তার উম্মু ওয়ালাদ ও মুদাব্বরগণকেও সে ওয়াক্ফের অংশ দেওয়া হবে (ফাতাওয়া কাযী খান)।

১৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি বলল, আমার এই জমি যাদের গোলাম সালিমের জন্য ওয়াক্ফ করলাম। তারপর যাদ সে গোলামকে বিক্রি করে দিল। তবে সে ফসল সালিমেরই থাকবে, তা সে যেখানেই থাক এবং সেটা গ্রহণকারী ইখতিয়ারও তারই, মুনীবের নয়। তা সে জমিতে ফসল আসার সময় যে ব্যক্তি সালিমের মালিক থাকবে, সে-ই ফসল পাবে (আল-হাবী)।

১৯. মাসআলা : যদি সে জমি যাদের গোলাম সালিমের জন্য এবং তার পর মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ করে তারপর যাদ সালিমকে বিক্রি করে দেয় তবে তার ফসল যাদই পাবে,

১. মাওলা শব্দটি বিপরীত দুই অর্থবোধক। আবাদকৃত গোলামকে যেমন আবাদকারীর মাওলা বলে, তেমনি আবাদকারীকেও আবাদকৃতের মাওলা বলা হয়।

তা সে যেখানেই থাক। যদি ওয়াক্ফদাতা নিজে সালিমের মালিক হয়ে যায়, তবে সালিমের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে (খায়ানাতুল-মুফতীন : আল-মুহীত)

২০. মাসআলা : যদি বলে, আমার গোলাম সালিমের জন্য ওয়াক্ফ এবং তার পরে মিসকীনদের জন্য, তবে সমস্ত ফসল মিসকীনদের হবে। সালিম ও ওয়াক্ফদাতা তার কোন অংশ পাবে না।

ওয়াক্ফদাতা যদি সালিমকে অন্য কারও কাছে বিক্রি করে ফেলে, তবুও সালিম কিংবা তার সেই মুনবি ওয়াক্ফের কিছুই পাবে না। বস্তুত ওয়াক্ফ বৈধ করা হয়েছে ওয়াক্ফদাতার উম্মু ওয়ালাদ ও মুদাক্বারদের জন্য, সাধারণ গোলামদের জন্য নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) এই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন, তিনি বলেন, উম্মু ওয়ালাদ ও মুদাক্বারের জন্য বৈধ এ কারণে যে, এক পর্যায়ে স্বাধীনতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, সাধারণ গোলামদের মধ্যে তা নেই (আয-যাহীরিয়া)।

২১. মাসআলা : আবু হামিদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যে জমি মাওয়ালী অর্থাৎ আবাদকৃত গোলামদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, সেই জমি যদি তারা চষাবাদের জন্য বণ্টন করতে চায়, তারা সেটা পারবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ তা পারবে, যদি হিফায়ত ও চষাবাদের সুবিধার্থে বণ্টন করা হয়, মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য না হয় (আত-তাতার খানিয়া, আল-ইয়াতীমার বরাতে)।

অষ্টম অনুচ্ছেদ : গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করার পর ওয়াক্ফদাতা নিজে বা তার কোন সন্তান কিংবা আত্মীয় গরীব হয়ে গেলে

১. মাসআলা : ফাতাওয়ায় আছে কেউ গরীব-মিসকীনদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করার পর তার কোন আত্মীয় কিংবা ওয়াক্ফদাতা নিজেই গরীব হয়ে গেলে সে ওয়াক্ফের ফসল হতে তাদেরকে কিছুই দেওয়া যাবে না। এটা সকলের মত (আল-খুলাসা)।

২. মাসআলা : কেউ যদি সুস্থাবস্থায় বলে, আমার জমি আমার পর গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ, আর সে এ ওয়াক্ফ করল তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতর থেকে, কিংবা সে এ কথা বলেছিল তার অসুস্থাবস্থায় এবং তারপর সে একটি শিশু কন্যা রেখে মারা গেল, তো এই ওয়াক্ফ হতে তার শিশু কন্যাকে কিছুই দেওয়া যাবে না। এই সব বিবরণ আবুল-কাসিম (র) হতে বর্ণিত আছে। সাদরুশ শাহীদ হুসাসুদ-দীন (র) বলেন, এ অনুযায়ীই ফাতাওয়া দেওয়া হয়ে থাকে (আল-গিয়াছিয়া)।

৩. মাসআলা : যদি সুস্থ অবস্থায় ওয়াক্ফ করে এবং তার কোন আত্মীয় কিংবা তার কোন সন্তান অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিধান রয়েছে:

এক. ওয়াক্ফের ফসল গরীব আত্মীয়দের মধ্যে বিতরণ করাই উত্তম। যদি কিছু বেঁচে থাকে, তবে তা অনাত্মীয়দেরকে দেওয়া হবে।

দুই. জমিতে ফসল আসার দিন যারা গরীব হয়ে গেছে, তাদের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। যে দিন ফসল বণ্টন করা হবে সে দিন যারা গরীব থাকবে তাদেরকেই তা দেওয়া হবে।

তিন. আত্মীয়তায় নৈকট্যের ক্রমানুসারে বণ্টন করা হবে। অর্থাৎ প্রথম দেওয়া হবে ঔরসজাত সন্তানকে, তারপর সন্তানের সন্তানকে, তারপর তৃতীয় প্রজন্মকে, তারপর চতুর্থ প্রজন্মকে এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে নিচের দিকে। যদি এভাবে নিচের দিকে কেউ না থাকে এবং ফসল কিছু অবশিষ্ট থাকে, তখন তা গরীব আত্মীয়দেরকে দেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রেও নৈকট্যের পর্যায়ক্রম রক্ষা (আল-হাবী)।

৪. মাসআলা : তারপর দেওয়া হবে ওয়াক্ফদাতার আবাদকৃত গোলামদেরকে (মাওয়ালী)। তারপর প্রতিবেশী গরীবদেরকে, তারপর ওয়াক্ফদাতার স্বদেশী গরীবদেরকে-তার বাড়ির সংগে তাদের নৈকট্যের ক্রমানুসারে (মুহীত : আস-সারাখসী)। [তাছাড়া কাযীখানের ফাতাওয়া এবং আল-মুহীতেও অনুরূপ আছে।

৫. মাসআলা : চার অংশ যাকেই দেওয়া হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দু'শ দিরহামের কম দেওয়া হয়। এটা হিলাল (র)-এর মত (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা : এটা সেই সময়ের কথা, যখন ওয়াক্ফ করা হয় গরীবদের জন্য এবং তারপর ওয়াক্ফদাতার কোন আত্মীয় অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে গরীব আত্মীয়দের জন্যই যদি ওয়াক্ফ হয়, তখন সমস্ত ফসলই তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যদিও প্রত্যেকের অংশে দু'শ দিরহামের বেশী পড়ে। যদি আত্মীয়দের মধ্যে দারিদ্র্যের পর্যায়ক্রম হিসেবে ওয়াক্ফ করে, তবে এক্ষেত্রে অবশ্য সমস্ত ফসল নয়, বরং প্রত্যেককে দু'শ দিরহামের কম পরিমাণ দেওয়া হবে (আয-যাখীরা)।

৭. মাসআলা : কাযী যদি ফসল থেকে দারিদ্র্যের জন্য ওয়াক্ফকৃত জমির বিশেষ কতিপয় আত্মীয়কে দান করে, তবে সে দেওয়াটা দু'ভাবে হতে পারে।

যদি সে দেওয়াটা তার ফায়সালা হিসেবে না হয়, তবে এর দ্বারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে না। কাজেই পরবর্তী কাযী সেটা রহিতও করে দিতে পারে, যাদরুন তারা কিছুই পাবে না। পক্ষান্তরে প্রথম কাযী যদি তার পক্ষে ফায়সালাস্বরূপ সেটা দিয়ে থাকে এবং সে মতে মুতাওয়ালীকে বলে দেয় যে, আমি তাদের জন্য এরূপ ফায়সালা করেছি এবং ওয়াক্ফ হতে তাদের জন্য এ হারে ধার্য করেছি, তাহলে অপরাপর গরীব অপেক্ষা তাতে তাদের অধিকতর হক প্রতিষ্ঠিত হবে। পরবর্তী কাযীর আর তা রহিত করার ক্ষমতা থাকবে না (আল-হাবী)।

৮. মাসআলা : যদি এভাবে জমি ওয়াক্ফ করে যে এর অর্ধেক ফসল মিসকীনদের এবং অর্ধেক তার গরীব আত্মীয়দের, তারপর তার আত্মীয়গণ যদি এমন অভাবে পড়ে যে, তাদের চাহিদা তাদের জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে কি মিসকীনদের অংশটাও কি তাদেরকে দেওয়া হবে? হিলাল (র) বলেন, দেওয়া যাবে না। ইউসুফ খালিদ আস-সিমাতি (র)-এর মতও তাই।

কিন্তু ইবরাহীম ইবন ইউসুফ আল-বালাখী (র), আলী ইবন আহমদ আল-ফারিসী (র) ও ফাকীহ আবু জা'ফর আল-হিনদাওয়ানী (র)-এর মত হচ্ছে যে, দরিদ্রদের অংশ হতেও তাদেরকে দেওয়া হবে। কেননা এরাও তো দরিদ্র! আত্মীয় গরীবগণ দুই দিক থেকেই ওয়াকফের অধিকারী হবে। যেমন কেউ যদি আত্মীয়দের জন্য একখণ্ড এবং প্রতিবেশীদের জন্য অপর একখণ্ড জমি ওয়াকফ করে তাহলে তারা আত্মীয় প্রতিবেশীরা উভয় ওয়াকফে উভয় কারণে অংশীদার হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, ওয়াকফদাতা যদি এরূপ শর্ত করে যায় যে, তার গরীব আত্মীয়গণ পাবে এই পরিমাণ এবং অপরগণ গরীব-মিসকীন পাবে এই পরিমাণ, তবে তার গরীব আত্মীয়দেরকে সাধারণ গরীবদের অংশ হতে দেওয়া যাবে। আর যদি বলে, আমার গরীব আত্মীয়গণ পাবে এই পরিমাণ এবং বাদ বাকী হবে গরীব-মিসকীনের, সে ক্ষেত্রে গরীব-মিসকীনের অংশ হতে তার গরীব আত্মীয়দেরকে দেওয়া যাবে না। মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) ও আবু নসর মুহাম্মাদ ইবন সালাম আল-বালাখী (র) এমতই গ্রহণ করেছেন (আয-যাখীরা)।

৯. মাসআলা : ওয়াকফদাতা জমি ওয়াকফের ফসল ঋণগ্রস্ত, মুসাফির, মুজাহিদ, হাজী কিংবা দাস-মুক্তির জন্য স্থির করে যায়, তারপর কোন সন্তান বা আত্মীয় সে জমির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, তবে তাদেরকে কিছুই দেওয়া যাবে না হাঁ তাদের মধ্যে কেউ যদি উপযুক্ত কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা সফরে যায়, তখন অবশ্য তার অধিকার থাকবে (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা : যদি কেউ তার গরীব আত্মীয়দের জন্য জমি ওয়াকফ করে এবং অন্যান্য গরীব মিসকীনের জন্য অন্য একখণ্ড জমি ওয়াকফ করে, তারপর দেখা যায় যে, আত্মীয়দের জন্য ওয়াকফকৃত জমি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়, তবে দুই ওয়াকফ স্বতন্ত্র দুই চুক্তির মাধ্যমে শপথ হয়ে থাকলে আত্মীয়দেরকে অপর ওয়াকফ হতে তাদের প্রয়োজন পরিমাণ দেওয়া যাবে। আর যদি উভয়টা একই চুক্তিতে সম্পন্ন হয়, তবে তাদেরকে তা থেকে দেওয়া যাবে না।

একই চুক্তিতে সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হল, সেটা নিশ্চয়ই হিলাল (র) ও ইউসুফ ইবন খালিদ (র)-এর মত অনুযায়ী গৃহীত (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : কোন গরীব আত্মীয়তে দু'শ' দিরহামের কম পরিমাণ দেওয়ার পর সে যদি তা খরচ করে ফেলে এবং এদিকে ফসলের কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাকে আবারও দেওয়া হবে, যদি না সে তা অন্যায় পরে খরচ করে থাকে (আল-হাবী)।

অষ্টম অনুচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১. মাসআলা : কেউ বলল, আমার এ জমি স্থায়ীভাবে যায়দ, তার পুত্র, পৌত্র ও নিম্নস্থ বংশধরদের জন্য, যাবত সে ধারা জারি থাকবে, ওয়াকফ করলাম, তারপর এটা গরীব-

মিসকীনদের জন্য ওয়াকফ, কিন্তু শর্ত হচ্ছে আমার কোন আত্মীয় অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে এ ওয়াকফ তাদেরকে প্রত্যর্পণ করতে হবে এবং এর ফসল তখন তারা পাবে। তার আত্মীয় আছে একাধিক। তাদের মধ্যে কেউ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং বাকী সকলে সচ্ছলই আছে এক্ষেত্রে বিধান এই যে, যে সকল আত্মীয় অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ওয়াকফ তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হবে।

এমনিভাবে যদি বলে, আমার মাওয়ালী' (আযাদকৃত গোলামগণ) অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে এটা তাদেরকে দেওয়া হবে, তারপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ল, এক্ষেত্রেও উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য।

যদি বলে, যায়দের সন্তানদের জন্য ওয়াকফ, আর তারা মারা গেলে এর ফসল আমরকে দিয়ে দেওয়া হবে, তারপর যায়দের সন্তানদের মধ্যে কেউ মারা গেলে এবং কেউ জীবিত থাকল, তবে এ ক্ষেত্রে ওয়াকফের ফসল আমরকে দেওয়া হবে না, যাবত না যায়দের সকল সন্তান মারা যায়। খাসুসাফ (র) এরূপ বলেছেন (আয-যাখীরা)।

২. মাসআলা : হিলাল (র) তার 'ওয়াকফ' সংক্রান্ত রচনায় বলেন, কেউ বলল আমার এ জমি আমার মৃত্যুর পর গরীবদের জন্য ওয়াকফ, অবশ্য আমার সন্তান বা সন্তানের সন্তানদের মধ্যে কেউ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে প্রয়োজন মাসফিক তাকে দিতে হবে, তো এ ক্ষেত্রে তার কথা অনুসারেই কার্য করতে হবে। তার ঔরসজাত সন্তানের মধ্যে কেউ গরীব হয়ে গেলে তার প্রয়োজন বিবেচনা করা হবে এবং সেই পরিমাণ তার সমস্ত ওয়ারিসের উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হবে।^১ যদি তার সন্তানের সন্তানদের মধ্যে কেউ অভাবে পড়ে তবে তার প্রয়োজন অনুপাতে তাকে দেওয়া হবে। যদি ঔরসজাত সন্তান ও পৌত্র উভয়ে অভাবগ্রস্তও হয়ে যায়, তবে উভয়কে দেওয়া হবে। তারপর ঔরসজাত সন্তানের ভাগে যা পড়বে তা তার ওয়ারিসদের হবে এবং পৌত্র যা পাবে তা তারই থাকবে। যদি সকলেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে তাদের সংখ্যানুপাতে বন্টন করা হবে, তারপর উপরিউক্ত নিয়মে তা মীরস বা ওয়াকফ সাব্যস্ত হবে। অভাবগ্রস্তদের কেউ পুনরায় সচ্ছলতা লাভ করলে তাকে আর ওয়াকফের হিস্যা দেওয়া যাবে না। এটা তো সুস্পষ্ট। ওয়াকফকারী যাদেরকে দেওয়ার কথা বলেছিল ফসল কম হওয়ার ফলে তাদের সকলকে যদি দেওয়া সম্ভব না হয় এবং কোন একজনকে দেওয়া^২ তবে তা পৌত্রকে দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

১. কেননা ওয়াকফ হিসেবে সে এর অধিকারী হতে পারে না, যেহেতু এরূপ ওয়াকফ 'ওসীয়াত'-এর পর্যায়ভুক্ত। আর ওয়ারিসের জন্য ওসীয়াত বৈধ নয়। ওয়ারিস কেবল উত্তরাধিকার সূত্রেই পেতে পারে। এ নিয়ম কেবল তার (পুত্রের) জন্যই নির্দিষ্ট নয় (বরং প্রত্যেক ওয়ারিসই এর অন্তর্ভুক্ত)। পক্ষান্তরে (পুত্রের বর্তমানে) পৌত্র যেহেতু ওয়ারিস হয় না তাই সে ওয়াকফের অধিকারী হবে। কারণ তার জন্য ওসীয়াত জায়েয (আয-যাখীরা)।

২. পৌত্রকে দেওয়া হবে এ কারণে যে, তার অধিকার শক্তিশালী। কেননা তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটা কারও অনুমতির উপর নির্ভরশীল নয়। পক্ষান্তরে ঔরসজাত পুত্রের অধিকার কেবল ওয়ারিসদের অনুমতিক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে (আয-যাখীরা)-সম্পাদক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শর্তযুক্ত-ওয়াক্ফ ও শর্তাবলীর ব্যাখ্যা

১. মাসআলা : আয়-যাখীরা গ্রন্থে বলা হয়েছে, কেউ যদি তার জমি বা অন্য কিছু এই শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, সে যতদিন জীবিত আছে সমস্ত ফসল বা তার কিয়দংশ তার থাকবে এবং তার মৃত্যুর পর তা দরিদ্ররা পাবে, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ওয়াক্ফ সহীহ হবে। বালার্থের ফুকাহায়ে কিরাম তার মতই গ্রহণ করেছেন। মানুষকে ওয়াক্ফে উৎসাহিত করার জন্য এমত অনুসারেই ফাতওয়া দেওয়া হয়ে থাকে। আস-সুগরা ও আন-নিসাবেও এরূপ বর্ণিত আছে (আল-মুযমারাত)।

২. মাসআলা : নিজের পক্ষে শর্তারোপের আরেক ছরত হলো ওয়াক্ফের ফসল দ্বারা তার ঋণ আদায় করতে বলা। কিংবা এ কথা বলা যে, আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা গেলে ওয়াক্ফের আয় দ্বারা প্রথমে আমার ঋণ শোধ করতে হবে। তারপর যা বেঁচে থাকবে তা যথানিয়মে ব্যয় হবে, তবে এ জাতীয় শর্তারোপও বৈধ।

এমনিভাবে ওয়াক্ফদাতা নিজের নাম নিয়ে বলল যে, অমুকের যখন মৃত্যু হয়ে যাবে, তখন এ ওয়াক্ফের আয় হতে প্রতি বছর দশ ভাগের এক ভাগ আলাদা করা হবে এবং তা দিয়ে কার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করানো হবে বা তার কসমের কাফ্ফারা আদায় করা হবে কিংবা অমুক অমুক কাজে তা খরচ করা হবে অথবা বলল, প্রতি বছর এর আয় হতে এত পরিমাণ টাকা পৃথক রাখা হবে এবং তা উপরিউক্ত ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ যথানিয়মে ওয়াক্ফের খাতসমূহে ব্যবহার করা হবে, তবে সেটাও জায়েয (ফাতহুল-কাদীর)।

৩. মাসআলা : কেউ বলল, এ জমি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ, যতদিন আমি জীবিত থাকব এর আয় আমার উপরই ব্যয় হবে। এর বেশী কিছু বলল না। তো এরূপ ওয়াক্ফও জায়েয। তার মৃত্যুর পর তা গরীবদের হয়ে যাবে।

যদি বলে, আমার এ জমি ওয়াক্ফ করলাম। আমি যতদিন জীবিত থাকব এর ফসল আমার উপরই ব্যয় হবে এবং আমার পরে তা পাবে আমার পুত্র, পৌত্র এবং এভাবে যতদূর পর্যন্ত তাদের বংশধারা বলে। যদি কখনও তাদের বংশধারা নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন এটা গরীব-মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ, এটাও জায়েয আছে। (খায়ানাতুল-মুফতীন)।

৪. মাসআলা : যদি শর্ত করল, সে এর আয় নিজের ও সন্তানের জন্য ব্যয় করবে এবং এর দ্বারা সে তার ঋণও পরিশোধ করবে। তার মৃত্যুর পর এ জমির ফসল দেওয়া হবে অমুকের পুত্র অমুককে এবং তার পুত্র পৌত্র ও নিম্নস্থ বংশধরদেরকে অথবা অমুকের পুত্র

অমুকের কথা আগে বলল এবং নিজের কথা বলল পরে, তো এ অবস্থায় খাসসাফ (র) বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে এরূপ শর্তে ওয়াক্ফ করা জায়েয (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : কেউ গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করল এবং শর্তারোপ করল যে, সে যতদিন বেঁচে থাকবে এর আয় নিজে খেতে এবং অন্যকে খাওয়াতে পারবে আর তার মৃত্যুর পর তা তার পুত্র, পৌত্র এবং নিম্নস্থ বংশধরদের থাকবে, যতদিন সে বংশধারা থাকে। তো এরূপ শর্তে ওয়াক্ফ করলে তা জায়েয (আল-মুযমারাত)।

৬. মাসআলা : শায়খ ইমাম শামসুল-আইম্মা আল-হানওয়ানী (র) এবং হসায়ুদ-দীন (র)-এ মতই করেছেন (আস-সিরাজিয়া)।

৭. মাসআলা : কেউ শর্ত আরোপ করল যে, ওয়াক্ফ করার সময় তার যে সব উম্মু ওয়ালাদ (যে ক্রীতদাসীর গর্ভে সে সন্তান উৎপাদন করেছে) আছে এবং পরে আরও যত উম্মু ওয়ালাদ হবে তারা ফসলের এক অংশ পাবে এবং সে তাদের প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক কিস্তির ঠিক করে দিল, তার জীবদ্দশার জন্যও এবং মৃত্যুর পরের জন্যও এরূপ শর্তও জায়েয। এতে কোন মতভেদ নেই (আল-ওয়াজীয; আল-মাবসূত : আয়-যাখীরাঃ ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটাই বিশুদ্ধতর মত (ফাতহুল-কাদীর)।

৮. মাসআলা : অনুরূপ শর্ত যদি মুদাক্বার (যে গোলাম সম্পর্কে সে ঘোষণা দিয়েছে যে, মৃত্যুর পর সে স্বাধীন)-এর জন্য করে তবে সেটাও বৈধ (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : যদি শর্তারোপ করে যে, জমির ফসল তার ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী পাবে, তবে সেটা নিজের জন্য শর্তারোপের মত। সুতরাং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তা জায়েয এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয নয় (আল-কাফী)।

১০. মাসআলা : কেউ যদি স্থায়ীভাবে কোন কিছু ওয়াক্ফ করে এবং শর্ত আরোপ করে যে, তার জীবদ্দশায় আয়ের কিয়দংশ সে নিজের জন্য এবং পোষ্যবর্গ ও দাস-দাসীর পেছনে ব্যয় করবে, তবে ওয়াক্ফ ও শর্ত উভয়ই জায়েয। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। যখন এদের কেউ জীবিত থাকবে না, তখন ফসল মিসকীনদের হবে (যাখীরা)।

১১. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে কিছু ওয়াক্ফ করে জীবদ্দশায় এর আয় সে ভোগ করবে, এ অবস্থায় মৃত্যুকালে যদি ওয়াক্ফের খাদ্য-শস্য আংগুর কিসমিস ইত্যাদি তার কাছে থেকে যায় তাহলে সেগুলো ফেরত দিতে হবে। যদি সে ওয়াক্ফের গম দ্বারা তৈরি রুটি থেকে যায় তবে সেটা ফেরত দিতে হবে না, বরং তা উত্তরাধিকারীদের হয়ে যাবে। কেননা সে রুটি প্রকৃতপক্ষে ওয়াক্ফের নয় (জাহীরিয়া)।

১২. মাসআলা : 'খাসসাফ' (র)-প্রণীত ওয়াক্ফের বিবরণে আছে যে, যদি শর্ত করে এই ওয়াক্ফের ফসল সে নিজে, তার সন্তান-সন্ততি, চাকর-বাকর ও পোষ্যবর্গ ভোগ করবে, তারপর সে জমিতে ফসল আসে এবং সে তা বিক্রি করত তার মূল্য গ্রহণ করে, তারপর তা খরচ করার আগেই মারা যায়, তবে সে অর্থ কি তার ওয়ারিসদের হবে, না যাদের জন্য

ওয়াক্ফ করা হয়েছে তাদের? খাস্‌সাফ (র) বলেন, তা তার ওয়ারিসগণ পাবে। কেননা এ অর্থ যখন তার হাতে এসেছিল তখন এতে তার অধিকার ছিল (ফাতহুল-কাদীর)।

১৩. মাসআলা : কেউ যদি তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করে, তারপর তার স্ত্রী মারা যায় তাহলে মৃত স্ত্রীর অংশ বিশেষভাবে তার গর্ভজাত সন্তান পাবে না, বরং-অংশ সকলের মাঝে বন্টিত হবে। অবশ্য ওয়াক্ফকারী বলে থাকে এদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার অংশ তার সন্তানরা পাবে তাহলে তা তার সন্তানদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে। (আল-কুবরা)।

১৪. মাসআলা : কেউ তার একখণ্ড জমির অর্ধেক ওয়াক্ফ করল তার স্ত্রীর জন্য এবং বাকী অর্ধেক তার বিশেষ কোন সন্তানের জন্য আর শর্ত করল যে, স্ত্রী মারা গেলে তার অংশ সমস্ত সন্তান পাবে এবং সবশেষে তা গরীবদের হবে। তারপর স্ত্রী মারা গেল, এ অবস্থায় যে সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছিল সেও তার একটা অংশ পাবে (আল-মুযমারাত)।

১৫. মাসআলা : কেউ তার একখণ্ড জমি কোন এক ব্যক্তির উপর এই শর্তে ওয়াক্ফ করল যে, তাকে প্রতি মাসে তার প্রয়োজন অনুপাতে দেওয়া হবে, কিন্তু সে সময় তার পরিবার পরিজন ছিল না। পরে পরিবার-পরিজন হয়ে গেল, এক্ষেত্রে তার ও তার পরিবারবর্গের যতটুকু প্রয়োজন সে অনুযায়ী তাদেরকে দেওয়া হবে (আল-কুবরা)।

১৬. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে কারও জন্য জমি ওয়াক্ফ করে যে, সে তাকে (ওয়াক্ফদাতাকে) কিছু টাকা ঋণ দেবে, তবে ওয়াক্ফ জায়েয হবে বটে, কিন্তু শর্ত বাতিল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে জমি ওয়াক্ফ করে যে, যখন ইচ্ছা এই জমি অন্য জমি দ্বারা বদল করে ফেলবে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ওয়াক্ফও শর্ত উভয়ই জায়েয। এমনিভাবে যদি শর্ত করে যে, এ জমি সে বিক্রি করে ফেলবে এবং এর মূল্যের বদলে অন্য জমি দান করবে, তবে সেটাও বৈধ।

১৮. মাসআলা : কাযী ইমাম ফখরুদ্দীন (র)-এর 'ওয়াকিআত' (ঘটনাপঞ্জী)-এর মাঝে বর্ণিত আছে যে, হিলাল (র)-এর মতও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতের অনুরূপ এবং এর উপরই ফাতওয়া (আল-খুলাসা)।

১৯. মাসআলা : একবার পাল্টানোর পর দ্বিতীয়বার আর পরিবর্তন করতে পারবে না। কেননা একবারের বদল দ্বারাই শর্ত পূরণ হয়ে গেছে। হাঁ, এমন কোন শব্দ যদি ব্যবহার করে, যাদ্বারা বুঝা যায়, যে সর্বদাই এরূপ পরিবর্তন করতে পারবে, তবে ভিন্ন কথা (ফাতহুল-কাদীর)।

২০. মাসআলা : ওয়াক্ফ প্রদানকালে ওয়াক্ফদাতা যদি শর্ত আরোপ করে যে, আমার যখন ইচ্ছা হয় এ জমি অল্প-বিস্তর যে কোন মূল্যে বিক্রি করতে পারব কিংবা এ জমি বিক্রি করে এর মূল্য দ্বারা গোলাম ক্রয় করব অথবা কেবল বলল, এ জমি বিক্রি করব, এর বেশী

কিছু বলল না, তো হিলাল (র) বলেন, এটা একটা অন্যায় শর্ত এবং এর দ্বারা ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা : যদি বলে, আমার এই জমি স্থায়ীভাবে এই শর্তে ওয়াক্ফ যে, অন্য জমি দ্বারা এটা পরিবর্তন করার ইখতিয়ার আমার থাকবে, তবে ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) অনুসারে ওয়াক্ফ জায়েয হবে-শর্ত হচ্ছে পরে যে জমিটা কেন হবে, সেটা প্রথম জমির মূল্য দ্বারাই কিনতে হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২২. মাসআলা : দ্বিতীয় জমি কেনামাত্রই প্রথমটির শর্ত অনুযায়ী ওয়াক্ফে পরিণত হবে এবং প্রথমটির স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। এজন্য আর নতুন করে ওয়াক্ফের চুক্তি সম্পাদন ও শর্ত আরোপের প্রয়োজন নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা : যদি পরিবর্তনের শর্ত আরোপ করা, কিন্তু জমি বা বাড়ির কথা উল্লেখ না করে, তারপর সে প্রথমটি বিক্রি করে ফেলে, তাহলে জমি হোক, বাড়ি হোক যে কোনও স্থাবর সম্পত্তি সে তার পরিবর্তে দিতে পারবে। এমনিভাবে সে যদি কোন অঞ্চলের কথা নির্দিষ্ট করে না বলে, তাহলে যে কোন অঞ্চলের জমি দ্বারাই পরিবর্তন করার ইখতিয়ার তার থাকবে (আল-খুলাসা)।

২৪. মাসআলা : যদি শর্ত আরোপ করে, 'এর বদলে আমি অন্য কোন জমি দিতে পারব', তা হলে বাড়ির বদলে তা পরিবর্তন করার অধিকার থাকবে না। এমনিভাবে এর বিপরীতও সে করতে পারবে না (ফাতহুল-কাদীর)।

২৫. মাসআলা : প্রথমটির মূল্য দ্বারা সে খারাজী ভূমি কিনতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৬. মাসআলা : যদি বলে বসরার জমি দ্বারা আশিষ্টা পরিবর্তন করতে পারব এই শর্তে ওয়াক্ফ করলাম, তা হলে সে অন্য কোন স্থানের জমি দ্বারা বদল করতে পারবে না। অবশ্য অন্য জায়গায় জমি উৎকৃষ্টতর হলে পরিবর্তন বৈধ হওয়া উচিত। যেহেতু শর্তের খেলাফ হলেও যাওয়া হচ্ছে আরও ভালোর দিকে (ফাতহুল-কাদীর)।

২৭. মাসআলা : 'আল-কুনয়া' গ্রন্থে আছে যে, ওয়াক্ফ ভূমির পরিবর্তন বৈধ হওয়ার জন্য উভয় জমি একই মহল্লায় হওয়া এবং দ্বিতীয়টি উৎকৃষ্টতর হওয়া শর্ত। অন্যথায় পরিবর্তন বৈধ না (আল-বাহরুর-রায়িক)।

২৮. মাসআলা : যদি নিজের পক্ষে ওয়াক্ফকৃত ভূমি পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংরক্ষিত রাখে তা হলে উকীলের মাধ্যমেও সে তা করতে পারবে, কিন্তু যদি মৃত্যুকালে পরিবর্তন করার ওসীয়ত করে যায় তা হলে ওসীয়তকৃত ব্যক্তি তা করতে পারবে না। যদি অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে পরিবর্তনের শর্ত করে তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রাক্কী তা করতে পারবে না, কিন্তু ওয়াক্ফদাতা একা পরিবর্তন করতে পারবে (ফাতহুল-কাদীর)।

২৯. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা যদি শর্ত করে যে, এ ব্যক্তিই এ ওয়াক্ফের মৃত্যওয়ালী হবে, সেই এটা পরিবর্তন করতে পারবে, তার ওয়াক্ফ নষ্ট হবে এবং যে ব্যক্তিই মৃত্যওয়ালী

হবে, তারই পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকবে। তবে ওয়াক্ফদাতা যদি বলে, এটা পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকবে অমুকের হাতে, তারপর সে মারা যায়, এক্ষেত্রে ওয়াক্ফদাতার মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তির পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকবে না, যদি না ওয়াক্ফদাতা নিজ মৃত্যুর পর তার সে ক্ষমতার শর্ত আরোপ করে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা স্পষ্ট করে বলে না গেলে মুতাওয়ালীর জন্য তা পরিবর্তন করার ইখতিয়ার থাকবে না। যদি মুতাওয়ালীর পক্ষে সে ইখতিয়ারের শর্ত আরোপ করে, কিন্তু নিজের জন্য না করে, তবে তার নিজেরও তা পরিবর্তন করার ইখতিয়ার থাকবে (ফাতহুল-কাদীর)।

৩১. মাসআলা : ওয়াক্ফ ভূমি বিক্রি এবং তার মূল্য দ্বারা অন্য জমি ওয়াক্ফের পরিবর্তে দান করার শর্তে যখন ওয়াক্ফ জায়েয হল, তখন বিক্রির ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, যদি বিক্রিটা কম মূল্যে হয় এবং সেটা এমন কম হয় যে, বেচাকেনার ক্ষেত্রে অনুরূপ কম সাধারণত হয়েই থাকে, তবে বিক্রি জায়েয হবে, কিন্তু এমন কমে যদি বিক্রি করে যেটা সাধারণত মানুষ স্বীকার করে নেয় না, তা হলে সে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা : যদি কোন মালের বদলে সে জমি বিক্রি করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী সে বিক্রি সহীহ হওয়ার কথা। তারপর তাকে তা স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে বিক্রি করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও হিলাল (র) বলেন, মালের বিনিময়ে বিক্রি জায়েয হবে না, অর্থের বিনিময়েই বিক্রি করতে হবে (আল-বাহরুর-রায়িক)। অবশ্য জমির বদলেও বিক্রি করতে পারবে (ফাতহুল-কাদীর)।

৩৩. মাসআলা : যদি ওয়াক্ফের জমি বিক্রি করে এবং মূল্যও হস্তগত করে, তারপর মারা যায়, কিন্তু সে টাকার কী অবস্থা তা বলে না যায় তবে সে টাকা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি উপর ঋণ থেকে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৪. মাসআলা : এমনভাবে যদি সে টাকা খরচ করে ফেলে তবুও তা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর ঋণ থাকবে (ফাতহুল-কাদীর)।

৩৫. মাসআলা : যদি ওয়াক্ফের জমি বিক্রি করে এবং বিক্রিমূল্য তার হাত থেকে হারিয়ে যায়, তবে তার জরিমানা দিতে হবে না। এ অবস্থায় ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩৬. মাসআলা : ওয়াক্ফের বিক্রয়-মূল্য দ্বারা যদি এমন কোন মাল খরিদ করে, যা ওয়াক্ফ হতে পারে না, তবে সে মাল তার হয়ে যাবে এবং মূল্যটা তার উপর ঋণ সাব্যস্ত হবে। যদি সে টাকা ক্রেতাকে হাদিয়া দিয়ে দেয় তাও বৈধ, তবে তার জরিমানা পরিশোধ করতে হবে। এটা আবু হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, হাদিয়া দেওয়া যাবে না।

যদি বিক্রি-মূল্য বুঝে নেয় এবং তারপর তা হাদিয়া দেয় তবে সে দান সর্ব সম্মতিক্রমেই বাতিল (ফাতহুল-কাদীর)।

৩৭. মাসআলা : যদি ওয়াক্ফের জমি বিক্রি করে এবং তারপর তা এমন উপায়ে তার কাছে ফেরত আসে, যেটা সর্বতোভাবে বিক্রি তুলে নেওয়া-রূপে গণ্য হয়। তবে দ্বিতীয়বার সে তা বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু যদি নতুন চুক্তির অধীনে ফেরত আসে তবে পুনরায় বিক্রির ইখতিয়ার থাকবে না। অবশ্য ওয়াক্ফকালে বিক্রির শর্তটা যদি ব্যাপকভাবে করে থাকে (যা দ্বারা যতবার ইচ্ছা বিক্রির ইখতিয়ার বুঝা যায়) তবে আবারও বিক্রি করতে পারবে।

যদি কোন দোষের কারণে কাযীর ফয়েসালাক্রমে কিংবা ক্রেতা বুঝে নেওয়ার পর কাযীর ফায়সালা ছাড়াই অথবা বুঝে নেওয়ার আগে ফায়সালা ক্রমে বিক্রেরতার কাছে ফেরত আসে, তবে তা পুনরায় ওয়াক্ফে পরিণত হবে।

এমনিভাবে যদি ক্রেতা সে জমি বুঝে পাওয়ার আগে বা পরে বিক্রি প্রত্যাহার করিয়ে নেয় তবুও তা পুনরায় ওয়াক্ফে পরিণত হবে (ফাতহুল-কাদীর)।

৩৮. মাসআলা : প্রত্যাহার করিয়ে নেওয়ার পর সে জমি আর বিক্রি করতে পারবে না, যদি না ওয়াক্ফকালে সেরূপ শর্ত থাকে (আল-মুহীত)।

৩৯. মাসআলা : যদি ওয়াক্ফের জমি বিক্রি করে এবং তার মূল্য দ্বারা অন্য একটা জমি কেনে, তারপর কোন দোষের কারণে কাযীর ফায়সালাক্রমে প্রথম জমিটি তার হাতে ফেরত আসে, তবে সেটা আবার ওয়াক্ফে পরিণত হবে এবং দ্বিতীয় জমিটি তার যা ইচ্ছা করতে পারবে। যদি প্রথম জমিটি কোন দোষের কারণে কাযীর ফায়সালা ছাড়াই ফেরত গ্রহণ করে, তবে প্রথমটির বিক্রি মূল থেকে উঠে যাবে না। সুতরাং দ্বিতীয় জমিটি প্রথমটির বদলরূপে ওয়াক্ফ হিসেবেই বলবৎ থাকবে। কাজেই প্রথমটিকে যেন সে নিজের জন্য খরিদ করে নিল, পূর্বকার সেই ওয়াক্ফ হিসেবে দ্বিতীয়টির স্থানে খরিদ করে নি (ফাতওয়া কাযীখান)।

৪০. মাসআলা : যদি প্রথম জমিটি বিক্রি করে এবং তদস্থলে আরেকটি ক্রয় করে, তারপর প্রথম জমিটিতে করও পূর্ব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে কিয়াস অনুযায়ী দ্বিতীয় জমিটির ওয়াক্ফ বাতিল হবে না, কিন্তু ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) অনুসারে দ্বিতীয়টি আর ওয়াক্ফ থাকবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪১. মাসআলা : ওয়াক্ফ যদি সাধারণভাবে করা হয়, বদল করার শর্ত তাতে না থাকে, তবে তা বিক্রি করে তার পরিবর্তে অন্য জমি দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। এমন কি সে জমি চাষের অযোগ্য জলাভূমি হলেও (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪২. মাসআলা : অবশ্য কাযীখানের বক্তব্যের মধ্যে বিরোধ আছে। এক জায়গায় তিনি ওয়াক্ফদাতার শর্ত ছাড়াই কাযীর জন্য বিক্রি করা জায়েয বলেছেন-যদি বিক্রি করার ভেতর ফায়দা দেখেন। অন্য জায়গায় নিষেধ করেছেন, এমনকি ওয়াক্ফের জমি কাছে লাগানোর অনুপযোগী হয়ে গেলেও। তবে সঠিক কথা এই যে, জমি যদি বিলকুল কাজে লাগানোর অনুপযোগী হয়ে যায় এবং সেখানে ওয়াক্ফের এমন কোন উঁচু ভূমিও না থাকে, যদ্বারা এ জমির সংস্কার করা যাবে, তা হলে এরূপ ওয়াক্ফ-ভূমি বিক্রি করা জায়েয হবে, যদি বিক্রিটা খুব বেশী কম দামে না হয় (আল-বাহরুর-রায়িক)।

৪৩. মাসআলা : 'আল-ইসআফ'-এছে বিক্রি জায়েয হওয়ার জন্য আরো শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, বদলকারী কাযী (হাদীসে বর্ণিত) জান্নাতী কাযী হতে পারে, অর্থাৎ 'ইলম ও আমল ওয়ালা ব্যক্তি হতে হবে (আন-নাহরুল ফায়িক)।

৪৪. মাসআলা : শামসুল-আইম্মা মাহমুদ আল-আওয়াজানদী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যদি কোন ব্যক্তি তার সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং তাদেরকে বলে দেয়, তোমরা যদি এ জমি ধরে রাখতে সক্ষম না হও, বিক্রি করে ফেলো, তা হলে তারা তা পারবে কি? তিনি বললেন, যদি ওয়াক্ফই করে এই শর্তে, তবে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতও এরূপই হওয়ার কথা। বাকী ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত অনুসারে ওয়াক্ফ বৈধ হবে, তবে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে।

কেউ বলল, আমার জমি এই শর্তে সাদাকা, ওয়াক্ফ যে, এর মূলটা আমারই থাকবে বা এর মূল থেকে আমার মালিকানা বিলুপ্ত হবে না কিংবা আমি জমি বিক্রি করে এর মূল্য দান-সাদাকা করতে পারব, এরূপ ওয়াক্ফ বাতিল (ফাতওয়া কাযীখান)।

৪৫. মাসআলা : শর্ত আরোপ করল যে, সে তা বিক্রি করে আরও উত্তম ওয়াক্ফে তার মূল্য ব্যবহার করবে, তবে প্রশাসক ভাল মনে করলে তাকে তা বিক্রির অনুমতি দিতে পারে (আল-ওয়াজীয)।

৪৬. মাসআলা : খাস্সাফ (র) তার 'ওয়াক্ফ' বিষয়ক রচনায় বলেন, যদি ওয়াক্ফদাতা শর্ত আরোপ করে যে, সে এ জমি বিক্রি করে তার মূল্য যে-কোন পুণ্যের কাজে লাগাতে পারবে, তবে সে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। যদি ওয়াক্ফ করার সময় শর্ত আরোপ করে যে, সে তা বিক্রি করতে পারবে কিন্তু বিক্রি করল না তা হলে তার পরে যে ব্যক্তি এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য সে জমি বিক্রি করা জায়েয হবে না (আয-যাখীরা)।

৪৭. মাসআলা : যদি বলে, আমার জমি এই শর্তে সাদাকা, ওয়াক্ফ যে, আমার তা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকবে, তবে হিলাল (র)-এর মতে সে ওয়াক্ফ বাতিল। ইউসুফ ইব্ন খালিদ (র)-এর মত হচ্ছে যে, ওয়াক্ফ জায়েয, কিন্তু শর্ত বাতিল। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর একটি বর্ণনার দৃষ্টিতে কেউ এটাও বলতে পারে যে, ওয়াক্ফ জায়েয, কেননা এটা নিজের জন্য ইখতিয়ার থাকার শর্ত আরোপের মত, আবার কেউ এটাও বলতে পারে যে, তার মতে এরূপ ওয়াক্ফ জায়েয নয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪৮. মাসআলা : আল-খাস্সাফ (র) তার ওয়াক্ফবিষয়ক রচনায় ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে কিছু মাসাইল উল্লেখ করেছেন। তাতে বলেন, ওয়াক্ফের দলীলে যদি লেখে, এটা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং কাউকে এর মালিক বানানো যাবে না, তারপর বলল, এবং এই শর্তে ওয়াক্ফ যে, অমুকের এটা বিক্রি করার এবং তার মূল্য দ্বারা তদস্থলে ওয়াক্ফের উপযুক্ত কোন সম্পত্তি খরিদ করার ইখতিয়ার থাকবে, তবে সেই ব্যক্তি তা বিক্রি করতে এবং তদস্থলে সেই মূল্য দ্বারা অন্য সম্পত্তি খরিদ করতে পারবে।

দলীলের প্রথমেই যদি লেখে, এই শর্তে ওয়াক্ফ যে, অমুকের এটা বিক্রি করার এবং অন্য কিছু দ্বারা এটাকে বদল করার ইখতিয়ার থাকবে। আর দলীলের শেষে লেখে আরও শর্ত হল যে, অমুকের এটা বিক্রি করার ইখতিয়ার থাকবে না। তবে সে তা বিক্রি করতে পারবে না (আয-যাখীরা)।

৪৯. মাসআলা : যদি নিজের জন্য শর্ত করে যে, দলীলে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে সে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে এবং ইচ্ছা হলে একজনকে বাদ দিয়ে তদস্থলে অন্য কাউকে ঢুকাতে পারবে, তবে তা করার ইখতিয়ার তার থাকবে, কিন্তু মুতাওয়াল্লীর সে ইখতিয়ার থাকবে না, যদি না তার জন্যও সেরূপ শর্ত থাকে (ফাতহুল-কাদীর)।

৫০. মাসআলা : আল-খাস্সাফ (র) তার 'ওয়াক্ফ' এছে বলেন, একবার পরিবর্তন করার পর দ্বিতীয়বার আর তা করতে পারবে না। বারবার পরিবর্তন করার ক্ষমতা পেতে হলে 'জীবদ্দশায় যতবার ইচ্ছা' কথাটা দলীলে উল্লেখ করতে হবে।

ওয়াক্ফদাতা যদি এরূপ শর্ত কোন ব্যক্তির জন্য তার জীবনকালের মেয়াদে আরোপ করে, তবে সে ব্যক্তিও অনুরূপ ইখতিয়ার লাভ করবে (আল-মুহীত)।

৫১. মাসআলা : যদি নিজ জীবনকালের জন্য অনুরূপ শর্ত করে এবং তার পরে মুতাওয়াল্লীর জন্য, তবে সেটাও বৈধ। যদি শর্ত করে যে, ওয়াক্ফদাতা যতদিন জীবিত থাকবে, মুতাওয়াল্লী অনুরূপ ইখতিয়ারের মালিক হবে, তবে মুতাওয়াল্লীর সে ইখতিয়ার ওয়াক্ফদাতার জীবনকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। তার মৃত্যুর পর সে ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। যে ব্যক্তির জন্য এরূপ শর্ত করা হবে, তার এ অধিকার নেই যে, অন্যকে এরূপ ইখতিয়ার দান করবে বা কাউকে এর ওসীয়াত করে যাবে (আল-বাহরুর-রায়িক)।

৫২. মাসআলা : কেউ যদি বলে যে, আমার জমি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে চিরদিনের জন্য এই শর্তে ওয়াক্ফ, সাদাকা যে, আমি এর আয় যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারব, তবে সেটা জায়েয এবং সে মতে সে যেখানে ইচ্ছা তার আয় ব্যবহার করতে পারবে। তবে কাউকে দেয়ার পর সেটা ফেরত আনতে পারবে না।

এমনিভাবে যদি বলে, আমি এটা অমুকের জন্য স্থির করলাম বা অমুককে দিলাম, তখনও তা প্রত্যাহার করতে পারবে না।

যদি একবার এক শ্রেণীকে দেয় এবং তারপর অন্য শ্রেণীকে, তবে সেটাও জায়েয। যদি নিজের জন্য সংরক্ষিত করে তবে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য এটা হিলাল (র)-এর মত অনুসারেই প্রযোজ্য হয়। তবে যদি বলে, এই শর্তে ওয়াক্ফ করছি যে, এর আয় যাকে ইচ্ছা তাকে দেব এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বাদ রাখব, তা হলে সেটা বৈধ হবে।

যদি বলে, আমার জমি এই শর্তে সাদাকা, ওয়াক্ফ যে, আমার সন্তানদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে এর ফসল দেওয়ার অধিকার আমার থাকবে, তবে ওয়াক্ফ বৈধ এবং সে মতে সে তার যে-কোন সন্তানকে তার ফসল দিতে পারবে (আল-মুহীত)।

৫৩. মাসআলা : যদি কেউ এই শর্তে জমি ওয়াক্ফ করে যে, সে যাকে ইচ্ছা তার ফসল দান করতে পারবে, তবে ওয়াক্ফ জায়েয এবং সে তার ইচ্ছা মত যে-কাউকে তার ফসল দিতে পারবে। তার মৃত্যু হলে এ ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৫৪. মাসআলা : এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের ফসল ওয়াক্ফদাতা ভোগ করতে পারবে না (আল-হাবী)।

৫৫. মাসআলা : ওয়াক্ফের ফসল কোন ব্যক্তির জন্য স্থির করার আগেই ওয়াক্ফকারীর মৃত্যু হলে সে ফসল গরীবদের হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৫৬. মাসআলা : যদি শর্ত করে, সে তার ফসল যাকে ইচ্ছা দিতে পারবে কিংবা বলে যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে, তবে সে তা ধনীদেবকেও দিতে পারবে (আল-কুনুয়া)।

৫৭. মাসআলা : নির্দিষ্ট ধনী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কোন গরীব ব্যক্তিকে দান করার ইচ্ছা করতে পারে, ঐ ব্যক্তির জীবদ্দশা পর্যন্ত অধিকার তারই হবে। ওয়াক্ফকারী তার পরিবারে অন্য কাউকে তার দিতে পারবে না। হাঁ, যে ব্যক্তির মৃত্যুর পর তা অন্য যাকে ইচ্ছা হয় দিতে পরবে। যদি গরীবদের না দিয়ে ধনীদেবকে দিতে চায় তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না। যদি ধনী ও গরীব উভয় শ্রেণীকে দিতে চায়, তবে কিয়াস অনুযায়ী ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী বাতিল হবে না, বরং তার ইচ্ছাটা বাতিল হয়ে যাবে এবং ফসলে গরীবদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৫৮. মাসআলা : যদি এক বছরের ফসল বিশেষ কোন গরীবের জন্য ধার্য করে তবে সেটা জায়েয হবে। তারপর সে তা যার জন্য ইচ্ছা স্থির করতে পারবে। যদি তার ফসল দু'জনের জন্য স্থির করে তবে তারা দুজন যতদিন জীবিত থাকবে ফসল তাদের হবে। একজন মারা গেলে অর্ধেক ফসল জীবিত ব্যক্তির হবে।

যদি বলে, এ জমির ফসল আমার পিতামাতার জন্য স্থির করলাম, তবে সেটাও বৈধ, যেমন প্রথমেই পিতামাতার জন্য ওয়াক্ফ করলে তা বৈধ হয়ে থাকে (আল-মুহীত)।

৫৯. মাসআলা : যদি তার ফসল তার পুত্রের জন্য স্থির করে তাও বৈধ (আল-হাবী)।

৬০. মাসআলা : এক ব্যক্তি একখণ্ড জমি ওয়াক্ফ করল এবং শর্ত আরোপ করল যে, মৃত্যু ওয়ালী এর ফসল যাকে ইচ্ছা দিতে পারবে, তবে সে ওয়াক্ফ জায়েয এবং মৃত্যু ওয়ালী গরীব-ধনী নির্বিশেষে যে-কাউকে তার ফসল দিতে পরবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬১. মাসআলা : কেউ অসুস্থ অবস্থায় জমি ওয়াক্ফ করল এবং শর্তারোপ করল যে, অমুক ব্যক্তি এর ফসল যাকে ইচ্ছা দিতে পারবে, তারপর ওয়াসী (ট্রাস্টি) অর্থাৎ সেই ব্যক্তি সে ফসল মৃতের পুত্রের পেছনে খরচ করতে চাইল, তাে এরূপ ইখতিয়ার ওয়াসীর থাকবেন না, বরং কিয়াস অনুযায়ী তাে ওয়াক্ফই বাতিল হয়ে যায়। ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস)-এর ভিত্তিতে অবশ্য ওয়াক্ফ সহীহ থাকে। কেননা মূলত সে, ওয়াক্ফ গরীবদের জন্য সহীহ হয়েছিল। এখন সেই ব্যক্তি যদি বৈধ খাতে তা ব্যয় করে তবে তাে ঠিক আছে, অন্যথায় তার ইখতিয়ারই বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৬২. মাসআলা : যদি বলে, এই শর্তে ওয়াক্ফ যে, অমুক ব্যক্তি এর ফসল যাকে ইচ্ছা দিতে পারবে, তবে সেটা জায়েয এবং সে ব্যক্তি ওয়াক্ফদাতার জীবদ্দশায় এবং তার মৃত্যুর পরেও যাকে ইচ্ছা তা দিতে পারবে। কেননা এক্ষেত্রে ওয়াক্ফদাতা যেন বলল, যে আমার জীবদ্দশায় এবং আমার মৃত্যুর পরে এর ফসল যাকে ইচ্ছা দিতে পারবে। কিন্তু কিয়াসের দাবী হচ্ছে যে, সে ওয়াক্ফদাতার মৃত্যুর পর নিজ ইচ্ছামত কাউকে দিতে পারবে না।

ওয়াক্ফদাতা যাকে ইখতিয়ার দিয়েছিল তারই যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তবে ওয়াক্ফের ফসল গরীব লোকে পাবে।

ওয়াক্ফদাতা যাকে ইখতিয়ার দেয় সে চাইলে নিজ পুত্র ও পুত্রবর্তী বংশধরদেরকেও দিতে পারে। এমনিভাবে দিতে পারে ওয়াক্ফদাতার পুত্র ও বংশধরদেরকে। কিন্তু সে নিজের জন্য খরচ করতে পারবে না। অবশ্য 'আমি নিজেকে দিলাম'-এ কথা বলার দ্বারা তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে না। যদি সে ওয়াক্ফদাতার জন্য তার ফসল স্থির করে, তবে সেই সব ফকীহর মত অনুযায়ী ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে, যারা বলেন, কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য ওয়াক্ফ করতে পারে না। এমনিভাবে যদি এক বছরের ফসল ওয়াক্ফদাতার জন্য ধার্য করে, সেক্ষেত্রে ওই একই কথা (আল-হাবী)।

৬৩. মাসআলা : অবশ্য ওয়াক্ফদাতা যদি ফসল বণ্টনের ইখতিয়ার নিজ হাতে রাখে তারপর সে তা নিজের পেছনে ব্যয় করে, তবে ওয়াক্ফ বাতিল হবে না। যেই ব্যক্তির হাতে ইখতিয়ার অর্পণ করা হয় সে যদি বলে, আমি এর ফসল ধনীদেবের জন্য স্থির করলাম তবে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৬৪. মাসআলা : যদি কেউ তার জমি কারও বংশধরদের জন্য এই শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে এর ফসল দিতে পারব এবং তদুপরে সে সেই বংশের কোন একজনকে তা দেওয়ার ইচ্ছা তবে তা জায়েয। চাইলে সে সকলকেও দিতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে তাদের সকলের মধ্যে ফসল সমান হারে বণ্টন করা হয়। বস্তুত 'যাকে ইচ্ছা দিতে পারব' কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। সকলেও এর মধ্যে শামিল হতে পারে। যদি সে অন্য কোন বংশের লোককে সে ফসল দিতে চায় তবে তার সে ইচ্ছা গ্রহণযোগ্য নয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৬৫. মাসআলা : যদি বলে, আমার এই জমি অমুকের পুত্রের জন্য এই শর্তে ওয়াক্ফ যে, আমি তাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা এর ফসল দিতে পারব, তবে তাদের মধ্যে যে-কাউকে ইচ্ছা হয় তা দিতে পারবে। যদি বলে, তাদের মধ্য হতে কোনও একজনকে তা দিতে চাব না, তবে ফসল তাদের সকলেরই হবে। এভাবে কার্যত সে তার ইখতিয়ারই বিলুপ্ত করে ফেলল এবং সে যেন নিজের জন্য কোন ইখতিয়ার রাখল না।

যদি বলে, আমার এ জমি অমুক বংশের জন্য ওয়াক্ফ এই বলে সে চূপ করে, এমনিভাবে যদি ওয়াক্ফদাতার মৃত্যু হয়ে যায় তবে সে ওয়াক্ফই বংশের জন্য হয়ে যাবে।

যদি বলে, আমি এর ফসল অমুকের পুত্রের জন্য স্থির করলাম তার ভাইদের জন্য নয়, তবে তাও জায়েয তারপর তার আর তাতে পরিবর্তন করার ইখতিয়ার থাকবে না। ওয়াক্ফদাতা চাইলে সে ব্যক্তির পুত্রদের একজনকে অপরের চেয়ে বেশী দিতে পারে এবং চাইলে কাউকে বঞ্চিতও করতে পারে। কিংবা সকলকে দিলে সে ইখতিয়ারও তার আছে। এ সিদ্ধান্ত 'ইসতিহসান' অনুযায়ী।

ওয়াক্ফের ফসল যার জন্য ধার্য করা হয়েছিল তার যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তবে ওয়াক্ফদাতার ইখতিয়ার তারপরও যথারীতি বহাল থাকবে (আল-হাবী)।

৬৬. মাসআলা : যদি সকল পুত্রকেই দিতে চায় তবে ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত এবং এটা কিয়াসসম্মত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সকলকে দিতে চাইলে সেটাও জায়েয এবং ইসতিহসান অনুযায়ী সকলেই তা পাবে। কেননা منهم (অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা দিতে পারব)-এর من (মধ্য হতে) অব্যয়টি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে অংশবোধক এবং তার শিষ্যদ্বয়ের মতে ব্যাখ্যাব্যঞ্জক (আল-বাহরুর রায়িক)।

৬৭. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা যদি তাদের মধ্যে কাউকে দেওয়া স্থির করে, ফেলে এবং তারপর তার মৃত্যু হয়ে যায়, সেই সংগে যাকে স্থির করেছিল সেও মারা যায়, তবে তার অংশ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যদি সেই ব্যক্তির পুত্রগণ ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া স্থির করে তবে তার সে ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৬৮. মাসআলা : যদি বলে, আমি এর ফসল অমুকের পুত্রদের এবং তাদের বংশধরদের দিলাম, তবে তার পুত্রদের ক্ষেত্রে তার দেওয়াটা বৈধ, কিন্তু তাদের আওলাদ ও বংশধরগণ কিছুই পাবে না (আল-হাবী)।

৬৯. মাসআলা : যদি বলে, আমার জমি অমুকের পুত্রদের জন্য এই শর্তে ওয়াক্ফ যে, আমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেশী দিতে পারব, তবে তা জায়েয এবং সে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেশী দেওয়ার ইখতিয়ার রাখবে। যদি সে ইখতিয়ার প্রত্যাহার করে নেয় এবং বলে ইখতিয়ার আরোপ করব না কিংবা সে যদি মারা যায়, তবে যাদের জন্য ওয়াক্ফ করেছিল, ফসল তাদের মধ্যে সমান হারে বন্টন করা হবে। সে যদি কাউকে বঞ্চিত করতে চায়, তবে তার সে অধিকার থাকবে না। এমনভাবে যদি কারও পুত্রদের জন্য এই শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, অমুক ব্যক্তি চাইলে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেশী দিতে পারবে, তবে সেই ব্যক্তি তার ইচ্ছা মত তাদের মধ্যে কমবেশী দেওয়ার ইখতিয়ার রাখবে (আল-মুহীত)।

১. অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে আরবী (তাদের মধ্যে) বলে ওয়াক্ফদাতা বুঝাতে চেয়েছে যে, তাদের সকলকে নয়, বরং অংশ-বিশেষকে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে তার শিষ্যদের মতে, এর দারা বোঝানো হয়েছে যে, ওয়াক্ফদাতা একজনকে দিক আর সকলকেই দিক সর্বাবস্থায় দেওয়া হবে অমুকের পুত্রদেরকেই, অন্য কারকে নয়।

৭০. মাসআলা : যদি তাদের মধ্যে বিশেষ কাউকে অর্ধেক ফসল এবং বাকি সকলকে অর্ধেক ফসল দেওয়া স্থির করে তবে তাও জায়েয। সেমতে তার স্থিরীকৃত ব্যক্তি অর্ধেক পাবে এবং সে সহ অন্যরা অবশিষ্ট অর্ধেক ফসলের সমান অংশীদার হবে। কেননা সে বিশেষভাবে অর্ধেকে তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল আর এভাবে অর্ধেকে কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবী হচ্ছে যে, বাকি অর্ধেকেও তার অংশীদারিত্ব থাকবে।

যদি বলে, এই শর্তে ওয়াক্ফ করেছি যে, আমি যাকে ইচ্ছা ফসলের একটা বিশেষ অংশ তাকে দান করব, তারপর সে তার জন্য অর্ধেক ফসল ধার্য করল, এ অবস্থায় অবশিষ্ট অর্ধেকে তার কোন অংশ থাকবে না। তবে সে যদি তাদের সকলকেই দিতে চায় তাও জায়েয (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৭১. মাসআলা : যদি বলে আমার জমি এই শর্তে ওয়াক্ফ যে, আমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে তাকেই দেব, তবে তার শর্ত অনুযায়ীই ওয়াক্ফ কর্তব্যকর হবে। সে তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করার অধিকার রাখবে এবং একজনকেই যদি সমস্ত ফসল দিয়ে দেয় তা বৈধ হবে। যদি সকলকেই সমস্ত ফসল দেয় তবে من অব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে কিয়াস অনুযায়ী জায়েয না হওয়ারই কথা, কিন্তু ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) অনুসারে এটা জায়েয। যদি বলে, এ বছর কাউকে নির্দিষ্ট করব না, তবে তাও জায়েয এবং ফসল তাদের মধ্যে সমান হারে বন্টন হবে (আল-মুহীত)।

৭২. মাসআলা : যদি বলে, এই শর্তে ওয়াক্ফ যে, আমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করতে পারব, তারপর সে এক ব্যক্তিকে বঞ্চিত রাখল তবে তা জায়েয। কিয়াস অনুযায়ী সে সকলকে বঞ্চিত রাখার অধিকার রাখবে না। কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী তাও পারবে। তারপর সে আর তাদেরকে ফসল দিতে পারবে না বরং সে ওয়াক্ফ গরীবদের হয়ে যাবে।

যদি বলে, তাদেরকে এই বছরের ফসল থেকে বঞ্চিত রাখলাম, তবে সেই বছরের ফসলে তাদের কোন অধিকার থাকবে না; তাতে গরীবদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে সেই বছরের পরের জন্য তার ইখতিয়ার বাকি থাকবে। সে তাদের কাউকে বঞ্চিত করার আগেই যদি মারা যায়, তবে ফসল তাদের সকলের মধ্যে বন্টিত হবে।

যদি বলে, এই শর্তে ওয়াক্ফ করেছি যে, তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাদ দিতে পারব, তারপর সে তাদের একজনকে কিংবা সকলকেই বাদ দিল, তবে সেটা জায়েয এবং তখন সে ফসল গরীবদের হয়ে যাবে। যদি তাদের একজনকে বাদ দেয় এবং তারপর তাকে আবার অন্তর্ভুক্ত করতে চায় তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না; বরং ওয়াক্ফ অন্যদের জন্য কার্যকর হবে। কেননা বাদ দেওয়ার ইখতিয়ারই শর্তভুক্ত করা হয়েছিল, অন্তর্ভুক্ত করার ইখতিয়ার নয় (আল-হাবী)।

৭৩. মাসআলা : তাকে বাদ দেওয়ার সময় ওয়াক্ফ ভূমিতে যদি ফসল থেকে থাকে, তবে হিলাল (র)-এর মতে সে বাদ দেওয়াটা বিশেষভাবে সেই ফসলের জন্যই প্রযোজ্য হবে। কিন্তু

‘আল-আসল’ ও আল-জামি‘উস-সাগীর’-এর ‘ওসীয়ত’ অধ্যায়ে যে মাসআলা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী পরবর্তী সকল ফসল হতেও তার বাদ যাওয়ার কথা। কেননা মাসআলা বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি তার বাগানের ফসল সম্পর্কে ওসীয়ত করে এবং তার মৃত্যুকালে বাগানে ফসল থাকে, তবে সেই ফসল-সহ ভবিষ্যতে উপন্ন ফসলেও ওসীয়ত কার্যকর হবে এবং যার জন্য ওসীয়ত করা হয়েছে সে তা সবই পাবে। কিন্তু হিলাল (র)-এর মত অনুযায়ী সে কেবল বর্তমান ফসল পাবে, ভবিষ্যতে যা জন্ম নেবে তা নয়। আমাদের কোন কোন ফুকাহায়ে কিয়াস হতে এরূপই বর্ণিত আছে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৭৪. মাসআলা : যদি এই কথা বলে বাদ দেয় যে, আমি অমুককে বা অমুককে বের করে দিলাম তবে তাও জায়েয এবং এর ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব তার। যদি ব্যাখ্যা করার আগেই তার মৃত্যু হয়ে যায় তবে অবশিষ্ট সকলকে এক এক অংশ করে দেওয়া হবে এবং তাদের দু’জনের জন্য এক অংশ ধার্য করা হবে। তারা দুজন মীমাংসায় আসলে সে অংশ তারা ভাগ করে নেবে আর যদি দুজন বা তাদের একজন মীমাংসায় রাযী না হয় তবে তাদের বিষয়টা স্থগিত থাকবে, যাবত না তারা মীমাংসায় আসতে সম্মত হয় (আল-বাহরুর-রায়িক)।

৭৫. মাসআলা : যদি বলে, ‘আমি অমুককে বাদ দিলাম, না বরং অমুককে’, তবে তারা দুজনই বাদ হয়ে যাবে।

যদি বলে, এই শর্তে (অমুকের পুত্রদের জন্য) ওয়াক্ফ করেছি যে, যাকে ইচ্ছা আমি এর অন্তর্ভুক্ত করব, তবে সে যে কাউকে ইচ্ছা অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার রাখবে, কিন্তু কাউকে বাদ দেওয়ার কোন ইখতিয়ার তার থাকবে না।

যদি কাউকে অন্তর্ভুক্ত করার আগেই তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে ফসল তাদের হয়ে যাবে। যদি বলে, আমি অমুক ব্যক্তিকে এর ফসলে স্থায়ীভাবে দাখিল করলাম, তবে তার কথা অনুযায়ীই ওয়াক্ফ কার্যকর হবে।

যদি বলে, আমি এই জমি আবদুল্লাহর পুত্রদের জন্য এই শর্তে ওয়াক্ফ করছি যে, যাদের পুত্রদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করবে তবে যাদের পুত্র ছাড়া অন্য কাউকে সে এর অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না, কিন্তু যাদের সকল পুত্রকেই সে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। ফলে সে ওয়াক্ফে তারা আবদুল্লাহর পুত্রদের সমান অধিকার লাভ করবে। উপরিউক্ত শর্ত আরোপের পর যদি বলে, তাদেরকে আমি এর অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা করব না, তবে তাদের ব্যাপারে তার ইখতিয়ার শেষ হয়ে যাবে এবং ওয়াক্ফ আবদুল্লাহর পুত্রদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে (আল-হাবী)।

৭৬. মাসআলা : এক ব্যক্তির কয়েকজন উম্মু ওয়ালাদ (এমন ক্রীতদাসী, মুনীব যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছে) আছে এবং সে তাদের জন্য এই শর্তে ওয়াক্ফ করল যে, তাদের মধ্যে কেউ স্বামী গ্রহণ করলে সে এর কিছুই পাবে না। পরে দেখা গেল তাদের মধ্যে একজন স্বামী গ্রহণ করেছে কিন্তু পরে আবার তালাকও হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে দুই অবস্থা হতে পারে; হয়ত ওয়াক্ফদাতা ওয়াক্ফের মাঝে এরূপ শর্ত করেনি যে, স্বামী গ্রহণের পর যার তালাক

হয়ে যাবে সেও পাবে অথবা এরূপ শর্ত করেছিল। প্রথম অবস্থায় পাবে না। কেননা সাধারণভাবে ওয়াক্ফদাতার শর্ত ছিল যে উম্মু ওয়ালাদ স্বামী গ্রহণ করবে সে পাবে না। দ্বিতীয় অবস্থায় পাবে, যেহেতু সেই শর্তের পর আবার তালাকপ্রাপ্তকে ব্যতিক্রম রেখেছিল। নেতিবাচক থেকে ব্যতিক্রম করলে ইতিবাচক সাব্যস্ত হয় (যা দ্বারা তার পাওয়াটা সাব্যস্ত হয়ে যায়)।

এমনিভাবে যদি কারও পুত্রদের জন্য এই শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, তাদের মধ্য হতে সে দেশ ত্যাগ করবে সে ব্যতিক্রম, তারপর তাদের মধ্য হতে কেউ দেশ ত্যাগ করার পর আবার ফিরে আসলে সে ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত নিয়ম প্রযোজ্য।

এমনিভাবে যদি ওয়াক্ফ করে যে অমুকের পুত্রদের মধ্যে যারা দীনী ইল্ম শিখবে তারা পাবে, তারপর দেখা গেল তাদের মধ্যে কোন একজন ইল্ম শেখা হতে বিরত থাকল, কিন্তু পরে আবার শেখায় রত হল, তবে এক্ষেত্রেও একই নিয়ম (আল-ওয়াকিআতুল হসামিয়া)।

৭৭. মাসআলা : ‘আল-খাসসাফ’-রচিত ‘ওয়াক্ফ’ গ্রন্থে আছে, কেউ যদি তার জমি এভাবে ওয়াক্ফ করে যে, তা পাবে তার সন্তান, বংশধর এবং পরবর্তী প্রজন্মের বংশধরগণ-যতদিন তাদের ধারা জারি থাকে এবং তারপর পাবে গরীব-মিসকীনগণ; সেই সংগে যদি শর্ত আরোপ করে যে, তাদের মধ্যে যে কেউ আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব ত্যাগ করে শাফিঈ (র)-এর মাযহাব গ্রহণ করবে, সে এ ওয়াক্ফ হতে বহিষ্কার বলে গণ্য হবে, তবে সে ওয়াক্ফ তার শর্ত অনুসারেই কার্যকর হবে। তাদের মধ্যে কেউ ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবে বলে সে ওয়াক্ফ হতেও বাদ হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে কেউ যদি বলে কারও সম্পর্কে দাবী করে যে, সে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মাযহাব ছেড়ে শাফিঈ (র)-এর মাযহাব গ্রহণ করেছে আর বিবাদী তা অস্বীকার করে, তবে বাদীকে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করতে হবে। অন্যথায় বিবাদীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (আয-যাখীরা)।

৭৮. মাসআলা : কেউ যদি তার আওলাদের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং শর্ত আরোপ করে যে, তাদের মধ্যে কেউ ‘মুতায়িলা’ মতাদর্শ গ্রহণ করলে সে ওয়াক্ফ হতে খারিজ হয়ে যাবে, তবে তাদের মধ্যে কেউ ‘মুতায়িলা’ মতের অনুসারী হলে সে ওয়াক্ফ হতে বাদ পড়ে যাবে, এমনিভাবে ওয়াক্ফদাতা যদি ‘মুতায়িলা’ মতের অনুসারী হয় এবং শর্ত করে যে, কেউ আহলুস-সুন্নাহ মত গ্রহণ করলে সে ওয়াক্ফ হতে খারিজ হয়ে যাবে, তবে তার শর্তও কার্যকর হবে।

যদি শর্ত করে, কেউ ‘আহলুস-সুন্নাহ’-র মতাদর্শ ত্যাগ করে অন্য মত গ্রহণ করলে সে ওয়াক্ফ হতে খারিজ হয়ে যাবে, তারপর যদি কেউ খারিজী বা রাফিযী হয়ে যায় তবে সে ওয়াক্ফ হতে বাদ হয়ে যাবে যদি কেউ ইসলাম ত্যাগ করে (নাউযুবিল্লাহ) মুরতাদ হয়ে যায় তবে সেও বাদ যাবে। এ ক্ষেত্রে নর ও নারীর একই বিধান। যদি শর্ত করে, কেউ ‘আছবাত’ মত ত্যাগ করলে সে বাদ হয়ে যাবে, তবে কেউ তা ত্যাগ করার পর পুনরায় ফিরে আসলেও সে ওয়াক্ফের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করবে না। তবে সেরূপ শর্ত থাকলে ভিন্ন কথা। মোদাকথা ওয়াক্ফদাতা যে- কোন ও মাযহাব নির্দিষ্ট করে দিলে এবং তা থেকে বের হলে ওয়াক্ফ হতে বঞ্চিত হওয়ার শর্ত আরোপ করলে তার সে শর্ত কার্যকর হবে। এমনিভাবে যদি শর্ত করে,

তার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ বাগদাদ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেলে ওয়াকফের মধ্যে তার কোন অধিকার থাকবে না, তবে তার সে শর্তও গ্রহণযোগ্য। অবশ্য এক্ষেত্রে সে ব্যক্তি বাগদাদে ফিরে আসলে সে ওয়াকফ ফেরত পাবে (আল-বাহরুর-রায়িক)।

৭৯. মাসআলা : যদি বলে, আমার এই জমি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে যায়দ ও আমরের জন্য তাদের জীবনকালের মেয়াদ এবং তাদের মৃত্যুর পর গরীবদের জন্য এই শর্তে ওয়াকফ যে, ফসল বন্টনের শুরু করতে হবে যায়দ হতে, তাকে প্রতি বছর এক হাজার দিরহাম পরিমাণ দিতে হবে। তারপর 'আমরকে বছরের খোরাক দেওয়া হবে, তবে তাও জায়েয। এভাবে বন্টনের পর ফসল কিছু বেঁচে থাকলে তা তাদের মধ্যে সমান হারে বন্টন হবে। যদি এক বছরের ফসল কেবল এক হাজার দিরহাম পরিমাণই হয় তবে সবটাই যায়দকে দেওয়া হবে। এমনভাবে তার কম হলেও সবটা যায়দ পাবে। যদি যায়দের মৃত্যুর পর বছরের ফসল ওঠে, তবে আমরকে এক বছরের খোরাক পরিমাণ দেওয়া হবে। যদি সর্বমোট আয় তিন হাজার দিরহাম বরাবর হয় এবং আমরের বার্ষিক খোরাক হয় এক হাজার দিরহাম, তবে তাকে এক হাজার দিরহাম দেওয়া হবে এবং তার প্রাপ্য হবে আয়ের অর্ধাংশ অর্থাৎ আরও পঁচিশ দিরহাম অবশিষ্ট এক হাজার পাঁচশ' দিরহাম গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

যদি যায়দের পরিবর্তে আমরের মৃত্যু হয় যায়দকে তার নির্ধারিত এক হাজার দিরহাম দেওয়া হবে এবং সেই সংগে আয়ের পূর্ণ অর্ধাংশ হতে আরও যতটুকু বাকি। তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তা গরীবদের।

যদি বলে, আমার এই জমি যায়দ, আমর ও খালেদের জন্য ওয়াকফ, তবে সে ওয়াকফের সূচনা হবে যায়দ থেকে। সুতরাং সে যতদিন বেঁচে থাকবে এ জমির ফসল সেই পাবে। তারপর আমরের অগ্রাধিকারে সে এর ফসল পেতে থাকবে, যতদিন সে বেঁচে থাকে। তারপর পাবে খালেদ। যতদিন বেঁচে থাকে ফসল পেতে থাকবে। তারপর পূর্ববর্ণিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এর বন্টন হতে থাকবে। যখন এদের সিলসিলা শেষ হয়ে যাবে, তখন এর ফসলে গরীবদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মুহীত)।

৮০. মাসআলা : 'সিয়ারুল-উয়ুন' গ্রন্থে আছে, কেউ একটি ঘোড়া দশ বছরের জন্য ফী সাবীলিল্লাহ ওয়াকফ করল এবং তার পর সেটি মালিকের হাতে প্রত্যাবর্তনের শর্ত করল, তা এ জাতীয় ওয়াকফ বাতিল। হিলাল (র)-এর উসতায় ইউসুফ ইব্ন খলিদ আস-সামতী (র) হতে বর্ণিত আছে যে, ওয়াকফ সহীহ হবে, তবে শর্ত বাতিল (আয-যাখীরা)।

৮১. মাসআলা : যদি কেউ জিহাদে বা আল্লাহর পথে এই শর্তে ঘোড়া ওয়াকফ করে যে, সে যতদিন জীবিত থাকবে, ঘোড়াটি নিজের কাছে রাখবে, তবে ওয়াকফ জায়েয হবে। কেননা এরূপ শর্ত না করলেও তার জন্য তা রাখা জায়েয হত। আল্লাহর পথে দানের অর্থ জিহাদে তার ব্যবহার। যদি অন্য কোন উপায়ে সেটি কাজে লাগানোর ইচ্ছা করে তবে তা জায়েয হবে না। সেটি ভাড়া দিলে তাও বৈধ হবে না। তবে সে যদি নিজের চলার খরচ যোগানোর জন্য যদি ভাড়া দিতে বাধ্য হয় সেটা ভিন্ন কথা (আল-ওয়াজীয)।

৮২. মাসআলা : আল-খাসুসাফ (র) মুতাওয়াল্লী ওয়াকফের জমি ইজারা দিতে পরবে না এরূপ শর্ত করা বৈধ। সেক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী ইজারা দেয়া বৈধ হবে না। এমনভাবে যদি শর্ত করে যে, জমিতে যে খেজুর গাছ বা অন্যান্য যেসব বৃক্ষ আছে, তা বর্গা দিতে পারবে না, সে শর্তও বিধি সম্মত। এরূপ শর্তও জায়েয আছে যে মুতাওয়াল্লী তা ইজারা দিলে সে বরখাস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং মুতাওয়াল্লী তার ব্যতিক্রম করলে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কাযী বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করবে। যদি শর্ত করে যে, এই ওয়াকফের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি ওয়াকফ বাতিল করার কোন পদক্ষেপ নিলেন বা ওয়াকফ হতে বহিস্কৃত হবে, তা হলে সে শর্তও কার্যকর হবে। যদি কোন ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হয় এবং দাবী করে যে, আমি তো ওয়াকফকে বিধিসম্মত করতে চেয়েছি, কিন্তু সংশ্লিষ্ট অপরাপর ব্যক্তিদের বক্তব্য হচ্ছে, তুমি চেয়েছিলে ওয়াকফ বাতিল করতে তা হলে কাযী বিবাদকারীদের অবস্থা খতিয়ে দেখবে। যদি তারা বিধিসম্মত করারই ইচ্ছা করে থাকে তবে কাযী সেটাই করে দেবে। আর যদি প্রমাণ হয় যে, তারা ওয়াকফ বাতিল করতে চেয়েছিল, তা হলে তাদেরকে বহিস্কার করবে এবং তাদের বহিস্কারের পক্ষে সাক্ষী রাখবে। যদি শর্ত করে যে, যে কেউ মুতাওয়াল্লীর সংগে বিবাদে লিপ্ত হবে এবং তার পেছনে পড়বে, সেই বহিস্কার হয়ে যাবে। ওয়াকফ বাতিল করার জন্য বিবাদ করার কথা সে বলল না, তা হলে যে ব্যক্তি মুতাওয়াল্লীর সংগে বিবাদ করবে এবং বলবে, সে আমার প্রাপ্য অংশ দিচ্ছে না, সে ব্যক্তিও বহিস্কার হয়ে যাবে। এমনকি যদি নিজ প্রাপ্যের দাবীতে বিবাদ করে, তবুও মুতাওয়াল্লীর শর্তসাপেক্ষে সে বহিস্কার হয়ে যাবে। যেমন শর্ত হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি তার অধিকার দাবী করবে মুতাওয়াল্লী তাকে বহিস্কার করতে পারবে। বহিস্কারের পর পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার শর্ত না থাকলে মুতাওয়াল্লী তাকে পুনর্বার দাখিল করতে পারবে না (আল-বাহরুর-রায়িক)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধান, মুতাওয়াল্লীর

ক্ষমতা, আয় বন্টন ইত্যাদি

১. মাসআলা : যে ব্যক্তি কর্তৃত্ব চায় না এবং তার মধ্যে বিশেষ কোন পাপাচার আছে বলেও জানা যায় না, এমন ব্যক্তিই তত্ত্বাবধায়ক (মুতাওয়াল্লী) হওয়ার উপযুক্ত (ফাতহুল-কাদীর)।

২. মাসআলা : 'আল-ইস্‌আফ' গ্রন্থে আছে, এমন ব্যক্তিকেই শুধু মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হবে যে বিশ্বস্ত এবং নিজে কিংবা প্রতিনিধির মাধ্যমে তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম, এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ কিংবা অন্ধ ও চক্ষুস্থান সমান। অপরাধে 'মাহদুদ ফিল কয়ফ' যদি তওবা করে তবে তাকেও এ পদে নিযুক্ত করা যাবে। অবশ্য প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া (অর্থাৎ উন্মাদ না হওয়া) এ পদের অপরিহার্য শর্ত (আল-বাহরুর-রায়িক)।

৩. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা যদি তার বংশধরদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হবে তার জন্য এ পদটি সংরক্ষণ করে যায়, তবে কাযী তার বংশধরদের মধ্যে যে, ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত তাকে এ পদে নিযুক্ত করবে। ওয়াক্ফ-সম্পত্তির কর্তৃত্ব লাভের অধিকার তারই। সুতরাং এ ক্ষমতা তারই হাতে যাবে। এটা ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস)-সম্মত।

এমনিভাবে যদি ওয়াক্ফ-সম্পত্তির জন্য নাবালক কাউকে ওয়াসী (ট্রাস্টি) বানিয়ে যায়, তবে কিয়াস অনুযায়ী তা বাতিল হলেও ইসতিহসান এই যে, এ অধিকার তারই জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যা বড় হওয়ার পর সে লাভ করবে।

ওয়াক্ফদাতা যদি অনুপস্থিত কোন ব্যক্তিকে এ পদে নিযুক্ত করে যায়, তবে কাযী তার ফিরে না আসা পর্যন্ত এক ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করবে। সে ব্যক্তি যখন ফিরে আসবে তখন দায়িত্ব তাকেই বুঝিয়ে দেওয়া হবে। (আল-হাবী)

৪. মাসআলা : 'আল-ইস্‌আফ' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী মুতাওয়াল্লী পদের জন্য স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া এবং মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। কিয়াস ও ইসতিহসান অনুসারে গোলামকেও মুতাওয়াল্লী বানানো যায়। এক্ষেত্রে যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) ও গোলামের একই হুকুম।

কাযী যদি গোলাম বা যিম্মীকে এ পদ হতে বরখাস্ত করে এবং তারপর গোলাম স্বাধীনতা পেয়ে যায় এবং যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করে, তবুও মুতাওয়াল্লী পদ তারা ফিরে পাবে না (আল-বাহরুর-রায়িক)

৫. মাসআলা : 'মুহাম্মাদ ইবনুল-ফাদল'-এর ফাতাওয়া সংকলনে আছে, এরূপ শর্ত করা সর্বসম্মতিক্রমেই বৈধ যে, ওয়াক্ফকারী এবং তার সন্তানরাই মুতাওয়াল্লী থাকবে (আত-তাজার খানিয়া)।

৬. মাসআলা : ওয়াক্ফকারী নিজে যদি মুতাওয়াল্লী নির্দিষ্ট না করে দেয় তাহলে কারো কারো মতে ওয়াক্ফকারী নিজেই মুতাওয়াল্লী হবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতের সংগে সংগতিপূর্ণ। কেননা তার মতে ওয়াক্ফ সহীহ হওয়ার জন্য হস্তান্তর শর্ত নয়। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ ওয়াক্ফই সহীহ নয়, এবং এ অনুযায়ীই ফাতওয়া দেওয়া হয়ে থাকে (আস-সিরাজিয়া)।

৭. মাসআলা : কেউ যদি তার ওয়াক্ফ করা জমি মুতাওয়াল্লীর কাছে হস্তান্তর করার আবার নিজের তত্ত্বাবধানে আনতে চায়, তাহলে যদি ওয়াক্ফকালে মুতাওয়াল্লীকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা নিজের জন্য সংরক্ষণ করে থাকে তা হলে তা পারবে। আর এরূপ শর্ত না থাকলে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী পারবে না এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী সে তা করতে পারবে। বলাখ-এর ফুকাহায়ে কিরাম ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত অনুসারে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। ফকীহ আবুল লাইস (র)-ও এটাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বুখারার ফুকাহায়ে কিরাম ফাতাওয়া দেন ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত হিসেবে আর ফাতাওয়াও দেওয়া হয় অনুরূপ (আল-মুহম্মারাত)।

৮. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা যদি নিজের জন্যই মুতাওয়াল্লী পদ সংরক্ষণ করে, কিন্তু ওয়াক্ফ সম্পত্তির ব্যাপারে সে বিশ্বস্ত না হয়, তাহলে কাযী তার হাত থেকে তা ছাড়াতে পারবে (আল-হিদায়া)।

৯. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি ওয়াক্ফ-সম্পত্তির সংস্কার না করে এবং তার হাতে ওয়াক্ফের এ পরিমাণ আর জমা থাকে, যাদ্বারা সংস্কার সম্ভব তা হলে কাযী তাকে সংস্কার কার্যে বাধ্য করবে। যদি তা করে তো ভাল, অন্যথায় সে জমি তার হাত থেকে মুক্ত করবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা : ওয়াক্ফকারী যদি এমন কঠিন শর্ত করে যে, সে নিজে মুতাওয়াল্লী থাকবে এবং তাকে বরখাস্ত করার অধিকার কাযীর থাকবে না, তাহলেও ওয়াক্ফে দেখাশুনায় সে বিশ্বস্ত না হলে কাযী তাকে বরখাস্ত করে উপযুক্ত মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করতে পারবেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : ওয়াক্ফের জন্য কল্যাণকর মনে হলে ওয়াক্ফদাতার নিযুক্ত মুতাওয়াল্লীকেও কাযী অব্যাহতি দিতে পারে (আল-ফুসুলুল-ইমাদিয়া)।

১. কারো প্রতি যিনার অপবাদ আরোপের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি। —সম্পাদক।

১২. মাসআলা : যদি শর্ত করে যে, অমুক এর মুতাওয়াল্লী হবে এবং আমি তাকে বরখাস্ত করতে পারব না, তবে মুতাওয়াল্লী বানানোটা ঠিকই আছে, কিন্তু বরখাস্ত করতে না পারার শর্ত বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৩. মাসআলা : যদি ওয়াক্ফদাতা তার জীবদ্দশা ও মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য কাউকে মুতাওয়াল্লী বানায়, তবে তাও জায়েয। এক্ষেত্রে তার জীবদ্দশায় সে ব্যক্তি তার উকীল এবং মৃত্যুর পরে তার ওয়াসী সাব্যস্ত হবে। যদি তার জীবিত থাকা পর্যন্ত মুতাওয়াল্লী থাকবে, তার মৃত্যুর পরে নয়। যদি বলে, আমি আমার এই সাদাকার জন্য তোমাকে আমার উকীল জানালাম, আমার জীবদ্দশায়ও এবং আমার মৃত্যুর পরেও, তবে তা জায়েয এবং সে ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় তার উকীল হবে এবং মৃত্যুর পর হবে তার ওয়াসী (আয-যাখীরা)।

১৪. মাসআলা : যদি কাউকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত না করে এবং ইত্যবসরে তার মৃত্যু হয়ে যায় এবং মৃত্যুকালে কাউকে ওসীয়াত করে যায়, তবে তার মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তি তার যাবতীয় সম্পদের ক্ষেত্রে ওয়াসী এবং ওয়াক্ফ ভূমির জন্য মুতাওয়াল্লী সাব্যস্ত হবে। যদি তার পর অন্য কোনও লোককেও ওসীয়াত করে থাকে তবে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি ওয়াসী হবে, কিন্তু মুতাওয়াল্লী হবে না, যদি কাউকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত না করে, পরিশেষে কাযী কাউকে এ পদে নিয়োগ দেয় এবং তার তত্ত্বাবধান সম্পর্কে ফায়সালা দিয়ে দেয়, তা হলে ওয়াক্ফদাতার আর তাকে বাদ দিয়ে নিজে মুতাওয়াল্লী হওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না (আল-ফাতাওয়া, আল-‘আত্তাবিয়্যার)।

১৫. মাসআলা : যদি কাউকে বিশেষভাবে ওয়াক্ফ সম্পর্কে ওসীয়াত করে, তবে সে জাহিরী রিওয়াযাত অনুসারে সে ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র) এর মতে যাবতীয় বিষয়ে, ওয়াসী সাব্যস্ত হবে এবং এটাই সহীহ মত (আল-গিয়াছিয়া)।

১৬. মাসআলা : এমনভাবে যদি এক ব্যক্তিতে ওয়াক্ফ সম্পর্কে ওসীয়াত করে এবং অন্য ব্যক্তিকে ওসীয়াত করে, তার সন্তানদের সম্পর্কে কিংবা একজনকে ওসীয়াত করে নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি সম্পর্কে এবং অন্য একজনকে ওসীয়াত করে ওয়াক্ফদের অন্য সম্পত্তি সম্পর্কে, তবে উভয়েই উভয় ক্ষেত্রে ওসী সাব্যস্ত হবে (আয-যাখীরা)।

১৭. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি তার জমি ওয়াক্ফ করে এবং কাউকে তার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরের জন্যও তার মুতাওয়াল্লী করে, তারপর যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন কাউকে সে সম্পর্কে ওসীয়াত করে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) সূত্রে হিলাল (র) বর্ণনা করেন যে, সেই ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লীর অংশীদার হবে। যেন ওয়াক্ফদাতা তাদের দু'জনকেই মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেছে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা : যদি দু'টি জমি ওয়াক্ফ করে এবং প্রত্যেকটির জন্য পৃথক মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে, তবে একজন অন্যজনের সংগে শরীক থাকবে না। পক্ষান্তরে একজনকে যদি তার ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী বানায় এবং তারপর অন্য কাউকে ওয়াসী নিযুক্ত করে তবে সে ওয়াসী ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লীর অংশীদার হবে। তবে যদি বলে, আমি আমার জমি অমুক

অমুকের জন্য ওয়াক্ফ করলাম এবং অমুক ব্যক্তিকে তার মুতাওয়াল্লী বানালাম আর অমুককে আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের ওয়াসী বানালাম, তবে এক্ষেত্রে প্রত্যেকের ইখতিয়ার তার প্রতি ন্যস্ত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে (আল-বাহরুর-রায়িক, আল-ইসআফ-এর বরাতে)।

১৯. মাসআলা : যদি শর্ত করে, আমার মৃত্যুর পর এর মুতাওয়াল্লী হবে অমুক, তার পরে অমুক এবং তারপর অমুক, তবে এরূপ শর্ত জায়েয (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২০. মাসআলা : যদি বলে, আমি অমুককে ওয়াসী বানালাম এবং ইতোপূর্বে আমার যত ওসীয়াত ছিল তা প্রত্যাহার করে নিলাম, তাহলে এই সর্বশেষ ব্যক্তিই মুতাওয়াল্লী সাব্যস্ত হবে এর ইতোপূর্বে যে ব্যক্তি মুতাওয়াল্লী ছিল, সে তার পদ থেকে বাদ হয়ে যাবে।

ওয়াক্ফদাতা যদি দুই ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী বানায় অথবা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ওয়াসী ও মুতাওয়াল্লী উভয়ের হাতে যায়, তবে তাদের কোনও একজন ওয়াক্ফের ফসল বিক্রি করতে পারবে না, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুসারে যে- কোনও একজনের সে ইখতিয়ার থাকার কথা। যদি একজন বিক্রি করে এবং অপরজন তা অনুমোদন করে অথবা একজন অপরজনকে তার উকীল বানিয়ে দেয় তবে জায়েয হবে (আল-হাবী)।

২১. মাসআলা : যদি ওয়াক্ফদাতা কাউকে তার ওয়াক্ফ-সম্পত্তির ওয়াসী বানায় এবং শর্ত আরোপ করে যে, সে অন্য কাউকে ওয়াসী বানাতে পারবে না তবে সে শর্ত জায়েয (আল-জাহীরিয়্যার)।

২২. মাসআলা : যদি দুই ওয়াসীর একজন মারা যায় এবং একদল লোককে ওসীয়াত করে যায়, তবে জীবিত ওয়াসীত ওয়াসীর একার তাতে কিছু করবার ইখতিয়ার থাকবে না। অর্ধেক ফসল সেই দলের হাতে ন্যস্ত করতে হবে যারা মৃত্যু ওয়াসীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে (আল-হাবী)।

২৩. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা যদি তার মৃত্যুর পরের জন্য ওয়াক্ফের দায়িত্ব দুই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করে, এরপর সেই দুই ব্যক্তির একজন অপর জনকে ওয়াক্ফের ব্যাপারে তার ওয়াসী নিযুক্ত করে এবং মারা যায়, তা হলে জীবিত ব্যক্তি সমস্ত ওয়াক্ফ-সম্পত্তিতে কাজ করার ইখতিয়ার রাখবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৪. মাসআলা : যদি দুই ব্যক্তিকে ওসীয়াত করে এবং একজন তা গ্রহণ করে এবং অন্যজন প্রত্যাখ্যান করে, তবে কাযী তার স্থানে অন্য একজনকে নিযুক্ত করবে, যাবত না উভয়ে তা গ্রহণে একমত হয়, যেমন ওয়াক্ফদাতার অভিপ্রায় ছিল। তবে যে ব্যক্তি গ্রহণ করেছিল কাযী যদি সমগ্র ওয়াক্ফের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করে সেও জায়েয। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ থাকার কথা নয় (আল-জাহীরিয়্যার)।

২৫. মাসআলা : যদি দু'জনকে ওসীয়াত করে এবং তাদের একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপরজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তবে কাযী অপ্রাপ্ত বয়স্কের স্থানে অন্য একজনকে নিযুক্ত করবে (আল-হাবী)।

২৬. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা তার পুত্রের বালেগ হওয়া পর্যন্ত সময়কালের জন্য যদি কাউকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে এবং শর্ত আরোপ করে যে, পুত্র বালেগ হওয়ার পর তার সংগে শরীক হবে, তবে পুত্রের পক্ষে আরোপিত শর্ত হাসান (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী জায়েয নয়। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, জায়েয। যদি কাউকে এই মর্মে ওয়াসী বানায় যে, এই পরিমাণ অর্থ দ্বারা সে এক খণ্ড জমি কিনবে এবং অমুক অমুকের জন্য তা ওয়াক্ফ করবে আর এ ওসীয়াত সম্পর্কে সাক্ষীও রাখে তবে তা জায়েয। সেই ব্যক্তি এ ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী হয়ে যাবে। চাইলে সে অন্যকে এ সম্পর্কে ওসীয়াতও করতে পারে।

ওয়াক্ফকারী যদি তার কোন ওয়াক্ফ-সম্পত্তিতে কাউকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে এবং তারপর আরও একখণ্ড জমি ওয়াক্ফ করে, কিন্তু কাউকে তার মুতাওয়াল্লী না বানায়, তবে প্রথম ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী এই দ্বিতীয় ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী হবে না 'অবশ্য ওয়াক্ফকারী যদি বলে, 'তুমি আমার ওসী', তাহলে ভিন্ন কথা (আল-বাহরুর-রায়িক)।

২৭-মাসআলা : যদি মুতাওয়াল্লীর পদটি নিজ সন্তানদের জন্য এই শর্তে সংরক্ষণ করে যে, শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ক্রমে তারা এর মুতাওয়াল্লী হবে, তা হলে তার সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠজন মুতাওয়াল্লী হবে। শ্রেষ্ঠতমজন যদি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা হলে পরবর্তী পর্যায়ে শ্রেষ্ঠজন মুতাওয়াল্লী হবে। তারপর প্রথমজন যদি পাপাচার ছেড়ে দিয়ে রুণ্যবান হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়জনকে ছাড়িয়ে যায় তবে মুতাওয়াল্লী পদটিও তার হাতে ফিরে আসবে। এটাই জাহিরী রিওয়াযাত (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২৮. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা যদি বলে, আমার সন্তানদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে শ্রেষ্ঠজন এ ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী হবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠজন তা গ্রহণ করতে অসম্মত হয়, তবে ইসতিহসান অনুযায়ী তার পরের শ্রেষ্ঠজন মুতাওয়াল্লী হবে। কেননা সর্বশ্রেষ্ঠজনের অসম্মতি, এক্ষেত্রে তার মৃত্যুতুল্য (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা : যদি সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্য মুতাওয়াল্লী-পদ সংরক্ষণ করে কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বে তারা সকলেই সমান হয়, তা হলে বয়ঃজ্যেষ্ঠজন মুতাওয়াল্লী, তা সে পুরুষ-নারী যাই হোক না কেন। যদি তাদের মধ্যে কেউ এ পদের উপযুক্ত না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে একজন উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কাযী বাইরের কাউকে মুতাওয়াল্লী বানাবে। যখন তাদের মধ্যে কেউ উপযুক্ত হয়ে যাবে, তখন দায়িত্ব তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

যদি নিজ সন্তানদের মধ্যে দু'জনকে মুতাওয়াল্লী বানানোর শর্ত করে, আর তাদের মধ্যে এক পুত্র ও এক কন্যার এ পদের উপযুক্ত হয়, তা হলে পুত্র তত্ত্বাবধান-কার্যে কন্যাটি পুত্রের শরীক হবে। 'কেননা সন্তান' (الولد) শব্দটি তার জন্যও প্রযোজ্য, পক্ষান্তরে যদি বলে, আমার সন্তানদের মধ্যে দু'জন পুরুষ এর মুতাওয়াল্লী হবে সেক্ষেত্রে কন্যা সন্তানের কোন অধিকার থাকবে না (আল-সাহরুর-রায়িক)।

৩০. মাসআলা : কাযী যদি শ্রেষ্ঠতম সন্তানকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে এবং তারপর অন্য কোন সন্তান শ্রেষ্ঠত্বে তাকে ছাড়িয়ে যায়, তখন সেই সন্তানের হাতেই এ দায়িত্ব ন্যস্ত হবে।

পুণ্য ও সততায় দু'জন বরাবর হলে ওয়াক্ফ বিষয়ে অধিকতর বিজ্ঞজন বেশী হকদার হবে। যদি একজন বেশী ধার্মিক এবং অন্যজন বেশী বিজ্ঞ হয়, তবে বিজ্ঞতরকে মুতাওয়াল্লী বানানোই উত্তম- যদি তার পক্ষ হতে খিয়ানত না ঘটায় আস্থা থাকে (আয-যাখীরা)।

৩১. মাসআলা : 'আল-হাবী'র ও ইবন সামাআ-কৃত 'নাওয়াদীর' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ওয়াক্ফদাতা যদি তার নাবালক পুত্রকে ওয়াসী বানায়, তা হলে কাযী সে নাবালকের স্থলে অপর একজন ওয়াসী নিযুক্ত করবে। আর প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর কাযীর নির্দেশ ছাড়া সে নিজে কাযীর নিযুক্ত ওয়াসীকে সরাসরি পারবে না (আল-তাতার খানিয়া)।

৩২. মাসআলা : যদি যায়দ দেশে না ফেরা পর্যন্ত সময়ের জন্য আবদুল্লাহকে মুতাওয়াল্লী বানানোর কথা বলে, তবে বিষয়টা তার কথা মতই হবে। যায়দ ফিরে আসার পর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত অনুযায়ী তারা দু'জনই মুতাওয়াল্লী থাকবে (আয-জাহীরিয়া)।

৩৩. মাসআলা : তবে যদি বলে, অমুক ফিরে আসলে সেই মুতাওয়াল্লী হবে। অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসার পর উপস্থিত ব্যক্তি মুতাওয়াল্লী থাকবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও হিলাল (র)-এর মতে (এরূপ না বললেও) সর্বাবস্থায়ই মুতাওয়াল্লী পদটি ফিরে আসা ব্যক্তির হাতেই বলে যাবে এবং উপস্থিত ব্যক্তির ইখতিয়ার শেষ হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩৪. মাসআলা : যদি বলে, আবদুল্লাহ যতদিন বসরায় থাকবে, ততদিন সেই মুতাওয়াল্লী থাকবে, তবে তার সে কথাও কার্যকর হবে। তদ্রূপ যদি বলে, আমার স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুতাওয়াল্লী থাকবে, অন্য স্বামী গ্রহণ করলে তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না, তবে তার এ শর্তও গ্রহণযোগ্য।

যদি বলে, আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর যায়দ, মুতাওয়াল্লী হবে, এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ যদি অন্য কাউকে ওয়াসী বানিয়ে মারা যায় তবে, যায়দই মুতাওয়াল্লী হবে (আল-হাবী)।

৩৫. মাসআলা : ওয়াক্ফকারীর জীবদ্দশায় যদি মুতাওয়াল্লী মারা যায় তাহলে পরবর্তী মুতাওয়াল্লী নিয়োগের ইখতিয়ার ওয়াক্ফকারীর, কাযীর না, আর ওয়াক্ফকারীর মৃত্যু হলে কাযী অপেক্ষা ওয়াসীর অধিকার বেশী। কোন ওয়াসী না অবশ্য মুতাওয়াল্লী নিয়োগের ইখতিয়ার কাযীর (আল-ফাতাওয়া, আস-সুগরা)।

৩৬. মাসআলা : 'আল-আসল' গ্রন্থে আছে যে, ওয়াক্ফকারীর পরিবারে উপযুক্ত কোন লোক থাকলে সরকার বাইরের কোন লোককে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করবে না। ওয়াক্ফকারীর বংশে উপযুক্ত লোক না থাকার কারণে বাইরের কোন লোককে যদি এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তারপর সে বংশে কোন উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়। তবে বাইরের লোককে অব্যাহতি দিয়ে তদস্থলে তাকেই নিয়োগ দেওয়া হবে (আল-ওয়াজীয)।

৩৭. মাসআলা : আল-হাবী গ্রন্থে আছে, আল-আনসারী তার 'ওয়াক্ফ-গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সরকার যদি ওয়াক্ফকারী নিযুক্ত ওয়াসীকে দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করে

এবং তারপর সে সংশোধন হয়ে যায়, তবে তাকে পুনঃ নিযুক্ত করা যাবে। ওয়াক্ফদাতা কোন প্রতিবেশী বা আত্মীয় বিনা ভাতায় মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালনে সম্মত না হয়, কি বাইরের কেই তাতে সম্মত থাকে, তবে কাযী বিবেচনা করে দেখবে যে, কোনটা ওয়াক্ফজীবীকে জন্য উত্তম এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির জন্য কল্যাণকর। সুতরাং যে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া (আত-তাতার খানিয়া)।

৩৮. মাসআলা : জামিউল-ফুসুল" গ্রন্থে বলা হয়েছে, ওয়াক্ফদাতা যদি শর্ত করে যে মুতাওয়াল্লী তার আওলাদ ও আওলাদের আওলাদের মধ্যে হবে, তবে কোনরূপ খেয়ানতের অভিযোগ না থাকলে কাযী কি বাইরের কাউকে মুতাওয়াল্লী বানাতে পারবে? যদি বানায় তবে সে কি আইনসম্মত মুতাওয়াল্লী হবে? শায়খুল-ইসলাম বুরহানুদ্দীন তার "ফাওয়াইদ" বলেন, কাযী তা পারবে না (আল-নাহরুল-ফায়িক)।

৩৯. মাসআলা : কাযী মারা গেলে বা পদচ্যুত হলে তার নিয়োগকৃত ব্যক্তি আপন পদ বহাল থাকবে (আল-কিনয়া)।

৪০. মাসআলা : ওয়াসীয যেমন তাঁর মৃত্যুকালে অন্য কাউকে ওয়াসী বানাতে পারে তেমনি মুতাওয়াল্লীও নিজ মৃত্যুকালে অন্যের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারে। তবে ওয়াক্ফদাতা মুতাওয়াল্লীর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা ধার্য করে থাকলে, মুতাওয়াল্লী কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি অনুরূপ ভাতার অধিকারী হয়ে যাবে না, বরং সে যখন বিনা ভাতায় কাজ শুরু করে দেবে তখন বিষয়টা কাযীর গোচরে আনা হবে, যাতে তিনি তার জন্য উপযুক্ত ভাতা ধার্য করেন। হাঁ, ওয়াক্ফদাতা যদি সে ভাতাটা যে কোন ব্যক্তি মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্যই ধার্য করে, তবে ভিন্ন কথা। ওয়াক্ফদাতা তার নিযুক্ত ব্যক্তির জন্য যা ধার্য করেছিল, কাযীও তার নিযুক্ত ব্যক্তির জন্য তাই ধার্য করবে এমন নয় (ফাতহুল-কাদীর)।

৪১. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে চায়, তবে তার জন্য তা জায়েয হবে না, যদি না নিয়োগ দানের দায়িত্ব সাধারণভাবে তার প্রতি আরোপ করা হয় (আল-মুহীত)।

ওয়াক্ফ যদি গণা-গুণতি সুনির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির জন্য করা হয়ে থাকে এবং তারা কাযীর অনুমতি ছাড়া কাউকে মুতাওয়াল্লী বানাতে চায়, তবে তা পারবে কি না, এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে প্রচুর মতভেদ। সাদরুশ-শাহীদ হুসামুদ্দীন (র) বলেন, সঠিক কথা এই যে তাদের কর্তৃক মুতাওয়াল্লী নিয়োগ বৈধ নয়।

শায়খুল ইসলাম আবুল হাসান (র) বলেন, আমাদের মাশায়েখে কিরাম এ প্রশ্নের উত্তর বলতেন যে, তারা কাউকে মুতাওয়াল্লী পদে নিযুক্ত করলে সে বৈধ মুতাওয়াল্লী হবে, যেহেতু কাযীর অনুমতিক্রমে করলে হয়ে থাকে।

পরবর্তীকালে ফুকাহায়ে কিরাম এবং উয্ভায জাহীরুদ্দীন এ ব্যাপারে একমত যে, কাযীর অজ্ঞাতসারে তারা মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে নিলে সেটাই উত্তম। ওয়াক্ফ-সম্পত্তির প্রতি তাদের

আগ্রহ দেখেই ফুকাহায়ে কিরাম এ রায় দিয়েছেন। আমার মতে (শায়খুল-ইসলাম, আবুল-হাসান) আমাদের এ যুগের অবস্থা তাই। যে দুরাচার, দুর্নীতি কেবল সম্ভাব্য স্তরে ছিল এখন সেটা বাস্তবেই দেখা দিয়েছে। সুতরাং এখন পরবর্তীকালের (মুতাআয়খিরীন) ফাতওয়া গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য (আল-গিয়াছিয়া)।

৪২. মাসআলা : নির্দিষ্ট কোন জমির কিছু ওয়াক্ফ-সম্পত্তি আছে এবং তার একজন মুতাওয়াল্লীও আছে। পরে সে মুতাওয়াল্লী মারা গেল এবং মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ একমত হয়ে কাযীর অনুমতি ছাড়াই একজনকে মুতাওয়াল্লী বানালো। এ মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফের আয় দ্বারা মসজিদের সংস্কার কার্য শুরু করে দিল, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এরূপ মুতাওয়াল্লী কি বিধিসম্মত? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। বিতর্কিত মত হচ্ছে যে, এরূপ মুতাওয়াল্লী সহীহ নয়, বরং মুতাওয়াল্লী নিয়োগের ইখতিয়ার কাযীর। বাকী এই মুতাওয়াল্লী যদি ওয়াক্ফ-জমি ভাড়া দিয়ে তার আয় দিয়ে মসজিদের নির্মাণ কার্যে ব্যয় করে তবে তার জরিমানা দিতে হবে না। কেননা মুতাওয়াল্লীর নিযুক্ত যখন বৈধ হল না, তখন সে জবরদখলকারী সাব্যস্ত হল। আর জবরদখলকারী দখলীকৃত বস্তু ভাড়া দিলে ভাড়ার অর্থ তারই হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৩. মাসআলা : অবশ্য তোমার এটা জানা থাকার কথা যে, ফাতওয়া-সম্মত রায় হল, ওয়াক্ফ-সম্পত্তি জবরদখলকারীর উপর জরিমানা আরোপিত হয় (ফাতহুল-কাদীর)।

৪৪. মাসআলা : যদি নিজ সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং তারা অন্য কোন অঞ্চলে থাকে, তবে সেই অঞ্চলের কাযী একজন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করবে। কাযী যখন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করবে এবং তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক ভাতা ধার্য করবে, তখন তার জন্য অনুরূপ পরিমাণ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে, যদিও ওয়াক্ফদাতার সেরূপ শর্ত না থাকে (আস-সিরাজিয়া)।

৪৫. মাসআলা : কোন ওয়াক্ফের যদি দু'জন মুতাওয়াল্লী থাকে, এবং তাদের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কাযী নিয়োগ দান করে থাকে, তবে তাদের কারও জন্য কি এটা জায়েয হবে যে, ইমাম ইসমাইল আয-যাহিদ (র) বলেন, তাদের প্রত্যেকের পৃথক কার্যক্রমও বৈধ হওয়া উচিত। যদি এই দুই কাযীর কোনও একজন অপর কাযী কর্তৃক নিযুক্ত মুতাওয়াল্লীকে অব্যাহতি দিতে চায় তা পারবে কি না? ইমাম ইসমাইল (র) বলেন, কাযী যদি তাকে অব্যাহতি দেওয়াটা ভাল মনে করে তবে তাকে অব্যাহতি দিতে পারবে, অন্যথায় নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৬. মাসআলা : কাযী যদি কোন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে, তবে তাতে ওয়াক্ফকারীর নিযুক্ত মুতাওয়াল্লী বরখাস্ত হয়ে যাবে না। যদি কাযী কর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং পরবর্তী নিয়োগ দানকালে তা জানা থাকে, তবে বরখাস্ত হয়ে যাবে।

'ফাতাওয়া মাইদ'-এ আছে, মুতাওয়াল্লী যদি ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে কিছু বিক্রি করে বা বন্ধক রাখে, তবে সেটা খেয়ানত বলে গণ্য হবে। সুতরাং তাকে বরখাস্ত করা হবে অথবা বিশ্বস্ত কাউকে তার সহযোগী করে দেওয়া হবে।

ওয়াক্ফকারীর নিযুক্ত মুতাওয়াল্লী নিজে অব্যাহতি গ্রহণ করলে তা গ্রহণযোগ্য ওয়াক্ফকারী বা কাযীকে যে বিষয়টি অবহিত করে এবং তারা তা গ্রহণ করে নেয়। তারা গ্রহণ করে নিলে সে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সাব্যস্ত হবে (আল-কিন্য়া)।

৪৭. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী ও ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ইজারা দিল এবং তাকে বরখাস্ত করা হয় এবং নতুন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হল, এখন ইজারার অর্থ আদায়ের ইখতিয়ার কার? কে বলেন, বরখাস্ত হয়ে যাওয়া মুতাওয়াল্লীর, কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে যে, এটা নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ইখতিয়ার। কেননা পূর্বের ব্যক্তি নিজের জন্য তো নয়, বরং ওয়াক্ফের স্বার্থেই ইজারা দিয়েছিল।

মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফের আয় দ্বারা একটি বাড়ি কিনেছিল। তারপর সে বাড়িটি আবার বিক্রি করে দিল। তো এ বিক্রয় যদি উপযুক্ত মূল্যের বেশী দামে না হয়, তবে চাইলে বিক্রি ক্রেতার সম্মতিক্রমে রহিত করতে পারবে।

এমনিভাবে যদি তাকে বরখাস্ত করা হয় এবং অন্য কাউকে নিয়োগদান করা হয়, তবে সম্মতিক্রমে তা রহিত করতে পারবে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই (আল-বাহক্কর-রায়িক)।

৪৮. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে একজন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করল। এখন সে যদি মারা যায় তবে অপর একজনকেও সে নিয়োগ দিতে পারবে। মুতাওয়াল্লীর মৃত্যুর পর সে ইখতিয়ার দিতে পারবে। মুতাওয়াল্লীর মৃত্যুর পর সে ইখতিয়ার কাযীর। তবে তাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তাদের আওলাদ বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যতক্ষণ উপযুক্ত লোক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্য হতে কাউকে নিয়োগ দান করাই উত্তম (আত-তাহযীব)।

৪৯. মাসআলা : ওয়াক্ফের জমিতে যদি খেজুর গাছ থাকে এবং মুতাওয়াল্লীর আশংকা হয় যে, সেগুলো মরে যাবে, তবে মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফের আয় দ্বারা চারা গাছ কিনে লাগাবে, যাতে সে গাছ নির্মূল না হয়ে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

ঠিক ওয়াক্ফের বাড়ির মত, অর্থাৎ মুতাওয়াল্লীকে আদেশ করা হবে, সে যেন ইট-কাঁ ইত্যাদি লাগিয়ে তার সংস্কার করে, যাতে বাড়িটি নষ্ট না হয়ে যায়। (আয-যাখীরা)

৫০. মাসআলা : ওয়াক্ফ-সম্পত্তির একটা অংশ যদি এমন জলাভূমি হয়, যা চাষাবাদের উপযুক্ত নয়, এবং চাষাবাদের উপযুক্ত করে তোলার জন্য তার উপরিভাগে মাটি ফেলে সংস্কার করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে মুতাওয়াল্লীর কর্তব্য হবে সমগ্র সম্পত্তির আয় দ্বারা প্রথমে সেই অংশের সংস্কার কার্যের ব্যয় নির্বাহ করা (আল-মুহীত)।

৫১. মাসআলা : জ্ঞাতব্য যে ওয়াক্ফের আয় দ্বারা সংস্কার করা হবে কেবল সেই ক্ষেত্রে, যখন খারাপ হওয়ার পেছনে কারও হাত না থাকে। এজন্যই 'আল ওয়ালওয়ালিজিয়া' (الووالجيه) গ্রন্থে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি ওয়াক্ফের বাড়ি ভাড়া দিল। ভাড়াটে লোকটি সে

বাড়ির চত্বরে আস্তাবল বানালো এবং তাতে গবাদি পশু রাখা শুরু করল এবং এভাবে বাড়িটি নষ্ট করে ফেলল। এরূপ ক্ষেত্রে তাকে জরিমানা পরিশোধ করতে হবে (আল-বাহক্কর-রায়িক)।

ওয়াক্ফকারী যদি ওয়াক্ফের জমিতে জনপদ গড়ে তুলতে চায়, যাতে লোকজন গড়ে এবং তার চাষাবাদ ও হিফাযতে সহায়ক হয় তাহলে তার সে ইখতিয়ার থাকবে। এটা গরীবদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সরাইখানার মত পরিষ্কার রাখা এবং তার দরজা খোলা ও বন্ধ করার জন্য কোন খাদেমের প্রয়োজন দেখা দিলে মুতাওয়াল্লীর জন্য এটা জায়েয যে, সে ওয়াক্ফের দোকান হতে একটি দোকান কারও কাছে ভাড়া দিবে, যদ্বারা সে খাদেমের ব্যয় নির্বাহ করবে। (আয-যহীরিয়া)

৫২. মাসআলা : ওয়াক্ফ-সম্পত্তি যদি নগরের ঘর-বাড়ির সাথে মিলিত হয় যাতে ঘর তৈরি করলে মানুষ তা ভাড়া নিতে আগ্রহী হবে এবং তার আয় ফলও ফসলের আয় অপেক্ষা বেশী হবে, তাহলে মুতাওয়াল্লী তাতে ঘর তৈরি করে ভাড়া দিতে পারবে। পক্ষান্তরে ওয়াক্ফ-ভূমি নগর হতে দূরে হলে, তাতে ভাড়া দেওয়ার জন্য ঘর-বাড়ি করা তার জন্য বৈধ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৩. মাসআলা : ওয়াক্ফের আয় ভোগকারীদের একাংশ ওয়াক্ফের আয় দ্বারা ওয়াক্ফ-সম্পত্তির সংস্কার করতে সম্মত আছে, কিন্তু অপর অংশ সম্মত নয়, এ অবস্থায় সম্মতদের প্রাপ্য আয় দ্বারা মুতাওয়াল্লী তাদের প্রাপ্য অংশের সংস্কার করবে এবং অসম্মতের প্রাপ্য অংশ ভাড়া দিয়ে সে ভাড়ার অর্থ তার সংস্কার কার্যে ব্যয় করবে। সংস্কার শেষে তখন সে সম্পত্তি খাতকদের জন্য প্রত্যর্পণ করবে (খিয়ানাতুল-মুফতীন, আল-হাবী)।

৫৪. মাসআলা : আবুল লাইস (র)-এর ফাতাওয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, একটি দোকান গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে। তার একজন মুতাওয়াল্লীও আছে। জনৈক ব্যক্তি মুতাওয়াল্লীর অনুমতি ছাড়া তাকে একটি কক্ষ তৈরি করল। এখন সে ব্যক্তি মুতাওয়াল্লীর কাছ থেকে তার খরচা দাবী করতে পারবে কি? উত্তর হচ্ছে যে, সে তা পারবে না। তবে সে লক্ষ্য করে দেখবে মূল ঘরের ক্ষতি না করে তার তৈরি কক্ষটি অপসারণ করা সম্ভব কি না। যদি সম্ভব হয় খুলে নেবে। যদি সম্ভব না হয় এবং তা করলে মূল ঘরের ক্ষতি হয়, তা হলে সে তা খুলতে পারবে না; বরং সে অপেক্ষা করবে এমনিতেই তা খুলে যায়, কি না। তখন যদি মুতাওয়াল্লীকে অর্থের বিনিময়ে তা ওয়াক্ফ সম্পত্তিরূপে দিতে রাখী না হয়, তো নিজেই নিয়ে যাবে। যদি ওয়াসীর সংগে আলোচনা করে এই মীমাংসার আসতে সক্ষম হয় যে, কোন কিছু বদলে তার নির্মিত কক্ষটি ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত করে দেবে, তা তাও বৈধ, তবে সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে যে, তৈরি কক্ষটির সংগে তার খুলে ফেলা সামগ্রীর মূল্যের কী পার্থক্য। যার মূল্য কম হয়, পরিবর্তে প্রদত্ত দামটা তার বেশী না হতে হবে (আল-মুহীত)।

৫৫. মাসআলা : কেউ যদি তার বাড়িটি এই শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, অমুক ব্যক্তি যতদিন বেঁচে থাকে এতে বাস করবে কিংবা দশ বছর বা তার বেশীকাল বাস করবে এবং তারপর গরীব মিসকীনদের হয়ে যাবে, তবে তা জায়েয। কিন্তু সে তা ভাড়া দিতে পারবে না। নিজে বাস করতে পারবে। পরিবারবর্গ এবং দাস-দাসীদেরকেও তাতে রাখতে পারবে।

ওয়াকফের আয়ভোগীদের একাংশ তাতে বাস করতে চায় আর অপরাংশ চায় তা ভাড়া দিতে, তবে প্রশাসন তাদেরকে একমত হয়ে যেতে বলবে। তারপর যার ইচ্ছা তাতে বাস করবে এবং যে চায় ভাড়া দেবে (আল-হাবী)।

ওয়াকফদাতা যদি শর্ত করে ওয়াকফের আয়টা তারই থাকবে, তবে তার হুকুম কী-এ সম্পর্কে পূর্বতন ফুকাহায়ে কিরাম হতে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বাড়ির আয় যাকে দেওয়ার ওসীয়াত করা হয়, সে যদি তাতে বাস করতে চায় তা পারবে কি না এ বিষয়ে পরবর্তীকালের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। তাদের সেই ইখতিলাফ আলোচ্য-ক্ষেত্রেও বর্তাবে। তাদের মধ্যে কেউ বলেন, যার জন্য আয়ের ওসীয়াত করা হয়, সে ব্যক্তি ওসীয়াতের বাড়িতে বাস করতে পারবে না। তবে সে তা ভাড়া দিতে পারবে। কেউ বলেন, সে তাতে বাসও করতে পারবে। কারও মতে সর্তকতার বিষয় হলো, ওয়াকফভোগীদের বাইরে কাউকে ভাড়া দিয়ে ভাড়ার অর্থ ওয়াকফভোগীকে প্রদান করা (মুহীত : আস-সারাখসী)।

ওয়াকফকারী যদি বলে তারা এর আয় ভোগ করতে পারবে এতে বাস করতে পারবে না, তবে সে শর্তই কার্যকর হবে (আল-হাবী)।

৫৬. মাসআলা : মাদরাসার নির্মাণকার্যে ব্যয়ের পর যে অর্থ বেঁচে থাকবে মুতাওয়াল্লী তা ঋণ নিয়ে ফুকাহায়ে কিরামের পেছনে খরচ করতে পারবে না, যদিও তারা তার মুখাপেক্ষী হয় (আল-কিন্যা)।

৫৭. মাসআলা : মুতাওয়াল্লীর হাতে যদি ওয়াকফ সম্পত্তির কিছু আয় জমা থাকে এবং কোন পুণ্যের খাতে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। এদিকে ওয়াকফ সম্পত্তিরও সংস্কার ও নির্মাণকার্য আবশ্যিক হয়ে পড়ে আর মুতাওয়াল্লীর আশংকা যে, সংস্কারকার্যে অর্থব্যয় করলে সে পুণ্যের কাজটি আয় করা হবে না এরূপ ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে যে, সংস্কার কার্যটি পরবর্তী আয়ের মওসুম পর্যন্ত বিলম্বিত করলে ওয়াকফ-সম্পত্তির এমন ক্ষতি কি না, যার দরুন সম্পত্তিটি বিনষ্ট হয়ে যাবে। যদি সে রকমের ক্ষতি না হয়, তবে সে অর্থ পুণ্যের কাজটিতেই ব্যয় করবে এবং সংস্কার কার্যটি পরবর্তী আয়ের সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করবে। আর এরূপ বিলম্বের ফলে ওয়াকফ সম্পত্তির যদি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি হয়ে যায়, তবে সংস্কার কার্যটিই আগে করবে। তারপর কিছু অর্থ বেঁচে থাকলে তা সেই পুণ্যের কাজে ব্যয় করবে। পুণ্যের কাজ বলতে এমন কাজ বুঝায়, যাতে খরচ করলে তা এক প্রকারে গরীবদের প্রতিই ব্যয় বলে গণ্য হয়। যেমন মুসলিম যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্ত করে আনা বা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত সৈনিকের সহযোগিতা করা। তবে মসজিদ, বা মুসাফিরখানা প্রভৃতি নির্মাণের কাজে এ অর্থ ব্যয় করা যাবে না, যেহেতু এসব গরীবের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৮. মাসআলা : যদি মুতাওয়াল্লী ওয়াকফের আয় উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করে, এদিকে ওয়াকফ-সম্পত্তির আশু সংস্কার প্রয়োজন দেখা দেয়, যা দেয়ী করার অবকাশ নেই, তা হলে মুতাওয়াল্লীর উপর জরিমানা আসবে। জরিমানা পরিশোধের পর তা আবার ইতোপূর্বে সেই উপযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করেছিল, তাদের কাছ থেকে আদায় করে

আনতে পারবে না। একে কিয়াস করা যায় এই মাসআলার সংগে যে, পুত্রের কাছে কারও টাকা আমানত থাকলে সে যদি তা স্বীয় পিতামাতার পেছনে ব্যয় করে, তবে তাকে জরিমানা পরিশোধ করতে হবে, কিন্তু সে জরিমানার টাকা পিতা-মাতার কাছ থেকে আদায় করে আনতে পারে না (আল-বাহরুর-রায়িক)।

৫৯. মাসআলা : ওয়াকফের একটি দোকান অন্য কারও দোকানের উপর ঝুঁকে পড়ল এবং সেটি ঝুঁকে পড়ল অপর একটির উপর আর এভাবে সেগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেল। এদিকে মুতাওয়াল্লী ওয়াকফের দোকানটি সংস্কার করতে রাযী নয়। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে দেখতে হবে ওয়াকফের এপরিমাণ আয় আছে কিনা, যা দ্বারা দোকানটির সংস্কার সম্ভব। যদি সম্ভব হয়, তবে অপর দোকান দুটির মালিক মুতাওয়াল্লীকে ধরবে, যাতে ঝুঁকে পড়া দোকানটি সোজা করে আপন স্থানে নিয়ে আসে এবং তাদের সম্পত্তি মুক্ত করে দেয়। আর যদি ওয়াকফের এ পরিমাণ আয় না থাকে, যা দ্বারা ঝুঁকে পড়া দোকানটি সংস্কার করা সম্ভব হয়, তা হলে তারা বিষয়টি কাযীকে অবহিত করবে, কাযী মুতাওয়াল্লীকে নির্দেশ দেবে, সে যেন ঋণ নিয়ে কাজটি করে ফেলে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬০. মাসআলা : ওয়াকফের জমিতে যদি মুতাওয়াল্লী ওয়াকফের টাকা দিয়ে ঘর তোলে তবে সেটা ওয়াকফেরই সম্পত্তি হয়ে যাবে। যদি ঘরটি নিজের টাকায় তোলে এবং ওয়াকফের জন্যই তোলার নিয়্যত করে কিংবা কোন নিয়্যত না থাকে তখনও সেটা ওয়াকফের হয়ে যাবে। যদি নিজের টাকায় নিজের নিয়্যতে ঘর তোলে এবং সে ব্যাপারে সাক্ষি রাখে তখন অবশ্য ঘরটি তার নিজেরই গহবে। অন্য কেউ যদি ঘর তোলে এবং কোন নিয়্যত না থাকে তবে তা তার। গাছ লাগালেও তাই হবে (আল-কিন্যা)।

৬১. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি ওয়াকফের টাকা নিজ প্রয়োজনে খরচ করে এবং তারপর সমপরিমাণ নিজের টাকা ওয়াকফ-সম্পত্তির মেরামতে লাগায়, তবে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

মুতাওয়াল্লী ওয়াকফের বাড়িতে নিজের কোন কাঠ ব্যবহার করে, ওয়াকফের আয় থেকে তার মূল্য আদায় করে নিতে পারে।

মুতাওয়াল্লী যদি নিজ অর্থ ওয়াকফের কাজে খরচ করে এবং ফেরত নেওয়ার শর্ত করে তবে তা ফেরত নিতে পারবে (আস-সিরাজিয়া)।

৬২. মাসআলা : ভাড়াটিয়া যদি মুতাওয়াল্লী বা মালিকের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় মেরামত করে তাহলে সে মুতাওয়াল্লী ও মালিক থেকে খরচের টাকা ফেরত নিতে পারবে। অবশ্য এটা সেই ক্ষেত্রে যখন তার অধিকাংশ লাভটা মালিকের ভাগে আসে। পক্ষান্তরে যদি ভাড়াটিয়ারাই লাভ বেশী হয়, এবং তার কার্য দ্বারা বাড়ির ক্ষতিও হয়, যেমন পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ড্রেন করা কিংবা চুলা বানানো ইত্যাদি, তাহলে পূর্বশর্ত না থাকলে খরচের টাকা চাইতে পারবে না (আল-কিন্যা)।

৬৩. মাসআলা : 'আল-ইয়াতীমা'- গ্রন্থে আছে, আবুল-ফাযলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ওয়াকফের এক-চতুর্থাংশ আয় যদি মেরামতের কাজে এবং তিন-চতুর্থাংশ গরীবদেরকে

দেওয়ার কথা থাকে এবং কোন এক বছর মাদরাসার (গরীব ছাত্রদের) কোন প্রয়োজন দেখা না দেয়, তবে সে বছর কি মুতাওয়াল্লী তা ঋণ নিয়ে এই শর্তে ফুকাহা (শিক্ষক)দের পেছনে ব্যয় করতে পারবে যে, পরের বছর প্রয়োজনে তাদের আয় কে তা কেটে নেওয়া হবে? তিনি বললেন, না। আবু হামিদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনিও একই উত্তর দেন (আত-তাতার খানিয়া)।

৬৪. মাসআলা : কেউ একখণ্ড জমি তার গরীব আত্মীয় এবং গরীব গ্রামবাসীদের জন্য ওয়াক্ফ করল এবং সবশেষে তা গরীবদের অধিকার বলে স্থির করল, তা এরূপ ওয়াক্ফ জায়েয, তাতে যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হল, তাদের সংখ্যা জানা থাকুক বা নাই জানা থাকুক। যদি মুতাওয়াল্লী তাদের মধ্যে কাউকে বেশী দিতে চায়, তবে অবস্থাতেই তার হুকুম বিভিন্ন রকমের।

যদি গরীব আত্মীয় ও গরীব গ্রামবাসীদের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং তাদের সংখ্যা জ্ঞাত থাকে কিংবা অজ্ঞাতই থাকে অথবা এক শ্রেণীর সংখ্যা জ্ঞাত এবং অপর শ্রেণীর অজ্ঞাত থাকে, তবে প্রথম অবস্থায় মুতাওয়াল্লী অর্ধেক আয় গরীব আত্মীয়দেরকে এবং অর্ধেক গরীব গ্রামবাসীদেরকে দেবে। প্রত্যেক শ্রেণীকে যে অর্ধেক দেবে, সেক্ষেত্রে অবশ্য কাউকে দিতে কাউকে না দিতে এবং কাউকে বেশী ও কাউকে কম দিতে পারে। কেননা ওয়াক্ফকারীর নিয়্যত ছিল সাদাকা করার আর সাদাকার বিধান এরকমই। দ্বিতীয় অবস্থায় উভয় শ্রেণীর মধ্যে তাদের সংখ্যানুপাতে বিতরণ করা হবে। কাউকে কমবেশী দেওয়া যাবে না। কেননা এক্ষেত্রে নিয়্যত ছিল ওসীয়তের। আর ওসীয়তের ক্ষেত্রে এরকমই বিধান। তৃতীয় অবস্থায় প্রথম আয়কে দু'ভাগ করে যাদের সংখ্যা জানা আছে তাদেরকে একভাগ এবং যাদের সংখ্যা জানা নেই তাদেরকে এক ভাগ দেবে। যাদের সংখ্যা জানা নেই তাদের মধ্যে বিতরণের ক্ষেত্রে যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারে এবং কমবেশী করতে পারবে। এ ব্যাখ্যা অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী প্রযোজ্য। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী এটা প্রযোজ্য নয় (আল-ওয়াজীয)।

৬৫. মাসআলা : যদি বলে, এই শহরের গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ, তবে তাদের সংখ্যা অগণিত হলে মুতাওয়াল্লী তাদের যাকে ইচ্ছা দেবে আর যদি হিসাব জানা থাকে, তবে তাদের সংখ্যানুপাতে বন্টন করবে। নারী-পুরুষ সকলকেই সমহারে দেবে। মুতাওয়াল্লী তাদের কারও অংশ যদি নিজের কাজে খরচ করে তবে সে ব্যক্তি চাইলে মুতাওয়াল্লী হতে জরিমানা আদায় করবে অথবা শরীকদের কাছে দাবী করবে।

যদি শর্ত করে যে, প্রত্যেককে তার খোরাক পরিমাণ দেওয়া হবে, তাহলে সাধ্য অনুযায়ী প্রত্যেকের অনু-বস্ত্র-বাসস্থানে সংস্থান করে দেবে। ওয়াক্ফ সম্পত্তি যদি চাষের জমি হয়, তবে প্রত্যেককে বছরের খোরাক দেবে আর মাসিক আয়কর সম্পত্তি হলে মাসিক হারে খোরাক দেবে (আল-ফাতাওয়া আল-আত্তাবিয়া)।

৬৬. মাসআলা : ওয়াক্ফের জমি নষ্ট হওয়ার কারণে মুতাওয়াল্লী তার একাংশ বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা বাকি অংশ সংস্কার করতে পারবে না। যদি মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফের এমন কোন

ইমারত বিক্রি করতে চায়, যা ভেঙ্গে পড়েনি, কিন্তু ক্রেতা তা ভেঙ্গে নিয়ে যাবে অথবা জীবিত কোন গাছ সে বিক্রি করতে চায়, যা ক্রেতা কেটে নিয়ে যাবে, তবে সে বিক্রি বাতিল গণ্য হবে। ক্রেতা ইমারত ভেঙ্গে ফেললে বা গাছ কেটে ফেললে কাযীর কর্তব্য সে মুতাওয়াল্লীকে বরখাস্ত করা। কেননা সে খিয়ানতকারী সাব্যস্ত হয়েছে। এখন কাযী চাইলে মুতাওয়াল্লী থেকেও জরিমানা আদায় করতে পারে অথবা ক্রেতা থেকেও আদায় করতে পারে। যদি বিক্রীতা (মুতাওয়াল্লী) থেকে জরিমানা আদায় করে, তবে তার বিক্রি কার্যকর হবে। ক্রেতা থেকে আদায় করল বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

কোন ওয়াক্ফ-ভূমির ব্যাপারে যদি মুতাওয়াল্লী আশংকা বোধ করে যে, ওয়াক্ফাদাতার ওয়ারিস বা অন্য কোন জালিম তা জবরদখল করতে পারে, তবে মুতাওয়াল্লী তা বিক্রি করে তার মূল্য সাদাকা করতে পারবে (আল-নাওয়াযিল)।

৬৭. মাসআলা : তবে ফাতওয়া হচ্ছে এই যে, তা বিক্রি করা জায়েয নয় (আয-সিরাজিয়া)।

৬৮. মাসআলা : ওয়াক্ফের বৃক্ষে ফলদার হলে তা না উপড়িয়ে বিক্রি করা জায়েয নয় আর ফলদার না হলে উপড়ানোর আগেও বিক্রি জায়েয (আল-মুযমারাত)।

৬৯. মাসআলা : ওয়াক্ফের গাছ-বৃক্ষ বিক্রির নিয়ম এই যে, তার ছায়ার যদি আংগুরের ফলন কম না হয়, তবে তা বিক্রি জায়েয নয়। যদি তার ছায়ায় আংগুরের কম উৎপন্ন হয়, তবে লক্ষ্য করে দেখবে সে বৃক্ষের ফল আংগুর ফল অপেক্ষা কম হয় না বেশী। যদি বেশী হয় তবে সে গাছ বিক্রি করা ও কাটা জায়েয হবে না। আর যদি আংগুর অপেক্ষা ফল কম হয় তবে বিক্রি জায়েয। যদি ফলদার গাছ না হয় তার ছায়ার আংগুর চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তা বিক্রি করা ও কেটে ফেলা জায়েয। আর যদি তার ছায়ায় আংগুরের ফলন কম না হয়, তবে তা বিক্রি করা ও কাটা জায়েয নয়।

যদি ডুমুর জাতীয় কোন গাছ কি বেতবৃক্ষ হয়, তবে তা বিক্রি করা জায়েয। কেননা এটা ভূমির আয় ও ফসলের মত। কেননা ডুমুর গাছ বা বেত কাটার পর মূল থেকে আবারও গজায়। এমনভাবে তুত গাছের পাতা বিক্রি করাও জায়েয। ক্রেতা যদি এসব গাছের মূল থেকে কাটতে চায় তবে তাকে বাধা দেওয়া মুতাওয়াল্লীর কর্তব্য। বাধা না দিলে সে খিয়ানতকারী হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৭০. মাসআলা : কোন ওয়াক্ফের বাড়িতে আখরোট গাছ আছে। এক সময় সে বাড়ির ইমারত নষ্ট হয়ে গেল। এ অবস্থায় মুতাওয়াল্লী তা মেরামত করার জন্য গাছ বিক্রি করতে পারে না বরং বাড়ি ভাঙার আয় দিয়ে বা আখরোট বিক্রির অর্থ দিয়ে মেরামত করতে পারে (আস্-সিরাজিয়া)।

৭১. মাসআলা : মসজিদের মুতাওয়াল্লী যদি মসজিদের অর্থ দিয়ে কোন দোকান বা বাড়ি কেনে, তবে তা বিক্রি করতে পারবে- যদি তাকে ক্রয়ের ইখতিয়ার দেওয়া হয়ে থাকে। বস্তুত অন্য একটি মাসআলার উপর এ মাসআলার ভিত্তি। মাসআলাটি এই যে, মসজিদের মুতাওয়াল্লী যদি মসজিদের আয় দ্বারা কোন বাড়ি বা দোকান কেনে তবে এ বাড়ি বা দোকান কি

মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত দোকানের সংগে যুক্ত হবে? অর্থাৎ তা কি ওয়াক্ফে পরিণত হবে? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে।

সাদরুশ-শাহীদ (র) বলেন, গ্রহণযোগ্য মত এই যে, তা ওয়াক্ফের সংগে যুক্ত হবে না, বরং তাকে মসজিদের একটা আয় রূপে গণ্য করা হবে (আল-মুয়মারাত)।

৭২. মাসআলা : যদি ওয়াক্ফের আয় দ্বারা কাপড় কেনে এবং তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে তবে ওয়াক্ফের যে অর্থ নগদ প্রদান করবে সেই পরিমাণ জরিমানা তার উপর আরোপ করা হবে, যেহেতু সে ক্রয়টা তার নিজের জন্য হয়েছে (আল-বাহরুর রায়িক, আল-ইসআফ-এর বরাতে)।

৭৩. মাসআলা : কেউ যদি গরীবদের জন্য বাড়ি ওয়াক্ফ করে তবে মুতাওয়াল্লী সে বাড়ি ভাড়া দেবে এবং তার আয় প্রথমে তার সংস্কার কার্যে ব্যয় করবে। কাউকে বিনা ভাড়ায় তাতে বাস করতে দেওয়ার ইখতিয়ার মুতাওয়াল্লীর নেই (আল-মুহীত)।

৭৪. মাসআলা : 'জমিউল-জাওয়ামি' গ্রন্থে আছে, ওয়াক্ফের বাড়ি ভেঙ্গে যাওয়ার পর সংস্কার করা হলে এতদিন যারা তাতে বাস করত, এখন তাদেরই তাতে বাস করার অধিকার থাকবে। তবে এমনভাবে যদি ভেঙ্গে যায় যে, তার কোন কোঠা বলতে অবশিষ্ট নেই তখন স্বতন্ত্র কথা (আত-তাতার খানিয়া)।

৭৫. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার পর মারা গেলে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে না। তবে যদি খোদ ওয়াক্ফদাতা দেওয়ার পর মারা যায়, তবে সে ক্ষেত্রে কিয়াম ও ইসতিহসান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ফায়সালা হয়। কiyাস অনুযায়ী সে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে, আবু বকর আল-ইসকাফ (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন। ইসতিহসান অনুযায়ী ইজারা বাতিল হবে না (আয-যাখীরা)।

৭৬. মাসআলা : মুহাম্মাদ ইবনুল-ফাযল (র)-এর ফাতাওয়ায় আছে, কোন মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ইজারা দেওয়া পর ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই যদি মারা যায় এবং মারা যায় ইজারা গ্রহীতাও, তবে ইজারাদাতা নিজের বীজ দ্বারা তা চাষ করে থাকলে ফসল তার ওয়ারিসগণ পাবে। বর্গাচাষের কারণে জমির যে ক্ষতি হবে তার দায়-দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হবে। সুতরাং তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করত ওয়াক্ফ-ভূমির সংস্কার কার্যে তা ব্যয় করা হবে, যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তাদেরকে দেওয়া যাবে না (আল-হাসীরী, আল-হাবী)।

৭৭. মাসআলা : কাযী যদি ওয়াক্ফের বাড়ি ইজারা দেয় এবং তার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই বরখাস্ত হয়ে যায় তবে ইজারা বাতিল হবে না (আল-মুয়মারাত)।

৭৮. মাসআলা : যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে মুতাওয়াল্লীও যদি সেই হয়ে থাকে এবং সে তা ইজারা দেওয়ার পর মারা যায় তবে ইজারা বাতিল হবে না, যদিও আয়টা তারই হবে (আল-হাবী)।

৭৯. মাসআলা : এমনভাবে যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি ইজারার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে মারা যায়, তাতেও ইজারা বাতিল হবে না। কাজেই এই ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত ইজারা যে ভাড়া এসেছে তা ওয়াক্ফের ভোক্তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে। মৃত ব্যক্তির অংশ পাবে তার ওয়ারিসগণ। এই ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে ভাড়া আসবে তা জীবিত ব্যক্তিগণ লাভ করবে। এমনভাবে প্রথম ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্য কেউ যদি মারা যায়, সে ক্ষেত্রেও এই নিয়ম অনুযায়ী বন্টন হবে (কাযীখান)।

৮০. মাসআলা : যদি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ভাড়া উসুল করে নেওয়া হয় এবং ভোক্তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়, তারপর তাদের কোনও একজন মারা যায়, তবে কiyাস অনুযায়ী সে বন্টন বাতিল হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তির ভাগে ভাড়ার সেই অংশ হতেই পড়বে, যা সে জীবিত থাকতে লাভ হয়েছিল, কিন্তু আমরা ইসতিহসান অনুসারে বলে থাকি যে, পূর্বের বন্টন বাতিল করা হবে না। এমনভাবে যদি ভাড়া অগ্রিম পরিশোধের শর্ত থাকে, তবে সে ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে (আল-যাহীরিয়া)।

৮১. মাসআলা : ওয়াক্ফের বাড়ি এক বছরের জন্য এক'শ' দিরহামে ইজারা দেওয়া হল। যাদের জন্য বাড়িটি ওয়াক্ফ করা হয়েছিল তারা মোট তিনজন। তাদের একজন বছরের এক-তৃতীয়াংশের মাথায় মারা গেল এবং আরও একজন মারা গেল দুই-তৃতীয়াংশের মাথায়, তৃতীয়জন জীবিত থাকল। এখন ভাড়ার অর্থ কিভাবে বন্টন করা হবে?

উত্তর এই যে, ভাড়ার তিন ভাগের প্রথম ভাগ প্রথম মৃতের ওয়ারিস ও দ্বিতীয় মৃতের ওয়ারিস এবং জীবিত ব্যক্তির মধ্যে তিন ভাগে বন্টন করা হবে। দ্বিতীয় ভাগ দ্বিতীয় মৃতের ওয়ারিস এবং জীবিতজনের মধ্যে দুই ভাগে বন্টন করা হবে আর তৃতীয় ভাগের সবটাই পাবে জীবিত ব্যক্তি। হিসাব করতে হবে আঠার সংখ্যা দ্বারা (আল-মুহীত)।

৮২. মাসআলা : 'জামিউল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুর পর তার নিয়োগকৃত ওয়াসী থাকলে সে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ইজারা দিতে পারবে। ইজারা যদি ফাসিদ (রীতি বিরুদ্ধ) হয় এবং ইজারা গ্রহীতা তা ব্যবহার করে থাকে, তবে সে তার ন্যায্য ভাড়া পরিশোধ করবে। তবে তা ওয়াসীর স্থিরীকৃত ভাড়ার চেয়ে বেশী হলে বেশীটা দিতে সে বাধ্য থাকবে না (আত-তাতার খানিয়া)।

৮৩. মাসআলা : যে বাড়িটি ফকীর-মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, মুতাওয়াল্লী যদি সেটি এক বছরের বেশী সময়ের জন্য ভাড়া দেয় তবে তা জায়েয হবে না। যদি ওয়াক্ফের দলীলে এক বছরের বেশী সময়ের জন্য ভাড়া না দেয়ার শর্ত না থাকে, তবে সঠিক মত এই যে, জমি তিন বছর মেয়াদ পর্যন্ত ইজারা দেওয়া জায়েয হবে। অবশ্য জায়েয না বলার মধ্যেই যদি কল্যাণ পরিলক্ষিত হয় তবে ভিন্ন কথা। অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে এক বছরের বেশী মেয়াদে ভাড়া দেয়া না জায়েয হবে, তবে কল্যাণকর হলে তা জায়েয হবে। বিষয়টা স্থান-বাল ভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে (আস্-সিরাজিয়া)।

৮৪. মাসআলা : ফাতাওয়া প্রদানের জন্য এ মতই সঠিক। জমির বর্গাচাষ বা ফলের বাগান বর্গা প্রদানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৮৫. মাসআলা : কাযী ইমাম আবু আলী-নাসাফী (র) ফাতওয়া দিতেন যে, মুতাওয়াল্লীর জন্য তিন বছরের বেশী মেয়াদে ইজারা দেওয়া উচিত নয়, তবে দিলে সেটা জায়েয হয়ে যাবে। এটা উপরিউক্ত রায়েরই কাছাকাছি। কেননা মুতাওয়াল্লী কর্তৃক বেশী দিনের জন্য ইজারা দেওয়া প্রমাণ করে যে, মুতাওয়াল্লী সেটা কল্যাণকর মনে করেছে (আল-গিয়াহিয়া)।

৮৬. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা যদি শর্ত আরোপ করে যে, ওয়াক্ফ-সম্পত্তি এক বছরের বেশী মেয়াদের ভাড়া দেওয়া যাবে না, অন্যদিকে মাত্র এক বছরের জন্য ভাড়া নিতেও মানুষ আগ্রহী নয়, আর এক বছরের বেশী মেয়াদে ভাড়া দিলে সেটা সম্পত্তির জন্য যেমন কল্যাণকর তেমনি গরীবদের পক্ষেও উপকারী মনে হয়, তবু মুতাওয়াল্লীর জন্য শর্ত লংঘন করে এক বছরের বেশী মেয়াদে ভাড়া দেওয়া জায়েয নয়। তবে এরূপ ক্ষেত্রে বিষয়টা কাযীর গোচরে আনা হবে এবং কাযী তা এক বছরে বেশী দিনের জন্য ভাড়া দিবে।

ওয়াক্ফের দলীল যদি এভাবে হয় যে, এক বছরের বেশী মেয়াদে ভাড়া দেওয়া যাবে না, তবে গরীবদের জন্য অধিকতর লাভজনক হলে দেয়া যাবে, তাহলে মুতাওয়াল্লী ভালো মনে করলে কাযীর ফায়সালা ছাড়াই নিজেও এক বছরের বেশী মেয়াদে ভাড়া দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮৭. মাসআলা : একটি বাড়িতে একটি ঘরের সমপরিমাণ জায়গা ও করা হয়েছে। এখন দীর্ঘ মেয়াদ ছাড়া তা ইজারা দেওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় বড় রাস্তার সংগে যদি তার আলাদা পথ থাকে তবে দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া দেওয়া যাবে না। অন্যথায় দেওয়া যাবে (আল-ওয়াজীব)।

৮৮. মাসআলা : ন্যায্য ভাড়া ব্যতীত ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ইজারা দেওয়া জায়েয নয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৮৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি ওয়াক্ফের একটি দোকান ন্যায্য ভাড়ায় ইজারা নিল। তারপর অপর এক ব্যক্তি আরও বেশী ভাড়া দিতে চাইল। এ অবস্থায় প্রথম ইজারা বাতিল করা যাবে না (আস-সিরাজিয়া)।

৯০. মাসআলা : যদি কেউ তিন বছরের জন্য সুনির্দিষ্ট ও ন্যায্য ভাড়ায় ওয়াক্ফ-ভূমি ইজারা নেয় তারপর সে অঞ্চলে ইজারার দর কমে যায়, তবে সে ইজারা বাতিল করা যাবে না (আল-মুহীত)।

৯১. মাসআলা : 'আল-কুবরা' গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট ও ন্যায্য ভাড়ায় ওয়াক্ফ-ভূমি ভাড়া দিল তিন বছর মেয়াদে। দ্বিতীয় বছরে দেখা গেল মানুষের চাহিদা বেড়ে গেছে এবং জমির ভাড়া চড়ে গেছে। এ অবস্থায় তার দোকান ঘরটি তুলে দিলে আরও অধিক দরে সে ভাড়া ন্যায্য দরের কম দেখে মুতাওয়াল্লী যদি ইজারা বাতিল করতে চায় তবে সে ইখতিয়ার নেই (আল-মুয়ামারাত)।

৯২. মাসআলা : ওয়াক্ফের জমিতে এক ব্যক্তির একটি দোকান আছে কিন্তু দোকান মালিক জমির ন্যায্য ভাড়া দিতে রাযী নয়। এ অবস্থায় দেখতে হবে সে জমি ভাড়া দেওয়া যাবে কি না। যদি দেওয়া যায় তবে সে ঘর তুলে দেওয়া হবে। অন্যথায় সেই দোকানীর হাতেই সেই ভাড়ায় তা রেখে দেওয়া হবে (আস-সিরাজিয়া)।

৯৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি মুতাওয়াল্লীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে ভাড়ায় জমি ইজারা নিল এবং তাতে মুতাওয়াল্লীর অনুমতিক্রমে ঘর করল। মেয়াদ পার হওয়ার পর অন্য একজন আরও বেশী ভাড়ায় পরবর্তী মেয়াদের জন্য ইজারা নিতে চাইল, ফলে আগের ব্যক্তির সেই বেশী দর দিতে রাযী হয়ে গেল। এখন সে ইজারায় কি তারই অগ্রাধিকার থাকবে? উত্তরে বলা হয়েছে যে, হ্যাঁ অগ্রাধিকার তারই (আল-ফুসুলুল-ইমাদিয়া)।

৯৪. মাসআলা : আল-খাসুসাফ (র)-এর 'ওয়াক্ফ'- গ্রন্থে আছে যে, ওয়াক্ফদাতা যদি দীর্ঘ মেয়াদে ওয়াক্ফ সম্পত্তি পত্তন দেয় এবং সেক্ষেত্রে এই আশংকা দেখা দেয় যে, দীর্ঘ পত্তনের কারণে সম্পত্তি হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে, তাহলে সরকার সে পত্তন বাতিল করতে পারবে (আয-যাখীরা)।

৯৫. মাসআলা : 'ফাতাওয়া আহলি সামারকান্দ'- গ্রন্থে আছে, ওয়াক্ফের সরাইখানা বা মুসাফিরখানা যদি নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তবে সেটি ভাড়া দেওয়া হবে এবং তার আয় দ্বারা তা মেরামত করা হবে। মেরামত কার্য সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর আর ভাড়া দেওয়া যাবে না (আল-মুহীত)।

৯৬. মাসআলা : ওয়াক্ফ সম্পদ যদি খারাপ হয়ে যায় এবং মুতাওয়াল্লীর পক্ষে তা সংস্কার করা সম্ভব না হয়, তবে কাযী তা ভাড়া দিয়ে দিবে এবং তার আয় দিয়ে সেটির সংস্কার করবে। সংস্কার কার্য সমাপ্ত হয়ে গেলে আবার তা মুতাওয়াল্লীর হাতে ফিরিয়ে দিবে (আত-তাহযীব)।

৯৭. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি ওয়াক্ফ-সম্পত্তির মেরামত কার্যে শ্রমিক নিযুক্ত করে এবং তার পারিশ্রমিক ধার্য করে এক দিরহাম ও এক দানিক, তারপর ওয়াক্ফের অর্থ দ্বারা তার পাওনা পরিশোধ করে, অথচ তার ন্যায্য পারিশ্রমিক মাত্র এক দিরহাম, তাহলে সে যা পরিশোধ করবে তার সবটাই জরিমানা স্বরূপ তার কাছ থেকে আদায় করা হবে (আয-যাহীরিয়া)।

৯৮. মাসআলা : কাউকে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ধার দেওয়া ও বিনা ভাড়ায় তাতে বাস করতে দেওয়া জায়েয নয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৯৯. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি কাউকে বিনা ভাড়ায় ওয়াক্ফ-সম্পত্তিতে বাস করতে দেয়, তবে হিলাল (র) এর মতে বাসিন্দার কোনরূপ বদলা দিতে হবে না, কিন্তু পরবর্তীকালীন ফুকাহায়ে কিরামের অধিকাংশই বলেন যে, তাকে ন্যায্য ভাড়া পরিশোধ করতে হবে, তাতে সে বাড়ি ওয়াক্ফের আয়-উপার্জনের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হোক আর নাই

হোক। তারা এ রায় দিয়েছেন ওয়াক্ফ-সম্পত্তির হিফায়তের স্বার্থে। এরই উপর ফাতওয়া। কেউ যদি মুতাওয়াল্লীর অনুমতি ছাড়া ওয়াক্ফের বাড়িতে বাস করে, সে ক্ষেত্রেও ফুকাহায়ে কিরাম বলেন যে, তাকে সে বাড়ির ন্যায্য ভাড়া পরিশোধ করতে হবে, তাতে তার পরিমাণ যাই হোক না কেন (আল-মুয্মারাত)।

১০০. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি কোন ঋণের বদলে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি বন্ধক রাখে তবে তা জায়েয হবে না, এমনভাবে মসজিদের মুসল্লিগণ বা তাদের কোনও একজন যদি মসজিদের সম্পত্তি বন্ধক রাখে তাও জায়েয নয়। বন্ধকগ্রহীতা যদি তাতে বাস করে তবে তাকে ন্যায্য ভাড়া দিতে হবে- তার পরিমাণ যাই হোক না কেন। এমনভাবে সে সম্পত্তি মসজিদের আয়ের উৎস হিসেবে বরাদ্দকৃত হোক বা নাই হোক। সাদরুশ-শাহীদ হুসামুদ্দীন (র) বলেন, ফাতওয়া হিসেবে এ মতই গ্রহণযোগ্য (আল-গিয়াছিয়া)।

১০১. মাসআলা : মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত কোন ঘর যদি মুতাওয়াল্লী বিক্রি করে ফেলে এবং ক্রেতা তাতে বসবাস শুরু করে দেয়, তারপর সে মুতাওয়াল্লী বরখাস্ত হয়ে যায় এবং অন্য কেউ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ক্রেতার কাছ থেকে সে ঘর ফেরত দাবী করে আর সে অনুযায়ী কাযী বিক্রি বাতিলের ফায়সালা দেয় এবং দ্বিতীয় মুতাওয়াল্লীর কাছে ঘরটি হস্তান্তর করে তবে সে ক্ষেত্রে ক্রেতাকে ন্যায্য ভাড়া পরিশোধ করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০২. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি ন্যায্য ভাড়ার কমে ওয়াক্ফের বাড়ি ইজারা দেয় এবং সেটা এতই কম হয় যে, লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণত মানুষ তা মেনে নেয় না, তাহলে সে ইজারা সহীহ হবে না। কাজেই এ অবস্থায় ইজারা গ্রহীতা তাতে বাস করলে তাকে ন্যায্য ভাড়া পরিশোধ করতে হবে, তাতে তার পরিমাণ যাই হোক। পরবর্তীকালীন ফুকাহায়ে কিরাম এমনতই গ্রহণ করেছেন। এমনভাবে বিধিসম্মত নয় এমন যে- কোন ইজারার ক্ষেত্রে অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য (আল-ফুসুলুল-ইমাদিয়া)।

১০৩. মাসআলা : ওয়াক্ফের দেখাশোনার দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি ওয়াক্ফের জমি বিধিসম্মতভাবে ইজারা দেয়, তারপর সে জমি পানিতে ডুবে যায়, তবে ভাড়া মওকুফ হয়ে যাবে। ইজারা গ্রহীতা যদি সে জমি বুঝে নেয়, কিন্তু তাতে চাষ না করে, তবু তাকে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

যদি ইজারা বিধিসম্মত না হয়, তথাপি ইজারা গ্রহীতা তা বুঝে নেয়, কিন্তু তাতে চাষ না করে কিংবা এরূপ বাড়িতে সে বসবাস না করে তবে তাকে কোন ভাড়া পরিশোধ করতে হবে না। ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে কেউ কেউ বিনা চুক্তিতে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ন্যায্য ভাড়া পরিশোধ করা অবশ্য কর্তব্য বলে ফাতওয়া দিয়েছেন (আল-হাবী)।

১০৪. মাসআলা : 'জামিউল-ফুসুল' গ্রন্থে আছে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মুতাওয়াল্লী তার সাবালক পুত্র বা পিতার কাছে ওয়াক্ফের বাড়ি ভাড়া দিতে পারবে না। অবশ্য ন্যায্য ভাড়ার বেশী দরে দিলে জায়েয হবে। তদ্রূপ মুতাওয়াল্লী নিজে ভাড়া নেয়ার ক্ষেত্রে তা

কল্যাণকর বিবেচিত হলে জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। এ অনুযায়ীই ফাতওয়া দেওয়া হয় (আল-বাহরুর রায়িক)।

১০৫. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মুতাওয়াল্লী কোন সামগ্রীর বদলে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ইজারা দিতে পারে। কোন কোন ফকীহ বেচাকেনা ও ইজারা-ভাড়ার ক্ষেত্রে যেসম বস্ত্র দাম ও বিনিময় হিসেবে প্রচলিত ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে কেবল সেগুলোই জায়েয, যেমন গম ও যব (চাউল)। কাজেই কাপড় বা গোলাম ইত্যাদি যদি বিনিময়রূপে দেওয়া হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমেই জায়েয নয় (আল-গিয়াছিয়া)।

১০৬. মাসআলা : বস্ত্র-সামগ্রীর বদলে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ভাড়া দেওয়ার বৈধতার মত অনুসারে ভাড়া দেওয়া হলে মুতাওয়াল্লী সে বস্ত্র গ্রহণ করার পর বিক্রি করে দেবে এবং তার মূল্য ওয়াক্ফের খাতে ব্যয় করবে (আল-মুহীত)।

১০৭. মাসআলা : ওয়াক্ফের তত্ত্বাবধায়ক ইচ্ছা করলে নিজেও লোক লাগিয়ে জমি চাষ করতে পারে, তখন ওয়াক্ফের ফসল দ্বারা তাদের পারিশ্রমিক আদায় করবে (আল-হাবী)।

১০৮. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ইজারা দেয় এবং শর্ত আরোপ করে যে, ইজারা গ্রহীতাকেই তার মেরামত করতে হবে তবে সে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে। তবে হাঁ, যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ স্থির করে দেয় এবং মেরামতের কাজে তা খরচ করতে বলে তা জায়েয হবে (আয-যাখীরা)।

১০৯. মাসআলা : ওয়াক্ফের বাড়ি ভাড়া নেওয়ার পর ভাড়াটিয়া নিজের জন্য তাতে কোন কক্ষ তৈরি করতে পারে না, হাঁ, তার ন্যায্য ভাড়া পরিশোধ করলে এবং মূল ইমারতের কোন ক্ষতি না হলে তা জায়েয হবে। আর কক্ষ তৈরির স্থানটি যদি বেকার পড়ে থাকে এবং অনুরূপ কক্ষ তৈরি অনুমতি ছাড়া কেউ তা ইজারা নিতেও আগ্রহী না হয়, তখন অবশ্য বাড়তি ভাড়া ছাড়াও কক্ষ তৈরি জায়েয হবে (আল-কিন্যা)।

১১০. মাসআলা : কোন ব্যক্তি তার বাড়িটি নির্দিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির জন্য ওয়াক্ফ করল এবং সবশেষে তা গরীবেরা পাবে বলে স্থির করল, সেক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী যদি এ বাড়িকে ওয়াক্ফ ভোগীদের কাছেও ভাড়া দিতে পারে (আল-মুয্মারাত), তবে ভাড়া গ্রহীতার হক তা থেকে খারিজ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১১১. মাসআলা : তদ্রূপ গরীবদের জন্য ওয়াক্ফকৃত বাড়িতে কোন গরীবকে ভাড়া থাকাতে দেয় এবং তার প্রাপ্য হতে ভাড়ার টাকা কেটে নেওয়া জায়েয। কেননা আমাদের উলামায়ে কিরাম হতে বিশুদ্ধভাবে এ বর্ণনা প্রমাণিত আছে যে, বায়তুল-মালে কারো পাওনার বদলে তার জমির খাজনা কাটা জায়েয। এখানেও বিষয়টি তদ্রূপ (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১১২. মাসআলা : যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, সে যদি ওয়াক্ফের সম্পত্তি ভাড়া দেয় তবে তা বৈধ হবে কি না? এ সম্পর্কে ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন, যেসব ক্ষেত্রে ভাড়ার সম্পূর্ণ টাকাই সে একা পাবে, যেমন ওয়াক্ফ-সম্পত্তির কোনরূপ মেরামতের প্রয়োজন নেই

এবং ওয়াক্ফের সম্পত্তি তার কোন অংশীদার নেই, সেসব ক্ষেত্রে তার ভাড়া দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। যদি সে সম্পত্তিটা হয় কোন বাড়ি বা দোকান ঘর। যদি তা চাষের জমি হয়, এবং ওয়াক্ফদাতা শর্ত করে থাকে যে, ওয়াক্ফের আয় হতে প্রথম তার খারাজ ও উশর পরিশোধ করা হবে, তারপর সে জমির সংস্কারাদি করা হবে এবং তারপর যা বেঁচে থাকে তা ভোজ্যকে দেওয়া হবে, তবে সে ক্ষেত্রে ভোজ্যের ভাড়া দেওয়ার অধিকার থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১৩. মাসআলা : যদি ওয়াক্ফদাতা অনুরূপ শর্ত অর্থাৎ ওয়াক্ফের আয় দ্বারা প্রথমে খারাজ ও উশর পরিশোধ এবং সংস্কার কার্য সম্পন্ন করার শর্ত আরোপ না করে, তবে ভোজ্য কর্তৃক ভাড়া দেওয়া জায়েয হওয়ারই কথা, অবশ্য সে ক্ষেত্রে খারাজ আদায় ও মেরামতের দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে (আয-যাখীরা)।

১১৪. মাসআলা : ওয়াক্ফ-সম্পত্তি যদি চাষের জমি হয় এবং যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তারা দুই বা তিন ব্যক্তি হয়, তারপর তারা শলা-পরামর্শ করে এক একে এক জন জমির এক অংশ নিয়ে নিজের জন্য চাষাবাদ করতে চায় তবে তা জায়েয হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যদি 'উশরী জমি হয় তবে তাদের অনুরূপ আপোসরফা জায়েয আর খারাজী জমি হলে জায়েয নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১৫. মাসআলা : বর্ণিত আছে যে, ফকীহ আবু জা'ফর হিন্দাওয়ানী (র)-বলেন, ওয়াক্ফ-ভূমিকে বহু বছরের জন্য ইজারা দেওয়া জায়েয নয়'-এ মর্মে ফাতওয়া থাকার কারণে সম্প্রতিকালে কিছু লোক ওয়াক্ফ-সম্পত্তির ইজারা সংক্রান্ত দলীলে এই কৌশল অবলম্বন করছে যে, তারা দলীলে লিখে দিচ্ছে- "ওয়াক্ফদাতা অমুক ব্যক্তিকে অমুকের কাছে এই জমি বার্ষিক এত টাকার বিনিময়ে ইজারা দেওয়ার জন্য উকীল বানিয়েছে আর যখনই তাকে উকীলের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেবে, তখনই সে এর উকীল নিযুক্ত হবে"। তাদের এ চাতুর্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইজারা গ্রহীতার হাতে ওয়াক্ফ-ভূমি এক বছরের বেশী কাল বাকি রাখা। ফকীহ আবু জা'ফর (র)- বলেন, আমরা কিন্তু ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে এরূপ উকীলের পদাধিকার বাতিল করে দেই, যদিও কিয়াস অনুযায়ী তা বৈধ হওয়া উচিত। আমরা একে বাতিল করে দেই ওয়াক্ফের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে, যেমন এ লক্ষ্যেই ওয়াক্ফ-সম্পত্তির দীর্ঘ মেয়াদী ইজারাকে বাতিল করে থাকি। তো ওয়াক্ফের স্বার্থ-রক্ষার খাতিরে যখন উকীলের পদাধিকার বাতিল করা জায়েয তখন ওয়াক্ফের কল্যাণে এ জাতীয় চুক্তি ও লেনদেনকেও বাতিল করা জায়েয হবে বৈ কি! এ অনুযায়ীই ফাতওয়া দেওয়া হয়ে থাকে (আল-মুয্মারাত)।

১১৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ইজারা নিল এবং তাতে একটি দোকান ঘর তৈরি করল, এমনকি তাতে সে থাকাও শুরু করে দিল। এ অবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি আরও বেশী ভাড়া দিতে চাইল এবং প্রথম ব্যক্তিকে সেখান থেকে হটাতে চাইল। এরূপ ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে এই যে, লক্ষ্য করে দেখতে হবে মাসিক ভাড়া অনুযায়ী তা ইজারা দেওয়া হয়েছিল কি না। যদি তাই হয়ে থাকে তবে মাস পূর্ণ হলে মুতাওয়াল্লীর সে ইজারা রদ করার ইখতিয়ার থাকবে-তারপর সে দোকান ঘর তুলেও দিতে পারবে যদি তা তুলতে গেলে ওয়াক্ফ-সম্পত্তির

কোন ক্ষতি না হয়। সুতরাং দোকান মালিকের কর্তব্য হবে সে ক্ষেত্রে ঘরটি তুলে নেওয়া। আর তুলতে গেলে যদি ওয়াক্ফ-সম্পত্তির ক্ষতি হয়, তা হলে মুতাওয়াল্লী তা তুলে দিতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা যদি রাযী থাকে, তবে মুতাওয়াল্লী মূল্যের বিনিময়ে সে ঘরের মালিক হয়ে যাবে। তখন প্রতিষ্ঠিত ঘর ও ভেঙ্গে ফেলা ঘর- এ দুয়ের মধ্যে যার দাম কম, সে মূল্যই ধার্য করা হবে। আর ইজারা গ্রহীতা যদি তাতে সম্মত না হয়, তবে সে অবস্থায়ই ঘরটি রেখে দেওয়া হবে, যাবত না তার মাল মুক্ত হয়ে আসে (আস-সিরাজিয়া)।

১১৭. মাসআলা : এ বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন ঘরটির মালিক মুতাওয়াল্লীর অনুমতি ছাড়াই তা তৈরি করবে। যদি তার অনুমতি নিয়ে তৈরি করে থাকে, তবে সে ঘর ওয়াক্ফ-সম্পত্তির হয়ে যাবে। ঘরটি তৈরি করতে যা খরচ হয়েছে মালিক তা মুতাওয়াল্লীর কাছ থেকে আদায় করে নেবে (আল-যাখীরা)।

১১৮. মাসআলা : 'মাজমুউল-নাওয়ালিল' গ্রন্থে আছে যে, নাজমুদ-দীন আন-নাসাফী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোনও ওয়াক্ফ-ভূমিকে কারও মালিকানাধীন ঘর আছে। ঘরটির মালিক নির্দিষ্ট ভাড়ায় সে জমি ইজারা নিয়েছিল এবং সেটা তখন ন্যায্য ভাড়াই ছিল। পরে সে ঘরের মালিক বদলে গেছে এবং এদিকে মুতাওয়াল্লীরও পরিবর্তন হয়েছে নতুন মালিক চাচ্ছে অতীতে যেই ন্যায্য ভাড়ায় ইজারা স্থির হয়েছিল এখনও সেই ভাড়াই পরিশোধ করবে, কিন্তু বর্তমান মুতাওয়াল্লীর দাবি বর্তমানকার ন্যায্য ভাড়া দিতে হবে। এখন এ মুতাওয়াল্লীর কি এরূপ দাবী করার অধিকার আছে? নাজমুদীন নাসাফী (র) বললেন, হাঁ, তার সে অধিকার আছে (আল-ফুসুলুল-ইমাদিয়া)।

১১৯. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি ওয়াক্ফের বাড়ি ভাড়া দেয় তবে চাইলে ভাড়ার অর্থ ইজারা গ্রহীতার কাছে যে ব্যক্তি ঋণী তার কাছ থেকেও আদায় করে নিতে পারে, যদি ইজারা গ্রহীতা সে ব্যক্তির উপর হাওয়াল্লা করে এবং সে ব্যক্তি সচ্ছল হয়ে থাকে। মুতাওয়াল্লী যদি ভাড়ার অর্থের জন্য ইজারা গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে কাউকে যামীন গ্রহণ করে তবে সেটা যে জায়েয তা বলাই বাহুল্য (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২০. মাসআলা : আবুল-লাইস (র) এর ফাতওয়া গ্রন্থের 'ইজারা' অধ্যায়ের শেষ দিকে আছে, ওয়াক্ফের জমি যেসব গাছ-বৃক্ষ আছে, মুতাওয়াল্লী যদি সেগুলো বিক্রি করে দেয় এবং তারপর ক্রেতার কাছে সে জমি ইজারা দেয়, তবে দেখতে হবে গাছ কি শিকড়সহ বিক্রি করেছে না জমির উপরের অংশ হতে। যদি শিকড়সহ বিক্রি করে থাকে, তবে ইজারা বৈধ হবে- যদি না ইজারা দীর্ঘ মেয়াদী হয়। আর যদি জমির উপরের অংশ হতে বিক্রি করে তবে ইজারা বৈধ হবে না। যদি দুই/তিন বছরের জন্য কারও কাছে গাছ বর্গা দেয় তারপর তার কাছেই ন্যায্য ভাড়ায় জমি ইজারা দেয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত অনুযায়ী জায়েয নয়, এবং ইমাম আবু-ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) এর মতে জায়েয। অবশ্য সাবধানতার পরিচায়ক হবে, যদি শিকড়সহ গাছ বিক্রি করে এবং তারপর জমি ইজারা দেয়, যাতে করে সর্বসম্মতিক্রমেই বৈধ হয়ে যায় (আল-মুহীত)।

১২১. মাসআলা : ওয়াক্ফের দেখা-শোনায় নিযুক্ত ব্যক্তি চাইলে ওয়াক্ফ-ভূমির চাষাবাদ, কুয়া খনন এবং ওয়াক্ফ-সম্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজে শ্রমিক নিযুক্ত করতে পারে (আল-হাবী)।

১২২. মাসআলা : ওয়াক্ফের জমি কাউকে বর্গাচাষের জন্য দিলে তা জায়েয হবে, যদি এই পরিমাণ ঠকে দেওয়া না হয়, যে ঠকটা কোন লোক মেনে নিতে রাযী থাকে না। এমনভাবে ওয়াক্ফ-ভূমির খেজুর গাছকেও বর্গা দেওয়া জায়েয। জমির বর্গা বা গাছ বর্গা দেওয়ার পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই যদি মুতাওয়াল্লী মারা যায়, তবে বর্গা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে না। পক্ষান্তরে জমি বা বৃক্ষের বর্গাচাষী মারা গেলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

মুতাওয়াল্লী যদি সুনির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য ওয়াক্ফ-ভূমি বর্গাচাষে প্রদান করে তবে তাও জায়েয-যদি তা গরীবদের পক্ষে উপকারী ও কল্যাণকর হয়। কেননা বর্গাচাষকে যে কয়েক বছরের জন্যও বৈধ বলা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে তিন বছরের কোন সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি, বরং যত বছরের জন্যও বর্গা দেওয়া হোক কেবল তার পরিমাণটা নির্দিষ্ট করে নেওয়ার শর্ত করা হয়েছে। ফুকাহায়ে কিরাম যে, ইসতিহসানের ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদে ওয়াক্ফ-সম্পত্তির ইজারাকে অবৈধ করেছেন, তার কারণ ছিল ওয়াক্ফ-সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকা। এ আশংকা বর্গাচাষের ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে।

ওয়াক্ফের জমি বর্গা দেওয়া হয় কিংবা ওয়াক্ফ-ভূমির খেজুর গাছ বর্গা দেওয়া হয় এবং ওয়াক্ফ-সম্পত্তির জন্য আয়ের কোন অংশ না রাখা হয় তবে তা জায়েয হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে বর্গাদাতা দখলদার সাব্যস্ত হবে। তারপর জমির কোন ক্ষতি না হলে তো জরিমানা আসবে না, কিন্তু যদি কোনরূপ ক্ষতি হয়, তবে জরিমানা দিতে হবে। সে জরিমানা বর্গাদাতার কাছ থেকেও আদায় করা যেতে পারে, অথবা বর্গা গ্রহীতার কাছ থেকেও আদায় করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জমির ফসলে ভোক্তাদের (যাদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা হয়েছিল) কোন অংশ থাকবে না। হাঁ গাছের ফল অবশ্য তাদেরই হবে। যে ব্যক্তি সে গাছ বর্গা চুক্তিতে নিয়েছিল, সে ফলের কোন অংশ পাবে না। সে পাবে তার ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং তা পাবে বর্গাদাতার কাছ থেকে। বর্গাদাতা নিজ পকেট থেকে তা পরিশোধ করবে (আয-যাখীরা)।

১২৩. মাসআলা : কেউ যদি ওয়াক্ফের জমি ঐ প্রশাসকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ভাড়ায় ইজারা নিয়ে চাষ করে, তারপর মুতাওয়াল্লী বর্গাচাষের প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী তার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ ফসল দাবী করে, আর ঐ ব্যক্তি বলে যে, আমি তো এটা নির্দিষ্ট ভাড়ায় গ্রহণ করেছি। এক্ষেত্রে বিধান এটাই যে, মুতাওয়াল্লীর দাবী কার্যকর হবে (খাযানাতুল-মুফতীন এবং ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২৪. মাসআলা : ওয়াক্ফ-সম্পত্তি যদি উশরী জমি হয় এবং মুতাওয়াল্লী তা বর্গা চাষে প্রদান করে, তবে উৎপন্ন সমস্ত ফসলের উশর বর্গাদাতার অংশ হতে আদায় করতে হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী। কেননা তাঁর মতে অর্থের বিনিময়ে ইজারা দিলে উশর ইজারাতাদার উপর বর্তায় ঠিক খারাজের মত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-ও ইমাম

মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ইজারার ক্ষেত্রে উশর ওয়াজিব হয় সমস্ত ফসলের উপর। তেমনভাবে বর্গাচাষের ক্ষেত্রেও (আল-মুহীত)।

১২৫. মাসআলা : হিলাল (র)- তাঁর ওয়াক্ফ-গ্রন্থে বলেন, ওয়াক্ফ-সম্পত্তির যদি মেরামত প্রয়োজন হয়, কিন্তু মুতাওয়াল্লীর হাতে এ পরিমাণ অর্থ না থাকে, যা দ্বারা তা মেরামত করা সম্ভব, তবে তজ্জন্য সে ঋণ করতে পারবে না। ফকীহ আবু জা'ফর (র)- বলেন এ রায় কিয়াস অনুযায়ী। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ জরুরী হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে কিয়াস বর্জন করা হবে, যেমন ওয়াক্ফের জমিতে যদি ফসল থাকে এবং তাতে পোকা লাগে আর মুতাওয়াল্লী ভরণ-পোষণের জন্য তার মুখাপেক্ষী হয় অথবা সরকার তার কাছে খারাজ (ভূমি রাজস্ব) তলব করে, তখন তার জন্য ঋণ গ্রহণ জায়েয। অবশ্য এসব প্রয়োজনে সরকারের অনুমতিক্রমে ঋণ গ্রহণই সত্যতার পরিচায়ক। হাঁ, সরকারী দফতর যদি এতটা দূরে হয় যে, সেখানে উপস্থিত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হন, তখন অবশ্য নিজে নিজে ঋণ নিলেও দোষ নেই (আয-যাহীরিয়া)।

১২৬. মাসআলা : উপরিউক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে সেই ক্ষেত্রে, যখন সেই বছর ওয়াক্ফ-সম্পত্তির কোন আয় না থাকবে। কিন্তু যদি জমি হতে আয় অর্জিত হয়ে থাকে এবং মুতাওয়াল্লী তা হতে খারাজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না রেখে সবটাই গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়, তবে খারাজ পরিমাণ তার থেকে জরিমানা স্বরূপ আদায় করা হবে (আয-যাহীরিয়া)।

১২৭. মাসআলা : ওয়াক্ফের দেখাশোনায় নিযুক্ত ব্যক্তির কাছে যদি খারাজ ও অন্যান্য কর তলব করা হয়, আর তার হাতে যদি দাবী পূরা করার মত ওয়াক্ফের কোন অর্থ না থাকে, তাহলে বিধান এই যে, ওয়াক্ফকারী তাকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে থাকলে সে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। আর ওয়াক্ফকারীর পক্ষ হতে অনুমতি না থাকলে সে ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। বিত্তমতম এই যে, ঋণ গ্রহণ ছাড়া কোন উপায় না থাকলে কাযীর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করবে। ফকীহ আবু জা'ফর (র)- এরূপ বলেছেন। তারপর সে ওয়াক্ফের আয় দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করবে (আল-মুযমারাত)।

১২৮. মাসআলা : ওয়াক্ফ-সম্পত্তির নির্মাণ মেরামত একটি অত্যাবশ্যিক কাজ। সুতরাং কাযীর অনুমতিক্রমে এজন্য ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। তবে যে সব ক্ষেত্রে লোকসানটা ভোক্তাদের উপর বর্তায় সে সব ক্ষেত্রে কাযীর অনুমতিক্রমেও ঋণ নিতে পারবে না (আল-বাহরুর রাযিক)।

১২৯. মাসআলা : যদি ওয়াক্ফের আয় দ্বারা পরিশোধের ইচ্ছায় কাযীর আদেশক্রমে ঋণ গ্রহণ করে, যাতে তা দিয়ে বীজ কিনে ওয়াক্ফের জমি চাষ করতে পারে, তবে সর্বসম্মতিক্রমেই তা জায়েয। যদি সে ঋণ কাযীর অনুমতি ছাড়া নেয়, তবে সে সম্পর্কে দু'টি মত আছে (আল-গিয়াছিয়া, আয-যাখীরা গ্রন্থেও অনুরূপ আছে)।

১৩০. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি ওয়াক্ফের আয় দ্বারা পরিশোধের ইচ্ছায় এই উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে যে, তা দিয়ে বন্ধক রাখার সামগ্রী কিনবে তবে তা কাযীর আদেশক্রমে হলে জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয নয় (আস-সিরাজিয়া)।

১৩১. মাসআলা : (الاستئذان) এর ব্যাখ্যা এই যে, ওয়াক্ফের উদ্বৃত্ত আয় না থাকার কারণে প্রয়োজনে ওয়াক্ফের কাজে ঋণ গ্রহণ করা। ওয়াক্ফ-সম্পত্তির-উদ্বৃত্ত থাকা অবস্থায় ওয়াক্ফ-সম্পত্তির সংস্কার কার্যে মুতাওয়াল্লী নিজ পকেট থেকে খরচ করলে ওয়াক্ফের আয় হতে তা উসূল করে নিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩২. মাসআলা : একখণ্ড ওয়াক্ফের জমি কোন চাষীর হাতে আছে। তাতে সে তুলার চাষ করেছিল, কিন্তু সে তুলা চুরি হয়ে গেল। চাষী তা খুঁজতে খুঁজতে শেষে জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে পেয়ে গেল। সে বাড়ির মালিককে পাকড়াও করল এবং তার কাছে তা দাবী করল। বাড়িওয়ালা বলল, আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে একশ'মণ' দেব। এক্ষেত্রে তার কাছ থেকে সেটা নেওয়া কি মুতাওয়াল্লীর জন্য জায়েয হবে?

মাসআলাটির তিনটি অবস্থা হতে পারে : (ক) হয়ত জানা যাচ্ছে যে, বাড়িওয়ালা তার মানহানির ভয়েই সেটা দিতে চাচ্ছে; (খ) অথবা জানা যাচ্ছে যে, সে সেই পরিমাণ বা তার বেশী চুরি করেছে কিংবা সে তা স্বীকার করেছে; (গ) অথবা জানা গেছে যে, সে চুরি করেছে, কিন্তু তার পরিমাণটা সে যা দিচ্ছে তার কম। প্রথম অবস্থায় তার কাছ থেকে কিছু নেওয়া জায়েয হবে না। দ্বিতীয় অবস্থায় নেওয়া জায়েয আর তৃতীয় অবস্থায় কেবল ততটুকু নেওয়া জায়েয, ঠিক যতটুকু পরিমাণ সে চুরি করেছে বলে নিশ্চিত জানা গেছে (আল-মুহীত)।

১৩৩. মাসআলা : ওয়াক্ফের কোন সম্পদ যদি চাষী আত্মসাৎ করে এবং তার পর কোন কিছুর বিনিময়ে মুতাওয়াল্লীর সংগে তার আপোসরফা হয়, তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে যে, মুতাওয়াল্লী যা দাবী করেছে তার পক্ষে তার কোন সাক্ষি প্রমাণ আছে কিনা কিংবা চাষী তা স্বীকার করেছে কিনা। যদি সাক্ষি প্রমাণ থাকে বা চাষী তা স্বীকার করে এবং সেই সংগে চাষী ধনী হয়, তবে সে যে পরিমাণ আত্মসাৎ করেছে তা হতে মুতাওয়াল্লীর কিছুমাত্র ছেড়ে দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। যদি সে লোকটি অভাবগ্রস্ত হয় তবে ছাড় দিতে পারবে বটে, কিন্তু তার কাছ থেকে যা আদায় করা হবে তা অত্যধিক কম না হতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩৪. মাসআলা : ওয়াক্ফ-সম্পত্তির দেখাশোনার জন্য ওয়াক্ফদাতা যদি মুতাওয়াল্লীর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক ভাতা ধার্য করে তবে জায়েয হবে। সে ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ-সম্পত্তির নির্মাণ-সংস্কার, আয়-উৎপাদন এবং যথাযথ খাতে তার আয় বণ্টন ইত্যাদি যে সব কাজ তার মত লোকে করে থাকে এবং করবার রেওয়াজ আছে, মুতাওয়াল্লীকে তা করতে বাধ্য করা হবে (আল-হাবী)।

১৩৫. মাসআলা : সুতরাং উপরিউক্ত কাজে মুতাওয়াল্লী কোনরূপ অবহেলা করতে পারবে না। হ্যাঁ, যে সব কাজ প্রতিনিধি মারফত বা শ্রমিক দিয়ে করানো হয়, সে সব নিজে করতে বাধ্য থাকবে না (আল-মুহীত)।

১৩৬. মাসআলা : এমন কি কোন মহিলাকে যদি মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে এবং তার জন্য সুনির্দিষ্ট ভাতা ধার্য করে তবে তাকেও কেবল এমন কাজই করতে বাধ্য করা যাবে, যা সমাজে তার মত মহিলারা করে থাকে। ভোক্তারা যদি মুতাওয়াল্লীর সংগে বিবাদে লিপ্ত হয় এবং তারা আদালতে দাবী করে যে, ওয়াক্ফদাতা এই ভাতা কেবল কাজের বিনিময়েই ধার্য করেছে অথচ সে কোন কাজই করেছে না, তা হলে আদালত কিন্তু তাকে এমন কাজ করতে বাধ্য করতে পারবে না, যে সব কাজ সাধারণত মুতাওয়াল্লীগণ করে না (আল-বাহরুর রাযিক)।

১৩৭. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি উন্মাদ হয়ে যায় কিংবা অন্ধ বা মূক হয়ে যায়, তবে লক্ষ্য করে দেখতে হবে, এ অবস্থায় আদেশ ও নিষেধ করার মত ক্ষমতা তার আছে কি না। সে ক্ষমতা থাকলে তার ভাতা যথারীতি বহাল থাকবে। আর যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে তা হতে সে কিছুই পাবে না।

মুতাওয়াল্লী সম্পর্কে কেউ যদি কোনরূপ অভিযোগ তোলে তবে সুস্পষ্ট খেয়ানতের অভিযোগ ছাড়া অন্য কোন কারণে কাযী তাকে বরখাস্ত করবে না।

কাযী যদি মুতাওয়াল্লীকে বরখাস্ত করে তবে ওয়াক্ফদাতা তার তত্ত্বাবধান কার্যের জন্য যে ভাতা ধার্য করেছিল তাও কাটা যাবে।

কাযী কর্তৃক বহিস্কৃত ব্যক্তি যদি আবার মুতাওয়াল্লী পদের জন্য উপযুক্ত হয়ে যায়, তবে সে তার পদ ফিরে পাবে (আল-হাবী)।

১৩৮. মাসআলা : কাযী যদি বিবেচনাবোধ করে যে, তার সংগে অন্য একজনকে সহযোগী করে দিলে ভাল হয় এবং বিনিময়ে ওয়াক্ফদাতা কর্তৃক ধার্যকৃত ভাতার আংশিক তাকে প্রদান করে, তবে তাতে কোন বাধা নেই। সে ভাতা যদি খুব কম হয় এবং আদালতের বিবেচনায় সহযোগীরূপে নিযুক্ত ব্যক্তিকে ওয়াক্ফের আয় হতে কিছু ভাতা প্রদান সমীচীনবোধ হয়, তবে তাতেও দোষ নেই।

ওয়াক্ফদাতা যদি ওয়াক্ফের তত্ত্বাবধান-কার্যের বিনিময়ে তার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক ভাতা ধার্য করে এবং সে ভাতাটা অনুরূপ কার্যের জন্য প্রাপ্য ন্যায্য ভাতা অপেক্ষা বেশী হয়, তবে তাও জায়েয। এ ক্ষেত্রে তার মত অপরাপর মুতাওয়াল্লীগণ কী পরিমাণ ভাতা পেয়ে থাকে তা লক্ষ্য করা হবে না।

মুতাওয়াল্লী যদি তার উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য অন্য কাউকে নিযুক্ত করে এবং নিজ ভাতা হতে একটা অংশ তাকেও দেয়, তবে সে ইখতিয়ার তার আছে। সে তাকে অব্যাহতিও দিতে পারবে কিংবা চাইলে তার পরিবর্তে অন্য একজনকেও নিযুক্ত করতে পারবে (ফাতহুল-কাদীর)।

১৩৯. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা যদি ওয়াক্ফ-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান-কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি তথা মুতাওয়াল্লীর জন্য ভাতা ধার্য করে, তারপর সেই মুতাওয়াল্লী অন্য কোন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করে এবং সেই ভাতা তার জন্য স্থির করে, তবে তা জায়েয হবে না- যদি না ওয়াক্ফদাতা সে ক্ষমতা তাকে দিয়ে থাকে। ক্ষমতা দিলে অবশ্য পারবে (আল-হাবী)।

১. মণ (মানন)- এটা ঠিক বাংলা মণ নয়। আরবীয় পরিমাপে এর পরিমাণ এক পাউণ্ডের মত।

১৪০. মাসআলা : যদি সে মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফ-সম্পত্তির জন্য কাউকে তার প্রতিনিধি (উকীল) নিযুক্ত করে কিংবা কাউকে তার ওয়াসী বানায় এবং তার জন্য ভাতার সবটা বা আংশিক স্থির করে তারপর সে সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যায়, তবে তার সে প্রতিনিধি নিয়োগ বা ওয়াসী বানানোটো বাতিল হয়ে যাবে। ওয়াসী বা প্রতিনিধির জন্য যে পরিশ্রমিক স্থির করেছিল তা ওয়াক্ফ-সম্পত্তির আয়ের সংগে যুক্ত হবে। তবে ওয়াক্ফদাতা যদি শর্ত করে থাকে যে, ভাতার সে অর্থ যখন মুতাওয়াল্লী হতে কাটা যাবে তখন তা অমুক অমুক খাতে ব্যয় করা হবে, তাহলে সেই খাতেই এ পারিশ্রমিক বলে যাবে (আল-বাহরুর রায়িক, আল-ইসআফের বরাতে)।

১৪১. মাসআলা : তারপর মুতাওয়াল্লী নিয়োগের ব্যাপারে কাযীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে (ফাতহুল-কাদীর)।

১৪২. মাসআলা : সম্পূর্ণ পাগল বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যার উন্মাদ অবস্থাটা এক বছর দীর্ঘায়িত হয় (আল-হাবী)।

১৪৩. মাসআলা : যদি মুতাওয়াল্লী এক বছর যাবত বুদ্ধি-বিলুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং স্বীয় দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে যায়, তারপর তার বুদ্ধি ফিরে আসে এবং সে সুস্থ হয়ে যায়, তবে ওয়াক্ফ-সম্পত্তির দেখা-শোনার দায়িত্বও তার হাতে ফিরে আসবে (আল-মুহীত)।

১৪৪. মাসআলা : আদালতের কাছে প্রমাণিত হল যে বর্তমান মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফের দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত নয় এবং সে মতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করল আর তদস্থলে অন্য একজনকে নিয়োগ দিল তারপর অন্য এক প্রশাসক আসল এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার কাছে হাযির হয়ে বলল যে, আপনার পূর্ববর্তী প্রশাসক আমাকে মুতাওয়াল্লীর পদ হতে বহিষ্কার করেছে অথচ তার কাছে আমার বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি যাদরুন আমাকে ওয়াক্ফের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রশাসক তার সে কথা ও দাবী গ্রহণ করবে না। বরং সে তাকে বলবে, তুমি আমার কাছে প্রমাণ কর যে, ওয়াক্ফদাতা কর্তৃক তুমি এ ওয়াক্ফের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত হয়েছিলে, তাহলে আমি তোমাকে সে পদে পুনর্নিয়োগ দেব। সুতরাং বর্তমান প্রশাসনের কাছে সে যদি তা প্রমাণ করতে পারে, তবে প্রশাসন তাকে সে পদে পুনরায় নিয়োগ দেবে এবং ওয়াক্ফের আয় থেকে পূর্বের ভাতা জারি করে দেবে (আয-যাখীরা)।

১৪৫. মাসআলা : এমনভাবে প্রশাসক যদি তাকে তার পাপাচার বা দুর্নীতির কারণে পদচ্যুত করে, তারপর সে আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করে সংশোধন হয়ে যায় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় যে, সে মুতাওয়াল্লী পদের উপযুক্ত হয়ে গেছে, তাহলে তাকে পুনরায় তাকে সে পদে নিযুক্ত করবে (ফাতহুল-কাদীর)।

১৪৬. মাসআলা : কাযী যদি মুতাওয়াল্লীকে যথাযথ কারণে তার পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কাউকে সে পদে নিযুক্ত করে, তবে কাযীর কর্তব্য হবে তার জন্য ন্যায়সঙ্গত ভাতা ধার্য

করা। তারপর পূর্বের মুতাওয়াল্লীর জন্য ধার্যকৃত ভাতা হতে কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা ওয়াক্ফের আয়ের সঙ্গে জুড়ে দেবে (আল-মুহীত)।

১৪৭. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা যদি বলে, এ পরিমাণ অর্থ মুতাওয়াল্লীর জন্য জারি থাকবে, এমনকি কাযী তাকে অব্যাহতি দিলেও কিংবা যদি বলে, সে মারা গেলে তার আওলাদ ও আওলাদের আওলাদের জন্য জারি থাকবে, তাহলে তার সে শর্ত সহীহ (আল-হাবী)।

১৪৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার আবাদকৃত গোলামদের (মাওয়ালী) জন্য একখণ্ড জমি বিশুদ্ধভাবে ওয়াক্ফ করল এবং তারপর মারা গেল। কাযী সে সম্পত্তি একজন মুতাওয়াল্লীর দায়িত্বে অর্পণ করল এবং তার জন্য আয়ের এক-দশমাংশ ধার্য করল। সে ওয়াক্ফের একটি পেশণযন্ত্র আছে, যা নির্দিষ্ট ভাড়াই কোনও এক ব্যক্তির হাতে রাখা আছে এবং তার জন্য মুতাওয়াল্লীর প্রয়োজন নেই। যাদের জন্য সেটি ওয়াক্ফ করা হয়েছে তারা নিজেরাই তার আয় বুঝে নেয়। এরূপ ক্ষেত্রে সে পেশণযন্ত্রের এক-দশমাংশ মুতাওয়াল্লী পাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪৯. মাসআলা : কাযীকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর মুতাওয়াল্লী দাবী করল যে, সেই প্রাজ্ঞন কাযী তার জন্য মালিক বা বার্ষিক এত টাকা ভাতা ধার্য করেছিল এবং সেই কাযীও তার দাবী প্রত্যায়ন করল। এরূপ ক্ষেত্রে তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না, যাবত না সে তার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে। তারপর প্রাজ্ঞন কাযী কর্তৃক ধার্যকৃত ভাতা যদি তার কার্য হিসেবে ন্যায্য হয়ে থাকে কিংবা তার চেয়ে কম হয় তবে সেটাই বহাল রাখবে। আর যদি বেশী দিয়ে থাকে তবে বেশীটুকু কেটে দেবে এবং তারপর যা অবশিষ্ট থাকে তার জন্য সে ভাতাই স্থির করবে।

মুতাওয়াল্লী তার কার্য অনুযায়ী ন্যায্য ভাতারই অধিকারী হবে, তাতে কাযী বা মহল্লাবাসী তার জন্য কোনরূপ ভাতার শর্ত করুক বা নাই করুক। কেননা সাধারণত বিনা পারিশ্রমিকে কেউ মুতাওয়াল্লী পদ গ্রহণ করে না। আর রেওয়াযটা শর্তেরই মত (আল-কিন্য়া)।

১৫০. মাসআলা : 'মাজমূউন-নাওয়াযিল'- গ্রন্থে আছে, কাযীর পক্ষ হতে নিযুক্ত মুতাওয়াল্লী যদি নিজেই দায়িত্ব পালন হতে বিরত থাকে এবং বিষয়টা সে কাযীর কাছে পেশ না করে, যাতে তাকে অব্যাহতি দিয়ে অন্য কাউকে তদস্থলে নিয়োগ করে, তবে সে কি মুতাওয়াল্লী পদ হতে অব্যাহতি পেয়ে যাবে?

নাজমুদ্দীন (র)- বলেন, না এর দ্বারাই সে অব্যাহতি পেয়ে যাবে না। যাদের কাছে পাওনা আছে, মুতাওয়াল্লী যদি তাদেরকে তা পরিশোধের জন্য তাগাদা দেওয়া হতে কিছুকাল বিরত থাকে, তবে কি সে ওনাহ্গার হবে? নাজমুদ্দীন (র)- বলেন, ওনাহ্গার হবে না,

কোন ব্যক্তির কাছে কোন যিম্মাদারীর কারণে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাওনা হয়ে যাওয়ার পর সে যদি পলায়ন করে তবে মুতাওয়াল্লীর উপর কি জরিমানা আসবে? নাজমুদ্দীন (র)- বলেন, না তার উপর জরিমানা আসবে না (আয-যাহীরিয়া)

১৫১. মাসআলা : মুতাওয়ালী ওয়াক্ফ-সম্পত্তির আয় সংগ্রহ করার পর যদি মারা যায় এবং বলে না যায় যে, সে তা কী করেছে, তাহলে তার উপর জরিমানা আসবে না (আল-মুয্মারাত)।

অনুচ্ছেদ : ওয়াক্ফের আয় বন্টনের নিয়ম কেউ যদি গ্রহণ করে এবং কেউ না করে কিংবা কেউ যদি মারা যায় এবং কেউ জীবিত থাকে তখন করণীয়

১. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি আবদুল্লাহ ও যায়দের জন্য জমি ওয়াক্ফ করে তবে তার ফসল তারা দু'জন পাবে। তারা দু'জনেই যদি মারা যায়, তবে তা সবই গরীবদের হবে। যদি একজন মারা যায়, তবে অর্ধেক ফসল হবে গরীবদের।

ওয়াক্ফদাতা একদল লোকের জন্য ওয়াক্ফ করলে তাদের সংখ্যানুপাতে আয় বন্টন হবে। তাদের মধ্যে একজন মারা গেলে তার অংশটা গরীবদেরকে দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট আয় জীবিতদের মধ্যে বন্টন হবে।

যদি বলে, আবদুল্লাহর সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ, কিন্তু তাদের কোন সংখ্যা উল্লেখ না করে, তা হলে যতদিন আবদুল্লাহর একজন সন্তানও জীবিত থাকবে ততদিন গরীবেরা তার কিছুই পাবে না (আয-যারীরিয়্যার)।

২. মাসআলা : যদি যায়দ ও আমরের নাম বলে আর যায়দের জন্য অর্ধেক ও আমরের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ স্থির করে এবং তারপর চুপ থাকে, তা হলে আওলের নীতিতে সাত ভাগ করা হবে, যার তিন ভাগ পাবে যায়দ এবং চার ভাগ আমর। যদি বলে, যায়দের অর্ধেক ও আমরের এক-তৃতীয়াংশ এবং তারপর চুপ থাকে, তবে প্রত্যেকে তার জন্য ধার্যকৃত অংশ পাবে এবং অবশিষ্ট অংশ তাদের মধ্যে অর্ধাঅর্ধি ভাগ হবে (খায়ানাতুল-মুফতীন)।

৩. মাসআলা : যদি বলে, আমার এ জমি যায়দ ও আমরের জন্য ওয়াক্ফ এবং আমর পাবে ফসলের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা যদি বলে, আমর পাবে আয়ের থেকে একশ' দিরহাম, তবে আমর তাই পাবে, যা তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বাকি সব পাবে সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে পরিমাণ উল্লেখ করেনি। এ নীতিই অনুসৃত হবে ওয়াক্ফদাতা কর্তৃক বর্ণিত যে-কোনও পরিমাণের ক্ষেত্রে। সে যার জন্য যে পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয় তাকে তাই দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট সব পাবে সেই ব্যক্তি যার জন্য কিছু নির্দিষ্ট করা হয় নি।

যদি বলে, এর থেকে যায়দ পাবে একশ' এবং আমর দু'শ'। কিন্তু আয়ের পরিমাণ তার চেয়ে কম, তাহলে প্রাপ্ত আয় তাদের মধ্যে তিনভাগে ভাগ করা হবে। যদি আয় বেশী হয়, তা হলে অতিরিক্তটা তাদের মধ্যে অর্ধাঅর্ধি হবে, অর্থাৎ তাদের সংখ্যানুপাতে বন্টন হবে; তাদের জন্য যে পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সে হারে নয়।

যদি বলে, এ সম্পত্তি ওয়াক্ফ ও সাদাকা। এর থেকে যায়দ পাবে একশ' দিরহাম এবং আমর দু'শ' দিরহাম, তবে প্রত্যেককে তাই দেওয়া হবে, যা তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে (আল-হাবী)।

৪. মাসআলা : যদি বলে, এটা এই শর্তে সাদাকা, ওয়াক্ফ যায়দ পাবে একশ' এবং বাদ বাকিটা আমরের, কিন্তু সর্বমোট আয়ের পরিমাণই হল ~~একশ'~~ দিরহাম, তবে আমর কিছুই পাবে না।

এমনিভাবে যদি বলে, যায়দের একশ' দিরহাম, কিন্তু আমরের ~~কোন~~ পরিমাণ নির্দিষ্ট না করে, পরে দেখা যায় যে, মোট আয়ই হয়েছে একশ' দিরহাম, তবে ~~আমর~~ কিছুই পাবে না।

৫. মাসআলা : যদি বলে (একজন) সাদাকা, ওয়াক্ফ এ আবদুল্লাহ পাবে এর অর্ধেক এবং যায়দ একশ' দিরহাম, তবে আবদুল্লাহকে তার অর্ধেক দেওয়া হলে অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে যায়দকে একশ' দিরহাম দেওয়া হবে। তার পর যা বাকি থাকে, তা গরীবদের। যদি সর্বমোট আয়ই হয় একশ' দিরহাম, তবে তার সবটাই যায়দের আবদুল্লাহ ~~কিছুই~~ পাবে না। যদি আয়ের পরিমাণ দু'শ' দিরহাম হয় তবে আবদুল্লাহ পাবে একশ' দিরহাম ~~যায়দ~~ একশ' দিরহাম। গরীবদের জন্য কিছুই থাকবে না। যদি আয়ের পরিমাণ একশ' ~~পঞ্চাশ~~ দিরহাম হয়। তবে যায়দ একশ' দিরহাম এবং আবদুল্লাহ অবশিষ্ট পঞ্চাশ দিরহাম পাবে (আল-মুফতীন)।

৬. মাসআলা : যদি বলে, আমার জমি আমার গরীব আত্মীয়দের ~~সাদাকা~~ সাদাকা, ওয়াক্ফ তবে তাদের প্রত্যেককে এই পরিমাণ খাদ্য ও বস্ত্র দেওয়া হবে, যা তাদের যথেষ্ট ও ন্যায়সংগত হয়। তারা সকলে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। প্রত্যেকে ~~কিন্তু~~ তা নিয়েই ক্ষান্ত হবে, যা তার জন্য যথেষ্ট হয়। আয় যদি এ পরিমাণ হয় যে, প্রত্যেককে ~~অন্য~~ ন্যূনতম প্রয়োজন (যথেষ্ট) পরিমাণ দেওয়া সম্ভব তবে প্রত্যেককে প্রয়োজন পরিমাণ দেওয়া হবে ~~কিন্তু~~ হয়, তবে সেটাই তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। যদি আয়ের পরিমাণ ন্যূনতম ~~প্রয়োজন~~ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে সে বেশীটা তাদের মধ্যে তাদের সংখ্যানুপাতে বন্টন করা হবে (আয-যারীরিয়্যা)।

৭. মাসআলা : যদি বলে, আমার জমি সাদাকা, ওয়াক্ফ, তবে ~~আবদুল্লাহ~~ তা'আলা তাতে যে ফসল দান করবেন, তা হতে তার গরীব আত্মীয়-স্বজনের প্রত্যেককে ~~সংগতভাবে~~ এ পরিমাণ খাদ্য ও বস্ত্র দেওয়া হবে, যা দ্বারা তার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটে। যদি ~~কিন্তু~~ তারপরও বেঁচে থাকে, তবে তা অন্যান্য গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে (খায়ানাতুল-মুফতীন)।

৮. মাসআলা : যদি বলে, আমার এ জমি সাদাকা, ওয়াক্ফ ~~কিন্তু~~ আবদুল্লাহ তা'আলা যে ফসল দেবেন তা থেকে এক হাজার দিরহাম যায়দ ও আবদুল্লাহ পাবে এবং আবদুল্লাহ পাবে তার একশ' দিরহাম, এরপর দেখা গেল সর্বমোট ফসলই ~~এক~~ এক হাজার দিরহাম পরিমাণ, তবে তার একশ' দিরহাম আবদুল্লাহকে দেওয়া হলে তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা দেওয়া হবে যায়দকে। যদি ফসলের পরিমাণ পঁচাত্তর হাজার হয়, তবে তাদের মধ্যে তা দশভাবে ভাগ করা হবে।

যদি বলে, এতে আবদুল্লাহ তা'আলা যে ফসল দেবেন তা থেকে ~~প্রতি~~ এক হাজার দিরহাম আলাদা করা হবে, যার একশ' দিরহাম আবদুল্লাহকে এবং অবশিষ্ট ~~পঁচাত্তর~~ যায়দকে দেওয়া হবে, কিন্তু ফসল এক হাজার দিরহাম অপেক্ষা কম হল, এক্ষেত্রে আবদুল্লাহকে ~~কিন্তু~~ বিতরণ শুরু করা

হবে। তাকে দেওয়া হবে একশ' দিরহাম। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পাবে যায়দ। আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকলে যায়দ কিছুই পাবে না (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : যদি বলে, এর আয় পাবে আবদুল্লাহ ও গরীব-মিসকীন, তবে অর্ধেক আয় আবদুল্লাহকে এবং বাকি অর্ধেক গরীব-মিসকীনকে দেওয়া হবে (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা : যদি বলে, আমার জমি সাদাকা, ওয়াক্ফ, এতে আল্লাহ তা'আলা যে ফসল দেবেন তা আবদুল্লাহর এবং গরীব ও মিসকীনের, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ফসলের অর্ধেক পাবে আবদুল্লাহ এবং অর্ধেক গরীব-মিসকীন। এটাই হিলাল (র)-এর মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ আবদুল্লাহকে, এক ভাগ গরীবদেরকে এবং এক ভাগ মিসকীনদেরকে দেওয়া হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ফসল পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে। এক ভাগ পাবে আবদুল্লাহ, দুই ভাগ গরীবগণ এবং দুই ভাগ মিসকীনগণ। আল-জামিউস-সাগীর-এর ওসীয়াত অধ্যায়ে এর দৃষ্টান্ত আছে (আয-যাহীরিয়া)।

১১. মাসআলা : যদি বলে, এর ফসল পাবে আমার আত্মীয়গণ, আমার প্রতিবেশীগণ, আমার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম)গণ এবং মিসকীনগণ, তবে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও মাওলাবৃন্দের প্রত্যেককে মাথা পিছু এক ভাগ করে দেওয়া হবে আর সমস্ত মিসকীনকে দেওয়া হবে এক ভাগ (খাযানাতুল-মুফতীন)।

১২. মাসআলা : যদি বলে, এর ফসল দেওয়া হবে আমার আত্মীয়-স্বজন ও মিসকীনদেরকে, তবে আত্মীয়দের প্রত্যেককে এক ভাগ দেওয়া হবে (আল-হাবী)।

১৩. মাসআলা : যদি বলে, এর ফসল দেওয়া হবে গরীবদেরকে, ঋণগ্রস্তদেরকে, আল্লাহর পথের মুজাহিদদেরকে এবং দাসমুক্তিতে কাজে, তবে এদের প্রত্যেক শ্রেণীকেই দু'ভাগ করে দেওয়া হবে। এটা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এক ভাগ করে দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : যদি বলে, এ জমি সাদাকা ব্যয়ের যত খাত আছে, সে সব খাতে সাদাকা, ওয়াক্ফ, তবে সাদাকার খাত বলতে কুরআনে যাকাত বন্টনের আয়াতে বর্ণিত খাতগুলোই উদ্দেশ্য হবে। অবশ্য ওয়াক্ফের আয় ওয়াক্ফের দায়িত্ব নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ (العصاة مالون) এবং তোষণ-উদ্দিষ্ট অমুসলিমদের (المؤلفة قلوبهم) মধ্যে বন্টন করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে এ দুটো খাত রহিত (আয-যাহীরিয়া)।

১৫. মাসআলা : যদি বলে সাদাকা বিতরণের খাতসমূহ এবং সৎকর্মের অপরাপর খাতে ওয়াক্ফ, তবে গরীব-মিসকীনদেরকে এক ভাগ, দাসমুক্তিতে একভাগ, ঋণগ্রস্তদেরকে একভাগ, আল্লাহর পথের মুজাহিদদেরকে একভাগ, পাথিক মুসাফিরদেরকে একভাগ এবং অপরাপর পুণ্যের খাতে তিন ভাগ প্রদান করা হবে।

যদি বলে, গরীবদের জন্য ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথের মুজাহিদ ও হজ্জ যাত্রীদের জন্য ওয়াক্ফ এবং এদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে, এরপর দেখা যায় যে,

ফসল আরও বেশী হয়েছে, তবে বন্টনের যতগুলো খাত উল্লেখ করেছে সেই সংখ্যা হিসেবে বন্টন করা হবে (আল-হাবী)।

১৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির জন্য জমি ওয়াক্ফ করল এবং শর্তারোপ করল যে, তাকে প্রতি মাসে এই পরিমাণ দেওয়া হবে, যাতে তার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটে, কিন্তু সেই সময় তার পরিবার-পরিজন ছিল না, পরে তার পরিবার-পরিজন হল, এরূপ ক্ষেত্রে তার ও তার পরিবারের ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমাণ দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা : যদি কেউ এক দল লোকের জন্য ওয়াক্ফ করে, কিন্তু তাদের সকলেই তা প্রত্যাখ্যান করল, তাহলে ওয়াক্ফ জায়েয হয়ে যাবে এবং তার আয় গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যদি কেউ কেউ প্রত্যাখ্যান করে এবং সেই নামে ওয়াক্ফ করা হয়েছিল সেটা অবশিষ্টদের জন্য প্রযোজ্য হয়, তবে আয়ের সবটাই অবশিষ্টগণ পাবে। আর তাদের জন্য সে নাম প্রযোজ্য না হলে যারা গ্রহণ করেনি তাদের অংশ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এর ব্যাখ্য নিম্নরূপ,

যদি বলে, আবদুল্লাহর সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ, এরপর তাদের কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে আয়ের সবটাই বাকি সন্তানগণ পাবে। যদি বলে, যায়দ ও আম্রের জন্য ওয়াক্ফ, কিন্তু যায়দ তা গ্রহণ না করে, তবে তার অংশ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে (আল-হাবী)।

১৮. মাসআলা : যদি বলে, আমার জমি আবদুল্লাহর সন্তান ও তার বংশধরদের জন্য সাদাকা, ওয়াক্ফ, কিন্তু তাদের সকলেই তা প্রত্যাখ্যান করে, ফলে তার স্বল গরীবদের জন্য সাব্যস্ত হয়ে যাবে, এরপর সে জমিতে ফসল আসে এবং যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছিল তারা ওয়াক্ফ গ্রহণ করে নেয়, তবে ফসল তারাই পাবে (যাহীরিয়া)।

১৯. মাসআলা : যদি তার পরে আবদুল্লাহর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে ওয়াক্ফ কবুল করে নেয়, তবে ফসল তাকে দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা : যার জন্য ওয়াক্ফ ভোজা যদি এক বছর ভোগ করার পর প্রত্যাখ্যান করে তবে তার প্রত্যাখ্যান কার্যকর হবে না।

ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন, এ উত্তর সেই ফসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা সে গ্রহণ করেছে। কেননা গ্রহণ করার ফলে তাতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে তা প্রত্যাখ্যান করার কোন ইখতিয়ার তার থাকবে না। পক্ষান্তরে যে ফসল এর পরে উৎপন্ন হবে তাতে তার মালিকানা নেই, আছে কেবল অধিকার আর মালিকানা বিহীন কেবল অধিকার প্রত্যাখ্যান হতে পারে (আয-যাহীরা)।

২১. মাসআলা : ওয়াক্ফ যে ব্যক্তির জন্য করা হয়েছে এবং তার মৃত্যুর পর তার বংশধরগণ পাবে বলে স্থির করা হয়েছে সেই ব্যক্তি যদি বলে, আমি এটা আমার নিজের জন্য এবং আমার বংশধরের জন্য গ্রহণ করছি না, তবে তার নিজের ব্যাপারে সে প্রত্যাখ্যান জায়েয হবে, কিন্তু তার বংশধর ও সন্তানদের পক্ষে জায়েয হবে না, যদিও সে সন্তান নাবালক হয় (আল-হাবী)।

২২. মাসআলা : যদি বলে এক বছর গ্রহণ করব এবং তারপর আর গ্রহণ করব না, তবে তার কথা মতই কাজ হবে, সুতরাং কেবল সেই বছরের জন্য তার সম্মতি গ্রহণযোগ্য হবে। এমনভাবে যদি বলে, এক বছর গ্রহণ করব না এবং তারপর গ্রহণ করব, তবে তার সে কথাও গ্রহণযোগ্য (আয-যাখীরা)।

এমনভাবে যদি বলে, ফসলের অর্ধেক গ্রহণ করব এবং অর্ধেক গ্রহণ করব না।

২৩. মাসআলা : যদি বলে, যায়দ ও আবদুল্লাহর জন্য ওয়াক্ফ-যতদিন তারা জীবিত থাকবে, এরপর তাদের একজন যদি মারা যায়, তবে অপর অর্ধেক যথারীতি বহাল থাকবে। সে যে বলেছিল- 'যতদিন জীবিত থাকবে', এটি জীবিত ব্যক্তির অংশ বাতিল করবে না।

যদি বলে, আবদুল্লাহর জন্য ওয়াক্ফ এবং তার পরে যায়দের জন্য, কিন্তু আবদুল্লাহ ওয়াক্ফ গ্রহণে সম্মত হল না, তবে তা যায়দকে দেওয়া হবে। যদি আবদুল্লাহ বলে, গ্রহণ করলাম এবং যায়দ বলে, গ্রহণ করব না, তবে সে ওয়াক্ফ আবদুল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হবে, তার মৃত্যুর পর তা গরীবদের হয়ে যাবে (হাবী)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : দাবী ও সাক্ষ্য প্রসংগে

[এতে দুটি অনুচ্ছেদ আছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ : দাবী প্রসংগে

১. মাসআলা : জমি বিক্রি করার পর কেউ যদি বলে যে, আমি এটি ওয়াক্ফ করেছিলাম অথবা বলে যে, এটি আমার জন্য ওয়াক্ফ, কিন্তু তার সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই আর সে বিবাদীকে কসম করাতে চায়, তবে তার সে অধিকার নেই। কেননা কসম করানোর জন্য (বিবাদীর বিরুদ্ধে) বিত্ত দাবী থাকা অপরিহার্য। কিন্তু এখানে তা নেই। কারণ বাদীর কথা পরস্পর বিরোধী। (যাদরুন দাবী বিত্ত প্রমাণিত হয় না।

যদি সে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তা শোনা হবে। কেননা কথার মধ্যে বিরোধ থাকায় দাবী বাতিল হলেও সাক্ষ্য বাকী রয়ে গেছে। আর ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে দাবী ছাড়াও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য (আল-গিয়াহিয়া)।

২. মাসআলা : সাক্ষ্য গৃহীত হলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (আল-ওয়াকিআতুল-হুসামিয়া)।

৩. মাসআলা : আল-নাসাফী (র)-এর 'ফাতাওয়া'-এতে আছে, বলা হয়ে থাকে যে, ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে দাবী ছাড়াই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য- সাধারণভাবে এ জবাব সঠিক নয়। বরং সঠিক কথা হচ্ছে যে, সে সব ওয়াক্ফ আল্লাহর হুক, সে ক্ষেত্রে দাবী ছাড়াই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আর যে ওয়াক্ফ বান্দার হুক, সে ক্ষেত্রে দাবী ছাড়া সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (আয-যাখীরা)।

৪. মাসআলা : রাশীদুদ-দীন (র) উপযুক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম ফুদুলী (র) এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং এটাই সঠিক। আবুল-ফায়ল কিরমানী (র) এ রূপই ফাতওয়া দিয়েছেন (আল-ফুসুলুল-ইমাদিয়া)।

৫. মাসআলা : এরূপ ক্ষেত্রে মূল্য ফেরত পাওয়ার লক্ষ্যে ক্রেতার জমি আটকে রাখার অধিকার নেই (আত-তাতার খানিয়া-আত-তাজনীসের বরাতে)।

১. 'আয-যাখীরা' গ্রন্থের বরাতে নাসাফী (র)-এর ফাতাওয়া হতে যে মাসআলা উদ্ধৃত করা হল, 'আয-যাখীরা' গ্রন্থ দেখে বুঝা যায় তা ঠিক নয়। কেননা তাতে লেখা আছে, 'কোন লোক বলে, সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, কিন্তু আমরা তা গ্রহণ করি না, কারণ-বলা হয়ে থাকে যে..... সম্পাদক।

৬. মাসআলা : বিক্রেতা যদি দাবী করে যে, এ জমি অমুক মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ এবং এর পক্ষে সে দলীল প্রমাণ ও পেশ করে তবে তা গ্রহণ করা হবে এবং বিক্রি বাতিল করা হবে। আমরা এ মতই গ্রহণ করি। কেউ বলেন, বিক্রেতার দাবী গ্রহণ যোগ্য হবে না, যেহেতু তার কথার মধ্যে স্ববিরোধিতা আছে। তবে প্রথম মতই বিশুদ্ধতর (আল-ওয়াজীয)।

৭. মাসআলা : আমার জন্য ওয়াক্ফ —এরূপ যদি না বলে, তবে নাসাফী (র)-এর ভাষ্য মতে তার দাবী আদৌ শ্রবণযোগ্য হবে না (আল-খুলাসা)।

৮. মাসআলা : যদি অন্য কাউকে বলে, এ জমি তো তোমার জন্য ওয়াক্ফ এবং তারপর আবার নিজের জন্য দাবী করে, তবে তার দাবী শোনা হবে না (আয-যাখীর)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি দাবী করে যে, এটি পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আমার জমি, তারপর বলে যে, এটি পিতা আমার জন্য ওয়াক্ফ করেছে, তবে স্ববিরোধিতার কারণে তার দাবী গৃহীত হবে না। যদি ওয়াক্ফ বাড়ির মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব গ্রহণ করে অথবা কোন উত্তরাধিকার সম্পত্তির ওয়াসীর দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সে নিশ্চিত জানে যে, সে বাড়িটি উত্তরাধিকার বা ওয়াক্ফ সম্পত্তি, এরপর যদি দাবী করে যে, সেটি তার নিজের বাড়ি তবে সে দাবী গৃহীত হবে না। যদি প্রথমে ওয়াক্ফের দাবী করে এবং তারপর উত্তরাধিকার সম্পত্তি বলে দাবী করে তবে তাও গ্রহণ করা হবে না। অবশ্য উভয় দাবীর মধ্যে যদি সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হয়, তবে গ্রহণযোগ্য হবে, যেমন বলল, আমার পিতা ওয়াক্ফ করেছিল, কিন্তু ওয়াক্ফ চূড়ান্ত না হতেই তার মৃত্যু হয়ে গেছে। যদি হদপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রথমে নিজের জন্য দাবী করে এবং তারপর দাবী করে যে, সেটি ওয়াক্ফ সম্পত্তি, তবে সঠিক জবাব এই যে, দাবী যদি মুতাওয়াল্লীর পদের ভিত্তিতে হয়, তাহলে উভয় দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব। কেননা এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম যে, দেখাওনা ও মামলা-মুকদ্দমার ইখতিয়ার থাকার ভিত্তিতে সম্পত্তিকে নিজের বলে প্রকাশ করা হয়।

১০. মাসআলা : যদি দাবী করে বাড়িটির সে মালিক এবং তারপর দাবী করে যে, সেটি ওয়াক্ফ সম্পত্তি, অমুক ব্যক্তি অমুক মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করেছে, তবে ওয়াক্ফের দাবী শ্রবণযোগ্য হবে না (খাযানাতুল-মুফতীন); আল-ফুসুলুল-ইমাদিয়া)।

১১. মাসআলা : নাসাফী (র)-এর ফাতওয়া এত্রে আছে যে, জমির ক্রেতা তার বিক্রেতার বিরুদ্ধে দাবী করল যে, হে বিক্রেতা! এটা তো ওয়াক্ফ ভূমি। তুমি অন্যায়ভাবে এটা আমার কাছে বিক্রি করেছ, তো সে ক্রেতার কি মুকদ্দমা চালানোর ইখতিয়ার আছে? তিনি বলেন, যদি তার কোন মুতাওয়াল্লী না থাকে, তবে কাযী একজন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করবে। তারপর সেই মুতাওয়াল্লী মামলা পরিচালনা করবে এবং প্রমাণ করবে যে, সেটি ওয়াক্ফ সম্পত্তি। যখন তা প্রমাণ হয়ে যাবে, তখন বিক্রিও বাতিল সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তখন তার ক্রেতা বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চেয়ে নেবে (আল-মুহীত)।

১. হদপ্রাপ্ত ব্যক্তি গ্রহণ করা সেটি হবে কিনা, এ প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রসঙ্গটি এসেছে।

১২. মাসআলা : কোম্পানী ক্রেতার বিরুদ্ধে দাবী করল যে, এই বাড়িটি অমুক ব্যক্তির আওলাদের জন্য ওয়াক্ফ এবং সে তার ক্রেতার বিরুদ্ধে প্রমাণ করতে সক্ষম হন, তখন সে ক্রেতা বিক্রেতার থেকে মূল্য ফেরত চাইল। ক্রেতা বলল, হাঁ, অমুক ব্যক্তি এটা অমুকের আওলাদের জন্য ওয়াক্ফ করেছিল বটে, কিন্তু ওয়াক্ফদাতার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ বিষয়টা কাযীদালাতে উত্থাপন করে এবং সে ওয়াক্ফ বাতিল বলে ফায়সালা দেয়। আমিও ওয়াক্ফদাতার একজন ওয়ারিস। আমরা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ার করি। তাহলে বাড়িটি আমার ভাগে পড়ুকাজেই আমার বিক্রি সঠিক হয়েছে। এতে ওয়াক্ফের দাবী রদ হয়ে যাবে এবং বাড়িটির হাতেই থাকবে (আল-ফুসুলুল-ইমাদিয়া)।

১৩. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফের দাবী করে অথবা ওয়াক্ফ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু ওয়াক্ফ কে করেছে না বলে, তবে খাসসাফ (র) বর্ণনা অনুযায়ী তা সঠিক। তিনি আদাবুল কাযী এত্রে *قبض المصتر من ديوان القاضي الفرواني* অধ্যায়ে বলেন, ওয়াক্ফদাতাকে তা না বলা ওয়াক্ফের দাবী এবং সাক্ষ্য বৈধ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা : কেউ দাবী করে যে, এ জমি তার জন্মকালীন ওয়াক্ফ, তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এরূপ দাবী মুতাওয়াল্লীর পক্ষ হতেই গ্রহণযোগ্য। 'আল-ফাতাওয়া'-তে অবশ্য এ দাবীকে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তবে প্রথম মত উপরই ফাতওয়া (আল-খুলাসা)।

১৫. মাসআলা : রাশীদুল্লাহ (র) তাঁর ফাতওয়া এত্রে বলেছেন এক ব্যক্তি দাবী করল যে, এই ব্যক্তি তার জন্য ওয়াক্ফ, তো তার সে দাবীটা যদি অনুমতিক্রমে হয়ে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। অনুমতি ছাড়া হলে সে ব্যাপারে মত পাওয়া যায়। তবে সঠিক মত হচ্ছে যে, তা বৈধ। কেননা তার অধিকার কেবল বা আসে, অন্য কিছুতে নয়। কাজেই কিছুতে সে কবুলে পারে না। যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তারা যদি বহুজন হয় এবং তাদের কে একজন দাবী করে যে, এ জন্মকালীন ওয়াক্ফ, তবে অনুমতি ছাড়া হলে তা বৈধ নয়। এপারে মতভেদ নেই। উপরিউক্ত আরও বলা হয়েছে যে, ওয়াক্ফের আসে যারা অধিক, তারা ওয়াক্ফের দাবী করার জন্য। এ অধিকার কেবলই মুতাওয়াল্লীর (আল-ফুসুলুল-ইমাদিয়া)।

ওয়াক্ফ বিষয়ক কর্মকর্তার মামলার গুনানী গ্রহণ করায় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ বা বিবাদী শপথে অসম্মতির ভিত্তি ফায়সালা প্রদান করতে চাহলে এ কর্মকর্তা যদি সরকারের সুস্পষ্ট আদেশে কবুল বলে জানা যায় তাহলে তার ফায়সালা জায়েয। অন্যথায় জায়েয নয় (আল-ওয়াকিআতুল-হামিয়া)।

১৬. মাসআলা : একখণ্ড উপস্থিত এক ব্যক্তির হাতে এবং অপর এক খণ্ড জমি আছে অনুপস্থিত এক ব্যক্তির। এ অবস্থায় এক ব্যক্তি উপস্থিত ব্যক্তির কাছে দাবী করল

যে, দু'টো জমিই তার জন্য ওয়াক্ফকৃত, যা তার দাদা তার আওলাদ ও আওলাদের আওলাদের জন্য ওয়াক্ফ করেছিল। ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন, সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়াক্ফদাতা এ দু'টো জমিরই মালিক ছিল এবং একই সঙ্গে সে উভয়টি ওয়াক্ফ ওয়াক্ফ করেছে, তবে উভয় জমি সম্পর্কেই ওয়াক্ফের ফায়সালা দেওয়া হবে। আর যদি তারা ভিন্নভাবে দুই ওয়াক্ফের সাক্ষ্য দেয়, তবে উপস্থিত ব্যক্তির হাতে যে জমি আছে, কেবল সেটি সম্পর্কেই রায় দেবে যে, এটি ওয়াক্ফের জমি (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা : একখণ্ড জমি দুই ভাইয়ের মধ্যে ওয়াক্ফকৃত তাদের একজন মারা গেল। জমিটি জীবিত ব্যক্তি এবং মৃতের সন্তানদের হাতে থাকল। তারপর জীবিত ব্যক্তি ভাইয়ের কোন পুত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করল যে, এ জমি ওয়াক্ফ করা হয়েছে এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্মের জন্য। লোকটির অপরাপর ভাতিজা অনুপস্থিত রয়েছে। জমির ওয়াক্ফদাতা একজন এবং সে জমিটি একইবারে ওয়াক্ফ করেছে। এক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে। আর অনুপস্থিত ভাইদের পক্ষ হতে বিবাতী হিসেবে দাঁড়াবে।

যদি মৃত ব্যক্তির পুত্রগণ পেশ করে যে, এটা তোমার ও আমাদের জন্য সাধারণভাবেই ওয়াক্ফ করা হয়েছে, তবে প্রজন্মের পর প্রজন্মের জন্য ওয়াক্ফের দাবীদার যে, প্রমাণ পেশ করেছে সেটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে (আল-কিন্যা)।

১৮. মাসআলা : এক ব্যক্তির হাতে একটি আসুর বাগান আছে। অপর এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সেটি তার। বিবাদী বলল, এটা সে যথারীতি শর্তে ওয়াক্ফ করেছে। কিন্তু বাদীর কোন সাক্ষী-প্রমাণ নেই। তার ইচ্ছা বিবাদী কসম করুক। এখন তার কসম গ্রহণের উদ্দেশ্য যদি হয় কসম করতে না চাইলে আসুর বাগানকে হস্তগত করা, তবে তার কসম গ্রহণের ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি তার ইচ্ছা থাকে যে, বিবাদী কসম করতে না চাইলে সে বাগানটি মূল্য গ্রহণ করবে, তবে তার কসম করতে বলার ইখতিয়ার থাকবে (আল-মুয়মারাত)।

১৯. মাসআলা : একটি ঘরের উপরে আরেক তলা ঘর আছে এবং সে ঘর মসজিদের সারি নিচের ঘরের সারির সাথে মিলে যায়। শীত ও গ্রীষ্মে নিচের ঘরে সালাতও আদায় করা হয়। এ অবস্থায় মসজিদের লোক এবং ঘরে উপরের তলার বাসিন্দাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। বাসিন্দাগণ বলল, এটি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। এক্ষেত্রে তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা : এক ব্যক্তির হাতে একটি বাড়ি আছে। অপর একজন দাবী করল যে, ভিটামাটিসহ এর মালিক সে, কিন্তু বিবাদী তা অস্বীকার করল এবং বলল, এটা অমুক মসজিদের কাজে ওয়াক্ফ করা হয়েছে। বাদী তার দাবীর পক্ষে সাক্ষী-প্রমাণ হাযির করল এবং তার পক্ষে এর রায় দেওয়া হল এমনটি তার পক্ষে দলীলও লিখে দেওয়া হল। পরে আবার সেই বাদী স্বীকার করল যে, ঘরটি তার বটে, কিন্তু জমিটা ওয়াক্ফের এ অবস্থায় তার দাবী রায় এবং দলীল সবই বাতিল হয়ে যাবে। সমরকন্দবাসীর ফাতওয়া এরূপ বর্ণিত আছে (আয-যাখীরা)।

২১. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি বাড়ির দাবী করল এবং তার পক্ষে রায়ও দেওয়া হল। এরপর মুতাওয়াল্লী দাবী করল যে, এর ভিটা ওয়াক্ফকৃত এবং তার পক্ষে সে প্রমাণও পেশ করল। তো বাড়ির দাবীদার যদি ভিটে বাড়ির দাবী করে থাকে, তবে গ্রহণ করা হবে না। আর যদি ভিটেসহ বাড়ির দাবী না করে থাকে, তবে ভিটেটি ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হবে। যদি সে লোকটি বাড়ির দাবী করে এবং তা দখলও করে, তারপর মুতাওয়াল্লী ভিটের হকদার হয়ে যায়, তবে ঘরটি বাদীর মালিকানা থেকে যাবে (আল-ফুযুলুল-ইমাদিয়া)।

২২. মাসআলা : ওয়াক্ফী বাড়ির হকদার দুই ভাইয়ের একজন অনুপস্থিত। উপস্থিত ভাই নয় বছর আয় ভোগ করার পর মারা গেলো এবং মৃত্যুকালে একজনকে ওয়াসী বানিয়ে গেল। তারপর অপর ভাই দেশে ফিরে ওয়াসীর কাছে তার অংশ দাবী করল। এ ক্ষেত্রে ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন, ওয়াক্ফের আয় ভোগ করা উপস্থিত ভাই যদি মুতাওয়াল্লীও হয়ে থাকে অনুপস্থিত ভাইয়ের দাবী গ্রহণযোগ্য। যদি উপস্থিত ব্যক্তি মুতাওয়াল্লী না হয়ে থাকে, কিন্তু উভয় ভাই মিলে একত্রে সে বাড়ি ইজারা দিয়ে থাকে তখনও একই হুকুম। শুধু উপস্থিত ভাই ইজারাদাতা হলে আয়ের সবটাই আইনত সে পাবে, কিন্তু তার তা ভোগ করা উচিত নয়, বরং অনুপস্থিত ব্যক্তি অংশ সে সাদাকা করে দেওয়া উচিত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি দখলে একটি বাড়ির অর্ধেক আছে। অন্য একজন দাবী করল, সেই এ অর্ধেকের মালিক ছিল, পরে ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। তারপর গোটা বাড়ি ওয়াক্ফ করার পক্ষে প্রমাণ পেশ করল, তো তার সে প্রমাণ গৃহীত হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে বাদী সমগ্র বাড়ির ওয়াক্ফ সম্পর্কেই এর দাবী করেছিল, বাদী তার প্রমাণ পেশের লক্ষ্যে কেবল দখলকারীর হাতের অংশ। সুতরাং তার নিজের হাতের অংশেও একই অংশেও একই বর্তাবে (আল-মুয়মারাত)।

২৪. মাসআলা : কোন ব্যক্তি ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে নিজের মালিকানা দাবী করলে ভোক্তাদের বিরুদ্ধে তার দাবীতে কর্ণপাত করা হবে না। তার দাবী শ্রবণযোগ্য হবে কেবল মুতাওয়াল্লীর বিরুদ্ধে কিংবা খোদ ওয়াক্ফদাতার বিরুদ্ধে (আল-ফাতাওয়া-আল-আত্‌তাবিয়া)।

২৫. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি ওয়াক্ফের পক্ষে প্রমাণ হাযির করে, অপর দিকে বাদীও তার মালিকানার পক্ষে প্রমাণ হাযির করে সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে বাড়িটি কার দখলে আছে। মুতাওয়াল্লীর দখলে থাকলে তার প্রমাণ গৃহীত হবে না, বরং বাইরের ব্যক্তির প্রমাণ অনুসারেই রায় দেওয়া হবে। তার পরে যদি মুতাওয়াল্লীর ওয়াক্ফের পক্ষে প্রমাণ পেশ করে তাও শোনা হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে যে ব্যক্তির দখলে আছে, ওয়াক্ফের পক্ষে তার প্রমাণও গ্রহণযোগ্য। বাইরের ব্যক্তি স্বীয় মালিকানার পক্ষে যে প্রমাণ হাযির করবে তা গৃহীত হবে না। তবে ফাতওয়া হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী (আল-ফুযুলুল-ইমাদিয়া- ফাতাওয়া রাশীদুদ-দীনের বরাতে)।

২৬. মাসআলা : কোনও এক ব্যক্তি একটি বাড়িতে স্বীয় মালিকানা দাবী করল। বাড়িটি আছে মুতাওয়ালীর হাতে। তার বক্তব্য এ বাড়িটি যায়দ অমুক মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করেছে। কিন্তু কাযী বাদীর পক্ষেই রায় দিল। এরপর যদি অন্য কোন মুতাওয়ালী এসে একই বাদীর বিরুদ্ধে দাবী করে যে, এ বাড়িটি অমুক মসজিদের জন্য আমার পক্ষে হতে ওয়াক্ফ, তবে তার দাবী গৃহীত হবে। কাযী যদি কোনও লোককে আদেশ করে, সে যেন ওয়াক্ফের বাড়িটি মাসিক চুক্তিতে ভাড়া দেয়। তবে সেই সব লোক এসব মামলার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে না। এমনভাবে ওয়াক্ফ সম্পত্তি যে ব্যক্তি চাষ করে তার বিরুদ্ধেও দাবী দাওয়া চলবে না। এমনভাবে অন্য জমির চাষীর বিরুদ্ধে দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। ওয়াক্ফের বাড়ির কি অন্য কোন বাড়ির কোন চাষাবাদকারী থাকলে তার বিরুদ্ধে সে বাড়ির আয়-উৎপাদন সম্পর্কেও দাবী-দাওয়া গ্রহণ করা হবে না (খাযানাতুল-মুফতীন)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : সাক্ষ্য প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : দুজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক তার জমি ওয়াক্ফ করেছে, কিন্তু সাক্ষীদ্বয় বা তাদের একজন জমির সীমানা বর্ণনা করতে ব্যর্থ হয়, কিংবা বলে যে, ওয়াক্ফকারী আমাদের সামনে তার সীমানা বর্ণনা করে নি, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। খাসসাফ (র) বলেন, তবে জমিটা যদি এতই প্রসিদ্ধ হয় যে, তার সীমানা বর্ণনার প্রয়োজনই পড়ে না, তা হলে সীমানা বর্ণনা ছাড়াও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, সেটি ওয়াক্ফ-সম্পত্তি। দুই সাক্ষী দুই দিকের সীমানা বর্ণনা করলে আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে যে, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। তারা যদি তিন দিকের সীমানা বর্ণনা করে তবে আমাদের তিন ইমামেরও মতে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : সাক্ষী দুজন যদি তিন দিকের সীমানা বর্ণনা করে এবং বলে যে, ওয়াক্ফদাতা আমাদের কাছে এই তিনটি সীমানাই স্বীকার করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-হাবী)।

৩. মাসআলা : উপরোক্ত মাসআলায় চতুর্থ সীমানা কিভাবে স্থির করা হবে? এ সম্পর্কে খাসসাফ (র) বলে তৃতীয় সীমানা হতে এভাবে সীমানা টানবে যাতে প্রথম সীমানার প্রথম কোণে গিয়ে মিলিত হয় (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : সাক্ষীগণ যদি বলে, সে তার অমুক স্থানের জমি ওয়াক্ফ করেছে এবং আমাদের কাছে তার সীমানাও বর্ণনা করেছে, কিন্তু আমরা তা ভুলে গিয়েছি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আয-যাখীরা)।

৫. মাসআলা : দুজন সাক্ষী যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার জমি ওয়াক্ফ করেছে, কিন্তু আমাদের কাছে তার সীমানা বর্ণনা করেনি, বাকি আমরা তার সীমানা জানি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে কি? হিলাল (র) বলেন, কাযী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। কাযী ইমাম আবু যায়দ শার্কতী (র) বলেন, এর ব্যাখ্যা এই যে, তারা কাযীর কাছে তা বর্ণনা

করেনি। পক্ষান্তরে তারা যদি কাযীর কাছে তা বর্ণনা করে এবং জমির পরিচয় দিতে সক্ষম হয়, তবে কাযী সে সাক্ষ্য গ্রহণ করবে। খাসসাফ (র) বলেন, আমি সে সাক্ষ্য কার্যকর করব এবং সীমানাসহ সে জমি ওয়াক্ফ-সম্পত্তি হওয়ার রায় দেব। আর সাক্ষীদেরকে বলব, তোমরা সীমানা উল্লেখ কর। সুতরাং তারা যে সীমানা বলবে, সে অনুযায়ী ফায়সালা দেব (আয-যাখীরিয়া, আল-মুহীত : আয-যাখীরা)।

৬. মাসআলা : হিলাল (র) বলেন, এমনভাবে তারা যদি বলে, এ শহরে তার এ ছাড়া আর কোন জমি ছিল না, তবুও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : দুজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার জমি ওয়াক্ফ করেছে, কিন্তু আমাদের কাছে তার সীমানা বর্ণনা করেনি, কিন্তু আমরা তার জমি চিনি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা হতে পারে তারা যে জমি চেনে ওয়াক্ফ দাতার তা ছাড়া আরও জমি আছে। এমনভাবে তারা যদি বলে, আমরা তার আর কোন জমি আছে বলে জানি না, তবুও তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেননা হতে পারে তার আরও জমি আছে কিন্তু তারা তা জানে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা : তারা দুজন যদি বলে, সে আমাদেরকে এই মর্মে সাক্ষী রেখেছে যে, সে এখন যেই জমিতে বাস করছে, সেটা ওয়াক্ফ করে দিয়েছে, কিন্তু যে এর সীমানা বর্ণনা করেনি, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (আল-ওয়াজীয)।

৯. মাসআলা : ইমাম (র) বলেন, এর ব্যাখ্যা এই যে, তারা যদি কাযীর কাছে তা বর্ণনা করে এবং তার পরিচয় দিয়ে দেয় তবে গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি তা বর্ণনা না করে তা হলে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আয-যাখীরা)।

১০. মাসআলা : সাক্ষীগণ যদি বলে, ওয়াক্ফকারী আমাদের কাছে জমির সীমানা বর্ণনা করেছিল, কিন্তু আমরা তার বর্ণিত সীমানা মনে করতে পারছি না, তা হলে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়াক্ফকারী তার জমি ওয়াক্ফ করেছে এবং জমির সীমানাও বর্ণনা করেছে, কিন্তু আমরা জানি না সেই জমি কোথায়, তবে তাদের সাক্ষ্য জায়েয হবে। এক্ষেত্রে বাদীকে আদেশ করা হবে, সে যেন সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থিত করে যে, সে যে জমি সম্পর্কে দাবী করছে, এটাই সেই জমি (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা : এমনভাবে তারা যদি বলে, সে আমাদেরকে জমির সীমানা ঘুরিয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে তা নির্দিষ্ট করে বলেনি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে। তারা যদি সীমানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং বলে, সে জমি সীমানা চিনি না, তবে সাক্ষ্য গৃহীত হবে। সে ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের বাদীকে বলা হবে, সে যেন এমন সাক্ষী উপস্থিত করে, যারা সেই সীমানা চেনে (আল-হাবী)।

১৩. মাসআলা : দুজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি তাদের কাছে স্বীকার করেছে, অমুক স্থানে অবস্থিত জমিতে তার যে অংশ আছে, যার সীমানা হচ্ছে এই এই এবং

যা সর্বমোট জমির এক-তৃতীয়াংশ, যে জমিটি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে অমুক জমি ওয়াক্ফ এবং সবশেষে তা হবে গরীব-মিসকীনের তারপর সরকারী কর্তৃপক্ষ খোঁজ-খবর নিয়ে দেখে যে, সে জমিতে তার অংশ এক-তৃতীয়াংশের বেশী, তবে সে আল-খাস্‌সাফ (র)-এর বর্ণনামতে তার সমুদয় অংশই তার বর্ণিত খাতে ওয়াক্ফ করা হবে (আয-যাহীরিয়া)।

১৪. মাসআলা : ওয়াক্ফকারী যদি সে ওয়াক্ফের আয় সুনির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য করে, এবং তাদের পর তা গরীব-মিসকীনের হক সাব্যস্ত করে যাদের জন্য ওয়াক্ফ হয়েছে তারাও তা প্রত্যয়ন করে এবং বলে, সে তো আমাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ ওয়াক্ফের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল, তবে সে ক্ষেত্রে খাস্‌সাফ (র) বলেন, তাদের প্রত্যয়ন না করা সমান কথা। সে জমিতে তার যতটুকু হক সবটাকেই ওয়াক্ফ বলে রায় দেওয়া হবে অবশ্য সুনির্দিষ্টভাবে যাদের নাম বলেছিল তাদেরকে এক-তৃতীয়াংশের আয় দেওয়া হবে এক-তৃতীয়াংশ হতে অর্ধেক পর্যন্ত জমিতে ফসলের যে পার্থক্য হয় সেই পরিমাণটা গরীব-মিসকীনের দেওয়া হবে (আয-যাহীরিয়া)।

১৫. মাসআলা : সাক্ষিগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে এই বাড়িতে তার প্রাপ্য অংশ ওয়াক্ফ করেছে অথবা এই বাড়িতে সে তার পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে যতটুকু পেয়েছে তা ওয়াক্ফ করেছে, কিন্তু তারা জানে না সে পরিমাণটা কি, তবে কিয়াস অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য জ্ঞান, কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী জায়েয (আল-হারী)।

১৬. মাসআলা : তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়াক্ফদাতা তাদের কাছে ওয়াক্ফের স্বীকার করেছে, কিন্তু তারা জানে না বা বাড়িতে তার অংশ কতটুকু, তবে কাযী ওয়াক্ফদাতা থেকে তার অংশের পরিমাণ জেনে নেবেন এবং তার কথিত পরিমাণকেই ওয়াক্ফ হিসেবে ফায়সালা দেওয়া হবে। ওয়াক্ফকারী মৃত হলে এ ব্যাপারে তার ওয়ারিসগণ স্থলাভিষিক্ত হবে। সুতরাং তাদের কথিত পরিমাণই ওয়াক্ফরূপে সাব্যস্ত হয়ে যাবে, ও কাযীর কাছে তার বিপরীত কিছু পরিমাণ প্রমাণিত হলে সে প্রমাণিত পরিমাণ সম্পর্কেই দেবে (আল-ফুসুনুল-ইমাদিয়া)।

১৭. মাসআলা : দুজন সাক্ষী যদি কারও সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, যে তার জমি ওয়াক্ফ করেছে, কিন্তু তাদের দু'জনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক জায়গার জমি ওয়াক্ফ করেছে এবং অন্যজন বলে, না, বরং অমুক স্থানের জমি ওয়াক্ফ করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। তাদের একজন যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে ওয়াক্ফ স্থানের জমি ওয়াক্ফ করেছে এবং সেই সংগে আরও একটি জমি, তবে যে জমির ব্যাপারে তারা একমত হবে সে ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। তাদের একজন যদি সাক্ষ্য দেয় যে এই জমির সবটাই ওয়াক্ফ করেছে এবং অন্যজন বলে যে, সে এর অর্ধেক ওয়াক্ফ করেছে, তবে অর্ধেকের ব্যাপারে সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং রায় দেওয়া হবে যে, সেই অর্ধেক ওয়াক্ফ-ভূমি। হিলাল ও খাস্‌সাফ (র) এরূপ উল্লেখ করেছেন। যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে এর আয়ের এক-তৃতীয়াংশ তার জন্য বরাদ্দ করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে

জন্য অর্ধেক আয় বরাদ্দ করেছে, তবে তাদের মতে এক-তৃতীয়াংশের ব্যাপারে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা : যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে এ জমির অবিভাজিত অর্ধেক অংশ ওয়াক্ফ করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে ওয়াক্ফ করেছে বিভাজিত ও পৃথকভাবে অর্ধেক, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাহীরিয়া)।

১৯. মাসআলা : যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, যে ওয়াক্ফ করেছে জুম'আর দিন এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়াক্ফ করেছে বৃহস্পতিবার অথবা একজন বলল, ওয়াক্ফ করেছে কুফায় বসে এবং অন্যজন বলল, ওয়াক্ফ করেছে বসরায় বসে, তবে তাদের সাক্ষ্য জায়েয হবে (আল-হারী)।

২০. মাসআলা : যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার জমি ওয়াক্ফ করেছে তার মৃত্যুর পর থেকে এবং অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে ওয়াক্ফ করেছে বিগত ও আবশ্যিকরূপে, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে সুস্থ অবস্থায় ওয়াক্ফ করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়াক্ফ করেছে অসুস্থ অবস্থায় তবে তাদের সাক্ষ্য জায়েয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা : যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার জমি গরীবদের জন্য সাদাকা, ওয়াক্ফ করেছে এবং অন্যজন সাক্ষ্য দেয় যে, মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

২২. মাসআলা : সারকথা সাদাকা, ওয়াক্ফ হওয়ার ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য যদি এক হয় এবং তাদের কোন একজন অতিরিক্ত কিছু উল্লেখ করে, তবে সেই অতিরিক্তটুকু গৃহীত হবে না, তারা যে বিষয়ে একমত তা প্রমাণিত হবে আর তা হচ্ছে গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করার বিষয়টা। এ সূত্র থেকেই আমরা বলি যে, একজন সাক্ষ্য দেবে যে, এই জমি আবদুল্লাহর জন্য সাদাকা ওয়াক্ফ এবং অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, এটা যায়দের জন্য সাদাকা, ওয়াক্ফ করেছে তবে তা ওয়াক্ফ হবে গরীবদের জন্য (আয-যাহীরিয়া)।

২৩. মাসআলা : যদি তাদের একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে এ জমি ওয়াক্ফ করেছে আবদুল্লাহর জন্য এবং তার পরে তার সন্তানদের জন্য আর অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে এটা ওয়াক্ফ করেছে আবদুল্লাহর জন্য, তবে তা আবদুল্লাহর জন্যই ওয়াক্ফ ধরা হবে (আয-যাহীরিয়া)।

২৪. মাসআলা : আল-খাস্‌সাফ (র) তাঁর 'ওয়াক্ফ' গ্রন্থে বলেন, যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়াক্ফদাতা এ জমি ওয়াক্ফ করেছে আবদুল্লাহর ও যায়দের জন্য এবং অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে ওয়াক্ফ করেছে কেবল আবদুল্লাহর জন্য, তবে আমরা রায় দেব যে, অর্ধেক পাবে আবদুল্লাহ এবং বাকী অর্ধেক গরীবগণ। আমাদের মাশাইখ বলেন, আবদুল্লাহর পক্ষে অর্ধেক প্রাপ্তির এই রায় সকল ইমামেরই রায় হওয়ার কথা (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা : যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়াক্ফদাতা এ জমি পুণ্যের কাজে, তবে সাক্ষ্য জায়েয হবে এবং জমির ফসল গরীবদেরকে দেওয়া (আল-হাবী)।

২৬. মাসআলা : আল, খাস্‌সাফ (র) তাঁর 'ওয়াক্ফ' গ্রন্থে বলেন, যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়াক্ফদাতা এ জমি ফকীর ও মিসকীনদের জন্য সাদাকা, ওয়াক্ফ করেছে এবং সাক্ষ্য দেয় যে, সে ওয়াক্ফ গরীব-মিসকীনদের জন্য এবং অন্যান্য পুণ্যকর্মে, তবে সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

তিনি আরও বলেন, যদি একজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার জমি গরীব-মিসকীনদের ওয়াক্ফ করেছে এবং অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে ওয়াক্ফ করেছে গরীব-মিসকীন ও গরীব আত্মীয়দের জন্য, তবে এটা 'পুণ্যকর্মে' বলার মত নয়। কেননা যে ব্যক্তি আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফের সাক্ষ্য দিয়েছে, সে সমস্ত ফসল গরীব-মিসকীনদের জন্য সাক্ষ্য দেয়নি (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা : যদি দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়াক্ফদাতা ওয়াক্ফ করেছে জন্ম বা তাদের একজনের জন্য বা তাদের সন্তানদের জন্য বা তাদের নারীদের জন্য বা পিতামাতার জন্য বা তার নিজ আত্মীয়দের জন্য এবং এরা দুজনও তার আত্মীয় বটে, আব্বাস (রা)-এর বংশধরদের জন্য এবং এরা দুজনও তাঁর বংশধর কিংবা তার মাংস জন্ম এবং এরা দুজনও তার মাওলা, তবে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। যদি তারা দেয় যে, ওয়াক্ফদাতা এ জমি তাদের জন্য এবং তাদের সংগে অপর কিছু লোকে ওয়াক্ফ করেছে, তবে তাদের সাক্ষ্য সকলের ক্ষেত্রেই বাতিল গণ্য হবে। সেই সাক্ষ্য বলে, সে এর আয়ের যে অংশ আমাদের জন্য বরাদ্দ করেছে আমরা তা নেব না, তবে অপর পক্ষে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে এবং তাদের জন্য বরাদ্দ অংশ তাদেরকে প্রদান করা হবে। সাক্ষীদের অংশ দেওয়া হবে গরীবদেরকে (আল-হাবী)।

২৮. মাসআলা : সাক্ষীগণ যদি ওয়াক্ফদাতার আত্মীয়দের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং দুজনও তার আত্মীয় বটে, কিন্তু তারা বলে যে, আমরা তা গ্রহণ করিনি, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, যদিও তাদের সন্তান-সন্ততি না থাকে (আয-যাখীরা)।

২৯. মাসআলা : ওয়াক্ফ-সম্পত্তি নিয়ে যদি মামলা হয় এবং দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, এ জমি ওয়াক্ফদাতার গরীব প্রতিবেশীদের জন্য সাদাকা, ওয়াক্ফ, আর তারা তার গরীব প্রতিবেশীও বটে, তবে তাদের সাক্ষ্য জায়েয। দুজন সাক্ষী যদি একত্রে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, এ জমি ওয়াক্ফদাতা তার গরীব আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করেছে আর তারা দুজন তার গরীব আত্মীয়ও বটে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা : দুজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়াক্ফদাতা এ জমি তার গরীব আত্মীয়দের জন্য ওয়াক্ফ করেছে আর তারা দুজন তার আত্মীয় বটে, তবে সাক্ষ্যদান কালে তারা ধনবান, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা পরে তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তো এতে তাদের অংশ থাকবে (আল-হাবী)।

৩১. মাসআলা : সাক্ষীগণ যদি সাক্ষ্য দেয় যে, ওয়াক্ফদাতা তার মসজিদের গরীব লোকদের জন্য ওয়াক্ফ করেছে আর তারা দুজন তার মসজিদের গরীবদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে মাদ্রাসার লোকে যদি সাক্ষ্য দেয় যে, এ জমি মাদ্রাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত, তবে তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে।

৩২. মাসআলা : কেউ যদি মসজিদের জন্য বা মসজিদবাসীর জন্য কুর্রাসা (বই-পুস্তক, ছোট বই, বইয়ের অংশ) ওয়াক্ফ করে, যাতে লোকে কুরআন পড়তে পারে এবং সে মসজিদের লোক কুর্রাসার ওয়াক্ফ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তবে এর বিধান ঠিক এই রকমের, যেন কোন মাদ্রাসার লোক মাদ্রাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত জমি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল বা কোন মহল্লাবাসী সেই মহল্লার জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল।

৩৩. মাসআলা : মাশায়খে কিরাম উপযুক্ত জবাবটি এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, মাদ্রাসার লোকদের সাক্ষ্য সম্পর্কে কথা হচ্ছে যে, তারা যদি সে ওয়াক্ফ হতে ভাতা গ্রহণ করে থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে না, আর ভাতা গ্রহণ না করলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। মহল্লাবাসীদের ক্ষেত্রেও তারা একই কথা বলেছেন। এমনিভাবে মজবের ওয়াক্ফ সম্পত্তি সম্পর্কে যদি সাক্ষ্য দেওয়া হয় আর সাক্ষীর শিশু সে মজবে থাকে তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। কেউ কেউ বলেন, এ সকল ক্ষেত্রেই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য এবং সেটাই সঠিক (আল-ফুসূলুল-ইমাদিয়া)।

৩৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী করল যে, সে এই জমি মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ করেছিল, কিন্তু এখন সে তা অস্বীকার করছে। বাদী সাক্ষ্য-প্রমাণও উপস্থিত করল যে, ওয়াক্ফদাতা নিজে সে কথা স্বীকার করেছিল। এ অবস্থায় কাযী রায় দেবে যে, সে ব্যক্তি ঠিকই মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ করেছিল। তারপর তার দখল থেকে সে জমি মুক্ত করবে (আল-মুহীত)।

৩৫. মাসআলা : 'জামিউল-ফাতাওয়া'-গ্রন্থে আছে, পল্লীতে এক মজব ও মুআল্লিমের জন্য রীতি সম্মতভাবে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি আছে। এক ব্যক্তি সে সম্পত্তি জবর দখল করল। সে গ্রামের কয়েক ব্যক্তি, যাদের কোন সন্তান সে মজবে নেই, সাক্ষ্য দিল যে, এ সম্পত্তি অমুকের পুত্র অমুক এই এই ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ করেছিল। তাদের সে সাক্ষ্য গৃহীত হবে (আত-তাতার খানিয়া)।

৩৬. মাসআলা : দুজন সাক্ষী একটি জমি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, অমুক ব্যক্তি এ জমিকে মসজিদ বা কবরস্থান বা মুসাফিরখানা বানিয়েছিল। পরে তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিল।

এক্ষেত্রে তারা যে জমি সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিল তা যথারীতি ওয়াক্ফ-সম্পত্তিই থেকে যাবে। বাকি জমিটি যার ছিল সাক্ষিগণ জরিমানা স্বরূপ, কাযীর ফায়সালার দিন জমির যে মূল্য ছিল সেই মূল্য তাকে পরিশোধ করবে। এমনভাবে তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি এ জমি ওয়াক্ফ করেছিল মিসকীনদের জন্য বা অমুক ব্যক্তির জন্য এবং তারপর মিসকীনদের জন্য। তারপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, সে ক্ষেত্রেও তাদেরকে জরিমানা দিতে হবে (আল-হাবী)।

৩৭. মাসআলা : কেবল খ্যাতির উপর ভিত্তি করে ওয়াক্ফ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে তা বৈধ, কিন্তু ওয়াক্ফদের শর্তাবলী সম্পর্কে বৈধ নয় আর এরই উপর ফাতওয়া (আস-সিরাজিয়া)।

৩৮. মাসআলা : শায়খ, ইমাম জাহীরুদ-দীন আল-মারগীনানী (র) বলতেন, কোন খাতে ওয়াক্ফ করা হয়েছে সাক্ষিগণকে তাও বলতে হবে, যেমন এটা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ বা কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ বা এ জাতীয় কিছু। কাজেই সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্যে এরূপ কিছু না বললে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। মাশায়েখে কিরাম যে বলেছেন, ওয়াক্ফের শর্তাবলী সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়'-এর অর্থ তারা ওয়াক্ফের খাত বর্ণনা করার পর এবং একথা বলার পর যে, এটা এই এই খাতে ওয়াক্ফ, যদি শর্তাবলী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, যেমন বলল, এর আয় প্রথমে এই খাতে এবং তারপর এই খাতে ব্যয় করার শর্ত রয়েছে, তা হলে সে সাক্ষ্য ন্যায় সংগত নয় এবং এরূপ বললে তাদের সাক্ষ্যই গৃহীত হবে না (আয-যাখীরা)।

৩৯. মাসআলা : ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এমনভাবে পুরুষের সংগে নারীর সাক্ষ্যও (আয-যাহীরিয়া)।

৪০. মাসআলা : এমনভাবে শুনে শুনে সাক্ষ্য প্রদানও জায়েয। সাক্ষিগণ যদি শুনে শুনে সাক্ষ্য দেয় এবং বলে, আমরা শুনে শুনে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তাদের সাক্ষ্য গৃহীত হবে, যদিও সে কথা তারা স্পষ্ট করেই বলে। কেননা অনেক সময় এমনও হয় যে, সাক্ষীর বয়স মাত্র বিশ বছর, অথচ ওয়াক্ফ করা হয়েছে একশ' বছর আগে। এক্ষেত্রে কাযী নিশ্চিত হয়ে যায় যে, সাক্ষী সাক্ষ্য দিচ্ছে শুনে শুনে, চাক্ষুস দেখে নয়। কাজেই সাক্ষী সে কথা স্পষ্ট বলুক আর নাই বলুক তাতে কোন প্রভেদ নেই। জাহীরুদ-দীন আল-মারগীনানী (র) এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করেছেন। তিনি এক জায়গায় বলেন, 'এটা সেই বিষয়ের মত নয়, যেখানে লোক মুখে শুনে আসার ভিত্তিতে সাক্ষ্য প্রদান জায়েয। সাক্ষিগণ যদি স্পষ্ট করে বলে যে, তারা শুনে শুনে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-ফুসূলুল-ইমাদিয়া)।

৪১. মাসআলা : 'আন-নাওয়াযিল'-এর আদে, আবু বকর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তি যদি কোন জালিম জবর-দখল করে এবং তা যে ওয়াক্ফ সম্পত্তি, সে কথা সে অস্বীকার করে, তবে কি এলাকাবাসীর এ সাক্ষ্য প্রদান কর্তব্য হয়ে যাবে যে, সেটা গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ওয়াক্ফদাতার কাছে তা শুনেছে তার কর্তব্য সাক্ষ্য দেওয়া আর যে শোনে তার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া জায়েয নয় (আত-তাতার খানিয়া)।

৪২. মাসআলা : একখণ্ড জমি এক ব্যক্তির দখলে আছে আর সে দাবী করছে এটা তার জমি। অপর দিকে একদল লোক সাক্ষ্য প্রমাণ হাযির করেছে যে, অমুক ব্যক্তি এ জমি তাদের জন্য ওয়াক্ফ করেছে। তো এর দ্বারাই তারা সে জমির অধিকারী হয়ে যাবে না। কেননা অনেক সময় এমনও হয় যে, একজন লোক এমন জমি ওয়াক্ফ করেছে, যে জমির সে প্রকৃত মালিক নয়। এমনভাবে সাক্ষ্যগণ যদি সাক্ষ্য দেয়। সে ব্যক্তি তা ওয়াক্ফ করেছে এবং এ জমি তার দখলেই ছিল, তবুও তাতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। কেননা একটা জিনিস কারও হাতে আমানত স্বরূপও থাকতে পারে কিংবা তা হতে পারে জবরদখলও। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক ব্যক্তি এটা তাদের জন্য ওয়াক্ফ করেছে এবং ওয়াক্ফকালে সে এর মালিক ছিল তখন অবশ্য ওয়াক্ফের পক্ষেই রায় দেওয়া হবে। সে ক্ষেত্রে ওয়াক্ফদাতার ওয়ারিস বা তার ওয়াসীকে উপস্থিত করারও দরকার নেই (আল-হাবী)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরিশিষ্ট

১. মাসআলা : এক ব্যক্তি এক এলাকার কাযীর কাছে এসে বলল, আমি এখানকার প্রাক্তন কাযীর আমিন (তত্ত্বাবধায়ক) ছিলাম। আমার হাতে এক ব্যক্তির সাদাকার অর্থ আছে। সে অমুকের পুত্র অমুক। সে এ সম্পত্তি অমুক অমুকের জন্য ওয়াক্ফ করেছিল। এখন তার কথা কি গ্রহণযোগ্য? হাঁ, তার কথা গৃহীত হবে-যদি সেই ওয়াক্ফদাতার কোন ওয়ারিস না থাকে এবং এই ব্যক্তি যা স্বীকার করেছে এ সাদাকা সম্পর্কে তা ছাড়া অন্য কিছু জানা না থাকে। যদি তার কোন ওয়ারিস থাকে এবং তারা বলে, এটা আমাদের মিরাসী সম্পত্তি, ওয়াক্ফ নয়, তবে তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তাদের মধ্যে তা উত্তরাধিকার স্বরূপ বণ্টন করা হবে। ওয়ারিসগণ যদি বলে, এটা ওয়াক্ফ বটে, তবে ওয়াক্ফ করা হয়েছে আমাদের জন্য ও আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য আর তাদের কেউ যখন থাকবে না তখন মিসকীনদের জন্য। ওদিকে যার হাতে সে সম্পত্তি আছে, তার বক্তব্য হচ্ছে, এটা আমাদের জন্য নয়, বরং গরীব মিসকীনের জন্য ওয়াক্ফ, তখনও ওয়ারিসদের কথাই গ্রহণযোগ্য। যার হাতে সে সম্পত্তি আছে সে যদি বলে, এটা গরীব-মিসকীনের জন্য ওয়াক্ফ, এ কথা না বলে যে, অমুক ব্যক্তি এটা ওয়াক্ফ করেছে, অন্যদিকে একদল লোক বলে যে, এটা আমাদের জন্য ও আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ এবং এটা ওয়াক্ফ করেছে আমাদের পিতা, তখন কাযী ওয়াক্ফের পক্ষে রায় দেবে। ওয়ারিসগণ কী বলছে সে দিকে ভ্রক্ষেপ করবে না, 'আজনাসুন-নাতিফী'-তে এ মাসআলাগুলো আছে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : যে সব ওয়াক্ফ অতি প্রাচীন, যার ওয়ারিসও মারা গেছে এবং এ সম্পর্কে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদেরও ইত্তিকাল হয়েছে, সে সম্পর্কে কাযীগণের ফাইলে যদি লেখাজোখা থাকে, যে লেখা অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে, তবে সে সম্পত্তি নিয়ে ভোক্তাদের মধ্যে বিরোধ থাকলে ফাইলের লেখা অনুযায়ী তার নিষ্পত্তি করা হবে। যদি সে ফাইলে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি সম্পর্কে এমন কিছু লেখা না থাকে, যার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে

সে সম্পত্তিকে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি সাব্যস্ত করা হবে। যদি কেউ তাতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তবে তার পক্ষে রায় দেওয়া হবে। এসবই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন ওয়াক্ফদাতার কোন ওয়ারিস জীবিত না থাকবে। যদি তার ওয়ারিস জীবিত থাকে এবং সে সম্পত্তি নিয়ে লোকের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তবে উভয় অবস্থায়ই ওয়ারিসদের শরণাপন্ন হতে হবে। তারা কোন কিছু স্বীকার করলে তাদের সে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে। যদি তাদের স্বীকারোক্তি ভিত্তিতে ফায়সালা গ্রহণ কঠিন হয়, তবে ফাইলের লেখা দেখতে হবে। যদি তাতে কিছু না পাওয়া যায় তবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি সাব্যস্ত করা হবে (আল-মুয়মারাত)।

৩. মাসআলা : উভয় পক্ষ আপোষের মাধ্যমে সম্পত্তির আয় গ্রহণ করতে চাইলে ইসতিহসান অনুযায়ী কাযী তাদের মধ্যে তা বন্টন করে দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা : যদি জমি কোন লোকের দখলে থাকে এবং তার বক্তব্য হচ্ছে যে, এ জমি অমুক ব্যক্তির ছিল, সে এটা এই এই খাতে ওয়াক্ফ করেছে, কিন্তু ওয়ারিসদের বক্তব্য হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি এটা আমাদের জন্য এবং আমাদের বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ করেছে আর আমাদের পর এটা মিসকীনদের জন্য বরাদ্দ করেছে। এক্ষেত্রে ওয়ারিসদের কথা যদি সেই ব্যক্তির কথার বিপরীত হয়ে থাকে, তবে কাযী ওয়ারিসদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সে জমি সম্পর্কে রায় দেবেন। এটা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন কাযী তার পূর্বের কাযীর ফাইলে ওয়াক্ফ বিষয়ে কোন বক্তব্য দেখতে না পান এবং সম্পত্তি যদি কোন আমীন (তত্ত্বাবধায়ক)-এর হাতে না থাকে, বরং কাযী কেবল দখলদারের পক্ষ হতে স্বীকারোক্তি পেয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি যদি আমীনের হাতে থাকে এবং প্রাক্তন কাযীর ফাইলে সে সম্পর্কে কিছু লেখা থাকে তা হলে কাযী ওয়ারিসদের দখলে নেই এমন সম্পত্তি সম্পর্কে ওয়ারিসদের কথা গ্রহণ করবে না (আয-যাখীরা)।

৫. মাসআলা : শায়খুল ইসলাম (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একটি সুপ্রসিদ্ধ ওয়াক্ফ-সম্পত্তির ব্যয়-খাত সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং ভোক্তাদের মধ্যে কী পরিমাণ বিতরণ করা হবে তাও সংশয়যুক্ত হয়ে পড়েছে, এ অবস্থায় কী করণীয়? তিনি বললেন, এক্ষেত্রে বিগত দিনে তাতে কী নীতি অবলম্বন করা হত তা লক্ষ্য করা হবে, অর্থাৎ মৃত্যুওয়াল্লিগণ তাতে কি রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করত? তারা কাদের মধ্যে আয় বিতরণ করত এবং কী পরিমাণ দিত। সুতরাং সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা নেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা : আল-ফুদুলী (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, 'ওয়াক্ফ' কর্মকর্তার হাতে একখণ্ড ওয়াক্ফ-সম্পত্তি আছে। সে সেই সম্পত্তির দলীলে লেখা পেল, এর অবশিষ্ট আয় জমিটি যে পথে অবস্থিত তার পার্শ্বের গরীব বাসিন্দা এবং অপরাপর গরীব মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে সে কর্মকর্তা ওয়াক্ফের অবশিষ্ট আয় সুনির্দিষ্টভাবে এমন গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে, যারা ওয়াক্ফের দিন সেই পথের পার্শ্ব বাস করত। তাদের

প্রত্যেককে এক এক ভাগ করে দেবে। এ ছাড়া অপরাপর গরীবদের সকলকে দেবে একভাগ। তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার অংশও বাদ যাবে এবং তা জীবিতদের মধ্যে উপযুক্ত নিয়মে বন্টন করবে। ওয়াক্ফ করার দিন সেই পথের যে সব গরীব জীবিত ছিল, যখন তাদের সকলের মৃত্যু হয়ে যাবে, তখন সেই পথের ধারের গরীবগণ ও অপরাপর গরীব মুসলিমগণ সে ওয়াক্ফে সমপর্যায়ের হয়ে যাবে (আল-যাখীরা)।

৭. মাসআলা : আল-খাসুসাফ (র)-এর 'ওয়াক্ফ' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি বলে যে, আমি আমার এই নামে সুপ্রসিদ্ধ জমিটা সাদাকা, ওয়াক্ফ করলাম। তারপর সে ওয়াক্ফের খাতও বর্ণনা করল এবং সবশেষে যে গরীব-মিসকীনগণ পাবে তাও স্থির করল, আর জমিটা এতই প্রসিদ্ধ যে তার সীমা বর্ণনা নিঃপ্রয়োজন। এই ওয়াক্ফ বৈধ। ওয়াক্ফদাতা যদি দাবী করে যে, তার জল-বৃক্ষহীন অংশটা এ ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা কি গ্রহণযোগ্য? খাসুসাফ (র) বলেন, সে জমির সীমানা যদি সুবিদিত হয় এবং এ অংশটিও সে সীমানার ভেতরে হয়, তবে তা ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনিভাবে সে জমি যদি তার প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা সজ্জন, তাদের কাছে সুপরিচিত হয় এবং উল্লিখিত অংশটি সে জমির সাথে সম্পৃক্ত ও তার নামেই পরিচিত হয়, তবুও তা ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর বিষয়টা যদি এরূপ না হয়, তখন ওয়াক্ফদাতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং উল্লিখিত খণ্ডটি ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ওয়াকফের দলীল প্রসংগে

১. মাসআলা : শায়খুল-ইসলাম (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একটি ওয়াকফের দলীলে লেখা ছিল অমুক ব্যক্তি এই সম্পত্তি তার মাওয়ালী (আযাদকৃত গোলামরা) এবং সুনির্দিষ্ট একটি মাদরাসার শিক্ষকদের জন্য ওয়াকফ করেছে। তাতে ওয়াকফ-সম্পত্তির পরিমাণ এবং ওয়াকফ সহীহ হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্তাবলীর কথাও লেখা ছিল। ওয়াকফদাতা এটাও স্থির করেছে যে, সবশেষে এটা পাবে গরীবরা। এ ওয়াকফ শুদ্ধ কি? তিনি জবাব দিলেন, শুদ্ধ নয় (আয-যাখীরা)।

২. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার একখণ্ড জমি ওয়াকফ করল এবং দলীলও লিখল। সেই সংগে সাক্ষী-প্রমাণও রাখল। তারপর ওয়াকফদাতা বলল, আমি এই শর্তে ওয়াকফ করেছিলাম যে, আমি তা বিক্রি করতে পারব। আমি জানতাম না লেখক দলীলে এ শর্তের কথা লিখেছে কিনা। তো এই ওয়াকফদাতা যদি দলীল যে ভাষায় লেখা হয়েছে সে ভাষায় পারদর্শী হয় এবং সম্মুখে দলীল পড়া হয়ে থাকে, তাতে লেখা থাকে যে, এটা বিশুদ্ধ ওয়াকফ এবং তাতে যা কিছু লেখা হয়েছে তা স্বীকার করে থাকে, তবে তার এখনকার এই কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে ওয়াকফদাতা যদি দলীলের ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ হয়, আর সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দেয় যে, দলীলের বিষয়বস্তু তাকে তার মাতৃভাষায় পড়ে শোনানো হয়েছিল এতে যা কিছু লেখা হয়েছে তা সে স্বীকার করেছিল, তখনও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা এরূপ সাক্ষ্য না দিলে অবশ্য তার কথা গ্রহণ করা হবে (আল-মুয়মারাত)।

৩. মাসআলা : উপরিউক্ত মাসআলা ওয়াকফের দলীলের মত সর্বপ্রকার দলীলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (আয-যাখীরিয়া)।

৪. মাসআলা : আবুল-লাইস (র)-এর 'ফাতাওয়া'-গ্রন্থে আছে, ফকীহ আবু জা'ফর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, জনৈক নারীকে তার প্রতিবেশীরা বলল, তুমি তোমার এই বাড়িটি এই শর্তে ওয়াকফ করে দাও যে, কখনও তোমার এটা বিক্রি করা প্রয়োজন হলে তুমি বিক্রি করতে পারবে; কিন্তু তারা যে দলীল লিখল তাতে এ শর্তের কথা উল্লেখ করল না, অথচ তারা বলল, আমরা লিখেছি। স্ত্রীলোকটি সে সম্পর্কে সাক্ষী রাখল। এখন তার সে ওয়াকফের হুকুম কী? তিনি বললেন, যদি ফারসী ভাষায় স্ত্রীলোকটির সামনে দলীলটি পড়া হয় এবং সে তা শোনে, তারপর সে সম্পর্কে সাক্ষী রাখে তবে বাড়িটি ওয়াকফ হয়ে যাবে। আর যদি তার সামনে তা পড়া না হয় তবে বাড়িটি ওয়াকফ হবে না।

উল্লেখ্য মাসআলা দুটির যে জবাব দেওয়া হল, তা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী ঠিক হয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী সঠিক হয় না (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার একখণ্ড জমি ওয়াকফ করল এবং ওয়াকফের দলীল লিখতে বলল। লেখক দুই দিকের সীমানা ঠিকই লিখল, কিন্তু দুই দিকের সীমানা লিখল ভুল। যে দুই দিকের সীমানায় ভুল করেছে, সেদিকে যদি সে সীমানা থাকে, বাকি তার বর্ণিত সীমানা এবং

ওয়াকফের জমির মাঝখানে অন্য কারও জমি বা আংগুর বাগান কিংবা বাড়ি থাকে, তবে ওয়াকফ সহীহ হবে। আর যদি সে সীমানা দুটির কোন অস্তিত্বই সেখানে না থাকে তবে ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে। হাঁ, সে জমিটা যদি এতই প্রসিদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট হয় যে, তার সীমানা বর্ণনার কোন প্রয়োজনই পড়ে না তখন অবশ্য ওয়াকফ জায়েয হবে (আল-ওয়াজীয)।

৬. মাসআলা : এক ব্যক্তির কোন এক পল্লীতে জমি আছে। সে ব্যক্তির ইচ্ছা সেখানকার সবটা জমি কিছু লোকের জন্য ওয়াকফ করবে। সেমতে সে একটি দলীল লিখতে বলল, কিন্তু লেখক সেখানকার কয়েক খণ্ড জমি ও আংগুর বাগানের উল্লেখ তাতে ভুলবশতঃ করল না। দলীলটি ওয়াকফদাতার সামনে পড়া হল। তাতে লেখা ছিল অমুকের পুত্র অমুক এই পল্লীতে অবস্থিত তার সমস্ত জমি অমুকের পুত্র অমুকের জন্য ওয়াকফ করেছে। জমিগুলো হচ্ছে এই এই। তার সীমানাও তাতে বর্ণিত আছে। লেখক যে ক'টি জমির কথা ভুলে গিয়েছিল সেগুলো পড়া হল না। ওয়াকফদাতা সে সব স্বীকার করে নিল। এখন সেই ভুলে যাওয়া জমিগুলোর হুকুম কী? আবু নাসর (র) বলেন, ওয়াকফ যদি তার সুস্থাবস্থায় হয়ে থাকে এবং ওয়াকফদাতা স্বীকার করে থাকে যে, সে সংশ্লিষ্ট পল্লীতে অবস্থিত সমস্ত জমি ওয়াকফ করেছে, যা দলীলে লেখা আছে তাও এবং যা লেখা হয়নি তাও তা হলে তার ইচ্ছামত সমস্ত জমিই ওয়াকফ সাব্যস্ত হবে। এমনিভাবে যদি ওয়াকফদাতার মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে এবং মৃত্যুর আগে সে বলে যায়, তবে তার কথা মতই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা : যদি মুতাওয়াল্লী ও ওয়াসী পদের জন্য দলীল লেখা হয়, কিন্তু কার পক্ষ হতে মুতাওয়াল্লী বা ওয়াসী নিযুক্ত হল সেকথা লেখা হল না, তবে দলীল শুদ্ধ হল না। যদি লেখা হয় যে, সে সরকারের পক্ষ হতে ওয়াসী বা সরকারের পক্ষ হতে মুতাওয়াল্লী, কিন্তু কোন কাযী তাকে ওয়াসী বা মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করল তা লেখা হল না, তবে তাতে অসুবিধা নেই। দলীল শুদ্ধ হবে (আল-ওয়াকিআতুল-হুসামিয়া, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা : সমরকান্দী ফকীহদের ফাতাওয়ায় আছে নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ওয়াকফ কৃত জমি মুতাওয়াল্লীর কাছ থেকে এক ব্যক্তি ইজারা নিল। ইজারার দলীলে লেখা হল, ওয়াকফকৃত সম্পত্তিতে নিযুক্ত মুতাওয়াল্লী অমুকের পুত্র অমুকের কাছ থেকে অমুকের পুত্র অমুক এই সম্পত্তি ইজারা নিয়েছে। দলীলে ওয়াকফদাতার পিতা ও দাদার নাম লেখা হল না এবং সে নাম পরিচিতও না, তবু সে দলীল শুদ্ধ আছে। কেননা ওয়াকফদাতার উল্লেখ ছাড়াই যদি কেবল এতটুকু লিখত যে, অমুকের পুত্র অমুক মুতাওয়াল্লীর কাছ থেকে ইজারা নিয়েছে আর এ জমিটা নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ওয়াকফকৃত, তবুও তা বৈধ হত। কাজেই এটার বৈধতা আরো পরিষ্কার (আয-যাখীরা)।

৯. মাসআলা : এক ব্যক্তির দখলে একখণ্ড জমি আছে। অপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল সেটি ওয়াকফ-ভূমি। সে একটি দলীলও হাযির করল, যাতে সাক্ষী ও কাযীদের লেখা আছে। যাদের কেউ বেঁচে নেই, লোকটি বর্তমান কাযীর কাছে যে দলীলের ভিত্তিতে রায় চাইল। তা কাযী রায় দেবে কি? না, সে দলীলের ভিত্তিতে কাযী রায় দিতে পারবে না (খুলাসা)।

১০. মাসআলা : এমনিভাবে কোন বাড়ির দরজায় যদি এমন কোন ফলক সাটা থাকে, যা বাড়িটির ওয়াকফ-সম্পত্তি হওয়ার ঘোষণা দেয়, তবে সাক্ষীদের সাক্ষ্য ব্যতিরেকে কেবল সে ফলকের ভিত্তিতে ফায়সালা দেওয়া যাবে না (আল-মুহীত)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : দখলদার যদি বলে, এটি ওয়াক্ফ-সম্পত্তি, তবে এটা ওয়াকফের স্বীকারোক্তি, ওয়াকফের সূত্রপাত নয়। কাজেই এজন্য ওয়াকফের শর্তাবলী বিদ্যমান থাকা জরুরী নয় (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : কেউ যদি তার হাতে থাকা জমি সম্পর্কে স্বীকার করে যে, সেটা ওয়াক্ফ-সম্পত্তি, কিন্তু ওয়াক্ফকারী এবং ওয়াকফের হাকদারের নাম উল্লেখ না করে, তবু তার স্বীকারোক্তি সही হবে এবং সে জমিটি গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হবে। স্বীকারকারী বা অন্য কাউকে ওয়াক্ফদাতা স্থির করা হবে না, যাবত না সাক্ষ্যগণ সাক্ষ্য দেয় যে, সে যখন স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে তখন সে এ জমির মালিক ছিল। এ সাক্ষ্য পাওয়া গেলে তখন স্বীকারোক্তি প্রদানকারীকে ওয়াক্ফদাতা স্থির করা হবে (মুহীত : আস-সারাখসী, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা : ইসতিহসান অনুযায়ী স্বীকারোক্তি প্রদানকারী সে জমির মুতাওয়াল্লী হবে। কাজেই সেই তার ফসল গরীবদের মধ্যে বন্টন করবে। তবে সে অন্য কাউকে সে সম্পর্কে ওয়াসী বানাতে পারবে না (আয-যাহীরী)।

৪. মাসআলা : স্বীকারকারী ছাড়া অন্য এক ব্যক্তি এসে দাবী করল যে, সে-ই ওয়াক্ফদাতা এবং এভাবে সে স্বীকারকারীর হাত থেকে জমি হস্তগত করতে চাইল। তখন স্বীকারকারী প্রমাণ পেশ করল যে, সে-ই ওয়াক্ফদাতা। এভাবে সে বাদীর দাবী রদ করল এবং নিজের জন্য এমন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করল, যার উপর পদচ্যুতি আরোপিত হতে পারে না- এটাই হচ্ছে স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর পক্ষে প্রমাণ গ্রহণের ব্যাখ্যা। এই স্বীকারকারী যদি স্বীকার করার পর আবার বলে যে, অমুক ব্যক্তিই এর ওয়াক্ফদাতা তবে তার সে কথা গৃহীত হবে না। যদি বলে, আমিই ওয়াক্ফকর্তা তবে তা গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা : কেউ যদি ওয়াক্ফ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রদান করে এবং ওয়াক্ফদাতার ও নাম বলে, কিন্তু কাদের জন্য ওয়াক্ফ তা না বলে, যেমন বলল, এই জমি আমার পিতার পক্ষ হতে সাদাকা, ওয়াক্ফ, আর তার পিতা মৃত, তবে তার পিতার যদি ঋণ থাকে তবে সে ঋণের দায়ে জমিটা বিক্রি করা হবে, যদি ওসীযত থাকে, তবে তার এক-তৃতীয়াংশে তা কার্যকর হবে। এর পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ হবে- যদি তার সংগে অন্য কোন ওয়ারিস না থাকে। অন্য কোন ওয়ারিস থাকলেও জায়েয (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৬. মাসআলা : তারপর দেখা হবে সে নিজের জন্য মুতাওয়াল্লী পদ দাবী করেছে কি না। দাবী না করলে সে মুতাওয়াল্লী হবে না। বাকী যাকে ইচ্ছা তার মুতাওয়াল্লী বানাতে পারবে। আর যদি মুতাওয়াল্লী পদের দাবী করে, তবে ইসতিহসান অনুযায়ী তা গৃহীত হবে এবং মনে করা হবে এটাই কল্যাণকর (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : যদি এক ওয়ারিস স্বীকার করে আর অন্য ওয়ারিস ওয়াকফের কথা অস্বীকার করে, তবে অস্বীকারকারীর প্রাপ্য অংশ তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। আর স্বীকারকারীর অংশ তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ওয়াক্ফ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা : যদি বলে, এ জমি আমার দাদার পক্ষ হতে ওয়াক্ফ, তখনও একই হুকুম প্রযোজ্য। যদি বলে, এ জমি আমার পিতার পক্ষ হতে সাদাকা, ওয়াক্ফ, তবে এটা তার পক্ষ হতে এ কথার স্বীকারোক্তি হয়ে যাবে না যে, তার পিতা এ জমির মালিক ছিল এবং ওয়াক্ফও জায়েয হবে না। তাতে তার পিতার ঋণ থাকুক বা ওসীযত থাকুক কিংবা তার সংগে অন্য কোন ওয়ারিস থাকুক কিংবা এর কোনটিই না থাকুক (আল-হাবী)।

৯. মাসআলা : তাকে বা অন্য কাউকে ওয়াক্ফদাতাও সাব্যস্ত করা যাবে না। হাঁ, ইসতিহসান অনুযায়ী সে মুতাওয়াল্লী হবে (মুহীত)।

১০. মাসআলা : যদি অপর কারও সংগে ওয়াক্ফকে সম্পৃক্ত করে, তবে দেখতে হবে কেমন লোকের সংগে সম্পৃক্ত করেছে। যদি খ্যাতনামা কোন লোকের কথা বলে থাকে এবং নির্দিষ্টভাবে তার নাম বলে আর সম্পর্কযুক্ত করে من অব্যয়ের সাথে (من فلان) অমুক ব্যক্তির পক্ষ হতে ওয়াক্ফ), তবে সেই ব্যক্তি জীবিত ও উপস্থিত থাকলে এ ব্যাপারে তাকেই জিজ্ঞেস করা হবে। কেননা (অব্যয়ের কারণে) সে তার মালিকানা স্বীকার করেছে এবং সাক্ষ্য দিয়েছে যে, সে ওয়াক্ফ করেছে। সে লোকটি তার সব কথা প্রত্যায়িত করলে উভয়ের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সব কিছুই প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি সে মালিকানার ব্যাপারে তার কথা সত্যায়ন করে এবং ওয়াকফের কথা প্রত্যাখ্যান করে তবে, উভয়ের স্বীকারোক্তির কারণে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু ওয়াক্ফ প্রতিষ্ঠিত হবে না, যেহেতু সাক্ষী মাত্র একজন। আর সে লোকটি মৃত হলে, উপরিউক্ত নিয়মে সত্যায়ন বা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তার ওয়ারিসদের কথা শোনা হবে। যদি তাদের কতিপয়ে তার সমস্ত কথা সত্য বলে স্বীকার করে এবং অপর কতিপয়ে ওয়াকফের বিষয়টা অস্বীকার করে, তবে স্বীকারকারীর অংশ ওয়াক্ফ প্রমাণিত হবে এবং অস্বীকারকারীর অংশে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। সে তাতে যা ইচ্ছা তাই করবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : তারা সকলেই যদি তার কথা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে সে মুতাওয়াল্লী সাব্যস্ত হবে। যদি কতিপয়ে স্বীকার করে এবং কতিপয়ে অস্বীকার করে, তবে কিয়াস অনুযায়ী সে মুতাওয়াল্লী হবে না। হিলাল (র) বলেন, আমরা কিয়াসকেই গ্রহণ করি। এমনভাবে তারা যদি ওয়াকফের ব্যাপারে তাকে সত্যায়ন করে এবং মুতাওয়াল্লী হওয়ার ব্যাপারে কেউ তার কথা প্রত্যাখ্যান করে, তবে কিয়াস অনুসারে সে মুতাওয়াল্লী হবে না (আয-যাহীরিয়া)।

১২. মাসআলা : (হিলাল (র) বলেন) তবে অস্বীকারকারীদের বিপরীতে দুজন সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সেই এর মুতাওয়ালী, তবে যে মুতাওয়ালী হবে। এ ক্ষেত্রে ওয়ারিসদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা : ব্যক্তির সাথে ওয়াকফের সম্বন্ধ যদি عن অব্যয় দ্বারা স্থাপন করা হয়, তবে এতে সেই ব্যক্তির পক্ষে মালিকানার স্বীকারোক্তি হবে না (খাযানাতুল-মুফতীন)।

১৪. মাসআলা : যদি সেই ব্যক্তির নাম সুনির্দিষ্টভাবে না বলে, যেমন বলল, এই জমি মুহাম্মাদের পক্ষ হতে সাদাকা, ওয়াক্ফ, তবে তা ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হবে (আয-যাহীরিয়া)।

১৫. মাসআলা : যদি পরে কোন ব্যক্তির নাম বলে, তবে পৃথকভাবে তার নাম বললে এবং من অব্যয় যোগে বললে সত্য মনে করা হবে না। যদি عن অব্যয়ের সাথে বলে তবে সত্য মনে করা হবে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা : যদি ওয়াক্ফদাতা এবং যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে উভয়ের নাম বলে, তবে ওয়াক্ফদাতা জীবিত থাকলে বিষয়টা তার কাছে জিজ্ঞেস করা হবে আর মারা গিয়ে থাকলে তার ওয়ারিসদের শরণাপন্ন হতে হবে। তারা যদি তাকে সত্যায়ন করে তবে সে ওয়াক্ফ ও তার শর্তাবলীর ব্যাপারে ফায়সালা হবে। পক্ষান্তরে অসত্যায়ন করলে ওয়াক্ফ ও তার শর্তাবলী কিছুই প্রতিষ্ঠিত হবে না (আল-হাবী আল-কুদসী)।

১৭. মাসআলা : কেউ ওয়াক্ফকারীর নামোল্লেখ ছাড়া এবং ওয়াক্ফভোগীর নামোল্লেখসহ যদি ওয়াক্ফ-এর যেমন বলল, এই জমি আমার জন্য এবং স্বীকারোক্তি করে, আমার সন্তান ও বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফকৃত, তবে তার স্বীকারোক্তি গৃহীত হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা : এ ক্ষেত্রে ইসতিহসান অনুযায়ী সেই স্বীকারকারীই মুতাওয়ালী হবে, কিয়াস অনুযায়ী নয়। অন্য কেউ এসে যদি দাবী করে, এ সম্পত্তি তার জন্য ওয়াক্ফ এবং স্বীকারোক্তি দাতাও তা তাসদীক করে তবে তার অংশের ব্যাপারে তার তাসদীক গৃহীত হবে, তার সন্তান ও বংশধরদের অংশের ক্ষেত্রে নয় (আল-হাবী)।

১৯. মাসআলা : কোনও এক ব্যক্তি তার দখলে থাকা জমির ব্যাপারে যদি স্বীকার করে যে, এটা নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য ওয়াক্ফ এবং সে তাদের নামও উল্লেখ করে কিন্তু পরে আবার বলে যে, ওয়াক্ফ তাদের জন্য নয়, বরং অন্যদের জন্য কিংবা তাদের সংগে যদি আরও কিছু লোককে যোগ করে বা তাদের থেকে কিছু লোক বিয়োগ করে তবে তার পরের কথায় ভ্রক্ষেপ করা হবে না, বরং প্রথম কথা অনুযায়ীই ফায়সালা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা : যদি স্বীকার করে যে, এটা ওয়াক্ফ-সম্পত্তি এবং কোন খাতে ওয়াক্ফ তাও উল্লেখ করে, তারপর সে আরও এক খাতের কথা বলে তবে কিয়াস ও ইসতিহসান অনুযায়ী তার পরের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমে যে খাতের কথা বলেছে তাতেই ওয়াক্ফের আয় খরচ হবে (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা : কেউ যদি তার দখলে থাকা একখণ্ড জমি সম্পর্কে স্বীকার করে যে, এটা ওয়াক্ফ-সম্পত্তি। এই বলে সে চুপ করে থাকে। তারপর আবার বলে যে, এটা অমুক অমুকের জন্য ওয়াক্ফ এবং সে সুনির্দিষ্ট কিছু লোকের নাম বলে, তবে কিয়াস অনুযায়ী তার পরের কথা গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা : যদি নির্দিষ্টভাবে কারও সম্পর্কে বলে যে, অমুকের জন্য ওয়াক্ফ, তারপর আলাদা বাক্যে আবার বলে যে, বিশেষভাবে অমুকের থেকেই বিতরণ শুরু হবে, তবে তার সে কথা গৃহীত হবে না। কিন্তু পূর্বের কথার সংগে মিলিয়ে সে কথা বললে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর নিকট গৃহীত হবে। ইমাম আবু ইয়ুযুফ (র)-এর মতে তাও গৃহীত হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২৩. মাসআলা : যদি কেউ নিজের দখলে থাকা জমি সম্পর্কে স্বীকার করে যে, অমুক কাযী তাকে এ জমির মুতাওয়ালী নিযুক্ত করেছে এবং এটা ওয়াক্ফ-সম্পত্তি, তবে মুতাওয়ালী পদ সম্পর্কে কিয়াস অনুসারে তার কথা গৃহীত হবে না। ইসতিহসান অনুসারে কাযী কিছুকাল অপেক্ষা করবে। এর ভেতর যদি সেই ব্যক্তির স্বীকৃত বিষয়ের বাইরে কিছু প্রকাশ না পায় তবে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ফায়সালা প্রদান করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৪. মাসআলা : যদি বলে, কাযী আমাকে এই জমির মুতাওয়ালী নিযুক্ত করেছিল। তারপর আমার পিতার ইত্তিকাল হয়ে গেছে এবং তিনি আমাকে এর ওয়াসী নিযুক্ত করেছেন আর এটা অমুক অমুক খাতে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি, তবে তার কথা গৃহীত হবে না। এমনিভাবে যদি বলে, এ জমি আমার পিতার হাতে ছিল কিংবা অমুকের হাতে ছিল। পরে সে আমাকে ওয়াসী বানিয়েছে আর এটা ওয়াক্ফ-সম্পত্তি, তখনও তার কথা গৃহীত হবে না। এমনিভাবে যদি বলে, এটা অমুকের হাতে ছিল আর সে আমাকে এর ওয়াসী বানিয়েছে তবুও তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তাকে আদেশ করা হবে সে যেন জমিটা সেই ব্যক্তির ওয়ারিসদের হাতে সমর্পণ করে, যার হাতে জমিটা ছিল বলে সে স্বীকার করেছে এবং যে ব্যক্তি তাকে ওয়াসী বানিয়েছে বলে সে দাবী করেছে (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা : যদি অন্য কারও জমি সম্পর্কে বলে, এটা সাদাকা, ওয়াক্ফ এবং তারপর সে সেই জমির মালিক হয়ে যায় তবে জমিটা ওয়াক্ফ হয়ে যাবে (আল-ফাতাওয়া আল-আত্তাবিয়া)।

২৬. মাসআলা : ওয়ারিসদের হাতে একটি জমি আছে। তারা স্বীকার করছে যে, তাদের পিতা এটি ওয়াক্ফ করেছে। কিন্তু তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা খাত বর্ণনা করল। কাযী তাদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেকে যে খাত বলেছে তার অংশ সেই খাতে ব্যয় করবে। এ ওয়াক্ফের কর্তৃত্ব কাযীর হাতে থাকবে। সে যাকে ইচ্ছা তার মুতাওয়ালী নিযুক্ত করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৭. মাসআলা : কোন ওয়ারিস যদি নাবালগ হয় বা অনুপস্থিত থাকে, তবে নাবালগ বালগ হওয়ার পর এবং অনুপস্থিত ব্যক্তি ফিরে আসার পর তাদের অংশ ওয়াক্ফ হবে। যদি

কতক ওয়ারিস স্বীকার করে যে, তাদের পিতা তাদের আওলাদ ও বংশধরের জন্য ওয়াক্ফ করেছে এবং অন্যরা তা অস্বীকার করে তবে স্বীকারোক্তিকারীদের কেউ ওয়াক্ফ হবে অন্যদের অংশ তাদের মালিকানায় থাকবে। তবে স্বীকারকারীর অংশের ফসলে অস্বীকারকারী কোন হিস্যা থাকবে না। অস্বীকারকারিগণ যদি তাদের অংশের কিছু জমি বিক্রি করে দেয় এবং তারপর স্বীকারকারীদের কথা তাসদীক করে, তবে তাদের হাতে অবশিষ্ট জমির ব্যাপারে তাসদীক গৃহীত হবে। বিক্রিত অংশের ক্ষেত্রে গৃহীত হবে না। হাঁ, ক্রেতাও যদি তাদের তাসদীক করে তা হলে গৃহীত হবে। আর সে যদি তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে তবে বিক্রেতাদের উপর তাদের বিক্রিত জমির মূল্য পরিমাণ জরিমানা আরোপ করা হবে। সেই টাক দিয়ে জমি কেনা হবে এবং তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অবশিষ্ট জমির সংগে তা ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। বিক্রেতাদের কোন একজন যদি ওয়াক্ফের ফসলে এই কারণে অন্যদের সংগে শরীক থাকে যে, তারা তার জন্যও ওয়াক্ফের কথা স্বীকার করেছিল এবং সেও পরে তাদের তাসদীক করেছিল তা হলে তার জরিমানার অর্থ ইতিপূর্বের ফসলের বদলে কাটা যাবে না (আল-হাবী)।

২৮. মাসআলা : আল-খাসুসাফ (র) তাঁর 'ওয়াক্ফ' গ্রন্থে বলেন, কোনও ব্যক্তি যদি বলে আমার এ জমি আবদুল্লাহর পুত্র যায়দের জন্য এবং তার সন্তান, পরবর্তী প্রজন্ম ও বংশধরের জন্য ওয়াক্ফ-যতদিন তাদের বংশধারা বাকি থাকে আর তাদের পর এটা মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ। পরে যায়দ বলল, ওয়াক্ফদাতা এটা ওয়াক্ফ করেছে আমার জন্য, আমার সন্তান সন্তানের সন্তানের জন্য এবং আমার জন্য, তবে তার নিজের ক্ষেত্রে তার কথা গৃহীত হবে অন্যদের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং ফসল প্রথমে যায়দ এবং তার বর্তমান সন্তান, সন্তানের সন্তান বংশধরের মধ্যে ভাগ করা হবে। তারপর যায়দের ভাগে যা পড়বে তাতে আমার শরীক থাকবে এভাবে যায়দের জীবদ্দশায় তার অংশটা তার ও 'আমরের মধ্যে ভাগ হতে থাকবে -তার মৃত্যুর পর এই ওয়াক্ফে 'আমরের কোন অধিকার থাকবে না। এমনিভাবে ওয়াক্ফদাতা যদি ওয়াক্ফ করে যায়দের জন্য এবং তার পরে মিসকীনদের জন্য, কিন্তু যায়দ 'আমরের পক্ষে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তবে ওয়াক্ফের ফসলে আমারও যায়দের সংগে শরীক থাকবে যতদিন যায় জীবিত থাকে। যায়দের মৃত্যুর পর সবটা ফসলই মিসকীনদের হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি দুটি ছেলে রেখে মারা গেল। একজন তার দখলে থাকা জমি সম্পর্কে দাবী করল যে, এটা তার পিতা তার নামে ওয়াক্ফ করেছে। অপর ছেলে বলল, এ জমি আমাদের দুজনের জন্যই ওয়াক্ফ। এ ক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং সে জমি তাদের দুজনের জন্যই ওয়াক্ফ হবে (আল-মুয়মারাত)।

৩০. মাসআলা : আল-খাসুসাফ (র) তাঁর 'ওয়াক্ফ' গ্রন্থে বলেন, এক ব্যক্তির হাতে একখণ্ড জমি বা একটি বাড়ি আছে। অপর এক ব্যক্তি কাযীর কাছে গিয়ে দাবী করল যে, সেটা তার যার দখলে আছে, তার বড়ব্যা এটা ওয়াক্ফ-সম্পত্তি। জনৈক মুসলিম এটা মিসকীনদের প্রাতি ওয়াক্ফ করেছে এবং আমার হাতে ন্যস্ত করেছে। এক্ষেত্রে কাযী সে সম্পত্তিকে সেই ব্যক্তি স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ওয়াক্ফ সম্পত্তি সাব্যস্ত করবে, তবে মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে না

কাজেই বাদী যদি কাযীকে বলে, আপনি তার কাছ থেকে এই মর্মে শপথ নিন যে, এটা আমার জমি নয়, তবে কাযী তার কাছ থেকে শপথ নিবে। সে শপথ করতে অস্বীকার করলে কিংবা সে জমি যে বাদীর তা স্বীকার করে নিলে কাযী তার উপর জমির মূল্য পরিমাণ অর্থ দণ্ড আরোপ করবে। ইতোপূর্বে ওয়াক্ফ সম্পর্কে যে রায় দিয়েছিল তা বাতিল করবে না (আয-যাখীরা)।

৩১. মাসআলা : বাদী যদি প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, এ জমি তার, তবে তার পক্ষেই রায় হবে। তখন ওয়াক্ফ-সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যদি স্বীকার করে যে, খ্যাতনামা এক ব্যক্তি এ জমি ওয়াক্ফ করেছে তারপর সেই ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে ওয়াক্ফের কথা স্বীকার করে, তবে সেই ব্যক্তিই বাদীর বিরুদ্ধে লড়বে। যার দখলে জমিটা আছে, সে যদি একদল লোকের নাম নিয়ে বলে, এ জমি তাদের জন্য ওয়াক্ফ, তবে তারাই বাদীর প্রতিপক্ষ হবে। তারা বাদীর পক্ষে যদি স্বীকার করে নেয় যে, জমিটি তারই, তবে তাদের সে স্বীকারোক্তি ফসলের ক্ষেত্রে কেবল তাদের নিজেদের ব্যাপারে গৃহীত হবে। তারা মারা গেলে ফসল পাবে মিসকীনগণ, বাদী নয়। জমি যদি কোন মুতাওয়াল্লীর হাতে থাকে এবং অবস্থা পূর্বের অনুরূপ হয়, তবে সেই মুতাওয়াল্লীই বাদীর প্রতিপক্ষ হবে এবং তার বিরুদ্ধেই বাদীর সাক্ষ্য প্রমাণ শোনা হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লীর কাছ থেকে শপথ নেওয়া হবে না। কেননা সে স্বীকার করলে স্বীকারোক্তি সহীহ হবে না। কাযীর আমীন (কাযী কর্তৃক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক, যার কাছে আমানত রাখা হয়)-এর ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য (আল-হাবী)।

৩২. মাসআলা : বাড়ির দখলদার প্রথমে স্বীকার করল যে, এ বাড়িটি অমুক ও অমুক ও তাদের আওলাদের জন্য এবং তাদের পর মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ। এখন যদি সে আবার বলে যে, বাড়িটি দাবীদারের। কিন্তু মিসকীনগণ উপস্থিত হয়ে দাবীকারীর পক্ষে তার সে স্বীকারোক্তিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং বলে যে, এ বাড়িটি আমাদের জন্য ওয়াক্ফকৃত, তাহলে দাবীদারের বিপক্ষে তারাই প্রতিপক্ষ হয়ে লড়বে। বাদী প্রমাণ পেশ করতে পারলে তো বাড়িটি তার বলেই রায় দেওয়া হবে এবং দখলদারের ওয়াক্ফের স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি দাবীর পক্ষে তার কোন প্রমাণ না থাকে, তা হলে সেই মুসলিমদের কাছ থেকে তাদের দাবী সম্পর্কে তার কসম গ্রহণের ইখতিয়ার থাকবে। তারা যদি দাবীদারের দাবী স্বীকার করে অথবা কসম করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের সে স্বীকারোক্তি তাদের নিজেদের পক্ষে জায়েয হবে, তাদের আওলাদ, আওলাদের আওলাদ ও মিসকীনদের পক্ষে জায়েয হবে না। এমনিভাবে তাদের স্বীকারোক্তি অন্য যাদের বিপরীতে যাবে তাদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে না (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি বিগত ওয়াক্ফ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রদান করল এবং আরও স্বীকার করল যে, সে তা নিজের দখল থেকে মুক্ত করে দিয়েছে, কিন্তু তার ওয়ারিস জানে যে, সে তা নিজ দখল থেকে মুক্ত করেনি। ফুকাহায়ে কিরাম এক্ষেত্রে বলেন, নিজ সম্বন্ধে তার স্বীকারোক্তি বৈধ। তার ওয়ারিসদের তাকে সে ব্যাপারে ধরবার কোন ইখতিয়ার নেই এবং বিচারে তাদের দাবীও শ্রবণযোগ্য নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৪. মাসআলা : 'আল-ফাতাওয়া'-তে আছে, এক ব্যক্তি সুস্থকালে তার জমি গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করল এবং তারপর সে মারা গেল। তারপর এক ব্যক্তি এসে দাবী করল, সে জমিটি তার। ওয়ারিসগণও তা স্বীকার করল। এতে তার ওয়াক্ফ বাতিল হবে না। বরং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে ওয়ারিসগণকে সে জমির মূল্য জরিমানা স্বরূপ আদায় করতে হবে। ফকীহ (র)- বলেন, জরিমানা যে দিতে হবে সে ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। একথাই সঠিক। ওয়ারিসগণ যদি তা অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি জমি বুঝে নেওয়ার জন্য তাদেরকে শপথ করাতে চায়, তবে তাদের উপর শপথ আসবে না, হাঁ, সে যদি তাদের কসম করতে না চাওয়ার ভিত্তিতে মূল্য গ্রহণ করতে রাযী থাকে তবে সে তাদেরকে শপথ করতে বলতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩৫. মাসআলা : বাড়ির দখলদার বললো যে, এটা জনৈক মুসলিম পুণ্যের কাজে এবং মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ করে আমাকে তার মুতাওয়াল্লী বানিয়েছে। তারপর এক ব্যক্তি তাকে কাযীর কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, বাড়িটি আমিই কথিত খাতে ওয়াক্ফ করেছি এবং তাকে মুতাওয়াল্লী বানিয়েছি। এখন আমি বাড়িটি আমার তত্ত্বাবধানে নিতে চাই। এ অবস্থায় দখলদার তাকে সত্যায়ন করলে সে বাড়িটি নিজের তত্ত্বাবধানে নিতে পারবে। পক্ষান্তরে দাবীদার যদি বলে, আমি তো আমানতস্বরূপ বাড়িটি তার কাছে অর্পণ করেছিলাম, কিন্তু দখলদারের বক্তব্য হচ্ছে, বাড়িটি তারই ছিল বটে, কিন্তু সে আমার বর্ণিত খাতসমূহে এটি ওয়াক্ফ করেছে। এ অবস্থায় কাযী দখলদারের এই বক্তব্য গ্রহণ করবে না যে, এই বাড়ি ও এই জমি এই দাবীদারের (আয-যাখীরা)।

৩৬. মাসআলা : এক ব্যক্তির দখলে এক খণ্ড জমি আছে। দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, এ ব্যক্তি স্বীকার করেছিল, বাড়িটি অমুকের পুত্র অমুক ও তার বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ। অন্য দুজন লোক সাক্ষ্য দিল যে, এটি অমুকের পুত্র অমুকের জন্য ওয়াক্ফ বলে সে স্বীকার করেছে। 'আল-কিতাব'-এ বর্ণিত আছে যে, এরূপ ক্ষেত্রে যদি জানা যায়, কোন স্বীকারোক্তি প্রথম করেছে, তবে সেই প্রথমটিই বৈধ হবে এবং দ্বিতীয়টি বাতিল হয়ে যাবে। আর কোনটি প্রথম, কোনটি পরের তা জানা না থাকলে উভয় স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই রায় দেওয়া হবে এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যে সে জমির আয় অর্ধাধি বণ্টন করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৭. মাসআলা : এ যিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক)-এর হাতে এক খণ্ড জমি আছে। সে স্বীকারোক্তি যে, জনৈক মুসলিম বাড়িটি মিসকীনদের জন্য, বা হজ্জের জন্য, বা জিহাদের জন্য কিংবা মুসলিমগণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করে থাকে এমন কোন খাতের নাম নিয়ে বলল যে, সেই জন্য ওয়াক্ফ করেছে। এ অবস্থায় তার সে স্বীকারোক্তি বৈধ। সুতরাং সে যেসব খাতের নাম বলেছে তাতে এ সম্পত্তি ব্যবহৃত হবে। যদি সে স্বীকারোক্তি দেয় যে, সে এটি ওয়াক্ফ করেছে বিক্রির জন্য অথবা এমন কোন কাজের নাম বলল, যাকে মুসলিমগণ আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে না, তবে তার সে স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে, সুতরাং জমিটি তার হাত থেকে মুক্ত করতঃ মুসলিমদের বায়তুল-মালে অর্পণ করা হবে (আল-হাবী)।

নবম পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফ-সম্পত্তির জবর দখল প্রসঙ্গে

১. মাসআলা : একজন তার জমি বা বাড়ি ওয়াক্ফ একজনকে তার মুতাওয়াল্লী বানালো। পরে দখলদার তা অস্বীকার করল। এ অবস্থায় সে জবরদখলকারী সাব্যস্ত হবে। কাজেই ওয়াক্ফদাতা তার বিরুদ্ধে বাদী হয়ে তার হাত থেকে জমিটি মুক্ত করতে পারবে। ওয়াক্ফদাতার মৃত্যুর পর ওয়াক্ফের ভোজাগণ যদি তাদের প্রাপ্য দাবী করে তবে কাযী একজন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করবে, যে এ ব্যাপারে মামলা চালাবে। সম্পত্তির কোন ক্ষতি হয়ে থাকলে তার অস্বীকৃতির পর যে ক্ষতি হয়েছে তার কাছ থেকে তার জরিমানা আদায় করা হবে এবং তা দ্বারা তার সংস্কার করা হবে।

ওয়াক্ফদাতা বা মুতাওয়াল্লীর কাছ থেকে কোন দখলদার তা দখল করে থাকলে তার কর্তব্য সেটি ওয়াক্ফদাতার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। যদি ফেরত দিতে না চায় এবং কাযীর কাছে তার জবরদখল প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে কাযী তাকে প্রেস্তার করবে এবং ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত তাকে মুক্তি দিবে না। এর মধ্যে সে সম্পত্তির কোন ক্ষতি হয়ে থাকলে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে এবং সে সম্পত্তির মেরামত ও সংস্কার কার্যে তা ব্যয় করা হবে। ভোজাদের মধ্যে তা বিতরণ করা হবে না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : জবর দখলকারী ওয়াক্ফ-সম্পত্তিতে কোন বৃদ্ধিসাধন করলে দেখতে হবে তার বৃদ্ধি কী রকমের। তা যদি এমন কোন মাল না হয়, যার মূল আছে, যেমন সে হয়ত জমি কর্ষণ করেছে, অথবা নালা কেটেছে কিংবা জমিতে গোবর ফেলেছে এবং তা মাটিতে মিশে গেছে, যেন তা নষ্টই হয়ে গেছে, এরূপ ক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী জবর দখলকারীর হাত থেকে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই ফেরত আনবে। আর সে বৃদ্ধিটা যদি এমন মাল হয়, যার মূল্য আছে, যেমন ঘর ও বৃক্ষ, তবে জবরদখলকারীকে আদেশ করা হবে, সে যেন তার ঘর তুলে নেয়, গাছ উপড়ে ফেলে এবং তারপর জমি ফেরত দেয়, যদি না এর ফলে জমির কোন ক্ষতি হয়। যদি তাতে জমির ক্ষতি হয়, যেমন গাছ উপড়ালে বা ঘর তুলে ফেললে হয়ত জমি ধসে পড়বে বা গর্ত হয়ে যাবে, তা হলে জবর দখলকারী ঘর তুলে ফেলতে বা গাছ উপড়াতে পারবে না। বরং উপড়ানো গাছ ও খুলে ফেলা ঘরের যে মূল্য হয় মুতাওয়াল্লীর কাছে ওয়াক্ফের সে পরিমাণ অর্থ থাকলে সে তা জবরদখলকারীকে পরিশোধ করবে। যদি এ পরিমাণ অর্থ না থাকে, তবে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ইজারা দেবে এবং ইজারার অর্থ দ্বারা সে মূল্য পরিশোধ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা : জবরদখলকারী যদি গাছটি এতটা উপর থেকে কাটতে চায়, যাতে জমির কোন ক্ষতি হয় না, তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে। তারপর জমির ভেতর গাছের যে অংশ

থাকবে, তার যদি মূল্য থাকে, তবে মুতাওয়াল্লীকে যে মূল্য পরিশোধ করতে বলা হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি কোন কিছুর বিনিময়ে সে গাছের ব্যাপারে জবরদখলকারীর সংগে আপোষ-রফা করে তবে তাও জায়েয, যদি সেটা ওয়াক্ফ-সম্পত্তির পক্ষে কল্যাণকর হয়। ঘরের ক্ষেত্রেও একই কথা (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি ওয়াক্ফ-জমি জবরদখল করল, যার মূল্য এক হাজার দিরহাম, তারপর সেই জবরদখলকারী হতে অন্য একজন জবরদখল করল এবং তখন তার মূল্য দাঁড়িয়েছে দুহাজার দিরহাম। এক্ষেত্রে মুতাওয়াল্লী প্রথম জবরদখলকারীকে নয়, বরং দ্বিতীয়জনকে ধরবে। যদি তার কাছ থেকে তৃতীয় একজন জবরদখল করে এবং তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনা কঠিন হয় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ধনী হয়, তখন তৃতীয়জনকে না ধরে বরং দ্বিতীয় দখলদারকেই পাকড়াবে। যদি দ্বিতীয়জন অপেক্ষা প্রথম জবরদখলকারী বেশী সচ্ছল হয়, তাহলে প্রথমজনকেই পাকড়াও করবে। মুতাওয়াল্লী একজন হতে জরিমানা আদায় করলে অপরজন দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কোনও একজন হতে জরিমানা আদায় করলে তা দিয়ে আরেকটি জমি কিনবে এবং প্রথমটির স্থানে সেটিকে ওয়াক্ফ করবে (আয-যাখীরা)।

৬. মাসআলা : কোনও একজন হতে মূল্য আদায়ের পর যদি জমি ফেরত পাওয়া যায় তবে সে মূল্যও ফেরত দিয়ে দেবে। ওয়াক্ফ-সম্পত্তিরূপে সে জমি আপন অবস্থায় বহাল থাকবে। মূল্য ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত সে জমি আটকে রাখার ইখতিয়ার জবরদখলকারীর থাকবে না (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : জবরদখলকারীর হাত থেকে মূল্য বুঝে নেওয়ার পর যদি মুতাওয়াল্লীর হাত থেকে তা হারিয়ে যায়, তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে না। এ ব্যাপারে কসমের সংগে তার কথাই গ্রহণযোগ্য (আল-হাবী)।

৮. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী অন্য কোন জমি কেনার আগেই যদি তার হাত থেকে জরিমানার টাকা হারিয়ে যায় এবং তারপর ওয়াক্ফের জমি তার হাতে ফেরত আসে, তবে সে জমি আগের মতই ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হবে। এক্ষেত্রে নিজের পকেট থেকে জবরদখলকারীর কাছ থেকে নেওয়া টাকা পরিশোধ করবে। তারপর ওয়াক্ফের আয় থেকে তা বুঝে নেবে। এটা ইসতিহসান-সম্মত সিদ্ধান্ত। সে তার টাকা ওয়াক্ফের আয় থেকেই বুঝে নেবে; ভোক্তাদের নিজেদের সম্পদ থেকে নয় (আয-যাখীরা)।

৯. মাসআলা : জবরদখলকারী হতে মূল্য গ্রহণ করে মুতাওয়াল্লী তা দিয়ে অন্য জমি কেনার পর যদি প্রথম জমিটি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেটাই ওয়াক্ফ হিসেবে বহাল থাকবে আর দ্বিতীয়টি ওয়াক্ফ হতে খারিজ হয়ে যাবে। মুতাওয়াল্লীর কাজ হবে সেটি বিক্রি করে জবরদখলকারীকে তার টাকা ফেরত দেওয়া। যদি দাম কমে যায়, তবে সেটা মুতাওয়াল্লীর নিজ পকেট থেকে যাবে। কিয়াস ও ইসতিহসান অনুযায়ী সে তা ওয়াক্ফের আয়

থেকে ফেরত নিতে পারবে না। ওয়াক্ফদাতা যদি ওয়াক্ফ-ভূমিকে এই জমি দ্বারা পরিবর্তন করতে পারার শর্তারোপ করে থাকে এবং সে মতে মুতাওয়াল্লী এ জমি বিক্রি করে দেয় ও মূল্য হস্তগত করে, কিন্তু তার হাত থেকে যে টাকা হারিয়ে যায় এবং তারপর প্রথম সম্পত্তি কোন ক্রটিযুক্ত অবস্থায় কাযীর ফায়সালাক্রমে তার হাত ফিরে আসে তবে, মুতাওয়াল্লীকে নিজ সম্পদ থেকে জরিমানা পরিশোধ করতে হবে। তারপর সে জরিমানার অর্থের জন্য ফিরে পাওয়া ওয়াক্ফ-সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে পারবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা : জবরদখলকারী যদি ওয়াক্ফের বাড়ি বা জমি ঘর ভেঙে ফেলে এবং জমির গাছ কেটে ফেলা হয়, তবে মুতাওয়াল্লী তার উপর বৃক্ষ ও গৃহের মূল্য বরাবর জরিমানা আরোপ করতে পারবে- যদি জবরদখলকারী তা ফেরত দিতে সক্ষম না হয়। এক্ষেত্রে অক্ষত ঘর ও অক্ষত বৃক্ষের মূল্য বিবেচ্য হবে। জরিমানা আদায় করার পর যদি জবরদখলকারী বাড়ি, ভেঙ্গে ফেলা ঘর ও গাছ-বৃক্ষ ফেরত দিতে সক্ষম হয়, তবে সে ওয়াক্ফদাতার হাতে জমিটা ফেরত দিয়ে দেবে আর ভাঙা ঘর ও গাছ জবরদখলকারীরই থেকে যাবে। এ অবস্থায় মুতাওয়াল্লী জমির অংশের মূল্য তাকে ফেরত দেবে (আয-যাখীরা; আল-মুহীত; ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : জবরদখলকারীর হাতে থাকা অবস্থায় কেউ যদি গাছ ও গৃহের কোন ক্ষতি করে এবং দখলদার ব্যক্তি তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয় আর সে নিজে নিঃশ্ব হয়ে থাকে, তবে মুতাওয়াল্লী ক্ষতিকারী হতে জরিমানা আদায় করতে পারবে না। দখলদার যদি সে জমিতে চাষাবাদ করে, তবে ফসল তার হবে। অবশ্য তাকে জমির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যা জমির সংস্কারকার্যে ব্যয় করা হবে (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা : ওয়াক্ফের জমিতে যদি খেজুর গাছ ও অন্যান্য বৃক্ষ থাকে, যাদ্বারা জবরদখলকারী কয়েক বছর আয়-উপার্জন করেছে। তারপর সে খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছসহ জমি ফেরত দিতে মনস্থ করেছে এক্ষেত্রে তাকে আয়সহই তা ফেরত দিতে হবে, যদি অর্জিত আয় তার হাতে থাকে। আর তা খরচ করে ফলে তার সমপরিমাণ অর্থ আদায় করতে হবে (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা : জবরদখলকারীর কাছ থেকে আয়ের বদলে যা গ্রহণ করেছে তা ওয়াক্ফের যথাযথ খাতে বিতরণ করতে হবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : ওয়াক্ফ-ভূমি জবরদখলকারীর দখলে থাকা অবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি ঐ জমির গাছ উপড়ে ফেলল। এ অবস্থায় মুতাওয়াল্লীর ইখতিয়ার, চাইলে সে অক্ষত বৃক্ষের মূল্য জবরদখলকারীর কাছ থেকে আদায় করতে পারে, আর চাইলে তা উৎপাটনকারীর কাছ থেকেও আদায় করতে পারে। জবরদখলকারীর কাছ থেকে আদায় করলে সে আবার তা উৎপাটনকারীর কাছ থেকে আদায় করে নেবে। কিন্তু উৎপাটনকারীর কাছ থেকে আদায় করলে সে তা জবরদখলকারীর কাছে ফেরত চাইতে পারবে না। মুতাওয়াল্লী যদি কারও কাছ থেকেই জরিমানা আদায় না করে এবং ইতোমধ্যে জবরদখলকারী উৎপাটনকারীর কাছ থেকে

মূল্য আদায় করে নেয়, তাহলে মুতাওয়াল্লী উৎপাটকের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করতে পারবে না (আয-যাখীরা)।

১৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি একখণ্ড ওয়াক্ফকৃত জমি জবরদখল করে নিল। যার কাছ থেকে দখল করেছে সে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল এবং দলীল-প্রমাণ পেশ করল। এক্ষেত্রে তার প্রমাণ গৃহীত হবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে জমি তার হাতে প্রত্যর্পণ করা হবে (আয-যাখীরিয়া)।

১৬. মাসআলা : ওয়াক্ফের হকদাররা কাযীর অনুমতি ছাড়া জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে না (আল-ফুসূলুল-ইমাদিয়া)।

১৭. মাসআলা : একদল লোকের উপর একখণ্ড জমি ওয়াক্ফ করা হয়েছে। এক জালিম তা দখল করে নিল, যার হাত থেকে তা মুক্ত করে আনা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন তাদেরই অপর একজন সম্পর্কে দাবী করল যে, সে জমিটা ওই জালিমের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে এবং তার কাছে তা হস্তান্তর করেছে, কিন্তু সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করেছে। বাকীরা চাইল তাকে কসম করাবে। তো তাদের সে ইখতিয়ার আছে কি? হাঁ, তারা তাকে কসম করতে পারবে। সে যদি কসম করতে অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে রায় যাবে এবং তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে বলা হবে। এমনিভাবে যদি তাদের যদি প্রমাণ থাকে, তখন তাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কেননা ওয়াক্ফকৃত বাড়ি ও স্থাবর সম্পত্তি জবরদখলের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের স্বার্থেই জরিমানা আদায়ের ফাতাওয়া দেওয়া হয়, যেমন কেউ জোরপূর্বক ওয়াক্ফ-সম্পত্তির আয় বা সুবিধা ভোগ করলে ওয়াক্ফের স্বার্থেই জরিমানা আদায়ের ফাতাওয়া দেওয়া হয়। আমাদের মাশায়খে কিরাম এ মতই গ্রহণ করেছেন। মূল্য পরিশোধের রায় দেওয়ার পর তার কাছ থেকে তা হস্তগত করা হবে এবং তা দিয়ে আরেকটি জমি কেনা হবে, যা ওয়াক্ফ-সম্পত্তি সাব্যস্ত হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার জীবদশায় সুস্থাবস্থায় একখণ্ড জমি ওয়াক্ফ করল এবং তা হস্তান্তরও করল। তারপর এক ব্যক্তি তা জবরদখল করল এবং তাকে তার কাছে ভিড়তেই দিল না। এরূপ ক্ষেত্রে দখলদার হতে সে জমির মূল্য আদায় করা হবে এবং তা দিয়ে আরেকটি জমি কিনে আগেরটির শর্তে ওয়াক্ফ করা হবে। কেননা দখলকারী যখন ওয়াক্ফ অস্বীকার করল, তখন ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ধ্বংস করা হল। আল্লাহর পথে প্রদত্ত (ওয়াক্ফকৃত) বস্তু ধ্বংস করা হলে তার বদলে আরেকটি দেওয়া আবশ্যিক হয়ে যায়, যেমন আল্লাহর পথে প্রদত্ত ঘোড়া হত্যা করা হলে এমনই হুকুম হয়ে থাকে। এটা ইসতিহসান মাশায়খে কিরাম এটাই গ্রহণ করেছেন (আল-মুয্মারাত)।

১৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি একখণ্ড জমি ওয়াক্ফ করল। তারপর ওয়াক্ফদাতা তাতে চাষাবাদ করল এবং টাকা-পয়সা খরচ করল। তাতে ফসলও জন্মাল। ওয়াক্ফদাতাই বীজ দিয়েছিল। তারপর সে বলল, আমি নিজের বীজ দিয়ে নিজের জন্যই এটা চাষ করেছি, কিন্তু

যাদের জন্য ওয়াক্ফ করেছিল তারা বলল তুমি ওয়াক্ফের জন্যই ভূমি চাষ করেছিলে। এক্ষেত্রে চাষকারী ওয়াক্ফদাতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। ফসল সেই পাবে। ভোজাগণ যদি কাযীর কাছে আবেদন করে যে, কাযী যেন তার হাত থেকে জমিটা মুক্ত করে দেয়, আর তখন সে জমিতে ফসল থাকে, তবে কাযী তা করতে পারবে না। কাযী তার হাত থেকে সে জমি বের করে আনবে না। তবে এর পর থেকে সে ওয়াক্ফের জন্যই চাষাবাদ করবে। সে যদি প্রমাণ করে যে, তার হাতে ওয়াক্ফের কোন অর্থ ও বীজ নেই, কাযী বলবে, ওয়াক্ফের পক্ষে ঋণ নিয়ে বীজ কেন ও চাষাবাদে তা খরচ কর। সে যদি বলে আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে কাযী ভোজাদেরকে একই কথা বলবে। জমির আয় দিয়ে তারা সে ঋণ পরিশোধ করবে। তারা যদি বলে, আমরা নিশ্চিত নই যে, ঋণ করে বীজ কিনব আর জমি ওয়াক্ফদাতার হাতেই থাকবে, অথচ সে তা অস্বীকার করবে না। তার চেয়ে বরং আমরাই চাষাবাদ করব, তবে তাদের হাতে এভাবে জমি ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। কেননা যে ব্যক্তি ওয়াক্ফ করেছে তত্ত্বাবধানের হক তারই বেশী। হাঁ, তার দিক থেকে যদি আশংকা থাকে এবং সে যে জমিটা নষ্ট করে ফেলবে এ ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হওয়া না যায় তবে ভিন্ন কথা। ওয়াক্ফদাতা যদি জমি চাষ করে এবং তাতে অর্থ ব্যয় করে তারপর সে ফসল বান বা অন্য কোন দুর্যোগে আক্রান্ত হল এবং সব ফসল নষ্ট হয়ে গেল। তখন ওয়াক্ফদাতা বলল, আমি ঋণ করে ওয়াক্ফের জন্য এই ফসল বুনেছিলাম। তারপর আরেক ফসল আসল এবং সে চাইল এই ফসল দিয়ে সে ঋণের টাকা শোধ করবে, কিন্তু ভোজাগণ বলল, সে তো তার নিজেরই জন্য চাষ করেছিল, তো এ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফদাতার কথাই গ্রহণযোগ্য। সে চাষাবাদের জন্য যে ঋণ করেছিল তা এই ফসল থেকে নিয়ে পরিশোধ করতে পারবে। চাষাবাদকারী ওয়াক্ফদাতা বলল, আমি এক হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তাদারা বীজ কিনেছি এবং চাষাবাদের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করেছি, কিন্তু ভোজাগণ বলল, তুমি চাষাবাদ ও বীজের পেছনে মাত্র পাঁচশ' দিরহামই খরচ করেছ, এক্ষেত্রে অনুরূপ কাজে যে পরিমাণ খরচ হয়ে থাকে সে পরিমাণের ভেতর ওয়াক্ফদাতার কথা গ্রহণ করা হবে। যদি মুতাওয়াল্লী ও ভোজাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং মুতাওয়াল্লী বলে যে, আমি এটা নিজের বীজ ও নিজ খরচে নিজেরই জন্য চাষ করেছি আর ভোজাগণের বক্তব্য হচ্ছে-তুমি এটা আমাদেরই জন্য চাষ করেছ, তবে মুতাওয়াল্লীর কথাই গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

দশম পরিচ্ছেদ : মুমূর্ষ ব্যক্তির ওয়াক্ফ

১. মাসআলা : কোনও রুগী যদি মৃত্যুশয্যাতে একটি বাড়ি ওয়াক্ফ করে তবে তা তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতর হলে জায়েয হবে। যদি তার বেশী হয় এবং ওয়ারিসগণ অনুমোদন করে তা হলেও জায়েয। তারা অনুমোদন না করলে এক-তৃতীয়াংশের বেশীটুকুতে জায়েয হবে না। যদি কতকে অনুমোদন করে এবং কতকে না করে তবে যারা অনুমোদন করেছে তাদের অংশে জায়েয হবে এবং অবশিষ্ট অংশে জায়েয হবে না। হাঁ, মৃত ব্যক্তির যদি এ ছাড়া আরও সম্পদ পাওয়া যায় তবে সবটাকেই ওয়াক্ফ কার্যকর হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা : কাযী যদি দুই-তৃতীয়াংশে ওয়াক্ফ বাতিল করে দেয় এবং তারপর তার আরও সম্পদ পাওয়া যায়, তবে সবটা ওয়াক্ফ এক-তৃতীয়াংশ হতে বের করে আনা হবে। যদি তা ওয়ারিসদের হাতে হুবহু বাকি থাকে তবে সবটাই ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। যদি তাদের হাতে বাকি না থাকে, বরং ওয়ারিস তা বিক্রি করে দেয় তবে তার বিক্রি বাতিল করা হবে না, বরং যে মূল্যে বিক্রি করেছে তার কাছ থেকে সে পরিমাণ টাকা আদায় করা হবে এবং তা দিয়ে অন্য একটি জমি কিনে তদন্তে ওয়াক্ফ করা হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩. মাসআলা : মৃত ব্যক্তির পক্ষে যদি অর্থ লাভ হয়, যেমন কেউ তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছিল ও তারপর অর্থের বিনিময়ে ওয়ারিসদের সংগে হত্যাকারীর আপোষরফা হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমেই বিক্রি বাতিল করা হবে না। যদি কতক ওয়ারিস বিক্রি করে এবং কতকে বিক্রি না করে, তবে যা বিক্রি হয়নি তা ওয়াক্ফ হয়ে যাবে আর বিক্রি হয়েছে, তার মূল্য দিয়ে অপর একটি জমি কিনে ওয়াক্ফ করা হবে (আয-যাখীরা)।

৪. মাসআলা : এমনভাবে কাযী যদি মৃত ব্যক্তির ঋণের দায়ে ওয়াক্ফের জমি বিক্রি করে দেয়, আর মৃত ব্যক্তির এই পরিমাণ সম্পদের খোঁজ পাওয়া যায়, যাদ্বারা ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়, তবে এক-তৃতীয়াংশ জমি ওয়াক্ফ সাব্যস্ত হবে। এক্ষেত্রেও বিক্রি বাতিল করা হবে না, বরং ওয়াক্ফ জমির মূল্য পরিমাণ অর্থ মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে আলাদা করা হবে এবং তা দিয়ে আরেকটি জমি কিনে গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করা হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৫. মাসআলা : কোনও ব্যক্তি তার জমি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে সাদাকা, ওয়াক্ফ করল তার সন্তানদের জন্য, সন্তানের সন্তানের জন্য এবং যতদিন তার বংশধারা চলতে থাকে ততদিন তাদের জন্য, তারপর মিসকীনদের জন্য। এখন এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির

ভেতর থেকেই যদি সে ওয়াক্ফ আদায় হয়ে যায়, তবে সে ওয়াক্ফ কার্যকর হবে। তারপর সে জমি থেকে আয়-উৎপন্ন করা হবে এবং মীরাসের নিয়মে তা ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। এমনকি তার স্ত্রী ও আওলাদ থাকলে স্ত্রীকে আট ভাগের এক ভাগ দেওয়া হবে। যদি তার সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতা থাকে, তবে পিতা-মাতার প্রত্যেককে ছয় ভাগের এক ভাগ করে দেওয়া হবে। যা অবশিষ্ট থাকে তা সন্তান-সন্ততির মধ্যে নারীর-দ্বিগুণ পুরুষ'-এ নিয়মে বন্টন করা হবে। এ নিয়ম সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন মৃত ব্যক্তির কেবল ঔরসজাত সন্তানই থাকে, তাদের সংগে সন্তানের সন্তান তথা পৌত্র না থাকে। তাদের সংগে পৌত্রও থাকে এবং যদি সব অবস্থা একই রকম হয়, তবে ওয়াক্ফের আয় ঔরসজাত সন্তানের মধ্যে তাদের সংখ্যানুপাতে এবং পৌত্রদের মধ্যে তাদের সংখ্যানুপাতে ভাগ হবে। তবে ঔরসজাত সন্তানদের ভাগে যা পড়ল ওয়ারিসদের মধ্যে তা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত মীরাসের বিধান অনুযায়ী বন্টন করা হবে। আর পৌত্রদের ভাগে যা পড়ল তাদের মধ্যে সমহারে বিতরণ করা হবে। ঔরসজাত সন্তানদের কেউ যখন জীবিত থাকবে তখন ওয়াক্ফের আয় তার সন্তানদের আওলাদ ও তার বংশধরদের মধ্যে বন্টন করা হবে তখন তার স্ত্রী ও তার পিতা-মাতার জন্য তাতে কোন হিস্যা থাকবে না (আয-যাখীরিয়া)।

৬. মাসআলা : মৃত ব্যক্তি যে পরিমাণ ওয়াক্ফ করেছে যদি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের বেশী হয়, তাহলে ওয়ারিসদের অনুমোদন সাপেক্ষে হ্রাস হবে। তখন আয় তাদের মধ্যে সমহারে বন্টন হবে। পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হবে না এবং স্ত্রী ও পিতা-মাতা তাতে কোন অংশ পাবে না। ওয়ারিসগণ যদি সে ওয়াক্ফ অনুমোদন না করে তবে তা এক-তৃতীয়াংশের ভেতর কার্যকর হবে। সুতরাং সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। আর তার আয়টা সমস্ত ওয়ারিসের মধ্যে মীরাসের বিধান অনুসারে বন্টন করা হবে। এই যে হুকুম বলা হল, এটা হিলাল (র) এরব্বী আবু বকর আল-খাসসাফ (র), ফকীহ আবু বকর আল-আমাশ (র) ও ফকীহ আবু বকর আল-ইস্কাফ (র)-এর মত (আয-যাখীরা)।

৭. মাসআলা : কেউ তার আত্মীয়দের জন্য জমি ওয়াক্ফ করলে তখন তার আত্মীয়গণ যদি তার ওয়ারিস হয়, তবে এ অবস্থা এবং সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করলে সে অবস্থার একই হুকুম। আর আত্মীয়গণ যদি তার ওয়ারিস না হয়, তবে তদন্তে জন্য ওয়াক্ফ করল তার আত্মীয়গণ যদি তার ওয়ারিস হয়, তবে এ অবস্থা এবং সন্তান জন্য ওয়াক্ফ করলে সে অবস্থার একই হুকুম। আর আত্মীয়গণ যদি তার ওয়ারিস না হয়, তবে তাদের জন্য ওয়াক্ফ জায়েয। তারা ওয়াক্ফের খাত হিসেবে আয়ের হুকুম হবে। যদি কতক ওয়ারিসের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং কতকের জন্য নয়, তবে বাকী ওয়ারিসগণ অনুমোদন করলে জায়েয হবে আর তারা যদি অনুমোদন না করে তবে সে তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতর গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। আর অফসল হিলাল (র) ও তার অনুসারীদের মতে ওয়ারিসদের মধ্যে তাদের মীরাসের অংশ অনুযায়ী বন্টন হবে। যে ওয়ারিসের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার মৃত্যু হয়ে গেলে ফকীহ গরীবদের হক হয়ে

যাবে। ওয়াক্ফদাতার অন্য কোন ওয়ারিস যদি মারা যায় এবং যার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছিল সে জীবিত থাকে, তবে ফসল সমস্ত ওয়ারিসদের মধ্যে বিতরণ হবে আর যে ব্যক্তি মারা গিয়েছে তার অংশ তার ওয়ারিসগণ পাবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : যদি বলে, আমার এ জমি আমার সন্তান, সন্তানের সন্তান ও আমার বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ এবং সব শেষে গরীবদের জন্য অথবা যদি এরূপ ওসীয়াত করে আর সে জমি এক-তৃতীয়াংশের ভেতরে হয়, তবে তারা অনুমোদন করলে ফসল ওয়ারিস ও সন্তানের মধ্যে তাদের সংখ্যানুপাতে বন্টন করা হবে। আর যদি তারা অনুমোদন না করে তবে ঔরসজাত সন্তান ও সন্তানের মধ্যে তাদের সংখ্যানুপাতে বন্টন করা হবে। সন্তানের সন্তানদের ভাগে যা পড়বে তাদের মধ্যে তা সমহারে বন্টন করা হবে। ঔরসজাত সন্তানদের ভাগে যা পড়বে তা সমস্ত ওয়ারিসদের মীরাস হবে। ঔরসজাত সন্তান সন্তানের ও সন্তানদের মধ্যে কতক মারা গেলে এবং নতুন কোন সন্তানের সন্তান জন্ম নিলে ফসল আসার দিন তাদের সংখ্যা হিসাব করা হবে। সে অনুযায়ী ঔরসজাত সন্তানের ভাগে যা পড়বে তা ওয়াক্ফদাতার মৃত্যুকালে তার যত ওয়ারিস ছিল তাদের মধ্যে তাদের মীরাছ অনুপাতে বন্টন করা হবে। তাদের মধ্যে যে ওয়ারিস মারা গিয়েছে তার অংশ পাবে তার ওয়ারিসগণ। ঔরসজাত সন্তানদের সকলের মৃত্যু হয়ে গেলে ফসল পাবে সন্তানের সন্তান ও পরবর্তী বংশধরগণ। অপরাপর ওয়ারিস কিছুই পাবে না (আয-যাহীরিয়া)।

৯. মাসআলা : রুগ্ন ব্যক্তি যদি বলে, আমার এই জমি আমার সন্তান ও বংশধরের মধ্যে যে কেউ অভাবী হয়ে পড়বে তার জন্য ওয়াক্ফ, তবে তাদের প্রত্যেককে এই পরিমাণ দেওয়া হবে যাতে তার ভরণ-পোষণের প্রয়োজন মেটে। যদি তার সন্তান ও বংশধরের মধ্যে কেউ গরীব না থাকে তবে জমির সমস্ত আয় গরীবদের হয়ে যাবে। তার সন্তান ও বংশধরগণ সকলেই গরীব হলে জমির আয় তাদের মধ্যে তাদের সংখ্যানুপাতে বন্টন করা হবে। প্রত্যেককে এই পরিমাণ দেওয়া হবে, যাতে তার নিজের, সন্তানের, স্ত্রীর ও খাদেমের এক বছরের খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজন মিটে যায়। ঔরসজাত সন্তানের ভাগে যা পড়বে তা ওয়াক্ফদাতার অন্যান্য ওয়ারিসসহ তাদের মধ্যে মীরাসের নিয়মানুসারে বন্টন করা হবে। এভাবে সন্তানের ভাগ থেকে নিয়ে অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাতে যদি তার প্রয়োজন না মেটে, তবে সন্তানের সন্তানদের ভাগে যা পড়েছে তা থেকে চাইতে পারবে না। সন্তান ও বংশধরদের মধ্যে কেউ ধনী থাকলে তাকে কিছুই দেওয়া হবে না। যারা গরীব কেবল তাদের মধ্যেই তাদের সংখ্যানুপাতে তা বন্টন করা হবে (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা : কেউ যদি মৃত্যুর শয্যায় জমি ওয়াক্ফ করে এবং কয়েকটি ওসীয়াত করে তবে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ ওয়াক্ফ ও ওসীয়াতসমূহের মধ্যে বন্টন করা হবে। যাদের জন্য ওসীয়াত করেছে তাদের প্রত্যেককে ওসীয়াত অনুযায়ী দেওয়া হবে এবং যাদের জন্য ওয়াক্ফ করেছে, তাদের ভাগে ওয়াক্ফ-জমির মূল্য ফেলা হবে। ওসীয়াতের লোক তো তাদের অংশ নিয়ে যাবে আর ওয়াক্ফ-জমির যে মূল্য স্থির হল সেই পরিমাণ জমি আলাদা করে তা

ওয়াক্ফদাতা বর্ণিত খাতে ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। জীবদ্দশায় কার্যকর করা ওয়াক্ফ এর চেয়ে অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে না (আয-যাহীরা)।

১১. মাসআলা : ওয়াক্ফের বিষয়টা গোলাম আযাদ করা বা গোলামকে মুদাক্কর^১ বানানোর মত নয়। কেননা এ দুটি বিষয় প্রথমে কার্যকর করা হয় (আল-হাবী আল-কুদসী)।

১২. মাসআলা : যদি বলে, আমার এ জমির আয় আমার মৃত্যুর পর আবদুল্লাহর পুত্র ও তার বংশধরকে দেবে, তবে এটা আয় সম্পর্কে ওসীয়াত হবে। এমনিভাবে যদি বলে, আমার জমি আমার মৃত্যুর পর অমুক ও তার বংশধরের জন্য ওয়াক্ফ-এটা বিক্রি করা যাবে না, তবে সেটাও আয় সম্পর্কে ওসীয়াত হবে। যদি বলে, আমার জমি আমার মৃত্যুর পর মিসকীনদের জন্য ওয়াক্ফ ও মিসকীনদের জন্য হাবস (আবদ্ধ) তবে এটা বৈধ ওয়াক্ফ হবে (আয-যাহীরিয়া)।

১৩. মাসআলা : কেউ যদি তার জমি কিছু লোকের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং তাদের পর তার ফসল ওয়ারিসদের জন্য স্থির করে, তবে তার ফসল সেই সব লোকই পাবে, যাদের জন্য ওয়াক্ফ করেছিল। তারা মারা যাওয়ার পর তা মীরাসের নিয়মে ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন হবে। তাদের মৃত্যুর পর তার ফসল গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে (খাযানাতুল-মুফতীন; আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : যদি বলে, আমার এ জমি আমার সন্তান, সন্তানের সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ওয়াক্ফ, আমার ঔরসজাত সন্তানের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার মীরাসের অংশ আমার সন্তানের সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ, তবে তা জায়েয এবং তার ফসল সন্তানের সন্তানদের মধ্যে তাদের সংখ্যানুপাতে এবং জীবিত ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে তাদের সংখ্যানুপাতে বন্টন হবে। ওয়াক্ফদাতার মৃত্যুর পর কেউ মারা গেলে ঔরসজাত পুত্র যা পেত তা সন্তানের সন্তানদের মধ্যে ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। জীবিতদের ভাগে যা পড়বে তা তাদের ও মৃতদের মধ্যে বন্টন করা হবে। মৃতদের অংশ তাদের ওয়ারিসগণ তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে। ওয়াক্ফদাতা যদি চায় যে, তা তার সন্তান ও সন্তানের সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ করবে এবং সে হিসেবে বলে, আমার জীবিত পুত্রের অংশ হতে মৃত ব্যক্তির ভাগে যা পড়বে তা আমার সন্তানের সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ, তবে তা জায়েয হবে না (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা : কেউ যদি তার সন্তান ও সন্তানের সন্তানদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করে আর জমি ছাড়া তার অন্য কোন সম্পত্তি না থাকে, তবে জমির এক-তৃতীয়াংশ সন্তানের সন্তানের জন্য ওয়াক্ফ হবে, তাতে ওয়ারিসগণ অনুমোদন করুক আর নাই করুক। বাকী দুই-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে ওয়ারিসগণ যদি ওয়াক্ফ অনুমোদন না করে তবে ওয়ারিসগণ তার মালিক হয়ে যাতে। আর যদি অনুমোদন করে তবে তা ঔরসজাত সন্তান ও সন্তানের সন্তানদের মধ্যে বন্টন হবে। যেহেতু ওয়াক্ফ হিসেবে তাদের অধিকার সমান (আয-যাহীরিয়া)।

১৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় জমি ওয়াক্ফ করল, যা তার এক-তৃতীয়াংশের সমান কিন্তু মৃত্যুর আগে আগেই তার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল। ফলে এখন আর এক-

১. অর্থাৎ গোলামকে একথা বলে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ।

তৃতীয়াংশের ভেতরে তা আদায় হয় না, অথবা সম্পদ নষ্ট হয়েছে তার মৃত্যুর পর ওয়ারিসদের হাতে পৌঁছার আগে, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ ওয়াক্ফ হবে এবং দুই-তৃতীয়াংশ ওয়ারিসদের (আল-বাহরুর-রায়িক আল-বায়যাযিয়া'র বরাতে)।

১৭. মাসআলা : যদি ওসীয়াত করে যে, তার মৃত্যুর পর যেন তার জমি গরীব মুসলিমদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয় এক্ষেত্রে ওয়াক্ফকে জমি সম্পদের তৃতীয়াংশের ভেতর হলে, কিংবা তৃতীয়াংশের বেশী হওয়া অবস্থায় ওয়ারিসগণ অনুমোদন করলে তা সব ওয়াক্ফ হবে। ওয়ারিসগণ অনুমোদন না করলে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওয়াক্ফ করা হবে। যদি সে জমি সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতরে হয় এবং তাতে খেজুর গাছ থাকে, যাতে তার মৃত্যুর পর জমি ওয়াক্ফ করার আগেই ফল এসেছে, তবে সে ফলও ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি মৃত্যুর আগে ফল আসে তবে সে ফল মীরাস হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা : কেউ যদি অসুস্থাবস্থায় বিতরণরূপে তার জমি ওয়াক্ফ করে এবং তার মৃত্যুর আগেই তাতে ফল আসে, তবে জমির সংগে ফলটাও ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। অসুস্থাবস্থায় যেদিন ওয়াক্ফ করেছিল, সেদিনই যদি তাতে ফল থাকে, তবে সে ফল ওয়ারিসদের মীরাস হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা : অসুস্থ ব্যক্তি বলল, আমি আমার এই জমি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ করলাম যায়দ, তার সন্তান, সন্তানের সন্তান ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য-যতদিন তার ধারা চালু থাকে এবং তাদের পর মিসকীনদের জন্য। আমার সন্তান বা সন্তানের সন্তানদের মধ্যে কেউ যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে এর ফসল তারাই পাবে অন্য কেউ নয় আর যতদিন তারা অভাবী থাকবে ততদিন এতে তাদেরই অগ্রাধিকার থাকবে। তারপর যে মারা গেল এবং তার ঔরসজাত পুত্রগণ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ল; তো এ অবস্থায় সমস্ত ফসলই তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। ওয়াক্ফদাতার কোন এক ওয়ারিস যদি মারা যায় এবং তারপর তার কোন ঔরসজাত সন্তান অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তা হলে ফসল তাদেরকেই দেওয়া হবে এবং তার অভাবগ্রস্ত সন্তান ও অপরাপর ওয়ারিসদের মধ্যে তা বন্টন করা হবে। তাদের মধ্যে কে মারা গেল তা লক্ষ্য করা হবে না-(আয-যাহীরিয়া)।

২০. মাসআলা : যদি সে বলে থাকে, আমার ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে কেউ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে ন্যায়সংগতভাবে তার খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আয়ের সেই পরিমাণ তার জন্য জারি করা হবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা ওয়াক্ফের ভোজাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, তবে তাও জায়েয। যদি তার সন্তানদের মধ্যে পাঁচজন অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তা হলে পরবর্তী ফসল আসা পর্যন্ত এ বছর তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কতটুকু প্রয়োজন তা বিবেচনা করা হবে। ধরে নেয়া যাক তার পরিমাণ হল একশ' দীনার। তাহলে এই একশ' দীনার তাদের মধ্যে এবং ওয়াক্ফদাতার অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। তো এরূপ বন্টন করার পর দেখা যাবে অভাবগ্রস্তদের ভাগে যা পড়েছে তা তাদের বার্ষিক প্রয়োজন অপেক্ষা কম। কাজেই এ অবস্থায় ওয়াক্ফের আয় হতে তাদেরকে এ পরিমাণ প্রত্যর্পণ করা হবে, যাতে একশ' দীনার পূর্ণ হয় (আল-মুহীত)।

একাদশ পঞ্চিদ : মসজিদ ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে

প্রথম অনুচ্ছেদ : মসজিদ কীভাবে হয় এবং এর বিস্তারিত বিধান।

১. মাসআলা : কেউ মসজিদ নির্মাণ করলে তা থেকে তত্ত্ব পর্যন্ত তার মালিকানা বিলুপ্ত হয় না, যতক্ষণ না সে তা ত্যাগ করে তার মালিকানা হতে পৃথক করে দেয় এবং তাতে সালাত আদায়ের অনুমতি দেয়। রাস্তা পৃথক তো এজন্য করতে হবে, এছাড়া তা কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত হয় (আল-হিদায়া)।

২. মাসআলা : যদি বাস্তিমাঝখানে মসজিদ তৈরি করে মানুষকে তাতে প্রবেশের ও সালাত আদায়ের অনুমতি দেয় তবে রাস্তা দেওয়ার শর্তে তা মসজিদ হবে। এটা সকলের মত। যদি রাস্তা না দেয় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মসজিদ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মসজিদ হবে এবং শর্ত ছাড়া রাস্তা মসজিদের প্রাপ্য হবে (কিনয়া)।

৩. মাসআলা : 'আস-সানকী'-এই আছে, যদি বড় রাস্তা মাঝে তার পৃথক দরজা করে দেয় তবে মসজিদ হয়ে যাবে ইমাম কাযীখান (র) ও এরূপ করছেন (আত-তাতার খানিয়া)।

৪. মাসআলা : যদি কেউ তুল গৃহের উপর মসজিদ তৈরি করে, অথবা মসজিদের উপর যদি ঘর থাকে এবং মসজিদে দরজা রাস্তার দিকে খুলে দেয় তাহলে নিজ মালিকানা হতে পৃথক করে দেয়, তবে সে স্বীকৃতি করতে পারবে এবং সে গুলে তাতে উত্তরাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হবে। হিমাগারটি মসজিদের কল্যাণের জন্যই হলে সে মসজিদ বৈধ হবে, যেমন 'বায়তুল-মুকাদাস' মসজিদে এমন আছে (আল-হিদায়া)।

৫. মাসআলা : কেউ মসজিদের নিচে বা উপরে মসজিদের নির্মাণ কার্যের লক্ষ্যে আয়ের উৎস হিসেবে দোকান করে, তবে সে ইখতিয়ার তার (আয-যাহীরা)।

৬. মাসআলা : (মসজিদ হওয়ার জন্য) সালাত আদায়ের অনুমতি থাকা শর্ত এ কারণে যে, ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মসজিদকে মালিকানা হতে হস্তান্তর করা অপরিহার্য (আল-বাহরুর রায়িক)।

৭. মাসআলা : দাতার অনুমতিক্রমে জামাআতের সালাত সালাত আদায় করা দ্বারা মসজিদের হস্তান্তর সাব্যস্ত হয়। ইমাম আবু হানীফা (র) এ ব্যাপারে দু'রকম বর্ণনা আছে। হাসান (র)-এর বর্ণনা আছে যে, তাঁর মতে দাতার অনুমতিক্রমে তাতে দুই বা

ততোধিক লোকের জামাআতে সালাত আদায় শর্ত। ইমাম মুহাম্মাদ (র) ও তাই বলেন। হাসান (র)-এর বর্ণনাই সঠিক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা : সেই সঙ্গে আরও শর্ত এই যে, সালাত হতে হবে আযান ও ইকামতসহ এবং প্রকাশ্যে, গোপনে নয়। সুতরাং একদল লোক যদি তাতে আযান-ইকামত ছাড়া গোপনে সালাত আদায় করে তবে তাদের দুজনের মতে মসজিদ হবে না (আল-মুহীত; আল-কিফায়া)।

৯. মাসআলা : যদি একই ব্যক্তিকে ইমাম ও মুআয্বিন নিযুক্ত করে এবং সে ব্যক্তি আযান-ইকামত দিয়ে একাকী সালাত আদায় করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে মসজিদ হয়ে যাবে (আল-কিফায়া; ফাতহুল-কাদীর)।

১০. মাসআলা : যদি মসজিদকে তত্ত্বাবধানকারী মুতাওয়াল্লীর হাতে অর্পণ করে দেয় তবে সালাত গুরু না হলেও তা মসজিদ হয়ে যাবে যদিও তাতে এটাই সহীহ (আল-ইখতিয়ার-শারহুল-মুখতার)। বরং এটাই বিগুহতর (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা : এমনিভাবে কাযী বা তার প্রতিনিধির হাতে অর্পণ করলেও তা মসজিদ হয়ে যাবে (আল-বাহরুর রাযিক)।

১২. মাসআলা : কোন স্থানের সহীহ ও অপ্রত্যাহারযোগ্য মসজিদ হওয়ার জন্য দানকে মৃত্যুর পরের সংগে সম্পৃক্ত করা এবং ওসীয়াত করা শর্ত নয়। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। কিন্তু তার মতে অপরাপর ওয়াক্ফে এটা অপরিহার্য (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা : আস-সাদরুশ শাহীদ (র) তাঁর 'আল ওয়াকিআত' শীর্ষক গ্রন্থের 'হিবা' ও 'সাদাকা' অধ্যায়ে উল্লেখ করেন যে, এক ব্যক্তির একটি খালি জায়গা আছে। তাতে কোন ঘর-দুয়ার নেই। সে কিছু লোককে তাতে জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিল। তার এ নির্দেশ তিনভাবে হতে পারে : (ক) হয়ত সে সুস্পষ্ট ভাষায় স্থায়ীভাবে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে, যেমন সে বলল তোমরা এতে সর্বদা সালাত আদায় করতে থাক; (খ) অথবা সে সাধারণ ভাবেই সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে এবং তার নিয়্যত হচ্ছে যে, তারা তাতে সর্বদাই সালাত আদায় করবে। এ দুই অবস্থায় সে জায়গাটা মসজিদ হয়ে যাবে। তার মৃত্যুর পর এতে ওয়ারিসদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না; (গ) অথবা সে দিন বা মাস কিংবা বছরের সময় সীমার জন্য আদেশ করেছে। এ অবস্থায় যে জায়গাটা মসজিদ হবে না। তার মৃত্যুর পর এটা ওয়ারিসদের সম্পত্তি হয়ে যাবে (আয-যাখীরা, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা : মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত একটা ঘরকে মুতাওয়াল্লী মসজিদ বানালো এবং মানুষ তাতে কয়েক বছর সালাত ও আদায় করল, কিন্তু তারপর তারা তাতে সালাত আদায় ছেড়ে দিল। এ অবস্থায় যদি সেটাকে মসজিদের আয়ের কাজে পূর্ণব্যবহার করা হয়, তবে তা বৈধ আছে। কেননা মুতাওয়াল্লী কর্তৃক তাকে মসজিদ বানানোই সহীহ হয়নি (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)।

১৫. মাসআলা : এক রুগ্ন ব্যক্তি তার বাড়িকে মসজিদ বানালো এবং তারপর তার মৃত্যু হয়ে গেল, কিন্তু সে বাড়িটি তার সমস্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের ভিতরে নয়, বরং তার বেশী, ওদিকে ওয়ারিসগণ তা অনুমোদন করছে না। এ অবস্থায় গোটা বাড়িই উত্তরাধিকার সম্পত্তি হয়ে যাবে এবং মসজিদ বানানোটা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা তাতে ওয়ারিসদের হক রয়ে গেছে। কাজেই সে মসজিদ বান্দার হক থেকে পৃথক হল না। সে অবিভাজিত একটা জমিকে মসজিদ বানিয়েছে। কাজেই তা বাতিল হয়ে যাবে, যেমন কেউ যদি তার জমিকে মসজিদ বানায় এবং তারপর তার অবিভাজিত এক অংশে কারও হক প্রমাণিত হয়, তখন অবশিষ্ট অংশও তার মালিকানায় ফিরে আসে। পক্ষান্তরে যদি ওসীয়াত করে যে, তার বাড়ির এক-তৃতীয়াংশকে যেন মসজিদ বানানো হয়, তবে তা সহীহ হবে। কেননা সেক্ষেত্রে পৃথকীকরণ পাওয়া যায়। কারণ বাড়িটি বন্টন করা হবে এবং তা থেকে তিন ভাগের এক ভাগ আলাদা করা হবে। এরপর তাতে মসজিদ বানানো হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৬. মাসআলা : সালাতুল-জানাযার জন্য নির্ধারিত স্থানেও মসজিদের অনুরূপ হুকুম বর্তায়। কাজেই মসজিদকে যা কিছু হতে রক্ষা করা হয়, তা থেকে সে জায়গাকেও রক্ষা করতে হবে। ফকীহ (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে মাশায়খে কিরামের মতভেদ আছে। আর যে স্থান ঈদের নামাযের জন্য স্থিরীকৃত, বিগুহত মত হচ্ছে যে, ইকতিদা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তাও মসজিদ তুল্য, যদিও কাতারসমূহের মধ্যে দূরত্ব থাকে। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সে ব্যাপারে মানুষের প্রতি কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করা যাবে না (আল-খুলাসা)।

১৭. মাসআলা : মসজিদে স্থান সংকুলান না হলে পার্শ্ববর্তী জমি মূল্য দিয়ে জোরপূর্বক হলেও নিয়ে নেয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা : মসজিদের পাশেই মসজিদের জন্য একখণ্ড জমি ওয়াক্ফ আছে। এ অবস্থায় ঐ জমির কিছু অংশে মসজিদ সম্প্রসারিত করতে চাইলে করা যাবে, তবে কঠোর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। ওয়াক্ফ-সম্পত্তির আয়ের জন্য নির্দিষ্ট সম্পত্তি, যেমন বাড়ি ও দোকান প্রভৃতিরও একই হুকুম (আল-খুলাসা)।

১৯. মাসআলা : 'আল-কুবরা'-গ্রন্থে আছে, একটি মসজিদের লোকের ইচ্ছা, তারা চতুরকে মসজিদ এবং মসজিদকে চতুর বানাবে তারা তার জন্য একটি নতুন দরজাও করতে চায় এবং পূর্বের দরজার স্থান পরিবর্তন করাও তাদের ইচ্ছা। তারা তা পারবে কি? হাঁ, সে ইখতিয়ার তাদের আছে। তাদের মধ্যে যদি মতভেদ দেখা দেয় তবে দেখতে হবে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। তাদের মতই অগ্রগণ্য হবে (আল-মুয়ামারাত)।

২০. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রশস্ত রাস্তার উপর মহল্লাবাসী যদি চলাচলের ক্ষতি না করে মসজিদ বানাতে চায়-তাহলে বানাতে পারে, তাতে অপরাধ হবে না এবং বাধা দেয়! বৈধ হবে না (আল-হাবী)।

২১. মাসআলা : 'আল-আজনা' ও 'নাওয়াদীর হিশাম'-এছাড়াও আছে, হিশাম (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্বনুল-হাসান (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, একটি জনপদে বিপুলসংখ্যক লোক বাস করে। সেখানে একটি নদী/খাল আছে। সেটি মাটির নিচ হতে উৎসারিত অথবা তাদের নিজস্ব একটি উপত্যকা হতে প্রবাহিত। তথাকার বাসিন্দাগণ চাইল তার একটি জায়গা ভরাট করে তাতে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবে। তাতে নদীর কোন ক্ষতি হবে না। সে নদী দ্বারা যারা উপকৃত হয় তাদের কেউ তাতে বাধাও দিচ্ছে না। এখন তারা কি তা করতে পারবে? ইমাম মুহাম্মাদ (র) বললেন, হ্যাঁ, তাদের সে অবকাশ আছে যে, জনসাধারণের জন্য বা সেই মহল্লার জন্য তারা সে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা : লোকে যদি মসজিদের একটা অংশকে মুসলিম জনগণের যাতায়াত পথ বানাতে চায়, তবে বলা হয় যে, তাদের সে ইখতিয়ার নেই, এটাই সহীহ মত (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা : মসজিদের ভিতর যদি যাতায়াতপথ বানানো হয়, তবে তা জায়েয, যেহেতু নগরসমূহের জামে মসজিদে এরূপ প্রচলন আছে। সে পথে যাতায়াত করা সকলের জন্যই জায়েয, এমনকি কাফিরের জন্যও। তবে যার উপর গোসল ফরয এবং যে নারীর হায়েয-নিফাস চলছে, তারা সে পথে যেতে পারবে না। এমনিভাবে তাতে পশু (ঢুকানোও জায়েয নয় (আত-তাবয়ীন)।

২৪. মাসআলা : কোন শাসক যদি একদল লোককে এই অনুমতি দেয় যে, তারা দেশের যে কোন জায়গায় মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত দোকান বানাতে পারে এবং তারা তাদের মসজিদও সম্প্রসারণ করতে পারে, তবে লক্ষ্য করতে হবে যে, সে দেশটা যদি শক্তি আরোপে দখল করা হয় তা হলে তার সে আদেশ জায়েয, যদি তাতে চলাচলকারীদের অসুবিধা না হয়। কেননা কোন দেশ শক্তি আরোপের মাধ্যমে জয় করা হলে বিজেতাগণ তার মালিক হয়ে যায়। কাজেই সে সম্পর্কে শাসকের আদেশ বৈধ। আর যদি সন্ধির মাধ্যমে জয় করা হয়, তবে দেশটি তার বাসিন্দাদের মালিকানায়ই বহাল আছে। কাজেই যে সম্পর্কে শাসকের আদেশ জায়েয নয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২৫. মাসআলা : কোন মহল্লার মসজিদ যদি মহল্লাবাসীর পক্ষে ছোট হয়ে যায় এবং তা সম্প্রসারণের কোন সুযোগ না থাকে, এমতাবস্থায় কোনও এক প্রতিবেশী তাদেরকে যদি বলে, সে মসজিদটা যেন তারা তাকে দিয়ে দেয়, তা হলে সে তার বাড়ির ভেতর সেটা ঢুকিয়ে ফেলবে এবং পরিবর্তে তাদেরকে সে এমন একটা জায়গা দেবে, যা মসজিদের পক্ষে আরও ভাল হবে এবং মহল্লাবাসীরও স্থান সংকুলান হবে, তা হলে তারা সেটা করতে পারবে কি? ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, না তাদের জন্য যে অবকাশ নেই (আয-যাখীরা)।

২৬. মাসআলা : 'আল-কুবরা' এছাড়াও আছে কেউ যদি একটি প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ভেংগে আরও মজবুত করে তৈরি করতে চায়, তাহলে তার তার সে অধিকার নেই। কেননা সে তো তার মৃত্যুওয়ালী নয় (আল-মুয়াম্মাত)।

২৭. মাসআলা : 'আন-নাওয়াযিল'-এছে আছে যে, ভেঙে পড়ার আশংকা থাকলে অবশ্য ভেঙ্গে পুনর্নির্মাণ করতে পারবে (আত-তাতার খানিয়া)।

২৮. মাসআলা : উপরোক্ত মাসআলার ব্যাখ্যা এই যে, পুনর্নির্মাণে ব্যক্তি সেই মহল্লার লোক না হলে তার ইখতিয়ার থাকবে না। পক্ষান্তরে সেই মহল্লার হলে মসজিদের পয়সায় নয়; বরং নিজের পয়সায় তা করতে পারবে এবং তাতে নতুন বিছানা বিছাবে ও নতুন বাতি লাগাতে পারবে। অবশ্য কঠোর অনুমোদন সাপেক্ষে মসজিদের টাকা দিয়েও করতে পারবে (আল-খুলাসা)।

২৯. মাসআলা : এমনিভাবে তারা পানি পান করা ও ওয়ূর জন্য পানির কলসও রাখতে পারবে-যদি মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা কে, তা জানা না থাকে। তা জানা থাকলে সে প্রতিষ্ঠারই অগ্রাধিকার (আল-ওয়াজী)।

৩০. মাসআলা : ইব্বন সামাআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করল এবং তারপর তার ইন্তিকাল হয়ে গেল। এরপর মসজিদের লোক সে মসজিদটি ভেংগে বড় করতে চাইল। তো তারা সেটা পারবে কি? তিনি বলেন, তারা তা করতে পারবে। প্রতিষ্ঠাতার ওয়ারিসগণ তাতে বাধা দিতে পারবে না। তারা যদি রাস্তার অংশ নিয়ে মসজিদ বাড়াতে চায়, তবে সে অনুমতি আমি তাদেরকে দেব না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩১. মাসআলা : কেউ যদি নিজের কোন জমিকে মসজিদ বানায় এবং তার কোন কিছুকে নিজের জন্য রাখার শর্ত করে তবে তা সহীহ নয়। এটা সকলেরই মত (আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা : সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, কেউ যদি এই শর্তে মসজিদ বানায় যে, তার ইখতিয়ার থাকবে, তবে ওয়াক্ফ জায়েয হবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে (মুখতারুল ফাতাওয়া)।

৩৩. মাসআলা : আল-খাসুসাফ (র)-এর 'ওয়াক্ফ'-এছে আছে যে, কেউ যদি তার জমিকে মসজিদ বানায় এবং তাতে মসজিদের ঘর তৈরি করে আর শর্তরূপ করে যে, সে তা বাতিল করতে ও বিক্রি করতে পারবে, তবে তার শর্ত বাতিল এবং মসজিদ হয়ে যাবে, যেমন কেউ যদি কোন মহল্লাবাসীর জন্য মসজিদ করে এবং বলে যে, আমি এটা কেবল এই মহল্লার লোকেও তাতে সালাত আদায় করতে পারবে (আয-যাখীরা)।

৩৪. মাসআলা : কোন মসজিদ বিরান এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলে এবং তাতে সালাত আদায় না হলে তাতে ওয়াক্ফদাতা বা তার ওয়ারিসদের মালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারা তা বিক্রি বা ব্যবহার করতে পারবে। তবে বিতর্কিত মতে সেটা স্থায়ীভাবেই মসজিদ থাকবে। (খাযানাতুল মুফতীন)।

৩৫. মাসআলা : 'ফাতাওয়াল-হুজ্জা' এছে আছে যে, যদি দুটি মসজিদের একটি প্রাচীন হয়ে যায় এবং বিরান হওয়ার উপক্রম হয় আর মহল্লার লোক সেটি বিক্রি করে নতুন মসজিদে স্থানান্তরিত করতে চায়, তবে তা জায়েয হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর

মতানুসারে তো জায়েয নয় এ কারণে যে, মসজিদ যদিও বিরান হয়ে যায় এবং তার কোন প্রয়োজন মহল্লাবাসীর না থাকে, তবুও প্রতিষ্ঠাতার মালিকানায় তো তা ফিরে আসে না। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুসারে এ কারণে জায়েয নয় যে, প্রয়োজন না থাকার পর যদিও মসজিদটি মালিকানায় ফিরে আসে কিন্তু তা ফিরে আসে প্রতিষ্ঠাতা বা তার ওয়ারিসদের মালিকানায়। কাজেই উভয় মত অনুসারেই মহল্লাবাসীর তা বিক্রি করার অধিকার থাকতে পারে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত অনুসারেই ফাতওয়া যে, কখনই কোন মালিকের মালিকানায় ফিরে আসবে না (আল-মুযমারাত)।

৩৬. মাসআলা : 'আল-হাবী' গ্রন্থে আছে যে, আবু বকর আল-ইসকাফ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি তার বাড়ির দরজায় নিজের জন্য একটি মসজিদ বানালো এবং তার নির্মাণকার্যের জন্য একখণ্ড জমি ওয়াক্ফ করল। এরপর সে ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে গেল এবং মসজিদটি বিরান হয়ে গেল। এ অবস্থায় ওয়ারিসগণ জানতে চাইল, তারা সেটি বিক্রি করতে পারবে কি? তাদেরকে বিক্রির ফাতওয়া দেওয়া হল। এরপর অন্য লোক সে মসজিদটি নির্মাণ করল। তখন তারা সে জমি দাবী করল। তো তাদের কি দাবী করার ইখতিয়ার আছে? তিনি বললেন, না, তাদের দাবী করার হক নেই (আত-তাতার খানিয়া)।

৩৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি মসজিদে নিজের টাকা দিয়ে চাটাই বিছিয়ে দিল। পরে মসজিদটি বিরান হয়ে গেল এবং তার কোন প্রয়োজন বাকি থাকল না। এ অবস্থায় চাটাইগুলো সেই ব্যক্তির হয়ে যাবে যদি সে জীবিত থাকে আর জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিসদের হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে চাটাইগুলো বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং তার মূল্য মসজিদের প্রয়োজনে ব্যয় করা হবে। সে মসজিদের কোন প্রয়োজন না থাকলে তা অন্য মসজিদে স্থানান্তর করা হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর রায় অনুসারেই ফাতওয়া। কেউ যদি মৃতের কাফন প্রদান করে এবং মৃতের লাশ হিংস্র জন্তুতে ছিঁড়ে ফেলে, তবে কাফনের কাপড় সেই দাতাই পাবে, যদি সে জীবিত থাকে। আর যদি জীবিত না থাকে তবে ওয়ারিসগণ পাবে (ফাতওয়া কাযীখান)।

৩৮. মাসআলা : আবুল লাইস (র) তাঁর 'নাওয়াযিল'-গ্রন্থে বলেন, মসজিদের চাটাই যদি জরাজীর্ণ হয়ে যায় এবং মসজিদের মুসল্লীদের তার কোন প্রয়োজন না থাকে আর তা কোন ব্যক্তির দান হয়ে থাকে, তবে সে দাতা জীবিত থাকলে চাটাই তারই হয়ে যাবে। যদি সে মারা গিয়ে থাকে এবং কোন ওয়ারিস রেখে না যায়, তবে আমার ধারণা মসজিদ কর্তৃপক্ষ তা কোন গরীবকে দিয়ে দিলে বা মসজিদের জন্য অন্য চাটাই কেনার জন্য তা কাজে লাগালে কোন দোষ হবে না। তবে বিতর্কিত মত হচ্ছে যে, কাযীর অনুমতি ছাড়া তাদের জন্য এসব করা জায়েয নয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩৯. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা'-গ্রন্থে আছে, মসজিদের চাটাই যদি এমন পুরাতন হয়ে যায় যে, তা কোন কাজে আসে না, ফলে যে ব্যক্তি তা দিয়েছিল সে চাইল যে, তা নিয়ে যাবে এবং সাদাকা করে দেবে অথবা তার বদলে অন্য চাটাই কিনে দেবে তবে তার জন্য তা জায়েয। সে যদি অনুপস্থিত থাকে এবং মহল্লাবাসী সে পুরাতন চাটাই নিয়ে সাদাকা করতে চায়, তবে সে

চাটায়ের যদি মূল্য থাকে তবে তাদের জন্য তা জায়েয নয় আর যদি তার কোন মূল্য না থাকে, তবে তা করতে পারে (আয-যাখীরা)।

৪০. মাসআলা : মসজিদের শুকনো ঘাস (খড়কুটা) যদি বসন্তকালে বের করে ফেলা হয় এবং তার কোন মূল্য না থাকে, তবে তা বাইরে ফেলে দিলে অসুবিধা নেই। কেউ তা তুলে নিয়ে কাজেও লাগাতে পারে (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)।

৪১. মাসআলা : মসজিদের খড়কুটার যদি মূল্য থাকে তবে কর্তৃপক্ষ তা বিক্রি করে দিতে পারে। যদি ঐষণ্যটি প্রশাসকের গোচরীভূত করে সেটাই ভাল। তারপর তার আদেশক্রমে তা বিক্রি করবে। এটাই গ্রহণযোগ্য মত (জাওয়াহিরুল-আখলাতী)।

৪২. মাসআলা : কোনও লোক যদি মসজিদের খড়কুটা তুলে নেয় এবং তা কুটি কুটি করে ফেলে-তবে তার উপর জরিমানা আসবে। কেননা এর মূল্য রয়েছে। শায়খ আবু হাফস আস-সাফহারদারী (র) তার শেষ জীবনে মসজিদের খড়কুটার জন্য পঞ্চাশ দিরহাম ওসীয়াত করেছিলেন (আল-ওয়াকিআতুল-হুসামিয়া)।

৪৩. মাসআলা : মসজিদের খাটিয়া যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষ তা বিক্রি করতে চায়, তবে উত্তম হচ্ছে বিক্রিটা কাযীর আদেশে হওয়া। বরং সহীহ মত হচ্ছে যে, কাযীর আদেশ ছাড়া তা বিক্রি করা জায়েযই নয় (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৪. মাসআলা : কা'বার গেলাফ হয়ে গেলে তা নিয়ে যাওয়া জায়েয নয়, বরং তত্ত্বাবধায়ক তা বিক্রি করে কা'বার কাজে লাগাবে (আস-সিরাজিয়া)।

৪৫. মাসআলা : মসজিদের বাতির তেল কেনার জন্য ওয়াক্ফ করলে তা রাত ভর ব্যবহার করা জায়েয নয়; বরং মুসল্লীর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ব্যবহার করবে। রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা সালাতের প্রয়োজনে অর্ধেক রাত পর্যন্ত জানানো জায়েয (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

৪৬. মাসআলা : তবে রাত ভর জ্বালানোর রেওয়াজ থাকলে কথা ভিন্, যেমন বায়তুল-মুকাদ্দাস, মাসজিদুন-নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও মাসজিদুল হারাম, অদ্রপ রাতভর জ্বালানোর জন্যই ওয়াক্ফ-করা হলেও জায়েয যেমন আমাদের কালে এমনই রেওয়াজ (আল-বাহরুর রাযিক)।

৪৭. মাসআলা : কেউ যদি মসজিদের বাতি দ্বারা কিতাব পড়াতে চায়, তা হলে দেখতে হবে বাতি মসজিদে কি জন্য দেওয়া হয়েছে। যদি সালাত আদায়ের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে, তবে কেউ কেউ বলেছেন, তাতেও দোষ নেই। আর যদি দেওয়ার উদ্দেশ্য কেবল সালাত আদায় না হয়, যেমন মানুষ সালাত আদায় শেষে নিজ নিজ বাড়ি চলে গেল। কিন্তু বাতি মসজিদে রয়ে গেল, সেক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, রাতের তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত কিতাবের দরস দিলে অন্যায় হবে না। তার বেশী দরস দেওয়ার হক নেই (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ এবং তাতে মুতাওয়াল্লীর ক্ষমতা প্রসঙ্গে

১. মাসআলা : কেউ যদি মসজিদের জন্য মসজিদের নির্মাণ কার্যের জন্য বা তেল, চাটাই প্রভৃতি যা কিছু মসজিদের প্রয়োজন হয় তজ্জন্য এমনভাবে ওয়াক্ফ করতে চায়, যা আর বাতিল হবে না, সে বলবে, আমি আমার এই জমি তার হক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরের জন্য স্থায়ীভাবে এই শর্তে ওয়াক্ফ করলাম যে, এর দ্বারা আয় উপার্জন করা হবে এবং সে আয়টা প্রথমে এর নির্মাণ-সংস্কার; মুতাওয়াল্লীদের বেতন-ভাতা ও এর অপরাপর প্রয়োজনে খরচ করা হবে। তারপর যা বেঁচে থাকবে, তা মসজিদের নির্মাণকার্য, এর তেল চাটাই ও অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করা হবে এবং সে ব্যাপারে মুতাওয়াল্লী স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করার ইখতিয়ার রাখবে। মসজিদের প্রয়োজন না থাকলে তা গরীব মুসলিমদের পেছনে ব্যয় করা হবে (আয-যাহীরিয়া)।

২. মাসআলা : এক ব্যক্তি মসজিদের জমি নিজ জমি ওয়াক্ফ করল, কিন্তু সবশেষে যে তা গরীব-মিসকীনগণ পাবে তা বলল না। তার সে ওয়াক্ফ বৈধ কি না সে ব্যাপারে মাশায়খে কিরামের মতভেদ আছে। গ্রহণযোগ্য মত এই যে, তাদের সকলের নিকটই তা জায়েয (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)।

৩. মাসআলা : মসজিদের নির্মাণ কার্য বা কবরস্থান মেরামতের জন্য ওয়াক্ফ করা জায়েয (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা : মসজিদ বা মাদরাসার জন্য জমি ওয়াক্ফ করা এবং তার ঘর করার জন্য এমন একটা জায়গা নির্ধারণ করা যেখানে মসজিদ-মাদরাসার কোন ঘর ছিল না। এমন ওয়াক্ফের বৈধতা সম্পর্কে পরবর্তীকালের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। সঠিক মতে তা জায়েয। মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার আয়টা গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা সে প্রতিষ্ঠানেই ব্যয় করতে হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৫. মাসআলা : সাদরুশ-শাহীদ (র) 'ওয়াও' অধ্যায়ে উল্লেখ করেন যে, মসজিদ বা মুসলিমদের রাস্তার জন্য জমি সাদাকা করা সম্পর্কে মতভেদ আছে। সঠিক মতে তা ওয়াক্ফের মতই জায়েয (আয-যাহীরিয়া)।

৬. মাসআলা : মসজিদের নির্মাণকার্যে মসজিদের খরচের জন্য বা মসজিদের প্রয়োজনে টাকা দান করা জায়েয। কেননা মাসজিদের জন্য হিবা করে তাকে মালিক বানানোর মাধ্যমে একে সহীহ বলা সম্ভব না হলেও উপরিউক্ত পন্থায় মসজিদের জন্য মালিকানা প্রতিষ্ঠা জায়েয, যা হস্তগতকরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয় (আল-ওয়াকিআতুল-হুসামিয়া)।

৭. মাসআলা : যদি বলে, আমার সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে তা জায়েয হবে না, অবশ্য যদি বলে, তা মসজিদের কাজে খরচ করা হবে, তা হলে জায়েয হবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

৮. মাসআলা : ইবন সামা আ (র) তরে 'নাওয়াদীর' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হস্তবর্ণনা করেন যে, কেউ যদি বলে, আমার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ মসজিদের বাতির জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তবে তা জায়েয হবে না। কিন্তু যদি বলে, তা দিয়ে মসজিদে বাতির ব্যবস্থা করা হবে তা হলে জায়েয (আয-যাহীরিয়া)।

৯. মাসআলা : যদি বলে, আমার বাড়িটি মসজিদের জন্য হিবা করলাম বা মসজিদ দান করলাম, তবে তা সহীহ হবে। এতে মসজিদকে মালিক বানানো হয়, কাজেই হস্তান্তরকারী, যেমন যদি বলে, এই একশ' টাকা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম, তাও মালিক বানানোর পন্থায় সহীহ হয়, যখন তা মুতাওয়াল্লীর হাতে সম্পূর্ণ করে (আল-ফাতাওয়ালা আন্তাবিয়া)।

১০. মাসআলা : যদি বলে, এ গাছটি মসজিদের, তবে মুতাওয়াল্লীর কাছে হস্তান্তর করা পর্যন্ত তা মসজিদের হবে না (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করে যে, নির্মাণকার্যের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা গরীবদের এরপর যদি আয় জমা হয়ে যায় এবং তখন মসজিদের কোন নির্মাণকার্যের প্রয়োজন না থাকে, প্রয়োজন না থাকে, তবে সঠিক মত এই যে, ওয়াক্ফ-সম্পত্তির যদি এ পরিমাণ আয় জমে যায় যে, মসজিদের বা ওয়াক্ফ-সম্পত্তির নির্মাণকার্যের প্রয়োজন হলে সে আয় দিয়ে তা করা যাবে, বরং তারপরও টাকা বেঁচে থাকবে, তা হলেইও গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যাতে ওয়াক্ফদাতার শর্ত এবং ওয়াক্ফ-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ উভয়টাই রক্ষা পায় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১২. মাসআলা : আল-খাসুসাফ (র) বলেন, মসজিদ ভেঙে পড়লে ওয়াক্ফের আয় তা পুনর্নির্মাণ করা যাবে না। কেননা ওয়াক্ফদাতা ওয়াক্ফ করেছে যে সম্পত্তির মেরামতের জন্য সে মসজিদ নির্মাণের তো আদেশ করেনি, কিন্তু ফাতওয়া এই যে, সে আর দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা : আবু বকর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেউ যদি পুণ্য কর্মের জন্য তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওয়াক্ফ করে, তবে তা দিয়ে কি মসজিদে কবির ব্যবস্থা করা যাবে? তিনি বলবেন, হাঁ, তা জায়েয। কিন্তু তা দিয়ে মসজিদে বাড়তি কবির দেওয়া যাবে না-এমনকি রমায়ান মাসে হলেও। এমনভাবে তা দিয়ে মসজিদের সাজসজ্জাও করা যাবে না (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : একটি মসজিদের দরজা বাতাসের দিকে। ফলে দরজায় বৃষ্টির পানি পড়বে এবং দরজা নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের ও মসজিদে ঢুকতে কষ্ট হয়। এ অবস্থায় মুতাওয়াল্লী ওয়াক্ফের আয় দিয়ে মসজিদের দরজার উপর চালা দিতে পারবে। যদি পথ চলাচলকারীর কোন ক্ষতি না হয় (আস-সিরাজিয়া)।

১৫. মাসআলা : ফকীহ আবুল কাসিম (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন একটি মসজিদের একজন মুতাওয়াল্লী আছে। কাযী তাকে ওয়াক্ফের আয় দেখা-শোনার জন্য এ পদে নিযুক্ত করেছিল এবং তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়াও ধার্য করেছিল, যা সে বার্ষিক নিয়মে পাবে। তো সে ব্যক্তি কি ভাতা গ্রহণ করতে পারবে? তিনি বললেন, সংশ্লিষ্ট কাজ অনুযায়ী তা যদি ন্যায্য ভাতা হয় তবে তার জন্য তা গ্রহণ করা হালাল (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা : কাযী মসজিদের জন্য খাদেম নিযুক্ত করতে পারেন, যদি ওয়াক্ফের শর্তে তার উল্লেখ থাকে; অন্যথায় তবে জায়েয হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ-আল-ওয়াকিআত-এর বরাতে)।

১৭. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী মসজিদের ঝাড়ু দেওয়া বা এ জাতীয় অন্য কোন কাজের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক বা মেনে নেওয়া যায় এতটুকু পরিমাণ অতিরিক্ত পারিশ্রমিকে খাদেম নিয়োগ করতে পারবে। যদি তার চেয়েও বেশী পারিশ্রমিক স্থির করে, তবে সে খাদেম নিয়োগটা নিজের পক্ষ থেকেই হবে এবং নিজের পকেট থেকেই তার পারিশ্রমিক মেটাতে হবে। মসজিদের টাকা দিয়ে মেটালে তাকে জরিমানা দিতে হবে। সে খাদেম যদি জানতে পারে যে, ওয়াক্ফের টাকা দিয়ে তার মজুরী শোধ করা হয়েছে তবে তার জন্য তা নেওয়া হালাল হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

১৮. মাসআলা : হিসাব না জানার কারণে মুতাওয়াল্লীর পক্ষে হিসাবে রাখা কঠিন হলে সে মসজিদের টাকায় কেরানী নিযুক্ত করতে পারবে না, (আয-যাখীরা)।

১৯. মাসআলা : ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, মসজিদের আয়ের উৎস হিসেবে ওয়াক্ফ-ভূমি আছে। মুতাওয়াল্লী সেই আয় দ্বারা মসজিদের জন্য তেল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারবে। ওয়াক্ফদাতা যদি মুতাওয়াল্লীকে সে অবকাশ দিয়ে থাকে এবং বলে যে, মসজিদের কল্যাণে তুমি যা কিছুই করা প্রয়োজন মনে কর তাই করতে পারবে, তবে মুতাওয়াল্লী মসজিদের জন্য যা ইচ্ছা কিনতে পারবে। যদি ওয়াক্ফদাতা তাকে সেরূপ অবকাশ না দেয়, বরং সে মসজিদ নির্মাণ ও তার সংস্কার কার্যের জন্য ওয়াক্ফ করে থাকে তা হলে উপরিউক্ত কিছু কেনার ইখতিয়ার তার থাকবে না। আর এ বিষয়ে ওয়াক্ফদাতার শর্ত আসলে কী ছিল তা যদি জানা না যায়, তবে বর্তমান মুতাওয়াল্লী তার প্রাক্তন মুতাওয়াল্লীদের কর্মপন্থা লক্ষ্য করবে। তারা জমি মসজিদের অর্থ দ্বারা তেল, চাটাই, খড়-কুটা ইট প্রভৃতি কিনে থাকে তবে তার জন্যও তা জায়েয হবে অন্যথায় জায়েয নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা : যদি নির্মাণ কার্যের জন্য ওয়াক্ফ করে তবে তা মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পাকা করার কাজে খরচ করা যাবে, মসজিদ অলঙ্করণ করার পেছনে ব্যয় করা যাবে না। যদি বলে, মসজিদের যথার্থ প্রয়োজনে ওয়াক্ফ করা হল, তবে তা তেল ও চাটাই কেনার জন্য খরচ করা যাবে (খাযানাতুল মুফতীন)।

২১. মাসআলা : মসজিদ নির্মাণ কার্যে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির কোন একটা অংশকে তার তদারকির জন্য স্থির করা হলে মুতাওয়াল্লীর নেই। যদি তা করে তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা : 'আল-মুতাওয়াল্লী আস-সুগ্গরা-এহে' আছে মুতাওয়াল্লী যদি মসজিদের ওয়াক্ফের অর্থ মসজিদের জন্য খরচ করে তবে তা জায়েয (আল-মুলাসা)।

২৩. মাসআলা : মসজিদ নির্মাণ কার্যে ওয়াক্ফ করা হলে মুতাওয়াল্লী তা দিয়ে মসজিদের ছাদ পরিষ্কার করার জন্য ~~কাজ~~ সিঁড়ি কিনতে পারবে কিংবা মসজিদের আয় দ্বারা কি সেই ব্যক্তির মজুরী দিতে পারবে মসজিদের ছাদ পরিষ্কার করে এবং বরফ বা জমা মাটি ফেলে দেয়? আবু নাসর (র) ~~বলেন~~ না করলে মসজিদ নষ্ট হয় এমন যে-কোন কাজ করার ইখতিয়ার মুতাওয়াল্লীর ~~আছে~~ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৪. মাসআলা : মসজিদ ~~নির্মাণ~~ ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় দ্বারা প্রয়োজনে মসজিদের জন্য মিনার তৈরি করা যাবে, ~~কিন্তু~~ পাশের লোকদের পক্ষে আযান শোনা সহজ হয়। যদি মিনার ছাড়াই তারা আযান ~~কর~~ তবে তা জায়েয নয় (খাযানাতুল মুফতীন)।

২৫. মাসআলা : ~~একটি~~ মসজিদের পার্শ্বে এমন কোন স্থাপনা রয়েছে যা মসজিদের দেওয়ালের জন্য ক্ষতিকর ~~অথবা~~ মুতাওয়াল্লী ও মসজিদের সংশ্লিষ্ট লোক ক্ষতি হতে দেওয়ালকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে যদি মসজিদের টাকা দিয়ে দেওয়ালের পাশে প্রাচীর তৈরি করতে চায়, তা পারবে ~~কিন্তু~~ কিরাম বলেন, ওয়াক্ফ যদি মসজিদের 'মাসালিহ' বা প্রয়োজনীয় কার্যের ~~জন্য~~ তবে মুতাওয়াল্লীর জন্য তা জায়েয আর যদি ওয়াক্ফ হয় নির্মাণ কার্যের ~~জন্য~~ জায়েয নয়। কেননা এটা নির্মাণকার্যের অন্তর্ভুক্ত নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৬. মাসআলা : বিজ্ঞ ~~মত~~ সেটাই, যা ইমাম জাহীরুদ্দীন (র) বলেছেন, তিনি বলেন, মসজিদের নির্মাণ কার্য ~~(ইয়া)~~ এর জন্য ওয়াক্ফ করা আর মাসালিহের জন্য ওয়াক্ফ করা একই কথা (ফাতহুল কাদীর)।

২৭. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী ~~জন্য~~ মসজিদের বাতি নিজ ঘরে নিয়ে যাওয়া জায়েয নয়। হাঁ ঘর থেকে চাইলে মসজিদের ~~অর্থ~~ আসতে পারে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা : মসজিদ ~~নির্মাণ~~ মুতাওয়াল্লী জানাযার খাঁটিয়া কিনতে পারবে (আস-সিরাজিয়া)।

২৯. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা যদি মসজিদের আয় দ্বারা কাপড় কেনে এবং গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে তবে তা জায়েয ~~নয়~~। কাপড়ের মূল্য হিসেবে মসজিদের যে টাকা খরচ করবে তা নিজ পকেট হতে তাকে ~~শোধ~~ করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি মসজিদের আয় দ্বারা কোন দোকান বা বাড়ি কেনে যাতে মসজিদের লাভ হয় এবং ~~প্রাক্তন~~ সময় বিক্রি করতে পারে তবে তা জায়েয যদি কেনবার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়ে থাকে। ~~কিন্তু~~ যখন জায়েয তখন বিক্রিও জায়েয হবে (আস-সিরাজিয়া)।

৩১. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি মসজিদের সীমানায় বা তার চত্বরে দোকান তৈরি করে তবে তা জায়েয হবে না। কেননা দোকান বা বাসস্থান বানালে মসজিদের মর্যাদা নষ্ট হয়, যা বৈধ নয়, চত্বর মসজিদের অধীন। কাজেই তার হুকুম মসজিদেরই হুকুমের অনুরূপ (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩২. মাসআলা : মসজিদের মুতাওয়াল্লীর কাছে ওয়াক্ফের আয় জমে গেলে সে যদি তা দিয়ে ঘর বানায় এবং মুআযযিনকে তাতে বাস করতে দেয়, তবে মুআযযিনের জন্য জেনেগুনে তাতে বাস করা মাকরুহ। কেননা সে ঘর ওয়াক্ফ-সম্পত্তির আয়ের উৎসস্বরূপ আর এরূপ ঘরে ইমাম ও মুআযযিনের বাস করা মাকরুহ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা : যে আয়ের কোন অংশ মসজিদের ইমাম বা মুআযযিনের পেছনে যদি খরচ করতে চায় তবে তার জন্য তা জায়েয নয়। হাঁ, ওয়াক্ফদাতা ওয়াক্ফের মাঝে সে শর্ত করলে তখন জায়েয হবে (আয-যাখীরা)।

৩৪. মাসআলা : ওয়াক্ফদাতা যদি ওয়াক্ফকালে শর্ত করে যে, আয়ের একটা অংশ ইমামকেও দেওয়া হবে এবং তার পরিমাণও যদি বলে দেয়, তবে ইমাম গরীব হলে তাকে তা দেওয়া যাবে। আর যদি ধনী হয় তবে তার জন্য তা হালাল নয়। ফুকাহায়ে কিরাম ও মুআযযিনদের জন্য ওয়াক্ফেরও এই একই হুকুম (আল-খুলাসা)।

৩৫. মাসআলা : মসজিদ কর্তৃপক্ষ যদি মসজিদের ফসল অথবা মসজিদের ভগ্ন সামগ্রী কাযীর অনুমতি ছাড়া বিক্রি করে তবে বিগত মতে তা জায়েয নয় (আস-সিরাজিয়া)।

৩৬. মাসআলা : কোন মসজিদের দেওয়াল যদি পার্শ্ববর্তী রাস্তার পাশের নালা/খালের পানিতে ভেঙে পড়ে অথবা সে নালায় তীর যদি ভেঙে যায় তবে মসজিদের অর্থ দ্বারা সে নালায় সংস্কারও মেরামতের কাজে খরচ করা যাবে? ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন, নালাটির মেরামতে যে খরচ হবে তা যদি দেওয়ালের সংস্কারে প্রয়োজনীয় ব্যয় অপেক্ষা বেশী না হয় তবে জায়েয হবে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে নালা ব্যবহারকারীদেরকে তা ব্যবহার করতে এবং যে মেরামত দ্বারা উপকৃত হতে বাধা প্রদান করতে পারবে যাবত না তারা সংস্কার ও মেরামতের টাকা পরিশোধ করে। এরপর তারা সে টাকা মসজিদের নির্মাণকার্যে ব্যয় করবে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে নালাটির ব্যবহারকারীদের সংগে যোগাযোগ করতে পারে যে, তারা যেন সেটি সংস্কার করে। তারা যদি তার সংস্কার না করে এবং পরিণামে মসজিদের প্রাচীর ধসে যায় বা ভেঙে পড়ে তবে তাদের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৭. মাসআলা : ইমাম শায়খ শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) তার 'নাফাকাত' গ্রন্থে বালার্থের মাশাইখের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মসজিদের যদি ওয়াক্ফ সম্পত্তি থাকে, কিন্তু তার কোন মুতাওয়াল্লী না থাকে, পরিশেষে মহল্লাবাসীদের কোনও একজন উদ্যোগী হয়ে সমস্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং চাটাই, খড়কুটা ইত্যাদি যা কিছু মসজিদের প্রয়োজন দেখা দেয় সে সবের পেছনে খরচ করে তবে সে যা-কিছু করবে তজন্য তার উপর জরিমানা

আসবে না। এটা ইসতিহসান সম্মত ফায়সালা। অবশ্য এটা তার ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার ব্যাপার। কাজেই যদি বিষয়টা প্রশাসনকে জানানো হয় এবং সে ব্যক্তি তা স্বীকার করে তবে প্রশাসন তার উপর জরিমানা আরোপ করবে (আয-যাখীরা)।

৩৮. মাসআলা : মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত-সম্পত্তির অতিরিক্ত আয় কি গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা যাবে? কেউ বলেন, না, তা করা যাবে না এবং এটাই সহীহ। বরং তা দিয়ে মসজিদের জন্য আয়কর কিছু কিনবে (আল-মুহীত)।

৩৯. মাসআলা : কাযী ইমাম শামসুল-ইসলাম মাহমুদ আল-আযওয়াজান্দী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন এক মসজিদের লোক মসজিদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি ইজারা দিল, অথচ তার মুতাওয়াল্লী আছে। তাদের যে কাজটা কি জায়েয? তিনি বললেন, না জায়েয নয়, বাকি যা মসজিদের জন্য কল্যাণকর কাযী তা কার্যকর করবে। জিজ্ঞেস করা হলো, কাজটা যদি এক ব্যক্তি করে তবে তার ও একাধিক ব্যক্তি করার মধ্যে কি প্রভেদ হবে? তিনি বললেন, এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণকারীকে অবশ্যই মহল্লার শ্রেষ্ঠ, নেতৃস্থানীয় ও সিদ্ধান্তদাতা পর্যায়ের হতে হবে (আয-যাখীরা)।

৪০. মাসআলা : 'আল-ফাতাওয়া আন-নাসাফিয়া'-গ্রন্থে আছে, এক মহল্লাবাসী মসজিদের নির্মাণ কার্যের জন্য মসজিদের ওয়াক্ফ-সম্পত্তি বিক্রি করল। সে বিক্রিটা জায়েয কি? নাসাফী (র) বললেন, না, কাযীর অনুমতিক্রমে ও অনুমতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই তা জায়েয নয়' (আয-যাখীরা)।

৪১. মাসআলা : নাজমুদ-দীন আন-নাসাফী (র)-এর 'ফাওয়াইদ'-এ আছে, মসজিদের লোক যদি মসজিদের আয় দ্বারা কোন স্থাবর সম্পত্তি কেনে, এরপর মসজিদের নির্মাণকার্যের জন্য তা বিক্রি করে, তা জায়েয কি না এ ব্যাপারে মাশায়খে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে সঠিক কথা হল যে, তা জায়েয (আল-গিয়াছিয়া)।

৪২. মাসআলা : মসজিদ তৈরির পর বেঁচে যাওয়া সরঞ্জাম বলেন, তা মসজিদের নির্মাণকার্যেই ব্যয় করতে হবে। মসজিদের তেল, চাটাই ইত্যাদিতে ব্যয় করা যাবে না। এটা সেই অবস্থার কথা, যখন এসব সামগ্রী মসজিদ নির্মাণের জন্য মুতাওয়াল্লীর কাছে সমর্পণ করা হয়। তা না হলে তারা তা যে কোনও কাজেই ব্যবহার করতে পারবে (আল-বাহরুর-রায়িক, আল-ইসআফের বরাতে)।

১. আয-যাখীরা : গ্রন্থে উদ্ধৃত পূর্ণ উত্তরটি নিম্নরূপ : আরও জিজ্ঞেস করা হল যে, কেউ বলেন, মসজিদের লোক যদি মসজিদের আয় দ্বারা মসজিদের জন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি কেনে, মসজিদের নির্মাণ কার্যের জন্য তারা কি সেটা বিক্রি করতে পারবে? তিনি বললেন, এ বিষয়ে মাশায়খে কিরামের মতভেদ আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের মতভেদ না থাকাই উচিত ছিল। কেননা মসজিদের জন্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের ইখতিয়ারই তো মসজিদের লোকদের নেই। কাজেই মসজিদের জন্য তাদের সে কেনাটাই সহীহ হয়নি। সুতরাং তাদের বিক্রিটা সর্বসম্মতিক্রমেই সহীহ হওয়া উচিত। হাঁ, কাজটা যদি মুতাওয়াল্লী করে তখনকার কথা ভিন্ন। এর দ্বারা এ গ্রন্থে উদ্ধৃত অংশ 'কাযীর অনুমতিক্রমে ও তার অনুমতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই তা জায়েয নয়'-এর অর্থ পরিষ্কৃত-সম্পাদক।

৪৩. মাসআলা : মসজিদের ওয়াক্ফ জমি চাষাবাদের অনুপযোগী হওয়ার জনসাধারণের জন্য পুকুর খনন করে তবে সে পানি ব্যবহার করা মুসলিমদের জন্য জায়েয হবে না (আল-কিন্য়া)।

৪৪. মাসআলা : কিছু সম্পত্তি কল্যাণমূলক খাতেও অনির্দিষ্টভাবে গরীবদের জন্য ওয়াক্ফকৃত এবং আরও কিছু সম্পত্তি ওয়াক্ফকৃত রয়েছে জামে মসজিদের জন্য। এরপর মুসলিমদের উপর রোমানদের আক্রমণ বা এ জাতীয় কোন বিপর্যয় আসল এবং তা মুকাবিলা করার জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা দিল। এ অবস্থায় যে ওয়াক্ফ-সম্পত্তি তাতে ব্যয় করা যাবে কি? জামে মসজিদের জন্য যে সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার উপস্থিতি কোন প্রয়োজন যদি মসজিদের না থাকে, তা হলে কাযী তা সেক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু সেটা করতে হবে ঋণস্বরূপ। গণীমতের মালে সেটা মসজিদের পাওনা থাকবে। আর যে সম্পত্তি ওয়াক্ফ করা হয়েছে গরীবদের জন্য, সেটা তিন রকমের হতে পারে। তা হয়ত নিছক গরীবদের পেছনে খরচ করা হয় অথবা সেই সব ধনীদেব পেছনে খরচ করা হয়, যারা মুসাফির অবস্থায় আছে অথবা মুসাফির নয় এমন ধনীদেব পেছনে খরচ করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় তা বিপর্যয় মুকাবিলায় ব্যয় করা যাবে এবং তা ঋণ হিসেবে দেওয়া অপরিহার্য নয় আর তৃতীয় অবস্থায় মাসআলাটি দু'রকমের হতে পারে। (ক) মুসলিম কোন কাযী (বিচারপতি) সেটা হয়ত জায়েয মনে করবেন অথবা (খ) জায়েয মনে করবেন না। যদি জায়েয মনে করেন, তবে ঋণের পদ্ধতি ছাড়াই তা ব্যয় করা বৈধ হবে আর দ্বিতীয় অবস্থায় ঋণ হিসেবে ব্যয় করা যাবে, যা গণীমতের সম্পদে ওয়াক্ফের পাওনা হয়ে থাকবে (আল-ওয়াকিআতুল-হসামিয়া)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : চৌকি, কবরস্থান, সরাইখানা, রাস্তা ও
জলাধারের জন্য ওয়াক্ফ এবং কবরস্থান ও ওয়াক্ফ ভূমির
গাছপালা সংক্রান্ত মাসাইল।

১. মাসআলা : ব্যক্তি যদি মুসলিমদের জন্য জলাধার বা মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা অথবা সেনাচৌকি কিংবা কবরস্থান তৈরি করে তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে প্রশাসনের রায় না হওয়া পর্যন্ত তা থেকে সে ব্যক্তির মালিকানা বিলুপ্ত হবে না (আল-হিদায়া)।

২. মাসআলা : (আর মালিকানা বিলুপ্ত হবে) যদি মৃত্যুর পরের সংগে সে দানকে সম্পূর্ণ করে তখন তা ওসীয়াত হয়ে যাবে, ফলে মৃত্যুর পর অবধারিত হয়ে যাবে। অবশ্য মৃত্যুর আগে সে তা প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। যেমন গরীবদের জন্য ওসীয়াত সংক্রান্ত মাসাইলে বলা হয়েছে (ফাতহুল কাদীর)।

৩. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে দাতার কথা দ্বারাই মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মূলনীতি এমনই। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে যখন জলাধার, মুসাফিরখানা, সেনাচৌকি ও কবরস্থান ব্যবহার করা শুরু হবে। তখন মালিকানা বিলুপ্ত হবে। যে কোন এক ব্যক্তি এসব কাজ করলেই যথেষ্ট। কেননা প্রত্যেক শ্রেণীর সকলের পক্ষে করাটা তো কঠিন ব্যাপার। কুয়া ও হাওয়ের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। এগুলো যদি মুতাওয়াল্লীর হাতে সমর্পণ করে তাও সঠিক (আল-হিদায়া)।

৪. মাসআলা : 'আল-মাবসূত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, এসব মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতের উপরই ফাতওয়া এবং এর উপর উম্মতের ইজমা আছে (আল-মুযমারাত)।

৫. মাসআলা : কুয়া ও হাওয়ের পানি নিজে পান করা এবং উট ও গবাদি পশুকে পান করানো এমনিভাবে তা দিয়ে ওয়ূ করা দোষণীয় নয় (আয-যাহীরিয়া)।

৬. মাসআলা : পানি পানের জন্য জলাধার ওয়াক্ফ করা হলে কেউ যদি তাতে ওয়ূ করতে চায়, তবে সে ব্যাপারে মাশাইখে কিরামের মতভেদ আছে। যদি ওয়ূর জন্য ওয়াক্ফ করা হয় তবে তা পান করা জায়েয না। যে পানি পান করার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়, এমন কি হাওযও যদি হয়, তা দিয়ে ওয়ূ করা জায়েয নয় (খাযানাতুল-মুফতীন)।

৭. মাসআলা : এমনিভাবে কেউ যদি মিসকীনদের থাকার জন্য নিজ বাড়ি ওয়াক্ফ করে এবং তার তত্ত্বাবধানের জন্য কোন মুতাওয়াল্লীর হাতে তা সমর্পণ করে, তবে সে তা প্রত্যাহার করতে পারবে না। কারণ হয়ত মক্কা মুকাররমায় একটি বাড়ি আছে। সে সেটি হজ্জ ও উমরাহ আদায়কারীদের বাসস্থানরূপে ওয়াক্ফ করল এবং কোন মুতাওয়াল্লীর হাতে

তা সমর্পন করল, যাতে বাড়িটি দেখাশোনা করে এবং যাকে প্রয়োজন মনে করে থাকতে দেয়। এ অবস্থায় সে ব্যক্তি তা আর প্রত্যাহার করতে পারবে না। এমনিভাবে যদি কেউ সীমন্তে অবস্থিত তার বাড়ি মুজাহিদ ও সীমান্তরক্ষীদের অবস্থানস্থল হিসেবে ওয়াক্ফ করে এবং তত্ত্বাবধানের জন্য কোর মুতাওয়াল্লীর কাছে হস্তান্তর করে, তবে সে তা প্রত্যাহার করতে পারবে না। সে ব্যক্তি মারা গেলে সেটা তার উত্তরাধিকারীদের মীরাস হবে না- যদি তখনও পর্যন্ত কেউ তাতে ব্যয় না করে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : এ জাতীয় ওয়াক্ফ-সম্পত্তি ভোগের ব্যাপারে ধনী-নির্ধনের কোন প্রভেদ নেই। সুতরাং মুসাফিরখানা ও চৌকিতে যে-কেউ অবস্থান করতে পারবে। জলাধার থেকে সকলেই পানি পান করতে পারবে এবং কবরস্থানের সকলেরই দাফনের সুযোগ থাকবে (আত-তাব্বীন)।

৯. মাসআলা : মুজাহিদদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির আয় অভাবগ্রস্ত মুজাহিদই শুধু গ্রহণ করতে পারবে; অন্য কেই নয় (খাযানাতুল-মুফতীন, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা : আল-খাসসাফ (র) তার ওয়াক্ফ গ্রন্থে বলেন, কেউ যদি সৈন্যদের অবস্থান করার জন্য নিজ বাড়ি ওয়াক্ফ করে তারপর কোন সৈন্য সে বাড়ির কতক অংশে অবস্থান করে এবং কিছু খালি অংশ থাকে, এখনও পর্যন্ত কেউ তাতে অবস্থান না করে, তা হলে মুতাওয়াল্লীকে আদেশ করা উচিত যে, যেন বাড়ির যে অংশ থাকার প্রয়োজনে আসে না তা ভাড়া দিয়ে দেয় এবং তার আয় দিয়ে বাড়ির নির্মাণ-সংস্কার সম্পন্ন করে। যদি কিছু বেঁচে থাকে তা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : 'আন-নাওয়াদির' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি মুসাফিরখানা তৈরি করে এবং তার মেরামতের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, সে বাড়ির একদিকের দু'একটি ঘর আলাদা করে ফেলা হবে এবং তা ভাড়া দেওয়া হবে। তাতে যে আয় হয় তা মেরামতের কাজে ব্যয় করা হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে আরেকটি মত বর্ণিত আছে যে, মানুষকে তাতে এক বছর থাকবার অনুমতি দেওয়া হবে এবং এক বছর ভাড়া দেওয়া হবে। তাতে যে আয় হয় তা দিয়ে মেরামত করা হবে।

জিহাদের জন্য ওয়াক্ফ ঘোড়া কোন মুজাহিদ সওয়ার হলে সেই তার প্রয়োজনীয় খরচাও বহন করবে। যদি কেউ তাতে সওয়ার না হয়, তবে সেটি ভাড়া দিয়ে সেই অর্থ তার পেছনে খরচ করা হবে (আয-যাখীরা)।

১২. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা'- গ্রন্থে আছে, ভাড়া নেওয়ার মত কোন লোক না পাওয়া গেলে সরকার ঘোড়াটি বিক্রি করে দেবে এবং তার মূল্য ওয়াক্ফ করবে। তারপর জিহাদের জন্য বাহনের প্রয়োজন হলে সে মূল্য দিয়ে একটি ঘোড়া কেনা হবে এবং জিহাদে ব্যবহার করা হবে (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা : আল-খাসসাফ (র) তার 'ওয়াক্ফ'- গ্রন্থে বলেন, কেউ যদি হাজীদের অবস্থানের জন্য নিজ বাড়ি ওয়াক্ফ করে, তাহলে কা'বা শরীফের যিয়ারতে রত ব্যক্তিগণ তাতে

বাস করতে পারবে না। হজ্জ মওসুম পার হয়ে যাওয়ার পর সে বাড়ি ভাড়া দিয়ে দেওয়া হবে। ভাড়ার অর্থ তার মেরামতে খরচ করা হবে এবং কিছু বেঁচে থাকলে তা মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করা হবে (আয-যাখীরিয়া)।

১৪. মাসআলা : আবুল-লাইস (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি এই শর্তে মুসলিমদের জন্য চৌকি তৈরি করে যে, সে যতদিন জীবিত আছে ততদিন তারই হতে থাকবে, তা হলে তার হাত থেকে তা মুক্ত করার ক্ষমতা কারও থাকবে না, যাবত না তার দিক থেকে এমন কিছু ঘটে, যাদ্দরুন তা তার হাত থেকে মুক্ত করা আবশ্যিক হয়ে যায়, যেমন সেখানে বসে মদ পান করা বা এ ধরনের অন্য কোন পাপকর্ম করা, যা আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন না (আয-যাখীরা)।

১৫. মাসআলা : গ্রামবাসীরা তাদের মালিকানাধীন জমিকে কবরস্থান বানিয়ে তাতে দাফনও শুরু করল। তারপর গ্রামবাসীদেরই একজন কাঁচা ইট ও কবরের অন্যান্য সামগ্রী রাখার জন্য কবরস্থানের এক জায়গায় একটা ঘর করল এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন লোক সেখানে বসাল, অথচ গ্রামবাসী থাকলে বা তাদের একাংশ তাতে সম্মত নয়। এ অবস্থায় কবরস্থানে যদি অতিরিক্ত জায়গা থাকে তবে সে তা করতে পারে। ইং পরে যদি প্রয়োজন পড়ে তবে ঘরটি ভেঙ্গে সেখানে কবর দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি ওসীয়ত করল তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে যেন এক-তৃতীয়াংশ আলাদা করা হয়। তারপর তার চার ভাগের এক ভাগ যেন অমুক ব্যক্তিকে এবং তিনভাগ তার আত্মীয়-স্বজন ও গরীবদেরকে দেওয়া হয়। তারপর যদি বলে, তোমরা চৌকিতে অবস্থানকারীদের অংশ ছেড়ে দিও না- আর যে অবস্থানকারীরা সকলেই গরীব এবং নির্দিষ্ট একটা চৌকিতে বাস করে, তবে এর দুই অবস্থা হতে পারে। হয়ত তার আত্মীয়-স্বজন গণা-গণতি লোক অথবা তাদের সংখ্যা গণা নয় প্রথম প্রত্যেকের জন্য এক এক ভাগ, গরীবের জন্য একভাগ এবং চৌকিবাসীদের জন্য এক ভাগ স্থির করা হবে। উদাহরণ, আত্মীয়দের সংখ্যা যদি দশজন হয় তবে এক-তৃতীয়াংশের চার ভাগের তিন ভাগকে বারটি ভাগ করা হবে। দশ ভাগ আত্মীয়দেরকে এক ভাগ গরীবদেরকে এবং একভাগ চৌকিবাসীদেরকে দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় এক-তৃতীয়াংশের চার ভাগের তিন ভাগকে তিন ভাগ করা হবে এবং প্রত্যেক শ্রেণীকে এক ভাগ করে দেওয়া হবে (আল-ওয়াকিআতুল হসামিয়া)।

১৭. মাসআলা : কেউ যদি একখণ্ড জমি কিনে সেটিকে মুসলিমদের জন্য রাস্তা বানায় এবং তার পক্ষে সাক্ষী রাখে, তবে তা সহীহ হবে। অবশ্য তা চূড়ান্ত হওয়ার জন্য কোন মুসলিমের সে পথে চলতে হবে। এটা তাদের মত অনুযায়ী, যাদের মতে ওয়াক্ফ চূড়ান্ত হওয়ার জন্য হস্তান্তর শর্ত (আয-যাখীরিয়া)।

১৮. মাসআলা : হিলাল (র) বলেন, এমনিভাবে কোনও লোক মুসলিমদের জন্য সেতু নির্মাণ করলে এবং মুসলিমগণ তাতে যাতায়াত শুরু করলে আর সে সেতুটি ওয়ারিসদের জন্য নির্মাণ না করলে তা ওয়াক্ফ-সম্পত্তি হয়ে যাবো এভাবে হিলাল (র) সেতু নির্মাণ করলে বিশেষভাবে সে সেতুতে উত্তরাধিকার বাতিল করেন (আয-যাখীরা)।

১৯. মাসআলা : হাকিম মাহরাওয়ায়হ (র)- বর্ণনা করেন যে, আমি 'নাওয়াদির'-এ হুজ্জে পেয়েছি, ইমাম আবু হানীফা (র) কবরস্থান ও রাস্তা ওয়াক্ফকে বৈধ বলেছেন, যেমন বৈধ বলেন মসজিদ ওয়াক্ফকে। এমনভাবে কেউ মুসলিমদের জন্য সেতু নির্মাণ করলে যদি তাতে মুসলিমগণ যাতায়াত করে এবং তা ওয়ারিসদের জন্য নির্মাণ না করলে বিশেষভাবে সে সেতুতে মীরাস বাতিল হয়ে যাবে। ফুকাহায়ে কিরাম এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এটা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন সেতুর জায়গাটি সেতু প্রতিষ্ঠাতার মালিকানাধীন না হবে। আর সাধারণত এমনই হয়ে থাকে। কেননা, এটা তো সুস্পষ্ট যে, মানুষ সাধারণ খাল/নদীর উপরই সেতু নির্মাণ করে থাকে। এ মাসআলাটি প্রমাণ করে যে, মূল (জমি) ছাড়া শুধু স্থাপনাও ওয়াক্ফ হতে পারে, যদিও মূলনীতি হচ্ছে যে, জমি ছাড়া স্থাপনার ওয়াক্ফ বৈধ নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা : মুশরিকদের পুরানো কবরস্থানকে মুসলিমদের কবরস্থান বানাতে চাইলে যদি তা থেকে মুশরিকদের সকল চিহ্ন মিটে গিয়ে থাকে তবে তা দোষ নেই, আর যদি তাদের চিহ্ন বাকি থাকে, যেমন হাড়-কংকাল রয়ে গেছে, তা হলে সেগুলো সরিয়ে তারপর সেটিকে মুসলিমদের কবরস্থান বানাতে হবে। কেননা, মসজিদে নববীর স্থানটি মুশরিকদের কবরস্থান ছিল। প্রথমে তা খুঁড়ে ফেলা হয় এবং তারপর মসজিদ বানানো হয় (আল-মুয্মারাত)।

২১. মাসআলা : এক ব্যক্তি মুফতী সাহেবের কাছে এসে বলল, আমি আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য একটি পুণ্যকর্ম করতে চাই এবং সেমতে মুসলিমদের জন্য কোন চৌকি নির্মাণ করতে বা গোলাম আযাদ করতে চাই, অথবা সে তার বাড়ি দ্বারা পুণ্য অর্জন করতে চায় এবং সে মতে বলল, আমি এটি বিক্রি করে তার মূল্য সাদাকা করতে বা তা দিয়ে কোন গোলাম কিনে আযাদ করতে চাই কিংবা সেটিকে মুসলিমদের জন্য নিবাসস্থল বানাতে চাই, এখন বলে দিন আমার জন্য কোনটি উত্তম? ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, তাকে বলা হবে, তুমি যদি কোন চৌকি বানিয়ে দাও এবং তার জন্য জমি ওয়াক্ফ করে দাও আর সে জমিকে চৌকির নির্মাণ-সংস্কারের জন্য আয়ের উৎস রূপে স্থির করে দাও তবে সেটাই উত্তম। কেননা এটা স্থায়ী কাজ এবং এর উপকারিতাও সর্বব্যাপক। যদি চৌকির জন্য কোন জমি ওয়াক্ফ না কর এবং তার নির্মাণ-সংস্কারের জন্য কোন আয়ের উৎস না দাও, তবে উত্তম হচ্ছে বাড়িটি বিক্রি করে দাও এবং তার মূল্য গরীবদের মধ্যে সাদাকা করে দাও (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা : অপেক্ষাকৃত এর চেয়ে কম গুরুত্বের কাজ হচ্ছে বাড়ির বিক্রয়-মূল্য দ্বারা কোন গোলাম কিনে আযাদ করা (আয-যাহীরিয়া)।

২৩. মাসআলা : 'আল-বায়যাযিয়া' গ্রন্থে আছে, জমি বিক্রি করে তার মূল্য সাদাকা করার চেয়ে সে জমি ওয়াক্ফ করাই শ্রেয় (আল-বাহরুর রাযিক)।

২৪. মাসআলা : বিনা ওযরে কবর থেকে লাশ উত্তোলনের অবকাশ নেই, তা দীর্ঘ দিন আগের দাফন হোক বা অল্পদিনের হোক। হাঁ, ওযর থাকলে অবশ্য জায়েয। যদি প্রমাণিত হয় যে, জমিটি জবরদখলকৃত, বা গুফআর ভিত্তিতে হকদার সে জমি হস্তগত করে, তবে সেটা ওযর (আল-ওয়াকিআতুল-হসামিয়া)।

২৫. মাসআলা : কোন চৌকির পশু-সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং খরচ বেড়ে গেল, এ অবস্থায় মৃতওয়ালী কি কিছু পশু বিক্রি করে তার মূল্য পশুর খাবার ও চৌকির মেরামতে ব্যয় করতে পারবে? উত্তর এই যে, কোন পশুর বয়স যদি এত বেশী হয়ে যায় যে, যে কাজের জন্য তা ওয়াক্ফ করা হয়েছে এখন আর তা সে কাজের উপযুক্ত নয়, তবে মৃতওয়ালী তা বিক্রি করতে পারবে। তা না হলে বিক্রি করতে পারবে না; বরং এই চৌকির জন্য যে পরিমাণ পশুর দরকার তা এখানে রাখবে আর অতিরিক্ত পশুগুলো সর্ব নিকটবর্তী চৌকিতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে (আয-যাহীরা)।

২৬. মাসআলা : কাযী ইমাম শামসুল-আইম্মা মাহমুদ আল আযওয়াজান্দী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একটি মসজিদের কোন মুসল্লী নেই। আশপাশ পতিত ভূমি হয়ে গেছে। মসজিদটির আর কারও প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় সেটিকে কবরস্থান বানানো যাবে কি? তিনি বললেন, না। তাকে আরও জিজ্ঞেস করা হল যে, কোন পল্লীর কবরস্থান যদি এতটা পুরাতন হয়ে যায় যে, মৃতদের হাড় বা অন্য কোন চিহ্ন তাতে বাকি নেই। এ অবস্থায় সেটিতে চাষাবাদ জায়েয হবে কি? তিনি বললেন, না। এখনও তার জন্য কবরস্থানের হুকুম প্রযোজ্য (আল-মুহীত)।

২৭। মাসআলা: কবরস্থানে ঘাস থাকলে তা কেটে পশুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে পশু ছেড়ে দেওয়া যাবে না (আল-বাহরুর রাযিক)।

২৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার জমিতে কবরস্থান বানালো অথবা মুসাফিরখানার আয়ের জন্য ওয়াক্ফ করল কিংবা বাসস্থান বানালো। এক্ষেত্রে সেটা যদি খারাজী জমি হয় তবে তার খারাজ রহিত হয়ে যাবে। এটাই সহীহ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৯. মাসআলা : এক স্ত্রীলোক তার জমিকে কবরস্থান বানিয়ে হস্তান্তরও করল। তারপর সেখানে তার একটি সন্তানকে দাফন করল। কিন্তু জলাবদ্ধতার কারণে (বা অন্য কোন কারণে) তা কবরস্থানের উপযুক্ত হলো না, তবে তারপরও কিছু কিছু মানুষ তাতে দাফন করতে আগ্রহী। এ অবস্থায় ঐ স্ত্রীলোক কবরস্থানটিকে বিক্রি করতে পারবে না। আর যদি তা দাফনের এতই অনুপযোগী হয়ে পড়ে যে, মানুষ তাতে দাফনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তবে সে তা বিক্রি করতে পারবে। আর ক্রেতা স্ত্রীলোকটিকে তার পুত্রের লাশ সেখান থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য চাপ দিতে পারবে (আল-মুয্মারাত, আল-কুবরার বরাতে)।

৩০. মাসআলা : কেউ যদি কোন কবরস্থানে নিজের জন্য কবর খোঁড়ে তবে অন্য কেউ কি সেখানে লাশ দাফন করতে পারবে? ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, কবরস্থানে যদি বেশী জায়গা থাকে, তবে তার জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে খননকারীকে বিরক্ত না করা। আর যদি বেশী জায়গা না থাকে তবে অন্য লোকও তাতে লাশ দাফন করতে পারবে। এটা সেই রকম, যেমন কোন লোক

১. এটা ইমাম য়াযলাঈ (র) 'জানাইয' অধ্যায়ে যা বলেছেন তার পরিপন্থী নয়। তিনি বলেছেন যে, লাশ যদি পুরানো হয়ে মাটিতে মিশে যায় তবে তাতে চাষাবাদ করা বা ঘর তোলা জায়েয। পরিপন্থী নয় এ কারণে যে, এস্থলে চাষাবাদের জন্য বাধা হচ্ছে যে, এ স্থানটিই দাফনের জন্য ওয়াক্ফ। কাজেই দাফন ছাড়া অন্য কোন কাজে এর ব্যবহার জায়েয হবে না। বিষয়টি ভাল করে চিন্তা করতে হবে ও বুঝতে হবে -সম্পাদক।

যদি মসজিদে জায়নামায বেছায় অথবা চৌকিতে অবস্থান নেয়, তারপর অন্য কেউ আসে, তবে জায়গা বেশী থাকলে সে প্রথম ব্যক্তিকে বিব্রত করবে না। তবে অন্য কেউ সে খননকৃত কবরে লাশ দাফন করলে তা মাকরুহ হবে না (আয-যাহীরিয়া)।

৩১. মাসআলা : অন্যের জমিতে যদি মালিকের অনুমতি ছাড়া লাশ দাফন করা হয় তবে মালিকের ইখতিয়ার থাকবে। সে চাইলে তাতে সম্মত থাকতে পারে এবং চাইলে লাশ সরিয়ে ফেলারও আদেশ করতে পারে। আবার চাইলে মাটি সমান করে তাতে চাষাবাদও করতে পারবে। কেউ যদি এমন কবরস্থানে কবর খনন করে, যেখানে তার জন্য খনন করা বৈধ, তারপর অন্য কেউ তাতে লাশ দাফন করে, তবে সে লাশ খুঁড়ে ফেলা হবে না, বরং তার খনন কার্যের পারিশ্রমিক মেটাতে হবে, যাতে উভয়ের হক রক্ষা পায় (খাযানাতুল-মুফতীন; আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা : একদল লোক 'জায়হুন' নদীর তীরে একটি পতিত জমি আবাদ করল। মুসলিম শাসক তাদের কাছ থেকে উশর আদায় করত। সেই জমির পাশে একটি চৌকি রয়েছে। চৌকির মুতাওয়াল্লী শাসকের কাছে গিয়ে আর্জি জানালে শাসক তাকে উশর তোলার অনুমতি দিল। এখন মুতাওয়াল্লীর জন্য কি জায়েয হবে সে, সেই উমর এই চৌকিতে আযানের দায়িত্বে নিয়োজিত মুআযযিনের পেছনে খরচ করবে। যাহারা যে তার ভরণ-পোষণের প্রয়োজন মেটাবে? এবং মুতাযযিনের পক্ষেও কি শাসক কর্তৃক অনুমোদিত সেই উশর গ্রহণ বৈধ হবে? ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন, মুআযযিন গরীব হলে তার জন্য তা বৈধ। মুতাওয়াল্লীর জন্য 'উশরের সে অর্থ চৌকির নির্মাণ কার্যে খরচ করা জায়েয নয়। সে তা কেবল গরীবদের পেছনেই খরচ করবে। অন্য কোন কাজে খরচ করতে পারবে না। যদি সে অর্থ গরীবদেরকে দিয়ে দেয় তারপর গরীবগণই একত্র হয়ে চৌকির নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করতে চায় তবে তা জায়েয হবে, বরং সেটা ভাল কাজই হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা : এমনিভাবে যার উপর যাকাত ফরয সে যদি তার যাকাত মসজিদ নির্মাণ বা সেতু তৈরিতে খরচ করতে চায় তা জায়েয হবে না। হাঁ, যদি কৌশল অবলম্বন করতে চায় তবে তা একরূপ হতে পারে যে, মুতাওয়াল্লী তা গরীবদেরকে দিয়ে দেবে এবং গরীবগণ আবার তা মুতাওয়াল্লীকে দেবে। মুতাওয়াল্লী তা মসজিদের কাজে খরচ করবে (আয-যাহীরিয়া)।

৩৪. মাসআলা : কোন সরাইখানার গাছে ফল আছে তবে বাজারে তার কোন মূল্য নেই যেমন তুত ইত্যাদি, তাহলে মুসাফিরগণ তা খেতে পারে। আর যদি তার মূল্য থাকে তবে তা থেকে বেঁচে থাকাই দীনের পক্ষে অধিকতর সতর্কতার পরিচায়ক। কেননা এমন তো হতেই পারে যে, তা গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, মুসাফিরদের জন্য নয়। পক্ষান্তরে যদি জানা তা গরীবদের জন্য ওয়াক্ফকৃত, তবে গরীব ছাড়া অন্য কারও জন্য তা গ্রহণ করা হালাল নয় (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)।

৩৫. মাসআলা : আবুল-লাইস (র)-এর 'ফাতাওয়া'-এর আছে, গরীবদের বসবাসের জন্য ওয়াক্ফকৃত এক বাড়ির খাদেমকে কেউ দশটি টাকা দিল এবং আদেশ করল, তা দিয়ে যেন রুটি ও গোশত কিনে আনে। তারপর সে বাড়িতে অবস্থানকারীদেরকে তা খেতে দেয়। কিন্তু সে দিন রুটি-গোশত কেনার কোন দরকার ছিল না। কেননা এর আগে সে রুটি-গোশত কিনেছিল।

কিন্তু সে তা কিনেছিল বাকিতে। এখন এই দশ টাকা দিয়ে যদি সে বাকি শোধ করতে চায়, তবে সে অনুমতি নেই। তেমন করলে জরিমানা দিতে হবে (আল-মুহীত)।

কবরস্থান ও ওয়াক্ফ-ভূমির গাছ-পালা সংক্রান্ত মাসাইল

১. মাসআলা : কোন কবরস্থানে বড় বড় গাছ আছে। সে গাছ আবার দূরকন্মের হতে পারে; (ক) হয়ত সে জমিতে কবরস্থান বানানোর আগেই গাছগুলো উদ্গত হয়েছিল অথবা (খ) কবরস্থান বানানোর পরে উদ্গত হয়েছে।

প্রথম অবস্থায় মাসআলা দু'রকমের হবে: (ক) হয়ত সে জমি কারও মালিকানাধীন ছিল, অথবা (খ) সেটি পতিত ভূমি ছিল-তার কোন মালিক ছিল না। পল্লীবাসী সেই পতিত ভূমিকেই কবরস্থান বানিয়েছে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে মূলসহই সে গাছের মালিক হবে জমিওয়ালা। সে তার ইচ্ছানুযায়ী গাছ ও মূল ব্যবহার করবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গাছগুলো মূলসহ তার পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকবে।

দ্বিতীয় অবস্থায়ও মাসআলার দুটি রূপ হতে পারে; (ক) যে গাছকে রোপণ করেছে তা হয়ত জানা থাকবে অথবা (খ) তা জানা থাকবে না। প্রথম ক্ষেত্রে রোপণকারীই গাছের মালিক হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিষয়টি কাযীর ফায়সালার উপর নির্ভরশীল। কাযী যদি মনে করে, তা বিক্রি করত তার মূল্য কবরস্থানের সংস্কার কার্যে ব্যয় করবে তবে সে ইখতিয়ার তার আছে (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)।

২. মাসআলা : কেউ যদি মসজিদের জমিতে গাছ লাগায় তবে সে গাছ মসজিদেরই হবে। কোন চৌকির জন্য ওয়াক্ফকৃত জমিতে গাছ লাগালো সে গাছ ওয়াক্ফ-সম্পত্তির হয়ে যাবে। ওয়াক্ফদাতা যদি তার কোন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত না করে থাকে তবে গাছটি তার হবে এবং সে চাইলে তা উপড়েও ফেলতে পারে। সর্বসাধারণের রাস্তায় কেউ গাছ লাগালে রোপণকারী তার মালিক হবে। এমনিভাবে জনগণের নদী/খালের তীরে বা পল্লীর জলাশয়ের তীরে বৃক্ষরোপণ করলে তারও মালিক রোপণকারী (আয-যাহীরিয়া)।

৩. মাসআলা : যদি সে গাছ কেটে ফেলে এবং তার মূল থেকে নতুন গাছ গজায় তবে তাও রোপণকারীর (ফাতহুল কাদীর)।

৪. মাসআলা : নদীর দুই তীরে রাস্তার উপর কিছু গাছ আছে। নদীর জল ভোগকারীদের মধ্যে তা নিয়ে বিরোধ দেখা দিল। জানা নেই সে গাছ কে লাগিয়েছে। রাস্তার পাশে এক ব্যক্তির বাড়ি আছে। তার দরজা দিয়ে নদীটি প্রবাহিত। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, একরূপ ক্ষেত্রে দেখতে হবে, গাছগুলোর জায়গা কার মালিকানাধীন, যদি পানি ভোগকারীদের মালিকানাধীন হয়ে থাকে, তবে তাদের সে জমিতে যেসব গাছ উদ্গত হয়েছে তার রোপণকারী অজ্ঞাত হলে গাছগুলো তাদেরই হবে। আর যদি ভোক্তাগণ সে জমির মালিক না হয়ে থাকে, বরং তাদের অধিকার কেবল পানির প্রবাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে দেখতে হবে বাড়িটির মালিক যখন বাড়ি কিনেছিল তখন গাছগুলো এই স্থানে ছিল কিনা। যদি থাকে তবে বাড়ির মালিক সে গাছের

অধিকারী হবে না। আর তা যদি জানা না যায়, তবে বাড়িওয়ালাই সে গাছের মালিক হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা : সাদরুশ-শাহীদ (র) তার 'ওয়াকিআত' গ্রন্থে বলেন, সে ব্যক্তির বাড়ির চত্বরের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হওয়া উচিত (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা : যে বৃক্ষের পাতা, ফল ও কাণ্ড উপকারে আসে তার ওয়াক্ফ করলে ওয়াক্ফ জায়েয হবে। তারপর তার কাণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় কাটা যাবে না। কেবল সেই ক্ষেত্রেই কাটা যাবে যখন তার মূল না কাটলে সে গাছ কোন কাজে আসে না। যেমন গাছটির সমস্ত ডালপালা যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে। অথবা গাছটাই এমন যে তা কাজে লাগাতে হলে কাণ্ড থেকে কাটতে হয়। তখনও কাটা যাবে। তারপর তা সাদাকা করতে হবে। যখন তার পাতা ও ফল উপকারে আসে তখন কাণ্ড কাটা যাবে না (আল-মুয়মারাত)।

৭. মাসআলা : কেউ যখন মসজিদের জন্য মূলসহ গাছ ওয়াক্ফ করে তারপর গাছটি শুকিয়ে যায় বা তার অংশ-বিশেষ শুকিয়ে যায়, তখন শুকনো অংশটি কেটে ফেলা হবে এবং বাকি অংশ রেখে দেওয়া হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা : গরীবদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জমি এক ব্যক্তি মুতাওয়াল্লীর নিকট থেকে ইজারা নিল। তারপর তাতে গোবর ফেলল ও গাছ লাগাল। তারপর ইজারা গ্রহীতার মৃত্যু হয়ে গেল। এ অবস্থায় উত্তরাধিকারসূত্রে গাছগুলো তার ওয়ারিসগণ পাবে। তাদেরকে সে গাছ কেটে ফেলতে বাধ্য করা হবে। গোবর ফেলার ফলে জমির শক্তি বৃদ্ধির বিনিময় তারা গ্রহণ করতে পারবে না। (আয-যাখীরা)।

৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি রাজপথে গাছ লাগাল। তারপর তার মৃত্যু হয়ে গেল। তার দুই পুত্র আছে। এক পুত্র তার অংশ মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করল। এখন তা কি মসজিদের হয়ে যাবে? না, তা মসজিদের হবে না (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)।

১০. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার জমিতে নিজের জন্য গাছ লাগাল এবং সুস্থাবস্থায় স্ত্রীকে বলল, আমি মারা গেলে এসব গাছ বিক্রি করো এবং সে টাকা আমার কাফন, গরীবদের জন্য খাবার এবং অমুক মসজিদের বাতির তেলে খরচ করো। তারপর সে মারা গেল এবং সেই স্ত্রী ও প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিস রেখে গেল। ওয়ারিসগণ তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি দিয়ে কাফন কিনল ও তাকে দাফন করল। এখন গাছগুলো কী করা হবে? গাছগুলো বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং তার মূল্য হতে কাফনের টাকা কাটা যাবে। তারপর যা বেঁচে থাকবে তা গরীবদের খাবার ও বাতির তেলে খরচ করা হবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার জমি সুনির্দিষ্ট খাতে বা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য ওয়াক্ফ করল। তারপর ওয়াক্ফদাতা যে জমিতে গাছ লাগাল। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, যদি ওয়াক্ফের টাকা দিয়ে সে গাছ লাগায় কিংবা পকেটের টাকা দিয়েই লাগায়, কিন্তু ওয়াক্ফের জন্য লাগাচ্ছে বলে উল্লেখ করে তবে সে গাছ ওয়াক্ফেরই হবে আর যদি কিছু না বলে নিজের টাকা দিয়ে

লাগিয়ে থাকে তবে তা তার নিজেরই হবে এবং সে মারা গেলে তা তার ওয়ারিসগণ পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১২. মাসআলা : নাজমুদ্দীন (র) বলেন, কবরস্থানের গাছ মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা যাবে। যদি অন্য কোন কাজের জন্য ওয়াক্ফ করা না হয়ে থাকে, ঐ গাছ কি কবরস্থানের প্রাচীর মেরামতের প্রয়োজনে খরচ করা হবে, না মসজিদের নির্মাণ কার্যে? এ সম্পর্কে তিনি বললেন, ওয়াক্ফের খাত জানা থাকলে তো তাতেই ব্যয় করা হবে। আর যদি মসজিদ ও কবরস্থানের কোন মুতাওয়াল্লী না থাকে, তবে কাযীর অনুমতি ছাড়া জনসাধারণের তাতে কিছু করার ইখতিয়ার নেই (আয-যাহীরিয়া)।

১৩. মাসআলা : নাজমুদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি মসজিদের জমিতে একটি তাল (বৃক্ষ বিশেষ) লাগাল। কয়েক বছর পর গাছটি বড় হল। মসজিদের মুতাওয়াল্লী চাইল যে মহল্লার একটি কুয়ার নির্মাণে গাছটি ব্যয় করবে, কিন্তু রোপণকারী বলল, গাছটি আমার। আমি তো এটি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করিনি। এ ক্ষেত্রে হুকুম কী? তিনি বললেন, দৃশ্যত রোপণকারী সেটি মসজিদের জন্যই রোপণ করেছিল। কাজেই সেটি কুয়ার নির্মাণেও খরচ করা যাবে না এবং রোপণকারী সেটি নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : সামরকান্দবাসীর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, এক মসজিদের জমিতে একটি 'সেব' গাছ আছে। লোকে যদি তার সেব দিয়ে ইফতার করে তবে তা বৈধ হবে। কিন্তু আস-সাদরুশ-শাহীদ (র) বলেন, সঠিক কথা হচ্ছে যে, তা জায়েয নয় (আয-যাখীরা)।

১৫. মাসআলা : মানুষের চলাচল পথে যদি কোন গাছ আছে, যেটি পথিকদের জন্য ওয়াক্ফকৃত, তবে পথিকদের জন্য তার ফল খাওয়া জায়েয। এ ক্ষেত্রে গরীব-ধনীর কোন প্রভেদ নেই। এমনভাবে মাঠে-ময়দানে রাখা পানি, জলাধারের পানি, জানাযার খাট, জানাযার কাপড়, ওয়াক্ফের কুরআন শরীফ প্রভৃতির ব্যাপারে গরীব-ধনী সমান। সকলের জন্যই তা বৈধ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : যে সব ওয়াকফের প্রয়োজন ফুরিয়ে

গেছে, যে ওয়াকফের ফসল অন্য খাতেও ব্যয় করা যায় : কাফিরদের ওয়াক্ফ

১. মাসআলা : কোন খাল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে যদি তার সেতুটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায় এবং অন্যত্র সেতু নির্মাণের প্রয়োজন হয় তাহলে এই সেতুর ওয়াক্ফ সম্পত্তির আয় সেখানে ব্যয় করা যাবে, যদি তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য হয় এবং তার কাছাকাছি সাধারণের জন্য অন্য কোন সেতু না থাকে (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)।

২. মাসআলা : শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একটি মসজিদ বা হাওয বিরান হয়ে গেছে। সে হাওয ও মসজিদটির আর কারও প্রয়োজন নেই। কারণ সব লোক সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেছে। এখন কাযী কি তার ওয়াক্ফ-সম্পত্তি অন্য কোন মসজিদ বা হাওযে স্থানান্তরিত করতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পারবে। যদি মানুষ অন্যত্র চলে না গিয়ে থাকে, কিন্তু হাওযটির নির্মাণ কার্যের কোন প্রয়োজন নেই, অবশ্য সেখানে আরেকটি মসজিদ আছে যার নির্মাণ কার্য প্রয়োজন অথবা এর বিপরীত অবস্থা যদি হয়, তবে কি কাযী যার নির্মাণ কার্যের প্রয়োজন নেই তার ওয়াকফের অর্থ যেটির নির্মাণ কার্য প্রয়োজন সেটির পেছনে খরচ করতে পারবে? তিনি বললেন, তা পারবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : একটি চৌকি নিঃপ্রয়োজন হয়ে পড়েছে, কিন্তু তার আয় জমা আছে, এক্ষেত্রে তার কাছাকাছি যদি অন্য চৌকি থাকে তবে আয়টা সেই চৌকিতে ব্যবহার করা হবে। যদি কাছাকাছি কোন চৌকি না থাকে, তবে চৌকিটি যে ব্যক্তি দান করেছে তার ওয়ারিসদের মতামত নেওয়া হবে। আবুল লাইস (র)-এর 'ফাতাওয়া'-এর মাসআলাটি এরূপই বলা হয়েছে। আস-সাদরুশ-শাহীদ (র) তার 'ওয়াকিআত'-এর বলেন, এতে আপত্তি আছে। কাজেই ফাতওয়া দানের সময় বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে হবে (আয-যাখীরা)।

৪. মাসআলা : আন-নাসাফী (র)-এর 'ফাতাওয়া'-এর আছে। শায়খুল-ইসলাম (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক গ্রামের লোক অন্যত্র চলে গেছে। গ্রামের মসজিদটি বিরান হওয়ার উপক্রম। কতিপয় দুর্বৃত্ত মসজিদটির কাঠ জবরদখল করে বসেছে এবং তা নিজ নিজ বাড়ি নিয়ে যেতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় গ্রামবাসীর কেউ কি কাযীর অনুমতিক্রমে তা বিক্রি করে দিতে এবং তার মূল্য অন্য কোন মসজিদে ব্যয় করার জন্য বা সেই মসজিদেরই জন্য সংরক্ষণ করতে পারবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ পারবে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন এক চৌকিতে একটি পশু বা একটি তরবারি ওয়াক্ফ করল। পরে চৌকিটি বিরান হয়ে গেল এবং তার আর কোন প্রয়োজন মানুষের থাকল না।

এরূপ ক্ষেত্রে সে পশু বা তরবারিটি অন্য চৌকিতে নিয়ে যাওয়া হবে। যে চৌকিটি সবচেয়ে কাছাকাছি (আয-যাখীরা)

৬. মাসআলা : 'আন-নাওয়াদির'-এর আছে। উপরের একটি তলা ওয়াক্ফ করা হয়েছে। সে তলাটি যদি ভেঙে পড়ে এবং নির্মাণ করার জন্য তার কোন আয় না থাকে তবে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে এবং সেখানে পূর্ণনির্মাণের অধিকার ওয়াক্ফদাতার অথবা তার ওয়ারিসদের হাতে ফিরে আসবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৭. মাসআলা : এক মহল্লার ওয়াকফের হাওয এমনভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে যে তার সংস্কার সম্ভব নয় এবং মহল্লাবাসীরও তার আর কোন প্রয়োজন নেই। এরূপ ক্ষেত্রে যদি জানা থাকে সেটি কে ওয়াক্ফ করেছিল এবং সে যদি জীবিত থাকে তবে হাওযটি তারই হয়ে যাবে আর তার মৃত্যু হয়ে গেলে তার ওয়ারিসগণ সেটির মালিক হবে। যদি ওয়াক্ফদাতা অবগত থাকে তবে সেটা পতিত সম্পত্তির মত তাদের হাতে থাকবে। তারা কোন ফকীরকে সেটা দিয়ে দেবে। ফকীর তা বিক্রি করে তার টাকা নিজের কাজে লাগাবে।

৮. মাসআলা : এ জাতীয়ই একটি মাসআলা এই যে, একটি দোকান বিশুদ্ধ পন্থায় ওয়াক্ফ করা হয়েছিল। এক অগ্নিকাণ্ডে সে দোকানটিসহ বাজার ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং দোকানটি কাজে লাগানো যায় এমন কোন অবস্থা তার থাকল না। সেটি ইজারা দেওয়ারও কোন উপায় নেই। এরূপ ক্ষেত্রে সেটি আর ওয়াক্ফ সম্পত্তি থাকবে না।

৯. মাসআলা : এমনিভাবে কোন চৌকি যদি আগুনে পুড়ে যায়। তবে তারও ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে এবং সেটি উত্তরাধিকার সম্পত্তি হয়ে যাবে।

১০. মাসআলা : তদ্রূপ সুনির্দিষ্ট একটি কবরস্থানের জন্য বৈধভাবে একটি ঘর ওয়াক্ফ করা হয়েছিল, আর সেটি জরাজীর্ণ হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেলো, আর এক ব্যক্তি সংশ্লিষ্টদের অনুমতি ছাড়াই নিজের অর্থে তার সংস্কার করল। এতে এ অবস্থায় ঘরের ভিত্তি হবে ওয়াক্ফদাতার ওয়ারিসগণের এবং ঘরটি হবে নির্মাতার ওয়ারিসগণের (আল-মুয়মারাত)।

১১. মাসআলা : এমনিভাবে সুনির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য একটি সম্পত্তি বিশুদ্ধভাবে ওয়াক্ফ করা হয়েছিল। সম্পত্তিটি এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যে, সেটি আর কোন উপকারে আসে না। লোকালয় থেকে সেটি দূরে। কেউ তার সংস্কারে আগ্রহী নয় এবং মূল জমিটাও কেউ ভাড়া নিতে সম্মত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে এবং সেটি বিক্রি করে দেওয়া জায়েয। যদি মূল জমিটা সামান্য অর্থের বিনিময়েও ভাড়া দেওয়া সম্ভব হয়, তা হলে তার ওয়াক্ফ বলবৎ থাকবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা : উপরিউক্ত সমাধান ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী প্রযোজ্য। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী এতে প্রশ্ন থেকে যায়। কেননা ওয়াক্ফ সহীহ-ওদ্ধভাবে চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া বাতিল হয় না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৩. মাসআলা : আবুল-লাইস (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণের জন্য মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছিল। সে ব্যক্তি যদি সেখান থেকে কিছু দিরহাম নিজ প্রয়োজনে খরচ করে এবং পরে তার পরিবর্তে সে নিজের থেকে মসজিদে খরচ করে, তবে তার জন্য সে অবকাশ নেই। যদি এরূপ করে এবং সেই দিরহাম যে ব্যক্তি দিয়েছিল তাকে খুঁজে পায় তবে তাকে তা ফেরত দিয়ে দেবে এবং তার কাছ থেকে নতুন করে অনুমতি চেয়ে নেবে। যদি কে তা দিয়েছিল তা জানা না যায়, তবে সে যা ব্যবহার করবে সে ব্যাপারে প্রশাসনের অনুমতি গ্রহণ করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে আমি আশা করি যে, সে যে পরিমাণ খরচ করেছে সেই পরিমাণ মসজিদে দিয়ে দিলে জায়েয হয়ে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে এই দেওয়াটা এবং প্রশাসনের অনুমতি গ্রহণের বিষয়টি কেবলই অপরাধ স্থলনের লক্ষ্যে। না হয়, জরিমানা- সে তো সর্বাবস্থায়, দিতেই হবে (আল-যাখীরা)।

১৪. মাসআলা : এ জাতীয় আরও কতগুলো মাসাইল আছে, যাতে 'উলামা-ও সুলাহা লিগু। (ক) কোন আলিম যদি গরীবদের জন্য সাহায্য চায় এবং সে সাহায্যের কতক কতকের সংগে মিলে যায়, তবে সমুদয় সাহায্যের সমপরিমাণ তাকে জরিমানা দিতে হবে। সে যদি তা আদায় করে দেয় তবে নিজ টাকা থেকে আদায় করা হবে এবং তাদেরকে তার জরিমানা পরিশোধ করতে হবে। এর দ্বারা তাদের যাকাতও আদায় হবে না। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে কর্তব্য হচ্ছে গরীবদের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নেওয়া যে, সে তাদের পক্ষ থেকে সাহায্যের অর্থ গ্রহণ করবে। তাহলে তাদের টাকাই তাদের টাকার সংগে মেলানো হবে (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা : কোনও ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে গরীবদের জন্য তাদের অনুমতি ছাড়াই সাহায্য চায়, তবে সাহায্যের অর্থ তার কাছে আমানত সাব্যস্ত হবে। যদি কারওটা কারও সাথে মেলায় এবং তারপর আদায় করে তবে নিজের পক্ষ থেকে আদায় করা হবে এবং তাদেরকে তার জরিমানা পরিশোধ করতে হবে। আর এতে তাদের যাকাতও আদায় হবে না। কাজেই উচিত হবে, গরীব ব্যক্তিই তাকে প্রথমে সাহায্য চাওয়ার আদেশ করবে। কেননা তখন সে গরীবের উকীল (প্রতিনিধি) সাব্যস্ত হবে। তখন তার টাকাই তার টাকার সংগে মেলানো হবে (আল-মুয়মারাত)।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা : কোনও লোক যদি পুণ্যের কাজে স্বীয় সম্পদ দান করতে চায়, তবে গোলাম আযাদ অপেক্ষা মুসলিমদের জন্য সীমান্ত-রক্ষার চৌকি তৈরি করে দেওয়া উত্তম। কেননা এটা একটা স্থায়ী কাজ। কেউ বলেন, মিসকীনদের জন্য দান-সাদাকা উত্তম। আমি বলব, ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, এরূপ ব্যক্তি যদি দীনী বই-পুস্তক কিনে গ্রন্থাগারে দান করে, যাতে ইলমের চর্চা হয়, তবে সেটাই অপরাপর দান অপেক্ষা উত্তম। কেননা এটা স্থায়ী সংকর্ম, যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে।

যদি নিজ বাড়ি গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করতে চায়, তবে তার মূল্য সাদাকা করাই উত্তম। বাড়ির জায়গাটা যদি ফসলী জমি হয়ে থাকে, তবে সে জমি ওয়াক্ফ করাই শ্রেয়।

২. মাসআলা : মসজিদে কোন জিনিস কিনে দিতে চাইলে, যে জিনিসটির প্রয়োজন বা বেশী প্রয়োজন সেটাই কিনে দেয়া উত্তম। কোন জিনিস দানের ফযীলত কম-বেশী হওয়া নির্ভর করে প্রয়োজনের কম-বেশী, হওয়ার উপর এবং বস্তুটির স্থায়িত্বের উপর। এ হিসেবে ইলমে দীনের শিক্ষার্থীর পেছনে খরচ করা এবং ইলমে দীন শেখার যত দিক আছে, যত ফিক্হ, রচনা, সংকলন প্রভৃতিতে কত থাকা নফল ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা অপেক্ষা উত্তম। এমনভাবে হাদীস-তাফসীরের খেদমতও অপরাপর কাজ অপেক্ষা উত্তম। কেননা এর উপকারিতা স্থায়ী। কাজেই ফযীলতেও শ্রেষ্ঠ হবে (আল-মুয়মারাত)।

৩. মাসআলা : কোনও ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন মাদরাসার আবাসিক ছাত্রদের জন্য সহীহ পন্থায় ওয়াক্ফ করল। এক ব্যক্তি সে মাদরাসায় থাকে বটে, কিন্তু রাত্রি যাপন করে না। রাতে সে পাহারাদারির কাজ করে, তা হলে সে ব্যক্তি ওয়াক্ফের সাহায্য হতে বঞ্চিত হবে না, যদি সে মাদরাসার কোন কক্ষে বাস করে এবং বসবাস সামগ্রী লাভ করে থাকে। কেননা তাকে এই স্থানের বাসিন্দা বলেই গণ্য করা হয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪. মাসআলা : যদি রাতে গ্রহরার কাজ করে এবং দিনে শিক্ষা গ্রহণে অবহেলা করে তবে লক্ষ্য করে দেখতে হবে যে, দিনে সে অন্য কাজে লিপ্ত থাকে কিনা এবং লিপ্ত থাকলে তা কি পরিমাণে। যদি অন্য কাজে এতটাই ব্যাপ্ত থাকে যে, তাকে শিক্ষার্থীরূপে গণ্যই করা যায় না, তবে সে কোন সুযোগ-সুবিধা পাবে না। আর যদি অন্য কাজে লিপ্ত না থাকে এবং তাকে তালিবে ইলমরূপে গণ্য করা যায় তবে ওয়াক্ফের সুযোগ-সুবিধা তাকে দেওয়া হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৫. মাসআলা : উপরিউক্ত মাসআলা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন ওয়াক্ফদাতা বলে যে, অমুক মাদরাসার আবাসিক ছাত্রদের জন্য ওয়াক্ফ। যদি বলে, অমুক মাদরাসার আবাসিকদের

জন্য 'ছাত্র' শব্দটি যোগ না করে, তখনও একই হুকুম। সুতরাং মাদরাসায় যে সব লোক থাকে, তাদের মধ্যে যারা ছাত্র নয়, তারা সে ওয়াকফের কোন সুবিধা পাবে না। কেননা মাদরাসার আবাসিক বললে ছাত্রদেরকেই বুঝায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা : শিক্ষার্থী যদি শিক্ষা গ্রহণের জন্য ফুকাহায়ে কিরামের কাছে যাতায়াত না করে, তবে যদি শহরে হয়ে থাকে এবং নিজের জন্য প্রয়োজনীয় ফিকহী মাসাইল লেখায় রত থাকে তবে ওযীফা গ্রহণে দোষ নেই। আর যদি শহরে থাকে এবং সে অন্য কাজে লিপ্ত থাকে, তা হলে ওযীফা গ্রহণ করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : শিক্ষার্থী যদি কিছু দিন দেশের বাইরে থাকে এবং ফিরে আসার পর ওযীফা দাবী করে তবে সফর-পরিমাণ দূরত্বে গিয়ে থাকলে বিগত দিনের ওযীফা সে পাবে না। কোথাও গিয়ে যদি পনের দিন অবস্থান করে এবং দূরত্ব তার চেয়ে কম হয় আর গিয়ে থাকে এমন কোন কাজের জন্য, যা তার জন্য অপরিহার্য ছিল, যেমন খাবার সংগ্রহ করা, তবে সেটা ক্ষমাযোগ্য। এ সময় অন্য কারও জন্য তার কামরা দখল করা বৈধ হবে না। তার ওযীফাও বহাল থাকবে। এ হুকুম এক মাস থেকে নিয়ে তিন মাস পর্যন্ত অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি তার বেশী হয়, তবে অন্যের জন্য তার কামরা দখল ও ওযীফা গ্রহণ বৈধ হয়ে যাবে (আল-বাহরুর রায়িক)

৮. মাসআলা : ফকীহ (র) বলেন, যে দিন দরস বলে না কোন তালিবে ইলম যদি সে দিনের ভাতা গ্রহণ করে তবে আশা করি তা জায়েয হবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : কোন শিক্ষার্থী যদি এক-দুই মাস অনুপস্থিত থাকে, তবে মাসিক হারে ভাতা দেওয়া হলে তার জন্য সে মাসের ভাতা গ্রহণ জায়েয হবে না। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। যদি বার্ষিক নিয়মে ভাতা দেওয়া হয় এবং ভাতা প্রদানকালে সে উপস্থিত থাকে আর বছরের অধিকাংশ সময় সে দরসে হাযির থাকে তবে তার জন্য ভাতা গ্রহণ জায়েয হবে (আল-কিনুয়া)।

১০. মাসআলা : ফকীহ আবু বকর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বলখে বসবাসকারী 'আলাবী (হযরত 'আলী (রা)-এর বংশধর)-এর জন্য ওয়াক্ফ করা হলে যদি তাদের কেউ অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু নিজ বাড়ি বিক্রি করত অন্যত্র নিবাস গ্রহণ না করে থাকে তবে সে বলখবাসী বলেই গণ্য হবে এবং তার ভাতা বাতিল হবে না, তার ওয়াক্ফ নয় (আয-যাখীরা)।

১১. মাসআলা : কেউ যদি কোন জমি কেনে, কিন্তু সে কেনাটা অবৈধ পন্থায় হয়, তারপর তা হস্তগত করতঃ তাতে মসজিদ বানায় এবং লোকে তাতে সালাত আদায় করে, তবে তার হুকুম কী? হিলাল (র) তার 'ওয়াক্ফ' গ্রন্থে বলেন, তা মসজিদ হয়ে যাবে এবং ক্রেতাকে তার মূল্যও পরিশোধ করতে হবে। বিক্রেতার কাছে তা ফেরত দেওয়া যাবে না। হিলাল (র) বলেন, এই হচ্ছে মসজিদ সম্পর্কে আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মত। এর উপর কিয়াস অনুযায়ী ওয়াকফেরও একই হুকুম। কিতাবুশ-শুফআ-এর মাঝে বলা হয়েছে কেউ যদি অবৈধ রীতিতে জমি কিনে তাতে মসজিদ বানায় এবং মসজিদের ঘরও তোলে; ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঘর তুলে জমি নষ্ট করার কারণে জরিমানা স্বরূপ তাকে জমির মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ঘর ভেঙে বিক্রেতাকে তার জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিতাবুশ-শুফআ-এর বর্ণনা অনুযায়ী ঘর তোলার শর্তটি প্রমাণ করে যে, কেবল

মসজিদ রূপে স্থির করলেই সে জমিটি মসজিদ হয়ে যাবে না, যাবত না ঘর তোলা হবে। এটা সকলেরই মত। আর হিলাল (র) বর্ণিত মতে ঘর তোলার শর্ত না থাকার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঘর না তুললেও সর্বসম্মতিক্রমে মসজিদ হয়ে যাবে। হাকিম শহীদ (র)-বলেন, হিলাল (র) এর বর্ণনা অপেক্ষা শুফআ অধ্যায়ে ইমাম মুহাম্মাদ (র) যে মত বর্ণনা করেছেন সেটাই বিত্ত্বতর।

যদি জায়েয পন্থায় জমি কেনে এবং তা হস্তগত করতঃ গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ করে, তা হলে এরপর তাতে কোন দোষ পাওয়া গেলে তা ফেরত দিতে পারবে না, হাঁ ক্ষতিপূরণ গ্রহণের সুযোগ থাকবে। পক্ষান্তরে জমি কেনার পর যদি মসজিদ বানায় এবং তারপর তাতে কোন দোষ পায়, তা হলে ক্ষতিপূরণও গ্রহণ করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা : যদি গোলামের বদলে জমি কেনে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা জমি ও গোলাম হস্তগত করে, তারপর ক্রেতা জমি ওয়াক্ফ করে দেয়, ওদিকে প্রমাণিত হয় যে, গোলামটির মালিক অন্য কেউ তবে ওয়াক্ফ জায়েয হয়ে যাবে এবং জমি হস্তান্তরের দিনের বাজার দর ক্রেতাকে তাই পরিশোধ করতে হবে (আল-হাবী)।

১৩. মাসআলা : যদি দেখা যায় গোলামটি আসলে গোলামই নয়, বরং সে স্বাধীন ব্যক্তি, তা হলে ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী ওয়াকফের আয় জমা করে ভোক্তাদের মধ্যে বন্টন করল, কিন্তু এক ব্যক্তিকে বঞ্চিত রেখে তার অংশ নিজ প্রয়োজনে খরচ করল। পরবর্তী ফসলের সময় সেই ব্যক্তি বীজ চাইল আগের বারের পাওনাও এই ফসল থেকে আদায় করে নেবে। তা এক্ষেত্রে বিধান এই যে, সে যদি মুতাওয়াল্লীর উপর জরিমানা আরোপ করে থাকে, তা হলে পরবর্তী ফসল থেকে সে তা নিতে পারবে না। আর যদি সে তার শরীকদের অংশ থেকে তা নিতে মনস্থ করে তবে দ্বিতীয় ফসলে তাদের যে অংশ আছে তা থেকে সেই পরিমাণ নিতে পারবে। আর সে তা নিয়ে যাওয়ার পর শরীকগণ মুতাওয়াল্লীকে ধরবে, যাতে সে বঞ্চিতের যে অংশ বিগত বছর খরচ করে ফেলেছিল তা আদায় করে দেয় (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা : মসজিদের ইমাম মসজিদের আয় সংগ্রহ করে যদি বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বলে যায়, তবে আংশিক বছরের আয় তার কাছ থেকে ফেরত নেওয়া হবে না। তার পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি বিচার করা হবে ফসল কাটার সময়ের ভিত্তিতে। অর্থাৎ ফসল কাটার সময় সে মসজিদে ইমামতি করে থাকলে ফসলের হকদার হবে (আল-ওয়াজীয)।

১৬. মাসআলা : বছরের যে সময়টা অবশিষ্ট রয়ে গেছে সেই অংশের ফসল ভোগ কি ইমামের জন্য হালাল হবে? হাঁ, সে গরীব হলে জায়েয হবে। একই বিধান প্রযোজ্য হবে তালিবে ইলমের ক্ষেত্রে। তাদেরকে প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা দেওয়া হয় এবং তা দেওয়া হয় ফসল আসার সময়। এখন কোন শিক্ষার্থী যদি ফসল আসার সময় তার অংশ গ্রহণ করে নেয় তারপর সে মাদরাসা থেকে চলে যায়, তা হলে সে যদি গরীব হয়, তবে তার জন্য বছরের অবশিষ্ট অংশের ভাতা হালাল হবে (আল-মুহীত)।

জাহীরুদ্দীন (র) বলেন, যদি ওয়াক্ফদাতার ওয়ারিসদের জন্য অনুমোদন করে তবে বিক্রি জায়েয এবং তদ্বারা ওয়াক্ফ বাতিলের ফায়সালা হয়ে যাবে। আর যদি ওয়ারিস ছাড়া অন্য কারও জন্য অনুমোদন করে তবে বিক্রি জায়েয হবে না। যদি ওয়াক্ফ-সম্পত্তি বিক্রি করে ফেলা হয় এবং কাযী বিক্রি সহীহ হওয়ার সিদ্ধান্ত দেয়, তাহারাও ফায়সালা হয়ে যাবে যে, ওয়াক্ফ বাতিল হয়ে গেছে (আল-খুলাসা)।

২৭. মাসআলা : শামসুল-ইসলাম মাহমুদ আল-মায়ওয়াজানদী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি তার ওয়াক্ফকৃত জমি, যার সীমানা নির্দিষ্ট ছিল, বিক্রি করে দিল এবং বিক্রির দলীলে কাযী সাক্ষ্য লিখে দিল, তাতে বিক্রি সহীহ হওয়ার ফায়সালা হয়ে যাবে কি? তিনি বললেন, না, সেটা বিক্রি সহীহ হওয়ার ফায়সালা বলে গণ্য হবে না। বলাই বাহুল্য এ জবাব সহীহ (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা : কাযী আল-ইমাম (র) বলেন, কাযী যদি এভাবে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে, যা বিক্রি সহীহ হওয়ার প্রমাণ বহন করে না, যেমন লিখল, বিক্রিতা বিক্রির কথা স্বীকার করেছে, সেই উপরিস্ত জবাব প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে যদি লিখে দেয়, সে এর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে আর দলীলে লেখা থাকে; সে বৈধ রূপে বিক্রি করেছে, তবে সেটা বিক্রি বাতিল হওয়ার ফায়সালা বলে গণ্য হবে (আল-খুলাসা)।

২৯. মাসআলা : মুতাওয়াল্লী যদি ওয়াক্ফের অবশিষ্ট অর্থ ঋণ দিতে চায়, তা জায়েয হবে কি? আবুল-লায়স (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থের 'ওয়াসায়া' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ওয়াক্ফের আয় জমা করে রাখার চেয়ে ঋণ দেওয়াটাই যদি সে আয়ের পক্ষে বেশী কল্যাণকার হয়, তবে আমার ধারণা ঋণ প্রদানের অবকাশ আছে। যদি সে বাড়তি অর্থ নিজ প্রয়োজনে খরচ করে এবং যখন মেরামতের দরকার হবে তখন ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা রাখে, তবে সে অবকাশ তার নেই। বরং এসব থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে দূরে থাকা উচিত। তথাপি যদি সে তা খরচ করে ফেলে এবং পরে ওয়াক্ফের সংস্কার কার্যে সেই সমপরিমাণ ব্যয় করে, তবে এতদ্বারা তার প্রদেয় জরিমানার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে বলেই মনে করি। আল-ফুযুলী (র)-এর 'ফাতাওয়া'-গ্রন্থে আছে, এতে সে জরিমানা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা : সে যে পরিমাণ খরচ করেছিল সেই পরিমাণ এনে যদি ওয়াক্ফের দিরহামের সংগে মিলিয়ে ফেলে, তবে সবটাই জরিমানা দিতে হবে। অবশ্য যদি সবটাই নির্মাণ কার্যে ব্যয় করে তবে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। অথবা বিষয়টা কাযীর কাছে পেশ করবে। কাযী কোনও লোককে তার নিকট থেকে তা বুঝে নেওয়ার জন্য বলবে। সে তা বুঝে নিয়ে আবার তার হাতে তা সমর্পণ করবে (আল-গিয়াছিয়া)।

১. গ্রন্থের সকল সংস্করণেই লেখা আছে। বিক্রি বাতিলের ফায়সালা বলে গণ্য হবে। কিন্তু সঠিক হবে-বিক্রি সহীহ হওয়ার ফায়সালা গণ্য হবে অথবা ওয়াক্ফ বাতিল হওয়ার ফায়সালা বলে গণ্য হবে। উপরের কথা তাই প্রমাণ করে। -সম্পাদক বাহরাবী।

৩১. মাসআলা : ওয়াক্ফ-সম্পত্তিকে তার আসল অবস্থা থেকে পরিবর্তন করা যাবে না। সুতরাং বাড়িকে বাগান, মুসাফিরখানাকে গোসলখানা এবং চৌকিকে দোকান বানাতে পারবে না। ওয়াক্ফদাতা যদি মুতাওয়াল্লীকে এই ইখতিয়ার দেয় যে, সে ওয়াক্ফ সম্পত্তির জন্য যা কল্যাণকর মনে করবে তাই করতে পারবে, তাতে ভিন্ন কথা (আস-সিরাজুল-ওয়াহাজ)।

৩২. মাসআলা : শামসুল-ইসলাম মাহমুদ আল-আমওয়াজানদী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। কোনও লোক সম্পত্তি ওয়াক্ফ করার পর যদি গরীব হয়ে পড়ে এবং তার ওয়াক্ফ প্রত্যাহার করতে চায় তা পারবে কি? তিনি বলেন, বিষয়টা কাযীর কাছে পেশ করবে, যাতে কাযী ওয়াক্ফ বাতিলের ফায়সালা দেয় (আয-যাখীরা)।

৩৩. মাসআলা : 'জামিউল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি আংুর বাগান বিক্রি করে, যার ভেতর একটি প্রাচীন মসজিদ আছে, তা হলে লক্ষ্য করতে হবে মসজিদটি আবাদ না বিরান। যদি আবাদ হয়ে থাকে তবে অবশিষ্ট অংশেও বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি মসজিদটি বিরান হয়, তবে বাতিল হবে না (আত-তাতার খানিয়া)।

৩৪. মাসআলা : আল-খাসাফ (র) তাঁর ওয়াক্ফ গ্রন্থে বলেন, কেউ যদি তার বাড়ির একটা ঘর ওয়াক্ফ করে, তবে রাস্তাসহ ওয়াক্ফ করলে ওয়াক্ফ জায়েয হবে। আর যদি রাস্তাসহ ওয়াক্ফ না করে তবে ওয়াক্ফ জায়েয হবে না (আল-মুহীত)।

৩৫. মাসআলা : কেউ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করল বা নিজ জমিকে কবরস্থান বানালো কিংবা মুসাফিরখানা তৈরি করল, যেখানে মানুষ আশ্রয় নেয়, তারপর কোন ব্যক্তি তাতে হুক দাবী করল, কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা উপস্থিত নেই। এরূপ ক্ষেত্রে যদি মসজিদের কতক লোকের বিরুদ্ধে রায় হয় তবে সেটা সকলের বিরুদ্ধেই রায় বলে গণ্য হবে। মুসাফিরখানার ক্ষেত্রে এরূপ রায় দেওয়া যাবে না, যে যাবত না তার প্রতিষ্ঠাতা বা তার প্রতিনিধি হাযির হয় (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

৩৬. মাসআলা : 'আল-মুলতাকাত'-গ্রন্থে আছে, কোনও লোক যদি মসজিদে কুয়া খনন করে এবং তাতে মানুষের উপকার হয় কারও কোন ক্ষতি না হয়, তবে তার সে ইখতিয়ার আছে এবং তা জায়েয হবে (আল-হাম্মাদিয়া)।

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

[এ অধ্যায়ে বিশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা, রুকুন, শর্ত, হুকুম এবং
প্রকারভেদসমূহের বিবরণ

১. মাসাআলা : ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা : পারস্পরিক সম্মতিতে^১ মালের সাথে মালের বিনিময়কে ক্রয়-বিক্রয় বলে (কাফী)। ক্রয়-বিক্রয়ের রুকুন দুই প্রকার (ক) এক পক্ষের إيجاب (প্রস্তাবন) এবং অপর পক্ষের قبول (প্রস্তাব গ্রহণ)। (খ) (মুখের কোন উচ্চারণ ছাড়াই) মালের আদান-প্রদান (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২. মাসাআলা : ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলী চার শ্রেণীতে বিভক্ত। ১. شرط الانعقاد - সম্পাদনের শর্ত। ২. شرط النفاذ কার্যকারিতার শর্ত। ৩. شرط الصحة শুদ্ধতার শর্ত। ৪. شرط اللزوم অপরিহার্যতার শর্ত।

৩. মাসাআলা : ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের শর্তাবলী কয়েক প্রকার। (ক) عاقد (চুক্তি সম্পাদনকারী) ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর তা হল, আকিদ এর লাভ ও ক্ষতির মাঝে পার্থক্য করার জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া (কাফী ও নিহায়া)। সুতরাং বালক এবং স্থূল বুদ্ধির ব্যক্তি যদি ক্রয়-বিক্রয় ও তার ফলাফল বুঝে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে (ফাতহুল কাদীর)। (খ) ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি অর্থাৎ দুটি পক্ষ বিদ্যমান থাকতে হবে। কাজেই এক ব্যক্তি দুই পক্ষের আকিদ হতে পারবে না (বাদায়ে)। কিন্তু পিতা ওসী (ওসীয়াত বাস্তবায়নের ব্যাপারে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি) এবং বিচারক যদি নাবালিগের নিকট কোন কিছু বিক্রি করে বা তার থেকে কোন কিছু খরিদ করে তবে একই ব্যক্তি উভয়ের পক্ষ থেকে আকিদ সম্পাদন করতে পারবে। তবে ওসীর ক্ষেত্রে শর্ত হল, উক্ত আকদের মধ্যে বাহ্যিকভাবে হলেও ইয়াতীমের লাভ ও কল্যাণ বিদ্যমান থাকতে হবে। অন্যথায় সে উভয় পক্ষের একজন

১. পারস্পরিক সম্মতির শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে; আয়াতকে অনুসরণ করে বস্তুতপক্ষে এটা সংজ্ঞার অংশ নয়।

প্রতিনিধি বলে গণ্য হবে বৈ কিছু নয় (আল-বাহরুর রায়িক)। গোলামের বিষয়টি ও ঠিক তাদের অনুরূপ। অর্থাৎ গোলাম ও মুনীরের অনুমতিক্রমে নিজেকে তার থেকে খরিদ করতে পারবে (আয়নী শরহে হিদায়া)। (খ) মূল চুক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ শর্ত হল, 'কবুল' (পূর্ববর্তী) ইজাবের অনুরূপ হওয়া। অর্থাৎ বিক্রেতা যে পরিমাণ বস্তু যে পরিমাণ মূল্যে বিক্রির প্রস্তাব করবে ক্রেতা তাতেই সম্মত হবে। পক্ষান্তরে যদি দুই পক্ষের কথার মধ্যে গড়মিল থাকে অর্থাৎ ক্রেতা, বিক্রেতার প্রস্তাবিত মাল থেকে ভিন্ন মালের কথা বলছে বা প্রস্তাবিত মালের কিয়দংশের কথা বলছে অথবা ক্রেতা, বিক্রেতার প্রস্তাবিত মূল্য থেকে ভিন্ন কোন মূল্যের কথা বলছে কিংবা প্রস্তাবিত মূল্যের কিয়দংশের কথা বলছে তাহলে চুক্তি সম্পন্ন হবে না। তবে ক্রেতা প্রস্তাবক হলে এবং বিক্রেতা প্রস্তাবিত মূল্যের কমে সম্মত হলে অথবা বিক্রেতা প্রস্তাবক হলে এবং ক্রেতা প্রস্তাবিত মূল্যের বেশী দিতে সম্মত হলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি ঐ মজলিসেই এই অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণে সম্মত হয় তাহলে তা জায়েয হবে (আল-বাহরুর রায়িক)। (গ) কতক শর্ত উভয় পক্ষের বিনিময়কৃত মালের সাথে সম্পর্কিত। আর তা হল, উভয়ের মাল মূল্যসম্পন্ন বস্তু হওয়া। মূল্যসম্পন্ন বস্তু না হলে চুক্তি সম্পন্ন হবে না' (মুহীত : আস-সারাখসী)। (ঘ) কতক শর্ত বিক্রিতব্য পণ্যের সাথে সম্পর্কিত। আর তা হল, উক্ত বিক্রিতব্য বস্তুর বিদ্যমানতা। কাজেই অবিদ্যমান বস্তুর বিক্রি সম্পন্ন হবে না। তদ্রূপ যে বস্তুর অবিদ্যমানতার আশংকা রয়েছে তারও বিক্রি সম্পন্ন হবে না। যেমন কোন পশুর গর্ভের বাচ্চা বা বাচ্চার বাচ্চা বিক্রি করা (বাদায়ে)। বিক্রিতব্য বস্তু মালিকানার আওতাযোগ্য (مملوك في نفسه) মাল হতে হবে এবং এ মালের উপর বিক্রেতার প্রত্যক্ষ মালিকানা থাকতে হবে। সুতরাং ঘাস বিক্রি করা হলে এ ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না। যদিও তা বিক্রেতার মালিকানাধীন ভূমিতে থাকে। যে মাল বর্তমানে বিক্রেতার মালিকানাধীন নয়, তার বিক্রি সম্পন্ন হবে না। যদিও পরে তার মালিক হয়ে যায়। কিন্তু بیع السلام (দাদন বিক্রয়)-এর পণ্য পরে প্রদানের শর্তে অগ্রিমমূল্য দিয়ে যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, একে বায়য়ে সলাম বলা হয়। এর ক্ষেত্রে তা জায়েয হবে। এমনি ভাবে গাসাবকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে ও বৈধতা রয়েছে। অর্থাৎ গাসাবকারী যদি গাসাবের মাল বিক্রি করার পর ঐ মালের দায় শোধ করে তাহলে বিক্রয় কার্যকর হবে (আল-বাহরুর রায়িক) বিক্রিতব্য বস্তুর সম্পর্কিত আরেকটি শর্ত হল, বিক্রিতব্য বস্তুটি শরীআত মতে মূল্য সম্পন্ন মাল হতে হবে এবং বিক্রেতা বর্তমানে বা পরবর্তীতে ঐ মাল হস্তান্তরে সক্ষম হতে হবে (ফাতহুল কাদীর)। (ঙ) আরেকটি শর্ত হল, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের কথা শ্রবণ করা। ফকীহগণের ইজমা অনুসারে এটি বিক্রয় চুক্তি সম্পন্নতার শর্ত। সুতরাং ক্রেতা, 'খরিদ করেছি', এই বক্তব্য বিক্রেতা শুনতে না পেলে বিক্রয় সম্পন্ন হবে না (আল-ফাতাওয়াস সুগরা)।

১. যেমন কোন মুসলিম ব্যক্তি তার মাল শূকর বা শরাবের বিনিময়ে বিক্রি করল অথবা শরাবের বিনিময়ে শূকর বিক্রি করল তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না। কেননা শরাব এবং শূকর মুসলমানের ক্ষেত্রে মূল্যসম্পন্ন বস্তু নয়।

২. পণ্য পরে প্রদানের শর্তে অগ্রিম মূল্য দিয়ে যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, একে বায়য়ে সলাম বলা হয়।

মজলিসে উপস্থিত লোকজন যদি ক্রেতার কথা শুনতে পায়, বিক্রেতা বলে যে, আমি শুনতে পাইনি, আর আমার কানে বধিরতা নেই, তাহলে অদ্বিতীয় তা গ্রহণযোগ্য হবে না (আল-বাহরুর রায়িক)। (চ) কতক শর্ত স্থানের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ইজাব ও কবুল উভয়ের মজলিস অভিন্ন হওয়া। উভয়টি একই মজলিসে না হলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবে না।

৪. মাসাআলা : شرائط النفاذ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হওয়ার শর্ত দুটি। (ক) বিক্রেতা মালের মালিক বা ওলী (অভিভাবক) হওয়া (খ) বিক্রিতব্য মালে বিক্রেতার দ্বারা অন্য কারো অধিকার না থাকা। অন্য কারো অধিকার থাকলে চুক্তি কার্যকর হবে না। যেমন বন্ধকের মাল বা ভাড়ার মাল ইত্যাদি (বাদায়ে)।

৫. মাসাআলা : شرائط الصحة অর্থাৎ বিক্রয় চুক্তি শুদ্ধতার শর্ত দু' প্রকার (১) عامة (সাধারণ শর্ত) (২) خاصة (বিশেষ শর্ত)। বিক্রয় চুক্তির সম্পন্নতার শর্তগুলোই হচ্ছে বা কোন বিক্রয় চুক্তির (সাধারণ) শর্ত। কেননা যা সম্পন্ন হয় নাজা শুদ্ধও হয় না। পক্ষান্তরে 'শুদ্ধ না হওয়ার অর্থ সম্পন্ন না হওয়া নয়। কেননা بیع فاسد (অশুদ্ধ বিক্রয়) আমাদের (হানাফী) মতে সম্পন্ন হয় এবং 'দখল' যুক্ত হওয়ার পর কার্যকরও হয়। উপরোক্ত সাধারণ শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম হল (ক) বিক্রয় চুক্তি সামগ্রিক না হওয়া সাময়িক সময়ের জন্য হলে তা সहीহ হবে না। (খ) পণ্য ও মূল্য দু'টাই এমন সুনির্দিষ্ট হতে হবে, যা বিবাদের সম্ভাবনা রহিত করে। সুতরাং বিবাদ পর্যন্ত গড়াতে পারে, এমন অজ্ঞাত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় সहीহ নয়। যেমন বিক্রেতা বলল, এই 'পাল' থেকে একটি কুকুরী বিক্রি করলাম, অথবা বলল, এর যথার্থ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করলাম কিংবা বলল অমুকের নির্ধারণকৃত মূল্যে বিক্রি করলাম তাহলে তা সहीহ হবে না। (গ) আরেকটি শর্ত হলো উপকারিতা ও অর্থবহতা। সুতরাং যে জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়ে উপকারিতা নেই তার ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হবে। যেমন অভিন্ন 'মান' ও 'পরিমাণ' সম্পন্ন দুটি দিরহামের বিনিময়ে করা (আল-বাহরুর রায়িক)। (ঘ) বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ শর্ত থেকে মুক্ত থাকা। এক্ষেত্রে অবস্থা হতে পারে। (ক) ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এমন শর্ত আরোপ করা যার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে 'অনিশ্চয়তা' রয়েছে। যেমন গাভীন হওয়ার শর্তে কেউ কোন উটনী খরিদ করল। (খ) এমন শর্ত আরোপ করা যা শরীআত সম্মত নয়, বা বিক্রয় চুক্তির স্বাভাবিক চাহিদা নয়। অথচ এতে বিক্রেতার কিংবা ক্রেতার কিংবা (দাস-দাসী হলে) বিক্রিত পণ্যের উপকারিতা রয়েছে। অথচ এ জাতীয় শর্ত বিক্রয় চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং লোক সমাজে তা প্রচলিত নয়। (ঘ) বিক্রিতব্য বস্তু এবং এর মূল্য যদি عین (নির্দিষ্টতা সম্পন্ন) হয় তবে লেনদেনের ক্ষেত্রে মেয়াদের শর্ত আরোপ করা হলে বিক্রয় চুক্তি ফাসিদ হবে' তবে পণ্য ও মূল্য (বা অনির্দিষ্টতা সম্পন্ন) হলে মেয়াদের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। (ঙ) তদ্রূপ مؤبد (বা স্থায়ী ইচ্ছাধিকারের)

১. পণ্য ও মূল্য عین হওয়ার মানে হল সুনির্দিষ্ট হওয়া। যেমন একই ঘোড়া একটি বাড়ীর বিনিময়ে বিক্রি করা।

২. مؤبد হওয়ার মানে, এমন বস্তু যা নির্দিষ্ট করার দ্বারাও নির্দিষ্ট হয়না কেন টাকা দিয়ে আশরাফী তথা স্বর্ণ মুদ্রা খরিদ করা।

শর্ত আরোপ করা হলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। (চ) তদ্রূপ যদি অত্যধিক অজ্ঞাত সময় দ্বারা আবদ্ধ 'ইচ্ছাধিকারের' শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। যেমন বায়ু প্রবাহের বা বৃষ্টিপাতের মৌসুম কিংবা অমুকের আগমনকাল শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা অথবা সামান্য অজ্ঞাত সময় দ্বারা আবদ্ধ ইচ্ছাধিকারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা যেমন ফসল কাটা ও মাড়াই দেওয়ার সময় বা হাজীদের আগমনের সময় টাকা পরিশোধ করা শর্তে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করা। (ছ) সময়ের উল্লেখ মুক্ত ইচ্ছাধিকারের শর্তে অথবা তিন দিনের অধিক সময়ের ইখতিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা (বাদায়ে)।

৬. মাসআলা : ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার **خاص** (বিশেষ) শর্ত হল, (ক) বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য ও মূল্য হস্তান্তরের সময় নির্ধারিত হওয়া। সুতরাং সময় নির্ধারিত না হলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। (খ) **الاشياء المنقولة** তথা স্থানান্তর যোগ্য মাল ক্রয় করলে তা ক্রেতার হস্তগত হওয়া। (গ) আর **دين** এর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও কবজা (হস্তগত) হওয়া শর্ত। সুতরাং যদি কবজার পূর্বে **دين** ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তবে তা ফাসিদ বলে গণ্য হবে। যেমন বায়য়ে সলম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়)-এর অবস্থায় তবে তা ফাসিদ বলে গণ্য হবে। যেমন বায়য়ে সলম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়)-এর অবস্থায় **راس المال** এবং **مسلم فيه** ক্রয়-বিক্রয় করা। যদিও তা ইকাল (বা বিক্রয়চুক্তি প্রত্যাহারে)-এর পর হয়। অর্থাৎ এ অবস্থায়ও কবজা জরুরী। এমনভাবে কারো নিকট পাওনা ঋণের বিনিময়ে কোন বস্তু বিক্রি করাও না জায়েয। তবে পাওনা বিক্রেতার নিকট থাকলে জায়েয হবে। (ঘ) যে সব মালের 'বিনিময় তারতম্যে' সুদ হয় সে সব ক্ষেত্রে 'বিনিময় সমতা' শর্ত। বায়য়ে সারফ অর্থাৎ 'মূল্য দ্রব্য' (স্বর্ণ-রৌপ্য) বিনিময়ের ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের 'মজলিস ত্যাগের' পূর্বেই উভয়ের হস্তান্তর শর্ত। (ঙ) **بيع المزاجحة** (মুনাফায়ুক্ত বিক্রয়) **بيع التولية** (মুনাফামুক্ত বিক্রয়) **بيع الوظيفة** (লোকসানী বিক্রয়) এবং শরীকী ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে 'প্রথম মূল্য' জ্ঞাত থাকা আবশ্যিক।

৭. মাসআলা : বিক্রয় চুক্তির অপরিহার্যতার জন্য শর্ত হল, বিক্রয় চুক্তি যদি শর্তের ইচ্ছাধিকার, দেখার ইচ্ছাধিকার, দোষের ইচ্ছাধিকার এবং নির্ধারণের ইচ্ছাধিকার-এই প্রসিদ্ধ চার ইচ্ছাধিকারসহ অপরাপর ইচ্ছাধিকার থেকে মুক্ত থাকা (আল-বাহারুর রায়িক)। বিক্রয় চুক্তির অনিবার্য ফল (**حكم**) এই যে, বিক্রয় চুক্তি যদি 'চূড়ান্ত' হয় তাহলে বিক্রয় পণ্যের উপর ক্রেতার এবং মূল্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর যদি বিক্রয় চুক্তি যদি **موقوف** (সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ) হয় তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের অনুমোদনের পর পণ্য ও মূল্যের উপর স্ব-স্ব মালিকানা সাব্যস্ত হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা : ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকারভেদ : ফকীহগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রয়-বিক্রয়কে বিভিন্নভাবে বিভক্ত কবেছেন। **مطلق البيع** (সাধারণ বিক্রয়) হিসাবে বিক্রয় চার প্রকার। (১) **نافذ** (কার্যকর) যা তৎক্ষণাৎ বহাল অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের পরই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই নিজ নিজ বস্তুর উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (২) **موقوف** সিদ্ধান্ত

সাপেক্ষে, যা কারো না কারো অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হয়। (৩) **فاسد** (ত্রুটিপূর্ণ) যেখানে বিক্রয়দ্রব্য দখলে নেয়ার পর বিক্রয় কার্যকর হয়। (৪) **باطل** (অবৈধ) যা আদৌ ক্রয়-বিক্রয় বলে গণ্য হয় না। বিক্রয় দ্রব্যের দিক থেকে বিক্রয় চার প্রকার। (১) **بيع العين** (পণ্যদ্রব্যের বিনিময়) একে **بيع المقايضة** (মূল্যদ্রব্যের বিনিময়) একে **بيع الدين بالدين** (পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে মূল্যদ্রব্য বিক্রি করা) একে **بيع السلم** বায়য়ে সলম বলা হয়। (২) **بيع الدين بالدين** (পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করা) যেমন সচরাচর বেচা-কেনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। একে বায়য়ে সিল'আ বলা হয় (আল-বাহারুর রায়িক)। অনুরূপভাবে মূল্য নির্ধারণের দিক থেকেও ক্রয়-বিক্রয় চার প্রকার। (১) **بيع المساومة** (মুক্ত মুনাফার বিক্রয়) এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা দরাদরির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করে নেয়। (২) **بيع المزاينة** (ধার্য মুনাফার বিক্রয়) এখানে প্রথম মূল্যের উপর নির্ধারিত অতিরিক্ত মূল্যের বিনিময়ে মুনাফার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় হয়। (৩) **بيع التولية** ক্রয় মূল্যের বিক্রয় এতে শুধুমাত্র প্রথম মূল্যের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় হয়। (৪) **بيع الوضعية** (লোকসানা মূল্যের বিক্রয়) এতে প্রথম মূল্য হতে কম মূল্যে বিক্রয় হয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের শব্দমালা এবং ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কবজাকৃত মালের হুকুম-আহকামের বিবরণ।

[এ পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের শব্দমালা

১. মাসআলা : আমাদের ইমামগণ বলেন, 'স্বত্বপ্রদান' ও 'স্বত্বগ্রহণ' মূলক যে কোন দুটি শব্দ দ্বারা অতীত ক্রিয়াপদ হোক বা বর্তমান ক্রিয়াপদ বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন সংঘটিত হবে (মুহীত)। অল্প আরবী বা অন্য যে কোন ভাষার শব্দ হোক (তাতার খানিয়া)। অতীত ক্রিয়াপদ হলে নিয়্যত ছাড়াই বিক্রয় সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে مضارع (দ্বিকালীন ক্রিয়া পদ) হলে বিশুদ্ধতম মতানুসারে এ ক্ষেত্রে নিয়্যত থাকা আবশ্যক (আল-বাহরুর রায়িক)। সুতরাং বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে লক্ষ্য করে বলে যে, আমি তোমার নিকট এ গোলামটি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করছি অথবা তোমাকে দিচ্ছি অথবা তোমাকে প্রদান করছি, আর ক্রেতা যদি বলে, আমি একে তোমার নিকট থেকে খরিদ করছি বা নিয়ে নিচ্ছি, এমতাবস্থায় তারা উভয়ে যদি বর্তমান ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়্যত করে তাহলে এতে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। এমনি ভাবে যদি ইজাব-কবুলের একটি অতীতকাল জ্ঞাপক হয় আর অপরটি ভবিষ্যত-কাল জ্ঞাপক হয় এবং তাদের উভয়ের বর্তমান ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়্যত থাকে তাহলে এতেও ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তারা যদি এরূপ নিয়্যত না করে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না (কিন্যা)। যদি ইজাব-কবুলের শব্দ দু'টো একান্তই বর্তমান কাল জ্ঞাপক হয় যেমন বলা হল যে, আমি এখন তোমার নিকট এ গোলামটি বিক্রি করছি; তাহলে এ ক্ষেত্রে নিয়্যতের প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে শব্দ দু'টো যদি একান্তই ভবিষ্যত-কাল জ্ঞাপক হয় যেমন-عوضا ع এর সাথে سوف বা سين অক্ষর যুক্ত থাকা অথবা শব্দটি আদেশসূচক ক্রিয়া হয় তাহলে এর দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না। কিন্তু যদি امر-এর صيغة এর উপরোক্ত অর্থ পাওয়া যায় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে। যেমন

১. বর্তমানকাল ও ভবিষ্যতকালবাচক ক্রিয়াপদ।

২. এ হুকুম এমন দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যে দেশের লোকেরা فعل مضارع এর জন্য ব্যবহার করে না। পক্ষান্তরে যে দেশের লোকেরা فعل مضارع এর অর্থে ব্যবহার করে সে দেশের লোকদের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

কেউ বলল; هذه بكذا (এটি অত টাকার বিনিময়ে নিয়ে নাও) তখন ক্রেতা বলল, اخذته (আমি তা নিয়ে নিলাম) তাহলে এ ক্ষেত্রে امر এর صيغة অতীতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়ার মতই হবে। অর্থাৎ এতে বেচাকেনা হয়ে যাবে (আল-বাহরুর রায়িক)। ইমাম আবুল লাইস কবীর (র)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল, الثوب بعشرة (এ কাপড়টি দশ দিরহামের বিনিময়ে নিয়ে নাও তারপর ক্রেতা বলল, আমি নিয়ে নিলাম। এরপর বিক্রেতা বলল, এই কাপড় আমি তোমাকে দিব না)। বিক্রেতার জন্য এরূপ অস্বীকৃতির সুযোগ আছে কিনা? জবাবে তিনি বললেন, তার এরূপ বলার ইখতিয়ার নেই। এমনি ভাবে اخذت (আমি নিয়ে নিলাম) বলার পর ক্রেতার জন্যও তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই (মুহীত)। স্মর্তব্য যে, যদি ক্রয়-বিক্রয় امر এর صيغة আদেশসূচক শব্দ দ্বারা সম্পাদন করা হয় তবে এ ক্ষেত্রে (দুই শব্দের স্থলে) শব্দ তিনটি থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন যদি বিক্রেতা বলে, আমার নিকট হতে ইহা ক্রয় করে নাও; তারপর ক্রেতা বলে, আমি ক্রয় করে নিলাম তাহলে এতে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না। যতক্ষণ না বিক্রেতা আবার বলে যে, আমি বিক্রি করেছি। এমনিভাবে যদি ক্রেতা বলে, আমার নিকট ইহা বিক্রি কর, তারপর বিক্রেতা বলে, হাঁ, বিক্রি করলাম তাহলে ক্রেতাকে পুনরায় বলতে হবে যে, আমি খরিদ করলাম, তাহলেই ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

২. মাসআলা : প্রশ্নবোধক শব্দে কোন ইমামের মতেই বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে না। যেমন ক্রেতা বলল, তুমি আমার নিকট এই বস্তুর এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করবে কি? বা বিক্রি করেছে কি? একথার পর বিক্রেতা যদি বলে, আমি বিক্রি করেছি, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবে না যাবৎ না ক্রেতা আবার বলে যে, আমি খরিদ করেছি (বাদায়ে)। কেউ যদি বলে, তুমি আমার নিকট হতে এই জিনিসটি এই মূল্যে খরিদ করে নাও কথার পর ক্রেতা বলে, খরিদ করে নিলাম। কিন্তু বিক্রেতা يبعث (আমি বিক্রি করলাম) বলল না, তাহলে এতে ক্রয়-বিক্রয় পরিপূর্ণ হবে না (খুলাসা)। ইমাম যহীরুদ্দীন (র) তার চাচা শামসুল আইম্মা উযজন্দী ও নিজের উসতাদ শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) থেকে বর্ণনা করে যে, এ অবস্থায় ও বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা বিক্রেতার কথা فروختم (আমি বিক্রি করলাম কথাটি উহ্য রয়েছে। কারণ তার কথার অর্থ হচ্ছে, خريدي كه فروختم (তুমি খরিদ কর; কারণ, আমি বিক্রি করেছি) (আল-মুহীত)। এটিই পসন্দনীয় অভিमत (মুখতারুল ফাতাওয়া)। যদি বিক্রেতা বলে, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এই গোলামটিকে আমি তোমার নিকট ইকাল করলাম এবং অপর ব্যক্তি বলে, আমি কবুল করলাম, তাহলে এতে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে কি না এ সম্বন্ধে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। আবু বকর ইসকাফ (র) বলেন, ইকাল শব্দের দ্বারাও তাদের ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাবে। ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন, ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না। ফকীহ আবুল লাইস (র) এ মতটি গ্রহণ করেছেন। এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর একটি অভিमतও বটে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা : সর্ব প্রকার বর্ণনা অনুপাতে এ কথা প্রমাণিত যে, সালাম (سلم) শব্দের দ্বারাও ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে থাকে (মুহীত)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, এক

বিনিময়ে এই গোলামটি তোমার। তারপর সে বলল, হাঁ, আমি ইচ্ছা করেছি ও খাহিশ করেছি তবে উপরোক্ত সমস্ত সুরতে উক্তরূপ জবাব দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু জবাবের পূর্বে সূচনার অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হবে না (যখীরা)।

৭. মাসআলা : কেউ যদি বলে, এই ভর্তি বস্তা যদি পাঁচশ' কেজি ওজনের হয়; তুমি ওজন করে দেখ তাহলে আমি এগুলো তোমার নিকট এই পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করলাম; তারপর ক্রেতা বলল; আমি ক্রয় করে নিলাম। তারপর তা ওজন করে বিক্রেতার কথিত ওজন হুবহু পাওয়া গেল তাহলে এতে ক্রয়-বিক্রয় হবে না। কিন্তু এ জাতীয় কথা বলার আগে এই মালের ওজন সম্বন্ধে যদি বিক্রেতার নিশ্চিত জানা থাকে তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। কেননা তখন এটা হয় নিশ্চিত কথা, শর্তযুক্ত কথা নয় (কিন্য়া)। কেউ যদি বলে, তুমি এই মাল নিয়ে যাও এবং আজকের দিন দেখ। যদি তুমি তা নিতে রাযী থাক তবে তোমার জন্য এর মূল্য এক হাজার দিরহাম। এই কথার উপর সে যদি ঐ মাল নিয়ে যায় তবে তা জায়েয আছে। এমনি ভাবে যদি বলে, যদি তুমি আজ এ মাল কিনতে রাযী হয়ে যাও তবে তা তোমার জন্য এক হাজার দিরহাম তবে এ ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয হবে। এটা হুবহু এই কথার মত হবে যে, আমি এই গোলাম তোমার নিকট এক হাজার দিরহামে বিক্রি করলাম। তবে আজকের দিন তোমাকে ইখতিয়ার দেওয়া হল। এ বক্তব্য দ্বারা যেমন বিক্রয় জায়েয, তদ্রূপ পূর্বোক্ত বাক্য দ্বারাও জায়েয হবে (কাযীখান)। বস্তুতঃ এ ফাতওয়ার ভিত্তি হলো ইসতিহসান আমাদের ইমাম-এর এই মতটি গ্রহণ করেছেন (যখীরা)।

৮. মাসআলা : যদি কেউ বলে, আমি এটা তোমার নিকট এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রি করলাম, যদি তুমি একদিন ও এক রাত্রে মধ্যে ইচ্ছা কর অর্থাৎ তোমার মঞ্জুর হয় তবে তা নিতে পার তাহলে এ কথা تَجِير (তৎক্ষণাৎ ক্রয়-বিক্রয়) বলে গণ্য হবে, تَطْلِق (শর্তযুক্ত) বলে গণ্য হবে না (আল্-বাহরুর রাযিক) যদি বলে, এই বস্তা আমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলাম, যদি অমুক রাযী থাকে, এহেন অবস্থায় যদি তার রাযী হওয়ার কোন সময় ধার্য করা হয় এবং সে রাযী হয়ে যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। (ওয়াজীয : আল কুরদুরী)

৯. মাসআলা : কেউ যদি কোন কাপড় ফাসিদ তরীকায় ক্রয় করে এবং পরের দিন উভয়ের সাক্ষাতে ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে, তুমি কি তোমার এই কাপড়টি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করনি? জাবাবে বিক্রেতা বলে যে, হাঁ, বিক্রি করেছি। তারপর ক্রেতা বলে, আমি তা নিয়ে নিলাম। তাহলে এই পরবর্তী কথাবার্তা ধর্তব্য হবে না। বরং এর ভিত্তি পূর্বোক্ত ফাসিদ তরীকার উপরই বলবৎ থেকে যাবে যা ইতিপূর্বে সংঘটিত হয়েছে। আর যদি তারা উভয়ে উক্ত ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করে এবং নতুনভাবে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করে তবে তা জায়েয হবে। একজন অপর জনের কাছে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম বিক্রি করল। তারপর বলল, যদি তুমি আজকের ভেতর আমাকে এর মূল্য না দাও তবে তোমার আমার মধ্যে বেচাকেনা হল না। তারপর ক্রেতা যদি তা কবুল করে নেয় এবং ঐ দিন বিক্রেতাকে মূল্য না দেয়, তারপর পরের দিন ক্রেতা বিক্রেতার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং

সে বিক্রেতাকে বলে, তুমি তোমার এ গোলামটি আমার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছিলে। এ কথা শুনে বিক্রেতা বলল, হাঁ, বিক্রি করেছিলাম। তারপর ক্রেতা বলল, আমি তা নিয়ে নিলাম। তাহলে এটা এই সময় নতুন ক্রয়-বিক্রয় বলে বলে পরিগণিত হবে। কেননা প্রথম ক্রয়-বিক্রয় নাকচ হয়ে গেছে। এই মাসআলা ফাসিদ তরীকায় ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলার অনুরূপ নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি একে একহাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার নিকট বিক্রি করলাম। এখন তুমি যদি আমাকে এক বছর পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ না কর তাহলে আমার ও তোমার মধ্যে কোন বেচাকেনা থাকবে না, তাহলে এই চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। আর এ জাতীয় কথা থিয়ারের অনুরূপ হবে না। যদি তিন দিনের শর্ত করা হয় এবং বলা হয় যে, যদি তিন দিন পর্যন্ত মূল্য না দাও তবে আমার ও তোমার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি থাকবে না। তাহলে ইসতিহসান মতে এই চুক্তি জায়েয হবে। কিন্তু যদি চার দিনের কথা বলে তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। কিন্তু চার দিনের শর্ত করা অবস্থায় ক্রেতা যদি তিন দিনের মধ্যেই মূল্য নিয়ে আসে এবং বলে যে, মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে বিলম্ব করার আমার ইচ্ছা নেই, তবে শায়খ (র) বলেন, উক্ত অবস্থায় আমার মতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে যদি ক্রেতা তিন দিনের ভেতর মূল্য পরিশোধ করে দেয় (খুলাসা)।

১১. মাসআলা : কেউ যদি বলে, যদি এই কাপড়ের, এই পরিমাণ মূল্য তুমি প্রদান কর তবে আমি তোমার নিকট এটা বিক্রি করলাম। তারপর ক্রেতা ঐ মজলিসেই উক্ত পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করে দিল তাহলে ইসতিহসানের দৃষ্টিতে তা সহীহ হবে। কেউ কেউ বলেন, এটি যাহিরী রিওয়াযাতের বিপরীত কথা। সহীহ মতে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। কিতাবুস সিয়ারে উল্লেখ আছে, অনুরূপ হুকুম হবে যদি কেউ বলে আমি বিক্রয় করলাম, যদি আমার নিকট মূল্য পৌঁছে। এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি ঐ মজলিসেই বিক্রেতাকে মূল্য দিয়ে দেয় তবে ইসতিহসানের দৃষ্টিতে এই ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে (মুহীত ও যখীরা)।

১২. মাসআলা : যদি কেউ বলে, আমি তোমার এই দাসীটি দশ দিনার মূল্যে খরিদ করলাম। তুমি বিক্রয় করলে তো? জাবাবে বিক্রেতা বলল, “ধরে নাও বিক্রি করা হয়েছে”। বিক্রেতা যদি বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের নিয়ত করে তবে সহীহ হবে (কিন্য়া)। ইয়াতীমা এহ্লে উল্লেখ আছে, একদা হাসান ইবন আলী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি বিক্রেতার উকীলের নিকট কোন বস্তুর মূল্য বাইশ দীনার বলল। কিন্তু উকীল বলল যে, পঁচিশ দীনারের কমে দিব না। তারপর ক্রেতা বলল, আমাকে এই তিন দীনার ছেড়ে দাও। উকীল তাতে রাযী হয়ে গেল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। ঘটনা স্থলে সাক্ষিও ছিল তারা তার রাযী হওয়ার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে এবং দেখেছে যে, সে এ ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্ত রাযী আছে। এহেন অবস্থায় এতে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে কিনা? জাবাবে হাসান ইবন আলী (রা) বলেছেন, এতটুকুতে বেচাকেনা সহীহ হবে না। কিন্তু যদি ইজাব ও কবুল অথবা ইজাব-কবুলের স্থলবর্তী কোন কাজ যদি পাওয়া যায় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে (তাতার খানিয়া)।

১৩. মাসআলা : যদি বিক্রেতা দূর থেকে অথবা দেয়ালের অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ করে বলে তবে এতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। এক ব্যক্তি ঘরের ভেতর থেকে ছাদের উপর দণ্ডায়মান কোন ব্যক্তিকে বলল, এই বস্তুটি আমি তোমার নিকট এততে বিক্রি করলাম। আর সে বলল, আমি খরিদ করলাম তাহলে ক্রয়-বিক্রয় তখনই সহীহ হবে যদি তারা পরস্পর একে অপরকে দেখে থাকে এবং দূরত্বের কারণে যদি কথা-বার্তায় কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ না থাকে (কিন্য়া)। যদি দূরত্ব এই পর্যায়ে হয় যে, একে অপরের কথা শুনা ও বুঝার ব্যাপারে সন্দেহ হয় তাহলে এই পরিমাণ দূরত্ব ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। এরূপ না হলে প্রতিবন্ধক হবে না (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তোমার এই আসবাবের বাগান লোকেরা দুই হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে নিচ্ছে। এ কথা শুনে বাগানের মালিক বলল, আমি তো এটি তোমার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছি। তারপর ক্রেতা বলল, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমি তা খরিদ করে নিয়েছি, তাহলে বিক্রেতার একথা ঠাট্টাস্বরূপ না হলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে। আর ঠাট্টাস্বরূপ বলা না বলা নিয়ে যদি উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে ঐ ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে যে ব্যক্তি ঠাট্টাস্বরূপ বলার দাবী করছে। যদি ক্রেতা তৎক্ষণাৎ বিক্রেতাকে কিছু মূল্য প্রদান করে থাকে তবে ঠাট্টার দাবী গ্রহণ যোগ্য হবে না (খুলাসা)।

১৪. মাসআলা : কোন দালাল ব্যক্তি গণ্য বিক্রেতাকে বলল, তুমি কি এই মূল্যে উক্ত মাল বিক্রি করে দিয়েছো। জবাবে বিক্রেতা বলল, বিক্রি হয়ে গেছে। তারপর সে আবার ক্রেতা কে বলল, তুমি কি খরিদ করেছো? জবাবে সে বলল, কেনা হয়ে গেছে। এহেন অবস্থায় যদি বিক্রয় সম্পাদন করাই উভয়ের উদ্দেশ্য হয় তাহলে বিক্রয় হয়ে যাবে (কিন্য়া)। যদি কেউ কাউকে বলে, আমার এই গোলাম আমি তোমার নিকট এত টাকা মূল্যে বিক্রি করলাম। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি মুখে কিছু না বলে তাকে কবজা করে নিল, তাহলে বেচাকেনা হয়ে যাবে। শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা (র) এই মতামত ব্যক্ত করেছেন (সিরাজিয়া)। যদি কেউ কাউকে বলে যে, এই খাদ্যদ্রব্য আমি তোমার নিকট হতে এক হাজার টাকার বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছি। সুতরাং তুমি তা মিসকীনদেরকে সাদাকা করে দাও। তারপর বিক্রেতা ঐ মজলিসেই এই কাজ পুরা করল তাহলে বেচাকেনা পূর্ণ হয়ে গেল। যদিও সে মুখে কিছুই বলেনি। কেননা এই সাদাকা করাই তার স্বীকৃতির প্রমাণ বহন করে। পক্ষান্তরে সে যদি ঐ মজলিস হতে পৃথক হওয়ার পর তা সাদাকা করে তবে এর হুকুম পূর্বোল্লিখিত হুকুমের বিপরীত হবে। অর্থাৎ মজলিস হতে পৃথক হওয়ার পর সাদাকা করা হলে এতে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে না। কেননা কবুল ও স্বীকৃতির পূর্বে এখানে অস্বীকৃতি পাওয়া গেছে। এমনিভাবে কেউ যদি বলে, আমি এই কাপড় এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার নিকট বিক্রি করলাম। সুতরাং তুমি তা কেটে জামা বানিয়ে নাও। তারপর মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বেই সে তা করে নিল তাহলে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)। ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমি আমার এই গোলামকে তোমার নিকট এক হাজার দিরহামের

বিনিময়ে বিক্রয় করলাম। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল যে, সে আযাদ তাহলে সে আযাদ হবে না (খুলাসা)। শায়খুল ইসলাম এবং সদরুশ শহীদ (র) জামে কিতাবের দাওয়ায় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, ক্রেতার কথা, বিক্রেতার কথার জবাব স্বরূপ। সুতরাং গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (মুহীত)। কেউ যদি ঐ রূপ বলে, আর তার জবাবে ক্রেতা বলে, فهو حر (সে আযাদ) তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে এক হাজার দিরহাম মূল্য হিসাবে পরিশোধ করে দেওয়া (খুলাসা)।

১৫. মাসআলা : শায়খ ইবরাহীম (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তি অপর কাউকে বলল যে, তোমার এই গোলাম আমার নিকট এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রয় কর। এ কথা শুনে বিক্রেতা বলল, আমি বিক্রয় করলাম। তারপর ক্রেতা বলল, সে আযাদ। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, ক্রেতার "সে আযাদ" কথা তাকে কবজা করার শামিল। কাজেই সে আযাদ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সে আযাদ হবে না। সুতরাং আযাদ করার কারণে সে কবজাকারীও হবে না (মুহীত)। বিক্রেতা যদি কোন বস্তু সম্পর্কে বলে যে, আমি এটা বিক্রি করলাম। তারপর ক্রেতার তা নিয়ে ভক্ষণ করা বা এর উপর সওয়ার হওয়া বা তা পরিধান করা তার পক্ষ থেকে উক্ত বেচাকেনার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করা (আয়নী-শরহুল হিদায়া)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি এটি খেয়ে ফেল। এর বিনিময়ে আমাকে এক দিরহাম প্রদান করা তোমার উপর অপরিহার্য। তারপর সে তা খেয়ে ফেলল। এতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়ে যাবে। কাজেই সে যা খেয়েছে তা তার জন্য হালাল বলে গণ্য হবে। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) কিতাবুল ইস্টিহসানের শরাহ গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা : এক ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির সাথে ক্রয়-বিক্রয়ের কল্পবার ছিল। সে তার নিকট থেকে কাপড় খরিদ করত। এহেন অবস্থায় ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলল, আমি তোমার নিকট হতে যত কাপড় নিব এর প্রতিটিতে তোমাকে এক দিরহাম করে মুনাফা দিব। এই ভাবে সে তার নিকট থেকে কাপড় নিয়ে যাচ্ছে এবং বিক্রেতাও তাকে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করছে। এমনিভাবে ক্রেতার নিকট দশ খানা বা এর চেয়ে বেশী কাপড়ের দাম জমা হয়ে গেছে। তারপর ক্রেতা প্রতি কাপড়ে এক দিরহাম মুনাফা হিসাবে সব মূল্য এক সাথে বিক্রেতাকে দিয়ে দিল। এ অবস্থায় ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যদি ক্রেতা নিকট কাপড় ঐ ভাবে বাকী থাকে এবং এ অবস্থায়ই সে মুনাফা দিয়ে দেয় তাহলে ক্রয় করণ জায়েয এবং মুনাফা দেওয়াও জায়েয। আর যদি কাপড় তার নিকট ঐ অবস্থায় বাকী না থাকে তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হবে এবং মুনাফা দেওয়া-নেওয়াও জায়েয হবে না। এক ব্যক্তি অন্য কারো নিকট কোন একটি কাপড়ের দর দাম জিজ্ঞেস করল। তারপর কাপড় বিক্রতা বলল, আমি এই কাপড় পনের টাকা দরে বিক্রি করি। একথা শুনে ক্রেতা বলল, আমি এটা দশ দিরহামের বেশী মূল্যে ক্রয় করব না। এই বলে সে ঐ কাপড়টি নিয়ে চলে গেল। কিন্তু বিক্রেতা কিছুই বলল না। এহেন অবস্থায় দেখতে হবে যে, যদি দর দাম করার সময় বিক্রিতব্য বস্তু ক্রেতার হাতে থাকে তাহলে এর মূল্য হবে পনের টাকা। অল্প যদি ঐ বস্তু

বিক্রেতার হাতে থাকে এবং তার হাত থেকে ক্রেতা তা নিয়ে নেয়, কিন্তু বিক্রেতা এর থেকে তাকে বারণ না করে তবে এর মূল্য হবে দশ দিরহাম। কাপড়টি যদি ক্রেতার হাতে থাকে এবং সে বলে যে, আমি দশ দিরহামের বেশি মূল্যে তা ক্রয় করব না, আর বিক্রেতা বলে, আমি পনের দিরহামের কমে এটি বিক্রি করব না। তারপর যদি ক্রেতা ঐ কাপড় বিক্রেতার হাতে ফিরিয়ে দেয় এরপর সে আবার বিক্রেতার হাত থেকে তা নিয়ে নেয় এবং বিক্রেতাও কোন কিছু না বলে তা তাকে দিয়ে দেয়। তৎপর ক্রেতা ঐ কাপড়টি নিয়ে চলে যায় তাহলে ক্রেতার উপর দশ দিরহাম ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা : মুজতবা নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কথার মধ্যে গড়মিল থাকে এবং এর উপরই বেচাকেনা হয়ে যায় তবে দেখতে হবে যে, সর্বশেষ কথা কি ছিল? সর্বশেষ কথা যেটি ছিল তার উপরই ফায়সালা দেওয়া হবে (আল-বাহরুর রাযিক)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, এই গোলাম আমি তোমার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলাম। তারপর আবার সে বলল, এই গোলাম আমি তোমার নিকট একশ' দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করলাম। তারপর ক্রেতা বলল, আমি কবুল করলাম। তাহলে এ বেচাকেনা শোষিত মূল্যের বিনিময়ে ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ একশ' দীনারের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে। আর যদি বলে, আমি এই গোলাম তোমার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলাম। তারপর ক্রেতা বলে যে, আমি কবুল করলাম। তারপর ঐ মজলিসেই অথবা অন্য কোন মজলিসে বিক্রেতা বলল, এই গোলাম আমি তোমার নিকট একশ' দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করলাম। এরপর ক্রেতা বলল, আমি খরিদ করে নিলাম, তাহলে প্রথম বারের বেচাকেনা বাতিল হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়বারের বেচাকেনা প্রকৃত বেচাকেনা বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অনুরূপভাবে প্রথমবারে যে জাতীয় মূল্যের বিনিময়ে মাল বিক্রি করা হয়েছে যদি দ্বিতীয় বারে ও ঐ জাতীয় মূল্যের বিনিময়ে মালামাল বিক্রি করা হয় তবে মূল্যের পরিমাণে কম বা বেশি করা হয় তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন প্রথমবারে দশ দিরহামের বিনিময়ে মাল বিক্রি করা হল। তারপর আবার বিক্রি করা হল নয় বা এগার দিরহামের বিনিময়ে, তাহলে দ্বিতীয়বারের বেচাকেনাই ধর্তব্য হবে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয়বার সেই দশ দিরহামের বিনিময়েই বেচাকেনা করা হয় তবে দ্বিতীয়বারের বেচাকেনা সংঘটিত হবে না। বরং প্রথমবারের বেচাকেনাই বহাল থাকবে। কেননা দ্বিতীয়বারের বেচাকেনার দ্বারা নতুন কোন ফায়দা হাসিল হয়নি। সুতরাং তা অনর্থক বলে গণ্য হবে (যহীরিয়া)।

১৮. মাসআলা : যদি বলে, আমি আমার এই গোলামকে তোমার নিকট এক হাজার দিরহামে বিক্রি করলাম। আর ক্রেতা বলে, আমি তোমার নিকট হতে দুই হাজার দিরহামের বিনিময়ে তা খরিদ করলাম। তাহলে বেচাকেনা জায়েয হবে। তবে বিক্রিতা যদি ঐ অতিরিক্ত মূল্য সেই মজলিসেই কবুল করে নেয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় দুই হাজার দিরহামের বিনিময়ে সাব্যস্ত হবে। আর যদি উক্ত মজলিসে তা কবুল না করা হয় তবে ক্রয়-বিক্রয় এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে সহীহ হবে। যদি ক্রেতা বলে, আমি এই গোলাম দুই হাজারের বিনিময়ে

খরিদ করলাম। কিন্তু বিক্রেতা বলে, আমি তোমার নিকট এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করলাম তাহলে এক হাজারের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে (খুলাসা)। কেউ যদি বলে, আমি একে তোমার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলাম, আমি একে তোমার নিকট দুই হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলাম। তারপর ক্রেতা বলল, আমি তোমার প্রথম কথা অর্থাৎ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয়ের কথা কবুল করলাম, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। আর ক্রেতা যদি এরূপ বলে যে, তোমার দুই বারের মূল্য মিলিয়ে আমি একে তিন হাজার দিরহামের বিনিময়ে কবুল করে নিলাম। তাহলে এ কথাটি- “আমি তোমার শেষোক্ত বিক্রিকে তিন হাজারের বিনিময়ে কবুল করে নিলাম” এর মত হয়ে গেল। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বেচাকেনা দুই হাজারের বিনিময়ে হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। আর এক হাজার দিরহাম অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে। এটি বিক্রেতার ইখতিয়ারে থাকবে। সে ইচ্ছা করলে ঐ মজলিসে তা কবুল করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে তা প্রত্যাখ্যানও করতে পারবে। যদি বিক্রেতা বলে, আমি ইহা এক হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করলাম এবং একশত দীনার মূল্যে বিক্রয় করলাম, তাহলে দ্বিতীয় মূল্য আদায় করা ক্রেতার উপর অপরিহার্য হবে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, উভয় মূল্য আদায় করাই তার উপর অপরিহার্য হবে। প্রথমোক্ত অভিমতটি “কিতাবুয্ যিয়াদাতে” উল্লেখ আছে এবং এটিই অধিক যুক্তি যুক্ত। আর বিক্রেতা যদি অতিরিক্ত মূল্য ঐ মজলিসেই কবুল করে নিবে তবে তা পরিশোধ করা ক্রেতার উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)। কোন ব্যক্তি অপর কাউকে বলল, আমি একে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমার নিকট বিক্রি করলাম। তারপর ক্রেতা বলল, আমি তা কবুল করলাম না। বরং আমাকে তা পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে দিতে পার। তারপর সে আবার বলল, আমি একে এক হাজারের বিনিময়ে নিয়ে নিলাম। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি গোলামকে ক্রেতার হাওয়ালা করে দেয় তবে এতে বিক্রেতার সম্মতি প্রকাশ পাবে। নচেৎ তার সম্মতি বুঝা যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা : ক্রেতা বা বিক্রেতার কোন একজনের প্রস্তাব করার পর অপর জনের ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে ঐ মজলিসেই উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে। পরিভাষায় একে “খিয়ারে কবুল” বলা হয়। এই খিয়ারের মধ্যে মীরাসের বিধান প্রযোজ্য হবে না (আল-জাওহারা তুন নায্যারা)। খিয়ারে কবুল মজলিস শেষ না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকে (কাফী)। কবুল সহীহ হওয়ার জন্য প্রস্তাবদাতার জীবিত থাকা শর্ত। পক্ষান্তরে যদি কবুল করার পূর্বেই প্রস্তাবদাতা মারা যায় তবে প্রস্তাব (ইজাব) বাতিল হয়ে যাবে (আন-নাহরুল ফায়িক)। যদি প্রস্তাবদাতা তার প্রতিপক্ষ যে কোন একজন কবুলের আগেই মজলিস ত্যাগ করে তাহলে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে। তদ্রূপ যদি মজলিসে বসা অবস্থায়ই ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত অন্যকোন কাজে মশগুল হয়ে যায় তাহলে ও ইজাব (প্রস্তাব) বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে এবং প্রস্তাবটি কবুল করে নেয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হয়ে যাবে (আস্-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

২০. মাসআলা : শায়খ নাসীর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি এই গোলামকে তোমার নিকট বিক্রি করলাম। এ সময় ঐ ব্যক্তির হাতে একটি

পেয়ালা ছিল। সে ঐ পেয়ালা থেকে পানি পান করল। তারপর বলল যে, আমি খরিদ করলাম, এতে ক্রয়-বিক্রয় হবে কী? জবাবে শায়খ (র) বললেন, এতে ক্রয়-বিক্রয় পুরা হয়ে যাবে। এমনভাবে সে যদি এক লুকমা খেয়ে এরপর বলে, আমি ক্রয় করলাম তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (যখীরা)। পক্ষান্তরে যদি সে ঐ আলোচনার পর আহায়ে ব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে এটাকে মজলিস পরিবর্তন ধরা হবে। যদি প্রস্তাবের পর উভয়ে বা কোন একজনে গুয়ে যায় এবং কাৎ হয়ে শোয় তাহলে এতেও পৃথক হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তারা বসে বসে ঘুমায় তাহলে এতে পৃথক হওয়া সাব্যস্ত হবে না (খুলাসা)। যদি প্রস্তাবের পর তারা উভয়ে বেইশ হয়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে আসে তারপর প্রস্তাব কবুল করে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি হুঁশ ফিরে আসতে এবং প্রস্তাব কবুল করতে অধিক বিলম্ব হয়ে যায় তবে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে (তাতার খানিয়া)।

২১. মাসআলা : কেউ যদি বলে, আমি তোমাকে এই বস্তুটি এত টাকার বিনিময়ে দিয়ে দিলাম। একথা শুনে ক্রেতা কিছুই বলল না। ইত্যবসরে বিক্রেতা অন্য কারো সাথে ব্যক্তিগত আলোচনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি বিক্রেতার প্রস্তাবের পর ক্রেতা ফরয নামাযে দাঁড়িয়ে যায় অথবা প্রস্তাবকালে ফরয নামাযে ছিল, নামায শেষ করে প্রস্তাব কবুল করল তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে (কিন্য়া)। যদি ক্রেতা ফরয নামাযের সাথে এক রাকাআত নফলও আদায় করে তারপর প্রস্তাব কবুল করে তাহলেও ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে (ওয়াজীয : আল-কুরদরী)। ক্রেতা ঘরের ভেতরে ছিল। তারপর সে ঘর থেকে বের হয়ে বলল, আমি খরিদ করলাম তাহলে বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হবে না (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা : যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা হাঁটা-চলা অবস্থায় অথবা একই সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় কিংবা দুই সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় বিক্রয় চুক্তি করে তাহলে প্রস্তাব পেশ করার সাথে সাথেই কবুল করলে চুক্তি সম্পন্ন হবে, পক্ষান্তরে জবাব দিতে সামান্য বিলম্ব হলেও ক্রয় বিক্রয় সহীহ হবে না, যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একই স্থানে থাকে (আয়নী : শরহে হিদায়া)। নাওয়াযিল গ্রন্থের সূত্রে খুলাসা কিতাবে বর্ণিত আছে যে, দুই এক কদম চলার পর প্রস্তাবের জবাব দিলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে (ফাতহুল কাদীর)। আমরা উক্ত অভিমতটি গ্রহণ করে থাকি (আন্-নাহরুল ফায়িক : জামউত তাফারীকের সূত্রে)। সদরুশ শহীদ (র) তৎপ্রণীত ফাতাওয়া গ্রন্থে এ কথা বলেছেন যে, যাহিরী রিওয়ায়েত মতে এ ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে না (খুলাসা)।

২৩. মাসআলা : উভয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় একজনে অন্যজনকে প্রস্তাব দিল। কিন্তু অন্য জনে তা কবুল করার আগেই উভয়ে অথবা একজন চলতে শুরু করল তাহলে ইজাব বাতিল হয়ে যাবে। যদি উভয়ে নৌকায় চলা অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা করে এবং একের প্রস্তাব ও অন্যের জবাবের মধ্যে সামান্য বিরতি ঘটে তাহলে তা ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার

ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। বস্তুত নৌযানের বিষয়টি ক্ষুদ্র কক্ষের অনুরূপ (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। কেউ বলল, আমি অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট এটি বিক্রি করে দিয়েছি। তারপর সে ব্যক্তি মজলিসে হাযির হয়ে বলল, আমি ক্রয় করে নিয়েছি তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে (আল-মুহীত)। বিক্রেতা বলল, আমি বিক্রি করলাম এবং ক্রেতা বলল, আমি খরিদ করলাম। এহেন অবস্থায় তাদের উভয়ের কথা যদি একত্রে উচ্চারিত হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে। আমার পিতা শায়খ (র) অনুরূপ বলতেন (যখীরিয়া)।

২৪. মাসআলা : বিক্রিত বস্তু পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হওয়ার আগেই কবুলের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া আবশ্যিক (আল-বাহরুর রায়িক)। সুতরাং কোন ব্যক্তি আঙ্গুরের রস বিক্রি করার পর ক্রেতা তা কবুল করল না। তারপর তা শরাব এবং পরে সিরকায় পরিণত হওয়ার পর ক্রেতা তা কবুল করল, তদ্রূপ দাসী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি দাসীর সন্তান প্রসবের পর কবুল করে, তদ্রূপ বিক্রেতা দুটি গোলাম বিক্রয়ের প্রস্তাব করার পর একজনকে হত্যা করা হল এবং বিক্রেতা তার রক্তপণ (دیه) গ্রহণ করল তারপর ক্রেতা উক্ত প্রস্তাব কবুল করল, প্রস্তাব ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না (তাতার খানিয়া)। কেউ বলল, আমি এই দাসীকে তোমার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলাম। কিন্তু ক্রেতা এই প্রস্তাব কবুল করল না। তারপর অন্য এক ব্যক্তি এই দাসীর হাত কেটে এর ক্ষতিপূরণ বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দিল অথবা ক্ষতিপূরণ এখনো হস্তান্তর করেনি, এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি বলে, আমি এটি কবুল করে নিলাম, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না (যখীরিয়া)।

২৫. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) কিতাবুল ওয়াকালাত-তে একটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন, তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদি এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমি এই গোলামকে তোমার নিকট এই পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করলাম। তারপর ক্রেতা বলে, আমি কবুল করলাম, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে না, যাবৎ না বিক্রেতা আবার বলবে اجزت (আমি অনুমতি প্রদান করলাম)। কোন কোন মাশায়িখ এই মতামত পোষণ করেন। কেননা বিক্রেতা بعت منك (আমি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম) বলে ক্রেতাকে এই গোলামের মালিক করে দিয়েছি। তারপর ক্রেতা اشتريت (আমি খরিদ করলাম) বলে, ঐ গোলামের মালিক হয়ে গেছে এবং বিক্রেতাকে এর মূল্যের মালিক বানিয়ে দিয়েছে। কাজেই এ অবস্থায় বিক্রেতার পক্ষ হতে অনুমতি প্রদান আবশ্যিক যাতে সে ঐ গোলামের মূল্যের মালিকানা পরিপূর্ণ ভাবে হাসিল করে নিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মতে এ পর আর বিক্রেতার অনুমতির কোন দরকার নেই। এটিই সহীহ মতামত। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে (যখীরা)।

২৬. মাসআলা : ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাবদাতা চাই বিক্রেতা হোক বা ক্রেতা, প্রতিপক্ষের কবুল করার পূর্বে সে তার নিজের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে পারবে (আন্-নাহরুল ফায়িক)। ইজাবকারী (প্রস্তাবকারী) ব্যক্তির ইজাব প্রত্যাহার করার কথা শুনা অপরিহার্য। অর্থাৎ বিষয়টি কারো না কারো শ্রুত হতে হবে (তাতার খানিয়া)। কিন্তু ইয়াতীমা গ্রন্থে উল্লেখ আছে

যে, ইজাব (প্রস্তাব) প্রত্যাহার করা সহীহ আছে, যদিও তা কেউ না জানে (আল-বাহারুর রাযিক)। বিক্রেতা বলল, আমি এই গোলামকে তোমার নিকট এই পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করলাম। তারপর সে বলল, আমি আমার এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলাম। কিন্তু ক্রেতা তার এই প্রত্যাহারের কথা শুনতে পেল না। ইত্যবসরে সে বলল, আমি তা ক্রয় করে নিলাম, তাহলে উক্ত বেচাকেনা সম্পন্ন হয়ে যাবে (যহীরিয়া)। বিক্রেতা বলল, আমি বিক্রয় করলাম। ক্রেতা বলল, আমি খরিদ করলাম। তাদের এরূপ উজির পর পরই বিক্রেতা যদি বলে, আমি বিক্রয় প্রত্যাহার করে নিলাম। সে এই কথা এত দ্রুত বলল যে, তা ক্রেতার উজির প্রায় সাথে সাথেই বলা হয়ে গেল তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবে না আর বিক্রেতা যদি ক্রেতার উজির পর তার প্রত্যাহার উক্তি ব্যক্ত করে তবে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয় যাবে (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)।

২৭. মাসআলা : ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে ইজাব ও কবুল হয়ে যাওয়ার পর বেচাকেনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। এ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহারের ব্যাপারে ক্রেতা ও বিক্রেতার কোন প্রকার ইখতিয়ার থাকে না। অবশ্য এ অবস্থায়ও তাদের জন্য খিয়ারে রুয়ত বা খিয়ারে আয়েব হাসিল হতে পারে (হিদায়া)। ইজাব কবুল হয়ে যাওয়ার পর বিক্রেতা কর্তৃক পুনঃঅনুমতির আর কোন প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মত এটিই। এটিই সহীহ অভিমত (আন্-নাহরুল ফায়িক)। ক্রেতা যদি বলে, আমি এ গোলামকে তোমার নিকট হতে এক হাজার টাকার বিনিময়ে খরিদ করেছি এবং বিক্রেতা বলে, আমি একে বিক্রি করেছি। তারপর ক্রেতা যদি বলে, এ মাল নেওয়ার ব্যাপারে এখন আর আমার আগ্রহ নেই, এহেন অবস্থায় তার এরূপ বলার ইখতিয়ার নেই (যখীরা)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি কি আমার নিকট এই কাপড়টি দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলে? বিক্রেতা বলল, (হাঁ), বিক্রয় করেছি। তারপর ক্রেতা বলল, এটি ক্রয় করার ব্যাপারে এখন আর আমার ইচ্ছা নেই। এ অবস্থায় সে এরূপ কথা বলতে পারবে (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট থেকে নয় দিরহামের বিনিময়ে একটি কাপড় খরিদ করতে চাইল। কিন্তু কাপড়ের মালিক বলল, আমি দশ দিরহামের কমে দিব না। তুমি (তা দিয়ে) খরিদ করবে কী? এ কথা শুনে ক্রেতা বলল, আমি রাযী আছি। তখন কাপড়ের মালিক বলল, এখন আর আমি এটি বিক্রি করব না, এহেন অবস্থায় বিক্রেতার এরূপ বলার অধিকার আছে (সিরাজিয়া)।

২৮. মাসআলা : পত্রযোগে ক্রয়-বিক্রয় উপস্থিত সম্বোধনের অনুরূপ দূতপ্রেরণ করে ক্রয়-বিক্রয় করার বিষয়টিও তাই। কাজেই চিঠি বা দূত মারফত পয়গাম পৌঁছার মজলিসটি ধর্তব্য হবে (হিদায়া)। তাজুশ শরীআ (র) বলেন, পত্রের ভাষা হবে যে, আমি এই পত্রটি অমুক ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করলাম। আম্মাবাদ! আমি আমার অমুক গোলামটি তোমার নিকট এতর বিনিময় বিক্রি করলাম। তারপর এই চিঠি তার নিকট পৌঁছার পর সে যদি তা পাঠ করে এর মর্ম বুঝে ঐ মজলিসেই তা কবুল করে নেয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হয়ে যাবে (আয়নী শরহে হিদায়া)। আর দূত প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রেরক ব্যক্তি দূতকে বলবে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে গিয়ে বল, অমুক ব্যক্তি তার অমুক গোলামটি এত টাকার বিনিময়ে তোমার নিকট বিক্রি করেছে। তারপর সংবাদ বাহকের কথা শোনার পর যদি সে ঐ মজলিসেই প্রস্তাব কবুল করে,

তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে। এমনি ভাবে দূত প্রেরক বিক্রেতা যদি দূতের সামনে বলে যে, আমি আমার অমুক গোলামটি এত টাকার বিনিময়ে অমুকের নিকট বিক্রি করেছি, হে অমুক! তুমি গিয়ে তাকে এ সম্পর্কে সংবাদ দাও। তারপর সে তাকে এ সম্পর্কে সংবাদ দিল এবং সে তা কবুল করে নিল, তাহলেও ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)।

২৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি বলল, আমি একে অমুক অনুগৃহিত ব্যক্তির নিকট এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছি। এ সংবাদ পৌঁছার পর সে তা কবুল করে নিল, তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্য কেউ ঐ মজলিসেই তার পক্ষ হতে প্রস্তাব কবুল করে নেয় তাহলে ঐটা ঐ ব্যক্তির অনুমোদনের উপর মওকুফ থাকবে (সিরাজিয়া)। কেউ যদি বলে, আমি একে অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিলাম, তুমি এ সংবাদ তার নিকট পৌঁছিয়ে দাও। তারপর অন্য কোন ব্যক্তি তাকে এ সংবাদ জানিয়ে দিল, তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে (আল-মুহীত)। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট এ মর্মে পত্র লিখল যে, আমি তোমার এই গোলামটি খরিদ করে নিয়েছি। তারপর গোলামের মালিক তাকে এ মর্মে পত্র লিখল যে, আমি একে তোমার নিকট বিক্রি করলাম। তাহলে বেচাকেনা হয়ে যাবে (যহীরিয়া)। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তির নিকট এ মর্মে পত্র লিখে যে, একে আমার নিকট এত টাকা মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। পত্রের উত্তরে সে লিখল যে, আমি একে তোমার নিকট বিক্রি করে দিলাম তাহলে পত্র প্রেরক ব্যক্তির 'খরিদ করলাম' না বলা পর্যন্ত চুক্তি সম্পন্ন হবে না (আয়নী : শরহে হিদায়া)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট এ মর্মে পত্র লিখল যে, এত টাকার বিনিময়ে তুমি কি তোমার এ গোলামটি আমার নিকট বিক্রি করলে? জবাবে সে লিখল, আমি আমার এ গোলামটি তোমার নিকট বিক্রি করলাম। তবে এতে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে না (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা : ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত পত্র বা দূত প্রেরণের পর প্রেরক যদি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয় তবে এ প্রত্যাহার সহীহ হবে। চাই বার্তাবাহক ব্যক্তি এ সম্বন্ধে অবগত হোক বা না হোক (আয়নী : শরহে হিদায়া)। ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত পত্র ও বার্তা প্রাপকের নিকট পৌঁছার এবং তার তা কবুল করার আগেই প্রেরক ব্যক্তি যদি এ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে এ প্রত্যাহার সহীহ হবে। চাই প্রাপক ব্যক্তি এ সম্পর্কে জানুক বা না জানুক। সুতরাং প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর যদি ঐ দ্বিতীয় (প্রাপক) ব্যক্তি এ প্রস্তাব কবুল করে নেয় তাহলে বেচাকেনা পূর্ণ হবে না (ফাতহুল কাদীর)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, এই গোলামটি এত টাকার বিনিময়ে আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম। তারপর সে ব্যক্তি নিজে জবাব না দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি বলে দাও, আমি খরিদ করে নিলাম, সে মতে এই তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমি খরিদ করে নিলাম। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, যদি এই ব্যক্তি رسالة তথা বার্তাবাহক হিসাবে এই রূপ বলে তবে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে। আর যদি সে উকীল হিসাবে এ কথা বলে তবে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে না (মুহীত)।

৩১. মাসআলা : মুখে কিছু না বলে শুধু লেনদেন দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যায়। এটাকে বায়উত তাআতী (بيع التعاطي) বলে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বিক্রিত বস্তু দামী বা সস্তা

হওয়াতে কোন পার্থক্য নেই। সব ধরনের মালের মধ্যেই بيع التعلطی (বা নীরব লেন-দেনের বিক্রয় জায়েয) আছে। এটিই সহীহ মতামত (তাবয়ীন)। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো লেনদেন উভয় পক্ষের তরফ থেকে হওয়া (কিফায়া)। অধিকাংশ মাশাইথে কিরাম এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বাযযায়িয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এটিই পসন্দনীয় অভিমত (আল-বাহরুর রায়িক)। বিশুদ্ধ মতানুসারে পণ্য ও পণ্য মূল্য এতদুভয়ের কোন একটি কবজা করাই 'বায়উত তাআতী' সহীহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা ইমাম মুহাম্মাদ (র) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পণ্য মূল্য কোন একটির কবজা হলেই 'বায়উত তাআতী' সাব্যস্ত হয়ে যাবে (আন-নাহরুল ফায়িক)। উপরোক্ত মতে যিনি প্রবক্তা তিনি বলেন, বায়উত তাআতী সংঘটিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিক্রিত পণ্য হস্তান্তর করার সাথে সাথে মূল্যের বিষয়টিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা। শায়খ আবুল ফযল কিরমানী (র) থেকে অনুরূপ ফাতওয়া উদ্ধৃত রয়েছে (মুহীত)। এ শর্ত ঐ সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যার মূল্য বাজারে অনির্দিষ্ট। কাজেই রূটি ও গোশতের ক্ষেত্রে মূল্য বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই (আল-বাহরুর রায়িক)।

৩২. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা মালের দরদাম করছে, কিন্তু ঐ মাল বহন করে নেওয়ার মত তার কাছে কোন পাত্র নেই। এ কারণে সে যদি ব্যাগ বা পাত্র আনার জন্য যায় এবং এরপর এসে বিক্রেতাকে মূল্য বাবদ দিরহাম বা টাকা পরিশোধ করে তবে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে (মুযমারাত)। মুনতাকা গ্রন্থে এও উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট এক হাজার দিরহাম পাওনা ছিল। দেনাদার পাওনাদারকে বলল, আমি তোমাকে তোমার পাওনার বিনিময়ে দীনার প্রদান করব এবং দীনারের ভাও ও সে সাব্যস্ত করল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বেচাকেনা হয়নি। ইত্যবসরে সে ঐ মজলিস হতে উঠে গিয়ে দীনার এনে তাকে প্রদান করল। কিন্তু তখন সে নতুন করে বেচাকেনার কথা বলল না। এক্ষেত্রেও বেচাকেনা পূর্ণ হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে আট দিরহামের বিনিময়ে এক বোঝা মাল কিনল। তারপর সে বিক্রেতাকে বলল, অনুরূপ মূল্যের বিনিময়ে আমাকে আরেক বোঝা মাল এনে দাও এবং তা এখানে রেখে দিবে। তারপর বিক্রেতা আরেক বোঝা মাল এনে তা এখানে রেখে দিল। এতে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাবে। এ অবস্থায় বিক্রেতা ওয়ার্ডার দাতা ব্যক্তির নিকট এই আট দিরহামের ব্যাপারে তাগাদা করতে পারবে (আল-মুযমারাত)।

৩৩. মাসআলা : মুজাররাদ গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে, কেউ গোশত বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কিভাবে গোশত বিক্রি করছো? সে বলল, তিন রতলের দাম এক দিরহাম। তারপর ক্রেতা বলল, আমি তোমার থেকে গোশত খরিদ করলাম। সুতরাং আমাকে তা মেপে দাও। কিন্তু বিক্রেতা গোশত মেপে দিতে রাযী নয়, তাহলে তার এই ইচ্ছাধিকার আছে। আর বিক্রেতা যদি গোশত মেপে দেয় তবে ক্রেতার সে গোশত কবজা করার আগে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই নিজ নিজ অভিমত প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি মাল কবজা করে নেয় অথবা বিক্রেতা যদি ক্রেতার নির্দেশে সে গোশত তার

পাত্রে ঢুকিয়ে দেয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে। এহেন অবস্থায় এক দিরহাম পরিশোধ করা ক্রেতার উপর অপরিহার্য হবে। নাওয়াদিরে ইবন সিমাআ গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, কেউ যদি কসাইকে বলে যে, তোমার গোশত মেপে দাও অথবা বলে যে, পার্শ্বের দিক থেকে অথবা পায়ের দিক থেকে আমাকে গোশত তা থেকে আমাকে কিছু গোশত মেপে দাও তবে প্রতি তিন রতল গোশতের বিনিময়ে এক দিরহাম পাবে। তারপর কসাই তাকে গোশত মেপে দিল। এক্ষেত্রে ক্রেতা গোশত না নেওয়ার ইসতিয়ার থাকবে না (মুহীত)। বিক্রেতার খাঁচায় ছোট বড় সব রকমের তরমুজই রয়েছে। তখন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, এর দশটির দাম কত? সে বলল এক দিরহাম। তারপর সে বিক্রেতার চোখের সামনে দশটি পসন্দ করে নিয়ে গেল, অথবা বিক্রেতা নিজ হাতে দশটি তরমুজ আলাদা করল, তারপর ক্রেতা তা কবুল করে নিল, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)।

৩৪. মাসআলা : গম ক্রয়ের উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি গম বিক্রেতাকে পাঁচটি দিনার দিয়ে জিজ্ঞেস করল যে, তুমি কি হিসাবে গম বিক্রি করছ? সে বলল, এক দীনারে একশ' রতল। এ কথা শুনে ক্রেতা নীরব থাকল, পরে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট গম চাইল এবং বলল যে, সে গম নিবে। তখন বিক্রেতা বলল, আগামীকাল আমি তোমাকে গম দিব। ফলে বেচা কার্যকারী করা ছাড়াই ক্রেতা চলে গেল, এবং পরের দিন আসল। এদিকে গমের দর পরিবর্তন হয়ে গেল। এক্ষেত্রে বিক্রেতার গম বিক্রি করা থেকে বিরত থাকতে পারবে না। বরং পূর্ব মূল্যে ক্রেতাকে গম দিতে বাধ্য থাকবে (কিনয়া)। এক ব্যক্তি একটি বালিশ ও একটি চাদর খরিদ করেছে- যা এখনো পর্যন্ত তৈরি করা হয় নি, পরে তৈরি করে তার নিকট হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু লেন-দেন কবে হবে তা নির্ধারণ করা হয় নি তবে এ ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে না। তারপর যদি বালিশ ও চাদর তৈরি করে ক্রেতার নিকট হস্তান্তরও করা হয় তবুও তা সহীহ হবে না। উল্লেখ্য যে, বায়উত তাআতী ক্রয়-বিক্রয় রূপে গণ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো এর ভিত্তি ফাসিদ বা বাতিল প্রক্রিয়ার উপর না হওয়া। সুতরাং যদি এর ভিত্তি ফাসিদ বা বাতিল প্রক্রিয়ার উপর হয় তাহলে তা বাতিল হবে (ওয়াজীয : আল কুরদুরী)।

৩৫. মাসআলা : কেউ বলল, এই লাকড়ীর আঁটি কত মূল্যে বিক্রি করছো? অপর জন বলল, এত করে। দাম শুনে সে বলল, ওহ! নিজের গাধা হাকিয়ে যাও। তারপর সে তার গাধা হাকিয়ে চলে গেল। এতে ক্রয়-বিক্রয় হবে না। তবে বিক্রেতা যদি তৎক্ষণাৎ তার নিকট লাকড়ীর আঁটি হস্তান্তর করে দিয়ে তার থেকে মূল্য উসূল করে নেয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হয়ে যাবে (সিরাজিয়া)। এক ব্যক্তি কসাইকে বলল, এই গোশত এক দিরহামে কতটুকু? জবাবে বিক্রেতা বলল, দুই কেজি। তারপর ক্রেতা বলল, মেপে দাও। এরপর সে বিক্রেতাকে এক দিরহাম দিয়ে গোশত নিয়ে নিল, এতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হয়ে যাবে। এরপর দ্বিতীয়বার আর গোশত ওজন করার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যদি ওজন করে দেখা যায় যে, পরিমাণে কম, তবে প্রদত্ত দিরহাম হতে সেই অনুপাতে মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। কিন্তু অতিরিক্ত গোশত নিয়ে তা পূরণ করা যাবে না। কেননা পণ্যের প্রদত্ত পরিমাণের উপরই বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে (ওয়াজীয আল-কুরদুরী)।

৩৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি কসাইকে প্রত্যহ এক দিরহাম করে প্রদান করত এবং কসাইও তাকে গোশত ওজন করে দিত। ক্রেতার ধারণা ছিল যে, সে তাকে এক কেজি করে গোশত দিচ্ছে আর শহরে গোশতের মূল্যও এরূপই ছিল। একদিন ক্রেতা বাড়িতে মেপে দেখল যে, পরিমাণ এক কেজির কম। তাহলে সে কমের পরিমাণ মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ গোশত নিতে পারবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি উক্ত ব্যক্তি ঐ শহরেরই অধিবাসী হয় যে শহরে বেচাকেনা হয়েছে। কিন্তু যদি সে অন্য শহরের লোক হয়, আর ঐ শহরে রুটি এবং গোশতের দর এমনভাবে স্থির করা আছে যে, তাতে হের-ফের হয় না। এ অবস্থায় ঐ পরদেশী ব্যক্তি বিক্রেতাকে বলে রেখেছিল যে, আমাকে এক দিরহামের গোশত দিবে বা রুটি দিবে। বিক্রেতা তাকে স্থির মূল্যের চেয়ে পরিমাণে কিছুটা কম দিয়েছে। কিন্তু ক্রেতা তা জানতে পারে নি, বরং পরে জেনেছে। তাহলে রুটির ক্ষেত্রে ক্রেতা কম পরিমাণের মূল্য ফেরত নিয়ে নিতে পারবে, যেমন শহরবাসীরা পারে। কিন্তু গোশতের ক্ষেত্রে ফেরত নিতে পারবে না। কেননা রুটির ক্ষেত্রে বাধা মূল্যের বিষয়টি প্রচলিত। কাজেই এর ফলাফল স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের ক্ষেত্রেই প্রকাশ হবে। কিন্তু গোশতের ক্ষেত্রে দর বেধে দেয়ার বিষয়টি প্রচলিত কাজেই এর ফলাফল বহিরাগতদের ক্ষেত্রে প্রকাশ হবে না (যহীরিয়া)।

৩৭. মাসআলা : মাজমুউন নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তির নিকট অপর ব্যক্তির কিছু পাওনা ছিল। পাওনাদার ব্যক্তি দেনাদারের নিকট তার পাওনা তলব করল। তখন দেনাদার ব্যক্তি কিছু যব নিয়ে এসে পাওনাদারকে বলল, বাজার দর অনুসারে তুমি তোমার পাওনা নিয়ে নাও। শায়খ (র) বলেন, যদি উক্ত শহরে যবের মূল্য নির্দিষ্ট থাকে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই তা জানে তবে ক্রয়-বিক্রয় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি ঐ শহরে যবের মূল্য নির্দিষ্ট না থাকে অথবা নির্দিষ্ট আছে কিন্তু তাদের তা জানা নেই তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে না (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা : খরিদকৃত মাল ক্রেতা কর্তৃক ঐ ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করাও বায়উত তাআতীর অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি এমন স্থানে গুফআর দাবী করেছে যে, স্থানে গুফআর হুকুম প্রযোজ্য হয় না। এমনভাবে উকীল কোন একটি বস্তু খরিদ করেছে এবং তা তার নিজের জন্য হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সে যদি ঐ বস্তু তার মুআকিলের নিকট হস্তান্তর করে তবে এটিও বায়উত তাআতী বলে গণ্য হবে। যদি আদেশদাতা ব্যক্তি ঐ মাল কবজা করে নেয়। আবার এদিকে আদেশ দেওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকারও করে। অথচ উকীল এই মাল তার জন্যই খরিদ করেছে (আল-বাহরুর রায়িক : মুজতবা এর সূত্রে)। অনুরূপভাবে নিম্নের অবস্থাগুলোও বায়উত তাআতীর অন্তর্ভুক্ত যেমন এক ব্যক্তির নিকট কোন এক দাসীকে আমানত রাখা হল। কিছু দিন পর আমানতদার ব্যক্তি ঐ দাসীকে রেখে ভিন্ন এক দাসীকে এনে আমানতকারী ব্যক্তিকে বলল, এটি তোমার দাসী এবং সে এ কথাটি কসম করে বলল, অথচ আমানতকারী ব্যক্তি পরিকারই জানে যে, মূলতঃ এটি তার দাসী নয়; তা সত্ত্বেও সে যদি তাকে গ্রহণ করে তবে আমানতকারী ব্যক্তির জন্য জায়েয হবে তার সাথে সঙ্গম করা এবং দাসীর জন্যও জায়েয

হবে তাকে এ কাজের জন্য সুযোগ দেওয়া। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে, কেউ যদি দর্জীকে বলে যে, এই আস্তরটি আমার নয়। তারপর দর্জী কসম করে বলে যে, এটি তারই তবে উক্ত ব্যক্তির জন্য জায়েয হবে এই আস্তরটি নিয়ে নেওয়া (ফাতহুল কাদীর)। ক্রেতা খিয়ারে আয়েব (ক্রেটিজনিত অধিকার)-এর কারণে কোন দাসীকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিল। অথচ বিক্রেতা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এটি তার দাসী নয়। তা সত্ত্বেও সে যদি তাকে গ্রহণ করে এবং এ বিষয়ে রাযী হয়ে যায় তবে এটিও বায়উত তাআতী রূপে গণ্য হবে (আল-বাহরুর রায়িক)। যদি ধোপা কারো কাপড় পরিবর্তন করে ভিন্ন কাপড় মালিকের নিকট হস্তান্তর করে অথবা মুচি যদি কারো জুতা বদলিয়ে ভিন্ন কোন জুতা মালিকের নিকট হস্তান্তর করে তবে গুলোও বায়উত তাআতী বলে গণ্য হবে (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)। কোন এক ব্যক্তি তরমুজ বিক্রেতা ব্যক্তিকে কিছু দিরহাম প্রদান করল, উদ্দেশ্য ছিল, তার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ তরমুজ খরিদ করা। তারপর তরমুজ বিক্রেতা ঐ দিরহামগুলো হস্তগত করে বলতে লাগল যে, এর বিনিময়ে আমি তোমাকে তরমুজ দিব না। এদিকে ক্রেতাও তার থেকে কিছু তরমুজ নিয়ে নিল। এমতাবস্থায় বিক্রেতা তার নিকট এগুলো আর ফেরত কামনা করল না। অথচ বাজারী লোকদের অভ্যাস ক্রেতার জানা আছে যে, বিক্রেতা যদি মূল্যের ব্যাপারে রাযী না হয় তবে সে মূল্য ফেরত দিয়ে দেয় অথবা পণ্য ফেরত নিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে সে যদি এরূপ না করে তবে একথা ধরে নেওয়া হবে যে, সে এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর রাযী আছে। এদিকে বিক্রেতা ব্যক্তি ক্রেতার মনকে খুশী করার জন্য চীৎকার করে করে বলছে যে, আমি তোমাকে এই মাল এই দামে দিব না, (এ অবস্থায় উক্ত ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে কিনা) এ সম্বন্ধে শায়খ (র) বলেন, এতসব কিছু করা সত্ত্বেও উক্ত ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে না (কিন্য়া)। খালাফ (র) বলেন, আমি আসাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যদি কোন ব্যক্তি বাজারে গিয়ে বলে, এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে হিরাতের কাপড় দশ দিরহাম মূল্যে বিক্রি করবে। তখন এক ব্যক্তি বলল, আমি আছি। তারপর সে তাকে ঐ কাপড় দিয়ে দিল, তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কিনা? জবাবে তিনি বললেন, না, জায়েয হবে না। তবে যদি ক্রেতা উক্ত কাপড় গ্রহণকালে বলে যে, আমি এই কাপড় দশ দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করেছি। আর বাড়িতে গিয়ে আমি এ কাপড় যাচাই করে দেখব, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে। খালাফ (র) বলেন, আমি হাসান (র)-কে এই মাসআলা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার ইখতিয়ার থাকবে (আল-মুহীত)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কবজা করে নেওয়া মালের বিধি-বিধান

১. মাসআলা : একটি কাপড়ের দরাদরি করতে গিয়ে বিক্রেতা বলল, এটি তোমার জন্য বিশ দিরহাম, ক্রেতা বলল, না, বরং দশ দিরহাম। এই বলে ক্রেতা কাপড়টি নিয়ে গেল, কিন্তু বিক্রেতা দশ দিরহামে রাযী হল না। তাহলে এটা ক্রয়-বিক্রয় হবে না। কিন্তু ক্রেতা যদি তা নষ্ট করে ফেলে বা হারিয়ে ফেলে তাহলে তার উপর বিশ দিরহামই ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কাপড় অক্ষত থাকলে তার সেটা ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। ইমাম আবু হানীফা এবং

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, কিয়াস মতে তো তার উপর বাজার মূল্যই অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওরফের কারণে আমরা কিয়াস তরক করে বলছি যে, তার উপর বিশ দিরহাম ওয়াজিব হবে। যদি কোন ব্যক্তি *مساومة*-এর ভিত্তিতে কাপড় নিয়ে যায় এবং বিক্রেতা এর মূল্যও বলে দেয়, তারপর ঐ কাপড় যদি ক্রেতার হাতে খোয়া যায় তাহলে তার উপর এর (বাজার) মূল্য ওয়াজিব হবে। এমনভাবে ক্রেতা মারা যাওয়ার পর ঐ কাপড় যদি ক্রেতার ওয়ারিসদের হাতে নষ্ট হয় বা খোয়া যায় তাহলে তাদের উপরও এর (বাজার) মূল্য ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি দোকানদারের নিকট থেকে এই বলে একটি কাপড় নিয়ে গেল যে, পসন্দ হলে তা খরিদ করবো। তারপর যদি তার হাত থেকে তা খোয়া যায় তাহলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, পসন্দ হলে আমি তা দশ দিরহামের বিনিময়ে নিয়ে নিব; তাহলে তার হাতে খোয়া যাওয়া অবস্থায় তাকে এর বাজার মূল্য অনুপাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (আল-মুহীত)। এর উপরই ফাতওয়া (তাতার খানিয়া)।

২. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি কাপড় দরাদরি করে ক্রয় করার উদ্দেশ্যেই সে ঐ কাপড়টি নিয়ে গেল অথবা মূল্য নির্ধারণ করার সময় বিক্রেতা নিজেই কাপড়টি তার হাওয়ালা করে দিল এবং বলল, এর মূল্য দশ দিরহাম। তারপর ক্রেতা তা নিয়ে গেল। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথিত মূল্যই হবে ঐ কাপড়ের মূল্য; যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রেতা তা রদ করবে। অর্থাৎ বলবে যে, নয় দিরহামে দেবো না, বা নয় দিরহামের বেশী দিয়ে নিতে আমি রাযী নই (যখীরা)। বিক্রেতা বলল, এই কাপড়ের দাম বিশ দিরহাম। ক্রেতা বলল, দশ দিরহামে আমি তা নিয়ে নিলাম। এই বলে সে কাপড়টি নিয়ে চলে গেল, তারপর তা তার হাতে খোয়া গেল, তাহলে তার উপর এর বাজার মূল্য ওয়াজিব হবে। আর ক্রেতার উপরোক্ত কথার পর বিক্রেতা যদি বলে আমি বিশ দিরহামের কমে দিব না; তা শুনেও সে যদি কাপড় নিয়ে যায় এবং তা তার হাত থেকে খোয়া যায় তাহলে তাকে বিশ দিরহামই পরিশোধ করতে হবে (খুলাসা)।

৩. মাসআলা : ফুরুকুল কারাবীসী এহু উল্লেখ আছে; বিক্রেতা বলল, এই কাপড়টি তোমার জন্য দশ দিরহাম। আর ক্রেতা বলল, কাপড়টি দাও; আমি তা দেখে নেই অথবা কাউকে দেখিয়ে নেই। তারপর যদি ঐ কাপড় খোয়া যায় তবে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে ক্রেতার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ “এই কাপড় আমানত হিসাবে খোয়া গেল” বলে ধর্তব্য হবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি বলে, কাপড়টি দাও; যদি পসন্দ হয় তবে তা আমি নিয়ে নিব। তারপর যদি কাপড়টি খোয়া গেলে ঐ মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে- যা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে মিলে সাব্যস্ত করেছে। উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রথম সুরতে ক্রেতা কাপড়টি হস্তান্তর করতে এজন্য বলেছিল নিজে দেখবে বা অন্য কাউকে দেখাবে। সুতরাং এটি কোন ক্রয়-বিক্রয় নয়। আর দ্বিতীয় সুরতে সে তাকে কাপড়টি হস্তান্তর করতে বলার উদ্দেশ্য ছিল, তা পসন্দ করে নিয়ে নেওয়া। প্রকৃতপক্ষে ক্রেতার আদেশ ছাড়া হলেও এটি বেচাকেনা রূপে গণ্য। সুতরাং আদেশ সম্বলিত হওয়া

অবস্থায় তা তো অবশ্যই বেচাকেনা রূপে গণ্য হবে (আন্ নাহরুল ফায়িক)। ক্রেতা যদি কাপড়টি দেখার উদ্দেশ্যে না নিয়ে এমনিই নেয় কিন্তু পরে বলে যে, আমি এটি দেখব; আর এ অবস্থায় তা তার হাত থেকে খোয়া যায় তাহলে প্রথমোক্ত অবস্থার ভিত্তিতে তার উপর যে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়েছিল শেষোক্ত বক্তব্য তাকে এর থেকে অব্যাহতি দিতে পারবে না (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)।

৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন কাপড় বিক্রেতার নিকট কাপড় চাইল। তারপর কাপড় বিক্রেতা তাকে তিনটি কাপড় দিয়ে বলল, প্রথমটির মূল্য দশ দিরহাম, দ্বিতীয়টির মূল্য বিশ দিরহাম এবং তৃতীয়টির মূল্য ত্রিশ দিরহাম। অতএব তুমি এই কাপড়গুলো বাড়িতে নিয়ে যাও। যেটি তোমার পসন্দ হবে সেটিই তোমার নিকট আমি বিক্রি করলাম। পরে ক্রেতার বাড়িতে আগুন লেগে সব পুড়ে গেল। কিন্তু এগুলো আগে পরে জ্বলছে কিনা, তা জানা নেই; অথবা এটা তো জানা আছে; কিন্তু প্রথমে কোনটি জ্বলছে; এরপর কোনটি জ্বলছে; এরপর কোনটি জ্বলছে তা জানা নেই, তাহলে ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে প্রত্যেক কাপড়ের ১/৩ মূল্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পরিশোধ করা। আর যদি প্রথমে কোনটি জ্বলছে তা জানা যায় তাহলে এই কাপড়ের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে। আর বাকী দুটি কাপড় তার আমানতস্বরূপ ছিল যা জ্বলে ভস্ম হয়ে গেছে। যদি দুটি কাপড় পুড়ে থাকে এবং তৃতীয়টি অক্ষত অবস্থায় থাকে, আর এ কথা জানা না থাকে যে, প্রথমে কোনটি ভস্ম হয়েছে তাহলে জ্বলে যাওয়া কাপড় দুটির প্রত্যেকটির অর্ধ মূল্য পরিশোধ করা তার উপর ওয়াজিব হবে এবং তৃতীয়টি এর মালিকের নিকট ফেরত দিয়ে দিবে। কেননা এটি তার নিকট আমানত হিসাবে আছে। যদি একটি কাপড় পুড়ে যায় এবং দুটি বাকী থাকে তাহলে জ্বলে যাওয়া কাপড়টির মূল্য পরিশোধ করা এবং বাকী দুটি ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি দুটি কাপড় সম্পূর্ণ এবং তৃতীয় কাপড়টি আংশিক পুড়ে যায়, আর এ কথাও জানা নেই যে, প্রথমে কোনটি জ্বলছে তাহলে ঐ দুইটি কাপড়ের প্রত্যেকটির অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং তৃতীয় কাপড়টির যে অংশ জ্বলেনি তা ফেরত দিতে হবে (সুগরা)। যদি দুইটি কাপড়ের একটি সম্পূর্ণ জ্বলে যায় এবং অন্যটির অর্ধেকাংশ এর সাথে সাথেই জ্বলে যায় তবে যে অর্ধাংশ বাকী আছে তা ফেরত দিবে এবং জ্বলে যাওয়া কাপড়টির ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দিবে। এ অবস্থায় ক্রেতার জন্য জায়েয হবে না জ্বলে যাওয়া কাপড়টিকে আমানত সাব্যস্ত করে দ্বিতীয় কাপড়টির অবশিষ্টাংশকে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে নিজের মালিকানায রেখে দেওয়া। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে ঐ কাপড়াংশের ক্ষেত্রেও যার কোন মূল্য নেই (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)।

৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি কাউকে কাপড় বিক্রেতার দোকানে বলে পাঠাল যে, বার্তাবাহকের মাধ্যমে আমার জন্য এ জাতীয় কাপড় পাঠিয়ে দাও। তারপর কাপড় বিক্রেতা বার্তাবাহকের মাধ্যমে অথবা অন্য কারো মাধ্যমে কাপড় পাঠিয়ে দিল। কিন্তু ঐ কাপড় তার কাছে পৌঁছার আগেই হারিয়ে গেল বা নষ্ট হয়ে গেল। আর দোকানদার তার কথা সত্য বলে মেনে নিল। তাহলে বার্তাবাহকের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। স্মর্তব্য যে, যদি উক্ত

বার্তাবাহক আদেশদাতা ব্যক্তির বার্তাবাহক হয় তাহলে আদেশদাতা ব্যক্তির উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর সে যদি কাপড়ের মালিকের পক্ষ হতে নিয়োজিত ব্যক্তি হয় তবে এই কাপড় আদেশদাতা ব্যক্তির নিকট না পৌঁছা পর্যন্ত তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু তার কাছে যাওয়ার পর তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে (খুলাসা)।

৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন ইলানকারী (مُتَدَي) ব্যক্তিকে কিছু মালামাল প্রদান করল যাতে সে এ মাল বিক্রির ব্যাপারে বাজারে ঘোষণা করে দেয়। তারপর অপর কোন ব্যক্তি এসে নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহামের বিনিময়ে, এ মাল নিতে চাইলে সে (ঐ ইলানকারী ব্যক্তি) এই মাল তার কাছে রেখে দিল। কিছুক্ষণ পর ক্রেতা ব্যক্তি বলল, এই মাল আমার নিকট হতে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা বলল যে, তা আমার নিকট হতে কোথাও পড়ে গেছে। এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে এই মালের মূল্য (قِيَمَت) পরিশোধ করা। কিন্তু ইলানকারী ব্যক্তির উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মালের মালিক ইলানকারী ব্যক্তিকে এইরূপ অনুমতি দেয় যে, বেচাকেনা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কেউ যদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তোমার নিকট হতে মাল নিয়ে তা দেখতে ও পসন্দ করতে চায় তবে তাকে মাল দিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে যদি মালের মালিকের পক্ষ থেকে এরূপ অনুমতি প্রদান না করা হয় সে ক্ষেত্রে ইলানকারী ব্যক্তির উপর এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে (যহীরিয়া)।

৭. মাসআলা : কোন কিছু খরিদ করার জন্য নিযুক্ত উকীল যদি কাপড় বিক্রেতা ব্যক্তির নিকট হতে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন কাপড় এনে তা তার মুআক্কিলকে দেখায়। তারপর কাপড়টি মুআক্কিলের পসন্দ না হওয়ায় সে তা উকীলকে ফেরত দিয়ে দেয়। এহেন অবস্থায় যদি এই কাপড় উকীলের হাতে খোয়া যায় তাহলে শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র) বলেন, উকীলের উপর এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। তবে দেয় ক্ষতিপূরণ সে আর মুআক্কিলের নিকট হতে রুজু করতে পারবে না। কিন্তু মুআক্কিল যদি উকীলকে কোন মাল ক্রয় করার জন্য অগ্রহণ করার হুকুম দিয়ে থাকে তবে এই অবস্থায় উকীল ক্ষতিপূরণ আদায় করবে কিন্তু এই আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ সে মুআক্কিলের নিকট হতে উসুল করে নিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তাজনীসে নাসিরী নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদি কোন কাপড় দালালের নিকট হতে খোয়া যায় তবে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি দোকানদারের নিকট থেকে খোয়া যায় এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে মিলে দরাদরি করে যদি এর মূল্য সাব্যস্ত করে থাকে তবে দোকানদারের উপর এই কাপড়ের মূল্যের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে (তাতার খানিয়া)।

৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি কামান (ধনুক) ক্রয় করতে চাইল এবং এর দাম দস্তরও ঠিক করা হল। তারপর বিক্রেতার অনুমতিক্রমে ক্রেতা ধনুকের তার খুব শক্তভাবে টেনে ধরল অথবা বিক্রেতা তাকে বলেছিল যে, ধনুকের তার শক্তভাবে টেনে ধরার কারণে ধনুক যদি ভেঙ্গে যায় তবে তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। বিক্রেতার এ কথার ভিত্তিতে ক্রেতা ধনুকের তার খুব শক্তভাবে টেনে ধরলে ধনুকটি ভেঙ্গে গেল। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ধনুকের মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া। যদি

ধনুকের মূল্য সাব্যস্ত না হয়ে থাকে তবে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে হলেও ক্রেতার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। ইমাম (র) থেকে বর্ণিত আছে, যদি বিক্রেতা-ক্রেতাকে দিরহাম প্রদর্শনের পর সে তা খুব জোরে চেপে ধরে এতে দিরহামগুলো সব ভেঙ্গে যায় অথবা বিক্রেতা ক্রেতাকে ধনুক দেখায় তারপর সে তা খুব শক্তভাবে টেনে ধরে এতে ধনুকটি যদি ভেঙ্গে যায় অথবা বিক্রেতা ক্রেতাকে কাপড় দেখানোর পর সে তা পরিধান করায় কাপড়টি ফেটে যায় তাহলে ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে এসবের ক্ষতিপূরণ আদায় করা। যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে দিরহাম চেপে ধরা ; ধনুকের তার শক্তভাবে টেনে ধরা এবং কাপড় পরিধান করার জন্য কোন প্রকার আদেশ না দিয়ে থাকে। কোন কোন ফকীহ বলেন, যদি ঐ দিরহাম সজোরে চেপে ধরা ব্যতীত পরীক্ষা করা না যায় এবং ক্রেতা যদি তা চেপে ধরতে গিয়ে সীমাতিক্রম না করে তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। উল্লেখ্য যে, সীমাতিক্রম না করার ব্যাপারে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (ওয়াজীয : আল কুরদুরী)।

৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন কাঁচ বিক্রেতার নিকট এসে বলল, এই কাঁচটি আমাকে দাও। বিক্রেতা তাকে তা দেখাল। তখন কাঁচ বিক্রেতা ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি এটি উঠিয়ে দেখ। তারপর সে তা উঠিয়ে দেখল, এতে কাঁচটি ভেঙ্গে গেল। এতে উত্তোলনকারী ক্রেতার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা সে তো মালিকের অনুমতিক্রমেই তা উত্তোলন করেছে। কেউ যদি খরিদ করার উদ্দেশ্যে কাঁচ হাতে নেয় এবং তখনো পর্যন্ত তারা মূল্য সাব্যস্ত করেনি, এ অবস্থায় যদি ঐ কাঁচ ভেঙ্গে যায় তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েতের বর্ণনা অনুসারে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কাঁচ নিজের হাতে নিয়ে ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বলে, এর দাম কত? বিক্রেতা বলে এর দাম এত। তারপর ক্রেতা বলে, তাহলে আমি তা নিয়ে নিলাম এবং বিক্রেতা বলে, ঠিক আছে। এই কথা বার্তার পর ক্রেতা নিজ হাতে কাঁচ তুলে নেওয়ার পর সেগুলো যদি তার হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে যায় তবে তার উপর ওয়াজিব হবে, এর মূল্য (قِيَمَت) ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিশোধ করা। উক্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ক্রেতা-বিক্রেতার অনুমতিক্রমে কাঁচ নিজের হাতে তুলে নেয়। পক্ষান্তরে সে যদি বিক্রেতার অনুমতি ছাড়াই নিজের হাতে কাঁচ তুলে নেয় তবে ভেঙ্গে যাওয়ার অবস্থায় তাকেই এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। চাই মূল্য (ثَن) ধার্য করা হোক বা না হোক (যহীরিয়া)।

১০. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে একটি পেয়ালার দাম দস্তর করছে। ইত্যবসরে ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলল, তোমার পেয়লাটি আমাকে একটু দেখাও। তারপর পেয়ালার মালিক তার হাতে পেয়লাটি দিল। সে তা দেখল হঠাৎ করে ঐ পেয়লাটি তার হাত থেকে পড়ে গেল এবং আরো অনেকগুলো পেয়ালার উপর গিয়ে পতিত হল। এতে ঐ পেয়লাটি আরো অন্যান্য পেয়লাসহ এক সাথে ভেঙ্গে গেল। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এই ক্ষেত্রে ক্রেতার উপর বিক্রিতব্য পেয়ালার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা তার নিকট আমানত স্বরূপ ছিল। কিন্তু বাকী পেয়লাগুলোর ক্ষতিপূরণ তার উপর ওয়াজিব হবে।

কেননা সে বিক্রেতার অনুমতি ছাড়াই এগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কোন একটি বস্তু খরিদ করেছে। কিন্তু বিক্রেতা ভুলবশত তাকে সেটি না দিয়ে অন্য কোন বস্তু সরবরাহ করেছে এবং তা খোয়া গেছে বা ভেঙ্গে গেছে, তাহলে ক্রেতা এর মূল্যের ব্যাপারে যামিন হবে। অর্থাৎ তাকে এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে। কেননা সে ক্রয় করার জন্যই তা কবজা করেছিল। কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, তুমি ঐ বস্তুটি কবজা করে নাও। তারপর গোলাম যদি ভুলবশত অন্য বস্তু কবজা করে নেয় এবং তা তার হাতে নষ্ট হয়ে যায় তবে তার উপর এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না (তাতার খানিয়া)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিক্রয় পণ্য এবং বিক্রয় মূল্যের সংজ্ঞা ও পরিচিতি এবং কবজার পূর্বে এগুলো ব্যবহার করার বিধান।

১. মাসআলা : ইমাম কুদুরী (র) তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, বিক্রয় চুক্তিতে যে জিনিসটির নির্দিষ্টতা গুণ রয়েছে সেটাই হল **مبيع** (বা বিক্রয় দ্রব্য) এবং যে জিনিসটির নির্দিষ্টতা গুণ নেই সেটাই হল **ثمن** বা বিক্রয় মূল্য। তবে যদি তার উপর **بيع** (বিক্রয়) শব্দটি প্রযুক্ত হয় তাহলে সেটা **بيع** হতে পারে (যখীরা)। উল্লেখ্য যে, দ্রব্য তিন প্রকার (১) যা সর্বদা মূল্য (**ثمن**) রূপেই গণ্য হয়ে থাকে। (২) যা সর্বদা বিক্রয় দ্রব্য (**مبيع**) রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। (৩) যা কখনো **مبيع** কখনো **ثمن** রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। স্থায়ী মূল্য দ্রব্য হল দিরহাম, দীনার, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ইত্যাদি। চাই এর বিপরীতে অনুরূপ কোন দ্রব্য হোক বা অন্য কোন দ্রব্য হোক। চাই চুক্তির বক্তব্যে ঐ এর পূর্বে **ب** অব্যয় যুক্ত হোক বা না হোক পরসাত **ثمن** (মূল্য) এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলোও দিরহাম দীনারের ন্যায় নির্দিষ্ট করা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট হয় না। স্থায়ী **ثمن** (বিক্রয় পণ্য) হল, এমন দ্রব্য যা **الامثال** (সাদৃশ্য গুণ সম্পন্ন) নয় এমন অতিশয় তারতম্য পূর্ণ **عددي** (গণনা যোগ্য) নয়। কিন্তু যদি কাপড়ের গুণ বর্ণিত হয় এবং তা হস্তান্তরের মেয়াদ উল্লেখিত হয় তাহলে তা **ثمن** (মূল্য) হবে। সুতরাং কেউ যদি নির্দিষ্ট মানের কাপড়ের বিনিময়ে কোন গোলাম খরিদ করে, কিন্তু তা হস্তান্তর করার কোন মেয়াদ উল্লেখ না করে তাহলে বিক্রয় জায়েয হবে না। মেয়াদ উল্লেখ করলে জায়েয হবে। এক্ষেত্রে যদি গোলাম কবজা করার আগে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই আলাদা হয়ে যায় তাহলেও ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। যে সব বস্তু **الامثال** নয় এগুলোর পরস্পরের বিনিময় নগদ হলে জায়েয হবে। বাকীতে জায়েয হবে না (আয়নী শরহে হিদায়া)। আর যে মাল কখনো **مبيع** এবং কখনো **ثمن** হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে তা হচ্ছে পরিমাণ যোগ্যবস্তু (**مكيلات**) ওজনযোগ্য বস্তু (**موزونات**) এবং স্পষ্ট তারতম্যপূর্ণ বা গণনাযোগ্য বস্তু (**عددي**) যদি মূল্যের (**ثمن**) বিনিময়ে এগুলোর লেনদেন হয় তবে এগুলো **مبيع** বলে গণ্য হবে। যদি পরিমাণযোগ্য, ওজনযোগ্য বা স্পষ্ট তারতম্যপূর্ণ গণনাযোগ্য বস্তুকে পরস্পর বিনিময় করা হয় তাহলে দেখতে হবে যদি মূল্য ও বিক্রিত পণ্য উভয়টিই **عين** হয় তবে এ

বিনিময় জায়েয হবে। যদি বিনিময়কৃত বস্তুর একটি **عين** এবং অপরটি গুণ বর্ণিত **دين** হয়, এ অবস্থায় **عين** বস্তুকে **مبيع** এবং **دين** বস্তুকে **ثمن** সাব্যস্ত করা হলে এ অবস্থায়ও ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। তবে শর্ত হল, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই **دين** বস্তুটিকে দখলে নিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি **دين** বস্তুটিকে **مبيع** এবং **عين** বস্তুটিকে **ثمن** সাব্যস্ত করা হয় তবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে বস্তুটিকে দখলে নিলেও বিক্রয় জায়েয হবে না। কেননা এ বেচাকেনাকে জায়েয বলা হলে, বিক্রেতার নিকট যে মাল মজুদ নেই সে মাল বিক্রয় করা হয়। অথচ সলম ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে অবিদ্যমান মাল বিক্রি করা জায়েয নেই। (আরবী ব্যাকরণে) **بائع** ও **مشتري** বুঝার বাহ্যিক আলামত এই যে শুরুতে **بائع** অব্যয় সংযুক্ত হয়। আর **مشتري**-এর শুরুতে তা সংযুক্ত হয় না। যদি বিনিময়যোগ্য উভয় দিকের পণ্য **دين** হয় তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা **مبيع** ও **ثمن** এর পরিচয় তো জানা হলো এবার **مبيع**-এর হুকুম এই যে, বিক্রিতব্য মাল যদি অস্থাবর বস্তু হয় তবে হস্তগত করার পূর্বে তা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে না। **اجرة**-এর হুকুমও **مبيع**-এর হুকুমের অনুরূপ। অর্থাৎ যদি তা সুনির্ধারিত হয় এবং নগদ গ্রহণ করা শর্ত হয়। তাহলে এর ক্রয়-বিক্রয়ও হস্তগত করার আগে জায়েয নেই। এমনভাবে ঋণের পরিবর্তে সমঝোতা করে যে মাল পাওয়া গেছে তা **عين** হলো তাও হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয নেই। পক্ষান্তরে মহর, খুলাও ইচ্ছাকৃত হত্যার বিনিময়ে প্রদত্ত মাল যদি **عين** জাতীয় বস্তু হয় তবে হস্তগত করার আগেও তা বিক্রি করা জায়েয হবে। উল্লেখ্য যে বস্তু হস্তগত করার আগে বিক্রি করা জায়েয নেই, হস্তগত করার আগে তা ইজারা দেওয়াও জায়েয নেই (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : ক্রীত বস্তু হস্তগত করার পূর্বে বিক্রেতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে হিবা করা, সাদাকা দেওয়া বা ঋণ দেওয়া কিংবা অন্য কারো নিকট বন্ধক রাখা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয আছে। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (মুহীত : আস-সারাখসী)। হস্তগত করার আগে খরিদকৃত দাসীকে বিয়ে দেওয়া জায়েয আছে (ওয়াজীয আল-কুরদুরী)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি অস্থাবর সম্পদ হস্তগত করার আগে তা নিয়ে খরিদদার তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাথে এ মুআমালা করে। পক্ষান্তরে যদি তা বিক্রেতার সাথে হয়, যেমন হস্তগত করার আগেই এ মাল সে বিক্রেতার নিকট বিক্রি করে দিল তাহলে তা আদৌ জায়েয হবে না (মুহীত)। ক্রেতা যদি খরিদকৃত মাল বিক্রেতাকে হিবা করে তবে তা সহীহ হবে না। ক্রেতা যদি বিক্রেতার নিকট এ মাল বন্ধক রাখে এবং সে তা গ্রহণ করে তাহলে পূর্বোক্ত ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি এই হিবা কবুল না করে তবে হিবা বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বহাল থাকবে (তাতার খানিয়া : শরহত তাহাবীর সূত্রে) ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মালামাল কবজা করা ছাড়াও যে **تصرف** (হস্তক্ষেপ) জায়েয, এ জাতীয় **تصرف** যদি কোন ক্রেতা মালামাল কবজা করার আগে করে তবে তা জায়েয হবে না। আর কবজা ব্যতীত যে

تصرف জায়েয নয়, যেমন হিবা ইত্যাদি, এ জাতীয় تصرف ক্রেতা যদি মালামাল কবজা করার আগে করে তবে তা জায়েয হবে' (যহীরিয়া)।

৪. মাসআলা : ইমাম কারখী (র) তৎপ্রণীত মুখতাসার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যদি ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট হতে ক্রয়কৃত বস্তু কবজা করার পূর্বে বলে যে, তুমি ইহা তোমার নিজের জন্য বিক্রি করে দাও। তারপর বিক্রেতা তা কবুল করে নেয় তবে তাদের পূর্বের ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে। আর ক্রেতা যদি এরূপ বলে যে, এটি আমার জন্য বিক্রি করে দাও তাহলে এতে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হবে না। তা সত্ত্বেও সে যদি ঐ মাল বিক্রি করে দেয় তবে এ বিক্রয় জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি তোমার জন্য বা আমার জন্য না বলে শুধুমাত্র بعه (এটি বিক্রি করে দাও) বলে এবং বিক্রেতা প্রস্তাব কবুল করে নেয় তবে এতে পূর্বের ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে। এটি ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এতে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। ক্রেতা যদি বলে, যার নিকট ইচ্ছা তুমি একে বিক্রি করে দাও; তবে তা সহীহ হবে না (তাতার খানিয়া : খুলাসার সূত্রে)।

৫. মাসআলা : যদি গোলামকে দখলে নেয়ার আগে বিক্রেতাকে বলে, তুমি তাকে আযাদ করে দাও। তারপর বিক্রেতা তাকে আযাদ করে দেয় তাহলে এ আযাদ করা জায়েয হবে এবং তা বিক্রেতার পক্ষ থেকে হবে। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় পূর্বের বেচা-কেনা ভঙ্গ হয়ে যাবে আর এ আযাদ করা ক্রেতার পক্ষ হতে গণ্য হবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, উক্ত আযাদকরণ বাতিল বলে গণ্য হবে (আল-মুহীত)। এক ব্যক্তি একটি দাসী খরিদ করল, কিন্তু তাকে কবজা করল না। এহেন অবস্থায় ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বলে তাকে বিক্রি করে দাও বা তার সাথে সঙ্গম কর অথবা খরিদকৃত বস্তুটি খাদ্য জাতীয় জিনিস ছিল, তাই ক্রেতা বলল, এগুলো খেয়ে ফেল। তারপর বিক্রেতা তাই করল। এতে পূর্বোক্ত ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর বিক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত তা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা : মীরাস বা ওসীয়তের ভিত্তিতে স্থানান্তরযোগ্য মালের মালিক হলে কবজা করার আগে তা বিক্রি করা জায়েয আছে (আল-মুহীত)। খরিদা বাড়ি বা জমি দখলে নেয়ার আগে বিক্রেতা ছাড়া অন্য কাউকে হিবা করে দিলে সমস্ত ইমামের মতে এই হিবা জায়েয হবে। আর যদি বিক্রি করে তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয হবে না। খরিদকৃত মাল কবজা করার পূর্বে ক্রেতা যদি তা বিক্রেতা বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট ইজারা দেয় তাহলে কোন ইমামের মতেই তা জায়েয হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি ফসলসহ জমি খরিদ করে এবং ফসল তখনও কাঁচা থাকে আর জমি কবজা করার আগেই ক্রেতা যদি তা বিক্রেতাকে

১. এর অর্থ হল, মাল হস্তগত না করে হিবা করা জায়েয নয়। এতদসত্ত্বেও ক্রেতা যদি এ অবস্থায় কোন মাল হিবা করে তবে হিবার বৈধতা যেহেতু কবজা নির্ভর তাই কবজা পরিগণিত হবে এরপর হিবা হবে। এ কারণেই এ জাতীয় تصرف জায়েয হবে।

আধাআধি ফসল প্রদানের শর্তে বর্ণা হিসাবে দিয়ে দেয় তবে তা জায়েয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি কোন বাড়ী খরিদ করে কবজা করা ও এর মূল্য প্রদানের আগেই তা ওয়াক্ফ করে দেয় তবে এই ওয়াক্ফের হুকুম মওকুফ থাকবে। তারপর যদি সে এর মূল্য আদায় করতঃ তা কবজা করে নেয় তবে ঐ ওয়াক্ফ জায়েয হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : কবজার পূর্বে ثمن (মূল্য) ও دين অদল-বদল করা আমাদের মাযহাব অনুসারে জায়েয হবে। তবে বায়য়ে সরফ এবং বায়য়ে সলমের হুকুম এর থেকে ব্যতিক্রম (যখীরা)। ইমাম তাহাবী (র) বলেছেন যে, কবজার আগে কর্জের মধ্যে কোনরূপ تصرف করা অর্থাৎ তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। ইমাম কুদুরী (র) বলেন, এটা ভুল মত। সহীহ মতে কবজার আগে কর্জের মধ্যে تصرف করা জায়েয আছে (মুহীত)। সিয়ারে কবীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে, শত্রুপক্ষ কোন মুসলমানের গোলামকে কয়েদ করতঃ তাদের ভূখণ্ডে নিয়ে সংরক্ষিত করে ফেলে এবং কোন মুসলমান ঐ দেশে গমন করতঃ উক্ত গোলামকে ঐ ব্যক্তির নিকট হতে খরিদ করে নেয় এবং তাকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে। তারপর গোলামের প্রথম মালিক এসে উপস্থিত হয় এবং বিচারক যদি মূল্যের বিনিময়ে তার অনুকূলে রায় প্রদান করেন। এরপর শত্রুপক্ষ থেকে খরিদকারী ব্যক্তির হাত থেকে গোলামকে কবজা করার আগেই মুনীব যদি তাকে বিক্রি করে দেয়, তাহলে হুকুম এই যে, যার কবজায় গোলাম আছে তার নিকটই বিক্রি করলে জায়েয হবে। অন্য কারো কাছে বিক্রি করলে জায়েয হবে না। এ মাসআলাটি নিম্নোক্ত মাসআলার অনুরূপ যেমন দোষ এর ভিত্তিতে বিচার ক্রেতার অনুকূলে। ক্রীত গোলাম ক্রেতাকে বললেন, ফেরত দেয়ার রায় দিলেন, আর বিক্রেতা গোলামকে কবজা করার আগেই বিক্রি করল তবে পূর্বের ক্রেতার নিকট বিক্রি করলে তা জায়েয হবে। অন্যের কাছে বিক্রি করলে জায়েয হবে না (যখীরা)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইজাব ও কবুলের মধ্যে মতভেদ হওয়ার বিবরণ।

১. মাসআলা : বিক্রেতা যদি দুটি অথবা তিনটি বস্তু বিক্রয়ের প্রস্তাব করে এবং ক্রেতা একটি বাদ দিয়ে অন্যটি গ্রহণ করতে চায় এক্ষেত্রে চুক্তি অভিন্ন হলে ক্রেতা তা করতে পারে না। কিন্তু চুক্তি বা প্রচার ভিন্ন ভিন্ন হলে ক্রেতা তা করতে পারবে। (মুহীত)। এমনিভাবে ক্রেতা কোন বস্তুর ব্যাপারে ইজাব করার পর বিক্রেতা যদি উক্ত মালের কিয়দংশের ব্যাপারে ইজাব কবুল করার ইচ্ছা করে এবং বাকী অংশের ব্যাপারে ইচ্ছা না করে তবে **صفقة** এক হলে তার এরূপ করার ইখতিয়ার থাকবে না। আর **صفقة** যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে সে এরূপ ইচ্ছা করতে পারবে (কাফী)। এমনিভাবে যদি বিক্রেতা বলে, আমি তোমার নিকট এই গোলাম বিক্রি করলাম, তারপর ক্রেতা যদি এর অর্ধেকের ব্যাপারে তার প্রস্তাব কবুল করে নেয় তবে তা সহীহ হবে না। কিন্তু যদি বিক্রেতা ঐ মজলিসেই এর উপর রাযী হয়ে যায় তবে তা সহীহ হবে। (মুহীত : আস-সারাখসী)। ইমাম কুদুরী (র) বলেন, এ আক্দ্ তখনই সহীহ হবে যদি ঐ অংশ বিশেষ যা ক্রেতা কবুল করেছে এর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য থাকে। পক্ষান্তরে **ثمن** যদি **قيمت** (বাজার মূল্য) হিসাবে বিভক্ত হয় যেমন বিক্রেতা দুই গোলাম বা দুই কাপড়ের দিকে আক্দ্কে **اضافت** (সম্বোধন) করল, এহেন অবস্থায় ক্রেতা যদি কোন একটির প্রস্তাবকে কবুল করে তবে আক্দ্ সহীহ হবে না। যদিও বিক্রেতা তাতে রাযী হয়ে যায় (যখীরা)।

২. মাসআলা : এ পর্যায়ে **صفقة** বা চুক্তির ভিন্নতা ও অভিন্নতার বিষয়টি জানা দরকার। যদি সব ক'টি পণ্যের মূল্য একত্রে বলা হয় এবং বিক্রেতাও একজন, আর ক্রেতাও একজন হয় তাহলে ক্রিয়াস ও ইসতিহসান উভয় দিক থেকে একে এক **صفقة** ধরা হবে। এমনিভাবে যদি বিক্রিতব্য বস্তুর প্রত্যেক অংশের মূল্য পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয় আর বাকী সব এক হয়, যেমন বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, আমি তোমার নিকট এই দশটি কাপড় বিক্রি করলাম, এর প্রত্যেকটির দাম দশ দিরহাম করে তবে এই অবস্থায়ও **صفقة** এক বলে ধর্তব্য হবে। এমনিভাবে যদি বিক্রেতা বা ক্রেতা দুইজন করে হয় এবং মূল্য (**ثمن**) এক সাথে উল্লেখ করা হয়, যেমন এক বিক্রেতা দুই ব্যক্তিকে বলল, আমি এই বস্তু তোমাদের দুইজনের নিকট এই মূল্যে বিক্রি করলাম, তারপর উভয় ক্রেতা বলল, আমরা তোমার নিকট হতে এই বস্তু এত মূল্যে ক্রয় করলাম তবে এটিও এক **صفقة** হিসাবেই পরিগণিত হবে (মুহীত)। এগুলো হচ্ছে বা চুক্তির অভিন্নতার সুরত। পক্ষান্তরে বিক্রিতব্য বস্তুর প্রতিটি অংশের মূল্য ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয় এবং ক্রয় বা বিক্রয়ের কথা পুনঃপুনঃ বর্ণনা করা হয় আর ক্রেতা ও বিক্রেতা একজন করে হয় অথবা বিক্রেতা দুইজন এবং ক্রেতা একজন বা ক্রেতা দুইজন এবং বিক্রেতা

একজন হয় তবে **صفقة** পৃথক বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি **ثمن** পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয় এবং ক্রয় বা বিক্রয়ের কথা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হয় আর ক্রেতা ও বিক্রেতা একজন করে হয় যেমন বিক্রেতা কোন এক ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমার নিকট এই কাপড়গুলো বিক্রি করলাম। আমি এটি তোমার নিকট বিক্রি করলাম দশ দিরহামের বিনিময়ে, আমি এটি তোমার নিকট বিক্রি করলাম পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে অথবা ক্রেতা বলল, আমি তোমার নিকট হতে এই কাপড়গুলো খরিদ করলাম। আমি এই কাপড়টি খরিদ করলাম দশ দিরহামের বিনিময়ে, এই কাপড়টি খরিদ করলাম পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে তবে ইমামগণের সকলের রায় অনুসারে এখানে **صفقة** ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে (নিহায়া : শরহে হিদায়া)।

৩. মাসআলা : যদি আক্দ্ এক হয় এবং আক্দ্কারী ও মূল্য ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে ক্রিয়াস অনুযায়ী **صفقة** ভিন্ন ভিন্ন হবে। আর ইসতিহসান অনুযায়ী **صفقة** ভিন্ন ভিন্ন হবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর একটি অভিমতও বটে। এর উপরই ফাতওয়া (ওয়াজীয)। কেউ যদি ভিন্ন ধরনের দুটি বা কয়েকটি বস্তু খরিদ করে অথবা একটি বস্তু খরিদ করে এবং ক্রয়কৃত বস্তুর আংশিক মূল্য পরিশোধ করে, এহেন অবস্থায় সে যদি খরিদকৃত বস্তুর অংশ বিশেষ কবজা করার ইচ্ছা করে তবে **صفقة** এক হলে সে এরূপ করতে পারবে না। আর **صفقة** যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে সে এরূপ করতে পারবে। জনৈক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে ইয়াহুদীদের তৈরি করা দশটি কাপড় খরিদ করল। প্রতিটি কাপড়ের দাম দশ দিরহাম। তারপর ক্রেতা বিক্রেতাকে নগদ দশ দিরহাম প্রদান করে বলল, এটি অমুক কাপড়ের মূল্য। এক্ষেত্রে সে ঐ কাপড়টি দখলে নিতে পারবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে **صفقة** এক ও অভিন্ন। তদ্রূপ বিক্রেতা যদি একটি নির্দিষ্ট কাপড়ের মূল্য মাফ করে দেয় এবং ক্রেতা বলে, আমি শুধুমাত্র এই কাপড়টিই নিয়ে নিলাম, এটা সে পারবে না। তদ্রূপ বিক্রেতা যদি নির্দিষ্ট একটি কাপড়ের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে এক মাস সময় দেয় তবে ক্রেতা ঐ কাপড়ের দখল নিতে পারবে না। বিক্রেতা যদি এক দিরহাম ব্যতীত সমস্ত কাপড়ের মূল্য মাফ করে দেয় অথবা এক দিরহাম ব্যতীত সমস্ত মূল্য বিলম্বে আদায় করার সুযোগ দেয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হকুম প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট কাপড়ের মূল্য নগদ প্রদান করা ধার্য হয় এবং বাকী কাপড়ের মূল্য বিলম্বে আদায় করা ধার্য হয় তাহলে নগদ মূল্য টুকু আদায় না করে সে ঐ মালের কিছুই কবজা করতে পারবে না। কাপড়ের দাম একশ' টাকা। আর বিক্রেতার কাছে ক্রেতার পাওনা নব্বই টাকা এ ক্ষেত্রে নব্বই টাকা কর্তন হয়ে যাবে। বাকী দশ টাকা পরিশোধ না করে ক্রেতা ঐ কাপড়ের কিছুই কবজা করতে পারবে না। এমনিভাবে যদি কোন নির্দিষ্ট কাপড়ের মূল্য দশ দীনার হয় এবং বাকী কাপড়ের মূল্য একশ' দিরহাম হয়। এমতাবস্থায় যদি ক্রেতা শুধুমাত্র দীনার বা দিরহাম পরিশোধ করে তাহলে বাকী মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত সে ঐ কাপড়ের কিছুই কবজা করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি গোলাম এক হাজার দিরহাম মূল্যে খরিদ করল। তারপর একজন ক্রেতা গায়েব হয়ে গেল, এক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তি সম্পূর্ণমূল্য পরিশোধ না করে গোলামের দখল নিতে পারে না। সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করে -৫৩

গোলাম কবজা করতে পারে। এক্ষেত্রে সে অনুপস্থিত ক্রেতার পক্ষ হতে স্বেচ্ছায় দানকারী বলে গণ্য হবে না। কাজেই অনুপস্থিত ক্রেতা তার অংশের মূল্য আদায় না করে তার অংশ কবজা করতে পারবে না। বরং পরিশোধ করার পরই সে তা কবজা করতে পারবে (মুহীত)। গায়ের শরীকের উপস্থিত হওয়ার আগে অথবা উপস্থিত হয়ে গোলাম তলব করার আগেই যদি অপর শরীকের হাতে গোলামটি মারা যায় তবে তা আমানতের মাল ধরা হবে। কাজেই গোলামের উপর কবজাকারী শরীক দ্বিতীয় শরীক হতে গোলামের মূল্য বাবদ তার পাওনা উসূল করে নিবে। পক্ষান্তরে যদি সে হাযির হয়ে অংশ দাবী করে, আর কবজাকারী ব্যক্তি বলে, তোমার অংশের মূল্য না দেওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে গোলামের অংশ দিব না, এ অবস্থায় গোলাম মারা গেলে তার প্রদত্ত মূল্যের বিপরীতে নষ্ট হয়েছে বলে ধরা হবে। সুতরাং গায়ের ব্যক্তির উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। বস্তুত এই মাসআলাটি ঐ (বিক্রিত পণ্য)-এর অনুরূপ যা বিক্রেতার হাতে নষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ এই অবস্থায় যেমন ক্রেতার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হয় না, অনুরূপভাবে উক্ত অবস্থায় গায়ের ব্যক্তির উপরও কিছু ওয়াজিব হবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। যদি বিক্রেতা দুই ক্রেতার একজনের নিকট যা পাওনা আছে তা মফ করে দেয় অথবা তার পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে তাকে এক মাসের সুযোগ দেয় তবে উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় শরীকের মূল্য আদায় না করা পর্যন্ত গোলামের মধ্যে তার যে অংশ আছে তা কবজা করতে পারবে না (যখীরা)। যদি উপরোক্ত সুরতসমূহে **صنفه** ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে এর হকুম উপরোক্ত হকুম থেকে সম্পূর্ণরূপে উল্টা হবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মূল্যের জন্য বিক্রিত বস্তু আটকিয়ে রাখা এবং বিক্রেতার অনুমতিক্রমে ও তার অনুমতি ছাড়া বিক্রিত বস্তু কবজা করা ইত্যাদির বিবরণ।

[এ পরিচ্ছেদে ছয়টি অনুচ্ছেদে রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ : মূল্যের জন্য বিক্রিত বস্তু আটক রাখা

১. মাসআলা : আমাদের ইমামগণ বলেন যে, যদি বিক্রয় চুক্তিতে নগদ মূল্যের শর্ত হলে পূর্ণ মূল্য উসূল করা পর্যন্ত বিক্রিত মাল আটক রাখতে পারবে (মুহীত)। আর মূল্য যদি মেয়াদী হয় তবে ঐ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে বা পরে কখনো বিক্রেতা বিক্রিত দ্রব্য আটক রাখতে পারবেনা (মাবসুত)। যদি কিছু মূল্য নগদ এবং কিছু মূল্য মেয়াদান্তে আদায় করা ধার্য করা হয় তবে যে পরিমাণ নগদ আদায়ের জন্য ধার্য করা হয়েছে তা পরিশোধ না করা বিক্রেতা বিক্রিত বস্তু আটকিয়ে রাখতে পারবে। যদি ঐ মূল্যের মধ্যে সামান্য পরিমাণ বাকী থাকে তবে বিক্রেতা সমস্ত বস্তুই আটকিয়ে রাখতে পারবে (যখীরা)।

২. মাসআলা : তাফরীদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে; যদি বিক্রিত বস্তু অনুপস্থিত হলে, তা উপস্থিত না করা পর্যন্ত ক্রেতা মূল্য পরিশোধে বিরত থাকতে পারবে (তাতার খানিয়া)। চাই তা বিক্রয় চুক্তির শহরে থাকুক অথবা অন্য কোন শহরে, আর হাযির করার খরচা বিক্রেতার জিম্মায় বর্তাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। মূল্য বুঝে পেয়ে, অথবা মূল্য গ্রহণ না করেই বিক্রেতা যদি বিক্রিত পণ্য হস্তান্তর করে দেয় অথবা বিক্রেতার মৌখিক অনুমতি বা নীরব সম্মতিতে ক্রেতা খরিদা মাল কবজা করে নেয়, তাহলে এসকল ক্ষেত্রে বিক্রেতা বিক্রেতার থেকে ঐ মাল ফেরত নিতে পারবে না। মাল আটকিয়ে মূল্য উসূল করার জন্য। আর ক্রেতা যদি বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া ঐ মাল করযা করে থাকে তবে বিক্রেতা ক্রেতার কবজাকে বাতিল করে দিতে পারবে (খুলাসা)।

৩. মাসআলা : ক্রেতা যদি মূল্যের পরিবর্তে কোন বস্তু বন্ধক রাখে অথবা কেউ যদি মূল্যের জামিন হয় তবে বিক্রেতার বিক্রিত বস্তু আটক রাখার হক বাতিল হবে না (মুহীত)। যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে; বিক্রেতা যদি তার কোন পাওনাদারকে ক্রেতার হাওয়ানা করে অর্থাৎ ক্রেতার কাছ থেকে পাওনা আদায় করে নিতে বলে তাহলে বিক্রেতার বিক্রিত বস্তু আটক রাখার হক রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে মূল্য উসূল করার

ব্যাপারে কোন ব্যক্তির হাওয়ালা করে তবে এতে বিক্রেতার হক রহিত হবে না। ইমাম কারখী (র)-বলেন, এটি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে বিক্রিত বস্তু আটকিয়ে রাখার তার যে অধিকার রয়েছে উপরোক্ত কারণে তা রহিত হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। ফাতওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে; যদি বিক্রেতা বিক্রিত বস্তু ক্রেতাকে ধার দেয় অথবা তার নিকট আমানত রাখে তবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে ঐ মাল আটকিয়ে রাখার অধিকার তার রহিত হয়ে যাবে। কাজেই ঐ সে আর ফেরতও আনতে পারবে না (বাদায়ে)।

৪. মাসআলা : মূল্য বাকি ধার্য করা হয়েছে। এ অবস্থায় ক্রেতা যদি বিক্রিত মাল কবজা না করে থাকে, এমনকি মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় এসে যায় তবে ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে ঐ মাল কবজা করে নিতে পারবে। বিক্রেতা এ ব্যাপারে তাকে নিষেধ করতে পারবে না (যখীরা)। যদি বিক্রেতা মূল্য পরিশোধ করার জন্য এক বছর সময় ধার্য করে কিন্তু বছর কোন তারিখ হতে কোন তারিখ পর্যন্ত পূর্ণ হবে তা স্থির না করে, আর ক্রেতা যদি এক বছরের মধ্যে হাযির না হয়, এমনি করে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়- তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে যখন ক্রেতা বিক্রিত বস্তু কবজা করবে তখন হতে বছর শুরু হবে। আর যদি বছর নির্দিষ্ট করা হয় তবে বছর উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বছর চাই নির্দিষ্ট হোক বা না হোক উভয় অবস্থাতেই মূল্য ১৮ (সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরই) পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে (মুহীত)। উল্লেখ্য যে, এই মতভেদ ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে। যদি বিক্রেতা বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে। আর যদি অস্বীকার না করে তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে বছরের শুরু আকদের সময় হতে ধার্য হবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

৫. মাসআলা : যদি বিক্রিত বস্তুর মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের বা কোন একজনের খিয়ার থাকে এবং মেয়াদ مطلق থাকে অর্থাৎ মেয়াদের মধ্যে এই শর্ত না থাকে যে, তা কখন হতে শুরু হবে তাহলে মেয়াদের শুরু ধর্তব্য হবে ঐ সময় হতে যখন থেকে আকদ অপরিহার্য হয়েছে। আর খিয়ারে রূয়তের ক্ষেত্রে মেয়াদের বিষয়টি আকদের পর হতে ধর্তব্য হবে। যদি বিক্রেতা আকদের পর মূল্য পরিশোধের বিষয়টিকে বিলম্বিত করে দেয় অর্থাৎ বিলম্বে মূল্য নিতে রাখী হয়ে যায় তাহলে তার মাল আটকিয়ে রাখার হক বাতিল হয়ে যাবে (বাদায়ে)। কেউ যদি গোলাম খরিদ করে কবজা করার পূর্বেই তাকে আযাদ করে দেয় অথবা মুদাব্বার বানিয়ে দেয়, অথচ ক্রেতা হচ্ছে একজন গরীব ও অভাবী ব্যক্তি তবে বিক্রেতার জন্য ঐ গোলামকে আটকিয়ে রাখার অধিকার থাকবে না। এ অবস্থায় গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর এই গোলাম নিজের মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে বিক্রেতার অনুকূলে কোন কাজ করবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত (খুলাসা)। এটি যাহিরী রিওয়ায়াতও বটে (মাবসূত)।

৬. মাসআলা : যদি ক্রেতা কবজা করার পূর্বে গোলামকে মুকাতাব করে দেয় বা ইজারা দেয় কিংবা রাহন দেয় তবে বিক্রেতা ইচ্ছা করলে বিষয়টি বিচারকের আদালতে পেশ করতে পারবে; যাতে তিনি এসব হস্তক্ষেপ বাতিল করে দেন। বিচারক তখনও পর্যন্ত ঐ হস্তক্ষেপসমূহ বাতিল করেনি এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি তার মূল্য দিয়ে দেয় তবে কিতাবাত জায়েয হবে এবং রাহন ও ইজারা বাতিল হয়ে যাবে (খুলাসা)। যদি ক্রেতা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দেয় অথবা বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে মাফ করে দেয় তাহলে তার বিক্রিত পণ্য আটকিয়ে রাখার হক বাতিল হয়ে যাবে (বাদায়ে)।

৭. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি একটি দরজা খরিদ করে তা বিক্রেতার অনুমতি ছাড়াই কবজা করে নিল, তারপর তাতে পেরেক সংযোজন করল অথবা কাপড় খরিদ করে বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া এতে রং লাগাল অথবা জমি খরিদ করে বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া তাতে ইমারত নির্মাণ করল বা গাছ লাগাল তাহলে এ অবস্থায় বিক্রেতা তার থেকে এগুলো ফেরত নিয়ে আটকিয়ে রাখতে পারবে। যদি বিক্রেতা বলে, আমি পেরেক খুলে ফেলব এবং আঙ্গুর বৃক্ষ উপড়িয়ে ফেলব- যাতে জমি পূর্বের ন্যায় হয়ে যায় এবং এতে যদি কোন লোকসান না হয় তবে বিক্রেতা এরূপ করতে পারবে। আর যদি লোকসান হয় তবে এগুলো করতে পারবে না। যদি বিক্রিত বস্তু বিক্রেতার হাতে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতাতে জরিমানাস্বরূপ পেরেক এবং রঙের মূল্য দিতে হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা : যদি বিক্রিত বস্তু দাসী হয় এবং বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া ক্রেতা তাকে কবজা করতঃ তার সাথে সহবাস করে, এতে যদি দাসী হামেলা হয় এবং সন্তান প্রসব করে তবে বিক্রেতা তাকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না। আর সহবাসের পর সে যদি হামেলা না হয় এবং সন্তান প্রসব না করে তবে বিক্রেতার তাকে আটকিয়ে রাখার ইখতিয়ার থাকবে। যদি দাসী বিক্রেতার নিকট মারা যায় তবে দেখতে হবে দাসীর সাথে সহবাস করার পর বিক্রেতা তাকে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেছিল কিনা। যদি অস্বীকার করে থাকে তবে সে বিক্রেতার মাল থেকে হালাক হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। পক্ষান্তরে সে যদি এ ব্যাপারে অস্বীকৃতি ব্যক্ত না করে থাকে তবে ক্রেতার মাল থেকে হালাক হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে (আল-ওয়াকিআতুল হসামিয়া)। রওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন গোলাম তার মুনীবকে বলল, আমি নিজে আমাকে আপনার নিকট হতে এত টাকা মূল্যে খরিদ করলাম। এ কথা শুনে মুনীব বলল, আমি বিক্রি করলাম, তাহলে পূর্ণ মূল্য উসুল করার জন্য মুনীব তাকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না (খুলাসা)। এমনিভাবে যদি আজনবী (তৃতীয়) কোন ব্যক্তি গোলামকে এ মর্মে উকীল নিয়োগ করে যে, তুমি তোমাকে তোমার মালিকের নিকট হতে আমার পক্ষ থেকে উকীল হয়ে খরিদ করে নাও। তারপর গোলাম তার মুনীবকে এ সম্পর্কে অবগত করে এবং ঐ আজনবীর পক্ষ হতে নিজেকে মুনীবের নিকট থেকে খরিদ করে নেয় তাহলে এই অবস্থায় মূল্য উসুল করার জন্য বিক্রেতা তাকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না (আল-বাহরুর রায়িক)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করা এবং কোন বস্তু কবজা হওয়া ও না হওয়ার বিবরণ।

১. মাসআলা : বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতাকে বলা হবে, তুমি প্রথমে মূল্য পরিশোধ কর। যদি পণ্য দ্বারা পণ্যের বিনিময় হয় অথবা মূল্য দ্রব্য দ্বারা মূল্য দ্রব্যের বিনিময় হয় তাহলে চুক্তির উভয় পক্ষকে বলা হবে, তোমরা পণ্য ও মূল্য একসাথে হস্তান্তর কর (হিদায়া)। বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করার মানে হল, বিক্রিত বস্তু ও ক্রেতার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা এমনভাবে উঠিয়ে দেওয়া যাতে সে ঐ বস্তু বিনা বাধায় কবজা করতে পারে। মূল্য হস্তান্তরের বিষয়টি ঠিক তদ্রূপই (যখীরা)। আজনা স কিতাবে উল্লেখ আছে, উপরোক্ত বস্তুবোয় সাথে এই শর্তটিও যুক্ত হবে যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে এ কথা বলে দিবে যে, আমি তোমার ও বিক্রিত বস্তুর মধ্যকার সমস্ত বন্ধক অপসারিত করে দিলাম, সুতরাং তুমি তা কবজা করে নাও (আন নাহরুল ফায়িক)। বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে এটাও ধর্তব্য হবে যে, বিক্রিত বস্তুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও আলাদা থাকবে এবং অন্য কারো হক এর সাথে যুক্ত থাকবে না (ওয়াজীয : আল কুরদুরী)।

২. মাসআলা : ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, বিশুদ্ধ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণকেই কবজা হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ফ্রটি পূর্ণ (فاسد) বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তা কবজা হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা, এ সম্বন্ধে দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। সহীহ মতে তা কবজা হিসেবে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিক্রেতার ঘরেও تخلیه (বা বাঁধা অপসারণ) গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। এক ব্যক্তি তার ঘরে রক্ষিত এক মটকা সিরকা বিক্রি করল এবং তা ক্রেতার জন্য সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত করে দিল। এরপর ক্রেতা ঐ মটকার উপর সীল মহর লাগিয়ে তা তার ঘরেই রেখে দিল, তারপর তা সেখান থেকে ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গেল, তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এই মাল ক্রেতার মাল থেকে গেছে বলে ধর্তব্য হবে। এর উপরই ফাতওয়া (আস সুগরা)। এক ব্যক্তি তার নিজ গৃহে রক্ষিত কোন পরিমাপ যোগ্য মাল পরিমাপ হিসেবে এবং ওজনযোগ্য মাল ওজন হিসাবে বিক্রি করে বলল, আমি তোমাকে এ মাল নেয়ার সুযোগ দিলাম, তারপর তাকে চাবিও দিয়ে দিল কিন্তু ঐ বস্তু মেপে এবং ওজন করে দিল না, এতে ক্রেতার দখল সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি ক্রেতার নিকট চাবি হস্তান্তর করে কিন্তু এ মাল আমি আমার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে দিলাম না বলে তবে সে কবজাকারী বলে গণ্য হবে না (যখীরিয়া)। চাবির দখলই হচ্ছে ঘরের দখল। যদি সহজভাবে ঘর খোলা যায় তাহলে নচেৎ তাতে ঘরের দখল সাব্যস্ত হবে না (মুখতারুল ফাতওয়া)।

৩. মাসআলা : কেউ যদি বাড়ি বিক্রি করে ক্রেতার নিকট (ঐ বাড়ির) চাবি হস্তান্তর করে দেয় এবং ক্রেতাও তা কবজা করে নেয়, তাহলে ঐ বাড়িতে না গিয়েও ক্রেতা দখল বুঝে

১. কেননা تخلیه মানে হল, বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করার ব্যাপারে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেওয়া। তা বিক্রেতার ঘরেও হতে পারে। হাত দ্বারা কবজা করা শর্ত নয়।

পেয়েছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, চাবিটি ঐ বাড়ির নয়, তাহলে দখল সাব্যস্ত হবে না। যদি বিক্রেতা ক্রেতার নিকট চাবি হস্তান্তর করে কিন্তু এ কথা না বলে যে, “এ বাড়িটি আমি আমার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে দিলাম, সুতরাং তুমি তা কবজা করে নাও” তাহলে এটি কবজা বলে গণ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে “নাও” ۛ তবে এ কথা কবজা বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি বলে ۛ (এটি নিয়ে নাও) তবে তা কবজা বলে গণ্য হবে যদি সে ওটি নেওয়ার জন্য যায় এবং তা দেখতে পায় (যখীরা)।

৪. মাসআলা : ফাতাওয়ায়ে ফযলী (র)-এর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ কাউকে বলে যে, আমি তোমার নিকট এই মাল বিক্রি করলাম এবং তোমার নিকট সমর্পণ করে দিলাম। তারপর সে ব্যক্তি বলল, আমি কবুল করলাম তবে এটি হস্তান্তর বলে গণ্য হবে না। যতক্ষণ না ক্রয়-বিক্রয়ের পর বাস্তবভাবে তা হস্তান্তর করা হয় (মুহীত)। কোন গোলাম বা দাসী ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি গোলামকে বলে, আমার সাথে এসো বা আমার সাথে চলো। তারপর সে যদি তার সাথে চলতে শুরু করে তবে এটি কবজা বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এমনভাবে যদি উক্ত গোলাম বা দাসীকে ক্রেতা কোন কাজে পাঠায় তবে এটিও কবজা হিসাবে ধর্তব্য হবে (ফাতহুল কাদীর)। কেউ যদি কারো নিকট এমন ঘর বিক্রি করে যা সেখানে বিদ্যমান নেই, তারপর বলে, আমি তা তোমার নিকট সোপর্দ করে দিলাম, এরপর ক্রেতা বলল, আমি কবজা করে নিলাম, তবে এসব কথা কবজা হিসেবে গণ্য হবে না। আর যদি ঘরটি কাছেই থাকে তবে তা কবজা বলে গণ্য হবে (আল-বাহরুর রায়িক)। এটিই যাহিরী রিওয়ায়েত এবং এটিই সহীহ অভিমত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ঘরটি কাছে থাকার মর্ম হলো, তা এমন অবস্থায় থাকা যে, ক্রেতা তাতে তালা লাগাতে সক্ষম। পক্ষান্তরে সেটি যদি এমন স্থানে না থাকে তবে তা দূরবর্তী স্থানে আছে বলে গণ্য হবে (আল বাহরুর রায়িক)। কেউ যদি অন্য কারো নিকট কোন বাড়ি বিক্রি করে এবং সে বাড়ি যদি ভিন্ন শহরে থাকে আর বিক্রেতা শুধু মুখের কথার দ্বারা তা সোপর্দ করে, তারপর ক্রেতা যদি মূল্য হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে তবে এই অস্বীকার করার তার ইখতিয়ার রয়েছে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : বিক্রেতার গৃহে একটি গোলাম খরিদ করার পর বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, আমি একে আমার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে দিলাম। এ অবস্থায় ক্রেতা যদি গোলামের দখল নিতে অস্বীকার করে আর সে মারা যায় তাহলে তা ক্রেতার মাল থেকে যাবে (মুখতারুল ফাতওয়া)। একটি কাপড় খরিদ করার পর বিক্রেতা ক্রেতাকে তা কবজা করতে বলল, কিন্তু সে তা কবজা করল না, অথচ ঐ সময় না দাঁড়িয়ে শুধু হাত বাড়ালেই তা কবজা করতে সে সক্ষম ছিল। যদি কেউ ঐ কাপড়টি গসব করে নিয়ে যায়- এ অবস্থায় তাহলে এই হস্তান্তর সহীহ হবে। যদি হাত বাড়ালেই কবজা করার মত অবস্থা না হয়, তাহলে কবজা সহীহ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা : কারো মালিকানাধীন একটি কাঠ রাস্তায় পতিত ছিল। এই কাঠটি সে কারো নিকট বিক্রি করল। তখন ক্রেতা ঐ কাঠটির উপর দণ্ডায়মান ছিল। বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ

এ কাঠটি তার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে দিল। কিন্তু ক্রেতা সেটিকে তার স্থান থেকে একটুও নড়ল না, এ অবস্থায় কেউ যদি তা জ্বালিয়ে দেয় তাহলে ক্রেতা ঐ ব্যক্তি থেকে জরিমানা উসূল করতে পারবে। যদি এই কাঠের অন্য কোন হকদার বেরিয়ে আসে তাহলে হকদার ব্যক্তি ঐ দাহকারী ব্যক্তির নিকট থেকে জরিমানা উসূল করতে পারবে। কিন্তু সে ক্রেতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ উসূল করতে পারবে না (যহীরিয়া)। ফাতাওয়ায়ে আবুল লাইসের মধ্যে উল্লেখ আছে, যদি কেউ কোন বাড়ি বিক্রি করে এবং তা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেয় আর সেখানে বিক্রেতার কোন সামান থাকে তাহলে এ হস্তান্তর সহীহ হবে না। যতক্ষণ না সে ঐ বাড়িটিকে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করবে। এহেন অবস্থায় বিক্রেতা-ক্রেতাকে ঐ বাড়ি এবং ঐ সমস্ত সামান কবজা করার জন্য অনুমতি প্রদান করে তাহলে হস্তান্তর সহীহ হবে। কেননা এ সামান ক্রেতার নিকট আমানত হয়ে গেছে। (যখীরা)। এমনিভাবে কেউ যদি এমন জমি বিক্রি করে যাতে বিক্রেতার ফসলাদি রয়েছে, তারপর সে যদি তা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেয় তবে এ হস্তান্তর সহীহ হবে না (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : কেউ যদি তুলার আটির মধ্যে তুলা বিক্রি করে অথবা শীষের ভেতর থাকা অবস্থায় গম বিক্রি করে, তারপর তা অনুরূপভাবে হস্তান্তর করে দেয় এবং ক্রেতা যদি তুলার আটি বিদীর্ণ করা ব্যতিরেকে এমনিভাবে গমের শীষ টুকরা টুকরা ব্যতিরেকে তুলা ও গম কবজা করতে পারে তবে তাকে কবজাকারী বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু বিদীর্ণ করা এবং টুকরা টুকরা করা ব্যতিরেকে এগুলো কবজা করা না যায় তবে তা কবজা হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা এ কাজ বিক্রেতার মালিকানায় হস্তক্ষেপ করার শামিল, অথচ তার সে অধিকার নেই। কেউ যদি গাছে বিদ্যমান ফল বিক্রি করে তা অনুরূপভাবে সোপর্দ করে দেয় তবে এতেই ক্রেতা কবজাকারী বলে গণ্য হবে। কেননা বিক্রেতার মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা ছাড়াই তার পক্ষে ফল আহরণ করা সম্ভব (বাদায়ে)।

৮. মাসআলা : বিক্রেতা সওয়ার অবস্থায় পশুটি খরিদ করার পর ক্রেতা বলল, আমাকে তোমার সাথে তুলে নাও, আর সে তাকে উঠিয়ে নিল আর এতে ঐ পশুটি মারা যায় তাহলে এটি ক্রেতার মাল থেকে হালাক হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। কাযী ইমাম (র) বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ঐ সওয়ারীর উপর কোন গদি ইত্যাদি না থাকে। পক্ষান্তরে যদি সওয়ারীর গদি থাকে এবং ক্রেতা ঐ গদির উপর বসে তাহলে সে কবজাকারী বলে গণ্য হবে। নচেৎ কবজাকারী হবে না। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সওয়ার অবস্থায় যদি বিক্রি হয়, তাহলে ক্রেতা কবজাকারী বলে গণ্য হবে না, যেমন ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে বিক্রেতার ঘরে থাকা অবস্থায় ঘর বিক্রি করলে ক্রেতা কবজাকারী বলে গণ্য হয় না (ফাতহুল কাদীর)।

৯. মাসআলা : কোন ব্যক্তি এক দীনারের বিনিময়ে আংটির একটি পাথর বিক্রি করে আংটিটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে বলল, তুমি এর থেকে পাথরটি খুলে নাও। পাথরটি খুলতে গিয়ে আংটিটি ক্রেতার হাতে ভেঙ্গে যায় তাহলে দেখতে হবে যে, ক্রেতা কোনরূপ কষ্ট ব্যতিরেকে সে এটি খুলতে সক্ষম কিনা? যদি সক্ষম হয় তাহলে শুধু পাথরের মূল্যই ক্রেতার উপর বর্তাবে। অন্য কিছু নয়। আর সে যদি খুব কষ্টে সৃষ্টে তা খুলতে সক্ষম হয়, সহসা খুলতে

সক্ষম না হয় তাহলে এ অবস্থায় ক্রেতার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা বিক্রিত পণ্য (مبيع) হস্তান্তর করা সহীহ হয়নি। আর যদি আংটিটি নষ্ট বা ভেঙ্গে না গিয়ে থাকে তাহলে ক্রেতাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে, হয়তো সে বিক্রেতা কর্তৃক পাথরটি খুলা দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, আর ইচ্ছা করলে সে ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গেও দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি ঘরে রক্ষিত এমন একটি মটকা বিক্রি করল যা দরজা ভাঙা ছাড়া বের করা সম্ভব নয়, তাহলে ঘরের বাইরে তা হস্তান্তর করার ব্যাপারে বিক্রেতাকে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে যদি সহসা তা হস্তান্তর করতে সক্ষম না হয়, হস্তান্তর করতে তার কষ্ট হয় তাহলে সে ইচ্ছা করলে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দিতে পারবে (যহীরিয়া)।

১০. মাসআলা : হারুনিয়াত গ্রন্থে আছে যে, পিতা তার ঘরকে তার ভরণ-পোষণাধীন নাবালিগ সন্তানের নিকট বিক্রি করে এবং পিতাও ঐ গৃহে বাস করে তবে ঐ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। কিন্তু পিতা ঐ ঘর খালি করে না দেওয়া পর্যন্ত সন্তান ঐ গৃহের উপর কবজাকারী বলে গণ্য হবে না। পিতা ঐ ঘরে বসবাসরত অবস্থায় যদি ঐ ঘরটি বিধ্বস্ত হয়ে যায় তবে এতে পিতার মাল নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। যদি পিতা ঐ গৃহে না থাকে বরং তার সন্তানাদি এবং মাল-সামান ঐ গৃহে থাকে তাহলেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। পিতা যদি তার শরীরে ব্যবহারে থাকা জামা, চাদর তার নাবালিগ সন্তানের নিকট আংটি বিক্রি করে তাহলে এগুলো শরীর থেকে খুলে না দেওয়া পর্যন্ত পুত্র এগুলোর কবজাকারী বলে গণ্য হবে না। তদ্রূপ পিতা যদি নিজ নাবালিগ পুত্রের নিকট এমন কোন সওয়ারী বিক্রি করে যার উপর পিতা সাওয়ার আছে, কিংবা তার মাল সামান আছে তাহলে পিতা ঐ সাওয়ারী থেকে না নামা পর্যন্ত বা তার মাল না নামানো পর্যন্ত ঐ সওয়ারীর উপর পুত্রের কবজা সহীহ হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা : যদি ঘোড়ী গুলো এমন দুয়ারবন্ধ খোয়াড়ে থাকে যা থেকে সেগুলোর বের হওয়া সম্ভব নয়, এহেন অবস্থায় যদি মালিক ঐ মাদী ঘোড়াগুলো কারো কাছে বিক্রি করে দিয়ে সেগুলোকে নেয়ার জন্য ক্রেতার পথ ছেড়ে দেয়। কিন্তু ক্রেতা ঐ দরজা খোলার পর সেগুলো তাকে নাজেহাল করে বের হয়ে পালিয়ে যায় তাহলে ক্রেতাকে এগুলোর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। চাই সে মাদী ঘোড়াগুলো ধরতে সক্ষম হোক বা না হোক। আর যদি ঐ খোয়াড়ের দুয়ার অন্য কোন মানুষ খুলে বা বাতাসে খুলে ক্রেতা ব্যক্তি না খুলে, তারপর মাদী ঘোড়া গুলো বের হয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে, যদি ক্রেতা খোয়াড়ে প্রবেশ করে সেগুলো ধরতে সক্ষম হওয়ার মত অবস্থা হয় তবে তাকে কবজাকারী বলে গণ্য করা হবে। অন্যথায় নয় (যহীরিয়া)।

১২. মাসআলা : এক ব্যক্তি তার আস্তাবলে রক্ষিত কতগুলো ঘোড়া থেকে নির্দিষ্ট একটি বিক্রি করে তার মূল্যও বুঝে নিল, তারপর ক্রেতাকে বলল, তুমি আস্তাবলে গিয়ে তা কবজা করে নাও। আমি তোমার পথ ছেড়ে দিলাম। তারপর ক্রেতা তা কবজা করার জন্য আস্তাবলে গেল। ইত্যবসরে সে একটি মাদী ঘোড়াকে ধরল। অমনি সেটি লাফিয়ে উঠল এবং আস্তাবলের দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল। তাহলে এর সমাধান সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে এমন স্থানে সেটি সোপর্দ করেন যে, ক্রেতা রশির সাহায্যে সেটিকে আটক

করতে পারত এবং তার নিকট রশিও মজুদ ছিল, আর মাদী ঘোড়াটিও এমন ছিল, সেটি ঐ আস্তাবল থেকে বের হতে সক্ষম ছিল না তাহলে বিক্রেতার এসব কথা কবজা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি এমন স্থানে হস্তান্তর করে যেখান থেকে ঘোড়া ভেগে যাওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকে এবং বিক্রেতাও এটিকে ধরে রাখতে পারে না তাহলে এটি কবজা বলে গণ্য হবে না। অবস্থা যদি এই হয় যে, রশি দ্বারা ঘোড়া আটক রাখতে সক্ষম, রশি ছাড়া নয়, কিন্তু তার নিকট কোন রশি নেই তাহলে এ ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। অর্থাৎ তাহলে এই অবস্থায়ও সে কবজাকারী বলে গণ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। খরিদকৃত ঘোড়ার অবস্থা যদি এমন হয় যে, ক্রেতা তা ধরতে পারে না, কিন্তু তার সাথে যদি সাহায্যকারী লোক বা আরো ঘোড়া থাকে তবে ধরতে পারে, এহেন অবস্থায় যদি তার সাথে সাহায্যকারী মানুষ বা সাহায্য নেওয়ার মত কোন ঘোড়া থাকে তবে তাকে কবজাকারী বলে গণ্য করা হবে। আর যদি তার সাথে এগুলো না থাকে তবে তাকে কবজাকারী বলে গণ্য করা হবে না (আল-মুহীত)

১৩. মাসআলা : ঘোড়া যদি বিক্রেতার হাতে থাকে এবং সে তা ধরে রেখে ক্রেতাকে বলে, তুমি এটি নিয়ে নাও, তারপর ক্রেতাও তার হাত তাতে স্থাপন করে, ফলে মাদী ঘোড়াটি উভয়ের হাতের নীচে চলে আসে, এ অবস্থায় বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে, আমি ঘোড়াটি তোমার ইখতিয়ারে দিয়ে দিলাম। আমি তোমাকে না দেওয়ার জন্য তা ধরি নি। তুমি যাতে সেটিকে কবজা করে নিতে পার সে জন্য আমি ওটিকে ধরেছি। এহেন অবস্থায় যদি ঘোড়াটি উভয়ের হাত থেকে ছুটে চলে যায় তবে এ ক্ষতির দায়-দায়িত্ব ক্রেতার উপর বর্তাবে। আর ঘোড়াটি যদি বিক্রেতার হাতে থাকে এবং সেখান পর্যন্ত ক্রেতার হাত না পৌঁছে, এ অবস্থায় যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, ঘোড়াটিকে আমি তোমার ইখতিয়ারে দিয়ে দিলাম, তুমি তা কবজা করে নাও, আমি একে তোমার জন্যই ধরে রেখেছি। বিক্রেতা এটিকে কবজা করার আগে ঠিক এই মুহূর্তেই ঘোড়াটি যদি বিক্রেতার হাত থেকে পালিয়ে যায়, অবশ্য ক্রেতা ইচ্ছা করলে তখন ঘোড়াটিকে নিজের কবজায় নিতে পারত তাহলে এই ক্ষয়-ক্ষতির দায়িত্ব বিক্রেতার উপর বর্তাবে (যখীরা)।

১৪. মাসআলা : একটি বড় ঘরে উড়ন্ত একটি পাখীকে কেউ ক্রয় করল, আর দরজা খোলা ছাড়া পাখিটির বের হওয়ার সুযোগ নেই। এদিকে উড়ার কারণে পাখিটিকে ক্রেতাও ধরতে পারছে না। এ অবস্থায় বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে পাখিটিকে ধরার জন্য পথ ছেড়ে দেয়, কিন্তু ক্রেতা দরজা খোলার পর পাখিটি উড়ে বের হয়ে যায় তবে নাতিফী (র) বলেন, এতে ক্রেতা ঐ পাখিটি কবজা করে নিয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যদি ক্রেতা ব্যতীত অন্য কেউ দরজা খুলে, বা বাতাসে দরজা খুলে যায় তাহলে ক্রেতা কবজাকারী বলে গণ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা : শামসুল আইম্মা উযজন্দী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, দুই ব্যক্তির শরীকানার একটি ঘোড়া কোন চারণভূমিতে আছে, এ অবস্থায় এক শরীকদার অপর জনের কাছে নিজের অংশ বিক্রি করল এবং তাকে বলল যে, তুমি গিয়ে তা কবজা করে নাও, ক্রেতা পৌঁছার আগেই ঘোড়াটি মারা গেল তবে এ ক্ষয়-ক্ষতির দায়-দায়িত্ব কার? তিনি বলেন, এর

দায়-দায়িত্ব উভয়ের। তিনি বলেন, আমাদের সময়েও এমন ঘটনা ঘটেছিল যে, এক ব্যক্তি কারো নিকট থেকে চারণভূমিতে থাকা একটি গাভী খরিদ করেছিল এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, তুমি গিয়ে গাভীটি কবজা করে নাও। এ সম্বন্ধে আমাদের মাশায়িখদের কেউ কেউ ফাতওয়া দিয়েছেন যে, যদি গাভীটি এরূপ নিকটবর্তী স্থানে থাকে যে, তা দেখা যায় এবং এর দিকে ইশারা করা যায় তাহলে এটি কবজা বলে গণ্য হবে। নচেৎ তা কবজা বলে গণ্য হবে না। বস্তুত: এ জবাবটি সহীহ নয়। সহীহ জবাব হচ্ছে, গাভীটি যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার এমন নিকটে থাকে যে, ক্রেতা ইচ্ছা করলে তা কবজা করতে পারে তাহলে তাকে কবজাকারী বলে গণ্য করা হবে (মুহীত)।

১৬. মাসআলা : কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণ তেল খরিদ করে, বিক্রেতা একটি বোতল দিল মেপে তাতে ভরে দেওয়ার জন্য। তারপর সে ক্রেতার সামনেই তেল মেপে দিল তাহলে ক্রেতা ঐ মাল কবজাকারী বলে গণ্য হবে। যদিও ঐ তেল বিক্রেতার গৃহে বা দোকানে থাকে আর বিক্রেতা যদি ঐ তেল ক্রেতার অনুপস্থিতিতে মেপে দেয় তাহলেও কোন কোন ইমামের মতে সে কবজাকারী বলে গণ্য হবে। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (জাওয়াহিরুল আখলাতী) বাযযায়িয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এইভাবে প্রত্যেক পরিমাপযোগ্য এবং ওজনযোগ্য বস্তু ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি নিজের পাত্র বিক্রেতার নিকট দেয় এবং বিক্রেতা পরিমাপ করে বা ওজন করে ঐ পাত্রে রাখে তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (আল্ বাহরুর রাযিক)। তেল অনির্দিষ্ট হলে ঐ অবস্থায় সে ক্রেতাও হবে না কবজাকারীও হবে না। চাই বিক্রেতা ঐ মাল ক্রেতার সামনে ওজন করুক বা তার অনুপস্থিতিতে ওজন করুক। আর ক্রেতার জন্য এ মালে মালিক সুলভ হস্তক্ষেপ করা জায়েয নেই। ফাতওয়ার জন্য এটিই পসন্দনীয় অভিমত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। তারপর যদি উক্ত ব্যক্তি বাস্তবভাবেই ঐ মাল কবজা করে তাহলে এখন হতে সে ঐ মাল ক্রয়কারী ও কবজাকারী বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় ঐ মাল নষ্ট হলে ক্ষয়-ক্ষতির দায়-দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে (গিয়াসিয়া)। উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময়ে কবজা করা অবস্থায় দ্বিতীয় বার ওজন করার পূর্বে তাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা জায়েয হবে না। অবশ্য কোন কোন ফকীহ জায়েয বলেছেন। এর উপরই ফাতওয়া (ওয়াজীয : আল কুরদুরী)।

১৭. মাসআলা : কেউ এক দিরহামে দশ রিতল তেল খরিদ করল। তারপর ক্রেতা একটি বোতল এনে বিক্রেতাকে দিয়ে বলল, তেল মেপে এতে ভরে দাও। আর তেলও সুনির্দিষ্ট আছে। তারপর বিক্রেতা এক রিতল পরিমাণ তেল মাপার পর বোতলটি ভেঙ্গে গেল এবং তেল সবই গড়িয়ে পড়ে গেল। এরপর বাকী তেলও মাপা হল (এবং তা ঐ পাত্রেই ভরা হল)। অথচ ক্রেতা-বিক্রেতা কেউই ঐ বোতল ভাঙ্গা সম্পর্কে জানে না। এহেন অবস্থায় বোতল ভাঙ্গার আগে যা মাপা হয়েছে, এর ক্ষয়-ক্ষতির দায়িত্ব ক্রেতার উপর আপতিত হবে। আর বোতল ভাঙ্গার পর যা মাপা হয়েছে এর ক্ষয়-ক্ষতির দায়িত্ব বিক্রেতার উপর বর্তাবে। বোতল ভাঙ্গার আগে যে তেল মাপা হয়েছিল বোতল ভাঙ্গার পর যদি সে তেল থেকে কিছু থেকে যায় এবং তাতে যদি বিক্রেতা আরো তেল ঢালে তাহলে বিক্রেতাই ঐ সমুদয় তেলের মালিক হবে। তবে ক্রেতাকে বিক্রেতার পক্ষ থেকে এই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (যহীরিয়া)। আর ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে ভাঙ্গা বোতল দিয়ে থাকে এবং ক্রেতা যদি বোতলটি নিজের কাছে ধরে

রাখে, বিষয়টি উভয়েরই অজ্ঞাত থাকে আর ক্রেতার আদেশে বিক্রেতা তাতে তেল ঢেলে থাকে, তাহলে ক্ষতি ক্রেতার হবে। আর মাসআলা পূর্ববত হয় তাহলে উপরোক্ত সমুদয় অবস্থায় ক্ষতিপূরণের দায়-দায়িত্ব ক্রেতার উপর বর্তাবে (মুহীত)।

১৮. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে আছে যে, কেউ ঘি খরিদ করে বিক্রেতাকে একটি পাত্র দিয়ে তাতে ঘি মেপে দিতে বলল, কিন্তু পাত্রে যে ছিল ছিল, ক্রেতার তা জানা ছিল না। তবে বিক্রেতার জানা ছিল। এক্ষেত্রে ক্ষয়-ক্ষতি বিক্রেতার উপর বর্তাবে। ক্রেতার উপর নয়। আর যদি ছিদ্রের কথা ক্রেতার জানা থাকে, বিক্রেতার জানা না থাকে অথবা উভয়েরই জানা থাকে তবে তাতে ক্রেতার দখল সাব্যস্ত হবে এবং সমস্ত বস্তুর মূল্য আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। মুনতাকা গ্রন্থে আরো আছে যে, কেউ এক স্তূপ গম থেকে এক 'কুরর' পরিমাণ গম খরিদ করল। তারপর সে বিক্রেতাকে একটি থলে দিয়ে বলল, গম মেপে এই থলিয়ায় ভরে দাও। বিক্রেতা তাই করল। তাহলে ক্রেতা উক্ত গমের উপর কবজাকারী বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা : কুদুরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণ গম খরিদ করে বিক্রেতার নিকট হতে একটি থলি হাওয়ান নিল এবং বিক্রেতাকে গম মেপে তাতে ভরে দিতে বলল। বিক্রেতা যদি ঐ থলিতেই ভরে দেয় তবে ক্রেতা ঐ মালের উপর কবজাকারী হয়ে যাবে। আর থলিটি যদি অনির্দিষ্ট হয়।

যেমন ক্রেতা-বিক্রেতাকে বলল, আমাকে একটি থলি ধার দাও এবং তাতে গম মেপে দাও। এক্ষেত্রে মাল মাপার সময় ক্রেতা হাযির থাকলে এটি কবজা হবে, হাযির না থাকলে কবজা হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ক্রেতার অনুপস্থিতিতেই মাল মাপা হলে দুই অবস্থার কোন অবস্থাতেই তা কবজা বলে গণ্য হবে না। যাবৎ না ক্রেতা নিজে থলিয়া হস্তগত করে তা পুনরায় বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে। অর্থাৎ এরূপ করলে ক্রেতা ঐ মাল কবজা করেছে বলে গণ্য হবে (আল-ফাতাওয়াস সুগরা)।

২০. মাসআলা : হিশাম (র) তার নাওয়াদির গ্রন্থে লিখেছেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কেউ কিছু বস্ত্র খরিদ করে বিক্রেতাকে বলল, এটি আমার পাত্রে রেখে দাও। তারপর বিক্রেতা তা মাপার জন্য ঐ পাত্রে রাখল। ইতিমধ্যে পাত্রটি ভেঙ্গে গেল এবং মাল সবই নষ্ট গেল, তাহলে এ ক্ষেত্রে হুকুম কি হবে? তিনি বললেন, ক্ষয়-ক্ষতি বিক্রেতার উপর বর্তাবে কেননা বিক্রেতা ঐ মাল মাপার জন্য রেখেছিল। হস্তান্তর করার জন্য নয়, বস্ত্র বিক্রেতা মাল মাপার পর যদি পাত্রটি ভেঙ্গে যায় তাহলেও ক্ষয়-ক্ষতি বিক্রেতার মালের উপর বর্তাবে। পক্ষান্তরে যদি বিক্রেতা নিজের পাত্রে রেখে মাল মাপে, তারপর ক্রেতার পাত্রে রাখে, আর এ অবস্থায় পাত্র ভেঙ্গে যায় তাহলে ক্ষয়-ক্ষতি ক্রেতার উপর বর্তাবে (যখীরা)।

১. এক কুরর (كُرْر) সমান সমান ১২ ওয়াসাক। এক ওয়াসাক সমান সমান ৬০ সা, আর এক সা সমান সমান সাড়ে তিন সের। এই হিসাবে এক কুরর সমান সমান ২৫২০ সের। অর্থাৎ ৬৩ মন।

২১. মাসআলা : কেউ যদি তেল খরিদ করে বিক্রেতাকে একটি বোতল দিয়ে বলে যে, এ শিশিতে তেল ভর্তি করে তা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। এ অবস্থায় পথে শিশিটি ভেঙ্গে গেল, এ সম্পর্কে শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র) বলেন, যদি ক্রেতা এ কথা বলে থাকে যে, এটি আমার গোলামের হাতে পাঠিয়ে দিবে এবং বিক্রেতা তাই করে, তাহলে ক্ষয়-ক্ষতি ক্রেতার উপর বর্তাবে। আর ক্রেতা যদি একথা বলে থাকে যে, তোমার গোলামের হাতে পাঠিয়ে দিবে, তারপর সে তাই করে। তাহলে ক্ষয়-ক্ষতির দায়িত্ব বিক্রেতার উপর বর্তাবে। কেননা ক্রেতার গোলামের হাযির হওয়া ক্রেতার হাযির হওয়ার অনুরূপই। এমনিভাবে বিক্রেতার গোলাম বিক্রেতার মতই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা : ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বলে, এই পাত্রে আমার জন্য এই পরিমাণ মাল মেপে তোমার গোলাম দ্বারা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিবে, অথবা বলে যে, আমার গোলাম দ্বারা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিবে। আর বিক্রেতা তাই করে। এখন ঐ পাত্র পথে ভেঙ্গে গেলে বিক্রেতার মাল নষ্ট হবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি বলে, এই পরিমাণ মাল মেপে তা তোমার গোলামের নিকট হস্তান্তর করে দিবে বা আমার গোলামের নিকট হস্তান্তর করে দিবে, তাহলে গোলাম ক্রেতার পক্ষ হতে উকীল হবে। সুতরাং এটা যেন ক্রেতার কাছেই হস্তান্তর করা হল। সুতরাং এ অবস্থায় ক্রেতার মালই নষ্ট হবে (মুহীত)। ক্রেতা যদি বলে, আমার পুত্রের নিকট পাঠিয়ে দিবে, তারপর বিক্রেতা এই মাল ক্রেতার পুত্রের নিকট পাঠানোর জন্য কাউকে মজদুর নিয়োজিত করল তাহলে এই মাল ক্রেতা কর্তৃক কবজা হয়েছে বলে গণ্য হবে না। কাজেই মজদুরের মুজরী বিক্রেতার উপরই বর্তাবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি এরূপ বলে যে, আমার পক্ষ হতে কাউকে মজদুর নিয়োগ করে তার মাধ্যমে এই মাল আমার পুত্রের নিকট পাঠিয়ে দিবে, তবে এ অবস্থায় মজদুরের কবজা তার কবজা বলে গণ্য হবে। তবে এর জন্য শর্ত হল, যদি ক্রেতা একথা স্বীকার করে যে, সে মজদুর নিয়োগ করার জন্য বলেছিল। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি মজদুর নিয়োগ করা এবং তার নিকট হাওয়ানা করার কথাটি অস্বীকার করে তবে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (তাতার খানিয়া)।

২৩. মাসআলা : 'মাজমূউন নাওয়ামিল' গ্রন্থে আছে, যদি কোন ব্যক্তি বাজারে গিয়ে দধি বিক্রেতা ব্যক্তির নিকট থেকে দধি খরিদ করে তাকে বলে, এই দধি তার দোকানে পৌঁছিয়ে দিতে, তারপর সে দধি রাস্তায় পড়ে যায়, তাহলে এই ক্ষয়-ক্ষতি বিক্রেতার উপর বর্তাবে। এমনিভাবে কেউ যদি শহরের ভেতর ভূমি বা লাকড়ীর বোঝা খরিদ করে তবে বিক্রেতার দায়িত্ব হবে তা ক্রেতার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়া। যদি এ জাতীয় মাল রাস্তায় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এই ক্ষয়-ক্ষতির দায় বিক্রেতার উপর বর্তাবে (খুলাসা)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে গাভী খরিদ করে বিক্রেতাকে বলল, তুমি একে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও। আমি তোমার পেছনে পেছনে আসছি। তোমার বাড়ি থেকে আমি আমার বাড়ি নিয়ে আসব। এমতাবস্থায় গাভীটি বিক্রেতার হাতেই মারা গেল তাহলে বিক্রেতার মালই ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। যদি বিক্রেতা এরূপ দাবী করে যে, আমি গাভীটি হস্তান্তর করে দিয়েছিলাম তবে কসম সাপেক্ষে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কোন ব্যক্তি বিক্রেতার আন্ত

বলে রাখা একটি রুগ্ন পশু খরিদ করল। তারপর ক্রেতা বলল, এটি আজ রাতে এখানেই থাকবে। যদি মারা যায় তবে আমার মাল থেকেই যাবে। এমতাবস্থায় পশুটি যদি মারা যায় তবে এতে বিক্রেতার মাল নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। ক্রেতার মাল নয় (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

২৪. মাসআলা : কেউ একটি দাসী বিক্রি করে, তারপর তৃতীয় ব্যক্তির যিম্মায়ে রাখল যাতে সে ক্রেতার নিকট থেকে পূর্ণ মূল্য উসূল করতে সক্ষম হয়। এ অবস্থায় দাসীটি যদি ঐ ব্যক্তির নিকট মারা যায় তাহলে এ ক্ষয়-ক্ষতি বিক্রেতার উপর বর্তাবে। যদি তৃতীয় ব্যক্তি আংশিক মূল্য কবজা করে বিক্রেতার অগোচরে ক্রেতার নিকট এই দাসীকে হাওয়ালা করে দেয় তবে বিক্রেতা ইচ্ছা করলে দাসীকে ক্রেতার নিকট থেকে ফেরত নিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, দাসীকে ফেরত নেয়ার পর পুনরায় ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট রাখা বিক্রেতার জন্য জরুরী না। তবে যদি তৃতীয় ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে ভিন্ন কথা। আর যদি দাসীকে ফেরত নেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে ঐ তৃতীয় ব্যক্তি বিক্রেতার অনুকূলে দাসীর বাজার মূল্যের দায় বহন করবে। বিক্রেতার নিকট (মুহীত : আস-সারাখসী) এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে একটি কাপড় খরিদ করল। কিন্তু সে তা কবজাও করলনা এবং এর মূল্যও দিলনা এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বলে আমি তোমাকে আমানতদার মনে করছি না অমুক ব্যক্তির নিকট কাপড় হস্তান্তর কর; তা তার কাছে থাকবে। তাহলে আমি তোমাকে মূল্য প্রদান করব। তারপর বিক্রেতা অমুক ব্যক্তির নিকট কাপড় হাওয়ালা করে দিল এবং তার নিকটই কাপড়টি খোয়া গেল। তাহলে এই ক্ষেত্রে বিক্রেতার মাল নষ্ট হবে। কেননা যার নিকট কাপড় রাখা হয়েছিল, সে বিক্রেতার তরফ হতেই মূল্য আদায় করার জন্য ক্রেতার নিকট হতে কাপড় আটকিয়ে রেখেছিল। কাজেই তার কবজা বিক্রেতার কবজার অনুরূপ হিসাবেই গণ্য হবে (যহীরিয়া)।

২৫. মাসআলা : বিক্রেতা যদি বিক্রিত বস্তু এমন লোকের নিকট হাওয়ালা করে যে ক্রেতার পরিবারভুক্ত তাহলে এতে ক্রেতা ঐ মালের উপর কবজাকারী বলে গণ্য হবে না (মুখতারুল ফাতওয়া)। যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু ক্রয় করে এবং কিছু মূল্য আদায় করত; বিক্রেতাকে বলে; আমি এই মাল বাকী মূল্যের বিনিময়ে তোমার কাছে বন্ধক রাখলাম অথবা বলে যে; আমি এই মাল তোমার নিকট আমানত রাখলাম তবে এ কথা কবজা হিসাবে গণ্য হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। বিক্রিত বস্তু বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় ক্রেতা যদি ঐ মাল নষ্ট করে ফেলে অথবা মালে কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করে তবে এটি ক্রেতা কতৃক কবজারূপে গণ্য হবে। এমনিভাবে বিক্রেতা যদি ক্রেতার নির্দেশে এরূপ করে তবে এটিও কবজা হিসাবে পরিগণিত হবে। অনুরূপভাবে ক্রেতা যদি ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে আযাদ করে দেয় অথবা মুদাক্কর বানিয়ে দেয় কিংবা এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, এ আমার উম্মু ওয়ালাদ তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি কেউ গর্ভবতী কোন দাসী ক্রয় করে কবজা করার আগেই দাসীর পেটের বাচ্চাটিকে আযাদ করে দেয় তাহলে এটিও কবজা হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা তার এ আযাদ করা সহীহ নাও হতে পারে। সুতরাং সে

বিনষ্টকারী বলে সাব্যস্ত হয়নি (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে বিক্রিত মাল কবজা করার জন্য হুকুম করে এবং সে তা কবজা করে তবে তার কবজা করা ক্রেতার কবজার অনুরূপ বলে গণ্য হবে না (ওয়াজীয)।

২৬. মাসআলা : তাফরীদ গ্রহে উল্লেখ আছে খরিদকৃত মাল ক্রেতা কবজা করার আগে যদি কোন ব্যক্তি এতে কোনরূপ জিনায়েত (অন্যায় স্ফুটিত) কত্রে; তারপর ক্রেতা অপরাধী ব্যক্তির পশ্চাদ্ধাবন করে তবে ইমাম আবু ইউসূফ (র)-এর মতে এভাবেই সে কবজাকারীরূপে পরিগণিত হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর থেকে ভিন্ন পোশা করেন (তাতার খানিয়া)। খরিদকৃত দাস-দাসী যদি কবজা করার আগে হত্যা করা হয় আর ক্রেতা এর খুন মাফ করে দেয় তবে এ মাফ করে দেওয়া ক্রেতা কতৃক খরিদকৃত বস্তু ইচ্ছার করে নেওয়ার শামিল। তারপর বিক্রেতা ইচ্ছা করলে হত্যাকারীর নিকট থেকে তার মূল্য উসূল করে নিতে পারবে এ অবস্থায় এই টাকা-পয়সা তার কাছে বাহন হিসাবে থাকবে। তারপর ক্রেতা যখন এর মূল্য পরিশোধ করবে তখন বিক্রেতা উসূলকৃত মূল্য হত্যাকারীকে ফেরত দিতে হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে তার খরিদকৃত গম পেষার জন্য হুকুম করে এবং বিক্রেতা যথাযথভাবে তা পালন করে তবে ক্রেতা এ মালের কবজাকারী বলে গণ্য হবে এবং সেই এই মালের মালিক বলে বিবেচিত হবে (আল-বাহরুর রাযিক)।

২৭. মাসআলা : ক্রেতা যদি খরিদকৃত বস্তু বিক্রেতাকে ধার দেয় বা তার কাছে আমানত রাখে অথবা বিক্রেতাকে ইজারা দেয় তবে ক্রেতার দখল সাব্যস্ত হবে না এবং ইজারার উজরত সাব্যস্ত হবে না। ক্রেতা যদি খরিদকৃত মাল তৃতীয় ব্যক্তিকে ধার দেয় বা তার কাছে আমানত রাখে এবং বিক্রেতাকে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করতে বলে তাহলে তার দখল সাব্যস্ত হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে, তুমি গোলামকে আমার এই কাজ করে দিতে বল। তারপর বিক্রেতা বলল হ্যাঁ গোলাম করল, তবে ক্রেতার দখল সাব্যস্ত হয়ে যাবে (মুহীত)। কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করল, কিন্তু এখন পর্যন্ত সে তাকে কবজা করেনি। এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে হুকুম করে; এ গোলামটি অমুককে হিবা করে দাও। তারপর বিক্রেতা তার হুকুম বাস্তবায়ন করল এবং গোলামটি যার জন্য হিবা করা হয়েছে তার নিকট হিবা করে দিল তাহলে হিবা হয়ে যাবে এবং ক্রেতা ঐ গোলামকে কবজা করেছে বলে পরিগণিত হবে। এইভাবে ক্রেতা বিক্রেতাকে হুকুম করে যে, তুমি আমার খরিদকৃত গোলামটিকে কারো নিকট ইজারা দিও, চাই সে কারো নাম নির্দিষ্টভাবে বলুক বা অনির্দিষ্টভাবে বলুক; তারপর বিক্রেতা তাই করে তাহলে এ ইজারা দেওয়া জায়েয হবে। আর ইজারা গ্রহণকারী ব্যক্তি প্রথমে ক্রেতার পক্ষ হতে ঐ মাল কবজাকারী হবে এবং পরে নিজের পক্ষ হতে কবজাকারী হবে। আর বিক্রেতা ইজারা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে তা ثمن (মূল্য) থেকে স্বীকৃত হবে- যদি তা ثمن (মূল্য) জাতীয় বস্তু হয়। বিক্রিত গোলাম ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করার আগেই বিক্রেতা যদি তা অন্য কারো নিকট আরিয়ত রাখে অথবা অন্য কাউকে হিবা করে অথবা তা অন্য কারোর নিকট বন্ধক রাখে তারপর ক্রেতা এ বিষয়ে অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে তা জায়েয হবে এবং ক্রেতা এই মাল কবজা করেছে বলে গণ্য হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা : ক্রেতা খরিদকৃত মাল কবজা করার পূর্বে যদি বিক্রেতা বলে যে, তুমি তাকে আযাদ করে দাও; তারপর বিক্রেতা তাকে তার তরফ হতে আযাদ করে দেয়, তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা জায়েয হবে (ওয়াজীয আল-কুরদুরী)। ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বিক্রিত বস্তুর উপর এমন কোন কাজ করতে বলে যার দ্বারা ঐ বস্তুর মূল্যহানি ঘটে না, যেমন পারিশ্রমিকে বা বিনা পারিশ্রমিকে বস্ত্র ধৌত করা বা পরিষ্কার করা, তবে এর দ্বারা ক্রেতার দখল সাব্যস্ত হবে না। তার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করানো হলে ক্রেতার উপর দিয়ে পাবে। আর যদি ঐ কাজ এমন হয়, যাতে বিক্রিত বস্তুর মূল্যহানি হয়; এ ক্ষেত্রে ক্রেতা কবজাকারী বলে গণ্য হবে (বাদায়ে)। যদি খরিদকৃত গোলামকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার মাথার চুল মুণ্ডন করা, অথবা তার গৌফ বা নখ কটন করার জন্য ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে-আজীর নিয়োগ করে তাহলে এতে সে গোলাম কবজাকারী বলে গণ্য হবে না। তবে বিক্রেতা পারিশ্রমিকের হকদার হবে। তবে আদিষ্ট কাজ যদি গোলামের মূল্যহানি ঘটানোর মত হয় তবে ক্রেতা সে ক্ষেত্রে কবজাকারী হিসাবে গণ্য হবে। যদি ক্রেতা খরিদ কৃত মালের হিসাবের জন্য বিক্রেতাকে নিযুক্ত করে তবে এ নিযুক্তি সহীহ হবে না। কেননা হিফায়ত করা বিক্রেতার উপর এমনিই ওয়াজিব (তাতার খানিয়া)।

২৯. মাসআলা : যদি ক্রেতা খরিদকৃত দাসীকে বিবাহ দিয়ে দেয় অথবা নিজের উপর কোন পাওনার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তবে এটি ইসতিহসানের দৃষ্টিতে কবজা বলে গণ্য হবে না। তবে বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় যদি উক্ত দাসীর স্বামী তার সাথে সহবাস করে তবে সমস্ত ইমামের মতে এটি কবজা বলে পরিগণিত হবে (আল-হাবী)। এক ব্যক্তি কোন দাসী খরিদ করে তাকে কবজা করার আগেই কারো নিকট বিয়ে দিয়ে দিল। তারপর দাসীর স্বামী তাকে চুম্বন করল বা স্পর্শ করল তবে শায়খ (র) বলেন; সহবাসের অবস্থায় যেমনি ভাবে ক্রেতা ব্যক্তি কবজাকারী বলে গণ্য হয়; এ অবস্থায়ও সে কবজাকারী বলে গণ্য হবে (কিন্য়া)। মুনতাকা গ্রন্থে আছে যে, কেউ দাসী খরিদ করে কবজা করার আগেই তাকে বিবাহ দিল। আর স্বামী সহবাসের আগেই সে মারা গেল। তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে এবং বিক্রেতার মাল নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর স্বামীর কাছে প্রাপ্য মোহর ক্রেতার হবে এবং ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে তার হিস্যা অনুসারে (ثمن) মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে দাসীর বিক্রয় মূল্যকে তার মহর ও বাজার মূল্যের মাঝে আনুপাতিক হারে বন্টন করা হবে। মহরের যে পরিমাণ তার বিক্রয় মূল্যের সমান হবে সে পরিমাণ বিক্রয় মূল্য তার যিম্মায় অপরিহার্য হবে। আর অতিরিক্ত অংশ সে সাদাকা করে দিবে। মহর এ ক্ষেত্রে সন্তানের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। উক্ত কিতাবে এ কথাও আছে যে, এক ব্যক্তি দাসীর বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন পক্ষ হতেই কবজা হয় নি, এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি দাসী এক শত দিরহামের বিনিময়ে কারো কাছে বিয়ে দিয়ে দেয়; তারপর গোলামকে তার ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করার আগেই সে যদি তার বিক্রেতার নিকটে মারা যায় তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ বাতিল হয়ে যাবে। দাসী যার কাছে ছিল তার কাছেই পুনরায় ফেরত আসবে, আর মহরও সে ব্যক্তিই পাবে। যদি এতে দাসীর মধ্যে কোন

ক্ষতি সাধিত হয়ে যায় তবে এর ক্ষতিপূরণ দাসীর মালিক হস্তান্তর নিকট হতে আদায় করে নিবে। উক্ত কিতাবের অন্যত্র এ মাসআলাটিই বর্ধিত আকারে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ গোলামের বিনিময়ে একটি দাসী খরিদ করল, তারপর দখলওয়ার আগেই ক্রেতা তাকে একশ' দিরহামের বিনিময়ে কারো কাছে বিয়ে দিয়ে দিল। ঐ দাসীর মূল্য দুই হাজার দিরহাম থেকে পাঁচশ' দিরহাম কমে গেল। এ দিকে দাসী বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় তার স্বামী তার সাথে সহবাস করল। তারপর গোলামকে তার ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করার পূর্বে বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় সে মারা গেল। এ অবস্থায় ক্রেতা দাসীর মহরের হকদার হবে এবং তার এই ইখতিয়ার থাকবে; সে ইচ্ছা করলে ঐ দাসীকে নিয়ে নিতে পারবে। তবে এ অবস্থায় সে ঐ দাসী ছাড়া আর কিছুই পাবে। আর ইচ্ছা করলে ক্রেতার নিকট থেকে জরিমানা স্বরূপ ঐ বাজার মূল্য উসুল করতে হবে যা তার স্বামী তার সাথে সহবাস করার সময় দিয়ে ছিল।

৩০. মাসআলা : গোলামের বিনিময়ে কোন দাসী ক্রয়ের পর তাকে, কবজা করার আগেই ক্রেতা যদি তাকে বিক্রেতার নিকট বিয়ে দিয়ে তারপর স্বামী তার সাথে সহবাস করে; এবং এরপর গোলামকে হস্তান্তর করার আগেই সে মারা গেল। এ অবস্থায় দাসীর বিক্রেতা (যার সাথে তার বিবাহও হয়েছে) যদি ইচ্ছা করে তবে সে তাকে ক্রেতার নিকট সমর্পণ করে দিবে এবং তার নিকট থেকে ঐ মূল্য উদ্ধার করে নিবে যে মূল্য তার ঐ দিন ছিল- যে দিন সে বিবাহের মাধ্যমে তার সাথে সহবাস করেছিল। আর যদি ইচ্ছা করে তবে সে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দিয়ে ক্রেতার নিকট দাসীকে ফেরত নিয়ে নিতে পারবে। এ অবস্থায় বিবাহ ও মহর উভয়ই বাতিল হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়া বা বহাল রাখার ইখতিয়ার বিক্রেতার থাকবে; ক্রেতার নয়। আর বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দিলে তা ভেঙ্গে যাবে। বিচারক্ষেত্রে হতে তা বাতিল ঘোষণা করা আবশ্যিক নয়। যদি ক্রেতা-বিক্রেতার অনুমতিক্রমে দাসীর উপর কবজা করত! কয়েকদিন পর ঐ বিক্রেতার নিকটই তাকে বিয়ে দিয়ে ক্রেতার বাকি মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে ঐ দাসীকে ফেরত নেওয়ার বিক্রেতার কোই ইখতিয়ার থাকবেনা। এহেন অবস্থায় ক্রেতাকে এর ঐ মূল্যের সামিল হতে হবে, যে মূল্যের কবজা করার দিন ছিল। আর দাসীকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করে দেওয়া হবে এবং বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে বিবাহও সহীহ থাকবে। ক্রেতা যদি বিক্রেতার অনুমতি ছাড়াই দাসীকে কবজা করে এবং বিক্রেতার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে তাকে নিকট বিয়ে দিয়ে দেয়; চাই বিক্রেতা ক্রেতার কবজা করা সম্পর্কে অবগত থাকুক বা না থাকুক; এটি বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট হস্তান্তর বলে গণ্য হবে না। কেননা কবজা পূর্বে তাকে বিয়ে দেওয়া জায়েয। পক্ষান্তরে দাসী ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় বিক্রি যদি বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তার সাথে সহবাস করে তবে এটি বিক্রেতা কর্তৃক বাজার জন্য হস্তান্তর হিসাবে পরিগণিত হবে। আর যদি হস্তান্তরের আগেই গোলাম মারা যায় তাহলে দাসীর উপর বিক্রেতার কোন অধিকার থাকবে না (মুহীত)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া বিক্রিত বস্তু কবজা করার বিবরণ

১. মাসআলা : ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে বিক্রেতার অনুমতি ছাড়াই বিক্রিত বস্তু কবজা করে তাহলে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে ঐ মাল ফেরত নিয়ে নিতে পারবেন। এ অবস্থায় ক্রেতা যদি খরিদকৃত বস্তু এবং বিক্রেতার মাঝখান থেকে প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দেয় তাহলে বিক্রেতা বস্তু ঐ মাল কবজা না করা পর্যন্ত কবজাকারী বলে গণ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে এমন কোন হস্তক্ষেপ করে বাতিল করা যায় বা ভেঙ্গে দেওয়া যায়, যেমন সে ক্রয়কৃত মাল বিক্রি করে দিয়েছে বা হিবা করে দিয়েছে কিংবা তা অন্যের কাছে বন্ধক রেখেছে বা কারো কাছে ইজারা রেখেছে অথবা কাউকে সাদাকা করেছে তাহলে এই হস্তক্ষেপ (تصرف)-কে বাতিল করে দেওয়া হবে বা ভেঙ্গে দেওয়া হবে। আর যদি ক্রেতা ঐ বস্তুর মধ্যে এমন কিছু করে যা বাতিল করা যায় না। যেমন আযাদ করা ; মুদাববার বানিয়ে দেওয়া কিংবা উম্মু ওয়ালাদ বানিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। তবে এই ক্ষেত্রে বিক্রেতার ঐ বস্তু নিজ কবজায় ফিরিয়ে নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না (যখীরা)।

২. মাসআলা : ক্রেতা বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে দেওয়ার পর বিক্রেতা যদি জানতে পারে যে এগুলো বা এর অংশাংশি সবই জাল অথবা এর অন্য হকদার আছে অথবা প্রদত্ত অর্থের কিছু এ জাতীয় তাহলে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে বিক্রিত বস্তু নিজের কাছে আটক রাখতে পারবে। আর ক্রেতা যদি ঐ জাতীয় দিরহাম (মুদ্রা) দ্বারা মূল্য পরিশোধ করতঃ বিক্রেতার অনুমতি ছাড়াই খরিদকৃত বস্তু কবজা করে নেয় তবে বিক্রেতা ইচ্ছা করলে ঐ কবজা বাতিল করে দিতে পারবে। এহেন অবস্থায় ক্রেতা যদি খরিদকৃত বস্তুতে এমন কোন হস্তক্ষেপ করে যা বাতিল করে দেওয়া যায় তবে তা বাতিল করে দেওয়া হবে (মুহীত)। ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে খরিদকৃত মাল কবজা করা অবস্থায় প্রদত্ত দিরহাম জাল বা মেকী হওয়ায় বিক্রেতা যদি তা ফেরত দিতে চায় তবে আমাদের ইমামত্রয়ের কারো মতেই সে আর তা ফেরত দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে দিরহামগুলো যদি (রূপার না হয়ে) রাষ্ট্র বা সীসার হয় অথবা যদি প্রদত্ত দিরহামের মধ্যে অন্য কারো হক থাকায় তা নিয়ে নেওয়া হয় তবে এ ক্ষেত্রে সে তা ফেরত দিতে পারবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি ঐ মালে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করে তাহলে ক্রেতার এতে কোনরূপ ইখতিয়ার থাকবে না। চাই সে এতে এমন হস্তক্ষেপ করুক যা বাতিল করা যায় বা যা বাতিল করা যায় না (বাদায়ে)। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি প্রদত্ত মূল্যের মধ্যে উপরোক্ত কোন ক্রটি দেখতে না পায় এবং ক্রেতা উক্ত গোলামকে কারো নিকট বিক্রি করে দেয় বা ইজারা দেয় কিংবা রাহন রাখে তারপর তাকে হস্তান্তরও করে দেয়; এ অবস্থায় যদি বিক্রেতা মূল্যের মধ্যে উপরোক্ত কোন ক্রটি দেখতে পায় তবে ক্রেতা ঐ গোলামের ক্ষেত্রে যা কিছু করেছে সবই জায়েয হবে। কাজেই বিক্রেতা তার প্রাপ্ত মূল্য আর ফেরত দিতে পারবেনা এবং গোলামের ব্যাপারে তার কোন অধিকারও থাকবে না (মুহীত)।

৩. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কেউ যদি এক জোড়া কপাট বা এক জোড়া মোজা বা একজোড়া জুতা খরিদ করে এবং জোড় থেকে একখানা

বিক্রেতার অনুমতি ব্যতীত কবজা করে ও দ্বিতীয়খানা কবজা না করে তারপর তা বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায় তবে বিক্রেতা মাল হতে তা নষ্ট হবে। অর্থাৎ তিনি একটির কবজার দ্বারা অপরটির কবজা সাব্যস্ত করেন নি। তারপর তিনি বলেছেন, ক্রেতা ইচ্ছা করলে কবজা কৃতটি রেখে দিতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে তা ফেরতও দিতে পারবে। অর্থাৎ তিনি ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে এই দুটি বস্তুকে একই বস্তুর ন্যায় বলে গণ্য করেছেন (যখীরা)। কবজা করার আগেই ক্রেতা যদি জোড়ার কোন একটির মধ্যে খুঁত সৃষ্টি করে দেয় তাহলে সে পূর্ণ জোড়া কবজা করেছে বলে গণ্য হবে (যখীরিয়া)। ক্রেতা উপরোক্ত জোড়া বস্তু হতে একখানা কবজা করার পর যদি সে নিজে তা নষ্ট করে দেয় বা তাতে খুঁত সৃষ্টি করে দেয় তবে দ্বিতীয়খানাও কবজা করে নিয়েছে বলে গণ্য হবে। সুতরাং যদি বিক্রেতার বারণ বা নিষেধ করার পূর্বে উপরোক্ত জোড়া বস্তুর কোন একটি বিক্রেতার নিকট নষ্ট হয়ে যায় তবে বিক্রেতার মাল নষ্ট হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। আর যদি আর যদি বিক্রেতার বারণ করার পর নষ্ট হয় তবে বিক্রেতার মাল নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় যে পরিমাণ মাল নষ্ট হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে, সাব্যস্তকৃত মূল্য থেকে এ পরিমাণ মূল্য হ্রাস করে দেওয়া হবে (যখীরা)। যদি উক্ত জোড়া বস্তুর কোন একটিতে বিক্রেতা ক্রেতার অনুমতিতে কোনরূপ ক্ষতি সাধন করে তবে সে উভয়টি কবজা করেছে বলে গণ্য হবে। কাজেই যদি এরপর বস্ত্বদ্বয়ের উভয়টি নষ্ট হয়ে যায় তবে ক্রেতার মাল থেকেই তা নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। যদি ক্ষতিসাধনের পর বিক্রেতা বস্ত্বদ্বয়ের উভয়টি বা কোন একটি আটকিয়ে রাখে তবে তার নিকটে যেটি নষ্ট হবে এর মূল্য পরিশোধ করা তার উপরই ওয়াজিব হবে। যদি বিক্রেতা দুটি বস্তুর কোন একটি কবজা করার জন্য ক্রেতাকে অনুমতি দেয় তবে এ অনুমতি উভয়টি কবজা করার অনুমতি রূপে গণ্য হবে। সুতরাং ক্রেতা উভয় বস্তু কবজা করার পর বিক্রেতা যদি মূল্য উসুলের উদ্দেশ্যে এর কোন একটি আটকিয়ে রাখার নিমিত্তে তা ফেরত তলব করে তবে সে গাসিব তথা জবর দখলকারী বলে গণ্য হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কেউ এক হাজার দিরহাম মূল্যে একটি দাসী খরিদ করল। তারপর সে মূল্য পরিশোধ না করে বিক্রেতার অনুমতি ছাড়াই তাকে কবজা করে নিল। তারপর ক্রেতা ঐ দাসীকে অন্য কারো কাছে একশ দীনার মূল্যে বিক্রি করে দিল। এবং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে বিক্রিত মাল ও মূল্য কবজা করে নিল। এরপর প্রথম ক্রেতা গায়েব হয়ে গেল, আর তার কাছে বিক্রয়কারী উপস্থিত হয়ে শোষোক্ত ক্রেতার নিকট হতে দাসীটি ফেরত নেওয়ার ইচ্ছা করে এবং এই শোষোক্ত ক্রেতা যদি উক্ত বক্তব্য স্বীকার করে তাহলে প্রথম বিক্রেতা দাসীকে ফেরত নিতে পারবে। আর যখন সে দাসীকে ফেরত নিয়ে নিবে তখন দ্বিতীয় বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম বিক্রেতার কথাকে অস্বীকার করে অথবা বলে যে, সত্য না মিথ্যা তা আমি জানি না, তাহলে প্রথম ক্রেতা উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত এ মকদ্দমা চলবে না সে উপস্থিত হওয়ার পর মকদ্দমার গুনানি চলতে থাকবে (যখীরা)। যদি উপস্থিত হয়ে প্রথম বিক্রেতার বক্তব্যকে সত্যায়ন করে তবে এই সত্যায়ন দ্বিতীয় ক্রেতার বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি মিথ্যায়ন করে তবে প্রথম বিক্রেতাকে প্রমাণ পেশ করতে বলা হবে সে যদি প্রথম ও দ্বিতীয়

ক্রেতার সামনে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তবে বিচারক ঐ দাসীকে প্রথম বিক্রেতার হাতে ফিরিয়ে দিবেন এবং দ্বিতীয় বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথম বিক্রেতার নিকট মাল ফেরত দেওয়ার আগেই প্রথম ক্রেতা যদি মালের মূল্য পরিশোধ করে দেয় তাহলে এ অবস্থায় বিচারক ঐ মাল প্রথম বিক্রেতার নিকট রদ করতে পারবে না। প্রথম বিক্রেতা দাসীকে নিয়ে নেওয়ার পর যদি প্রথম ক্রেতা দাসীর মূল্য পরিশোধ করে দেয় তাহলে ঐ দাসীকে প্রথম ক্রেতার নিকট হাওয়ালা করে দেওয়া হবে। এই অবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতার দাসীর উপর কোন অধিকার থাকবে না (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : উক্ত মাসআলা কাঠামোতে দাসী যদি দ্বিতীয় ক্রেতার নিকটে মারা যায় তাহলে প্রথম বিক্রেতা ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট থেকে জরিমানা স্বরূপ এর বাজার মূল্য উসূল করে নিতে পারবে। আর প্রথম বিক্রেতার কাছে ফেরতকৃত মূল্য দাসীর বদল রূপে গণ্য হবে। সুতরাং ঐ মূল্য যদি প্রথম বিক্রেতার নিকট খোয়া যায় তবে উভয় ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতাকে যে পরিমাণ মূল্য দিয়েছিল তা সে ফেরত নিয়ে নিবে। যেমনিভাবে দাসীকে ফেরত নেওয়ার পর সে যদি প্রথম বিক্রেতার নিকটে মারা যায় তবে দ্বিতীয় ক্রেতা তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত নিতে পারে। আর যদি প্রথম বিক্রেতার নিকট রক্ষিত বাজার মূল্য নষ্ট না হয়; এমনকি প্রথম ক্রেতা এর বিক্রয় মূল্য পরিশোধ করে দেয় তাহলে সে তার বিক্রেতার নিকট হতে দাসীর বাজার মূল্য নিয়ে নিবে। আর দ্বিতীয় ক্রেতার ঐ বাজার মূল্য উসূল করে নেওয়ার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। যেমন উপরোক্ত অবস্থাসমূহে দাসীর জীবদ্দশায় দাসীকে নিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তার কোন ইখতিয়ার ছিল না। এ অবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা হতে ঐ মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে যা সে তাকে নগদ প্রদান করেছে। প্রথম ক্রেতার নিকট মূল্য হস্তান্তর করার পর দেখতে হবে যে, এই ثمن (মূল্য) জাতীয় জিনিস কি না? যদি ثمن জাতীয় জিনিস না হয় তাহলে এর থেকে কিছুই সাদাকা করা যাবে না। আর যদি ثمن জাতীয় জিনিস হয় তাহলে মূল্য থেকে যা কিছু অতিরিক্ত হবে তা সাদাকা করে দিবে (যখীরা)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : যে কবজা ক্রয়ের কবযীয় স্থলাভিষিক্ত হয় এবং স্থলাভিষিক্ত হয় না।

১. মাসআলা : এ ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যখন কোন বস্তু কোন ব্যক্তির কবজায় নিজের মূল্যের জামানত হিসাবে থাকে এবং পরে তার নিকটেই ঐ বস্তু বিক্রি করা হয় তাহলে ঐ কবজা ক্রয়ের কবজার স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে। কেননা এটি ঐ জাতীয় কবজা যা ক্রয়ের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। কারণ ক্রয়ের কবজার মধ্যেও বস্তু তার নিজের সত্তার বিপরীতে জামানত হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। (মুহীত : আস-সারাখসী) যদি উভয় কবজা এক জাতীয় হয় যেমন উভয় কবজা আমানতের বা উভয় কবজা যামানতের তবে একটি অপরটির নায়িব বা স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে। আর যদি কবজা দুটি ভিন্ন জাতীয় হয়, জামানতমূলক কবজা অপরটির স্থলাবর্তী হতে পারবে। কিন্তু উল্টোটি হতে পারবে না (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)

২. মাসআলা : যদি গাসাব (জবর দখল) বা ফাসিদ আকদের ভিত্তিতে কোন বস্তু কারো হাতে থাকে তারপর যে ঐ বস্তুটি তার যথাযথ মালিকের নিকট থেকে সহীহ আকদের ভিত্তিতে খরিদ করে তাহলে প্রথম কবজা দ্বিতীয়টির স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে। সুতরাং ক্রেতা যদি নিজ গৃহে যাওয়া এবং ঐ বস্তু পর্যন্ত পৌছা অথবা ওটা গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়ার পূর্বে ঐ বস্তুটি নষ্ট হয়ে যায় তবে তা ক্রেতার মাল থেকে নষ্ট হবে (খুলাসা)। যদি গাসাবকৃত বস্তুকে 'বায়য়ে সরফ' (بيع الصرف)-এর বদলে ধরা হয় এবং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই পৃথক হয়ে যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না। এমনভাবে যদি বায়ায়ে সরফের মজলিসে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কোন একজনের নিজের বদলের উপর কবজা করার পূর্বে তারা উভয়ে পৃথক হয়ে যায়, তারপর কবজাকারী ব্যক্তি নিজের কবজাকৃত বস্তু ক্রয় করে তবে ক্রয়-করার সাথে সাথেই যে ঐ বস্তুর উপর কবজাকারী হিসাবে পরিগণিত হবে। কেননা তার কবজাকৃত বস্তু যদি ফাসিদ আকদের ভিত্তিতে তার কবজায় থাকে তবে এর মূল্যের জামানত (ক্ষতিপূরণ) ওয়াজিব হবে। কাজেই ঐ কবজা ক্রয়ের কবজায় স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে। (মুহীত : আস-সারাখসী) যদি কোন বস্তু কারো নিকট ধার, আমানত বা রাহন হিসাবে থাকে তবে শুধু আকদের দ্বারা যে ঐ বস্তুর উপর কবজাকারী বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি ঐ বস্তু সামনে মজুদ থাকে অথবা সে যদি এর নিকট গিয়ে তা কবজা করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে কবজাকারী বলে গণ্য করা হবে। (হাবী) যদি ধার বা আমানত রাখার অবস্থায় ক্রেতা এরূপ কোন কাজ করে যা দ্বারা সে কবজাকারী হয়ে যায়, তারপর বিক্রেতা এরূপ নিয়ত করে যে, সে মূল্য আদায় করার জন্য বিক্রিত বস্তু আটক করবে তবে তার সে অধিকার থাকবে না। যদি ক্রেতার কবজা করার আগে বিক্রেতা আমানত গচ্ছিত ব্যক্তির বাড়ি থেকে ঐ মাল নিয়ে নেয় তবে তার এরূপ করার ইখতিয়ার রয়েছে। যদি বিক্রিত বস্তু উভয়ের সামনে মজুদ থাকে এবং এ অবস্থায় বিক্রেতা যদি তা উপস্থিত ব্যক্তির নিকটে তা বিক্রি করে তাহলে বিক্রেতা আর ঐ মাল আটকে রাখতে পারবে না (মুহীত)।

৩. মাসআলা : কেউ যদি তার গোলামকে নিজের প্রয়োজনে কোথাও পাঠায়, তারপর ঐ গোলামকে নিজের নাবালিগ পুত্রের নিকট বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে আর ঐ গোলাম ফিরে আসার পূর্বে মারা গেলে পিতার মাল নষ্ট হবে। কেননা ঐ গোলামের উপর এখনো তার পিতার কবজা বিদ্যমান, তবে তা হল আমানতী কবজা। তাই তা ক্রয়ের কবজায় স্থলাবর্তী হবে না। যদি ঐ গোলাম ফিরে আসে এবং পিতা তাকে কবজা করতে পারে তবে সে (পুত্রের পক্ষ হতে) কবজাকারী বলে গণ্য হবে। কেননা পিতা তার ওলী। যদি পুত্র বালিগ হওয়ার পর গোলাম ফিরে আসে তবে পিতা কবজাকারী হবে না। বরং এ অবস্থায় স্বয়ং পুত্র নিজে কবজা করবে। পিতা যদি অন্য কোন লোকের নিকট হতে পুত্রের জন্য গোলাম খরিদ করে তারপর পুত্র বালিগ হয় তবে আগের মত এখনো কবজায় হক পিতারই হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)

৪. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একশ দীনারের বিনিময়ে একটি রূপার পাত্র খরিদ করল, এরপর ক্রেতা তা কবজা করল, কিন্তু দীনার পরিশোধ করল না। ইত্যবসরে তারা উভয়ে পৃথক

হয়ে গেল ফলে বিনিময় দ্রব্যদ্বয়ে একটি মজলিসে কবজা না হওয়ায় 'সারফ বিক্রয়' বাতিল হয়ে গেল, এ অবস্থায় ক্রেতাকে রূপার পাত্রটি বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে হবে। ক্রেতা যদি ফেরত না দিয়ে তা নিজ গৃহে রেখে দেয়; এরপর বিক্রেতার সাথে দেখা করে নতুন করে কিছু দীনারের বিনিময়ে তার কাছ থেকে তা খরিদ করে এবং মূল্য পরিশোধ করে, তারপর তারা পৃথক হয়ে যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে এবং শুধুমাত্র ক্রয়ের দ্বারাই সে ঐ লোটোর উপর কবজাকারী হয়ে যাবে (যখীরা)।

৫. মাসআলা : কেউ যদি কোন গোলাম খরিদ করতঃ তাকে কবজা করে এর মূল্যও পরিশোধ করে, তারপর তারা যদি বিক্রয় চুক্তি প্রত্যাহার (إلغاء) করে এর গোলামটি ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় পুনরায় তাকে খরিদ করে তবে এই আকদ সহীহ হবে। আর যদি ক্রেতা ছাড়া অন্য কারো কাছে বিক্রি করে তবে তা সহীহ হবে না এবং শুধুমাত্র আকদের কারণে উক্ত ব্যক্তি কবজাকারী বলে গণ্য হবে না। সুতরাং কবজা করার আগে যদি গোলাম মারা যায় তাহলে প্রথম চুক্তির মাল হিসাবে মারা যাবে এবং ইকালার ও দ্বিতীয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ইকালার বিক্রিত বস্তু তার নিকট প্রথম বিক্রয় চুক্তির মূল্যের বিপরীতে জামানত স্বরূপ আছে। এ হিসাবে এটি বন্ধক রাখা বস্তুর ন্যায় হয়ে গেল। কাজেই এটি ক্রয়ের কবজার স্থলবর্তী হতে পারবে না। তদ্রূপ দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তির মূল্য যদি প্রথম বিক্রয় চুক্তির মূল্যের সমজাতীয় না হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট হতে দাসীর বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করল। তারপর তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বস্তু কবজা করতঃ স্বীয় গৃহে রেখে দিল। তারপর তারা উভয়ে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দিয়ে ঐ বস্তু ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করার পূর্বে পুনরায় সে তা খরিদ করে নিল। এতে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হয়ে যাবে। এমনকি শুধুমাত্র ক্রয় করার দ্বারাই ক্রেতা ব্যক্তি ঐ বস্তুর উপর কবজাকারী হয়ে যাবে। অতএব এই গোলাম ক্রেতার হাতে আসার আগেই যদি কোন কারণবশত মারা যায় তবে দ্বিতীয় খরিদের মাল ধ্বংস হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় ইকালার বাতিল হবে না। কেননা ইকালার পর দাস-দাসীর প্রত্যেকেই তাদের কবজাকারী ব্যক্তির নিকটে মূল্যের পরিবর্তে জামানত স্বরূপ আছে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি দাস-দাসী জীবিত থাকা অবস্থায় ইকালার করা হয়। পক্ষান্তরে বিনিময়কৃত দাস-দাসী কবজা হয়ে যাওয়ার পর গোলাম যদি মারা যায় এবং এরপর ইকালার করা হয় তবে ইকালার সহীহ হবে, এবং যে ব্যক্তি গোলাম খরিদ করেছে তার উপর ওয়াজিব হবে গোলামের মূল্য পরিশোধ করা। উপরোক্ত অবস্থায় যে ব্যক্তির কবজায় দাসী আছে সে ঐ দাসীকে ফেরত দেওয়ার আগে তাকে পুনরায় বিক্রেতার নিকট হতে খরিদ করে, অথচ দাসী তাদের সামনে উপস্থিত নেই এই দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয়ের পর নতুনভাবে কবজা করার আগে ঐ দাসী যদি মারা যায় তবে এ মারা যাওয়া প্রথম খরিদের ভেতরে গণ্য হবে। কাজেই ইকালার এবং দ্বিতীয় খরিদ সবই বাতিল হয়ে যাবে। কেননা গোলাম মারা যাওয়ার পর দাসীর অবস্থা হল এমন যে, তা ক্রেতার কবজায় আছে, কিন্তু এর জামানত হচ্ছে অন্য কিছু আর তা হল, গোলামের মূল্য। এ জাতীয় কবজা ক্রয়ের কবজায় স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। ইকালার করার পর গোলাম ও দাসী উভয়ই জীবিত আছে, এ

অবস্থায় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যদি একে অপরের কবজাকৃত বস্তু দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে; তারপর উভয় বস্তুই যদি একত্রে বা আগে-পিছে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতার মাল থেকে তা খোয়া গেছে বলে গণ্য হবে। কেননা উভয় পণ্য এমন ভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার কবজায় আছে যে, এর জামানত হিসাবে এ জাতীয় জিনিসই ওয়াজিব হয়ে থাকে। এ কারণেই দেখা যায় যে, যদি ইকালার পর দ্বিতীয়বার ক্রয়-বিক্রয়ের আগে এতদুভয়ের কোন একটি মারা যায় তবে এর মূল্য ওয়াজিব হয় (এর মূল কারণ এটিই যে, এ অবস্থায় শুধুমাত্র ক্রয়ের দ্বারাই কবজা সাব্যস্ত হয়ে যায়)।

৭. মাসআলা : যদি কেউ কিছু দিরহামের বিনিময়ে তিন দিনের ইচ্ছাধিকারের শর্তে কোন দাসী খরিদ করে এরপর তারা বিক্রিত বস্তু এবং মূল্য উভয়ই কবজা করে এরপর ক্রেতা তার ইচ্ছাধিকারের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দিল। কিন্তু দাসীকে বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করল না। এমনভাবে ক্রেতা যদি বিক্রেতার নিকট হতে নতুনভাবে তাকে আবার খরিদ করে তবে তা সহীহ হবে। এমনভাবে ঐ দাসীকে ক্রেতা-কর্তৃক কবজা করার পূর্বে তৃতীয় কোন ব্যক্তি যদি তাকে তার নিকট হতে খরিদ করে তবে তাও সহীহ হওয়ার কথা ক্রেতা দাসীকে কবজা করার আগেই সে যদি মারা যায় তবে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে এবং ঐ দাসী প্রথম ক্রয়ের মধ্য হতে মারা গেছে বলে ধর্তব্য হবে। কেননা ইচ্ছাধিকারের শর্তের শুরুতে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হলে বিক্রিত পাত্র ক্রেতার হাতে তার মূল্যের বিপরীতে দায়বদ্ধরূপে থাকে আর যদি ইচ্ছাধিকারের শর্ত থাকে ক্রেতার পরিবর্তে বিক্রেতার আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তবে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ও সহীহ হবে। এ অবস্থায় দাসী মারা গেলে তবে দ্বিতীয় ক্রয়ের মধ্যে হতে মারা যাবে। যদি দেখার ইচ্ছাধিকার বা দোষের ইচ্ছাধিকারের ভিত্তিতে খরিদকৃত মাল ফেরত দেওয়া হয় তাহলে এর বিধান ক্রেতার খিয়ারের শর্তের ভিত্তিতে মাল ক্রয়ের বিধানের অনুরূপ বলে গণ্য হবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : এ জাতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, স্থানান্তরযোগ্য অস্থাবর মালের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় যদি ক্রেতার ও বিক্রেতার মাঝে এমন কোন কারণে বাতিল হয় যা সর্বদিক থেকে সকলের ক্ষেত্রে বাতিল বলে গণ্য, এ অবস্থায় এ মাল বিক্রেতা নিজের কবজায় আনার পূর্বেই যদি (উক্ত) বিক্রেতা বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে তবে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে। চাই সে তা পূর্ববর্তী ক্রেতার নিকট বিক্রি করুক বা অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রি করুক। উল্লেখ্য যে, যে সকল ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় এমন কোন কারণে বাতিল হয় যা (متعاقدیت) ক্রেতা-বিক্রেতা এর ক্ষেত্রে (فسخ) এবং অন্য লোকদের ক্ষেত্রে (عقد جری) (নতুন আকদ) যে সকল ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি কোন মাল পূর্বের ক্রেতার নিকট বিক্রি করে তবে তা সহীহ হবে। কিন্তু যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে তবে তা সহীহ হবে না। এই মূলনীতিটি খুবই সুন্দর। ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে গ্রন্থে এর দিকে ইংগিত করেছেন (যখীরা)। কোন ব্যক্তি একটি রৌপ্য নির্মিত লোটোর পরিবর্তে আরেকটি রৌপ্য নির্মিত লোটা খরিদ করল এবং বিনিময়কৃত বস্তু দুটো তারা কবজাও করে নিল। এরপর তারা উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দিয়ে ঐ স্থান থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে আবার নতুন করে

ক্রয় বিক্রয় করল। কিন্তু এবার তারা তা আর কবজা করল না। এ অবস্থায়ই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাহলে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় ও ইকাল বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু প্রথম ক্রয় বিক্রয় বলবৎ থাকবে। কেননা বায়য়ে সরফের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় ইকাল তথা বাতিল করার পর বিনিময় কৃত বস্তু দুটির প্রতিটি অপরটির পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কবজার মধ্যে থাকে। নিজ যামানতের ভিত্তিতে কবজার মধ্যে থাকে না, কোন ব্যক্তি দীনারের পরিবর্তে রূপার একটি লোটা খরিদ করল এবং বিনিময় কৃত বস্তু উভয়ে কবজা করে নিল। তারপর ক্রেতা-ব্যক্তি দীনারের পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে দিল। এ অবস্থায় বিক্রেতা যদি এ অতিরিক্ত পরিমাণকে ঐ মজলিসেই কবুল করে নেয় তাহলে ক্রয় বিক্রয় সহীহ হবে। এ ক্ষেত্রে ঐ অতিরিক্ত পরিমাণের জন্য তা আবার নতুন করে কবজা করা আবশ্যিক হবে না। পক্ষান্তরে যদি দীনারের পরিমাণ বৃদ্ধি না করা হয় কিন্তু পূর্ব মূল্য হতে মূল্য বৃদ্ধি করে বা কমিয়ে নতুনভাবে বেচা-কেনার আকদ করা হয় তাহলে লোটা এবং পরবর্তীতে সাব্যস্তকৃত মূল্য নতুনভাবে কবজা করতে হবে। অন্যথায় দ্বিতীয় ক্রয় বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে এবং প্রথম ক্রয় বিক্রয় বলবৎ থাকবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : অন্য দ্রব্যের সাথে বিক্রয় দ্রব্যের মিশ্রণ এবং বিক্রয় দ্রব্যের ক্ষতি সাধন করার বিবরণ

১. মাসআলা : নাওয়াদিরে ইবন সিমাতা গ্রন্থে উল্লেখ আছে; ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে এককুরর নির্দিষ্ট পরিমাণ গম এবং এককুরর নির্দিষ্ট পরিমাণ যব খরিদ করল। ক্রেতা এখনো তা কবজা করেনি। ইত্যবসরে বিক্রেতা তা অন্য মালের সাথে মিলিয়ে ফেলল। এহেন অবস্থায় এর বিধান কি হবে এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন মিশ্রিত গমের এক কুরের মূল্য কত তা নির্ধারণ করতে হবে এবং এরপর এককুরর অমিশ্রিত গমের মূল্য কত; তাও সাব্যস্ত করতে হবে। তারপর এই মূল্য ঐ গমের উপর হারাহরিভাবে ভাগ করা হবে। এরপর যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সে পরিমাণ টাকা ক্রেতার উপর থেকে হ্রাস করে দেওয়া হবে। আর ক্রেতা এককুরর মিশ্রিত গম নিয়ে নিবে এবং যবের মূল্য পরিশোধ করে যব নিয়ে নিবে। কেউ যদি এক রিতল ইয়াসমীনের তেল এবং এক রিতল বেগুনের তেল বিক্রি করে এগুলোকে মিশিয়ে ফেলে তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। কেউ যদি এক রিতল ইয়াসমীনের তেল এবং একশ' রিতল যায়তুনের তেল বিক্রি করে ইয়াসমীনের তেল যায়তুনের সাথে মিলিয়ে দেয় তবে ইয়াসমীনের ক্রয় বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ইচ্ছা করলে ঐ একশ রিতল যায়তুনের তেল নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু নেওয়া না নেওয়া তার ইচ্ছাধীন থাকবে। যদিও দুই প্রকার বস্তু মিলিয়ে নেওয়াতে কোন ক্ষতি সাধিত না হয়। এক ব্যক্তি দশ রিতল যায়তুনের তেল মেপে কোন এক মটকায় রেখেছে। তারপর অপর কোন ব্যক্তি তার নিকট থেকে ঐ তেল খরিদ করে নিল কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে তা কবজা করল না। ইত্যবসরে বিক্রেতা ক্রেতার ক্রয়কৃত তেল মটকার তেলের সাথে মিলিয়ে দিল তাহলে এই তেল নেওয়া না নেওয়ার ব্যাপারে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করল। কিন্তু এখনো সে তাকে কবজা করেনি। ইত্যবসরে বিক্রেতা একশ' দিরহামের বিনিময়ে তাকে কারো নিকট বন্ধক রাখল অথবা কারো নিকট তাকে ইজারা দিল বা কারো নিকট তাকে আমানত রাখল। এ সময় ঐ গোলাম মারা গেলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে এবং যার নিকট গোলামকে বন্ধক রাখা হয়েছে বা যার নিকট একে ইজারা দেওয়া হয়েছে কিংবা যার নিকট তাকে আমানত রাখা হয়েছে ক্রেতা এদের কারো নিকট থেকেই ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি তাদের কারো নিকট হতে ক্ষতিপূরণ উসূল করে নেয় তবে তারা বিক্রেতার নিকট থেকে এ পরিমাণ অর্থ ফেরত নিয়ে নিতে পারবে। বিক্রেতা যদি এ জাতীয় গোলাম কাউকে ধার দেয় অথবা কাউকে হিবা করে তারপর সে ধার গ্রহীতা বা হিবা গ্রহীতা ব্যক্তির নিকট মারা যায় অথবা বিক্রেতা এ জাতীয় গোলামকে কারো নিকট আমানত রাখার পরে আমানত গ্রহীতা ব্যক্তি তাকে কোন কাজে ব্যবহার করে এবং এতে সে মারা যায় তাহলে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে ক্রয়-বিক্রয় বহাল রেখে ধার গ্রহীতা, আমানত গ্রহীতা বা যাকে হিবা গ্রহীতা থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। তবে ক্ষতিপূরণ দাতা ব্যক্তি এই টাকা বিক্রেতার নিকট থেকে উসূল করে নিতে পারবে না। আর ইচ্ছা করলে সে এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিলও করে দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এই ক্ষেত্রে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে; সে ইচ্ছা করলে আমানত গ্রহীতার নিকট হতে জরিমানা স্বরূপ এর বাজার মূল্য আদায় করতে পারবে। কেননা সে বিক্রেতার অনুমতি ব্যতিরেকেই গোলামকে এ জাতীয় কঠিন কাজে ব্যবহার করেছে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা ধার গ্রহণকারীকে দায়বদ্ধ করতে পারবে না। কেননা ধার গ্রহীতা বিক্রেতার অনুমতিক্রমেই তাকে ব্যবহার করেছে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : কেউ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করল। তারপর ক্রেতার কবজা করার আগেই বিক্রেতা তার একটি হাত কেটে দিল। এক্ষেত্রে ক্রেতার ইচ্ছা সে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে গোলামকে নিতে পারে, আবার চুক্তি বাতিল করতে পারে। তখন পূর্ণ মূল্য তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। আর যদি হাতকাটা গোলামকে নেওয়া পসন্দ করে তাহলে আমাদের মাযহাব মতে তার উপর অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ বিক্রেতা যদি কবজার আগে তাকে মেরে ফেলে তাহলে আমাদের মাযহাবে ক্রেতার উপর থেকে পূর্ণমূল্য রহিত হয়ে যাবে। যদি কারো হস্তক্ষেপ ছাড়াই গোলামের কোন হাত নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এ অবস্থায়ও ক্রেতার ইচ্ছা পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে তাকে নিতে পারে আবার চুক্তি বাতিলও করতে পারে। যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি গোলামের হাত কর্তন করে দেয় তাহলে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে; সে যদি ক্রয়-বিক্রয়কে বহাল রাখতে চায়, রাখতে পারবে। কিন্তু এ অবস্থায় তাকে গোলামের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে, তবে অর্ধেক মূল্য সে (ক্রেতা) হাত কর্তনকারী ব্যক্তির নিকট থেকে উসূল করে নিয়ে নিবে। এ পর্যায়ে দেখতে হবে যে, যদি বিক্রয় মূল্যের অর্ধেক থেকে বাজার মূল্যের অর্ধেকের পরিমাণ বেশী হয় তবে অতিরিক্ত পরিমাণ সাদাকা করে দিবে। ক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল করে দেওয়া পসন্দ করে তবে

বিক্রেতা গোলামের হাত কর্তনকারী ব্যক্তিকে পাকড়াও করে তার থেকে গোলামের অর্ধেক মূল্য আদায় করে নিবে। এ ক্ষেত্রেও বিক্রয় মূল্যের অর্ধেক থেকে বাজার মূল্যের অর্ধেকের পরিমাণ যদি বেশী হয় তবে অতিরিক্ত পরিমাণটুকু সাদাকা করে দিবে। কেননা গোলাম বিক্রেতার মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় মূল অপরাধটি সংঘটিত হয়নি, যদিও আর্থিক জরিমানা প্রাপ্তির দিক থেকে একে বিক্রেতার মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় হাসিল হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায় (মাবসুত)।

৪. মাসআলা : যদি বিক্রেতা গোলামের হাত কেটে ফেলার পর ক্রেতা অনুমতিতে অথবা বিনা অনুমতিতে গোলামকে কবজা করে; তারপর এই গোলাম হাত কর্তনের কারণে মারা যায় তবে গোলামের অর্ধেক মূল্য ক্রেতার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে এবং বাকী অর্ধেক মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে। এ অপরাধের কারণে বিক্রেতার উপর আর কিছু অপরিহার্য হবে না। কেননা ক্রেতার কবজা এদিক থেকে চুক্তির সমতুল্য যে তা দ্বারা ক্রেতার ব্যবহার ক্ষমতা (ملك التصرف) অর্জিত হয় এবং বস্তুরটি মালিকানা সুদৃঢ় হয়। সুতরাং বিক্রেতার অপরাধ ও তার ফল তথা মৃত্যুর মাঝে ক্রেতার ব্যবহার ক্ষমতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই বিক্রেতার অপরাধের সাথে এই আছরের সম্বন্ধ কর্তিত হয়ে যাবে। কেননা মালিকানার পরিবর্তন এ জাতীয় সম্বন্ধের জন্য প্রতিবন্ধক। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির গোলামের হাত কর্তন করে দেয়, এরপর গোলামের মালিক তাকে বিক্রি করে, তারপর সে ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় ঐ হাত কর্তনের কারণে মারা যায় তাহলে হাত কর্তনকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র হাত কর্তনের জরিমানা দিবে। পক্ষান্তরে ক্রেতার কবজা করার পর যদি বিক্রেতা গোলামকে হস্তগত করে মূল্য উসুলের জন্য তাকে আটকিয়ে রাখে তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। কেননা তার এ কবজার দ্বারা পরিপূর্ণ মালিকানা হাসিল হয় না। কাজেই অপরাধ এবং এর আছরের মধ্যে নতুন কোন মালিকানা অন্তরায় হচ্ছে না। অতএব অপরাধীর অপরাধের আছর তথা মৃত্যুর দিকে তার অপরাধের সম্বন্ধ বাকী থাকবে। ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধের আগে বিক্রেতার অনুমতি ছাড়াই গোলাম কবজা করে নেয় তারপর এই গোলাম ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় বিক্রেতা তার হাত কেটে দেয় এবং এতে সে মারা যায় তাহলে ক্রেতার উপর থেকে এর পূর্ণ মূল্য রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি অন্য কোন কারণে মারা যায় তবে ক্রেতার উপর তার অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৫. মাসআলা : ক্রেতা খরিদা গোলামকে কবজা করার পূর্বেই তৃতীয় কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করে ফেলল, এর সমাধান সম্বন্ধে শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিमत অনুসারে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে; যদি সে ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখতে চায় তবে এই হত্যার কিসাস গ্রহণ করতে পারবে। আর যদি সে ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দিতে চায় তবে বিক্রেতা কিসাস গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যদি ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখার ইচ্ছা করে তবে কিসাসের হক তারই থাকবে। কিন্তু সে যদি ক্রয় বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়ার ইচ্ছা করে তবে সে ক্ষেত্রে গোলাম হত্যার কোন কিসাস হবে না। বরং এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা গোলামের মূল্য পাবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইসতিহসান অনুসারে বলেন যে, উভয় অবস্থাতেই মূল্য ওয়াজিব হবে, কিন্তু কিসাস ওয়াজিব হবে না। এ হত্যা তার মতে ভুলক্রমে হত্যা করার অনুরূপ বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা : ক্রেতা তার খরিদা গোলামকে কবজা করার আগেই বিক্রেতার আদেশে কোন ব্যক্তি গোলামকে হত্যা করল। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইচ্ছা সে হত্যাকারীকে বাজার মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য দিয়ে দিবে। আর ইচ্ছা করলে ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিলও করে দিতে পারবে। যদি সে হত্যাকারীর নিকট হতে জরিমানা উসুল করে নেয় তবে হত্যাকারী বিক্রেতার নিকট থেকে কোন কিছু আদায় করতে পারবেনা (যখীরা)। যদি গোলামের স্থলে কোন কাপড় হয় এবং বিক্রেতা কোন দর্জিকে বলে, আমার জন্য একটি জামার কাপড় কেটে দাও, চাই তা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হোক বা পারিশ্রমিক ছাড়া হোক; এতে ক্রেতা দর্জির নিকট হতে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না। বরং সে বিক্রেতার নিকট থেকে তার প্রদত্ত মূল্য উসুল করে নিবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি বকরী খরিদ করল। তারপর বিক্রেতা কাউকে তা যবাহ করার হুকুম করল। এ অবস্থায় যবাহকারী ব্যক্তির যদি বকরীটি বিক্রি হওয়ার কথা জানা থাকে তবে ক্রেতা তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ উসুল করতে পারবে। ক্ষতিপূরণ উসুল করা অবস্থায় সে বিক্রেতার নিকট হতে আর কিছু উসুল করতে পারবে না। আর বিক্রি হওয়া সম্পর্কে যদি যবাহকারী ব্যক্তির কোন কথা জানা না থাকে তবে ক্রেতা তার নিকট থেকে কোন ক্ষতিপূরণ উসুল করতে পারবে না (যহীরিয়া)। কোন ব্যক্তি তার একটি বকরী যবাহ করার জন্য কাউকে হুকুম দেওয়ার পর যবাহ এর পূর্বেই সেটি যদি সে অন্য কারো নিকট বিক্রি করে দেয়, তারপর যবাহ এর জন্য আদিষ্ট ব্যক্তি তা যবাহ করে তাহলে ক্রেতা যবাহকারী ব্যক্তির নিকট থেকে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে যবাহকারী ব্যক্তি হুকুমদাতা ব্যক্তির নিকট হতে কোন কিছু পাবে না। যদিও আদিষ্ট ব্যক্তি বকরীটির বিক্রয় হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনবগত থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা : ক্রেতা নিজেই যদি গোলামের হাত কাটে পূর্ণ গোলামের কবজাকারী হয়ে যাবে। তারপর গোলামটি যদি বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় ঐ হাত কর্তনের কারণে অথবা অন্য কোন কারণে মারা যায় এবং তা ক্রেতাকে দখল নিতে বাধা দেয়ার আগে ঘটে তাহলে ক্রেতাকে পূর্ণ বিক্রয়মূল্য পরিশোধ করতে হবে আর যদি ক্রেতাকে দখলে নিতে বাধা দেয়ার পর হাত কর্তনের কারণে মারা যায় তাহলেও ক্রেতাকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অন্য কারণে মারা গেলে ক্রেতা অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করবে। যদি প্রথমে বিক্রেতা গোলামের হাত কাটে তারপর ক্রেতা বিপরীত দিক থেকে তার পা কেটে দেয় তারপর সে উভয় জখম হতে ভাল হয়ে যায় তাহলে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতাকে গোলাম হস্তান্তর করে দেওয়া ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে গোলাম নেওয়া না নেওয়ার ব্যাপারে ক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি প্রথমে গোলামের হাত কেটে দেয় তারপর বিক্রেতা বিপরীত দিক থেকে তার পা কেটে দেয়; এরপর সে উভয় জখম থেকে ভাল হয়ে যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে

ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে সে যদি ইচ্ছা করে তবে তিন-চতুর্থাংশ মূল্য পরিশোধ করে গোলাম নিয়ে নিতে পারবে। আর যদি নিতে না চায় তবে গোলামের ক্ষতি করার কারণে তার উপর ওয়াজিব হবে এর অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করা। ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করেছে কিন্তু এখনো গোলাম কবজা করেনি, এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি তার হাত কেটে দেয় তারপর বিপরীত দিক থেকে বিক্রেতা তার পা কেটে দেয়, তারপর সে উভয় জখম থেকে ভাল হয়ে যায় তাহলে ক্রেতা গোলামের হকদার হবে এবং এ ক্ষেত্রে তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না (মাবসূত)। আর বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে হাত কর্তিত গোলামের যা মূল্য হয় তার অর্ধেক পরিশোধ করা (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি বিক্রেতা প্রথমে গোলামের হাত কেটে থাকে তারপর ক্রেতা তার পা কেটে তাহলে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে গোলাম ক্রেতার জন্য অপরিহার্য হয়ে যাবে। এ অবস্থায় সে বিক্রেতার নিকট থেকে তার প্রদত্ত অর্ধেক মূল্য আদায় করে নিয়ে নিবে (মাবসূত)।

৯. মাসআলা : উপরোক্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ঘা শুকিয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি ঘা না শুকিয়ে গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং উভয় জখমের কারণে গোলাম মারা যায় এবং বিক্রেতা যদি প্রথমে তার হাত কাটে, পরে ক্রেতা তার পা কর্তন করে তারপর বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় ঐ জখমদ্বয়ের কারণে গোলাম মারা যায় এবং গোলামের মূল্য ক্রেতা যদি আদায় না করে থাকে তাহলে ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে পূর্ণ মূল্যের তিন-অষ্টমাংশ পরিশোধ করা। কেননা বিক্রেতা কর্তৃক গোলামের হাত কাটার কারণে গোলামের অর্ধেক মূল্য রহিত হয়ে গেছে। আর ক্রেতা তার পা কর্তন করে বাকী অর্ধেক নষ্ট করে দিয়েছে। এই হিসাবে বুঝা গেছে যে, উভয় ব্যক্তির জখমের কারণে বিক্রিত গোলামের এক-চতুর্থাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই এই এক-চতুর্থাংশ উভয়ের উপর অর্ধাংশ করে ভাগ করে দেওয়া হবে। আর ক্রেতা যদি গোলামের মূল্য আদায় করে দিয়ে থাকে তবে সে বিক্রেতার নিকট হতে অর্ধেক মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। কেননা সে গোলামের অর্ধাংশ নষ্ট করে দিয়েছে। এমনিভাবে সে গোলামের এক-অষ্টমাংশের মূল্যও নিয়ে নিবে। কেননা ক্রেতার কবজা করার পর এক-অষ্টমাংশ বিক্রেতার জখম করার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। যদি এই মাসআলার সুরত এমন হয় যে, ক্রেতা প্রথমে গোলামের হাত কেটেছে তারপর বিক্রেতা কেটেছে এবং ক্রেতা গোলামের মূল্য পরিশোধ করেনি তবে তার উপর গোলামের পূর্ণ মূল্যের আট ভাগের পাঁচ ভাগ ওয়াজিব হবে। আর যদি মূল্য দিয়ে থাকে তবে ক্রেতার উপর পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে এবং বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে তিন-অষ্টমাংশ পরিশোধ করা (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১০. মাসআলা : যদি কেউ এক হাজার দিরহাম মূল্যের বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করে এবং ক্রেতা তার মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই বিক্রেতা তার হাত কেটে ফেলে তারপর ক্রেতা তার অন্য হাত অথবা কর্তিত হাতের দিকের পা কেটে ফেলে এরপর গোলাম এ সব আঘাতের যন্ত্রণায় মারা যায় তাহলে বিক্রেতা কর্তৃক গোলামের হাত কাটার কারণে তার অর্ধেক মূল্য ক্রেতার যিম্মা থেকে রহিত হয়ে যাবে। এরপর দেখতে হবে, ক্রেতা কর্তৃক গোলামের হাত বা পা কাটার কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, যদি চার-পঞ্চমাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তবে

অর্ধেক মূল্যের চার-পঞ্চমাংশ ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে। তারপর যদি বাকী এক-পঞ্চমাংশ উভয়ের জখমের কারণে নষ্ট হয়ে যায় তবে এর অর্ধাংশও ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ ক্রেতার যিম্মায় সম্পূর্ণ মূল্যের দশ ভাগের সাড়ে চার ভাগ ওয়াজিব হবে এবং বিক্রেতার জখমের কারণে দশ ভাগের সাড়ে পাঁচভাগ ক্রেতার যিম্মা হতে রহিত হয়ে যাবে (মাবসূত)। যদি বিক্রেতা প্রথমে গোলামের হাত কাটে তারপর মূল্য পরিশোধের আগে ক্রেতা এবং অপর ব্যক্তি মিলে তার পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয় আর এতে সে মারা যায় তবে ক্রেতার এবং ঐ তৃতীয় ব্যক্তির জখমের কারণে তার (ক্রেতার) যিম্মায় আট ভাগের সোয়া তিন ভাগ মূল্য ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হতে পূর্ণ মূল্যের এক-অষ্টমাংশ এবং এক অষ্টমাংশের দুই-তৃতীয়াংশ ফেরত নিয়ে নিবে। কেননা অর্ধেক গোলাম বিক্রেতার জখমের কারণে নষ্ট হয়েছে। সুতরাং গোলামের অর্ধেক মূল্য প্রথমেই রহিত হয়ে গেছে। আর বাকী অর্ধেক নষ্ট হয়েছে উভয় ব্যক্তির জখমের কারণে। সুতরাং ক্রেতার যিম্মায় এক-চতুর্থাংশ মূল্য সাব্যস্ত হবে। আর এক-চতুর্থাংশ যা বাকী আছে উভয়ের জখমের কারণে নষ্ট হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকের যিম্মায় এর এক-তৃতীয়াংশ মূল্য প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য যে, এই মাসআলার যথাযথ হিসাব বের করার জন্য এমন সংখ্যার প্রয়োজন যাকে চার ভাগে ভাগ করা যায় এবং ঐ চার ভাগের এক ভাগকে দুই ভাগে এবং তিন ভাগে ভাগ করা যায়। আর তা হল চব্বিশ। অর্থাৎ পূর্ণ মূল্যকে চব্বিশ ভাগে ভাগ করা হবে। তারপর ক্রেতা দশ ভাগ আদায় করবে এবং বাকী চৌদ্দ ভাগ রহিত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ক্রেতা ঐ অপর ব্যক্তির নিকট হতে চব্বিশ ভাগের পাঁচ ভাগ ফেরত নিয়ে নিবে। আর ক্রেতার এই মূল্যের মধ্যে যদি কিছু বেশী হয়ে যায় তবে এই অতিরিক্ত পরিমাণ সাদাকা করা হবে না। কেননা এই অতিরিক্ত পরিমাণ তার মালিকানাধীন বস্তু এবং ক্ষতিপূরণের মাল থেকে অর্জিত হয়েছে। যদি বিক্রেতা ও অপর কোন ব্যক্তি মিলে প্রথমে তারা গোলামের হাত কাটে, তারপর ক্রেতা বিপরীত দিক হতে তার পা কেটে দেয় এবং এতে গোলাম মরে যায় তবে ক্রেতার উপর তাকে জখম করার কারণে মূল্যের এক-চতুর্থাংশ ওয়াজিব হবে। আর জখমের ফলে প্রাণ যাওয়ার কারণে অষ্টমাংশের দুই-তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ঐ অপর ব্যক্তির নিকট থেকে হাত কর্তনের কারণে এক-চতুর্থাংশ মূল্য নিয়ে নিবে এবং গোলামের প্রাণ সংহারের কারণে আট ভাগের দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য তার আকিলা (ভাই বেরাদার)-দের উপর ওয়াজিব হবে এবং তিন বছরের মধ্যে তারা তা পরিশোধ করবে। তারপর ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর যা ওয়াজিব হবে তা ক্রেতা পাবে। কেননা আজানবী ব্যক্তির জখমের পর ক্রেতা যখন তার পা কেটেছে তখন সে ঐ ব্যক্তিকে পাকড়াও করার বিষয়টি পসন্দ করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। কাজেই হাত কাটার কারণে সে আজানবী ব্যক্তির নিকট হতে যা প্রাপ্ত হবে তা যদি মূল্যের এক-চতুর্থাংশ হতে বেশী হয় তবে সে ঐ বেশী অংশ সাদাকা করে দিবে। কেননা এই ফায়দা কবজার আগে হাসিল হয়েছে এবং এটি এমন জিনিসের উপর হাসিল হয়েছে যার কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নি। আর গোলামের জীবনের বিনিময়ে যা কিছু গ্রহণ করা হবে তা থেকে সাদাকা করা হবে না। কেননা এটি এমন মুনাফা যা তার যামানতে হাসিল হয়েছে। কারণ হাত কাটার এ কাজ এমন সময় সংঘটিত হয়েছে যখন বিক্রিত বস্তু ক্রেতার যামানতে দাখিল হয়ে গেছে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা : যদি ক্রেতা এবং আজনবী ব্যক্তি একই সময়ে এবং একই সাথে গোলামের হাত কর্তন করে; তারপর বিক্রেতা বিপরীত দিক থেকে তার পা কেটে দেয় আর এতে সে মারা যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে যদি ক্রয়-বিক্রয়কে বহাল রাখে তবে তার যিম্মায় আট অংশ হতে পাঁচ অংশ সম্পূর্ণ এবং এক অংশের এক-তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে এবং মূল্যের আট ভাগের দুই ভাগ সম্পূর্ণ এবং এক ভাগের দুই-তৃতীয়াংশ রহিত হয়ে যাবে যা বিক্রেতার জখম এবং তা ছড়িয়ে পড়ার কারণে ওয়াজিব হয়েছে। তারপর ক্রেতা আজনবী ব্যক্তির নিকট থেকে পূর্ণ মূল্যের আট ভাগের দুই ভাগ এবং এক-অষ্টমাংশের দুই-তৃতীয়াংশ ফেরত নিয়ে নিবে। তবে অতিরিক্ত টাকা-পয়সা তাকে সাদাকা করতে হবে না। ক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেওয়াকে ইখতিয়ার করে তবে জখম ও তা ছড়িয়ে পড়ার কারণে যা ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে এ পরিমাণ পরিশোধ করা তার উপর অপরিহার্য হবে। আর তা হল পূর্ণ মূল্যের দুই-অষ্টমাংশ এবং এক-অষ্টমাংশে দুই-তৃতীয়াংশ। এছাড়া বাকী সব ক্রেতার দায়-দায়িত্ব থেকে রহিত হয়ে যাবে। এহেন অবস্থায় ক্রেতা আজনবী ব্যক্তির নিকট হতে পূর্ণ মূল্যের এক-অষ্টমাংশ এবং অপর এক অষ্টমাংশের দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। এ ক্ষেত্রে যদি (ثمن)-এর তুলনায় (قيمة)-এর পরিমাণ কিছুটা বেশী হয়ে যায় তবে বেশীটুকু সাদাকা করে দিবে (মাবসূত)।

১২. মাসআলা : কোন ব্যক্তি দুই ব্যক্তির নিকট হতে একটি গোলাম খরিদ করল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ করেনি, এমতাবস্থায় দুই বিক্রেতার কোন একজনে যদি গোলামের হাত কেটে দেয়; তারপর অপরজনে বিপরীত দিক থেকে তার পা কেটে দেয়; এরপর ক্রেতা তার একটি চোখ ফোঁড়া করে দেয় এবং বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় এতে সে মারা যায় তাহলে ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে প্রথম হস্ত কর্তনকারী ব্যক্তিকে পূর্ণ মূল্যের এক-অষ্টমাংশ এবং এক-অষ্টমাংশের পাঁচ-ষষ্ঠাংশ পরিশোধ করা। আর ক্রেতা তার নিকট থেকে গোলামের মূল্যের দুই-অষ্টমাংশ এবং এক-অষ্টমাংশের এক-ষষ্ঠাংশ মূল্য নিয়ে নিবে। তবে তার এ দেয় তার আকিলা (সাহায্যকারী আত্মীয়) তিন বছরের মাঝে পরিশোধ করবে। ক্রেতার উপর আরো ওয়াজিব হবে হস্ত কর্তনকারী দ্বিতীয় ব্যক্তিকে গোলামের মূল্যের দুই-অষ্টমাংশ এবং এক-অষ্টমাংশের পাঁচ-ষষ্ঠাংশ পরিশোধ করা। এ পর্যায়ে ক্রেতা দ্বিতীয় ব্যক্তির আকিলা তথা সাহায্যকারী আত্মীয়ের নিকট থেকে এর মূল্যের এক-অষ্টমাংশ এবং এক-অষ্টমাংশের ষষ্ঠাংশ ফেরত নিয়ে নিবে। ক্রেতা যা ফেরত পেয়েছে এর পরিমাণ যদি তার প্রদত্ত মূল্য হতে বেশী হয় তবে তা সাদাকা করে দিবে। কিন্তু জানের বদলায় যা মিলবে তা তার নিজের জন্যও হালাল হবে। আর যদি দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তির নিকট হতে গোলাম খরিদ করে এবং ক্রেতাঘরের একজনে তার হাত কেটে দেয়, তারপর দ্বিতীয়জনে তার পা কেটে দেয় তারপর বিক্রেতা গোলামের এক চোখ ফোঁড়া করে দেয় এবং এ সবেব যন্ত্রণায় সে মারা যায় এ অবস্থায় যদি উভয় ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেয় তবে প্রথম ক্রেতার যিম্মায় ওয়াজিব হবে বিক্রেতাকে গোলামের মূল্যের দুই-অষ্টমাংশ এবং এক অষ্টমাংশের এক-ষষ্ঠাংশ প্রদান করা। আর দ্বিতীয় ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে এক-অষ্টমাংশ এবং এক-অষ্টমাংশের এক-ষষ্ঠাংশ তাকে প্রদান করা। এহেন অবস্থায় বিক্রেতা প্রথম ক্রেতার নিকট থেকে ঐ গোলামের মূল্যের

দুই-অষ্টমাংশ এবং এক-অষ্টমাংশের এক-ষষ্ঠাংশ ফেরত নিয়ে নিবে। আর দ্বিতীয় ক্রেতা হতে গোলামের মূল্যের এক-অষ্টমাংশ উসূল করে নেবে। যদি উভয় ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখে তাদের প্রত্যেকের যিম্মায় গোলামের মূল্যের তিন-অষ্টমাংশ এবং এক-অষ্টমাংশের এক-তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। আর দ্বিতীয় কর্তনকারী প্রথম কর্তনকারীর নিকট থেকে গোলামের মূল্যের দুই-অষ্টমাংশ এবং এক-অষ্টমাংশের এক-ষষ্ঠাংশ ফেরত নিয়ে নিবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি দুটি বকরী ক্রয় করল। ইত্যবসরে সে বকরীগুলো কবজা করার আগে এর একটি অপরটিকে শিং দ্বারা আঘাত করলে একটি বকরীটি মারা গেল। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে; ইচ্ছা করলে সে দ্বিতীয় বকরীটিকে এর মূল্যের বিনিময়ে নিয়ে নিতে পারবে। আর মনে না চাইলে তা নাও নিতে পারবে। এইভাবে একটি গাধা ও কিছু পরিমাণ যব খরিদ করার পর এগুলো কবজা করার আগেই গাধায় যদি ঐ যব খেয়ে ফেলে তাহলে এই অবস্থায় ক্রেতা ইচ্ছা করলে মূল্য দিয়ে গাধাটি নিয়ে নিতে পারবে। কেননা জীবের কর্ম ধর্তব্য নয়। এই হিসাবে যব খেয়ে ফেলার বিষয়টি এমন হল যেন তা আসমানী বালার দ্বারা ধ্বংস হয়েছে। এক ব্যক্তি দুটি গোলাম খরিদ করল এবং সে তাদেরকে কবজা করা পূর্বেই একটি গোলাম অন্য গোলামকে হত্যা করে ফেলল তাহলে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় গোলামটিকে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে নিয়ে নিবে। আর মনে না চাইলে তা ছেড়েও দিতে পারবে। এই ভাবে যদি কেউ কোন গোলাম ও কিছু খাদ্য দ্রব্য খরিদ করে তারপর সে তা কবজা করার আগেই গোলাম ঐ খাদ্য দ্রব্য খেয়ে ফেলে তাহলে এ ক্ষেত্রেও মূল্য হতে কিছুই রহিত হবে না। কেননা মানুষের কর্ম ধর্তব্য হয়ে থাকে। এই হিসাবে প্রথমোক্ত ব্যক্তির কর্মের মাধ্যমে ক্রেতা ঐ মাল কবজাকারী হয়ে গেছে। কাজেই মূল্য রহিত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি দুই গোলামের কোন একজন মারা যায় তবে ক্রেতা ইচ্ছা করলে অন্য জনকে তার মূল্যের সম অংশের বিনিময়ে তাকে নিয়ে নিতে পারবে। কেউ যদি দুটি চতুষ্পদ জন্তু ক্রয় করে এবং সেগুলো কবজা করার আগেই যদি এর একটি মারা যায় তবে ক্রেতা ইচ্ছা করলে অপরটিকে তার মূল্যের সম অংশের বদলে নিয়ে নিতে পারবে। আর মনে না চাইলে তা ছেড়েও দিতে পারবে।

১৪. মাসআলা : জামে গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি একটি দাসী খরিদ করল এরপর সে তাকে কবজা করার পূর্বেই তার একটি বাচ্চা হল। তারপর ঐ দাসী ও তার বাচ্চা এই দু'জনের কোন একজনে অপরজনকে হত্যা করল। এ অবস্থায় ক্রেতা যদি জীবিতজনকে নিতে চায় তবে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে তাকে নিতে হবে। আর ইচ্ছা করলে নাও নিতে পারবে। যদি সে জীবিতজনকে নিয়ে যায় এবং এরপর তার মধ্যে কোন দোষ পায় তবে পূর্ণ মূল্য ফেরত নিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। কোন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট রুটির বিনিময়ে একটি গোলাম বিক্রি করল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তারা তাদের বিনিময় ক্রয় বস্ত্ত কবজা করেনি, ইত্যবসরে গোলাম রুটিটি খেয়ে ফেলল, তাহলে এতে একথা প্রতীয়মান হবে যে, বিক্রেতা তার পূর্ণ মূল্য বুঝে পেয়েছে। কেননা ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় গোলাম অন্যায় করলে বিক্রেতাকেই এর দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণ যবের

বিনিময়ে একটি গাধা বিক্রি করল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা তাদের মালামাল কবজা করেনি, এহেন অবস্থায় গাধায় যদি ঐ যব খেয়ে ফেলে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। এবং বিক্রেতা তার পাওনা পরিপূর্ণভাবে বুঝে পেয়েছে বলে গণ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফাতাওয়ায়ে ওয়াল ওয়ালজিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে দাসী খরিদ করে তার মূল্য পরিশোধ করার আগেই তার সাথে সহবাস করল। তারপর বিক্রেতা মূল্য আদায়ের জন্য দাসীকে নিজের কাছে আটকিয়ে রাখল তারপর বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায়ই দাসী মারা গেল, তাহলে কোন ইমামের মতেই ক্রেতার উপর উকর (عقر) ওয়াজিব হবে না। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (তাতার খানিয়া)।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : পণ্য ও মূল্য হস্তান্তরে ক্রেতা ও বিক্রেতার খরচ বহনের বিবরণ

১. মাসআলা : এ ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, সাধারণ বিক্রয় চুক্তির দাবী হল, চুক্তিকালে বিক্রয় দ্রব্য (معقود عليه) যেখানে থাকবে সেখানেই তা হস্তান্তর করা। চুক্তি স্থলে হস্তান্তর করা জরুরী নয়। এটিই আমাদের ইমামগণের যাহিরী মায়হাব। সুতরাং কেউ যদি শহরে বসে গম খরিদ করে এবং গম থাকে গ্রামে তবে গ্রামেই এই গম হস্তান্তর করা হবে (মুহীত)। কেউ যদি শীষের মধ্যে গম বিক্রি করে তাহলে বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে, শীষ থেকে গম কেটে তা মাড়া দিয়ে, পরিচ্ছন্ন করে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেওয়া এটিই পসন্দনীয় অভিমত (খুলাসা)। তবে ভূমি পাবে বিক্রেতা (আন-নাহরুল ফায়িক)। কেউ যদি 'কয়েল' তথা পরিমাপ করে গম খরিদ করে তবে তা মেপে ক্রেতার পাত্রে ভরে দেওয়া বিক্রেতার দায়িত্বে থাকবে। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (খুলাসা)। কেউ যদি কোন পানিওয়ালা ব্যক্তির নিকট থেকে মটকায় পানি খরিদ করে তবে মটকা থেকে ক্রেতার পাত্রে পানি ভরে দেওয়া পানিওয়ালার দায়িত্বে থাকবে। এ ক্ষেত্রে ওরফ (দেশ রেওয়াজ) ধর্তব্য বিষয় বলে বিবেচিত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা : পরিমাণযোগ্য বস্তু যেমন খেজুর, আঙ্গুর, পিয়াজ, গাজর ইত্যাদি যদি অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা হয় তবে তা তুলে বা কেটে নেওয়া ক্রেতার যিম্মায় থাকবে। বিক্রেতা যদি বাধ্যমুক্ত করে দেয় তবে এতেই ক্রেতার দখল সাব্যস্ত হবে। যদি এ জাতীয় বস্তু পরিমাপ করে বা ওজন করে দেওয়ার শর্ত থাকে তবে সেটা বিক্রেতার দায়িত্ব হবে। কিন্তু বিক্রেতা যদি জানিয়ে দেয় যে, এখানে এই পরিমাণ মাল আছে, এখন ক্রেতা যদি একথা বিশ্বাস করে তবে ওজন করা প্রয়োজন নেই। আর যদি বিশ্বাস না করে তবে সে নিজে মেপে নিবে। তবে সহীহ ও পসন্দনীয় অভিমত হচ্ছে মেপে দেওয়ার দায়িত্ব সর্বাবস্থায় বিক্রেতার (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)। মুনতাকা গ্রন্থে আছে যে, কেউ যদি নৌকায় রাখা কোন গম খরিদ করে তবে নৌকা থেকে গম বের করে আনা ক্রেতার দায়িত্ব। আর তা যদি ঘরের ভেতর থাকে তবে ঘরের দরজা খুলে দেওয়া বিক্রেতার দায়িত্ব এবং মাল বের করে আনা ক্রেতার দায়িত্ব

১. যে যিনায় হুদ (দণ্ড) ওয়াজিব হয় না, এ জাতীয় যিনার পারিশ্রমিকে উকর বলা হয়। যেমন সন্দেহের ভিত্তিতে কারো সাথে সহবাস করা। আর এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ হল, মহরে মিছালের এক-দশমাংশ

এমনভাবে কেউ যদি খলিতে রক্ষিত গম বা কাপড় বিক্রি করে খলি বিক্রি না করে তাহলে খলি খুলে দেওয়ার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর এবং খলি থেকে মালামাল বের করে নেওয়া ক্রেতার দায়িত্ব (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : মালামাল যদি মেপে বা ওজন করে দেওয়ার ভিত্তিতে কিংবা ওণে দেওয়া বা গজ হিসাবে মেপে দেওয়ার ভিত্তিতে বিক্রি করা হয় তাহলে পরিমাণ ও ওজনকারীর পারিশ্রমিক এবং গণনাকারী ও গজ দ্বারা পরিমাণকারী পারিশ্রমিক বিক্রেতাকে বহন করতে হবে (কাফী)। তবে মূল্যদ্রব্য ওজনকারী ব্যক্তির পারিশ্রমিক ক্রেতার উপর বর্তাবে। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (জাওয়াহিরুল আখমাতী)। যদি ক্রেতা দাবী করে যে, তার দেওয়া মূল্যদ্রব্য উৎকৃষ্ট মানের তাহলে মূল্য দ্রব্যের জাল-ভেজাল পরীক্ষাকারীর পারিশ্রমিক বিক্রেতার উপর বর্তাবে। কিন্তু বিগততম বর্ণনা অনুসারে সর্বাবস্থায় এ দায়িত্ব ক্রেতার উপরই থাকবে। এ অভিমতের উপরই ফাতওয়া (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)। এটিই যাহিরী রিওয়ায়েত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যাচাইকারী ব্যক্তির পারিশ্রমিক ক্রেতার উপর হওয়ার এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে। যদি বিক্রেতা এখনো পর্যন্ত এই (ثمن) মূল্য কবজা না করে থাকে। এটিই সহীহ মতামত। বস্তুত সে যদি তা কবজা করে থাকে তবে এ দায়িত্ব বিক্রেতার উপর বর্তাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

৪. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে মাল খরিদ করে যে, তা আমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিবে তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। কেউ যদি গ্রামে রাখা জ্বালানী খরিদ করে এবং খরিদ করার সাথে সাথে এ কথা বলে যে, এগুলো আমার বাড়িতে পৌঁছে দাও, তবে এ কথা শর্ত হিসাবে গণ্য হবে না এবং এতে বেচাকেনা ফাসিদ হবে না (খুলাসা)। যদি কেউ জ্বালানী কাঠের বোঝা খরিদ করে তবে লোক প্রচলন অনুসারে ক্রেতার বাড়িতে তা পৌঁছিয়ে দেওয়া বিক্রেতার দায়িত্ব। “সুলহন নাওয়াযিল” গ্রন্থে ফকীহ মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে সব মালামাল পণ্ড বহনের পিঠে রেখে বিক্রি করা হয়, যেমন জ্বালানী কাঠ, কয়লা ইত্যাদি এগুলো বিক্রি করার পর বিক্রেতা যদি তা ক্রেতার বাড়িতে পৌঁছে দিতে অস্বীকার করে তবে বিক্রেতাকে বাধ্য করা যাবে, তদ্রূপ সওয়ারীর পিঠে রাখা গম খরিদ করা হলেও একই হুকুম হবে। কেউ যদি গমের স্তূপ এই শর্তে খরিদ করে যে, তা আমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিতে হবে, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ বলে গণ্য হবে (আল-ফাতাওয়াস সুগরা)।

৫. মাসআলা : তোশকের ভিতরের পশম খরিদ করার পর বিক্রেতা যদি তা তোশক থেকে খুলে দিতে অস্বীকার করে আর খোলার কাজটি কষ্টকর হয় তাহলে বিক্রেতাকে বাধ্য করা হবে না। কেননা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির কারণে কাউকে কষ্ট দেওয়া যায় না। আর কষ্টকর না হলে তাকে বাধ্য করা হবে। তবে এ হুকুম ঐ পরিমাণের উপর প্রযোজ্য হবে যতটুকু খোলা ক্রেতা জরুরী মনে করে। ক্রেতা যদি সবটুকু নেওয়ার জন্য রাযী হয়ে যায় তবে সবগুলো খুলে দেওয়ার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করা হবে (আল ওয়াকিআতুল ইসামিয়া)। “নিসাব” নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি একটি বাড়ি খরিদ করে বিক্রেতার নিকট

থেকে এ বিষয়ে লিখিত কিছু চাইল এবং বিক্রেতা তা দিতে অস্বীকৃতি জানাল, তাহলে এ ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা যাবে না। ক্রেতা যদি নিজের মাল থেকে তা লিখিয়ে দেয় এবং বিক্রেতাকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য রাখার জন্য নির্দেশ দেয় এবং বিক্রেতা এ বিষয়ে নিজের অস্বীকৃতি ব্যক্ত করে তবে বিক্রেতাকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, তুমি দুজনকে সাক্ষী হিসাবে নির্ধারণ কর। এটিই পসন্দনীয় অভিমত। কেননা ক্রেতা সাক্ষীর মুখাপেক্ষী। তবে এ হুকুম তখনই দেওয়া হবে-যদি ক্রেতা বিক্রেতার নিকট দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করে যাদেরকে বিক্রেতা সাক্ষী হিসাবে মনোনীত করবে। বিক্রেতাকে সাক্ষীদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার জন্য কষ্ট দেওয়া হবে না (মুযম্মারাত)। বিক্রেতা যদি বিষয়টিকে অস্বীকার করে তবে ক্রেতা এই বিষয়টি বিচারকের আদালতে উপস্থাপিত করবে। যদি বিচারকের সামনে বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তবে বিচারক একটি দলীল সম্পাদন করিয়ে এ ব্যাপারে দুজনকে সাক্ষী রাখবে, (মুহীত)। এমনিভাবে ক্রেতার নিকট পুরাতন কোন দলীল হস্তান্তর করার জন্যও বিক্রেতাকে বাধ্য করা যাবে না (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)। তবে বিক্রেতাকে হুকুম করা হবে যেন সে পুরাতন কোন দলীল উপস্থাপিত করে যাতে ক্রেতা এর থেকে এক কপি নকল সম্পাদন করিয়ে নিতে পারে এটি ক্রেতার হাতে থাকবে এবং পুরাতন মূল দলীলটি থাকবে বিক্রেতার হাতে (আল-ফাতাওয়াস সুগরা)। পুরাতন দলীল থেকে নকল কপি সম্পাদন করার জন্য বিক্রেতা যদি পুরাতন মূল দলীলটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করতে অসম্মতি প্রকাশ করে তবে দলীল হস্তান্তরের ব্যাপারে তার প্রতি চাপ প্রয়োগ করা যাবে কিনা এ জাতীয় বিষয়ে ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেছেন এ ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিক্রয় চুক্তিতে যা কিছু পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় কিংবা হয় না

[এ পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ : বাড়ি-ঘর বিক্রয়ের মধ্যে যা কিছু পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে

১. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি এমন একটি মনযিল খরিদ করে যার উপরোক্ত আরেকটি মনযিল আছে তবে নীচের মনযিলের মালিক উপরের মনযিলের মালিক হবে না। কিন্তু যদি সে ঐ মনযিল ক্রয়কালীন সময় একথা বলে যে, আমি এ মনযিলটি তার সমুদয় হকসহ ক্রয় করলাম, অথবা যদি বলে, আমি এ মনযিলটি এর সমুদয় লাভালাভসহ ক্রয় করলাম অথবা যদি বলে, আমি এই মনযিলটি এর সাথে সংশ্লিষ্ট কম-বেশী সব জিনিসসহ ক্রয় করলাম তাহলে উপরের মনযিলটিও এর মধ্যে शामिल হয়ে যাবে। বাড়ি বিক্রি করা হলে নীচের তলার ন্যায় এর মধ্যে উপরের তলাও शामिल হয়ে যাবে। যদিও ক্রয় কালীন সময়ে ক্রেতা 'আমি এই বাড়িটি এর সমুদয় হকসহ ক্রয় করলাম' বা এ জাতীয় কোন কথা না বলে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : কেউ যদি কোন (بيت) বা ঘর খরিদ করে তবে স্পষ্ট উল্লেখ ছাড়া বালাখানা তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদিও সমুদয় হক সহ তা খরিদ করা হয় (মুহীত : আস-সারখসী)। ঐ ঘরের উপরে কোন বালাখানা না থাকলে ক্রেতা বালাখানা তৈরি করতে পারবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। মাশাইখে কিরাম বলেছেন, এই বিষয়ে হুকুম হচ্ছে কূফা শহরের ওরফ বা প্রচলন অনুসারে। আমাদের দেশের রেওয়াজ অনুযায়ী ঘর খরিদ করলে বালাখানাও অন্তর্ভুক্ত হবে চাই তা (بيت) ঘর (منزل) বা মনজিল অথবা (دار) বাড়ি বা নামেই বিক্রি করুক। কেননা আমাদের পরিভাষায় এগুলোর প্রত্যেকটিকেই (صانه) (বাসস্থান) বলা হয় চাই তা ছোট হোক বা বড় হোক। কিন্তু বাদশাহর বাড়ির বিষয়টি ভিন্ন, কেননা সেটা শাহীখানা বা রাজবাড়ি বলা হয় (কাফী)। বাড়ি বিক্রয়ে বাড়ির কিনারা ও বহির্ভাগ অন্তর্ভুক্ত হবে (আল ইয়ানাবি)। রাস্তার উপর নির্মিত ছাউনি-যার এক প্রান্ত এক বাড়ির উপর এবং অপর প্রান্ত অন্য বাড়ির উপর অথবা যা বাড়ির বহির্ভাগ বিদ্যমান স্তম্ভের উপর নির্মিত হয়েছে, এ জাতীয় ছাউনি

১. দার (دار) অর্থ বাড়ি, মনযিল এবং বায়ত ও এর মধ্যে शामिल। প্রকৃতপক্ষে মনযিল বলা হয় এমন অবতরণ স্থলকে যেখানে কয়েকটি (بيت) থাকে। আর (بيت) এমন ইমারতকে বলা হয় যাতে চার দেয়াল ছাদ এবং দরজা থাকে। এটি আরব দেশীয় পরিভাষা।

বাড়ি বিক্রির চুক্তিতে আনুষঙ্গিকভাবে দাখিল হবে না। কিন্তু যদি ক্রয়কালীন সময়ে সমুদয় হক সহ আমি এটি খরিদ করলাম বলা হয় তবে তা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে শামিল হবে। এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি এই ছাউনির রাস্তা এই বাড়ির দিক দিয়ে হয় তবে এই ছাউনি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে আনুষঙ্গিকভাবে দাখিল হয়ে যাবে। যদিও চুক্তিকালীন সময়ে 'এর সমুদয় হকসহ ক্রয় করলাম' কথাটি না বলা হয়। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ছাউনির রাস্তা যদি ঐ বাড়ির দিকে থাকে তবে এর সমুদয় হক ও এর সমুদয় লাভালাভসহ খরিদ করার কথা উল্লেখ থাকার শর্তে এটি ক্রয় চুক্তিতে দাখিল হবে। আর যদি ছাউনির রাস্তা বাড়ির দিকে না থাকে তবে সমুদয় হক এবং 'সমুদয় লাভালাভসহ ক্রয় করলাম' বলা সত্ত্বেও তা ক্রয়-চুক্তিতে দাখিল হবে না (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : বাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে ভবনের কথা উল্লেখ না করা সত্ত্বেও তা অন্তর্ভুক্ত হবে (হিদায়া)। বাড়ির গুণ একটি ঘর ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাস্তা এবং পানির নালা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়া শামিল হবে না। অবশ্য 'যদি এর সমুদয় হক ও সুবিধাসহ খরিদ করলাম' বলা হয় তবে এগুলোও অন্তর্ভুক্ত হবে। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (আল ফাতাওয়াস সুগরা)। কেউ যদি কোন বাড়ির একটি মনজিল অথবা একটি মাসকান (বাসস্থান) খরিদ করে তবে ক্রেতা ঐ মনযিল বা মাসকানে যাওয়ার জন্য এই বাড়ির মধ্যে কোন রাস্তা পাবে না। কিন্তু ক্রেতা যদি এই মনযিলের বা মাসকানের সমুদয় লাভালাভ সহ বা সব কিছু সহ চাই তা কম হোক বা বেশী হোক খরিদ করে তবে ক্রেতা এ জাতীয় রাস্তার হকদার হবে। পানির নালার হকুমও অনুরূপই (ফতহুল কাদীর)। কোন ব্যক্তি একটি বাড়ি খরিদ করল তবে এর খাস রাস্তা উল্লেখ করা ব্যতীত ঐ বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হবে না। যদি ক্রেতা বিক্রয়ের মধ্যে সমুদয় হক ও লাভালাভসহ বিক্রি করে অথবা যদি সে বিক্রয়ের সময় বলে, এই বাড়িটি আমি বিক্রি করলাম ছোট, বড় সব জিনিসসহ চাই তা বাড়ির ভিতরে হোক বা বাইরে হোক তাহলে ক্রেতা এই খাস রাস্তার হকদার হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা : রাস্তা তিন প্রকার (১) বড় রাস্তার সাথে গিয়ে মিলিত রাস্তা (২) গলি পথের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়া রাস্তা যে গলি পথ সামনে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। (৩) রাস্তা যা কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন ব্যক্তিগত রাস্তা। ব্যক্তির মালিকানাধীন ব্যক্তিগত রাস্তার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলে অথবা 'এ বাড়িটি এর সমুদয় হক ও সুবিধাসহ ক্রয় করলাম' না বললে তা চুক্তিভুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে বাকী দুই রাস্তার কথা চুক্তিতে উল্লেখ না করলেও অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন পানির নালা এবং ব্যক্তি সত্ত্বাধীন এমন জায়গা যেখানে বরফ নিয়ে জমা করা হয় এগুলোও বিক্রয় চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ব্যতিরেকে অথবা 'আমি এই বাড়িটি এর সমুদয় হক ও লাভালাভসহ ক্রয় করলাম না' বললে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হবে না। কিন্তু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হলে এবং আমি এই বাড়িটি এর সমুদয় হক ও লাভালাভ সহ ক্রয় করলাম বলা হলে তা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে শামিল হয়ে যাবে (মুহীত)। পানি সেচের হক এবং পথ চলার হক এর জন্যও মূল্যের একটা অংশ ধার্য করতে হবে।

সুতরাং কেউ যদি চলার পথসহ বাড়ি বিক্রি করে তারপর কোন ব্যক্তি হকের দাবী করে রাস্তা বাদে গুণ ঐ বাড়ি নিয়ে যায় তবে মূল্যকে ভাগ করা হবে। অর্থাৎ যে জায়গা নিয়ে গেছে ঐ জায়গার মূল্য বাদ যাবে। বাকী মূল্য পরিশোধ করতে হবে (কাফী)। যেহেতু ব্যক্তি মালিকানাধীন খাস রাস্তা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে শামিল হয় না, এহেন অবস্থায় ক্রয়কৃত বাড়ি থেকে বড় রাস্তায় যাওয়ার জন্য যদি কোন পথ না থাকে এবং ক্রয়ের সময় ক্রেতা এ বিষয়ে অবগতও না থাকে তবে সে ইচ্ছা করলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করে দিতে পারবে (ওয়াজীয : আল কুরদুরী)। যদি ঘরের মেঝেতে কোন দরজা ফেলে রাখা হয় তবে উল্লেখ ছাড়া তা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না (মুহীত)। যদি ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকা পড়ে থাকা জ্বালানী কাঠ ও ভুসি শর্ত করা ছাড়া তা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটিই সহীহ অভিমত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

৫. মাসআলা : যদি ইমারতের উপর বালাখানা নির্মিত থাকে তবে উপরের তলা ব্যতিরেকে গুণ নীচের তলা বিক্রি করাও জায়েয আছে। কিন্তু বালাখানা নির্মিত না থাকলে নীচের তলা বাদ দিয়ে উপরের তলা বিক্রি করা জায়েয হবে না। ইমারতের উপর বালাখানা নির্মিত থাকা অবস্থায় উপরের তলা বিক্রি করার ক্ষেত্রে যদি এর সমুদয় হক ও সুবিধার কথা উল্লেখ না করা হয় তবে রাস্তা বাড়ি বিক্রির চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। ইমারতের উপর নির্মিত বালাখানা বিক্রি করা হলে নীচের তলার মালিক প্রথম তলার ছাদের হকদার হবে। তবে ক্রেতার এর উপর থাকার অধিকার হাসিল থাকবে। বালাখানা (উপরের তলা) ধসে পড়লে ক্রেতা পূর্বের অনুরূপ বালাখানা তৈরি করতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি নীচের তলা বিক্রি করা হয়; চাই এর উপরে বালাখানা নির্মিত হোক বা তা বিধ্বস্ত হোক উভয় অবস্থাতেই এই বিক্রি জায়েয হবে (শরহত তাহাবী)।

৬. মাসআলা : কেউ যদি রাস্তা বাদ দিয়ে কোন মনযিলের বালাখানা (উপরের তলা) খরিদ করে তবে তা সহীহ হবে (কাফী)। বাড়ির বিক্রি চুক্তিতে যদি 'হকুক' সুবিধাদি ছোট বড় সব কিছু ইত্যাদি (অন্তর্ভুক্তমূলক কথা) উল্লেখ না করে তাহলে এই বাড়ির সমস্ত ঘর ও মনযিল উপর নীচসহ সবই চুক্তিভুক্ত হবে। এমনভাবে এই বাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে যত কিছু আছে; অর্থাৎ রান্নাঘর শৌচাগার ইত্যাদি সব কিছু এর মধ্যে শামিল থাকবে (মুযমারাত)। এইভাবে বাড়ি বিক্রি করা হলে এর মধ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথ-আস্তাবল এবং কুয়া ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। চাই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে এই বাড়ির সমুদয় হক ও লাভালাভের কথা উল্লেখ করা হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে মনযিল বিক্রি করা হলে এগুলোর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ব্যতিরেকে এগুলো চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না। এ হকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বের হওয়ার পথ আস্তাবল ও কুয়া বিক্রিত বাড়ির অভ্যন্তরে থাকে। পক্ষান্তরে যদি এ সব জিনিস বিক্রিত বাড়ি সংলগ্ন অন্য বাড়ির অভ্যন্তরে থাকে তবে এগুলো ঐ বিক্রয় চুক্তির মধ্যে শামিল হবে না (মুহীত)।

৭. মাসআলা : কেউ যদি কোন ঘর বিক্রি করে তবে জেনে রাখবে যে, ঘর এমন ইমারত বা গৃহকে বলা হয় যার মধ্যে ছাদ দেয়াল এবং দরজা আছে। সুতরাং ঘর বিক্রি করা হলে

দেয়াল ছাদ ও দরজা সবই এই বিক্রির মধ্যে शामिल হয়ে যাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। গ্রাম (قرية) এর হুকুমও বাড়ির অনুরূপই সুতরাং যদি গ্রাম বা বাড়ি বিক্রি করা হয় এবং গ্রাম বা বাড়ির আদিনায় কোন দরজা, কাঠ, কাঁচা-পাকা ইট ইত্যাদি পতিত ও রক্ষিত অবস্থায় থাকে তাহলে হক হুকুমের কথা উল্লেখ করা সত্ত্বেও এগুলো ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে शामिल হবে না। এমনিভাবে বাড়ি ক্রয়কালীন সময়ে ক্রেতা যদি বলে, যত কিছু ছোট বড় এর মধ্যে আছে সবসহ আমি এই বাড়ি ক্রয় করলাম তথাপিও এগুলো বাড়ি ক্রয়-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক ব্যক্তি কোন একটি বাড়ি বিক্রি করল। পূর্বে ঐ বাড়ি থেকে বের হওয়ার একটি রাস্তা ছিল, কিন্তু বাড়ির মালিক সে রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে নতুন একটি রাস্তা তৈরি করেছে। এহেন অবস্থায় বাড়ির মালিক যদি হক হুকুমসহ ঐ বাড়িটি বিক্রি করে থাকে তবে এই নতুন রাস্তায় ক্রেতার জন্য অধিকার থাকবে না (মুহীত : আস-সারাকসী)। জনৈক ব্যক্তি কোন এক মনযিলের একটি নির্দিষ্ট ঘর এর হক হুকুম সহ সীমানা নির্ধারণ করত : বিক্রি করার পর ক্রেতা যদি ঐ মনযিলে প্রবেশ করতে চায় এবং মনযিলের মালিক তাকে সেখানে প্রবেশ করতে নিষেধ করে এবং বলে যে, গলির দিকে তুমি নিজে কোনা খুলে নাও তাহলে দেখতে হবে, বিক্রয়কালীন সময়ে বিক্রেতা এই গৃহের জন্য নির্দিষ্ট কোনা পথের কথা উল্লেখ করেছিল কি না? যদি উল্লেখ করে থাকে, তবে তার নিষেধ করার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি উল্লেখ না করে থাকে তবুও কোন কোন ফকীহ এর মতে এ অবস্থায়ও তার নিষেধ করার ইখতিয়ার থাকবে না। এটিই সহীহ অভিমত (যহীরিয়া)।

৮. মাসআলা : এক মহিলার দুটি হজরা আছে। প্রথম হজরার শৌচাগার দ্বিতীয় হজরার মধ্যে এবং শৌচাগারের দরজা দ্বিতীয় হজরার মধ্যে এ অবস্থায় মহিলা দ্বিতীয় হজরাটি বিক্রি করে, তারপরে প্রথম হজরাটি বিক্রি করে (যাতে শৌচাগারের দরজা আছে কিন্তু শৌচাগার নেই) আর ঐ বিক্রেতা মহিলা যদি উভয় চুক্তির সপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দলীল দেয় তাহলে এর সমাধান কি হবে, এ বিষয়ে আবু বকর বলখী (র) বলেন যে, যদি প্রথম দলীলে এ কথা লেখা থাকে যে, ক্রেতা এই হজরাটি এর উপর নীচসহ খরিদ করেছে। কিন্তু একথা লেখা হয় নিয়ে এতে ঐ শৌচাগার বাদ যার দরজা অন্য হজরাতে আছে তাহলে প্রথম ক্রেতা শৌচাগারও পাবে আর যদি প্রথম দলীলে "শৌচাগার বাদ" কথাটি স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকে তবে দ্বিতীয় হজরার ক্রেতা এই হজরা থেকে শৌচাগারটি তুলে দিতে পারবে আব্রার ইচ্ছা করলে এর প্রবেশ দ্বারটি বন্ধ করেও দিতে পারবে। উক্ত অবস্থায় অপর হজরার ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে আনুপাতিক হারে এর মূল্য প্রদান করে হজরাটি নিয়ে নিবে অথবা এটি ক্রয় করাই বাদ দিয়ে দিবে যদি বিক্রেতা মহিলা বিক্রয়ের মধ্যে তার অনুকূলে শৌচাগারের শর্ত উল্লেখ করে থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শায়খ আবু বকর (র)-কে প্রশ্ন করা হয়েছে, এক মহিলার দুটি হজরা আছে। আর তার অবস্থা এই যে, প্রথমটির শৌচাগার দ্বিতীয়টির মধ্যে আব্রার যেটির মধ্যে শৌচাগার তাতে কোন দরজা নেই, দরজা আছে অন্যটিতে। এমতাবস্থায় সে মহিলা যদি ঐ হজরাটি বিক্রি করে দেয়-যাতে শৌচাগারের দরজা রয়েছে, এরপর অন্যটি বিক্রি করে এবং উভয় চুক্তির জন্য আলাদা দলীল লিখে দেয় তাহলে এর ফায়সালা কি হবে; এ প্রশ্নের জবাবে শায়খ আবু বকর (র) বললেন, দলীলে মহিলা যদি এ কথা লিখে দিয়ে থাকে যে, ক্রেতা এ

হজরাটি তার থেকে ক্রয় করেছে, এর উপর নীচ সহ এবং শৌচাগার ব্যতীত কথাটির উল্লেখ না থাকে তাহলে প্রথম দলীলের ক্রেতা ঐ শৌচাগারের হকদার হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রথম দলীলে "শৌচাগার ব্যতীত" কথাটি স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ থাকে তবে অপর হজরার ক্রেতা তার হজরা থেকে শৌচাগারটি উঠিয়ে দিতে পারবে; আব্রার ইচ্ছা করলে এর পথ বন্ধ করে দিতে পারবে। এহেন অবস্থায় অপর ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে শৌচাগার ব্যতীত হজরাটি পূর্ণ মূল্য হতে এর হিস্যার সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে তা নিয়ে নিবে। কিংবা চুক্তি পরিত্যাগ করবে। যদি বিক্রেতা মহিলা বিক্রয় চুক্তিতে তার অনুকূলে শৌচাগারের উল্লেখ করে থাকে (তাতার খানিয়া-হাবী গ্রন্থের সূত্রে)।

৯. মাসআলা : বাড়ির বহু ঘর থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘর তার সুবিধাদিসহ বিক্রি করা হলো। এরপর বিক্রেতা বাড়ির সদর দরজা তৈরি করতে চায় কিন্তু ক্রেতা তাতে বাধা দেয় তবে বাড়ির মালিক তা করতে পারবে না। তদ্রূপ যদি ঐ বাড়ির কতিপয় ঘর তার সমুদয় হক ও সুবিধাসহ বিক্রি করা হয় তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি বিক্রিত বাড়ির মধ্যে বিক্রেতার কোন নালা বা তার অন্য বাড়ির কোন পথ থাকে এবং এ বাড়ি সে এর সমুদয় হকসহ খরিদ করে থাকে তাহলে ক্রেতাই এ সবার মালিক হবে। এবং সে বিক্রেতাকে এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে বারণ করতে পারবে। এমনিভাবে যদি বিক্রিত বাড়ির দেয়ালের উপর বিক্রেতার কোন কাঠ থাকে তবে ক্রেতা তাকে এটি তুলে নেওয়ার জন্য হুকুম দিতে পারবে। অনুরূপভাবে যদি বিক্রিত বাড়ির নীচে কোন ভূগর্ভস্থ ঘর থাকে তবে ক্রেতাই এর হকদার হবে। তবে বিক্রেতা যদি এটি বাদ দিয়ে বিক্রি করে তাহলে এর হুকুম ভিন্ন হবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি বলে যে, বিক্রেতা এগুলোকে বাদ দেয়নি তাহলে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্যম্ভাবী হক অথবা ইজারার ভিত্তিতে কোন আজনবী ব্যক্তি যদি রাস্তা ধরিয়ান বা ভূগর্ভস্থ এ সব জিনিসের মালিক হয় তবে এটি দোষ হিসাবে গণ্য হবে। কেননা এহেন অবস্থায় ক্রেতা তাকে এগুলো ব্যবহারে বারণ করতে পারবে না। তাই ক্রেতা এই বেচাকেনা প্রত্যাখ্যান করার ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু আরিয়তের ভিত্তিতে এগুলো আজনবীর ব্যবহারে থাকা এটি দোষ হিসাবে গণ্য হবে না এবং এ অবস্থায় ক্রেতার কোন ইখতিয়ারও হাসিল হবে না। কেননা এটি অবশ্যম্ভাবী কোন বিষয় নয়। যদি বিক্রেতা বলে, আমি এটিকে বাদ দিয়ে বিক্রি করেছি তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (তাতার খানিয়া)।

১০. মাসআলা : যদি কেউ বাগানওয়ালা বাড়ি খরিদ করে তাহলে এই বাগানও উক্ত বিক্রিতে शामिल হয়ে যাবে। চাই তা ছোট হোক বা বড় হোক। আর যদি ঐ বাগান, বাড়ির বহির্ভাগে হয় তবে शामिल হবে না। যদিও ঐ বাগানের দরজা বাড়ির ভেতর দিয়ে থাকে। আবু সুলায়মান (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন কেউ যদি একটি বাড়ি বিক্রি করে যাতে অপর এক ব্যক্তির একটি পানির নালা আছে। আর নালার মালিক বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে সম্মত থাকে তবে ফকীহগণের মতে যদি নালার মালিক জমিসহ এর মালিক হয় তবে আনুপাতিকহারে সেও এর মূল্য পাবে। আর যদি সে ভূমির মালিক না হয়, শুধুমাত্র পানি বাহিরে নেওয়ার অধিকার তার থাকে তাহলে বিক্রিত বাড়ির মূল্য হতে কোন কিছুই সে পাবে না। সর্বোপরি এ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সে রাযী হলে তার হক বাতিল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : আল-উয়ুন কিতাবে আছে, যদি কোন ব্যক্তি এমন বাড়ি বিক্রি করে যার মধ্যে কোন ইমারত বা গৃহ নেই, বরং এতে পানির কূপ আছে-তাতে আছে কিছু পাকা ইট এবং কূপের সাথে সংশ্লিষ্ট কূপের কিছু প্রয়োজনীয় আসবাব-সামগ্রী তবে তা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। নাওয়াযিল গ্রন্থে আছে, কেউ যদি এমন বাড়ি বিক্রি করে যাতে পানির কূপ আছে এবং ঐ কূপে আছে চরখা, বালতি এবং পানি উঠাবার রশি, এ অবস্থায় দেখতে হবে যদি বাড়ি বিক্রেতা বাড়িটি এর হক-হকুমসহ বিক্রি করে তবে এই সমস্তও বাড়ি বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। কেননা এগুলো বাড়ির হক-হকুমের মধ্যে শামিল। আর বিক্রেতা যদি বিক্রয় চুক্তিতে হক-হকুমের কথা উল্লেখ না করে তবে এগুলো বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হবে না। তবে চরখা সর্বাবস্থায়ই বিক্রয় চুক্তির মধ্যে শামিল থাকবে। কেননা চরখার বিষয়টি কূপের সাথেই লাগান ও সংশ্লিষ্ট। এ পর্যায়ে মূলনীতি হল, বাড়ির মধ্যে যে সব ইমারত বা ঘর দুয়ার থাকে অথবা যে সব জিনিস ইমারত বা ঘর-দুয়ারের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে, বাড়ি বিক্রির সময় এগুলোর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও তা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর যে সব জিনিস ইমারত কিংবা ঘর-দুয়ারের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, বাড়ি বিক্রয়ের সময় এগুলোর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলে তা ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিন্তু যে সব জিনিসের ব্যাপারে ওরফ এভাবে জারী আছে যে, এগুলোর ব্যাপারে বিক্রেতা কোনরূপ কার্পণ্য করে না এবং এগুলো নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ক্রেতাকে সে বাধাও দেয় না তাহলে এগুলোও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যদিও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে এগুলোর কথা উল্লেখ না করা হয়। এ কারণেই আমরা যদি বলি যে, খিলির কথা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ না করলে তা এর মধ্যে শামিল হবে না। কেননা এটিও ইমারতের সাথে সংশ্লিষ্ট (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা : দোকান, বাড়ি-ঘর বিক্রি করার ক্ষেত্রে তানা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদিও তানাটি ক্রয়-বিক্রয়কালে ঐ গৃহের দরজায় লাগানো থাকে। চাই চুক্তিকালে এর হক এবং সুবিধার কথা উল্লেখ করা হোক বা না হোক। দরজার সঙ্গে যুক্ত তানার চাবি সূক্ষ্ম ক্রিয়াসের দৃষ্টিতে বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তবে স্বতন্ত্র তানার চাবি ক্রয় বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না (মুহীত)। বাড়ি, ঘর বিক্রির চুক্তিতে সিঁড়ির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে ফকীহগণ বলেন, সিঁড়ি যদি ঘরের সাথে সংযুক্ত থাকে তবে তা অন্তর্ভুক্ত হবে। সংযুক্ত না থাকার ফকীহদের মতভেদ রয়েছে, তবে অন্তর্ভুক্ত না হওয়াই হলো সহীহ মত (যহীরিয়া)। তজাসমূহের হকুমত সিঁড়ি অনুরূপ (মুহীত)। বাড়ি বিক্রি করার ক্ষেত্রে (اجار) সুতরাং বিক্রি চুক্তির মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। চাই তা বাঁশের হোক বা ইটের হোক। কেননা এটিও ইমারত বা গৃহের সাথে সংযুক্ত থাকে। আভিধানিক অর্থে ছাদ (اجار)-কে বলা হয়। তবে এখানে (اجار) থেকে উদ্দেশ্য হল, ছাদের উপর তৈরি পার্শ্ব দেয়াল। গৃহ বিক্রি করা হলে (اجار) এর মধ্যে দাখিল হবে না; যেমন গৃহ বিক্রি করা হলে উপরের তলা এর মধ্যে দাখিল হয় না (যহীরিয়া)। বিক্রয়কৃত বাড়িতে যদি উনান থাকে এবং তা যদি বাড়ির সাথে সংযুক্ত থাকে তবে তা বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হবে। সংযুক্ত না হলে অন্তর্ভুক্ত হবে না (তাতার খানিয়া খানিয়া এর সূত্রে)। উয়ুন গ্রন্থে আছে, কেউ যদি এমন বাড়ি খরিদ করে যাতে উট চালিত

পেষণ যন্ত্র রয়েছে এবং ক্রেতা যদি এ বাড়িটি এর হক ও সুবিধাসহ খরিদ করে থাকে তবে ক্রেতা উট চালিত পেষণ যন্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট আসবাবের হকদার হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি হক এবং সুবিধাদি সহ জমি বিক্রি করে এবং সে জমিতে পানি-চরকা থাকে তাহলে ক্রেতা সেটার হকদার হবে। এমনিভাবে জমিতে বিদ্যমান চরকার হকদারও ক্রেতা হবে। কিন্তু যদি উক্ত জমিতে চামড়ার বড় ধরনের কোন বালতি থাকে (যা পানি তোলার কাজে ব্যবহৃত হত) তবে এর হকদার হবে বিক্রেতা। এমনিভাবে এ কাজের জন্য যে কাষ্টদও ব্যবহৃত হয়ে থাকে এর হকদারও বিক্রেতাই হবে (যখীরা)। কেউ যদি জাতাঘর এর হকসমূহসহ বা এর সাথে কম-বেশী যত কিছু সংযুক্ত আছে তা সহ খরিদ করে তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) শরুত (شروط) অধ্যায়ে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, এ অবস্থায় ক্রেতা চাকার উপর এবং নীচে উভয় পাথরের হকদার হবে (যহীরিয়া)।

১৩. মাসআলা : কেউ যদি বারান্দার অর্ধাংশ নিজের শরীক অথবা অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে তাহলে বহিরাংশের অর্ধেক দরজা এর মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে (কিন্যা)। যদি বিক্রিত বাড়িতে কাঠের কোন সিঁড়ি বা তাক থাকে এবং তা যদি ইমারত অভ্যন্তরে থাকে তবে উল্লেখ ছাড়াই তা অন্তর্ভুক্ত হবে। আর সিঁড়ি বা তাক যদি ইমারত অভ্যন্তরে অবিচ্ছেদ্যভাবে না থাকে বরং তা স্থানান্তরযোগ্য হয় তাহলে তার বিক্রেতার মূলত : এর হকুম ইমারত সংযুক্ত সিঁড়ির হকুমেরই অনুরূপ (মুহীত)। ছাদের সাথে সংযুক্ত বাতি এবং শিকলের হকুমও ঠিক অনুরূপই (তাতার খানিয়া আল-ফাতাওয়াল ইতাবিয়ার সূত্রে)। যদি বাড়ির ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এর দরজা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় আর ঐ দরজা যদি গৃহের সাথে সংযুক্ত থাকে তাহলে ক্রেতার হবে। চাই বাড়িটি বিক্রেতার হাতে থাকুক বা ক্রেতার হাতে থাকুক। পক্ষান্তরে দরজাটি সংযুক্ত না হলে এবং গৃহ বিক্রেতার কবজায় থাকলে বিক্রেতার হবে। আর যদি ক্রেতার কবজায় থাকলে তার হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে আছে, কেউ যদি বলে, এই ঘরটি এবং এর দরজার অভ্যন্তরে যত কিছু আছে আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম, তাহলে দরজার অভ্যন্তরে ঘরের ভেতর যে সব সামান রয়েছে ক্রেতা এর মালিক হবে না। অবশ্য যে সকল বস্তু ঘরের হক ও সুবিধার মধ্যে গণ্য তা ক্রেতা পাবে। সুতরাং বিক্রেতার এরূপ কথা ঘরের ঐ সমস্ত মাল সামানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা এর হকসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট। কাজেই তার উক্ত বক্তব্যটি এমনই হল যেন সে বলল, আমি তোমার নিকট এই ঘরটি এর সমুদয় হকসহ বিক্রি করলাম। ফকীহ হিশাম (র) বলেন, একদা আমি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-কে জিজ্ঞেস করেছি; যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এই গৃহ এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে, সবই তোমার নিকট বিক্রি করলাম। তাহলে এর হকুম কি হবে? জবাবে তিনি বলেছেন, এটি ঐ গৃহের যাবতীয় হকসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যদি বলে, على ما فيه من المتاع এতে যেসব সামান আছে তা সহ বিক্রি করলাম তাহলে গৃহের সমস্ত সামানের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হবে (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা : নাওয়াযিল কিতাবে আছে একদা ইমাম আবু বকর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কারো দুটি বাড়ি আছে। এর একটির নীচে ভূগর্ভস্থ ঘর আছে যার রাস্তা বা দরজা

তার অন্য বাড়ির ভেতর দিয়ে এ অবস্থায় বাড়ির মালিক যদি ভূগর্ভস্থ গৃহের দরজাওয়ালা বাড়িটি প্রথমে বিক্রি করে তারপর অন্য বাড়িটি বিক্রি করে তবে তাহলে এর সমাধান কি হবে? জবাবে শায়খ আবু বকর (র) বলেন, এই ভূগর্ভস্থ ঘরটি ঐ ব্যক্তি পাবে যার বাড়ির ভেতর দিয়ে এর রাস্তা বা দরজা রয়েছে। যদি বিক্রেতা প্রথমে ভূগর্ভস্থ ঘরওয়ালা বাড়িটি বিক্রি করে তারপর অন্য বাড়িটি বিক্রি করে তবে যে বাড়ির ভেতর দিয়ে এর রাস্তা বা দরজা ঐ বাড়ির মালিক এর হকদার হবে না। শায়খ আবু নসর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি একটি বাড়ি খরিদ করল যাতে একটি ভূগর্ভস্থ ঘর আছে। এর দরজা ঐ ক্রেতার বাড়ির দিকে এবং এর পেছনে অথবা এর শৌচাগার প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে। তারপর ঐ ক্রেতা ও প্রতিবেশীর মধ্যে বিবাদ শুরু হল যে, ভূগর্ভস্থ ঘরটি কে পাবে? এর সমাধান কি হবে? জবাব শায়খ (র) বললেন, দরজা যার বাড়ির দিকে সেই এই ভূগর্ভস্থ গৃহের মালিক হবে। পেছনটা যার বাড়ির দিকে সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে তার অনুকূলে ফায়সালা দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ক্রেতা যদি যাবতীয় হকসহ বাড়িটি খরিদ করে তবে ক্রেতার ইচ্ছা সে বিক্রেতার নিকট হতে ঐ ভূগর্ভস্থ গৃহের সমপরিমাণ মূল্য ফেরত নিতে পারবে (তাতার খানিয়া)।

১৬. মাসআলা : এমন এক গলিতে কোন ব্যক্তির দুটি বাড়ি আছে-যার সামনের দিক বন্ধ খোলা নয়। বাড়ির মালিক এই দুই বাড়িতে দুই ব্যক্তিকে বসবাস করার জন্য দিয়েছে। তাদের একজনে সেখানে এমনভাবে একটি ছাউনি তৈরি করল যার কড়িকাঠের এক প্রান্ত ঐ বাড়ির দেয়ালের উপর যাতে সে নিজে বসবাস করছে এবং অপর প্রান্ত দ্বিতীয় বাড়ির দেয়ালের উপর। উক্ত ব্যক্তি ঐ ছাউনির দরজা রেখেছে ঐ বাড়ির দিকে যাতে সে নিজে বসবাস করছে। বাড়ির মালিকও এ কথা জানে। ইত্যবসরে ছাউনি নির্মাণকারী ব্যক্তি বাড়ির মালিকের নিকট তার বসবাসের বাড়িটি হক ও সুবিধাদিসহ খরিদ করল। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তিও তার বাগানের বাড়িটি মালিক থেকে একইভাবে খরিদ করে নিল। তারপর উভয় ক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং দ্বিতীয় ক্রেতা তার বাড়ির দেয়ালের উপর থেকে ছাউনির কড়িকাঠটি তুলে দেওয়ার ইচ্ছা করে তাহলে সে তা করতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ কোন প্রাচীর খরিদ করে তবে এই প্রাচীরঘেরা এলাকায় যে জমি থাকবে তাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ মাসআলাটি এভাবেই মতভেদ ছাড়া তুহফানামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু মুহীত কিতাবে উক্ত অভিমতটিকে ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম হাসান ইবন যিয়াদ (র)-এর অভিমত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাতে এও বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জমি উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে शामिल হবে না। কিন্তু কোন কোন ফকীহ বলেন ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর যাহিরী মতানুসারে ফাউণ্ডেশন সংলগ্ন ভূমি এই ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)। কোন ব্যক্তি একটি বাড়ি বা দোকান খরিদ করল। ইত্যবসরে এর প্রাচীর ধসে পড়ল এবং এতে কিছু সীসা, পিতল, কাঠ পাওয়া গেল। তাহলে দেখতে হবে যদি এগুলো ইমারত ও প্রাচীরের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং এগুলোর উপরই ঐ ইমারত ও প্রাচীরের ভিত্তি স্থাপিত হয়ে

থাকে তবে তা ক্রেতার স্বত্ব বলে গণ্য হবে। আর যদি এগুলো এমনই রাখা হয়ে থাকে তবে তা বিক্রেতার স্বত্ব বলে গণ্য হবে (মুহীত)।

১৮. মাসআলা : ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ দোকান ঘর বিক্রি করে তবে এর তজ্জা বিক্রয়ের মধ্যে शामिल হয়ে যাবে। চাই বিক্রেতা দোকান গৃহের হক হুকুমসহ তা বিক্রি করুক বা না করুক। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (খুলাসা)। যদি দোকানের উপর কোন ছাউনি থাকে-যেমন বাজারের দোকানগুলোতে করা হয়ে থাকে তাহলে দোকানটি এর হক-হুকুমসহ বিক্রি করা হলে ছাউনি বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এভাবে বিক্রি না করা হলে তা এই বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে না (ওয়াজীয : আল কুরদুরী)। যদি কোন কর্মকার ব্যক্তি তার নিজের দোকান অন্য কারো নিকট বিক্রি করে তবে হাপরও এই বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। যদিও ক্রেতা বিক্রেতা এ পর্যায়ে হক হুকুম এবং লাভাভারের কথা উল্লেখ না করে। কিন্তু স্বর্ণকার তার দোকান বিক্রি করলে সে ক্ষেত্রে হাপর এই বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদিও বিক্রয়কালে হক হুকুমের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কেননা কর্মকারের হাপর তার দোকানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দোকানের সাথেই সংযুক্ত থাকে। কিন্তু স্বর্ণকারের হাপর দোকানের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত থাকে না। উল্লেখ্য যে, কর্মকার যদি দোকান বিক্রি করে তবে ধাতু গরম করার চুন্ধিতে হাওয়া দিবার জন্য চর্ম নির্মিত থলি এর মধ্যে शामिल হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তামা-কাসার ডেক ডেকটি যাতে ছাতুওয়ালাদের রুটি পাকানো হয় অথবা যাতে রঙেরঘদের রঙিন পানি গরম করা হয় অথবা যাতে ধোপীদের কাপড় রাখা হয় এর হকদার হবে বিক্রেতা (আল-মুহীত)। কাপড় ধোয়ার তজ্জা বিক্রয় চুন্ধিতে দাখিল হবে না। যদিও হক-হুকুমের কথা বিক্রয়কালে উল্লেখ করা হয় (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)। ছাতু মাখার পাত্র যদি লোহা বা কাসার হয় তবে তা বিক্রেতার থাকবে। যদিও তা দোকানের ইমারতের সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত থাকে (মুহীত : সারাখসী)। আর যদি তা মৃত্তিকা নির্মিত হয় তবে তা বিক্রয় চুন্ধিতে দাখিল হয়ে যাবে (যখীরা)।

১৯. মাসআলা : ইমারত প্রাচীরে রক্ষিত সিন্দুক ধোপা ও তেলীদের পাত্র এবং যমীনে প্রোথিত মটকা গৃহ বিক্রয় চুন্ধিতে शामिल হবে না। কেননা এগুলো ঘরের জরুরী সামান এবং হক-হুকুমের মধ্যে পরিগণিত হয় না। এ দোকান বিক্রি করার এসব মাসআলার মধ্যে হক-হুকুম এবং লাভাভারের কথা উল্লেখ করা এবং না করা উভয়ই সমান (মুহীত)। হাম্মাম (সাধারণ স্নানাগার) বিক্রির ক্ষেত্রে পানি উঠাবার পাত্র এবং পেয়ালা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হকসমূহের কথা উল্লেখ করলেও হবে না (যহীরিয়া)। এমনভাবে পানি তোলার চরকা এবং বালতিও বিক্রয়ভুক্ত হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। সায়্যিদ আবুল কাসিম (র) বলেছেন, আমাদের ওরফ বা লোক প্রচলন অনুসারে ক্রেতাই এ সবার মালিক বলে গণ্য হবে (মুখতারুল ফাতাওয়া)। হাম্মাম বিক্রি করার ক্ষেত্রে (পানি গরম করার) ডেগ-ডেকটির উল্লেখ না থাকলেও চুন্ধিভুক্ত হবে (মুহীত)। হাবী কিতাবে আছে যে, ইমাম আবু বকর (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, হাম্মাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হাম্মামের চেরাগ বা প্রদীপ অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা? জবাবে তিনি বলেছেন, না তা অন্তর্ভুক্ত হবে না (তাতার খানিয়া)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : জমি এবং [দেয়াল পরিবেষ্টিত] আগুর বাগান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পরোক্ষ অন্তর্ভুক্তির বিবরণ

১. মাসআলা : কেউ যদি যমীন বা আগুরের বাগান বিক্রি করে এবং হকসমূহ ও সুবিধাদি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কম-বেশী সকল বস্তুর কথাটি উল্লেখ না করে তবে যে সব বস্তু এতে সব সময় বিদ্যমান আছে ও থাকবে তা এই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে শামিল হয়ে যাবে। যেমন বৃক্ষের চারা, বৃক্ষ এবং ঘর-দরজা ইত্যাদি (যখীরা)। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, জমি বিক্রয়ের সময় বৃক্ষের কথা উল্লেখ না করলেও তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এক্ষেত্রে তিনি ফলবান বা ফলশূন্য বৃক্ষ এবং ছোট বড় বৃক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। বিশুদ্ধতম মতে উল্লেখ ছাড়াই এগুলো চুক্তিভুক্ত হবে (আল ফাতাওয়াস সুগরা)। চাই এগুলো জ্বালানী বৃক্ষ হোক বা অন্য কোন বৃক্ষ হোক। এটিই সহীহ অভিমত (খুলাসা)। কিন্তু শুকনা গাছ-বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হবে না। কেননা এ জাতীয় গাছ অচিরেই কেটে ফেলা হবে। কাজেই এ জাতীয় গাছ জমিতে রাখা জ্বালানী কাঠের মত বলেই পরিগণিত হবে (ফাতহুল কাদীর)। আমাদের মাশাইখে কিরাম বলেছেন, কেটে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে রোপণ করা গাছ জমির বিক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এ জাতীয় বৃক্ষ যমীনের ফসলাদির অনুরূপ (আস সুগরা)। সুস্থ কিয়ামের দৃষ্টিতে ফল ও ফসল বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না কিন্তু ক্রয়কালে ক্রেতা এর শর্ত করে নিলে তা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে (যখীরা)।

২. মাসআলা : কেউ যদি হক-হকুমের কথা উল্লেখ করত জমি বিক্রি করে তবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী শস্য ও ফল বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি বিক্রেতা একথা বলে যে, আমি এই যমীনটি এর ছোট বড় সব হক-হকুম ও লাভালাভসহ বিক্রি করলাম তাহলেও জমির উৎপন্ন ফসল ও ফল-ফলাদি উক্ত বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে যদি ছোট-বড় সব কিছু সহ বিক্রি করলাম বলে, কিন্তু হক-হকুম ও লাভালাভের কথা না বলে তবে শস্য ও ফল-ফলাদি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)। মুনতাকা এহুও আছে যে, যদি বিক্রেতা বলে **بكل قليل وكثير هو فيها** এতে ছোট বড় যত কিছু আছে সব সহ এটি আমি বিক্রি করলাম তবে ফসল, তরি-তরকারি, ফল-ফুল যা কিছু আছে সবই জমির বিক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে (যখীরা)। গাছ থেকে কর্তন কৃত ফল-ফলাদি কর্তিত শস্য, জ্বালানী কাঠ কাঁচা ইট যা জমির উপর রক্ষিত অবস্থায় আছে এগুলো জমির বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। অবশ্য বিক্রয় চুক্তিতে এগুলোর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলে অন্তর্ভুক্ত থাকবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। কবরওয়ালা কোন জমি বিক্রয় করলে কবর ছাড়া বাকী জমির ক্রয় বিক্রি সহীহ হবে। ফসল কেটে যে স্থানে রাখা হয় তা (مطرح الحصاد) তথা জমির সংশ্লিষ্ট স্থান নয়। কাজেই জমির হক-হকুম এবং লাভালাভের কথা উল্লেখপূর্বক জমি বিক্রি করা হলে এ জাতীয় স্থান এ বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে না (আল-বাহরুর রায়িক)।

৩. মাসআলা : যদি বলে যে, আমি এই জমিটি তোমার নিকট এর হক ও সুবিধাদি সহ বিক্রি করলাম, তাহলে হক ও সুবিধার উল্লেখ না করা অবস্থায় যে সব বস্তু চুক্তিভুক্ত হত না, এখন সেগুলোও চুক্তিভুক্ত হয়ে যাবে। তা হল সেচ, পানির নালা এবং ব্যক্তিগত রাস্তা (আল ইয়ানাবী)। কেউ যদি খেজুর বাগান এর ভূমির রাস্তাসহ খরিদ করে কিন্তু রাস্তার স্থানের কথা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ না করে এবং নির্দিষ্ট কোন দিকে তার নির্দিষ্ট কোন রাস্তাও না থাকে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে এবং ক্রেতাকে কোন দিক থেকে ইচ্ছা এ বাগানে যাতায়াতের রাস্তা নির্দিষ্ট করে নিতে পারবে। কেননা ভূমির অংশগুলোর মাঝে কোন তারতম্য নেই। যদি পার্থক্য থাকে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শাহতুত জাফরান এবং গোলাপের পাতা ফলের অনুরূপ এবং এসবের বৃক্ষসমূহ খুরমা বৃক্ষের অনুরূপ বলে গণ্য হবে (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা : কোন ব্যক্তি এমন একটি জমি বিক্রি করল যাতে কার্পাস তুলা আছে তাহলে এই তুলার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ব্যতীত তা বিক্রয়ভুক্ত হবে না। কেননা তুলাও ফলের মতই। ফকীহদের মতে তুলা গাছও জমির বিক্রয়ভুক্ত হবে না। এটিই সহীহ অভিমত। বেগুন গাছ ও উল্লেখ করা ছাড়া বেগুন ক্ষেত্রের বিক্রয়ভুক্ত হবে না। হাকিম আহমদ নসরকন্দী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (যহীরিয়া)। ঝাউ এবং বেত গাছ জমির বিক্রয়ভুক্ত হচ্ছে। জংলী গাছ সমূহের একই হকুম এমনভাবে যে সব গাছের কাণ্ড আছে সেগুলোর হকুমত অনুরূপই। ইমাম ফযলী (র) বেত গাছের কাণ্ড বা নিম্নাংশকে ফলের সাথে তুলনা করেছেন। চাই তা কাটার যোগ্য হোক বা না হোক। এভাবেই তিনি ফাতওয়া প্রদান করতেন (খুলাসা)। কেউ যদি শাহতুত গাছ খরিদ করে তবে শর্ত না করলে এর পাতাসমূহ বিক্রয়ভুক্ত হবে না (আল-ফাতাওয়াস সুগরা)। রসুন জাতীয় এক প্রকার তরকারী যাকে গন্দনা বলা হয় এ জাতীয় তরকারী যদি কোন জমিতে থাকে এবং সে জমি যদি নিঃশর্তরূপে বিক্রি করা হয় তাহলে এ জাতীয় তরকারির যে পরিমাণ যমীনের উপরিভাগে থাকে তা এই নিঃশর্ত বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যমীনের নীচের অংশ বিশুদ্ধ মতে বিক্রয়ভুক্ত হবে। কেননা এগুলো কয়লা বছর পর্যন্ত যমীনের নীচে বাকী থাকে। কাজেই এর হকুম গাছের হকুমের অনুরূপ বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কাত (এক প্রকার জংলী দানা) এবং রাতাবা যদি যমীনের উপরিভাগে থাকে তবে ক্রয়-বিক্রয়কালে এর কথা উল্লেখ না করলে তা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হবে না, যেমন শস্য ও ফল-ফলাদি এর মধ্যে দাখিল হয় না। এসব গাছ-গাছালির মূল কাণ্ড যা যমীনের নীচে সুপ্ত থাকে এগুলোর ব্যাপারে কোন কোন ফকীহ বলেছেন যে এগুলো ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে দাখিল হবে না। কেননা শেষ সময়কাল সম্পর্কে মোটামুটিভাবে মানুষের জানা আছে। কাজেই এগুলোর হকুম শস্য ও ফসলাদির হকুমের অনুরূপ হবে। আর কেউ কেউ বলেন, এগুলো বিক্রয়কৃত যমীনের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা যমীনের বিভিন্নতাভিত্তিতে এগুলোর শেষ সময় কালের মধ্যেও বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে। তাই এগুলোর হকুম গাছের হকুমের অনুরূপ হবে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে মূলনীতি এটা দাঁড়াল যে, যেসব গাছ-গাছালি কেটে ফেলার একটা সুনির্দিষ্ট সময় আছে এবং যেগুলোর শেষ সময়কাল মোটামুটিভাবে সর্বজন জ্ঞাত এ হকুম ফল-ফলাদির হকুমের অনুরূপ হবে। তাই এ জাতীয়

গাছ-গাছালির কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলে এগুলো বিক্রয়ভুক্ত হবে না। আর যে সব গাছ-গাছালি কর্তন করার কোন সুনির্দিষ্ট সময় নেই এবং যেগুলোর শেষ সময়কাল সর্বজন-জ্ঞাত নয়, এগুলোর হুকুম বৃক্ষের হুকুমের অনুরূপ উল্লেখ না করলেও এগুলো বিক্রয়ভুক্ত হবে। জমি বিক্রয়ের মধ্যে জাফরান শামিল হবে না। এমনভাবে এর মূল কাণ্ডও এতে শামিল হবে না (মুহীত)। যে সব গাছ-গাছালী বাকী থাকার মত নয়, আমি বিক্রি করা হলে এ জাতীয় গাছ-গাছালি এ বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হবে না। যদিও তা জমির সাথে সংযুক্ত থাকে। যেমন বাঁশ জ্বালানি কাঠ ও ঘাস ইত্যাদি (মুহীত : সারাখাসী)। যে সব গাছের কাণ্ড আছে বড় গাছে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত যা কর্তন করা হয় না এ জাতীয় গাছ জমি বিক্রয়ের মধ্যে উল্লেখ করা ছাড়াও বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে সব গাছ এ রকমের নয়, এগুলো জমি বিক্রয়ের মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ব্যতীত এতে শামিল হবে না। কেননা এগুলো ফল-ফলাদির পর্যায়ভুক্ত জিনিস (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি জমিতে বীজ বপন করে এবং চারা গজাবার পূর্বেই ঐ জমি বিক্রি করে দেয় তবে এই বীজ বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হবে না। কেননা গজাবার পূর্বে তা যমীনের تابع অর্থাৎ যমীনের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে গণ্য হয় না। আর যদি ঐ বীজ থেকে চারা গজিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, এখনো তা কোন মূল্যমান বস্তু নয় তাহলে ফকীহ আবুল লাইস (র)-এর মতে এগুলোও জমি বিক্রয় চুক্তির আওতাভুক্ত হবে না। তবে সঠিক মতানুসারে অন্তর্ভুক্ত হবে (যহীরিয়া)। এটিই সহীহ অভিমত (মুহীত : আস-সারখাসী)। ফাতাওয়া যে ফসলীর টীকাতে উল্লেখ আছে যে, জমিতে বীজ বপনের পর এখনো তা থেকে চারা গজিয়ে উঠেনি এ জমি কেউ যদি বিক্রি করে তবে দেখতে হবে, বীজের কি অবস্থা, বীজ যদি মাটিতে মিশে গিয়ে থাকে তবে ক্রেতা এর মালিক হবে। আর যদি জমির সাথে এখনো না মিশে থাকে তবে এই বীজের মালিক বিক্রেতাই হবে। ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ে বীজ মাটির সাথে মিশে নি, এমতাবস্থায় বিক্রেতা তাতে পানি ঢালার পর যদি এর থেকে চারা গজিয়ে উঠে তাহলেও এই চারার মালিক বিক্রেতাই হবে। আর ক্রেতা যা করেছে তা তার নফল কাজ বলে গণ্য হবে (নিহায়া)।

৬. মাসআলা : কেউ যদি জমি বিক্রি করে তবে এ জমিতে খেজুর গাছ এবং অন্যান্য যত গাছ-গাছালি আছে সবই এই বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদিও এর কথা বিক্রয় চুক্তিতে উল্লেখ না করা হয়। যদি বিক্রয়ের সময় ঐ বৃক্ষে ফল থাকে এবং ক্রেতা এই ফল পাবে বলে শর্ত করা হয় তবে সে তার হিস্যা অনুসারে ফল নিয়ে নিবে। যদি জমির মূল্য পাঁচশ' দিরহাম হয়, বৃক্ষের মূল্যও পাঁচশ' দিরহাম হয় এবং খেজুরের মূল্যও পাঁচশ' দিরহাম হয় তাহলে এই মূল্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে। তারপর যদি কবজা করার পূর্বে এই ফল প্রাকৃতিক কোন দুর্ঘোণে নষ্ট হয়ে যায় কিংবা বিক্রেতা তা খেয়ে ফেলে তবে পূর্ণ মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ ক্রেতার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে; সে ইচ্ছা করলে দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য পরিশোধ করে খেজুর গাছসহ ঐ জমি নিয়ে নিতে পারবে। আবার মনে না চাইলে তা বর্জনও করতে পারবে। আমাদের ইমামগণের সমস্ত ইমামই এই অভিমত পোষণ

করেন (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)। উল্লেখ্য যে, মূল্য বন্টনের ক্ষেত্রে ফলের ঐ সময়ের মূল্য ধর্তব্য হবে যে সময় বিক্রেতা ঐ ফল তক্ষণ করেছে (মাবসূত)। যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় গাছে ফল না থাকে বরং গাছে ফল এসেছে ক্রয়-বিক্রয়ের পর কবজার আগে তাহলে ক্রেতা এই ফলের হকদার হবে। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ফলের এই অতিরিক্ততা যমীন এবং বৃক্ষ উভয়ের মধ্যে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তা শুধুমাত্র ফলের মধ্যে গণ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ জমি বৃক্ষ এবং ফল-ফলাদি এগুলোর প্রত্যেকটির মূল্য পাঁচশত দিরহাম করে সর্বমোট পনেরশ' দিরহাম এ অবস্থায় ক্রেতা কবজা করার আগেই বিক্রেতা যদি এর মূল্যসমূহ বেয়ে ফেলে তাহলে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে পূর্ণ মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ ক্রেতার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ অবস্থায় ক্রেতা দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য পরিশোধ করে জমি এবং বৃক্ষ নিয়ে নিবে। এ ক্ষেত্রে তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এ অবস্থায় পূর্ণ মূল্যের এক-চতুর্থাংশ ক্রেতার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। এবং তার ইখতিয়ার থাকবে; ইচ্ছা করলে সে তিন-চতুর্থাংশ মূল্য পরিশোধ করে জমি ও খেজুর বৃক্ষ নিতে পারবে কিংবা চুক্তি পরিত্যাগ করতে পারে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। উপরোক্ত সুরতে যদি বৃক্ষে দুইবার ফল আসে তবে ক্রেতা অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে জমি এবং খেজুর বৃক্ষ নিয়ে নিবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, ক্রেতা এই দুটিকে দুই-তৃতীয়াংশ মূল্যের বিনিময়ে নিয়ে নিতে পারবে। আর যদি উক্ত খেজুর বৃক্ষসমূহে তিনবার ফল আসে তাহলে জমি এবং বৃক্ষ দুই-পঞ্চমাংশ মূল্য নিয়ে নিবে। আর তিন-পঞ্চমাংশ মূল্য তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ক্রেতা জমি এবং বৃক্ষ পাঁচ-অষ্টমাংশ মূল্যের বিনিময়ে নিয়ে নিবে। যদি উক্ত বৃক্ষসমূহে পাঁচবার ফল আসে তাহলে দুই-সপ্তমাংশ মূল্য পরিশোধ করে ক্রেতা ঐ জমি এবং খেজুর বৃক্ষসমূহ নিয়ে নিবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে পূর্ণ মূল্যের বার ভাগের সাত ভাগ পরিশোধ করে ক্রেতা ঐ জমি এবং খেজুর বৃক্ষসমূহ নিতে পারবে (মাবসূত)।

৭. মাসআলা : ফলবান গাছসহ বিক্রিত জমির ফল ফলাদি যদি প্রাকৃতিক দুর্ঘোণে নষ্ট হয়ে যায় তবে এতে মূল্য হতে কিছুই রহিত হবে না। আমাদের ইমামগণের সকলের অভিমত এটিই। আর যদি বৃক্ষ ও জমি প্রত্যেকটির দাম পাঁচশ' টাকা করে উল্লেখ করা হয় তাহলে এই সুরতে সকল ইমামের মতে ফলের এই অতিরিক্ততা বৃক্ষের উপর অতিরিক্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে আমাদের ইমামগণের কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং যদি বিক্রেতা এই ফল খেয়ে ফেলে তবে ক্রেতার উপর থেকে পূর্ণ মূল্যের এক-চতুর্থাংশ রহিত হবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে (মাল জাওহারাতুন ন্যায়ারা)। কেউ যদি বৃক্ষের চারা খরিদ করে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে তা ঐ জমিতেই রেখে দেয় তারপর তা বড় হয়ে শাখা-প্রশাখা পূর্ণ হয় তাহলে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে; সে ইচ্ছা করলে ক্রেতাকে এর মূল্যসহ নিতে বলতে পারে তখন সমগ্রবৃক্ষ ক্রেতা পাবে। আর ক্রেতা যদি বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া ঐ

চারাগাছ বিক্রতার জমিতে রেখে দেয় তারপর তা ফলবান হয় তাহলে ক্রেতা এই ফল সাদাকা করে দিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা : কেউ যদি জমি এবং খেজুর বৃক্ষ খরিদ করে অথচ এ জমিতে পানি সেচ করার মত কোন ব্যবস্থা নেই, কিন্তু ক্রেতা এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাহলে এ জমি নেওয়া না নেওয়ার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার রয়েছে। মুনতাকা গ্রন্থে অনুরূপ অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে (মুহীত)। এক ব্যক্তি পানি সেচের হিস্যা সহ কোন জমি খরিদ করল। ইতিপূর্বে বিক্রতা যে কুয়া থেকে জমিতে পানি সিঞ্চন করত তাতে প্রচুর পানি রয়েছে। এমতাবস্থায় এর হুকুম কি হবে; এ সম্বন্ধে নাওয়াদির গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যে পরিমাণ পানি ঐ বিক্রয়কৃত যমীনের জন্য যথেষ্ট; কাযী। (বিচারক) ক্রেতার জন্য সেই পরিমাণ পানির ফায়সালা দিবেন। কাজেই যমীনের সাথে পানির এই পরিমাণ অংশ বিক্রিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) এক ব্যক্তি এমন একটি জমি খরিদ করল- যার এক পার্শ্বে একটি ছোট নালা রয়েছে। আর ঐ নালা ও যমীনের মাঝখানে রয়েছে আইল বা বাঁধ এ আইলের উপর রয়েছে বহু গাছ-গাছালি। তাহলে আইল এবং আইলের উপরের গাছ-গাছালিও এই বিক্রয়ের মধ্যে शामिल হবে। এটিই যাহিরী রিওয়ায়েত। (যহীরিয়া) কেউ যদি ফলবান কোন খেজুর গাছ বা অন্য কোন গাছ খরিদ করে তবে বিক্রতাই ঐ ফল ফলাদির হকদার হবে। কিন্তু ফলের কথা উল্লেখ করা হলে তা বিক্রয় চুক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে। চাই ঐ গাছগুলোতে কলম করা হোক বা না হোক (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। সহীহ মতে ফল মূল্যবান হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। উভয় অবস্থাতেই এই ফল বিক্রতা পাবে (তাবয়ীন)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি উপড়ে নিয়ে যাওয়ার শর্তে গাছ ক্রয় করে তবে এ জাতীয় ক্রয় বিক্রয়ের বৈধতার ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সহীহ মতে তা জায়েয হবে এবং ক্রেতাকে গাছ উপড়ে নিয়ে যেতে হবে। কেটে নেওয়ার শর্তে গাছ খরিদ করার ক্ষেত্রে কোন কোন ফকীহ বলেন যে, ক্রয়কালে যদি কর্তনের স্থান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় অথবা (বর্ণনা না করা হলেও) কর্তনের স্থানটি যদি লোক প্রচলনে জানা থাকে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না। আবার কোন কোন ফকীহ বলেন যে, উভয় অবস্থাতেই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। এটিই সহীহ অভিমত। এক্ষেত্রে ঐ গাছটির যমীনের উপরে যে অংশ আছে সে অংশটি ক্রেতা কেটে নিতে পারবে। তবে এর যে মূল ও শিকড় যমীনের নীচে আছে ক্রেতা তা কাটতে পারবে না। অবশ্য শর্ত করে নিলে তা তুলে নিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা : জেনে রাখা উচিত যে, বৃক্ষ ক্রয় করার তিন অবস্থা হতে পারে। (১) হয়তো জমি ব্যতীত শুধু গাছ মূলসহ উৎপাটিত করার নিমিত্তে খরিদ করা হবে। এ অবস্থায় ক্রেতাকে গাছটি মূলসহ তুলে নিতে বলা হবে। আর ক্রেতাও তা শিকড় এবং মূলসহ উঠিয়ে নিতে পারবে। কেননা মূল এবং শিকড়ও এই ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে ক্রেতা শিকড়ের শেষ মাথা পর্যন্ত উপড়াতে পারবে না। যতটুকুর ওরফ বা রেওয়াজ রয়েছে, ততটুকুই নিতে

পারবে। কিন্তু যদি মাটির উপর থেকে গাছ কেটে নেওয়ার শর্তে তা বিক্রি করে অথবা যদি জমি খনন করে মূল বা শিকড় তুলে বিক্রতার কোন ক্ষতি ও লোকসান হয় যেমন হতে পারে যে গাছের নিকটেই কোন প্রাচীর বা দেয়াল আছে এবং বৃক্ষের শিকড় ঐ দেয়াল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে তাহলে ক্রেতাকে যমীনের উপরিভাগ থেকে গাছ কেটে নেওয়ার হুকুম করা হবে। এহেন অবস্থায় ঐ গাছ মূলসহ উৎপাটিত করে নেওয়ার বা যমীনের উপরিভাগ থেকে কেটে নেওয়ার পর যদি গোড়া থেকে আরেকটি গাছ গজিয়ে উঠে তবে বিক্রতাই এর হকদার হবে। যদি গাছটির গোড়া থেকে না কেটে উপরের দিক থেকে কাটা হয় এবং এরপর এর ডাল-পালা গজিয়ে উঠে তাহলে ক্রেতা এর হকদার হবে। (২) অথবা ক্রেতা গাছটিকে তৎসংলগ্ন দাঁড়াবার জমিসহ খরিদ করবে। এ অবস্থায় ক্রেতাকে গাছটি তুলে নেওয়ার জন্য হুকুম করা হবে না। যদি সে তা উৎপাটিত করে নেয় তবে তার জন্য জায়েয হবে এ স্থানে আরেকটি চারা রোপণ করা। (৩) অথবা কোন শর্ত ছাড়াই ক্রেতা বৃক্ষ খরিদ করবে। এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ভূমির বিক্রয় চুক্তিতে তা দাখিল হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দাখিল হবে এবং ক্রেতা বৃক্ষটির দাঁড়াবার স্থানসহ এর মালিক বলে গণ্য হবে। সদরুশ শহীদ (র) বলেন, ফাতওয়া এর উপর যে, যমীন বৃক্ষের সাথে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে (মুহীত)। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (আল-বাহরুর রাযিক)। ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কেউ যদি কেটে নেওয়ার শর্তে কোন গাছ খরিদ করে তবে এর নীচের ভূমি এই বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না (আন-নাহরুল ফায়িক)। আর বাকী থাকার শর্তে যদি গাছ খরিদ করা হয় তাহলে জমি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে (আল-বাহরুর রাযিক)। যে অবস্থায় বৃক্ষের নীচের যমীন বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় সে অবস্থায় ক্রেতার উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার সময় গাছ যতখানি প্রশস্ত ও মোটা থাকবে ততখানি জমিই বিক্রয়ের মধ্যে शामिल হবে। সুতরাং যদি বিক্রয়ের পর গাছটি মোটা হয় তবে বিক্রতা গাছটিকে কেটে-ছেটে কমিয়ে দিতে পারবে। গাছের গোড়া, শিকড় ও ডালা যতটুকুন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে সব জায়গা এই বিক্রয় চুক্তির মধ্যে शामिल হবে না। এর উপরই ফাতওয়া (মুহীত)।

১১. মাসআলা : কোন ব্যক্তি শিকড়সহ গাছ খরিদ করল। পরে এ শিকড় থেকে বহু গাছ গজাল। এক্ষেত্রে যদি উদগত গাছগুলো এমন হয় যে, মূল বৃক্ষটি কেটে ফেললে এই গাছগুলো শুকিয়ে যাবে তাহলে এগুলোও বিক্রয়ভুক্ত হবে। অন্যথায় হবে না। কেননা মূল গাছটি কেটে ফেলার পর ঐগুলো শুকিয়ে যাওয়ার দ্বারা একথা প্রতিভাত হয় যে, এই মূল গাছ থেকেই এইগুলো গজিয়ে উঠেছে। কাজেই এগুলোও বিক্রিত গাছের মধ্যে গণ্য হবে (যখীরা)। কেউ যদি আঙ্গুরের বাগান খরিদ করে তবে পেরেকের সাথে বাধা যে সব রশি আছে তা এবং পেরেক সবই বিক্রয়ভুক্ত হবে। তদ্রূপ মাচানের কাঠ-বাঁশ ইত্যাদি যা মাটিতে প্রোথিত আছে এগুলোও বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। বিক্রয় চুক্তিতে এগুলোর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই (কিন্য়া)।

১২. মাসআলা : জমি একজনের গাছ অন্যজনের এ অবস্থায় জমির মালিক দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুমতিক্রমে এক হাজার টাকার বিনিময়ে জমি ও গাছ বিক্রি করে দিল। জমির মূল্য পাঁচশত

টাকা এবং বৃক্ষের মূল্য পাঁচশত টাকা। তাহলে মূল্য উভয়ের মাঝে সমান হারে বন্টন করা হবে। ক্রেতার কবজা করার আগে যদি বৃক্ষসমূহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যায় তবে ক্রেতার ইচ্ছা, এই ক্রয় চুক্তি বর্জন করতে পারবে আবার পূর্ণ মূল্য দিয়ে যমীনটি নিতেও পারবে। কেননা (ভূমির) গুণ হিসাবে এবং (ভূমির) অনুবর্তী হিসাবে এ দুই হিসাবে ক্রেতা বৃক্ষসমূহের মালিক হয়েছে। আর বিক্রেতা পূর্ণ মূল্যেরই হকদার হবে। কেননা বৃক্ষ বিক্রয়ের চুক্তি ভেঙ্গে যাওয়ায় ক্রেতাকে শুধু যমীনই হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্য কিছু নয়। আর মূল্য তো হস্তান্তর কৃত বস্তুর মুকাবিলাই হয়ে থাকে, নষ্ট হয়ে যাওয়া বস্তুর মুকাবিলায় নয়। যদি অর্ধেক খেজুর গাছ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বৃক্ষের মালিক এক-চতুর্থাংশ মূল্য পাবে। আর যমীনের মালিক পাবে পূর্ণ মূল্যের তিন-চতুর্থাংশ। যদি জমিতে বিদ্যমান খেজুর গাছে এই পরিমাণ ফল আসে যে, এর মূল্য হয় পাঁচশত দিরহাম তবে পূর্ণ মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ পাবে খেজুর গাছের মালিক এবং যমীনের মালিক পাবে এক-তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে যমীনের মালিক অর্ধেক পাবে। কেউ যদি জমি এবং বৃক্ষ বিক্রি করে এবং প্রত্যেকটির মূল্য পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করে, আর জমি ও বৃক্ষ একই ব্যক্তির বা দুই ব্যক্তির হয়, আর বৃক্ষগুলো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রয় মূল্যের অর্ধেক রহিত হয়ে যাবে। কেননা বৃক্ষসমূহ এক হিসাবে اصل আসল কিন্তু অন্য হিসাবে তা وصف গুন। সুতরাং এর জন্য নির্দিষ্ট মূল্য উল্লেখ না করলে তা تابع (সংশ্লিষ্ট বস্তু) হিসাবে গণ্য হবে। আর যখন নির্দিষ্টভাবে এর মূল্য সাব্যস্ত করা হবে তখন তা আসল হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং যখন তা নষ্ট হবে তখন এর সম পরিমাণ মূল্য রহিত হয়ে যাবে। যদি খেজুর গাছ সমূহ ধ্বংস না হয় বরং ক্রেতা কর্তৃক হস্তগত হওয়ার পূর্বে তাতে এ পরিমাণ ফল আসে যার মূল্য পাঁচশত দিরহাম। তাহলে আমাদের ইমামগণের সকলের মতানুসারে জমির মূল্য হবে পাঁচশত দিরহাম এবং গাছ ও ফলের মূল্য হবে পাঁচশত দিরহাম (কাফী)।

১৩. মাসআলা : যমীনের উপরে গাছের যে অংশ আছে তা কেটে নেওয়ার জন্য কেউ কিছু গাছ খরিদ করল। অথচ বাস্তব অবস্থা এমন যে, গাছ কাটা হলে জমি এবং গাছের গোড়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে ক্রেতা এই গাছ সমূহ কাটতে পারবেনা। কেননা এতে জমির মালিকের ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা রয়েছে। কাজেই জমির মালিক এই ক্ষয়-ক্ষতি এড়ানোর জন্য ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করে দিতে পারবে। এটিই পসন্দনীয় অভিমত। কেননা মূলতঃই বিক্রেতা বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট সোপর্দ করতে অসমর্থ (মুহীত : আস-সারাখসী)। ফাতাওয়ায়ে আবুল লাইস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মাটির উপরিভাগে গাছের যে অংশ রয়েছে তা কর্তন করার জন্য কোন ব্যক্তি কিছু গাছ খরিদ করেছে। কিন্তু এখনো সে তা কর্তন করেনি। এমনিভাবে কিছু দিন কেটে যায় এবং গ্রীষ্মের মৌসুম চলে আসে। এ সময় ক্রেতা যদি গাছগুলো কেটে নেওয়ার ইচ্ছা করে এতে যদি জমি এবং গাছের গোড়ার জন্য ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা না থাকে তবে ক্রেতা তা কেটে নিতে পারবে। কেননা এটি তার মালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রে তাসাররুফ তথা হস্তক্ষেপ। আর এতে যদি জমি ও বৃক্ষ মূল্যের কোন

ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে জমির মালিক ও বৃক্ষ মূল্যের ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিহত করার লক্ষে ক্রেতা এই বৃক্ষ সমূহ কর্তন করতে পারবেনা। উপরোক্ত অবস্থা সমূহে ক্রেতার জন্য যেহেতু গাছ কাটার অনুমতি নেই; তাই সে কি করবে। এ বিষয়ে মাশাইখে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এ অবস্থায় জমির মালিক বৃক্ষ সমূহের মূল্য ক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দিবে এবং সে নিজে পূর্ববৎ এর মালিক হয়ে যাবে। তবে মূল্য কি হিসাবে ফেরত দিবে; কর্তিত বৃক্ষের মূল্য হিসাবে মূল্য ফেরত দিবে; না কি কর্তিত বৃক্ষের মূল্য হিসাবে মূল্য ফেরত দিবে; এ ব্যাপারেও ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মতে অকর্তিত বৃক্ষের মূল্য হিসাব করে সে হিসাবে এর মূল্য ফেরত দিবে। এটিই সहीহ অভিমত। কিন্তু কোন কোন ফকীহ বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে বৃক্ষের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। এবং ক্রেতা-বিক্রেতাকে বৃক্ষের মূল্য বাবত যে টাকা প্রদান করেছে সে এ টাকা ক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দিবে। ফকীহ আবু জাফর (র) এভাবেই ফাতওয়া দিতেন। সদরুশ শহীদ (র) স্বীয় ওয়াকিআত গ্রন্থে এই অভিমতটিকে গ্রহণ করেছেন (মুযমারাত)।

১৪। মাসআলা : যদি কারো জমিতে অন্য কারো গাছ থাকে এবং জমির মালিক গাছের মালিককে বলে, এগুলোকে আমার জ্বালানী কাঠের জন্য আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তারপর উভয়ে কয়েকজন অভিজ্ঞ লোকের ব্যাপারে একমত হল যেন তারা গাছ দেখে লাকড়ীর পরিমাণ আন্দাজ করে বলে দেয় যে কত আঁটি লাকড়ী হতে পারে। তারপর ঐ লোকেরা একমত হয়ে বলল যে, এখানে পঁচিশ আঁটি লাকড়ী হতে পারে। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পর ক্রেতা নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে গাছগুলো খরিদ করল। কিন্তু কাটার পর দেখা গেল, এখানে পঁচিশ আঁটির চেয়েও অধিক লাকড়ী রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি ইচ্ছা করে যে, এই অতিরিক্ত লাকড়ী সে ক্রেতাকে দিবেনা তবে সে তা করতে পারবেনা। (যহীরিয়া) ফাতাওয়ায়ে আবুল লাইস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বাগানে পানি সিঞ্চন করার নালা সহ এক ব্যক্তি একটি আঙ্গুর বাগান বিক্রি করল এবং বাগানের সমস্ত হক হুকুমসহ সে তা বিক্রি করল। আর বাগানের পানির নালাটি এমন এক গলিতে গিয়ে শেষ হয়েছে-যা সামনের দিক দিয়ে বন্ধ এবং এই গলিটি বাগানের মালিক ও অন্য দুই ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী সম্পত্তি হিসাবে আছে। এদিকে ঐ নালার দুই প্রান্তে রয়েছে কতগুলো বৃক্ষ। এ পর্যায়ে দেখতে হবে যে, প্রবাহমান নালার মূল ভূমির মালিক বিক্রেতা কি না? যদি বিক্রেতা এর মালিক হয়ে থাকে তবে ক্রেতা এই গাছগুলোর মালিক হবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি এই নালার মূল ভূমির মালিক না হয় বরং তার শুধু حق سبيل অর্থাৎ পানি বাহিরে নেওয়ার হক থাকে তাহলে বিক্রেতা এই গাছগুলোর মালিক হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি বিক্রেতা নিজে এই গাছগুলো রোপণ করে থাকে অথবা রোপণকারী কে তা জানা নেই। যদি বিক্রেতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি এ বৃক্ষ সমূহ রোপণ করে থাকে তবে রোপণকারী ব্যক্তিই এর মালিক হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা : যদি কেউ কোন একটি গ্রাম বিক্রি করে এবং এর চৌহদ্দি উল্লেখ না করে তাহলে ঐ বিক্রয় শুধুমাত্র গ্রামের ঘর দরজা এবং ইমারতের উপর প্রযোজ্য হবে। শস্য এবং ফসলের ক্ষেতের উপর প্রযোজ্য হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি কেউ কোন গ্রাম

১. وصف (গুণাগুণ) فوت এবং নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ক্রেতার ঐ যমীনটি নেওয়া বা না নেওয়ার ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু সাব্যস্তকৃত মূল্য হতে কিছুই হ্রাস করা হবে না।

জমিসহ বিক্রি করে এবং বিক্রেতার এই গ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি গ্রাম থাকে, আর বিক্রয়কালে সে এ কথা বলে যে, তোমার নিকট আমি আমার এই গ্রামটি বিক্রি করলাম। এই গ্রামের প্রথম দিকে, দ্বিতীয় দিকে, তৃতীয় দিকে কিংবা চতুর্থ দিকে আমার অন্য গ্রামটি অবস্থিত তাহলে বিক্রিত গ্রামের পার্শ্বে অবিক্রিত গ্রামের যে সব ভূমি আছে এগুলোও ঐ বিক্রিত গ্রামের ভূমির মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। আর যদি সে এই কথা বলে যে, এর অমুক দিকে আমার অমুক গ্রামের জমি আছে তাহলে অবিক্রিত গ্রামের জমিসমূহ এই বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হবে না (আল-মুহীত)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : স্থানান্তরযোগ্য বস্ত্ত বিক্রয়কালে উল্লেখ ছাড়াও যা কিছু বিক্রয়ভুক্ত হয়

১. মাসআলা : গোলাম বা দাসী বিক্রি করার সময় বিক্রেতার অবশ্য কর্তব্য হবে তাকে গতর ঢাকার পরিমাণ কাপড় দেয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। দাস-দাসীর পোশাক শর্তারোপ ছাড়াই বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ওরফ তথা দেশ প্রথা হিসাবে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দামী পোশাক পরানো হলে শর্ত করা ছাড়া চুক্তিভুক্ত হবে না। কেননা এর প্রচলন নেই। প্রচলন আছে স্বল্প মূল্যের ব্যবহারিক কাপড় দেয়ার। তারপর বিক্রেতার ইচ্ছাধিকার রয়েছে দাস-দাসীর দেহাঙ্গ পোশাকটি দিতে পারে আবার অনুরূপ মানের অন্য পোশাকও দিতে পারে। কেননা ওরফ হিসাবে বিক্রয়ভুক্ত হলো তাদের পরায়ের কোন পোশাক দেয়া এই জাতীয় পোশাকই নির্দিষ্ট কোন পোশাক নয়। এই কারণেই লেবাসের বিপরীতে মূল্যের কোন অংশ ধার্য হয় না। কাজেই ঐ পোশাকের কোন হকদার বের হলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে মূল্যের কোন অংশ ফেরত নিতে পারবে না। তদ্রূপ দোষ বা খুঁত পাওয়া গেলে কাপড় ফেরত দেওয়া যাবে না (তাবয়ীন)। ক্রেতার-খরিদকৃত দাসীকে-কবজা করার পর যদি তার কাপড় নষ্ট বা খুঁত যুক্ত হয়ে যায় এরপর আয়েবের কারণে ঐ দাসীকে তার মুনীবের নিকট ফেরত দেওয়া হয় তবে ক্রেতা পূর্ণ তার থেকে উসূল করে নিবে (আল-বাহরুর রায়িক)। যদি দাসীর মধ্যে কোন দোষ বা খুঁত পাওয়া যায় তবে ক্রেতার জন্য জায়েয হবে বিক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত কাপড় ছাড়াই তাকে তার মুনীবের নিকট ফেরত দেওয়া (তাবয়ীন)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সে কাপড় খোয়া গিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি ঐ কাপড় খোয়া না গিয়ে থাকে বরং বর্তমান থাকে তবে কাপড়সহ দাসীকে ফেরত দিবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

২. মাসআলা : ফকীহ হিশাম (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি একটি দাসী বিক্রয় করল। দাসীর পরিধানে রৌপ্যের কাঁকন ও দুটি বালি ছিল। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়কালে ক্রেতা ও বিক্রেতা এর কোন শর্ত করেনি। তারপর এই অলংকার নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে ঝগড়া বাধল। বিক্রেতা ক্রেতাকে তা দিতে অস্বীকৃতি জানাল। তাহলে এর সমাধান কি হবে, এ বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, অলংকার দাসী বিক্রয়ভুক্ত হবে না। যদি বিক্রেতা তা দিয়ে দেয় তবে দাসীই এর হকদার হবে। দেখা সত্ত্বেও সে যদি তা তলব করা থেকে নিশ্চুপ থাকে তবে এটিও দিয়ে দেওয়ার মত বলেই ধর্তব্য হবে (যহীরিয়া)। যদি কেউ এমন গোলাম বিক্রি করে যার মাল আছে কিন্তু ঐ মালের কথা বিক্রয় চুক্তির সময় উল্লেখ না করে তাহলে বিক্রয়কারী মুনীবই এই মালের হকদার হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটিই সহীহ

অভিমত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। কেউ যদি মালসহ গোলাম বিক্রি করে এবং বলে যে, আমি তাকে তার মালসহ এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম, কিন্তু মালের পরিমাণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা না করে তাহলে ক্রয় বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি মালের কথা পরিষ্কার বর্ণনা করে কিন্তু তা পুরাই যদি অন্যের কাছে হাওলাদ থাকে অথবা কিছু মাল হাওলাদ হিসাবে থাকে তাহলেও ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি মাল নগদ হয় তাহলে বিক্রয় জায়েয হবে। তবে শর্ত হল, মূল্যদ্রব্য না হওয়া মাল যদি মূল্য দ্রব্য হয় এবং তা যদি দিরহাম হয় আর গোলামের মূল্যও দিরহাম হয়, এ ক্ষেত্রে মূল্যের পরিমাণ যদি ঐ মাল থেকে বেশী হয় তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। মূল্য ও মাল সমান হলে অথবা মূল্যের পরিমাণ কম হলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে গোলামের মূল্য তার মাল থেকে ভিন্ন শ্রেণীর হয় যেমন মূল্য হচ্ছে দিরহাম আর মাল হচ্ছে দীনার, অথবা উল্টো তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা বিনিময়কৃত মালামাল ঐ বৈঠকেই কবজা করে এমনিভাবে ক্রেতা যদি গোলামের মাল কবজা করে নিয়ে এর মুকাবিলায় যে মূল্য আসে তা নগদ আদায় করে দেয় তাহলেও ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি বিনিময়কৃত মালামাল কবজা করার আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে গোলামের মালের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা : ঘোড়া বাঁধার রশি শর্ত করা ছাড়াই এই ঘোড়া বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে। উটের লাগাম সম্পর্কেও একই কথা। কিন্তু রশির কথা গাধার উল্লেখ না করা হলে বিক্রয়ভুক্ত হবে না। কেননা ঘোড়া ও উট রশি ছাড়া টেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু গাধাকে নেয়া যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। গাধার গলার রশি ওরফ ও প্রচলন হিসাবে গাধার বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু দেশ-প্রথা ও ওরফ এর বিপরীত থাকলে তা শামিল হবে না (মুহীত : আস-সারাকসী)। কেউ যদি পালান অর্থাৎ বস্তা বোঝাই করার গদি বিশিষ্ট উট বিক্রি করে তবে এই পালান এবং পালানের নীচের কম্বল এই বিক্রয় চুক্তিতে দাখিল হয়ে যাবে। কিন্তু যে গাধার পিঠে পালান নেই তা বিক্রি করা হলেও বিক্রয় চুক্তিতে এই পালান অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এটিই পসন্দনীয় অভিমত। (খুলাসা ও যহীরিয়া) সদরুশ শহীদ (র) এই অভিমতটি গ্রহণ করেছেন (মুহীত)। উল্লেখ্য যে, কোন খাস পালান প্রদান করা বিক্রেতার উপর অপরিহার্য হয়, যেমন-কোন খাস কাপড় প্রদান করা বিক্রেতার উপর অপরিহার্য হয় না (আল নাহরুল ফায়িক)। ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র) বলেন, শর্ত করা ব্যতীত পালান বিক্রয়ের মধ্যে শামিল হবে না এবং মালিকানা ও ইসতিহ্বাকের ভিত্তিতে বিক্রেতার নিকট থেকে কেউ তা নিতেও পারবে না। এ ক্ষেত্রে তিনি গাধাটি পালান বিশিষ্ট হওয়া ও না হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য করেন নি। এটিই যাহিরী রিওয়ায়েত। কেননা গাধা যখন পালানসহ বিক্রি করা হয় তখন বলা হয় لِيُحِبَّ بَنُوهُ (আমি এটিকে এর পোশাকসহ বিক্রি করছি) (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উটের গদি এর মধ্যে শামিল হয়ে যাবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

৪. মাসআলা : কেউ যদি জীন বা গদি বিশিষ্ট ঘোড়া বিক্রি করে তবে এর হুকুম কি হবে, এ সম্বন্ধে কোনই বর্ণনা কোন কিতাবে নেই, তবে মাশাইখে কিরাম বলেছেন যে, বিক্রয়কালে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়া জীন বিক্রয় চুক্তিতে দাখিল না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য উল্লেখ করলে তা বিক্রয় চুক্তিতে শামিল হবে অথবা যদি গদি থাকা অবস্থায় ঘোড়ার দাম বেশী হয় এবং গদি

ছাড়া অবস্থায় কম হয় তবুও তা বিক্রয় চুক্তিতে দাখিল হবে (গিয়াসিয়া)। পশুর লাগাম, গরুর শিং-এ বাঁধা রশি এবং ঘোড়ার গায়ে জড়ানো কঞ্চল শর্ত করা ব্যতীত বিক্রয়ের মধ্যে शामिल হয় না। কেননা দেশে এ জাতীয় প্রচলন নেই। পক্ষান্তরে দেশ প্রথা যদি এর বিপরীত থাকে তখন হুকুমও বিপরীত হবে (তাবয়ীন)। যদি উষ্ট্রী, দেশীয় ঘোড়া, বকরী ইত্যাদি জন্তু বিক্রি করা হয় এবং বিক্রয়ের স্থলে এগুলোর বাচ্চাও সঙ্গে আনা হয় তবে لا مال حال এর ভিত্তিতে বাচ্চাগুলোও এই বিক্রয়ের মধ্যে शामिल থাকবে। কিন্তু ওরফ যদি এর বিপরীত থাকে তাহলে বাচ্চাগুলো বিক্রয়ের মধ্যে দাখিল হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৫. মাসআলা : আমাদের ইমামগণ বলেছেন যে, যদি কেউ মাছ খরিদ করে এবং মাছের পেটে সে মণি-মুজাপ্রাপ্ত হয় এবং ঐ মুজা যদি শামুকের ভেতরে থাকে তাহলে ক্রেতা এর হকদার হবে। আর তা যদি শামুকের ভেতরে না থাকে এবং বিক্রেতা যদি তা শিকার করে পেয়ে থাকে তবে ক্রেতা এই মুজা বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিবে। এ পর্যায়ে এটি বিক্রেতার নিকট লুকাতা (হারানোপ্রাপ্ত মাল) হিসাবে গণ্য হবে। কাজেই এক বছর পর্যন্ত সে এর ঘোষণা দিবে। এরপর মালিক না পেলে তা সাদাকা করে দিবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) যে সব বস্তু মাছের খাদ্য নয় তা বিক্রেতা পাবে। আর যে সব জিনিস মাছের খাদ্য তা পাবে ক্রেতা (যখীরা)। কেউ যদি একটি মাছ খরিদ করার পর ঐ মাছের পেটের ভেতর আরেকটি মাছ পায় তবে ক্রেতা এই মাছের হকদার হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি মাছের পেটে আম্বর পাওয়া যায় তাহলে ক্রেতাই এর হকদার হবে (যখীরা)। কেউ যদি মুরগী খরিদ করার পর এর পেটে লু-লু মোতি পায় তবে বিক্রেতা এর হকদার হবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা : তাজরীদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যে সব জিনিস পাখীর পেটে পাওয়া যায় যা সচরাচর পাখীরা ভক্ষণ করে তবে তা ক্রেতা ব্যক্তি পাবে। আর তা যদি এমন বস্তু হয় যা সচরাচর পাখী খায়না তবে তা বিক্রেতা পাবে (তাতার খানিয়া)। যদি ক্রয় কৃত মাছের পেটে আরেকটি মাছ পাওয়া যায় এবং সে মাছের পেটে কোন লু লু মোতি পাওয়া যায় তাহলে বিক্রেতা এর হকদার হবে। যদি ক্রয়কৃত মাছের পেটে শামুক পাওয়া যায় এবং শামুকের ভেতরে গোশত থাকে; আর সে গোশতের ভেতরে লু-লু মোতি পাওয়া যায় যেমন শামুকের ভেতরে তা পাওয়া যায় তাহলে ক্রেতা এই মোতির হকদার হবে। কেউ শামুক খরিদ করল এর অভ্যন্তরস্থ গোশত খাওয়ার জন্য। তারপর সে এর গোশতের ভেতর লু লু মোতি প্রাপ্ত হল তাহলে প্রাপকই এর মালিক হবে (যখীরা)। জেনে রাখবে, যে সব বস্তু আনুষঙ্গিকভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে शामिल হয় সে বস্তুর মুকাবিলায় মূল্যের কোন অংশ ধার্য হয় না। এই কারণেই কিন্না গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি একটি বাড়ি খরিদ করল, তারপর ঐ বাড়ির কোন ইমারত ধসে পড়ল, তাহলে ঐ বাড়ির মূল্য হতে কিছুই হ্রাস করা হবে না। আর যদি এর কোন গৃহে কোন ব্যক্তির হক সাধিত হয় তবে ক্রেতা এর মূল্য পরিমাণ অংশ বাদ দিয়ে বাকী মূল্য দিয়ে ঐ বাড়িটি নিয়ে নিবে। কিন্তু কোন কোন ফকীহ বলেন, উভয় মাসআলার হুকুম একই। পক্ষান্তরে বকরীর পশমের মাসআলাটি এই হুকুম থেকে ভিন্নতর। কেননা বকরীর পশমের মুকাবিলায় শর্ত করা ছাড়া কোন মূল্য ধার্য হয় না। কিন্তু শর্ত করা হলে এর মুকাবিলায়ও মূল্য ধার্য হয়ে থাকে (আন-নাহরুল ফায়িক)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : খিয়ারে শর্তের বিবরণ

[এ পরিচ্ছেদ সাতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ : যে যে অবস্থায় খিয়ারে শর্ত সহীহ হয় এবং যে যে অবস্থায় তা সহীহ হয় না, এর বিবরণ

১. মাসআলা : আমাদের মাযহাবে খিয়ারে শর্তের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে। এই খিয়ার ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য হতে পারে এবং তাদের একজনেরও হতে পারে। এমনিভাবে আমাদের মাযহাবে তা আজনবী (তৃতীয়) ব্যক্তির জন্যও খিয়ারে শর্ত জায়েয আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আমাদের মাযহাবে খিয়ারের শর্ত প্রবর্তন করা হয়েছে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ; অনুমতি প্রদানের জন্য নয়। সুতরাং খিয়ারে শর্তের সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে যখন চুক্তি রদ করার সুযোগ চলে যাবে তখন চুক্তি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

২. মাসআলা : খিয়ারে শর্ত কয়েক প্রকার। (১) প্রথম প্রকার খিয়ার যা সর্ব সম্মতিক্রমে ফাসিদ। যেমন ক্রেতা বলল, আমি এই শর্তে খরিদ করলাম যে আমার ইখতিয়ার থাকবে, অথবা আমার কয়েক দিনের ইখতিয়ার থাকবে অথবা সব সময়ের জন্য ইখতিয়ার থাকবে। (২) দ্বিতীয় প্রকার খিয়ার যা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। যেমন ক্রেতা বলল, আমি এই শর্তে ক্রয় করলাম, যে আমার তিন দিন অথবা এর কম সময়ের জন্য ইখতিয়ার থাকবে। (৩) তৃতীয় প্রকার খিয়ার যার বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। যেমন ক্রেতা বলল যে, আমি এই শর্তে ক্রয় করলাম, আমার এক মাস অথবা দুই মাসের ইখতিয়ার থাকবে। এ জাতীয় খিয়ার ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ফাসিদ। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয (ইনায়া)। বস্তুত ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য খিয়ারের শর্ত আরোপ করা হলে তা জায়েয হবে না। আর সাহেবাইনের মতে তিন দিনের বেশী সময়ের জন্য খিয়ারের শর্ত আরোপ করা হলেও তা

১. খিয়ার অর্থ ইখতিয়ার বা অধিকার। শরীআতে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিল করার ইখতিয়ার কে শর্ত বহাল রাখা বা বাতিল করার ইখতিয়ার কে শর্ত হিসাবে রাখা জায়েয আছে এবং একেই পরিভাষায় খিয়ার বলা হয়। উল্লেখ্য যে, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা বা বিক্রেতা অথবা উভয়ের জন্য ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি তিন দিন কিংবা তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে বহাল রাখা বা বাতিল করার ইখতিয়ার থাকার শর্ত করাকে খিয়ারে শর্ত বলা হয়। খিয়ারে শর্তের সাথে সম্পাদিত ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যম্ভাবী হয় না। কেননা এতে চুক্তি বহাল রাখা ও বাতিল করে দেওয়া উভয়টির সম্ভাবনা রয়েছে।

জায়েয হবে যদি সময় নির্দিষ্ট হয় (মুখতারুল ফাতাওয়া)। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতটিই সহীহ (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

৩. মাসআলা : তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য অথবা সব সময়ের জন্য থিয়ারের শর্ত আরোপ করার চুক্তি ফাসিদ হওয়ার পর যদি তিন দিনের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয় তবে আমাদের মাযহাবে উক্ত আক্দ সহীহ হয়ে যাবে (কাফী)। যদি তিন দিনের বেশী সময়ের জন্য থিয়ারের শর্ত আরোপ করা হয় অথবা মোটেই সময়ের কথা উল্লেখ না করা হয় অথবা **مجهول** (অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট) সময়ের কথা উল্লেখ করা হয় তারপর তিন দিনের মধ্যে বেচাকেনার অনুমতি প্রদান করা হয় অথবা ক্রেতা বা গোলামের মৃত্যুতে থিয়ার বাতিল হয়ে যায় কিংবা ক্রেতা-গোলামকে আযাদ করে দেয় অথবা এর মধ্যে কেউ এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেয় যাতে ক্রয়-বিক্রয় আক্দ অবশ্যস্বাবী হয়ে যায় তবে এই সকল অবস্থায় ফাসিদ আক্দ জায়েয আক্দে রূপান্তরিত হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে প্রাথমিক অবস্থায় উপরোক্ত আকদের হুকুমের ব্যাপারে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ইমাম বলেছেন, প্রাথমিক অবস্থায় এটি ফাসিদ আক্দ হিসাবে গণ্য হবে। তবে চতুর্থ দিনের আগে থিয়ারের বিষয়টি রহিত করে দেওয়ার তা আবার সহীহ আকদের রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এটিই ইরাকী ফুকাহায়ে কিরামের মাযহাব (নিহায়া)। কেউ কেউ বলেন, এটিই যাহিরী রিওয়ায়েত (আন্-নাহরুল ফায়িক)। অবশ্য সর্বাধিক যুক্তি যুক্ত অভিমত হল, এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় মওকুফ (স্থগিত) বলে গণ্য হবে। তারপর যখন চতুর্থ দিনের কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখনই ঐ ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। এটিই খুরাসানবাসী ফাকীহগণের মাযহাব (নিহায়া)। মাওয়ারাউ নাহর অর্থাৎ মেসোপটেমিয়ার মাশাইখে কিরাম যেমন ইমাম সারাখসী, ইমাম ফখরুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তি বর্ণ এই অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। ফাওয়াযিদে যহীরিয়া এবং যখীরা গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে (আল বাহরুর রায়িক)। যদি থিয়ারের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ উল্লেখ না করা হয় এবং তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর যার জন্য থিয়ারের শর্ত করা হয়েছিল, সে নিজেই যদি তা বাতিল করে দেয় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এই ক্রয়-বিক্রয় বৈধতায় রূপান্তরিত হবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে তা বৈধতায় রূপান্তরিত হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

৪. মাসআলা : ফাতাওয়া গ্রন্থে আছে যে, যদি ক্রেতার জন্য রমায়ান মাসের পর দুই দিনের থিয়ারের শর্ত করা হয় এবং ক্রয়-বিক্রয় রমায়ান মাসের শেষ দিন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে এবং ক্রেতার তিন দিনের থিয়ার হাসিল হবে। রমায়ানের শেষ দিন এবং পরবর্তী দুই দিন, এই সর্বমোট তিন দিন। যদি বলে, রমায়ান মাসে তার কোন থিয়ার থাকবে না তাহলে এই বিক্রি ফাসিদ বলে গণ্য হবে (মুহীত)। খানিয়া গ্রন্থে আছে, কেউ যদি এই শর্তে রমায়ান মাসে ক্রয় করে যে, রমায়ানের পর তার তিন দিনের থিয়ার থাকবে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এই আক্দ ফাসিদ হয়ে যাবে। এই জাতীয় থিয়ার যদি বিক্রেতার থাকে তবে তাও ফাসিদ হয়ে যাবে। ক্রেতা যদি বিক্রেতার উপর শর্ত আরোপ করে যে, রমায়ান মাসে তোমার কোন থিয়ার থাকবে না, রমায়ানের পর তোমার জন্য তিন দিনের থিয়ার থাকবে অথবা এ জাতীয় কথা যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে তবে উভয় অবস্থাতেই

ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে উক্ত আক্দ ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি দশ দিরহাম মূল্যে একটি কাপড় বিক্রি করল, তারপর বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, আমাকে তুমি কাপড় দিবে ; অথবা দশ দিরহাম দিবে। তাহলে এই কথার হুকুম কি হবে ? এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমাদের মাযহাব অনুসারে এ কথা থিয়ার হিসাবে গণ্য হবে (মুহীত)।

৫. মাসআলা : থিয়ারে শর্ত যেভাবে জায়েয ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সাব্যস্ত হয়, এমনিভাবে তা ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও সাব্যস্ত হয়। সুতরাং কেউ যদি এক হাজার দিরহাম ও এক রিতল মদের বিনিময়ে তিন দিনের ইচ্ছাধিকারের শর্তে কোন গোলামকে বিক্রি করে তারপর ক্রেতা-বিক্রেতার অনুমতিক্রমে ঐ গোলামকে কবজা করে নেয় এবং পরে তাকে আযাদ করে দেয় তবে তা জায়েয হবে না। অর্থাৎ তা কার্যকরও হবে না, স্থগিতও থাকবে না (আল ফাতওয়াস সুগরা)। কেউ যদি কোন বস্তু এই শর্তে বিক্রি করে যে, তিন দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না করলে বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হবে না। এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয এবং শর্ত আরোপ করাও জায়েয। আসল গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বিষয়টি এভাবেই উল্লেখ করেছেন। এই মাসআলার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। (১) শর্তের সময়সীমা উল্লেখ না করা যেমন বিক্রেতা বলল, তুমি যদি এর মূল্য পরিশোধ না কর তাহলে আমাদের মাঝে কোন বিক্রয় চুক্তি নেই (২) অথবা অনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা। যেমন বিক্রেতা বলল, তুমি যদি কয়েক দিনের মধ্যে মূল্য 'পরিশোধ' না কর, এ দুই অবস্থায় আক্দ ফাসিদ হবে। (৩) নির্দিষ্ট সময় সীমা উল্লেখ করা এ ক্ষেত্রে দুই অবস্থা তিন দিন বা তার কম সময় উল্লেখ করার এ ক্ষেত্রে তবে আক্দ জায়েয হবে। এটি আমাদের ইমামগণের সকলের অভিমত তিন দিনের বেশী সময় সীমা উল্লেখ করা এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এ অবস্থায় আক্দ ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে আক্দ জায়েয হবে (মুহীত)। এ অবস্থায় যদি তিন দিনের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া হয় তবে সকল ইমামের মতেই আক্দ জায়েয হবে (হিদায়া)। ক্রেতা যদি তিন দিনের মধ্যে মূল্য আদায় করার পূর্বে গোলাম আযাদ করে দেয় তবে তার এই আযাদ করা জায়েয হবে। কেননা এই বিক্রয় ক্রেতার জন্য থিয়ারে শর্ত করে নেওয়ার মতই। যদি তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং ক্রেতা মূল্য পরিশোধ না করে তবে সহীহ মতে এই আক্দ ফাসিদ হবে, তবে রহিত হবে না। কাজেই ক্রেতা তিনদিনের পর গোলামটি আযাদ করলে তা কার্যকরী হবে, যদি গোলাম ক্রেতার নিয়ন্ত্রণে থাকে। তখন ক্রেতাকে এই গোলামের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর গোলাম যদি বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে ক্রেতার এই আযাদ করা কার্যকর হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অনুচ্ছেদ : ফাসিদ শর্তসমূহের বিবরণ) যদি কেউ নগদ মূল্য নিয়ে গোলাম বিক্রি করে এবং এই শর্ত করে যে, যদি বিক্রেতা মূল্য ফেরত দিয়ে দেয় তবে তাদের মাঝে কোন বিক্রয় চুক্তি নেই। এটা জায়েয। কেননা এটা বিক্রেতার জন্য থিয়ারে শর্ত আরোপ করার মতই (যখীরা)। সুতরাং ক্রেতা যদি গোলামকে কবজা করে তাহলে ক্রেতার বিপক্ষে তা বাজার মূল্য দ্বারা দায়বদ্ধ হবে। ক্রেতার এই গোলাম আযাদ করা কার্যকরী হবে না। পক্ষান্তরে বিক্রেতার আযাদ করা কার্যকরী হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৬. মাসআলা : যেমনিভাবে ক্রয়-বিক্রয়কালে খিয়ারের শর্ত আরোপ করা জায়েয, এমনিভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের পরেও খিয়ারের শর্ত আরোপ করা জায়েয। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে বলে অথবা বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, আমি তোমাকে তিন দিনের জন্য খিয়ার দিলাম অথবা এ জাতীয় কোন কথা বলে, তবে তা সহীহ হবে এবং শর্ত অনুসারে খিয়ার সাব্যস্ত হবে। যদি খিয়ার ফাসিদ হয়ে যায় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে আকদও ফাসিদ হয়ে যাবে। কিন্তু সাহেবাইন বলেন, ফাসিদ হবে না। ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তু কবজা করার পর কয়েক দিন অতিবাহিত হল। তারপর বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, তোমাকে খিয়ার দেওয়া হল। তাহলে এই খিয়ার মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হবে। কেননা “তোমাকে খিয়ার দেওয়া হল,” কথাটি তোমাকে ইকালার চুক্তি প্রত্যাখ্যান করার ইখতিয়ার দেওয়া হল” এর মতই। বিক্রেতা যদি ‘তিন দিনের খিয়ার দেওয়া হল’ বলে, তাহলে তিন দিনের খিয়ার হবে (মুহীত)। এটিই সহীহ অভিমত (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। ফাতওয়ায়ে ইতারিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে যে, তুমি যে ক্রয়-বিক্রয়ের আকদ করবে আমি তাতে তোমাকে খিয়ার দিলাম। তারপর ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় কালে **مطلقاً** অর্থাৎ খিয়ারের কথা উল্লেখ করা ছাড়াই কোন বস্তু তার থেকে খরিদ করল, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে পূর্বে কথার ভিত্তিতে উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তার খিয়ার হাসিল হবে না। ক্রেতা যদি বলে, আমি এই বস্তুটি তোমার নিকট থেকে খরিদ করলাম এই শর্তে যে, মূল্যের ব্যাপারে অথবা বিক্রিত বস্তুর ব্যাপারে আমার খিয়ার থাকবে, তাহলে এই কথাটি “আমার খিয়ার থাকবে” কথার অনুরূপ বলে গণ্য হবে (তাতার খানিয়া)।

৭. মাসআলা : যদি রাত পর্যন্ত, অথবা যুহর পর্যন্ত অথবা তিন দিন পর্যন্ত খিয়ারের শর্ত করা হয় তবে পূর্ণ রাত যুহরের পূর্ণ ওয়াক্ত এবং পূর্ণ তিন দিন পর্যন্ত খিয়ার হাসিল হবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে খিয়ারের মধ্যে যে সময়টি ধার্য করা হয়েছে এর শেষ সময়টি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত খিয়ার শেষ হবে না। পক্ষান্তরে সাহেবাইন বলেন, ধার্যকৃত সময়ের শেষ প্রহরটি খিয়ারের মধ্যে দাখিল হবে না (আল-ফুসুল ইমাদিয়া)। আসল গ্রন্থেও উক্ত মাসআলাটি অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ফকীহ হাসান ইবন যিয়াদ (র) ইমাম আবু হানীফা (র) হতে পূর্বোক্ত মতের বিপরীত বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাতে বলা হয়েছে যে, যদি এই শর্তে বিক্রি করে যে, রাত পর্যন্ত আমার খিয়ার থাকবে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঐ সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার খিয়ার থাকবে। সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (যখীরা)। ক্রয়-বিক্রয় এর মধ্যে তিন দিনের খিয়ার ধার্য করার পর যদি এর থেকে কিছু সময় কমিয়ে দেওয়া হয় তবে ঐ সময়টুকু কমে যাবে। এমন হবে যেন ঐ সময় টুকু দাঁড়াই খিয়ারের শর্ত করা হয়েছে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

৮. মাসআলা : কোন ব্যক্তি তিন দিনের খিয়ারে শর্তের উপর একটি গোলাম বিক্রি করল এবং শর্ত করল যে, সে এই গোলামকে মজদুরের কাজ করাবে এবং তার থেকে খিদমত গ্রহণ করবে তাহলে এরূপ শর্ত আরোপ করে খিয়ারে শর্তের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে। আর এরূপ কাজ করানোর কারণে তার খিয়ার বাতিল হবে না। কেউ যদি তিন দিনের খিয়ারের ভিত্তিতে কোন আঙ্গুর বাগান এই শর্তে বিক্রি করে যে, সে এই সময়ের মধ্যে উক্ত

বাগানের আঙ্গুর থেকে (প্রয়োজনে) খাবে তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি পিতা বা ওসী (ওসীয়াত বাস্তবায়নের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) নাবালিগ পুত্রের মাল থেকে কোন মাল বিক্রি করে এবং নিজের জন্য খিয়ারের শর্ত করে তবে তা জায়েয হবে। তারপর যদি মুদতে খিয়ারের মধ্যে পুত্র বালিগ হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর যাহিরী রিওয়ায়েত মতে খিয়ারের বিষয়টি পুত্রের প্রতি ন্যস্ত থাকবে। যদি মুদতে খিয়ারের মধ্যে সে ক্রয়-বিক্রয়কে জায়েয রাখে তবে তা জায়েয হবে। আর যদি রদ করে দেয় তবে বাতিল হয়ে যাবে (আল ফাতাওয়াস সুগরা)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : খিয়ারের কার্যকারিতা এবং এর হুকুমের বিবরণ

১. মাসআলা : বিক্রেতার জন্য খিয়ারের শর্ত হলে বিক্রিত বস্তু কোন ইমামের মতেই তার মালিকানা হতে বের হবে না। কিন্তু মূল্য সর্বসম্মতভাবে ক্রেতার মালিকানা হতে বের হয়ে যায়। তবে তা বিক্রেতার মালিকানায় দাখিল হয় কিনা? ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতার মালিকানার দাখিল হবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে দাখিল হয়ে যাবে (মুহীত)। উভয়ের জন্য খিয়ারের শর্ত হলে আকদের হুকুম আদৌ সাব্যস্ত হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। ক্রেতার জন্য খিয়ারের শর্ত করা হলে কোন ইমামের মতেই মূল্য তার মালিকানা মুক্ত হবে না। তবে বিক্রিত বস্তু বিক্রেতার মালিকানা থেকে অবশ্যই বের হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে ইমামগণ সকলেই একমত। তবে তা ক্রেতার মালিকানায় দাখিল হবে কিনা? ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ক্রেতার মালিকানায় দাখিল হবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে ক্রেতার মালিকানায় দাখিল হবে (আল ফাতওয়াস সুগরা)।

২. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র) এবং সাহেবাইনের উক্ত নীতিগত মতভেদের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত কতিপয় মাসাইলের সৃষ্টি হয়েছে।

(ক) কেউ যদি তার স্ত্রীকে তিনদিনের খিয়ারে শর্তের উপর ক্রয়-করে তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উক্ত বিবাহ ফাসিদ হবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি উক্ত সময়ে ক্রয়-বিক্রয়কে কবুল করার পূর্বে ক্রেতা তার সাথে সহবাস করে এবং সে যদি কুমারী হয় তবে সমস্ত ইমামের মতে খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি **ثيب** (কৌমার্যরহিতা) হয় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে খিয়ার রহিত হবে না। কাজেই সে তাকে রদ বা ফেরত দিতে পারবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে সহবাস দ্বারা সে তাকে কবুল করে নিয়েছে বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় তার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সহবাসের কারণে মূল্য-ক্ষতি না হয় ‘মূল্য-ক্ষতি’ হলে ‘কৌমার্যরহিতা’ হওয়া সত্ত্বেও তাকে আর ফেরত দেওয়া যাবে না (আন-নাহরুল ফায়িক)। ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি সে তার স্ত্রী না হয়ে দাসী হয় এবং সে সহবাস করে তবে এতে কবুল করা সাব্যস্ত হবে। চাই সে কুমারী হোক বা কৌমার্যরহিতা (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। চাই সহবাসের কারণে তার ‘মূল্যক্ষতি’ হোক বা না হোক (নিহায়া)।

(খ) যদি খরিদকৃত দাসী বিবাহের কারণে মুদতে খিয়ারের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে ঐ ব্যক্তির উম্মু ওয়ালাদ হবে না। কিন্তু সাহেবাইন এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন (হিদায়া)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি দাসী মুদতে খিয়ারের মধ্যে সন্তান প্রসব করে এবং সে তখন বিক্রেতায় কবজায় থাকে। পক্ষান্তরে সে যদি ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় মুদতে খিয়ারের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তবে খিয়ার রহিত হয়ে যাবে এবং ক্রেতার মালিকানাও সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর দাসী সর্বসম্মতভাবে ক্রেতার উম্মু ওয়ালাদ সাব্যস্ত হবে। কেননা সে প্রসব দ্বারা সে দোষযুক্ত হয়ে পড়েছে (কিফায়া)। কেউ যদি খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে এমন দাসী খরিদ করে যে, উক্ত ক্রেতার সহবাসের কারণে সন্তান প্রসব করেছিল, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে শুধু ক্রয়ের দ্বারা সে তার উম্মু ওয়ালাদ হবে না। কাজেই তার পূর্ববৎ বাকী থাকবে। কিন্তু যখন সে তাকে কবুল করে নিবে তখন উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইন বলেন, শুধু ক্রয়ের কারণেই সে তার উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং তার খিয়ারও বাতিল হয়ে যাবে। আর তখনই মূল্য আদায় করা ক্রেতার উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)।

(গ) ক্রেতা যাকে খরিদ করবে সে যদি ক্রেতার কোন আত্মীয় হয় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে আযাদ হবে না। কিন্তু সাহেবাইন এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। অর্থাৎ তাদের মতে সে আযাদ হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

(ঘ) কেউ 'যদি কোন গোলামের মালিক হই তবে সে আযাদ'। একথা বলার পর যদি খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে কোন গোলাম খরিদ করে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে গোলাম আযাদ হবে না, সাহেবাইনের মতে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি 'আমি কোন গোলাম খরিদ করলে সে আযাদ' বলার পর খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে গোলাম খরিদ করে তবে সমস্ত ইমামগণের মতেই সে আযাদ হয়ে যাবে।

(ঙ) কেউ যদি খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে কোন দাসী খরিদ করে কবজা করে নেয়, খিয়ারের সময় সীমায় তার ঋতুস্রাব দেখা দেয়, তারপর ক্রেতা তাকে কবুল করে নেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এই হায়েয তার গর্ভমুক্ততা সাব্যস্তির জন্য যথেষ্ট হবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে এটিই যথেষ্ট হবে (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)। তদ্রূপ মুদতে খিয়ারের মধ্যে যদি হায়েযের অংশ বিশেষ পাওয়া গেলেও একই হুকুম (ফাতহুল কাদীর)। যদি ক্রেতা চুক্তি রদ করে দাসীকে ফেরত দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতার উপর ইসতিবরা (গর্ভমুক্ততা সাব্যস্তকরণ) ওয়াজিব হবে না। চুক্তি রদ করা এবং ফেরত দেয়া কবজার আগে হোক বা পরে হোক। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে যদি কবজার আগে সে চুক্তি রদ করে এবং ফেরত দেয় তবে ইসতিহ্সান অনুসারে বিক্রেতার উপর ইসতিবরা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু কিয়াস অনুসারে ওয়াজিব হবে। আর যদি কবজার পর চুক্তি রদ করে এবং ফেরত দেয় কিয়াস ও ইসতিহ্সান উভয় হিসাবেই বিক্রেতার উপর ইসতিবরা ওয়াজিব হবে (মুহীত)। ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি দাসীর বিক্রয় পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পর ইকাল বা অন্য কোন কারণে আকুদ ভেঙ্গে যায় এবং এ ভেঙ্গে যাওয়া যদি

কবজার আগে হয় তাহলে বিক্রেতার উপর ইসতিবরা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে কবজার পরে হলে বিক্রেতার উপর ইসতিবরা ওয়াজিব হবে। খিয়ার বিক্রেতার ছিল, সে আকুদকে ফসখ করে দিয়েছে তাহলে এ অবস্থায় ইসতিবরা ওয়াজিব হবে না। যদি সে বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে দেয় তবে ক্রেতার উপর বিক্রয় ও কবজার বৈধতার পর নতুন হায়েযের মাধ্যমে দাসীর ইসতিবরা করা ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)।

(চ) কবজা করার পর ক্রেতা যদি খরিদা মাল বিক্রেতার নিকট আমানত রাখে, আর তা মুদতে খিয়ারের মধ্যে অথবা পরে বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ক্রয়-বিক্রয় ভাস হয়ে যাবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে ভাস হবে না। সুতরাং ক্রেতাকে মূল্য আদায় করতে হবে (মুযমারাত)। খিয়ারে শর্ত যদি বিক্রেতার অনুকূলে হয় আর সে তা ক্রেতার হাতে অর্পণ করে দেয়, তারপর মুদতে খিয়ারের মধ্যে ক্রেতা তা বিক্রেতার নিকট আমানত রাখে এবং ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হওয়ার আগে বা পরে বিক্রেতার নিকটেই তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সকল ইমামের মতে ঐ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)। ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি পাকা হয়ে যাওয়ার পর ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতি ক্রমে অথবা অনুমতি ছাড়া বিক্রিত বস্তু কবজা করে নিয়েছে এবং মূল্য নগদ পরিশোধ করা হয়েছে অথবা মূল্য পরিশোধের জন্য মেয়াদ ধার্য করা হয়েছে। আর বিক্রিত বস্তুতে ক্রেতার খিয়ারে রূয়ত কিংবা খিয়ারে আয়েব আছে। এহেন অবস্থায় ক্রেতা যদি ঐ বস্তুটি বিক্রেতার নিকট আমানত রাখে এবং তা বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায় তবে ক্রেতার মাল নষ্ট হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে এবং ইমামগণের ঐকমত্য ফায়সালা অনুসারে ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে, এর মূল্য পরিশোধ করা (নিহায়া)।

(ছ) ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি কোন বস্তু খরিদ করে এবং নিজের জন্য খিয়ারের শর্ত করে, তারপর বিক্রেতা তাকে মূল্য পরিশোধে ব্যাপারে দায়-মুক্ত করে দেয় তাহলে তার খিয়ার পূর্ববৎ বাকী থাকবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে বিনিময় ছাড়াই বিক্রিত বস্তু নিয়ে নিতে পারবে। আর যদি ইচ্ছা করে তবে ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গেও দিতে পারবে। তখন বিক্রিত বস্তু মূল্য ব্যতীতই বিক্রেতার নিকট ফেরত যাবে (এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত)। কিন্তু সাহেবাইনের মতে ক্রয়-বিক্রয় আকুদ কার্যকরী হয়ে যাবে এবং তার খিয়ার বাতিল বলে গণ্য হবে (মুযমারাত)। আর যদি ক্রয়-বিক্রয় পাকাপাকি হয়ে যায় এবং বিক্রেতা কর্তৃক দায়মুক্ত করে দেওয়ার কারণে ঐ অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম দায়-মুক্ত হয়ে যায় তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে সে আর এই মাল ফেরত দিতে পারবে না। খিয়ারে রূয়তের ভিত্তিতেও পারবে না এবং খিয়ারে আয়েবের কারণেও পারবে না। ক্রেতা যদি গোলাম না হয়ে কোন আযাদ মানুষ হয় এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তবে সে খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে খরিদকৃত মাল ফেরত দিতে পারবে। যদি ও মূল্য পরিশোধের যিম্মাদারী থেকে সে দায়মুক্ত। এটিই ইমামগণের সকলের অভিমত। আর এটিই যাহিরী এবং স্পষ্ট কথা। এমনি ভাবে সে খিয়ারে রূয়তের ভিত্তিতেও ঐ মাল ফেরত দিতে

পারবে। চাই তা কবজার আগে হোক বা পরে হোক। যদিও মূল্য পরিশোধের যিম্মাদারী থেকে সে দায়মুক্ত। ক্রেতা যদি খরিদকৃত মালে কোন দোষ খুঁজে পায় এবং মূল্য পরিশোধের যিম্মাদারী থেকে দায়মুক্ত হওয়ার পর সে এই মাল বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে চায় তাহলে দেখতে হবে, যদি মালামাল কবজা করার আগে এ অবস্থা হয় তবে সে এই মাল ফেরত দিতে পারবে। আর যদি কবজা করার পর এ অবস্থা হয় তবে সে আর এই মাল ফেরত দিতে পারবে না (নিহায়া)।

(জ) কোন যিম্মী অপর কোন যিম্মীর নিকট থেকে শরাব বা শূকর খরিদ করার পর তা কবজা করার আগে যদি তারা উভয়ে অথবা তাদের কোন একজন মুসলমান হয়ে যায় তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। চাই ঐ ক্রয়-বিক্রয় পাকাপোক্তা হয়ে থাকুক অথবা তাদের উভয়ের জন্য কিংবা কোন একজনের জন্য খিয়ারে শর্ত থাকুক। পক্ষান্তরে যদি মালামাল কবজা করার পর তাদের উভয়ে কিংবা কোন একজনে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ক্রয়-বিক্রয় পাকা হয়ে গিয়ে থাকে তবে এই আক্দ জায়েয হবে। বাতিল হবে না। আর যদি উক্ত আক্দে বিক্রেতার জন্য খিয়ারে শর্ত থাকে, তারপর বিক্রেতা মুসলমান হয় তবে উক্ত আক্দ বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা মুসলমান হয় তবে আক্দ বাতিল হবে না এবং বিক্রেতার খিয়ার পূর্ববৎ বহাল থাকবে। যদি বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে দেয় তাহলে তার শরাব তার কাছেই ফেরত চলে আসবে। আর যদি বিক্রেতা এই আক্দের ব্যাপারে অনুমতি দেওয়াকে পসন্দ করে তাহলে হুকুম অনুসারে (حكما) এই শরাব ক্রেতার হয়ে যাবে। তবে হুকুমের দিক থেকে মুসলমানের জন্যও এর মালিকানা থাকতে পারে। ক্রেতার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হওয়া অবস্থায় সে যদি মুসলমান হয়ে যায় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে আক্দ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সাহেবাইনের অভিমত অনুসারে আক্দ বাতিল হয়ে যাবে না। বরং তা পূর্ণ হয়ে গেছে বলে ধর্তব্য হবে। যদি বিক্রেতা মুসলমান হয় তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই আক্দ বাতিল হবে না এবং ক্রেতার খিয়ার পূর্বাবস্থায় বহাল থাকবে। ক্রেতা যদি 'আক্দকে কবুল করে নেয় তবে ক্রেতাই এর মালিক হবে। আর সে যদি ক্রয়-বিক্রয়কে ভঙ্গ করে দেয় তবে শরাব বিক্রেতার হবে। তবে হুকুম অনুসারে মুসলমান এর মালিক হতে পারবে (নিহায়া)।

(ঝ) কোন হালাল (যে মুহরিম নয়) ব্যক্তি খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে একটি হরিণ খরিদ করে তা কবজা করে নিল। তারপর সে ইহরাম বাধল। তখন হরিণটি তারই কবজায় ছিল। তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাই হরিণটি ক্রেতার নিকটে ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। হরিণটি গ্রহণ করা ক্রেতার উপর অপরিহার্য হবে না। খিয়ার যদি বিক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে তবে ফকীহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি খিয়ার ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হয় এবং বিক্রেতা ইহরাম অবস্থায় থাকে তাহলে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে (ফাতহুল কাদীর)।

(ঞ) এক মুসলমান অপর কোন মুসলমানের নিকট হতে খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে আঙ্গুরের শিরা খরিদ করল। তারপর মুদতে খিয়ারের মধ্যে তা মদ হয়ে গেল, তাহলে ইমাম আবু

হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে ঐ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সাহেবাইনের অভিমত অনুসারে তা বাতিল হবে না। বরং পূর্ণাঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য হবে (নিহায়া)।

(ট) খিয়ার ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হয়েছিল। এহেন অবস্থায় সে আক্দ ভেঙ্গে দেওয়ার পর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মুদতে খিয়ারের মধ্যে এই মাল থেকে যদি কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তবে এই অতিরিক্ত মাল/বস্তু বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে ক্রেতা এর হকদার হবে (ফাতহুল কাদীর)। কেউ কোন গোলামকে একটি দাসীর বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রি করল যে, গোলাম বিক্রেতার তিন দিন পর্যন্ত খিয়ার থাকবে। তারপর তিন দিনের মধ্যে বিক্রেতা গোলামকে আযাদ করে দিল তাহলে সমস্ত ইমামের মতে এই আযাদ করা কার্যকরী হবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে দাসীকে আযাদ করে দেয় তবে তা জায়েয হবে এবং এই আযাদ করা নিজের খিয়ারকে রহিত করা হিসাবে গণ্য হবে। আর ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণাঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য হবে। বিক্রেতা যদি একই কথার দ্বারা উভয়কে আযাদ করে দেয় তবে দাস-দাসী উভয়ই আযাদ হয়ে যাবে এবং তার উপর ওয়াজিব হবে দাসীর মূল্য পরিশোধ করা। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি তাদেরকে আযাদ করে তবে তার এ আযাদকরণ কার্যকরী হবে না। দাসের ক্ষেত্রে হবে না এবং দাসীর ক্ষেত্রেও হবে না। উক্ত মাসআলায় যদি বিক্রেতার পরিবর্তে ক্রেতার জন্য 'খিয়ার' ধার্য করা হয় তবে এ হুকুম পূর্বোক্ত হুকুম থেকে ভিন্নতর হবে। যদি ঐ দাসী গোলাম বিক্রেতার কন্যা হয় এবং খিয়ার গোলাম বিক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঐ দাসী আযাদ হবে না। আর যদি সে তার স্ত্রী হয় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতানুসারে তাদের বিবাহ ফাসিদ হবে না। কিন্তু যদি গোলাম বিক্রেতা তাকে আযাদ করে দেয় তবে তা কার্যকরী হবে এবং এ আযাদ করা তার নিজের খিয়ারকে রহিতকরণ বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। জনৈক ফকীহকে প্রশ্ন করা হয়েছে, এক ব্যক্তি এই শর্তের উপর কোন গোলাম খরিদ করল যে, ক্রেতার জন্য তিন দিনের খিয়ার থাকবে। তাহলে মুদতে খিয়ারের মধ্যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মূল্য তলব করতে পারবে কিনা? জবাবে তিনি বলেছেন যে, এই তিন দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সে তার নিকট মূল্য তলব করতে পারবে না (তাতার খানিয়া : হাবী-এর সূত্রে)।

ফকীহ বংশ (র) বলেন, আমি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মুখে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে গোলাম খরিদ করে তবে ক্রেতার নিকট গোলাম হস্তান্তর করার জন্য আমি বিক্রেতাকে বাধ্য করব না এবং বিক্রেতার নিকট মূল্য হস্তান্তর করার ব্যাপারে আমি ক্রেতাকেও বাধ্য করব না। তবে ক্রেতা যদি বিক্রেতার নিকট মূল্য পরিশোধ করে দেয় তাহলে ক্রেতার নিকট গোলামকে হস্তান্তর করার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করব। এমনিভাবে বিক্রেতা যদি ক্রেতার নিকট গোলাম হস্তান্তর করে দেয় তাহলে ক্রেতাকে বাধ্য করব বিক্রেতার পাওনা পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য এবং তার খিয়ার পূর্বাবস্থায় বহাল থাকবে। বিক্রেতার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হয়েছে। এ অবস্থায় ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধ করে খরিদকৃত গোলামটি হস্তগত করে নিতে চায় এবং বিক্রেতা তা

এ থেকে বারণ করে তবে সে তা করতে পারবে। এরূপ করার তার ইখতিয়ার রয়েছে। তবে প্রাপ্ত মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করা হবে।

৩. মাসআলা : আমাদের ইমামগণ বলেন, খিয়ারে শর্তের অবস্থায় সাফকা তথা লেনদেন পরিপূর্ণ হয় না। খিয়ার যদি বিক্রেতার জন্য হয় অথবা ক্রেতার জন্য হয় এবং বিক্রিত বস্তু একটি হয় বা কয়েকটি হয় তবে এমনটি হতে পারবে না যে, এর কোনটিতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে, আর অপরটিতে জায়েয হবে না। চাই বিক্রিত বস্তু কবজায় থাকুক বা না থাকুক। কেননা এতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার আগে تفريق صفقة (একই লেনদেনে পার্থক্য বিধান করা) লাযিম আসে। অথচ এরূপ করা জায়েয নেই। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হওয়ার পর এরূপ করাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এ অবস্থায় তাফরীকে সাফকা। (تفريق صفقة) জায়েয আছে (মুহীত)। খিয়ার বিক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং বিক্রিত বস্তুর উপর ও কবজা করা হয়ে গেছে। এ অবস্থায় যদি বিক্রিত মালের কিছু খোয়া যায় অথবা কোন ব্যক্তি তা নষ্ট করে দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর কিয়াস অনুসারে বিক্রেতার জন্য জায়েয আছে বাকী বস্তুর ব্যাপারে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বিক্রিত বস্তুগুলো যদি এমন হয় যে, এগুলোর মতো তফাৎ ও ব্যবধান আছে, এহেন অবস্থায় যদি এর অংশ বিশেষ ধ্বংস হয়ে যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে। কাজেই বিক্রেতা বাকী বস্তুর ক্ষেত্রে বিক্রয় চুক্তিতে অপরিহার্য করতে পারবে না। পক্ষান্তরে বিক্রিত বস্তুগুলো যদি মাপার, ওজন করার এবং গণনা করার যোগ্য বস্তু হয়, তারপর যদি এর মধ্য হতে কিছু খোয়া যায় তাহলে বিক্রেতা অবশিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে আক্দ্দকে অপরিহার্য করে দিতে পারবে। বিক্রিত বস্তু ক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় কেউ যদি তা ধ্বংস করে দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর প্রথমোক্ত অভিমত অনুসারে বিক্রেতা এ বিক্রয়কে অবশ্যম্ভাবী ঘোষণা করে ক্রেতার নিকট থেকে এর মূল্য নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর দ্বিতীয় মতে, ক্রেতার সম্মতি ছাড়া বিক্রেতা এই ক্রয়-বিক্রয়কে অপরিহার্য বলে ঘোষণা দিতে পারবে না। দুটি গোলাম খরিদ করার পর বিক্রেতার হাতে থাকাবস্থায় যদি একজন মারা যায় তাহলে ক্রেতার সম্মতি ব্যতিরেকে বিক্রেতা দ্বিতীয় গোলামের ক্রয়কে তার উপর বাধ্যতামূলক করে দিতে পারবে না (হাবী)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হওয়া না হওয়া এবং বাতিল হওয়া না হওয়ার আর বিবরণ।

১. মাসআলা : ক্রেতা, বিক্রেতা বা তৃতীয় ব্যক্তি যার জন্য ইচ্ছাধিকারের শর্ত করা হোক ফকীহদের সর্বসম্মত মতে সে খিয়ারের সময় সীমার মধ্যে চুক্তি অনুমোদন করতে পারে, আবার রদও করতে পারে। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে অর্থাৎ অগোচরে সে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করে তবে তা জায়েয হবে (ফাতহুল কাদীর)

২. মাসআলা : খিয়ারে শর্ত বিক্রেতার হলে চুক্তি অনুমোদন তিন ভাবে হতে পারে। (১) মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)। যেমন সে বলল, আমি তা অনুমোদন

করলাম, বা আমি এতে সম্মত আছি, বা আমি আমার খিয়ারে রহিত করলাম ইত্যাদি (ফতহুল কাদীর)। বিক্রেতা যদি বলে, আমি এটি নেওয়ার ব্যাপারে সংকল্প করেছি, আমি এটি পসন্দ করেছি, এটি আমার পসন্দ হয়েছে অথবা এটি আমার মনের সাথে মিলেছে তাহলে এতে খিয়ার বাতিল হবে না। (২) বিক্রেতার মৃত্যু যদি ঐ সময়ের মধ্যে বিক্রেতা মারা যায় তবে তার মৃত্যুর কারণে খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হয়ে যাবে (শরহত তাহাবী)। (৩) ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমোদন বা রহিতকরণ ছাড়াই অনুমতি সময় সীমা পার হয়ে গেলেও বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)। এমনি ভাবে যদি উক্ত ব্যক্তি বেহুশ বা পাগল হয়ে যায় এবং মুদতে খিয়ারের তিন দিন অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি পাগল বা বেহুশ ব্যক্তি মুদতে খিয়ারের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায় তাহলে এর ফায়সালা কি হবে, এ সম্বন্ধে ইমাম আহমদ তাওয়াবীসী (র) বলেন, এই ব্যক্তি তার খিয়ারের উপর বহাল থাকবে না। পক্ষান্তরে শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, সে তার খিয়ারের উপর বহাল থাকবে। শায়খ (র) বলেন, এই হুকুম কিতাবুল মাযুনে পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (যখীরা)। সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, বেহুশী এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি খিয়ারকে রহিত করে না। বরং ক্রয়-বিক্রয়কে ইখতিয়ার করা বা ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়াকে ইখতিয়ার ব্যতীত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার দ্বারাই কেবল মাত্র খিয়ার রহিত হয়ে যায় (আল্ বাহরুর রায়িক)। অনুরূপ যার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হয়েছে সে যদি ঘুমিয়ে থাকে, আর এ অবস্থায় মুদতে খিয়ার অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। কেউ যদি মদ্যপান করে মাতাল হয়ে যায় তবে তার খিয়ার বাতিল হবে না। এটিই সহীহ অভিমত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। কেউ যদি মুদতে খিয়ারের মধ্যে ভাং সেবনের কারণে মাতাল হয়ে যায় তবে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং যদি মুদতে খিয়ারের মধ্যে তার ভাং এর নেশা দূর হয়ে যায় তাহলে খিয়ারের কারণে তার কোন نصرف তথা হস্তক্ষেপ করা জায়েয হবে না। ইমাম যাহিদ তাওয়াবীসী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সহীহ মতে তার খিয়ার বাতিল হবে না (মুহীত)।

৩. মাসআলা : কেউ যদি মুরতাদ হয়ে যায়, তারপর আবার মুদতে খিয়ারের মধ্যে পুনরায় মুসলমান হয়ে যায় তবে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে সে তার খিয়ারের উপর বহাল থাকবে। আর যদি ঐ মুদতে মধ্যে মুরতাদ অবস্থায় সে মারা যায় বা নিহত হয় সর্বসম্মতভাবে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি মুরতাদ হওয়ার পর হুকুমে খিয়ারের ভিত্তিতে সে কোন হস্তক্ষেপ করে তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা ঐ نصرف (হস্তক্ষেপ) মওকুফ (স্থগিত) থাকবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে তার ঐ কাজ কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য হবে (যখীরা)।

৪. মাসআলা : বিক্রয় চুক্তি রহিত করার সূত্র দুটি। (১) উচ্চারণ দ্বারা (২) আচরণ দ্বারা। উচ্চারণের উদাহরণ এই যে, সে বলল, আমি চুক্তি রদ করলাম। উচ্চারণের সময় ক্রেতা সেখানে হাযির থাকলে রদ করা সহীহ হবে। আদালতের ফায়সালা অথবা সম্মতির

দরকার হবে না। ক্রেতা উপস্থিত না থাকলে 'রদ' সহীহ হবে না। বরং ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ 'রদ' স্থগিত থাকবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে কার্যকর হয়ে যাবে (মুহীত)। এই মতভেদ শুধু উচ্চারণ দ্বারা রদ করার ক্ষেত্রে আচরণ দ্বারা রদ করা হলে সকলেরই মতে ক্রেতা উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত থাকুক চুক্তি রদ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, এখানে অনুপস্থিত থাকা না থাকার অর্থ হল অবগত হওয়া না হওয়া, বিক্রেতা যদি ক্রেতার অনুপস্থিতিতে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দেয়, তারপর ক্রেতা মুদতে খিয়ারের মধ্যে তা জানতে পারে তাহলে 'রদ' পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা ক্রেতা এ সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম হয়েছে। আর যদি মুদত অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে জানতে পারে তাহলে 'রদ' পূর্ণ হওয়ার আগে মুদত অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে আক্দ পূর্ণ হয়ে যাবে। তদ্রূপ বিক্রেতার রদ করার পর ক্রেতার অবগত হওয়ার পূর্বে বিক্রেতা যদি চুক্তি পুনঃ অনুমোদন করে ফেলে তাহলে 'রদ' বাতিল হয়ে চুক্তি বহাল হয়ে যাবে (আল বাহরুর রায়িক)।

৫. মাসআলা : আচরণ দ্বারা চুক্তি রদ করার উদাহরণ এই যে, খিয়ারের সময় সীমার মধ্যে বিক্রিত বস্তুর মধ্যে বিক্রেতা মালিকানা সুলভ কোন আচরণ করল যেমন গোলামকে আযাদ করা ; মুদাক্কর বা তাকে মুকাতাব বানানো ইত্যাদি। তদ্রূপ অন্য কারো কাছে বিক্রি করা বা অন্য কাউকে হিবা করে হস্তান্তর করে দেওয়া। হিবা করার পর হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বিক্রয় চুক্তি রদ হবে না। যদি গোলামকে বন্ধক রেখে তাকে ঐ ব্যক্তির নিকট সোপর্দও করে দেওয়া হয় তবে এতেও বিক্রয় চুক্তি রদ হবে (মুহীত)। যদি বিক্রেতা বিক্রিত বস্তু কারো নিকট ইজারা দেয় তবে কিতাবের কোন কোন স্থানে উল্লেখ আছে যে, এতে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হবে না যদি না তা ইজারা গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করা হয়। আবার কোন কোন স্থানে উল্লেখ আছে যে, এতে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও তা ইজারা গ্রহীতার হাতে সোপর্দ না করা হয়। অধিকাংশ মাশায়িখে কিরাম এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন (যযীরা)। যদি মুদতে খিয়ারের মধ্যে বিক্রেতা-বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেয় তবে ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল(র) বলেন, যদি সে ইখতিয়ার করে নেওয়ার সূরতে বিক্রিত বস্তুটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে তবে তার খিরাদ বাতিল হবে না এবং এ অবস্থায় ক্রেতাও এর মালিক হবে না। আর যদি তামলীক (মালিক বানিয়ে দেওয়া)-এর প্রক্রিয়ায় সে এটি তার নিকট সোপর্দ করে তাহলে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (আল ফুসুলুল ইমাদিয়া)। মোদাকথা হচ্ছে, যদি বিক্রেতা এমন কোন কাজ বা হস্তক্ষেপ করে, যে কাজ ثمن (মূল্য)-এর মধ্যে করা হলে তা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি বলে পরিগণিত হয়, এ জাতীয় কাজ বা হস্তক্ষেপ যদি সে বিক্রিত বস্তুর মধ্যে করে তবে এটি ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গকারী বলে পরিগণিত হবে (বাদায়ে)।

৬. মাসআলা : মূল্য পরিশোধের বিষয়টি ক্রেতার যিম্মায় থাকবে অর্থাৎ মূল্যটি সে নগদ পরিশোধ করছে না এ জাতীয় মূল্যের বিনিময়ে কেউ একটি গোলাম এই শর্তে বিক্রি করল যে, এতে তার তিন দিনের খিয়ার থাকবে। তারপর মুদতে খিয়ারের মধ্যে বিক্রেতা ক্রেতাকে সে মূল্য হিবা করে দিল কিংবা সে তাকে এর থেকে দায়মুক্ত করে দিল অথবা সে ঐ মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতার নিকট হতে কোন বস্তু খরিদ করল তবে তার ক্রয় করা, দায় মুক্ত করে

দেওয়া এবং হিবা করা সবই সহীহ হবে এবং খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যে মূল্য যিম্মায় রাখা হয় তা মালসামানের মতই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এমনিভাবে ক্রেতার যিম্মায় যে মূল্য ছিল এর বিনিময়ে বিক্রেতা যদি ক্রেতার মালের দাম-দস্তুর ঠিক করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (বাদায়ে)। পক্ষান্তরে যদি বিক্রেতা ক্রেতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট থেকে এ জাতীয় মূল্যের বিনিময়ে কোন বস্তু খরিদ করে তবে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং তার ক্রয়ও সহীহ হবে না। আর মূল্য যদি ক্রেতার নিকট কর্তৃক হিসাবে থাকে এবং পরে ক্রেতা তা আদায় করে দেয়, তারপর বিক্রেতা তা কবজা করে এর থেকে কিছু খরচ করে ফেলে তাহলে এ অবস্থায় তার খিয়ার বাতিল হবে না। তদ্রূপ বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট সোপর্দ করে দিলেও তার খিয়ার বাতিল হবে না। খিয়ার যদি ক্রেতার হয় এবং বিক্রেতা যদি মূল্য মাফ করে দেয় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার দায়-মুক্তকরণ সহীহ হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি মুদতে খিয়ার অতিক্রান্ত হওয়া বা মুদতে খিয়ারের মধ্যে খিয়ারকে রহিতকরণের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় তবে বিক্রেতা কতৃক ক্রেতাকে দায়মুক্ত করার বিষয়টি কার্যকরী হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মোট কথা এই যে, 'বিক্রয়' যদি নির্দিষ্টতা গুণসম্পন্ন হয় বিক্রেতা যদি তা কবজা করে তাতে কোন রূপ হস্তক্ষেপ করে যেমন বিক্রি করা বা হিবা করা ইত্যাদি তাহলে এই হস্তক্ষেপ বিক্রয় চুক্তিকে বহাল রাখা বলে গণ্য হবে। আর 'বিক্রয় মূল্য' যদি নির্দিষ্টতা গুণসম্পন্ন না হয়। যেমন দিরহাম দীনার তাহলে তা কবজা করার পর বিক্রেতা, ক্রেতা বা অন্য কারো সঙ্গে এতে হস্তক্ষেপ করা দ্বারা বিক্রয় চুক্তির অনুমোদন সাব্যস্ত হবে না। আর যদি মূল্য 'কবজা' করার আগে বিক্রেতা ক্রেতার সাথে মিলে তাতে হস্তক্ষেপ করে, যেমন ঐ মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতার নিকট হতে কোন খরিদ করল অথবা মূল্যের পরিমাণ এক হাজার দিরহাম ছিল। এর বিনিময়ে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে বাইয়ে সরফের ভিত্তিতে একশ' দীনার খরিদ করল। এটা বিক্রয় চুক্তিকে অনুমোদন বলে গণ্য হবে (মুহীত)।

৭. মাসআলা : কেউ যদি ইচ্ছাধিকারের শর্তে দুটি গোলাম খরিদ করে এবং নিজের দখলে নেয় এরপর তাদের একজন মারা যায় বা তার হকদার বের হয় তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতা সম্মত হলেও দ্বিতীয়টির ক্রয়-বিক্রয় কেননা খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে যে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় হুকুমের দিক থেকে তা প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় রূপে সংঘটিত হয় না। সুতরাং দুই গোলামের কোন একজনের মারা যাওয়ার পর অন্যটির ব্যাপারে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান নতুনভাবে এই অংশের মাঝে আক্দ করার নামান্তর। কাজেই এই আক্দ জায়েয হবে না। যদি বিক্রয়কারী ব্যক্তি উভয় গোলামের জীবদ্দশায় এ কথা বলে যে, আমি এই নির্দিষ্ট গোলামের বিক্রয় ভেঙ্গে দিলাম অথবা আমি তাদের একজনের বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে দিলাম তাহলে তার এভাবে ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়া বাতিল বলে গণ্য হবে। কাজেই উভয় গোলামের ক্ষেত্রে তার খিয়ার পূর্ববৎ বহাল থাকবে। তদ্রূপ কেউ যদি ইচ্ছাধিকারের শর্তে একটি গোলাম বিক্রি করে, তারপর বলে যে, এর অর্ধেকের মধ্যে আমি বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দিলাম, তাহলে এটিও বাতিল বলে গণ্য হবে। তিন দিনের ইচ্ছাধিকারের শর্তে কেউ যদি

খেলুর বিক্রি করে, আর খিয়ারের সময়সীমার মধ্যে ডিম হতে বাচ্চা বের হয় অথবা খেলুর পুরামাত্রায় পেকে যায় তবে খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। আর খিয়ার ক্রেতার জন্য হলে এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হলে তার খিয়ার বাকী থাকবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি উপরোক্ত অবস্থায় কারো জন্যই খিয়ার না থাকে তবে ক্রয়-বিক্রয় বহাল থাকবে এবং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে তা কবুল করতে পারে আবার বর্জনও করতে পারে (আল ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)।

৮. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি যমীন বিক্রি করল এই শর্তে যে, এতে তার তিন দিনের খিয়ার থাকবে। তারপর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের তাদের পরস্পর বিনিময় কৃত মালামাল কবজা করে নিল। এরপর বিক্রেতা তিন দিনের মধ্যে বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে দিল। তাহলে এই যমীন ক্রেতার নিকট তার প্রদত্ত মূল্যের জামানত হিসাবে বাকী থাকবে। এ পর্যায়ে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে প্রদত্ত মূল্য পরিশোধের জন্য ঐ জমিটি আটকিয়েও রাখতে পারবে। তারপর বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে এক বছর পর্যন্ত ঐ জমিতে চাষাবাদ করার জন্য অনুমতি দেয় এবং সে তাতে চাষাবাদ করে তবে এ যমীন তার নিকট আমানত হিসাবে থাকবে। প্রাপ্ত মূল্য পরিশোধ করার আগে যখন ইচ্ছা সে এই জমি ক্রেতার নিকট থেকে নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু প্রদত্ত মূল্য উসূল করার জন্য ক্রেতা এই জমিটি আর আটক রাখতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ক্রেতা যদি জমিতে ফসল বপন করে তবে তার ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে এরূপ যমীনের উজরত অনুপাতে উজরত প্রদান করে তা নিজের রেখে দিবে এবং ফসল কর্তন করা পর্যন্ত বিক্রেতাকে এ জমি কবজায় নেওয়া থেকে বারণ করবে। জমিতে ফসল বপন করার পর ক্রেতা যদি মূল্য ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত বিক্রেতাকে জমির কবজা দিতে না চায়, তাহলে সে তা করতে পারে না। যদি ক্রেতা ফসল পাকা পর্যন্ত এরূপ জমির যা উজরত হয় তা দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং যমীনের ফসলাদি উপড়িয়ে ফেলাও অপসন্দ করে বরং সে যমীনের মালিকের নিকট হতে ফসলের জরিমানা আদায় করতে চায় তাহলে তার এরূপ করার ইখতিয়ার থাকবে। তবে এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে। যদি জমির মালিক ফসল পাকা পর্যন্ত তাকে উক্ত জমিতে ফসল করার জন্য অনুমতি প্রদান করে থাকে। কিন্তু যদি জমির মালিক কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই তাকে উক্ত জমিতে ফসল কাটা পর্যন্ত ফসল করার জন্য ছেড়ে দিতে সম্মত হয় তাহলে তার উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না (মুহীত)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে গোলাম বিক্রি করার পর তাকে বলে যে, তুমি আযাদ, যদি তুমি গৃহে প্রবেশ কর অথবা বলে, তুমি যদি গৃহে প্রবেশ কর তবে তুমি আযাদ, তাহলে তাতে বিক্রয় চুক্তি রদ হবে না। তদ্রূপ বিক্রেতা যদি ঐ গোলামকে বলে যে, তুমি আযাদ অথবা বলে যে, অমুক গোলামটি আযাদ তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুনতাকা)। আর এই শেষোক্ত মাসআলা হিশাম ও বিশর (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যদি ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে মুদতে খিয়ার অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব তথা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এবং ঐ দ্বিতীয় গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (যখীরা)।

১০. মাসআলা : যাঁতা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি ক্রয়-বিক্রেতার খিয়ার থাকে, আর সে তা দ্বারা আটা পেষার কাজ করে তবে তাতে চুক্তি রদ হবে। ক্রেতার খিয়ার থাকা অবস্থায় সে যদি যাঁতার অবস্থা বুঝার জন্য পেষণের কাজে করে, তাহলে তার খিয়ার রহিত হবে না। অবশ্য যদি বুঝার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী মাত্রায় পেষণ করে তবে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন, এক রাত ও একদিনের বেশী পেষণ করা অধিক পেষণ বলে গণ্য হবে। আর এর থেকে কম হলে তা কম পেষণের মধ্যে গণ্য হবে। তা দ্বারা খিয়ার বাতিল হবে না (মুখতারুল ফাতাওয়া)।

১১. মাসআলা : যদি বিক্রিত বস্তু কবজা করার পূর্বে হালকা বা নষ্ট হয়ে যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। চাই খিয়ার ক্রেতার জন্য থাকুক বা বিক্রেতার জন্য থাকুক অথবা উভয়ের জন্য তা সাব্যস্ত হোক। আর যদি তা কবজার পর নষ্ট হয় বা খোয়া যায় তাহলে দেখতে হবে খিয়ার কার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে। যদি বিক্রেতার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হয়ে থাকে তবে এ অবস্থায়ও ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বিক্রিত বস্তু এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, এই বস্তুতে আর নতুন করে আকৃদ করার কোন সুযোগ নেই। কাজেই এ ক্ষেত্রে আকৃদের ব্যাপারে অনুমতি প্রদানের আর কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব আকৃদ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং ক্রেতার উপর অপরিহার্য হবে এর বাজার মূল্য পরিশোধ করা যদি উক্ত বস্তুটির অনুরূপ কোন বস্তু (مثل) না থাকে। পক্ষান্তরে এটি যদি مثل অর্থার্থ এমন বস্তু হয় যার মত আরো বস্তু আছে তাহলে ক্রেতার উপর অপরিহার্য হবে বিক্রেতাকে এর مثل (অনুরূপ বস্তু) পরিশোধ করা। আর খিয়ার চুক্তি বাতিল হবে না। কিন্তু খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। অর্থার্থ ক্রয়-বিক্রয় অবধারিত হয়ে যাবে এবং ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে (বাদায়ে)।

১২. মাসআলা : মুনতাকা গ্রহে আছে, কেউ যদি খিয়ারের শর্তে একটি দাসী বিক্রয় করে এবং ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করল। আর ক্রেতা খিয়ারের সময় সীমার মধ্যে তাকে আযাদ করে বিবাহ দেয়। তারপর বিক্রেতা অনুমোদন করে তাহলে ক্রেতার আযাদ করা বা বিবাহ দেওয়া জায়েয হবে না। কেননা বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করে এবং ক্রেতার জন্য তার যৌনাঙ্গকে হালাল ঘোষণা করে বিবাহকে নাকচ করে দিয়েছে। কাজেই তার আযাদ করা এবং বিবাহ দেওয়া জায়েয হবে না। যদি স্বামী তার সাথে সহবাস করে এবং সে কুমারী হয়; এরপর বিক্রেতা তার ক্রয় বিক্রয়কে বাতিল করে দেয় এবং সহবাসের কারণে যদি দাসীর মূল্য একশত দিরহাম পরিমাণ হ্রাস পেয়ে যায় আর 'সহবাস-দণ্ড' দুই শত দিরহাম সাব্যস্ত হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার ইখতিয়ার। সে দাসীর স্বামী থেকে সম্পূর্ণ 'সহবাস-দণ্ড' আদায় করে নিবে। তবে স্বামী এই টাকা ক্রেতা থেকে ফেরত উসূল করতে পারবে না। অথবা সহবাসের ক্ষতি (একশত দিরহাম) অর্থ ক্রেতার নিকট থেকে আদায় করতে পারে আর ক্রেতা সেটা সহবাসকারী স্বামীর নিকট থেকে উসূল করে নিবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় ক্রেতা যদি দাসীকে কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করে, এরপর বিক্রেতা বিক্রয় অনুমোদন করে, আর 'কৌমার্যরহিত' হওয়ার কারণে সহবাস দ্বারা দাসীর 'মূল্য ক্ষতি' না হয় তাহলে ঐ বিবাহ ফাসিদ বলে গণ্য হবে। যদি ক্রেতা বিবাহ ভঙ্গ

করে দেয়। আর যদি ভঙ্গ না করে তবে বাতিল হবে না। কেননা বিক্রেতার অনুমোদনের কারণে ক্রেতার জন্য ঐ দাসীর যৌনাঙ্গ আর বৈধ থাকেনি। উল্লেখ্য যে, ক্রেতা যদি বিবাহকে ভেঙ্গে দেয় তাহলে সে সহবাসকারী স্বামীর নিকট থেকে মহরে মিছিল আদায় করে নিতে পারবে। আর সহবাসের কারণে যদি দাসীর মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় তাহলে বিক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় দাসীর সাথে যে সহবাস করা হয়েছে তজন্য ক্রেতা তাকে বিক্রেতার নিকট রদ করে দিতে পারবে না। অবশ্য যদি যিনার তরীকায় তার সাথে সহবাস করা হয় তবে তা আয়েব এবং অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এ কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দিয়ে দিতে পারবে (মুহীত)।

১৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি তিন দিনের খিয়ারের শর্তে একটি ঘর বিক্রি করল তারপর ক্রেতা নির্দিষ্ট কিছু দিরহাম অথবা নির্দিষ্ট কোন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় চুক্তি অনুমোদনের জন্য বিক্রেতার সাথে সমঝোতা করল। এটা জায়েয আছে। ক্রেতার পক্ষ হতে অতিরিক্ত মূল প্রদান বলে গণ্য হবে। এমনি ভাবে খিয়ার যদি ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হয় এবং বিক্রেতা ক্রেতার সাথে এ মর্মে আপোষ মীমাংসা করে যে, তুমি খিয়ার রহিত করে দাও, তাহলে আমি তোমার দেয় মূল্য হতে এই পরিমাণ কমিয়ে দিব অথবা এই পরিমাণ মাল বিক্রিত বস্তুর সাথে তোমাকে আরো বাড়িয়ে দিব, তাহলে এরূপ করাও জায়েয আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) কেউ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কোন গোলাম এই শর্তে বিক্রি করল যে, এতে বিক্রেতার তিন দিনের খিয়ার থাকবে। তারপর ক্রেতা এক হাজার দিরহামের স্থলে একশ' দীনার প্রদান করল। তারপর বিক্রেতা ঐ ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দিল। তাহলে এতে বাইয়ে সরফও বাতিল হয়ে যাবে। এ অবস্থায় বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে ক্রেতার দেওয়া দীনারসমূহ ফেরত দিয়ে দেওয়া (মুহীত)।

১৪. মাসআলা : হিশাম (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিন দিনের খিয়ারে শর্তে কেউ একটি বাড়ি বিক্রি করল। এদিকে ক্রেতা চুক্তিকে অবশ্যম্ভাবী করার জন্য নিজ গৃহে তিন দিন পর্যন্ত আত্মগোপন করে থাকল তাহলে এটিকে ওযর হিসাবে গ্রহণ করা হবে কিনা এবং তার কাছে কোন সংবাদ বাহক পাঠানো হবে কিনা? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ, আমি তার নিকট সংবাদ বাহক পাঠাব। যদি বের হয়ে আসে তবে ভাল। অন্যথায় আমি তার খিয়ারকে বাতিল করে দিব। হাঁ, সে যদি তিন দিনের মধ্যে বেরিয়ে আসে তবে স্বতন্ত্র কথা। হিশাম (র) বলেন, তারপর আমি বললাম, যদি সে ব্যক্তি মুদতে খিয়ারের তিন দিনের মধ্যে না আসে বরং তৃতীয় দিনে এমন সময় আসে যে, আপনি তখন আর সংবাদ বাহক পাঠাতে পারছেন না। এহেন অবস্থায় সে এসে খিয়ার বাতিল করে দেওয়ার জন্য আবেদন জানাল, তাহলে কি করা হবে? জবাবে ইমাম সাহেব বললেন, আমি এরূপ করব না। অর্থাৎ খিয়ার বাতিল করব না। হিশাম (র) বলেন, তারপর আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, যদি অভিযোগকারী বলে যে, আমি সংবাদবাহক পাঠিয়েছি এবং সাক্ষী রেখেছি, তারপর সে আমার হতে গোপন হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় আমি কি কিছু লোককে সাক্ষী বানাব? (যাতে তারা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আমি বিবাদীকে লোক

পাঠিয়ে তালাশ করেছি) জবাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বললেন, এ অবস্থায় আমি বলব, হে লোক সকল! তোমরা সাক্ষী থাক, এই লোক বলেছে; আমার সাথে যার বিবাদ আমি তার নিকট তিন দিন সংবাদবাহক পাঠিয়েছি, সে আমার নিকট হতে পালিয়ে থাকত। এই ব্যক্তি যা বলছে যদি অবস্থা তদ্রূপই হয় তাহলে আমি তার খিয়ারকে বাতিল করে দিলাম। তারপর যদি ক্রেতা বের হয় এবং সে এই বিষয়টি অস্বীকার করে তবে আমি অভিযোগকারীর নিকট খিয়ার এবং সংবাদ বাহক পাঠানোর উপর সাক্ষী তলব করব (যখীরা)।

১৫. মাসআলা : তিন দিনের খিয়ারের শর্তে কেউ কোন বস্তুর খরিদ করল, তারপর চুক্তি রদ করার জন্য সময়সীমার মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট গমন করল। কিন্তু বিক্রেতা তার থেকে আত্মগোপন করে থাকল। তারপর ক্রেতা-বিচারকের আদালতে মুকাদ্দমা দায়ের করল, যাতে বিচারক বিক্রেতার পক্ষ হতে কোন ব্যক্তিকে প্রতিপক্ষ নিযুক্ত করে তার সামনে চুক্তি রদ করে দেন। এ ক্ষেত্রে কোন কোন ফকীহ বলেন, ক্রেতার কল্যাণার্থে বিচারক তা করবেন। কিন্তু ফকীহ মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র) বলেন, বিচারক তা করতে পারেন না। কেননা আত্মগোপনের সম্ভাবনা সত্ত্বেও ক্রেতা যখন বিক্রেতার পক্ষে কাউকে উকীল না বানিয়ে ঐ মাল খরিদ করেছে, অথচ তার আত্মগোপনে তখন ক্রেতা নিজেই তো নিজের কল্যাণের বিষয়টি হাতছাড়া করেছে কাজেই তাকে দয়া করার কিছু নেই। যদি বিচারক কাউকে প্রতিপক্ষ মনোনীত না করেন এবং ক্রেতা বিচারকের নিকট সংবাদ বাহক পাঠানোর জন্য আবেদন জানায় তাহলে কি করা হবে, এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে বিচারক তার আবেদন মঞ্জুর করতঃ বিক্রেতার গৃহে সংবাদ বাহক পাঠাবেন। সে তার বাড়ির দরজায় গিয়ে বলবে, বিচারক বলছেন যে, তোমার অমুক প্রতিপক্ষ 'ক্রয়' বাতিল করতে চায়। যদি তুমি হাযির হও তবে ভাল কথা। অন্যথায় আমি তা বাতিল করে দিব। বিচারক সংবাদ বাহক পাঠানো ছাড়া 'ক্রয়' বাতিল করবেন না। দ্বিতীয় বর্ণনা মতে বিচারক বার্তাবাহক পাঠানোর উক্ত দরখাস্ত মঞ্জুর করবেন না। তখন ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এ অবস্থায় ক্রেতার কি করণীয়? তিনি বললেন, যদি ক্রেতার মনে বিক্রেতার আত্মগোপনের আশংকা থাকে তাহলে চুক্তিকালেই বিক্রেতার পক্ষ হতে কোন নির্ভরশীল ব্যক্তিকে উকীল মনোনীত করে ক্রেতাকে আশংকা মুক্ত হতে হবে। তখন বিক্রেতা আত্মগোপন করলে ক্রেতা উকীলের কাছেই রদ করতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা : কেউ যদি তিন দিনের খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে দ্রুত পচনশীল কোন বস্তুর খরিদ করে তবে কিয়াস অনুসারে ক্রেতার উপর কোন জবরদস্তি করা যাবে না। আর সূক্ষ্ম কিয়াস অনুসারে ক্রেতাকে বলা হবে, হয় তুমি চুক্তি রদ কর অথবা বিক্রিত বস্তু নিয়ে নাও। তোমার উপর কোন মূল্যদায় আসবে না, যতক্ষণ না তুমি অনুমোদন দাও অথবা বিক্রিত বস্তু তোমার নিকট বিনষ্ট হয়ে যায়। এ বিধানের উদ্দেশ্য উভয়ের ক্ষতি রোধ করা (ফাতহুল কাদীর)। দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যায় এরূপ কোন বস্তু যদি কেউ পাকাপাকিভাবে কারো নিকট বিক্রি করে, তারপর ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করা ও খরিদকৃত বস্তু কবজা করার আগেই যদি অদৃশ্য হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে এটি অন্য কারো নিকট বিক্রি

করে দিতে পারবে। যদি ও সে এ কথা জানে যে, এটি আগেও একবার বিক্রি করা হয়েছিল (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা : যদি বিক্রেতা ও ক্রেতা যার অনুকূলেই খিয়ারের শর্ত থাকুক সে যদি বলে, “আমি যদি আজ এরূপ না করি তবে আমার খিয়ার বাতিল” তাহলে তার খিয়ার বাতিল হবে না। অনুরূপ ভাবে যদি দোযের খিয়ারের ক্ষেত্রেও যদি এরূপ বলে তাহলে একই হুকুম হবে। যদি উক্ত কথার পরিবর্তে এরূপ বলে, যদি আমি আজ এ কাজটি না করি তবে আমি আমার খিয়ারকে আগামীকাল বাতিল করছি অথবা বলে আমার খিয়ার বাতিল করছি যখন আগামী কাল আসবে, তারপর আগামীকাল আসল। উক্ত মাসআলার হুকুম কী? এ সম্বন্ধে মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এতে খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এই অভিমতিটি প্রথমটির অনুরূপ নয়। কেননা (আগামী কালের) এই সময়টি অবশ্যই আসবে কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতিটি এর থেকে ভিন্নতর (যহীরিয়া)। কেউ কোন দাসীকে কোন গোলামের বদলে এই শর্তে বিক্রি করল যে, দাসীর মধ্যে তার খিয়ার থাকবে। তারপর গোলামকে হিবা করা বা তাকে বিক্রয়ের জন্য পেশ করা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু দাসীকে বিক্রয়ের জন্য পেশ করা বিদ্বতম মতানুসারে ক্রয়-বিক্রয়কে ভেঙ্গে দেওয়ার নামান্তর (আল-বাহরুর রায়িক)।

১৮. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি দাসী খরিদ করল এই শর্তে যে, এতে তার খিয়ার থাকবে। তারপর ক্রেতা অন্য কোন দাসীকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে বলল, এই তোমার সেই দাসী যাকে আমি তোমার নিকট হতে খরিদ করেছিলাম, তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এহেন অবস্থায় বিক্রেতার জন্য জায়েয হবে ঐ দাসীকে গ্রহণ করত তার সাথে সহবাস করা (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)। বিশর (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানের নিকট আগুরের শিরা এই শর্তে বিক্রি করল যে, এতে বিক্রেতার খিয়ার থাকবে। তারপর ক্রেতা তা কবজা করে নিল এবং তার হাতে পৌছার পর সেটি মদ হয়ে গেল, এহেন অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে। এই মাসআলা সম্পর্কে মুনতাকা কিতাবে উল্লেখ আছে যে, উক্ত অবস্থায় ক্রেতাকে বিক্রেতার আগুরের শিরার জামানত দিতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। হাকিম আবুল ফযল (র) বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র) অপর এক স্থানে বলেছেন যে, বিক্রেতা তার খিয়ারের উপর বহাল থাকবে। যদি সে তিন দিন অতীত হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে তবে ক্রেতার জন্য বিক্রিত বস্তু গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে যাবে। তারপর বিশর (র) ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন এর উপর ভিত্তি করে তিনি কথা বলেছেন যে, যদি তারা পরস্পর ঝগড়া না করে আর ইতিমধ্যে শরাব সিরকা হয়ে যায়, তার পর বিক্রেতা নিজের খিয়ার অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয়ের অপরিহার্যতাকে ইখতিয়ার করে নেয় তবে বিক্রেতার সে ইখতিয়ার হাসিল হবে এবং প্রসিদ্ধ রিওয়ায়েত অনুসারে এ পর্যায়ে ক্রেতার সম্মতির বিষয়টি ধর্তব্য হবে না (যখীরা)।

১৯. মাসআলা : মুনতাকা কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কেউ একটি গোলাম এই শর্তের উপর বিক্রি করল যে, এতে বিক্রেতার খিয়ার থাকবে। তারপর সে ঐ গোলামকে ব্যবসা করার

জন্য অনুমতি প্রদান করল তাহলে ইহা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা বলে গণ্য হবে না। কিন্তু তখনই ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হবে যদি গোলাম ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঋণগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার পর বিক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করতে চায় তবে তা জায়েয হবে না (মুহীতঃ সারাখাসী)। কেউ তার নিজ গোলাম এই শর্তের ভিত্তিতে বিক্রি করল যে, এতে তার তিন দিনের খিয়ার থাকবে। তারপর বিক্রেতা তাকে ক্রেতার নিকট সোপর্দ করে দিয়ে আবার ক্রেতার নিকট হতে তাকে গসব (জোরপূর্বক ছিনিয়ে) করে আনল। তাহলে এটি ক্রয়-বিক্রয়কে ভঙ্গ করা এবং খিয়ারকে বাতিল করে দেওয়া বলে গণ্য হবে না (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)। কেউ কোন গোলাম এই শর্তের ভিত্তিতে বিক্রি করল যে, এতে বিক্রেতার খিয়ার থাকবে। তারপর ক্রেতা গোলামটি কবজা করে নিল। ইত্যবসরে ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় গোলাম যদি কোন লোককে হত্যা করে, এরপর সে নিজেও মারা যায় এবং ক্রেতা বিক্রেতাকে জরিমানা স্বরূপ এর মূল্য পরিশোধ করে দেয় তাহলে নিহত ব্যক্তির ওলী ওয়ারিসগণ বিক্রেতার নিকট হতে তার মূল্য নিয়ে নিবে। তারপর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে অনুরূপ পরিমাণ অর্থদণ্ড উসূল করে নিতে পারবে। এই মাসআলা গসবের মাসআলার অনুরূপ। কেউ এই শর্তের ভিত্তিতে কোন গোলাম বিক্রি করল যে, এতে তার খিয়ার থাকবে। গোলাম তখনও বিক্রেতার কবজায় আছে। তারপর বিক্রেতা তিন দিনের মধ্যে বলল যে, আমি উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দিলাম। এরপর আবার সে বলল, আমি উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করলাম এবং ক্রেতাও তা কবুল করে নিল, তাহলে ইসতিহসানের দৃষ্টিতে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। উপরোক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি বিক্রিত গোলামের উপর কোন জিনায়েত (ক্ষয়-ক্ষতি) করে বসে এবং গোলামের লোকসান হয়, তা সত্ত্বেও ক্রেতা বলে যে, এ অবস্থায়ই আমি তা নিতে চাই তাহলে ক্রেতা তাকে নিতে পারবে না। এরূপ করার তার কোন অধিকার থাকবে না। কিন্তু বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে ঐ গোলাম সোপর্দ করে দেয় তবে তা গ্রহণ করা ক্রেতার জন্য জায়েয হবে (মুহীত)।

২০. মাসআলা : বিক্রেতার খিয়ার ছিল, এমতাবস্থায় যদি কোন আজনবী (তৃতীয়) ব্যক্তি বিক্রিত গোলামকে ধ্বংস তবে এতে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হবে না এবং বিক্রেতার খিয়ার পূর্বাবস্থায় বহাল থাকবে। যদি বিক্রিত গোলাম ক্রেতার কবজায় থাকুক বা বিক্রেতার কবজায় থাকুক। যদি বিক্রেতা ইচ্ছা করে তবে সে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দিয়ে অপরাধী ব্যক্তির নিকট হতে ক্ষতিপূরণ উসূল করে নিতে পারবে। এমনি ভাবে যদি বিক্রিত গোলামকে ক্রেতা নিজে হলাক করে দেয় তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দিয়ে ক্রেতার নিকট থেকে এর জরিমানা উসূল করে নিতে পারবে। আর ইচ্ছা করলে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করতঃ ক্রেতার নিকট থেকে তার মূল্যও আদায় করে নিতে পারবে। বিক্রিত বস্তু বিক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় আয়েবদার হয়ে যায় তাহলে এর কারণ তলিয়ে দেখতে হবে। বস্তুতঃ এই দোষ যদি প্রকৃতিক কারণে অথবা বিক্রিত বস্তুর নিজস্ব আচরণে হয়ে থাকে তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না। এবং বিক্রেতার খিয়ার বহাল থাকবে। সুতরাং সে চুক্তি রদ করতে পারবে এবং অনুমোদনও করতে পারবে, অনুমোদন করলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে সে পূর্ণ মূল্য দিয়ে বস্তুটি গ্রহণ করতে পারে, কিংবা তা বর্জন ও করতে

পারে। কেননা কবজায় আগে বিক্রিত বস্তুতে পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে। আর এই লোকসান বিক্রেতার কোন কাজের দ্বারা হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু তৃতীয় কারো দ্বারা হলে বাতিল হবে না বরং বিক্রেতার খিয়ার বহাল থাকবে। সুতরাং সে চুক্তি রদ করে দোষ সৃষ্টিকারী থেকে জরিমানা আদায় করতে পারে, আবার চুক্তি অনুমোদন করে ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য উসূল করতে পারে তখন ক্রেতা ঐ তৃতীয় ব্যক্তি থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিবে। বিক্রিত বস্তু যদি ক্রেতার কোন কর্মের দ্বারা আয়েবদার তথা দোষী হয়ে যায় তাহলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না। আর বিক্রেতাও তার খিয়ারের উপর বহাল থাকবে। সে ইচ্ছা করলে সে ক্রয়-বিক্রয়কে ভেঙ্গে দিয়ে ক্রেতার নিকট হতে এর জরিমানা উসূল করে নিবে। আর যদি ইচ্ছা করে তবে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করতঃ বিক্রেতার নিকট থেকে এর মূল্য নিয়ে নিতে পারবে। আর এই ভাবে যদি বিক্রিত বস্তু ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় কোন আজনবী বা বাইরের লোকের কর্ম দ্বারা অথবা ক্রেতার কাজের দ্বারা অথবা প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগের কারণে খুঁত বিশিষ্ট হয়ে যায় তাহলেও বিক্রেতার খিয়ার বহাল থাকবে। বিক্রেতা চুক্তি অনুমোদন করতে পারে, রদও করতে পারে। সুতরাং যদি সে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করে তবে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে পূর্ণ মূল্য উসূল করে নিবে। তবে তৃতীয় কারো কাজ দ্বারা বিক্রিত বস্তুতে খুঁত সৃষ্টি হলে ক্রেতা তার থেকে জরিমানা উসূল করতে পারবে। আর যদি বিক্রেতা চুক্তি রদ করে এবং খুঁত যদি ক্রেতার কাজ দ্বারা কিংবা প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি হয় তাহলে বিক্রেতা ঐ খুঁত বিশিষ্ট বস্তু এবং ক্ষতিপূরণ ক্রেতার থেকে নিয়ে নিবে। আর খুঁত যদি তৃতীয় কারো দ্বারা সৃষ্টি হয় তাহলে বিক্রেতার ইখতিয়ার, সে তৃতীয় ব্যক্তি বা ক্রেতা থেকে জরিমানা উসূল করতে পারবে, দ্বিতীয় ছরতে ক্রেতা তৃতীয় ব্যক্তি থেকে আদায় করে নিবে (বাদায়ে)। আবু সূলায়মান (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সূত্রে আমালী গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, যদি বিক্রিত বস্তু বিক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় কোন জিনায়েত তথা অপরাধ মূলক কাজ করে এবং খিয়ার বিক্রেতার থাকে, এহেন অবস্থায় বিক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দেয় তাহলে বিক্রেতা হয়তো বিক্রিত বস্তু দিয়ে দিবে অথবা এর ফিদ্যা (রক্তপণ) দিয়ে দিবে। আর সে যদি ক্রয়-বিক্রয় বাকী রাখে অথবা এ বিষয়ে চুপ থাকে, ইত্যবসরে মুদতে খিয়ার অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং ক্রেতা এই আক্দ কবুল করে নেয় এবং রাযী হয়ে যায় সে গোলামের উক্ত অপরাধ জনিত আয়েবের ব্যাপারে তাহলে ক্রেতা হয়তো ঐ বিক্রিত গোলামকে দিয়ে দিবে অথবা এর ফিদ্যা প্রদান করবে (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা : কেউ যদি খিয়ারের শর্তে আপন পুত্রকে খরিদ করে আর ক্রেতা মারা যায় এবং বিক্রেতা চুক্তি অনুমোদন করে, তাহলে পুত্র আযাদ হয়ে যাবে এবং পুত্র তার পিতার ওয়ারিস হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মুকাতাব বা 'অনুমতিপ্রাপ্ত' গোলাম যদি খিয়ারে শর্তে কোন বস্তু বিক্রি করে এবং তারপর মুকাতাব কিতাবাতের অর্থ আদায়ের অক্ষম হয়ে পড়ে অথবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে যায় আর এ অবস্থায় খিয়ারের সময়সীমার মধ্যে হয় তাহলে সমস্ত ইমামের মতে ক্রয়-বিক্রয় অপরিহার্য হয়ে যাবে এবং খিয়ারে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে (আল-ইয়ানাবী)। খিয়ারের শর্তে কেউ একটি বকরী বিক্রি

করল তারপর খিয়ারের সময়সীমা মধ্যে বকরীর পশম কেটে নিল তাহলে এ কাজ চুক্তি রদ বলে গণ্য হবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়া)। কেউ যদি নিজের খিয়ারে শর্ত ধার্য করে কোন দাসী বিক্রি করে এবং তার নিকটে থাকা অবস্থায় যদি সন্দেহজনিত ভাবে দাসীর সাথে সহবাস করা হয় তবে এতে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। কেউ কোন দাসী বিক্রি করল এই শর্তে যে, এতে তার তিন দিনের খিয়ার থাকবে। তারপর এই দাসী যদি ক্রেতা বা বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় কোন মাল কামাই করে কিংবা কোন সন্তান প্রসব করে তাহলে এই অতিরিক্ত বিষয়- সমূহকে মূল বিষয়ের সাথে যোগ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ যদি ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয়ে যায় তবে ক্রেতা এগুলোর হকদার হবে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যায় তবে বিক্রেতা এই সমস্তের হকদার হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উল্লেখ্য যে, খিয়ার যদি ক্রেতার জন্য সাব্যস্ত হয় তবে ক্রয়-বিক্রয় কার্যকরী হবে পূর্বোল্লিখিত তিন প্রক্রিয়ায় এবং তা ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় কার্যকরী হওয়ার আরো একটি প্রক্রিয়া আছে। তা হল, বিক্রিত বস্তুর মাঝে ক্রেতা ব্যক্তির মালিকানাশুলভ কোন হস্তক্ষেপ করা এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, খিয়ার শর্তের ভিত্তিতে খরিদকৃত বস্তুর মধ্যে ক্রেতা যদি এমন কোন কাজ বা হস্তক্ষেপ করে যে কাজ করা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিমিত্তে তার জন্য আবশ্যিক ছিল এবং যে কাজ করা কোন এক অবস্থায় মালিকানাহীন বস্তুতেও তার জন্য বৈধ ছিল, এ জাতীয় কাজ একবার করা ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণ করে নেওয়ার দলীল নয়। কাজেই তার খিয়ার রহিত হবে না। কিন্তু যদি খরিদকৃত বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার নিমিত্তে ক্রেতার এ জাতীয় কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা না দেয় অথবা প্রয়োজনীয়তা তো আছে বটে কিন্তু এ জাতীয় কোন কাজ কোন অবস্থাতেই মালিকানাহীন বস্তুতে করা বৈধ হয় না তাহলে এটি ক্রয়-বিক্রয়কে গ্রহণ করে নেওয়া বলে গণ্য হবে (যখীরা)।

২২. মাসআলা : খিয়ারের শর্তে খরিদা মালকে ক্রেতা যদি বিক্রি করে, বা আযাদ করে, বা মুদাব্বার বা মুকাতাব বানায় অথবা বন্ধক রাখে বা হিবা করে-চাই তা হস্তান্তর করুক বা না করুক-অথবা তাকে ইজারা দেয় তাহলে তা ক্রয়ের অনুমোদন বলে গণ্য হবে। কেননা এ সমস্ত কাজ নিজের মালিকানাভুক্ত বস্তুর মধ্যেই সাধারণত করা হয়ে থাকে (নিহায়া)। গোলামকে আংশিক আযাদ করলেও একই হুকুম হবে (আন-নাহরুল ফায়িক)।

২৩. মাসআলা : খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে খরিদা দাসীর সাথে (ক্রেতার) সহবাস, বা সকাম চুম্বন বা আলিঙ্গন অথবা তার যৌনাঙ্গের প্রতি সকাম দৃষ্টিপাত, ইত্যাদি আচরণের অর্থ হবে ক্রয়ের অনুমোদন। পক্ষান্তরে নিষ্কাম স্পর্শ, যৌনাঙ্গের অবলোকন দ্বারা ক্রয়ের অনুমোদন সাব্যস্ত হবে না (বাদায়ে)। যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গের সকাম অবলোকন দ্বারা খিয়ার রহিত হবে না। কেননা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য এসব অঙ্গের প্রতি নজর করা অত্যাৱশ্যক। কিন্তু বিক্রেতার বিষয়টি ভিন্ন। সুতরাং তার পক্ষ হতে যে কোন অঙ্গের সকাম স্পর্শ বা অবলোকন দ্বারা তার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে। কেননা এগুলো তার প্রয়োজন বহির্ভূত কাজ এবং তা মালিকানা ছাড়া বৈধও নয় (মুহীত : আস-সারাকসী)। কামোদ্দীপনার সংজ্ঞা হচ্ছে, পুরুষাঙ্গ খাড়া হওয়া এবং পরে তা আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া। আবার কেউ কেউ

বলেছেন, মনে মনে যৌনাচারের ইরাদা ও কামনা করা। এ ক্ষেত্রে যৌনাসঙ্গের উত্থান বা তা খাড়া হওয়া শর্ত নয় (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

২৪. মাসআলা : খিয়ারের শর্তে দাসী খরিদ করার পর ক্রেতা চুম্বন, বা যৌনাসঙ্গ অবলোকন করল। তারপর এগুলো 'নিষ্কাম' দাবী করে দাসী ফেরত দিতে চাইল তাহলে কসমের সাথে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে মুনতাকা গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তারপর তিনি বলেছেন, যেমন কোন ব্যক্তি যদি নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করে বা স্পর্শ করে অথবা তার যৌনাসঙ্গ অবলোকন করে তারপর নিষ্কামতার কথা বলে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, এখানেও তাই। আর যদি সে সহবাস না করে শুধু আলিঙ্গন করে এবং পরে বলে, একাজ আমি কামোদ্দীপনা ছাড়াই করেছি তাহলে এ ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। সদরুশ শহীদ (র) বাবুল কবুল তথা চুম্বন প্রসঙ্গে আলোচনায় বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত চুম্বনের নিষ্কামতা প্রতীয়মান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হরমতে মুসাহারা (বিবাহ-শাদী সম্পর্কীয় হরমত) সাব্যস্ত হওয়ার ফাতাওয়া দেওয়া হবে। আর স্পর্শ করা ও যৌনাসঙ্গের প্রতি নজর করা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো 'সকাম' বলে প্রতীয়মান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হরমতে মুসাহারার ফাতাওয়া দেওয়া যাবে না। সদরুশ শহীদ (র) পূর্বের মাসআলায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এর উপর কিয়াস করে এ কথা বলা অপরিহার্য যে, খরিদা দাসীকে চুম্বন করার পর ক্রেতা নিষ্কামতার দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে (মুহীত)। ক্রেতা যদি দাসীকে চুম্বন করার পর বলে যে, আমি তাকে কামোদ্দীপনা ছাড়াই চুম্বন করেছি তাহলে দেখতে হবে যে, সে কোন স্থানে চুম্বন করেছে। যদি মুখে চুমু খেয়ে থাকে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি শরীরের অন্যান্য স্থানে চুমু খেয়ে থাকে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে তার খিয়ারের উপর পূর্ববৎ বহাল থাকবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

২৫. মাসআলা : সদরুশ শহীদ (র) কিতাবুল বুয়ু অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে বলেছেন যে, যদি দাসী কামভাবে ক্রেতার যৌনাসঙ্গ অবলোকন করে অথবা তাকে চুম্বন বা স্পর্শ করে, তারপর ক্রেতা স্বীকার করে যে, দাসী এগুলো কামভাবে করেছে তবে যদি এগুলো ক্রেতার প্রশ্নে ঘটে থাকে তাহলে সর্বসম্মতভাবে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (আল-ফাতাওয়াস সুগরা)। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতার প্রশ্নে নয় বরং হঠাৎ করে এরূপ করে থাকে এবং ক্রেতা তা অপসন্দ করে থাকে তাহলেও ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ একই হুকুম হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এসব ঘটনা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি বা সম্মতিরূপে গণ্য হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, দাসীর তরফ হতে কোন রকমের কাজই ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মতি এবং অনুমতি হিসাবে গণ্য হবে না। অবশ্য ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ক্রেতার শায়িত থাকা অবস্থায় দাসী যদি তার সাথে সঙ্গম করে অর্থাৎ সে ক্রেতার জননেন্দ্রীয়কে নিজের জননেন্দ্রীয়ের ভেতরে ঢুকায় তাহলে খিয়ার রহিত হয়ে যাবে (বাদায়ে)। ক্রেতা যদি খরিদা দাসীকে তার শয্যায় আসার জন্য ডাকে তাহলে খিয়ার বাতিল হবে না। এমনিভাবে সে যদি তাকে অন্য কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলেও খিয়ার বাতিল হবে

না। দাসীর স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে ফেলে তাহলে খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (আল-ফাতাওয়াস সিরাজিয়া)।

২৬. মাসআলা : যদি ক্রেতার খিয়ার থাকে এবং মাল তার কবজায় থাকে; আর এ অবস্থায় খরিদকৃত মালে এমন কোন খুঁত সৃষ্টি হয় যা দূরীভূত হয় না তবে ক্রয়-বিক্রয় অপরিহার্য হয়ে যাবে এবং খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। চাই এ জাতীয় খুঁত বিক্রতার আচরণের দ্বারা সৃষ্টি হোক বা অন্য কারো দ্বারা সৃষ্টি হোক। এটি ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত (যহীরিয়া)। আর ঐ আয়েব বা খুঁত যদি দূরীভূত হওয়ার মত হয়, যেমন রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি তাহলে ক্রেতা তার খিয়ার বহাল থাকবে। সে চুক্তি রদ করতে পারে, আবার অনুমোদনও করতে পারে। উল্লেখ্য যে, সে ক্রয়-বিক্রয় তখনই ভেঙ্গে দিতে পারবে যদি মুদতে খিয়ারের মধ্যে ঐ আয়েব দূরীভূত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি মুদতে খিয়ার অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং আয়েব পূর্ববৎ বহাল থাকে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় অপরিহার্য হয়ে যাবে এবং তা রদ করার অধিকার রহিত হয়ে যাবে (বাদায়ে)। যদি গোলাম অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ক্রেতার খিয়ার থাকে আর সে বিক্রতাকে গিয়ে যে, আমি চুক্তি রদ করলাম এবং গোলাম ফিরিয়ে দিলাম, তখন বিক্রতা যদি তা কবুল না করে এবং গোলামের উপর কবজা না করে, ইত্যবসরে যদি মুদতে খিয়ার অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং গোলাম রুগ্ন থাকে তবে ক্রেতার কর্তব্য হবে তাকে গ্রহণ করে নেওয়া। আর যদি খিয়ারের সময়সীমার মধ্যে গোলাম সুস্থ হয়ে যায় এবং ক্রেতা তাকে বিক্রতার কাছে ফিরিয়ে না দেয়, ইত্যবসরে খিয়ারের সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে সে এ গোলাম বিক্রতার নিকট ফেরত দিতে পারবে (ফাতহুল কাদীর)।

২৭. মাসআলা : যদি ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় মুদতে খিয়ারের মধ্যে বিক্রিত বস্তুর মধ্যে কোন অতিরিক্ততা পয়দা হয় এবং ঐ অতিরিক্ত বস্তু মূল বস্তু হতে সৃষ্টি হয় এবং এটি মূল বস্তুর সাথেই সংযুক্ত থাকে, যেমন (পূর্বাপেক্ষা) মোটা হয়ে যাওয়া, রোগ নিরাময় হওয়া কিংবা চোখের জ্বালা-যন্ত্রণা ভাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি, তবে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এ জাতীয় অতিরিক্ততার কারণে বিক্রিত বস্তু ফেরত দেওয়া যাবে না এবং ক্রয়-বিক্রয় বস্তুও ভঙ্গ হবে না (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। আর যদি ঐ অতিরিক্ত বস্তু মূল বস্তুর সাথে সংযুক্ত থাকে বটে কিন্তু তা থেকে পয়দা না হয় যেমন কাপড় রঞ্জিত হওয়া, কাপড়ে সেলাই যুক্ত হওয়া, ঘি দ্বারা ছাতু গুলানো, জমিতে ইমারত নির্মাণ করা বা বৃক্ষ রোপণ করা ইত্যাদি, তবে ফকীহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে এরূপ বৃদ্ধির কারণেও বিক্রিত বস্তু ফেরত দেওয়া যাবে না। এমনিভাবে যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বস্তু মূল বস্তু হতে পয়দা হয় কিন্তু মূল বস্তুর সাথে সংযুক্ত না থাকে বরং পৃথক থাকে যেমন সন্তান, দুধ, পশম, উকর (ব্যভিচারের জরিমানা) এবং আরশ (মুক্তিপণ) ইত্যাদি। এ জাতীয় বৃদ্ধির কারণে ও বিক্রিত বস্তুকে রদ করা যাবে না (আল ইয়ানাবি)। আর যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত বস্তু এমন হয় যা মূল বস্তু থেকে সৃষ্ট নয় এবং মূল বস্তুর সাথে সংযুক্তও থাকে না বরং পৃথক থাকে যেমন উপার্জন এবং ভাড়ার টাকা ইত্যাদি, এ জাতীয় বৃদ্ধি বিক্রিত বস্তুকে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হবে না। অর্থাৎ এ

অবস্থায় ঐ বস্তুর ফেরত দেওয়া যাবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত (আন্ নাহারুল ফায়িক)। তারপর যদি ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়কে ইখতিয়ার করে নেয় তবে সর্বসম্মত ভাবে সেই মূল বস্তুর সাথে এই অতিরিক্ত বস্তুরও হকদার হবে। আর যদি ক্রেতা চুক্তি রদ করে তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে অতিরিক্ত রদ ও মূল বস্তু সবই ফেরত দিতে হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে শুধু মূল বস্তু ফেরত দেবে। আর ঐ অতিরিক্ত বস্তুর হকদার হবে ক্রেতা (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)।

২৮. মাসআলা : বিক্রিত বস্তু কোন চতুষ্পদ জন্তু। এ জাতীয় বস্তু যদি কেউ খরিদ করে এই শর্তে যে, এতে ক্রেতার খিয়ার থাকবে, তারপর সে এর গতি বা শক্তি পরীক্ষা করার জন্য এর উপর আরোহণ করল অথবা খরিদকৃত সে বস্তু হল কাপড়, ক্রেতা এর পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখার জন্য তা পরিধান করল অথবা তা ছিল কোন দাসী। ক্রেতা তার কর্মকুশলী পরীক্ষা করার জন্য তার থেকে খিদমত নিল তাহলে ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকবে। কিন্তু ক্রেতা যদি এ সব কাজ প্রয়োজনের চেয়ে বেশী করে তবে তাতে খিয়ার বাতিল হয়ে ক্রয়ের অনুমোদন হয়ে যাবে। ক্রেতা যদি নিজ প্রয়োজনে ঐ সওয়ারীর উপর আরোহণ করে তবে এটিও তার সম্মতি হিসাবে গণ্য হবে। (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ) যদি দাসীর নিকট থেকে সামান্য খিদমত গ্রহণ করা হয় তবেই তা পরীক্ষামূলক খিদমত রূপে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি অধিক সময় খিদমত গ্রহণ করা হয় তবে তা পরীক্ষামূলক খিদমত বলে গণ্য হবে না। বরং তখন তা স্বত্বাধিকারী হওয়ার নিমিত্তে খিদমত গ্রহণ রূপে গণ্য হবে (মুহীত)। এমনভাবে শরীরের শীত দূর করার জন্য ক্রেতা যদি কাপড় পরিধান করে তবে এতেও তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (যহীরিয়া)। ক্রেতা যদি খরিদকৃত পশুকে পানি পান করানোর জন্য অথবা এর খাবারের ঘাস খরিদ করার জন্য অথবা পশুটিকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়ার জন্য এর উপর আরোহণ করে তাহলে কিয়াস অনুসারে এটা ক্রয়ের অনুমোদন বলে গণ্য হবে। কিন্তু ইসতিহসান অনুসারে তা অনুমোদন বলে গণ্য হবে না। এবং সে তার খিয়ারের উপর বহাল থাকবে (বাদায়ে)। কোন ফকীহ বলেন, খিয়ার বাকী থাকার হকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি এর উপর সওয়ার হওয়া ব্যতীত তা ফেরত দেওয়া, পানি পান করানো এবং খাদ্য আনয়ন করা সম্ভব না হয়। আর যদি সওয়ার হওয়া ব্যতীত এগুলো করা সম্ভব হয় তবে খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এমনভাবে ঘাস আনার জন্য সওয়ার হওয়ার ক্ষেত্রে যদি ঘাস এক গাঁঠুরিতে থাকে এবং সে অন্য দিকে সওয়ার হয় তবে এতে খিয়ার বাতিল হবে না। আর যদি গাঁঠুরি দুই দিকেই থাকে, তদুপরি সে এর উপর আরোহণ করে তবে খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। সিয়ারে কবীর গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত আছে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২৯. মাসআলা : দাসী থেকে যদি দুই বার খিদমত নেয়া হয় এবং দ্বিতীয় খিদমত প্রথম বারের অনুরূপ হয় তবে তা মালিকানা গ্রহণ বলে গণ্য হবে। আর যদি তা প্রথমবারের থেকে ভিন্নতর হয় তবে তা মালিকানা গ্রহণ বলে গণ্য হবে না। খিদমতের ব্যাপারে জবরদস্তি করা প্রথমবারেই ক্রয়-বিক্রয়ের সম্মতির লক্ষণরূপে গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) কিতাবুল ইজারা (ইজারা অধ্যায়ে) খিদমত নেওয়ার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ক্রেতা দাসীকে বলল, এই মাল

ছাদে নিয়ে বা ছাদ থেকে নামিয়ে আনো অথবা আমার জুতা এনে দাও, বা আমার পা দাবিয়ে দাও তবে শেযোজটির ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, তা যেন কামভাবে না হয়, অথবা সে তাকে খানা বা রুটি পাকিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দিবে। তবে এ ক্ষেত্রেও শর্ত হল, যেন তা অল্প কাজ হয়। যদি অধিক পরিমাণে খানা বা রুটি বানাতে বলে তবে তা ক্রয়ের অনুমোদন বলে গণ্য হবে (মুহীত)।

৩০. মাসআলা : খরিদকৃত পশুর গতি পরীক্ষা করে দেখার জন্য সওয়ার হওয়ার যদি ক্রেতা যদি এর উপর পূর্ণবার সওয়ার হয় তবে দেখতে হবে যে, এই সওয়ার হওয়ার পেছনে তার উদ্দেশ্য কী? যদি দ্বিতীয় বার সওয়ার দ্বারা তার ভিন্ন গতি পরীক্ষা করে দেখা উদ্দেশ্য হয়, যেমন প্রথমবারে সওয়ার হওয়ার দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল এ কথা পরীক্ষা করে দেখা যে, এটি দ্রুত গতি সম্পন্ন কি না? আর দ্বিতীয় বার সওয়ার হওয়ার দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল একথা পরীক্ষা করে দেখা যে, এটি লফ দেয় কিনা? তাহলে সে তার খিয়ারের উপর বাকী থাকবে। এমনভাবে ক্রেতা যদি খরিদকৃত কাপড় এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ পরীক্ষা করে দেখার জন্য তা প্রথম-বার পরিধান করে এরপর আবার তা দ্বিতীয়বার পরিধান করে তবে এতে তার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে (বাদায়ে)।

৩১. মাসআলা : ফসলসহ জমি খরিদ করার পর ক্রেতা যদি তাতে পানি সিঞ্চন করে বা এর থেকে কিছু ফসল তুলে আনে এর সমুদয় ফসল কেটে আনে অথবা বিক্রির জন্য প্রদর্শন করে তাহলে ক্রেতার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ফসলের পরিমাণ অনুমান করার জন্য যদি কাউকে দেখায় তাহলে তার খিয়ার বাতিল হবে না (আন্ বাহরুল রাযিক)। যমীনের মধ্যে খেজুর বৃক্ষ ছিল, এই অবস্থায় ক্রেতা যদি গাছগুলো কেটে ফেলে বা অধিক ফলনের জন্য কলম করে তবে এতেও তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। জমিতে ফসল বপন করা বা তা কর্ষণ করার অর্থ হল ক্রয়ের অনুমোদন। বিক্রেতার এ কাজের অর্থ হল চুক্তি রদ করা। আরিয়তের খাল হতে যদি পূর্বের ন্যায় পানি সিঞ্চন করা হয় তবে এতে খিয়ার রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপ ভাবে যদি এ জাতীয় জমি আরিয়ত বা ইজারা দেওয়া হয় তাহলে তার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে। চাই আরিয়ত গৃহীতা ব্যক্তি এর থেকে পানি সিঞ্চন করুক অথবা না করুক (তাতার খানিয়া, আল-ফাতাওয়াল ইতাবিয়া এর সূত্রে) যদি এ জাতীয় ভূমিতে ক্রেতা খাল খনন করে অথবা কূপের গর্তে মাটি ফেলে তবে এতে তার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে। কুয়া ধসে যাওয়ার পর যদি তা পুনরায় নির্মাণ করা হয় তবে এতে খিয়ার ফিরে আসবে না (যখীরা)। যদি খরিদকৃত যমীনের কুয়া হতে ক্রেতা নিজ জীব জানোয়ারকে পানি পান করানো হয় বা নিজে পানি পান করে তবে এতে তার খিয়ার রহিত হবে না। কেননা এটি একটি মুবাহ কাজ। সকলের জন্যই তা বৈধ। কিন্তু যদি ঐ যমীনের নহর থেকে অন্য যমীনে পানি সিঞ্চন করা হয় তবে এটি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সম্মতি হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি অন্য কোন ব্যক্তি তার অগোচরে পানি বহিয়ে দেয় তবে তাতে তার সম্মতি বুঝা যাবে না। যদি ক্রেতা নিজের বকরীসমূহ ঐ জমিতে চরাতে দেয় তবে তার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অন্যের বকরী তাতে চরে তবে তার খিয়ার বাকী থাকবে (মুহীত)।

৩২. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে কোন কুয়া বা নহর খরিদ করে, তারপর উক্ত কুয়ায় বা নহরে বকরী পতিত হয় অথবা নাপাক বস্তু কিংবা এমন বস্তু পতিত হয় যাতে কুয়ার পানি নাপাক হয়ে যায় তাহলে উক্ত কুয়ার সম্পূর্ণ পানি না উঠানো পর্যন্ত ঐ কুয়া তার মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া যাবে না। যদি মুদতে খিয়ারের মধ্যে ঐ কূপের সম্পূর্ণ পানি উঠিয়ে ফেলা হয় এবং এতে ঐ কূপ সম্পূর্ণ রূপে পাক-পবিত্র হয়ে যায় তাহলে এই অবস্থায় ঐ কূপটি বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া যাবে কিনা? এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মাদ (র) তার কিতাবে কোন মতামত উল্লেখ করেন নি। তবে এ ব্যাপারে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সে কুয়া ফেরত দিতে পারবে। কেননা মুদতে খিয়ারের মধ্যে কুয়ার আয়েব তথা নাপাকী এমন ভাবে দূর হয়ে গেছে যে, এখন আর এর কোন আছর বাকী নেই। সুতরাং ক্রেতার কুয়া রাখা বা না রাখার ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকবে। এ মাসআলাটিকে নিম্নোক্ত মাসআলার উপর কিয়াস করে বলা হয়েছে। আর তা হল এই যে, যদি মুদতে খিয়ারের মধ্যে ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় খরিদকৃত গোলামের গায়ে জ্বর আসে, আবার তা এ সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় তাহলে ক্রেতার সেই খিয়ার বাকী থাকবে। উপরোক্ত বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপই। কাজেই উক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু ফকীহ আবু জা'ফর (র) তার উসতাদ আবু বকর বলখী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সমস্ত পানি তুলে ফেলার পরও ঐ কুয়া ফেরত দেওয়ার তার ইখতিয়ার থাকবে না। কেননা এখনো এতে এক প্রকার আয়ের বাকী রয়ে গেছে। কারণ যদিও তা প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পাক হয়ে গেছে কিন্তু কোন কোন আলিমের নিকট তা এখনো পাক হয়নি (যখীরা)। কুয়ার মধ্যে কি পরিমাণ পানি আছে তা পরীক্ষা করে দেখার লক্ষ্যে নিজে পান করা ওয়ূ করা এবং জীব জানোয়ারকে পানি পান করানোর জন্য কেউ যদি সেখান থেকে পানি উঠায় তবে এতে তার খিয়ার রহিত হবে না। কেননা সে এই পানির মুখাপেক্ষী। আর যদি কোন শস্য ক্ষেতে তা থেকে পানি বহিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা পানির পরিমাণ জানার জন্য সে এসব কাজের মুখাপেক্ষী নয় (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা : যদি চতুষ্পদ জন্তুর খুর কেটে নেওয়া হয় অথবা এর কোন রগ কেটে নেওয়া হয় তবে এতে খিয়ার বাতিল হবে না (ফাতহুল কাদীর)। যদি পশুর ঘাড়ের রগে ছুরি মারা হয় অথবা থুতনীর নীচে ছুরি মারা হয় কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর পা তাপার পর তাতে যদি অস্ত্র দ্বারা দাগান হয় তবে এ সব কাজ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সম্মতি বলে ধর্তব্য হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। যদি ক্রেতা খরিদকৃত পশুর উপর এরই খোর পোষের বোঝা উঠায় তবে এতে তার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, খরিদকৃত পশুর উপর যদি তাকে খাওয়ানোর জন্য খোরপোষ বহন করা হয় তাহলে তার খিয়ার রহিত হবে না। একজনের অনেকগুলো পশু আছে। এমতাবস্থায় সে যদি ঐ খরিদকৃত পশুর পিঠে এই সমস্ত পশুর খাদ্য বহন করে আনে তাহলে এটি তার পক্ষ হতে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সম্মতি বলে গণ্য হবে (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা : কোন ব্যক্তি খিয়ারে শর্তের একটি গাভী বা বকরী খরিদ করল। তারপর সে এর দুধ দহন করল। তাহলে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। এটিই পসন্দীয় অভিমত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। কুদুরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ক্রেতা যদি খরিদকৃত গৃহে বসবাস করে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে ভাড়া বা বিনা ভাড়ায় তাতে থাকতে দেয় অথবা তাতে কোনরূপ সংস্কার করে অথবা সেখানে কোন ইমারত বানায় অথবা তাতে চুনকাম করে বা খরিদকৃত বাড়ি ঘরে আসতরের কাজ করানো হয় অথবা ঐ বাড়ির কোন গৃহ ভেঙ্গে দেয় তাহলে এ সব কাজ ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি রূপে গণ্য হবে (যহীরিয়া)। যদি কারো হস্তক্ষেপ ছাড়াই ঐ বাড়ির কোন দেয়াল ধসে পড়ে তবে খিয়ার রহিত হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। ক্রেতা যে গৃহে অবস্থান করেছে এ জাতীয় ঘর সে যদি খিয়ারের শর্তের সাথে খরিদ করে এবং সর্বদা তাতে অবস্থান করে তবে তার খিয়ার হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক ব্যক্তি কোন ঘরে ভাড়ায় থাকতে ছিল, এ জাতীয় কোন ঘর যদি বিক্রেতা ঐ ব্যক্তির সম্মতিক্রমে বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতার জন্য খিয়ারের শর্ত থাকে, তারপর সে ভাড়া গ্রহণ করা বর্জন করে তাহলে এটি তার পক্ষ হতে সম্মতি বলে গণ্য হবে (হাবী)।

৩৫. মাসআলা : কেউ যদি খিয়ারের শর্তের ভিত্তিতে কোন বস্তু খরিদ করার পর পুনরায় তা খিয়ারের শর্তের ভিত্তিতে বিক্রি করে দেয় তাহলে তার খিয়ার বাতিল হবে না। কিন্তু কোন কোন ফকীহ এর মতে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এটিই সহীহ অভিমত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। কেউ খিয়ারের শর্তের ভিত্তিতে কোন কিতাব খরিদ করার পর ঐ কিতাব থেকে সে যদি নিজের জন্য বা অন্যের জন্য কপি করায় তবে তার খিয়ার বাতিল হবে না। যদিও এই কাজের কারণে কিতাবের পৃষ্ঠা ওলট-পালট হয়ে যায়। কিন্তু ঐ কিতাব পাঠ করলে খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (আল-বাহরুর রায়িক)। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, যদি বলা হয় যে, কপি করলে খিয়ার বাতিল হবে, কিন্তু পাঠ করলে বাতিল হবে না। তবে এরও একটা যুক্তি রয়েছে এবং এই অভিমত গ্রহণ করা বৈধও আছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটিই গ্রহণযোগ্য অভিমত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

৩৬. মাসআলা : খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে খরিদকৃত গোলামকে যদি শিঙ্গা লাগানো হয় অথবা যদি তাকে ঔষধ সেবন করানো হয় অথবা যদি তার মাথামুণ্ডন করে দেওয়া হয় তবে এ সব কাজ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সম্মতি বলে গণ্য হবে (মুহীত)। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, (খরিদা) গোলামকে মাথার চুল কেটে আসতে বললে ক্রয়ের অনুমোদন সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে চুল কাটতে বলা হলে তা ক্রয়ের অনুমোদন হবে। তদ্রূপ চুনার দ্বারা প্রলেপ দিতে বলারও একই হুকুম। অনুরূপ ভাবে মাথা এবং দাড়ি ধৌত করার ক্ষেত্রেও এ হুকুম হবে। মুনতাকা গ্রন্থে আছে যে, যদি গোলাম ক্রেতার হুকুমে শিঙ্গা লাগায় তবে এটিও সম্মত হিসাবে গণ্য হবে (যহীরিয়া)। কোন ব্যক্তি খিয়ারে শর্তে ভিত্তিতে গোলাম খরিদ করার পর দেখল যে, সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিঙ্গা লাগাচ্ছে, এরপর সে চুপ থাকল তবে এটিও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে তার সম্মতি প্রদান রূপে গণ্য হবে। আর যদি বিনা পারিশ্রমিকে শিঙ্গা গ্রহণ করে তবে এতে সম্মতি প্রতীয়মান হবে না। কেননা এ বস্তু খিদ্মত

গ্রহণ করার অনুরূপ। কারণ এ কথা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ক্রেতা যদি গোলামকে বলে, আমার শরীরে শিঙ্গা লাগাও, তারপর সে তার শরীরে শিঙ্গা লাগাল তবে এর দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে তার সম্মতি সাব্যস্ত হবে না (আল বাহরুর রায়িক)।

৩৭. মাসআলা : আমল নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, খরিদা দাসীকে যদি বলে যে, আমার সন্তানকে দুধ পান করাও তাহলে তাতে ক্রয়ের অনুমোদন সাব্যস্ত হয় না (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)। যদি কেউ দাসী খরিদ করার পর তাকে চিরুনি করতে, তেল তাগাতে অথবা কাপড় পরিবর্তন করতে বলে তাহলে এসব বলাও সম্মতি বলে গণ্য হবে না (যহীরিয়া)। কেউ খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে কোন বস্তু খরিদ করার পর তা কবজা করলে অথবা তার মূল্য আদায় করলে তা দ্বারা তার খিয়ার বাতিল হবে না। (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া) ইবন সিমআ (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণনা করা হয়েছে খিয়ারের শর্তে কেউ কোন গোলাম খরিদ করার পর তাকে কবজা করল এবং গোলামকে কিছু মাল হিবা করল বা সে নিজেই কিছু মাল কামাই করল। তারপর গোলাম ক্রেতার জ্ঞাতসারে কিন্তু তার অনুমতি ছাড়া অথবা তার অজ্ঞাতসারে ঐ মাল নষ্ট করে ফেলল তাহলে এতে তার খিয়ার বাতিল হবে না। যদি ক্রেতা গোলামের জন্য ক্রেতার পুত্রকে হিবা করে এবং সে তাকে কবজাও করে নেয় তাহলে ঐ পুত্র আযাদ হয়ে যাবে এবং গোলামের ব্যাপারে ক্রেতার খিয়ার বাতিল হবে না। যদি ক্রেতা গোলামের জন্য ক্রেতার উম্মু ওয়ালাদকে হিবা করে এবং সে তাকে কবজা করে নেয় তাহলে গোলামের ক্ষেত্রে ক্রেতার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। সন্তান এবং উম্মু ওয়ালাদের মাসআলায় পার্থক্য রয়েছে। কেননা উম্মে ওয়ালাদ হিবা করার পরও খিয়ারের কারণে সে তার মালিকের মালিকানার বাকি থাকে। কিন্তু সন্তান তার মালিকানায় বাকি থাকে না। যদি হিবাকৃত বস্তু ক্রেতা নিজে নষ্ট করে দেয় তাহলে গোলামের ব্যাপারে ক্রেতার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। ইবন সিমআ (র) এই মাসআলা ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতেও অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। (যহীরিয়া) তিন দিনের খিয়ারের শর্তে কেউ কোন গোলাম খরিদ করার পর ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় বিক্রেতা তার হাত কেটে দিল তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বাতিল হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে এই মাসআলায় দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা গোলামকে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করার আগেই যদি তার হাত কেটে দেয় তাহলে কারো মতেই ক্রেতার খিয়ার বাতিল হবে না। গোলাম ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় কোন তৃতীয় ব্যক্তি যদি তার হাত কেটে দেয় তাহলে সমস্ত ইমামের মতোই ক্রেতার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৮. মাসআলা : খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে কোন বাড়ি খরিদ করার পর যদি ঐ বাড়ির পার্শ্বে অন্য কোন বাড়ি বিক্রি হয় আর ক্রেতা হক্ক ওফআর ভিত্তিতে তা ক্রয় করে তাহলে তার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে (মুহীত)। আসলে বাড়ি ক্রয় করা জরুরী নয়। বরং শুধু ওফআর দাবী করলেই খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (আন-নাহরুল ফায়িক)। যদি কেউ খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে কোন বস্তু খরিদ করার পর মুদতে খিয়ারের মধ্যে মূল্যের বিনিময়ে তা আবার বিক্রেতার নিকট বন্ধক রাখে তবে তা জায়েয হবে (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)। যদি কেউ কোন মুরগী ক্রয় করে

এবং খিয়ারের সময় সীমার মধ্যে তা ডিম দেয় তবে খিয়ার রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু ডিম যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে খিয়ার রহিত হবে না। কেউ যদি খিয়ারের শর্তের ভিত্তিতে যা খরিদ করে এবং তা বাচ্চা দেয় তাহলে ক্রেতার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু মরা বাচ্চা হলে হবে না (আল বাহরুর রায়িক)। মুনতাকা গ্রন্থে আছে যে, খরিদকৃত পশু ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় যদি মৃত বাচ্চা প্রসব করে এবং প্রসবের কারণে যদি ঐ পশুটির কোন মূল্যক্ষতি ঘটে তাহলে ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকবে না (মুহীত)। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য খিয়ারের শর্ত করা হলে এক জনের অনুমোদনে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হবে না। উভয়ের অনুমোদনে সম্পন্ন হবে (মাবসূত)।

৩৯. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে আছে যে, কোন ব্যক্তি দাসীর বদলে একটি গোলাম বিক্রি করল এই শর্তে বিক্রিত বস্তুর মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতা তাদের প্রত্যেকের খিয়ার থাকবে। তারপর তারা উভয়ে তাদের বিনিময়কৃত দাস-দাসী কবজা করে নিল। ইত্যবসরে গোলাম বিক্রেতা ক্রয় অনুমোদন করল। তারপর ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় গোলাম মারা গেল। তাহলে ক্রয়-বিক্রয় অপরিহার্য ও সম্পন্ন হয়ে যাবে। উক্ত কিতাবে আরো আছে যে, এক ব্যক্তি দাস দাসীর বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করল। এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে নিজেদের জন্য খিয়ার ধার্য করল। তারপর তারা উভয়ে একসাথে নিজ ক্রয়কৃত দাস-দাসী আযাদ করে দিল তাহলে তাদের এই আযাদ করণ নিজ নিজ মালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রে জায়েয হবে। কেউ একহাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করল, এই শর্তে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের খিয়ার থাকে। তারপর বিক্রেতা ক্রেতার উপস্থিতিতে বিক্রয় অনুমোদন করল। তারপর বিক্রেতার উপস্থিতিতে ক্রেতা বিক্রয় চুক্তি রদ করে দিল তবে তা রদ হয়ে যাবে। গোলামকে খিয়ারের সময় সীমার মধ্যে বা পরে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়ার পূর্বে ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় যদি ঐ গোলাম মারা যায় তাহলে ক্রেতাকে গোলামের মূল্য পরিশোধ করতে হবে এই কারণে যে, বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়কে অবধারিত করে দিয়েছিল। কাজেই এই অবস্থায় ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকবে, বিক্রেতার নয়। যদি এ জাতীয় কথা-বার্তার আগে বা পরে ঐ গোলামের মধ্যে কোন আয়েব কোন দোষ পাওয়া যায় তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ অবস্থায় ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে এর মূল্য পরিশোধ করা। আর উক্ত আয়েবের পর ক্রেতা আর ঐ গোলামকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না। যদি অবস্থা এমন হয় যে ক্রেতা প্রথমে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দেয়, তারপর বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করে ; তারপর গোলাম মারা যায় তবে ক্রেতার উপর এর মূল্য ওয়াজিব হবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের কথোপকথনের পর ঐ গোলামের মধ্যে মূল্যহানি হওয়ার মত কোন দোষ দেখা দেয় তবে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই বিক্রিত বস্তু বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে এবং গোলামের যে ক্ষতি হয়েছে এর ক্ষতিপূরণও প্রদান করা হবে। ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়কে ভেঙ্গে দেওয়ার পূর্বে যদি গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখা দেয় তারপর বিক্রেতা বিক্রয় অনুমোদন করে তাহলে ক্রেতার উপর এই ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। এবং মূল্য পরিশোধ করাও তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা : ক্রেতার বা বিক্রেতার উভয়ের খিয়ার থাকা অবস্থায় উভয়ে যদি ক্রয়-বিক্রয় রদ করে দেয়, তারপর বিক্রেতা ঐ বিক্রিত গোলামকে (ফেরত) কবজা করার আগেই যদি সে ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় মারা যায় তাহলে ক্রেতার উপর বিক্রয়মূল্য ওয়াজিব হবে যদি খিয়ার ক্রেতার হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে খিয়ার বিক্রেতার হলে ক্রেতার উপর বাজার মূল্য ওয়াজিব হবে (মাবসূত)। দুই ব্যক্তি এই শর্তে কোন বস্তু খরিদ করল যে, এতে তাদের খিয়ার থাকবে। তারপর তাদের একজনে স্পষ্টভাবে বা ইংগিতপূর্ণ শব্দে চুক্তি অনুমোদন করল, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি তা আর রদ করতে পারবে না। বরং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার অংশের ব্যাপারে ক্রয়-বিক্রয়কে রদ করে দিতে পারবে। দেখার খিয়ার এবং দোষের খিয়ারের ক্ষেত্রেও আমাদের এই ইমামত্রয়ের মধ্যে অনুরূপ মতভেদ রয়েছে (আন-নাহরুল ফায়িক)। কেউ দুই ব্যক্তির নিকট হতে এক সাফকায় একটি গোলাম খরিদ করল এই শর্তে যে, এতে বিক্রেতার খিয়ার থাকবে। তারপর তাদের একজনে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে রাযী হয়ে গেল, কিন্তু অপরজন রাযী হল না তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তাদের উভয়ের উপর এই ক্রয়-বিক্রয় অপরিহার্য হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে খিয়ারে শর্তেও ব্যাপারে মতানৈক্য হলে, এর বিবরণ।

১. মাসআলা : খিয়ারে শর্ত ছিল কিনা এ বিষয়ে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে মতভেদ করে তাহলে ঐ ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য হবে যে তা অস্বীকার করছে। যদি তারা উভয়ে খিয়ারের সময়সীমা সম্পর্কে মতভেদ করে তবে যে কম সময়ের কথা বলবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তারা খিয়ারের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করে তবে যে ব্যক্তি খিয়ারের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়নি বলবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (মাবসূত)। ক্রেতা ও বিক্রেতা খিয়ারে শর্ত না হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ করার পর যদি তারা উভয়ে নিজ নিজ সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ কয়েম করে তবে যে ব্যক্তি খিয়ারে শর্তের দাবীদার হবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়াই উত্তম বলে বিবেচিত হবে (কিন্য়া)। ক্রেতা ও বিক্রেতার একজনের খিয়ার ছিল, এমতাবস্থায় তারা যদি খিয়ারের সময়সীমার মধ্যে বিক্রয়ের অনুমোদন ও তা রদ করার ব্যাপারে মতভেদ করে তবে খিয়ারওয়ালার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। চাই সে চুক্তি রদের দাবী করুক বা অনুমোদনের। আর যে ব্যক্তি চুক্তি রদের দাবী করবে তার থেকে সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে মতভেদ খিয়ারের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার হলে যে অনুমোদনের দাবীদার হবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে আর যে চুক্তি রদের দাবীদার হবে তার থেকে সাক্ষী-প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। আর যদি তাদের উভয়ের জন্য খিয়ার থাকে এবং খিয়ারের সময়সীমার মধ্যে তারা চুক্তি রদ ও অনুমোদনের ব্যাপারে মতভেদ করে তবে রদকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এবং অন্য জনকে সাক্ষী পেশ করতে হবে। আর যদি তারা মুদত অতিবাহিত হওয়ার পর মতভেদ করে তবে যে ব্যক্তি চুক্তির অনুমোদনের দাবীদার হবে

তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে ব্যক্তি চুক্তি রদের দাবীদার হবে তার থেকে সাক্ষী লওয়া হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তাদের সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে কোন তারিখের কথা উল্লেখ না থাকে। আর যদি তাদের উভয়ের সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যে তারিখ উল্লেখ থাকে তবে যার তারিখটি আগের হবে তার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে (শরহুত তাহাবী)।

২. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে কবীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কেউ যদি নিজের খিয়ারের শর্তে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কোন গোলাম বিক্রি করে। তারপর ক্রেতা তা কবজা করে নেয়। এরপর খিয়ারের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ইত্যবসরে তাদের একজনে বলে খিয়ারের তিন দিনের মধ্যে গোলাম মারা গেছে, ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে গেছে এবং ক্রেতার উপর মূল্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় জন বলে যে, না, সে জীবিত আছে। পালিয়ে গেছে। তাহলে যে ব্যক্তি তার জীবিত থাকা ও পালিয়ে যাওয়ার কথা বলছে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তারা উভয়ে নিজ নিজ দাবীর সপক্ষে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে তবে যে ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করেছে যে, সে জীবিত আছে; কিন্তু পালিয়ে গেছে তার সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত)। যদি তারা উভয়ে গোলামের মৃত্যুর ব্যাপারে একমত হয়, কিন্তু একজনে বলে, সে তিন দিনের মধ্যে মারা গেছে এবং অপরজনে বলে, সে তিন দিনের পর মারা গেছে তাহলে যে ব্যক্তি তিন দিনের ভেতর মারা যাওয়ার দাবীদার তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর অপর ব্যক্তির নিকট থেকে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। আর যদি তারা উভয়ে এই কথার উপর একমত থাকে যে, গোলাম তিন দিনের পর ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় মারা গেছে; কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়া বা এর অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়; তারপর তাদের একজনে এই মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, বিক্রেতা তিন দিনের ভিতরে ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দিয়েছে এবং অন্য জনে এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, সে তিন দিনের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করেছে তবে যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়ার দাবীদার তার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। ফকীহদের কেউ কেউ বলেন, এটি কিয়াসের হুকুম। কিন্তু ইসতিহসানের আলোকে ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে যে, অনুমোদনের দাবীদার। যদি উভয় ব্যক্তি তিন দিনের ভিতর মারা যাওয়ার ব্যাপারে একমত হয় আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে অনুমোদনের দাবীদারের সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। আর এটিই উত্তম। যদি এক ব্যক্তি এ মর্মে দাবী করে যে; সে তিন দিন পর মারা গেছে এবং বিক্রেতা তিন দিনের ভিতর অনুমতি প্রদান করেছে এবং অপর জন দাবী করে যে, সে তিন দিনের ভিতর মারা গেছে এবং মারা যাওয়ার আগেই সে ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দিয়ে গেছে তাহলে চুক্তি রদ করার দাবীদারের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর অপর জনের নিকট থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ নেওয়া হবে। যদি তাদের একজনে তিন দিন পর মৃত্যু এবং তিন দিনের মধ্যে বিক্রেতার চুক্তি রদ করার দাবী করে এবং অপরজনে তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পূর্বে বিক্রেতার অনুমোদনের দাবী করে তাহলে চুক্তি রদ করার দাবীদারের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর অপর জনের নিকট থেকে সাক্ষ্য-প্রমাণ নেওয়া

হবে। এমনি করে খিয়ার যদি উভয় ব্যক্তির থাকে আর তারা এভাবে মতভেদে লিপ্ত হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত : আস সারখসী)।

৩. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেউ খিয়ারের শর্তে এক হাজার দিরহাম মূল্যে একটি গোলাম বিক্রি করল। তারপর ক্রেতা তাকে কবজা করে নিল। কিন্তু খিয়ারের সময়সীমা গোলামের মূল্য বেড়ে দুই হাজার দিরহাম হয়ে গেল। এদিকে ধার্যকৃত তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এরপর বিক্রেতা এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, মুদতে খিয়ারের তিন দিনের মধ্যে এর মূল্য দুই হাজার দিরহাম হয়ে যাওয়ার পর ক্রেতা তাকে ভুলক্রমে হত্যা করেছে। কিন্তু ক্রেতা এই কথাকে অস্বীকার করতঃ এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল যে, মুদতে খিয়ারের তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিক্রেতা তাকে ভুলক্রমে হত্যা করেছে তাহলে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি ক্রেতা-বিক্রেতা দুই জনের কোন একজনে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলাম তিন দিনের মধ্যে ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় মারা গেছে এবং অপর ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে সে তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর মারা গেছে তাহলে ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে যে তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর মৃত্যুর কথা বলছে। উল্লেখ্য যে, আমরা যদি বিক্রেতার অনুকূলে হত্যার কারণে জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার আদেশ জারী করি তাহলে বিক্রেতা ক্রেতার রক্তসম্পর্কীয় নিকট-আত্মীদের থেকে তা উসূল করতে পারবে। কিন্তু বিক্রেতা যদি গোলামকে কবজা করার দিনের মূল্য পরিমাণ জরিমানা উসূল করতে চায় তাহলে সে তা পারবেনা। অনুরূপ ভাবে বিক্রেতা এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি গোলামকে তিন দিনের মধ্যে ভুল ক্রমে হত্যা করেছে এবং ক্রেতা এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি তিন দিন পর গোলামকে হত্যা করেছে তাহলে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং বিক্রেতার অনুকূলে হত্যাকারীর নিকট আত্মীয়দের উপর এ নির্দেশ জারী করা হবে যে, সে তাদের থেকে হত্যার দিন এর যা মূল্য ছিল এর সমপরিমাণ মূল্য জরিমানাস্বরূপ নিয়ে নিবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি ক্রেতার নিকট এর মূল্য জরিমানাস্বরূপ আদায় করতে চায় তবে সে তা করতে পারবে না। ক্রেতা যদি বিক্রেতার বিপক্ষে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, বিক্রেতা মুদতে খিয়ারের তিন দিনের মধ্যে গোলামকে হত্যা করেছে এবং বিক্রেতা এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ক্রেতা ঐ তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর গোলামকে হত্যা করেছে, তাহলে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি বিক্রেতা এরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, মুদতে খিয়ারের তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক আজনবী ব্যক্তি গোলামকে হত্যা করেছে এবং ক্রেতা এভাবে সাক্ষ্য পেশ করে যে, আজনবী ব্যক্তি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ তিন দিনের মধ্যে গোলামকে হত্যা করেছে তাহলেও বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। উপরোক্ত অবস্থায় ক্রেতা যদি ঐ ব্যক্তিকে হত্যার ব্যাপারে দায়ী করতে চায় যার উপর বিক্রেতা এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ কায়েম করেছে যে, সেই গোলামকে ঐ তিন দিন পর হত্যা করেছে এবং তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে চায় তাতে সে তা করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা এ মর্মে একমত হয় যে মুদতে খিয়ারের তিন দিনের মধ্যে অমুক ব্যক্তিই গোলামকে গসব করে নিয়েছে; তারপর তার মৃত্যুকালে নিরূপণের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়; বিক্রেতা দাবী করে যে, সে তিন দিনের মধ্যে মারা গেছে এবং ক্রেতা দাবী করে যে, তিন দিন পর মারা গেছে তাহলে ক্রেতার দলীল প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। আর দাবী যদি এর বিপরীত হয় তবে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে এ অবস্থায় ক্রেতা গসবকারী ব্যক্তির নিকট এর মূল্য জরিমানা হিসাবে উসূল করে নিতে পারবে (মুহীত : আস-সারখসী)। এমনি ভাবে যদি দুই ব্যক্তি মিলে গসব করে তবে ক্রেতা যার উপর গসব প্রমাণ করবে তার থেকে সে জরিমানা উসূল করে নিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, হত্যা বা মৃত্যুর ব্যাপারে আমরা যে বিবরণ পেশ করেছি যদি সেভাবে দলীল প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহলে ঐ ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে যে, তিন দিনের ভিতরে হত্যা বা মৃত্যুর দাবী করে (আল-মুহীত)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : বিক্রিত বস্তুর অংশবিশেষের ক্ষেত্রে খিয়ারের শর্ত আরোপ করা এবং আক্দকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির জন্য খিয়ার সাব্যস্ত করার মাসআল

১. মাসআলা : যদি দুটি কাপড় অথবা দুটি গোলাম অথবা দুটি জন্তু কেউ এই শর্তের উপর খরিদ করে যে, এতদুভয়ের একটিতে ক্রেতার তিন দিনের খিয়ার থাকবে অথবা বিক্রেতার এর কোন একটিতে তিন দিনের খিয়ার থাকবে, তবে এই মাসআলা চার অবস্থা হতে পারে। তন্মধ্যে তিন অবস্থায় আক্দ সম্পূর্ণরূপে ফাসিদ হয়ে যাবে। আর এক অবস্থায় আক্দ সহীহ ও জায়েয হয়ে যাবে। যে তিন অবস্থায় আক্দ ফাসিদ হয়ে যাবে তা হচ্ছে নিম্নরূপ :

(১) দুটি বস্তুর যেটিতে খিয়ার থাকবে যদি সুনির্দিষ্ট না করা হয় এবং বস্তু দুটোর মূল্যও পৃথকভাবে বর্ণনা না করা হয় (তবে এই আক্দ ফাসিফ হয়ে যাবে।) (২) দুটি বস্তুর যেটিতে খিয়ার থাকবে তা যদি সুনির্দিষ্ট করা হয়; কিন্তু প্রত্যেকটির মূল্য পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা না করা হয় (তবে এই আক্দও ফাসিফ হয়ে যাবে।) (৩) বস্তু দুটির প্রত্যেকটির মূল্য যদি পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হয় কিন্তু যেটিতে খিয়ার থাকবে তা যদি সুনির্দিষ্ট না করা হয় (তবে এই আক্দও ফাসিফ বলে গণ্য হবে।) (৪) দুটি বস্তুর যার মধ্যে খিয়ার থাকবে তা যদি সুনির্দিষ্ট করা হয় এবং প্রত্যেকটির মূল্যও যদি পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয় তাহলে এই অবস্থায় একটি বস্তুও ক্রয়-বিক্রয় তো নিশ্চিতরূপে জায়েয হবে এবং অপরটির মধ্যে খিয়ার থাকবে। তারপর যার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হতে সে যদি ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয় অথবা মারা যায় কিংবা ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়া ব্যতীত মুদতে খিয়ার অতিবাহিত হয়ে যায় তবে উভয় বস্তুতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং ক্রেতার উপর অপরিহার্য হবে উভয় বস্তুও মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া। এহেন অবস্থায় মূল্য ফেরত দেওয়া ব্যতিরেকে উভয় বস্তুর বা কোন একটির ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপারে অপর ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে না (আল ইয়ানাবী)।

২. মাসআলা : কেউ যদি কোন كلى বা وزنى (ওজন যোগ্য) বস্তু কিংবা কোন গোলাম এই শর্তের উপর খরিদ করে যে, এর অর্ধেকের মধ্যে ক্রেতার খিয়ার থাকবে তবে তা সহীহ

হবে। চাই সে মূল্যের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুক অথবা না করুক। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার খিয়ার থাকা বা ক্রেতার খিয়ার থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি ক্রেতার খিয়ার থাকে তবে যে অর্ধেকের মধ্যে তার খিয়ার থাকবে তা সে ফেরত দিতে পারবে। যদিও এতে বিক্রেতার ক্ষেত্রে তাফরীকে সাদকা (ভেঙ্গে ভেঙ্গে লেনদেন করা) লাযিম আসে। (তাতেও কোন অসুবিধা নেই।) কেননা বিক্রেতা এতে সম্মত রয়েছে (কাফী)।

৩. মাসআলা : যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে এক হাজার দিরহাম করে মূল্য সাব্যস্ত করে দুটি গোলাম খরিদ করে এবং বিক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট একটির মধ্যে খিয়ারের শর্ত আরোপ করে, এমন কি আকদ জায়েয হয়ে যায়। তারপর যদি ক্রেতা বলে, যে গোলামের মধ্যে খিয়ার নেই আমি তাকে নিব এবং তার মূল্যই পরিশোধ করব তবে তার এরূপ করার ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে এরূপ প্রত্যাশা করে যে, সে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দিক; কিন্তু ক্রেতা এ ব্যাপারে অসম্মতি ব্যক্ত করে তবে ক্রেতাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। যদি বিক্রেতা এরূপ ইচ্ছা করে যে, যে গোলামটির মধ্যে খিয়ার নেই সে সেটিকে ক্রেতার নিকট সোপর্দ করবে এবং এর মূল্য ক্রেতার নিকট থেকে আদায় করে নিবে এবং দ্বিতীয় গোলামের বিষয়টি স্থগিত থাকবে এ অবস্থায় ক্রেতা যদি বলে, আমি কিছুই নিব না এবং আমি তোমাকে কোন মূল্যই দিব না, যে পর্যন্ত না তুমি অপর গোলামের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করবে। তখন আমি দুটিই নিয়ে নিব অথবা যে গোলামের মধ্যে খিয়ার রয়েছে তুমি তার ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দাও তাহলে আমি যে গোলামের ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়ে গেছে তাকে তার সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে নিয়ে নিব; ক্রেতার এরূপ বলার ইখতিয়ার থাকবে (মুহীত)। বিক্রেতা যদি উভয় গোলাম ক্রেতাকে দিয়ে তাদের উসূল করতে চায় তাহলে এ ব্যাপারে ক্রেতার উপর বল প্রয়োগ করা যাবে না। তদ্রূপ ক্রেতা যদি উভয় গোলামকে নিয়ে তাদের মূল্য পরিশোধ করতে চায় তাহলে সে তা পারিবে না। অবশ্য বিক্রেতা বাড়ি হলে পারবে। উপরোক্ত মাসআলায় যদি ক্রেতার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হয়ে থাকে এবং সে ইচ্ছা করে যে, যে গোলামের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গেছে তাকে নিয়ে তার মূল্য আদায় করে দিবে এবং বিক্রেতা যদি তা অস্বীকার করে তবে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। এমনভাবে যদি বিক্রেতা এরূপ ইচ্ছা করে যে, যে গোলামটির ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে গেছে তাকে ক্রেতার নিকট সোপর্দ করে তার থেকে এর মূল্য নিয়ে নিবে। অথচ ক্রেতা তাতে রাযী না তাহলে ক্রেতাকে বাধ্য করা যাবে না। ক্রেতা যদি বলে আমি উভয় গোলামকে নিয়ে তাদের মূল্য পরিশোধ করে দিব অথচ বিক্রেতা তাতে রাজী নয় তাহলে এ ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা যাবে না। যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, আমি তোমার নিকট ঐ দুজন গোলাম হস্তান্তর করে তাদের উভয়ের মূল্য নিয়ে নিতে চাই; কিন্তু তোমার খিয়ার বাকী থাকবে; তাহলে ও তাকে বাধ্য করা যাবে না (যখীরা)।

১. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন গোলঅম খরিদ করল এবং অন্য কোন ব্যক্তির জন্য তিন দিনের খিয়ার রাখল তাহলে ক্রেতার এবং ঐ ব্যক্তি এই দুই জনের যে কেউ ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করবে তাতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হয়ে যাবে এবং তাদের যে কেউ চুক্তি রদ করবে তাতে রদ হয়ে যাবে। এরূপ শর্ত সাপেক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করা আমাদের ইমামত্রয়ের মতে

ইসতিহসানের দৃষ্টিতে সহীহ আছে (আল-জামেউস সগীর)। যদি উভয়ের একজনে চুক্তি অনুমোদন করে এবং অপরজনে রদ করে তাহলে অগ্রগামীর সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে (মুহীত)। যদি উভয়ে একই সঙ্গে অনুমোদন করে এবং রদ করে তাহলে রদ হয়ে যাবে (হাবী)। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (আন-নাহরুল ফায়িক)।

৫. মাসআলা : কোন ব্যক্তি কাউকে হুকুম করল যে, তুমি আমার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত করে কারো নিকট আমার এই গোলামটি বিক্রি করে দাও। তারপর আদিষ্ট ব্যক্তি খিয়ার ব্যতীত পাকাপাকিভাবে তাকে কারো নিকট বিক্রি করে দিল অথবা নিজের জন্য খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে তাকে বিক্রি করল তবে এই ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত থাকবে। আর যদি আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশ দাতার হুকুম তামিল করতঃ আদেশদাতার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত করে ঐ গোলামকে বিক্রি করে তাহলে আদেশদাতা ও আদিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হবে। তাদের যে কেউ অনুমোদন করে বা রদ করে তা সহীহ হবে। কিন্তু আদিষ্ট ব্যক্তি যদি অনুমোদন করে তবে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু আদেশদাতার খিয়ার বহাল থাকবে। তবে এই খিয়ার হবে খিয়ারে ইজাযা।^১ কাজেই এই খিয়ার কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি অন্য কাউকে ^{مطلق} ^{توا} শর্তহীনভাবে বিক্রি করার জন্য হুকুম করে অথবা নিজের জন্য খিয়ারের শর্তের ভিত্তিতে বিক্রি করার জন্য হুকুম করে, তারপর আদিষ্ট ব্যক্তি যদি তাকে বিক্রি করে এবং খিয়ার রাখে আদেশদাতা ব্যক্তির জন্য অথবা কোন তৃতীয় ব্যক্তির জন্য তাহলে তাদের উভয়ের জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হবে। কেননা আমরা আগেই বলেছি যে আকদকারী ছাড়া অন্য কারো জন্য খিয়ারের শর্ত করা নিজের জন্য খিয়ারের শর্ত করার অনুরূপই (কাফী)।

৬. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি অপর কাউকে এ মর্মে হুকুম করে যে, আমার জন্য ঐ নির্দিষ্ট গোলামটি অথবা যে কোন একটি খরিদ করে দাও। আর আদেশদাতা যদি ঐ ব্যক্তি সে গোলামের মূল্য এবং মূল্যের ^{جنس} সব কিছু বন্ধে দেয় তবে এই হুকুম দেওয়া অর্থাৎ ওকালত সহীহ হবে। এ অবস্থায় আদেশদাতা আদিষ্ট ব্যক্তিকে বলে দিল যে তুমি তোমার নিজের জন্য খিয়ারের শর্ত করে নিবে। তারপর সে গোলাম খরিদ করল এবং তার নিজের জন্য অথবা আদেশদাতার জন্য অথবা আজনবী কোন ব্যক্তির জন্য খিয়ার সাব্যস্ত করল তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয় হুকুমদাতা ব্যক্তির উপর জারী হবে। পক্ষান্তরে আদেশদাতা ব্যক্তি যদি এরূপ হুকুম করে যে, খিয়ার আমার জন্য রাখবে। এহেন অবস্থায় সে যদি খিয়ার ছাড়া ঐ গোলাম খরিদ করে অথবা নিজের জন্য খিয়ার রাখে তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয় হুকুমদাতার উপর জারী হবে না। বরং যাকে হুকুম করা হয়েছে তার উপর অপরিহার্য হবে। আর যদি তাকে এরূপ হুকুম দেওয়া হয় যে, তুমি নিজের জন্য খিয়ারের শর্ত করে নিবে, এ অবস্থায় সে যদি নিজের জন্য খিয়ারের শর্ত না করে ঐ গোলাম খরিদ করে তবে এই ক্রয়-বিক্রয় হুকুমদাতার উপর জারী

১৩. খিয়ারে ইজাযা, খিয়ারে শর্ত নয়। অর্থাৎ আদেশদাতা ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করতে পারবে। তখন এটি তার জন্য হয়ে যাবে। আবার ইচ্ছা করলে সে তা ভেঙ্গেও দিতে পারবে। তখন দায়-দায়িত্ব উকীলের উপর বর্তাবে।

হবে না। যদি তাকে হুকুম দেওয়া হয় যে সে যেন হুকুমদাতা ব্যক্তির জন্য খিয়ারের শর্ত আরোপ করে, তারপর সে ঐ হুকুমদাতা ব্যক্তির খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে গোলাম খরিদ করল তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয় হুকুমদাতা ব্যক্তির উপর জারী হবে। তারপর যদি আদিষ্ট ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং আদেশ ব্যক্তির খিয়ার পূর্বের মত বহাল থাকবে। যদি সে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয় তবে গোলাম তার হয়ে যাবে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়কে রদ করে দেয় তবে এই গোলামের উকীলের বলে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং এই গোলাম যদি উকীলের কবজায় থাকা অবস্থায় পরবর্তীতে মারা যায় তাহলে এই গোলাম উকীলের মাল থেকে খোয়া গেছে বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে উকীল যদি শুরু থেকেই ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি না দেয় আর এ অবস্থায় আদেশদাতা ব্যক্তি তাকে গোলাম ফেরত দিতে বলে। এ কথা বলার পর এই গোলাম যদি উকীলের কবজায় থাকা অবস্থায় মারা যায় তাহলে আদেশদাতার মাল থেকে খোয়া গেছে বলে ধরা হবে। আদেশদাতা ব্যক্তির এ কথার উত্তরে যদি বলে আমি এই আকুদ তথা লেনদেনের উপর রাযী আছি; তারপর উকীলের কবজায় এই গোলাম মারা যায় তাহলে আদেশদাতার মাল থেকে খোয়া গেছে বলে ধরা হবে। আদেশদাতা ব্যক্তির এ কথা বলার পর যদি ঐ আদিষ্ট ব্যক্তি গোলামকে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেয় তাহলে তা আদেশদাতার অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল থাকবে। তারপর আদেশদাতা যদি দ্বিতীয় বিক্রয় অনুমোদন করে তবে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বিক্রয়ই সহীহ হবে এবং মুআকিলের জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হবে। আর এই দ্বিতীয় বিক্রিতে যদি কিছু লাভ হয় তবে সেই এই লাভের হকদার হবে। পক্ষান্তরে আদেশদাতা যদি দ্বিতীয় বিক্রয় রদ করে তবে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের আগে এর যে অবস্থা ছিল বর্তমানে তার সেই অবস্থায় হবে। আর সে যদি দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের পর প্রথম ক্রয়-বিক্রয়কে ভেঙ্গে দেয় তাহলে গোলাম আদিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্বে বর্তাবে। কিন্তু এর আগে যে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছিল তা তার উপর জারী হবে না। আর যদি আদিষ্ট ব্যক্তি এর পর ক্রয়-বিক্রয়কে আবার পুনরায় নবায়ন করে তাহলে তা আবার কার্যকর হবে এবং তাতে মুনাফা হলে তা ভোগ করাও তার জন্য বৈধ হবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারো জন্য তার নির্দেশে কোন বস্তু খরিদ করে এবং নির্দেশদাতা ব্যক্তির নির্দেশ অনুযায়ী তার জন্য খিয়ারের শর্ত আরোপ করে তাহলে আদেশদাতা ব্যক্তি ও উকীল উভয়ের জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হবে। তারপর যদি বিক্রেতা এবং উকীলের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়, বিক্রেতা বলে, হুকুমদাতা ব্যক্তি এই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে রাযী এবং সম্মত আছে। তবে বর্তমানে সে অনুপস্থিত। অপরদিকে উকীল ব্যক্তি এই কথা অস্বীকার করে তাহলে উকীলের কথা কসম ছাড়াই গ্রহণযোগ্য হবে। শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (র) বলেন, এই মাসআলা উকীল দ্বারা কসম করানোর ব্যাপারে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুসারে উকীল থেকে কসম নেওয়া হবে (যখীরা)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বিক্রেতা স্বীয় দাবীর সপক্ষে কোন সাক্ষ প্রমাণ কায়েম না করে। আর যদি সে প্রমাণ পেশ করে যে, আদেশদাতা এই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সম্মত আছে তাহলে আদেশদাতার জন্য এই ক্রয়-বিক্রয় অপরিহার্য হয়ে যাবে। যদিও আদেশদাতা ব্যক্তি তখন অনুপস্থিত থাকে। আর যদি বিক্রেতা এ ব্যাপারে সাক্ষ-প্রমাণ পেশ না করে কিন্তু আদেশদাতা ব্যক্তির সম্মতির ব্যাপারে বিক্রেতার দাবী ক্রেতা সত্যায়ন করে; তারপর খিয়ারের সময়সীমার মধ্যে আদেশদাতা

ব্যক্তি হাযির হয়ে তার সম্মতির কথা অস্বীকার করে বলে যে, বিক্রেতার সামনে আমি এই চুক্তি রদ করে দিয়েছি তবে শামসুল আইম্মা (র) বলেন যে, এই ক্রয়-বিক্রয় ক্রেতা (উকীল)-এর উপর অপরিহার্য হবে। আদেশদাতার উপর অপরিহার্য হবে না। অতএব উকীল আদেশদাতার নিকট হতে এর মূল্য উসুল করতে পারবে না যদি আদেশদাতা তাকে মূল্য না দিয়ে থাকে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য যদি আদেশদাতা খিয়ারের সময়সীমার মধ্যে এ জাতীয় কথা বলে থাকে। পক্ষান্তরে যদি খিয়ারের সময়সীমার পরে বলে তাহলে বিক্রয় চুক্তির দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে। এবং তার বজব্বের ব্যাপারে তাকে সত্যবাদী গণ্য করা হবে না। কেননা সে এমন কথা বলছে যা আবার নতুনভাবে করা সম্ভব নয় (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : যদি কোন পিতা ওসী (ওসীয়াত বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি); মুযারিব, অংশীদার অথবা উকীল ব্যক্তি নাবালিগের পক্ষ হতে কোন কিছু বিক্রি করে এবং নিজের জন্য কিংবা ক্রেতার জন্য খিয়ারের শর্ত করে তবে তা জায়েয হবে। যদি খিয়ারের সময়সীমার মধ্যে নাবালিগ বালিগ হয়ে যায় তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে (মুহীত)। ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে যাহিরী রিওয়ায়েতে আছে যে, খিয়ারের বিষয়টি বালকের প্রতিই ন্যস্ত থাকবে। অতএব যদি সে খিয়ারের সময়সীমার মধ্যে বিক্রয় অনুমোদন করে তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। আর যদি তা রদ করে দেয় তাহলে রদ হয়ে যাবে (আস্ সুগরা)। আর যদি মুদতে খিয়ার অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে (কাফী)। যদি মুকাতাব গোলাম কোন বস্তু বিক্রি করতঃ নিজের জন্য খিয়ারের শর্ত আরোপ করে, তারপর সে মুদতে খিয়ারের তিন দিনের মধ্যে বদলে কিতাবাত আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে সমস্ত ইমামের মতে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে। এমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের উপর যদি তার মুনীব ঐ তিন দিনের মুদতের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তবে তার খিয়ারও বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : যদি নাবালিগের জন্য তার পিতা বা ওসী নিজেদের যিম্মায় লওয়া কর্জের বিনিময়ে কোন বস্তু খরিদ করে এবং খিয়ারে শর্ত করে নেয়, তারপর ঐ নাবালিগ বালিগ হয় এবং পিতা বা ওসী উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে দেয় তবে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে এবং ঐ বালকের খিয়ার থাকবে। সে বিক্রয় অনুমোদন করতে পারে, আবার রদও করতে পারে। অনুমোদন করলে তার ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আর রদ করলে নাবালিগের হক খতম হয়ে যাবে এবং অনুমোদন করার কারণে পিতা বা ওসীর ক্ষেত্রে ক্রয় করার বিষয়টি সহীহ হয়ে যাবে। যদি বালক কোন কিছুর অনুমতি না দেয়; ইত্যবসরে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে রাযী হওয়ার আগে বা পরে ওসী মারা যায় তবে ঐ ইয়াতীম বালকের খিয়ার বাকী থাকবে। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, ওসী তো মারা যায়নি বরং মুদতে খিয়ারের মধ্যে অথবা মুদতে খিয়ার অতিক্রান্ত হওয়ার পর গোলাম ওসীর কবজায় থাকা অবস্থায় মারা যায় অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ওসীর সম্মত হওয়ার আগে বা পরে মুদতে খিয়ারের মধ্যে যদি ঐ ইয়াতীম বালক মারা যায় তাহলে ক্রয়ের দায়িত্ব তার ক্রেতার যিম্মায় অপতিত হবে (যখীরা)।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ খিয়ারে তাঈন বা নির্ধারণের ইচ্ছাধিকারের বিবরণ

১. মাসআলাঃ ذوات القيم (মূল্যনির্ভর বস্তু) এর মধ্যে খিয়ারের তাঈন সহীহ হয় কিন্তু ذوات الامثال (সদৃশ্য বস্তু) এর মধ্যে তা সহীহ হয় না। আর ইসতিহসানের দৃষ্টিতে চারের কম বস্তুতে খিয়ারে তাঈন সহীহ হয় (আন নাহরুল ফায়িক)। যদি বস্তুর সংখ্যা চারটি হয় তবে এতে খিয়ারে তাঈন সহীহ হবে না (কাফী)। খিয়ারে তাঈনের সূরত হচ্ছে নিম্নরূপঃ যেমন কেউ দুজন বা তিন জন গোলামের একজনকে অথবা দুটি বা তিনটি কাপড়ের একটিকে এই শর্তে বিক্রি করল যে, ক্রেতা এর যে কোন একটি পসন্দ করে নিবে (আল-বাহরুর রায়িক)। খিয়ারে তাঈন ক্রেতার মত বিক্রেতার জন্যও হতে পারে (যহীরিয়া)। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (আল-বাহরুর রায়িক)।

২. মাসআলাঃ খিয়ারে তাঈনের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পর ক্রেতা যদি উভয় বস্তু কবজা করে নেয় তবে দুইয়ের একটি ক্রেতার যিম্মায় মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে তার মালিকানাভুক্ত হিসাবে থাকবে। আর অপরটি তার নিকট আমানত হিসাবে থাকবে (হাবী)। কোন কোন ফকীহ বলেছেন এ জাতীয় আকদের মধ্যে খিয়ারে তাঈনের সাথে খিয়ারে শর্তও যুক্ত থাকতে হবে। জামে সগীর গ্রন্থে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। শামসুল আইম্মা (র) বলেন, এটিই সহীহ অভিমত। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, এরূপ হওয়া শর্ত নয়। জামে কবীর গ্রন্থে এ অভিমতটি উল্লেখ রয়েছে। ফখরুল ইসলাম (র) বলেন, এটিই সহীহ অভিমত (তাবয়ীন)।

৩. মাসআলাঃ যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে খিয়ারে তাঈন এবং খিয়ারে শর্তের উপর রাযী হয়ে যায় তবে এ পর্যায়ে খিয়ারে শর্তের হুকুমও সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে তিন দিনের মধ্যে উভয় কাপড় ফেরত দেওয়া বৈধ হওয়া। যদিও এই কাজ হবে ঐ কাপড় নির্দিষ্টকরণের পর যাতে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে। যদি দুই কাপড়ের মধ্যে হতে একটিকে রদ করে দেওয়া হয় তবে তা খিয়ারে তাঈনের ভিত্তিতে হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। কাজেই দ্বিতীয় কাপড়টির মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে। দুটি বস্তুর কোন একটি ফেরত দেওয়া বা নির্দিষ্টকরণের পূর্বেই যদি তিন দিন গত হয়ে যায় তবে খিয়ারে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে এবং একটি কাপড়ের ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হয়ে যাবে। তখন ক্রেতার কর্তব্য হবে ঐ একটি কাপড় নির্দিষ্ট করে নেওয়া (ফাতহুল কাদীর)।

৪. মাসআলাঃ যদি খিয়ারের শর্তের উল্লেখ না থাকলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে খিয়ারে তাঈনের জন্য তিন দিন মুদত ধার্য করা অপরিহার্য। কিন্তু সাহেবাইনের মতে নির্দিষ্ট মুদত ধার্য করা অপরিহার্য। তবে তা যে কোন মুদতই হতে পারে (হিদায়া)। যদি খিয়ারের জন্য কোন মুদত নির্দিষ্ট না করে অনির্দিষ্ট রেখে দেওয়া হয় তবে ইমাম কারখী (র)-এর মতে

১. যে বস্তুর দায় বাজার মূল্য দ্বারা আদায় করা হয় ذوات القيم (সদৃশ্য বস্তু) দ্বারা আদায় করা যায় না তাকে ذوات القيم বলা হয়। আর ذوات الامثال দ্বারা যে বস্তুর দায় আদায় করা হয়, মূল্য দ্বারা নয় একে ذوات الامثال বলা হয়।

এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। জামে সগীর কিতাবেও এদিকে ইশারা রয়েছে “কিতাবুল মাযুনে” আছে শামসুল আইম্মা হালওয়ানী, শামসুল আইম্মা সারাখসী এবং ফখরুল ইসলাম আলী আলবায়দুবী (র)ও এই অভিমতের দিকে ধাবিত হয়েছেন বলে প্রমাণ রয়েছে (মুহীত)। যদি কেউ খিয়ারে তাঈনের সাথে খিয়ারে শর্তের কথাও উল্লেখ করে এবং যার জন্য খিয়ার ধার্য করা হয়েছে পরবর্তীতে সে যদি মারা যায় তবে খিয়ারে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে এবং তার ওয়ারিসদের জন্য খিয়ারে তাঈন সাব্যস্ত হবে। ফলে ওয়ারিসদের ঐ বস্তু দুটো রদ করার আর অধিকার থাকবে না। যখন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস ঐ বস্তু দুটো থেকে কোন একটি পসন্দ করে নিবে তখন দ্বিতীয়টি তার কাছে আমানত হিসাবে থাকবে। যদি ক্রেতার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হয় এবং তার কবজা করার পূর্বে ঐ বস্তু দুটোর কোন একটি খোয়া যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তবে খোয়া যাওয়া জিনিসটি আমানতের বস্তু বলে সাব্যস্ত হবে এবং যেটি বাকী থাকবে তা বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর এই অবশিষ্ট বস্তুর মধ্যে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে; সে ইচ্ছা করলে তা নিতে পারবে আর মনে না চাইলে তা ফেরতও দিতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি উভয়টি খোয়া যায় কিংবা নষ্ট হয়ে যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি একটি খোয়া যাওয়ার পর আরো দুটি বস্তু বাকী থাকে তবে সে এই দুটির থেকে যেটি ইচ্ছা নিতে পারবে। আর ইচ্ছা করলে উভয়টি তরক করতে পারবে। যদি সব বস্তুই খোয়া যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে (শরহত তাহাবী)।

৫. মাসআলাঃ কবজা করার পর যদি দুটি বস্তুর একটি খোয়া যায় তবে সেটাই বিক্রয় দ্রব্যরূপে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর অন্যটি আমানতস্বরূপ থাকবে। তাই এটি বিক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে। যদি দুটি বস্তুই পর্যায়ক্রমে নষ্ট হয়ে যায় প্রথমে প্রথমটি খোয়া যাওয়ার আগে বিক্রয় দ্রব্যরূপে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এবং এর মূল্য আদায় করতে হবে। আর উভয় বস্তু একসাথে খোয়া গেলে ক্রেতাকে বস্তুর অর্ধেক মূল্য আদায় করতে হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। এমনিভাবে যদি উভয় পর্যায়ক্রমে খোয়া যায় কিন্তু প্রথমে কোনটি খোয়া গেছে তা জানা না যায় তাহলেও ক্রেতার উপর প্রত্যেক বস্তুর অর্ধমূল্য আদায় করা ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে (নিহায়া)। যদি বিক্রেতা বলে, দুটি বস্তুর মধ্যে যেটি অধিক মূল্যবান সেটি নষ্ট হয়েছে এবং ক্রেতা বলে, না; বরং যেটি কম মূল্যের তা নষ্ট হয়েছে তাহলে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে গুণমাত্র একজনে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং এই ক্ষেত্রে তার থেকে কসম গ্রহণ করা রহিত হয়ে যাবে। আর যদি উভয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তবে বিক্রেতার সাক্ষ্য প্রমাণটি গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে উত্তম বলে বিবেচিত হবে। যদি দুটি বস্তুর কোন একটি বস্তু কবজা করার আগে বিক্রেতার নিকটে থাকা আয়েব দার হয়ে যায় তাহলে এই আয়েবদার বস্তুটি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হবে না। এ অবস্থায় ক্রেতার জন্য খিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে ঐ আয়েবদার বস্তুটি নিয়ে নিতে পারবে। ইচ্ছা করলে এটি না নিয়ে অন্যটি নিতে পারবে। আর যদি মনে না চায় তবে উভয়টিই বর্জন করতে পারবে। এমনিভাবে যদি দুটি বস্তুর উভয়টিই আয়েবদার হয়ে যায় তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (শরহত তাহাবী)।

৬. মাসআলা : যদি ক্রেতা উভয় বস্তু কবজা করে নেয় তারপর তার কবজায় থাকা অবস্থায় এর একটি খুঁতযুক্ত হয়ে যায় তবে এটি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টি তার নিকটে আমানত হিসাবে থাকবে। আর যদি উভয়টিই আয়েবদার হয়ে যায় এবং তা যদি পর্যায়ক্রমে হয় তবে প্রথমটি ক্রেতার জন্য অবধারিত হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টি বিক্রেতাকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। এ অবস্থায় আয়েবের কারণে যে লোকসান এবং ক্ষতি হয়েছে এর জামানত জরিমানা তাকে দিতে হবে না (আল ইয়নাবী)। প্রথমে কোনটি আয়েবদার হয়েছে এ নিয়ে যদি ক্রেতা বিক্রেতা মতভেদে লিগ হয় তবে এর অবস্থাও অনুরূপ হবে যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে (আল-বাহরুর রাযিক)। আর যদি উভয় বস্তু একই সাথে আয়েবদার হয়ে যায় তবে এর কোনটিই ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হবে না। এ অবস্থায় ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকবে, সে যেটিকে ইচ্ছা মূল্যের বিনিময়ে নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু উভয়টি ফেরত দিতে পারবে না। আর এ পর্যায়ে তার খিয়ারে শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। যদি কবজার পর উভয় বস্তু থেকে কোন একটির আয়েব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যায় অথবা কোন একটির মধ্যে যদি নতুন আয়েব সৃষ্টি হয় তাহলে উক্ত বস্তুটিই ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে (আল ইয়নাবী)।

৭. মাসআলা : খিয়ারে তাঈনের শর্তের কিস্তিতে কোন কিছু খরিদ করার পর ক্রেতা যদি ঐ বস্তু দুটির কোন একটিতে মালিকানা সুলভ কোন আচরণ করে তবে এরূপ করা তার জন্য জায়েয হবে। এতে সে ঐ বস্তুটি মনোনীত করেছে বলে গণ্য হবে এবং তার উপর এর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এ অবস্থায় দ্বিতীয় বস্তুটি তার নিকট আমানতরূপে থাকবে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি ঐ বস্তু দুটির কোন একটিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে তবে তার হস্তক্ষেপ স্থগিত থাকবে। অর্থাৎ এটি যদি বিক্রয় দ্রব্যরূপে নির্দিষ্ট হয়ে যায় তবে তার হস্তক্ষেপ বাতিল বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি আমানতের বস্তুরূপে সাব্যস্ত হয় তবে তাতে তার হস্তক্ষেপ কার্যকরী হবে (শরহুত তাহাবী)। যদি ক্রেতা ব্যক্তি বস্তু দুটোতে কোন হস্তক্ষেপ করে অর্থাৎ এগুলোকে ব্যবহার করে এবং তারা দুজনেই জীবিত থাকে তাহলে ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকবে। সুতরাং যে বস্তুটি সে ইখতিয়ার করবে না বা মনোনীত করবে না তা ফেরত দিয়ে দিবে। কিন্তু উভয়টি ফেরত প্রদানের তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : খিয়ারে তাঈনের শর্তে খরিদকৃত দুটো বস্তুই যদি ক্রেতা বিক্রি করে দেয় তারপর একটিকে সে মনোনীত করে নেয় তবে এই মনোনীত বস্তুটি বিক্রি করা তার জন্য জায়েয হবে। ক্রেতা যদি দুটি কাপড়ের কোন একটিকে রং দ্বারা রঞ্জিত করে তবে এটিই ক্রয়ের জন্য মনোনীত হয়ে যাবে। এবং দ্বিতীয়টি ফেরত দিতে হবে। আর এভাবে বেচাকেনা সম্পন্ন হওয়ার পর বিক্রেতা যদি দুটি গোলামই আযাদ করে দেয় তবে যেটি সে ফেরত পাবে সেটি আযাদ করা সহীহ হবে। পক্ষান্তরে ক্রেতার মনোনীত গোলামটি আযাদ করে দিলে সহীহ হবে না। ক্রেতা যদি খরিদকৃত উভয় দাসীকে কবজায় নিয়ে উম্মু ওয়ালাদ বানায় তাহলে প্রথম উম্মু ওয়ালাদটি ক্রয়ের মনোনীত হয়ে যাবে। এবং দ্বিতীয়টিকে সে যে সহবাস করেছে এর জরিমানা বিক্রেতার নিকট তাকে পরিশোধ করতে হবে। আর এই দ্বিতীয় দাসীর উপর ক্রেতার মালিকানা যেহেতু নেই তাই থেকে এই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। এ পর্যায়ে ক্রেতার জবানবন্দী নেয়া হবে যে, সে প্রথমে কাকে উম্মু ওয়ালাদ বানিয়েছে? যদি তা বয়ান দেওয়ার

আগেই মারা যায় তবে তার খিয়ারে তাঈন তার ওয়ারিসদের জন্য সাব্যস্ত হবে। ওয়ারিসগণ যদি প্রথম উম্মু ওয়ালাদ নির্ধারণ করতে না পারে তাহলে ক্রেতা প্রত্যেক দাসীর অর্ধেক মূল্য এবং অর্ধেক উকর (সহবাসদণ্ড) বিক্রেতাকে প্রদান করবে। তারপর তারা উভয়ে উপার্জন করে বাকী অর্ধেক মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করে দিবে। উল্লেখ যে, কোন কোন রিওয়ায়েতে এ কথা ও উল্লেখ রয়েছে যে, ঐ বাচ্চা দুজনও নিজেদের অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করার ব্যাপারে কার্যিক পরিশ্রম করবে এবং এতে যা অর্জিত হবে তা তারা বিক্রেতাকে দিয়ে দিবে (যাহীরিয়া)।

৯. মাসআলা : খিয়ারে তাঈনের ভিত্তিতে খরিদকৃত দাসীদের সাথে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই সহবাস করে এবং এতে উভয়েই দাসীই সন্তান প্রসব করে; তারপর তারা প্রত্যেকে উভয় সন্তানের দাবীদার হয় তবে ক্রেতা যার সাথে প্রথমে সহবাস করেছে বলবে, তার ব্যাপারে ক্রেতার কথা সত্য বলে ধরে নেওয়া হবে। এ অবস্থায় তার উপর ওয়াজিব হবে দ্বিতীয় দাসীর সাথে সে যে যিনা করেছে এর জরিমানা বিক্রেতাকে পরিশোধ করে দেওয়া। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় দাসীর সন্তানের নসব বিক্রেতার থেকে সাব্যস্ত হবে এবং বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে অপর দাসীর উকর ক্রেতাকে পরিশোধ করা। যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই এ বিষয়ে 'বয়ান দেওয়ার পূর্বে মারা যায় এবং 'প্রথম সহবাস পাত্রী' ওয়ারিসদের কারো জানা না থাকে তাহলে তাদের কারো থেকেই ঐ সন্তান দুটির নসব সাব্যস্ত হবে না। দাসীদের উভয়েই নিজ নিজ সন্তানসহ আযাদ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ক্রেতাকে উভয় দাসীর অর্ধেক মূল্য এবং অর্ধেক 'উকর পরিশোধ করতে হবে। এবং বিক্রেতার কর্তব্য হবে উভয় দাসীর অর্ধেক 'উকর ক্রেতাকে পরিশোধ করা। এভাবে বিষয়টি উভয়ের মাঝে সমান সমান হয়ে যাবে। আর তাদের ওয়ালাء এর ব্যাপারে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই সমভাবে শরীক থাকবে (আল-বাহরুর রাযিক)।

১০. মাসআলা : খিয়ারে তাঈনের ভিত্তিতে দুটি কাপড় খরিদ করা অবস্থায় যদি বিক্রেতার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হয় এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে বিক্রেতা যে কোন একটি কাপড় ক্রেতার যিম্মায় দিয়ে দিতে পারবে। ক্রেতার তা বর্জন করার ইখতিয়ার থাকবে না। কেননা তার তরফ হতে ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তবে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা বিক্রয় চুক্তি রদ করতে পারবে। কেননা বিক্রিত উভয় বস্তুর মাঝেই তার ইখতিয়ার রয়েছে। কিন্তু উভয়টি সে তার উপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। কেননা বিক্রিত বস্তু হল শুধুমাত্র একটি। যদি কবজা করার আগে বা পরে কাপড় দুটির কোন একটি খোয়া যায় তবে তা আমানত হিসাবে খোয়া যাবে। এ অবস্থায় বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে অবশিষ্টটির ক্রয়-বিক্রয়কে বাধ্যতামূলক করে দিতে পারবে। আর ইচ্ছা করলে এর ক্রয়-বিক্রয়কে ভেঙ্গেও দিতে পারবে। কিন্তু খোয়া যাওয়া কাপড়টির ক্রয়-বিক্রয়কে বাধ্যতামূলক করে দেওয়ার তার কোন ইখতিয়ার নেই। যদি কবজা করার পূর্বে উভয় কাপড় খোয়া যায় তবে উভয়টির ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কবজা করার পর উভয় কাপড় খোয়া যায় তবে উভয়টির ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কবজা করার পর উভয় কাপড় খোয়া যায় এবং তা যদি পর্যায়ক্রমে

আগে-পরে খোয়া যায় তাহলে পরে খোয়া যাওয়া কাপড়টির মূল্যের জামানত (ক্ষতিপূরণ) পরিশোধ করা ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা প্রথমটি আমানতের মাল হিসাবে খোয়া গেছে। আর যদি উভয় কাপড় একসাথে খোয়া যায় তবে প্রত্যেক কাপড়ের অর্ধেক মূল্য করে পরিশোধ করা ক্রেতার উপর অপরিহার্য হবে (শরহত তাহাবী)।

১১. মাসআলা : খিয়ারে তাঈনের ভিত্তিতে খরিদ করা কাপড় দুটোর উভয়টি অথবা কোন একটি কবজা করার আগে বা পরে দোষযুক্ত হয়ে গেলে বিক্রেতার খিয়ার বহাল থাকবে। এবং দুটির কোন একটি সে ক্রেতার যিম্মায় বাধ্যতামূলক করে দিতে পারবে। যদি নিখুঁত কাপড়টি ক্রেতার জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয় তবে ক্রেতার তা তরক করার ইখতিয়ার থাকবে না। আর খুঁতযুক্ত কাপড়টি চাপিয়ে দিলে এবং তা কবজার পর হলে এ ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। পক্ষান্তরে কবজার আগে হলে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে সে গ্রহণ করতে পারে। প্রত্যাখ্যানও করতে পারে (আল-ইয়ানাবী)। যদি বিক্রেতা খুঁতযুক্ত কাপড়টি ক্রেতাকে চাপিয়ে দেয় এবং এ ব্যাপারে সে সম্মত না থাকে তা হলে বিক্রেতার এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে পরে খুঁতহীন কাপড়টি তাকে দিয়ে দিবে (যহীরিয়া)। উপরোক্ত অবস্থায় বিক্রেতা ইচ্ছা করলে বিক্রয় চুক্তি রদ করে কাপড় দুটো তার থেকে নিয়ে নিতে পারবে (শরহত তাহাবী)। যদি কাপড় দুটো ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় দোষযুক্ত হয় তাহলে ক্রেতাকে প্রত্যেকটির অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে হবে (আল ইয়ানাবী)। এ অবস্থায় উভয় কাপড় অথবা কোন একটি ক্রেতার ব্যবহার করা জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে বিক্রেতা দুটির কোন একটি কাপড় ব্যবহার করতে পারে তখন দ্বিতীয় কাপড়টি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে বিক্রেতা ইচ্ছা করলে ক্রয়-বিক্রয়কে বাধ্যতামূলক করে দিতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে তা ভেঙ্গেও দিতে পারবে। আর যদি বিক্রেতা কাপড় দুটোর উভয়টিই ব্যবহার করে তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু এতে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে (শরহত তাহাবী)।

১২. মাসআলা : যে যে কারণে খিয়ারে শর্ত রহিত হয়ে যায় ঐ একই কারণে খিয়ারে তাঈনও রহিত হয়ে যায় (যহীরিয়া)। ইবন সিমআ (র) স্বীয় নাওয়াদির কিতাবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে এই শর্তে দুটি কাপড় খরিদ করল যে, এতদুভয়ের থেকে যেটি তার পসন্দ হবে সেটিই সে নিয়ে নিবে। অর্থাৎ যদি পসন্দ হয় তবে এই কাপড়টি দশ দিরহাম মূল্যে এবং যদি পসন্দ হয় তবে ঐ কাপড়টি বিশ দিরহাম মূল্যে নিয়ে নিবে। আর যদি পসন্দ হয় তবে দুটি কাপড়ই নিয়ে নিবে। তারপর সে একটি কাপড় রং দ্বারা রঞ্জিত করল এবং এই কাপড়টি মনোনীত করল আর দ্বিতীয়টি ফেরত দিয়ে দিল। ইত্যবসরে বিক্রেতা বলল, তুমি ঐ কাপড়টিই মনোনীত করেছ যার মূল্য বিশ দিরহাম। এ কথা শুনে ক্রেতা বলল, আমি তো ঐ কাপড়টি মনোনীত করেছি যার মূল্য দশ দিরহাম, মূল্য নিয়ে এই বিতর্কের ক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি ঐ কাপড় দ্বারা জামা তৈরি করার লক্ষ্যে ক্রেতা কাপড়টি কেটে ফেলে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা সেলাই করেনি, এমতবস্থায় যদি উভয়ের মধ্যে মূল্য নিয়ে বিতর্ক হয় তবে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে ক্রেতা যে মূল্যের কথা স্বীকার করেছে, তা সে নিয়ে নিবে। আর যদি ইচ্ছা করে তবে ঐ কর্তিত কাপড়ও নিয়ে নিতে

পারবে। যদি কাপড় কাটার পর তাতে আরো কিছু করা হয় যেমন কাপড়টিতে রং করে ফেলা হল, তবে বিক্রেতা আর ঐ কাপড় নিতে পারবে না। তখন তার সেই মূল্যই গ্রহণ করতে হবে যা ক্রেতা বলেছে। মুআল্লা ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে এক ব্যক্তি দুটি কাপড় অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে এই শর্তে খরিদ করল যে, এর মধ্য হতে একটি সে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে নিয়ে নিবে। তারপর একটি কাপড় খোয়া গেল এবং দ্বিতীয় কাপড়টি ক্রেতা কর্তন করিয়ে নিল। তারপর ক্রেতা বলল, যে কাপড়টি আমি কাটিয়েছি সেটিকেই আমি মনোনীত করেছিলাম। তারপর দ্বিতীয় কাপড়টি খোয়া গেছে এবং এটি আমার নিকট আমানত হিসাবে থাকা অবস্থায় খোয়া গেছে। এ কথা শুনে বিক্রেতা বলল, যে কাপড়টি খোয়া গেছে সেটিই তুমি মনোনীত করেছিলে। তারপর তুমি অপর কাপড়টি কর্তন করিয়ে নিয়েছো, সুতরাং তোমার উপর ঐ কাপড়ের মূল্য পরিশোধ করা অপরিহার্য যেটি তুমি কর্তন করিয়েছো। আর যেটি খোয়া গেছে এর মূল্যও তোমাকেই পরিশোধ করতে হবে। এহেন অবস্থায় কর্তিত কাপড়টির অর্ধেক ثمن (পরস্পর সাব্যস্তকৃত মূল্য) আর খোয়া যাওয়া কাপড়টির অর্ধেক قیمت (বাজার মূল্য) এবং অর্ধেক ثمن (পরস্পর মিলে সাব্যস্তকৃত মূল্য) ক্রেতার যিম্মায় পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে (মুহীত)।

১৩. মাসআলা : ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও খিয়ারে তাঈন জায়েয আছে। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকুন যে, বায়য়ে ফাসিদের মধ্যে যে বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট হবে এর মূল্য দিতে হবে। আর বাকী অবস্থা ঠিক তদ্রূপই যা আমরা জায়েয ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনায় বর্ণনা করেছি। কেউ যদি বায়য়ে ফাসিদের ভিত্তিতে দুটি গোলাম খরিদ করে এবং দুটিই এক সাথে মারা যায় তবে ক্রেতা প্রত্যেক গোলামের অর্ধেক মূল্যের যামিন হবে। আর যদি ক্রেতা তাদের উভয়কে আযাদ করে দেয় তবে শুধুমাত্র এক গোলাম আযাদ হবে। তবে তা নির্দিষ্ট করা ক্রেতার ইখতিয়ারে থাকবে। আর ক্রেতা যদি নির্দিষ্ট কোন একটিকে আযাদ করে বা বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে এবং তার উপর এর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট অবস্থায় আযাদ করা বিক্রেতা এবং ক্রেতা কারো তরফ হতেই জায়েয নয়। যদি বিক্রেতা দুটি গোলামের কোন একটিকে নির্দিষ্টভাবে আযাদ করে দেয় তারপর ক্রেতা ঐ নির্দিষ্ট গোলামকে পুনরায় আযাদ করে অথবা বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে অথবা সে মারা যায় তবে বিক্রেতার আযাদ করা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি ঐ গোলামই বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হয় তবে তার আযাদ করা সহীহ হবে। আর যদি বিক্রেতা উভয়টিকে আযাদ করে দেয় তারপর বিক্রেতাকে উভয়টিই ফেরত দেওয়া হয় তবে দুটির একটিই শুধু আযাদ হবে এবং তা নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার বিক্রেতার (যহীরিয়া)।

সপ্তম অনুচ্ছেদ : খিয়ারে শর্তে খরিদা বস্তু রদ করার সময়, তা নির্ধারণের মতানৈক্য এবং খিয়ারে শর্তের বিক্রিত দাসের অপরাধ প্রসঙ্গ।

১. মাসআলা : তিন দিনের খিয়ারের শর্তে খরিদা বস্তু কবজা করার পর যখন তা ফেরত দিতে আসলে তখন বিক্রেতা বলল, এ তো আমার বিক্রিত মাল নয়, আর ক্রেতা বলল, এটি সে মালই; এ অবস্থায় কসমের সাথে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (যহীরিয়া)।

২. মাসআলা : যদি উপরোক্ত অবস্থাসমূহে খরিদকৃত বস্তু ক্রেতার কবজায় না থাকে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার নিয়ন্ত্রনাধীন কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করতে চায়, আর এ অবস্থায় বিক্রেতা বলে, আমি এই বস্তু তোমার নিকট বিক্রি করিনি এবং ক্রেতা বলে যে, এই বস্তুই তুমি আমার নিকট বিক্রি করেছো, তাহলে এই মাসআলার সমাধান কি হবে; এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর কিতাবে কোন কথাই উল্লেখ নেই। তবে ফকীহগণ বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হওয়াই অধিক সমীচীন। এ হুকুম ক্রেতার খিয়ারের ক্ষেত্রে পক্ষান্তরে বিক্রেতার খিয়ার হলে এবং বিক্রয় দ্রব্য ক্রেতার কবজায় হলে এবং ক্রেতা খিয়ারের সময়সীমায় মধ্যে বিক্রিত বস্তু ফেরত দেওয়ার জন্য নিয়ে আসলে বিক্রেতা যদি বলে যে, এটি ঐ বস্তু নয় যা আমি তোমার নিকট বিক্রি করেছিলাম এবং যা তুমি আমার নিকট হতে কবজা করেছিলে। এ কথা শুনে ক্রেতা যদি বলে, এটিই তুমি আমার নিকট বিক্রি করেছো এবং এটিই তুমি আমার কবজায় দিয়েছো, তাহলে কসমের সাথে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি বিক্রিত বস্তুর উপর কবজা না হয়, এ অবস্থায় বিক্রেতা যদি কোন নির্দিষ্ট বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়কে বাধ্যতামূলক করে দিতে চায় এবং ক্রেতা বলে যে, আমি এটি খরিদ করি নি, তাহলে এর সমাধান সম্পর্কে কিতাবে বর্ণিত আছে যে, এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কথাই কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে (যখীরা)।

৩. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি দিনের খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে একটি গোলাম বিক্রি করল। আর ঐ গোলাম খিয়ারের সময়সীমার মধ্যে ভুলক্রমে হত্যা করল। আর মালিক এই অপরাধের কথা জেনেও বিক্রয় অনুমোদন করল। এই অনুমোদের 'রজুপণ' প্রদানের স্বীকৃতি নয়। দানের তরে অনুমোদন গ্রহণযোগ্য এ অবস্থায় ক্রেতার খিয়ার থাকবে। কেননা গোলাম বিক্রেতার যামানতে থাকা অবস্থায় দোষযুক্ত হয়েছে। অতএব ক্রেতা যদি গোলামকে নিয়ে নেওয়া পসন্দ করে তবে তার ইখতিয়ার থাকবে; সে ইচ্ছা করলে গোলামকে নিহত ব্যক্তির ওলী-ওয়ারিসদের নিকট হস্তান্তর করতে পারবে; আবার ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ (ফিদ্যা)-ও দিতে পারবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়াকে পসন্দ করে তবে তারও অনুরূপ ইখতিয়ার হাসিল হবে। ইচ্ছা করলে সে গোলামকেও হস্তান্তর করে দিতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে এর মুক্তিপণও আদায় করতে পারবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি উক্ত অপরাধ বিক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় এ জাতীয় অপরাধ সংঘটিত হয় এবং বাকী মাসআলা পূর্বের ন্যায় হয় তাহলে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি সে অনুমোদন দেয় তবে তা বৈধ হবে এবং আকদের সময় হতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হবে। তারপর (অপরাধের কারণে) গোলাম হস্তান্তর করা বা মুক্তিপণ প্রদান করা এতদুভয়ের মধ্যে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি ক্রেতার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত থাকে এবং গোলামের এই অপরাধ বিক্রেতার কবজায় হয় তাহলে ক্রেতার জন্য খিয়ারে আয়েব হাসিল হবে এবং তার খিয়ারে শর্তও বাকী থাকবে। তারপর যদি সে দোষযুক্ত গোলাম নিতে চায় তবে পূর্বোক্ত নীতি অনুসারে গোলাম হস্তান্তর করা এবং মুক্তিপণ পরিশোধ করার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি সে মুক্তি রদ করতে চায় তবে এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুই অবস্থার মধ্যে কোন একটি অবলম্বন করার

ব্যাপারে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি ঐ গোলাম ক্রেতার কবজায় খিয়ারের সময়সীমায় অপরাধ করে তবে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু যদি মুদতে খিয়ারের মধ্যে তার ফিদ্যা (মুক্তিপণ) দিয়ে দেয় তাহলে খিয়ারে শর্তের কারণে তাকে ফেরত দিতে পারবে। কেননা অপরাধের কারণে তার মধ্যে যে আয়েব (খুঁত) সৃষ্টি হয়েছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি তার ফিদ্যা পরিশোধ না করা হয় বরং অপরাধের কারণে স্বয়ং গোলামকে হস্তান্তর করে দেওয়া পসন্দ করে তবে ক্রেতার খিয়ারে শর্ত রহিত হয়ে যাবে। আর গোলামকে হস্তান্তরের উদ্যোগ নেয়ার সময়ই গোলামের মধ্যে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাকে গোলামের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৪. মাসআলা : কোন ব্যক্তি বিক্রেতা বা ক্রেতার খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে একটি বাড়ি খরিদ করল অথবা পাকাপাকিভাবে একটি বাড়ি খরিদ করল। তারপর সে বাড়িতে কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গেল। তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অতিমত অনুসারে বর্তমানে ঐ বাড়িটি যে ব্যক্তির কবজায় রয়েছে তার নিকট আত্মীয়ের উপরই সর্বাবস্থায় এর দিয়াত (রজুপণ) ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অতিমত অনুসারে যদি ক্রয়-বিক্রয় পাকাপাকিভাবে হয়ে থাকে তবে ক্রেতার নিকট আত্মীয় ওলী-ওয়ারিসদের উপর এর দিয়াত ওয়াজিব হবে। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে খিয়ার থাকে তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা বা অনুমতি দেওয়ার কারণে ঐ বাড়িটি ভবিষ্যতে যার মালিকানাধীন হবে; তার উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের মতে যদি ক্রয়-বিক্রয় পাকাপাকিভাবে হয় এবং বাড়িটি ক্রেতার কবজায় থাকে আর এ কারণে ক্রেতার নিকট আত্মীয় ওলী-ওয়ারিসদের দিয়াত ওয়াজিব হয় তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কোন ইখতিয়ার হাসিল হবে কিনা, এ বিষয়ে কিতাবে কোন কথা উল্লেখ নেই। যুক্তি অনুসারে খিয়ার হাসিল না হওয়াই উচিত। কেননা কোন বাড়িতে নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া حقیقة (প্রকৃতপক্ষে) এবং اعتباراً (রূপক অর্থে) এমন কোন আয়েব নয় যা ঐ বাড়িকে দোষী এবং আশ্রয়দার করে দেয়। কেননা হত্যার অপরাধের জামানত হিসেবে ঐ বাড়ির উপর কারো কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না (আল-মুহীত)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : দেখার ইচ্ছাধিকার সম্পর্কিত মাসাইল

[এ পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ : থিয়েরে রুয়ত সাব্যস্ত হওয়ার ধরন এবং এর বিধি-বিধান

১. মাসআলা : ক্রেতার জন্য না দেখা মাল খরিদ করা জায়েয আছে (হাবী)। উক্ত মাসআলার সূরত হলো, যেমন কোন ব্যক্তি কাউকে বলল, আমার আসতীনের ভেতর বা বগলের নীচে যে কাপড় রয়েছে, যার গুণাগুণ এরূপ; তা আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম। অথবা বলল, আমার মুঠোয় এই এই ধরনের যে মোতি আছে তা আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম, অথবা গুণাগুণের কথা উল্লেখ না করেই এ জাতীয় কথা বলল, অথবা বলল যে, আমি তোমার নিকট আমার নেকাব পরিহিত দাসীকে বিক্রি করলাম। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি বলে আমি তোমার নিকট আমার আস্তিন বা মুঠোয় যা আছে তা বিক্রি করলাম, তবে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কিনা, এ সম্বন্ধে মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) কোন ফায়সালা উল্লেখ করেন নি। কিন্তু অধিকাংশ মাশাইখে কিরাম বলেন, 'কোন বস্তু না দেখে ক্রয় করা জায়েয হওয়ার নিঃশর্ত বিধান' থেকে বুঝা যায় যে, আমাদের মাযহাবে উপরোক্ত কথার দ্বারাও ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : কেউ যদি না দেখে কোন বস্তু ক্রয় করে তবে তা জায়েয হবে এবং দেখার পর তার ইচ্ছাধিকার থাকবে। অর্থাৎ যেন তা পূর্ণ মূল্যে গ্রহণ করতে পারে, আবার ফেরত দিতে পারে। চাই ক্রেতা বস্তুটিকে বিক্রেতার বর্ণিত গুণসম্পন্ন পাক অথবা এর বিপরীত পাক (ফাতহুল কাদীর)। থিয়েরে রুয়ত হকুম অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়ে যায়, এতে কোনরূপ শর্ত আরোপ করার প্রয়োজন হয় না (আল-জাওহারা তুন ন্যায়ারা)। থিয়েরে রুয়ত বিক্রিত বস্তু ও এর মূল্যে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না, কিন্তু তা ক্রয়-বিক্রয় অপরিহার্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় (মুহীত : আস-সারাখসী)। বিক্রিত বস্তু দেখার পূর্বে থিয়েরে রুয়ত স্পষ্ট শব্দে রহিত করে দিলেও তা রহিত হয় না। কিন্তু দেখার পর রহিত করে দিলে তা রহিত হয়ে যাবে (বাদায়ে)। অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মতে, খরিদা মাল দেখার আগেও ক্রেতা চুক্তি রদ করে দিতে পারে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত (আল-ফাতাওয়াস সুগরা)। যদি দেখার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হয় তবে তা জায়েয হবে না। সুতরাং তার থিয়ের বহাল থাকবে। তারপর যখন সে দেখবে তখন তার ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে

১৪. না দেখে মাল খরিদ করলে মাল দেখার পর ক্রেতা চুক্তি বহাল রাখতে পারে, আবার তা বাতিলও করতে পারে এই ইচ্ছাধিকারকে শরীআতের পরিভাষায় থিয়েরে রুয়ত বলে। এই প্রকার ইখতিয়ার নির্দিষ্ট সময়ের সাথে খাস নয়। বরং যখন দেখবে তখনই এই ইখতিয়ার হাসিল হবে।

সেটি সে নিয়ে যাবে, আবার ইচ্ছা করলে তা ফেরতও দিতে পারবে (মুযমারাত)। যেভাবে ক্রেতার জন্য বিক্রিত বস্তুতে থিয়েরে রুয়ত সাব্যস্ত হয়; এমনিভাবে মূল্য যদি عین হয় তবে তা বিক্রেতার জন্যও এতে থিয়েরে রুয়ত সাব্যস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা : থিয়েরে রুয়ত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হল, বিক্রিত বস্তু নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন হওয়া পক্ষান্তরে যে বস্তু নির্দিষ্টতা গুণসম্পন্ন নয় তাতে থিয়েরে রুয়ত সাব্যস্ত হবে না (বাদায়ে)। পরিমাপযোগ্য এবং ওজনযোগ্য বস্তু যদি عین (বা নির্দিষ্ট) হয় তবে অপরাপর اعیان (নির্দিষ্ট বস্তু) এরই হকুমভূক্ত হবে। এমনিভাবে স্বর্ণ-রৌপ্যের টুকরা এবং বাসন-কোসন ইত্যাদির ব্যাপারে উক্ত হকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি নিজের যিম্মায় ঋণ হিসাবে কোন কিছুর মালিক হয় তবে এতে থিয়েরে রুয়ত সাব্যস্ত হবে না। যেমন বায়য়ে সলমের মধ্যে মাসলাম (مسلم فيه) এর মালিক হওয়া। এতে থিয়েরে রুয়ত সাব্যস্ত হবে না। দিরহাম দীনারের মধ্যেও থিয়েরে রুয়ত সাব্যস্ত হয় না, চাই তা নগদ হোক বা বাকি হোক। পরিমাপযোগ্য এবং ওজনযোগ্য বস্তু যদি নির্দিষ্ট না হয় তবে তা দিরহাম ও দীনারের অনুরূপ বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা : যে সমস্ত আক্দ 'রদ' করার দ্বারা ভেঙে যায় তাতে থিয়েরে রুয়ত সাব্যস্ত হবে। যেমন ইজারা; আর্থিক দাবীর উপর সুলেহ করা মালামাল বণ্টন করা এবং ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি (শরহত তাহাবী)। আর যে সব আক্দ রদ করার দ্বারা ভাঙে না তাতে থিয়েরে রুয়ত সাব্যস্ত হবে না। যেমন বিয়ের মহর, খুলার বদল, অথবা হত্যাজনিত সুলহের বদল এবং এ জাতীয় অন্যান্য আক্দ যাতে ফেরত দেওয়া বস্তু নিজ সত্তার উপর যামানাত হিসেবে থাকে। নিজের বিনিময়ের বস্তুর বদলে জামানত হয় না (যখীরা)। শায়খ উসূত গুনী (র) فوائد بعض الأئمة (ফাওয়ায়িদু বাদিল আইম্মা) কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, আমি বুখারার ইমামদের নিকট এ মর্মে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করেছি যে, থিয়েরের রুয়ত এবং থিয়েরে আয়েব ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সাব্যস্ত হয় কিনা? জবাবে তারা বলেছেন যে, হাঁ, এগুলো ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও সাব্যস্ত হবে (আল ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

৫. মাসআলা : থিয়েরে রুয়ত কি সময়যুক্ত না নির্দিষ্ট সময়যুক্ত? এ ব্যাপারে মাশাইখে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ইমাম বলেন যে, এর জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকবে। অর্থাৎ দেখার পর চুক্তি রদ করার জন্য যতটা সময় দরকার ঐ সময় দ্বারা আক্দ হবে। সুতরাং যদি মাল দেখার পর চুক্তি রদ করার প্রয়োজনীয় সময় থাকা সত্ত্বেও রদ না করে তবে থিয়েরে রুয়ত রহিত হয়ে যাবে। যদিও ঐ সময় পর্যন্ত প্রকাশ্যত বা অপ্রকাশ্যত ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন অনুমতি পাওয়া যায় (আল-বাহরুর রায়িক)। কিন্তু মুখতার এবং পসন্দনীয় অভিমত হল যে, থিয়েরে রুয়ত সময়যুক্ত হবে না বরং যতক্ষণ পর্যন্ত থিয়ের বাতিল করার মত কোন বিষয় না ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বাকী থাকবে (ফাতহুল কাদীর)। এটিই সহীহ কথা (আল-বাহরুর রায়িক)। ক্রেতার পক্ষ হতে থিয়েরে রুয়তকে বাতিল না করা পর্যন্ত তার নিকট বিক্রিত পণ্যের মূল্য চাওয়া বিক্রেতার জন্য জায়েয নেই (ফাতহুল কাদীর)। থিয়েরে রুয়তের মধ্যে মীরাস

১. যেমন দিরহাম ও দীনার। এগুলোতে থিয়েরে রুয়ত সাব্যস্ত হবে না।

জারী হয় না। সুতরাং ক্রয়কৃত বস্তু দেখার পূর্বেই যদি ক্রেতা মারা যায় তবে তার ওয়ারিসদের মাল ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না (শরহত তাহাবী)। যদি কোন ব্যক্তি এমন বস্তু বিক্রি করে যা সে দেখেনি, যেমন কেউ এমন কোন বস্তুর ওয়ারিস হল, যা সে দেখেনি, তারপর সে তা বিক্রি করে দিল তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর আখিরী অভিমত অনুসারে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে এবং তার জন্য কোন খিয়ারও থাকবে না (যখীরা)।

৬. মাসআলা : কেউ যদি عین (নির্দিষ্ট বস্তু)-কে عین (নির্দিষ্ট বস্তুর)-এর বিনিময়ে না দেখা এবং دین (অনির্দিষ্ট বস্তু)-এর বিনিময়ে বিক্রি করে তারপর ঐ বস্তু দেখে এবং তা ফেরত দেয় তাহলে নির্দিষ্ট বস্তুর অংশের বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু অনির্দিষ্ট বস্তুর অংশের বিক্রয় বাতিল হবে না। কেননা তার কর্জের অংশে খিয়ারে রূয়ত ছিল না (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি কোন ব্যক্তি এমন বস্তু খরিদ করে যা সে দেখেছে, কিন্তু পরে যদি তা পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে এতে তার খিয়ার থাকবে। আর যদি পরিবর্তিত না হয় তবে খিয়ার থাকবে না। কিন্তু যদি ক্রয়কালে তার এ কথা মনে না থাকে যে, সে পূর্বে তা দেখেছিল তাহলে তার জন্য এতে খিয়ার সাব্যস্ত হবে (তাবয়ীন)। খরিদকৃত বস্তুটি পরিবর্তিত হয়েছে না হয়নি যদি এ বিষয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, ক্রেতা বলে, পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু বিক্রেতা বলে যে, পরিবর্তিত হয়নি, তাহলে কসমের সাথে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে; যদি বিক্রয় উত্তরকালীন সময় এতই নিকটবর্তী যাতে বুঝা যায় যে, এ সময়ের মধ্যে এই জাতীয় বস্তুতে পরিবর্তন আসতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি বিক্রয় উত্তরকালে অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, যেমন যৌবনকালে দেখা দাসীকে কয়েক বছর পর ক্রয় করল। এ অবস্থায় বিক্রেতা যদি অপরিবর্তনের দাবী করে তাহলে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (কাফী)। ফাতওয়া এর উপরই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এরূপ মতভেদ হয় যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে যে, ক্রয়কালে তুমি এটি দেখেছো, আর ক্রেতা বলে যে, আমি দেখেনি তাহলে কসমের সাথে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (বাদায়ে)। যদি খরিদকৃত ভাজ করা থাকে এবং ক্রেতা ঐ ভাজ করা বস্তু কবজা করার কথা স্বীকার করে এবং পরবর্তী সময়ে বলে যে, আমি এর সব ক'টি ভাজ খুলে দেখেনি তবে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (মুহীত)। আমাদের হানাফী ইমামগণ বলেন, বিক্রেতা যদি বলে যে, এটা আমার বিক্রি করা মাল নয়, আর ক্রেতা বলে যে, এটা তোমারই বিক্রি করা মাল। তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এইভাবে যে সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্রেতার কথায় আক্দ ভেঙ্গে যায় সে সব ক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যে সব ক্ষেত্রে বিক্রেতার সম্মতি অথবা আদালতের রায় ছাড়া শুধু ক্রেতার কথায় চুক্তি রদ হয় না সে সব ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন আয়েব বা ক্রটিজনিত কারণে খরিদকৃত বস্তু রদ করার অবস্থায় হয়ে থাকে (শরহুল কুদুরী)।

৭. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি যবাহকৃত বকরীর চামড়া খসানোর পূর্বে এর নাড়িভুড়ি খরিদ করে তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু যদি তরমুজ কাটার আগেই এর বীজ বিক্রি করে দেয়

তবে তা জায়েয হবে না। যদিও বিক্রেতা সেটি কাটার উপর রাখী থাকে। চামড়া খসানোর আগে ভুড়ি বিক্রি করা জায়েয আছে বটে তবে এই ভুড়ি বের করে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করা বিক্রেতার উপর ওয়াজিব। এ অবস্থায় ক্রেতার জন্য খিয়ারে রূয়ত হাসিল হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কিন্তু যদি যবাহ নাড়িভুড়ি ক্রয় করে তবে তা জায়েয হবে না (আল ফাতাওয়াস সুগরা)। কেউ হিরুবী কাপড়ের কোন গাঁঠুরি দেখে তা গ্রহণ করে নিয়েছে। তারপর এই গাঁঠুরির মালিক তা থেকে একটি কাপড় কেটে নিয়ে ক্রেতাকে এ সম্পর্কে অবগত করেছে। কিন্তু এই কাপড়টি নিজ চোখে দেখেনি। এমতাবস্থায় সে যদি গাঁঠুরির বাকী কাপড়সমূহ খরিদ করে তবে এ ক্ষেত্রে কাপড়গুলো দেখার পর তার খিয়ারে রূয়ত হাসিল হবে। কোন ব্যক্তি বিক্রয়ের জন্য দুটি কাপড় বাজারে নিয়ে এসেছিল, (তারপর ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত আলোচনার পর সেগুলো সে বাড়ি নিয়ে গেল) তারপর ঐ দুটি কাপড়ের একটিকে সে (বিক্রেতা) রুমাল দ্বারা পেচিয়ে এনে তা ক্রেতার সামনে পেশ করল। ক্রেতা না দেখেই তা খরিদ করে নিল। এহেন অবস্থায় ক্রেতার যদি জানা না থাকে যে, কোনটি রুমাল দ্বারা পেচানো হয়েছে তাহলে কাপড়টি দেখার পর তার খিয়ার হাসিল হবে (হাবী)। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি দুটি কাপড়ের প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন রুমাল দ্বারা পেচিয়ে ক্রেতার সামনে এনে বলে যে, এ দুটো ঐ কাপড় যা আমি তোমাকে গতকাল দেখিয়েছিলাম। এহেন অবস্থায় ক্রেতা যদি বলে, আমি এই নির্দিষ্ট কাপড়টি দশ দিরহামের বিনিময়ে এবং নির্দিষ্ট কাপড়টি দশ দিরহামের বিনিময়ে নিয়ে নিলাম এবং খরিদকালে সে কাপড় দুটো না দেখে তাহলে তার খিয়ারে রূয়ত হাসিল হবে না। কিন্তু সে যদি কাপড় দুটো ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে খরিদ করে যেমন সে বলল, আমি এই কাপড়টি বিশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করলাম এবং ঐ কাপড়টি দশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করলাম তাহলে তার খিয়ার হাসিল হবে। আর যদি বলে আমি এই কাপড় দুটির একটি বিশ দিরহাম মূল্যের বিনিময়ে নিয়ে নিলাম কিন্তু সে জানে না যে, এ কাপড়টি কোনটি? তাহলে এই আক্দ ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : মুনতাকা গ্রহে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তির সামনে এক গাঁঠুরি হিরুবী কাপড় পেশ করা হল। তারপর সে গাঁঠুরির প্রতিটি কাপড় দেখে নিল। তারপর কাপড়ের মালিক ঐ গাঁঠুরি থেকে একটি কাপড় খুলে এনে রুমালে পেচিয়ে তা ঐ লোকটির সামনে পেশ করল যার সামনে গাঁঠুরি পেশ করা হয়েছিল। এরপর সে ঐ কাপড়টি খরিদ করে নিল এ অবস্থায় কাপড়টি দেখার পর ক্রেতার তাতে খিয়ারে রূয়ত হাসিল হবে। যদিও গাঁঠুরির মালিক স্পষ্টভাবে এ কথা বর্ণনা করে যে, এটি ঐ গাঁঠুরিরই কাপড় এবং তা এমনভাবে বর্ণনা করল যে, সে কাপড়টি ভালভাবে চিনে নিল (যখীরা)। কেউ যদি এমন জিনিস খরিদ করে যা সে দেখেছে, কিন্তু এখন সে আর তা চিনতে পারছে না, যেমন কেউ কাপড় কারো হাতে দেখেছিল, তারপর কাপড়ের মালিক সেটিকে রুমালে পেচিয়ে তার নিকট বিক্রি করে দিল কিন্তু সে এখন আর তা চিনতে পারছে না অথবা কেউ কারো হাতে কোন দাসীকে দেখল তারপর নিকাব পরিহিত অবস্থায় সে তাকে বিক্রেতার নিকট দেখল এবং তার থেকে তাকে খরিদ করে নিল, কিন্তু এখন সে আর বুঝতে পারছে না যে, এটি কি ঐ দাসী, না অন্য কোন দাসী, তবে এ ক্ষেত্রে যখন সে তা দেখবে তখনই তার খিয়ারে রূয়ত হাসিল হবে (মুহীত)। কেউ যদি পানিবাহী ব্যাগ হতে পানি খরিদ করে তবে সেটি দেখার পর তার খিয়ারে রূয়ত হাসিল হবে।

কেননা কিছু পানি আছে সুন্দার আবার কিছু এই পর্যায়ের নয়। এমনভাবে পানি খরিদ করার সময় দজলার পানি শর্ত করা হয়েছিল কিন্তু পরে দেখা গেল যে, এ পানি দজলার পানি নয় তাহলেও ক্রেতার খিয়ার হাসিল হবে। কেননা এক স্থানের পানি অন্য স্থানের পানির তুলনায় কখনো সুপেয় হয়ে থাকে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা : খিয়ারে রুয়ত লেনদেন (صفقة) পরিপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।^২ সুতরাং কেউ যদি এক গাঁঠুরি যুতী কাপড় কারো থেকে খরিদ করে, অথচ সে তা দেখেনি, তারপর ক্রেতা তা কবজা করার পর তাতে নতুনভাবে কিছু খুঁত দেখা দেয় তাহলে খিয়ারে রুয়তের কারণে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না (যখীরা)। যদি ক্রেতা খরিদকৃত বস্তুর অংশ বিশেষের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করে; কিন্তু অপর অংশের ব্যাপারে অনুমতি না দেয় যেমন কেউ কাপড় অথবা দুটি গোলাম অথবা তদ্রূপ অন্য কিছু খরিদ করে এবং তা কবজা করে নেয়। তারপর সে ঐ বস্তু দুটো দেখার পর একটি পসন্দ করে এবং বলে, আমি এটি পসন্দ করেছি তাহলে এতে পূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় অপরিহার্য হবে না। কাজেই খিয়ার পূর্ববৎ বাকী থাকবে (মুহীত)। কেউ যদি দুটি বস্তু খরিদ করে এগুলো দেখে এতদুভয়ের থেকে একটি কবজা করে নেয় তবে এ কবজা তার পক্ষ হতে সম্মতি বলে গণ্য হবে। ইবন রাস্তম (র) ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে অনুরূপ থেকে বর্ণনা করেছেন, খরিদকৃত দুটি বস্তুর একটিকে দেখা দুটিকে দেখার অনুরূপ নয়। কিন্তু যদি দেখা বস্তুটি কবজা করার পর ক্রেতা তা নষ্ট করে ফেলে তাহলে এ অবস্থায় তার ক্রয়-বিক্রয় অপরিহার্য হয়ে যাবে। অবশ্য ইমাম আবু ইউসুফ (র) এ ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেন (যহীরিয়া)।

১০. মাসআলা : দুই ব্যক্তি এক সঙ্গে না দেখা কোন মাল খরিদ করল এবং কবজা করার পর উভয়ে মাল সেখান এখন একজন পসন্দ করে রাখতে চায় আর অন্যজন অপসন্দ করে ফেরত দিতে চায় এ ক্ষেত্রে উভয়ে একমত না হওয়া পর্যন্ত ঐ ফেরত দিতে পারবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। এমনভাবে যদি বিক্রেতা দুজন ও ক্রেতা একজন হয় এবং খিয়ার বিক্রেতাদ্বয়ের উভয়ের জন্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে আর এ অবস্থায় তাদের একজনে যদি ক্রয়-বিক্রয়কে ভেঙ্গে দেয়, কিন্তু অপরজনে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করে তাহলে উভয়ে একমত হয়ে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। একজন দেখেছে, একজন দেখেনি এমন দুব্যক্তি যদি একটি দাসী খরিদ করে এবং কবজাও করে। তারপর না দেখা লোকটি দাসীকে দেখার পর উভয়ে তাকে ফেরত দিতে চাইলে ফেরত দিতে পারবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দাসীকে দেখেনি সে দাসীকে ফেরত প্রদানের আগে যে দেখেছে সে যদি বলে, আমি রাযী আছি এবং ক্রয় চুক্তি চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করছি তাহলে যে ব্যক্তি দেখেনি তার চুক্তি রদ করার পূর্ণ ইখতিয়ার থাকবে এ অবস্থায় শরীক ব্যক্তির সম্মত হওয়ার বিষয়টি তার দেখার পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে (মুহীত)। যদি কেউ দুটি কাপড়ের একটি দেখে দুটি কাপড় খরিদ করে, তারপর দ্বিতীয় কাপড়টি দেখে তবে সে ইচ্ছা করলে দুটি কাপড়ই দুটি

ফেরত দিতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে উভয়টিই রেখে দিতে পারবে (কাফী)। যদি কেউ না দেখে যুতী কাপড়ের কোন গাঁঠুরি খরিদ করে; তারপর সে এই গাঁঠুরির কোন একটি কাপড় পরিধান করে তাহলে এই গাঁঠুরির মধ্যে যত কাপড় আছে সব কাপড়ের ক্ষেত্রেই তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা : কবজার আগে বা পরে খিয়ারে রুয়তের ভিত্তিতে ফেরত দেওয়ার অর্থ হলো চুক্তি রহিত করা। এ ক্ষেত্রে বিচারকের ফায়সালা এবং বিক্রেতার সম্মতি আবশ্যিক নয়। শুধু ফেরত দিলাম বলার দ্বারাই রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিক্রেতার অবগতি ছাড়া ফেরত দেয়া সহীহ হবে না (আল বাহরুর রাযিক)। কেউ যদি খরিদকৃত মালামাল কবজা করে নেওয়ার পর তা দেখে তবে তার খিয়ার বাকী থাকবে-যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করবে অথবা তার তরফ হতে এমন কোন ব্যাপার না ঘটে যা দ্বারা তার সম্মতি বুঝা যায় (যহীরিয়া)। (খিয়ারে রুয়তের মধ্যে খরিদকৃত) মাল দেখার পর এই মালের ব্যাপারে তার সম্মতির বিষয়টি সহীহ বলে ধর্তব্য হয়। চাই এ সময় বিক্রেতা উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, এতে কোন পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত। রাযী হওয়া দুভাবে হতে পারে। (১) رضاء بالصريح অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে রাযী হওয়া। (২) رضاً بالادلة ইসারা ইংগিতে রাযী হওয়া। পরিষ্কারভাবে রাযী হওয়া, যেমন মাল দেখার পর পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া যে, আমি এতে রাযী আছি অথবা বলে দেওয়া যে, আমি এই ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে অনুমতি দিলাম। আর ইসারা ইংগিতে বলে দেওয়ার মর্ম হল খরিদ করার পর মাল দেখে তা কবজা করে নেওয়া (এটিও সম্মতির-আলামত) (যখীরা)।

১২. মাসআলা : খরিদকৃত বা বিক্রিত মাল দোষযুক্ত হয়ে গেলে অথবা ব্যবহার (تصرف) করলে খিয়ারের শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। তারপর যদি ঐ মালে এমন হস্তক্ষেপ করা হয় যা সম্পন্ন হওয়ার পর আর রদ করা যায় না-যেমন গোলাম আযাদ করা বা মুদাব্বার বানানো ইত্যাদি। আর যদি ঐ মালে এমন হস্তক্ষেপ করা হয় যা দ্বারা তাতে অন্যের হক সাব্যস্ত হয়ে যায় যেমন নিঃশর্ত বিক্রয় করা বন্ধক রাখা বা ইজারা দেওয়া ইত্যাদি। এ জাতীয় হস্তক্ষেপ (تصرف) মাল দেখার আগে হোক বা পরে হোক সর্বাবস্থায়ই এতে খিয়ারে রুয়ত বাতিল হয়ে যাবে (কাফী)। যদি ক্রেতা ব্যক্তি মাল কবজা করার পর কিন্তু দেখার পূর্বে তা বিক্রি করে দেয়, তারপর আদালতের নির্দেশে কোন 'দোষ' এর ভিত্তিতে অথবা এমন কোন কারণ দ্বারা যা সর্বোত্তম পরে বিক্রয় বাতিলের নামান্তর, ঐ মাল ফেরত আসে এবং এতে বন্ধক বা ইজারা খতম হয়ে যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে খিয়ারে রুয়ত আর ফিরে আসবে না। এটিই সহীহ অভিমত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর যদি এমন হস্তক্ষেপ (تصرف) করে যার সাথে অন্যের হকের কোন সম্পর্ক নেই, যেমন কেউ নিজের জন্য খিয়ারে শর্ত করে মাল বিক্রি করল অথবা হিবা করল কিন্তু মাল হস্তান্তর করল না অথবা ঐ মাল বিক্রয়ের জন্য পেশ করল তাহলে এতে তার খিয়ার বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে যদি মাল দেখার পর এসব হস্তক্ষেপ করা হয় তবে খিয়ারে বাতিল হয়ে যাবে (কিফায়া)। খরিদকৃত বস্তু দেখার পর যদি এর অংশ

বিশেষ বিক্রয়ের জন্য পেশ করা হয় তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে খিয়ার বাতিল হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটিই সহীহ অভিমত (বাদায়ে)। কেউ যদি খরিদকৃত গোলামকে মুকাতাব দাস বানায় তারপর সে বদলে কিতাবাও আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, এর পর ক্রেতা তাকে দেখে, এ অবস্থায় খিয়ারে রূয়তের কারণে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না (হাবী)। যদি বিক্রিত বস্তুর অংশ বিশেষ হস্তচ্যুত হয়ে যায় অথবা ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় তাতে কোন ত্রুটি দেখা যায় অথবা এতে বর্ধিত কিছু সৃষ্টি হয় চাই তা এর সাথে সংযুক্ত হোক বা পৃথক কোন কিছু হোক; এতে ক্রেতার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। এমনিভাবে যদি খরিদকৃত বস্তু দাসী হয় এবং ক্রেতা তার সাথে সহবাস করে অথবা কামোদ্দীপনার সাথে সে তাকে স্পর্শ করে অথবা কামভাবের সাথে সে তার লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অথবা খরিদকৃত বস্তু যদি ঘোড়া বা সওয়ারী হয় এবং সে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এতে আরোহণ করে বা এ জাতীয় অন্য কোন কাজে তা ব্যবহার করা হয় তবে এতেও তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (বাদায়ে)। যদি খরিদকৃত বস্তু দেখার পূর্বে কারো নিকট তার (ক্রেতার) খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে বিক্রি করা হয় তবে এই ক্রয়-বিক্রয় শর্তহীনভাবে ক্রয়-বিক্রয় করার মত বলে গণ্য হবে। সুতরাং তার খিয়ারের রূয়ত দেখার আগেই রহিত হয়ে যাবে (আয়নী-শরহুল কানয)। এমনিভাবে যদি এ জাতীয় বস্তু ফাসিদ তরীকায় বিক্রি করার পর তা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেওয়া হয় তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায়ও খিয়ারে রূয়ত বাতিল হয়ে যাবে (যহীরিয়া)। এমনিভাবে যদি খরিদকৃত বস্তু দেখার পূর্বেই তা হিবা করতঃ مرهوب (যাকে হিবা করা হয়েছে) এর নিকট হস্তান্তর করে দেওয়া হয় তবে এ অবস্থায়ও খিয়ার রহিত হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি দেখার সাথে সাথে মূল্য আদায় করে দেওয়া হয় তবুও খিয়ার রহিত হয়ে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি ক্রেতার নিকট খরিদকৃত বস্তুর কিছু খোয়া যায় তাহলে এতেও খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (হাবী)। যদি ক্রেতা খরিদকৃত বস্তুর মধ্যে এমন কোন হস্তক্ষেপ (نصرف) করে যার ফলে ঐ বস্তুর মধ্যে লোকসান সাধিত হয়; অথচ ক্রেতা জানে না যে, এটিই সেই ক্রয়কৃত বস্তু তাহলেও খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। যেমন ক্রেতা তার ক্রয়কৃত বকরীর কিছু পশম কেটে নিল, কিন্তু সে বুঝতে পারল না যে, এটিই তার সেই খরিদকৃত বকরী অথবা কোন কাপড় পরিধান করতঃ সে এর ক্ষতিসাধন করে দিল, অথচ সে বুঝতে পারল না যে, এটিই তার সেই ক্রয়কৃত কাপড় (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

১৩. মাসআলা : না দেখে দাসীকে খরিদ করার পর বিক্রেতা তাকে ক্রেতার নিকট আমানত রাখল। কিন্তু ক্রেতা তাকে তার খরিদা দাসী বলে সনাক্ত করতে পারল না, এ অবস্থায় দাসীটি ক্রেতার নিকট মারা গেলে তার কবজা সাব্যস্ত হবে এবং তাকে দাসীর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কেননা তার যামানতে থাকা অবস্থায় দাসী মারা গেছে (মুহীত : আস-সারাখসী)। পক্ষান্তরে ক্রেতা দাসীকে কবজা করার পর বিক্রেতার নিকট আমানত রাখে তারপর দাসী যদি ক্রেতার অনুমোদনের পূর্বে বিক্রেতার কাছেই মারা যায় তাহলে ক্রেতার মাল নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে (মাবসূত)। কেউ মোজা খরিদ করার পর ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর তার ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় বিক্রেতা তার পায়ে ঐ

মোজা পরিয়ে দিল। তারপর সে জাঘত হয়ে ঐ মোজা পায়ে কিছুক্ষণ হাটা চলা করল, এতে মোজার কিছু ক্ষতি সাধিত হল, তা হলে তার খিয়ারে রূয়ত বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি এতে মোজার কোন লোকসান না হয় তবে তার খিয়ারে রূয়ত বাতিল হবে না (মুহীত)।

১৪. মাসআলা : কেউ না দেখে কোন বাড়ি খরিদ করল তারপর ঐ বাড়ির পার্শ্বে আরেকটি বাড়ি বিক্রি হলে ক্রেতা সেটিকে গুফআর দাবীতে নিয়ে নিল, তা হলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে তার খিয়ারে রূয়ত বাতিল হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (আল নাহরুল ফায়িক)। কুবরা গ্রন্থে আছে, যদি ঝিনুকের ভেতরকার মোতি খরিদ করে জায়েয হবে এবং ক্রেতার খিয়ারে রূয়ত থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ বিক্রয় বাতিল হবে এবং এর উপরই ফাতওয়া (মুযমারাত)। কেউ যদি বলে, ঐ থলের মধ্যে যা কিছু আছে অথবা ঐ গৃহের মধ্যে যা কিছু আছে আমি তা তোমার নিকট বিক্রি করলাম, তাহলে ঐ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। তবে দেখার পর তা খিয়ার হাসিল হবে। যদি বলে ঐ বাড়িতে অথবা ঐ গ্রামে যা কিছু আছে তা আমি তোমার নিকট বিক্রি করলাম, তাহলে ঐ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। কেননা এতে অজ্ঞতার অবস্থা অনেক বেশী (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৫. মাসআলা : কোন মুরগী মুক্তার দানা গিলে ফেলার পর দানাসহ মুরগীটি বিক্রি করা জায়েয হবে না। যদিও মুক্তাটি গলধকরণ করার পূর্বে ক্রেতা তা দেখে থাকে। কিন্তু যদি মুরগীটি মারা যাওয়ার পর বিক্রেতা ঐ মুক্তা বিক্রি করে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। তবে মুক্তাটি আগে না দেখে থাকলেও খিয়ারে রূয়ত হাসিল হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। খরিদা মাল অন্যত্র বহন করে নিয়ে যাওয়ার পরও খিয়ারে আয়েব বা খিয়ারে রূয়ত বহাল থাকবে। তবে ঐ ক্ষেত্রে শর্ত ঐ যে মালকে চুক্তিহলে ফিরিয়ে আনতে হবে, নতুবা ফেরত দেওয়া সহীহ হবে না (আল বাহরুর রায়িক)। চাই মাল অন্যস্থানে উঠিয়ে নেওয়ার কারণে এর মূল্য বেড়ে যাক বা কমে যাক, তাতে কোন পার্থক্য নেই (কিনয়া)। কেউ ঐ শর্তের উপর দুধ খরিদ করল যে, বিক্রেতা তা ক্রেতার গৃহে পৌছিয়ে দিবে এবং ক্রয়-বিক্রয় যদি ফারসী ভাষায় সংঘটিত হয় তবে তা জায়েয হবে। ক্রয়কালে ক্রেতা যদি ঐ দুধ না দেখে থাকে বরং বাড়িতে পৌছিয়ে দেওয়ার পর দেখে তাহলে এ অবস্থায় সমাধান কি হবে, এ সম্পর্কে ফকীহ আবুল লাইস (র) বলেন, ঐ মালকে খিয়ারে রূয়তের কারণে ফেরত দিতে পারবে না। কেননা সে যদি ফেরত দেয় তবে তা বহন করে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিবে। আর এটি এমন একটি আয়েব সমস্যা এর অনুরূপ যা ক্রেতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। খিয়ারে আয়েব, খিয়ারে শর্ত এবং খিয়ারে রূয়তের কারণে ক্রয়কৃত বস্তু ফেরত দেওয়ার যে খরচ পড়বে তা ক্রেতার যিম্মায় বর্তাবে। জামিউল ফুসুলীল গ্রন্থে আছে যে, যদি ক্রেতা খরিদকৃত ঘরে কোন ব্যক্তিকে থাকতে দেয় তবে এতে তার খিয়ারে রূয়ত রহিত হবে না। কিন্তু যদি ভাড়ার বিনিময়ে থাকতে দেয় তবে খিয়ার রহিত হয়ে যাবে (আল বাহরুর রায়িক)।

১৬. মাসআলা : কেউ যদি জমি খরিদ করার পর কোন কৃষককে তাতে ক্ষেতি করার জন্য অনুমতি দেয় তবে ক্রেতার খিয়ারে রূয়ত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা ক্রেতার নির্দেশে কৃষকের

কোন কর্ম সম্পাদন করা খোদ ক্রেতার কর্ম করার অনুরূপই (আয়নী শরহুল কানয)। কেউ যদি কোন জমি খরিদ করে এবং ঐ জমির বিশেষ কোন কৃষক বা চাষী থাকে এবং সে ক্রেতার সম্মতিক্রমে তাতে ক্ষেতি করে (সম্মতির উদাহরণ) যেমন ক্রেতা জমিটিতে কোন আবাদ না করে তা পূর্বের অবস্থায় রেখে দিল, তারপর সে তা দেখল, তাহলে সে আর এই জমিটি ফেরত দিতে পারবে না (কিফায়া)। ক্রেতা যদি খরিদা জমি কাউকে চাষাবাদের জন্য ধার দেয় তবে চাষাবাদ করার আগে তার খিয়ার রহিত হবে না (আল ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

১৭. মাসআলা : ওয়াল ওয়াল জিয়া গ্রন্থে আছে যে, কেউ যদি নিজের জমি এভাবে বিক্রয়ের ইচ্ছা করে যে, এতে যেন ক্রেতার কোন খিয়ারে রুয়ত না থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে এভাবে হীলা করা যেতে পারে যে মালিক কোন একটি কাপড়ের ব্যাপারে এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করবে যে, এ কাপড়টি অমকের, তারপর এ কাপড়টি জমি সহ বিক্রি করে দিবে। তারপর কাপড়টি যার বলে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করা হয়েছে সে ঐ কাপড়টির মধ্যে তার আরবী (অধিকার) সাব্যস্ত করে তা নিয়ে নিবে। এরূপ করা হলে এই ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার খিয়ারে রুয়ত বাতিল হয়ে যাবে (আন্ নাহরুল ফায়িক)। কোন ব্যক্তি অপর কারো নিকট হতে এরূপ একটি বাড়ি খরিদ করল যা সে দেখেনি। তারপর সে তা দেখল। কিন্তু পসন্দ হয়েছে কি হয়নি কিছুই বলল না। তারপর সে কিছু লোকের কাছে বলল যে, আমি যে এ বাড়িটি (ঘরটি) খরিদ করেছি; এ ব্যাপারে তোমরা সাক্ষী থাক। এরপর ক্রেতা খিয়ারে রুয়তের ভিত্তিতে বাড়িটি ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করল তাহলে সে তা আর ফেরত দিতে পারবে না (যখীরা)।

১৮. মাসআলা : অন্য শহরে অবস্থিত কোন ঘর খরিদ করার পর বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, সেটি আমি তোমার হাওয়ালার করে দিলাম। তারপর ক্রেতা তা না দেখা এবং কবজা না করার কারণে এর মূল্য পরিশোধে অস্বীকৃত জানাল। এ অবস্থায় ক্রেতা খিয়ারে রুয়তের ভিত্তিতে সেটিকে ফেরত দিতে পারবে। যদি সে তা ফেরত না দেয় তবে বিক্রেতাকে হুকুম করা হবে যেন সে নিজে বা তার কোন উকীল ক্রেতাকে নিয়ে ঐ শহরে যায় যেন উকীল তার নিকট থেকে মূল্য উসুল করে তাকে ঐ বাড়ি সোপর্দ করে দেয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কোন ব্যক্তি গোলাম খরিদ করে তারপর তাকে অন্ধ দেখতে পায় এবং বলে যে, আমি একে আমার কসমের কাফফারা স্বরূপ আবাদ করে দিতে চাই। যদি এর দ্বারা কসমের কাফফারা পুরোপুরিভাবে আদায় হয় তবে নিয়ে নিব। অন্যথায় ফেরত দিয়ে দিব। তাহলে ক্রেতা ঐ গোলামকে ফেরত দিয়ে দিতে পারবে। বিশর (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি না দেখে দুই কুরর (এক নির্দিষ্ট ধরনের পরিমাপ) গম খরিদ করে। তারপর কবজা করার আগে বা পরে এক কুরর গমের ব্যাপারে ইকালার বিক্রয় প্রত্যাহার করে। তাহলে বাকী গমের মধ্যে তার খিয়ারে রুয়ত হাসিল হবে (যখীরা)।

১৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি না দেখে কোন বস্ত্র ক্রয় করল। তারপর সে বিক্রেতাকে বলল, তুমি এটি বিক্রি করে দাও অথবা বলল, তুমি এটি নিজের জন্য বিক্রি করে দাও, তাহলে ঐ সময়ই তা রদ বলে গণ্য হয়ে যাবে। চাই বিক্রেতা তা বিক্রি করুক বা না করুক। অর্থাৎ উক্ত অবস্থায় পূর্বের ক্রয়-বিক্রয় সব ভেঙ্গে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি দেখার পর এ কথা বলে তবে এর বিধান কি হবে, এর ফায়সালা এ মাসআলায় উল্লেখ নেই। তবে এ মাসআলার পরে বকরীর মাসআলায়

এরূপ বর্ণিত আছে যে, খরিদা বকরী কবজা করার আগেই ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বলে, এই বকরী বিক্রি করে দাও অথবা বলে, এটিকে তোমার নিজের জন্য বিক্রি করে দাও তাহলে এই দুটি কথার একই হুকুম হবে। অর্থাৎ যদি সে বকরী না দেখে থাকে তাহলে ক্রয় চুক্তি বাতিল হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বলে, আমি এটি কবুল করলাম এবং আমি এটি বিক্রি করব (মুহীত)। কোন ব্যক্তি না দেখে একটি বকরী ক্রয় করল। তারপর সে বিক্রেতাকে হুকুম করল যে, তুমি এর দুধ দোহন করে তা সাদাকা করে দাও বা মাটিতে ফেলে দাও। বিক্রেতা তদ্রূপই করল। এ অবস্থায় দুধের উপর ক্রেতার কবজা হাসিল হওয়ার কারণে বকরীর ব্যাপারে তার খিয়ারে রুয়ত বাতিল হয়ে যাবে (আল বাহরুর রাযিকঃ জামিউল ফুসুলায়ন এর সূত্রে)

২০. মাসআলা : দুটি গোলাম খরিদ করায় তাদেরকে কবজা করার পূর্বেই কোন ব্যক্তি ভুলক্রমে তাদের একজনকে হত্যা করল। তারপর ক্রেতা হত্যাকারী থেকে গোলামের মূল্য এবং তার খরচাদি নিয়ে নিল তাহলে দ্বিতীয় গোলামের ক্ষেত্রে তার খিয়ার বাতিল হবে না (যহীরিয়া)। আসল গ্রন্থে আছে যে, যদি ক্রেতার নিকট গোলামকে কেউ এমনভাবে যখম করে যে, এতে ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য হয় অথবা খরিদা দাসীকে ক্রেতা ছাড়া অন্য কেউ সন্দেহবশত সহবাস করে তবে তাকে খিয়ারে রুয়তের ভিত্তিতে ফেরত দিতে পারবে না। যদি ক্রেতা ছাড়া অন্য কেউ তার সাথে ব্যভিচারের তরীকায় সহবাস করে কিংবা ক্রেতা নিজে তার সাথে সঙ্গম করে কিংবা ক্রেতা নিজে তাকে আঘাত করে জখম করে দেয় তাহলে এই তিন অবস্থার কোন অবস্থাতেই ক্রেতা তাকে আর ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু যদি বিক্রেতা রাযী থাকে তবে ঐ মাল ফেরত দিতে পারবে। উপরোক্ত তিন মাসআলাই এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি দাসীর কোন সন্তান জন্ম হয় এবং সে যদি জীবিত থাকে তবে কোন অবস্থাতেই সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। আর সন্তান যদি মারা যায় এবং প্রসবের কারণে দাসীর যদি কোন ক্ষতি বা মূল্যহানি হয় তাহলে ক্রেতা ঐ দাসীকে ফেরত দিতে পারবে না। তবে বিক্রেতা রাযী হলে পারবে। আর প্রসবের কারণে দাসীর বাহ্যত কোন ক্ষতি না হয় তাহলেও কিতাবুল মুযাবাবার বর্ণনা অনুযায়ী একই হুকুম হবে (মুহীত)।

২১. মাসআলা : যদি খরিদা পশু বা বকরী বাচ্চা প্রসব করলে ক্রেতার খিয়ারে রুয়ত থাকে না। তদ্রূপ খরিদকৃত পশু বা বকরীর বাচ্চাকে ক্রেতা বা অন্য কেউ যদি মেরে ফেলে তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি বাচ্চা মরে যায় তবে ক্রেতার তা ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না (হাবী)। যদি ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় বিক্রেতা গোলামকে আহত বা নিহত করে দেয় তবে আসল কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ক্রেতার উপর ক্রয়-বিক্রয় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে হত্যা করার অবস্থায় এর জরিমানা আদায় করা (মুহীত)। ইসা ইব্ন আবাল (র) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি ক্রেতা কবজা করার পূর্বে ক্রয়কৃত দাসীকে অন্য কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করার পূর্বে সে তাকে দেখে তবে ক্রেতা তাকে ফেরত দিয়ে দিতে পারবে আর বিবাহ দেওয়ার কারণে তার মধ্যে যে আয়েব সৃষ্টি হয়েছে এর বদলায় মহরই যথেষ্ট। যদিও আয়েবের ক্ষতিপূরণ মহর হতে বেশী হয়। কোন কোন ফকীহ বলেন, মহরের পর অতিরিক্ত যা বাকী থাকবে এর জরিমানাও দিয়ে দিবে (যহীরিয়া)।

২২. মাসআলা : খরিদকৃত গোলামের গায়ে জ্বর আসার পর তা যদি ভাল হয়ে যায় তবে দেখার পর ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। আর যদি জ্বর না থাকা অবস্থায় ক্রেতা বিচারকের আদালতে এ মর্মে মুকাদ্দমা দায়ের করে এবং বিক্রেতা গোলামকে কবুল তথা ফেরত নিতে অস্বীকার করে তাহলে বিচারক গোলাম ফেরত প্রদানের ইখতিয়ারকে রহিত করে ক্রয়-বিক্রয়কে বাধ্যতামূলক করে দিবেন। আদালতের ফায়সালার পর যদি গোলাম সুস্থ হয়ে যায় তবে ক্রেতা আর ফেরত দিতে পারবে না। যদি গোলাম সুস্থ থাকা অবস্থায় বিক্রেতার উপস্থিতিতে তাকে ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী রাখা হয় তারপর বিক্রেতার কবজা করার পূর্বে তার জ্বর আসে, আবার জ্বর ভাল হয়ে সে সুস্থ হয়ে যায় তাহলে এ গোলাম বিক্রেতার যিম্মায়ই থাকবে (হাবী)। পূর্বে দেখা গম অনুমান করে খরিদ করল কিন্তু কবজা করার আগে শুকিয়ে এর ওজন কমে গেল। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার খিয়ারে রুয়ত থাকবে সে ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দিতে পারবে। কিন্তু তিন ব্যক্তি তা করতে পারবে না। (১) উকীল (২) ওসী (৩) ঐ গোলাম যাকে তিজারতের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যদি তাদের কেউ কোন বস্তু তার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে খরিদ করে তবে খিয়ারে আয়েবের কারণে তারা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করতে পারবে না। অবশ্য খিয়ারে রুয়ত অথবা খিয়ারে শর্তের কারণে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করতে পারবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : খিয়ার বাতিল করার ক্ষেত্রে যেসব বস্তু আংশিক দেখা পূর্ণ বলে গণ্য বা তার বিবরণ

১. মাসআলা : এ ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যদি না দেখা অংশ দেখা অংশের অনুবর্তী হয় তবে না দেখা অংশের মাঝে ক্রেতার খিয়ার হাসিল হবে না। আর যদি না দেখা অংশ অনুবর্তী না হয়ে মূল হয়, আর দেখা অংশ দ্বারা না দেখা অংশের অবস্থা জানা না যায় তাহলে ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকবে। আর যদি জানা যায় তবে খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। কেউ যদি দাসী বা গোলাম খরিদ করে এবং তার চেহারা দেখে তাকে পসন্দ করে তবে এরপর ক্রেতার আর খিয়ারে রুয়ত বাকী থাকবে না (মুহীত)। চেহারার অধিক অংশ দেখা পূর্ণ দেখার মতই। কাজেই এ অবস্থায়ও পূর্বের হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি চেহারা ব্যতীত মানুষের সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষ করে তবে তার খিয়ারে রুয়ত বাকী থাকবে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)। কেউ যদি ঘোড়া, খচ্চর অথবা গাধা ইত্যাদি খরিদ করে এবং শুধু মুখের অংশ দেখে, অন্য কিছু না দেখে তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে; এ অবস্থায় ক্রেতার জন্য খিয়ার থাকবে-যাবৎ না চেহারা এবং পেছনের অংশ দেখবে। এটিই সহীহ অভিমত (বাদায়ে)। ফকীহগণ বলেন, যদি পশু বিশেষজ্ঞ লোকেরা এ কথা বলে যে, চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে এর চার পা দেখে নেওয়া আবশ্যিক, তাহলে চার পা দেখা খিয়ার রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হিসাবে ধর্তব্য হবে (শরহুল কুদুরী লিল আকতা)। শুধুমাত্র পায়ের খুর; কপাল এবং লেজ দেখা যথেষ্ট নয়। এটিই সহীহ অভিমত (আল ফাতওয়াস গিয়াসিয়া)। কেউ যদি প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে বকরী খরিদ করে তবে বকরীর দুধ খলি এবং এর সর্ব শরীর দেখে নেওয়া আবশ্যিক (যহীরিয়া)। আর যদি গোশত খাওয়ার জন্য হয় তবে বকরীটি হুট-পুট কিনা তা ধরে দেখতে হবে। শুধু দূর থেকে দেখলে তার খিয়ার বাকী থাকবে (বাদায়ে)। যদি

দুধবতী গাভী অথবা দুধবতী উষ্ট্রী খরিদ করা হয় এবং এর দুধ খলি ব্যতীত সর্ব শরীর দেখা হয় তবে ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকবে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)।

২. মাসআলা : আহায্য দ্রব্য ক্রয়কালে তার স্বাদ চেখে দেখা এবং আণ যোগ্য বস্তু খরিদকালে এর আণ নিয়ে দেখা জরুরী। আর যুদ্ধের ময়দানে যে দফ (রণভেরী) বাজানো হয় তা খরিদ কালে এর আওয়াজ শুনে নেওয়া জরুরী। (তারযীন) স্বাদ বিশিষ্ট জিনিস যদি রাত্রিকালে না দেখে শুধু চেখে খরিদ করে তাহলে তার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে (কিন্য়া)। কেউ যদি জীব-জন্তু ছাড়া অন্য কোন অস্থাবর বস্তু খরিদ করে এবং কোন অংশ যদি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (مقصد) হয়, যেমন লৌহ শিরোজ্ঞানের সম্মুখ ভাগ, ইত্যাদি তাহলে এর সম্মুখ ভাগ না দেখা পর্যন্ত তার খিয়ার বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে এর কোন অংশ যদি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় না হয় যেমন কার্পাসের কাপড় এ ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি এর কিয়দংশ দেখে এবং এর উপর রাযী ও সম্মত হয়ে যায় তাহলে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। যদি গুণাগুণের মধ্যে না দেখা বস্তু দেখা বস্তুর ন্যায় মান সম্পন্ন হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি গুণাগুণের ক্ষেত্রে না দেখা বস্তু দেখা বস্তুর তুলনায় নিম্ন মানের হয় তবে তার খিয়ারে রুয়ত হাসিল হবে (যখীরা)।

৩. মাসআলা : কোঁচানো কাপড় যদি ভেতর খুলে না দেখে শুধু উপরিভাগ দেখে খরিদ করে তাহলে দেখতে হবে, কাপড়টির অবস্থা কেমন। যদি একেবারেই সাদাসিদে হয় এবং কোন নকশা ও কারুকাজ না থাকে তবে ক্রেতার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হবে না। যদি কাপড়টি নকশা ও কারুকাজ যুক্ত হয় তাহলে কাপড় খুলে নকশা না দেখা পর্যন্ত তার খিয়ার বাকী থাকবে। আর কাপড়ে যদি তেমন কোন নকশা না থাকে সামান্য কাজ করা থাকে এবং ক্রেতা ঐ কাজ নিজ চোখে দেখে থাকে তবে তার খিয়ারে রুয়ত থাকবে না, আর না দেখে থাকলে খিয়ারে রুয়ত হাসিল হবে (বাদায়ে)। কোন কোন ফকীহ বলেন, এ ক্ষেত্রে দেশের প্রচলন (ওরফ) অনুসারে হুকুম হবে। আমাদের দেশের প্রচলন অনুসারে কাপড় খুলে এর ভেতরের অংশ না দেখা পর্যন্ত খিয়ার রহিত হবে না। কেননা কাপড়ের ভেতর বাইর বেশ কম করার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এটি ইমাম যুফার (র)-এর অভিমত। মাবসুত কিতাবেও অনুরূপ বর্ণিত আছে (ফাতহুল কাদীর)। চাদরের সদর পিঠ এবং নকশার স্থান না দেখে শুধু উপরিভাগ দেখার কারণে খিয়ারে রুয়ত রহিত হবে না। যে কাপড়ের মধ্যে দুই ধরনের রুখ বা রং আছে ঐ কাপড়ের ক্ষেত্রে উভয় রুখ বা উভয় রং দেখাই জরুরী (যহীরিয়া)। ফরাশ বা বিছানার ক্ষেত্রে ফকীহগণ বলেছেন যে এর সবটাই দেখা জরুরী (আন নাহরুল ফায়িক)। তাকিয়া বা বালিশের ভেতর যদি কোন কিছু ভর্তি থাকে এবং ক্রয়কালে ক্রেতা যদি এর উপরিভাগ দেখে তা ক্রয় করে তাহলে দেখতে হবে যে, এর ভেতর কি আছে? যদি এর ভেতর এমন জিনিস থাকে যা দ্বারা সাধারণত বালিশ পূর্তি করা হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির খিয়ার রহিত হয়ে যাবে। আর যদি তা এমন বস্তু দ্বারা পুরা করা হয় যদ্বারা সচরাচর তাকিয়া পূর্তি করা হয় না তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার খিয়ার থাকবে (আল বাহরুর রায়িক-মি'রাজ গ্রন্থের সূত্রে)।

৪. মাসআলা : কেউ যদি আসতর লাগানো জুকা খরিদ করে এবং আসতর দেখে খরিদ করে তাহলে সে যখন এর অভ্যন্তর ভাগ দেখবে তখন তার খিয়ার হাসিল হবে। চাই আসতর তার উদ্দেশ্যের মধ্যে शामिल থাকুক বা না থাকুক। কেননা জুকার উপরিভাগই সর্বাবস্থায় মূল

উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি জুব্বার উপরিভাগ মূল উদ্দেশ্য না হয় যেমন জুব্বার উপরিভাগটি খুবই তুচ্ছ ধরনের তাহলে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। যদি জুব্বার উপরিভাগ দেখে কেউ অসতর বিশিষ্ট জুব্বা খরিদ করে তবে অভ্যন্তর ভাগ দেখার পর তার খিয়ার হাসিল হবে না। কিন্তু আসতর যদি মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য থাকে যেমন আসতরের মধ্যে তুলা ঢুকানো আছে তাহলে অভ্যন্তর ভাগ দেখার পর তার খিয়ার হাসিল হবে (তাতার খানিয়া-বুরহানিয়ায় সূত্রে) ফাতাওয়ায়ে নাসাফীতে আছে, কেউ যদি মোজা খরিদ করে এবং এসবের একটির মুখ অপরটির মুখের দিকে থাকে, আর ক্রেতা যদি এগুলোর গোড়ালির দিকে দেখে তবে তার কিয়ারে রুয়ত বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি এগুলোর সামনের অংশ দেখে পেছনের চামড়া না দেখে তাহলে তার খিয়ারে রুয়ত বাতিল হয়ে যাবে। (আস সুগরা) কোন কোন ফকীহ বলেছেন, এ যুগে পেছনের অংশ দেখাও জরুরী। কেননা এসবের মধ্যেও বেশ ব্যবধান থাকে এবং পেছনের অংশও কখনো উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। (ফাতহুল কাদীর) খনি এবং স্বর্ণকারের মাটি খরিদ করার সময় এ মাটি থেকে কি জিনিস বের হয়, তা দেখে নেওয়া জরুরী। কেউ যদি ঘোড়ার জিন বা গদি সংশ্লিষ্ট সামান সহ খরিদ করে এবং তা কবজাও করে নেয়, কিন্তু বসার বিছানা না দেখে তাহলে যখন সে বিছানা দেখবে তখন সবগুলোর ব্যাপারে তার খিয়ার থাকবে। তদ্রূপ কেউ যদি জাঁতা বা পানির চরকা সংশ্লিষ্ট সামান সহ খরিদ করে, কিন্তু খুচরা জিনিসগুলো না দেখে তাহলে দেখার পর তার খিয়ারে রুয়ত হাসিল হবে (যহীরিয়া)।

৫. মাসআলা : কেউ যদি দুটি মোজা, জুতা বা দুটি চৌকাঠ খরিদ করে এবং একটি দেখে তাহলে দ্বিতীয়টি দেখার সময় তার খিয়ার হাসিল হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি হরিণের উদরন্ত মৃগনাভির থলি খরিদ করে, তার এর থেকে কস্তুরী তৈরি করে তাহলে খিয়ারে রুয়ত অথবা খিয়ারে আয়েবের কারণে থলিটি আর ফেরত দেওয়া যাবে না। কেননা মৃগনাভির থলি থেকে কস্তুরী বের করাতেও আয়েব পয়দা হয়ে যায়। কাজেই কস্তুরী বের না করা হলে তা রদ করা যাবে (যখীরা)। না দেখে চিনির ব্যাগ খরিদ করার পর তা থেকে চিনি বের করে চালনীতে চালা হলে তার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে (আল বাহরুর রায়িক)। কেউ যদি কোন শিশি ভর্তি তেল খরিদ করে এবং খরিদকালে শিশি দেখে নেয়, কিন্তু তেল হাতে বা আঙ্গুলে নিয়ে না দেখে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এই তেল দেখা হয়েছে বলে গণ্য হবে না (খুলাসা)। কেউ যদি খরিদকৃত বস্ত্র কাঁচের ভেতর বা আয়নার ভেতর দেখে অথবা খরিদকৃত বস্ত্র হাউজের পার্শ্ব থাকার কারণে পানিতে তার ছায়া দেখে তাহলে তা যথেষ্ট হবে না। কাজেই তার খিয়ার বাকী থাকবে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)। কেউ যদি পানির ভেতরকার এমন মৎস খরিদ করে যা শিকার করা ব্যতীত ধরা সম্ভব, তারপর ক্রেতা পানির ভেতরে থাকা অবস্থায় সে মাছ দেখে তাহলে কোন কোন ফকীহ এর তার খিয়ার রহিত হবে না। এটিই সহীহ অভিমত (ফাতহুল কাদীর)। ক্রেতা যদি মিহিন পর্দার বাইরে থেকে খরিদকৃত বস্ত্রটি দেখে তাহলে এটি দেখা হিসাবে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি বিভিন্ন ধরনের আঙ্গুরের মধ্য হতে এক ধরনের আঙ্গুর দেখে এক সাথে সব আঙ্গুর খরিদ করে তবে এই ক্ষেত্রে তার খিয়ার হাসিল হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে সব ধরনের আঙ্গুর একবার দেখে

নেয়, কিন্তু খুরমা এবং খেজুর বৃক্ষের ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন। অর্থাৎ সামান্য কিছু খুরমা-খেজুর দেখে অনেকগুলো খরিদ করলে তার খিয়ারে রুয়ত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা খুরমা-খেজুর সামান্য দেখা সব দেখার মতই। কেউ যদি টক-মিষ্টি জাতীয় আনার একটি দেখে একত্রে অনেকগুলো খরিদ করে তবে অন্যটি দেখার পর তার খিয়ার হাসিল হবে। মুনতাকা গ্রন্থে আরো আছে যে, কেউ যদি কিছু খেজুর দেখে খেজুরের কাধি খরিদ করে এবং এতে সে সম্মত থাকে তাহলে তার জন্য ক্রয়-বিক্রয় অপরিহার্য হবে না। যতক্ষণ না সে সবগুলো দেখে তাতে নিজের সম্মতি ব্যক্ত করবে। এমনিভাবে প্রকাশ্যে বিদ্যমান ফল-ফলাদি যা পরিমাপ ও ওজন করা যায় কিংবা গাছের উপর বিদ্যমান ফল-ফলাদি যা গণনা করা যায় এসবের হুকুমও পূর্বে উল্লেখিত বস্ত্র হুকুমের অনুরূপ (যখীরা)। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (মুযম্মারাত)।

৭. মাসআলা : খরিদকৃত বস্ত্র যদি জমি হয় তবে অধিকাংশ বর্ণনা মতে, এ ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি বাড়ির বহিরাংশ দেখে এবং এতে সে রাযী হয়ে যায় তাহলে তার খিয়ার বাকী থাকবে না। ফকীহগণ বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বাড়ির ভেতর কোন ইমারত না থাকে। কিন্তু যদি বাড়ির ভেতরে ইমারত থাকে তবে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে তা দেখতে হবে অথবা যে সব জিনিস বাড়ি কেনার দ্বারা উদ্দেশ্য তা দেখে নিতে হবে। এর উপরই ফাতওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সুতরাং যদি বাড়ির ভেতর দুটি শীতকালীন ঘর, দুটি গ্রীষ্মকালীন ঘর এবং দুটি কাঠের ঘর থাকে তবে বাড়ির আঙ্গিনা যেভাবে দেখা শর্ত, অনুরূপভাবে এইগুলো সব দেখে নেওয়াও শর্ত। তবে বাবুর্চিখানা, পায়খানা এবং বালাখানা দেখা শর্ত নয়। কিন্তু যে শহরে বা যে দেশে বালাখানা (উপরের তলা) ও মূল ঘরের ন্যায় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যেমন সমরকন্দ (বাংলাদেশ) ইত্যাদি অঞ্চল এসব দেশের ক্ষেত্রে বালাখানাও দেখে নেওয়া জরুরী। কোন কোন ফকীহ এর মতে বাড়ির ভেতরে বিদ্যমান যত কিছু আছে সব দেখে নেওয়াই শর্ত এবং আবশ্যিক। এটিই পরিষ্কার এবং যুক্তি সম্মত কথা (মুহীত)। ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মাণকৃত গৃহের ক্ষেত্রে ফাতওয়া হল, এ পর্যায়ে ঘরটি দেয়ালের বাহির থেকে দেখে নেওয়াই যথেষ্ট (খুলাসা)। কেউ যদি আঙ্গুরের বাগান খরিদ করে তবে “আল কিতাবে” উল্লেখ আছে যে, সে যদি বাহির থেকে সমুদয় গাছের উপরিভাগ দেখে নেয় এবং এতে রাযী হয়ে যায় তাহলে তার খিয়ারে রুয়ত বাকী থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বাগানের ক্ষেত্রে ফকীহগণ বলেছেন যে, এর বাহির বাতিল অর্থাৎ ভেতর বাহির সবই দেখে নেওয়া জরুরী (আল বাহরুর রায়িক)।

৮. মাসআলা : যদি ক্রয়কৃত বস্ত্র কয়েক প্রকার হয় এবং ক্রয় করার সময় এর কোন একটি দেখে অন্যগুলো না দেখে আর এইগুলো যদি পরিমাপ যোগ্য এবং ওজনযোগ্য বস্ত্র হয় এবং একই পাত্রে রক্ষিত থাকে তাহলে ক্রেতার খিয়ারে রুয়ত হাসিল হবে না। কিন্তু অবশিষ্ট বস্ত্রগুলো যদি দেখা বস্ত্রের পরিপন্থী হয় তাহলে তার খিয়ার হাসিল হবে। অর্থাৎ খিয়ারে আয়েব হাসিল হবে। কিন্তু খিয়ারে রুয়ত হাসিল হবে না। আর যদি ঐ সব বস্ত্র বিভিন্ন পাত্রে থাকে এবং সেগুলো যদি একই জাতীয় এবং একই গুণের হয় তাহলে এ বিষয়ে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। ইরাকী মাশাইখে কিরামের মতে তার খিয়ার হাসিল হবে না। এটিই সহীহ অভিমত। আর সে গুলো যদি বিভিন্ন জাতীয় বস্ত্র হয় অথবা এক জাতীয় বস্ত্রই কিন্তু গুণাগুণ হচ্ছে ভিন্ন ধরনের তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য খিয়ার হাসিল হবে। এ বিষয়ে কারো কোন মত বিরোধ নেই (বাদায়ে)।

৯. মাসআলা : ক্রয়কৃত বস্তু যদি গণনাযোগ্য বস্তু হয় এবং সেগুলোর পরস্পরের মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে যেমন সে ব্যাগের ভেতরের কাপড় খরিদ করল অথবা টুকরীতে বিদ্যমান তরমুজ খরিদ করল, তাহলে প্রতিটি বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা আবশ্যিক। যদি কিছু দেখে কিছু না দেখে তাহলে না দেখা বস্তু দেখার পর তার খিয়ার হাসিল হবে। এহেন অবস্থায় সে যদি তা ফেরত দিতে চায় তবে সকল বস্তুই ফেরত দিতে হবে (যখীরা)। আর যদি খরিদকৃত বস্তু এমন গণনাযোগ্য বস্তু হয় যার একটি অপরটি হতে ভিন্ন ধরনের- যেমন আখরোট, ডিম ইত্যাদি, এ জাতীয় জিনিসের মধ্যে যদি না দেখা বস্তুগুলো দেখা বস্তুর অনুরূপ হয় বা এর থেকে উন্নত মানের হয় তাহলে সব দেখা জরুরী নয়। বরং কিছু দেখাই যথেষ্ট হবে (মুহীত)। তবে দেখার পর ক্রেতা যদি তা ফেরত দিতে চায় তবে সবগুলোই ফেরত দিতে হবে। এটিই সহীহ্ অভিমত (জাওয়াহিরুল আখলাজী)। উপরোক্ত মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি এরূপ বলে যে, আমি যা দেখেছি তা বাদে অন্যগুলো আমার দেখা বস্তুর মত নয়। বরং তা থেকে নিম্ন মানের। আর বিক্রেতা বলে যে, না, বরং তুমি সব গুলোকে একই কোয়ালিটি বা গুণসম্পন্ন পেয়েছো। এ ক্ষেত্রে কসমের সাথে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, এবং ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা (যখীরা)।

১০. মাসআলা : কেউ যদি মাটির নীচের (গুপ্ত) বস্তু খরিদ করে যেমন পেয়াজ, রসুন, গাজর ইত্যাদি তাহলে এ ক্ষেত্রে কিছু দেখা যথেষ্ট নয়। বরং সব না দেখা পর্যন্ত ক্রেতার খিয়ার বাকী থাকবে। এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। কিন্তু সাহেবাইনের মতে যদি মাটির নীচ হতে এ পরিমার মালামল উঠানো হয় যদ্বারা বাকী মালের অবস্থাও জানা যায় এবং ক্রেতা এর উপর রাযী হয়ে যায় তাহলে ক্রেতার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)। অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মতে এ মাসআলাটি যাহিরী রিওয়ায়েতে উল্লেখ নেই। অবশ্য আমানী গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, মাটির নীচে গুপ্ত মাল মাটির নীচ থেকে উত্তোলন করার পর তা যদি পরিমাপ ও ওজন করা যায়; যেমন পেয়াজ, রসুন, গাজর ইত্যাদি এ জাতীয় জিনিস খরিদ করার পর ক্রেতা যদি বিক্রেতার অনুমতিক্রমে তা থেকে কিছু উত্তোলন করে অথবা খোদ বিক্রেতা উত্তোলন করে এবং তা ওজন করা যায় পরিমাণ হয়, আর ক্রেতাও তা দেখে রাযী হয়ে যায় তবে খরিদকৃত সব মালের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় অপরিহার্য হয়ে যাবে এবং কিছু মাল দেখাই সমস্ত মাল দেখার অনুরূপ বলে গণ্য হবে। তবে শর্ত হল, যদি না দেখা মাল দেখা মালের অনুরূপ হয়। যদি উত্তোলিত মালের পরিমাণ এমন কম হয় যে, তা ওজন করা যায় না তাহলে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি বিক্রেতা নিজে উত্তোলন করে অথবা বিক্রেতার অনুমতিতে ক্রেতা তা উত্তোলন করে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা-বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া তা থেকে কিছু মাল উত্তোলন করে এবং উত্তোলিত মাল এই পরিমাণ হয় যে, এর কিছু মূল্য আছে তাহলে এ পর্যায়ে সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় অপরিহার্য হয়ে যাবে। চাই ক্রেতা এতে রাযী থাকুক বা না থাকুক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি জমির অন্য প্রান্তে ঐ বস্তু কম উত্তোলিত হয় অথবা মোটেই উত্তোলিত না হয় তাহলেও এই একই হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত)। যদি উত্তোলিত বস্তু পরিমাণে এতই কম হয় যে, এর কোন মূল্য নেই তাহলে ক্রেতার খিয়ার বাতিল হবে না। এ মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমতের উপরই ফাতওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : যদি মাটির নীচের গুপ্ত বস্তু এমন হয় যা গণনা করে বিক্রি করা হয় যেমন মূলা ইত্যাদি তাহলে এর কিছু দেখার দ্বারা অবশিষ্ট মালের ক্ষেত্রে তার খিয়ার বাতিল হবে না। তবে শর্ত হল, যদি বিক্রেতা নিজে ঐ বস্তু উত্তোলন করে অথবা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে ক্রেতা উত্তোলন করে। যদি বিক্রেতার অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রেতা তা উত্তোলন করে এবং উত্তোলিত বস্তু এমন পরিমাণ হয় যার কিছু মূল্য আছে তাহলে ক্রেতার খিয়ার রহিত হয়ে যাবে (মুহীত)। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (ফাতহুল কাদীর)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মাটির অভ্যন্তরান্ত বস্তু মাটির নীচে বিদ্যমান থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। পক্ষান্তরে যদি চারা উদগত হওয়ার আগেই ফসল বিক্রি করা হয় অথবা চারা উদগত হওয়ার পর ফসল বিক্রি করা হয় কিন্তু এ কথা জানা নাই যে, এই চারা জমিতে রোপন করার পর তা থেকে ফসল আসবে কিনা? তাহলে এসবের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। যে সব জিনিস মাটির নীচে থাকা সুনিশ্চিত যেমন পেয়াজ, রসুন ইত্যাদি এ জাতীয় জিনিস কেউ যদি বিক্রি করে এবং বিক্রির পর বিক্রেতা যদি কোন স্থান থেকে সামান্য কিছু উত্তোলন করে বলে, “আমি তোমার নিকট এই শর্তে উক্ত বস্তু বিক্রি করেছি যে, এই ভূমির সব জায়গায়ই এইভাবে প্রচুর পরিমাণ ফসল বিদ্যমান রয়েছে” তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, কেউ যদি গাজর বিক্রি করে এবং বিক্রয়ের পর বিক্রেতা বলে যে, আমার ভয় হয়, যদি আমি তা উত্তোলন করি এবং তুমি তাতে রাযী না হও। তবে আমার লোকসান হবে। এ কথা শুনার পর ক্রেতা যদি বলে, আমার ভয় হয়, যদি আমি তা উত্তোলন করি আর ভাল কিছু বের না হয় তবে আমি তা ফেরত দিতে পারব না। এহেন অবস্থায় যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা উত্তোলন করবে তা জায়েয হবে। আর যদি তাদের উভয়ের মধ্যে কেউই তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তোলন না করে তবে বিচারক তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের ‘আকদ’ ভেঙ্গে দিবে (শরহুল কুদুরী)। কেউ দুই কেয়ারী গাজর খরিদ করল। তারপর সে তা উত্তোলন করার পর দেখল যে, এক কেয়ারীর গাজর খুব ভাল। কিন্তু অন্য কেয়ারীর গাজর ভাল না। বরং খুঁত বিশিষ্ট। তাহলে এসবের মধ্য হতে কিছুই সে ফেরত দিতে পারবে না। কেননা উত্তোলন দ্বারাই তা দোষ যুক্ত হয়েছে। অবশ্য লোকসান পরিমাণ ক্ষতিপূরণ বিক্রেতার নিকট হতে ফেরত নিতে পারবে। কেউ এক ব্যাগ গাজর খরিদ করে দেখে যে, ব্যাগের মুখে রয়েছে বড় বড় গাজর এবং ভেতরে রয়েছে ছোট ছোট গাজর। এ ক্ষেত্রে ছোটগুলো বড়গুলোর চেয়ে কম মূল্যের হয় তবে তা আয়েব রূপে গণ্য হবে। কাজেই ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে এই আয়েবের ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফকীহ হিশাম (র)-এর নাওয়াদির কিতাবে উল্লেখ আছে, তিনি বলেন, একদা আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এক ব্যক্তি দশ জারীব পরিমাণ জমির গাজর খরিদ করতঃ জমি কবজাও করে নিল। তারপর সে নিজ গোলামকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠাল যে, তুমি গিয়ে গাজর উত্তোলন কর। সে সমস্ত গাজর উত্তোলন করল। তারপর ক্রেতা আগমন করল, তবে কি এ অবস্থায় তার খিয়ারে রূয়ত হাসিল হবে? জবাবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বললেন যে, হ্যাঁ, হাসিল হবে। তখন আমি বললাম, উত্তোলন করার কারণে তো এর এক-তৃতীয়াংশ মূল্য হ্রাস পেয়ে গেছে। তিনি বললেন, মূল্য হ্রাস পেলেও তার খিয়ার হাসিল হবে (মুহীত)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : অফিস, উকীল এবং প্রতিনিধি কর্তৃক মালামাল ক্রয় করার মাসাইল

১. মাসআলা : আমাদের ইমামত্রয়ের মতে অন্ধ ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয় জায়েয (ফাতহুল কাদীর)। অন্ধের খরিদা তার থিয়্যার থাকবে। কিন্তু তার বিক্রিত বস্তুতে থিয়্যার থাকবে না (আস সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)। ‘স্পর্শ প্রধান’ বস্তু ক্রয়কালে অন্ধ ব্যক্তি যদি স্পর্শ করে দেখে তাহলে এটিও চক্ষুস্থান ওয়াহ্‌জ)। ‘স্পর্শ প্রধান’ বস্তু ক্রয়কালে অন্ধ ব্যক্তির জিনিসের ক্ষেত্রে ঘ্রাণ নেওয়া ধর্তব্য হবে। আর যে সব ব্যক্তির দেখার অনুরূপ হবে। গন্ধ প্রধানের জিনিসের ক্ষেত্রে স্বাদ গ্রহণ করা ধর্তব্য হবে (যখীরা)। প্রসিদ্ধ জিনিস স্বাদ গ্রহণ করে পরীক্ষা করা সে সে ক্ষেত্রে স্বাদ গ্রহণ করা শর্ত নয় (মুহীত : আস-বর্ণনা মুতাবিক অন্ধের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বস্তুর গুণাগুণ বর্ণনা করা শর্ত নয় (মুহীত : আস-সারাখসী)। কাপড় ক্রয়কালে অন্ধ ব্যক্তি তা স্পর্শ করে এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এবং এর গুণাগুণও বর্ণনা করবে। অর্থাৎ তা পাতলা না মোটা তা বর্ণনা করবে। গম ক্রয়কালে তা স্পর্শ করে এর গুণাগুণও জিজ্ঞাসা করে নিবে (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। যদি অন্ধ ব্যক্তি গাছের ফল গাছে থাকা অবস্থায় ক্রয় করে তবে প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুসারে তাকে এর গুণাগুণ বর্ণনা করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করা তার জন্য অপরিহার্য নয় (মুহীত : আস-সারাখসী)। জমি ক্রয়কালে এর গুণাগুণ বর্ণনা করে তাকে না শুনানো পর্যন্ত তার থিয়্যার রহিত হবে না। এটিই সহীহ মাযহাব (শরহুল কুদুরী লিল আকতা)। জীব-জন্তু, গোলাম, গাছ-গাছালি এবং যে সব জিনিস স্পর্শ করে, শুঁকে এবং স্বাদ গ্রহণ করে চিনা যায় না সে সবের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (আস সিরাজুল ওয়াহ্‌জ)। যদি এসব বিষয়াষয় ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আগে পাওয়া যায় তবে অন্ধের জন্য কিয়ার সাব্যস্ত হবে না (ফাতাওয়ায়ে তামার তাশী)।

২. মাসআলা : অন্ধ ব্যক্তি গুণাগুণের বর্ণনা শুনে রাযী হয়ে খরিদ করার পর দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলে দেখার অধিকার ফিরে পাবে না। (বাদায়ে) যদি চক্ষুস্থান ব্যক্তি কোন বস্তু খরিদ করার পর তা দেখার আগে সে অন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার দেখার খিয়ার অন্ধদের ন্যায় গুণাগুণ বর্ণনা করার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)। যদি গুণাগুণ বর্ণনা করার পূর্বে অন্ধ ব্যক্তি এ কথা বলে দেয় যে, আমি এতে রাযী আছি তবে তার খিয়ারে রূয়ত রহিত হবে না (আল্ জাওহারাতুন নায্যার)। ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে সগীর গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যদি না দেখে কোন খাদ্য খরিদ করে এবং পরে তা কবজা করার জন্য কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে। তারপর উকীল তা দেখার পর সেটি কবজা করে তাহলে ক্রেতা ঐ বস্তু আর ফেরত দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি না দেখে কোন বস্তু খরিদ করে তারপর তা কবজা করার জন্য সে কোন প্রতিনিধি (رسول) প্রেরণ করে আর ঐ প্রতিনিধি যদি উক্ত বস্তু দেখে তা কবজা করে তবে ক্রেতা ঐ বস্তু ফেরত দিতে পারবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, উকীল এবং প্রতিনিধি (رسول) এর হুকুম একই। সুতরাং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে ঐ বস্তু ফেরত দিতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে তা নিয়েও নিতে পারবে (যখীরা)। এ মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, খরিদকৃত মালামাল কবজা করার জন্য যাকে উকীল মনোনীত করা হয় সে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে ক্রেতার খিয়ারে রূয়ত বাতিল করার অধিকারী বলে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু সাহেবাইন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উকীল তখনই খিয়ার বাতিল করার অধিকারী হবে, যদি সে উক্ত মালামাল কবজা

করার সময় তা দেখে থাকে। কিন্তু সে যদি কবজা করার পরে মাল দেখে এবং খিয়ার বাতিল করতে চায় তবে সে তা পারবে না (কাফী)।

৩. মাসআলা : কাউকে উকীল নিয়োগ করার প্রক্রিয়া হল: ক্রেতা অপর কোন ব্যক্তিকে বলবে, আমার খরিদকৃত মাল কবজা করার জন্য তুমি আমার উকীল হও অথবা এরূপ বলবে যে, আমি ঐ বস্তু কবজা করার জন্য তোমাকে উকীল নিয়োগ করলাম। আর রাসূল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করার প্রক্রিয়া হল: ক্রেতা কোন ব্যক্তিকে বলবে, তুমি আমার মাল কবজা করার জন্য প্রতিনিধি হয়ে যাও অথবা এরূপ বলবে যে, আমি আমার মাল কবজা করার জন্য তোমাকে হকুম করলাম অথবা তোমাকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করলাম অথবা এরূপ বলবে যে, তুমি অমুককে বল, যেন সে তার বিক্রিত মাল তোমার কাছে হস্তান্তর করে দেয় (আল্ বাহরুর রায়িক-ফাওয়াযিদ গ্রন্থের সূত্রে)। মাল খরিদ করার জন্য নিয়োজিত উকীল ব্যক্তির দেখা মুআক্কিলের দেখারই অনুরূপ। এ ব্যাপারে ফকীহগণ সকলেই একমত (মুহীত)। উকীলের দেখে পসন্দ করা মাল মুআক্কিল রদ করতে পারবে না (আয়নী শরহুল হিদায়া)। ফকীহগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, যাকে কোন বস্তু খরিদ করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় খিয়ার বাতিল করার ব্যাপারে তার কোন অধিকার নেই। তার দেখা প্রেরকের দেখা হিসাবে গণ্য হবে না এবং যদি প্রেরক খরিদকৃত বস্তু না দেখে তবে তার খিয়ার হাসিল হবে (বাদায়ে)।

৪. মাসআলা : ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্বে এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে উকীল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে। সেই প্রেক্ষিতে উকীল বা প্রতিনিধি ঐ মাল দেখেছে। এমতাবস্থায় মুআকিল বা প্রেরক যদি নিজেই ঐ মাল খরিদ করে নেয় তবে তার খিয়ারে রূয়ত হাসিল হবে (মুহীত)। ফাতওয়া এর উপরই। ক্রয় উকীল মুআকিলের দেখা মাল ক্রয় করল, কিন্তু উকীল তা জানে না, তাহলে উকীলের খিয়ারে রূয়ত হাসিল হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এ হুকুম তখনই হবে, যদি সে অনির্দিষ্ট কোন বস্তুর ক্রয়-উকীল হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট বস্তুর ক্রয়-উকীল হলে এবং বস্তুটি মুআকিলের দেখা হলে উকীল না দেখে খরিদ করলেও তার খিয়ারে রূয়ত থাকবে না (আল ফুসূলুল ইমাদিয়া)।

৫. মাসআলা : বিক্রিতব্য বস্তু দেখার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করা সহীহ্ নয় এবং তার দেখা মুআক্কিলের দেখার অনুরূপ বলে গণ্য হবে না। সুতরাং কেউ যদি না দেখা বস্তু খরিদ করে, তারপর কোন ব্যক্তিকে তা দেখার জন্য উকীল নিয়োগ করে এবং বলে যে, তোমার পসন্দ হলে তা নিয়ে আসবে তবে তা জায়েয হবে না (আল্ বাহরুর রাযিক-জামিউল ফুসুলায়ন গ্রন্থের সূত্রে)। না দেখে কোন বস্তু খরিদ করার পর সে তা দেখার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করে বলে দিল যে, তোমার পসন্দ হলে ক্রয় চূড়ান্ত করে ফেলো আর পসন্দ না হলে রদ করে দিও। এভাবে উকীল নিয়োগ করা সহীহ্ হবে এবং উকীলের দেখা মুআক্কিলের দেখা রূপে গণ্য হবে। কেননা ঐ বস্তুটি দেখে এর সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করার বিষয়টি মুআক্কিল উকীলের প্রতি ন্যস্ত করে দিয়েছে। কাজেই এই ওকালত সহীহ্ হবে; যেমন খিয়ারে শর্তের সাথে কোন বস্তু ক্রয় করার ক্ষেত্রে উকীলের প্রতি ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়া বা এর অনুমতি প্রদানের অধিকার ন্যস্ত করা সহীহ্ হয়ে থাকে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : খিয়ারে আয়েবেব বিবরণ

[এ পরিচ্ছেদে সাতটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ : খিয়ারে আয়েব সাব্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া; এর হুকুম, শর্ত এবং আয়েব চিনবার বিবরণ

১. মাসআলা : খিয়ারে আয়েব শর্ত করা ছাড়াই সাব্যস্ত হয়ে থাকে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)। কোণ ব্যক্তি (আয়েবদার) কোন বস্তু খরিদ করল কিন্তু খরিদ করার সময় সে তা জানতে পারেনি এবং এর পূর্বেও বিষয়টি তার জানা ছিল না। এ অবস্থায় আয়েবের পরিমাণ কম হোক বা বেশী, তার খিয়ার হাসিল হবে। এখন সে ঐ আয়েবদার বস্তুটি পূর্ণ মূল্য দিয়ে নিতে পারবে। আবার ফেরত দিতে পারবে (শরহত তাহাবী)। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি উক্ত আয়েব কঠিন শ্রম ছাড়া দূর করা সম্ভব না হয়। পক্ষান্তরে যদি তা অনায়াসে দূর করা সম্ভব হয় তবে তার খিয়ারে আয়েব হাসিল হবে না। যেমন খরিদ কৃত দাসীর ইহরাম বাধা প্রকাশ পেল, তাহলে ক্রেতা তাকে ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল করিয়ে নিতে পারবে (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা : ক্রেতা দোষ যুক্ত বস্তুটি রেখে দিয়ে বিক্রেতার কাছ থেকে এর ক্ষতিপূরণ উসুল করতে পারবে না (রাখলে পূর্ণ মূল্য দিয়ে রাখতে হবে অন্যথায় ফেরত দিয়ে দিতে হবে) (শরহুল কুদুরী লিল আকতী)। তারপর দেখতে হবে, যদি কবজা করার পূর্বে ক্রেতা দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় তবে তা ফেরত দিতে পারবে এবং ফেরত দিলাম বলে ক্রয় বাতিল করতে পারবে। এক্ষেত্রে বিক্রেতার সম্মতি এবং আদালতের ফায়সালার প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে কবজার পর অবগত হলে বিক্রেতার সম্মতি বা আদালতের ফায়সালা ছাড়া সে ক্রয় বাতিল করতে পারবে না। তারপর সে যদি বিক্রেতার সম্মতিতে ঐ ক্রয়-বিক্রয় রদ করে দেয় তবে এটি তাদের দুজনের ক্ষেত্রে فسخ (ভঙ্গ করা) হিসাবে গণ্য হবে এবং তাদের ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে بيع (ক্রয়-বিক্রয়) হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি আদালতের ফায়সালার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় রদ করা হয় তাহলে তাদের দুজনের ক্ষেত্রে এবং অপরাপর সকলের ক্ষেত্রে এটি فسخ হিসাবেই গণ্য হবে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)।

১. ক্রেতা যদি ক্রয়কৃত মালের মধ্যে এমন ক্রটি দেখতে পায় যার কারণে এর নির্ধারিত মূল্য হ্রাস পায় তাহলে ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বহাল রাখতে পারে আবার তা বাতিলও করে দিতে পারে। ফিকহের পরিত্যাগ একে খিয়ারে আয়েব বলা হয়। এ অবস্থায় খরিদকৃত মাল রাখতে হলে পূর্ণ মূল্য দিয়েই রাখতে হবে।

৩. মাসআলা : মাল ফেরত দেওয়ার কারণে যে আকদ ভেঙ্গে যায় এবং যাতে মাল তার মুকাবিল বস্তুর বিনিময়ে জামানত হিসাবে থাকে সে সকল আকদের ক্ষেত্রে কম-বেশি সব ধরনের আয়েবের কারণে মাল ফেরত দেওয়া জায়েয হবে। পক্ষান্তরে মাল ফেরত দেওয়ার কারণে যে আকদ ভঙ্গ হয় না এবং যাতে মাল তার মুকাবিল বস্তুর বিনিময়ে জামানত হিসাবে থাকে না বরং স্থায়ী যাতে বিনিময়েই জামানত হিসাবে থাকে, যেমন মহর এবং খুলা ও কিসাসের বদল ইত্যাদি, এ জাতীয় আকদের ক্ষেত্রে অল্প আয়েবের কারণে ফেরত দেওয়া যাবে না। বেশী আয়েবের কারণে ফেরত দেওয়া যাবে (শরহত তাহাবী)। মহর যদি পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য বস্তু না হয় তবে অল্প আয়েবের কারণে তা ফেরত দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য বস্তু হলে অল্প আয়েবের কারণেও ফেরত দেওয়া যাবে (আল ফুসুলুল ইমাদিয়া)। মহরের ক্ষেত্রে অধিক আয়েব হল এমন আয়েব যা মহর সাব্যস্তকৃত বস্তুকে উচ্চ পর্যায় হতে মধ্যম পর্যায় এবং মধ্যম পর্যায় হতে নিম্ন পর্যায় নিয়ে আসে (আল বাহরুর রাযিক)। এ ক্ষেত্রে هـ فاصل (পার্থক্য বিধানকারী সীমানা) হল, যে আয়েব মূল্য নির্ধারণকারী বিশেষজ্ঞ লোকদের দৃষ্টিতে বিভিন্নভাবে মূল্যায়িত ও অনুমতি হয়ে থাকে তা অল্প আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। যেমন কোন ব্যক্তি একটি নিখুঁত বস্তুর মূল্য সাব্যস্ত করল এক হাজার দিরহাম এবং আয়েবদার অবস্থায় এর মূল্য সাব্যস্ত করল এর চেয়ে তুলনামূলক কিছু কম। কিন্তু অপর ব্যক্তি উক্ত আয়েবের অবস্থায়ও এর মূল্য এক হাজার দিরহামই সাব্যস্ত করল। (তবে এটি অল্প আয়েব বলে পরিগণিত হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন আয়েব বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মূল্যায়িত না হয় বরং সর্বাবস্থায় সকলে একইভাবে একে মূল্যায়ন করে তবে তা অধিক আয়েব বলে গণ্য হবে। যেমন মূল্য সাব্যস্তকারী লোকেরা সর্বসম্মতিক্রমে একটি নিখুঁত বস্তুর মূল্য সাব্যস্ত করল এক হাজার দিরহাম এবং আয়েবের অবস্থায় ঐ বস্তুর মূল্য সাব্যস্ত করল এর থেকে কম। (তাহলে এটি অধিক আয়েব হিসাবে পরিগণিত হবে।) ফাতওয়ার জন্য এটিই পসন্দনীয় অভিমত (মুখতারুল ফাতওয়া)।

৪. মাসআলা : খিয়ারে আয়েবের হুকুম হল এ অবস্থায় বিক্রিত বস্তুর মধ্যে তৎক্ষণাৎ ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তবে মালিকানা লাযিম অর্থাৎ চূড়ান্ত হয় না (বাদায়ে)। খিয়ারে আয়েবের মধ্যে ওয়ারাসাত জারী হয় (শরহত তাহাবী)। এটি কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট হয় না (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)।

৫. মাসআলা : খিয়ারে আয়েব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। (ক) বিক্রয়কালে অথবা বিক্রয়ের পরে হস্তান্তরের আগে আয়েব সাব্যস্ত হওয়া চাই। সুতরাং হস্তান্তরের পরে আয়েব সৃষ্টি হয় খিয়ারে আয়েব সাব্যস্ত হবে না। (খ) ক্রেতা খরিদকৃত মাল কবজা করে নেওয়ার পর তার নিকটে থাকা অবস্থায় আয়েব সাব্যস্ত হওয়া। অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মতে আয়েব যে ধরনেরই হোক খরিদকৃত বস্তু ফেরত দেওয়ার হক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বিক্রেতার নিকটে আয়েব সাব্যস্ত হওয়াই যথেষ্ট নয়। (গ) পালিয়ে যাওয়া, চুরি করা বা বিছানায় পেশাব করার ক্ষেত্রে এগুলো যে আয়েব অবগত এ সম্বন্ধে থাকা আবশ্যিক। (ঘ) উপরোক্ত আয়েবত্রয়ের ক্ষেত্রে উভয়ের নিকটে সংশ্লিষ্ট বস্তুর অবস্থা একই রকম হওয়া চাই। যদি বেশ-কম হয়ে যায় অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট এক অবস্থা আবার ক্রেতার নিকট ভিন্ন

অবস্থা তাহলে খরিদকৃত বস্ত্র ফেরত দেওয়ার হক সাব্যস্ত হবে না। (৬) আকুদ সম্পাদন করা এবং মালামাল কবজা করার সময় ক্রেতার আয়েব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়া। পক্ষান্তরে যদি আকুদ সম্পাদন করা মালামাল কবজা করার সময় ক্রেতা আয়েব সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে তবে তার খিয়ারে আয়েব হাসিল হবে না। (৭) আমাদের মাযহাব অনুপাতে খিয়ারে আয়েব হাসিল হওয়ার জন্য অপর একটি শর্ত হল, বিক্রিত বস্ত্র সর্ব প্রকার আয়েব থেকে মুক্ত এরূপ শর্ত আরোপ না করা। যদি এরূপ শর্ত আরোপ করা হয় তবে ক্রেতার খিয়ার হাসিল হবে না (বাদায়ে)।

৬. মাসআলা : মুখতাছারুল কুদুরী কিতাবে ইমাম কুদুরী (র) বলেন যে, ব্যবসায়ীদের প্রচলনে যে সব কারণে মূল্য হানি ঘটে তা-ই আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা (র) বলেন, দৃশ্যতঃ যে সব কারণ খরিদকৃত মালে লোকসান সৃষ্টি করে যেমন প্রাণী জাতীয় বস্তুর হাত-পা অবস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাওয়া অথবা পাত্র ইত্যাদি ভেঙ্গে যাওয়া কিংবা উক্ত মাল দ্বারা ফায়দা হাসিল করার ক্ষেত্রে লোকসান সৃষ্টি করে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। আর যে কারণে মূল বস্ত্র এবং এর লাভালাভে কোন লোকসান হয় না সে ক্ষেত্রে মানুষের ওরফ তথা রীতি-নীতির বিষয়টি ধর্তব্য হবে। যদি ওরফে লোকেরা একে আয়েব মনে করে তবে তা আয়েব বলে গণ্য হবে। অন্যথায় আয়েব হিসাবে গণ্য হবে না (মুহীত)।

৭. মাসআলা : কোন বস্ত্রতে আয়েব আছে কিনা তা জানা ও বুঝার জন্য ওয়াকিফহাল লোকদের শরণাপন্ন হতে হবে। যেমন- ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং শিল্পপতি সম্প্রদায়। শিল্পপতিদের শরণাপন্ন তখনই হতে হবে যদি 'খরিদকৃত বস্ত্র শিল্প জাতীয় মাল হয় (ফাতহুল কাদীর)। অন্ধ হওয়া, কানা হওয়া, টেরা চক্ষু বিশিষ্ট হওয়া, হাতে-পায়ে আঙ্গুল বেশী হওয়া বা কম হওয়া এগুলো সবই আয়েব হিসাবে গণ্য হবে (মুহীত)। এমনিভাবে (قيل) অর্থাৎ এমন উঁচা ও খাড়া নাক বিশিষ্ট হওয়া যে চোখ দ্বারা এর এক প্রান্ত দেখা যায়, এটিও আয়েব। বন্ধ অস্বাভাবিক উঁচু হওয়াও আয়েব (বাদায়ে)। অনুরূপভাবে বধির হওয়া, মূক হওয়া এবং শরীরে এ জাতীয় অন্য কোন ত্রুটি থাকা এগুলো সবই আয়েব হিসাবে পরিগণিত (হাবী)। মুখে ও বগলে দুর্গন্ধ থাকা দাসীর ক্ষেত্রে আয়েব হিসাবে গণ্য। কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে আয়েব হিসাবে গণ্য নয়। কিন্তু খুব মারাত্মক হলে গোলামের ক্ষেত্রেও তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। কেননা এতে বুঝা যায় যে, তার শরীরের ভেতরে রোগ আছে। আর শরীরের ভেতরে রোগ থাকা আয়েব (কাফী)। বাদায়ে মাযসুত এবং তাবয়ীন গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। داس-দাসী উভয়ের ক্ষেত্রে আয়েব। بجر বলা হয় নাতীর নীচে ফুলে যাওয়াকে (আল্ বাহরুর রায়িক)। قرن আয়েব হিসাবে গণ্য। قرن বলা হয় মহিলার যৌনাঙ্গে এমন হাড় সৃষ্টি হওয়া যা সহবাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এমনিভাবে عقل ও এক প্রকারের আয়েব। عقل বলা হয়, যৌনাঙ্গে কিছু গোশত বেড়ে যাওয়া যার ফলে সহবাস দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)।

১. قرن এর অবস্থায় পুরুষের জননেন্দ্রীয় মহিলার যৌনিদ্বারে ঢুকানোই সম্ভব হয় না। আর عقل এর অবস্থায় ঢুকানো সম্ভব হয়। কিন্তু পুরা ঢুকানো যায় না।

কোন কোন ফকীহ বলেছেন, قرن বলা হয়, মহিলার যৌনিদ্বার থলির ন্যায় হওয়া যার ফলে সহবাসকারী সহবাসে কোন তৃপ্তি পায় না (যহীরিয়া)।

৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি এমন এক দাসী ক্রয় করল যার সন্তান জন্মেছে বিক্রেতা বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকটে। কিন্তু ক্রয়কালে ক্রেতা তা জানত না। সে এ সম্পর্কে পরে জেনেছে, তাহলে এ ব্যাপারে দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। এক রিওয়ায়েত অনুসারে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। এর উপরই ফাতওয়া। কিন্তু অপর বর্ণনায় আছে যে, শুধুমাত্র সন্তান প্রসবের বিষয়টিকে আয়েব হিসাবে গণ্য করা যায় না। কাজেই এ অবস্থায় দাসীকে ফেরত দেওয়া যাবে না। যদি সন্তান প্রসবের কারণে বাহ্যতঃ দাসীর কোন ক্ষতি না হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বাচ্চা প্রসব করা জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে আয়েব নয়। কিন্তু প্রসব যদি পশুটির ক্ষতির কারণ হয় তবে তা আয়েব হবে। ফাতওয়া এর উপরই (মুযম্মারাত)। দাসীর গর্ভবতী হওয়া আয়েব (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)। কেউ যদি গর্ভবতী দাসী খরিদ করে এবং ক্রেতার কবজায় যাওয়ার পর সে সন্তান প্রসব করে তবে ক্রেতার তা নিয়ে বিক্রেতার সাথে ঝগড়া করার ইখতিয়ার থাকবে না। কিন্তু দাসী যদি নিফাসের অবস্থায় মারা যায় তাহলে বিক্রেতার নিকট হতে ক্রেতা এর ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। যদি ক্রেতা ক্রয়কালে তার গর্ভের কথা না জেনে থাকে (আল্ বাহরুর রায়িক)। নিসাব গ্রন্থে আছে যে, চতুর্দশ জন্তু এবং সওয়ারীর ক্ষেত্রে গর্ভবতী হওয়া দোষের নয়। কিন্তু তা প্রকাশ্য ক্ষতির কারণ হলে দোষ হবে। এর উপরই ফাতওয়া (মুযম্মারাত)।

৯. মাসআলা : امرأة رتقاء আয়েব হিসাবে গণ্য। امرأة বলা হয় এমন মহিলাকে যার যৌনাঙ্গে পেশাব করা যায় এমন পরিমাণ ছিদ্র ছাড়া আর কোন ছিদ্র নেই। এমনিভাবে فتق ও আয়েব। فتق মূলত থলিতে সৃষ্ট এক প্রকার বাতাস যা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করলে এতে মানুষ মারাও যায়। উল্লেখ্য যে, শরীরের অভ্যন্তরে কোন রোগ সৃষ্টি হলেই কেবল এ জাতীয় ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে (যহীরিয়া)। যে দাসীকে উম্মু ওয়ালাদ বানানো হবে গান গাওয়া তার জন্য আয়েব (মুহীত)। বাচ্চালীতে উল্লেখ আছে, যদি দাসীর পিতা বা দাদা ব্যভিচারে জন্মলাভ করে তবে সেটি দাসীর ক্ষেত্রে আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। ইব্ন রশীদ (র)-এর নাওয়াদির গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, দাসীর পিতা বা দাদা যদি ব্যভিচার সূত্রে জন্মগ্রহণ করে তবে এটি ঐ দাসীর ক্ষেত্রে আয়েব হিসাবে গণ্য হবে- যাকে উম্মু ওয়ালাদ বানানো হবে। পক্ষান্তরে যাদের বিষয়টি এমন নয় তাদের ক্ষেত্রে এটি দোষ হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু দাস-দাসী ক্রয়কারী (ব্যবসায়ী) ব্যক্তিদের নিকট যদি তা আয়েব বলে ধর্তব্য হয় তবে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে (যখীরা)।

১০. মাসআলা : যিনা করা দাসীর জন্য আয়েব। চাই তা বেশী হোক বা কম হোক। পক্ষান্তরে যিনার পরিমাণ যদি কম হয় তবে গোলামের ক্ষেত্রে তা আয়েব নয়। শুধু এতটুকু কথা যে, সে একটি কবীরা গুনাহ করেছে। কাজেই তার উপর ওয়াজিব হল, এর জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা ও ইসতিগফার করা। অবশ্য সে যদি এত বেশী ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে যে,

এতে মুনীরের খিদমতে বিয় সৃষ্টি হয় তাহলে এটি আয়েব হিসাবে গণ্য হবে (আল ইয়ানাবী)। যদি কোন গোলামের ক্ষেত্রে এ কথা প্রকাশ পায় যে, তার উপর হদ্দ (দণ্ড) ওয়াজিব হয়েছে তাহলে এটি আয়েব বলে গণ্য হবে (বাদায়ে)। দাসী নিজে যদি ব্যভিচারের সন্তান হয় তবে তা তার জন্য আয়েব হিসাবে পরিগণিত হবে। কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া আয়েব নয় (মুহীত)। পূর্বে যত আয়েবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এসব আয়েবের কারণে খরিদকৃত দাস-দাসীকে তখনই ফেরত দেওয়া যাবে যদি ক্রেতার কবজায় যাওয়ার পরও তাদের থেকে এসব বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং এ পুনরাবৃত্তি অত্যাৱশ্যক। কিন্তু দাসীর যিনার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে আমালী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি এমন বালিগ দাসী খরিদ করে যে, বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। তাহলে ক্রেতার কবজায় আসার পর সে যদি পুনরায় যিনা নাও করে তবুও ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। নাওয়াদিরে বিলবের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি একটি দাসী খরিদ করল। তারপর সে তার নিকট থেকে পালিয়ে গেল। তারপর দাসীটিকে পাওয়া গেল, তারপর এক ব্যক্তি দলীল প্রমাণ দ্বারা এতে তার অধিকার প্রমাণ করল তাহলে পলায়ন করার এ আয়েব তার মধ্যে সর্বদার জন্য অবধারিত হয়ে যাবে। এতে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, যিনার ন্যায় পলায়ন করার বিষয়টিরও পুনরাবৃত্তি ঘটা শর্ত নয়। কাজেই হকদার (مستحق) ব্যক্তি তার নিকট হতে এই আয়েবের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিবে। যদিও তার নিকটে যাওয়ার পর এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তদ্রূপ কেউ তার থেকে এই দাসী খরিদ করলে সেও তাকে ফেরত দিতে পারবে। যদিও তার নিকটে যাওয়ার পর এই দোষের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। প্রথমোক্ত অভিমতটি অতীব স্পষ্ট কথা (তাবয়ীন)।

১১. মাসআলা : কেউ যদি এমন গোলাম খরিদ করে যার সাথে সমকামিতা করা হয় তবে দেখতে হবে যে, তার সাথে এ কাজ বিনা-পারিশ্রমিকে করা হয় না কি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করা হয়- যদি বিনা পারিশ্রমিকে করা হয় তবে এটি আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। কেননা এটি তার মজ্জাগত অভ্যাস হওয়ার আলামত। আর যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে করা হয় তবে এটি আয়েব হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু দাসীর হকুম এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা সে যেভাবেই এ কাজ করুক তার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় এটি আয়েব হিসাবে ধর্তব্য হবে (কিনয়া)। বায়যামিয়া গ্রন্থে আছে যে, হিজড়া হওয়া দুই রকমের হতে পারে। (১) কুর্ম ও মন্দ কাজ করা নিঃসন্দেহে এটি আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। (২) রসের ভাষায় সুললিত কণ্ঠে নরম সুরে কথা বলা এবং অঙ্গ ভেঙ্গে হাঁটা-চলা করা। এহেন অবস্থা যদি কম হয় তবে তাকে ফেরত দেওয়া যাবে না। কিন্তু বেশী হলে ফেরত দেওয়া যাবে (আল বাহরুর রায়িক)। নপুংসক এবং ধ্বজভঙ্গ হওয়াও আয়েব। এমনভাবে খাসী হওয়াও আয়েব। কেউ গোলাম খরিদ করল এই শর্তে যে, সে খাসী। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, সে খাসী নয়, তাহলে তাকে ফেরত দেওয়া যাবে না। কিন্তু কেউ যদি কাউকে 'নর' হওয়ার শর্তে খরিদ করে আর সে খোজা হয়, তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। একসিরা রোগও আয়েব। একসিরা রোগ মানে উভয় অণ্ডকোষ বড় হওয়া (যহীরিয়া)। স্তন্য যদি এমন হয় যে, এতে দাসের মূল্য হ্রাস হয়ে

যায় তাহলে এটি আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু এতে যদি মূল্য হ্রাস না হয় তাহলে তা আয়েব হবে না। তিলকের হকুমও অনুরূপই। তিলকের দ্বারা কখনো শোভা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং এতে বস্ত্রের মূল্য হ্রাস পায় না। কাজেই (তখন) এটি আয়েব হবে না। এ হকুম তখনই হবে যদি তিলক গালের উপর থাকে। আবার তিলক আয়েবের কারণও হতে পারে। যদি তা নাকের অগ্রভাগের উপর থাকে। এ জাতীয় তিলকের কারণে বস্ত্রের মূল্য হ্রাস পেয়ে থাকে (মাবসূত)।

১২. মাসআলা : খতনাকৃত না হওয়া দাস-দাসী কারো ক্ষেত্রেই আয়েব বলে গণ্য হবে না। যদি তাদেরকে দারুল হরব থেকে তুলে আনা হয় অথবা দারুল ইসলামেই তাদের জন্ম, কিন্তু তারা হচ্ছে না বালিগ। পক্ষান্তরে যদি দারুল ইসলামে জন্মগ্রহণ করা অবস্থায় তারা বালিগ হয়ে যায় তবে তা (খতনাকৃত না হওয়া) আয়েব হিসাবে গণ্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। দাসীর খতনা না করানো আরবের ওরফ অনুসারে আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু আমাদের দেশে দাসীকে খতনা করানো হয় না। কাজেই আমাদের দেশে তা আয়েব হবে না (বাদায়ে)। ফাতাওয়ায়ে কাযীখানে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। বিবাহ-শাদী দাস-দাসীর ক্ষেত্রে আয়েব। যদি ফেরত প্রদানের আগে গোলাম তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তার রদ করার ইখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে। আর স্বামী যদি তার দাসীকে তালাক দেয় এবং তা যদি রাজসী তালাক হয় তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। কেননা রাজসী তালাকপ্রাপ্ত মহিলাও তার (স্বামীর) বৈবাহিক সম্পর্কধীন। এ কারণেই মুনীরের অনুমতি ছাড়া স্বামী তাকে পুনঃগ্রহণ করতে পারে। আর বায়িন তালাক হলে রদ করার ইখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে। ইমাম কারখী (র) বলেন, যদি দুধ পানের কারণে অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে ক্রেতার জন্য দাসীর সাথে সহবাস করা হারাম হয় তাহলে এটি আয়েব হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন দাসী তার দুধ বোন অথবা দুধমা অথবা তার স্ত্রীর মা অথবা তার স্ত্রীর কন্যা (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)।

১৩. মাসআলা : দাস-দাসীর উপর কর্জ থাকা আয়েবের বিষয়। কিন্তু বিক্রেতা যদি ঋণ পরিশোধ করে দেয় অথবা পাওনাদার ব্যক্তির যদি তাদের পাওনা মাফ করে দেয় তাহলে এ আয়েব আর থাকবে না (খুলাসা)। কিনয়া গ্রন্থে আছে, ঋণ থাকা আয়েব। কিন্তু তা যদি এতই নগণ্য হয় যে, তাকে ক্ষতি মনে করা হয় না, তবে এ পরিমাণ ঋণ আয়েব ধরা হবে না (আল বাহরুর রায়িক)। এমনভাবে খরিদকৃত গোলামকে যদি কারো নিকট বন্ধক হিসাবে বা ইজারায় দেওয়া অবস্থায় পাওয়া যায় তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হকুম প্রযোজ্য হবে (আল ইয়ানাবী)। ইমাম কারখী (র) বলেছেন, যদি গোলাম কোন জিনায়েত বা অপরাধমূলক কাজ করে তবে তা আয়েব বলে গণ্য হবে। এর সূরত এরূপ হতে পারে যে, উক্ত গোলাম এই অপরাধমূলক কাজ আকদের পরে কবজার আগে করেছে। কিন্তু সে যদি আকদের আগে এ জাতীয় অপরাধমূলক কাজ করে তবে বিক্রেতা বিক্রি করার কারণে জরিমানা পরিশোধ করার বিষয়টিকে ইখতিয়ার করে নিয়েছে বলে গণ্য হবে। গোলামকে ফেরত দেওয়ার আগেই মুনীর যদি তার ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে ক্রেতার ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)।

১৪. মাসআলা : মদ পানের কারণে আর্থিক ক্ষতি হলে দাসীদের ক্ষেত্রে তা আয়েব। কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে আয়েব নয়। অবশ্য দাড়ি গজায়নি এমন কিশোর গোলামের ক্ষেত্রে আয়েব হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মদ্য পানের পরিমাণ এমন বেশী হয় যে, পরিমাণ সাধারণত মানুষ পান করে না। যদি মদ্য পানের পরিমাণ এত না হয় তবে তা দাসীর ক্ষেত্রে আয়েব হিসাবে গণ্য হবে না (খুলাসা)। পুরাতন কাশি যা রোগ-ব্যাদির কারণে সৃষ্টি হয়েছে তা আয়েব বলে গণ্য। কিন্তু সচরাচর মানুষ যে পরিমাণ কাশি ঐ পরিমাণ কাশি আয়েব বলে গণ্য হবে না। শ্বেতরোগ ও কুষ্ঠরোগ আয়েব হিসাবে গণ্য। কুষ্ঠরোগ মানে এমন রোগ যে রোগের কারণে চামড়ার নীচে পুঁজ সৃষ্টি হয় এবং দূর থেকে এর দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। এই রোগের কারণে অনেক সময় শরীরের চামড়া, গোশত ইত্যাদি স্থলিত হয় ও খশে পড়ে। এগুলো হচ্ছে জঘন্যতম আয়েব (যহীরিয়া)।

১৫. মাসআলা : দাঁত কালো এবং সবুজ হওয়াও আয়েব। কিন্তু হলুদ হওয়া সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। (মুহীত)। দাঁত পড়ে যাওয়াও আয়েব চাই তা চোয়ালের দাঁত হোক বা অন্য দাঁত হোক। এটিই সহীহ্ অভিমত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। বালিগা দাসীর হায়েয বন্ধ হওয়াও আয়েব। বালিগা মানে হল, সতের বছর বয়সে পদার্পণ করা। তদ্রূপ ইসতিহাযাও এক প্রকারের আয়েব (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)। এ বিষয়টি দাসীর উজির দ্বারাই জানা যাবে। যদি তার স্বীকারোক্তির সাথে বিক্রেতার শপথ করা থেকে বিরত থাকার বিষয়টিও সংযুক্ত হয়ে যায়, তবে ক্রেতা দাসীকে ফেরত দিতে পারবে। চাই তা কবজার আগে হোক বা পরে। এটিই সহীহ্ অভিমত (হিদায়া)। ফকীহগণ বলেন, যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে এ ব্যাপারে দাসীর মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না (কাফী)।

১৬. মাসআলা : গোলাম খরিদ করার পর দেখা গেল যে, সে জুয়ারী তাহলে যদি (সমাজ প্রচলনে) একে আয়েব গণ্য করা হয় যেমন দাবা এবং সতরজু ইত্যাদির মাধ্যমে জুয়া খেলা, তাহলে এটা আয়েব বলে গণ্য হবে। আর যদি সমাজ প্রচলনে একে আয়েব মনে না করা হয় যেমন আখরোট এবং তরমুজের মাধ্যমে জুয়া খেলা যাকে ফার্সী ভাষায় *কোজ বাখ্তন* (লেটা খেলা) *سنه زدن* (ছয়গুটি খেলা) এবং *خريزه زده* (তরমুজ মেরে খেলা) বলা হয়। এ সবার মাধ্যমে জুয়া খেলা আয়েব বলে গণ্য হবে না (আল ফুসলুল ইমাদিয়া)। যদি কোন গোলামকে ইসলামের উপর না পাওয়া যায় তবে তা আয়েব রূপে গণ্য হবে (হাবী)। কাফির হওয়ার শর্তে গোলাম খরিদ করার পর দেখা গেল যে, সে মুসলমান, তাহলে তাকে ফেরত দেওয়া যাবে না। কিন্তু বিপরীত ছুরতে ফেরত দেওয়া যাবে (তাহযীব)। এক খৃস্টান ব্যক্তি কোন গোলাম খরিদ করল এই শর্তে যে, সে খৃস্টান, তারপর দেখা গেল যে, সে মুসলমান তাহলে তার খিয়ার সাব্যস্ত হবে না (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)।

১৭. মাসআলা : গোলামের এমন বাহাতী আয়েব যে, ডান হাত দ্বারা কিছুই করতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি বাম হাত অপেক্ষা ডান হাত কিছু দুর্বল থাকে কিন্তু কাজ করার অযোগ্য নয়, তবে তা আয়েব হবে না (মাবসূত)। *عشاء* (দৃষ্টি শক্তি দুর্বল) আয়েব। *عشاء* মানে বেশী অন্ধকারে এবং বেশী আলোতে দেখতে না পাওয়া আসাম (عسم)ও এক প্রকারের

আয়েব। আসাম মানে শরীরের রং শুকিয়ে যাওয়া। সিলআ (السلة) আয়েবের মধ্যে গণ্য। সিলআ মানে শরীরের কোন অংশে মাংসপিণ্ডের ন্যায় গোশত এমনভাবে বেড়ে যাওয়া যে তা নাড়া দিলে নড়ে উঠে। কখনো তা চনা-বুটের মত থাকে। আবার তা বেড়ে তরমুজের মতও বড় হয়ে যায়। সালআ (السلة) ও আয়েবের মধ্যে গণ্য। সালআ মানে যক্ষ্ম। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, সালআ মানে পুষ্টির উপর সৃষ্ট ফোঁড়া (যহীরিয়া)। হানাফ (حنف) আয়েব হিসাবে গণ্য। হানাফ মানে উল্ল হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি তৎসংযুক্ত অঙ্গুলির দিকে বাঁকা হয়ে যাওয়া। ইবনুল আ'রাবী (র) বলেন, হানাফ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে চলে (যহীরিয়া)। সাদক (صدف) ও আয়েব হিসাবে গণ্য। সাদাক মানে ঘাড় বাঁকা হওয়া। শাদক *شدق* আয়েব হিসাবে গণ্য। এর মানে হচ্ছে, মুখের ফাঁক বেশী প্রশস্ত হওয়া (মাবসূত)। শরীরে দাগ থাকাও আয়েব রূপে গণ্য। তবে তা যদি বিশেষ চিহ্ন হিসাবে থাকে, যেমন কোন কোন পশুর গায় থাকে তবে তা আয়েব রূপে গণ্য হবে না। ফাহজ (الفتح) আয়েব রূপে গণ্য। এর মানে হচ্ছে, উভয় পায়ের আঙ্গুল সম্মুখ কাছাকাছি থাকা এবং গোড়ালি দ্বয় দূরে থাকা। আর এ অঙ্গ মানুষের মধ্যে হয়ে থাকে। ফাদা (القداح) আয়েব রূপে গণ্য। ফাদা মানে হাতের কবজ বেকে যাওয়া (মুহীত)। অশ্রু বরা রোগ আয়েবের মধ্যে গণ্য (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)। শাতর *الشتر* আয়েব হিসাবে গণ্য। শাতর মানে চোখের পলক উল্টিয়ে যাওয়া (যহীরিয়া)। রীহস সুবুল (ريح السبل) আয়েব হিসাবে গণ্য (এ হচ্ছে এক প্রকার চক্ষু রোগ যার ফলে চোখের রংসমূহ ফুলে যায়) (খুলাসা)। পাঁচড়া বা খুজলি চোখের অভ্যন্তরে এবং চোখের বাইরে সব স্থানেই আয়েব হিসাবে গণ্য (মুহীত)। চোখের মধ্যে ঘোলাটে শ্বেত বর্ণের আবরণ থাকাও আয়েব। চোখের মধ্যে পলক উদগত হওয়াও আয়েব হিসাবে গণ্য (যহীরিয়া)।

১৮. মাসআলা : মাথার চুল কিছু হলুদ এবং কিছু লাল বর্ণের হওয়া তুর্কী এবং হিন্দুস্তানীদের ক্ষেত্রে আয়েব। কিন্তু রোমী ও সাকল্লিয়াদের ক্ষেত্রে এটি আয়েব নয়। কেননা অধিকাংশ রোমীদের চুল অনুরূপই হয়ে থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শামাত (الشمت) আয়েব রূপে গণ্য। শামাত মানে চুলের কিছু অংশ অথবা গোশতের কিছু অংশ সাদা এবং অপর অংশ কালো হওয়া (মুখতারুল ফাতাওয়া)। চুলের স্বাভাবিক রং হচ্ছে কালো রং। এ ছাড়া অপরূপ রং এর ক্ষেত্রে বিধান হল যদি এর দ্বারা গোলামের মূল্য হ্রাস পায় এবং ব্যবসায়ীরা যদি একে আয়েব মনে করে তবে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে (যহীরিয়া)। হাবী গ্রন্থে আছে যে, যদি দাসীর চুল লালচে হওয়া অথবা কিছু লাল এবং কিছু কালো হওয়া আয়েব। পুরো চুল পুরো লাল হওয়া আয়েব নয়। অবশ্য ক্রয়কালে চুল কালো হওয়ার শর্ত থাকলে দাসীকে ফেরত দেওয়া যাবে (তাতার খানিয়া)।

১৯. মাসআলা : পালিয়ে যাওয়া এবং বিচ্ছিন্ন পেশাব করাও আয়েব। যদি এমন ছোট বাচ্চা চুরি করে যে, ভাল-মন্দ বুঝে না অর্থাৎ ভ্রম অবস্থা এমন যে, সে একা বেতে পরতে পারে না তাহলে এ কাজ তার ক্ষেত্রে আয়েব বল গণ্য হবে না। কিন্তু না বালিগ বাচ্চা যদি

জানবান হয় তবে চুরি করা তার ক্ষেত্রে আয়েব বলে গণ্য হবে। তবে এই দোষের কারণে তাকে তখনই ফেরত দেওয়া যাবে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের তার এই দোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে (মুযমারাত যাদ গ্রন্থের সূত্রে)। যদি উপরোক্ত আয়েবের বিষয়সমূহ নাবালিগের মধ্যে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের নিকটে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে এবং এ কারণে তাকে ফেরত দেওয়া হবে। এমনিভাবে এসব আয়েবের কোন একটি যদি বয়ঃবৃদ্ধির পরও উভয়ের কাছে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায় তবে তা আয়েবরূপে গণ্য হবে এবং এ কারণে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে। পক্ষান্তরে যদি ঐ বদ অভ্যাস নাবালিগ অবস্থায় বিক্রেতার কাছে থাকা কালে পাওয়া যায় এবং ক্রেতার কাছে থাকা কালে তার বয়ঃবৃদ্ধির পর পাওয়া যায় তাহলে এই দোষের কারণে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না (গিয়াসিয়া)। পাগল হওয়া ব্যতিরেকে আর যত আয়েব আছে যেমন চুরি করা, পালিয়ে যাওয়া এবং বিছানায় পেশাব করা এগুলো সম্পর্কে শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র) তৎপ্রণীত শরাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ক্রেতার কবজায় আসার পর এসব দোষের পুনরাবৃত্তি হওয়া (গোলাম ফেরত দেওয়ার জন্য) শর্ত নয়। কিন্তু কোন কোন মাশায়িখ বলেন যে, ক্রেতার নিকটে এ সবার পুনরাবৃত্তি ঘটা শর্ত। এটিই সহীহ অভিমত। আবার কেউ কেউ নিজ নিজ শরাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ক্রেতার কবজায় আসার পর এ সবার পুনরাবৃত্তি ঘটা যে শর্ত, এ বিষয়ে মাশাইখে কিরামের মধ্যে আদৌ কোন মতভেদ নেই। অধিকাংশ বর্ণনায় এভাবেই বর্ণিত রয়েছে (মুহীত)।

২০. মাসআলা : ক্রেতার কবজায় আসার পর যদি তার পুরাতন কোন দোষের পুনরাবৃত্তি ঘটে, তারপর সে কারণে গোলামকে ফেরত দেয়ার আগেই যদি ঐ দোষ দূর হয়ে যায় তাহলে তার খিয়ার বাতিল হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)। পলায়ন করা বা ভেংগে যাওয়ার সংজ্ঞা হল যদি কোন গোলাম বা দাসী মুনীবের অবাধ্য হয়ে হঠাৎ গায়েব হয়ে আত্মগোপন হয়ে যায় তবে একে পলায়ন বলে গণ্য করা হবে। ইমাম যহীরুদ্দীন মুরগীনানী (র) এই মতটি পসন্দ করেছেন এবং বলেছেন, এটিই পসন্দনীয় মতামত। আর তিনি এ হিসাবেই ফাতওয়া প্রদান করতেন (মুখতারুল ফাতওয়া)। গোলাম যদি পালিয়ে এই পরিমাণ দূরে চলে যায় যে তা ৪৮ মাইল থেকে কম হয় তবে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। এতে মাশায়িখদের কারো দ্বিমত নেই (নিহায়া)। গোলাম যদি পালিয়ে শহর থেকে বের হয়ে যায় তবে ফকীহদের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তাও আয়েব বলে গণ্য হবে। চাই সে নিজের মুনীবের নিকট থেকে পলায়ন করুক কিংবা যার নিকট ইজারা বা ধার দেওয়া হয়েছে বা যার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়েছে তার নিকট থেকে পলায়ন করুক। পক্ষান্তরে গোলাম যদি পালিয়ে শহরের বাইরে না যায় তবে এতে মাশাইখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ কথা হল এই যে যদি শহর ষড় হয় যেমন মিসরের কায়রো শহর তবে শহরের অভ্যন্তরে থাকলেও তা আয়েব রূপে গণ্য হবে। আর যদি শহর এমন ছোট হয় যে, এর অধিবাসীগণ এবং এর গৃহসমূহ কারো নিকট অপরিচিত নয়, তবে সে ক্ষেত্রে তা আয়েব হবে না (তাবয়ীন)। গোলামের গ্রাম হতে শহরে পালিয়ে যাওয়া আয়েব রূপে গণ্য হবে। এমনিভাবে গোলাম যদি শহর থেকে পালিয়ে গ্রামে চলে যায় তবে তাও আয়েবের মধ্যে শামিল হবে। গোলাম যদি

গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে পালিয়ে নিজ মুনীবের কাছে চলে আসে তবে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু সে যদি গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে পালিয়ে নিজ মুনীবের নিকট ফিরে না আসে এবং গসবকারী ব্যক্তির নিকটও না যায় তবে দেখতে হবে সে মুনীবের বাড়ি চিনে কিনা এবং সেখানে যেতে সে সক্ষম কিনা? যদি সে মুনীবের বাড়ি চিনে এবং সেখানে ফিরে যেতেও সে সক্ষম ও সামর্থ্যবান, এমতাবস্থায় সে যদি ফিরে না আসে তবে তা আয়েব রূপে গণ্য হবে। আর যদি মুনীবের বাড়ি না চিনে অথবা তথায় ফিরে যেতে সে যদি সক্ষম ও সামর্থ্যবান না হয় তবে ফিরে না আসা আয়েব রূপে গণ্য হবে না (ফাতহুল কাদীর)। যদি কোন গোলাম বা দাসী দারুল হরবে গনীমত রূপে বন্টিত হওয়ার আগে পালিয়ে যায়, তারপর তাকে ধরে এনে আবার গনীমতের মালের মধ্যে শামিল করে দেওয়া হয় তবে এ যাওয়া পালিয়ে যাওয়া বলে গণ্য হবে না। যদি কোন গোলাম বা দাসীকে গনীমত হিসাবে বিক্রি করা হয় অথবা গনীমতের মাল হিসাবে বন্টন করা হয় এবং বন্টনে সে কারো ভাগে পড়ে তারপর সে যদি দারুল হরবের মধ্যেই পালিয়ে যায় তবে সে পালায়নকারী বলে গণ্য হবে। চাই সে পালিয়ে নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছা করুক অথবা না করুক (যহীরিয়া)।

২১. মাসআলা : দশ দিরহামের কম চুরি করলেও তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, এক দিরহামের কম যেমন এক পয়সা, দুই পয়সা চুরি করলে তা আয়েবের মধ্যে শামিল হবে না। নিজের মুনীবের মাল চুরি করুক বা অন্যের মাল চুরি করুক উভয় অবস্থায় হকুম একই হবে। অর্থাৎ আয়েব হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। অবশ্য খাদ্য দ্রব্য চুরি করলে এ হকুমের মধ্যে পার্থক্য হবে। অর্থাৎ গোলাম যদি আহার করার জন্য মুনীবের খাদ্য দ্রব্য থেকে চুরি করে তবে তা আয়েব হবে না। কিন্তু অন্যের খাদ্য দ্রব্য থেকে চুরি করলে তা আয়েব বলে গণ্য হবে। যদি খাদ্য দ্রব্য বিক্রির উদ্দেশ্যে চুরি করে তবে তা মুনীবের হোক বা অন্য লোকের হোক সর্বাবস্থায় আয়েব রূপে পরিগণিত হবে (ফাতহুল কাদীর)। জামিউল ফুসলায়ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দাস-দাসী যদি খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে হতে পিয়াজ বা তরমুজ চুরি করে অথবা পয়সা চুরি করে যেমন চাকর-চাকরানিরা করে তবে তা আয়েব হিসাবে ধর্তব্য হবে না। কিন্তু যদি বাইরের লোকের তরমুজ চুরি করে তবে তা আয়েব রূপে গণ্য হবে। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (আল্ বাহরুর রায়িক)। কেউ যদি খাবার বস্ত্র সঞ্চয় করার জন্য চুরি করে তবে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে মুনীব এবং বাইরের লোক সবই সমান (আল্ ফুসলুল ইমাদিয়া)। দাস-দাসী যদি ঘরের মধ্যে সিঁদ কাটে, কিন্তু কোন মাল না নেয় তাহলে এটিও আয়েব বলে গণ্য হবে (যহীরিয়া)।

২২. মাসআলা : আল ফাওয়ায়িদুস যহীরিয়া (الفوائد الظهيرية) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এখানে একটি চমৎকার মাসআলা আছে, তা এই যে, কেউ যদি কোন না বালিগ গোলাম খরিদ করার দেখে যে, সে বিছানায় পেশাব করে তাহলে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে। কিন্তু যদি সে ফেরত না দেয়, ইত্যবসরে তার কবজায় থাকা অবস্থায় তার মধ্যে আরেকটি আয়েব সৃষ্টি হয় তাহলে বিক্রেতার নিকট হতে ক্রেতা এর ক্ষতিপূরণ উসুল করার পর ঐ গোলাম যখন বড়

হবে এবং বালিগ হওয়ার ফলে যখন তার পূর্বের আয়েবটি দূর হয়ে যাবে তখন বিক্রেতা তার প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ ক্রেতার নিকট থেকে ফেরত নিতে পারবে কিনা? এ সম্পর্কে কিতাবে কোন সিদ্ধান্ত নেই। তবে শায়খ (র) বলেন, আমার পিতা মরহুম দুটি মাসআলার ভিত্তিতে বলেছেন, সে ফেরত নিতে পারবে। (১) দাসী খরিদ করার পর যদি জানতে পারে যে, তার স্বামী আছে। তাহলে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে। ইত্যবসরে ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় যদি দাসীর মধ্যে অন্য কোন আয়েব পয়দা হয় তাহলে বিক্রেতার নিকট হতে ক্রেতা এর ক্ষতিপূরণ উসুল করে নিতে পারবে। ক্ষতিপূরণ উসুল করে নেওয়ার পর যদি দাসীর স্বামী তাকে বায়িন তালাক দেয় তবে স্বামীবর্তী হওয়ার আয়েব দূর হওয়ার কারণে বিক্রেতা তার ক্ষতিপূরণ ফেরত নিতে পারবে। আলোচ্য মাসআলাও একই রকম। (২) খরিদা গোলাম রুগ্ন হওয়ার কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। পরে ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় যদি তার মধ্যে আরেকটি আয়েব দেখা দেয় তাহলে ক্রেতা এর ক্ষতিপূরণ উসুল করতে পারবে। ক্ষতিপূরণ উসুল করে নেওয়ার পর সে যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতা ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে কিনা? এ সম্পর্কে ফকীহগন বলেছেন, গোলাম চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ হলে ফেরত পাবে না, বিনা চিকিৎসায় সুস্থ হলে ফেরত পাবে। আর আলোচ্য মাসআলায় বালিগ হওয়ার ব্যাপারটিও যেহেতু চিকিৎসার সাথে সম্পর্কহীন সেহেতু এখানেও ফেরত পাওয়ার কথা (নিহায়া)। পেশাবের বেগ হওয়ার পর তা যদি আটকিয়ে না রাখা যায় তবে এটিও আয়েব হিসাবে গণ্য হবে (আল বাহরুর রায়িক)।

২৩. মাসআলা : শৈশবের পাগলত্ব সর্বদার জন্য আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ যদি মালিকের কাছে শৈশবে পাগলত্ব দেখা দেয় তারপর ক্রেতার কবজায় গিয়ে শৈশবে বা প্রাপ্ত বয়সে হয় তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। কোন কোন ফকীহ বলেন, মালিকের কাছে থাকা অবস্থায় যদি পাগলত্বের দোষ থাকে তাহলে ক্রেতার কবজায় আসায় আবার পাগল না হলেও ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। কিন্তু অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের অভিমত হল, ক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় সে পুনরায় এই (পাগলামীর) দোষে দোষী না হলে তাকে ফেরত দেওয়া যাবে না। এটিই সহীহ মতামত (কাফী)। যে পাগলামীর কারণে ক্রেতা দাসী বা গোলামকে ফেরত দিতে পারে এর স্থায়িত্বের পরিমাণ কত সময় হবে, এ সম্পর্কে ফকীহগন বলেন, তা এক দিন এবং এক রাতের অধিক হতে হবে। এর চেয়ে কম সময় হলে তা আয়েব রূপে ধর্তব্য হবে না (তাবয়ীন আয়নী শরহুল কানয, জামে কবীর, আন্ নাহরুল ফায়িক)। যহীরিয়া গ্রন্থে মুহাযির থেকে বর্ণিত আছে, কাফন চুরি করা এবং ডাকাতি করাও চুরির ন্যায় গোলামের জন্য আয়েব রূপে গণ্য (আল বাহরুর রায়িক)। যে গোলামের এখনো দাড়ি উঠেনি কেউ যদি এ জাতীয় গোলাম খরিদ করার পর তাকে দাড়ি মুড়ানো অবস্থায় পায় অথবা এমন অবস্থায় পায় যে, সে তার দাড়ি উৎপাটিত করে ফেলেছে তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। যদি এ অবস্থা ক্রয়ের পর এমন সময়ের মধ্যে হয় যার ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, বিক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায়ই তার মধ্যে এই আয়েব ছিল (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৪. মাসআলা : কেউ তুর্কী দাসী খরিদ করল। অথচ দাসী তুর্কী ভাষা জানেনা অথবা তুর্কী ভাষায় ভালভাবে কথা বলতে পারে না। আর (দাসীর) এ অবস্থা সম্বন্ধে ক্রেতা পূর্বেই জ্ঞাত

ছিল। তবে সে একথা জানত না যে এটি ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিতে আয়েবের বিষয়। এহেন অবস্থায় ক্রেতা যদি ঐ দাসীকে কবজা করে নেয়, তারপর এটি যে, আয়েব, এ সম্বন্ধে অবগত হয় তাহলে দেখতে হবে যে, এই আয়েবটি কোন পর্যায়ে। যদি তা এমন প্রকাশ্য হয় যা কারোই অজানা থাকার কথা নয়। যেমন কানা হওয়া ইত্যাদি এমন দোষের কারণে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। আর যদি এমন অপ্রকাশ্য দোষ হয় যা মানুষের অজানা থাকা সম্ভব তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। কেউ যদি হিন্দুস্তানী এমন দাসী খরিদ করে যে, হিন্দুস্তানী ভাষা জানে না তাহলে এর সম্বন্ধে ফায়সালা হল, যদি ব্যবসা-পারদর্শী লোকেরা একে আয়েব মনে করে তবে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। আর এ জাতীয় লোকেরা যদি একে আয়েব মনে না করে তবে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না (মুহীত)। দেখা গেল ক্রীতদাসী ভাল রাঁধতে পারে না, রুটি পাকাতে পারে না, তাহলে ক্রয়কালে এ বিষয়ে পারদর্শিতার শর্ত না থাকলে তা আয়েব বলে গণ্য হবে না। গোলামের ক্ষেত্রেও একই কথা, যদি তাদের অবস্থা এমন হয় যে, তারা ভালভাবে রান্না-বান্না করতে জানত, কিন্তু বিক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় তারা তা ভুলে গেছে তাহলে ক্রেতা তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিতে পারবে (খুলাসা)।

২৫. মাসআলা : কুবরা গ্রন্থে আছে, ক্রেতার কাছে আসার পর দাসীর অনবরত চোখের ব্যথা লেগেই থাকে। যদি এ রোগ নতুন হয় তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। আর তা যদি (বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায়) পুরাতন রোগ হয়ে থাকে তবে ফেরত দিতে পারবে (তাতার খানিয়া)। যদি খরিদকৃত দাসীর চোয়ালের দাঁতে অনবরত ব্যথা হয় তবে দেখতে হবে যে, এ ব্যথা পুরাতন না নতুন। যদি এ ব্যথা নতুনভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। আর পুরাতন ব্যথা হয়ে থাকলে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে (তাতার খানিয়া)। মুহীত গ্রন্থে আছে, যদি খরিদকৃত দাসী বলে, আমার চোয়ালের দাঁতে ব্যথা আছে তাহলে তার একথার কারণে তাকে ফেরত দেওয়া যাবে না (সিরাজিয়া)। যদি খরিদকৃত দাসীর এক চোখ নীল বর্ণের এবং অন্য চোখ আরেক বর্ণের হয় অথবা এক চোখ কালো সুরমা বর্ণের এবং অন্য চোখ সাদা বর্ণের হয় তাহলে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে (আল বাহরুর রায়িক)। কেউ কোন গোলাম খরিদ করার পর প্রকাশ পেল যে, সে জরাক্রান্ত তাহলে এটি আয়েব রূপে গণ্য হবে এবং এ কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে (মুখতারুল ফাতওয়া)।

২৬. মাসআলা : কেউ যদি কোন সায়িবা (সধবা) দাসীকে এই শর্তে খরিদ করে যে, বিক্রেতা তার সাথে সঙ্গম করেনি। তারপর এ কথা প্রকাশ পেল যে, দাসীকে বিক্রি করার পূর্বে বিক্রেতা তার সাথে সঙ্গম করেছে তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না (মুহীত)। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ কোন দাসীকে কুমারী হওয়ার শর্তে খরিদ করল। তারপর সে তাকে কবজা করে নিল। তারপর ঐ দাসী তার কবজায় থাকা অবস্থায় মারা গেল। এরপর প্রকাশ পেল যে, সে মূলতঃ কুমারী ছিল না তাহলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছুই পাবে না। চাই এতে দাসীর কোন ক্ষতি হোক বা না হোক। ফকীহ হাসান (র) ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে এই অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন। পক্ষান্তরে ফকীহ

ইবন আবু মালিক (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে লোকসান অনুপাতে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিবে (যখীরা)। অপ্রাপ্ত বয়স্কতার শর্তে দাসী খরিদ করার পর যদি দেখা যায় যে সে প্রাপ্ত বয়স্কা তাহলে এই কারণে ফেরত দেওয়া যাবে না (খুলাসা)।

২৭. মাসআলা : না দেখে দাসী খরিদ করার পর দেখল যে, দাসীটি কুশী, কালো তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। যদি তার শারীরিক গঠন দোষমুক্ত হয় (যখীরিয়া)। কেউ দাসী খরিদ করার পর দেখল যে, তার চেহারা একেবারে জুলে ছাই বর্ণ হয়ে গেছে, অর্থাৎ এমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে যে, চেহারার সৌন্দর্য বলতে কিছুই নেই। ভাল-মন্দ কিছুই বুঝা যায় না, তবে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। যদি কোন কারণে ফেরত না দেওয়া যায় তবে এইরূপ ফ্যাকাশে চেহারা বিশিষ্ট এই দাসীর দাম কত এবং স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায় তার দাম কত হতে পারে তা সাব্যস্ত করে যা অতিরিক্ত হবে এই অতিরিক্ত পরিমাণ মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে উসূল করে নিবে (মুহীতঃ যিয়াদাত গ্রন্থের সূত্রে)। কেউ যদি কোন দাসী এই শর্তে খরিদ করে যে, সে সুন্দরী, তারপর দেখা গেল যে, সুন্দরী নয়, বরং বদসুরত তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে (খুলাসা)।

২৮. মাসআলা : ক্রয়কালে দেখা গেল গোলামের উভয় হাঁটু ফোলা, বিক্রেতা বলল, এটা নতুন ফোলা। আঘাতের কারণে এভাবে ফুল গেছে। এ কথা ভিত্তিতে ক্রেতা তাকে খরিদ করে নিল। তারপর প্রকাশ হল যে, এটি তার পুরাতন রোগ তাহলে এ কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। শায়খ (র) বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বিক্রেতা এর কারণ বর্ণনা না করে থাকে। কিন্তু বিক্রেতা এই অবস্থার কারণ বর্ণনা করে থাকে, তারপর প্রকাশ পায় যে, এটি এই কারণে নয় বরং অন্য কোন কারণে এ অবস্থায় আক্রান্ত হয়েছে। তাহলে ক্রেতা এই গোলামকে রদ করে দিতে পারবে। যেমন কেউ কোন জুরাক্রান্ত গোলামকে খরিদ করার সময় বিক্রেতা বলেছিল যে, এটি সাময়িক জ্বর। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, বিক্রেতার কথা ঠিক নয়, তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। তদ্রূপ বিক্রেতা যদি বলে যে, তুমি খরিদ করো। যদি এটি পুরাতন রোগ হয় তবে আমি দায়ী। তারপর প্রকাশ পেল যে, এটি পুরাতন রোগ তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। এমনিভাবে কেউ যদি এই শর্তে কোন গোলাম খরিদ করে যে, তার পায়ের এ ফোলা নতুন ফোলা, তারপর দেখা গেল যে, এটি পুরাতন ফোলা এ অবস্থায়ও ক্রেতা গোলামকে ফেরত দিতে পারবে না। ফাতাওয়ায়ে ফযলীর মধ্যে এ মাসআলা এভাবেই উল্লেখ রয়েছে (যখীরা)।

২৯. মাসআলা : কেউ এমন এক গোলাম খরিদ করল যার এক কানের ছিদ্রের অবস্থা এমন যে, তা দেমাগ পর্যন্ত পৌঁছেনি তবে তা আয়েব রূপে গণ্য হবে। হিন্দুস্তানী দাসীদের মধ্যে কানের ছিদ্র প্রশস্ত হলেও তা আয়েব হবে না। কিন্তু তুর্কী দাসীদের ক্ষেত্রে তা আয়েব রূপে গণ্য হবে যদি লোকেরা একে আয়েব হিসাবে মনে করে (খুলাসা)। অধিক ভক্ষণ করা

১২. উক্ত সূরতে মাসআলা না দেখে দাসী খরিদ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনিভাবে পরবর্তী মাসআলা সমূহও

দাসীদের ক্ষেত্রে আয়েব। কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে আয়েব নয় (মুখতারুল ফাতাওয়া)। সুলহুল ফাতাওয়া গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি এমন এক দাসী খরিদ করল যার শরীরে ফোড়া ফোসকা আছে। কিন্তু এটি যে আয়েব ক্রেতা তা জানত না, এ অবস্থায় ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। বস্তুত এ জাতীয় ফোড়া-ফোসকার ক্ষেত্রে সহীহ জবাব হল, উক্ত ফোড়া-ফোসকা যদি শরীরের কোন প্রকাশ্য স্থানে থাকে যা কারো দৃষ্টির অগোচরে থাকে না, তবে এ অবস্থায় ক্রেতা গোলামকে ফেরত দিতে পারবে না। আর তা যদি শরীরের কোন প্রকাশ্য স্থানে না হয় তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে (যখীরা)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ জীব-জন্তুর আয়েব বুঝার উপায় এবং এর বিবরণ।

১. মাসআলা : গাভী খরিদ করার পর দেখা গেল যে, তা দুগ্ধ দোহন করতে দেয় না। তাহলে এ শ্রেণীর গাভী যদি দুগ্ধের জন্য খরিদ করা হয়ে থাকে তাহলে ক্রেতা এটিকে ফেরত দিতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি এ শ্রেণীর গাভী গোশতের জন্য খরিদ করা হয়ে থাকে তাহলে ফেরত দিতে পারবে না। গাভী যদি নিজের স্তনে মুখ লাগিয়ে নিজেই নিজের সমস্ত দুগ্ধ খেয়ে ফেলে তবে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে (খুলাসা)। কম খাওয়া চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে দোষ। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে দোষ নয় (আস্ সিরাজুল ওয়াহাজ)। ফাওয়ায়িদে শামসুল ইসলামে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন পশু স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বেশী ভক্ষণ করে তবে তা আয়েব বলে গণ্য হবে না (খুলাসা)। কেউ যদি এমন গাধা খরিদ করে যা চিৎকার করে আওয়াজ করে না তবে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে (কিনুয়া)।

২. মাসআলা : বলদ গরু জমি কর্ষণের সময় গুয়ে পড়ে তবে তা দোষ হবে (আল ফুসুলুল ইমাদিয়া)। গাধার চলার গতি অতিশয় মন্থর হওয়ার কারণে ফেরত দিতে পারবে না। তবে দ্রুত গতির শর্তে খরিদ করে থাকলে ফেরত দিতে পারবে। চলতে গিয়ে বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া গাধার জন্য দোষ হবে। পক্ষান্তরে মাঝে মাঝে হোঁচট খাওয়া আয়েব হবে না (যখীরিয়া)। কেউ মোরগ খরিদ করার পর দেখল যে, এটি অসময়ে ডাকছে তাহলে ক্রেতা এটিকে ফেরত দিতে পারবে (মুখতারুল ফাতাওয়া)। পশু খরিদ করার পর দেখা গেল যে, এর কান কাটা। তাহলে যদি কুরবানীর জন্য খরিদ করে থাকে তবে সে এটিকে ফেরত দিতে পারবে। পক্ষান্তরে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হলে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু মানুষ যদি একে দোষযুক্ত পশু মনে করে তবে এ অবস্থায়ও এটিকে ফেরত দেওয়া যাবে। পশুটি কুরবানীর জন্য খরিদ করা হয়েছে কিনা, যদি এ বিষয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে ক্রয়কালে দেখতে হবে কুরবানীর মৌসুম হলে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদি ক্রেতা কুরবানীদাতা লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা : কোন গাভী বা বকরীর যদি নাপাক রক্ত খাওয়ার ব্যাপারে অভ্যাস থাকে এবং সর্বদাই যদি তা খায় তবে তা ঐ নাপাক পশুর জন্যও আয়েব বলে গণ্য হবে। আর যদি সপ্তাহের মধ্যে এক দুই বার খায় তবে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে না (আল ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

মুনতাকা গ্রন্থে আছে যে, কেউ কোন পশু খরিদ করার পর দেখল যে, সেটি মাছি খায়। যদি অধিকাংশ সময়ই উহা তা খায় তবে তা আয়েব রূপে গণ্য হবে। আর যদি কখনো কখনো খায় তবে তা আয়েব রূপে গণ্য হবে না (যহীরিয়া)। কেউ গাধা খরিদ করার পর দেখল যে, কয়েকটি গাধা এর উপর উঠে এর সাথে সংগমে লিপ্ত হয়েছে তাহলে এটি খরিদকৃত ঐ গাধার ক্ষেত্রে এমন আয়েব রূপে গণ্য হবে কিনা, যে আয়েবের কারণে সেটিকে ফেরত দেওয়া যাবে? উক্ত মাসআলা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এ জাতীয় ঘটনা একবার বুখারা শহরে সংঘটিত হয়েছে। তারপর এর সমাধান কি হবে, এ সম্পর্কে তৎকালীন মুফতী ও ইমামগণের নিকট ফাতওয়া তলব করা হল। কিন্তু তারা এ বিষয়ে একমত হতে পারলেন না। পরবর্তীতে ইমাম কাযী আবদুল মালিক হুসায়ন নাসাফী (র) এ সম্পর্কে নিম্নরূপ ফাতওয়া প্রদান করেন। তিনি বলেন, যদি অনন্যোপায় হয়ে সেটি এ কাজ করে তবে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে না। আর যদি সে নিজে নিজেকে এভাবে সমর্পন করে তবে তা আয়েব রূপে গণ্য হবে। তারপর ফকীহগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন (যখীরা)। **دخس** অর্থাৎ ঘোড়ার খুরের নীচে সৃষ্ট ফোলা আয়েব হবে (যহীরিয়া)। পশুর লেজ বাকা হওয়া আয়েবের মধ্যে গণ্য। **مشش** বা পশুর গোড়ালিতে নরম গ্রন্থি সৃষ্টি হওয়া আয়েব (মুহীত)। জন্তুর মুখ থেকে সর্বদা পানি বা লালার ঝরার কারণে যদি মূল্যহানি ঘটে তবে তা দোষ (মুহীত : আস-সারাখসী)। যে জন্তু রশি দ্বারা বেঁধে রাখলে কোন না কোন কৌশল অবলম্বন করে ঐ বাঁধন খুলে ছুটে যায়, এটি ঐ জন্তুর জন্য আয়েব হিসাবে গণ্য হবে (যহীরিয়া)। উভয় পা কাছাকাছি থাকা এবং রান দুটোর মধ্যে অস্বাভাবিক ফাঁক থাকা আয়েব রূপে গণ্য (মুহীত)। হারন (**الجموح**) অর্থাৎ অশ্ব মালিকের অনুগত না হওয়াও আয়েবের অন্তর্ভুক্ত। **الحرف** আয়েব হিসাবে গণ্য। এর মানে হল, লাগাম পরানোর সময় স্থিরভাবে না দাঁড়ানো (খুলাসা)। অশ্ব এবং অপরাপর জন্তুর গোড়ালির উপরের রঙে মাংস গ্রন্থির ন্যায় কিছু সৃষ্টি হওয়া অথবা গোড়ালির উপরের রঙ ফোলে যাওয়া আয়েব রূপে গণ্য। যাওয়ানিদ্ (**الزوائد**) আয়েব রূপে গণ্য। যাওয়ানিদ্ মানে রঙের বিভিন্ন মাথা আজায়া কাছে গিয়ে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। তদুপরি এর সাথে জড়িয়ে থাকা। আর আজায়া (**العجاية**) হল, উটের খুরের মধ্যস্থিত রঙ (যহীরিয়া)।

৪. মাসআলা : সাকাক **الصكك** আয়েব হিসাবে গণ্য। সাকাক মানে চলার সময় উভয় পায়ের নলা বা উভয় পায়ের মধ্যে ঘসা লাগা (মুহীত : আস-সারাখসী)। **المهقوع** (মাহকু) বস্ত্র আয়েবদার হিসাবে গণ্য। আসল গ্রন্থে এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ শব্দটি **هقعة** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পশুর বা দিকের সীনা সংলগ্ন গোল চক্র। সাধারণতঃ এটি সাদা রং এর হয়ে থাকে। একে মানুষ অশুভ বিষয় মনে করে। মুনতাকা গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, চলার সময় যে পশুর কোমর এবং পেশাবের মধ্যবর্তী স্থান থেকে আওয়াজ শুনা যায় এ জাতীয় পশুকে **مهقوع** বলা হয়। ইনতিশার অর্থাৎ ক্লান্তির সময় রঙ ফুলে যাওয়াও আয়েবের মধ্যে গণ্য। কারো কারো মতে ইনতিশার (**انشاء**) অর্থ চোখের কৃষ্ণাংশ ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে শুভ্রাংশ গ্রাসিত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়া (মুহীত)।

৫. মাসআলা : অশ্ব ক্রয় করার পর বয়স বেশী বলে ফেরত না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে ক্রয়কালে অল্প বয়স্কতার শর্ত থাকলে ফেরত দিতে পারবে। যেমন কোন দাসী খরিদ করার পর তাকে যদি অধিক বয়সী পাওয়া যায় তবে তাকে ফেরত দেওয়া জায়েয হয়ে থাকে (আল্ বাহরুর রায়িক)। “ফাতাওয়ায়ে আহ” তে উল্লেখ আছে, কেউ যদি এমন কোন গাভী খরিদ করে যা প্রায়শঃ ক্রেতার বাড়ি হতে বার বার বিক্রেতার বাড়িতে চলে যায় তবে তা আয়েব হিসাবে গণ্য হবে না। গোলাম যদি দুই তিনবার এরূপ করে তবে এটিও তার ক্ষেত্রে আয়েব হিসাবে গণ্য হবে না (তাতার খানিয়া)। কেউ যদি মুসররাত উষ্ট্রী অর্থাৎ অধিক দুধেল প্রমাণ করার জন্য যে উষ্ট্রীর ওলানে ছান দেওয়া হয়েছে এ জাতীয় উষ্ট্রী খরিদ করে (এবং পরে এ প্রতারণা সম্পর্কে জানতে পারে) তবে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। বস্ত্রত আমাদের মাযহাবে তাসরিয়া (**التصريه**) ওলানে ছান দেওয়া আয়েব নয়। যদি গোলামের আঙ্গুলে কালি লাগিয়ে রাখার কারণে ক্রেতা মনে করে যে, সে লিখতে জানে, অথবা গোলামকে বাবুটির পোশাক পরিয়ে বাজারে নেয়ার কারণে ক্রেতা মনে করল যে, সে রুটি বানাতে জানে (অথচ সে এ সব কিছুই জানে না) তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না (যহীরিয়া)। কোন ব্যক্তি মোজা খরিদ করার পর দেখল যে, তা এমন ছোট এবং সংকীর্ণ যে, এতে তার পা ঢুকে না। এ অবস্থায় উক্ত মোজার গুরাহা কিভাবে হবে, এ সম্বন্ধে শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা (র) বলেন, পায়ে কোন ত্রুটি থাকার কারণে যদি মোজার ভেতর পা না ঢুকে তবে ক্রেতা এ মোজা ফেরত দিতে পারবে না। আর যদি এরূপ কিছু না থাকে শুধু মোজা ছোট হওয়ার কারণেই তাতে পা ঢুকছে না তাহলে ক্রেতা এ মোজা ফেরত দিতে পারবে। শায়খুল ইসলাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্ন ফযল (র) বলেন, ক্রেতা যদি পরিধানের জন্য এ মোজা খরিদ করে থাকে তবে এ অবস্থায় সে তা ফেরত দিতে পারবে। আর যদি কোন উদ্দেশ্যে ছাড়াই (**مطلق**) খরিদ করে তবে ফেরত দিতে পারবে না। কাযী আলী সাখদী (র) সর্বাবস্থায়ই তা ফেরত যোগ্য বলে ফাতওয়া প্রদান করতেন। চাই সে মোজা পরিধানের উদ্দেশ্যে ক্রয় করুক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ক্রয় করুক। আর যদি মোজা দুটোর একটি অপরিষ্কার তুলনায় চাপা ও সংকীর্ণ হয় এবং মানুষের স্বাভাবিক মোজা যেমন হয় তা যদি তেমন না হয় তবে এই মোজা ফেরত দেওয়া যাবে। অন্যথায় ফেরত দেওয়া যাবে না (যহীরিয়া)। ক্রেতার পায়ের কোন সমস্যার কারণে নয় বরং অন্য কোন কারণে মোজার ভেতর পা ঢুকছে না এ অবস্থায় বিক্রেতা বলল, তুমি নিয়ে যাও। পায়ে দিলে বড় হয়ে যাবে। এই কথার ভিত্তিতে ক্রেতা যদি তা নিয়ে একদিন ব্যবহার করল কিন্তু তা বড় ও প্রশস্ত হলো না এক্ষেত্রে ক্রেতা এ মোজা ফেরত দিতে পারবে কিনা? এ জাতীয় এক ঘটনায় ফাতওয়া দিতে গিয়ে কোন কোন ইমাম বলেছেন যে, ফেরত দেওয়া যাবে না (আল্ ফুসলুল ইমাদিয়া)। মোজা ক্রয়ের পর দেখা গেল যে, লেফাফাসহ পায়ের ভেতর ঢোকে না কিন্তু লেফাফা ছাড়া ঢোকে তাহলে ক্রেতা ঐ মোজা ফেরত দিতে পারবে। যদি পরিধানের জন্য সে এ মোজা খরিদ করে থাকে (কিন্তু)। ফাতাওয়াল ফযলীতে উল্লেখ আছে যে, কেউ একটি জুকা ক্রয়ের পর দেখল যে, তাতে একটি মরা ইঁদুর আছে তাহলে যদি ইঁদুরটি বের করতে জুকার কোন ক্ষতি হয় তবে ফেরত দেয়া যাবে। আর যদি ইঁদুর বের করতে জুকা ফাড়ার কোন প্রয়োজন না হয় এবং এতে জুকার কোন ক্ষতি না হয় তাহলে তা আয়েব হবে না (খুলাসা)।

৬. মাসআলা : যখীরা গ্রহে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি একটি নাপাক কাপড় খরিদ করল কিন্তু ক্রয় করার সময় তার তা জানা ছিল না, (পরে জেনেছে) এহেন অবস্থায় এই কাপড় ধৌত করলে যদি এর কোন ক্ষতি না হয় তাহলে ফাতওয়ায়র জন্য যে, অভিমতটি পসন্দনীয় সে অভিমতের ভিত্তিতে ক্রেতা এ কাপড়টি ফেরত দিতে পারবে না (মুযমারাত)। যদি ক্রয়কৃত কাপড় তেল মাখানো থাকে তবে এটি ঐ কাপড়ের জন্য আয়েব হিসাবে গণ্য হবে। কেননা কাপড় তেল লাগলে তা সহজে যায় না। কাজেই এটি আয়েব হিসাবে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ একটি দোকান খরিদ করল এবং কবজা করার পর দেখল যে, এর দরজায় লেখা আছে, এই দোকান অমুক মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত, তাহলে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। কেননা এটি এমন এক আলামত যার উপর শরীআতের বিধি-বিধান নির্ভরশীল হতে পারে না (কিন্য়া)। কোন ব্যক্তির অপর কারো দোকানে থাকার জায়গা ছিল। তারপর সে তা বিক্রি করে দিল এবং ক্রেতাকে এ মর্মে অবহিত করল যে, দোকানের ভাড়া এত। পরে ক্রেতা জানতে পারল যে, এর ভাড়া তদপেক্ষা বেশী, এ ক্ষেত্রে ফকীহগণ বলেছেন যে, উক্ত কারণে ক্রেতা এই سكنى (থাকার জায়গা) ফেরত দিতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বিক্রিকৃত গৃহের তালার ছিদ্র যদি অপর কারো গৃহের দেওয়ালে থাকে তবে তা আয়েব বলে গণ্য হবে। এমনভাবে বিক্রিকৃত গৃহের দেওয়ালে যদি বড় ধরনের কোন ছিদ্র থাকে তবে তাও আয়েবের মধ্যে শামিল হবে (ওয়াজীয)।

৭. মাসআলা : কেউ কোন যমীন খরিদ করার পর জানতে পারল যে, মানুষ এটিকে অশুভ ও অকল্যাণকর জানে তবে ক্রেতার জন্য এই জমি ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয় (কিন্য়া)। কেউ যদি এমন গম খরিদ করে যা তাকে ইশারা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর সে তা কবজা করার পর দেখল যে, এগুলো নিম্নমানের তাহলে এই আয়েবের কারণে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। কোন ব্যক্তি রৌপ্যের নির্দিষ্ট কোন পাত্র খরিদ করল। তারপর তা কবজা করে দেখল যে, সেটি নিম্নমানের রৌপ্য দ্বারা তৈরি একটি পাত্র। তবে এতে কোন প্রকার ভাঙ্গন ও ভেজাল নেই তাহলে উক্ত নিম্নতা ও মন্দতা পরিমাপ ও ওজনের ক্ষেত্রে আয়েব হিসাবে ধর্তব্য হবে না (মুহীত)। যদি গম খরিদ করার পর দেখা যায় যে, তাতে ঘুন ধরেছে বা গমগুলো দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে তবে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ এই শর্তে রূপা খরিদ করল যে, এটি খুব শক্ত ও ওজনী হবে। তারপর ক্রেতা তা কবজা করে গলিয়ে দেখল যে, না, এটি তেমন শক্ত ও ওজনী নয় তবে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে। কেননা যা শর্ত করা হয়েছে তা না পাওয়াও এক প্রকারের আয়েব (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি তুলা খরিদ করে, তারপর এর সাথে মাটি মিশ্রিত পায় তবে তা কম হোক কি বেশী হোক ক্রেতা এই তুলা ফিরিয়ে দিতে পারবে (ওয়াজীয)। কেউ এক আটি শাক ক্রয়ের পর দেখল যে, এতে ঘাসও রয়েছে তাহলে দেখতে হবে যে, এই পরিমাণ ঘাসকে আয়েব মনে করা হয় কিনা? যদি আয়েব মনে করা হয় তাহলে ক্রেতা তা ফিরিয়ে দিতে পারবে। এমনভাবে কেউ যদি টুকরী ভর্তি ফল কিনার পর ফলের নীচে ঘাস পায় তবে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে। কেউ যদি গমের স্তূপ খরিদ করার পর দেখে যে,

উপরে সাদা ও লাল বর্ণের গম এবং নীচে কাল বর্ণের গম তাহলে ক্রেতা এই গম ফেরত দিতে পারবে (যখীরিয়া)। কোন ব্যক্তি একটি জমি খরিদ করল। তারপর দেখল যে, এর উপর দিয়ে মানুষের চলাচলের পথ, তাহলে দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে ক্রেতা ঐ জমি বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে। যদি কেউ আঙ্গুরের বাগান খরিদ করার পর দেখে যে, তাতে পিপড়ার বাঁসায় ভর্তি তাহলে ক্রেতা এ বাগান ফেরত দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি ক্রয়কৃত আঙ্গুরের বাগানে অন্য মানুষের চলাচলের পথ বা অন্য কারো পানির ড্রেন থাকে তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (খুলাসা)। কেউ আঙ্গুরের বাগান খরিদ করার পর দেখল যে, এক নলের মাধ্যমে এতে পানি সিঞ্চন করা হয় আর এই নলটি বসানো আছে কোন খালের মুখে বা অন্য কোন স্থানে তাহলে ক্রেতা এই বাগানটি ফেরত দিয়ে দিতে পারবে। এমনভাবে যদি বাগানের অবস্থা এমন হয় যে, খালের মুখ বন্ধ করা ব্যতীত তাতে পানি দেওয়া সম্ভব নয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (যখীরিয়া)। এমনভাবে খরিদকৃত বাগানের কোন প্রাচীর যদি শরীকী প্রাচীর হয় তবে এটিও আয়েব বলে গণ্য হবে। যদি প্রাচীরের ভিত্তি কাঁদা মাটি দ্বারা দেওয়া হয় এবং মানুষ যদি একে আয়েব মনে করে তবে তা আয়েব রূপে গণ্য হবে (খুলাসা)।

৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি এমন একটি বাড়ি খরিদ করল যে, বাড়ির পানি নিষ্কাশনের ড্রেন অন্যের ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত। পরে একথা প্রকাশ পেল যে, পানি নিষ্কাশনের ঐ ড্রেনটিতে ঐ ব্যক্তির কোন হক নেই। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়কালে একথা জানা ছিল না, এ অবস্থায় ক্রেতা এই বাড়িটি ফিরিয়ে দিতে পারবে। আর ইচ্ছা করলে তা রেখেও দিতে পারবে। রাখলে সে ক্ষতিপূরণ পাবে (কিন্য়া)। কেউ খেজুর বাগানসহ একটি জমি খরিদ করল। অথচ তাতে পানি সিঞ্চন করার কোন নালা নেই। কিন্তু ক্রয় করার সময় তার একথা জানা ছিল না তাহলে ক্রেতার খিয়ার হাসিল হবে (ওয়াজীয : আল কুরদূরী)। মুনতাকা কিতাবে আছে, কেউ কুরআন মজীদ খরিদ করার পর (তা কবজা করে) দেখল যে, এর অক্ষরগুলো কাটা অথবা কেউ এই শর্তে কুরআন মজীদ খরিদ করল যে, তাহলে পূর্ণ নোকতাওয়ালা। তারপর দেখা গেল যে, মাঝে মাঝে নোকতা নেই, তাহলে দোষযুক্ত হিসাবে ফেরত দেওয়া যাবে। উক্ত কিতাবে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, কেউ এই শর্তে কুরআন খরিদ করল যে, তাতে সমস্ত আয়াত আছে। কোন আয়াত বাদ নেই। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, তাতে দুই একটি আয়াত নেই, তাহলে এ অবস্থাও আয়েবের মধ্যে শামিল হবে এবং এ কারণে তা ফেরত দেওয়া যাবে। শায়খ (র) বলেন, আমি উক্ত কিতাবের অন্য স্থানে দেখেছি যে, কোন ব্যক্তি সন্তানের পড়ার জন্য কুরআন শরীফ খরিদ করল। তারপর তা উস্তাদের হাতে দেওয়ার পর তিনি বললেন, এতে বহু ভুল রয়েছে। এহেন অবস্থায় উক্ত কুরআন শরীফটি ফেরত দেওয়া যাবে কি না, এ সম্পর্কে ফকীহগণ বলেন, উক্ত কুরআন মজীদে বিদ্যমান ভুলগুলো যদি লেখার (প্রফের) ভুল হয় তবে ক্রেতা তা ফেরত দিয়ে তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত নিবে (মুহীত)।

৯. মাসআলা : খরিদা জমি ক্রেতার কবজায় আসার পর লবণাক্ত হয়ে গেল। পরে জানা গেল যে, বিক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায়ও এরূপ লবণাক্ত হয়ে যেত তাহলে জমি ফেরত

দেয়া যাবে কিন্তু জমি খরিদ করার পর ক্রেতা যদি যমীনের উপরিভাগ থেকে এক কোদাল পরিমাণ মাটি উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং এরপর তা লবণাক্ত হয় তবে মনে করা হবে যে, মাটি উত্তোলনের কারণে তা লবণাক্ত হয়েছে অথবা অন্য জায়গার লবণাক্ত পানি আসার ফলে এই মাটি লবণাক্ত হয়েছে, তাই এই অবস্থায় আর ঐ জমি ফেরত দেওয়া যাবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। ক্রেতার কবজায় আসার পর লবণাক্ততা বেড়েছে, না সমান আছে তা দেখা হবে না। বরং দেখা হবে যে, উভয় অবস্থার লবণাক্ততার কারণ অভিন্ন কি না। কারণ অভিন্ন হলে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে (মুহীত)। ক্রেতার কবজায় আসার পর আঙ্গুর বাগানে পুনরায় আর্দ্রতা দেখা দিল। যদি উভয় অবস্থায় দেখা দেয়া আর্দ্রতার কারণ অভিন্ন হয় তবে ক্রেতা এই বাগান ফিরিয়ে দিতে পারবে (আল্ ফাতাওয়াস সুগরা)।

১০. মাসআলা : কোন ব্যক্তি এই শর্তের উপর রুটি খরিদ করল যে, তা মিষ্টি পানি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কবজা করার পর জানা গেল যে, না এগুলো মিষ্টি পানি দ্বারা তৈরি করা হয়নি তাহলে ক্রেতা এই রুটি ফেরত দিতে পারবে। এমনি ভাবে শর্ত আরোপ না করা হলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (কিনয়া)। কেউ যদি মেহেদী বা এই জাতীয় কিছু এই শর্তে খরিদ করে যে, এর সবগুলোই অনুরূপই। অথচ কবজা করার পর দেখা গেল এগুলো দেখা বস্তুগুলোর অনুরূপ নয় তাহলে এগুলো ফেরত দিতে পারবে (খুলাসা)। কেউ পাঁচশত কাফীয গম খরিদ করল। তারপর ক্রেতা তা কবজা করার পর দেখল যে এর সাথে মাটি মিশ্রিত আছে। এ অবস্থায় মাটির পরিমাণ দেখতে হবে। গমের সাথে এ পরিমাণ মাটির মিশ্রণ স্বাভাবিক হয় এবং লোকেরা একে আয়েব মনে না করে তাহলে ক্রেতা এই গম ফেরত দিতে বা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না। আর মাটির পরিমাণ অস্বাভাবিক হয় এবং এ পরিমাণ মাটি থাকাকে লোকেরা আয়েব মনে করে, তাহলে সে সব গম ফেরত দিতে পারবে। যদি গম থেকে মাটি পৃথক করে বিক্রেতার নিকট হতে এ পরিমাণ মূল্য ফেরত নিতে চায় এবং নির্ভেজাল গম রেখে দিতে চায় তাহলে সে তা পারবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সে গমের থেকে মাটি আলাদা না করে থাকে। পক্ষান্তরে সে যদি গম থেকে মাটি আলাদা করে নিয়ে থাকে এবং মাটির পরিমাণ এমন বেশী হয় যে মানুষ একে আয়েব হিসাবে গণ্য করে তাহলে এর দুই অবস্থা হতে পারে। যদি গম ও মাটি একত্রিত করে খরিদকৃত মালের ওজন পূরা করে তা বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া যায় তবে সে তা ফেরত দিতে পারবে। আর যদি গমের থেকে মাটি পরিষ্কার করতে গিয়ে এর পরিমাণ কিছু কমে যায় এবং গম ও মাটি একত্রে মিশ্রিত করা সত্ত্বেও যদি ঐ পরিমাণ পূর্ণ না হয় তবে সে তা ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু ক্ষতিপূরণ উসূল করে নিতে পারবে। তা হল মাপে যে পরিমাণ গম কম হবে; এর মূল্য কিন্তু বিক্রেতা যদি স্বেচ্ছায় ঐ গম নিয়ে নিতে রাযী হয় তবে সে তা নিয়ে নিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, গম ছাড়া অন্যান্য বস্তুর হুকুমও গমের হুকুমের অনুরূপ হবে। যেমন তিল ইত্যাদি। অর্থাৎ তিল ইত্যাদি খরিদ করার পর যদি এতে মাটি পাওয়া যায় তবে এর হুকুম ও উপরোক্ত বিধান অনুসারে হবে (মুহীত)।

১১. মাসআলা : কেউ যদি তেল খরিদ করে এবং এতে গাদ পায় তবে এর হুকুম ও অনুরূপ হবে। সুতরাং এ অবস্থায় ক্রেতা শুধুমাত্র গাদ ফেরত দিতে পারবে না (খুলাসা)। কেউ

মিশ্ক খরিদ করার পর দেখল যে, এতে রাঙা মিশ্রিত আছে তাহলে এ অবস্থায় সে ঐ রাঙা মিশ্ক থেকে পৃথক করে এ পরিমাণ মূল্য বিক্রেতার নিকট থেকে আদায় করতঃ মিশ্ক নিয়ে নিবে। চাই রাঙা এর পরিমাণ কম হোক বা বেশী (যহীরিয়া)। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এ জাতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন যে, যে সব বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তু অল্প পরিমাণ মিশ্রিত থাকলে তা ধর্তব্য হয়না এ সব বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তু বেশী পরিমাণ মিশ্রিত থাকলে তা পৃথক করা যাবে না। অর্থাৎ পৃথক করে ক্রয় করা যায় না। আর যে সব বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তু অল্প মিশ্রিত হলেও তা ধর্তব্য হয় সে সব বস্তুর ক্ষেত্রে অন্য বস্তু অধিক মিশ্রিত থাকলে তা পৃথক করা যাবে। অর্থাৎ পৃথক করে তা ক্রয় করা যাবে। মিশ্কের মধ্যে রাঙা অল্প পরিমাণ মিশ্রিত হলেও যেহেতু তা ধর্তব্য হয়। সুতরাং অধিক পরিমাণ মিশ্রিত হলে তা পৃথক করা হবে। আর মাটি অল্প পরিমাণ মিশ্রিত হলে তা ধর্তব্য হয় না। কাজেই অধিক পরিমাণ মিশ্রিত হলে একে পৃথক করা যাবে না। অধিকাংশ মাশায়েখে কিরাম এই রিওয়াযটি গ্রহণ করেছেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ শুষ্ক চর্বি খরিদ করার পর দেখল যে, এতে প্রচুর লবণ রয়েছে তাহলে গমের মধ্যে মাটি মিশ্রিত থাকলে যে হুকুম এ ক্ষেত্রেও অস্বরূপ হুকুম হবে (মুহীত)। ফাতাওয়ায়ে আবুল লাইসের মধ্যে উল্লেখ আছে যে, কেউ তামার ক্রান টুকরা খরিদ করার পর তা গলাল। তারপর দেখল যে, এর থেকে পাথর নুড়ি বের হচ্ছে যেমন তাম্র থেকে পাথর নুড়ি বের হয়ে থাকে তাহলে ক্রেতার জন্য পাথর পরিমাণ মূল্য কেটে রাখা জায়েয হবে। কিন্তু বিক্রেতা যদি বিক্রিতমাল পুরাপুরি ফেরত নিয়ে ক্রেতাকে তার দেওয়া মূল্য ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয় তবে সে তাও করতে পারবে (যখীরা)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : কোন্ দোষ ফেরত দেয়া যায় এবং যায় না তদ্রূপ ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায় বা যায় না।

১. মাসআলা : এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, ক্রেতা কোন ক্রয় করার পর এর আয়ত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পরও যদি তাতে মালিকানা সুলভ কোন আচরণ বা ব্যবহার করে তাহলে তার ঐ বস্তু ফেরত দেওয়ার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। যদি কেউ চতুষ্পদ জন্তু খরিদ করার পর তাতে কোন আয়েব তথা জখম দেখতে পায় এবং পরে এর জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বা নিজ প্রয়োজনে এর উপর সওয়ার হয় তবে সে আর এই পশুটি ফেরত দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পর পশুটি যদি ভাল হয়ে যায়, তারপর আবার কোন দোষ হয়ে যায় যা থেকে এখনো সেটি ভাল হয়নি তাহলে ক্রেতা এটিকে ফেরত দিতে পারবে (মুহীত)। একবার খিদমত গ্রহণ করা, দোষ গ্রহণ করে নেয়া বুঝায় না, তবে বলপূর্বক খেদমত নেয়া দোষ সম্পর্কে সম্মতি প্রমাণ করে। ক্রেতা আর একাধিকবার খিদমত গ্রহণ আয়েবের উপর রাযী হওয়া প্রমাণ করে এর উপরই এর ফাতওয়া (মুযমারাত)। কিতাবুল ইজারায় খিদমত গ্রহণ করার ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, ক্রেতা যদি দাস-দাসীকে কোন বোঝা ছাদের উপর নিয়ে যাওয়া বা ছাদ থেকে তা নামানোর হুকুম করে অথবা দাসীকে নিষ্কাম অবস্থায় পা দাবাতে বলে অথবা সামান্য পরিমাণ খানা বা রুটি পাকাতে বলে তবে তা আয়েবের উপর রাযী হওয়ার নিদর্শন হবে না। কিন্তু যদি স্বাভাবিক অবস্থা হতে অধিক

পরিমাণে খানা বা রুটি পাকনোর জন্য বলে তবে তা আয়েবের উপর রাখী হওয়া বরে প্রমাণিত হবে (যখীরা)।

২. মাসআলা : ক্রেতা যদি সওয়ারী পশুর চলার গতি পরীক্ষা করে দেখার জন্য তার পৃষ্ঠে আরোহণ করে অথবা কাপড়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ পরীক্ষা করে দেখার জন্য তা ব্যবহার করে তবে এটি তার সম্মতির পরিচায়ক বলে গণ্য হবে (মুহীত)। পক্ষান্তরে পশুটিকে ফেরত দেওয়ার জন্য অথবা তাকে পানি পান করানোর জন্য অথবা তার খাদ্য তথা ঘাস ইত্যাদি খরিদ করার জন্য তার পৃষ্ঠে আরোহণ করে তবে এটি সম্মতি রূপে গণ্য হবে না। যদি সওয়ারীর পৃষ্ঠে আরোহণ করা ব্যতীত তার অন্য কোন উপায় না থাকে। যেমন সফর অনেক দূরের অথবা লোকটি হাঁটা-চলা করতে অক্ষম অথবা ঘাস কেবল মাত্র এক পাত্রে অর্থাৎ এক প্রান্তে আছে। কিন্তু ঘাস যদি দুই পাত্রে অর্থাৎ দুই প্রান্তে থাকে এবং তার সওয়ার হওয়ার কোন প্রয়োজন না থাকে, তা সত্ত্বেও সে যদি তাতে সওয়ার হয় তবে এটি তার সম্মতিরূপে গণ্য হবে (সিরাজিয়া)। যদি ক্রয়কৃত পশুর উপর সওয়ার হয়ে অন্য কোন পশুর জন্য ঘাস-পানির বোঝা নিয়ে আসে অথবা এর উপর নিজে সওয়ার না হয়ে শুধু মাত্র অন্য পশুর জন্য ঘাসের বোঝা নিয়ে আসে তাহলে এ কাজ তার সম্মতি রূপে গণ্য হবে (যখীরা)। খরিদকৃত বস্ত্র যদি বাড়ি-ঘর জাতীয় জিনিস হয় এবং এর আয়েব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পরও ক্রেতা যদি তাতে বসবাস করে অথবা তা মেরামত করে বা ঐ বাড়িটি ধসিয়ে দেয় তাহলে তার বিয়ার রহিত হয়ে যাব (বাদায়ে)।

৩. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি দুগ্ধবতী ক্রয় দাসী করল। তারপর সে তার মধ্যে আয়েব দেখতে পেল। তা সত্ত্বেও সে ঐ দাসীকে হুকুম করল যেন সে কোন বাচ্চাকে দুধ পান করায় তাহলে এটি তার সম্মতি বলে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি তার দুগ্ধ দোহন করে কোন বাচ্চাকে পান করা হয় বা বিক্রি করে দেওয়া হয় তবে তা সম্মতি বলে গণ্য হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। যদি দুগ্ধ দোহন করে তা বিক্রি না করা হয় এবং তা কাউকে পাওয়ানও না হয় তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। “সুলহুল ফাতাওয়া” গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, খাওয়া এবং বিক্রি ছাড়া শুধু দুগ্ধ দোহন করা সম্মতি বলে গণ্য হবে না (মুহীত)। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি দুগ্ধবতী দাসী খরিদ করল। তারপর সে তার বাচ্চাকে অথবা ক্রেতার বাচ্চাকে দুধ পান করাল। এরপর ক্রেতা তার মধ্যে আয়েব দেখতে পেল তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। যদি ক্রেতা এর দুগ্ধ দোহন করে তা নষ্ট করে দেয় বা পান করার কাজে লাগায়, তারপর ক্রেতা কোন আয়েব দেখতে পায় তবে সে তা ফেরত দিতে পারবে না (যখীরিয়া)।

৪. মাসআলা : কোন খরিদা গাভীর দুধ পান করার পর গাভীর কোন দোষ জানতে পারলে ফেরত দিতে পারবে না। বরং ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে (আল্ ফুসুলুল ইমাদিয়া)। কোন ব্যক্তি বাছুরসহ একটি গাভী বা বকরী খরিদ করল। তারপর সে এর আয়েব সম্পর্কে অবগত হল। তারপর বাছুর গাভী বা বকরীর দুধ পান করল এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ফেরত দিতে পারবে। বাছুরটিকে ক্রেতা নিজে ছেড়ে দিয়ে থাকলেও দোষের উপর ক্রেতার সম্মতি সাব্যস্ত হবে না।

পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি গাভীর দোষ জানার পর দুগ্ধ দোহন করে নিজে পান করে বা তার বাচ্চাকে পান করায় তাহলে এতে আয়েবের ব্যাপারে তার সম্মতি আছে বলে প্রমাণিত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কোন ক্রেতা খরিদকৃত পশুর পশম কর্তন করে, তারপর তাতে আয়েব দেখতে পায়, তাহলে এ অবস্থায় দেখতে হবে যে, এতে পশুর কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা? যদি ক্ষতি না হয়ে থাকে তবে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, পশম কর্তন করা আমার নিকট কোন লোকসানের বিষয় নয়। মুনতাকা গ্রন্থের অন্য এক জায়গায় আছে যে, খরিদকৃত পশুর আয়েবের ব্যাপারে জানার পরও ক্রেতা যদি এর পশম কর্তন করে তবে তা আয়েবের ব্যাপারে সম্মতি বরে প্রমাণিত হবে। কিন্তু ক্রেতা যদি এর কোন রং কেটে নেয় তবে এটি তার আয়েবের ব্যাপারে সম্মতি বলে প্রমাণিত হবে না (মুহীত)। শায়খ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কেউ আঙ্গুরের বাগান খরিদ করল। তারপর তার কবজায় অবস্থায় তাতে ফল ধরল। সে ঐ ফল তুলে এনে যমীনে রাখল। ইত্যবসরে সে ঐ বাগানের কোন দোষ জানল, যা আগে জানতো না, এর হুকুম কী? সে শায়খ (র) বলেন, ফল পাড়ার কারণে বাগানের ক্ষতি না হলে বাগান ফেরত দিতে পারবে (আল্ ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

৫. মাসআলা : ‘বাজলী’ জানার শর্তে দাসী ক্রয় করা জায়েয আছে। তবে পরে যদি শর্ত না পাওয়া যায় তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবেনা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। গোলাম খরিদ করার পর তাতে দোষ পাওয়া গেল তারপর ক্রেতা তাকে প্রহার করল, এক্ষেত্রে যদি তার শরীরে প্রহারের দাগ পড়ে থাকে তাহলে তা ফেরত দিতে পারবে না। এবং ক্ষতি পূরণও পাবে না। ক্রেতা যদি খরিদকৃত গোলামের গায়ে চাপেটাঘাত করে অথবা দু তিন ঘা বেত মারে এবং তার শরীরে এর কোন দাগ না থাকে তাহলে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না (আল্ ফুসুলুল ইমাদিয়া)। কেউ যদি এমন গোলাম খরিদ করল যার চোখে সাদা দাগ রয়েছে। তারপর ক্রেতা-বিক্রেতা কে এর কারণ জিজ্ঞেস করল। জবাবে সে বলল, এটি কোন রোগ নয়, বরং প্রহারের কারণে এরূপ হয়েছে। দিন দশেকের মধ্যে তা ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু দশদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দেখা গেল যে, তার ঐ রোগ ভাল হয়নি, তাহলে তাকে ফেরত দেওয়া যাবে না (কিন্য়া)। আলী ইব্ন আহমদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করল। এর তিনদিন পর সে দাবী করল যে, তার কাশি আছে। ক্রেতার এই দাবীর পরও ঐ গোলাম যদি তার নিকট এক মাস বা ততোধিক সময় থাকে এবং সে তাকে কাজে ব্যবহার করে, এ অবস্থায়ও ক্রেতা যদি দাবী করে যে, তার কাশি আছে, তাহলে এ আয়েবের কারণে ক্রেতা গোলামকে ফেরত দিতে পারবে কিনা? জবাবে শায়খ বলেন, আয়েব সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ও ক্রেতা যদি তাকে কাজে ব্যবহার করে তবে এটি তার সম্মতি বলে গণ্য হবে (তাতার খানিয়াঃ ইয়াতীমা গ্রন্থের সূত্রে)।

৬. মাসআলা : কেউ যদি কোন দাসী খরিদ করে এবং পরে তার সাথে সঙ্গম করে; তারপর সে তার মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় তাহলে এ আয়েবের কারণে ক্রেতা তাকে

১. রং কাটার মানে হল, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রং কেটে তা থেকে রক্ত বহিয়ে সে রক্ত দ্বারা শরীরের কোন স্থানে দাগ দেওয়া।

ফেরত দিতে পারবে না। তবে সে ক্ষতিপূরণ পাবে। চাই সে দাসী কুমারী হোক বা অকুমারী হোক। তবে বিক্রেতা এ অবস্থায় ফেরত নিতে রাযী হলে ফেরত দিতে পারবে। তদ্রূপ ক্রেতা যদি দাসীকে সকাম চুম্বন করে বা স্পর্শ করে তবে এ ক্ষেত্রেও একই হুকুম ক্রেতা যদি জানার পরও দাসীর সাথে সঙ্গম করে অথবা তাকে সকাম চুম্বন বা স্পর্শ করে তবে এটি তার সম্মতি বলে গণ্য হবে। সুতরাং ফেরত দিতে বা ক্ষতিপূরণ চাইতে পারবে না। দাসী ক্রেতার কবজায় অন্য কেউ তার সাথে যিনার করলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। চাই সে কুমারী হোক বা অকুমারী হোক। তবে দোষের ক্ষতিপূরণ উসূল করতে পারবে। কিন্তু বিক্রেতা যদি এই অবস্থায় তাকে ফেরত নিতে সম্মত হয় তবে তাকে ফেরত দেওয়া যাবে। যদি উক্ত দাসীর সাথে অপর কোন ব্যক্তি সন্দেহজনিত ভাবে সহবাস করে এবং এর ফলে তার উপর উকর (ব্যভিচারের পারিশ্রমিক)। ওয়াজিব হয় তবে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। বিক্রেতা ফেরত নিতে সম্মত হলেও পারবেনা (মুহীত)। কেউ যদি দাসী খরিদ করে তাকে বিবাহ দিয়ে দেয় তবে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। চাই দাসীর স্বামী তার সাথে সঙ্গম করুক বা না করুক এবং চাই বিক্রেতা তাকে ফেরত গ্রহণ করার ব্যাপারে রাযী হোক বা না হোক (মুযমারাত)। তবে সে ক্ষতিপূরণ পাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। দাসী বিক্রেতার নিকট থাকা কালেই তার স্বামী ছিল, এই স্বামী যদি ক্রেতার কবজায় আসার পর তার সাথে সঙ্গম করে এবং ঐ দাসী যদি সাযিয়া (অকুমারী) হয় এবং এ সহবাসের কারণে তার যদি ক্ষতি হয় ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু বিক্রেতা সম্মত থাকলে ফেরত দিতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি সহবাসের কারণে তার কোন ক্ষতি না হয় তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। সাযিয়ার ক্ষেত্রে এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় স্বামী তার সাথে একবার সহবাস করে এবং ক্রেতার নিকট যাওয়ার পর পুনরায় তার সাথে সে সহবাস করে। পক্ষান্তরে যদি তার নিকট থাকা অবস্থায় তার সাথে সহবাস না করা হয় শুধুমাত্র ক্রেতার নিকট যাওয়ার পর তার সাথে সহবাস করা হয় তবে এর সমাধান কি হবে, 'আসল' গ্রন্থে এ সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ সম্বন্ধে মাশাইখে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিদ্বান মতানুসারে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে (মুযমারাত : নিসাব গ্রন্থের সূত্রে)। আর দাসী যদি কুমারী হয় তবে তাকে ফেরত দেওয়া যাবে না। কিন্তু ক্ষতিপূরণ পাবে। কিন্তু বিক্রেতা যদি বলে, এ অবস্থায়ই আমি তা নিতে রাযী আছি তবে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে (মুহীত : সারাখাসী)।

৭. মাসআলা : কেউ যদি কুন্দা বা বন্ধুর বাট বানানোর জন্য একটি কাঠখণ্ড খরিদ করে এবং ক্রয় চুক্তির মধ্যে এর শর্ত আরোপ করে তারপর তা রাতের বেলায় কর্তন করে ক্রেতা এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, এর মধ্যে কোন আয়েব নেই। পরবর্তীতে আবার নতুন করে শর্তহীনভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে এবং দিনের বেলায় এর প্রতি নজর করে দেখে যে, এতে আয়েব আছে, তাহলে ক্রেতা এই মাল ফেরত দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ একটি ঘোড়া খরিদ করার পর সেটিকে খাসী করে দিল। তারপর তাতে আয়েব দেখতে পেল তাহলে সে তা ফেরত দিতে পারবে যদি খাসী করানোর কারণে এর কোন ক্ষতি না হয়

(ফাতাওয়ায়ে আহলে সমরকন্দের মধ্যে অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ইমাম শায়খ যহীরুদ্দীন (র)-এর বিপরীত ফাতওয়া প্রদান করেন (যহীরিয়া)। কেউ যদি খাবার জাতীয় বস্তু খরিদ করে এর কিয়দংশ খেয়ে নেয় তারপর তাতে আয়েব দেখতে পায় তবে সে যে পরিমাণ খাদ্য খেয়েছে এর মধ্যে আয়েব জনিত কারণে যে লোকসান ছিল এই লোকসানের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ সে আদায় করে নিবে এবং বাকী খাদ্যগুলো ফেরত দিয়ে দিবে। এটি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। এমনিভাবে ক্রেতা যদি খরিদকৃত খাদ্য দ্রব্যের অর্ধেক বিক্রির জন্য পেশ করে তবে সে বাকী খাদ্য দ্রব্য ফিরিয়ে দিতে পারবে। এমনি ভাবে ক্রেতা যদি কিছু মাল বিক্রি করে দেয় এবং লোকসানের কোন ক্ষতিপূরণ উসূল না করে তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বাকী মাল সে ফেরত দিতে পারবে। এর উপরই ফাতাওয়া। কেউ আটা খরিদ করে এর কিছু পরিমাণ দ্বারা রুটি বানিয়ে খেয়ে দেখল যে, আটাগুলো সম্পূর্ণ তিতা তাহলে যে পরিমাণ আটা বাকী আছে এর মূল্য আদায় করে তা ফেরত দিয়ে দিবে। আর যে পরিমাণ নষ্ট হয়েছে এই পরিমাণের ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। এটি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। এটিকেই ফকীহ (র) গ্রহণ করেছেন (খুলাসা)। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি আটাগুলো একই পাত্রে থাকে, দুই পাত্রে না থাকে। পক্ষান্তরে আটাগুলো যদি দুই ব্যাগের বা টুকরীর দুই পাত্রে থাকে এবং ক্রেতা এক পাত্রের আটা থেকে ভক্ষণ কবে বা বিক্রি করে, তারপর বিক্রেতার নিকটের কোন আয়েবের ব্যাপারে সে অবহিত হয় তাহলে সমস্ত ইমামের মতে যে পরিমাণ মাল বাকী আছে এর মূল্য উসূল করে ক্রেতা তা বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা : কেউ একটি কাপড় খরিদ করল, তারপর দেখল যে, কাপড়টি বেশ ছোট, কাটাই সম্ভব নয়। এ কারণে সে তা ফেরত দেওয়ার সংকল্প করল। তখন বিক্রেতা তাকে বলল, কাপড়টি দর্জিকে দেখাও। যদি সে এটি কেটে কোন কিছু তৈরি করতে পারে তবে তো ভাল। না পারলে তখন তা আমার কাছে ফেরত দিয়ে দাও। এরপর সে দর্জিকে কাপড়টি দেখালো। দর্জি দেখলো যে, কাপড়টি এমন ছোট যে এটি কাটাই যাবে না, তাহলে ক্রেতা এই কাপড়টি ফিরিয়ে দিতে পারবে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)। মোজা এবং টুপীর হুকুমও অনুরূপই (আল ইয়ানাবি)। এমনিভাবে ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে অচল টাকা দিয়ে বলে যে, এগুলো খরচ কর, যদি চলে যায় তবে তো ভাল। আর না চললে, আমাকে দিয়ে দিবে। তারপর বিক্রেতা বলল, এই শর্তে আমি এগুলো নিয়ে নিলাম। পরে দেখা গেল যে, সে এগুলো আর চালাতে পারল না, তাহলে সূক্ষ্ম ক্রিয়াসের দৃষ্টিতে এগুলো ফেরত দিতে পারবে। বিষয়টি নাওয়াযিল গ্রন্থের সুলেহ অধ্যায় এর অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে (যহীরিয়া)। ক্রেতা খরিদকৃত বস্তুকে আয়েবদার অবস্থায় পেল, তখন বিক্রেতা তাকে বলল, এটিকে বিক্রি করে দাও। যদি কেউ তা খরিদ করে নেয় তবে ভাল। অন্যথায় আমাকে ফেরত দিয়ে দিবে। তারপর ক্রেতা তা বিক্রির জন্য পেশ করল, কিন্তু কেউ তা খরিদ করল না তাহলে সে তা ফেরত দিতে পারবে না (আল ফাতাওয়াস সুগরা)। কোন ব্যক্তি গোলাম খরিদ করার পর বিক্রেতার সাথে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ইকাল (ভঙ্গ) করতে চাইল, কিন্তু সে এতে অসম্মতি প্রকাশ

করল তাহলে এটি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পেশ করা বলে গণ্য হবে না। কাজেই ক্রেতা একে ফেরত দিতে পারবে (যহীরিয়া)।

৯. মাসআলা : কোন ব্যক্তি কাপড় খরিদ করে জামা তৈরি করার জন্য তা কেটে নিল। কিন্তু এখনো সেলাই শুরু করেনি। এহেন অবস্থায় যদি ঐ কাপড়ে ক্রেতা যদি কোন আয়েব পায় তবে ক্রেতা এ কাপড় ফেরত দিতে পারবে না। উক্ত অবস্থায় বিক্রেতা যদি বলে এই কাপড় আমি ফেরত নিতে রাখি। তাহলে বিক্রেতা তা ফেরত নিতে পারবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি ঐ কাপড় বিক্রি করে দেয় তবে সে নিজেই তার ফেরত দেওয়ার হক বাতিল করে দিয়েছে বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সে আর কোন ক্ষতিপূরণ ফেরত পাবে না। চাই সে এ আয়েবের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক। আর যদি জামা সেলাই করে নেওয়ার পর আয়েবের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক। আর যদি জামা সেলাই করে নেওয়ার পর ক্রেতা তাতে আয়েব দেখতে পায় তাহলে আয়েবজনিত ক্ষতিপূরণ সে বিক্রেতার নিকট হতে আদায় করে নিবে। মাল ফেরত দেওয়া যাবে না। বিক্রেতা যদি বলে, এ অবস্থায়ও আমি তা ফেরত নিতে রাখি তাহলে সে তা ফেরত নিতে পারবে না (জামে সগীর)। ছাড়া যদি ঘি বা মধু দ্বারা মাখানো হয় তবে এ ক্ষেত্রে ও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুয়মারাত)। কেউ যদি ক্রয়কৃত বস্তুর আয়েব সম্বন্ধে জানা সত্ত্বেও তা বিক্রয়ের জন্য পেশ করে অথবা ইজারা দেয় কিংবা কারো কাছে বন্ধক রাখে তাহলে এসব কাজ আয়েবের ব্যাপারে সম্মতি বলে গণ্য হবে। কাজেই এ অবস্থায় সে উক্ত বস্তুর আয়েবের কারণে ফেরত দিতে পারবে না এবং আয়েবের কারণে ক্ষতিপূরণ ও পাবে না (যখীরা)।

১০. মাসআলা : 'কুদুরী' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি কোন বস্তু খরিদ করে তা কারো কাছে ইজারা প্রদান করে, তারপর সে এতে আছে বলে জ্ঞাত হয় তাহলে সে ইজারা ভঙ্গ করে ঐ বস্তু ফিরিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু যদি এ জাতীয় বস্তু কারো কাছে বন্ধক রাখে তবে এর হুকুম ভিন্ন তর হবে (যহীরিয়া)। যদি আয়েবের কথা জানার পরও ক্রয়কৃত বস্তু কাউকে হিবা করে দেয়, কিন্তু এখনো তা সোপর্দ করেনি তবে ক্রেতা তা বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না। আর যদি আয়েবের কথা জানার পূর্বে ক্রয়কৃত বস্তু বিক্রয়ের জন্য পেশ করে কিংবা কাউকে হিবা করে কিন্তু হস্তান্তর না করে তাহলে এটি তার সম্মতি বলে গণ্য হবে না (যখীরা)। খরিদা গোলাম কবজা করার পর কাউকে হিবা করল এবং হস্তান্তর ও করল। এরপর আদালতের ফায়সালা ছাড়াই হিবা ফেরত নিয়ে নিল। তারপর ক্রয় কালের কোন দোষ জানতে পারল তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ফেরত দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : উল্লেখ্য যে, বিক্রিত বস্তুর মধ্যে কোন কিছু বৃদ্ধি পাওয়া দুই প্রকার (১) সংযুক্ত বৃদ্ধি (২) বিযুক্ত বৃদ্ধি। সংযুক্ত বৃদ্ধি আবার দুই প্রকার। (১) বিক্রয় দ্রব্যের শরীর থেকে উদ্ভূত নয়। যেমন রং প্রয়োগ ইত্যাদি। সবার মতেই এটা দোষজনিত কারণে ফেরত দেয়ার প্রতিবন্ধক। এমন কি বিক্রেতা ফেরত নিতে রাখী হলেও। (২) 'বিক্রয় দ্রব্য' এর শরীর থেকে উদ্ভূত খরিদা দাস-দাসী বা পশুর পুষ্টি বৃদ্ধি অথবা চেহারার সৌন্দর্য

বৃদ্ধি অথবা চোখের দৃষ্টি বৃদ্ধি। যহীরী রিওয়ায়াত মতে এগুলো দোষজনিত কারণে ফেরত দেওয়ার প্রতিবন্ধক নয় (যহীরিয়া)। এটিই সহীহ অভিমত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক্ষেত্রে ক্রেতা যদি ফেরত না দিয়ে পূরণ নিতে চায় আর বিক্রেতা না দিয়ে বিক্রয় দ্রব্য ফেরত নিতে চায় ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে বিক্রেতার এ অধিকার থাকবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত ভিন্ন (যহীরিয়া)। বিযুক্ত বৃদ্ধি আবার দুই প্রকার। (১) বিক্রয় দ্রব্যের শরীর থেকে সৃষ্ট যেমন দাসীর বাচ্চা এবং বৃক্ষের ফল কিংবা অনুরূপ কিছু। যেমন যখমের ক্ষতিপূরণ এবং উকর সহবাসের দণ্ড ইত্যাদি। আমাদের মাযহাবে এগুলো দোষজনিত কারণে মূল বস্তুকে ফেরত দেয়ার প্রতিবন্ধক। (২) বিক্রয় দ্রব্যের শরীর থেকে উদ্ভূত নয়। গোলামের উপার্জন, বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি। এগুলো আয়েবের কারণে খরিদা বস্তুকে ফেরত দেয়ার নয়।

এ অবস্থায় ফেরত দেওয়ার নিয়ম এই বর্ধিত বস্তুটির ক্ষেত্রে নয় বরং মূল বস্তুর ক্ষেত্রে ক্রয় চুক্তি বাতিল করবে। তারপর কোন রূপ বিনিময় ছাড়াই বিনামূল্যে বর্ধিত বস্তুটিকে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দিবে (মুহীত)।

১২. মাসআলা। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি এই বর্ধিত অংশ ক্রেতার হাতে বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে ঐ বর্ধিত অংশটুকু যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে দেখতে হবে যে এটি ধ্বংস হয়েছে কেন? যদি আসমানী বিপদের কারণে ধ্বংস হয়ে থাকে তবে আয়েবের কারণে সে আসল বস্তু ফেরত দিতে পারবে। আর এই অতিরিক্ত পরিমাণের হওয়ার বিষয়টি না হওয়ার মত বলেই গণ্য হবে। আর তা যদি ক্রেতার হস্তক্ষেপের কারণে নষ্ট বা ধ্বংস হয় তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে সে ইচ্ছা করলে সে এই বিষয়টি কবুল করে নিয়ে ক্রেতার নিকট এর পূর্ণ মূল্য হস্তান্তর করে দিবে। আর ইচ্ছা করলে তা কবুল না করে আয়েব জনিত ক্ষতিপূরণ তাকে দিয়ে দিবে। ক্রয়কৃত বস্তুটি যদি বাইরের কোন মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে তবে ক্রেতা ঐ বস্তুটি ফেরত দিতে পারবে না। তবে আয়েব জনিত ক্ষতিপূরণ উসুল করে নিবে (বাদায়ে)। উল্লেখ্য যে, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি খরিদ কৃত বস্তু কবজা করার পর এই বৃদ্ধি হাসিল হয়। পক্ষান্তরে যদি কবজা করার আগে এই অবস্থা হয় এবং বর্ধিত বস্তুটি যদি মূল বস্তুর সাথে সংযুক্ত থাকে ও তার থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে তবে এই অতিরিক্ততা ক্রয়কৃত বস্তু ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। আর বর্ধিত ও অতিরিক্ত বস্তু যদি মূল বস্তুর সাথে সংযুক্ত থাকে, কিন্তু এর থেকে সৃষ্ট না হয় তবে এতে ক্রেতা কে ঐ বস্তুটির উপর কবজাকারী বলে গণ্য করা হবে। আর অতিরিক্ত যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে তা কবজার পর সৃষ্ট হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। কাজেই এ অবস্থায় খরিদ কৃত বস্তুটি ফেরত দেওয়া যাবে না। বরং সে এর ক্ষতিপূরণ উসুল করে নিবে। যদি বর্ধিত ও অতিরিক্ত বস্তুটি মূল বস্তুর সাথে সংযুক্ত না থাকে, কিন্তু মূল বস্তু থেকেই সৃষ্ট হয়ে থাকে, যেমন বাচ্চা, পশম, দুধ, ফল, মারশ, 'উকর' ইত্যাদি। এ জাতীয় অতিরিক্ততা ক্রয়কৃত বস্তু ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। ক্রেতা ইচ্ছা করলে উভয় বস্তু পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে রেখে দিতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে ফেরতও দিতে পারবে। (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)।

১৩. মাসআলা : যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত মূল বস্তুর মধ্যে কোন আয়েব না পায় বরং অতিরিক্ত বস্তুর মধ্যে আয়েব পায় তাহলে সে ঐ বস্তুটি ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু যদি এই অতিরিক্ত অংশ কবজার আগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তা যদি খরিদ কৃত মূল বস্তুর মধ্যে ক্ষতি সাধন করে তবে খরিদকৃত বস্তুতে ক্ষতি সাধিত হওয়ার কারণে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে (শরহত তাহাবী)। যদি ক্রেতা মূল বস্তু এবং বর্ধিত বস্তু উভয়টি কবজা করার পর খরিদকৃত বস্তুতে দোষ দেখতে পায় তাহলে ক্রেতা এর সমপরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে বস্তুটি ফেরত দিতে পারবে। কেননা বর্ধিত অংশটি কবজা করার পর এর মুকাবিলায়ও মূল্যের একটি অংশ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। কাজেই মূল্য হারাহারিভাবে এতদুভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে। যদি বর্ধিত অংশের মধ্যে আয়েব পাওয়া যায় তবে হারাহারিভাবে এর মুকাবিলায় যে পরিমাণ মূল্য সাব্যস্ত হবে ঐ মূল্যের বিনিময়ে এটিকে বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে (কিন্য়া)। যদি বর্ধিত ও অতিরিক্ত অংশটি মূল বস্তুর সাথে সংযুক্ত না হয় এবং মূল বস্তু থেকে সৃষ্টও না হয় যেমন উপার্জন ও হিবা ইত্যাদি, তবে এই প্রকার অতিরিক্ত বস্তু ক্রয়কৃত বস্তুকে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মূল বস্তুটি ফেরত দেওয়ার পর অতিরিক্ত বস্তুটি ক্রেতার বলে গণ্য হবে। তবে এটি খাওয়া ও ভোগ করা তার জন্য জায়েয হবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে বিক্রেতা এই অতিরিক্ত পরিমাণের মালিক হবে। তবে তা খাওয়া ও ভোগ করা তার জন্য জায়েয হবে না। আর ক্রেতা যদি দোষ মেনে নিয়ে ক্রয়কৃত বস্তু গ্রহণ করে নেয় তবে ফকীহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে এ অবস্থার অতিরিক্ত বস্তু সহ মূল বস্তুর মালিক ক্রেতাই হবে। তবে এ মাল ব্যবহার করা তার জন্য জায়েয হবে না (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)। ক্রয়কৃত বস্তু অতিরিক্ত বস্তুসহ কবজা করে নেওয়ার পর ক্রেতা যদি ততে আয়েব দেখতে পায় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতানুসারে সে শুধু মাত্র মূল বস্তুটি পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে ফেরত দিয়ে দিবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে অতিরিক্ত বস্তুসহ মূল বস্তুটি ফেরত প্রদান করবে। আর যদি অতিরিক্ত ও বর্ধিত অংশে আয়েব দেখতে পায় তবে ঐ অতিরিক্ত বস্তু ফেরত দিতে পারবে না। যদি অতিরিক্ত ও বর্ধিত অংশ ধ্বংস হয়ে যায় আর মূল বস্তুটি আয়েবদার হয়ে যায় তবে ফকীহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্রেতা পূর্ণ-মূল্যের বিনিময়ে শুধুমাত্র মূল বস্তুটি ফেরত দিয়ে দিবে (কিন্য়া)।

১৪. মাসআলা : খরিদা গম কবজা করার পর এর ধূলাবালি গুলো উড়ে গেল এবং এতে এর ওজন কিছুটা হ্রাস পেল। এ কারণে ক্রেতা এ গম ফেরত দিতে পারবে না। তদ্রূপ যদি গমের মধ্যে কিছুটা আর্দ্রতা থাকে এবং তা ক্রেতার কবজায় যাওয়ার পর শুকিয়ে গমের ওজন হ্রাস পায় তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। অনুরূপ ভাবে কেউ যদি কাঁচা জ্বালানী খরিদ করে এবং পরে তা ক্রেতার কবজায় আসার পর শুকিয়ে যায় তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি লেখক গোলাম বা রুটি তৈরিকারী গোলাম খরিদ করে। তারপর সে ক্রেতার কবজায় এসে এ সব কাজ ভুলে যায়। এ অবস্থায় ক্রেতা যদি অন্য কোন দোষ অবগত হলে তাকে ফেরত দিতে পারবে। (যখীরা)। মুনতাকা গ্রন্থে এও বর্ণিত আছে যে কেউ যদি রায় শহর থেকে কিছু খুরমা-খিজুর খরিদ করে কূফা শহরে নিয়ে যায় এবং দোষ পেয়ে তা ফেরত দিতে চায় তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে ঐ মাল ফেরত দিতে চাইলে রায় শহরে এনে ফেরত দিতে হবে। উক্ত মাসআলা

খুরমা-খিজুরের স্থলে দাসী হলে এ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইংগিত করেছেন যে, তা খিজুরের মাসআলার অনুরূপ হবে না। কেননা দাসীর দাম কূফা এবং রায় শহরে প্রায় কাছাকাছি এবং তাকে খরচও বেশী নয়। যেমনটি লেগে থাকে খিজুরের বেলায় (যখীরিয়া)।

১৫. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি অপর কারো নিকট থেকে এমন একটি দাসী খরিদ করল যার একটি চোখ সাদা, ক্রেতা এ সম্পর্কে জানত, তাহলে এই দাসীকে ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার আর থাকবে না। যদি ক্রেতা তাকে কবজা না করে থাকে, আর ইত্যবসরে তার চোখের সাদা দাগ ভাল হয়ে যায়, এরপর আবার তা সাদা হয়ে যায় তাহলে এই দাসী ক্রেতার যিম্মায় অপরিহার্য হয়ে যাবে এবং তাকে ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে ক্রেতার আর কোন ইখতিয়ার থাকবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার ইখতিয়ার বাকী থাকবে। তবে যাহিরী রিওয়ায়াতে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটিই সহীহ মতামত। যেমন কোন ব্যক্তি যদি এমন এক দাসী খরিদ করে যার সামনের দুটি দাঁত পড়ে গেছে অথবা তা খুবই কাল। ক্রেতাও এ সম্বন্ধে জানে। তারপর সে তাকে কবজা করল না। ইত্যবসরে ঐ পড়ে যাওয়া দাঁত দুটো গজিয়ে উঠল অথবা দাঁতের কাল রং 'দূর' হয়ে গেল। তারপর ঐ দাঁত দুটো আবার পড়ে গেল কিংবা তা আবার কাল হয়ে গেল তাহলে এই দাসী ক্রেতার জন্য অপরিহার্য হয়ে যাবে। কেননা আকদের কারণে বিক্রেতার উপর যা অপরিহার্য হয়েছে তা সে যথাযথভাবে হস্তান্তর করতে অক্ষম নয়। দাসীর একটি চোখ সাদা অথবা সামনের দুটি দাঁত পড়া, তা জানা সত্ত্বেও ক্রেতা যদি তাকে কবজা করে নেয়, তারপর ঐ সাদা দাগ দূর হয়ে যায় বা সামনের দাঁত দুটো গজিয়ে উঠে এরপর আবার ঐ চোখ সাদা হয়ে যায় বা দাঁত দুটো পড়ে যায়। তারপর ক্রেতা, বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় কোন দোষ জানতে পারে তাহলে এই দোষের কারণে সে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে। যদি আক্রান্ত চোখের সাদা দাগ দূর হয়ে যাওয়ার পর তা আবার ফিরে না আসে কিন্তু অন্য চোখে সাদা দাগ সৃষ্টি হয় তাহলে ক্রেতা কোন আয়েবের কারণেই এই দাসীকে আর ফেরত দিতে পারবে না। আর যদি অন্য চোখে সাদা দাগ সৃষ্টি না হয় বরং আগের চোখেই নতুন করে সাদা দাগ সৃষ্টি হয় এবং তা ক্রেতার হস্তক্ষেপের কারণে হয় যেমন ক্রেতা দাসীর চোখে আঘাত করল ফলে তার চোখটি পুনরায় সাদা হয়ে গেল, তারপর ক্রেতা তার মধ্যে বিক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় কোন দোষ জানতে পারল তাহলেও ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু বিক্রেতা যদি এ অবস্থায়ও নিতে রাযী হয় তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। পক্ষান্তরে ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় যদি বাইয়ের কোন লোকের আঘাতে গোলামের ঐ চোখ পুনরায় সাদা হয়ে যায় তাহলে আয়েবের কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। যদিও এ ব্যাপারে বিক্রেতা রাযী থাকে। এ হুকুম ঐ সময়ের যখন ক্রেতা দাসীর 'চক্ষু-সাদা'র দোষ জেনে তাকে খরিদ করে। পক্ষান্তরে এই দোষ না জেনে ক্রয় ও কবজা করার পর জানতে পারলে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে। যদি না দেয়, ইত্যবসরে তার ঐ সাদা দাগ শেষ হয়ে যায় তবে এরপর আর সে ঐ দাসীকে ফেরত দিতে পারবে না। যদিও সে নিখুঁত দাসীর হকদার ছিল। কেননা আয়েব সম্বন্ধে তার কোন অবগতি ছিল না। যদি এরপর ঐ দাসীর চোখে সাদা দাগ নতুন করে সৃষ্টি হয় তবুও সে তাকে ফেরত দিতে পারবে

না। কিন্তু যদি দাসীর মধ্যে অন্য কোন আয়েব পাওয়া যায় তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে (মুহীত)।

১৬. মাসআলা : কোন দাসীর একটি চোখে সাদা দাগ আছে, এ জাতীয় দাসী যদি কেউ না জেনে খরিদ করে, কিন্তু সে এখনো তাকে কবজা করেনি, ইত্যবসরে যদি ঐ সাদা দাগটি মিটে যায়, তারপর আবার তা নতুন করে সৃষ্টি হয় এবং ক্রেতা তা জানতে পারে তাহলে ক্রেতা দাসীকে ফিরিয়ে দিতে পারবে। পক্ষান্তরে দাসীর কোন একটি চোখে সাদা দাগ থাকা অবস্থায় এ সম্পর্কে না জেনে ক্রেতা যদি তাকে কবজা করে নেয়, ইত্যবসরে ঐ সাদা দাগ খতম হয়ে গিয়ে তা আবার নতুন করে সৃষ্টি হয় তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফাতাওয়ায়ে ফযলীতে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি এমন একটি দাসী খরিদ করল-যার এক চোখে সাদা দাগ আছে। তারপর ঐ সাদা দাগ ভাল হয়ে আবার তা নতুনভাবে দেখা দেয়, এরপর ক্রেতা অজানা অবস্থায় তা কবজা করে পরে এ সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে (মুহীত)। এমনভাবে কেউ যদি এমন কোন দাসী খরিদ করে যার সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে কিংবা কাল হয়ে গেছে। অথচ ক্রেতা এ সম্পর্কে কিছুই জানত না। তাই সে তাকে কবজা করে নিল। তারপর সে এ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর দাঁতের কাল দাগ ভাল হয়ে গেল কিংবা পড়ে যাওয়া দাঁত দুটো আবার গজিয়ে উঠল তাহলে ক্রেতা এই দাসীকে ফেরত দিতে পারবে না। এই ভাবে যদি সামনের দাঁত দুটি আবার পড়ে যায় বা কাল হয়ে যায় তাহলে এ অবস্থার পরও তাকে ফেরত দিতে পারবে না। হাঁ, যদি তার মধ্যে অন্য কোন আয়েব দেখা যায় তাহলে ফেরত দেওয়া যাবে (মুহীত)।

১৭. মাসআলা : পাখী যবাহু করে পশম উপড়ে ফেলার পর কোন আয়েবের কারণে তা আর ফেরত দেওয়া যাবে না (কিন্য়া)। ফাতাওয়ায়ে আবুল লাইসে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ কোন রুগ্ন গোলাম খরিদ করে, তারপর ক্রেতার কবজায় আসার পর তার রোগ আরো বেড়ে যায় তাহলে ক্রেতা এ গোলামকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না। অবশ্য সে তার নিকট হতে আয়েব জনিত ক্ষতিপূরণ উসূল করে নিতে পারবে (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি একথা না জেনে গোলাম খরিদ করে যে বিক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় সে দু' তিন দিন মেয়াদি জ্বরে আক্রান্ত থাকতো কিন্তু তারপর গোলাম ক্রেতার কবজায় আসার পর তার একাধারে জ্বর আসতে লাগল তাহলে মুনতাকা গ্রন্থের বর্ণনা মতে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। পক্ষান্তরে ক্রেতার কবজায় আসার পর সে যদি শয্যাশায়ী হয়ে যায় তবে জ্বর ছাড়া এটি আরেকটি আয়েব হিসাবে ধর্তব্য হবে। কাজেই এর ক্ষতিপূরণও সে পাবে। কিন্তু ফেরত দিতে পারবে না। এমনভাবে যদি ক্রয়কৃত গোলামের শরীরে কোন ফোঁড়া বা বসন্ত থাকে এবং তা থেকে পুঁজ নির্গত হয় তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। আর যদি কোন জখম থাকে এবং ক্রেতার কবজায় এসে ঐ জখমের কারণে তার হাত নষ্ট হয়ে যায় অথবা চেহারা বা মাথায় এমন বড় জখম থাকে ক্রেতার কবজায় গিয়ে যার আসর দেমাগে গিয়ে পৌছেছে তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা : যদি বিক্রেতার নিকট গোলামের পালা জ্বর থাকে, তারপর তা ভাল হয়ে যায় তারপর গোলাম ক্রেতার কবজায় যাওয়ার পর আবার তার জ্বর শুরু হয় তাহলে এই জ্বরের অবস্থা লক্ষ্য করতে হবে। যদি এই জ্বর পালাজ্বর হয় তবে সাবা (কারণ) এক হওয়ার কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। আর যদি ক্রেতার নিকট যাওয়ার পর গোলামের ভিন্ন রকমের জ্বর আসে তাহলে তাকে ফেরত দেওয়া যাবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে জ্বরের কারণ ভিন্ন ভিন্ন। অনুরূপভাবে কেউ যদি গোলাম খরিদ করে এবং গোলাম ক্রেতার কবজায় যাওয়ার পর তার মধ্যে কোন রোগ দেখা দেয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। উক্ত মাসআলা থেকে অনুরূপ আরো বহু মাসআলা উদগত হয়ে থাকে (মুখতারুল ফাতাওয়া)। কোন ব্যক্তি গোলাম খরিদ করে তাকে কবজা করে নিল। তারপর তার শরীরে জ্বর আসল। ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায়ও এভাবে তার শরীরে জ্বর আসত। তাহলে শায়খ ইবনুল ফযল (র) বলেন, এই মাসআলায় আমাদের ইমামগণের পক্ষ হতে এই মত বর্ণিত হয়েছে যে, বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় যে যে সময় তার জ্বর আসত যদি এই সময়েই ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায়ও তার জ্বর আসে তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ঐ গোলামকে ফেরত দিতে পারবে। আর যদি ঐ সময় জ্বর না এসে অন্য সময় আসে তাহলে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না (আন নাহরুল ফায়িক-খানিয়ার সূত্রে)। যদি খরিদকৃত বস্ততে ফোঁড়ার কোন চিহ্ন থাকে এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়ে আর এ বিষয়টি সম্পর্কে ক্রেতার জানা না থাকে, এ অবস্থায় ক্রেতার নিকটে আসার পর যদি ঐ ফোঁড়ার আবার ভেসে উঠে এবং অপারেশনকারী ডাক্তারগণ এ কথা বলে যে, পূর্বের কারণেই এর সৃষ্টি তবে সে এই বস্তুটি ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু ক্ষতিপূরণ পাবে (কিন্য়া)।

১৯. মাসআলা : দাসীকে দখলে নেয়ার 'দোষ' পেয়ে ক্রেতা সে বিক্রেতার সাথে বিবাদে লিপ্ত হল। তার পর কিছু দিন চুপ থেকে এই ভাবে পুনরায় বিবাদে লিপ্ত হল। তখন বিক্রেতা বলল, দোষ জানা সত্ত্বেও এতদিন একে তোমার কাছে আটকে রাখলে কেন? জবাবে ক্রেতা বলল, দোষ দূর হয় কি না তা দেখার জন্য রেখেছিলাম, এ সম্বন্ধে শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন ফযল (র) বলেন, উক্ত কারণে বিবাদ ছেড়ে দেওয়া আয়েবের উপর রাযী হওয়ার নিদর্শন নয়। কাজেই ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে। তদ্রূপ ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে না পাওয়ার কারণে দাসীকে নিজের কাছে রেখে প্রতিপালন করতে থাকে, তবে সাথে এমন কোন আচরণ না করে যা থেকে তার সম্মতি প্রতীয়মান হয়, তার পর যদি সে বিক্রেতার সন্ধান পায় তাহলে সে ঐ দাসীকে ফেরত দিতে পারবে। ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (র) বলেন, আমি আমার যমানার মাশাইখে কিরামকে এ অভিমত পোষণ করতে দেখছি (আল্ ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

২০. মাসআলা : মুনতাকা কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি কারো নিকট থেকে একটি গোলাম খরিদ করল। তারপর ক্রেতা তাকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য অন্য কাউকে হুকুম করল। তারপর আদেশদাতা ব্যক্তি জানতে পারল যে, তার মধ্যে কোন আয়েব আছে তাহলে এর সমাধান সম্পর্কে শায়খ (র) বলেন, যদি উকীল মুআক্কিলের সামনে তাকে বিক্রি করে এবং মুআক্কিল কিছু না বলে তবে এতে আয়েবের ব্যাপারে তার রাযী হওয়া প্রমাণিত

হবে। এরপর যদি কোন ঘটনা ক্রমে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন না হয় তবে ক্রেতা আয়েবের কারণে ঐ গোলামকে ফেরত দিতে পারবে না। তদ্রূপ উকীল যদি মুআক্কিলকে গোলামকে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাওয়ার কথা বলে আর ক্রেতা বারণ না করে তাহলে এটিও তার সম্মতি হিসাবে ধর্তব্য হবে। অথবা যদি আদেশদাতা ব্যক্তিকে এ মর্মে সংবাদ দেওয়া হয় যে, উকীল গোলাম বিক্রি করার জন্য দাম দস্তুর ঠিক করেছে। এ কথা শুনে আদেশদাতা যদি উকীলকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত না করে তবে এটিও আয়েবের ব্যাপারে তার সম্মতিরূপে গণ্য হবে (মুহীত)। যদি কেউ সানজাব' ও খেখশিয়ালের চামড়া খরিদ করে দাবাগাতের জন্য তা পানিতে বিজিয়ে রাখে তারপর তাতে আয়েব বাহির হয় তবে ক্রেতা এর ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিতে পারবে। এই ভাবে কেউ যদি রেশম খরিদ করে তা পানিতে ভিজায় এবং তখন তাতে কোন আয়েব পরিলক্ষিত হয় তবে এ ক্ষেত্রেও ক্রেতা আয়েব জনিত ক্ষতিপূরণ পাবে (কিন্য়া)।

২১. মাসআলা : কোন ব্যক্তি এমন একটি যমীন খরিদ করল যাতে কোন খারাজ ছিলনা। তারপর ক্রেতা তাতে আয়েব দেখতে পেল এবং তখন ঐ যমীনের উপর খারাজ ধার্য করা হল, তাহলে ক্রেতা আর এই জমি ফেরত দিতে পারবে না। কেউ যদি খরিদা গোলাম কবজা করার পর খিয়ারে শর্ত বা খিয়ারে রুয়ত কিংবা খিয়ারে আয়েবের ভিত্তিতে ফিরিয়ে দেয়, তারপর ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় যদি ঐ গোলামের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতা এর অর্ধেক লোকসানের যামিন হবে। আর যদি এই অবস্থায় গোলামের উভয় চোখ নষ্ট হয়ে যায় তবে ক্রেতা সম্পূর্ণ লোকসানের যামিন হবে। এ অবস্থায় বিক্রেতার গোলামকে ফেরত লওয়া ও না লওয়ার ব্যাপারে কোন খিয়ার থাকবে না। কেউ যদি খরিদা বাড়ির কিছু অংশ (কিছু সামান) বিক্রি করে দেয়, তারপর তাতে আয়েব দেখতে পায় তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ক্রেতা এই বাড়ি আর ফেরত দিতে পারবে না। এবং সে কোন ক্ষতিপূরণও পাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। খরিদা বাগানের কিছু ফল খাওয়ার পর যদি কোন দোষ জানতে পারে তাহলে বিক্রেতা রাযী হলেও ক্রেতা এই বাগান ফেরত দিতে পারবে না (মুহীত)। কেউ যদি রেশমের কাপড় খরিদ করার পর তা গুঁকে এবং তাতে কোন আয়েব পায় তাহলে ক্রেতা এ কাপড় ফেরত দিতে পারবে (কিন্য়া)।

২২. মাসআলা : কেউ যদি কুড়াল খরিদ করার পর তা আগুনে ঢুকায় এবং পরে কোন দোষ ধরা পড়ে তবে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে স্বর্ণ খরিদ করে তা আগুনে ঢুকানোর পর যদি তাতে কোন আয়েব পরিলক্ষিত হয় তাহলে ক্রেতা সেটি ফেরত দিতে পারবে (যখীরাঃ খুলাসা)। যদি কেউ কাঠ মিস্রিরদের হাতিয়ার তৈরি করার জন্য লোহা খরিদ করে এবং সেটিকে আগুন দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য কর্মকারের হাপরের মধ্যে ঢুকায়, এবং এ পরীক্ষায় যদি তাতে কোন আয়েব পাওয়া যায় এবং এতে তা যদি হাতিয়ার তৈরির জন্য অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে আয়েব জনিত ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। কিন্তু লোহা ফেরত দিতে পারবে না (কিন্য়া)। কোন ব্যক্তি করাত খরিদ করে তা ধার দিল, তারপর তাতে আয়েব দেখতে পেল, তাহলে ক্রেতা এই করাত ফেরত দিতে

পারবে না। কিন্তু যদি এতে বিক্রেতা সম্মত থাকে তবে ফেরত দিতে পারবে। (সুগরা)। কেউ যদি ছুরি খরিদ করে তা ধার দেয় এবং এরপর তাতে কোন আয়েব দেখতে পায় তাহলে লক্ষ্য করতে হবে যে, সে ছুরটিকে কিসের দ্বারা ধার দিয়েছে? যদি রেত দিয়ে ধার দেওয়া হয় তবে তা ফেরত দেওয়া যাবে না। কেননা এতে ছুরির ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে থাকে। আর যদি পাথর দিয়ে ধার দেওয়া হয় তবে ফেরত দিতে পারবে (আল ফুসুলুল ইমাদিয়া)। কেউ একটি নতুন হাড়ি খরিদ করল। তারপর বিক্রেতা তাকে বলল, তুমি এতে রান্না-বান্না করে দেখ, যদি কোন আয়েব পরিলক্ষিত হয় তবে পাকানোর পরও আমি তোমার নিকট থেকে তা ফেরত নিয়ে নিব এবং তোমাকে এর মূল্য দিয়ে দিব। তারপর ক্রেতা রান্না-বান্না করল এবং তাতে কোন আয়েব প্রকাশ পেল, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া ঐ হাড়িটি ফেরত দিতে পারবে না। তবে আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ উসুল করতে পারবে। যদি ক্রেতা আয়েব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, কিন্তু এ কথা জানতে না পারে যে, এটি পুরাতন আয়েব না নতুন আয়েব ইত্যবসরে সে যদি ঐ হাড়ি মালিকের ন্যায় ব্যবহার করে, তার পর জানতে পারে যে, এটি পুরাতন আয়েব, তাহলে ক্রেতা ঐ হাড়ি ফেরত দিতে পারবে না (কিন্য়া)।

২৩. মাসআলা : কেউ কোন গোলাম খরিদ করার পর জানতে পারল যে, কিসাস, রিদ্দত (মুরতাদ হওয়া) অথবা ডাকাতির সময় কাউকে হত্যা করার কারণে সে (مباح الدم) হত্যা যোগ্য হয়ে পড়েছে। আর এই কারণেই যদি ক্রেতার কবজায় আসার পর তাকে হত্যা করা হয় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে পূর্ণ মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে ক্রেতা এই গোলামকে ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু আয়েব জনিত ক্ষতিপূরণ পাবে। এক্ষেত্রে গোলামের অপরাধ পরবর্তী এবং অপরাধ পূর্ব মূল্য নির্ণয় করে মধ্যবর্তী ব্যবধানটুকু বিক্রেতার নিকট থেকে নিয়ে নিবে। কেউ যদি এমন গোলাম খরিদ করে যে ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় চুরি করেছে, কিন্তু এ সম্পর্কে ক্রেতা কিছুই জানে না, তারপর ক্রেতার কবজায় পৌছার পর তার হাত কাটা হয় তাহলে ক্রেতা তাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে। তারপর সে বিক্রেতার নিকট হতে পূর্ণ মূল্য আদায় করে নিবে। এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু আয়েব জনিত কারণে ক্ষতিপূরণ উসুল করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে অপরাধী অবস্থায় তার মূল্য কত এবং অপরাধ মুক্ত অবস্থায় তার মূল্য কত তা সাব্যস্ত করে এতদুভয় অবস্থার মধ্যে যে পরিমাণ বেশ-কম হবে এই অতিরিক্ত পরিমাণ সে বিক্রেতার নিকট হতে আদায় করে নিবে। বিক্রেতার কবজায় চুরি করা গোলাম যদি ক্রেতার কবজায় আবার চুরি করে এবং উক্ত দুই কারণেই তার হাত কাটা হয় তাহলে সাহেবাইনের মতে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ পাবে। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না। কেননা এতে নতুন আয়েব সৃষ্টি হয়েছে। তবে সে গোলামের পূর্ণ মূল্যের এক-চতুর্থাংশ ফেরত পাবে। কেননা মানুষের হাত তার অর্ধেকের সমান। আর তার সেই হাত দুই অপরাধের কারণে কাটা হয়েছে। কাজেই সে এক চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত পাবে। যদি বিক্রেতা নিজে ঐ গোলামকে মেরে ফেলে তাহলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে তিন-চতুর্থাংশ মূল্য ফেরত পাবে। যদি কোন গোলামকে

১. ইদুরের থেকে বড় এক প্রকার প্রাণী যার মোলায়েম পশম বিশিষ্ট চামড়া দ্বারা পোশাক তৈরী করা যায়।

কয়েকবার বেচাকেনা করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে মুনীবদের হাত বদল হয় তারপর সর্বশেষ ক্রেতার নিকট তার হাত কাটা হয় অথবা তাকে হত্যা করা হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মাসআলায়ে ইসতিহাকার মত অর্থাৎ মালিকানার অধিকারী হওয়ার মাসআলার মত। এ ক্ষেত্রেও বিক্রেতাগণ পরস্পর একে অপরের থেকে ক্ষতিপূরণ উসূল করতে পারবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে এটি আয়েবের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। কাজেই সর্বশেষ ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে এর আয়েব জনিত ক্ষতিপূরণ পাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি ক্রেতা এ আয়েব সম্পর্কে অবগত না থাকে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি আয়েব সম্পর্কে অবগত থাকে তাহলে সাহেবাইনের মতে ক্রেতা কিছুই ফেরত পাবে না। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দুই রিওয়াযাতের বিশুদ্ধতম রিওয়াযেত অনুসারে ক্রেতা আয়েব জনিত ক্ষতিপূরণ পাবে। কেননা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এটি অন্যের 'মালিকানা-হক' (المستحقاق) প্রকাশ পাওয়ার অনুরূপ। তাঁর মতে অন্যের 'মালিকানা হক' সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা ক্ষতিপূরণ লাভের পতিবন্ধক নয় (কাফী জামে সগীর)। যদি ক্রেতা খরিদকৃত গোলামকে মালের বিনিময়ে আযাদ করে দেয়, তারপর তাকে হত্যা করা হয় কিংবা তার হাত কর্তন করা হয় তাহলে সাহেবাইনের মতে ক্রেতা আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ পাবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে পাবে না। আর যদি কোন প্রকার আর্থিক বিনিময় ছাড়া ক্রেতা ক্রয়কৃত গোলামকে আযাদ করে তবে আমাদের মাযহাব অনুসারে ক্রেতা ক্ষতিপূরণ পাবে (জামে সগীর)।

২৪. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করে তাকে কবজা করে নিল তারপর সে তাকে বিক্রেতার নিকট বিক্রি করে দিল। তারপর বিক্রেতা তাতে কোন পুরাতন আয়েব দেখতে পেল তা হলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে ক্রেতা গোলামকে প্রথম ক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে। এটি ইমাম আবু হানীফা (র)-এর একটি অভিমতও বটে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে কয়েক দিরহামের পরিবর্তে একটি দীনার খরিদ করল এবং তারা আপন আপন বস্ত্র কবজাও করে নিল। তারপর দীনার খরিদকারী ব্যক্তি ঐ দীনার আবার অন্য কারো নিকট বিক্রি করে দিল। তারপর দ্বিতীয় খরিদ কারী ব্যক্তি তাতে আয়েব দেখতে পেল এবং এ কারণে সে আদালতের ফায়সালা ছাড়াই ঐ দীনারটি প্রথম ক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিল তাহলে প্রথম ক্রেতা দীনারটি উক্ত আয়েবের কারণে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে। এমনি ভাবে যদি কোন পাওনাদার ব্যক্তি করজদার ব্যক্তির নিকট হতে পাওনা দিরহাম উসূল করে তা নিজের পাওনাদার ব্যক্তিকে পরিশোধ করে দেয়। তারপর উক্ত পাওনাদার ব্যক্তি তাতে কোন খুঁত দেখতে পেয়ে আদালতের ফায়সালা ছাড়াই তা দ্বিতীয় করজদারের নিকট ফেরত দিয়ে দেয় তাহলে এই ব্যক্তি প্রথম করজদার ব্যক্তির নিকট এই দিরহামসমূহ ফিরিয়ে দিতে পারবে (যহীরিয়া)। মুনতাকা কিতাবে এও উল্লেখ আছে যে, কেউ একটি গোলাম খরিদ করে তাকে অন্ধ হিসাবে পেল তখন ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল আমি তাকে আমার কসমের কাফফারা স্বরূপ আযাদ করে দিতে চাই যদি শরীআতে তা জায়েয হয়। এরূপ হলে আমি এই গোলাম নিয়ে নিব। অন্যথায় তাকে ফেরত দিয়ে দিব। তাহলে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে (মুহীত)।

২৫. মাসআলা : কোন ব্যক্তি এক গাঁঠুরি হারাভী কাপড় খরিদ করার পর সে তাতে আয়েব দেখতে পেল, ইত্যবসরে সে যদি শধুমাত্র ঐ গাঁঠুরিটি নষ্ট করে ফেলে তাহলে মুনতাকা গ্রন্থের বর্ণনা মতে ক্রেতা পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে সমুদয় কাপড় ফেরত দিয়ে দিবে। শাযখ (র) বলেন, দাস-দাসীর ক্ষেত্রে যদি তাদের কাপড় নষ্ট করে দেওয়ার পর তাদের মাঝে কোন আয়েব পাওয়া যায় তবে এ অবস্থায়ও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও ক্রেতা পূর্ণ মূল্যের বিপরীতে তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে পারবে (আল-ফুসূলুল ইমাদিয়া)। মুনতাকা গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, খিয়ারে আয়েবের অবস্থায় ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বলে আজকের মধ্যে এটি ফেরত না দিলে বুঝা যাবে আমি সম্মত আছি এ কথা অর্থহীন হবে। সুতরাং এর পরেও সে ফেরত দিতে পারবে (যখীরা)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে একটি বাড়ি খরিদ করার পর তৃতীয় অপর কোন ব্যক্তি তাতে তার পানির ড্রেন বা নালা আছে বলে দাবী করল এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী-প্রমাণও পেশ করল, তাহলে এই দাবী ঐ বাড়ির ক্ষেত্রে আয়েব বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় ক্রেতা ইচ্ছা করলে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে তা নিয়ে নিতে পারবে। আবার মনে না চাইলে সেটি ফেরতও দিতে পারবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি ঐ বাড়িতে কোন ইমারত নির্মাণ করে থাকে তাহলে দাবীদার ব্যক্তির তা ভেঙ্গে দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু এর মূল্য ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে ক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না (যহীরিয়া)। 'অনুমতি প্রাপ্ত' গোলাম কোন বস্ত্র খরিদ করার পর যদি তাতে দোষ পায়, আর বিক্রেতা মূল্য মাফ করে দেয় কিংবা তাকে মূল্য হিবা করে দেয় এবং গোলামও তা কবুল করে নেয়, তাহলে গোলাম আয়েবের কারণে তা ফেরত দিতে পারবে না। যদি এই মাসআলার মধ্যে গোলামের স্থলে কোন আযাদ ব্যক্তি হয় এবং কবজা করে নেওয়ার পর ক্রয়কৃত বস্ত্রতে সে কোন দোষ দেখতে পায় তাহলে সে তা ফেরত দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি কবজার পূর্বে সে তাতে আয়েব দেখতে পায় তবে ঐ মাল ফিরিয়ে দিতে পারবে (যখীরা)।

২৬. মাসআলা : দোষ জানার পরে বা আগে ক্রেতা যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, ক্রয়কৃত বস্ত্রটি বিক্রেতার নয়, বরং অমুকের আয় অমুক ব্যক্তি তাকে মিথ্যায়ন করে তাহলে ক্রেতা এই বস্ত্র বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে। ক্রেতা আয়েব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও যদি ক্রয়কৃত বস্ত্র অন্য কারো হাতে বিক্রি করে দেয়, তারপর এই দ্বিতীয় ক্রেতা এই বস্ত্র পুনরায় তার নিকট ফিরিয়ে দেয় তাহলে এই ফেরত দেওয়া ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়ার নামান্তর হওয়া সত্ত্বেও প্রথম ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট এই বস্ত্র ফেরত দিতে পারবে না (ওয়াজীয : আল কুরদুরী)। যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্ত্র কারো কাছে বিক্রি করে দেয়, তারপর ঐ বস্ত্র ক্রেতার নিকটে এমন কারণে (سبب) ফেরত দেওয়া যা সর্বদিকে থেকেই (نسخ) (ভেঙ্গে দেওয়া) হিসাবে গণ্য, তারপর ক্রেতা তার এমন কোন আয়েবের ব্যাপারে জ্ঞাত হয় যা বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় এর মধ্যে ছিল তাহলে ক্রেতা একে ফিরিয়ে দিতে পারবে। (যখীরা) এক ব্যক্তি এক কুরুর অনির্দিষ্ট পরিমাণ গমের বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করল। তারপর তারা নিজ নিজ কবজা করে নেওয়ার পর গোলাম বিক্রেতা গমের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পেল এবং পরে ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় তাতে আরেকটি নতুন আয়েব সৃষ্টি

হল, তাহলে ক্রেতা কোন কিছুই ফেরত পাবে না। ক্রয়কালে গমের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট থাকলে যে পরিমাণ লোকসান হবে। গোলাম থেকে সে পরিমাণ রুজু করে নিতে পারবে। কিন্তু গম বিক্রেতা অর্থাৎ গোলামের ক্রেতা যদি বলে যে, আমি গম ফেরত নিয়ে গোলাম ফিরিয়ে দিতে রাখী আছি তাহলে তার এ অধিকার রয়েছে। কেউ এক কুরুর পরিমাণ গম ধার নিয়ে তা কবজা করার পর মালিকের নিকট হতে একশত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিল। তারপর সে তাতে কোন আয়েব দেখতে পেল তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে আয়েবের কারণে ক্রেতা এই গম ফেরত দিতে পারবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্যের উপর কিয়াস করা হলে ফেরত দেওয়া জায়েয হবে না। তদ্রূপ কেউ যদি দিরহাম ধার নেয়, তারপর ঋণদাতা এর বিনিময়ে দীনার খরিদ করে তা কবজাও করে নেয়, তারপর ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তি দিরহামে কোন খুঁত দেখতে পায় তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে সে (ধার গ্রহণকারী ব্যক্তি) এ গুলোকে বদলিয়ে নিতে পারবে (মুহীত)।

২৭. মাসআলা : উল্লেখ্য যে, যে যে ক্ষেত্রে ক্রেতার খরিদকৃত বস্তু ফেরত দেওয়ার হক হাসিল হয় সে সে ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি বিক্রেতার সামনেই মাল কবজা করার আগে বলে, “আমি এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করলাম” তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে যাবে। চাই বিক্রেতা এই কথা কবুল করুক বা না করুক। যদি ক্রেতা কবজা করার পর এ কথা বলে, এবং বিক্রেতা তা কবুল করে নেয় তবে এ ক্ষেত্রেও ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি কবুল না করে তবে ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে যদি বিক্রেতার অনুপস্থিতিতে ক্রেতা এ কথা বলে, তাহলেও ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হবে না। যদি ও তা কবজা করার আগে বলা হয়ে থাকে (যখীরা)। কেউ যদি আসুরের বাগান এর ফল-ফলাদিসহ খরিদ করে এবং পরে তাতে আয়েব দেখতে পায় আর এ কারণে সে এই বাগান ফেরত দিতে চায় তবে যে সময় এর মধ্যে আয়েব দেখতে পেয়েছে তৎক্ষণাৎ তা ফেরত দিতে হবে। কেননা সে এর ফল সংগ্রহ করে নিয়েছে। আর যদি তৎক্ষণাৎ ফেরত না দেয় তবে সে আর ঐ বাগান ফেরত দিতে পারবে না (সিরাজিয়া)।

২৮. মাসআলা : কেউ যদি একই চুক্তির অধীন দুটি গোলাম অথবা দুটি কাপড় অথবা এ জাতীয় অন্য দুটি বস্তু খরিদ করার পর একটি কবজা করে এবং দোষের কারণে দ্বিতীয়টি কবজা না করে তবে তার ইখতিয়ার থাকবে। অর্থাৎ সে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ঐ দুটি জিনিস নেবে বা ফেরত দিয়ে দিবে। কিন্তু দোষ যুক্তটি ফেরত দিয়ে দোষ মুক্তটি নিয়ে নিতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি কবজাকৃত বস্তুর মধ্যে আয়েব পাওয়া যায় তাহলে এর সমাধান কি হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ অবস্থায় ক্রেতা শুধু আয়েবদার বস্তুটি ফেরত দিয়ে দিবে। কিন্তু বিত্তমত অভিমত হচ্ছে, হয় দুটি বস্তুই রেখে দিবে, অথবা দুটিই ফেরত দিয়ে দিবে। যদি ক্রেতা বলে, আমি ক্ষতিপূরণ সহ আয়েবদার বস্তুটি নিতে রাখী আছি, তাহলে তার এই ইখতিয়ার থাকবে না। ক্রেতা যদি উভয় বস্তু তথা উভয় গোলামই কবজা করে নেয় তারপর তাদের কোন একজনের মধ্যে আয়েব দেখতে পায় তাহলে এ ক্ষেত্রে সে শুধু মাত্র আয়েবদার বস্তুটি ফেরত দিতে পারবে (ফাতহুল কাদীর)। এ অবস্থায় সে উভয়টি ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু বিক্রেতা যদি সম্মত থাকে

তবে ফেরত দিতে পারবে (মুহীত)। উল্লেখ্য যে, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি দুটি বস্তুর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে ফায়দা হাসিল করা সম্ভব হয়। যেমন দুই গোলাম ইত্যাদি। যদি স্বভাবত এরূপ করা সম্ভব না হয় যেমন, দুই জুতা, দুই মোজা অথবা দুটি চৌকাঠ ইত্যাদি। এ জাতীয় দুটি বস্তুর কোন একটির মধ্যে যদি আয়েব পাওয়া যায় তবে ফকীহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্রেতা হয়তো উভয়টি রেখে দিবে অথবা উভয়টি ফিরিয়ে দিবে (ফাতহুল কাদীর)।

২৯. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি এক সাথে একা জোড়া বলদ গরু খরিদ করে সেগুলো কবজা করার পর এর কোন একটিতে আয়েব দেখতে পায়, তারপর সে শুধুমাত্র আয়েবদার বলদটি ফেরত দিতে চায় তবে যাহিরী জবাব হল, এ ব্যাপারে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু আমাদের মাশাইখে কিরাম বলেন, যদি উভয়টির মাঝে একত্রে কাজ করার অভ্যাস গড়ে উঠে থাকে এবং এদের অবস্থা হয় যে, একটি অন্যটি ছাড়া কোন কাজই করতে পারে না তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতা শুধুমাত্র আয়েবদার বলদটি ফেরত দিতে পারবে না। কেননা এ দুটো বলদ পরস্পর মিলে একটির ন্যায় হয়ে গেছে (মুহীত)। কেউ দুটি দাসী খরিদ করল। কিন্তু তাদের কাউকে কবজা করল না। এমতাবস্থায় সে যদি তাদের কোন এক জনের মধ্যে আয়েবের সন্ধান পায় এবং এই আয়েবদার দাসীকেই কবজা করে নেয় তাহলে উভয় দাসীই তার যিম্মায় অপরিহার্য হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি আয়েবহীন দাসীটি কবজা করে নেয় তাহলে সে তাদের উভয়কে ফেরত দিতে পারবে। ক্রেতা যদি উভয় দাসীকে কবজা করার পর আয়েবহীন দাসীটিকে বিক্রি করে দেয় কিংবা তাদের উভয়কে কবজার আগে বা পরে আযাদ করে দেয় তাহলে আয়েবদার দাসীটি তার যিম্মায় অপরিহার্য হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা : কোন ব্যক্তি এক গাঁঠুরি হারাজী কাপড় খরিদ করে এর থেকে একটি কাপড় বের করে নিল। তারপর তা কেটে জামা সেলাই করল অথবা তা বিক্রি করে দিল। তারপর ঐ গাঁঠুরির কোন কাপড়ে আয়েব দেখতে পেল তাহলে ক্রেতা আয়েবদার কাপড়টি ফেরত দিয়ে বাকি কাপড়গুলো নিয়ে নিতে পারবে। এ অবস্থায় বিক্রেতা যদি বলে তা হবে না পুরা গাঁঠুরি ফেরত দিতে হবে তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য ক্রেতা রাখী থাকলে তা হতে পারে। ক্রেতা কাপড় কর্তন করেছে ঠিক কিন্তু তা দ্বারা জামা সেলাই করেনি, এমতাবস্থায় বিক্রেতা যদি কর্তিত কাপড়সহ গাঁঠুরি ফেরত নিতে রাখী হয় তবে সে তা করতে পারবে (মুহীত)।

৩১. মাসআলা : দখল নেয়ার পর খরিদা বাগানে ফল ধরল এ অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাগানটি নষ্ট হয়ে গেল তারপর তাতে কোন দোষ জানা গেল। এ ক্ষেত্রে বাগান ফেরত দেওয়া যাবে। আর যদি ক্রেতা ঐ ফল ভক্ষণ করে ফেলে তাহলে তা আর ফেরত দেওয়া যাবে না (কাফী)। কোন ব্যক্তি ফলবান খেজুর গাছ তৎসংশ্লিষ্ট জমি ও ফল-ফলাদি সহ খরিদ করল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ক্রেতা তা কবজা করে নি। ইত্যবসরে বিক্রেতা ঐ গাছের ফলগুলো পেড়ে নিয়ে গেল। তাহলে দেখতে হবে যে এ ফল পাড়ার কারণে ঐ বৃক্ষের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে

কিনা? যদি ফল পাড়ার কারণে গাছ বা ফলের কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয় যেমন এখনো ফল পাড়ার সময় হয়নি তাহলে এ অবস্থায় ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। আর ফল পাড়ার কারণে গাছের বা ফলের কোন ক্ষয়-ক্ষতি না হলে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে না। ক্রেতা যদি গাছ এবং ফল উভয়টিই কবজা করে নেয় তারপর এর কোন একটিতে আয়েব দেখতে পায় তাহলে ক্রেতা শুধুমাত্র আয়েবদার বস্তুটি ফিরিয়ে দিবে। আর যদি ক্রেতা ফল পাড়ার পূর্বে সবগুলো জিনিসই কবজা করে নেয় তারপর সে তা পেড়ে আনে তাহলে দেখতে হবে যদি এর কারণে গাছ এবং ফল কোনটিরই লোকসান না হয় এবং এরপর এতদুভয়ের কোন একটিতে ক্রেতা আয়েবের সন্ধান পায় তাহলে ক্রেতা একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে ফেরতদিতে পারবে না। কিন্তু উভয়টি ফেরত দিতে পারবে। যদি ফল পাড়ার কারণে উভয় বস্তুর কোন একটির ক্ষতি সাধিত হয় এরপর ক্রেতা দুটির কোন একটিতে দোষ পায় তাহলে ক্রেতা কোনটিই ফেরত দিতে পারবে না। অবশ্য দোষের ক্ষতিপূরণ পাবে কিন্তু বিক্রেতা যদি আয়েবসহ সেগুলো ফেরত নিতে চায় তবে এই অবস্থায় তা বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া যাবে। অনুরূপ ভাবে কেউ যদি এমন বকরী খরিদ করে যার পিঠের উপর পশম আছে। তারপর ক্রেতা কর্তৃক তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রেতা এর পশম কেটে নেয় কিংবা ক্রেতার হস্তগত করার পর সে নিজেই এর পশম কেটে ফেল তবে এর হুকুম ফলের হুকুমের অনুরূপ হবে (মুহীত)।

৩২. মাসআলা : কেউ গাভিন বকরী খরিদ করল তারপর সে বকরী বিক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় বাচ্চা প্রসব করল এবং এ প্রসবের কারণে বকরীটির কোন ক্ষতি হল না তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কোন খিয়ার থাকবে না। আর যদি ক্রেতা বকরী ও বাচ্চা উভয়টি কবজা করে নেয় তারপর দুটির কোন একটিতে আয়েব দেখতে পায় তাহলে একে তার সম-পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে ফেরত দিয়ে দিবে। বকরী যদি ক্রেতার কবজায় বাচ্চা দেয় তবে একে আর ফেরত দেওয়া যাবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। বকরীর স্তনে দুগ্ধ আছে এমন কোন বকরী যদি কেউ খরিদ করে তারপর ক্রেতা বা বিক্রেতা এর দুগ্ধ দোহন করে তাহলে এই দুগ্ধ দোহন করা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার অনুরূপ বলে গণ্য হবে। কেননা বাচ্চার যেমন মায়ের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় স্বতন্ত্র মূল্য নেই তেমনি বকরীর স্তনে থাকা অবস্থায়ও দুগ্ধের স্বতন্ত্র মূল্য নেই (মুহীত)। মূলা ও শালগম যমীনের মধ্যে লাগানো ও স্থিত আছে, এমতাবস্থায় কেউ এগুলো খরিদ করল। তারপর ক্রেতা এগুলো ক্ষেত থেকে তুলে নিল এবং দেখল যে, এতে আয়েব আছে তাহলে ক্রেতা এসব মালামাল ফেরত দিতে পারবে না। তবে দোষের ক্ষতিপূরণ পাবে (তাতার খানিয়া)। কোন ব্যক্তি গাছ-গাছালির বাগান খরিদ করার পর এর কোনটিতে আয়েব দেখতে পেল তাহলে ফকীহ আবু বকর (র)-এর মতে সে হয়তো সবগুলো গাছ ফেরত দিয়ে দেবে অথবা সবগুলো গাছ রেখে দেবে। শুধুমাত্র আয়েব গাছটি ফেরত দিতে পারবে না যদি গাছগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট না হয়ে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা-আলাদা জমির বিভিন্ন স্থানে লাগানো থাকে তবে শায়খ আবু বকর (র) বলেন, যদি কবজায় আগে এ অবস্থা হয় তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি কবজার পরে এরূপ হয় এবং জমিসহ সে গাছ-গাছালি খরিদ করে থাকে তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। আর ক্রেতা যদি শুধুমাত্র গাছ-গাছালি খরিদ করে থাকে তাহলে আয়েবদার গাছটি ফেরত দিয়ে দিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা : কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করল। তারপর এক আজনবী ব্যক্তি এসে যিক্রিত বস্তুর সাথে একটি কাপড় ক্রেতাকে অতিরিক্ত দিয়ে দিল এবং ক্রেতাও তা কবজা করে নিল তাহলে এই ব্যক্তি (مُتَطَوِّع) (বিনামূল্যে দানকারী) বলে গণ্য হবে। আর ঐ কাপড়ের মুকাবিলায়ও মূল্যের অংশবিশেষ সাব্যস্ত হবে। আর এ ক্ষেত্রে কাপড়ের মালিক প্রাসঙ্গিকভাবে এ কথার উপর সম্মত হয়ে গেছে যে, তার কাপড়ের অংশটি বিক্রেতার জন্য হয়ে যাক। এহেন অবস্থায় যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় তাহলে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে সে এই গোলামকে ফিরিয়ে দিবে। আর কাপড়ের অংশ বিক্রেতা পাবে। ক্রেতা যদি কাপড়ের মধ্যেও কোন আয়েব দেখতে পায় তবে সে তা কাপড়ের মালিককে ফেরত দিয়ে দিবে এবং বিক্রেতার নিকট থেকে এই পরিমাণ মূল্য নিয়ে নিবে। গোলামের মধ্যে কোন আয়েব পাওয়া যায়নি শুধুমাত্র কাপড়ের মধ্যে আয়েব পাওয়া গেছে, তাহলে কাপড় ফেরত দিয়ে মূল্যের কোন অংশ ফেরত পাবে না। এরপর যদি গোলামের মধ্যেও আয়েব পাওয়া যায় তবে পূর্ণ মূল্য ফেরত নিয়ে গোলাম ফেরত দেবে (মুহীত)।

৩৪. মাসআলা : যদি কেউ এক দরজার দুটি কপাট খরিদ করে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে একটি কপাট কবজা করে নেয় এবং অন্যটি বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় খোয়া যায় তবে এতে বিক্রেতার মাল নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় ইচ্ছা করলে ক্রেতা দ্বিতীয় কপাটটি ফিরিয়ে দিতে পারবে। এ পর্যায়ে একটির কবজা দুটির কবজা রূপে গণ্য হবে না। আর ক্রেতা যদি একটিকে কবজা করে সেটিকে নষ্ট করে দেয় এবং অপরটি বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় খোয়া যায় তাহলে ক্রেতার মাল খোয়া গেছে বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি নগীনা (আংটির পাথর) বিশিষ্ট আংটি খরিদ করে এবং আংটির অবস্থা এমন হয় যে, নগীনাটি খুলে ফেলা হলে এতে নগীনা ও আংটি কোনটির ক্ষতি হয় না এ পর্যায়ে উভয়টি কবজা করার গর যদি কোন একটিতে আয়েব পাওয়া যায় তবে দোষযুক্ত ক্রেতা ফেরত দিতে পারে। রৌপ্য খচিত তলোয়ার এবং রৌপ্য খচিত কোমরবন্ধনীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (আন্-নাহরুল ফায়িক)।

৩৫. মাসআলা : খরিদকৃত বস্তুটি একটি বস্তু ছিল। তারপর কবজা করার আগে বা পরে দেখা গেল যে, এর কোন এক অংশে আয়েব আছে তাহলে শুধুমাত্র ঐ আয়েবদার অংশটি ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার থাকবে না। পক্ষান্তরে খরিদা বস্তু যদি পরিমাপ যোগ্য বা ওজনযোগ্য বস্তু হয় এবং তা একই জাতীয় বস্তু হয় আর এর কিছু কিছু বস্তুর মধ্যে আয়েব পাওয়া যায় তবে শুধুমাত্র আয়েবদার বস্তুগুলোকে ফেরত দেওয়া যাবে না। চাই তা কবজা করার আগে হোক বা পরে হোক। ফকীহ যাহিদ আহমদ তাওয়াবীসী (র) বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতামতের উপর কিয়াস করার দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়েবের কারণে পরিমাণ যোগ্য বা ওজন যোগ্য বস্তুর অংশ বিশেষ ফেরত দেওয়া অপরিহার্য। যদিও ঐ বস্তুগুলো সব এক সাথে জড় ও মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। তবে শর্ত হল, যদি পৃথক করার কারণে আয়েবদার বস্তুর আয়েব না বাড়ে। যদি মিশ্রিত বস্তুর মধ্যে ছোট বড় বস্তু থাকে এবং ক্রেতা চালনি দিয়ে চেলে ছোট বস্তুগুলোকে ফেরত

দিয়ে বাকীগুলো রেখে দিতে চায় তাহলে সে তা পারবে না। এমনভাবে কেউ যদি মিশ্রিত আখরোট বা ডিম থেকে ক্রেতা যদি ছোটগুলো ফেরত দিয়ে বড়গুলো রেখে দিতে চায় তবে সে তা পারবে না। ফকীহ আবু জা'ফর হিন্দুওয়ানী (র) থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন, পরিমাণযোগ্য ও ওজনযোগ্য বস্তু সম্পর্কে যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে তা এমন অবস্থায় প্রযোজ্য হবে যখন সকল বস্তু একই পাত্রে থাকবে। পক্ষান্তরে খরিদকৃত বস্তুগুলো যদি পৃথক পৃথক পাত্রে থাকে এবং এর কোন কোন পাত্রের বস্তুগুলোকে আয়েবদার পাওয়া যায় তাহলে এই পাত্রের বস্তুসমূহ ফেরত দেওয়া যাবে। তিনি এভাবেই ফাতওয়া প্রদান করতেন এবং বলতেন, এটি আমাদের ইমামগণেরই রিওয়াযাত। শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা (র) এই অভিমতি গ্রহণ করেছেন। আমাদের যে সকল মাশায়েখ বলেছেন যে, সকল বস্তু একই পাত্রে থাকা বা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই তাদের মতে খরিদকৃত বস্তুর অংশ বিশেষ ফেরত দেওয়া জায়েয হবে না। “আসল” গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) মাসআলাটি যে ভাবে শর্তহীনভাবে বর্ণনা করেছেন তাতেও এ কথাই প্রতীয়মান হয়। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) অনুরূপ ফাতওয়াই প্রদান করতেন (মুহীত)।

৩৬. মাসআলা : ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন, কোন ব্যক্তি রেশমের কয়েকটি লেফাফা (আচ্ছাদনী) খরিদ করল এবং প্রত্যেকটি লেফাফায় কিছু কিছু আয়েব পাওয়া গেল। এ অবস্থায় ক্রেতা আয়েবদার লেফাফাগুলো আলাদা ফেরত দিতে পারবে না! কিন্তু যদি কোন লেফাফা সম্পূর্ণরূপে আয়েবদার হয় তবে সেটি ফেরত দিয়ে বাকীগুলো রেখে দিবে (মুহীত)। এমনি ভাবে কেউ যদি সুতার কয়েকটি বাণ্ডিল খরিদ করে এবং এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে কিছু কিছু আয়েব পায় তবে এ অবস্থায় সে শুধু আয়েবদার জিনিসটি পৃথক করে তা ফেরত দিতে পারবে না। আর যদি কোন কোন বাণ্ডিল আয়েবদার পায় তবে সে আয়েবদার বাণ্ডিলগুলো ফেরত দিয়ে বাকীগুলো রেখে দিতে পারবে (যখীরা)। যদি পরিমাপযোগ্য বা ওজন যোগ্য বস্তুর অংশ বিশেষের কোন মুস্তাহিক (হকদার) বের হয় তবে ক্রেতার বাকী অংশ ফেরত প্রদানের ইখতিয়ার থাকবে না। এ হুকুম মাল কবজা করার পর মুস্তাহিক বের হওয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু কবজা করার আগে হকদার বের হলে ক্রেতা বাকী অংশ ফেরত দিতে পারবে (হিদায়া)। খরিদকৃত বস্তু যদি কাপড় হয় এবং ক্রেতা তা কবজাও করে নেয়, এরপর যদি কিছু কাপড়ের কোন হকদার বেরিয়ে আসে তাহলে বাকী কাপড় ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে (নিহায়া)। কাপড় ক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় আসমানী বালা-মুসীবত বা অন্য কোন কারণে তা যদি আয়েবদার হয়ে যায়, তারপর ক্রেতা যদি এমন আয়েবের সন্ধান পায়-যা বিক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় এর মধ্যে ছিল তাহলে ক্রেতা আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ পাবে। কিন্তু ক্রয়কৃত বস্তু ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু বিক্রেতা যদি ক্রেতার নিকটে সৃষ্ট ঐ আয়েবসহ বিক্রিত বস্তুটি ফেরত নিতে রাযী থাকে তবে ফেরত দিতে পারবে। অবশ্য শরঈ কোন কারণ যদি ঐ বস্তুটি ফেরত লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় তবে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৩৭. মাসআলা : দোষের ক্ষতিপূরণ ধার্য করা এবং তা উসূল করার নিয়ম এই যে, বস্তুটির দোষ যুক্ত ও দোষযুক্ত অবস্থার মূল্য নির্ণয় করে মধ্যবর্তী পরিমাণ মূল্য ক্রেতা বিক্রেতার নিকট

হতে নিয়ে নিবে। যদি উভয় অবস্থার মূল্যের মাঝে অর্ধেক বেশ-কম হয়ে যায় তবে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে অর্ধেক মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুর আয়েব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পরও তা যদি অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেয় তবে এ সম্পর্কে মূলনীতি হল যে যে ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত বস্তু ক্রেতার মালিকানায় থাকলে তা বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া সম্ভব, হয় তার সম্মতিতে অথবা তার সম্মতি ছাড়াই। এহেন অবস্থায় বিক্রি বা এ জাতীয় কোন কারণে যদি ঐ বস্তু থেকে ক্রেতার মালিকানা অপসারিত হয়ে যায় তবে ক্রেতা এ অবস্থায় আয়েব জনিত লোকসানের কারণে ক্ষতিপূরণ পাবে না। আর যে যে ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত বস্তু ক্রেতার মালিকানায় থাকলে তা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়, এহেন অবস্থায় বিক্রি ইত্যাদির কারণে ঐ বস্তু থেকে যদি ক্রেতার মালিকানা অপসারিত হয়ে যায় তবে আয়েব জনিত লোকসানের কারণে সে ক্ষতিপূরণ পাবে (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন গোলাম খরিদ করে তাকে কবজা করে নিল। তখন সে তার আয়েবের কথা জানত না। তারপর ক্রেতা এবং অপর এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে ফেলল। এরপর জানা গেল যে, তার মধ্যে অমুক আয়েব ছিল তাহলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে ঐ আয়েব বাবত কিছুই পাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি আজনবী বা বাইরের কোন ব্যক্তি গোলামকে হত্যা করে তবে সে বিক্রেতার নিকট হতে কিছুই পাবে না। চাই সে তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করুক বা ভুলক্রমে হত্যা করুক (মুহীত)। যদি ক্রেতা নিজে তাকে হত্যা করে তবে এ ক্ষেত্রেও যাহিরী রিওয়াযাত মুতাবিক ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে কিছু ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর বর্ণনা মুতাবিক ক্রেতা আয়েবজনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ পাবে (শরহত তাকমীলা)। কোন ব্যক্তি গোলাম খরিদ করতঃ মাল ব্যতীত তাকে আযাদ করে দিল অথবা ঐ গোলাম তার নিকট মারা গেল। তারপর সে তার কোন আয়েবের কথা জানতে পারল তাহলে সে আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ পাবে। মুদাববার এবং উম্মু ওয়ালাদ বানানোর বিষয়টিও আযাদ করার অনুরূপ। যদি তাকে কিছু মাল লয়ে আযাদ করা হয় অথবা মুকাতাব সাব্যস্ত করা হয় তাহলে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট হতে কিছুই ফেরত পাবে না (কাফী ও মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩৯. মাসআলা : কেউ জুব্বা খরিদ করে তা পরিধান করল এবং এ কারণে এর কিছুটা ক্ষয়-ক্ষতি হল। তারপর ক্রেতা জানতে পারল যে, এর মধ্যে একটি মরা ইঁদুর আছে তবে এটি আয়েব রূপে গণ্য হবে এবং ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে আয়েবজনিত লোকসানের কারণে ক্ষতিপূরণ উসূল করতে পারবে। কিন্তু বিক্রেতা যদি পরিধান জনিত লোকসানসহ সেটি ফেরত নিতে রাযী থাকে তবে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ একটি মাছ খরিদ করার পর তাতে আয়েব দেখতে পেল। কিন্তু তখন পর্যন্ত বিক্রেতা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় বিক্রেতার অপেক্ষা করতে গেলে মাছটি পঁচে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই ক্রেতা সে টিকে ভুনা করে বিক্রি করে দিল। এমতাবস্থায় আয়েব জনিত লোকসানের কারণে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না এবং এই ক্ষতি পূরণের জন্য তার কোন পথও নেই (কিন্য়া)। কেউ একটি বাঁকে পড়া দেয়াল খরিদ করল।

কিন্তু সে এর অবস্থা সম্বন্ধে জানত না। তারপর তা ধসে পড়ে গেল, তাহলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে এ বাবত কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না (আন্ নাহরুল ফায়িক)। কুদুরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, কেউ খাদ্য খরিদ করার পর তা যদি নষ্ট হয়ে যায় অথবা কাপড় খরিদ করার পর তা যদি ফেটে যায়, তারপর ক্রেতা এসবের কোন আয়েব সম্পর্কে জানতে পারে যা তাতে পূর্ব হতেই ছিল, তাহলে ক্রেতা আয়েব জনিত লোকসানের কারণে বিক্রেতার নিকট থেকে কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। এতে কারোই কোন দ্বিমত নেই। আর যদি ক্রেতা কাপড় পরিধান করার কারণে তা ফেটে যায় অথবা খরিদকৃত খাবার ক্রেতা নিজেই যদি খেয়ে ফেলে, তারপর সে এগুলোর আয়েবের ব্যাপারে জানতে পারে তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে এর ক্ষতিপূরণ পাবে না। এটিই সহীহ মতামত। কেউ যদি গোলাম খরিদ করে এর কিছু অংশ বিক্রি করে দেয় এবং কিছু অংশ বাকী থাকে তবে এই বাকী অংশ সে বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। এবং বিক্রয়কৃত অংশের আয়েবের ক্ষতিপূরণ ও আদায় করতে পারবে না। এতে কোন ইমামের দ্বিমত নেই। আর বাকী অংশের ক্ষেত্রে আয়েব জনিত কারণে ক্ষতিপূরণ পাবে কিনা, এ সম্বন্ধে যাহিরী রিওয়াযাতে আমাদের ইমামত্রয় হতে বর্ণিত আছে যে, ক্ষতিপূরণ পাবে না। এটিই সহীহ মতামত (যখীরা ও মুহীত)।

৪০. মাসআলা : কেউ আটা খরিদ করার পর এর কিছু দ্বারা রুটি বানিয়ে খেয়ে দেখল যে, এগুলো খবুই তিতা তাহলে ইমাম আবু জা'ফর (র) বলেন, ক্রেতা প্রদত্ত মূল্য হতে সমপরিমাণ মূল্য উসূল করে বাকী আটা ফেরত দিতে পারবে। আর যে আটার রুটি তৈরি করা হয়েছে এ পরিমাণ আটার ক্ষতিপূরণ পাবে। এটি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর একটি অভিমতও বটে। ফকীহ আবুল লাইস (র) বলেন, আমরা এ অভিমতটিই গ্রহণ করে থাকি (আল ইয়ানাবী)। খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ খেয়ে ফেলার পর তাতে দেখতে পেল যে পরিমাণ সে ভক্ষণ করেছে এর মধ্যে আয়েব জনিত কারণে যে লোকসান হয়েছে এর ক্ষতিপূরণ সে পাবে। আর বাকী দ্রব্য এর সমপরিমাণ মূল্য উসূল ফিরিয়ে দিবে। এটি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। ফকীহ আবু জা'ফর (র) এ ভাবেই ফাতওয়া প্রদান করতেন। ফকীহ আবুল লাইস (র) এই অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন। ক্রেতা যদি উক্ত মালের অর্ধেক বিক্রি করে দেয় তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে বাকী অর্ধেক ফিরিয়ে দিবে। এর উপরই ফাতওয়া। তবে বিক্রি মালের কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না (মুয়মারাত)।

এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন খাদ্য দ্রব্য একই পাত্রে থাকবে। যদি দুই পাত্রে যেমন দুই টুকরী বা দুই ব্যাগ ইত্যাদিতে থাকে। আর ক্রেতা এক পাত্রের খাদ্য খায় বা বিক্রি করে। তারপর সে বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থার কোন দোষ জানতে পারে, তাহলে সকল ইমামের মতে ক্রেতা বাকী খাদ্যের সমপরিমাণ মূল্য আদায় করে নিয়ে সেগুলো ফিরিয়ে দিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪১. মাসআলা : কেউ তরল ঘি খরিদ করে তা খেয়ে ফেলল। তারপর বিক্রেতা স্বীকার করল যে, এতে ইঁদুর পড়ে মারা গিয়েছিল, তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ অবস্থায় ক্রেতা আয়েবজনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ বিক্রেতার নিকট হতে আদায় করে নিতে পারবে। এর উপরই ফাতওয়া (মুয়মারাত)। কেউ রুটি খরিদ করার পর দেখল যে,

প্রচলিত ভাও থেকে তা পরিমাণে কম তাহলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে বাকী মাল নিয়ে নিতে পারবে। এমনি ভাবে যে সব মালের ভাও এভাবে যাহির হবে সেগুলোর ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (সিরাজিয়া)। যদি কেউ ডিম, তরমুজ, কাকড়, খিরা, আখরোট, লাউ অথবা অন্যান্য ফল-ফলাদি খরিদ করার পর এগুলোকে ভালো মনে করে ভেঙ্গে ফেলে, অথচ তা ছিল নষ্ট। এক্ষেত্রে যদি এগুলো যদি ব্যবহার যোগ্য না থাকে। যেমন লাউ, তিতা হয়ে যাওয়া বা ডিম পঁচে যাওয়া ইত্যাদি তাহলে ক্রেতা পূর্ণ মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। কেননা এ অবস্থায় এ গুলো মালই নয়। কাজেই উক্ত বেচাকেনা বাতিল বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি এ সবের আয়েব সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকা অবস্থায় এগুলো ভেঙ্গে ফেলে তাহলে ক্রেতা আর এ সব মালামাল ফেরত দিতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, যদি আখরুটের ছিলকা ঠিক-ঠাক থাকে তবে তা ধর্তব্য হবে না। যদিও এর ভেতর নষ্ট হয়ে যাওয়া অবস্থায় তা দ্বারা কিছু ক্ষয়দা হাসিল করা সম্ভব হয়। যেমন গরীব লোকদের তা ভক্ষণ করা এবং গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে তা ব্যবহার করতে পারা ইত্যাদি। এ অবস্থায় ক্রেতা আয়েব পরিমাণ ক্ষতিপূরণ উসূল করে নিবে (ফাতহুল কাদীর)। কিন্তু বিক্রেতা যদি এ অবস্থায়ও তা ফেরত নিতে রাযী থাকে তাহলে ক্রেতা ফেরত দিতে পারবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি ক্রেতা এর থেকে কিছুই না খায়। যদি স্বাদ গ্রহণের পর তা খায় তবে ফেরত দিতে পারবে না। যদি মালের অংশবিশেষ নষ্ট হয় এবং পরিমাণে তা সামান্য হয় তাহলে ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। সামান্য অর্থ এমন পরিমাণ যা থেকে সাধারণত মুক্ত হয় না। যেমন শর্তের মধ্যে এক, দুটি নষ্ট হওয়া। আর যদি নষ্টের পরিমাণ বেশী হয় তবে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। এ অবস্থায় ক্রেতা পূর্ণ মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে (হিদায়া)।

৪২. মাসআলা : কোন ব্যক্তি উট পাখির ডিম খরিদ করে তা ভেঙ্গে দেখল যে, তা নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে কোন কোন মাশাইখে কিরামের মতে ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। তবে পূর্ণ মূল্য ফেরত পাবে না। কেননা সে ঐ ডিমের খোসা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। কিন্তু ডিম পঁচে যাওয়াটা দোষ। এ সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মত হওয়াই কথা। পক্ষান্তরে উট পাখির ডিম ভাঙ্গার পর যদি তাতে মরা বাচ্চা পাওয়া যায় তবে এ সম্পর্কে পরবর্তী আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, এই ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। কেননা ক্রেতা দুটি বস্ত্র ক্রয় করেছে। এর মধ্যে একটি হল মৃত। আবার কেউ কেউ বলেন, ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। কেননা 'মৃত' তার উৎস স্থলেই রয়েছে (মুহীত)। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিক্রয় দ্রব্যের দোষ মুক্ত অংশে (যেমন খোসায়) ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। নিহায়া গ্রন্থে আছে, এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (আন্-নাহরুল ফায়িক)।

৪৩. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি উট খরিদ করে তা নিয়ে নিজ বাড়িতে পৌছা মাত্রই সেটি গুয়ে পড়ল। তারপর ক্রেতার নির্দেশে অপর কোন ব্যক্তি সেটিকে যবাহু করে দিল। তারপর দেখা গেল যে, তাতে পুরাতন আয়েব আছে; তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। মাশাইখে কিরাম এই অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। এ হুকুম হল উটটি যবাহু করার পর দোষ জানার ক্ষেত্রে পক্ষান্তরে যদি দোষ জানার পর ক্রেতা নিজে অথবা তার হুকুমে অন্য কেউ বা তার হুকুম ছাড়াই অন্য

কেউ যবাহু করে তবে ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ পাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কোন উট খরিদ করে সে নিজেই তা যবাহু করল। তারপর দেখল যে, এর নাঁড়ি-ভুড়ি বহু পূর্বে নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে সাহেবাইনের মতে ক্রেতা এই আয়েবের ক্ষতিপূরণ পাবে। ফাতওয়া এর উপরই। যদি উক্ত পশুর কিয়দংশ ভক্ষণ করার পর এর আয়েব সম্বন্ধে জ্ঞাত হয় তবে সে ভক্ষিত অংশের ক্ষতিপূরণ উসুল করে বাকী অংশ ফিরিয়ে দিবে (সিরাজিয়া)। উট খরিদ করার পর তাতে কোন আয়েব প্রকাশ পেল। তারপর আছাড় খেয়ে এর গর্দানটি ভেঙ্গে গেলে ক্রেতা তাকে যবাহু করে দেয় তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না (যখীরা)।

৪৪. মাসআলা : কেউ একটি উট খরিদ করে তা কবজা করে নিল। তারপর তাতে আয়েব দেখতে পেয়ে সেটিকে ফেরত দেওয়ার লক্ষ্যে বিক্রেতা উদ্দেশ্যে নিয়ে চলল। পথিমধ্যে উটটি মারা গেল তাহলে এতে ক্রেতার মাল ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। তারপর ক্রেতা যদি আয়েবের কথা প্রমাণ করতে পারে তাহলে সে বিক্রেতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ক্রেতার কবজা থেকে দাসী পালিয়ে গেল। তারপর ক্রেতা দাসীর কোন দোষ জানতে পারল তাহলে দাসীর জীবদশায় ক্রেতা কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। যদি সে মারা যায় তাহলে দোষের ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। কেউ দাসীর বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করল। আর ক্রেতা ও বিক্রেতা দখল বিনিময় করল। এরপর ক্রেতা দাসীর সাথে সঙ্গম করল। এদিকে গোলামের ক্রেতা খিয়ারে রুগ্নত, বা খিয়ারে আয়েবের ভিত্তিতে গোলাম এ কারণে সে ফেরত দিল। এক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার থাকবে, অর্থাৎ দাসীকে কবজা করার দিন তার যে বাজার মূল্য ছিল সেই মূল্য আদায় করে নিবে অথবা দাসীকেই ফেরত নিয়ে নিবে। কিন্তু লোকসান বাবদ কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। যদি সে কুমারী হয়। এমনি ভাবে উকর (যিনার বদলা)ও পাবে না; যদি সে সায়িয়া হয় (যখীরা)।

৪৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট দাসীর বিনিময়ে একটি গোলাম বিক্রি করল। তারপর তারা উভয়ে উভয়ের খরিদকৃত বস্তু কবজা করে নিল। তারপর দাসী ক্রয়কারী ব্যক্তি দাসীর হাতে একটি আঙ্গুল বেশী আছে বলে দেখতে পেল। তাই সে আদালতের ফায়সালা অনুসারে দাসীকে বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিয়ে নিজের গোলামকে নিয়ে নিল। তারপর দাসীর মালিক জানতে পারল যে, দাসী খরিদকারী ব্যক্তি দাসীকে ফেরত দেওয়ার আগে তার সাথে সহবাস করেছে। সহবাসের কারণে অবশ্য তার কোন ক্ষতি হয় নি। ক্রেতার দাসীর সাথে সঙ্গম করার খবর দাসীর মালিক এমন অবস্থায় জানতে পারল যখন ঐ দাসী তার মালিকের নিকট মারা গেছে অথবা সে তাকে বিক্রি করে দিয়েছে, এ ক্ষেত্রে দাসীর মালিক ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছুই পাবে না (আল-মুহীত)।

৪৬. মাসআলা : হিময়ার আল ওয়াবরী; ইউসুফ ইবন মুহাম্মাদ এবং উমর ইবনুল হাফিয (র)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি একটি গাভীর বদলে একটি বলদ বিক্রি করল। তখন ঐ গাভীটি গাভীন ছিল। ক্রেতার কবজায় যাওয়ার পর সেটি একটি বাচ্চা দিল।

ওদিকে বলদ ক্রয়কারী ব্যক্তি বলদের মধ্যে আয়েব দেখতে পেল। এ কারণে সে বলদটিকে তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিল। এহেন অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি বলদের মালিকের নিকট হতে বলদের মূল্য ফেরত নিবে। নাকি গাভীর মূল্য ফেরত নিবে? জবাবে তারা বললেন, গাভীর মূল্য ফেরত পাবে (তাতার খানিয়া)। কেউ যমীন খরিদ করে তাতে মসজিদ নির্মাণ করল। তারপর ক্রেতা তাতে আয়েব দেখতে পেল তাহলে কোন ইমামের মতেই তাকে আর ফেরত দেওয়া যাবে না। তবে সে ক্ষতিপূরণ পাবে কিনা? এ সম্বন্ধে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। ফাতওয়ার জন্য পসন্দনীয় অভিমত হল, সে ক্ষতিপূরণ পাবে। যেমন কেউ কোন ভূমি ক্রয় করে তা ওয়াক্ফ করে দেওয়ার পর তাতে আয়েব দেখতে পেল তবে ফকীহ হিলাল (র) বলেন, আয়েবজনিত লোকসানের কারণে সে ক্ষতিপূরণ পাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক ব্যক্তি কাপড় খরিদ করে এর দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে কাফন দিল। তাহলে দেখতে হবে যে, এই ব্যক্তির সাথে মৃত ব্যক্তির কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে কিনা? যদি ক্রেতা মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস হয় এবং সে এই কাপড় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল দ্বারা খরিদ করে থাকে তাহলে সে এ কাপড়ের আয়েব জনিত লোকসানের কারণে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। কিন্তু যদি কাপড় ক্রেতা কোন আজনবী অর্থাৎ বাইরের লোক হয় এবং নেক কাজ মনে করে কাফনের জন্য কাপড় কিনে দিয়ে থাকে তবে সে আয়েবজনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ পাবে না (মুহীত)। এক ব্যক্তি কোন গাছ খরিদ করে তা কর্তন করার পর দেখল যে, এটি জ্বালানী কাঠ ব্যতীত অন্য কোন কাজের উপযোগী নয়, তাহলে এ ক্ষেত্রেও সে আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ পাবে। অর্থাৎ গাছটি ফেরত দেওয়া যাবে না। কিন্তু বিক্রেতা যদি ঐ কর্তিত বৃক্ষ ফেরত নিতে রাযী হয় তবে এটিও তাকে ফেরত দেওয়া যাবে না। ফকীহগণ বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ঐ বৃক্ষ জ্বালানী কাঠের জন্য ক্রয় না করা হয়। পক্ষান্তরে গাছটি যদি জ্বালানী কার্যের জন্য ক্রয় করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না (যখীরা)।

৪৭. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, কোন মুসলমানের খরিদ করা আগুরের রস তার কবজায় থাকা অবস্থায় মদ হয়ে গেল। ঐ মুসলিম ক্রেতা পূর্ব দোষের কারণে এটিকে ফেরত দিতে পারবে না। তবে দোষের ক্ষতিপূরণ পাবে। এমন কি বিক্রেতা মদ ফেরত নিতে রাযী হলেও জায়েয হবে না। কেননা ফেরত প্রদানের এই নিষিদ্ধতা হলো শরীআতের হকের কারণে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি বিক্রেতার সাথে এ আয়েবের ব্যাপারে কোন রূপ ঝগড়া না করে, তারপর তা সিরকায় পরিণত হয়ে যায় তবে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ পাবে। কিন্তু আয়েবের কারণে তা ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু বিক্রেতা যদি ফেরত নিতে রাযী থাকে তবে ফেরত দিতে পারবে (আল-মুহীত)।

৪৮. মাসআলা : এক খৃস্টান অপর কোন খৃষ্টানের নিকট হতে মদ খরিদ করে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বস্তু কবজা করে নিল। তারপর তারা উভয়ে ইসলাম কবুল করে নিল। তারপর ক্রেতা মদের মধ্যে আয়েব দেখতে পেল তাহলে আয়েবের কারণে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারবে না। যদিও বিক্রেতা তা কবুল করে নিতে রাযী থাকে। কিন্তু আয়েব জনিত

লোকসানের ক্ষতিপূরণ পাবে। ক্রেতা যদি লোকসানের না নেয়, ইত্যবসরে মদ সিরকা হয়ে যায় তবে ক্রেতা তা বিক্রেতাকে ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু যদি বিক্রেতা তা ফেরত নিতে রাখী থাকে তবে ফেরত দিতে পারবে (যখীরা)। আবুল কাসেম (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কেউ সিরকা খরিদ করল। তারপর তা ক্রেতার পাত্রে ঢালার পর দেখা গেল যে, তা এমন দুর্গন্ধ যুক্ত হয়ে গেছে যে, তা আর কোন কাজে লাগনো সম্ভব নয় তাহলে এর হুকুম কি হবে? তিনি বললেন, এটা ক্রেতার কাছে আমানত হিসাবে থাকবে। এরপর যদি তা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায় বা খোয়া যায় তবে ক্রেতার উপর কোনরূপ জরিমানা ওয়াজিব হবে না। তারপর তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল যে, উক্ত সিরকা এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ক্রেতা যদি তা মাটিতে ঢেলে (ফেলে) দেয় তাহলে এর হুকুম কি হবে? তিনি বললেন, যদি উক্ত সিরকা একেবারে মূল্যহীনতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করে তবে ক্রেতার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (তাতার খানিয়া)। কোন বস্তু দুই বার বিক্রিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ক্রেতা যদি তাতে আয়েব দেখতে পায়, সর্বোপরি বস্তুটি তার কবজায় যাওয়ার পর যদি তাতে আরেকটি আয়েব সৃষ্টি হয় এবং এ কারণে উক্ত ব্যক্তি একে বিক্রেতার নিকট প্রত্যাহার করতে না পারায় সে যদি আয়েবজনিত লোকসানের কারণে দ্বিতীয় বিক্রেতার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ নিয়ে নেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে প্রথম ক্রেতা প্রথম বিক্রেতার নিকট হতে দোষের ক্ষতিপূরণ উসুল করতে পারবে না। কিন্তু সাহেবাইন ভিন্ন মত পোষণ করেন (আস-সুগরা)।

৪৯. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করে তা কবজা করতঃ অন্য কারো নিকট বিক্রি করে দিল। তারপর গোলামটি দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট মারা গেল। তারপর এই ব্যক্তি গোলামের এমন কোন আয়েবের ব্যাপারে জানতে পারল- যা তার মধ্যে প্রথম বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায়ই বিদ্যমান ছিল। তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতা দ্বিতীয় বিক্রেতার নিকট হতে আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয় বিক্রেতা প্রথম বিক্রেতার নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। কেননা আয়েব জনিত লোকসানের কারণে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ হয়ে যায়নি। অতএব এই দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয় বাকী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিক্রেতা প্রথম বিক্রেতার নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে সগীর গ্রন্থে বলেছেন যে, কেউ এক হাজার দিরহাম মূল্যের বিনিময়ে একটি গোলাম বা দাসী খরিদ করার পর ক্রেতা ও বিক্রেতা দখল বিনিময় করল। তারপর ক্রেতা স্বীকার করল যে, বিক্রেতা বিক্রয়ের আগেই আযাদ করে দিয়েছে বা মুদাক্ক্বার বানিয়েছে অথবা দাসীকে উম্মু ওয়ালাদ বানিয়েছে কিন্তু বিক্রেতা কসম করে তা অস্বীকার করল, তবে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার বিরুদ্ধে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে আযাদ করার ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তির কারণে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং তাঁর ওয়ালা (৫১) মওকুফ থাকবে। মুদাক্ক্বার বানানোর মাসআলার মধ্যে গোলাম মুদাববার বলে গণ্য হবে। তবে বিষয়টি কার্যকরী না হয়ে মওকুফ থাকবে। এমনিভাবে উম্মু ওয়ালাদ বানানোর মাসআলার ক্ষেত্রেও একই হুকুম। আর যদি ক্রেতা তাতে ক্রয় পূর্ব কোন দোষের কথা জানতে পারে তাহলে ক্রেতা আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ পাবে।

এমনিভাবে ক্রেতা যদি এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, এই গোলাম আসলে আযাদ আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে ক্রেতা আয়েবজনিত লোকসানের কারণে ক্ষতিপূরণ পাবে (মুহীত)।

৫০. মাসআলা : খরিদকৃত গোলামের ব্যাপারে ক্রেতা যদি দাবী করে যে, বিক্রেতা এই গোলাম বিক্রি করেছে বটে, তবে এটি তার নয়, বরং অমুকের মালিকানাধীন গোলাম। আর অমুক ব্যক্তিও যদি তার এ দাবীর সত্যতা স্বীকার করে ঐ গোলামকে নিয়ে নেয় তারপর ক্রেতা তাতে কোন আয়েব ছিল বলে জানতে পায় তাহলে সে কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না। পক্ষান্তরে অমুক ব্যক্তি যদি ক্রেতার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে সে তা ফিরিয়ে দিতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। ক্রেতা যদি প্রথমে আয়েবের ব্যাপারে জ্ঞাত হয়; তারপর এই গোলাম অমুকের গোলাম বলে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে এবং অমুক ব্যক্তি তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে ক্রেতা এই গোলামকে ফেরত দিতে পারবে (কাফী)। ক্রেতা যদি গোলামের মধ্যে কোন পুরাতন আয়েবের সন্ধান পায়, তারপর ক্রেতার কবজায় যাওয়ার পর তার মধ্যে আরেকটি নতুন আয়েব সৃষ্টি হয়, ফলে এই গোলামকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে, আর তা যদি “এটি অমুক ব্যক্তির গোলাম” বলে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করার আগে হয়ে থাকে এবং ক্রেতা ক্ষতিপূরণও পেয়ে থাকে; এরপর ক্রেতা যদি স্বীকার করে যে, এটি অমুক ব্যক্তির গোলাম এবং অমুক ব্যক্তিও তার কথার সত্যতা মেনে নেয় তাহলে বিক্রেতা তার থেকে নেওয়া ক্ষতিপূরণ ক্রেতার নিকট থেকে উসুল করে নিতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৫১. মাসআলা : যদি কেউ গোলাম খরিদ করে তাকে কবজা করে নেয়, তারপর বলে, আমি তাকে খরিদ করার পর অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিয়েছি এবং সে তাকে আযাদ করে দিয়েছে। এ কথা শুনে যদি উক্ত ব্যক্তি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে গোলাম ক্রেতার তরফ হতে তার স্বীকারোক্তির কারণে আযাদ হয়ে যাবে। এরপর যদি ক্রেতা ঐ গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় তাহলে সে বিক্রেতার নিকট হতে কোন কিছু ফেরত পাবে না। যদি ক্রেতা দাবী করে যে, আমি এ গোলাম অমুকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। কিন্তু “আযাদ করে দিয়েছি” না বলে। তারপর এ কথা শুনে ঐ ব্যক্তি তা অস্বীকার করে এবং কসম করে এ বিষয়টিকে আরো সুদৃঢ় করে। তারপর ক্রেতা তাতে কোন আয়েব দেখতে পায় তাহলে ক্রেতা গোলামকে বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫২. মাসআলা : কেউ এক হাজার দিরহাম মূল্যে একটি গোলাম খরিদ করল এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা দখল বিনিময় করল। এরপর ক্রেতা স্বীকার করল যে, এই গোলাম অমুক ব্যক্তির। এবং সে আমার ক্রয়ের আগেই তাকে আযাদ করে দিয়েছে। কিন্তু বিক্রেতা তা অস্বীকার করল। এ অবস্থায় উক্ত মাসআলায় তিন সূরত হতে পারে। (১) হয়তো مقرر (যার পক্ষে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করা হয়েছে) ক্রেতাকে মালিকানা এবং আযাদ করা উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রে সত্য বলে মেনে নিবে। (২) অথবা মালিকানার ক্ষেত্রে মানবে, কিন্তু আযাদ করার বিষয়ে

মানবে না। (৩) অথবা উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রে **مقرم** ক্রেতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় এই গোলাম **مقرم** এর আবাদকৃত গোলাম বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে যদি ক্রেতা ঐ গোলামের মধ্যে পুরাতন কোন আয়েব পায় তবে সে বিক্রেতার নিকট হতে কিছুই ফেরত পাবে না। দ্বিতীয় অবস্থায় অমুক ব্যক্তি অর্থাৎ **مقرم**-কে এই গোলাম দিয়ে দেওয়া হবে এবং সে তার গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। আবাদ হবে না। এহেন অবস্থায় ক্রেতা যদি তার মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় তবে সে বিক্রেতার নিকট হতে কিছুই ফেরত পাবে না। আর শেষোক্ত অবস্থায় গোলাম ক্রেতার তরফ হতে আবাদ হয়ে যাবে। তবে ওয়ালা (ولا) মওকুফ থাকবে। এ অবস্থায় ক্রেতা যদি গোলামের মধ্যে কোন পুরাতন আয়েবের সন্ধান পায় তাহলে সে বিক্রেতার নিকট হতে দোষের ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে (মুহীত)। উপরোক্ত অবস্থায় যদি **مقرم** ক্রেতার সত্যবাদী হওয়ার কথা মেনে নেয় তবে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হতে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ ফেরত নিয়ে নিবে। আর যদি ক্রেতা এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, এই গোলাম অমুক ব্যক্তির ছিল এবং আমার ক্রয় করার পরে সে তাকে আবাদ করেছে তাহলে ক্রেতা আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ পাবে না। চাই **مقرم** তাকে সত্য বলে জানুক বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক (মুহীত : আস-সারাখসী)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : আয়েবের দাবী এবং এ ব্যাপারে বিবাদ সাক্ষ্য উপস্থাপন

১. মাসআলা : বিক্রয় দ্রব্যের দোষ দু' প্রকার, (১) এমন প্রকাশ্য দোষ যা বিচারক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে চিনতে পারে। যেমন ফোড়া ওঠা, অন্ধ হয়ে যাওয়া। অতিরিক্ত আগুল থাকা ইত্যাদি। (২) এমন অপ্রকাশ্য দোষ যা বিচারক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে চিনতে পারে না। প্রকাশ্য দোষ আবার কয়েক প্রকার (১) পুরানো দোষ যেমন, অতিরিক্ত আগুল থাকা ইত্যাদি। (২) নতুন দোষ, যা ক্রয়কাল থেকে বিবাদকালের মাঝে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। যেমন- বসন্তের দাগ ইত্যাদি। (২) নতুন দোষ যা ক্রয়কাল থেকে বিবাদকালের মাঝে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। যেমন জখম ইত্যাদি। (৩) নতুন দোষ যা ক্রয়-পূর্বকালের হওয়া অসম্ভব। তদ্রূপ অপ্রকাশ্য দোষও দুই প্রকার (১) এমন দোষ যা বিক্রয় দ্রব্যে বিদ্যমান আলামত ও চিহ্ন দ্বারা বুঝা যায়। যেমন অকুমারী হওয়া, গর্ভবতী হওয়া কিংবা এমন কোন স্থানে রোগ ব্যাধি হওয়া যা কোন পুরুষের পক্ষে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। (২) এমন আয়েব যা তার মধ্যে বিদ্যমান কোন নিদর্শন ও চিহ্ন দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়। যেমন চুরি করা, পালিয়ে যাওয়া কিংবা পাগল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এখন কেউ যদি এমন প্রকাশ্য দোষ দাবী করে যা চাক্ষুষ অবলোকন করা সম্ভব, তাহলে বিচারক তা পরীক্ষা করে দেখবে এবং দোষ বাস্তব হলে তিনি বাঁদীর বক্তব্য শুনবেন। অন্যথায় শুনবেন না। আর যদি পুরোনো দোষ হয় অথবা এমন নতুন আয়েব হয় যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় হতে বিবাদ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় তাহলে ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুকে উক্ত আয়েবের কারণে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে। কেননা চোখে দেখে আমরা জানতে পেরেছি যে, তাতে আয়েব আছে এবং আমরা এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হয়েছি যে, এটি বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায়ই তাতে বিদ্যমান ছিল। কেননা এ জাতীয় আয়েব সাধারণত এত অল্প সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। কিন্তু বিক্রেতা যদি দাবী করে যে, ক্রেতার সম্মতি ইত্যাদির

ভিত্তিতে উক্ত বস্তু ফেরত প্রদানের হক রহিত হয়ে গেছে, তাহলে ক্রেতা তখন আর ঐ বস্তু ফেরত দিতে পারবে না। এ অবস্থায় ক্রেতার কথা কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত)। উল্লেখ্য যে, যদি বিক্রেতা-ক্রেতার নিকট কসম তলব করে তবে সমস্ত রিওয়ায়েত অনুসারে ক্রেতাকে কসম করানো হবে। কিন্তু বিক্রেতা যদি ক্রেতার নিকট কসম তলব না করে তবে তার কসম গ্রহণ করা যাবে কিনা, এ সম্বন্ধে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ মাশাইখে কিরামের মতে এ অবস্থায় ক্রেতার থেকে কসম নেওয়া যাবে না। এটিই যাহিরী রিওয়ায়েত। ক্রেতার থেকে কসম গ্রহণ করা হবে? এ বিষয়েও ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ বিচারকের মতে তাকে বলা হবে, তুমি আল্লাহর নামে এ ভাবে শপথ কর যে, আল্লাহর কসম! আমি যে আয়েবের দাবী করছি সে আয়েবের কারণে খরিদকৃত মাল ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে আমার যে অধিকার রয়েছে তা কোন ভাবেই রহিত হয়নি। না **نصا** (স্পষ্ট কোন শব্দের মাধ্যমে) এবং না **دلالة** (অস্পষ্ট তথা ইংগিতবহ কোন শব্দের মাধ্যমে) এটিই সহীহ মতামত (মুহীত ও যখীর)।

২. মাসআলা : দোষ যদি এমন হয় যা উক্ত সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব বা এমন হয় যা ক্রয় পূর্ব কালে ঐ বস্তুতে থাকার সম্ভাবনা আছে অথবা তা যদি এমন হয় যে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া খুবই মুশকিল তাহলে বিচারক বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করবে যে, তোমার নিকট থাকা অবস্থায় কি এর মধ্যে এ আয়েব ছিল? যদি সে বলে, হ্যাঁ, ছিল, তাহলে ক্রেতা এই মাল ফিরিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বিক্রেতা যদি দাবী করে যে, উক্ত মাল ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ক্রেতার যে হক ছিল, তা রহিত হয়ে গেছে, তাহলে সে এ জাতীয় দাবী করতে পারবে। আর বিক্রেতার এই দাবী প্রমাণিত হবে দুই তরীকায়। অর্থাৎ ক্রেতার শপথ করা থেকে অস্বীকৃতি প্রকাশ করার দ্বারা অথবা বিক্রেতা কর্তৃক সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করার দ্বারা। পক্ষান্তরে “ক্রয়কৃত বস্তু বিক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায়ই তাতে উক্ত আয়েব বিদ্যমান ছিল” কথাটি বিক্রেতা যদি অস্বীকার করে তবে কসমের সাথে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি এই বিষয়ে ক্রেতার নিকট কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে (মুহীত)। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা কি ভাবে শপথ করবে, এ ব্যাপারে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। আমাদের মাশায়িখ কিরাম বলেছেন, সহীহ মতামত অনুসারে তাকে এ ভাবে কসম করানো হবে যে, আল্লাহর কসম! ক্রেতা যে আয়েবের দাবী করছে ঐ আয়েবের কারণে ঐ মাল ফেরত প্রদানের ব্যাপারে আমার উপর তার কোন অধিকার নেই (মুহীত : আস-সারাখসী)। এর উপরই ফাতওয়া (তাতার খানিয়া)।

৩. মাসআলা : যদি আয়েবের অবস্থা এমন হয় যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ের পূর্বকাল বলে বুঝা যায় না তবে বিচারক তা ফেরত প্রদানের নির্দেশ দিবেন না। আর যদি এমন অপ্রকাশ্য হয় যা আলামত ও নিদর্শন দ্বারা চিনা যায় এবং তা এমন স্থানে হয় সে সম্পর্কে পুরুষ মানুষও জ্ঞাত থাকতে পারে। তাহলে দেখতে হবে রোগ চিহ্নিত করার ব্যাপারে বিচারকের কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা? যদি বিচারকের অভিজ্ঞতা থাকে তবে তিনি নিজেই তা পরীক্ষা করে দেখবেন। আর যদি এ ব্যাপারে তাঁর কোন অভিজ্ঞতাও না থাকে তবে (অভিজ্ঞ) ন্যায়পরায়ণ

ব্যক্তিকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাদের কথার উপর নির্ভর করবেন। এতেই সর্বাধিক সতর্কতা নিহিত আছে। তবে একজন হলেও যথেষ্ট হবে। যদি একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষ রোগের কথা বলে তাহলে মকদ্দমা দাঁড় করাবার ক্ষেত্রে তার কথায় আয়েব প্রমাণিত হয়ে যাবে। তখন বিচারক বিক্রেতাকে কসম করাবে শুধু এই একজনের কথায় খরিদকৃত বস্ত্র ফেরত দেওয়া যাবে না। 'শরহুল জামে' গ্রন্থে কোন কোন মাশায়িখ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, ইমাম খাস্‌সাফ (র)-এর শরহু আদাবিল কাযী কিতাবে আছে, যদি আয়েব এ ধরনের হয় যা এই পরিমাণ সময়ের মধ্যে পয়দা হতে পারে এবং যা এক ব্যক্তি বা দুই ব্যক্তির কথার দ্বারা জানা যায় অথবা যদি উভয় ব্যক্তির এ ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয় এবং এ কারণে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত বস্ত্র বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাবে না। বরং তার থেকে কসম গ্রহণ করা হবে। আর আয়েব যদি এ ধরনের হয় যা এই পরিমাণ সময়ের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং তা যদি এক ব্যক্তির কথার দ্বারা জানা যায় তাহলে খরিদকৃত বস্ত্র ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাবে না। বরং বিক্রেতার থেকে কসম নেওয়া হবে। যদি বিষয়টি দুই ব্যক্তির কথার দ্বারা জানা যায় তাহলে কিতাবুল আকমিয়া এবং কুদুরী গ্রন্থে আছে যে, বিচারক ঐ দুই ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে খরিদকৃত মাল ফেরত দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করবেন। শরহুল জামে গ্রন্থে কোন কোন মাশাইখে কিয়াম অনুরূপ অভিমত উল্লেখ করেছেন (যখীরা)।

৪. মাসআলা : আয়েব যদি এ ধরনের হয় যা মহিলা ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব না হয় যেমন হামেলা হওয়া ইত্যাদি তাহলে বিচারক বিষয়টি (অভিজ্ঞ) মহিলাদেরকে দেখাবে। এ ক্ষেত্রে একজন ন্যায়পরায়ণ মহিলাই যথেষ্ট। তবে দুজন হলে অধিক সতর্কতা হয়। যদি একজন (বা দুজন) ন্যায়পরায়ণ মহিলা বলে যে, এই দাসী গর্ভবতী তবে তাদের বক্তব্যের ভিত্তিতে অভিযোগ দাঁড় করাবার ক্ষেত্রে আয়েব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তারপর যদি একজন বা দুজন মহিলা বলে যে, এই গর্ভ ক্রয়-বিক্রয়ের মুদতের মধ্যেই হয়েছে তাহলে বিচারক দাসীকে ফেরত দেওয়ার আদেশজারী করবেন না। কিন্তু বিক্রেতার নিকট হতে শপথ গ্রহণ করবেন। যদি সে শপথ করতে অসম্মতি ব্যক্ত করে তবে দাসীকে ফেরত দেওয়া যাবে। যদি এক বা দুজন মহিলা এ কথা বলে যে, এ আয়েব বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায়ই এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল, এ অবস্থায় দেখতে হবে যে, এটি কবজার আগে হয়েছে না পরে হয়েছে। যদি কবজার পরে হয়ে থাকে তবে ক্রয়-কৃত বস্ত্রটি ফেরত দেওয়া যাবে না। কিন্তু বিক্রেতার থেকে কসম নেওয়া হবে। আর যদি কবজার আগে হয়ে থাকে তবে এ ক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় একজনের কথায় মাল ফেরত দেওয়া যাবে না। কিন্তু দুই ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে মাল ফেরত দেওয়া যাবে কি না? এ সম্বন্ধে মাশাইখে কিরামের কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, এ অবস্থায় খরিদকৃত ফেরত দেওয়া যাবে না। আর সাহেবাইনের অভিমতের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, তা ফেরত দেওয়া যাবে। ইমাম খাস্‌সাফ (র) আদাবুল কাযীতে বর্ণনা করেছেন, যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে এ জাতীয় মাল ফেরত দেওয়া যাবে না। কুদুরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবু

ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হল, এ জাতীয় বস্ত্র ফেরত দেওয়া যাবে না। তবে বিক্রেতার থেকে কসম নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে সে যদি কসম করতে অসম্মতি প্রকাশ করে তবে দুই মহিলার সাক্ষ্য আরো মজবুত হয়ে যাবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে দাসীকে ফেরত দেওয়ার হক সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সদরুশ শহীদ (র) জামে সগীর গ্রন্থের ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে এবং গর্ভবতী হওয়ার দাবী করা অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন মহিলা বলে যে, এই দাসী হামেলা (গর্ভবতী) অপর পক্ষে অন্য দুই বা তিনজন মহিলা বলে যে, সে গর্ভবতী নয় তাহলে এই এক মহিলার বক্তব্যের ভিত্তিতে বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় হয়ে যাবে। অপর দুই বা তিন মহিলার বক্তব্য এই এক মহিলার বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। এহেন অবস্থায় বিক্রেতা যদি বিচারককে বলে, যে মহিলা ঐ দাসীর গর্ভবতী হওয়ার কথা বলছে, সে অজ্ঞ এ সম্পর্কে তার কোন জানা-শুনা নেই তাহলে এ অবস্থায় বিচারকের জন্য উচিত হবে এ বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখার জন্য কোন অভিজ্ঞ রমনীকে নিয়োগ করা (মুহীত)।

৫. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একজন বালিগা দাসী খরিদ করল। তারপর ক্রেতা দাবী করল যে, ঐ দাসী নপুংশক, তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ অবস্থায় বিক্রেতা থেকে কঠোর ভাবে কসম নেওয়া হবে। সে কসম করে বলবে যে, দাসী এরূপ নয়। কেননা পুরুষ মহিলা কেউই তাকে দেখতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি কোন দাসীর ব্যাপারে ইসতিহাযা রোগের দাবী করে তবে ঐ দাবী শ্রবণযোগ্য হওয়ার জন্য নিরীক্ষণকারী মহিলাদের বক্তব্য শুনা এবং কবজার আগে বা পরে তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দাসীকে ফেরত ক্ষেত্রে ঐ হুকুমই প্রযোজ্য হবে, যে হুকুম প্রযোজ্য হয়ে থাকে গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে। তবে পার্থক্য এই যে, যদি ইসতিহাযার বিষয়ে কোন পুরুষ সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের সাক্ষ্য কবুল হবে। কেননা রক্ত দেখে পুরুষ লোকও তা চিনতে ও বুঝতে পারে। কাজেই পুরুষ মানুষের সাক্ষ্য দ্বারাও এই বিষয়টি সাব্যস্ত হতে পারবে (মুহীত)।

৬. মাসআলা : খরিদা দাসীকে কবজা করার পর ক্রেতা যদি দাসীর হায়েয না হওয়ার দাবী করে তবে এর সমাধান সম্পর্কে শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফযল (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে ক্রেতার দাবী শ্রবণযোগ্য হবে না। কিন্তু সে যদি হামল বা অন্য কোন রোগের কারণে হায়েয বন্ধ হওয়ার দাবী করে তবে তার দাবী শ্রবণযোগ্য হবে। অতএব যদি উক্ত ব্যক্তি এ মর্মে দাবী করে যে, গর্ভবতী হওয়ার কারণে তার শ্রাব বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে তার এ কথা শ্রুত হবে এবং বিচারক তাকে মহিলাদের মাধ্যমে নিরীক্ষা করবে। যদি তারা বলে সত্যিই সে গর্ভবতী তাহলে বিক্রেতার থেকে এ মর্মে শপথ নেওয়া হবে যে, এই দাসী তার নিকটে থাকা অবস্থায় গর্ভবতী ছিল না। পক্ষান্তরে নিরীক্ষণকারী মহিলাগণ যদি বলে, সে গর্ভবতী নয় তবে কসম করা বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। রোগের কারণে শ্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার দাবী করার ক্ষেত্রে ডাক্তারদের কথা ধর্তব্য হবে (যখীরা)। ক্রেতা যদি দাবী করে যে, গর্ভবতী হওয়ার কারণে এই দাসীর শ্রাব বন্ধ হয়ে গেছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনাতে আছে যে, ক্রয়কাল থেকে দাবী উত্থাপন পর্যন্ত যদি চারমাস দশদিন সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ক্রেতার দাবী শ্রবণযোগ্য হবে।

কিন্তু এর থেকে কম হলে তা শ্রুত হবে না। অপর বর্ণনায় আছে যে, এই মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ যদি দুইমাস পাঁচ দিন হয় তবে ক্রেতার কথা শ্রবণযোগ্য হবে। মানুষের আমল এর উপরই। ফাতওয়ার জন্য এটিই পসন্দনীয় অভিমত (মুখতারুল ফাতওয়া)।

৭. মাসআলা : ক্রেতা কর্তৃক এ জাতীয় দাবী উত্থাপিত হওয়ার পর বিচারক বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করবে; দাসী সম্পর্কে ক্রেতা যা বলছে; তা কি সত্য? যদি সে হ্যাঁ বলে তবে বিচারক দাসীকে বিক্রেতার নিকট ফেরত প্রদানের আদেশ দেবেন। আর যদি বলে, এ অবস্থা এখন হয়েছে; আমার নিকটে থাকা অবস্থায় এরূপ ছিল না তাহলে বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় হয়ে যাবে। কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই দাসীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একে অপরকে সত্যায়ন করছে। এক্ষেত্রে ক্রেতা যদি বিক্রেতার নিকট কসম তলব করে তাহলে বিচারক তার দ্বারা শপথ করাবেন। বিক্রেতা কসম করার পর সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে তবে দাসীকে তার নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে। উক্ত অবস্থায় ক্রেতা যদি তার দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তবে হয়েয বন্ধ হওয়ার দাবীর ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু ইসতিহাযার দাবীর ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি বর্তমানে হয়েয বন্ধ হওয়ার দাবীকে অস্বীকার করে তবে তার থেকে কসম নেওয়া যাবে কি না? এ সম্পর্কে আমাদের ইমামত্রয়ের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার থেকে কসম নেওয়া যাবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে তার থেকে কসম নেওয়া হবে (আন-নাহরুল ফায়িক)।

৮. মাসআলা : কিতাবুল আকযিয়া তথা বিচার অধ্যায়ে আছে, ক্রেতা অভিযোগ করল যে, ক্রয় পূর্বকাল থেকেই দাসীর মাথায় একটি জখম আছে এই দাবীর প্রেক্ষিতে বিচারক বিক্রেতাকে কসম করতে বলল, কিন্তু সে কসম করতে অস্বীকার করল। তখন ক্রেতা দাসীকে তার কাছে ফিরিয়ে দিল। তারপর বিক্রেতা এ মর্মে দাবী করল যে, দাসী ক্রেতার নিকটে গর্ভবতী হয়েছে এবং এখনো সে ঐ গর্ভবতী অবস্থায়ই আছে। এক্ষেত্রে বিচারক ক্রেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যদি সে বলে যে, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না তখন বিচারক মহিলাদের মাধ্যমে দাসীকে পরীক্ষা করাবেন। মহিলাগণ যদি বলে, সে সত্যিই গর্ভবতী, তবে শুধুমাত্র তাদের কথায় তাকে ফেরত দেওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু ক্রেতার উপর এতেই অভিযোগটি দাঁড় হয়ে যাবে। কাজেই তাকে শপথ করানো হবে। সে আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, দাসী তার নিকটে থাকা অবস্থায় হামেলা হয় নি। যদি সে এ মর্মে হলফ করে তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে দাসীকে ফেরত প্রদানের বিষয়টি পূর্ববৎ বলবৎ থাকবে। পক্ষান্তরে সে যদি কসম করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তাহলে বিক্রেতার দাবী প্রমাণিত হয়ে যাবে। তখন বিক্রেতা যখম জনিত লোকসানসহ দাসীকে ক্রেতার নিকট সমর্পণ করে দিবে। এ অবস্থায় বিক্রেতা যদি বলে, গর্ভবতী হওয়ার আয়েবসহ আমি দাসীকে আমার নিকট রেখে দিতে রাবী আছি এবং যখমজনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ আমি নিব না, তাহলে সে এরূপ করতে পারবে। বিচারক ক্রেতাকে দাসীর গর্ভ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সে যদি বলে, ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় সে এ গর্ভ ধারণ করেছে

এবং এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না তাহলে বিচারক তার কথা শ্রবণ করে বিক্রেতাকে কসম করাবে। যদি সে কসম করে তবে তার নিকট দাসীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হবে না। আর যদি ক্রেতা তার নিজের নিকট দাসীর গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে তবে বিক্রেতা দাসীকে ক্রেতার নিকট সমর্পণ করতে পারবে। তবে এর সাথে যখম জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণও দিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি শপথ করতে অস্বীকার করে তবে এতে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, এ আয়েব বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায়ই সৃষ্টি হয়েছে। দাসীকে ফেরত দেওয়াও সহীহ ছিল। কিতাবুল আকযিয়াতে একথাও বর্ণিত আছে যে, বিচারক যখমজনিত দোষের কারণে দাসীকে ফেরত দেওয়ার হুকুম দানের পর ক্রেতা তাকে বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার পূর্বে বিক্রেতা যদি বলে যে, সে গর্ভবতী এবং ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় হয়েছে। আর ক্রেতা বলে যে, না এটি বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় হয়েছে, তাহলে বিচারক দাসীকে ফেরত দেওয়ার আদেশ জারী করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। বরং তিনি ক্রেতার এ দাবীর উপর বিক্রেতার নিকট থেকে কসম গ্রহণ করবেন। বিক্রেতা এ মর্মে কসম করবে যে, এ গর্ভ ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায়ই হয়েছে। এ অবস্থায় ক্রেতার উপর কসমের হুকুম বর্তাবে না (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : আয়েব যদি এমন অপ্রকাশ্য হয় যা শরীরের কোন আলামত দ্বারা চিনা যায় না, যেমন পালিয়ে যাওয়া; পাগল হয়ে যাওয়া, চুরি করা, বা বিছানায় পেশাব করা ইত্যাদি, এ সব আয়েব তৎক্ষণাৎ সাব্যস্ত হওয়া অপরিহার্য। এ জাতীয় আয়েব চিন্তার পন্থা সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মাদ (র) জামে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আদালতে এ জাতীয় আয়েবের ব্যাপারে অভিযোগ আসার পর বিচারক বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এর মধ্যে এ সব দোষ বর্তমানে আছে কি? ফকীহগণ বলেন, ক্রেতার দাবী সহীহ প্রমাণিত হওয়ার পরই বিচারক এ সম্পর্কে বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। এর আগে নয়। আর ক্রেতার দাবী তখনই সহীহ প্রমাণিত হবে যদি ক্রেতা এ মর্মে দাবী করে যে, এই আয়েব বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায়ই তার মধ্যে ছিল। তারপর ক্রেতার কবজায় আসার পরও তা ঐ দাসীর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, পাগল হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেই কেবল মাত্র ক্রেতার এতটুকু কথা বলা তার দাবী সহীহ প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া চুরি করা বা বিছানায় পেশাব করার অভিযোগের ক্ষেত্রে তার দাবী সহীহ প্রমাণিত হওয়ার জন্য আরো কিছু কথা বলা জরুরী। আর তা হল : ক্রেতার এ মর্মে দাবী করা যে, এই আয়েব সমূহ বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায়ই দাসীর মধ্যে ছিল এবং আমার কাছে আসার পরও তা তার মধ্যে আছে। অবস্থা একই রকমের। অবস্থা একই রকমের হওয়ার মানে হলঃ এই আয়েব ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের নিকটে বালিগ হওয়ার আগে পাওয়া যায় অথবা বালিগ হওয়ার পরে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় যদি এই আয়েব বালিগ হওয়ার পূর্বে পাওয়া যায় এবং ক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় বালিগ হওয়ার পরে পাওয়া যায় তাহলে ক্রেতার দাবী সহীহ হওয়ার জন্য এবং এই দাবীর প্রেক্ষিতে বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট হবে না। কিন্তু পাগলত্বের দোষের বিষয়টি ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এই আয়েব চাই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের নিকটে বালিগ হওয়ার পূর্বে পাওয়া যাক অথবা বালিগ হওয়ার পরে পাওয়া যাক

অথবা বিক্রেতার নিকটে বালিগ হওয়ার পূর্বে এবং ক্রেতার নিকটে বালিগ হওয়ার পরে পাওয়া যাক সব অবস্থায় এই একই হুকুম হবে। অর্থাৎ এতটুকু পাওয়া যায়ই ক্রেতার দাবী সহীহ হওয়ার এবং এই দাবীর প্রেক্ষিতে বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যথেষ্ট হবে (যখীরা)। যদি ক্রেতা গোলামের পালিয়ে যাওয়া বা এ জাতীয় কোন আয়েবের দাবী করে যে আয়েবের ক্ষেত্রে খরিদকৃত দাস-দাসীকে বিক্রেতার নিকট ফেরত প্রদানের বিষয়টি উক্ত আয়েব ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের নিকট পাওয়া যাওয়ার উপর নির্ভরশীল, যেমন বিছানায় পেশাব করা; চুরি করা বা পাগল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি এ জাতীয় আয়েবের দাবী করার ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতা ঐ দোষ বর্তমান থাকার কথা অস্বীকার করে তবে বিক্রেতাকে কসম করানো হবে না। যাবৎ না ক্রেতা এ মর্মে দলীল-প্রমাণ পেশ করবে যে, এই গোলাম তার নিকট থেকেই পালিয়ে গেছে। যদি বিক্রেতা এ মর্মে স্বীকারোক্ত ব্যক্ত করে যে, দাস-দাসীর মধ্যে এই আয়েব বর্তমান আছে তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তার নিকটে থাকা অবস্থায় এই আয়েব তার মধ্যে ছিল কিনা, যদি সে স্বীকার করে তবে বিচারক-ক্রেতার অনুরোধে তাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত প্রদানের নির্দেশ জারী করবেন। আর যদি বিক্রেতা বর্তমানে তার মধ্যে ঐ দোষ বিদ্যমান থাকার বিষয়টিকে অস্বীকার করে তবে ক্রেতার নিকট হতে এ মর্মে দলীল-প্রমাণ চাওয়া হবে যে, এই গোলাম বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় পলায়ন করত। এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর বিচারক এই গোলামকে বিক্রেতার নিকট ফেরত প্রদানের আদেশ দিবেন। অন্যথায় বিক্রেতার নিকট হতে শপথ নেওয়া হবে। সে আল্লাহর নামে এভাবে হলফ করবে যে, আল্লাহর কসম আমি এই গোলামকে বিক্রি করে তাকে ক্রেতার নিকট হস্তান্তরও করে দিয়েছি এবং আমার নিকটে থাকা অবস্থায় সে কখনো পলায়ন করে নি। তারপর ক্রেতা যদি এ মর্মে দলীল-প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামের মধ্যে এখনো আয়েব বিদ্যমান আছে তাহলে বিক্রেতার নিকট থেকে আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করা হবে। সে শপথ করে বলবে যে, আল্লাহর কসম; এই গোলাম আমার কাছে থাকা অবস্থায় কখনো পলায়ন করেনি। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি দলীল-প্রমাণ পেশ না করে এবং বিক্রেতাও স্বীকার না করে তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতার নিকট হতে কসম নেওয়া যাবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে কসম গ্রহণ করা যাবে (আন্-নাহরুল ফায়িক)। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এই আয়েবের সাথেই ক্রেতা-এই গোলামকে নেওয়ার জন্য রাযী আছে। বিক্রেতার পক্ষ এই জাতীয় দাবী করা ব্যতিরেকে ক্রেতার নিকট থেকে শপথ নেওয়া যাবে না। তারপর বিক্রেতা যখন দাবী করবে তখন তার থেকে কেমন করে শপথ গ্রহণ করা হবে এ বিষয়ে অধিকাংশ বিচারকের অভিমত হল : সে আল্লাহর নামে হলফ করে বলবে যে, আল্লাহর কসম, এই গোলামকে ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে আমার হক রহিত হয়নি যেমনটি দাবী করছে বিক্রেতা। স্পষ্ট ভাবেও তা রহিত হয়নি এবং ইংগিতবহ কোন শব্দ বা আচরণের কারণেও রহিত হয়নি। এটিই সহীহ মতামত (আল-বাহরুর রায়িক)।

১০. মাসআলা : কোন ব্যক্তি গোলাম খরিদ করার পর তাতে আয়েব দেখতে পেল। কিন্তু বিক্রেতা খরিদকৃত বস্তুটি তার নিকটে থাকা অবস্থায় তাতে আয়েব ছিল কথাটি স্বীকার করল না এবং তা মেনে নিতে রাযী হল না। ইত্যবসরে ক্রেতা দুজন সাক্ষী পেশ করল। তন্মধ্যে একজনে বলল, এই গোলামের মধ্যে আয়েব থাকা অবস্থায়ই সে তাকে বিক্রি দিয়েছে। আর

অপর জনে বলল বিক্রেতা ঐ গোলামের আয়েবের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছিল, তাহলে এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি দুই সফকায় (লেনদেন) একটি গোলাম খরিদ করল। যেমন কেউ পঞ্চাশ দীনারের বিনিময়ে গোলামের অর্ধাংশ খরিদ করল। এরপর বাকী অর্ধেক খরিদ করল সে একশ' দিরহামের বিনিময়ে এবং তখন সে এতে আয়েব আছে বলে জানতে পারল। তারপর সে বলল উক্ত দুই বারের লেনদেনের পূর্বেই এই আয়েব গোলামের মধ্যে ছিল। কিন্তু বিক্রেতা বলল, এই দুই লেনদেনের পরে তোমার নিকটে থাকা অবস্থায় এই আয়েব সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি ক্রেতা বলে, আমি দ্বিতীয় অর্ধেকের মধ্যে বিক্রেতাকে কসম দিচ্ছি এবং প্রথম অর্ধেকের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা (توقف) করছি। কেননা দ্বিতীয় রাযের লেনদেনের সময় ঐ গোলামের মধ্যে আয়েব ছিল, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কিন্তু প্রথম বারের লেনদেনের সময় তাতে আয়েব ছিল কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। এরূপ বলার ব্যাপারে ক্রেতার অধিকার রয়েছে। এ পর্যায়ে বিক্রেতা যদি কসম করে তবে ক্রয়-বিক্রয় ক্রেতার যিম্মায় অপরিহার্য হয়ে যাবে। আর কসম না করলে ক্রয়-বিক্রয় রদ করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অর্ধেকের মধ্যে শপথ করানোর পর ক্রেতা ইচ্ছা করলে প্রথম অর্ধেকের মধ্যেও শপথ করাতে পারবে (কাফী)। দ্বিতীয় অর্ধেকের মধ্যে অভিযোগ উত্থাপনের আগে ক্রেতা যদি প্রথম অর্ধেকের মধ্যে অভিযোগ উত্থাপন করে এবং বিক্রেতা যদি শপথ করার বিষয়টি অস্বীকার করে তাহলে প্রথম অর্ধেক বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তারপর ক্রেতা যদি ঐ অস্বীকৃতির ভিত্তিতে দ্বিতীয় অর্ধেকও ফিরিয়ে দিতে চায় তাহলে সে তা করতে পারবে না। যাবৎ না এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র ভাবে কোন অভিযোগ উত্থাপন করবে (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : ক্রেতা যদি গোলামের উভয় অংশের ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করে তবে তার এই ইখতিয়ার থাকবে। উল্লেখ্য যে, প্রথম অর্ধেকের মধ্যে আয়েবের ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করা দ্বিতীয় অর্ধেকের মধ্যেও স্বীকৃতি প্রদানের নামান্তর। কিন্তু বিষয়টি যদি এর বিপরীত হয় তবে সে ক্ষেত্রে এ হুকুম হবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় অর্ধেকের মধ্যে আয়েবের ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করার দ্বারা প্রথম অর্ধেকের মধ্যে আয়েবের স্বীকৃতি প্রদান করা সাব্যস্ত হবে না। এমনিভাবে কোন এক অংশের ব্যাপারে কসম করা থেকে অস্বীকৃতি প্রকাশ করার দ্বারা অপর অংশের ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি সাব্যস্ত হবে না (কাফী)। ক্রেতা যদি খরিদকৃত গোলামের উভয় অংশের ব্যাপারে অভিযোগ তুলে তবে। (বিক্রেতা একজন হলে) এক বিক্রেতার উপর এক কসমই ওয়াজিব হবে। কেননা ক্রেতা এ ক্ষেত্রে দুই দাবীকে একত্রিত করে ফেলেছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে এক কসমই যথেষ্ট হবে। যেমনিভাবে কয়েক ঋণকে একই দাবীর মধ্যে জমা করার অবস্থায় একই কসম যথেষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং বিক্রেতা যদি কসম করাকে অস্বীকার করে তাহলে পূর্ণ গোলাম তার যিম্মায় অপরিহার্য হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি গোলামের এক অংশের ব্যাপারে কসম করে কিন্তু অন্য অংশের ব্যাপারে কসম না করে তবে যে অংশের ব্যাপারে কসম করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছে তা তার যিম্মায় অপরিহার্য হবে। অন্য অংশটি নয়। বিক্রেতা যদি দুজন হয় এবং তারা এক সফকায় বা দুই সফকায় (লেনদেনে) কোন গোলামকে অপর কারো নিকট বিক্রি করে এবং তাদের থেকে কোন একজন

মারা যায় ফলে অপর কোন ব্যক্তি তার ওয়ারিস হয়; এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি ঐ গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় তাহলে সে ইচ্ছা করলে এক অংশের ব্যাপারে অভিযোগ করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে উভয় অংশের ব্যাপারেও অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে। যদি ক্রেতা বিক্রেতার নিকট কোন এক অংশের ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করে তবে যে অংশটি বিক্রেতা নিজে বিক্রি করেছে সে অংশটির ব্যাপারে তার থেকে নিশ্চিত কসম গ্রহণ করা হবে। আর যে অংশটি তার (বিক্রেতার) উত্তরাধিকারী ব্যক্তি বিক্রি করেছে সে অংশটির ক্ষেত্রে নিজের জানার উপর কসম করবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি বলবে, আল্লাহর কসম আমার মুরিস যে এই অংশটি বিক্রি করেছে তা আমার জানা নেই (মুহীত : আস-সারাখসী)। বিক্রেতা যদি বিক্রিত গোলামের দুই অংশের কোন এক অংশের ব্যাপারে শপথ করে তবে এ কারণে দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে শপথ করার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে না। আর যদি কোন এক অংশের ব্যাপারে শপথ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তবে দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে তা অপরিহার্য হবে না। অর্থাৎ উভয় অংশ গ্রহণ করা তার যিম্মায় অপরিহার্য হবে না। ক্রেতা যদি গোলামের উভয় অংশের ব্যাপারে অভিযোগ বা মুকাদ্দমা দায়ের করে তাহলে তা দুই অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো ক্রয়-বিক্রয় একই সফকায় সম্পন্ন হয়েছে অথবা দুই সফকায় সম্পন্ন হবে। যদি দুই সফকায় সম্পন্ন হয়ে থাকে তবে উভয় অংশের ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করা হবে। বিক্রেতা উভয় অংশের ব্যাপারে এভাবে শপথ করবে যে, আল্লাহর কসম আমি আমার গোলামের এই অংশটি অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে তা তার নিকট হস্তান্তরও করে দিয়েছি। তখন এর মধ্যে এই আয়েব ছিল না। এমনিভাবে এই গোলামের দ্বিতীয় অর্ধাংশ আমার সাথী তার নিকট বিক্রি করেছে তা তার নিকট হস্তান্তরও করে দিয়েছে। আর তখন তার মধ্যে এই আয়েব ছিল বলে আমি জানি না, উক্ত বিষয়ে ইমামত্রয়ের সকলেই একমত আছেন। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয় যদি একই সফকায় সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে এক কসমই যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ সে তার নিজের অংশের ব্যাপারে নিশ্চিত ও ইয়াকীন ভাবে শপথ করবে। আর এই কসমই তার মুরিসের বিক্রিত অংশের কসমের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। এই অংশের জন্য ভিন্নভাবে কসম করতে হবে না (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি দাসী খরিদ করে তাকে কবজা করে নিল। তারপর সে তাকে অন্য কারো নিকট বিক্রি করল। এরপর দ্বিতীয় ক্রেতা তাকে তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিল। তারপর দাসী দাবী করল যে, সে আযাদ। এ কথা শুনে তৃতীয় ব্যক্তি তাকে দ্বিতীয় বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিল এবং সে তাকে কবুলও করে নিল। তৎপর দ্বিতীয় বিক্রেতা দাসীকে প্রথম বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিল। কিন্তু সে তাকে কবুল করল না। এ অবস্থায় এর সমাধান কিভাবে করা হবে? এ সম্বন্ধে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, যদি উক্ত দাসী আযাদকৃত হওয়ার দাবী করে তবে প্রথম ক্রেতার জন্য তা কবুল না করারও ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি দাসী এ মর্মে দাবী করে যে, সে (حرۃ الاصل) অর্থাৎ মৌলগত দিক থেকে আযাদ তবে বিক্রি করার এবং হস্তান্তর করার সময়ে সে যদি আদেশ পালন করে থাকে

তাহলে এটিও আযাদকৃত হওয়ার দাবী করার অনুরূপ বলে গণ্য হবে। আর যদি সে আদেশ পালন না করে থাকে এবং দাবী করে যে সে (حرۃ الاصل) (মৌলগত দিক থেকে আযাদ) তাহলে প্রথম বিক্রেতার জন্য তাকে কবুল না করার ব্যাপারে কোন রূপ ইখতিয়ার থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সহীহ অভিমত হল : যদি দাসীর পক্ষ হতে অগ্রে এমন কোন বক্তব্য না এসে থাকে যা দ্বারা তার দাসত্বের স্বীকারোক্তি প্রমাণিত হয় তাহলে আযাদীর দাবী করার ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এ অবস্থায় ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে তার দেওয়া মূল্য ফেরত নিতে পারবে (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

১৩. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি একটি দাসী খরিদ করল। অথচ সে দাসী তখন বিক্রেতার নিকটে ছিল না। তারপর ক্রেতা তাকে কবজা করে নিল। কিন্তু তখনো সে নিজের দাসত্বের কথা স্বীকার করল না। তারপর ক্রেতা তাকে অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় বিক্রয়ের সময়ও সে ঐ স্থানে উপস্থিত ছিল না। তারপর দ্বিতীয় ক্রেতা তাকে কবজা করে নিল। এরপর দাসী বলল, আমি আযাদ, তাহলে বিচারক তার কথা কবুল করে নিবেন এবং প্রত্যেক ক্রেতা- নিজের বিক্রেতার নিকট থেকে তার দেওয়া মূল্য উসূল করে নিবে। যদি প্রথম ক্রেতা বলে, দাসী তার দাসত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছে এবং দ্বিতীয় ক্রেতা এ কথা অস্বীকার করে আর প্রথম ক্রেতার নিকট তার দাসত্বের স্বীকারোক্তির ব্যাপারে কোন দলীল-প্রমাণ না থাকে তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতার নিকট থেকে তার দেওয়া মূল্য উসূল করে নিবে। কিন্তু প্রথম ক্রেতা তার বিক্রেতার নিকট থেকে কোন কিছু ফেরত পাবে না। কেননা সে তো দাবীই করেছে যে, দাসী তার দাসত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যহীরিয়া গ্রন্থে আছে যে, কেউ এক চুক্তিতে বা ভিন্ন দুই চুক্তিতে দুটি গোলাম খরিদ করল, পরে একটির মূল্য নগদ এক হাজার দিরহাম আর অন্যটির মূল্য এক বছর মেয়াদি এক হাজার দিরহাম। তারপর ক্রেতা এর একটিকে আয়েবের কারণে ফেরত দিয়ে দিল। তখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিবাদ দেখা দিল। বিক্রেতা বলল, তুমি ঐ গোলাম ফেরত দিয়েছো যার মূল্য এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করা সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ক্রেতা বলল, না বরং যেটির মূল্য নগদ আদায় যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে আমি সেটি ফেরত দিয়েছি। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। চাই ক্রেতার নিকটে যে গোলাম আছে সে মারা যাক অথবা মার না যাক; উভয় অবস্থাতে এই একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ অবস্থায় তাদের কারো থেকেই কসম নেওয়া হবে না। আর যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা দুটি মূল্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করে যেমন বিক্রেতা বলে যে, ফেরত দেওয়া গোলামটির মূল্য এত ছিল, এবং ক্রেতা বলে যে, না এর মূল্য এত ছিল, তাহলে এর ক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (আন-নাহরুল ফায়িক)

১৪. মাসআলা : যায়েদ আমরের নিকট একটি গোলাম বিক্রি করল। আরেকটি গোলাম তাকে হিবা করল। আর আমর উভয় গোলামকে কবজা করার পর কোন একটি মারা গেল। তখন আমর আয়েবের কারণে জীবিত গোলামটিকে ফেরত দিতে গিয়ে বলল যে, এটাই বিক্রিত গোলাম। কিন্তু যায়েদ বলল এটি হিবাকৃত গোলাম। এ ক্ষেত্রে যায়েদের কথাই

গ্রহণযোগ্য হবে। এবং তার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে হিবা প্রত্যাহার করে নিতে পারবে। অর্থাৎ এই জীবিত গোলামকে নিয়ে নিতে পারবে। যদি ক্রেতা দাবি করে যে, হিবাকৃত গোলামটি মারা গেছে তবে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে নিজের দেওয়া মূল্য ফেরত নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু বিক্রেতার জীবিত গোলামের ক্ষেত্রে হিবা প্রত্যাহার করার ইখতিয়ার তখনই হাসিল হবে, যদি সে এ মর্মে কসম করে যে, “এই জীবিত গোলামকে বিক্রি করেনি”। এমনি ভাবে ক্রেতাও যখন এ মর্মে কসম করবে যে, “সে এই মৃত গোলামকে ক্রয় করেনি” তখনই কেবল সে বিক্রেতার নিকট হতে তার দেওয়া মূল্য উসূল করতে পারবে। আর হিবা প্রত্যাহার করা অবস্থায় বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে মৃত গোলামের মূল্য উসূল করে নিবে। খরিদা দুটি গোলামের একটি যদি মারা যায় আর ক্রেতা জীবিতটিকে আয়েবের কারণে ফেরত দিতে চায় এবং বলে, এর মূল্য দিরহাম ছিল কিন্তু বিক্রেতা বলে যে, না এর মূল্য দীনার ছিল, তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি গোলাম একজন হয় এবং ক্রেতা আয়েবের কারণে একে ফেরত দিতে চায়; এমতাবস্থায় বিক্রেতা যদি বলে, বিক্রিত গোলাম এটি নয়, অন্যটি। তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (কাফী)।

১৫. মাসআলা : ইমলা গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে দুটি গোলাম এক হাজার দিরহাম মূল্যে এক সাদাকায় খরিদ করে এবং তাদেরকে কবজা করার পর তাদের কোন একজনের মধ্যে আয়েব দেখতে পায় তারপর বেচাকেনা সংঘটিত হওয়ার দিন এর মূল্য ‘কত’ ছিল, এ ব্যাপারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় ক্রেতা বলে, আয়েবদার গোলামের মূল্য দুহাজার দিরহাম এবং অন্যটির মূল্য একহাজার দিরহাম। কিন্তু বিক্রেতা এর বিপরীত বলে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাদের কারো কথার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে না। বরং তাদের যে মূল্য ছিল সেটাই ধর্তব্য হবে। যদি বিবাদের দিন প্রত্যেক গোলামের মূল্য এক হাজার দিরহাম করে হয় তবে আয়েবদার গোলামটিকে তার অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে ফেরত দেওয়া হবে। তবে এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই অপরের দাবীর বিপরীত কাজ করে (যখীরা)। যদি তারা উভয়ে নিজ নিজ দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে, তবে বর্ধিত পরিমাণের ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের থেকেই সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করা হবে। তারপর ক্রেতার সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফেরত দেওয়া গোলামের মূল্য দুহাজার দিরহাম ধার্য করা হবে এবং বিক্রেতার সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী অন্য গোলামটির মূল্যও দুহাজার দিরহাম ধার্য করা হবে। তারপর ক্রেতা আয়েবদার গোলামকে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে ফেরত দিয়ে দিবে। যদি দুই গোলামের একটি মারা যায় এবং বেঁচে থাকা গোলামের মধ্যে কোন দোষ পাওয়া যায়; তারপর জীবিত ও মৃত গোলামের মূল্যের ব্যাপারে ক্রেতাও বিক্রেতার মাঝে মতভেদ দেখা দেয় এবং তাদের কারো কাছেই কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে তবে মারা যাওয়া গোলামের মূল্যের ব্যাপারে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর জীবিত গোলামের মূল্য সাব্যস্ত হবে বিবাদের দিনের মূল্য হিসাবে যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই মারা যাওয়া গোলামের মূল্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ কয়েম করে তবে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। যদি তারা মরে যাওয়া

গোলামের মূল্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে না পারে; বরং জীবিত গোলামের মূল্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত)।

১৬. মাসআলা : নাওয়াযিল গ্রন্থে আছে; সিরকা ভর্তি মটকা হতে সিরকা ক্রয় করে নিজের কলসে করে নিয়ে যাওয়ার পর ক্রেতা তাতে একটি মরা ইঁদুর দেখতে পেল। বিবাদকালে বিক্রেতা বলল; এটি তোমার কলসেই ছিল। ক্রেতা বলল; না, এটি মটকার মধ্যেই ছিল, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (যখীরিয়া)। সমরকন্দী আলিমদের ফাতওয়া গ্রন্থে আছে যে, কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পাত্রের নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু তেল খরিদ করল। কিছুদিন পর ক্রেতা যখন ঐ পাত্রের মুখ খুলল তখন সে তাতে মরা ইঁদুর দেখতে পেল। অথচ কবজা করার পর হতে এ পর্যন্ত এর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। কিন্তু বিক্রেতা তার কবজায় থাকা অবস্থায় এমনটি ঘটায় কথা সে অস্বীকার করল। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে আয়েবের বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে। এই মাসআলার ব্যাখ্যা হল : যদি পাত্রের মুখ কবজা করার সময়ে বন্ধ থাকে এবং ইঁদুর পাওয়ার সময় পর্যন্ত পাত্রের মুখ খোলা ও না খোলার বিষয় কিছুই জানা না যায়; তাহলে এ ক্ষেত্রে-ই কেবল মাত্র উক্ত হুকুম হবে। আর যদি এ কথা জানা যায় যে, পাত্রের মুখ সর্বদাই বন্ধ ছিল এবং ইঁদুর পাওয়া যাওয়ার সময় পর্যন্ত তা কখনো খোলা হয়নি তাহলে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে তা ফেরত দিতে পারবে (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা : কেউ কোন গোলাম খরিদ করে তাকে কবজা করতঃ নিজের কাছে নিয়ে আসল। তারপর সে বলল, আমি তাকে দাঁড়ি মুগুনো অবস্থায় পেয়েছি। কিন্তু বিক্রেতা অস্বীকার করছে, তাহলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তারপর ক্রেতা যদি প্রমাণ করতে পারে যে, আজ সে দাঁড়ি মুগুনো অবস্থায় আছে। তাহলে ক্রয় কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত না হয় যাতে ক্রেতার কবজায় তার মুখে দাঁড়ি উঠতে পারে তাহলে তাকে ক্রেতা ফিরিয়ে দিতে পারবে। আর যদি বিক্রয়ের পর এ পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে ক্রেতা তাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না যাবৎ না সে এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হবে যে, এই গোলাম বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায়ই দাঁড়ি মুগুনো ছিল অথবা বিক্রেতার নিকট শপথ তলব করার পর সে এ ব্যাপারে তার অস্বীকৃতি ব্যক্ত করবে (যখীরা)।

১৮. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি কারো নিকট একটি গোলাম বিক্রি করল। তারপর ক্রেতা তাকে কবজা করে নিয়ে তার প্রতি কোন আয়েব আরোপ করল এবং বলল, আমি অদ্য তাকে খরিদ করেছি। অথচ এ জাতীয় কোন আয়েব এক দিনে সৃষ্টি হতে পারে না। অপর দিকে বিক্রেতা বলল, না; বরং এক মাস পূর্বে আমি এই গোলাম বিক্রি করেছি। আর এক মাস সময়ের মধ্যে এ জাতীয় আয়েব সৃষ্টি হতে পারে। তাহলে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে একটি দাসী খরিদ করার পর সে তাতে আয়েব দেখতে পেল। তারপর সে বিক্রেতার বিরুদ্ধে পুলিশ অফিসারের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করল। অথচ বিচার ও ফায়সালা করার ব্যাপারে

রাষ্ট্রপ্রধান তার প্রতি কোন দায়িত্ব তার অর্পণ করেন নি। এতদসত্ত্বেও ঐ পুলিশ অফিসার যদি বিক্রেতার বিপক্ষে রায় জারী করে এ মর্মে ফায়সালা দেয় যে, ক্রেতা দাসীকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দিবে এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে তার দেওয়া পূর্ণ মূল্য ফিরিয়ে দিবে। তাহলে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে পূর্ণ মূল্য নিয়ে নিতে পারবে। কোন ব্যক্তি একটি চতুষ্পদ পশু খরিদ করল এবং আয়েবের কারণে তা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করল। তখন বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, তুমি এর আয়েব সম্বন্ধে জানা সত্ত্বেও নিজ প্রয়োজনে এর উপর সওয়ার হয়েছো। এ কথা শুনে ক্রেতা বলল, না, বরং একে তোমার নিকট ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি এর উপর সওয়ার হয়ে এসেছি। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কোন কোন মাসাইখে কিয়ামের মতে 'যদি উক্ত পশুর উপর আরোহণ করা ব্যতীত একে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া ক্রেতার পক্ষে সম্ভব না হয়' তখনই কেবল এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত)। যদি বিক্রেতা বলে, তুমি পানি পান করানোর জন্য নিঃপ্রয়োজনে এর পৃষ্ঠে সওয়ার হয়েছো তাহলেও ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় (ফাতহুল কাদীর)। যদি ক্রেতা ক্রয়কৃত বস্তুর মধ্যে কোন আয়েব দাবী করে এবং বিক্রেতাও জানে যে; ঐ আয়েব উক্ত বস্তুর মধ্যে বিক্রয়ের দিন বিদ্যমান ছিল তাহলে বিচারক তা ফেরত প্রদানের ফায়সালা না দেওয়া অবস্থায়ও তা ফেরত গ্রহণ করা বিক্রেতার জন্য জায়েয হবে। শায়খ (র) বলেন, আমার পিতা মরহুম বলতেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে; যদি বিক্রেতা ঐ বস্তু অন্য কারো নিকট হতে খরিদ করে থাকে। কেননা বিক্রেতা যদি এ জাতীয় বস্তু বিচারকের ফায়সালা ছাড়া গ্রহণ করে তবে আয়েবের সে তা নিজ বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি এই বস্তু অন্যের নিকট হতে খরিদ করে না থাকে তবে তার জন্য অপরিহার্য হবে সেটিকে ফেরত নিয়ে নেওয়া এ ক্ষেত্রে ফেরত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না (যহীরিয়া)।

১৯. মাসআলা : খরিদা বস্তু কবজা করার আগেই তাতে আয়েব আছে বলে জানা গেল। তাই ক্রেতা ক্রয়চুক্তি বাতিল করে দিল। যদি বিক্রেতার উপস্থিতিতে বাতিল করে তাহলে বাতিল হয়ে যাবে। যদিও বিক্রেতা তা কবুল না করে। আর যদি ঐ কথা বিক্রেতার অনুপস্থিতিতে বলে তবে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে না। যদি কবজার পর ক্রেতা দোষের কথা জানতে পারে এবং ক্রয়চুক্তি বাতিল করে তবে সহীহ মতে বিচারকের ফায়সালা অথবা বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া বাতিল হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট একটি দাসী বিক্রি করল এবং স্পষ্টভাবে একথা বলে ছিল যে, এর অমুক স্থানে একটি ফোঁড়া আছে; এ অবস্থায় আমি একে বিক্রি করলাম। তারপর ক্রেতা দাসীকে নিয়ে গেল এবং দেখল যে, সত্যিই তার শরীরের অমুক স্থানে একটি ফোঁড়া আছে। এহেন অবস্থায় ক্রেতা ঐ দাসীকে ফেরত দেওয়ার মনস্থ করল। তখন বিক্রেতা বলল : এ ফোঁড়া সে ফোঁড়া নয়। বরং আমি যে ফোঁড়ার কথা বলেছি তা তো ভাল হয়ে গেছে। আর এই ফোঁড়া তোমার নিকটে যাওয়ার পর সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত)। যদি বিক্রেতা এ কথা বলে যে, আমি একে বিক্রি করলাম এমতাবস্থায় যে, এর একটি চোখে সাদা দাগ আছে। তারপর ক্রেতা ঐ দাসীকে নিয়ে

গিয়ে দেখল যে, তার বাম চোখে সাদা দাগ আছে। এ কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দেওয়ার মনস্থ করলে বিক্রেতা বলল; আমার কাছে থাকা অবস্থায় তার ডান চোখে সাদা দাগ ছিল। তা ভাল হয়ে গেছে। আর বাম চোখের এ সাদা দাগ পরে সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি বিক্রেতা বলে, আমি তাকে বিক্রি করেছি; এমতাবস্থায় যে, তার মাথায় যখম ছিল এবং বাকী মাসআলা পূর্ণ হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। মাথার যখমের অবস্থায় বিক্রেতা যদি বলে, আমার কাছে থাকা অবস্থায় এর যখম موضحة (হাড় বের হওয়া যখম) ছিল, কিন্তু ভ্রমের কাছে যাওয়ার পর তা منقولة (হাড় ভাঙ্গা যখম) হয়ে গেছে তাহলে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে চোখ সাদা থাকা অবস্থায় বিক্রেতা যদি বলে, এর চোখে একটি ক্ষুদ্র দাগ ছিল কিন্তু তোমার নিকটে যাওয়ার পর তা আরো বেড়ে গেছে, অথচ দাসীর পূর্ণ চোখ বা অধিকাংশ চোখই হচ্ছে সাদা তাহলে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি দাসীর চোখে সাদা দাগ থাকে এবং বিক্রেতা বলে যে, এর সাদা দাগটি সরিষার দানার মত বা এর থেকেও ছোট আকৃতির ছিল, তাহলে এর সমাধানের ব্যাপারে শায়খ (র) বলেন, যদি বিক্রেতার কথা ক্রেতার কথার কাছাকাছি হয় তবে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি তাদের কথার মধ্যে বেশ ব্যবধান থাকে তবে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি বিক্রেতা বলে, আমি তাকে জ্বর অবস্থায় বিক্রি করেছি আর ক্রেতা জ্বরের অবস্থায়ই তাকে ফেরত দেওয়ার জন্য নিয়ে আসে আর বলে যে, তার জ্বর আগের চেয়ে বেশী তবে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। যদি বিক্রেতা বলে, আমি তোমার নিকট এই দাসীকে বিক্রি করলাম এই অবস্থায় যে, এর মধ্যে আঙ্গুর আছে। এ কথা শুনেও ক্রেতা তাকে নিয়ে নিল এবং নেওয়ার পর দেখল যে, আসলেই তার মধ্যে আয়েব আছে। এ কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করলে বিক্রেতা বলল, পূর্বকার আয়েবটি তো এমন ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এরূপ। তাহলে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। বিক্রেতা যদি বলে আমি দাসীকে এই অবস্থায় বিক্রি করলাম যে, তার মাথায় আয়েব আছে। তারপর ক্রেতা মাথায় আয়েবের কথা বলেই তাকে ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে এলে, তাহলে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে যে, এই আয়েব পূর্বকার আয়েবই। যদিও বিক্রেতা তা স্বীকার না করে মোদ্দা কথা হচ্ছে; বিক্রেতা যদি আয়েবের বিষয়টিকে কোন নির্দিষ্ট অঙ্গের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে তবে এক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি কোন অঙ্গের দিকে সম্পর্ক যুক্ত না করে বিষয়টিকে مطلقاً অর্থাৎ সাধারণ ভাবে উল্লেখ করে তাহলে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (যখীরা)।

২১. মাসআলা : কোন ব্যক্তি দাসী খরিদ করে তাকে কবজা করে নিল। তারপর সে একে ফেরত দেওয়ার জন্য আসল এবং বলল; আমি তাকে বিবাহিত অবস্থায় পেয়েছি; এহেন অবস্থায় বিক্রেতা যদি একথা অস্বীকার করে অথবা বলে যে, তার বিবাহ হয়েছে ঠিক; কিন্তু স্বামী মারা গেছে; অথচ ক্রেতা দাবী করে যে, তার স্বামী আছে। তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য ঐ দাসীকে ফেরত দেওয়ার হক সাব্যস্ত হবে না। সে ইচ্ছা করলে বিক্রেতার নিকট হতে শপথ গ্রহণ করতে পারবে। ক্রেতা যদি এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, অমুক ব্যক্তি ঐ দাসীর স্বামী এবং ঐ সময় সে অনুপস্থিত ছিল তবে তার এরূপ সাক্ষ্যের প্রতি কোন ক্ষেপ করা হবে

না। কিন্তু সে যদি এই কথার উপর সাক্ষ্য পেশ করে যে, বিক্রেতা বিবাহের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছে, তাহলে তার এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি বিক্রেতা এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, অমুক ব্যক্তি তার স্বামী ছিল, কিন্তু বেচাকেনার আগেই সে তাকে বায়িন তলাক প্রদান করেছে। এ অবস্থায় ক্রেতা যদি তার স্বামী বর্তমানে আছে বলে দাবী করে তাহলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। উপরোক্ত অবস্থায় যদি দাসীর স্বামী এসে হাযির হয় এবং বিবাহের দাবী করে; আর তলাকের বিষয়টি অস্বীকার করে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। উপরোক্ত কারণে ক্রেতা তাকে বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে। যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে যখন আমি তাকে তোমার নিকট বিক্রি করেছিলাম তখন তার স্বামী বর্তমান ছিল, কিন্তু দাসীকে তোমার নিকট হস্তান্তর করার পূর্বেই তাকে তলাক দিয়ে দিয়েছে বা মারা গেছে; এখন তার স্বামী নেই; আর এ অবস্থায় আমি তাকে তোমার কাছে হস্তান্তর করেছি, তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে তাকে বিক্রেতার নিকট প্রত্যাহার করতে পারবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। যদি ক্রেতার নিকট দাসীর স্বামীকে পাওয়া যায় এবং বিক্রেতা বলে, আমার নিকটে থাকা অবস্থায় তার স্বামী ছিল; কিন্তু সে এই ব্যক্তি নয়, তার ঐ স্বামী তাকে ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্বেই তাকে তলাক প্রদান করেছিল অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্বেই সে মারা গেছে, তবে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি খাদিম খরিদ করে তাকে কবজা করে নেয়। তারপর তার মধ্যে কোন আয়েব আছে বলে তাকে ফেরত দেওয়ার জন্য বিক্রেতার কাছে আসে। এহেন অবস্থায় বিক্রেতা যদি বলে, এটি আমার খাদিম নয়। প্রত্যুত্তরে ক্রেতা বলে 'না' এটিই তোমার খাদিম। একেই আমি তোমার নিকট হতে ক্রয় করেছি তাহলে কসমের সাথে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (যখীরা)। এক গোলাম কোন এক ব্যক্তির কবজায় আছে। এমতাবস্থায় যদি দুই ব্যক্তির প্রত্যেকেই এই মর্মে দাবী করে যে, সে এই গোলামকে কবজাকারী ব্যক্তির নিকট এত মূল্যে বিক্রি করেছে। কিন্তু ক্রেতা এখনও পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ করেনি। এহেন অবস্থায় তারা উভয়ে যদি নিজ নিজ দাবীর সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে তাহলে উভয়ের দাবীকৃত মূল্যের বিনিময়ে ঐ গোলামকে কবজাকারী ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে দেওয়া হবে। তারপর তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দাবী অনুসারে মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া হবে। এমনি ভাবে যদি তাদের প্রত্যেকেই এ মর্মে দাবী করে যে, এই গোলাম আমার এবং আমার মালিকানায় তার জন্ম হয়েছে— আর আমিই তাকে কবজাকারী ব্যক্তির হাতে বিক্রি করেছি তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা তাদের দাবী-দাওয়া হচেছ মূল্যের ব্যাপারে এবং এ ব্যাপারে তারা উভয়েই সমান। এহেন অবস্থায় ক্রেতা যদি তার মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় তবে আয়েবের কারণে সে এই গোলামকে তাদের কোন একজনের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে। প্রত্যাহার উভয়ের কাছে করা যাবে না। ক্রেতা যদি তাদের দুজনের কোন একজনের নিকট থেকে আয়েবজনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয় তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট থেকেও ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয়

ব্যক্তি আয়েবদার অবস্থায় ঐ গোলামকে ফেরত নিতে রাযী থাকে তবে ক্রেতা এ অবস্থায় তার থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না। যদি ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় গোলাম মারা যায়; তারপর সে তার পুরাতন কোন আয়েবের কথা জানতে পারে তাহলে সে উভয়ের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে। এমনিভাবে গোলাম মারা যায় নি, কিন্তু ক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় তার হাত কাটা গেছে তারপর সে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিয়ে দেখল যে, তার মধ্যে আয়েব আছে তাহলে সে এই গোলামকে উভয়ের নিকট প্রত্যাহার করতে পারবে না বটে; কিন্তু তাদের থেকে ক্ষতিপূরণ উসুল করতে পারবে। এই ক্ষেত্রে তাদের কোন একজনে এই আয়েবদার গোলামকে ফেরত নিতে পারবে না। যদি দাবীদার ব্যক্তিদ্বয়ের প্রত্যেকেই গোলাম বিক্রির তারিখ বর্ণনা করে এবং তারিখের মধ্যে আগ-পিছ থাকে তবে যার তারিখ পরের হবে গোলামকে তার নিকটই ফেরত দেওয়া হবে। যেন কবজাকারী ব্যক্তি উক্ত গোলামকে প্রথম ব্যক্তির নিকট হতে খরিদ করে তাকে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিয়েছে এবং পরে আবার তার নিকট হতে খরিদ করে নিয়েছে (কাফী)।

২৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমার এই গোলামটি পলাতক গোলাম, তুমি তাকে আমার নিকট হতে খরিদ করে নাও। তারপর উক্ত ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, কত হলে তুমি তা বিক্রি করবে? জবাবে সে বলল, এত টাকা। তারপর উক্ত ব্যক্তি তার থেকে এই গোলামটি খরিদ করে নিল। সেও তাকে পলাতক হিসাবেই পেল তাহলে ক্রেতা তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে। এটি একটি যাহিরী কথা। এহেন অবস্থায় যদি প্রথম ক্রেতা একে আরেক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দেয় এবং সে ও তাকে পলাতক হিসাবেই পায়, এ কারণে সে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার মনস্থ করলে প্রথম ক্রেতা তার পলায়নকারী হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করল। তারপর দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম বিক্রেতার স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করল, তাহলে এ ক্ষেত্রে সে কিছুই পাবে না। যদি প্রথম বিক্রেতা প্রথম ক্রেতাকে বলে, “আমি তোমার নিকট এই গোলাম বিক্রি করলাম এই শর্তে যে, সে হচ্ছে, পলায়নকারী অথবা এই শর্তে যে, তার পালিয়ে যাওয়ার বিষয় থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ বা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত”। আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে উক্ত আয়েবের কারণে দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতার নিকট এই গোলামকে ফিরিয়ে দিতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি প্রথম বিক্রেতা বলে, “আমি তাকে বিক্রি করলাম এই শর্তে যে, পালিয়ে যাওয়ার বিষয় থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ”। তার পালিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ না করে তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতার নিকট এই গোলামকে ফেরত দিতে পারবে না যাবৎ না সে এ মর্মে সাক্ষ্য পেশ করবে যে, এই ব্যক্তি উক্ত গোলামটি বিক্রি করেছে, এই অবস্থায় যে, সে ছিল পলায়নকারী (যহীরিয়া)।

২৪. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করল যে, তার গোলামের উপর অমুক ব্যক্তির কিছু পাওনা আছে। তারপর সে ঐ পাওনার কথা না বলেই তাকে অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিল। তারপর ক্রেতাও সেই পাওনার কথা উল্লেখ করা ব্যক্তিরকে আরেক ব্যক্তির কাছে তাকে বিক্রি করে দিল। তাহলে প্রথম বিক্রেতার উক্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দ্বিতীয় ক্রেতা তাকে তার বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে

পারবে। কেননা ঋণ একটি আদায়যোগ্য অবশ্যম্ভাবী বিষয়। কাজেই ঋণের কারণে পাওনাদার ব্যক্তি এই খরিদ কৃত বস্তুটি ফিরিয়ে দিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, ঋণের স্বীকারোক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের আগে বা পরে গোলামের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করার অনুরূপ নয়। তবে বিবাহিত হওয়ার স্বীকারোক্তি ঋণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করার অনুরূপ বলে গণ্য। কাজেই প্রথম বিক্রেতার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দ্বিতীয় ক্রেতা তার খরিদ কৃত দাসীকে নিজ বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে (মুহীত)।

২৫. মাসআলা : জনৈক ব্যক্তি কোন একটি গোলাম খরিদ করে তাকে কবজা করে নিল। তারপর অপর এক ব্যক্তি তার থেকে এই গোলামকে খরিদ করার জন্য তার সাথে কথা বার্তা বলল এবং দাম দস্তুর করল। তখন সে ঐ ব্যক্তিকে বলেছিল যে, এতে কোন আয়েব নেই। কিন্তু ঘটনা ক্রমে তাদের মধ্যে আর বেচাকেনা হল না। তারপর ক্রেতা ঐ গোলামের মধ্যে এমন কোন আয়েব দেখতে পেল যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করল যে, বিক্রেতার কবজায় থাকা অবস্থায় এই আয়েব গোলামের মধ্যে ছিল, তাহলে সে এই গোলামকে ফিরিয়ে দিতে পারবে। তবে দাম-দস্তুরকারী ব্যক্তির নিকট ক্রেতা বলেছিল যে, তার মধ্যে কোন আয়েব নেই; এই কথা বলার কারণে গোলামকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তার যে অধিকার ছিল তা রদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি দাম-দস্তুরকারী ব্যক্তিকে বলে, তুমি একে খরিদ করে নাও; এর মধ্যে এ জাতীয় কোন আয়েব নেই; তারপর ঘটনাক্রমে তাদের মধ্যে কোন বেচাকেনা হল না; পরে ক্রেতা তাতে আয়েব আছে বলে দাবী করল এবং এ আয়েবের কারণে সেটিকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়ার মনস্থ করল, তাহলে সে তা করতে পারবে না। যদি বিক্রিত বস্তু গোলাম না হয়ে কাপড় হয় আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তবে দাবী শ্রবণযোগ্য হবে না এবং উক্ত অবস্থা দু'টোর কোন অবস্থাতেই সে আর ঐ বস্তুকে বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে না। যদি আয়েবের অবস্থা এমন হয় যে, তা আদৌ সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই অথবা সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু এই মুহুরতের মধ্যে হতে পারে না তাহলে বিচারক গোলামকে তার বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়ার আদেশ জারী করবেন (মুহীত)।

২৬. মাসআলা : কেউ স্বীকার করল যে, তার দাসী পলায়ন করেছে তারপর উক্ত ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ঐ দাসীটি বিক্রি করার জন্য উকীল নিয়োগ করল। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার দোষের কথা তাকে বলল না। পরে উকীল তাকে বিক্রি করে দিল। এরপর ক্রেতা বিক্রেতা মুয়াক্কিলের স্বীকারোক্তির জেনে দাসী ফেরত দিতে চাইল। কিন্তু বিক্রেতা পলায়নের কথা অস্বীকার করল। তাহলে ক্রেতা এই গোলামকে উকীলের নিকট ফেরত দিতে পারবেনা। পক্ষান্তরে মুয়াক্কিল যদি উকীলকে বলে, আমার এই গোলাম পালিয়ে যায়; তুমি তাকে বিক্রি করে দাও এবং সে যে পালিয়ে যায় এ বিষয়ে তোমার কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না এ কথা জানিয়ে দিবে। তারপর উকীল তাকে বিক্রি করে দিল। কিন্তু দায়িত্ব মুজির কথা বলল না। তারপর কবজার আগে ক্রেতা মুয়াক্কিলের বক্তব্য সম্পর্কে জানতে পারল, তাহলে এই আয়েবের কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দিয়ে দিতে পারবে (যহীরিয়া)। আল ফুসুলুল ইমাদিয়া গ্রন্থে আছে যে, কথিত এক ক্রেতা অতিরিক্ত আশুল বিশিষ্ট এক দাসীকে ফেরত দেওয়ার জন্য

কথিত এক বিক্রেতার কাছে নিয়ে এলো কিন্তু সে বললো যে, আমি তোমার নিকট একে বিক্রি করিনি। তখন ক্রেতা সাক্ষ্য পেশ করল। তারপর বিক্রেতা বলল, তুমি এই দাসীকে খরিদ করেছো; কিন্তু আমি এর দোষ-ত্রুটির দায়-দায়িত্ব থেকে মুজির কথা তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। এই কথার উপর সে সাক্ষীও পেশ করল তবে এ ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (হাম্মাদিয়া)।

২৭. মাসআলা : কোন ব্যক্তি গোলাম খরিদ করার পর আয়েবের কারণে তাকে ফেরত দেওয়ার মনস্থ করলে বিক্রেতা যদি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, ক্রেতা এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছে যে, সে এই গোলাম বিক্রি করে দিয়েছে; তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং আয়েবের কারণে ক্রেতা গোলামকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না।

বিক্রেতা যদি এ মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে যে, ক্রেতা এই গোলামকে অমূকের নিকট বিক্রি করে দিয়েছে। আর অমুক ব্যক্তি তখন হাযির ছিল এবং সে বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে, এমনভাবে প্রথম ক্রেতাও তা অস্বীকার করেছে তাহলে তাদের উভয়ের অস্বীকার করার বিষয়টি ٱلأمر (ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়া)-এর পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে এবং এ ক্ষেত্রে গোলামকে প্রত্যর্পণ করা যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি নিজ দাসীকে বলে, হে চোরনী! হে পলায়ন কারিনী! হে ব্যভিচারিনী! অথবা হে পাগলিনী! ইত্যাদি অথবা কেউ নিজ দাসীকে এরূপ বলে যে, এই চোরনী, এ কাজটি করেছে তাহলে একে তার পক্ষ হতে দাসীর মধ্যে এসব আয়েব থাকার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান বলে গণ্য করা হবে না। সুতরাং মুনীব যদি তাকে বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতা তার মধ্যে এ সব আয়েব দেখতে পায় তবে বিক্রেতার এ জাতীয় কথা বলার কারণে ক্রেতা তাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না (মুখতারুল ফাতওয়া)।

২৮. মাসআলা : কোন ব্যক্তি গোলাম খরিদ করল। তারপর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই তার পালিয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করল এবং ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন কালে তারা এ স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করল। তারপর ক্রেতা এই গোলাম অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিল। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার কথাটি গোপন রাখল। এরপর দ্বিতীয় ক্রেতা তাকে তৃতীয় অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিল এই শর্তে যে, এই গোলাম সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত ও নির্দোষ, সে পালায়নকারী নয়। অবশেষে সর্ব শেষ ক্রেতা তার পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পারল এবং আরো জানতে পারলো, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন কালে প্রথম বিক্রেতা ও প্রথম ক্রেতা কর্তৃক তার পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য, তাহলে শেষোক্ত ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে না এবং প্রথম ক্রেতা কর্তৃক গোলামের পলায়নের ব্যাপারে স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য ঐ সমস্ত বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে কার্যকারী হবে না যারা তার থেকে এই গোলাম খরিদ করেনি। পক্ষান্তরে প্রথম ক্রেতা যদি তার এবং বিক্রেতার পক্ষ হতে গোলামের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন রূপ স্বীকারোক্তি মূলক বক্তব্য প্রদান করা ছাড়াই তাকে খরিদ করে এবং পরে প্রথম তার পলায়নের ব্যাপারে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে এবং এর প্রেক্ষিতে বিচারক প্রথম বিক্রেতার নিকট তাকে ফেরত দানের ব্যাপারে আদেশ জারী করেন। তারপর প্রথম

বিক্রেতা তাকে এ ক্রেতার নিকট অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দেয়, তারপর এই ক্রেতা অন্যের নিকট এবং অন্য ব্যক্তি, আরেক ব্যক্তির নিকট তাকে বিক্রি করে দেয়, অবশেষে সর্বশেষ ক্রেতা তার পালিয়ে যওয়ার ব্যাপারে জানতে পারে এবং আরো জানতে পারে প্রথম ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংঘটিত ঘটনাটি। অর্থাৎ ক্রেতা কর্তৃক গোলামের পালিয়ে যাওয়ার উপর উপস্থাপিত সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিকে তাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে আদেশ জারী করার বিষয়টি, তাহলে এই ব্যক্তি উক্ত গোলামকে তার বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে (মুহীত)।

২৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে একটি দাসী খরিদ করল। তারপর সে দাবী করল যে, এ হচ্ছে পলায়নকারিণী এবং সে তার পলায়নের উপর সাক্ষী-প্রমাণ ও পেশ করে, তারপর বিচারক এর ভিত্তিতে তাকে ফেরত দেওয়ার আদেশ জারী করেন। তারপর তৃতীয় কোন ব্যক্তি এ মর্মে দলীল পেশ করে যে, এটি আমার গোলাম, আমার মালিকানায় থাকাকালে তার জন্ম হয়েছে। উক্ত দাবীর প্রেক্ষিতে বিচারক এ মর্মে ফায়সালা দেন যে, এই গোলামের মালিক উক্ত দাবীদার ব্যক্তিই। তারপর **مستحق** ব্যক্তি গোলামকে ঐ ক্রেতা ব্যক্তির নিকটই আবার বিক্রি করে দেয়। এরপর ক্রেতা, গোলাম যে পলায়নকারী এ বিষয়ে (**مستحق**) ব্যক্তির সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় এবং হাকিমের পক্ষ হতে তার পলায়নকারী হওয়ার ব্যাপারে যে ফায়সালা জারী করা হয়েছে তার ভিত্তিতে দলীল পেশ করে তাহলে উক্ত খরিদদার ব্যক্তি এই গোলামকে ফিরিয়ে দিতে পারবে (যহীরিয়া)। রাষ্ট্রপ্রধান বা তার পক্ষ হতে নিয়োজিত আমিন ব্যক্তি যদি দারুল ইসলামে সংরক্ষিত গনীমতের মাল কারো কাছে বিক্রি করে এবং এরপর ক্রেতা ব্যক্তি তাতে কোন আয়েব দেখতে পায় তাহলে সে তা তাদের নিকট প্রত্যর্পণ করতে পারবে না (কাফী)। তবে এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রধান কোন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেন, তার সাথে মামলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য। এ ক্ষেত্রে আয়েবের ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং অস্বীকারকারী ব্যক্তির উপরও কোনরূপ কসম করা ওয়াজিব হবে না। ক্রেতা যেন তার মুকাবিলায় সাক্ষ্য পেশ করতে পারে শুধুমাত্র এজন্যই তাকে নিয়োজিত করা হবে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োজিত ব্যক্তি যদি আয়েবের কথা স্বীকার করে তবে সে উক্ত দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হয়ে যাবে। এদতসত্ত্বেও যদি ঐ মাল ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তা যদি গনীমতের মাল বন্টনের আগে হয়ে থাকে তবে তা গনীমতের মালের সাথে মিলিয়ে একত্রিত করে রাখা হবে। আর এ ঘটনা যদি গনীমতের মাল বন্টনের পরে হয়ে থাকে তবে মূল্যের বিনিময়ে তা বিক্রি করে দেওয়া হবে। যদিও এর মূল্য কম বা বেশী হয়। পরে তা বায়তুল মালে জমা করে রাখা হবে (আল-বাহরুর রাযিক)।

৩০. মাসআলা : কোন ব্যক্তি গোলাম খরিদ করার পর সুস্থ থাকা অবস্থায় তা তার নিজ পুত্রের নিকট বিক্রি করে দিল। তারপর সে মারা যাওয়ার পর পুত্র তার ওয়ারিস হল। এই পুত্র ব্যতীত উক্ত ব্যক্তির আর কোন ওয়ারিসও ছিল না। এহেন অবস্থায় খরিদদার উক্ত ওয়ারিস পুত্র যদি ঐ গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় তাহলে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে। তবে তাকে এর আগে বিচারকের নিকট দাবী করতে হবে যেন তিনি মৃত ব্যক্তির পক্ষে কাউকে

বিবাদী নিয়োজিত করেন। বিবাদী নিয়োগ হওয়ার পর পুত্র তাকে ঐ বিবাদীর নিকট প্রত্যর্পণ করবে। তারপর সে একে তার পিতার বিক্রেতার নিকট প্রত্যর্পণ করে দিবে। যদি উক্ত মৃত ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিসও থাকে তবে ক্রেতা পুত্র তাকে ঐ ওয়ারিসের নিকট ফেরত দিবে এবং সে ফেরত দিবে তাকে মৃত ব্যক্তির বিক্রেতার নিকট। মৃত ব্যক্তি তার ক্রেতার নিকট হতে পূর্ণ মূল্য উসুল করে নেক অথবা না নেক এ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদ “আল কিতাবে” কোনরূপ পার্থক্য করেন নি। বরং তিনি মাসআলাটি **مطلقا** (পার্থক্য ছাড়া) বর্ণনা করেছেন। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, উভয় অবস্থাই সমান (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) ওয়ারিস যদি মূরিসের (যার সে উত্তরাধিকারী হয়েছে) নিকট কোন কিছু বিক্রি করে, তারপর ক্রেতা মারা যায় এবং বিক্রেতা তার ওয়ারিস হয়, তারপর সে ঐ মালে আয়েব দেখতে পায়, এ অবস্থায় তাকে ছাড়া যদি অন্য কোন ওয়ারিস থাকে তাহলে এই মাল সে এই ওয়ারিসের নিকটই ফিরিয়ে দিবে। আর যদি তাকে ছাড়া অন্য কোন ওয়ারিস না থাকে তাহলে সে এই মাল ফেরত দিতে পারবে না এবং ক্ষতিপূরণও পাবে না। এমনিভাবে কেউ যদি স্বীয় নাবালিগ সন্তানের নিকট হতে নিজের জন্য কোন কিছু খরিদ করে তা কবজা করে নেয় এবং এ ব্যাপারে সাক্ষীও রাখে, তারপর তাতে আয়েব দেখতে পায় তাহলে সে বিষয়টি বিচারকের আদালতে উত্থাপন করবে। তারপর বিচারক কোন একজনকে তার পুত্রের পক্ষে বিবাদী নিয়োগ করবে যার নিকট সে এই মাল ফেরত দিবে। তারপর পিতা তার পুত্রের পক্ষ হতে এই মাল তার বিক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দিবে। এমনিভাবে পিতা যদি তার পুত্রের পক্ষ হতে মাল বিক্রি করে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হকুম হবে (ওয়াজীয : আল-কুরদূরী)।

৩১. মাসআলা : যদি কোন মুকাতাব গোলাম নিজ পিতা বা সন্তানকে খরিদ করে তাহলে আয়েবের কারণে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না এবং আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণও উসুল করতে পারবে না। আয়েব সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার পর মুকাতাব যদি বদলে কিতাবাত আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে মুনীব তার **مبيع**-কে ফেরত দিয়ে দিবে। এ ক্ষেত্রে মুকাতাব তার ওলী হিসাবে গণ্য হবে। মুনীব যদি মুকাতাবকে বিক্রি করে দেয় অথবা সে মারা যায় তাহলে মুনীব নিজে তাকে ফেরত দিবে। যদি মুকাতাব ব্যক্তি বদলে কিতাবাত আদায় করা থেকে অক্ষম হওয়ার আগে বিক্রেতাকে দায়িত্ব মুক্ত করে দেয় তাহলে মুনীব তাকে ফেরত দিতে পারবে না। মুকাতাব ব্যক্তি বদলে কিতাবাত আদায় করার ব্যাপারে অক্ষম হওয়ার আগে মুনীব যদি বিক্রেতাকে দায়িত্বমুক্ত করে দেয় তবে তা জায়েয হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

মুকাতাব যদি নিজের মাকে খরিদ করে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হকুম হবে। মুকাতাব যদি নিজের ভাই, চাচা বা বোনকে খরিদ করে তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ সমস্ত লোকগুলোও তার সাথে সাথে মুকাতাব বলে গণ্য হবে। এই হিসাবে তাদের হকুম এবং পিতা ও পুত্রে হকুম সমান সমান বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এ সমস্ত লোকেরা মুকাতাব বলে গণ্য হবে না। কাজেই আয়েবের কারণে সে তাদেরকে ফেরত দিতে পারবে, যেমন সে তাদেরকে বিক্রি করতে পারে। মুকাতাব বদলে

কিতাবাত আদায় করা থেকে অক্ষম হওয়ার আগেই মুনীব যদি বিক্রেতাকে আয়েবের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্ত করে দেয় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার এ দায়িত্ব মুক্তি সहीহ হবে না। মুকাতাব যদি উম্মু ওয়ালাদকে খরিদ করে এবং তাতে আয়েব দেখতে পায়, এ অবস্থায় তার সাথে যদি কোন সন্তান থাকে তবে মুকাতাব তাকে প্রত্যর্পণ করতে পারবে না, যেমন সে এ অবস্থায় তাকে বিক্রি করতে পারে না। কিন্তু সে আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ পাবে। আর এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে মুকাতাব নিজে মুতাওয়ালী হিসাবে গণ্য হবে। মুকাতাব বদলে কিতাবাত আদায় করা থেকে অক্ষম হওয়ার আগে সে নিজেই যদি আয়েবের ব্যাপারে বিক্রেতাকে দায়িত্ব মুক্ত করে দেয় তবে তা সहीহ হবে। কিন্তু মুনীব এভাবে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করলে তা সहीহ হবে না। যদি উম্মু ওয়ালাদের সাথে কোন সন্তান না থাকে তবে সাহেবাইন (র)-এর অভিমত অনুসারে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে মুকাতাব তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে (মুহীত)। যদি কোন ব্যক্তি নিজ মুকাতাব গোলামের নিকট থেকে কোন গোলাম খরিদ করে, তারপর তাতে আয়েব দেখতে পায় তবে আয়েবের কারণে মুনীব তাকে ফেরত দিতে পারবে না এবং বিক্রেতার সাথে এ ব্যাপারে সে কোন আইনী লড়াইও করতে পারবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩২. মাসআলা : মুকাতাব বা আযাদ ব্যক্তি কোন গোলাম খরিদ করার পর তাকে মুকাতাব বানিয়ে নিল। তারপর সে তাতে কোন আয়েব দেখতে পেল তাহলে আয়েবের কারণে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না এবং আয়েব জনিত লোকসানের কারণে সে কোন ক্ষতিপূরণও পাবে না। যদি মুকাতাব বা আযাদ ব্যক্তি বিক্রেতাকে আয়েব থেকে দায়িত্বমুক্ত করে দেয় তাহলে এ দায়িত্বমুক্ত করা সहीহ হবে। কাজেই মুকাতাব ব্যক্তির অক্ষম হওয়ার পর তার মুনীবের জন্য এবং আযাদ ব্যক্তির ওয়ারিসের জন্য আয়েবের কারণে তাকে ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে না। পক্ষান্তরে মুকাতাব ব্যক্তির অক্ষম হওয়ার আগে মুনীব যদি বিক্রেতাকে দায়িত্বমুক্ত করে দেয় তাহলে তার দায়িত্বমুক্ত করা সहीহ হবে না। এমনিভাবে আযাদ ব্যক্তির ওয়ারিস যদি বিক্রেতাকে দায়িত্বমুক্ত করে দেয় তবে এ অবস্থায়ও তার এ দায়িত্বমুক্তি সहीহ হবে না। যদিও এ ঘটনা আযাদ ব্যক্তির মূর্খ অবস্থায় ঘটে থাকে; যদি প্রথম মুকাতাব ব্যক্তির অক্ষম হওয়ার পর দ্বিতীয় মুকাতাব ব্যক্তির অক্ষম হওয়ার আগে বা পরে মুনীব বিক্রেতাকে দায়িত্বমুক্ত করে দেয় তবে তার দায়িত্বমুক্ত করা সहीহ হবে। এমনিভাবে আযাদ ব্যক্তির কোন ওয়ারিস যদি মৃত্যুর পর বিক্রেতাকে দায়িত্বমুক্ত করে দেয় তবে তার দায়িত্বমুক্ত করাও সहीহ হবে। কেউ যদি কোন গোলাম খরিদ করে তাকে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেয়, তারপর প্রথম ক্রেতা মারা যায় এবং গোলামের মধ্যে এমন আয়েব প্রকাশ পায় যা প্রথম বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তারপর প্রথম ক্রেতার ওয়ারিস বিক্রেতাকে আয়েব থেকে দায়িত্বমুক্ত করে দেয় তাহলে তার এ দায়িত্ব মুক্তকরণ সहीহ হবে। সুতরাং যদি তাকে গোলাম ফেরত দেওয়া হয় তাহলে সে তাকে প্রথম বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না। যদিও বর্তমানে তাকে ফেরত দেওয়া অসম্ভব সাব্যস্ত হয়। মালিকে মুকাতাব কোন গোলামকে কারো নিকট খরিদ করে তাকে নিজের মুকাতাব

গোলামের নিকট বিক্রি করল। তারপর মুকাতাব গোলাম বদলে কিতাবাত আদায় করা থেকে অক্ষম হয়ে যাওয়ার পর মুনীব গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পেল এবং এ কারণে সে তাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে ইচ্ছা করল, এহেন অবস্থায় সে তা করতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে “আল কিতাব” স্পষ্ট কোন সমাধান উল্লেখ নেই। আমাদের মশাইখে কিরাম বলেন, তার জন্য এরূপ অধিকার না থাকাই বাঞ্ছনীয় (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা : ঋণগ্রস্ত গোলাম যাকে তার মুনীবের পক্ষ হতে ব্যবসার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে সে যদি তার গোলামকে নিজ মুনীবের কাছে ন্যায্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে, তারপর তার মুনীব তাকে কবজা করে নেয় এবং তার মধ্যে আয়েব আছে বলে জানতে পারে তাহলে দেখতে হবে যে, মুনীব তার মূল্য নগদ পরিশোধ করে দিয়েছে না কি তা বাকী রয়েছে। যদি মূল্য নগদ পরিশোধ করা হয় অথবা دين অর্থাৎ যিম্মায় ঋণ হিসাবে থাকে যেমন মূল্য ধার্য করা হয়েছিল দিরহাম, দীনার বা পরিমাণ যোগ্য অনির্দিষ্ট বস্ত্র বা ওজনযোগ্য অনির্দিষ্ট বস্ত্র কিংবা কোন সামান জাতীয় বস্ত্র, কিন্তু এগুলো গোলামের হাতেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মূল্যের বিষয়টি তার যিম্মায় دين তথা ঋণ হয়ে বাকী থাকে। এহেন অবস্থায় আয়েবের কারণে মুনীব তাকে ফেরত দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে গোলামের মূল্য যদি নগদ পরিশোধ না করা হয় অথবা নগদ পরিশোধ করা হয় কিন্তু সামান হয় এবং তা গোলামের হাতে বর্তমান থাকে তাহলে আয়েবের কারণে মুনীব তাকে ফেরত দিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, মুনীব যদি গোলামকে কবজা না করে তবে উপরে বর্ণিত সকল অবস্থাতেই মুনীব গোলামকে আয়েবের কারণে ফেরত দিতে পারবে (কাফী)।

৩৪. মাসআলা : ঋণগ্রস্ত গোলাম যাকে তার মুনীব ব্যবসা করার জন্য অনুমতি প্রদান করেছে সে যদি কোন গোলাম খরিদ করে তাকে নিজ মুনীবের নিকট বিক্রি করে দেয় এবং মুনীব তাকে কবজা করে নেয়, এরপর পাওনাদার ব্যক্তির কাছে ঋণমুক্ত করে দেয়, তারপর মুনীব তাতে আয়েব দেখতে পায় তাহলে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না এবং ক্ষতিপূরণও পাবে না। পক্ষান্তরে সে যদি তাকে কবজা না করে থাকে তবে মুনীব তাকে ফেরত দিতে পারবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্ত্র বিক্রি করেছে। কিন্তু ক্রেতা এখনো তা কবজা করেনি। ইত্যবসরে বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে তার পাওনা মূল্য হিবা করে দেয় তাহলে ক্রেতা আয়েবের কারণে এ মাল ফেরত দিতে পারবে না। আর যদি মূল্য কবজা করে নেওয়ার পর বিক্রেতা তাকে তা হিবা করে দেয় তাহলে ক্রেতা আয়েবের কারণে তা ফেরত দিতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। কেউ যদি কোন গোলাম বিক্রি করার পর এর মূল্য ক্রেতাকে হিবা করে দেয় অথবা ক্রেতাকে এর দায় থেকে মুক্ত করে দেয় তারপর সে তাতে আয়েব দেখতে পায় তাহলে কবজার আগে হলে ক্রেতা ঐ মাল ফিরিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু কবজার পরে হলে ফেরত দিতে পারবে না (কাফী)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : আয়েব হতে দায়মুক্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করা এবং আয়েবের কারণে জামানত দেওয়ার বিবরণ।

১. মাসআলা : আয়েব থেকে দায়মুক্ত হওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করা জীব-জানোয়ার ইত্যাদির ক্ষেত্রে জায়েয আছে। এ দায়-মুক্তির মধ্যে ঐ আয়েবও অন্তর্ভুক্ত হবে যা সম্বন্ধে বিক্রেতা জানে এবং ঐ আয়েবও অন্তর্ভুক্ত হবে যা সম্বন্ধে বিক্রেতা জানে না। এমনভাবে যে আয়েব সম্বন্ধে ক্রেতা জ্ঞাত আছে এবং যে আয়েব সম্বন্ধে ক্রেতা জ্ঞাত নেই, সবই এর মধ্যে शामिल হবে। এটিই আমাদের ইমামগণের অভিমত। চাই আয়েবের جنس (যাত) এর কথা উল্লেখ করা হোক বা না হোক। এমনভাবে চাই এর দিকে ইশারা করা হোক বা না হোক। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এরূপ শর্তের সাথে কোন বস্তু বিক্রি করা হলে বিক্রেতা বিক্রিত বস্তুর সকল আয়েব যা তাতে এখন আছে এবং যা পরে হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পয়দা হবে সব কিছু থেকে দায় মুক্ত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যে আয়েব পরে সৃষ্টি হবে সে আয়েব থেকে বিক্রেতা জিম্মামুক্ত হবে না (শরহত তাহাবী)। যদি বিক্রেতা এই শর্তে কোন কিছু বিক্রি করে যে, সে সর্ব প্রকার আয়েব থেকে দায়মুক্ত তাহলে যে আয়েব পরে সৃষ্টি হবে এর থেকে সে দায়মুক্ত হবে না। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। এমনভাবে যদি কোন বিশেষ ধরনের আয়েব থেকে দায় মুক্তির শর্ত আরোপ করে তবে এ তাখসীস সহীহ হবে (মুহীত)। কেউ যদি এই শর্তে কোন বস্তু বিক্রি করে যে, বিক্রেতা বিক্রিত বস্তুর সকল প্রকার আয়েব যা তাতে বর্তমানে আছে এবং যা পরে সৃষ্টি হতে পারে সব থেকে জিম্মামুক্ত তবে এতে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে (শরহত তাহাবী)।

২. মাসআলা : যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যে, এই আয়েব আকদের পরে তাতে সৃষ্টি হয়েছে, না কি এটি আকদের সময়েই এতে বিদ্যমান? তাহলে এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে কোন বর্ণনা নেই। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে, এক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে এ হুকুম তখনই হবে যদি সে কসম করে বলে যে, আমি আমার জ্ঞাতসারে আল্লাহর নামে কসম করে বলছি যে, এ আয়েব নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি দায়-মুক্তির বিষয়টি مطلق ভাবে বর্ণনা করা হয়। আর যদি এমন আয়েব থেকে দায়-মুক্তির কথা বলা হয় যা আকদের সময় তাতে বিদ্যমান ছিল, তারপর তারা উপরেক্ত নিয়মে মতভেদে লিপ্ত হয় তাহলে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-বাহরুর রাযিক)। যদি দুজন সাক্ষী কোন দাসীর ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য পেশ করে যে, সে সব প্রকার আয়েব থেকে মুক্ত, তারপর তাদের কোন একজনে দোষ মুক্তির কথা উল্লেখ করা ছাড়াই তাকে খরিদ করে নেয়, এরপর সে তাতে আয়েব দেখতে পায় তাহলে ক্রেতা এই দাসীকে ফিরিয়ে দিতে পারবে। এমনি ভাবে যদি দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এই দাসী পলায়নের আয়েব থেকে মুক্ত, তারপর তাদের কোন একজনে তাকে খরিদ করে দেখল যে, সে পালিয়ে যায় তাহলে এই ক্রেতাও তাকে তার

মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে। যদি সাক্ষীগণ এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, বিক্রেতা এই দাসীকে বিক্রি করার সময় একথা বলেছিল যে, সে তার পালিয়ে যাওয়ার আয়েব থেকে জিম্মামুক্ত, তারপর সাক্ষীগণের কোন একজনে তাকে খরিদ করে এবং তাকে পালানকারী হিসাবে পায় তাহলে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না (মাবসূত)।

৩. মাসআলা : বিক্রেতা যদি সর্ব প্রকার আয়েব থেকে দায় মুক্তির কথা উল্লেখ করে তবে এতে আয়েব এবং রোগ ব্যাধি সবই দাখিল হবে। আর যদি সর্বপ্রকার রোগ থেকে দায়-মুক্তির কথা বলে তবে তা শুধুমাত্র রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এতে দাগ, অতিরিক্ত আগুল এবং ঐ যখমের চিহ্ন যা ভাল হয়ে গেছে, দাখিল হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি সর্ব প্রকার غللة থেকে দায় মুক্তির কথা বলে তবে غللة (গায়িলা) শব্দটি চুরি, পালিয়ে যাওয়া এবং পাপাচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)। কেউ যদি সর্ব প্রকার কালো দাঁতও থেকে দায়-মুক্তির কথা বলে তবে লাল এবং সবুজ দাঁতও এই কথার অন্তর্ভুক্ত থাকবে (ফাতহুল কাদীর)। কেউ যদি গোলাম বিক্রি করে এবং সর্ব প্রকার ফোঁড়া ও যখম থেকে তার জিম্মামুক্তির কথা ঘোষণা করে তাহলে ঐ সমস্ত ফোঁড়া এ কথার অন্তর্ভুক্ত হবে যা থেকে বর্তমানে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এবং এতে ফোঁড়ার ঐ সমস্ত আহার এবং চিহ্নও অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা ভাল হয়ে গেছে। তবে দাগের চিহ্ন এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা দাগ এবং ফোঁড়া এক জাতীয় জিনিস নয়। কেউ যদি বলে, আমি এই গোলামের মাথার উপরিভাগের সর্ব প্রকার আয়েব ও যখম থেকে দায়মুক্ত, তারপর তার মাথায় যদি এমন যখম পাওয়া যায়, যার কারণে মাথার হাড় বেরিয়ে পড়ে তাহলে উক্ত ব্যক্তি موضحة এমন আয়েব বা যখম যার ফলে মাথার হাড় বের হয়ে গেছে) থেকে দায় মুক্ত বলে গণ্য হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তোমার পক্ষ থেকে আমার যত হক আছে সব হক থেকে তুমি দায়মুক্ত তাহলে আয়েব এবং দোষ-ত্রুটি সবই এর মধ্যে দাখিল হবে। এটিই পসন্দনীয় অভিমত। তবে در এর বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)।

৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে একটি কাপড় খরিদ করল এবং বিক্রেতা তাকে দেখিয়ে দিল যে, এর অমুক জায়গায় একটু ফাটা আছে। তখন ক্রেতা বলল, আমি এ ব্যাপারে তোমাকে দায় মুক্ত করে দিলাম। তারপর ক্রেতা ঐ কাপড় বিক্রেতার নিকট থেকে কবজা করার জন্য এসে ফাটা দেখে বলল, এই ফাটা তো ঐ পরিমাণ ফাটা নয় যে পরিমাণ ফাটা থেকে আমি তোমাকে দায় মুক্ত করে দিয়েছিলাম। ঐ ফাটা তো এক বিষত পরিমাণ ছিল। আর এই ফাটা দেখা যাচ্ছে এক হাত পরিমাণ। তাহলে এক্ষেত্রে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে যদি চোখের সাদা দাগ নিয়ে মতভেদ হয় কেউ বেশী বলে, কেউ কম বলে, তবে এ ক্ষেত্রেও ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে ক্রেতা বিক্রেতাকে বিক্রিত বস্তুতে যত ধরনের আয়েব বিদ্যমান আছে তা থেকে কিংবা রকমারি আয়েব থেকে দায় মুক্ত করে দেয় তারপর ঐ ক্রেতা বিক্রিত বস্তু দেখে বলে যে, ইহা সে আয়েব নয় যা এর মধ্যে

১. ورك বলি হয়, খরিদকৃত পণ্ডর কোন হকদার বের হয়ে আসার আশংকায় ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার নিকট থেকে প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে কোন বস্তু বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করা

ছিল, বরং এ আয়েব পরে সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এমনভাবে ক্রেতা যদি বলে, আমি তোমাকে কুষ্ঠরোগ থেকে দায় মুক্ত করে দিলাম। এরপর বলে, এখন আমি এতে যে রোগ দেখতে পাচ্ছি তা তো পূর্বের রোগ নয় বরং এটি দায়িত্ব মুক্ত করার পরে সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এ ক্ষেত্রেও ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা : বিক্রেতা যদি বলে, দাসীর চোখের যে কোন আয়েব হতে আমি দায় মুক্ত, এ কথা আমি তোমাকে বলে দিয়েছি। এরপর দেখা গেল যে, সে কানা তাহলে বিক্রেতা এ ক্ষেত্রে দায় মুক্ত হবে না। এমনভাবে বিক্রেতা যদি বলে, দাসীর হাতে যত ধরনের আয়েব আছে আমি সব কিছু থেকে দায় মুক্ত, তারপর দেখা গেল যে, এর হাত কাটা তাহলে সে দায় মুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে যদি তার একআঙ্গুল বা দুইআঙ্গুল কাটা থাকে তাহলে এর দায়-দায়িত্ব বিক্রেতার উপর আপত্তি হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)। হাতের দুটি আঙ্গুল কাটা থাকা দুটি আয়েব হিসাবে গণ্য। এহেন অবস্থায় বিক্রেতা যদি একথা বলে যে, হাতের এক আয়েব থেকে আমি দায় মুক্ত, তাহলে দুইআঙ্গুল কাটা পাওয়া গেলে সে দায় মুক্ত হবে না। যদি হাতের সমস্ত আঙ্গুল অর্ধহাতুলি সহ কাটা থাকে তবে তা এক আয়েব হিসাবে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বিক্রেতা যদি বলে পলায়নের অভ্যাস ব্যতীত এর মধ্যে যত আয়েব আছে, আমি এর থেকে দায় মুক্ত। তারপর যদি তাকে পলায়নকারী হিসাবে পাওয়া যায় তাহলে সে দায়মুক্ত বলে গণ্য হবে। যদি সে **الاباء** (পলায়ন ব্যতীত) বলে তাহলে পালিয়ে যাওয়ার আয়েবের কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি কাপড় এই শর্তের উপর বিক্রি করল যে এতে ফাটা-ফুটা জাতীয় যত আয়েব আছে সব কিছু থেকে সে মুক্ত। তারপর দেখা গেল যে, এতে বহু ছেঁড়া-ফাটা আছে। তবে তা সেলাইকৃত এবং তালি লাগানো তবে এ অবস্থায় বিক্রেতা দায়মুক্ত থাকবে। এমনভাবে যদি আগুন লেগে কাপড় ফুটা হয়ে যায় বা অংশ বিশেষ গলে যায় তবে এ ক্ষেত্রে সে দায়মুক্ত বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি এই শর্তের উপর গোলাম খরিদ করে যে, এতে একটি আয়েব আছে, তারপর দেখা গেল যে, এতে দুটো আয়েব আছে, এহেন অবস্থায় মৃত বা অনুরূপ কোন কারণে যদি খরিদকৃত ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এক্ষেত্রে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য ইখতিয়ার থাকবে। সে উক্ত দুই আয়েবের যে কোন একটির ক্ষতিপূরণ উসূল করতে পারবে। এক্ষেত্রে প্রথমে উভয় আয়েবের সাথে এর দাম কত তা সাব্যস্ত করতে হবে এবং পরে যে, আয়েবের ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে না এর সাথে এর মূল্য কত হতে পারে তা সাব্যস্ত করতে হবে এবং দেখতে হবে যে, এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবধান কি পরিমাণ আছে? যে পরিমাণ ব্যবধান হবে সে ঐ পরিমাণ মূল্য উসূল করে নিবে। এমনভাবে যদি ঐ বস্তুর তিনটি আয়েব পাওয়া যায় এবং তার কাছে যাওয়ার পর এতে আরেকটি অতিরিক্ত আয়েব সৃষ্টি হয়, যার ফলে একে ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে ঐ তিন আয়েবের থেকে যে কোন দুটির ক্ষতিপূরণ সে উসূল করে নিতে পারবে। এটি

ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। এক্ষেত্রে ক্রেতা প্রথমে ঐ তিন আয়েবসহ এর মূল্য কত হতে পারে তা সাব্যস্ত করবে। তারপর যে আয়েবের ক্ষতিপূরণ সে না নিতে চায় তা সহ এর মূল্য কত হতে পারে তা সাব্যস্ত করবে। তারপর যে পরিমাণ ব্যবধান হবে ঐ পরিমাণ সে বিক্রেতার নিকট হতে নিয়ে নিবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে দুটি গোলাম খরিদ করে যে, এদের একটিতে আয়েব আছে, তারপর ক্রেতা যদি তাদের একটিতে আয়েব পায় তাহলে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তাতে দুটি আয়েব পায় তবে সে তাকে ফেরত দিতে পারবে। এমনভাবে যদি দুটি গোলামের প্রত্যেকটিতে একটি করে আয়েব পায় তাহলেও ক্রেতা তাকে ফেরত দিতে পারবে। তারপর দেখতে হবে যে, যদি ক্রেতা কবজা করার পূর্বে এরূপ আয়েবের ব্যাপারে জানতে পারে তাহলে সে উভয়টি ফেরত দিতে পারবে। আর যদি কবজার পরে এই আয়েব দেখতে পায় তবে গোলাম দুটির যে কোনটি ইচ্ছা ফেরত দিতে পারবে।

এটি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত। তার মতে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। ক্রেতা যদি দুই গোলামের একজনকে কবজা করে তার মাঝে কোন দোষ না পায়, তারপর দ্বিতীয় গোলামের মাঝে দোষ আছে বলে জানতে পারে এবং তা সত্ত্বেও তাকে কবজা করে নেয়, তারপর প্রথম গোলামের মাঝেও দোষ আছে বলে জানতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে ক্রেতা তাদের দুজনের যে কোন একজনকে ফেরত দিতে পারবে। এক্ষেত্রে তার পূর্ণ ইখতিয়ার থাকবে। গোলামের আয়েবের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও ক্রেতা যে গোলামকে কবজা করেছিল সে যদি ঐ গোলামটি ফেরত দিতে চায় এবং বিক্রেতা বলে, এ গোলাম ফেরত প্রদানের ব্যাপারে তোমার কোন হক নেই। কেননা আয়েবের কথা জানা সত্ত্বেও তুমি যেহেতু সেটি কবজা করেছো, এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এর উপর তুমি সম্মত ও রাযী আছো। এ অবস্থায় বিক্রেতার কথার প্রতি আদৌ কোন লক্ষ্য করা হবে না। যদি ক্রেতা উভয় গোলামের মধ্যে আয়েবের কথা জানা অবস্থায় তাদেরকে কবজা করে অথবা তাদের একজনকে কবজা করে তাহলে এ কবজা করা তার পক্ষ থেকে গোলামদ্বয়কে মনোনীত করে নেওয়ার দলীল (যখীরা)।

৮. মাসআলা : কেউ যদি কোন বস্তু এই শর্তের উপর বিক্রি করে যে, আমি এর সর্ব প্রকার আয়েব হতে দায়মুক্ত তবে তার এ কথা গোলামের মধ্যে আয়েব থাকার স্বীকৃতি বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি এক আয়েব অথবা দুই আয়েব হতে দায়মুক্ত থাকার শর্ত আরোপ করা হয় তাহলে একথা গোলামের মধ্যে আয়েব থাকা স্বীকৃতি বলে গণ্য হবে। এর ব্যাখ্যা হল, কেউ যদি দুটি গোলাম এই শর্তের উপর বিক্রি করে যে, বিক্রেতা এই নির্দিষ্ট গোলামের আয়েবের ব্যাপারে দায়মুক্ত, তারপর গোলাম দুটি সে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দেয়, তারপর দুটির কোন একটির **مستحق** (হকদার) বেরিয়ে আসে এবং ক্রেতা অপরটির মধ্যে আয়েব দেখতে পায় তাহলে হারাহারি মূল্য অনুপাতে আয়েবদার গোলামটি তার যিম্মায় অপরিহার্য হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত গোলাম দুটি সুস্থ ও নিখুঁত হলে এর যে দাম হত ঐ দামকে উভয় গোলামের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। এভাবে করার পর **مستحق** (হকদার ব্যক্তির) অংশ কত তা সহজেই বুঝা যাবে। তারপর ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে হকদার

ব্যক্তির নিয়ে যাওয়া মূল্যের সম-পরিমাণ মূল্য উসূল করে নিবে। কেউ যদি একই মূল্যে দুই গোলাম এই শর্তে বিক্রি করে যে, এই খাস গোলামের এক আয়েবের ব্যাপারে বিক্রেতা দায়মুক্ত, তারপর দুই গোলামের কোন একজনের ব্যাপারে কেউ হকের দাবী করল, তারপর যে গোলামের মধ্যে এক আয়েবের ব্যাপারে বিক্রেতা দায়মুক্তির কথা বলেছে তাতে একটি আয়েব পাওয়া গেল তাহলে সাব্যস্তকৃত মূল্যকে **مستحق** (যার ব্যাপারে হকের দাবী করা হয়েছে) দোষ মুক্ত গোলামের মূল্য এবং দোষযুক্ত গোলামের মূল্যের উপর ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে। এভাবে করার পর **مستحق** গোলামের অংশ কত তা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। তারপর এ অংশ বাদ দিয়ে যে পরিমাণ মূল্য বাকী থাকবে, তা ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে নিয়ে নিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তির নিকট এই শর্তের ভিত্তিতে কোন গোলাম বিক্রি করে যে, এতে কোন আয়েব নেই। কিন্তু সে এক আয়েব থেকে দায়-মুক্তির কথা বলে। এরপর ক্রেতা এই শর্তের ভিত্তিতে তার থেকে গোলাম খরিদ করে নেয় এবং তাকে কবজাও করে নেয়। তারপর সে তাতে দুটি আয়েব দেখতে পায় এবং কোন কারণবশত সে খরিদকৃত গোলামকে ফেরত দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে এই গোলামটি সুস্থ ও নিখুঁত হলে তার কি পরিমাণ মূল্য হত সে অনুপাতে উক্ত দুই আয়েবের কোন একটির ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। পক্ষান্তরে বোচাকেনার গুরুতে বিক্রেতা একথা না বলে যে, “এতে কোন আয়েব নেই” তাহলে এই আয়েবদার গোলামের মধ্যে অন্য আয়েব সংযুক্ত থাকা অবস্থায় এর কত মূল্য হতে পারে তা সাব্যস্ত করে এই দুই আয়েবের যে কোন একটির ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। কেউ যদি দুই গোলামকে একই শর্তের উপর বিক্রি করে যে, এর একটির সর্বপ্রকার আয়েবের ব্যাপারে বিক্রেতা দায় মুক্ত। তারপর ক্রেতা গোলাম দুটিকে কবজা করে দেখে যে, এতে বহু আয়েব তাহলে ক্রেতা একে ফেরত দিতে পারবে না। এহেন অবস্থায় যদি অপর গোলামের কোন হকদার বেরিয়ে আসে তাহলে এর যে পরিমাণ মূল্য হবে ক্রেতা এই পরিমাণ মূল্য বিক্রেতার নিকট হতে ফেরত নিয়ে নেবে। অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় এতদুভয় গোলামের মূল্য কত হতে পারে তা সাব্যস্ত করে ঐ মূল্যটি উভয় গোলামের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে এবং পরে **مستحق** গোলামের ভাগে যে পরিমাণ টাকা পড়বে ঐ পরিমাণ টাকা ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে নিয়ে নিবে। কেউ যদি এই শর্তের উপর দুটি গোলাম খরিদ করে যে, এর একটির মাথায় তিনটি যখম হওয়ার দায়-দায়িত্ব থেকে বিক্রেতা দায়মুক্ত। তারপর এক গোলামের মাথায় তিনটি যখম পাওয়া গেল। এরপর অপর গোলামের কোন হকদার বেরিয়ে আসল। তাহলে দুই গোলামের পূর্ণ মূল্যকে সুস্থ **مستحق** গোলামের মূল্যের উপর এবং তিন যখমওয়ালা গোলামের মূল্যের উপর ভাগ করে দেওয়া হবে। তারপর সুস্থ **مستحق** গোলামের যে পরিমাণ মূল্য হবে ঐ পরিমাণ মূল্য ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে নিয়ে নিবে (মুহীত)।

১০. মাসআলা : নাওয়াদিরে ইবন সিমআ গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি কারো কাছ থেকে একটি গোলাম খরিদ করল এবং তৃতীয় অপর এক ব্যক্তি এর দোষ সম্পর্কে যামিন হল। তারপর ক্রেতা তাতে কিছু আয়েব দেখতে পেল এবং এ

কারণে গোলামকে তার মুনীবের নিকট ফেরত দিয়ে দিল তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কিয়াস অনুসারে যামিন ব্যক্তির উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। এ হুকুম ১৫৮ এর ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের দায়-দায়িত্ব বিক্রেতার উপরই আবর্তিত হয়ে থাকে। যামিনদার ব্যক্তির উপর নয়। কাজেই যামিনদারের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, ঐ ব্যক্তি আয়েবের ব্যাপারে যামিন হয়েছে। কাজেই আয়েবের জামানত তার উপর বর্তাবে। আর এটি **الاستحقاق في الدرك** এর মত একটি বিষয়। এমনিভাবে কেউ যদি ক্রেতার জন্য চুরি বা আযাদ হয়ে যাওয়ার বিষয়ে যামিন হয়। তারপর দেখা যায় যে, সে আযাদ ব্যক্তি অথবা চুরি করে আনা গোলাম তবে উক্ত যামিনদার ব্যক্তির উপর জামানত ওয়াজিব হবে। যদি কোন ব্যক্তি বিক্রিত গোলামের অন্ধ বা মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার ব্যাপারে যামিন হয়, তারপর দেখা গেল যে, সে আসলেই অন্ধ বা মস্তিষ্ক বিকৃত তাহলে ক্রেতা যামিন ব্যক্তির নিকট হতে তার দেওয়া মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। গোলামকে ফেরত দেওয়ার পূর্বেই সে যদি ক্রেতার নিকট মারা যায় এবং বিচারক বিক্রেতার নিকট হতে আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ আদায়ের হুকুম দেয় তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে ঐ মূল্য যামিন ব্যক্তির নিকট হতে উসূল করে নিতে পারবে (যখীরা)। কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করল এবং ক্রেতাকে আয়েবের ক্ষতি পরিমাণ মূল্য ফেরত দিবার জন্য কোন ব্যক্তি যামিন হল তাহলে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, এরূপ করা জায়েয আছে। তারপর যদি তাতে কোন আয়েব পাওয়া যায় এবং এ কারণে একে বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবে এহেন অবস্থায় ক্রেতার জন্য জায়েয হবে আয়েব অনুপাতে যামিনদার ব্যক্তির নিকট হতে এর মূল্য উসূল করে নেওয়া, যেমনিভাবে জায়েয আছে বিক্রেতার নিকট হতে আয়েব অনুপাতে মূল্য উসূল করে নেওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : আয়েবের ব্যাপারে আপোষ নিষ্পত্তি করার বিবরণ

১. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) “আসল” নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যদি কোন গোলাম এক হাজার দিরহাম মূল্যে ক্রয় করে তাকে কবজা করে নেয় এবং গোলামের মূল্যও আদায় করে দেয়, তারপর ক্রেতা তার মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় (এবং এ ব্যাপারে বিক্রেতাকে অবগত করে) কিন্তু বিক্রেতা ঐ আয়েবের সাথে একে বিক্রি করেছে বলে অস্বীকার করে। তারপর বিক্রেতা-ক্রেতার সাথে এ মর্মে আপোষ নিষ্পত্তি করতে চায় যে, সে কিছু দিরহাম ক্রেতাকে নগদ অথবা নির্দিষ্ট মুদতের মধ্যে দিয়ে দিবে তবে এরূপ আপোষ নিষ্পত্তি করা জায়েয আছে। যদি আয়েবের ব্যাপারে এক দীনারের উপর আপোষ নিষ্পত্তি

১. ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তিকে যামিন হিসাবে গ্রহণ করা যাতে খরিদকৃত বস্তুতে কোন অসুবিধা দেখা দিলে তার থেকে এর ক্ষতিপূরণ উসূল করা যায়। একেই **الدرك** বলা হয়।

২. অর্থাৎ কেউ যদি বলে, এ গোলাম চুরি করে আনা গোলাম বা আযাদ ব্যক্তি নয়। যদি এরূপ হয় তবে আমি এর জন্য যামিন। পরে যদি দেখা যায় যে, সে আযাদ মানুষ বা চুরি করে আনা গোলাম তাহলে ঐ যামিনদার ব্যক্তির উপর ক্ষতিপূরণ প্রদান ওয়াজিব হবে।

করা হয় এবং আকদের মজলিস থেকে উভয়ের পৃথক হওয়ার পূর্বে তা পরিশোধ করা হয় তাহলে তা জায়েয হবে। আর যদি আদায় করার পূর্বে পৃথক হয়ে যায় তবে আপোষ নিষ্পত্তি বাতিল হয়ে যাবে। যদি ক্রেতা গোলামকে বিক্রি করে দেয় এবং মূল্যও নগদ নিয়ে নেয়, তারপর সে ঐ আয়েবের ব্যাপারে জানতে পারে এবং নিজের বিক্রেতার সাথে এ আয়েবের কারণে কয়েক দিরহামের বিনিময়ে আপোষ নিষ্পত্তি করে তবে তা জায়েয হবে না। তারপর গোলাম যদি দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট মারা যায় এবং সে নিজের বিক্রেতার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ নিয়ে নেয়, তারপর দ্বিতীয় বিক্রেতা যদি প্রথম বিক্রেতার সাথে আপোষ নিষ্পত্তি করে নেয় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এই আপোষ নিষ্পত্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে সহীহ হবে। আর মূল্য যদি পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য বস্তু হয় এবং তা অনির্দিষ্ট হয় এবং বিক্রেতা পরিমাপ ও ওজনের কথা স্পষ্টভাবে বলে দেয় তারপর তারা উভয়ে নিজ নিজ বস্তু কবজা করে নেয়, তারপর ক্রেতা গোলামের মধ্যে আয়েব দেখতে পেয়ে এ বিষয়ে আপোষ নিষ্পত্তি করে তাহলে দেখতে হবে, যে মালের বিনিময়ে আপোষ করা হয়েছে তা যদি মূল্যের অংশ বিশেষ হয় এবং মূল্য জাতীয় (خبر) বস্তু হয় তাহলে এটি استيفاء (নিজের পাওনা উসূল করে নেওয়া) হিসাবে গণ্য হবে। استبدال (পরিবর্তন) বলে গণ্য হবে না। সুতরাং তা নগদ হোক বা বাকী উভয় অবস্থাতেই জায়েয হবে। চাই ক্রেতার হাতে মূল্য বাকী থাকুক অথবা নষ্ট হয়ে যাক। পক্ষান্তরে যদি মূল্য থেকে ভিন্ন জাতীয় মালের পরিবর্তে আপোষ নিষ্পত্তি করা হয় তাহলে এটি معاوضة (বিনিময়) বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, যে ক্ষেত্রে دين এর সাথে عين এর লেনদেন হয় সে ক্ষেত্রে যদি লেনদেনের আগেই افتران (বিচ্ছিন্নতা) হাসিল হয়ে যায় তবে এ লেনদেন জায়েয হবে। পক্ষান্তরে যদি دين এর সাথে دين এর লেনদেন হয় এবং এক্ষেত্রে লেনদেনের আগেই যদি افتران হাসিল হয়ে যায় তবে তা জায়েয হবে না। আর মূল্য যদি পরিমাপযোগ্য ও ওজনযোগ্য বস্তু হয় এবং তা নির্দিষ্ট পরিমাণ হয় আর ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি নিজ নিজ বস্তু কবজা করে নেয়, তারপর মূল্যের কিয়দাংশের উপর আপোষ নিষ্পত্তি হয় এবং এই মাল যদি মূল্য জাতীয় জিনিস হয় তবে এই আপোষ নিষ্পত্তি জায়েয হবে। চাই ঐ মাল নগদ আদায় করা হোক বা নির্দিষ্ট মুদতের মধ্যে আদায় করার শর্তে ধার্য করা হোক। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, গোলামের বিনিময়ে যা কিছু লওয়া হয়েছে, তা ধ্বংস হয়ে থাকলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি তা ধ্বংস না হয়ে যথার্থভাবে পূর্ববৎ বিদ্যমান থাকে তবে মূল্যের অংশ বিশেষের উপর ঐ জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে বাকীতে সোলেহ (আপোষ নিষ্পত্তি) করা হলে তা জায়েয হবে না। তবে যদি আপোষ নিষ্পত্তির মাল নগদ পরিশোধ করা হয় তাহলে আপোষ নিষ্পত্তি জায়েয হবে। যদি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তা পরিশোধ করা হয় অথবা যদি ঐ মাল সুনির্দিষ্ট পরিমাণ হয় (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : আয়েব দূর হয়ে গেলে সমঝোতা বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই আয়েবের কারণে বিক্রেতার নিকট হতে যা কিছু পরিমাণ নেওয়া হয়েছিল বা বিক্রেতা মূল্যের পরিমাণ হতে যা কিছু হ্রাস করেছিল তা বিক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর এর আয়েব দূরীভূত হয় তাহলে একে আর ফেরত

দেওয়া যাবে না। যদি খরিদ করার পর সর্ব প্রকার আয়েব থেকে এক দিরহামের বিনিময়ে আপোষ নিষ্পত্তি করে নেয় তাহলে এ আপোষ নিষ্পত্তি জায়েয হবে। যদিও তাতে কোন আয়েব না পাওয়া যায়। ক্রেতা যদি বলে, আমি তোমার নিকট থেকে সব আয়েব খরিদ করে নিলাম তাহলে তা জায়েয হবে না (ফাতহুল কাদীর)। যদি ক্রেতা দাসীর চোখে কোন আয়েব দেখতে পায় এবং পরে বিক্রেতা এ আয়েবের কারণে কোন কিছুর বিনিময়ে তার সাথে আপোষ নিষ্পত্তি করে তবে তা জায়েয হবে। যদিও আয়েবের নাম উল্লেখ না করে আয়েবের স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়। তবে এটিই আয়েবের নামোল্লেখরূপে গণ্য হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : যদি ক্রেতা গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে মিলে এ কথার উপর আপোষ নিষ্পত্তি করে যে, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাওনা থেকে এক-দশমাংশ কমিয়ে দিবে, এবং বাইরের কোন লোক গোলামকে ঐ হ্রাসকৃত মূল্যে নিতে রাখী থাকে তবে এ আপোষ নিষ্পত্তি জায়েয আছে। ক্রেতার পক্ষ হতে হ্রাস করা জায়েয আছে। কিন্তু বিক্রেতার পক্ষ হতে হ্রাস করা জায়েয নয়। যদি ক্রেতা ধোপার নিকট কাপড় ধৌত করার জন্য দেয় তারপর ক্রেতা তাতে বহু ফাটা-ছেঁড়া দেখতে পায় এবং বলে, আমি জানি না, এ কাপড় ধোপার নিকট ফেটেছে, নাকি বিক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায়ই ফেটেছিল, তারপর তারা সকলে মিলে এভাবে আপোষ নিষ্পত্তি করল যে, ক্রেতা এই কাপড় নিয়ে নিবে এবং বিক্রেতা তাকে এক দিরহাম দিবে, এমনিভাবে ধোপাও তাকে এক দিরহাম দিবে, তবে এভাবে আপোষ করা জায়েয আছে। আর যদি এক দিরহাম ধোপা দেয় এবং এক দিরহাম ক্রেতা দেয় আর বিক্রেতা ঐ ছেঁড়া কাপড়টি কবুল করে নেয় তবে তাও জায়েয হবে। কোন কোন ফকীহ বলেন, এটি গলৎ অর্থাৎ ভুল হুকুম। এর ব্যাখ্যা হল, প্রথমে ধোপা ক্রেতাকে এর জরিমানা পরিশোধ করবে, তারপর ক্রেতা তা বিক্রেতাকে পরিশোধ করবে (ফাতহুল কাদীর)।

৪. মাসআলা : ফাতাওয়ায়ে ফযলীতে আছে যে, ক্রেতা যদি দাসীর মাঝে কোন আয়েব দেখতে পায়, তারপর ক্রেতা ও বিক্রেতা এইভাবে আপোষ করে যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে এই পরিমাণ দিরহাম প্রদান করবে, আর দাসীকে ক্রেতা নিয়ে নিবে। তাহলে এই আপোষ জায়েয হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি এভাবে আপোষ করে যে, ক্রেতা বিক্রেতাকে এই পরিমাণ দিরহাম প্রদান করবে এবং বিক্রেতা দাসীকে নিয়ে নিবে তবে এই সোলেহ জায়েয হবে না। কিন্তু যদি ক্রেতা এই দাসীকে পূর্ণ মূল্যে খরিদ করার পর তদপেক্ষা কম মূল্যে তাকে ঐ বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করে তবে উক্ত আপোষ নিষ্পত্তি জায়েয হবে (যখীরা ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কাপড় খরিদ করার পর জামা বানানোর জন্য তা কেটে নিল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত এর দ্বারা জামা সেলাই করা হয়নি, ইত্যবসরে ক্রেতা যদি তাতে আয়েব দেখতে পায় এবং বিক্রেতাও স্বীকার করে যে, এ আয়েব আমার কাছে থাকা অবস্থায় ছিল, তারপর বিক্রেতা ক্রেতার সাথে এ মর্মে আপোষ করল যে, কাপড় আমিই নিয়ে নিচ্ছি তবে ক্রেতা প্রদত্ত মূল্য হতে দুই দিরহাম কম ফেরত নিবে তাহলে এ আপোষ মীমাংসা জায়েয হবে এবং কাপড়ের মূল্য হতে যে পরিমাণ বিক্রেতার নিকট রয়ে গেল তা ঐ লোকসান বাবদ বলে গণ্য হবে যা ক্রেতা কর্তৃক কাপড় কর্তনের কারণে সাধিত হয়েছে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : আসল গ্রন্থে আছে যে, কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ দীনার মূল্যে একটি দাসী খরিদ করল। তারপর দাসীকে কবজা করার পর তাতে কোন আয়েব আছে বলে ক্রেতা অভিমত ব্যক্ত করল। তখন ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে মিলে এ মর্মে আপোষ করল যে, বিক্রেতা দাসীকে নিয়ে নিবে এবং সে ক্রেতাকে ঊনপঞ্চাশ দীনার ফিরিয়ে দিবে। এভাবে আপোষ করা জায়েয আছে। তবে ঐ এক দীনার যা বিক্রেতার কাছে রয়ে গেল তা ভোগ করা বিক্রেতার জন্য জায়েয হবে কিনা? এ সম্পর্কে বলা হয়, যদি বিক্রেতা একথা স্বীকার করে নেয় যে, এই আয়েব তার নিকটে থাকা অবস্থায়ই দাসীর মধ্যে ছিল, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এই দীনার ভোগ করা তার জন্য জায়েয হবে না। বরং তার উপর ওয়াজিব হবে, এটিকে ক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দেওয়া। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে ফেরত দেওয়া তার উপর ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে “বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় দাসীর মধ্যে এই আয়েব বিদ্যমান থাকার কথা” সে যদি অস্বীকার করে এবং যদি এ জাতীয় আয়েব এ সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। আর যদি ঐ আয়েবের অবস্থা এমন হয় যে, তা এই সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে ফকীহদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই অতিরিক্ত দীনারটি ভোগ করা বিক্রেতার জন্য জায়েয হবে। বিক্রেতা যদি আয়েবের বিষয়টি স্বীকার না করে এবং অস্বীকারও না করে বরং চুপ থাকে তবে চুপ থাকা ও অস্বীকার করা উভয়টিই সমান বলে গণ্য হবে (যখীরা)। বিক্রেতা যদি ক্রেতার নিকট থেকে এই শর্তে একটি কাপড় নেয় যে, সে ক্রেতার নিকট হতে দাসীকে নিয়ে নিবে এবং তার নিকট তার প্রদত্ত মূল্য ফিরিয়ে দিবে তাহলে এই সূরত এবং এক দীনার হাতে রেখে দেওয়া উভয়ই সমান। যদি কাপড়ের স্থলে দিরহাম গ্রহণ করে এবং মজলিসেই তা কবজা করে নেওয়া হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি দিরহামের বিষয়টি নগদ আদায়যোগ্য না হয়ে মেয়াদী হয় তাহলে কোন অবস্থাতেই তা জায়েয হবে না। কেননা এ লেনদেন বাইয়ে সরফ হিসাবে গণ্য। যদি দিরহামের স্থলে খাদ্য দ্রব্য হয় এবং তা নির্দিষ্ট মুদতান্তে আদায় যোগ্য হয়, এদিকে বিক্রেতা তার নিকটে থাকা অবস্থায় দাসীর মধ্যে এই আয়েব ছিল বলে অস্বীকার করে এবং তারা যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে নিজ নিজ বস্ত্র কবজা করে নেয় আর আয়েবের অবস্থাও এমন হয় যে, তা এই সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে তাহলে এই আপোষ নিষ্পত্তি জায়েয হবে। পক্ষান্তরে মূল্য নগদ আদায় করার আগেই তারা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে এই খাদ্য অর্থাৎ লেনদেন বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এটি দিন এর পরিবর্তে দিন এর লেনদেন। এহেন অবস্থায় দীনারগুলোকে আয়েবমুক্ত দাসী এবং আয়েবদার দাসীর মূল্যের উপর ভাগ করে দেওয়া হবে। তারপর দাসীর বাবদ যে পরিমাণ মূল্য আসবে ঐ পরিমাণ মূল্য ক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে। আর যে পরিমাণ মূল্য লোকসানের মুকাবিলায় আসবে তা নিজের কাছে রেখে দিবে (মাবসূত)।

৬. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করল এবং তাকে কবজা করার আগেই তার মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পেল। তারপর এই আয়েবের কারণে বিক্রেতা ক্রেতার সাথে কোন দাসীর দ্বারা (দাসী প্রদান করে) আপোষ মীমাংসা করে নেয় তবে এই দাসী زيادة فی

المبيع (বিক্রিত বস্তুতে অতিরিক্ত সংযুক্তকরণ) বলে গণ্য হবে। অতএব যে মূল্য দ্বারা গোলাম খরিদ করা হয়েছে তা গোলাম ও দাসীর মূল্যের উপর হারাহারি ভাবে বণ্টন করা হবে। সুতরাং এ অবস্থায় যদি তাদের কোন একজনের মধ্যে আয়েব পাওয়া যায় তাহলে তার মূল্যের বিনিময়ে তাকে ফেরত প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা গোলামকে কবজা করার পর যদি এই আপোষ মীমাংসা হয় তবে এই দাসী আয়েবের পরিবর্তে প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। সুতরাং যদি এ অবস্থায় দাসীর মধ্যে কোন আয়েব পাওয়া যায় তবে মূল্যের মধ্যে যে অংশ গোলামের আয়েবের বদলা স্বরূপ ঐ অংশের বিনিময়ে দাসীকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা : নাওয়াদির ইবন সিমাআর মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে একটি গোলাম খরিদ করল এবং তাকে কবজা করার আগেই তার মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পেল। তারপর অন্য এক গোলামের দ্বারা এ আয়েবের ব্যাপারে আপোষ নিষ্পত্তি করল এবং ক্রেতা উভয় গোলামকেই কবজা করে নিল। তারপর উভয় গোলামের কোন একজনের হকদার বের হয়ে এল তাহলে مستحق (হকের ভিত্তিতে নিয়ে যাওয়া) গোলামের যে মূল্য হবে ঐ পরিমাণ মূল্য ক্রেতা বিক্রেতার থেকে নিয়ে নিবে। যেন সে উভয় গোলামকে একই সাথে ক্রয় করেছে। যদি খরিদকৃত গোলামকে কবজা করার পর তাতে আয়েব পাওয়া যায় এবং বিক্রেতা কোন গোলামের বদলায় তার সাথে আপোষ মীমাংসা করে নেয় এবং ক্রেতা তার নিকটে পাওনা মূল্য পরিশোধ করে দেয়, তারপর খরিদকৃত গোলামের কোন হকদার বের হয়ে আসে তবে দ্বিতীয় গোলামের দ্বারা যে আপোষ মীমাংসা করা হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত ও ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি খরিদকৃত বস্তুতে আয়েব দেখতে পেয়ে “নিজস্ব প্রয়োজনে বিক্রেতার সওয়ারীর উপর একমাস পর্যন্ত সওয়ার হওয়ার শর্তের ভিত্তিতে সুলেহ করা হয় তবে তা জায়েয হবে। ফকীহগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি শহরের মধ্যে সওয়ারীর উপর আরোহণ করার শর্ত করা হয়। পক্ষান্তরে যদি শহরের বাইরে সওয়ারীর উপর আরোহণের শর্ত করা হয় অথবা যদি বিষয়টিকে مطلق অর্থাৎ ব্যাপক রাখা হয় তবে সে ক্ষেত্রে আপোষ নিষ্পত্তি জায়েয হবে না (যখীরা)।

৮. মাসআলা : ক্রেতার নিকট হতে তার খরিদকৃত মাল কেউ হকদার হওয়ার দাবীতে নিয়ে গেছে। তারপর ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত চাইলে বিক্রেতা তার সাথে প্রদত্ত টাকা অপেক্ষা কম টাকার বিনিময়ে আপোষ নিষ্পত্তি করলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতা পূর্ণ টাকা বিক্রেতার নিকট হতে ফেরত নিতে পারবে (আস সুগরা : মাসাইলে ইসতিহকাফ)। ক্রেতা তার খরিদকৃত দাসীর ব্যাপারে আয়েবের দাবী উত্থাপন করার পর বিক্রেতা তা অস্বীকার করল। তারপর তারা সামান্য কিছু মালের উপর এই শর্তের ভিত্তিতে আপোষ মীমাংসা করল যে, ক্রেতা-বিক্রেতাকে ঐ আয়েব থেকে দায়মুক্ত করে দিবে। পরে জানা গেল যে, দাসীর মধ্যে ঐ আয়েব ছিল না অথবা ছিল, কিন্তু ভাল হয়ে গেছে তাহলে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে ঐ মাল ফেরত নিয়ে নিতে পারবে যা সে তাকে আপোষ নিষ্পত্তি করতে

গিয়ে প্রদান করেছে (আস-সুগরা)। যদি ক্রেতা তার ক্রয়কৃত দাসীর চোখে সাদা দাগজনিত কোন আয়েব পায় এবং এ কারণে বিক্রেতা তার সাথে এভাবে আপোষ করে যে, ক্রেতা দাসীর মূল্য হতে এক দিরহাম কম দিবে তবে এভাবে আপোষ করা জায়েয হবে। এরপর যদি ঐ সাদা দাগ ভাল হয়ে যায় তবে ক্রেতা ঐ এক দিরহাম বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দিবে। এমনিভাবে ক্রেতা যদি তার ক্রয়কৃত দাসীর ব্যাপারে বলে যে, সে গর্ভবতী, তারপর বিক্রেতা তার সাথে এভাবে আপোষ করে যে, ক্রেতা তার মূল্য হতে এক দিরহাম কম দিবে, তারপর দেখা যায় যে, সে গর্ভবতী নয় তাহলে এ ক্ষেত্রে ক্রেতা ঐ এক দিরহাম বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দিবে। অনুরূপভাবে কেউ দাসী খরিদ করার পর দেখল যে, সে বিবাহিতা, এ কারণে ক্রেতা তাকে ফেরত দেওয়ার মনস্থ করলে বিক্রেতা তার সাথে কয়েক দিরহামের বিনিময়ে আপোষ করে নিল। তারপর তার স্বামী তাকে বায়িন তালাক প্রদান করল তাহলে ক্রেতার উপর অপরিহার্য হবে ঐ দিরহামগুলো বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দেওয়া (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : কেউ কাপড় খরিদ করতঃ জামা তৈরি করার নিমিত্তে তা কর্তন করে নিয়ে এর দ্বারা জামাও সেলাই করে নিল, তারপর ঐ জামা কারো কাছে বিক্রি করে দিল অথবা বিক্রি করেনি, এমতাবস্থায় সে যদি এর আয়েবের ব্যাপারে জানতে পারে কিংবা আয়েব যাহির হওয়ার পরই ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়ে থাকে, তারপর কয়েক দিরহামের বিনিময়ে ঐ আয়েবের উপর আপোষ নিষ্পত্তি করা হয় তবে তা জায়েয হবে। এমনিভাবে যদি খরিদকৃত কাপড়ে লাল রং লাগিয়ে তা বিক্রি করে দেওয়া হয় অথবা বিক্রি করা হয়নি, এমতাবস্থায় এর কোন আয়েবের ব্যাপারে জ্ঞাত হয়ে আপোষ করে নেওয়া হয় তবে তা জায়েয হবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রয়কৃত কাপড়টি কর্তন করা হয়, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেলাই করা হয়নি, এমতাবস্থায় তা বিক্রি করার পর যদি আয়েবের ব্যাপারে আপোষ মীমাংসা করা হয় তবে এ আপোষ সহীহ হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কাপড়ে কালো রং লাগানো শুধুমাত্র কর্তন করার অনুরূপ। কিন্তু সাহেবাইনের মতে এটি কর্তন করে সেলাই করে নেওয়ার অনুরূপ (যখীরা)।

১০. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি গাধা খরিদ করার পর তাতে পুরাতন কোন আয়েব দেখতে পেল। এ কারণে সে গাধাটি ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করলে এক দীনারের বিনিময়ে তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা হয়ে যায় এবং ক্রেতা তা আদায়ও করে নেয়। তারপর ক্রেতা ঐ গাধার মধ্যে আরেকটি দোষ দেখতে পায় তাহলে সে ঐ দীনারসহ গাধাটি বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে (কিনুয়া)। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট হতে দশ দিরহামের বিনিময়ে এক কুরুর গম খরিদ করল। এবং মূল্য পরিশোধের আগেই ক্রেতা তা কবজা করে নিল। তারপর সেই কুরুর মধ্যে ক্রেতা এমন আয়েব দেখতে পেল যার কারণে এক-দশমাংশ মালের ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়। উক্ত আয়েবের কারণে ক্রেতা ঐ মাল ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করলে বিক্রেতা নির্দিষ্ট এক কুরুর পরিমাণ যবের বিনিময়ে তার সাথে আপোষ করে নেয় তবে এই আপোষ নিষ্পত্তি জায়েয হবে। আর এই যব আয়েব জনিত লোকসানের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধর্তব্য হবে। পক্ষান্তরে যদি যবের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয় কিন্তু মূল বস্তু অনির্দিষ্ট থাকে এবং মেয়াদান্তে বাকীতে তা আদায়

করা সাব্যস্ত হয় তাহলে এ আপোষ নিষ্পত্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এ লেনদেন এমন বায়য়ে সলম (بيع سلم) হল যার المال (মূলধন) অগ্রে আদায় করা হয়নি। কিন্তু যদি মূল্যের দশমাংশ নগদ পরিশোধ করে এ কথা বলা হয় যে, এটি এক কুরুর যবের বিনিময়ে প্রদান করা হল তবে এ লেনদেন জায়েয হবে এবং যব সলম হিসাবে গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া হয় তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। পক্ষান্তরে যদি পূর্ণ মূল্যের এক-দশমাংশ নগদ পরিশোধ করা হয় কিন্তু এ কথা না বলা হয় যে, এটি হচ্ছে যবের বিনিময় তাহলে যা কিছু নগদ আদায় করা হয়েছে তা মূল্য হিসাবেই ধর্তব্য হবে। কাজেই যবের এক-দশমাংশে সলম সাব্যস্ত হবে এবং এর নয়-দশমাংশে সলম বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত)।

সপ্তম অনুচ্ছেদঃ ওসী, উকীল এবং রুগ্ন ব্যক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি-বিধান

১. মাসআলা : যদি ওসী (ওসীয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি) মৃত ব্যক্তির মাল বিক্রি করে তবে এর দায়-দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে এবং দোষের কারণে তার কাছেই ফেরত দেওয়া হবে। কেউ যদি এক হাজার দিরহাম মূল্যে গোলাম খরিদ করে মূল্য পরিশোধ করার আগেই তাকে কবজা করে নেয়, তারপর ক্রেতা এই মূল্য ছাড়া আরো এক হাজার দিরহাম ঋণ রেখে মারা যায়। আর এই গোলাম ছাড়া তার অন্য কোন মালও না থাকে, এ অবস্থায় ওসী যদি দোষের কারণে ঐ গোলামকে বিচারকের ফায়সালা ছাড়াই বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেয়, তাহলে পাওনাদার ব্যক্তি তার এই কাজের উপর কোন হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে ওসী বিক্রেতার নিকট থেকে অর্ধেক মূল্য নিয়ে তা পাওনাদারকে দিয়ে দিবে। এমনিভাবে কোন দোষ ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় ইকাল (ভঙ্গ) করে দেওয়া হয় তবে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা : বিক্রেতা যদি ওসীর নিকট হতে এই গোলামকে ফেরত না নেয় ফলে সে বিচারকের কাছে মামলা করে, আর বিচারক যদি অপর পাওনাদারের পাওনা সম্পর্কেও জানতে পারেন তাহলে গোলামকে ফেরত দানের আদেশ না দিয়ে তাকে বিক্রি করতঃ এর মূল্য মামলাকারী ওসী এবং অপর পাওনাদার এ দুজনের মাঝে বন্টন করে দিবেন, এ অবস্থায় বিক্রেতা আয়েবজনিত লোকসানের যামিন হবে না। বিচারক কতক গোলামকে বিক্রি করার আগেও নয় এবং পরেও নয়। বিচারক যদি অন্য কোন পাওনাদারের পাওনা সম্পর্কে অবগত না থাকে এবং এ অবস্থায় ওসী বিক্রেতার সাথে আয়েবের ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয় তাহলে বিচারক আয়েবের কারণে ঐ গোলামকে বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশজারী করবেন এবং মৃত ব্যক্তির নিকট বিক্রেতার যে মূল্য পাওনা আছে তা বাতিল হয়ে যাবে। যদি অপর পাওনাদার ব্যক্তি নিজের পাওনার উপর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয় তবে বিক্রেতা যার কাছে গোলাম প্রত্যর্পণ করা হয়েছে তার ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে প্রত্যর্পণের বিষয়টিকে বহাল রেখে দ্বিতীয় পাওনাদার ব্যক্তিকে গোলামের অর্ধেক মূল্য ফিরিয়ে দিবে। এ অবস্থায় মূল্য উভয় পাওনাদার ব্যক্তির মধ্যে আধা আধি করে ভাগ করে দেওয়া

হবে। আর ইচ্ছা করলে বিক্রেতা গোলাম প্রত্যাৰ্পণ করার বিষয়টিকে নাকচ করে এবং ওসী ঐ গোলামকে ফেরত দিয়ে দিবে। তারপর উভয় পাওনাদারের ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে গোলামকে বিক্রি করে দেওয়া হবে (যখীরা)।

৩. মাসআলা : বিচারক গোলামকে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ জারী করার পর যদি গোলাম মারা যায় অথবা বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় গোলামের মধ্যে কোন আয়েব পয়দা হয় অথবা সে তাকে আযাদ করে দেয় বা মুদাব্বার বানায় কিংবা (দাসী হলে) তাকে উম্মু ওয়ালাদ বানায় তাহলে বিক্রেতার উপর মূল্যের অর্ধেক জামানত হিসাবে ওয়াজিব হবে। গোলামের সাধারণ মূল্যের চেয়ে যদি ফেরত দেওয়ার দিন এর মূল্য তুলনামূলকভাবে কিছু বেশী হয়, যা মানুষ ভোগ করে অভ্যস্ত তাহলে এ অতিরিক্ত মূল্যের বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি ফেরত দেওয়ার দিন এর মূল্য সাধারণ মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী হয় যা মানুষ ভোগ করে অভ্যস্ত নয় তবে এ অতিরিক্ত মূল্য ক্ষমায়োগ্য বলে ধর্তব্য হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪. মাসআলা : সুস্থ অবস্থায় একটি গোলাম এক হাজার দিরহাম মূল্যে খরিদ করার পর কবজাও করে নিল। কিন্তু মূল্য পরিশোধ করার আগে ক্রেতা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এদিকে তার উপর আরো এক হাজার দিরহাম ঋণ আছে। এ অবস্থায় ক্রেতা গোলামের মধ্যে আয়েব দেখতে পেয়ে যদি আদালতের ফায়সালা ছাড়াই তাকে ফেরত দিয়ে দেয় অথবা বিক্রেতার সাথে ইকালার করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে সে যদি ক্রয়-বিক্রয় ইকালার (বাতিল) করে দেয় তাহলে এর দুই অবস্থা হতে পারে। যদি ক্রেতা আরোগ্য লাভ করে তাহলে সে যা কিছু করেছে সবই সহীহ বলে গণ্য হবে। যদি ঐ রোগে সে মারা যায় আর গোলামের قیمت (বাজার মূল্য) ثمن (বিক্রয় মূল্য) এর সম-পরিমাণ অথবা ثمن অপেক্ষা কম হয় এবং এই গোলাম ছাড়া তার অন্য মাল না থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে ঐ বিধানই প্রযোজ্য হবে যে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে ওসীর ক্ষেত্রে। যদি ক্রেতা গোলামকে আদালতের ফায়সালা ছাড়া ফেরত দিয়ে দেয় অথবা ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করে দেওয়া হয় এবং গোলামের বাজার মূল্য বিক্রয় মূল্যের সমান বা কম হয় তাহলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি বিক্রেতা গোলামকে কবুল না করে এবং নিরুপায় হয়ে ক্রেতা তার অসুস্থ অবস্থার বিচারকের আদালতে মকদ্দমা দায়ের করে তাহলে বিচারক গোলামকে বিক্রেতার নিকট ফেরত প্রদানের আদেশ জারী করবেন। চাই তিনি অন্য পাওনাদারের পাওনা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক। পক্ষান্তরে বিচারক গোলামকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়ার পর ক্রেতা যদি পূর্ব রোগে মারা যায় তাহলে ওসীর ক্ষেত্রে যে হুকুম এ ক্ষেত্রেও সে হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি সে আদালতের ফায়সালা মুতাবিক গোলামকে ফেরত প্রদান করে থাকে এবং বিচারক অন্য পাওনাদার ব্যক্তির পাওনা সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে। কিন্তু যদি গোলামের বাজার মূল্য তার বিক্রয় মূল্য থেকে বেশী হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে না। বরং কাযী ফেরত প্রদানের বিষয়টিকে নাকচ করে করতঃ গোলামকে বিক্রি করবেন। তারপর এই টাকা উভয় পাওনাদারের মধ্যে আধা-আধি করে ভাগ করে দেবেন। যদি বিক্রেতা বলে, গোলামের যা বাজার মূল্য আছে তা থেকে অর্ধেক পরিশোধ করে আমিই গোলামটি নিয়ে নিচ্ছি যাতে محاباة (বেশী দামের জিনিস কম দামে বেচা) থেকে বাঁচা যায় তবে তার এরূপ করার ইখতিয়ার থাকবে না (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত কোন উকীল যদি কোন বস্তু বিক্রি করে তারপর ঐ বস্তুতে আয়েবের কারণে বিবাদ সৃষ্টি হয়, তারপর উকীল যদি আদালতের ফায়সালা ছাড়া বিক্রিত বস্তু কবুল করে নেয় তাহলে বিক্রিত বস্তু উকীলের যিম্মায় বর্তাবে। মুআকিলের যিম্মায় বর্তাবে না এবং বিক্রিত এই বস্তু উকীলের জন্য সাব্যস্ত হবে। এ পর্যায়ে উকীলের জন্য জায়েয হবে না মুআকিলের সাথে বিবাদে বা মামলায় জড়িয়ে পড়া। উকীল যদি মুআকিলের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় এবং এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, মুআকিলের নিকটে থাকা অবস্থায় এই আয়েব এর মধ্যে ছিল তাহলে তার এ সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি এই সময়ের মধ্যে এ জাতীয় আয়েব সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি আয়েবটি এমন পুরাতন যে, এ সময়ে মধ্যে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাহলে রুয়ু, রাহন, ওয়কালাহ এবং মায়ুন ইত্যাদি অধ্যায়সমূহের অধিকাংশ বর্ণনায় একথা উল্লেখ আছে যে, লেনদেনের উক্ত বিষয়টি উকীলের উপরই বর্তাবে। এটিই সহীহ অভিমত। ফকীহ আবু বকর বলখী (র) এই অতীমতটি গ্রহণ করেছেন। ক্রেতা যদি তার ক্রয়কৃত বস্তুটি আদালতের ফায়সালা সাপেক্ষে ফেরত দিয়ে থাকে এবং বিষয়টি সে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করে পেশ করে তাহলে এই আকদের দায়-দায়িত্ব মুআকিলের উপর বর্তাবে। আয়েব চাই পুরাতন হোক বা নতুন হোক। উকীলের অস্বীকৃতির ভিত্তিতে যদি আদালতের পক্ষ হতে ফায়সালা প্রদান করা হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও আমাদের আনিমগণের মতে উক্ত হুকুম হবে। যদি ক্রয়কৃত উকীলের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচারকের ফায়সালা সাপেক্ষে উকীলের কাছে ফেরত দেওয়া হয় তাহলে দেখতে হবে যে, এ আয়েবের অবস্থা কি? যদি এমন আয়েব হয় যা এ সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে না তাহলে এটি মুআকিলের কাছে রদ অর্থাৎ প্রত্যাৰ্পণ বলে গণ্য হবে। আর যদি এ সময়ের মধ্যে এই জাতীয় আয়েব সৃষ্টি হতে পারে তাহলে এই রদ উকীলের উপর বর্তাবে। তারপর উকীল এ ব্যাপারে মুআকিলের সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে পারবে। যদি উকীল এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হয় যে, এই আয়েব মুআকিলের কাছে থাকা অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এই মাল মুআকিলের কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উকীলের কাছে সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে সে মুআকিলকে কসম করতে পারবে। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে খরিদকৃত মাল মুআকিলের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি সে কসম করে নেয় তবে এই মাল উকীলের দায়িত্বে বর্তাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি উকীল আযাদ এবং আকিল তথা জ্ঞানবান ব্যক্তি হয়। পক্ষান্তরে উকীল যদি মুকাতাব বা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হয় তাহলে আয়েবের কারণে গোলাম বা অন্য কোন বস্তু প্রত্যাৰ্পণ করার ক্ষেত্রে উকীল ও মুআকিল উভয়ের সাথেই বিবাদে আসা যাবে। এ ক্ষেত্রে উকীল, মুআকিল কেউই মুনীবের নিকট হতে কোন কিছুই রুজ করতে পারবে না, বা ফেরত পাবে না। কিন্তু যে গোলামকে মুনীবের পক্ষ থেকে ব্যবসার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তাকে মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করা যাবে এবং উক্ত মূল্য করজ বা ঋণ হিসাবে মুকাতাব গোলামের যিম্মায় বাকী থাকবে (মুহীত)।

৬. মাসআলা : বিক্রিত বস্তু আয়েব পাওয়া গেলে উকীল তা ফেরত গ্রহণ করতে পারবে। এবং এই মাল তার কাছেই ফেরত দেওয়া হবে যতক্ষণ সে জীকিত, আকিল এবং ওকালতের যোগ্য থাকবে। আর যদি সে ওকালতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যোগ্য না হয় যেমন সে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত গোলাম বা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত বালক তাহলে বিক্রিত বস্তু মুআকিলের নিকট প্রত্যাৰ্পণ করা হবে। উকীল ওকালতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যোগ্য ছিল বটে, কিন্তু

এহেন অবস্থায় সে যদি কোন ওসী বা ওয়ারিস না রেখে মারা যায় তবে ক্রয়কৃত বস্তু মুআকিলের নিকট প্রত্যর্পণ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা : কেউ অন্যের গোলামকে বলল, তুমি নিজেকে তোমার মালিকের নিকট হতে এক হাজার দিরহাম মূল্যে আমার জন্য খরিদ কর। গোলাম রাযী হয়ে নিজের মুনীবের কাছে গিয়ে বলল, আপনি আমাকে আমার নিকট এক হাজার দিরহাম মূল্যে অম্বকের জন্য বিক্রি করে দিন। মালিক তাই করল। তাহলে সে আদেশকর্তার গোলাম হয়ে যাবে। এ অবস্থায় আদেশদাতা যদি গোলামের মাঝে কোন দোষ পেয়ে বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করতে চায় তাহলে দেখতে হবে যে এ নিজেকে খরিদ করার দিন আয়েবের ব্যাপারে গোলাম নিজে জ্ঞাত ছিল কিনা? যদি জ্ঞাত থাকে তবে আদেশদাতা এ দোষের কারণে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। আর গোলাম যদি এ সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকে তাহলে ফেরত দিতে পারবে। আর এ ক্ষেত্রে গোলাম নিজেই বাদী হয়ে লড়তে পারবে এবং আদেশদাতার মতামত না নিয়েও সে নিজেই নিজেকে মুনীবের কাছে প্রত্যর্পণ করতে পারবে (যখীরা)।

৮. মাসআলা : ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত উকীল তার মুআকিলের জন্য দাসী খরিদ করল। কিন্তু এখনো সে তাকে তার নিকট হস্তান্তর করেনি। এমতাবস্থায় সে যদি ঐ দাসীর মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় তাহলে উকীল তাকে তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে। চাই মুআকিল উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু মুআকিলের নিকট সোপর্দ করে দেওয়ার পর মুআকিলের অনুমতি ব্যতিরেকে তাকে ফেরত দিতে পারবে না। প্রথমোক্ত সুরতে বিক্রেতা যদি দাবী করে যে, মুআকিল উক্ত আয়েবের ব্যাপারে রাযী ও সম্মত আছে, অথচ সে ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত, এহেন অবস্থায় বিক্রেতা যদি উকীল বা মুআকিলের নিকট শপথ তলব করে তবে আমাদের মাহযাব অনুসারে তার এরূপ শপথ তলব করার অধিকার নেই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। পক্ষান্তরে যদি বিক্রেতা শপথ তলব না করে এবং উকীল দাসীকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দেয়, তারপর মুআকিল উপস্থিত হয়ে নিজের সম্মত থাকার দাবী করে এবং দাসীকে বিক্রেতার হাত থেকে ফেরত আনতে চায় তাহলে সে তা করতে পারবে (যখীরা)। যদি বিক্রেতা নিজের দাসীর অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ কায়েম করে তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবে। আর যদি উকীল এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, তার মুআকিল আয়েবের ব্যাপারে সম্মত আছে তবে তার এ স্বীকারোক্তি সহীহ হবে। তখন তার জন্য এ বিষয়ে মামলা-মকদ্দমা করার আর কোন অধিকার থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। পক্ষান্তরে উকীল যদি এ মর্মে ইকরার করে যে, মুআকিল বিক্রেতাকে এ আয়েব থেকে দায় মুক্ত করে দিয়েছে তবে তার কথা তার নিজের ব্যাপারে বিশ্বাস-যোগ্য হবে। কিন্তু বিক্রিত বস্তু তার যিম্মায় অপরিহার্য হবে। অবশ্য আদেশদাতা ব্যক্তি যদি এ ব্যাপারে সম্মত হয়ে যায় কিংবা যদি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুআকিল বিক্রেতাকে এ আয়েব থেকে দায় মুক্ত করে দিয়েছে তবে এই দাসী মুআকিলের যিম্মায়ই বর্তাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)। কাউকে মালামাল খরিদ করার ব্যাপারে উকীল নিযুক্ত করার পরিবর্তে যদি তাকে আয়েবের ব্যাপারে মামলা করার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয়, এ অবস্থায় বিক্রেতা যদি দাবী করে যে, ক্রেতা এই আয়েব সহ মাল গ্রহণ করতে রাযী আছে তাহলে উকীল এই মাল

ফেরত দিতে পারবে না, যতক্ষণ না মুআকিল নিজে উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে শপথ করবে (যে আমি এতে রাযী নই) (মুহীত)।

৯. মাসআলা : ক্রয়-উকীল যদি কোন বস্তু ক্রয় করে তা মুআকিলের নিকট সোপর্দ করে দেয়, তারপর মুআকিল তাতে কোন আয়েব দেখতে পায় তাহলে সে একে উকীলের নিকট ফিরিয়ে দিবে, তারপর উকীল তাকে বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ক্রয়-উকীল যদি ক্রয়কৃত বস্তুতে কবজার আগেই কোন দোষ দেখতে পায় এবং সে বিক্রেতাকে দায়মুক্ত করে দেয় তবে তা জায়েয হবে। এ অবস্থায় আদেশদাতার উপর এর দায় বর্তাবে। আর যদি কবজার পরে দেখতে পায় তবে দায়-দায়িত্ব আদেশদাতার উপর বর্তাবে না, উকীলের উপরই বর্তাবে (খুলাসা)। উকীলের নিকট হতে খরিদকৃত বস্তুতে কোন আয়েব পাওয়া গেলে তা উকীলের কাছেই ফেরত দেওয়া হবে। যদিও মুআকিলের নিকট মূল্য পৌছে গিয়ে থাকে (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)। ক্রয়-উকীল যদি ঐ গোলামকেই ক্রয় করে যার জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে, তারপর তাকে কবজা করার আগেই সে যদি তাতে কোন আয়েব দেখতে পায় তবে তাকে নেওয়া না নেওয়ার ব্যাপারে উকীলকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। চাই আয়েবের পরিমাণ কম হোক বা বেশী হোক। যদি সে তাকে ফেরত দিয়ে দেয় তবে তা ফেরত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে উকীল যদি আয়েবের উপর রাযী থাকে এবং আয়েবের পরিমাণও কম হয় তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয় মুআকিলের উপর কার্যকরী হবে। পক্ষান্তরে আয়েবের পরিমাণ বেশী হলে সূক্ষ্ম কiyাসের দৃষ্টিতে এই আকদের দায়-দায়িত্ব উকীলের উপর বর্তাবে। কিন্তু যদি আদেশদাতা মুআকিল ব্যক্তি যদি রাযী হয়ে যায় তবে ক্রয়-বিক্রয় তার উপর কার্যকরী হবে (আস-সুগরা)। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে দোষযুক্ত বিক্রয় দ্রব্যের বাজার মূল্য যদি তার ক্রয় মূল্যের সমান হয় এবং এ আয়েবের ব্যাপারে উকীল যদি রাযী থাকে তাহলে এ মাল আদেশদাতা মুআকিলের দায়িত্বে বর্তাবে। যিয়াদাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি উকীল আয়েবের ব্যাপারে রাযী হয়ে যায় এবং এ বিষয়টি যদি কবজার আগে হয় তবে এ মাল আদেশদাতা ব্যক্তির যিম্মায় বর্তাবে। আর যদি কবজার পরে রাযী হয় তবে এ মাল উকীলের যিম্মায় বর্তাবে। মুআকিলের যিম্মায় বর্তাবে না। এক্ষেত্রে দোষ কম হওয়া বা বেশী হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করা হয় নি। মূলতঃ মুনতাকা গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে এটিই সহীহ অভিমত। চাই তা কবজার আগে হোক বা পরে হোক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আয়েব প্রত্যক্ষ করার সময় আদেশদাতা ব্যক্তি যদি উকীলকে বলে, আমি এই আয়েবের সাথে উক্ত মাল ক্রয় করতে রাযী নই, তারপর ক্রেতা (উকীল) এর উপর রাযী হয়ে গেলে আদেশদাতা ব্যক্তি আদিষ্ট ব্যক্তির উপর এর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারবে (আস-সুগরা)।

১০. মাসআলা : মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি কাউকে নিজের গোলাম বিক্রি করে দেওয়ার জন্য উকীল নিয়োগ করল। তারপর উকীল এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করল যে, এই গোলামের পলায়নের অভ্যাস আছে। কিন্তু একথা জানা নেই যে, উকীলের এই স্বীকারোক্তি তার উকীল হওয়ার পূর্বকার না পরবর্তী সময়ের। তারপর উকীল ঐ গোলাম কারো কাছে বিক্রি করল। এরপর তারা নিজ নিজ বস্তু কবজাও করে নিল। তারপর ক্রেতা উকীলের এই বক্তব্য সম্পর্কে অবগত হল তাহলে ক্রেতা এই গোলামকে উকীলের কাছে ফেরত দিতে পারবে।

কিন্তু উকীল তাকে মুআকিলের নিকট ফেরত দিতে পারবে না। যদি ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের আগে উকীলের পক্ষ হতে এই স্বীকারোক্তি শুনে যে, এই গোলাম পলায়নে অভ্যস্ত তারপরও সে তাকে ক্রয় করে তাহলে ক্রেতা তাকে উকীলের কাছে ফেরত দিতে পারবে না (মুহীত)। উকীলের নিকট হতে ক্রয় করা গোলামের মাঝে যদি দোষ পাওয়া যায় তাহলে ক্রেতা উকীলের নিকট থেকে মূল্য উসূল করে নিবে। যদি ক্রেতা তার কাছে মূল্য পরিশোধ করে থাকে। আর যদি সে মুআকিলকে মূল্য পরিশোধ করে থাকে তবে মুআকিলের নিকট থেকে তা উসূল করে নিবে (ওয়াজীয : আল-কুরদূরী)।

১১. মাসআলা : কোন ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করতঃ তা অন্যের নিকট বিক্রি করল। তারপর দ্বিতীয় ক্রেতা তার মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পেল এবং গোলামটিকে প্রথম ক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিল। এহেন অবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতা যদি কবজার আগে আদালতের ফায়সালা সাপেক্ষে কিংবা বিক্রেতার সম্মতির ভিত্তিতে তাকে ফেরত দিয়ে থাকে তবে প্রথম ক্রেতা তার বিক্রেতার নিকট এই গোলামকে ফেরত দিতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় ক্রেতা গোলামকে কবজা করে নেয়, তারপর তাকে প্রথম ক্রেতার নিকট ফেরত দেয় তাহলে ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়াটি দেখতে হবে। যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আদালতের ফায়সালা সাপেক্ষে হয় অথবা ক্রেতার কসম অস্বীকার করার কারণে হয় কিংবা আয়েবের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হয় তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতার নিকট এই গোলামকে ফিরিয়ে দিতে পারবে। তবে শর্ত এই যে, প্রথম বিক্রেতার নিকট দোষের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হতে হবে। ইকরার বা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা দেওয়ার মর্ম হল, প্রথম ক্রেতা স্বীকারোক্তির বিষয়টি অস্বীকার করার পর সেটিকে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা। যদি দ্বিতীয় ক্রেতা গোলামকে প্রথম ক্রেতার নিকট তার সম্মতি সাপেক্ষে ফেরত প্রদান করে তবে প্রথম ক্রেতা এ গোলামকে তার বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না। বিশুদ্ধ মতানুসারে যে আয়েব সময়ের মধ্যে পয়দা হতে পারে যেমন রোগ ব্যাধি এবং যে আয়েব স্বল্প সময়ের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে না যেমন হাতের মধ্যে অতিরিক্ত আঙ্গুল থাকা ইত্যাদি সবই সমান (কাফী)।

১২. মাসআলা : মুনতাকা গ্রহণে আছে যে, এক ব্যক্তি কারো কাছ থেকে একটি বাড়ি খরিদ করে তা আবার তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট বায়য়ে সলমের ভিত্তিতে প্রদান করল। তারপর বাড়িটি কবজা হওয়ার আগেই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এরপর ক্রেতা ঐ বাড়িতে কোন আয়েব দেখতে পেল তাহলে সে ঐ বাড়িটি বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে। আর যদি তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই বাইয়ে সলমকে নাকচ করে দেয় তবে এ ক্ষেত্রেও ক্রেতা বিক্রেতার নিকট বাড়িটি ফিরিয়ে দিতে পারবে। উক্ত মাসআলা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর অভিমত অনুসারে প্রযোজ্য হবে। কেননা তার মতে কবজার আগে জমি বিক্রি করা জায়েয নয় (যখীরা)।

১৩. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দিরহাম মূল্যে একটি গোলাম খরিদ করে তাকে কবজা করে নিল। তারপর একশ' দীনার মূল্যে সে তাকে অন্য কারো নিকট বিক্রি করে দিল এবং তারা নিজ নিজ বস্ত্র কবজাও করে

নিল। তারপর দ্বিতীয় বিক্রেতার সাথে দ্বিতীয় ক্রেতার সাক্ষাতের পর সে তাকে আরো পঞ্চাশ দীনার মূল্য বাড়িয়ে দিল। মূল্য এভাবে বর্ধিত করা সহীহ আছে। এবং ক্রেতাও তার প্রতিশ্রুত মূল্য নগদ দিয়ে দিল। তারপর ঐ দ্বিতীয় ক্রেতা গোলামের মধ্যে কোন আয়েব পেয়ে বিচারকের ফায়সালা অনুসারে তাকে তার বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিলে সে তার নিকট থেকে আসল এবং অতিরিক্ত মূল্য সবই নিয়ে নিবে। এহেন অবস্থায় প্রথম ক্রেতাও তাকে তার বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে (মুহীত)। উপরোক্ত অবস্থায় যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে মিলে আবার নতুনভাবে প্রথম মূল্য অপেক্ষা কম বা বেশী মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করে, তারপর আয়েবের কারণে দ্বিতীয় ক্রেতা একে দ্বিতীয় বিক্রেতার নিকট ফেরত দেয় তাহলে উক্ত আয়েবের কারণে দ্বিতীয় বিক্রেতা একে প্রথম বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না। চাই এ জাতীয় আয়েব পয়দা হওয়ার সম্ভাবনা থাকুক বা না থাকুক (খুলাসা)। উপরোক্ত অবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতা যদি মূল্যের মধ্যে এমন কিছু সামান বাড়িয়ে দেয় যা সুনির্দিষ্ট, তারপর গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পেয়ে আদালতের ফায়সালা সাপেক্ষে তাকে প্রথম ক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেয় তাহলে প্রথম ক্রেতা তাকে প্রথম বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে। দ্বিতীয় ক্রেতা গোলামের মধ্যে কোন আয়েব পায়নি, কিন্তু দ্বিতীয় বিক্রেতা ঐ সামান কবজা করার আগেই তা ধ্বংস হয়ে গেছে, এহেন অবস্থায় সামানের মূল্য যদি পঞ্চাশ দীনার হয় তাহলে গোলামের এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে আকুদ বাতিল হয়ে যাবে এবং ঐ এক-তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় বিক্রেতার মালিকানায় চলে আসবে। এরপর দ্বিতীয় ক্রেতা যদি উক্ত গোলামের মধ্যে কোন আয়েব দেখতে পায় এবং বিচারকের নির্দেশে গোলামের বাকী দুই-তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দেয় তাহলে ঐ আয়েবের কারণে দ্বিতীয় বিক্রেতা গোলামকে প্রথম বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে। সামান নষ্ট হয় নি, এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি এক-তৃতীয়াংশ গোলামের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়কে ইকাল বা বাতিল করে দেয়, এরপর সে বাকী গোলামের মধ্যে আয়েব দেখতে পায় তাহলে ক্রেতা উক্ত গোলামকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না (মুহীত)।

১৪. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন গোলাম খরিদ করতঃ তাকে কবজা করে অপর কোন ব্যক্তির নিকট তাকে বিক্রি করে দিল। এদিকে দ্বিতীয় ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টিকে অস্বীকার করে বসল এবং সে এ ব্যাপারে কসমও করল। তখন প্রথম ক্রেতা সিদ্ধান্ত করল যে, সে বিবাদে লিপ্ত হবে না। বরং গোলামকে নিজের কাছেই রেখে দিবে। তারপর সে যদি গোলামের মধ্যে এমন কোন আয়েবের সন্ধান পায় যা প্রথম বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় তার মধ্যে ছিল তাহলে সে এ গোলামকে তার বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি শপথ করে অস্বীকার করে এবং প্রথম ক্রেতা এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প করে যে, সে বিবাদে লিপ্ত হবে না, কিন্তু সে দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট থেকে কোনরূপ শপথ গ্রহণ না করে, এমতাবস্থায় সে যদি গোলামের মাঝে বিক্রেতার কাছে থাকাকালীন কোন দোষ দেখতে পায়, তাহলে সে তার বিক্রেতার নিকট ঐ গোলামকে ফেরত দিতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ক্রেতা যখনই জানতে ও বুঝতে পারবে যে, সে ক্রয়-বিক্রয়ের দাবীতে সত্যবাদী, তাহলে নৈতিকতার দৃষ্টিতে এ মাল ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে তার আর কোন সুযোগ থাকবে না। কিন্তু সে যদি এ মর্মে সংকল্প করে নেয় যে, আমি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে পারলেও দ্বিতীয়

ক্রেতার সাথে বিবাদে লিপ্ত হবনা তাহলে নৈতিকতার দৃষ্টিতে সে এ গোলামকে ফিরিয়ে দিতে পারবে (যখীরা)। যদি ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার কথা দ্বিতীয় ক্রেতা মেনে নেয় এবং এরপর বলে যে, এটি বাইয়ে তালজিয়া' (تَلْجِيَة) ছিল বা এ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে খিয়ারে শর্ত ছিল বা খিয়ারে রূয়ত ছিল বা এটি বাইয়ে ফাসিদ ছিল, বর্তমানে তা ভেঙ্গে গেছে তাহলে প্রথম ক্রেতা গোলামকে আয়েবের কারণে স্বীয় বিক্রেতার নিকট ফিরিয়ে দিতে পারবে। যদি ক্রয়-বিক্রয়ের স্বীকারোক্তির পর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যদি একথা মেনে নেয় যে, এই বিক্রয়ের সাথে খিয়ারে শর্ত যুক্ত ছিল, পরে সাহেবে খিয়ার (যার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হয়েছিল) ঐ খিয়ারকে ভেঙ্গে দিয়েছে, তাহলে এ অবস্থায় প্রথম ক্রেতা গোলামকে নিজ বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে পারবে না। যদি তারা উভয়ে বিচারকের নিকট ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তারপর আবার তারা তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে তাহলে বিচারক তাদের অস্বীকৃতির বিষয়টিকে ফসখ (ক্রয়-বিক্রয় ভেঙ্গে দেওয়া) বলে গণ্য করেন। সুতরাং এ অবস্থায় যদি দ্বিতীয় ক্রেতা গোলামকে নিজের কাছে রেখে দিতে বা আবাদ করে দিতে চায় তাহলে তা সহীহ হবে না। এমনিভাবে আয়েবের কারণে দ্বিতীয় বিক্রেতা একে প্রথম বিক্রেতার নিকট ফেরতও দিতে পারবে না (মুহীত : আস-সারখসী)।

১৫. মাসআলা : খরিদা গোলাম কবজা করার পর তার মাঝে দোষ পেয়ে তাকে ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করল। তখন বিক্রেতা এ মর্মে সাক্ষী পেশ করল যে, ক্রেতা একথা স্বীকার করেছে যে, সে এই গোলামকে সে অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিয়েছে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা গোলামকে আর ফেরত দিতে পারবে না। চাই অমুক ব্যক্তি উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি এরূপ সাক্ষ্য পেশ করে যে, ক্রেতা এই গোলামকে এই ব্যক্তির নিকট বিক্রি করেছে, অথচ সেই ব্যক্তিও ঐ মজলিসে উপস্থিত আছে এবং তারা (ক্রেতা এবং অমুক ব্যক্তি) উভয়ে এই ক্রয়-বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করছে, তাহলে প্রথম ক্রেতা গোলামকে ফেরত দিতে পারবে না (যখীরা)। ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি একটি গোলাম পসন্দ করে তার দাম বার দীনার বলল। কিন্তু বিক্রেতা তাতে রাযী হল না। তারপর বিক্রেতা তাকে বলল, তোমার জন্য একে আমি হিবা করে দিলাম। এ কথার পর ক্রেতা তাকে কবজা করে নিল এবং বিক্রেতাকে সে বার দীনার হিবা করে দিল। আর বিক্রেতাও তা হস্তগত করে নিল। তারপর হিবাগ্রাপ্ত ব্যক্তি গোলামের মাঝে কোন দোষ পেল। এক্ষেত্রে সে তাকে বিক্রেতা অর্থাৎ হিবাকারীর নিকট ফেরত দিতে পারবে না (কিনুয়া)।

১. এটি এমন আকদ যা বিশেষ প্রয়োজনে মানুষ করে, কিন্তু পরে আবার ঐ মাল তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। هو العقد الذي يباشره انسان عن ضرورة ويصير كالمرفوع اليه صورته ان يقول الرصل لغيره ابيع. دارى منك بكزا فى الظاهر ولا يكون بيعا فى الحقيقة ويشهد على ذلك وهو نوع من اليزل

নবম পরিচ্ছেদ : যে সব বিষয়ে বেচাকেনা জায়েয এবং যা জায়েয নয়।

[এতে দশটি অনুচ্ছেদ আছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ : دين (অনির্দিষ্ট বস্তু)-এর বদলে ثمن (মূলদ্রব্য তথা স্বর্ণ-রৌপ্য এবং দিরহাম দিনার, বেচাকেনা করা এবং উভয় বিনিময় দ্রব্য হস্তগত করায় আগে মজলিসের চুক্তি বাতিল হওয়া প্রসঙ্গ।

১. মাসআলা : দায়ন-এর বদলে দায়ন বিক্রি জায়েয হবে-যদি উভয় বদল (পণ্য ও মূল্য) বাস্তবিকভাবে বা আইনত কবজা করার পর ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হয় অথবা তারা বিচ্ছিন্ন হয় এক বদল বাস্তবিকভাবে এবং অপরটি আইনত কবজা করার পর। এরূপ বিক্রি জায়েয, তাতে সে চুক্তি সারফ (মূল্য দ্রব্যের বিনিময়) জাতীয় হোক বা অন্য কিছু হোক।

উভয় বদল বাস্তবিক অর্থে কবজা করার পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাখ্যা এই যে, একজন অপরজন হতে দশ দিরহামের বদলে একটি দীনার কিনল এবং এভাবে সেটা সারফ জাতীয় লেনদেন হল, কিন্তু দিরহাম ও দীনার তখন তাদের কাছে ছিল না, তারপর তারা মজলিসেই তা পরিশোধ করল এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাদের সে বেচাকেনা বৈধ।

এমনিভাবে যদি দিরহামের বদলে পয়সা বা খাদ্যবস্তু ক্রয় করে যা কিনা সারফ জাতীয় বেচাকেনা নয়, আর উভয় বদলের কোনটাই তাদের কাছে উপস্থিত না থাকে, তারপর তারা মজলিসের ভেতরই তা পরিশোধ করে এবং তারপর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে সে বেচাকেনাও জায়েয।

আর উভয় বদল আইনত (حكما) কবজা হওয়ার পর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তির দশ দিরহাম পাওনা আছে আবার সেই ব্যক্তি তার কাছে এক দীনার পাবে। এই দুই ব্যক্তির প্রত্যেকে অপরজনের কাছে যা পাবে তার বিনিময়ে নিজের কাছে অপরের পাওনাটা ক্রয় করল এবং এভাবে সেটা 'সারফ' জাতীয় বেচাকেনা হল-

অথবা তাদের বেচাকেনা 'সারফ' জাতীয় নয়, যেমন একজন অপরজনের কাছে পয়সা বা খাদ্যদ্রব্য পাবে এবং তার কাছে অপর ব্যক্তির পাওনা আছে দিরহাম, এ অবস্থায় তাদের প্রত্যেকে অপরজনের কাছে যা পাবে তার বদলে নিজের কাছে অপরের পাওনাটা ক্রয় করল, এই উভয় অবস্থায় বেচাকেনার পর তারা যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে সে বেচাকেনা বৈধ হবে।

আর অপর এক বদল বাস্তবিক অর্থে এবং অপর বদল আইনত কবজা করার পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে দশ দিরহাম পাবে। যার কাছে

পাওনা, সে এক দীনারের বিনিময়ে পাওনাদারের কাছ থেকে সেই দশ দিরহাম ক্রয় করল এবং সে দীনার নগদ পরিশোধ করল, তারপর উভয়ে মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাদের সে বেচাকেনা জায়েয।

এমনিভাবে কারও যদি অপর কারও কাছে গম পাওনা থাকে এবং দেনাদার ব্যক্তি দিরহামের বিনিময়ে পাওনাদারের কাছ থেকে সেই গম ক্রয় করে নেয় এবং মজলিসেই তা পরিশোধ করে, তবে সে বেচাকেনাও জায়েয।

সুলহুল-ফাতওয়া (আল ফাতওয়া গ্রন্থের 'সুলহ' অধ্যায়?) গ্রন্থে গম সংক্রান্ত মাসআলাটি উল্লেখ করত বলা হয়েছে যে, এ বেচাকেনা জায়েয নয়, যদিও মজলিসে দিরহাম পরিশোধ করে।

কিন্তু ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, 'সুলহুল ফাতওয়া' গ্রন্থে যা বলা হয়েছে, তা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন গমটা 'সালাম' জাতীয় বেচাকেনার হয়। পক্ষান্তরে যদি করজের গম হয় বা অন্য কোন বিক্রির দাম হয়, তাহলে উপরিউক্ত বেচাকেনা জায়েয হবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : উভয় বদল (পণ্য ও মূল্য)-এর কোন একটা বাস্তবত বা আইনত কবজা করার পর যদি তারা মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং অপরটি কবজা না হয়, তবে তার হকুম নিম্নরূপ-

বাস্তবিকভাবে কোন একটা বদল কবজা করার পর বিচ্ছিন্ন হলে 'সারফ'-এর ক্ষেত্রে বিক্রি বৈধ হবে না, অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈধ হবে। এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

এক ব্যক্তি দশ দিরহামের বদলে একটি দীনার ক্রয় করল এবং এভাবে সেটা 'সারফ' জাতীয় চুক্তি হল, তারপর দীনার কবজা করল, কিন্তু দিরহাম সমর্পণ করল না, অথবা দিরহাম সমর্পণ করল কিন্তু দীনার কবজা করল না, আর এ অবস্থায় তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সুতরাং এ বেচাকেনা বাতিল হয়ে যাবে।

যদি দিরহামের বিনিময়ে পয়সা বা খাদ্যদ্রব্য কেনে, যা কিনা 'সারফ' জাতীয় চুক্তি নয়, তারপর বাস্তবত কোনও একটা বদল কবজা করার পর তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে সে বেচাকেনা জায়েয। পক্ষান্তরে কোনও একটা বদল যদি কেবল আইনত কবজা হয়, বাস্তবত কবজা না হয় এবং তারপর তারা বিচ্ছিন্ন হয় তবে সে বেচাকেনা বৈধ হবে না, তা 'সারফ' জাতীয় চুক্তি হোক কিংবা অন্য কিছু হোক। এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তির এক দীনার পাওনা আছে। সেই ব্যক্তি পাওনাদারের কাছ থেকে দশ দিরহামের বদলে দীনারটি ক্রয় করল এবং এভাবে এটা 'সারফ'-এর বেচাকেনা হল, তারপর দশ দিরহাম পরিশোধ হওয়ার আগেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাদের এ বেচাকেনা বাতিল হয়ে যাবে।

তদ্রূপ পাওনা যদি পয়সা বা খাদ্যবস্তু হয় এবং সে পাওনাদারের কাছ থেকে দিরহামের বদলে সেই পয়সা বা খাদ্যবস্তু ক্রয় করে আর দিরহাম পরিশোধের আগেই তারা মজলিস থেকে পৃথক হয়ে যায়, তবে সে বেচাকেনা বাতিল হয়ে যাবে। এসব মাসআলা ভাল করে মনে রাখা চাই। মানুষ এ ব্যাপারে খুবই অসচেতন (আয-যাখীরা)।

৩. মাসআলা : কেউ যদি কারও কাছ থেকে একশ' দীনার দ্বারা এক হাজার দিরহাম খরিদ করে এবং সে তার একশ' দীনার পরিশোধ করে দেয়, কিন্তু দিরহামের বিক্রেতা তার দিরহামগুলো পরিশোধ না করে, অন্যদিকে এই বেচাকেনার আগে দিরহামের ক্রেতার কাছে তার এক হাজার দিরহাম পাওনা থাকে আর এখন দিরহামের বিক্রেতা তাকে বলে দেয় যে, আমার পাওনা এক হাজার দিরহাম এই দীনারের মূল্যরূপে ধরে নাও, তো দিরহামের ক্রেতা যদি রাযী হয়ে যায় তবে তা জায়েয হবে। এটা ইসতিহসান বা (সুন্ম কিয়াস) সম্মত।

'সারফ'-এর চুক্তির পর অন্য চুক্তির পাওনা দ্বারা সারফের বদলকে কাটাকাটি করা যাবে কিনা এ সম্পর্কে মতভেদ আছে, যেমন কেউ কারও কাছ থেকে এক দীনার দিয়ে দিরহাম ক্রয় করল এবং দীনার নগদ পরিশোধ করল, কিন্তু দিরহাম কবজা করল না, ইত্যবসরে দিরহামের ক্রেতা সেই দিরহাম দ্বারা তার বিক্রেতার কাছ থেকে একটা কাপড় কিনল। তারপর কাপড়ের বিক্রেতা বলল, সারফ-এর কারণে আমার কাছে তোমার যে দিরহাম পাওনা হয়েছিল, তার বদল হিসেবে এই দিরহামগুলোই ধরে নাও, যা কাপড়ের মূল্যরূপে আমার প্রাপ্য উভয়ে এতে সম্মত হলে, আবু সুলায়মান (র)-এর বর্ণনা মতে এ কাটাকাটি জায়েয হবে। আয-যিয়াদাত-গ্রন্থেও এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু আবু হাফস (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী এটা জায়েয নয়। আর সেটাই সহীহ (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : যদি দুজনে সুনির্দিষ্ট এক পয়সার বদলে সুনির্দিষ্ট দুটি পয়সা বিনিময় করে, তবে সে বেচাকেনা জায়েয হবে এবং এতে উভয় দিকের পয়সা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই কবজার আগে যদি এক দিকের পয়সা হৃতহস্ত হয়ে যায় তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। তাদের কোন একজন নির্দিষ্ট পয়সার বদলে যদি অন্য একটা দিতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না (শারহুত-তাহাবী)।

৫. মাসআলা : অনির্দিষ্ট একটা পয়সাকে যদি অনির্দিষ্ট দুই পয়সার বদলে বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে না, এমনকি মজলিসের ভেতর উভয়ে কবজা করলেও নয়।

যদি নির্দিষ্ট এক পয়সাকে অনির্দিষ্ট দুই পয়সার বদলে বা অনির্দিষ্ট এক পয়সার বদলে নির্দিষ্ট দুই পয়সার বেচাকেনা করে, তবে অনির্দিষ্ট পয়সাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মজলিসে কবজা না করবে, সে বেচাকেনা জায়েয হবে না (মুহীত : আস-সারাক্ষী)।

৬. মাসআলা : ইমাম শামসুল আইম্মা : আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, ফুলুস (পয়সা) সম্পর্কিত সমস্ত মাসআলা বুখারার দিরহাম 'আল-গাতারিফ'-এর জন্যও প্রযোজ্য। রাসাস' ও সাততুক'-এর ক্ষেত্রেও একই মাসআলা। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, আদালী'-এর ক্ষেত্রেও একই হকুম প্রযোজ্য হওয়া উচিত (আয-যাখীরা)।

৭. মাসআলা : সুতরাং উপরিউক্ত মুদ্রার একটিকে দুটির বিনিময়ে বিক্রি করলে তা জায়েয হবে- যদি উভয়টা নগদ হয় (আল-গিয়াছিয়া)।

১. রাসাস এমন রৌপ্যমুদ্রা, যার মাঝখানে সীসা ও দু'পাশে রূপা থাকে।

২. সাততুক এমন রৌপ্যমুদ্রা, যার মাঝখানে লোহা ও দু'পাশে রূপা থাকে।

৩. আদালী তাশখন্দ, মা-ওয়ারাউন-নাহর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত মুদ্রা।

৮. মাসআলা : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে এই শর্তে যদি এ দিরহামের বিনিময়ে ফুলুস (পয়সা) বেচাকেনা করে এবং উভয়ে তা কবজা করার পর পৃথক হয়, তবু সে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। ইখতিয়ার যদি তাদের যে কোন একজনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে বিক্রিও বাতিল, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা বৈধ (আল-বাদায়ে)।

৯. মাসআলা : কুদুরী (র) তার ভাষ্য গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে এই শর্তে যদি পয়সার বদলে পয়সা বেচাকেনা করে এবং উভয়ে নিজ নিজ পণ্য কবজা করার পর পৃথক হয়, তবে সে বেচাকেনাও ফাসিদ। যদি ইখতিয়ার তাদের জন্য ধার্য করা হয়, তবে বিক্রি বৈধ। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতেও এরূপই হওয়ার কথা। এর দ্বারা সেই অবস্থার কথা বুঝানো উদ্দেশ্য, যখন ইখতিয়ার একজনের জন্য সাব্যস্ত করা (আয-যাখীরা)।

১০. মাসআলা : ইখতিয়ারের শর্তে যদি সুনির্দিষ্ট এক পয়সা সুনির্দিষ্ট দুই পয়সার বদলে বিক্রি করে, তবে সে বিক্রি বৈধ হবে (মুহীতঃ আস-সারাখসী,)।

১১. মাসআলা : কোনও পয়সা যে স্থানে অচল হয়ে গেছে, সেখানে যদি সেই অচল পয়সা দ্বারা কোন দ্রব্য খরিদ করে, তবে পয়সা সুনির্দিষ্ট হলে বৈধ হবে আর সুনির্দিষ্ট না হলে বৈধ হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-জামিউস-সাগীর' গ্রন্থে বলেন, কেউ যদি কারও কাছে থেকে এক কুরুর (পরিমাপ বিশেষ) খাদ্যদ্রব্য ধার করে এবং তা বুঝে নেয়, তারপর ধার গ্রহীতা একশ' দিরহাম দ্বারা সেই একশ' 'কুরুর' খাদ্যদ্রব্য ধারদাতার কাছ থেকে ক্রয় করে তবে তা জায়েয হবে। এ অবস্থায় ধারদাতার কাছে ধার গ্রহীতার অনুরূপ এক 'কুরুর' খাদ্যদ্রব্য পাওনা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তার ক্রয় করা সহীহ হবে। পক্ষান্তরে সেই এক 'কুরুর' যার কাছে পাওনা সে ছাড়া অন্য কেউ যদি তা কেনে তবে জায়েয হবে না। উপরের অবস্থায় যখন ক্রয় জায়েয সাব্যস্ত হল, তখন মজলিসে যদি একশ' দিরহাম পরিশোধ করে দেয় তবে ঐ ক্রয় সহীহ হিসেবে কার্যকর হবে। আর যদি কবজা ছাড়াই তারা পৃথক হয়ে যায় তবে সে ক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে ধারদাতার কাছে যদি ধার গ্রহীতার এক কুরুর গম পাওনা সাব্যস্ত হয় এবং তারপর তাদের প্রত্যেকে অপরজনের কাছে যা পাবে তার বিনিময়ে নিজের কাছে অপরের পাওনাটা কিনে নেয়, তারপর তারা পৃথক হয়ে যায় তবে তা জায়েয।

ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, 'আল-জামিউস-সাগীরে' যে মাসআলা বর্ণিত হয়েছে, তা ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ধারগ্রহীতা ততক্ষণ পর্যন্ত ধারের বস্তুর মালিক হয় না যতক্ষণ সে তা কবজা করার পর নিঃশেষ করে ফেলে। কাজেই সেটি বহাল থাকা অবস্থায় ধারগ্রহীতার দায়িত্বে কিছুই ওয়াজিব হয় না। সুতরাং ক্রয়ও সহীহ হবে না। হাঁ, সে যখন ধারের বস্তুটি নিঃশেষ করে ফেলবে এবং তারপর ক্রয় করবে, তখন তা অবশ্যই সহীহ হবে। এতে কোন মতভেদ নেই। তারপর ক্রেতা অর্থাৎ

ধারগ্রহীতা মজলিসেই যদি একশ' দিরহাম পরিশোধ করে, তারপর ধারের সে খাদ্যে কোন দোষ দেখতে পায়, তবে সে তা ফেরত দিতে পারবে না, হাঁ মূল্য হতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারবে। ধারের খাদ্যটা কবজ করার পর যদি ধ্বংস করে থাকে, তখনও সে হুকুম প্রযোজ্য, তবে হাঁ প্রথম অবস্থায় বিষয়টা মতভেদপূর্ণ এবং দ্বিতীয় অবস্থায় সকলেই একমত।

দিরহাম, দীনার ও ফুলুস ছাড়া যে কোন ওজনী দ্রব্য বা কৌটা দ্বারা পরিমাপ বস্তু যদি ধার করা হয়ে থাকে তবে সে সব ক্ষেত্রেই একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

ধারগ্রহীতার কাছে ধারদাতা যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য পাবে, যদি ধারগ্রহীতা সমপরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে তা ক্রয় করে, তবে তা সুনির্দিষ্ট হলে জায়েয হবে, সুনির্দিষ্ট না হলে মজলিসের ভেতরই কবজা করার শর্তে জায়েয হবে। তারপর ধারগ্রহীতা ধারের বস্তুর কোন দোষ দেখতে পেলে সে তা ফেরতও দিতে পারবে না এবং ক্ষতিপূরণও গ্রহণ করতে পারবে না, কিন্তু উপরের অবস্থায় ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারত।

এক কুরুর পরিমাণ খাদ্যবস্তু ধার করার পর যদি সেটাই ক্রয় করে এবং তা ধারগ্রহীতার কবজায় থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ক্রয় সহীহ হবে না, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে সহীহ হবে।

ধারদাতা যদি ধারগ্রহীতার কাছ থেকে ধারের বস্তুটিই ক্রয় করে তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা সহীহ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে সহীহ নয় (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে এক হাজার দিরহাম এই কথার উপর ঋণ দিল যে, সে দিরহাম নিখাদ। ঋণগ্রহীতা তা কবজাও করল। তারপর সে দশ দীনারের বিনিময়ে তা ঋণদাতার কাছ থেকে ক্রয় করল। তার সে ক্রয় বৈধ। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। এ ক্রয় তো বৈধ সাব্যস্ত হল, কিন্তু চুক্তির মজলিসে যদি দীনার পরিশোধ না করে এবং সে অবস্থায় তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যদি মজলিসের ভেতর দীনার কবজা করা হয় তবে সে চুক্তি বৈধরূপেই কার্যকর হবে। ঋণ নেওয়া সে দিরহামগুলো যদি ঋণযুক্ত প্রমাণিত হয় বা নিকৃষ্টমানের রূপা দ্বারা তৈরি হয়, তবে ঋণগ্রহীতা (ক্রেতা) তা ফেরত দিতে পারবে না এবং ক্ষতিপূরণও গ্রহণ করতে পারবে না (আত-তাতার খানিয়া)।

১৩. মাসআলা : এক ব্যক্তির কাছে নিখুঁত দশ দিরহাম আছে, সে যদি কারও কাছে তা বারটি ভাগ দিরহামের বদলে বিক্রি করতে চায় তবে তা জায়েয হবে না। তবে বৈধতার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে যে, সে তার কাছ থেকে ভাগা বার দিরহাম ঋণ হিসেবে আনবে। তারপর সে তা থেকে দশ দিরহাম কবজা করবে এবং দুই দিরহাম ছেড়ে দিবে (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)।

১৪. মাসআলা : কেউ কারও কাছে পাত্র নির্ভর বস্তু বা ওজন নির্ভর কিংবা গণনা নির্ভর বস্তু পাবে বলে দাবী করল, তারপর বিবাদী তার কাছ থেকে তা একশ' দীনারের বদলে ক্রয় করল,

তারপর দুজনেই স্বীকার করল যে, বাদী আসলে বিবাদীর কাছে কিছুই পেত না, এ অবস্থায় উল্লিখিত বেচাকেনা বাতিল হয়ে যাবে, তাতে তারা পরস্পর পৃথক হোক বা নাই হোক।

যদি দিরহাম, দীনার বা ফুসূল দাবী করে, তারপর বিবাদী দিরহামের বদলে তা ক্রয় করে এবং সে দিরহাম পরিশোধ করে ফেলে, তারপর তারা উভয়ে স্বীকার করে যে, আসলে তার কাছে কিছুই পাওনা ছিল না, তো এই দিরহাম ও দীনারের ক্ষেত্রে মাসআলা এই যে, তারা যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয় এবং মজলিসের ভেতরই খরিদকৃত দ্রব্যের অনুরূপ বস্তু ফেরত গ্রহণ করে তবে বেচাকেনা সহীহ হবে। আর যদি মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর ফুলসের ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত বস্তু কবজা করার আগে মজলিস ত্যাগ করলেও চুক্তি বাতিল হবে না (আয-যাখীরা)।

১৫. মাসআলা : একটি ছোট দিরহামের বদলে একটি বড় দিরহাম বা একটি মন্দ দিরহামের বদলে একটি ভাল দিরহাম বিক্রি করা জায়েয হবে। কেননা এর ভেতর তাদের সদুদ্দেশ্য নিহিত আছে। যদি গুণে ও পরিমাণে উভয়টি সমান হয় তবে কারও কারও মতে তার একটির বদলে অন্যটি বিক্রি জায়েয নয়। আল-জামিউস-সাগীর গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) যা বলেছেন, তা দ্বারাও এরই প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাকিম ইমাম আবু আহমদ (র) এরূপই ফাতওয়া দিতেন (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা : মুদ্রিত দিরহাম তিন প্রকার : (ক) দিরহামের দুই-তৃতীয়াংশ তামা ও এক-তৃতীয়াংশ রূপা অথবা তিন-চতুর্থাংশ তামা ও এক-চতুর্থাংশ রূপা বা পাঁচ-ষষ্ঠাংশ তামা ও এক-ষষ্ঠাংশ রূপা (এক কথায় রূপা অপেক্ষা তামার পরিমাণটাই বেশী) (খ) দিরহামের দুই-তৃতীয়াংশ রূপা ও এক-তৃতীয়াংশ তামা বা তিন-চতুর্থাংশ রূপা ও এক-চতুর্থাংশ তামা (এক কথায় তামা অপেক্ষা রূপার ভাগটাই বেশী); (গ) রূপা ও তামা উভয়ই সমপরিমাণ।

প্রথম প্রকারের দিরহামকে তিন দুটি জিনিসরূপে গণ্য করা হবে রূপা ও তামা। তার কোনও একটি অন্যটির মধ্যে লীন হয়ে যাবে না; বরং প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য হবে।

এ জাতীয় দিরহাম দ্বারা নিখাদ রূপা কিনতে চাইলে কিংবা নিখাদ রূপা হিসেবে গণ্য এমন জিনিস কিনতে চাইলে তখন উভয় রূপার পরিমাণ লক্ষ্য করতে হবে। যদি দিরহামের রূপা অপেক্ষা নিখাদ রূপার পরিমাণ কম হয় বা দিরহামের রূপার ওজন নিখাদ রূপার সমপরিমাণ হয়, কিংবা জানা না থাকে যে, তার ওজন কতটুকু, তাহলে সে বেচাকেনা আমাদের ইমামগণের মতে জায়েয নয়।

যদি নিখাদ রূপার ওজন দিরহামের রূপার ওজন অপেক্ষা বেশী হয়, তবে সে বেচাকেনা জায়েয। তখন দিরহামের রূপা তার সমপরিমাণ নিখাদ রূপার বদলে হবে এবং নিখাদ রূপার অতিরিক্তটুকু হবে দিরহামের তামার বদলে। এক্ষেত্রে 'সারফ'-এর শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে। সুতরাং তার কোন একটি শর্ত লঙ্ঘন হলে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। সারফের (রূপার) অংশেও এবং তামার অংশেও।

এ জাতীয় দিরহাম দ্বারা যদি সোনা কেনে তবে তা যেভাবেই কিনুক জায়েয হয়ে যাবে। তবে সারফের কোন শর্ত লঙ্ঘন হলে সারফের অংশের সঙ্গে তামার অংশেও বিক্রি বাতিল অংশ হয়ে যাবে।

এ জাতীয় দিরহাম একটির বদলে আরেকটি বেচাকেনা করলে তা কমবেশী করে বা সমান সমান, সর্বপ্রকারেই জায়েয। তবে উভয় দল মজলিসে কবজা করা অবশ্যই শর্ত (শারহু-তাহাবী)।

১৭. মাসআলা : যে দিরহামের বেশী অংশ খাদ ও কম অংশ রূপ, তা যদি সমজাতীয় দিরহামের বদলে ক্রয় করে এবং তার একটা হয় বাকি, তবে তা জায়েয হবে না, যদিও সে দিরহাম বাজারে চালু থাকে। এমনভাবে যদি অন্য জাতীয় দিরহামের বদলে বেচাকেনা করে, তখনও একটি বাকি থাকলে জায়েয হবে না। পরিশোধকৃত দিরহাম যদি চালু এবং বাকি রাখা দিরহাম অচল হয় তখনও সে বেচাকেনা অবৈধ (আল-গিয়াছিয়া)।

১৮. মাসআলা : দ্বিতীয় প্রকারের দিরহাম, অর্থাৎ যার রূপার ভাগ খাদ অপেক্ষা বেশী, যেমন রূপা দুই-তৃতীয়াংশ এবং খাদ এক-তৃতীয়াংশ, এমন দিরহামকে নিখাদ রূপার বদলে বিক্রি করতে হলে উভয় দিক সমান সমান হতে হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না (আয-যাখীরা)।

১৯. মাসআলা : এ জাতীয় দিরহাম একটি অন্যটির বদলে বিক্রি করতে চাইলে পরিমাণ সমান হওয়া শর্ত, অন্যথায় জায়েয হবে না (আল-বাদায়ে)।

২০. মাসআলা : তৃতীয় প্রকার দিরহাম অর্থাৎ যার রূপা ও খাদ উভয়ই সমান এরূপ দিরহাম নিখাদ রূপার বদলে বিক্রি করলে সে ক্ষেত্রে প্রথম প্রকার দিরহামের নিয়ম প্রযোজ্য (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা : এরূপ দিরহাম দ্বারা বেচাকেনা করা বা এরূপ দিরহাম ঋণ দেওয়া কেবল তখনই জায়েয হবে, যখন এর লেনদেন ওজন করে করা হবে। তবে চুক্তিকালে যদি ইশারা করে দেখিয়ে দেয়, তখন সে ইশারাটা পরিমাণ ও গুণের ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হবে, যেমন নিখুঁত দিরহামের প্রতি ইঙ্গিত করলে তাকে ব্যাখ্যারূপে গণ্য করা হয়ে থাকে।

এরূপ দিরহাম সমর্পণ করার আগে হাতছাড়া হয়ে গেলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে না।

সারফের ক্ষেত্রে এরূপ দিরহামের ক্ষেত্রে সেই জাতীয় দিরহামের নিয়ম প্রযোজ্য, যাতে খাদের পরিমাণ বেশী। সুতরাং যদি সমজাতীয় দিরহামের বদলে বিক্রি করে তবে তা সেখানকার নিয়ম অনুসারে বৈধ হবে। যদি নিখাদ রূপার বদলে বিক্রি করে তবে নিখাদ রূপার পরিমাণ দিরহামের রূপা অপেক্ষা বেশী না হলে তা জায়েয হবে না (আল-নাহরুলফায়িক)।

২২. মাসআলা : 'আল-জামিউস-সাগীর' গ্রন্থে আছে, দিরহামের তিন ভাগের দুই ভাগ তামা ও এক ভাগ রূপা হলে তা দিয়ে যদি কোন পণ্য কেনে এবং দিরহাম ওজন করে দেয়

তবে তা সর্বাবস্থায় জায়েয। আর সে দিরহাম নির্দিষ্ট হয়ে যাবে না (যে সেটাই দিতে হবে)। এ জাতীয় বিশেষ সংখ্যক দিরহাম দ্বারা যদি পণ্য কেনে এবং ইশারা দ্বারা যদি তা নির্দিষ্ট করে না দেয় আর সে অঞ্চলে তার লেনদেন ওজনে হয়ে থাকে, তবে সে বেচাকেনা জায়েয নয়। তবে হাঁ, সংখ্যা নির্দিষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে যদি দিরহামগুলোও নির্দিষ্ট করে দেয়, তাহলে অসুবিধা নেই, যদিও তার লেনদেন ওজনেই প্রচলিত থাকে। তারপর যদি তদন্তে অন্য দিরহাম পরিশোধ করে তবে তা ইশারাকৃত দিরহামের ওজন পরিমাণ হতে হবে। আর যদি দিরহামই পরিশোধ করে তবে ওজন ছাড়াই জায়েয হবে, যেমন নিখাদ দিরহামের ক্ষেত্রে ওজনের দরকার হয় না।

যদি এ জাতীয় দিরহাম নির্দিষ্ট করে দেয় এবং তার সংখ্যাও উল্লেখ করে, যেমন বলল, আমি তোমার কাছ থেকে এই পণ্য এই দিরহাম দ্বারা কিনলাম এবং এখানে এত দিরহাম আছে আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওজনের পরিমাণ বুঝানো, আর সে দিরহাম তাদের অঞ্চলে ওজনেই প্রচলিত, তাহলে সে চুক্তি ওজন হিসেবেই সাব্যস্ত হবে। আর যদি গণনায় প্রচলিত থাকে, তবে দিরহাম নির্দিষ্ট না করে তার কেবল সংখ্যার উল্লেখ করলেও ক্রয় সহীহ হবে। যদিও তাতে ওজনের পার্থক্য থাকে (আয-যাখীরা)।

২৩. মাসআলা : দিরহামের দুই-তৃতীয়াংশ রূপা ও এক-তৃতীয়াংশ যদি তামা হয় তবে তা নিকৃষ্টমানের পর্যায়ভুক্ত হবে, যাকে পরিভাষায় 'যুযুফ' ও 'নাবাহরাজা' বলে। এর দ্বারা যদি কোন পণ্য কেনে এবং ইঙ্গিতে এ দিরহাম দেখিয়ে না দেয়, তবে ওজন হিসেবেই ক্রয় সাব্যস্ত হবে, অন্য কোনভাবে তা জায়েয হবে না, যেমন সবটাই নিকৃষ্টমানের রূপার তৈরি হলে এমনই হুকুম প্রযোজ্য হয়। আর যদি ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয় তবে বিনা ওজনেও তা দ্বারা ক্রয় সহীহ হবে। দিরহামের অর্ধেক রূপা ও অর্ধেক তামা হলে তখন সে দিরহাম ও দুই-তৃতীয়াংশ রূপা ও এক-তৃতীয়াংশ তামাযুক্ত দিরহামের মাসআলা একই রকম রাখা হবে (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা : যদি কেউ এরূপ দিরহাম দ্বারা কোন পণ্য কেনে, তারপর তা অটল হয়ে যায় এবং এর দ্বারা লেনদেন ছেড়ে দেয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং এ অবস্থায় বিক্রিত পণ্য অক্ষত থাকলে বিক্রেতা সেটি নিয়ে যাবে আর নষ্ট হয়ে গেলে ক্রেতাকে তার বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং কবজার দিনের বাজারমূল্য ধর্তব্য হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিক্রি বৈধ হয়েছে। তবে মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ক্রেতার কবজা করার দিনের বাজার মূল্যের কথা বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র) সেই দিরহাম পরিত্যক্ত হওয়ার দিনের বাজার মূল্যের কথা বলেন।

যদি ফুলুস (পয়সা) দ্বারা কোন পণ্য কেনে, তারপর যে পয়সা অচল হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রেও একই রকমের মতভেদ রয়েছে (আল-ইয়ানাবী)।

২৫. মাসআলা : আল-উযুন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, মুদ্রার প্রচলন সকল এলাকা থেকে উঠে যাওয়া শর্ত। যদি কোন এলাকায় অচল হয়ে যায় আর কোন এলাকায় চালু থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রি বাতিল হবে না। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, 'আল-উযুন' গ্রন্থে যা বলা হয়েছে, তা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে সকল এলাকায় হওয়া শর্ত নয়। বরং যে এলাকায় পণ্যটি বিক্রি হয়েছে সেই এলাকায় যদি স্থিরীকৃত মুদ্রা অচল হয়ে যায় তাতেও বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (ফাতহুল-কাদীর)।

২৬. মাসআলা : যে দিরহামের এক-তৃতীয়াংশ রূপা ও এক-তৃতীয়াংশ তামা এবং তার প্রচলন ওজন বা গুণতি হিসেবে হয়, সেই রকমের সুনির্দিষ্ট দিরহাম দ্বারা যদি কারও কাছ থেকে কাপড় কেনে এবং নগদ মূল্য পরিশোধ না করে, তারপর সে দিরহাম হারিয়ে যায়, তবে তাতে বিক্রি বাতিল হবে না; বরং তাকে অনুরূপ দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। এটা তখনকার কথা, যখন সে মুদ্রার ওজন বা সংখ্যা জানা থাকবে, যাতে সমওজন বা সমসংখ্যক দিরহাম পরিশোধ করতে পারে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) আর-জামিউস-সাগীর গ্রন্থে এরূপ বলেছেন। ওজন বা সংখ্যা জানা না থাকলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।

দিরহামের দুই-তৃতীয়াংশ রূপা ও এক-তৃতীয়াংশ তামা হলে তা 'নাবাহরাজা' ও 'যুযুফ' দিরহামের পর্যায়ভুক্ত, যা হারিয়ে গেলে বিক্রি বাতিল হয় না। সুতরাং দেখানো সে দিরহামের যদি ওজন জানা থাকে, তবে সম-ওজনের সেই দিরহাম পরিশোধ করতে হবে। হাঁ, যদি ওজন জানা না থাকে, তবে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। যদি অর্ধেক রূপা ও অর্ধেক তামা হয়, তবে সে দিরহামের ক্ষেত্রেও মাসআলা একই। যদি দুই-তৃতীয়াংশ তামা হয় এবং পণ্য হিসেবে তা ওজনে বিক্রি করা হয়, তবে চুক্তি দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং ক্রেতার হাতে সমর্পণ করার আগে তা হারিয়ে গেলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। মাশাইখগণ বলেছেন (আল-মুহীত)।

যদি এ জাতীয় দিরহাম অচল হয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে এর প্রচলন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়, তবে তা অচল ফুলুস, যুযুফ ও রাসাস এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে ইশারা করলে তা নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং সেই ইশারাকৃত বস্তুটির সঙ্গেই চুক্তি সম্পূর্ণ হয়। কাজেই তা পরিশোধ করার আগে হারিয়ে গেলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এ মাসআলা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে সে মুদ্রার অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে তাদের প্রত্যেকে এ কথাও জানে যে, অপরজন তার মতই এ বিষয়ে জ্ঞাত।

পক্ষান্তরে তারা উভয়ে বা একজন যদি সে সম্পর্কে অবগত না থাকে, কিংবা অবগত উভয়ের আছে বটে, কিন্তু একে অপরের অবগতির কথা না জানে, তখন চুক্তির সম্পর্ক ইঙ্গিতকৃত মুদ্রা বা তার সমজাতীয় মুদ্রার সঙ্গে হয় না, বরং সেই এলাকায় সাধারণত মানুষ যেই দিরহাম দ্বারা লেনদেন করে থাকে, সেই দিরহামের সাথেই চুক্তি সম্পূর্ণ হয়। এ মাসআলা সেই অবস্থায় প্রযোজ্য যখন উপরিউক্ত দিরহাম সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তা যদি এমন হয় যে কতক লোক গ্রহণ করে এবং কতক লোক গ্রহণ করে না, তাহলে তা যুযুফ (নিকৃষ্টমানের) দিরহামের পর্যায়ভুক্ত হবে। তখন তার দ্বারা বেচাকেনা জায়েয

হবে এবং চুক্তির সম্পর্ক তখন নির্দিষ্ট কোন দিরহামের সঙ্গে হবে না, বরং তার সমজাতীয় মুদ্রার সঙ্গে হবে, যদি বিক্রেতা বিশেষভাবে তার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে। আর যদি বিক্রেতার তা জানা না থাকে, তবে ইঙ্গিতকৃত মুদ্রার জাতির সঙ্গেও সম্পর্ক হবে না, বরং চুক্তি সম্পূর্ণ হবে সেই অঞ্চলের উৎকৃষ্ট মুদ্রার সঙ্গে (আল-বাদায়ে)।

২৭. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা'-এর বরাতে 'আল-খুলাসা' ও 'আল-বায়যাযিয়া' গ্রন্থে আছে যে, 'ফুলুস' এর মুদ্রামান হ্রাস-বৃদ্ধি যাই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সেটাই পরিশোধ করতে হবে অন্য কিছু নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-ও প্রথমদিকে একথাই বলতেন। পরবর্তী তিনি মত পরিবর্তন করেন এবং বলেন, বেচাকেনার ও কবজার দিন তার যে মূল্যমান ছিল সেটা পরিশোধ করবে। এরই উপর ফাতওয়া বেচাকেনার ও কবজার দিনের মূল্য দ্বারা বুঝানো হচ্ছে- বিক্রির ক্ষেত্রে সেই দিনের মূল্য এবং ঋণের ক্ষেত্রে কবজায় দিনের মূল্য পরিশোধ করবে (আন-নাহরুল ফায়িক)।

২৮. মাসআলা : দিরহামগুলো যদি বিভিন্ন প্রকারের হয়, যেমন তন্মধ্যে কিছু এক-তৃতীয়াংশ রূপা ও দুই-তৃতীয়াংশ তামা দ্বারা প্রস্তুত, কিছু দুই-তৃতীয়াংশ রূপা ও এক-তৃতীয়াংশ তামা দ্বারা প্রস্তুত এবং কিছু অর্ধেক তামা ও অর্ধেক রূপার প্রস্তুত, তাহলে এর কোনও এক প্রকারকে অন্য প্রকারের বিনিময়ে বেশকম করে বিক্রি করায় কোন দোষ নেই, তবে লেনদেন নগদ হওয়া শর্ত। বাকী হলে জায়েয হবে না। যদি এর কোনও একটাকে সমজাতীয় দিরহামের বদলে কমবেশী করে বিক্রি করে, তবে যে দিরহামে রূপার পরিমাণ বেশী তাতে সে বিক্রি জায়েয হবে না, বরং সমান সমান করেই বিক্রি করতে হবে। যদি তামা বেশী হয় বা রূপা ও তামা সমান হয়, তখন কমবেশী বা সমপরিমাণ উভয় রকমেই বিক্রি জায়েয। তবে রূপা থাকার কারণে উভয়টা হওয়া জরুরী।

উপরিউক্ত মাসআলার উপর কিয়াস করে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, আমাদের কালের আদালী দিরহাম যদি একটাকে দুটির বদলে বিক্রি করে, তবে নগদ-নগদ হওয়ার শর্তে জায়েয হবে। এ মাসআলাগুলো আল-জামিউল-কাবীর হতে সংকলিত (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা : আমাদের মাশাইখে কিরাম আদালী ও গাতারিফা মুদ্রায় এটা জায়েয বলে ফাতওয়া দেন নি, কেননা আমাদের দেশে এটা গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রা। এ ক্ষেত্রে কমবেশী করাকে জায়েয বললে সুদের দুয়ার খুলে যাবে (আল-হিদায়া, আত-তাবয়ীন)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ফল, আঙ্গুর-গুচ্ছ, গাছের পাতা, তরমুজ-ক্ষেত্র, ফসল এবং তাজা ও শুষ্ক ঘাস বিক্রি প্রসঙ্গে।

১. মাসআলা : গাছে ফল দেখা দেওয়ার আগে (ফুল অবস্থায়) তা বিক্রি করা জায়েয নয়। এটা সকলেরই মত। ফল আসার পর যখন ব্যবহারযোগ্য হলে তখন বিক্রি করা জায়েয। ব্যবহারযোগ্য হওয়ার আগে যদি বিক্রি করে, যেমন সে ফল মানুষের খাওয়ার যেমন উপযোগী নয়, তেমনি পশুর খাদ্য হওয়ার পর্যায়ও পৌঁছায় নি, তবে বিশুদ্ধ মতে তা বিক্রি জায়েয। ক্রেতার কর্তব্য তা ক্রয় মাত্র কেটে নেওয়া যদি বিনা শর্তে বা কেটে নেওয়ার

শর্তে কিনে থাকে। আর যদি গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বেচাকেনা হয় তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। এটা সেই অবস্থার কথা, যখন ফলের আকার আরও বড় হওয়ার অবকাশ থাকে। পক্ষান্তরে তার আকৃতি বর্ধন যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তখন কেটে নেওয়ার শর্তে বা বিনা শর্তে বিক্রি হয় তবে তা সে বিক্রি জায়েয আর যদি গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি হয় তবে সে ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয নয় এবং এটাই কিয়াস সম্মত। ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'ইসতিহসান' অনুসারে এ বিক্রিকে জায়েয বলেন। 'আল-আসরার' গ্রন্থে আছে যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতের উপরই ফাতওয়া (আল-কাফী)।

২. মাসআলা : 'আত-তুহফা' গ্রন্থে আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতই সহীহ (আন-নাহরুল ফায়িক)।

৩. মাসআলা : যদি সমস্ত ফল বিক্রি করে, অথচ ফুল থেকে কিছু ফল বের হয়ে আসলেও কিছু ফল এখনও বের হয়নি, তবে মাযহাবের আসল মত তা এটাই যে, বিক্রি সহীহ হবে না। কিন্তু শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) ও ইমাম আল-ফযলী (র) ফল, তরমুজ, বেগুন ইত্যাদিতে এরূপ বিক্রি জায়েয বলে ফাতওয়া দিতেন। তারা বর্তমানে ফলকে মৌলিকভাবে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করেন আর যে ফল এখনও বের হয়নি তাকে বর্তমানে ফলের অনুবর্তীরূপে চুক্তির শামিল সাব্যস্ত করেন। এমত ইসতিহসান সম্মত, যেহেতু মানুষের মধ্যে এরূপ বিক্রির ব্যাপক প্রচলন আছে। বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যে, এরূপ বিক্রি জায়েয নয় (আল-মাবসূত)।

৪. মাসআলা : যদি নিঃশর্তভাবে কেনে এবং তারপর বিক্রেতার অনুমতিক্রমে সে ফল গাছে রেখে দেয়, তবে বাড়তিটা তার জন্য হালাল হবে। যদি বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া রেখে দেয় এবং আকারে তা বৃদ্ধি পায়, তবে যে পরিমাণ বাড়বে তা সাদাকা করতে হবে। যদি বৃদ্ধি সমাপ্ত হওয়ার পর গাছে রেখে দেয় তবে কিছুই সাদাকা করতে হবে না।

যদি নিঃশর্তভাবে বিক্রি করে, তারপর বিক্রেতা তা গাছে রেখে দেয় এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে গাছ ইজারা দেয় তবে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্রেতার জন্য অতিরিক্তটা হালাল হবে (আল-কাফী)।

৫. মাসআলা : যদি নিঃশর্তভাবে ফল কেনার পর তা গাছে রেখে দেয় আর ইত্যবসরে গাছে নতুন ফল আসে তবে দেখতে হবে সে ফলটা ঠিক কখন এসেছে। ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে গাছের ফল নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার আগে আসলে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে আর যদি তার পরে আসে, তবে বিক্রি ফাসিদ হবে না। তখন গাছের ফলে বিক্রেতা ও ক্রেতা অংশীদার হবে। এখন নতুন ফলের পরিমাণ কতটুকু, এ সম্পর্কে কসমসহ ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য। বেগুন তরমুজের ক্ষেত্রেও একই মাসআলা।

নতুন জন্ম নেওয়া ফল, যাতে ক্রেতা পেতে পারে সে জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা যায় যে, বেগুন, তরমুজ প্রভৃতি মূল গাছসহ ক্রয় করবে, যাতে নতুন যা জন্ম নেয় তা তার মালিকানার ভেতরই জন্ম নেয় (আন-নাহরুল ফায়িক)।

৬. মাসআলা : কেউ যদি গাছে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন জাতের আগুর গুচ্ছ কেনে এবং তার কতক কাঁচা এবং কতক পাকা, তবে দেখতে হবে যে, কাঁচা-পাকা কি একই জাতের, না ভিন্ন ভিন্ন জাতের। যদি প্রত্যেক জাতের আগুর কতক কাঁচা ও কতক পাকা হয়, তবে সে বেচাকেনা জায়েয। যদি এক জাতের আগুর কাঁচা ও অন্য জাতের আগুর পাকা হয় তবে জায়েয হবে না। কিন্তু সহীহ মত হচ্ছে এই যে, উভয় অবস্থায়ই বিক্রি জায়েয। এটা সেই অবস্থার কথা যখন সবটা ফলই বিক্রি করে।

যদি ফলের আংশিক বিক্রি করে এবং তার কতক কাঁচা ও কতক পাকা হয় বা সবটাই কাঁচা হয় তবে বিক্রি জায়েয নয়।

যদি আগুরের বাগানে দুজন শরীক থাকে এবং তাদের একজন তার অংশ বিক্রি করে, যার কতক কাঁচা ও কতক পাকা বা সবটাই কাঁচা তখনও সে বিক্রি জায়েয নয়। অবশ্য এটা সেই অবস্থায় প্রযোজ্য যখন তৃতীয় কারো কাছে বিক্রি করা হয়।

যদি দুই শরীকের একজন অপরজনের কাছে বিক্রি করে তবে রুকনুল ইসলাম আলী আস সুগদীর ফাতওয়া হচ্ছে যে, তাও জায়েয নয় (আল-মুহীত : আয-যখীরা)।

৭. মাসআলা : এই ক্ষেত্রে ঐ কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে যে, বাগানের সবটা আগুরই বিক্রি করে ফেলবে। তারপর অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা এমন কিছু অংশে বিক্রি প্রত্যাহার করে নেবে।

আগুর ফল যদি পেকে যাওয়ার পর বিক্রি করে তবে বাগানের সবটা বিক্রি করুক বা অবিভাজ্য অংশ, সর্বাবস্থায়ই জায়েয (আস-সিরাজিয়া)।

৮. মাসআলা : যদি ফসলসহ আগুরের গাছ কেনে, তবে চাষীর সম্মতি থাকলে জায়েয হবে এবং তখন মূল্যের একটা অংশ সেও পাবে। আর সে সম্মত না থাকলে জায়েয নয় (মুখতারুল ফাতওয়া)।

৯. মাসআলা : যদি গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে এমন ফল কেনে যার কতক ঝরে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার অবস্থা উতরে গেছে এবং কতক উতরে যাওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা জায়েয। যদি ছোটগুলো পরিপক্বতায় পৌঁছেতে খুব বেশী দেবী হয়ে যায়, তবে যেগুলো পরিপক্বতায় পৌঁছাবে তার বিক্রি জায়েয এবং বাকিগুলোর জায়েয নয় (খুলাসা)।

১০. মাসআলা : কেউ যদি এই কথার উপর গাছের আগুর কেনে যে, তাতে এক মান্ন (দুই রিতল=এক মান্ন) আছে, কিন্তু পরে যে আগুর পাওয়া গেল তাতে মাত্র নয়শ' মান্ন হয়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার কাছে একশ' মান্নের মূল্য ফেরত চাইতে পারবে (আয-যহীরিয়া : আল কাফী)।

১১. মাসআলা : কেউ তৃত গাছের পাতা কিনল, কিন্তু পাতা কোন জায়গা থেকে কাটা হবে তা স্থির করা হল না, তবে নির্দিষ্ট একটা জায়গা থেকে কাটার প্রচলন যদি থাকে, তাহলে সে

বেচাকেনা সহীহ হবে। যদি ডালা ছেড়ে দেয়, তবে পরের বছর সে তা কাটতে পারবে। যদি কিছু ডাল ছেড়ে দেয় এবং তারপর তা কাটতে চায়, তবে গাছের কোন ক্ষতি না হলে কাটতে পারবে (আল-বাহরুর রাযিক)।

১২. মাসআলা : তৃত গাছে পাতা গজানোর পর যদি তা ক্রয় করে, কিন্তু সময় মত তা না কাটে এবং এভাবে কাটার মৌসুম পার হয়ে যায়, তবে ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন, যদি ডালসহ পাতা কিনে থাকে এবং কাটার স্থানও নির্ধারিত থাকে, তবে মৌসুম চলে যাওয়ার অজুহাতে ক্রেতা বিক্রি বাতিল করতে পারবে না; বরং তাকে তা কেটে নিতে বাধ্য করা হবে। অবশ্য ডাল কাটলে যদি গাছের কোন ক্ষতি হয়, তবে বিক্রেতাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে, চাইলে সে বিক্রি বাতিল করবে অন্যথায় ডাল কাটায় সম্মত হবে।

যদি ডাল ছাড়া পাতা কেনে এবং এই শর্তে কেনে যে, অবিলম্বেই সে তা কেটে নেবে, তবে তা জায়েয। আর কেটে আস্তে আস্তে নেয়ার শর্তে হলে জায়েয নয়। তদ্রূপ গাছে রেখে দেয়ার শর্তে কিনলেও জায়েয নয়। যদি নিঃশর্তভাবে কেনে, তবে সেই দিনই তা কেটে নিলে জায়েয হবে আর সেদিন না কাটলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা : এ ক্ষেত্রে এই কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে যে, ক্রেতা মূলসহ গাছটাই কিনে ফেলবে, তারপর সে পাতা কেটে নিয়ে গাছটা আবার বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে বা তাকে দান করে দেবে (মুখতারুল ফাতওয়া)।

১৪. মাসআলা : বেত ঝাড় বিক্রি জায়েয, যদিও তা আস্তে আস্তে বাড়ে। কুররাছ (সবজি বিশেষ Leek) বিক্রি জায়েয, যদিও তা নিচের দিকে বাড়ে। এগুলো জায়েয মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রচলন থাকার কারণে। যেগুলো বিক্রির প্রচলন নেই, অথচ আস্তে আস্তে বাড়ে, তা বিক্রি জায়েয নয় (আয-যহীরিয়া)।

১৫. মাসআলা : ইমাম আল-ফযুলী (র) বলেন, সঠিক কথা এই যে, বেত ঝাড় বিক্রি জায়েয নয় (ফাতহুল কাদীর)।

১৬. মাসআলা : কেউ যদি তার তরমুজের ক্ষেত তাতে তরমুজ আসার আগে এই বলে বিক্রি করে যে, এই তরমুজ বিক্রি করলাম, তবে তাতে গাছের ক্ষেত্রে বিক্রি সম্পন্ন হবে, তার ফসল তথা তরমুজের ক্ষেত্রে নয়। তারপর যে তরমুজ উৎপন্ন হবে, তা ক্রেতার মালিকানায় উৎপন্ন হবে। ক্রেতা যদি তা ক্ষেত্রেই রেখে দিতে চায় এবং সে ক্ষেত্রে শরীআত সম্মত কর্তৃত্ব লাভ করতে চায় তবে এই কৌশল অবলম্বন করতে পারে যে, মূল্যের কয়দাংশ দ্বারা সে ঘাস ও তরমুজ গাছ কিনবে এবং বাকি অংশ দ্বারা নির্দিষ্ট মেয়াদে জমি ভাড়া নেবে। আল জামিউস সাগীরে আছে, এটা জায়েয নয় (আল-খুলাসা)।

১৭. মাসআলা : এরূপ ক্ষেত্রে কর্তব্য হচ্ছে, প্রথমে বৃক্ষ, ফল বা ঘাস কিনবে এবং তারপর জমি ইজারা নেবে। কেননা প্রথমে ইজারা চুক্তি সম্পন্ন করলে জায়েয হবে না (মুখতারুল ফাতওয়া)।

১৮. মাসআলা : যদি তরমুজ গাছ বিক্রি করে এবং জমি ধার দেয় তবে তাও জায়েয। তবে তা বাধ্যতামূলক হবে না, বরং মালিক (বিক্রেতা) যখন ইচ্ছা তা প্রত্যাহার করে নিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা : একটি তরমুজ ক্ষেতের দুজন মালিক। একজন যদি নিজ অংশ কারো কাছে বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে না। কেননা তাতে অপর শরীকের ক্ষতি হয়। আর কাউকে ক্ষতি মেনে নিতে বাধ্য করা যায় না, এমনকি সে তাতে রাযী থাকলেও। কাজেই ক্রেতার কর্তব্য উভয় শরীক হতে ক্ষেত কিনে নেওয়া। তারপর সে একজনের অংশে বিক্রি বাতিল করবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা : এক ব্যক্তি অন্য একজনকে বলল, আমি দশ দিরহামের বিনিময়ে এই তরমুজ তোমার কাছে বিক্রি করলাম, কিন্তু তখনও ক্ষেতে তরমুজ আসেনি, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন ফাযল (র) বলেন, এ বিক্রি জায়েয হবে এবং বিক্রি সংঘটিত হবে। তরমুজ গাছের উপর, তা হতে উৎপন্ন তরমুজের উপর নয়। তারপর যে তরমুজ উৎপন্ন হবে তা ক্রেতারই হবে। যদি ক্ষেতে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি হয় তবে সে বিক্রি জায়েয নয়।

তরমুজের ক্ষেতে যদি দুই ব্যক্তি শরীক থাকে এবং এক শরীক তার অংশ বিক্রি করে ফেলে তবে তা জায়েয হবে না। যদি একজন তার অংশ বিক্রি করে এবং ক্রেতার হাতে তা সমর্পণ করে তবে বিক্রেতার অংশ ক্রেতারই হয়ে যাবে, যাবত না বিক্রি প্রত্যাহার করা হয়। অপর শরীক যদি বিক্রেতার অংশের বিক্রি অনুমোদন করে এবং তাতে সম্মতি প্রকাশ করে তবে পরে আবার অসম্মতিও প্রকাশ করতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা : কেউ যদি তার তরকারির ক্ষেত এই শর্তে বিক্রি করে যে, ক্রেতা তা কেটে নিয়ে যাবে বা ক্ষেতে তার পশু ছেড়ে দেবে, যাতে পশু তা খেয়ে ফেলে, তবে তা জায়েয হবে। যদি এই শর্তে বিক্রি করে যে, তোলার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তা ক্ষেতেই থাকবে তবে জায়েয হবে না। ঘাস ও তৃণাদির ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিবরণ প্রযোজ্য। এটাই সঠিক। ফকীহ আবুল লাইস (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

২২. মাসআলা : আবুল লাইস (র)-এর ফাতওয়া গ্রন্থে আছে, দুই ব্যক্তি একখণ্ড জমির মালিক। তাতে তারা ফসল বুনেছে। তাদের একজন তার অংশের জমি ছাড়া কেবল ফসল তৃতীয় কারও কাছে বিক্রি করল। এ বিক্রি জায়েয হবে কি?

যদি ফসল তোলার উপযুক্ত হয় তবে সে বিক্রি জায়েয আর যদি তোলার উপযুক্ত না হয় তবে শরীকের অনুমতি ছাড়া জায়েয হবে না। সে অনুমতি দিলে জায়েয হবে, তা নিঃশর্তভাবে বিক্রি করুক বা কাটার শর্তে।

যদি জমিতে রেখে দেওয়ার শর্তে বিক্রি করে তবে জায়েয হবে না, যদিও অপর শরীক তাতে রাযী থাকে।

যদি এক শরীক তার অংশের ফসল বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে। তখন বিক্রেতার স্থলে ক্রেতা শরীকদার হবে।

প্রথম অবস্থায় যখন অর্ধেক ফসল জমিসহ বিক্রি অবৈধ সাব্যস্ত হল, তখন সে বিক্রি (প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত) যদি প্রত্যাহার করা না হয় এবং শেষ পর্যন্ত ফসল তোলার উপযুক্ত হয়ে যায়, তাহলে সে বিক্রি আবার বৈধতায় রূপান্তরিত হবে।

প্রথম অবস্থায় যদি জমি সহ ফসল দুজনের মধ্যে শরীকানা হয় এবং এক শরীক জমি ছাড়া কেবল ফসলের অংশ অপর শরীকের কাছে বিক্রি করে দেয়, তবে ফসল কাটার উপযুক্ত হয়ে না উঠলে সে বিক্রি জায়েয নয় (আল-মুহীত)।

ফকীহ আবুল লাইস (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২৩. মাসআলা : একই মাসআলা হবে তুলা ও অপরাপর ফসলের ক্ষেত্রে, যদি দুই শরীকের একজন জমি ছাড়া কেবল ফসলের অংশ অপর শরীকের কাছে বিক্রি করে।

যদি জমিসহ ফসলের অংশ শরীকের কাছে বিক্রি করে বা শরীকের সম্মতি ছাড়াই তৃতীয় কারো কাছে বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে।

‘আল আজনাস’ গ্রন্থে আছে, শরীকানা ফসলের অর্ধেক যদি শরীকের কাছে বিক্রি করে তবে জাহিরী রিওয়ায়াত অনুসারে তা জায়েয (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা : ‘আল ফাতওয়া আস-সুগরা’ গ্রন্থে আছে, গাছের দুই শরীকের এক শরীক তার অংশ তৃতীয় কারো কাছে বিক্রি করলে তা জায়েয নয়। যদি শরীক তিনজন হয় এবং তাদের একজন বাকি দুই শরীকের একজনের কাছে নিজ অংশ বিক্রি করে তবে তা জাহীয নয়। উভয় শরীকের কাছে বিক্রি করলে জায়েয (আয-যহীরিয়া)।

২৫. মাসআলা : ফসল যদি চাষী ও জমির মালিক উভয়ের মধ্যে শরীকানা হয়, তারপর মালিক তার অংশ চাষীর কাছে বিক্রি করতে চায়, তবে তা জায়েয হবে না। চাষী যদি স্বয়ং অংশ জমির মালিকের কাছে বিক্রি করে তবে তা জায়েয। কেননা মালিকের কাছে সমর্পণ করার জন্য তার তা ভাগ করার দরকার হবে না। যদি ফসল পেকে যায় তবে তাদের প্রত্যেক নিজ অংশ অপরের কাছে বিক্রি করতে পারবে।

‘আল-জামিউস সাগীর’-এর মুখায়াআ অধ্যায়ে আছে, বর্গাচাষী তার ফসলের অংশ যদি ভূস্বামীর কাছে বা অন্য কারও কাছে বিক্রি করে তবে তা জায়েয নয়।

‘আল-মাবসূত’ গ্রন্থে আছে, ভূস্বামী যদি তার জমি বিক্রি করে এবং তাতে ফসল থাকে, যাতে সে ও বর্গাচাষী শরীক, তবে তা দূরকম হতে পারে-

(ক) সে ফসল হয়ত কোন তরি-তরকারি হবে। এ অবস্থায় বিক্রিটা বর্গাচাষীর অনুমতির উপর মওকুফ থাকবে, তাতে সে জমি ফসলসহ বিক্রি করুক বা ফসল ছাড়া। যদি সমস্ত ফসলসহ জমি বিক্রি করে থাকে এবং চাষী জমি ও ফসল উভয়ের ক্ষেত্রে বিক্রি অনুমোদন করে তবে বিক্রি কার্যকর হবে। এ ক্ষেত্রে জমি ও ফসলের দাম অনুযায়ী মূল্য ভাগ করা হবে। জমির ভাগে যা পড়বে তা পাবে জমির মালিক আর ফসলের ভাগে যা পড়বে, জমির মালিক ও চাষীর মধ্যে অর্ধাঅর্ধি ভাগ করা হবে।

বর্গাচাষী যদি বিক্রি অনুমোদন না করে, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার হয় যে ফসল পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে নয়ত বিক্রি রহিত করবে।

ভূস্বামী যদি কেবল জমি বিক্রি করে (ফসল বিক্রি না করে) এবং বর্গাচাষী সে বিক্রি অনুমোদন করে তবে জমি হবে ক্রেতার এবং ফসল ভূস্বামী ও বর্গাচাষীর মধ্যে ভাগ হবে। বর্গাচাষী যদি বিক্রি অনুমোদন না করে, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে।

জমির মালিক যদি তার অংশের ফসলসহ জমি বিক্রি করে এবং বর্গাচাষী বিক্রি অনুমোদন করে, তবে ক্রেতা গোটা মূল্য দিয়ে জমি এবং ভূস্বামীর অংশের ফসল গ্রহণ করবে।

বর্গাচাষী অনুমোদন না করলে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। সে যদি এ অবস্থায় বিক্রি বাতিল করতে চায় তবে সঠিক মত হচ্ছে যে, বিক্রির সময় ফসল কাটার উপযুক্ত হলে ক্রেতার সে ইখতিয়ার থাকবে না।

ঐ প্রথম (ক-এর) অবস্থায় কেবল জমি বা তার অংশের ফসলসহ জমি বিক্রি করলে বর্গাচাষীর অনুমোদন ছাড়াই বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে।

যদি সমস্ত ফসলসহ জমি বিক্রি করে তবে জমি এবং মালিকের ফসলের অংশের ফসলে বিক্রি কার্যকর হয়ে যাবে আর বর্গাচাষীর অংশের ফসলে বিক্রি তার অনুমোদনের উপর স্থগিত থাকবে। তখন তার অংশের ফসলে যে মূল্য আসে তা সে পাবে। বাদবাকি মূল্য হবে মালিকের।

বর্গাচাষী যদি অনুমোদন না করে তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যদি ক্রয়কালে বর্গাচাষের কথা জানা থাকে (যখীরা)।

২৬. মাসআলা : একখণ্ড জমিতে ফসল আছে। মালিক যদি ফসল ছাড়া শুধু সেই জমি কিংবা জমি ছাড়া শুধু ফসল বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে। এমনিভাবে যদি ফসল ছাড়া অর্ধেক জমি বিক্রি করে তাও জায়েয। যদি জমি ছাড়া অর্ধেক ফসল বিক্রি করে, তবে তা জায়েয নয়। হাঁ, ফসল যদি তার ও চাষীর মধ্যে শরীকানা হয় এবং চাষী তার অংশ মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয় তবে জায়েয হবে। মালিক যদি তার অংশ বর্গাচাষীর কাছে বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে না। এটা সেই অবস্থার কথা, যখন ফসলের বীজ জমির মালিক দেয়। বীজ যদি চাষী দেয়, তবে সে বিক্রি জায়েয হওয়ার কথা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৭. মাসআলা : ফসল যদি কাটার উপযুক্ত হয় তবে মালিক ও বর্গাচাষী উভয়ের প্রত্যেকে অপরকে কাছে বিক্রি করতে পারবে। আল-জামিউল সাগীরের 'মুযারআ' অধ্যায়ে আছে, এক-তৃতীয়াংশের শর্তে বর্গাচাষীর যদি তার ফসলের অংশ জমির মালিকের কাছে বা অন্য কারও কাছে বিক্রি করে তবে তা জায়েয নয় (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা : শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, জমির মালিক যদি জমি ছাড়া কেবল তার ফসলের অংশ তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে কিংবা বর্গাচাষী যদি তার অংশ তৃতীয় কারও কাছে বিক্রি করে আর ফসল কাটার উপযুক্ত না হয়, যে কারণে শরীকের ক্ষতিরোধ

করার উদ্দেশ্যে বিক্রি অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে, তারপর তার শরীক যদি নিজের অংশ একই ক্রেতার কাছে বিক্রি করে তবে প্রথম বিক্রি আবার বৈধতায় রূপান্তরিত হবে (আয-যখীরা)।

২৯. মাসআলা : জমি ছাড়া অর্ধেক ফসল বিক্রি জায়েয নয় কেবল সেই ক্ষেত্রে, যেখানে ফসলকারীর স্থিতিশীলতার অধিকার আছে আর এটা থাকে তখন, যখন নিজের মালিকানাধীন জমিতে চাষ করে। পক্ষান্তরে তার যদি স্থিতিশীলতার অধিকার না থাকে, যেমন সে হয়ত জবরদখলের জমিতে অন্যায়ভাবে চাষ করেছে, তখন অর্ধেক ফসল বিক্রি জায়েয আছে।

এমনিভাবে জমি ছাড়া যদি অর্ধেক ঘর বিক্রি করে, তবে ঘর তোলাটা ন্যায়সঙ্গতভাবে হলে সে বিক্রি জায়েয হবে না আর অন্যায়ভাবে হলে বিক্রি জায়েয হবে (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা : 'আল ইয়াতীমা' গ্রন্থে আছে, আল-বাককালী (র) উল্লেখ করেন যে, কেউ যদি জমি কিনে তাতে ফসল করে এবং তারপর সে জমি ও ফসলে কাউকে শরীক করে তবে তা জায়েয। যদি কেবল ফসলে শরীক করে তবে তা জায়েয নয় (আত-তাতার খানিয়া)।

৩১. মাসআলা : গাছে থাকা অবস্থায় গাছের ডাল কেনা জায়েয। ক্ষেতের ভেতর থাকা অবস্থায় তরকারি কেনা জায়েয নয় (আল-কুন্যা)।

৩২. মাসআলা : গাছের খেজুরকে পাড়া খেজুরের বদলে বিনা পরিমাপে কেবল অনুমান করে বিক্রি জায়েয নয় (তাহযীব)।

৩৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বর্গাচাষের চুক্তিতে এই শর্তে জমি দিল যে, সে এতে গাছ লাগাবে এবং আয়ের অর্ধেক সে পাবে। চাষী তাতে তৃত গাছ লাগাল। কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর মালিক জমি এবং তার অংশের গাছ বিক্রি করে দিল তার সে বিক্রি সহীহ। ক্রেতা যদি অন্য কারও কাছে বিক্রি করে তবে তা ফাসিদ হবে। এ ফায়সালা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুসারেই হওয়ার কথা। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী সে বিক্রিও সহীহ হবে। কেননা তাদের নিকট স্থাবর সম্পত্তি কবজা করার আগেও বিক্রি করা জায়েয। এরই উপর ফাতওয়া (মুযমারাত)।

৩৪. মাসআলা : কুর্রাহ (Leek) একটু উপরে উঠে আসার পর যদি এক আঁটি বিক্রি করে তবে তা জায়েয, কিন্তু কয়েক আঁটি বিক্রি করলে জায়েয হবে না। এমনিভাবে যে কোন তরি-তরকারি মাটির একটু উপরে উঠে আসলে তা থেকে এক আঁটি বিক্রি করা জায়েয; কয়েক আঁটি জায়েয নয়। এমনিভাবে 'কাসীল' (জবের চারা, যা গবাদি পশুকে খাওয়ানো হয়) মাটির উপরে উঠে আসার পর বিক্রি করা জায়েয, যদি এখনই তা কেটে নেয়। বৃক্ষাদিও যদি ক্রেতা সঙ্গে সঙ্গে উপড়ে নেয় বা কেটে ফেলে তবে মাটিতে খাড়া থাকা অবস্থায় বিক্রি জায়েয (আয-যখীরা)।

৩৫. মাসআলা : মাঠে এমনিতেই যে ঘাস জন্মায়, তা বিক্রি করা বা ইজারা দেওয়া জায়েয নয়, যদিও তা নিজ মালিকানা জমিতে হয়। অবশ্য জমির মালিক তাতে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারে। বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর অন্যরা তাকে বলতে পারে যে, তোমার জমিতে আমাদেরও হক আছে। কাজেই আমাদেরকে ঢুকতে দেবে না হয় ঘাস কেটে আমাদেরকে হস্তান্তর করবে।

উল্লেখিত মাসআলা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন সে ঘাস আপনা-আপনি জন্মাবে। পক্ষান্তরে জমিতে যদি সেচ দিতে হয় এবং ঘাস জন্মানোর জন্যই সে প্রস্তুত রাখে, তবে আয়-যখীরা, আল-মুহীত ও আন-নাওয়াযিলের বর্ণনা অনুসারে তা বিক্রি করা জায়েয। কেননা সে তার মালিক। এটাই সাদরুশ-শহীদ (র)-এর মত।

যদি জমির চারপাশে পরিখা খনন করে তা চাষাবাদের জন্য প্রস্তুত করে, তারপর তাতে বাঁশ জন্মায় তবে সে-ই তার মালিক হবে। এটাই অধিকাংশের মত (আল-বাহরুর রায়িক)।

৩৬. মাসআলা : কেউ যদি তার অনুমতি ছাড়া ঘাস কাটে, তবে সে তার কাছ থেকে তা ফেরত নিতে পারবে। এটাই সঠিক মত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

৩৭. মাসআলা : ঘাসের ইজারা বৈধ হওয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে যে, পশু বেঁধে রাখা বা অন্য কোন প্রয়োজনে সে ঘাসের জমি ইজারা নেবে এবং মালিক সেজন্য যে মূল্য বা ভাড়া চায় তা পরিশোধ করবে। এতে উভয় উদ্দেশ্যই হাসিল হয়ে যাবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

৩৮. মাসআলা : তাজা-শুকনা যে কোন রকমের পশু খাদ্যই ঘাস সম্পর্কিত মাসাইলের অন্তর্ভুক্ত। তবে বৃক্ষ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা ঘাস হচ্ছে এমন উদ্ভিদ যার কাণ্ড নেই, পক্ষান্তরে বৃক্ষের কাণ্ড থাকে। কাজেই ঘাসের হুকুম বৃক্ষে বর্তাবে না। সুতরাং নিজ জমিতে বৃক্ষ গজালে তা বিক্রি জায়েয হবে। ছত্রাক ঘাসেরই মত (আত-তাবয়ীন)।

৩৯. মাসআলা : কারও জমিতে পাখি ডিম পাড়লে তা সংগ্রহ না করা পর্যন্ত বিক্রি জায়েয নয় (আল-হাবী)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বন্ধকী বস্তু, ভাড়ায় প্রদত্ত সামগ্রী, জবরদখলী মালামাল, পলাতক গোলাম, জায়গীর সম্পত্তি, পতিত ভূমি ও বর্গা জমি বিক্রি প্রসঙ্গ-

১. মাসআলা : বন্ধকী বস্তু বিক্রি করা হলে তার হুকুম সম্পর্কে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে সে বিক্রি স্থগিত থাকবে (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

২. মাসআলা : বন্ধকদাতা যদি ঋণ পরিশোধ করে ফেলে বা বন্ধকগ্রহীতা তার ঋণ মওকুফ করে দেয় বা তার বন্ধক তাকে ফিরিয়ে দেয় কিংবা সে বিক্রি অনুমোদন করে ও তাতে সন্তুষ্ট থাকে তবে বিক্রি চূড়ান্ত হয়ে যাবে। তখন চুক্তি নবায়নের দরকার হবে না (আল-গিয়্যাছিয়া)।

৩. মাসআলা : বন্ধক গ্রহীতা যদি বিক্রি অনুমোদন না করে এবং ক্রেতা কাযীর কাছে গিয়ে দাবী জানায় যে, তাকে যেন পণ্য সমর্পণ করা হয়, তবে কাযী তাদের বোচাকেনা বাতিল করে দেবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : ভাড়ায় খাটানো বস্তু বিক্রির হুকুম বন্ধকী দ্রব্যের অনুরূপ। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে স্থগিত থাকে এটাই সহীহ। ক্রয়কালে যদি ক্রেতার জানা না থাকে যে, তার কেনা বস্তুটি ভাড়ার মাল বা বন্ধকী বস্তু, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে (যখীরা)।

৫. মাসআলা : সাদরুশ শহীদ (র) বলেন, যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী সঠিক জবাব এই যে, ক্রেতার তা জানা থাকলেও তার ইখতিয়ার থাকবে (আল-গিয়্যাছিয়া)।

৬. মাসআলা : ইজারা গ্রহীতার ঐ বিক্রি রহিত করার ইখতিয়ার আছে কি-না? সাদরুশ শহীদ (র) বলেন, যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী তার সে ইখতিয়ার থাকবে। ইমাম তাহাবী (র)-এর বর্ণনা অনুসারে তার সে ইখতিয়ার থাকবে না। শায়খুল ইসলাম খাহারযাদে (র) বলেন, এ ব্যাপারে দু'রকম বর্ণনা আছে। ফাতওয়া হচ্ছে এই যে, তার সে ইখতিয়ার থাকবে না (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

৭. মাসআলা : ইজারা যদি অনেক দিন আগের হয়ে থাকে, তারপর মালিক তা বিক্রি দেয় এবং ইত্যবসরে ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তবে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে বিক্রি কার্যকর হয়ে যাবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা : বন্ধক গ্রহীতার ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, সে বিক্রি রহিত করার দাবী করতে পারে কি-না? কেউ বলেন, তার সে ইখতিয়ার আছে, কারও মতে, সে ইখতিয়ার নেই। এটাই সঠিক (আল-গিয়্যাছিয়া)।

৯. মাসআলা : ইজারা গ্রহীতা যদি বিক্রি অনুমোদন না করে অবশেষে ইজারার পরিসমাপ্তি ঘটে, তবে পূর্বকার বিক্রি কার্যকর হবে। এমনভাবে বন্ধকগ্রহীতার যখন বিক্রি রহিত করার ইখতিয়ার থাকল না, এবং শেষ পর্যন্ত যখন তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে, তখন পূর্বকার বিক্রি কার্যকর হবে। বন্ধক ও ইজারাদাতার বিক্রি বাতিল করার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। ইজারাগ্রহীতা যদি বিক্রি অনুমোদন করে তবে বিক্রি কার্যকর হবে। তবে তার মালামাল তার হাতে না পৌঁছা পর্যন্ত ইজারার বস্তু তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে না (আল ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

১০. মাসআলা : ইজারার বস্তুটি যদি এমন হয় যে, ইজারাগ্রহীতার হাতে যাওয়ার পর তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অবকাশ থাকে, তবে তাতে পাওনা মওকুফ হয়ে যাবে না, পক্ষান্তরে বন্ধকের ক্ষেত্রে ঋণ মওকুফ হয়ে যায় (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : মালিক যদি ভাড়া বাড়িটি বিক্রি করে দেয়, তারপর ভাড়াগ্রহীতা ভাড়ার মূল্য বাড়িয়ে দেয় এবং চুক্তি নবায়ন করে। তবে যে বিক্রি এ যাবত স্থগিত ছিল, তা চূড়ান্ত হয়ে যাবে। কেননা চুক্তি নবায়নের ফলে আগেরটি রহিত হয়ে গেছে। কাজেই বিক্রি কার্যকর হয়ে যাবে (আল-কিন্যা)।

১২. মাসআলা : ইজারাদাতা যদি ইজারাগ্রহীতার অনুমতি ছাড়া ইজারার বস্তুটি কারও কাছে বিক্রি এবং তারপর আবার সেটি ইজারাগ্রহীতার কাছে বিক্রি করে, তবে এই দ্বিতীয় বিক্রি বৈধ হবে এবং এর দ্বারা প্রথমটি রহিত হয়ে যাবে।

যদি অন্য কারও কাছে বিক্রি করে এবং তারপর অপর আরেক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে, এরপর ইজারাগ্রহীতা প্রথম ও দ্বিতীয় বিক্রি অনুমোদন করে, তবে প্রথম বিক্রি কার্যকর হবে এবং দ্বিতীয়টি বাতিল হয়ে যাবে (আস-সুগরা)।

১৩. মাসআলা : ইজারায় খাটানো গোলাম বিক্রি করতঃ যদি ক্রেতার হাতে সমর্পণ করে, তারপর সে গোলামকে ক্রটিযুক্ত করে ফেলে, তবে ইজারাগ্রহীতা তার উপর জরিমানা আরোপ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে বন্ধকগ্রহীতা এরূপ ক্ষেত্রে বন্ধকী মালের মূল্য পরিমাণ জরিমানা আদায় করতে পারে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৪. মাসআলা : ইজারাগ্রহীতা বিক্রির কথা শুনে ক্রেতাকে বলল, মালটি আমার কাছে ইজারায় আছে, সুতরাং আপনি আমাকে সময় দিন, যাতে আমি ভাড়ার টাকা ফেরত আনতে পারি। তো তার এ অনুরোধটা তার পক্ষ হতে বিক্রির অনুমোদনরূপে গণ্য হবে। সুতরাং এর ফলে বিক্রি কার্যকর হয়ে যাবে (আল-কিনয়া)।

১৫. মাসআলা : বন্ধকদাতার কাছ থেকে ক্রয় করার পর ক্রেতা যদি আবার বিক্রি করে দেয় বা খরিদকৃত গোলাম আযাদ করে দেয় তারপর বন্ধকগ্রহীতা বিক্রি অনুমোদন করে, তবে ক্রেতার বিক্রি ও আযাদকরণ কার্যকর হবে। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই (আল ফুসূলুল ইমাদিয়া)।

১৬. মাসআলা : বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি ছাড়া বন্ধকদাতা যদি মাল বিক্রি করে ফেলে, তারপর আবার বন্ধকগ্রহীতার কাছে বিক্রি করে তবে দ্বিতীয় বিক্রি বৈধ হবে এবং এর দ্বারা প্রথমটি বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা : বন্ধকদাতা যদি বন্ধক গ্রহীতার অনুমতি ছাড়া কারও কাছে বন্ধকী দ্রব্য বিক্রি করে এবং তারপর সে দ্বিতীয় কারও কাছে বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি ছাড়াই বিক্রি করে, তারপর বন্ধকগ্রহীতা দুটি বিক্রির একটি অনুমোদন করে, তবে যেই বিক্রির সঙ্গে অনুমোদন যুক্ত হয়েছে, সেটি কার্যকর হবে। বিক্রিমূল্য পাবে বন্ধকগ্রহীতা, যাদ্বারা সে নিজ পাওনা উসূল করে নেবে (আস সুগরা)।

১৮. মাসআলা : দ্বিতীয় বিক্রির স্থলে যদি বন্ধক বা ইজারা হত এবং বন্ধকগ্রহীতা সেই বন্ধক বা ইজারা অনুমোদন করত, তবে বিক্রি কার্যকর হত এবং বন্ধক ও ইজারা বাতিল হয়ে যেত (আয-যখীরা)।

১৯. মাসআলা : বন্ধকী গোলাম যদি বিক্রি করা হয় এবং বন্ধকগ্রহীতার কাছ থেকে তা কবজা করার আগেই ক্রেতা সে গোলাম আযাদ করে দেয়, তবে সে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং জরিমানাস্বরূপ তার মূল্য বন্ধকগ্রহীতাকে দেওয়া হবে। বিক্রেতা তার কাছ থেকে কোন মূল্য পাবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২০. মাসআলা : বন্ধকদাতা যদি বন্ধকী মাল বিক্রি করে দেয় এবং মূল্য বুঝে নেয়, তারপর সেটি ছাড়িয়ে আনার আগে অন্য কারও কাছে বিক্রি করে এবং তারপর ছাড়িয়ে আনে, তবে প্রথম বিক্রিই কার্যকর হওয়ার অধিকতর যোগ্য (আল-কিনয়া)।

২১. মাসআলা : মালিক যদি জবরদখল হয়ে যাওয়া সম্পত্তি দখলদার ছাড়া অন্য কারও কাছে বিক্রি করে তবে সে বিক্রি স্থগিত থাকবে। এ মতই সহীহ। দখলদার ব্যক্তি যদি তা

স্বীকার করে তবে বিক্রি চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আর যদি অস্বীকার করে এবং যার কাছ থেকে দখল করা হয়েছে তার সাক্ষী প্রমাণ থাকে, তবে তখনও একই হুকুম (আল-গিয়াছিয়া)।

২২. মাসআলা : তার যদি সাক্ষী-প্রমাণ না থাকে এবং ক্রেতার হাতে মালও সমর্পণ না করে আর ইত্যবসরে সে মাল ধ্বংস হয়ে যায়, তবে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (আয-যখীরা)।

২৩. মাসআলা : কেউ যদি অন্যের মাল বিক্রি করে, তারপর নিজে তা কিনে আনে এবং ক্রেতার হাতে সমর্পণ করে তবে তা জায়েয হবে না। সে বিক্রি ফাসিদ নয়, বরং বাতিল হয়ে যাবে। এটা জায়েয তখনই হত, যখন বিক্রেতার বিক্রির আগে স্বীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠার কারণ (ক্রয়) পাওয়া যেত এজন্যই জবরদখলকারী যদি দখলী মাল বিক্রি করে এবং তারপর সে মালের জরিমানা আদায় করে, তা হলে তার বিক্রি জায়েয হয়ে যায়। কিন্তু জবরদখলকারী যদি মালিকের কাছ থেকে মালটা কিনে নেয় বা মালিক তাকে দান করে অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে তার কাছ থেকে তার অর্জিত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে তার পূর্বকার বিক্রি কার্যকর হয় না (আল-ফুসূলুল-ইমাদিয়া)।

২৪. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বিশর (র) বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি অন্য লোকের খাদ্যবস্তু জবরদখল করে, তারপর তা দান করে দেয়, তারপর সে খাদ্য গরীবদের হাতে মজুদ থাকা অবস্থায় সে তা মালিকের কাছ থেকে কিনে নেয়, তবে তার সে ক্রয় বৈধ হবে এবং গরীবদের কাছ থেকে সে তার দান প্রত্যাহার করতে পারবে। সেই দানকে যদি তার কসমের কাফ্যারা হিসেবে গণ্য করতে চায়, তবে তা বৈধ হবে না। জবরদখলকারী কর্তৃক খরিদ করার পর গরীবেরা যদি সে খাদ্য নিঃশেষ করে ফেলে তবে তাদেরকে জরিমানা দিতে হবে। সে যদি তা ক্রয় না করে বরং তার জরিমানা আদায় করে তবে তার সে দান সহীহ হবে এবং কাফ্যারা হিসেবে দিয়ে থাকলে তাও আদায় হবে। কাজেই সে তার দান প্রত্যাহার করতে পারবে না।

জবরদখলকারী মালিকের কাছ থেকে ঐ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার সময় যদি গরীবদের হাতে তা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে সে ক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য যদি এই কথা বলে কেনে যে, আমার কাছে তোমার যে খাদ্যদ্রব্য পাওনা আছে তোমার কাছ থেকে সেইটা ক্রয় করছি, তাহলে সে ক্রয় বৈধ হবে এবং গরীবদেরকে যে দান করেছিল তাও জায়েয হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-জামিউস-সাগীর' গ্রন্থে বলেন, কেউ যদি অন্যের গোলাম জবরদখল করে এবং তারপর অন্য কাউকে আদেশ করে যে, সে যেন তার পক্ষ হতে মালিকের কাছ থেকে গোলামটি ক্রয় করে, আর সে অনুযায়ী সেই লোক গোলামটি ক্রয় করে, তবে সে ক্রয় সহীহ হবে এবং ক্রয় দ্বারাই গোলামটিতে আদেশদাতার কবজা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এমনিভাবে তৃতীয় কোন লোক যদি তার পক্ষ হতে জবরদখলকারীকে ক্রয় করতে আদেশ করে এবং সে মতে জবরদখলকারী মালিকের কাছ থেকে গোলামটি ক্রয় করে, তবে সে ক্রয় সহীহ হবে এবং ক্রয় দ্বারাই আদেশদাতার কবজা প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে ইবন সামাআ (র) বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি অন্যের গোলাম জবরদখল করে এবং তারপর অন্য কারও কাছে সেটি বিক্রি করে দেয় এবং সমর্পণও করে, তারপর জবরদখলকারী কোন কিছু বিনিময়ে মালিকের সঙ্গে আপোষ রফা করে, তবে সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে আপোষ রফা করেছে কিসের বিনিময়ে? যদি অর্থ তথা দিরহাম-দীনারের বিনিময়ে করে, তবে জবরদখলকারীর বিক্রি জায়েয হবে। আর যদি কোন মালামালের বিনিময়ে করে তবে সেটা একটা নতুন বেচাকেনার মত। এর ফলে প্রথম বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাহীরিয়া)।

২৬. মাসআলা : যদি সে গোলামকে আযাদ করে দেয় এবং তারপর জরিমানাস্বরূপ তার মূল্য পরিশোধ করে তবে সে আযাদস্বরূপ সহীহ হবে না (মুখতারুল-ফাতওয়া)।

২৭. মাসআলা : জবরদখলকারীর কাছ থেকে যে ব্যক্তি গোলামটি কিনেছিল, সে যদি কেনার পর আযাদ করে দেয় এবং তারপর মালিক বিক্রি অনুমোদন করে, তবে কিয়াস অনুযায়ী আযাদী কার্যকর হবে না। এটাই ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। কিন্তু ইস্তিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) অনুযায়ী আযাদী কার্যকর হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র) সে মতই পোষণ করেন।

জবরদখলকারীর কাছ থেকে খরিদ করার পর ক্রেতা যদি গোলামটি বিক্রি করে দেয়, তারপর মালিক প্রথম বিক্রি অনুমোদন করে, তবে ক্রেতার বিক্রি কার্যকর হবে না। এতে কোন মতভেদ নেই।

জবরদখলকারী যদি দখলীকৃত বস্তু কারও কাছে বিক্রি করে, তারপর সেই ক্রেতা অন্য কারও কাছে বিক্রি করে এবং এভাবে তাতে হাতবদল হতে থাকে, অবশেষে মালিক কোনও একটি বিক্রি অনুমোদন করে তবে জবরদখলকারীর বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে।

এক ব্যক্তি একটি গোলাম জবরদখল করল এবং সেটি বিক্রি করে দিল, তারপর সেই ক্রেতা অন্য কারও কাছে বিক্রি করল, তারপর মালিক জবরদখলকারীর কাছ থেকে জরিমানা আদায় করল। এ ক্ষেত্রে জবরদখলকারীর বিক্রি বৈধ হবে এবং তার কাছ থেকে যে কিনেছিল তার বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (আল-ফুসুল-ইমাদিয়া)।

২৮. মাসআলা : ক্রেতার কাছে থাকাকালে যদি দখলীকৃত গোলামের হাত কাটা যায় এবং ক্রেতা তার ক্ষতিপূরণ (দিয়াত) আদায় করে নেয় এবং তারপর মালিক বিক্রি অনুমোদন করে তবে ক্ষতিপূরণের অর্থ ক্রেতার হক হয়ে যাবে। তার পরিমাণটা যদি গোলামের মূল্যের অর্ধেকের বেশী হয় তবে বেশীটুকু সাদাকা করতে থাকে।

যদি গোলাম মারা যায় বা নিহত হয় এবং তারপর মালিক বিক্রি অনুমোদন করে, তবে তার সে অনুমোদন সহীহ হবে না।

যদি ক্রেতা গোলামকে আযাদ করার পর তার হাত কাটা যায়, তারপর মালিক বিক্রি অনুমোদন করে, তবে ক্ষতিপূরণের অর্থ গোলাম পাবে (আত-তাতার খানিয়া)।

২৯. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে হিশাম (র) বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কারও গোলাম জবরদখল করার পর বিক্রি করে দেয় তারপর যার কাছ থেকে দখল করেছিল, সে এসে বিক্রি অনুমোদন করে, তবে লক্ষ্য করতে হবে তার গোলামকে ছাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল কিনা। যদি ছাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তবে তার অনুমোদন বৈধ অন্যথায় বৈধ নয়। জবরদখল করেছিল রায় নামক স্থানে এবং গোলাম এখন রয়েছে কুফায় আর দখলকারী ও মালিক উভয়ে আছে রায়-এ, এ অবস্থায় মালিকের বিক্রি অনুমোদন করা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বৈধ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যদি জানা থাকে যে, গোলামটি জীবিত আছে, তবে তার অনুমোদন বৈধ আর যদি জানা না থাকে সে জীবিত, না মৃত তা হলে অনুমোদন বাতিল সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এ মত প্রকাশ করেছেন পরবর্তীকালে (আয-যাহীরিয়া)।

৩০. মাসআলা : মালিক যদি জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং তার পক্ষে রায় দেওয়া হয়, তারপর সে বিক্রি অনুমোদন করে, তবে যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী অনুমোদন সহীহ হবে।

যদি দখলীকৃত গোলাম কোথায় আছে তা জানা না থাকে, যেমন সে হয়ত পালিয়ে গেছে, আর এ অবস্থায় মালিক বিক্রি অনুমোদন করে, তবে যাহিরী রিওয়ায়াত অনুসারে অনুমোদন সহীহ হবে। অনুমোদনের আগে যা কিছু অর্জিত হবে, যেমন গোলামের উপার্জন, ক্রীতদাসী হলে তার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান, কেউ তার অঙ্গহানি ঘটালে তার দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) ইত্যাদি তা ক্রেতা লাভ করবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩১. মাসআলা : আল-জামিউস-সাগীর গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির ক্রীতদাসী এবং আরেক ব্যক্তি একই মনিবের একটি গোলাম জবরদখল করল, তারপর জবরদখলকারী ব্যক্তিদ্বয় ক্রীতদাসীর বিনিময়ে গোলামের বেচাকেনা করল এবং উভয়ে তা কবজাও করল, তারপর মনিবের তা জানতে পেরে তাদের বেচাকেনা অনুমোদন করল। এক্ষেত্রে অনুমোদন কার্যকর হবে না। তাদের বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে গোলাম ও ক্রীতদাসীর মালিক যদি দুজন হত এবং তারা বেচাকেনার খবর পেয়ে তা অনুমোদন করত, তবে বিক্রি জায়েয হয়ে যেত এবং বাঁদীটি হয়ে যেত গোলামের জবরদখলকারীর আর গোলামটি বাঁদীর জবরদখলকারীর। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি গোলামের জবরদখল করেছিল তার গোলামের মূল্য এবং যে ব্যক্তি বাঁদী জবরদখল করেছিল তার বাঁদীর মূল্য গোলাম ও বাঁদীর মনিবকে প্রদান করতে হবে (আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা : যদি একই ব্যক্তি হতে একজন দীনার ও অন্যজন দিরহাম জোরপূর্বক নিয়ে যায়, তারপর তার দীনারের বদলে দিরহাম বেচাকেনা করে এবং কবজা করার পর আলাদা হয়ে যায়, তারপর মালিক তা অনুমোদন করে, তবে তা জায়েয হবে। তাদের প্রত্যেকে যা হিনতাই করেছে মালিককে তার অনুরূপ তাদের পরিশোধ করতে হবে। মালিক অনুমোদন না করলে তাদের বেচাকেনা বাতিল হয়ে যাবে। ফুলূস (পয়সা)-এর হুকুম দিরহাম ও দীনারের অনুরূপ।

একই মালিক থেকে একজন যদি দিরহাম ছিনতাই করে এবং অপরজন বাঁদী তারপর তারা বাঁদীর বদলে দিরহামের বিনিময় করে, তবে মালিক অনুমোদন করলে সে বিক্রি জায়েয হবে। বাঁদীর ছিনতাইকারী যদি দিরহাম কবজা করে এবং তারপর মালিক অনুমোদন করে, তবে এ বাঁদীর ছিনতাইকারী যদি দিরহাম কবজা করে হারিয়ে গেলে আমানত হারিয়েছে বলে গণ্য হবে, তবে বাঁদীর অবস্থায় তার হাতে দিরহামগুলো হারিয়ে গেলে আমানত হারিয়েছে বলে গণ্য হবে, তবে বাঁদীর ক্রেতাকে সেই পরিমাণ দিরহাম জরিমানাস্বরূপ পরিশোধ করতে হবে, যা সে ছিনতাই করেছিল। বাঁদীর ছিনতাইকারী দিরহাম কবজা করার আগে যদি মালিক বিক্রি অনুমোদন করে এবং তারপর সে দিরহাম কবজা করে আর তার হাতে তা হারিয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মালিক যার উপর ইচ্ছা জরিমানা আরোপ করতে পারে। যদি ক্রেতার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে, তবে সে বিক্রেতার কাছে তা ফেরত চাইতে পারবে না আর যদি বিক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে তবে সে অনুরূপ পরিমাণ ক্রেতার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারবে এবং তখন সে তার মালিক হয়ে যাবে। ক্রেতা তা পরিশোধ করলে সে যা কবজা করেছিল তা তার জন্য হালাল হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩৩. মাসআলা : পলাতক গোলাম বিক্রি করা জায়েয নয়। যদি বিক্রি করে এবং তারপর গোলাম ফিরে আসে আর সে তখন ক্রেতার হাতে তাকে সমর্পণ করে, তাহলে জায়েয হয়ে যাবে কিনা? ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তখন সে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে। ইমাম কারখী (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন। আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের অনেকেই এই মত পোষণ করেন। কাযী আল-ইসবীজাবী (র) তার ভাষ্যগ্রন্থে এরূপই উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষ্যগ্রন্থে আছে, পলাতক গোলাম যদি ফিরে আসে এবং বিক্রেতা তাকে ক্রেতার কাছে সমর্পণ করে, তবে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে। বিক্রেতা তাকে সমর্পণ করতে অথবা ক্রেতা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাকে তা করতে বাধ্য করা যাবে। এ ক্ষেত্রে বিক্রি নবায়ন জরুরী নয়, তবে ক্রেতা যদি বিষয়টা কাযীর আদালতে পেশ করে এবং বিক্রেতার পক্ষ হতে গোলাম সমর্পণের দাবী জানায়, কিন্তু কাযীর কাছে প্রমাণিত হয় যে, বিক্রেতা সমর্পণ করতে অক্ষম যদ্বন্ধন কাযী তাদের বেচাকেনা নাকচ করে দিয়েছে, তারপর গোলাম যদি ফিরে আসে তখন নতুনভাবে বেচাকেনার দরকার হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে ভিন্ন একটি মতও বর্ণিত আছে। সে অনুযায়ী এরূপ বিক্রি বৈধ নয়; বরং নতুন বেচাকেনা অপরিহার্য। আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের এক শ্রেণী এ মত গ্রহণ করেছেন এবং আবু আবদুল্লাহ বালখী (র) এ হিসেবেই ফাতওয়া দিতেন। শায়খুল ইসলাম (র) 'কিতাবুল বুয়ূ'-এর ভাষ্যে 'ফাসিদ বেচাকেনা' অধ্যায়ে এরূপ উল্লেখ করেছেন (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা : ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এ মতই সঠিক। প্রথমোক্ত বর্ণনায় ব্যাখ্যায় তারা বলেন, ঐ দ্বারা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, গোলাম ফিরে আসার পর তারা দুজন বেচাকেনার রাযী হয়ে যাবে (আর এটাই তো নতুন বিক্রি) (আল-গিয়াহিয়া)।

৩৫. মাসআলা : কেউ যদি পলাতক গোলামের মনীবের কাছে এসে বলে, তোমার পলাতক গোলামটি আমার কাছে আছে। আমি তাকে পাকড়াও করেছি। তুমি গোলামটি আমার কাছে বিক্রি কর। এই বিক্রি জায়েয হবে (আয-যাখীরা)।

৩৬. মাসআলা : উপরিউক্ত বিক্রি জায়েয সাব্যস্ত হওয়ার পর কথা এই যে, লোকটি যদি এই মর্মে সাক্ষী রেখে থাকে যে, সে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই তাকে পাকড়াও করেছি, তবে কেবল কেনার দ্বারাই তার কবজা প্রতিষ্ঠিত হবে না। কাজেই গোলামটি মালিকের কাছে হস্তান্তর করার আগে হারিয়ে গেলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তখন বিক্রেতার কাছ থেকে সে মূল্য ফেরত পাবে। আর যদি সাক্ষী না রেখে থাকে, তবে কেনার দ্বারাই কবজা প্রতিষ্ঠিত হবে (ফাতহুল-কাদীর)।

৩৭. মাসআলা : যদি বলে, গোলামটি অমুকের কাছে আছে, সে তাকে রেখে দিয়েছে, আমার কাছে তাকে বিক্রি কর, এখন মালিক তার কথা বিশ্বাস করে যদি তার কাছে বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে না। অবশ্য এ বিক্রি (বাতিল নয় বরং) ফাসিদ, কাজেই ক্রেতা কবজা করলে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে (আল-বাহরুর রাযিক)।

৩৮. মাসআলা : কেউ যদি গোলাম কেনে এবং কবজার পূর্বে সেটি পালিয়ে যায় তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে বিক্রি রহিত করতে পারবে। পলাতক গোলাম ফিরে না আসা পর্যন্ত ক্রেতার কাছে বিক্রেতা মূল্য দাবী করতে পারবে না (আয-যাখীরা)।

৩৯. মাসআলা : পলাতক গোলামকে নিজের নাবালক পুত্রের কাছে বিক্রি করা জায়েয নয়। যদি তাকে বা নিজের প্রতিপালনাধীন ইয়াতীমকে সে গোলাম দান করে, তবে তা জায়েয হবে। যদি জানা থাকে যে, পলাতক গোলামটি জীবিত আছে এবং এটাও জানা থাকে যে, সে কোথায় আছে, তবে কাফ্ফারা আদায়ার্থে তাকে আযাদ করা জায়েয (আন-নিহায়া)।

৪০. মাসআলা : অপহরণকারীর কাছ থেকে যদি অপহৃত গোলাম পালিয়ে যায়, তারপর তার পলাতক অবস্থায় মালিক তাকে অপহরণকারীর কাছে বিক্রি করে তবে সে বিক্রি জায়েয (আয-যাখীরা)।

৪১. মাসআলা : খারাজী ভূমি বিক্রি জায়েয। এর দ্বারা নগরের বাইরের খারাজী জমি বুঝানো হয়েছে। এমনিভাবে জায়গীরের জমিও বিক্রি জায়েয। জায়গীর বলতে এমন জমিকে বুঝানো হয়, যা সরকার বিশেষভাবে কাউকে বা কোনও সম্প্রদায়কে দান করে (আল-হাবী)।

৪২. মাসআলা : ইখারা ও ইকারা ভূমি বিক্রি প্রসঙ্গ : ইখারা হচ্ছে এমন পতিত ভূমি, যা তার মালিকের অনুমতিক্রমে কোন লোক দখলে নেয় এবং তাতে চাষাবাদ করে।

ইকারা হচ্ছে এমন জমি যা চাষীদের হাতে থাকে। এ উভয় প্রকার জমি তার প্রকৃত মালিক বিক্রি করলে তা জায়েয। কিন্তু যারা এ সব জমি চাষাবাদ করে তারা যদি বিক্রি করে তবে তা জায়েয নয়।

বর্গাচাষের চুক্তিতে কারও হাতে জমি থাকলে সে জমি যদি মালিক বিক্রি করে, তবে তার হুকুম সম্পর্কে শামসুল আইম্মা : আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, বর্গার মেয়াদের ভেতর সে জমিতে বর্গাচাষীরই অধাধিকার, তাতে বীজ মালিক দিক বা চাষী। বর্গাচাষী যদি বিক্রি অনুমোদন করে, তবে সে তার শ্রমের কোন বদলা পাবে না।

‘মাজমুউন-নাওয়াযিল’ গ্রন্থে আছে, বর্গাচাষী যদি বিক্রি অনুমোদন করে, তবে মালিক ও চাষী উভয়ের অংশই ক্রেতার হয়ে যাবে এতদ্বারা জমিতে ফসল থাকলে সেই অবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে।

বর্গাচাষী অনুমোদন না করলে বিক্রি জায়েয হবে না। আস্তুর বাগানেরও একই হুকুম, তাতে বাগানে ফল থাকুক আর নাই থাকুক।

কেউ বলেন, জমির ক্ষেত্রে মাসআলায় অবস্থাভেদে পার্থক্য আছে। চাষীর পক্ষ হতে বীজ দেওয়া হলে তার অংশে বিক্রি জায়েয হবে না। আর যদি মালিক দেয় এবং জমিতে তা বপন করা হয়ে যায়, তবে তখনও বিক্রি জায়েয নয়। আর যদি জমি খালি থাকে তবে বিক্রি জায়েয।

এমনিভাবে আস্তুর বাগানে ফল না আসলে বিক্রি জায়েয। জাহীরুদ্দীন (র) এ মত অনুসারেই ফাতওয়া দিতেন (আল-মুহীত)

৪৩. মাসআলা : চাষী যদি জমিতে এখনও বীজ না লাগায়, কেবল কর্ষণ করে ও নালা কাটে, তবে যাহেরী রিওয়াযাত অনুযায়ী তাতে বিক্রি কার্যকর হবে। এমতই বিশুদ্ধতর।

আস্তুর বাগান বিক্রি করলে বর্গাচাষীর অংশে বিক্রি কার্যকর হবে না, তাতে সে আস্তুর বাগানে কোন রকমের মেহনত করুক বা নাই করুক (আল-ফুসূলুল-ইমাদিয়া)।

৪৪. মাসআলা : যদি একটি গ্রাম কেনে এবং তা হতে মসজিদ ও কবরস্থানকে ব্যতিক্রম না রাখে তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। এটা সেই অবস্থায়, যখন মসজিদ আবাদ থাকে। যদি তার আশ-পাশ বিরান হয়ে যায় এবং সে মসজিদের কোন প্রয়োজন মানুষের না থাকে, তবে বিক্রি ফাসিদ হবে না।

যদি কেউ জমি কেনে এবং তার এক অংশ ওয়াক্ফভূমি হয়, তবে মসজিদের মতই সে বিক্রি জায়েয হবে না। শামসুল আইম্মা : আল-হালাওয়ানী (র) ও শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী (র) এ মাসআলা উল্লেখ করেছেন। রুকনুল ইসলাম আলী আস-সুগদী (র) বলেন, এ বিক্রি জায়েয। আত্-তাফরীদ (র) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত ইমামদ্বয় পরবর্তীতে নিজেদের মত পরিত্যাগ করত রুকনুল ইসলাম (র)-এর মত গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং এ মতই গ্রহণযোগ্য।

কেউ যদি মালিকানাধীন জমি ওয়াক্ফ জমির সাথে মিলিয়ে বিক্রি করে এবং এটা মালিকানাধীন জমির মূল্য আলাদা না বলে তবে বিশুদ্ধতর মত অনুসারে সে বিক্রি জায়েয।

কেউ যদি কাঁচাও মালিকানাধীন জমি কেনে এবং তার ভেতর জনসাধারণের চলার পথ থাকে, তাতে বিক্রি ফাসিদ হবে না, তবে পথটা একটা দোষ বটে।

‘আল-মুনতাকা’ গ্রন্থে আছে, পথের যদি সীমা নির্দিষ্ট না থাকে এবং তার পরিমাণও জানা না থাকে তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি একটা গ্রাম বিক্রি করে ফেলে এবং তাতে মসজিদ থাকে, যাকে সে বিক্রি হতে বাদ রাখে, তবে সে ক্ষেত্রে মসজিদের সীমানা উল্লেখ করা

কি শর্ত? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। সঠিক মত হচ্ছে যে, সেটা শর্ত নয় এবং এরই উপর ফাতওয়া।

পুকুর ও জনপথ বাদ রাখার ব্যাপারে একই কথা। কবরস্থান থাকলে তার সীমানা উল্লেখ করা জরুরী, তবে অন্য জমি হতে তা যদি উঁচু হয়, তাহলে ভিন্ন কথা (মুখতারুল-ফাতওয়া)।

৪৫. মাসআলা : কোনও মালিকানাধীন কোন পাহাড়ে গন্ধক থাকলে তা উত্তোলন করে বিক্রি করা যায়। পাথর নিয়েও বিক্রি করা যায় ঐ পাহাড়ের গাছ থাকে সেখান থেকে ফল আহরণ করেও বিক্রি করা যায়। লবণের ক্ষেত্রেও একই মাসআলা। তবে পাহাড় মালিকানাধীন থাকলে কোনও কিছুই বিক্রি করা জায়েয হবে না (আত-তাতার খানিয়া)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : জীব-জন্তু বিক্রি প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : নদী বা জলাশয়ে থাকা অবস্থায় মাছ বিক্রি জায়েয নয়। তবে যদি তার সাথে সংযুক্ত হাউয ইত্যাদি থাকে এবং সেটি মাছের জন্যই তৈরি করা হয় আর তাতে মাছ প্রবেশ করে, তাহলে সে মাছে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্য কারও জন্য তা ধরা জায়েয নয়। তারপর সে মাছ যদি কোনরূপ শিকার সামগ্রী ছাড়াই ধরা যায়, তবে তা বিক্রি জায়েয আর যদি শিকার সামগ্রী ছাড়া ধরা না যায়, তবে (ধরার আগে) বিক্রি জায়েয নয়। আর সে যদি মাছের জন্য প্রস্তুত করা না হয়, তবে তাতে যে মাছ প্রবেশ করবে তাতে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না। সুতরাং তা বিক্রিও জায়েয হবে না। হাঁ, মাছ প্রবেশের পর সে হাউযের মুখ বন্ধ করে ফেললে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তখন দেখতে হবে বিনা উপকরণে তা ধরা যায় কিনা। ধরা গেলে বিক্রি জায়েয হবে- অন্যথায় জায়েয হবে না।

যদি সে হাউয মাছের জন্য তৈরি করা না হয়, সে ক্ষেত্রে যদি মাছ ধরে তাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তাতে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর বিনা উপকরণে ধরা সম্ভব হলে তা বিক্রি জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয নয় (ফাতহুল-কাদীর)।

২. মাসআলা : যে সব অবস্থায় পানির ভেতর মাছ বিক্রি জায়েয, তাতে ক্রেতা মাছ কবজা করার পর যখন দেখবে, তখন তার ইখতিয়ার লাভ হবে।

কেউ মাছ ধরার পর কোন কুয়ায় ছাড়লে, সে ক্ষেত্রে উপরিউক্ত হাউযের নিয়মাবলী প্রযোজ্য (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : বড় খালের ভেতর মাছ বিক্রি কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়, যদিও বিক্রির পর তা ক্রেতাকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এমনিভাবে কোন মাছে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সে মাছ যদি হাত থেকে ছুটে খালে পড়ে যায়, তখনও তা বিক্রি জায়েয নয়, অবশ্য এ অবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা বিক্রি প্রত্যাহার করার আগেই যদি বিক্রেতা সে মাছ সমর্পণ করতে সক্ষম হয়, তবে জায়েয হয়ে যাবে। তখন ক্রেতার দর্শনজনিত ইখতিয়ার লাভ হবে। এর আগে সে দেখুক বা নাই দেখুক। এটা ইমাম আবুল হাসান আল-কারখী (র)-এর মত।

বালার ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, সমর্পণে সক্ষম হলেও সে মাছ বিক্রি জায়েয নয় (আল-ইয়ানাবী)।

৪. মাসআলা : হাউয়ের ভেতর যদি 'দল' (ঘাস বিশেষ) ও মাছ থাকে এবং একই সঙ্গে দল ও মাছ বিক্রি করে, আর উপকরণ ছাড়া মাছ ধরা সম্ভব না হয় তবে উভয়ের মধ্যেই বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে, তা ইতোপূর্বে মাছ শিকার করুক আর নাই করুক। যদি উপকরণ ছাড়াই সে মাছ ধরা সম্ভব হয়, কিন্তু ইতোপূর্বে শিকার করা হয় নি, তবুও মাছের ক্ষেত্রে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। দলের বিক্রি ফাসিদ হবে কিনা, এ ব্যাপারে দ্বিবিধ মত পাওয়া যায়। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী দলের ক্ষেত্রেও বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে ফাসিদ হবে না। কিন্তু শিষ্যদ্বয়ের মতানুসারে সঠিক সিদ্ধান্ত এটাই যে, 'দলের' ক্ষেত্রেও বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। ইতোপূর্বে হাউয়ের মাছ শিকার করে থাকলে তাদের সকলের মতেই বিক্রি জায়েয (আয-যাখীরা)।

৫. মাসআলা : কবুতরের সংখ্যা জানা থাকলে এবং তা হস্তান্তর করা সম্ভব হলে বিক্রি জায়েয।

কবুতর যদি খোপের ভেতর থাকে এবং তার দরজা বন্ধ থাকে তবে তার বিক্রি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। যদি উড়ন্ত অবস্থায় থাকে এবং খুপরিতে ফিরে আসে বলে জানা থাকে তখনও তা বিক্রি জায়েয (ফাতহুল-কাদীর)।

৬. মাসআলা : কেউ যদি খুপরিসহ কবুতর বিক্রি করতে চায়, তবে রাতে বিক্রি করলেও তা জায়েয হবে। 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি পানিতে পাখি বা মাছ বিক্রি করে এবং তা পানি থেকে তীরে ফিরে আসতে অভ্যস্ত থাকে কিংবা শূন্যে উড়ন্ত পাখি বিক্রি করে, যা ফিরে আসে বলে জানা থাকে, তবে সে বিক্রি জায়েয। সুতরাং তা ফিরে আসার পর সমর্পণ করবে।

পোষ মানা হরিণ যদি ফিরে আসতে অভ্যস্ত থাকে তবে তা বিক্রি জায়েয। পোষ মানার পর আবার বন্য হয়ে গেলে এবং বিনা ফাঁদে ধরা সম্ভব না হলে তা বিক্রি জায়েয নয় (যখীরা)।

৭. মাসআলা : অবাধ্য ঘোড়া যদি বিনা ফাঁদে ধরা না যায় তবে তা বিক্রি করা জায়েয নয় (আস-সিরাজিয়া)।

৮. মাসআলা : সংরক্ষিত মৌমাছি বিক্রি জায়েয নয়। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মত। তবে মৌচাকের ভেতর যদি মধু থাকে এবং তার ভেতরে থাকা মৌমাছিসহ চাক ক্রয় করে, সেটা জায়েয। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সংরক্ষিত আকারে মৌমাছি বিক্রি জায়েয (আল-হাবী)।

৯. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মৌমাছি বিক্রি জায়েয। এই উপর ফাতওয়া (আল-গিয়াছিয়া)।

১০. মাসআলা : আবুল লাইস (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে জৌক (العلق) বিক্রি জায়েয। সাদরুশ শহীদ (র) এ মতকেই গ্রহণ করেছেন (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : (চিকিৎসা উদ্দেশ্যে) জৌক লাগানোর জন্য যদি কোন লোক ভাড়া করে, তাও সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয (আল-খুলাসা)।

১২. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে রেশমের বীজ বিক্রি জায়েয। এরই উপর ফাতওয়া। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে রেশমের পোকা বিক্রিও জায়েয এবং তার মতেরই উপরই ফাতওয়া (আল-ওয়াকিআত)।

১৩. মাসআলা : ভূমিজ কীট-পতঙ্গ, যেমন সাপ, বিচ্ছু, টিকটিকি প্রভৃতি বিক্রি করা জায়েয নয়। মাছ ছাড়া অন্য কোন জলজ প্রাণী, যেমন ব্যাঙ, কাঁকড়া প্রভৃতি বিক্রি জায়েয নয়। এমনভাবে তার চামড়া বা হাড় ক্রোন কাজে লাগানোও বৈধ নয় (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : 'আন-নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে, সাপ যদি ঔষধের কাজে লাগে, তবে তা বিক্রি জায়েয, অন্যথায় জায়েয নয়। সঠিক কথা হচ্ছে যে, কাজে লাগানো যায় এমন যে কোন বস্তু বিক্রি করা জায়েয (আত-তাতার খানিয়া)।

১৫. মাসআলা : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বিক্রি আমাদের মাযহাবে জায়েয। এমনভাবে বিভ্রাল এবং হিংস্র পশু-পক্ষী বিক্রি করা আমাদের মাযহাবে বৈধ, তা প্রশিক্ষণ দেওয়া হোক বা নাই হোক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা : সাধারণ কুকুর যদি প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপযুক্ত হয় তবে বিক্রি করা জায়েয, অন্যথায় জায়েয নয়। এটাই সঠিক (জাওয়াহিরুল-আখলাতী)।

১৭. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সিংহের ক্ষেত্রেও আমাদের কথা এই যে, তা যদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্য হয় এবং তা দিয়ে শিকার করা যায়, তবে বিক্রি করা জায়েয। চিতা বাঘ ও বাজপাখি সর্বাবস্থায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কাজেই, তা সর্বাবস্থায় বিক্রি জায়েয (আয-যাখীরা)।

১৮. মাসআলা : 'ফাতওয়া আল-আত্তাবিয়া' গ্রন্থে আছে, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে না এমন ছোট চিতা বাঘ বিক্রি করা জায়েয। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, চিতা বাঘ ছোট হোক, বড় হোক মাসআলা একই (আত-তাতার খানিয়া)।

১৯. মাসআলা : হাতি বিক্রি জায়েয। বানর সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র) হতে দুই রকম বর্ণনা আছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী জায়েয এবং এটাই সঠিক (মুহীত : আস-সারাকসী)।

২০. মাসআলা : শূকর ছাড়া সর্বপ্রকার জীব-জন্তু বিক্রি করা জায়েয। এটাই সঠিক (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

২১. মাসআলা : মক্কা মুকাররামায় অবস্থিত ঘর-বাড়ির, দালান-কোঠা ও গৃহ-সামগ্রী বিক্রি জায়েয, কিন্তু তার জমি বিক্রি জায়েয নয় (আল-হাবী)।

২২. মাসআলা : বাগদাদের সুলতানের ঘর-বাড়ি ও দোকান-পাট বিক্রি জায়েয নয় এবং তাতে গুফআর নেই (আল-তাহযীব)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : মুহরিম কর্তৃক শিকার বিক্রি এবং নিষিদ্ধ বস্তু সামগ্রী বিক্রি প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : মুহরিম কর্তৃক শিকার বিক্রি জায়েয নয়। এমনভাবে হারাম শরীফের শিকার বিক্রিও অবৈধ (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : হারাম শরীফের শিকার, মুহরিম ব্যক্তি বিক্রি করুক বা হালাল ব্যক্তি, কোন অবস্থায়ই জায়েয নয় (আস-সিরাজিয়া)।

৩. মাসআলা : 'হিল্ল' (হারাম শরীফের বাইরের এলাকা)-এর কোন শিকার যদি হারাম শরীফের ভেতরে এমন দুই ব্যক্তি বেচাকেনা করে, যারা ইহরাম অবস্থায় নয়, অর্থাৎ হালাল, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা জায়েয, অবশ্য সেটা সমর্পণ করতে হবে হারাম শরীফ থেকে বের হয়ে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিক্রিই জায়েয নয় (মুহীত : আস-সারাক্ষী)।

৪. মাসআলা : ইহরাম অবস্থায় যদি কারো হাতে অন্য কারো শিকার থাকে আর সে হালাল ব্যক্তি হয় তবে তার শিকার বিক্রি করতে পারে যার হাতে আছে তাকে তা সমর্পণ করতে হবে। যদি তার হাতে সেটি মারা যায়, তবে তাকে (বিধিমত) বদলা দিতে হবে। মুহরিম ব্যক্তি শিকার বিক্রির জন্য কোন হালাল ব্যক্তিকে উকীল বানায় এবং সে তা বিক্রি করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে বিক্রি জায়েয। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, সে বিক্রি বাতিল (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা : হালাল ব্যক্তি যদি মুহরিমকে শিকার বিক্রি বা ক্রয়ের উকীল বানায়, তবে তা জায়েয নয়। কেউ যদি কাউকে শিকার বিক্রির উকীল বানায়, তারপর আদেশদাতা ইহরাম বাঁধে এবং উকীল সেটি বিক্রি করে তবে বিক্রি জায়েয এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে বিক্রি বাতিল (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা : হালাল ব্যক্তি যদি অপর হালাল ব্যক্তি হতে কোন শিকার কেনে, কিন্তু তখন কবজা না করে এবং এ অবস্থায় তাদের একজন ইহরাম বাঁধে, তবে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা : মাজুসী, মুরতাদ এবং যাদের কোন আসমানী কিতাব নেই, এমন সম্প্রদায়ের লোক কোন পশু যবাহু করলে তা বিক্রি করা জায়েয নয়। এমনভাবে যে পশু যবাহুকালে ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ বলা হয় নি তাও বিক্রি করা বৈধ নয় (আয-যখীরা)।

৮. মাসআলা : 'আত-তাজরীদ' গ্রন্থে আছে, এমনভাবে অবুঝ শিশু ও উন্মাদ ব্যক্তি যবাহু করলে তাও বিক্রি করা জায়েয নয় (আত-তাতার খানিয়া)।

৯. মাসআলা : মুহরিম ব্যক্তি যা যবাহু করে কিংবা হালাল ব্যক্তি হারাম শরীফের যে শিকার যবাহু করে তা বিক্রি করা জায়েয নয় (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা : আহলে কিতাব (যারা আসমানী কিতাবের অনুসারী) এর যবাহুকৃত পশু বিক্রি করা জায়েয (আল-মুহীত)।

১১. মাসআলা : কাফিররা নিজেদের মাঝে মৃতপশু বেচাকেনা করতে পারে। শ্বাসরোধ করে বা পিটিয়ে হত্যা করা যদি তাদের ধর্মে যবাহু বলে গণ্য হয়, তবে তাদের মধ্যে তার বেচাকেনা বৈধ (আল-ওয়াকিআত)।

১২. মাসআলা : দুই যিম্মী (মুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিক) যদি আপসের মধ্যে মদ বা শূকর বেচাকেনা করে, তারপর তা কবজার আগে তারা উভয়ে বা তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে, অর্থাৎ সে বিক্রি প্রত্যাহার করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তারা তা কবজা করার পর ইসলাম গ্রহণ করলে বিক্রি বৈধ হবে, মূল্য কবজা করা হোক বা না হোক (আল-হাবী)।

১৩. মাসআলা : যিম্মী কোন মুসলিম গোলাম কিনলে তা জায়েয, তবে তাকে সে গোলাম বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে, তাতে সে বিক্রেতা সাবালক হোক বা নাবালোক (আত-তাতার খানিয়া : আত তাজনীসের বরাতে)।

১৪. মাসআলা : এক কাফির যদি অন্য কাফিরের কাছ থেকে ফাসিদ পদ্ধতিতে কোন মুসলিম গোলাম ক্রয় করে, তবে তাকে সে গোলাম ফেরত দিতে বাধ্য করা হবে, তারপর বিক্রেতাকে বাধ্য করা হবে, সে যেন গোলামটি বিক্রি করে দেয়। যিম্মী যদি মুসলিম গোলামকে আযাদ করে দেয় অথবা মুদাব্বার বানায়, তবে তা জায়েয। আর মুদাব্বার উপার্জন করে মুক্তি লাভের চেষ্টা করবে। তদ্রূপ যদি মুসলিম দাসী হয় এবং যিম্মী তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে তখনও তাকে বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে এবং প্রয়োজনে তাকে প্রহার করা যাবে। যদি সে দাসীর সঙ্গে কিতাবাত চুক্তি করে তবে তা বৈধ হবে এবং সে চুক্তি আর বাতিল হবে না।

যিম্মী যদি কুরআন মাজীদের কোন কপি কেনে বা কোন মুসলিম গোলামের অংশ বিশেষের মালিক হয়, তখনও তাকে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে। অংশ বিশেষের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গের হকুমই প্রযোজ্য।

ক্রেতা-বিক্রেতার একজন মুসলিম ও অন্যজন যিম্মী হলে তারা কেবল সেই সব বস্তুই বেচাকেনা করতে পারবে, যা দুইজন মুসলিম করতে পারবে, অন্য কিছু বেচাকেনা তাদের জন্য জায়েয নয়।

কোন মুসলিম যদি কোন যিম্মীকে মদ বেচাকেনার জন্য উকীল বানায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা জায়েয, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয নয়।

খৃষ্টান ইয়াতীমদের কোন গোলাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাকে বিক্রি করা জন্য তাদেরকে বাধ্য করা যাবে। তাদের কোন ওয়াসী (দ্রোষ্টি) থাকলে সে-ই তাকে বিক্রি করবে।

ওয়াসী না থাকলে কাযী তাদের জন্য একজন ওয়াসী নিযুক্ত করবে এবং সে তাদের পক্ষ হতে তাকে বিক্রি করবে।

কোন মুসলিম যদি কোন কাফিরকে মুসলিম গোলাম উপহার দেয় বা তাকে সাদাকা হিসাবে তার হাতে অর্পণ করে তবে তা জায়েয। তারপর ঐ কাফিরকে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে (আল-হাবী)।

১৫. মাসআলা : 'আল উয়ুন' গ্রন্থে আছে, হাতি ও অন্যান্য মৃত প্রাণীর হাড় বিক্রি জায়েয। মানুষের হাড় বিক্রি জায়েয নয়। এমনিভাবে শূকরের হাড় বিক্রিও নাজায়েয। হাতি ইত্যাদির হাড় বিক্রি জায়েয তখনই, যখন তাতে চর্বি না থাকে। চর্বি থাকলে তা নাপাক বিধায় জায়েয নয়।

'ফাতাওয়ায়ে আহলি সামারকান্দ' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি তার কুকুর যবাহু করে এবং তার গোশত বিক্রি করে তবে তা জায়েয। এমনিভাবে গাধা যবাহু করতঃ তার গোশত বিক্রি করাও জায়েয। বস্তুত এ মাসআলায় ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। আর সে মতভেদের ভিত্তি হচ্ছে এই মূলনীতির উপরে যে, এসব পশু যবাহু করলে এদের গোশত পবিত্র হবে কি না। সাদরুশ শহীদ (র)-এর মত হচ্ছে যে, পবিত্র হয়ে যাবে। শূকর যবাহু করতঃ তার গোশত বিক্রি করা জায়েয নয় (আয-যখীরা)।

১৬. মাসআলা : হিংস্র পশু ও গাধা যবাহু করতঃ গোশত বিক্রি করা জায়েয। এটাই সহীহ রিওয়ায়াত। মৃত হিংস্র পশুর গোশত বিক্রি করা জায়েয নয় (মুহীত : আস-সারখসী)।

১৭. মাসআলা : হিংস্র পশু ও গাধা যবাহু করার পর তার চামড়া বিক্রি করা জায়েয। যদি মৃত হয় কিন্তু তার চামড়া শোধন করা হয় তাহলেও বিক্রি বৈধ। যবাহুকৃত বা দাবাগতকৃত না হলে সে চামড়া বিক্রি বৈধ নয়। এ মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে এই মূলনীতির উপরে যে, মানুষ ও শূকর ছাড়া সমস্ত জীব-জন্তুর চামড়া যবাহু বা দাবাগত দ্বারা পবিত্র হয়ে যায় আর যখন পবিত্র হয়ে যায় তখন তা কাজে লাগানোও জায়েয সুতরাং তা বিক্রিও জায়েয।

মৃত জন্তুর পশম, হাড় ও শিঙা কাজে লাগালে তাতে কোন দোষ নেই এবং এসব জিনিস বিক্রি করাও বৈধ।

মৃত জন্তুর পাঠা (সেই সব শক্ত শিরা যেগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাড়া-চাড়ায় নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে) বিক্রি সম্পর্কে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা অনুযায়ী এগুলো কাজে লাগানো ও বিক্রি করা জায়েয (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা : শূকরের পশম বিক্রি জায়েয নয়। তবে মুচিদের জন্য এগুলো ব্যবহার করার অবকাশ আছে। মানুষের চুল বিক্রি জায়েয নয় এবং কোন কাজে এর ব্যবহারও বৈধ নয়। এটাই সহীহ মত (আল-জামিউস সাগীর)।

১৯. মাসআলা : যদি কারও কাছে নবী (সা)-এর পবিত্র কেশ থাকে এবং সে কাউকে বিনিময় ছাড়া একটি মহান উপহারস্বরূপ দান করে, তবে তাতে কোন দোষ নেই (আস-সিরাজিয়া)।

২০. মাসআলা : স্বাধীন নারীর বা ক্রীতদাসীর কোন অবস্থাই মনুষ্যদুগ্ধ বিক্রি করা জায়েয নয়; পাত্রে করেও নয়। কেউ তা নষ্ট করে ফেললে জরিমানাও দিতে হবে না (আল-কাফী)।

২১. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, ক্রীতদাসীর দুগ্ধ বিক্রি করা জায়েয। এটাই সঠিক (মুখতারুল ফাতওয়া)।

২২. মাসআলা : বীর্যকীট ও গর্ভস্থ জ্ঞপ্তি বিক্রি করা বৈধ নয়। এতদ্বারা ঘাঁড়ের পাল (সঙ্গম) বিক্রির হুকুম বের হয়ে আসে (আল-বাদায়ে)।

২৩. মাসআলা : স্বাধীন মানুষ, মদ, শূকর ও মৃত জন্তু বিক্রি জায়েয নয় (আত তাহযীব)

২৪. মাসআলা : গবাদি পশুর মল বিক্রি করা ও তা কাজে লাগানো জায়েয। মানুষের মল মাটিতে মিশে যাওয়া এবং মাটি তার উপর প্রবল হওয়ার আগ পর্যন্ত তা কাজে লাগানো ও বিক্রি করা জায়েয নয়। মাটিতে মিশে যাওয়ার পর মলের উপর মাটি প্রবল হয়ে গেলে তা কাজে লাগানো ও বিক্রি করা জায়েয (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা : চৌকির গোবর বিক্রি জায়েয নয়। তবে কেউ যদি তা সংগ্রহ করে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে তখন তা বিক্রি করতে পারে (আস-সিরাজিয়া)।

২৬. মাসআলা : কবুতরের পায়খানা বেশী পরিমাণ হলে তা বিক্রি করা বা দান করা জায়েয (আল-কিন্য়া)।

২৭. মাসআলা : হালাল বস্তু যদি হারাম বস্তুর সাথে মিশে যায়, যেমন মদ বা ইঁদুর ঘি বা আটার খামীরের ভেতর পড়ে গেল, তবে হারাম বস্তু যদি হালাল বস্তুর উপর প্রবল না হয়ে ওঠে বা সমান সমান না হয় তবে ক্রেতাকে সে কথা বলে দিয়ে বিক্রি করা যেতে পারে (আস সারখসী : আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা : একরূপ বস্তু খাওয়া জায়েয নয়, তবে অন্য কোন কাজে লাগালে দোষ নেই।

'আল খানিয়া' গ্রন্থে আছে, সিরকা বা তেলের ভেতর এক ফোঁটা রক্ত বা পেশাব পড়ে গেলে তা বিক্রি করা জায়েয নয় (আত-তাতার খানিয়া)।

২৯. মাসআলা : যার ভেতর হারাম বস্তু পড়ে প্রবল হয়ে ওঠে তা বিক্রি করা বা দান করা জায়েয নয়। এমনিভাবে তেলের ভেতর মৃত জন্তুর চর্বি পড়লে যদি তেল প্রবল থাকে তবে তা বিক্রি করা জায়েয। আর চর্বি প্রবল হয়ে গেলে জায়েয নয়। কাজে লাগালে বৈধ হওয়ার অর্থ দেহ ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার করা, দেহে ব্যবহার করা জায়েয নয় (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সারঙ্গী, তবলা, বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বিক্রি করা জায়েয, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আবু মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রি জায়েয নয় এ মাসআলাটি 'আল মাবসূত' গ্রন্থের 'ইজারা' অধ্যায়ে-বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে ভাসা না ভাসার পার্থক্য স্পষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু 'আস সিয়াকুল কাবীর' গ্রন্থে সাহেবাইনের মাযহাবে উপরোক্ত পার্থক্য তুলে

ধরা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এসব বস্তু যদি এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে, যে নিজে এগুলো ব্যবহার করবে না এবং কোন ব্যবহারকারীর কাছে বিক্রিও করবে না, তার কাছে এগুলো না ভেঙ্গেও বিক্রি করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি নিজে ব্যবহার করবে বা কোন ব্যবহারকারীর কাছে বিক্রি করবে, তাহলে না ভেঙ্গে বিক্রি করা জায়েয নয়।

শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, 'আল মাবসূত' গ্রন্থে সাধারণভাবে বলা হয়েছে, তাকে 'আস সিয়াকুল কাবীর' গ্রন্থে বর্ণিত ব্যাখ্যার সংগেই গ্রহণ করতে হবে (আয-যখীরা)।

৩১. মাসআলা : এসব বাদ্যযন্ত্র যদি কেউ নষ্ট করে ফেলে, তবে তা কাযীর আদেশে নষ্ট করলে জরিমানা দিতে হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে যদি কাযীর আদেশ ছাড়াও নষ্ট করে তবুও জরিমানা দিতে হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩২. মাসআলা : এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতের উপরই ফাতওয়া (আত-তাহযীব)।

৩৩. মাসআলা : ক্রেতার জমিতে বিক্রেতার উট যে ঘাস খায় বা তার কুয়া থেকে যে পানি খায় তার বদলে যদি তার কাছে গোলাম বিক্রি করে তবে তা জায়েয। এমনভাবে যদি বিক্রেতা তার গোলাম ক্রেতার কোন একটি বাঁদীর বদলে বিক্রি করে এবং সে বাঁদীটি নির্দিষ্ট না করে তবুও সে বিক্রি জায়েয হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩৪. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, খাম্বর অর্থাৎ আগুরের কাঁচা রস দ্বারা যে মদ তৈরি হয় তা ছাড়া যাবতীয় নিষিদ্ধ পানীয় বিক্রি জায়েয এবং তা কেউ নষ্ট করলে তার উপর জরিমানা আসবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম আবু মুহাম্মাদ (র) কোনও রকমের নিষিদ্ধ পানীয় বিক্রি জায়েয নয় এবং কেউ তা নষ্ট করলে জরিমানাও দিতে হবে না (আল-মুহীত)।

৩৫. মাসআলা : 'আল ফাতাওয়াল আন্তাবিয়া' গ্রন্থে আছে, এমন ব্যক্তির কাছে যদি দ্রাক্ষারস বিক্রি করে, যে তা দিয়ে মদ তৈরি করবে, তবে তা জায়েয আছে। কিন্তু এমন ব্যক্তির কাছে জমি বিক্রি করা যাবে না, যে সেখানে গির্জা প্রতিষ্ঠা করবে (আত-তাতার খানিয়া)।

৩৬. মাসআলা : মুকাতাব (নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে যে গোলামের সাথে আযাদীর চুক্তি হয়েছে), মুদাক্কার (মনিব নিজ মৃত্যুর পর যে গোলামের মুক্তি ঘোষণা করেছে), উম্মু ওয়ালাদ (মনিব যে ক্রীতদাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছে) এবং যে গোলামের আংশিক আযাদী লাভ করেছে, এদের কাউকে বিক্রি করা জায়েয নয় (আল-হাবী)।

৩৭. মাসআলা : কেউ যদি উম্মু ওয়ালাদ বিক্রি করে এবং ক্রেতার হাতে সমর্পণ করে, তবে ক্রেতা তার মালিক হবে না। তদ্রূপ আংশিক মুক্ত গোলামের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। আমাদের মাযহাবে মুদাক্কার সম্পর্কেও মাসআলা একই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৮. মাসআলা : মুকাতাব যদি বিক্রিতে রাযী হয়ে যায়, তবে সে সম্পর্কে বর্ণনা দু'রকমের। সঠিক এটাই যে তখন বিক্রি জায়েয হবে (আল-হিদায়া)।

৩৯. মাসআলা : 'আল মাজমা' গ্রন্থে আছে, মুকাতাবের বিক্রি যখন জায়েয সাব্যস্ত হল, তখন আর তা ফাসিদ হবে না। এটাই সঠিক বর্ণনা এবং অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম এ মতই পোষণ করেন (মুখতারুল ফাতওয়া)।

৪০. মাসআলা : স্বাধীন ব্যক্তি, উম্মু ওয়ালাদ, মুদাক্কার ও মুকাতাব বিক্রির পর যদি ক্রেতার হাতে মারা যায়, তবে তাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মুদাক্কার ও উম্মু ওয়ালাদের ক্ষেত্রে জরিমানাস্বরূপ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) হতেও এরূপ একমত বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে মুকাতাবকে কবজা করার পর যদি ক্রেতার হাতে তার মৃত্যু ঘটে তবে সকলের মতে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে না (আল-কাফী)।

৪১. মাসআলা : মূল্য সম্পন্ন কোন মাল যদি মুকাতাব বা উম্মু ওয়ালাদের বিনিময়ে বিক্রি করে, এবং ক্রেতা মাল কবজা করে, তবে সে মালে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে, অবশ্য তা ফাসিদ মালিকানা হবে। উম্মু ওয়ালাদকে তার নিজের কাছে, এমনভাবে মুদাক্কারকে তার নিজের কাছে বিক্রি করা জায়েয (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪২. মাসআলা : মৃত জন্তু বা রক্ত দ্বারা কোন কিছু ক্রয় করলে তার মালিক হয় না। কেননা এ দুটো মূল্য সম্পন্ন নয়। সুতরাং মাল নয় (যদরুন ক্রয় সঠিক হয়নি)।

মৃত জন্তুর চামড়া দ্বারা যদি কোন কিছু ক্রয় করে এবং সেটা এমন চামড়া হয়, যা মানুষ দাবাগতের জন্য সংরক্ষণ করে, তবে সে ক্রয় সঠিক হবে।

কেউ যদি মৃত জন্তু বা রক্ত দ্বারা গোলাম কিনে তাকে কবজা করে এবং এ অবস্থায় তার হাতে মারা যায় জরিমানাস্বরূপ মূল্য পরিশোধ করতে হবে কি?

'আস সিয়াকুল কাবীর' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মূল্য পরিশোধ করতে হবে না, কিন্তু শিষ্যদ্বয়ের মতে পরিশোধ করতে হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

শামসুল আইম্মা : আস-সারাখসী (র) বলেন, মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এটাই সঠিক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৩. মাসআলা : উপরোক্ত শ্রেণীর বাঁদীদের সন্তান-সন্ততি তাদের আয়েবেরই পর্যায়ভুক্ত। একই হুকুম তাদের জন্য প্রযোজ্য। এমনভাবে কিতাবাতের চুক্তি থাকা অবস্থায় খরিদকৃত সন্তান ও তার মাতা-পিতার ক্ষেত্রেও একই হুকুম। এ ছাড়া অন্যান্য আত্মীয় কিতাবাত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তাদেরকে বিক্রি করা জায়েয, কিন্তু শিষ্যদ্বয়ের মতে জায়েয নয় (আল-হাবী)।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : 'রিবা'-এর ব্যাখ্যা ও বিধি-বিধান

১. মাসআলা : মাল বিনিময় কালে যে অতিরিক্ত অংশের বিপরীতে কোন মাল থাকে না, শরীআতের পরিভাষায় সেই অতিরিক্ত মালকে রিবা বলে। পরিমাপ নির্ভর এবং ওজন নির্ভর

দ্রব্য যদি সমজাতীয় দ্রব্যের বদলে বেচাকেনা করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে এরূপ অতিরিক্ত মাল হারাম **عِلَّتْ فِي قَدْرِ** (সমপরিমাণ ও (কায়লী) সমজাতীয়তা) হল রিবা হারাম হওয়ার **عِلَّتْ** বা হেতু **قَدْر** অর্থ পাত্র নির্ভর দ্রব্য পাত্রের পরিমাপ এবং ওজন নির্ভর দ্রব্য ওজনের পরিমাপ। সুতরাং কায়লী (পাত্র নির্ভর) দ্রব্য, যেমন গম, জব, খেজুর ও লবণ এবং ওজনী দ্রব্য, যেমন সোনা, রূপা প্রভৃতিকে যদি সমজাতীয় দ্রব্যের বদলে সমপরিমাপে বিক্রি করে তবে জায়েয হবে, কিন্তু কোন এক দিকে বেশী হলে জায়েয হবে না। এ ক্ষেত্রে গুণগত তারতম্য ধর্তব্য নয়। সুতরাং রিবা জাতীয় কোন দ্রব্যের ভালটাকে মন্দের বিনিময়ে বিক্রি করলে সমপরিমাপেই বিক্রি করতে হবে। কম-বেশী করলে জায়েয হবে না।

এক মুঠোর দুই মুঠোর বদলে এবং একটি আপেল দুইটি আপেলের বদলে বিক্রি করা জায়েয। আধা সা'-এর কম হলে সেটা মুঠোভর বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

খাদ্য দ্রব্য এমন নয় এমন কয়লা বা ওজনী দ্রব্য, যেমন চুনা, লোহা প্রভৃতিকে দ্রব্যের বদলে কম-বেশী করে বেচাকেনা করা আমাদের মাযহাবে জায়েয নয়।

কাদার (কৌটা বা ওজনের মাপ) ও জিন্স (সমজাতীয়তা) উভয় কারণ পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে কম-বেশী অর্থাৎ একদিকে অতিরিক্ত মাল যেমন হারাম, তেমনি বাকি বিক্রিও হারাম। দুই কারণের একটি যদি পাওয়া যায় এবং অন্যটি না পাওয়া যায়, তবে কম-বেশী বৈধ, কিন্তু বাকি হারাম। দুটোর কোনটিই যদি না পাওয়া যায়, তবে কম-বেশী ও বাকি উভয় বৈধ (আল-কাফী)।

২. মাসআলা : যেসব দ্রব্য মহানবী (সা) কায়ল হিসেবে কম-বেশী হারাম বলেছেন সেগুলো সর্বদা কায়লী দ্রব্যই বিবেচিত হবে, যদিও লোকে তাতে কায়ল (কৌটার মাপ) পরিত্যাগ করে, যেমন গম, জব, খেজুর, ও লবণ। আর মহানবী (সা) যেসব দ্রব্য ওজন হিসেবে কম-বেশী হারাম বলেছেন, সেগুলোকে সর্বদা ওজনী দ্রব্য রূপেই দেখা হবে, যদিও লোকে তাতে ওজন পরিত্যাগ করে, যেমন সোনা ও রূপা (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

৩. মাসআলা : যেসব দ্রব্য সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা) হতে কিছুই বর্ণিত নেই, কিন্তু এতটুকু জানা যায় যে, তাঁর আমলে তা কায়লী হিসেবেই প্রচলিত ছিল, সেগুলোও সর্বদা কায়লী থাকবে, যদিও আমাদের কালে মানুষ ওজনের দ্বারাও তার লেন-দেন করে। আর যেগুলো তাঁর আমলে ওজনী হিসেবে প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়, সেগুলো সর্বদাই ওজনী থাকবে।

যেসব দ্রব্য সম্পর্কে নবুওয়াত যুগের প্রচলন জানা নেই সে ব্যাপারে বর্তমান প্রচলন ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ পাত্র দ্বারা পরিমাপের প্রচলন থাকলে কয়লা ধরা হবে আর ওজনের প্রচলন থাকলে ওজনী ধরা হবে। আর যদি কায়লী ও ওজনী উভয়রূপেই প্রচলিত থাকে, তবে তাকে কায়লী ও ওজনী উভয়ই ধরা হবে। এ হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু মুহাম্মাদ (র)-এর মত (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : এ হিসেবে যদি গমকে সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে ওজন হিসেবে সমান সমান করে বিক্রি করে অথবা সোনাকে সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে কৌটা দ্বারা মেপে সমান

সমান করে বিক্রি করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে বিক্রি জায়েয হবে না, যদিও লোকের মধ্যে এভাবে প্রচলন থাকে (আল কাফী)।

৫. মাসআলা : যদি কায়লী দ্রব্য ওজন দিয়ে বিক্রি করে অথবা ওজনী দ্রব্যকে কায়লী হিসেবে বিক্রি করে তবে সে পরিমাপে সমান সমান হলেও জায়েয হবে না, যাবত না মূল পরিমাপে সমান সমান হয় (আন-নাহরুল ফায়িক)।

৬. মাসআলা : আশ-শায়খ আল ইমাম (র) বলেন, হাদীস দ্বারা যেসব বিষয় কায়লী বলে জানা গেছে সেগুলো যদি দিরহামের বিনিময়ে ওজন দ্বারা বিক্রি করে তবে তা জায়েয হওয়া সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের ইজমা রয়েছে। এমনিভাবে এ বিষয়েও ইজমা রয়েছে যে, হাদীস দ্বারা যেসব বিষয় ওজনী বলে জানা আছে, দিরহামের বিনিময়ে তা কৌটা দ্বারা মেপে বিক্রি করা জায়েয (আয-যখীরা)।

৭. মাসআলা : যা কিছু 'মান্ন' বা উকিয়া দ্বারা বিক্রি হয়, যেমন তেল ইত্যাদি, তা ওজনী দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত (মুখতারুল ফাতাওয়া)।

৮. মাসআলা : যেসব দ্রব্য 'রাতল' ও 'উকিয়া'-এর সাথে সম্পৃক্ত তা যদি পাত্র দ্বারা মেপে সমান সমান করে বিক্রি করে যা পাত্রের পরিমাপে কতটুকু হল তা জানা গেলেও ওজনের মাপে কতটুকু হল জানা যায় না, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে এরূপ দ্রব্য যদি পাত্রের পরিমাপে কম বেশী করে বিক্রি করা হয়, কিন্তু ওজনে তা সমান সমান হয় তবে তা জায়েয হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৯. মাসআলা : 'আল মাবসূত' গ্রন্থে আছে, নিকৃষ্টমানের গম ও উৎকৃষ্টমানের পরস্পর বিনিময় করলে উভয়টাকে সমজাতীয় ধরা হবে। এমনিভাবে খেজুরের ক্ষেত্রে সেচের জলে উৎপন্ন ও বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন খেজুর সমজাতীয় বলেই গণ্য। ফারিসী প্রজাতির খেজুর (যা উৎকৃষ্টমানের হয়ে থাকে) ও রদী খেজুর একই জাতির অন্তর্ভুক্ত, যদিও গুণগতমানে তারতম্য আছে। এমনিভাবে শক্ত জমিতে উৎপন্ন খেজুরের সাথে নরম জমির খেজুরও সমজাতীয় (আয-যহীরিয়া)।

১০. মাসআলা : ফুকাহায়ে কিরাম ইয়াতীমের সম্পদে রিবার ক্ষেত্রে ভাল-মন্দের তারতম্য ধর্তব্যে আনেন। সুতরাং তার ভাল মালকে মন্দের বিনিময়ে বিক্রি করা ওয়াসীর উচিত নয়। ওয়াকফের ক্ষেত্রেও মাসআলা এমনই হওয়া উচিত (আন-নাহরুল ফায়িক)।

১১. মাসআলা : একটি ডিম দুটি ডিমের বিনিময়ে, একটি খেজুর দুটি খেজুরের বিনিময়ে এবং একটি পেস্তা দুটি পেস্তার বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয।

ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে পয়সা সুনির্দিষ্ট হলে একটিকে দুটির বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয, কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয নয় (আল-কাফী)।

১২. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কিসমিসের বিনিময়ে আগুর পাত্রের মাপে সমান সমান করে বিক্রি করা জায়েয, কিন্তু সাহেবাইনের মতে জায়েয নয়।

এমনিভাবে যেসব ফলের একটা গুঁড় অবস্থা আছে, যেমন আন্জীর, মিষ্টি আলু, আখরোট, নাস্পাতি, বেদানা ও আলুবোখারা, এসব ফলের তাজাটাকে যেমন তাজার বিনিময়ে তেমনি তাজাটাকে গুঁড়ের বিনিময়েও বিক্রি করা জায়েয (আন্-নাহরুল ফায়িক)।

১৩. মাসআলা : খেজুর দ্বারা প্রস্তুত হালুয়াকে খেজুরের বিনিময়ে কম-বেশী করে বিক্রি করলে দোষ নেই। তবে যেখানে খেজুর ওজনে বিক্রি হয় সেখানে (কম বেশী করে জায়েয হলেও) বাকিতে এরূপ বিক্রি জায়েয নয়। আর যেখানে খেজুর পাত্রে মেপে বিক্রি হয়, সেখানে বাকিও জায়েয (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা : আবুল হাসান আল-কারখী (র) উল্লেখ করেছেন যে, সর্ব প্রকার খেজুরই একজাতের ফল। এ ছাড়া অন্য যত ফল আছে তার প্রত্যেক প্রকার গাছের ফল একজাতের, যেমন আঙ্গুর, এর সবই একজাতীয়, যদিও এর ভেতর প্রকারভেদ আছে। এমনিভাবে সমস্ত নাস্পাতি একজাতীয়, যদিও এর মধ্যে প্রকারভেদ আছে। তদ্রূপ সর্ব প্রকার সেব একই জাতের ফল। কাজেই এক প্রকার আঙ্গুর অন্য প্রকারের বিনিময়ে কম-বেশী করে বিক্রি জায়েয নয়। সেব ও নাস্পাতির ক্ষেত্রেও একই কথা। তবে নাস্পাতিকে সেবের বদলে কিংবা সেবকে আঙ্গুরের বদলে কম-বেশী করে বিক্রি করলে তা জায়েয হবে (আয-যখীরা)।

১৫. মাসআলা : আঙ্গুর ফলকে আঙ্গুরের রসের বদলে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করা যাবে (আল-কিনয়া)।

১৬. মাসআলা : ভেজা গমকে ভেজা গমের বিনিময়ে এবং ভেজা গমকে শুকনা গমের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয। এমনিভাবে তাজা খেজুরকে তাজা খেজুরের বিনিময়ে এবং তাজা খেজুরকে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয। তাজা তরকারিকে তাজা তরকারির বিনিময়ে এবং ভেজা কিসমিসকে ভেজা কিসমিসের বদলে বিক্রি করা জায়েয। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ভেজা কিসমিস শুকনা কিসমিসের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয, কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এটা জায়েয হয়, তবে যদি জানা যায় যে, শুকানোর পর উভয়টা মাপে সমানই থাকবে, তখন তার মতেও এরূপ বিক্রি জায়েয (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৭. মাসআলা : অভাজা গমের বিনিময়ে ভাজা গম বিক্রির ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। সঠিক মত এই যে, তা জায়েয নয়। যদিও কায়ল বা পাত্রে মাপে সমান হয়। ভাজা গমের বিনিময়ে ভাজা গম বিক্রি জায়েয হবে। যদি পাত্রে পরিমাপে সমান হয় (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা : আটা বা ছাতুর বিনিময়ে গম বিক্রি জায়েয নয়, সমান-সমান বা কম বেশী হোক না কেন। আটার বিনিময়ে আটা বিক্রি করলে আমাদের মতে মাপে সমান হওয়ার শর্তে জায়েয। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে আটার বিনিময়ে ছাতু বিক্রি সমান-সমান বা কম-বেশী কোন অবস্থাতেই জায়েয নয় (আল-কাফী)।

১৯. মাসআলা : আটার বিনিময়ে ভুসি বিক্রি করলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তা এই শর্তে জায়েয হবে যে, খালেস ভুসির পরিমাণ আটার ভেতরের ভুসি অপেক্ষা বেশী হতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সেভাবে জায়েয নয়, বরং উভয়টা কৌটার মাপে বরাবর হলে জায়েয হবে (আস-সুগরা)।

২০. মাসআলা : আটার বিনিময়ে আটা বিক্রি করা জায়েয নয়, যেমন গমের বিনিময়ে গম ওজনে বিক্রি জায়েয নয়। ছাতুর বিনিময়ে ছাতু কিংবা ছাতুর বিনিময়ে ভুসি বিক্রির মাসআলা আটার বিনিময়ে আটা বিক্রির অনুরূপ। ভুগিয়ুক্ত আটা ভুসিবিহীন আটার বিনিময়ে বিক্রি করলে তা পাত্রে মাপে সমান-সমান হওয়ার শর্তে জায়েয (আয-যখীরা)।

২১. মাসআলা : খাবিছ (ময়দা, খেজুর ও মালাইযোগে প্রস্তুত হালুয়া বিশেষ)-এর বিনিময়ে আটা বিক্রি জায়েয (কিনয়া)।

২২. মাসআলা : রুটির বিনিময়ে গম কিংবা গমের বিনিময়ে রুটি বিক্রি, এমনিভাবে আটার বিনিময়ে রুটি বা রুটির বিনিময়ে আটা বিক্রি সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, এটা সমান মাপে বা কম-বেশী করে সর্বাবস্থায়ই জায়েয। এরই উপর ফাতওয়া। কেননা গম কায়লী দ্রব্য আর আটা ও রুটি ওজনী। কাজেই এর একটিকে অপরের বিনিময়ে সমান বা কম-বেশীতে বিক্রি করা জায়েয যদি উভয়টা নগদ হয়। যদি রুটি নগদ হয় এবং অন্যটা বাকি হয় তাহলে ফুকাহায়ে কিরামের মতে তখনও জায়েয। যদি রুটি বাকি এবং অপেরটা নগদ হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয। ইমাম আবু হানীফা (র) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা আছে। আর এ মতের উপরই ফাতওয়া (আয-যখীরিয়া)।

২৩. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, একটি রুটি দুটি রুটির বিনিময়ে নগদ বিক্রি করা জায়েয, যদিও উভয়ের মধ্যে ছোট-বড়র প্রভেদ থাকে। এ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ফুকাহায়ে কিরামের নিকট রুটি যে কোন প্রকারে বিক্রি করা জায়েয (আল-কিনয়া)।

২৪. মাসআলা : 'আল মুজতাবা' গ্রন্থে আছে, নগদ একটি রুটি বাকি দুটি রুটির বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয। যদি দুটি রুটি নগদ ও একটি রুটি বাকি হয়, তবে জায়েয নয়। রুটির হেঁড়া টুকরা নগদ হোক কিংবা বাকি যে কোন প্রকারে বিক্রি জায়েয (আন্ নাহরুল ফায়িক)।

২৫. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ওজনে বা গুণে কোন ভাবেই রুটি ধারে আনা জায়েয নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মানুষের মধ্যে এর প্রচলন থাকার কারণে এটা ওজনে বা গুণে যেভাবেই হোক জায়েয। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ওজনে জায়েয এবং এরই উপর ফাতওয়া (আত-তাবয়ীন)।

'শারহুল মাজমা' গ্রন্থে আছে, এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতের উপরই ফাতওয়া (আল-বাহরুর রাযিক)।

২৬. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সমান-সমান হোক বা কম-বেশী কোন অবস্থায়ই ছাতুর বিনিময়ে আটা বিক্রি জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ

(র)-এর মতে নগদ-নগদ হলে সমান-সমান বা কম-বেশী সর্বাবস্থায় ছাত্তর বিনিময়ে আটা বিক্রি জায়েয (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা : 'আল আসল' গ্রন্থে আছে, অনুমান করে গমের বিনিময়ে গম বিক্রি বৈধ নয় (জায়েয নয়)।

ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এটা সেই অবস্থার কথা, যখন গমের পরিমাণ কায়ল (পাত্র) দ্বারা মাপ দেওয়ার মত হয়। যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে সামান্য গমের বিনিময়ে সামান্য গম বিক্রি জায়েয। যে কোন কায়লী ও ওজনী দ্রব্যের ক্ষেত্রে একই কথা।

অনুমান করে গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করার পর যদি কায়ল দ্বারা মাপ দেওয়া হয় এবং সমান-সমান হয়ে যায় তখনও সে বিক্রি জায়েয হবে না।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যে সকল ক্ষেত্রে বিক্রি বৈধ হওয়ার জন্য শরীআত সম্মত পরিমাপ পদ্ধতিতে সমান সমান হওয়া শর্ত করা হয়েছে, তাতে পরিমাপ সমান-সমান হওয়ার বিষয়টা বোচাকেনার চুক্তি সম্পাদনকালে জানা থাকতে হবে (আয-যখীরা)।

২৮. মাসআলা : সমপরিমাপে খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য কেনার পর বিক্রেতা যদি তার পণ্য কবজা করে, কিন্তু ক্রেতা কবজা না করে এবং এ অবস্থায় তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে আমাদের মতে তাতে কোন দোষ নেই।

সমজাতীয় বা বিপরীত জাতের খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য বিক্রি জায়েয হওয়ার জন্য আমাদের মাযহাবে মজলিসে কবজা করা শর্ত নয় (আল-মাবসূত)।

২৯. মাসআলা : যবের বিনিময়ে গম যদি কমবেশী করে বিক্রি করে, তবে তা নগদ-নগদ হলে জায়েয হবে, যদিও যবের ভেতর যবের সমপরিমাণ গমের দানা থাকে।

গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করলে তা সমান-সমান না হলে জায়েয হবে না, যদিও উভয় দিকের গমের মধ্যে যবেরও দানা থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা : মলাই দেওয়া গমের বিনিময়ে শীষযুক্ত গম বিক্রি করা আমাদের মাযহাবে জায়েয নয়। তবে যদি জানা থাকে যে শীষের গম অপেক্ষা মলাই দেওয়া গমের পরিমাণ বেশী, তখন জায়েয হবে (আয-যাহীরিয়া)।

ক্ষেতের গমযুক্ত গম গাছ যদি মলাই দেওয়া গমের বদলে যথাক্রমে অনুমান ও পরিমাপের সাথে বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে-যদি ক্ষেতে রেখে দেওয়ার শর্ত না থাকে (আল-বাহরুর-রায়িক)।

৩১. মাসআলা : 'আল-আসল' গ্রন্থে আছে, যায়তূনের বদলে যায়তূন তৈল, তিলের বদলে তিলের তৈল, পশমের বদলে পশমযুক্ত ছাগল, দুধের বদলে দুধসহ ছাগল, আঙ্গুরের বদলে তার নির্যাস, খেজুরের নির্যাসের বদলে খেজুর, ঘির বদলে দুধ, তুলার সুতার বদলে তুলা, খেজুরের বদলে বীচি, সোনার বদলে সোনার দরজা বিশিষ্ট ঘর, রূপার বদলে রূপার

কারুকার্যখচিত তরবারি কিংবা শীষযুক্ত গমের বদলে পরিশোধিত গম বিক্রি করলে সে ক্ষেত্রে খালিস বা পৃথকীকৃত যদি সংযুক্তটির চেয়ে বেশী হয় তাহলে আমাদের মাযহাবে জায়েয হবে। পৃথকীকৃত কম বা সমপরিমাণ হলে কিংবা পরিমাণ অজ্ঞাত জায়েয হবে না এবং এটা সকলেরই মত। উল্লেখ্য এটা সেই অবস্থার কথা যখন সংযুক্তটির বর্জ্যেরও মূল্য থাকে। বর্জ্য যদি মূল্যহীন হয় তবে বিক্রি জায়েয হবে না, যেমন মাখনের বদলে ঘি বিক্রি জায়েয নয়। হাঁ, যদি জানা থাকে যে, খালিস ঘির পরিমাণ মাখনের ভেতরকার ঘির সমান, তাহলে জায়েয হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) হতে এ শর্তের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩২. মাসআলা : সুতার বিনিময়ে তুলা বিক্রি করা ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয এবং এটাই সঠিক। ধুনা হয় নি এমন তুলা যদি ধুনা তুলার বিনিময়ে বিক্রি করে তবে ধুনা ছাড়া তুলা ধুনার পর যে পরিমাণ দাঁড়াবে ধুনা তুলা তার চেয়ে বেশী বলে জানা থাকলে সে বিক্রি জায়েয হবে। এমনিভাবে ধুনা ছাড়া তুলা যদি বীচির বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে বীচির পরিমাণটা তুলার ভেতরের বীচি অপেক্ষা বেশী হতে হবে (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

৩৩. মাসআলা : তুলার কাপড়ের বদলে তুলা বিক্রি করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে যে কোনভাবে জায়েয (আল-হিদায়া)।

৩৪. মাসআলা : তুলার কাপড়ের বদলে তুলার সুতা নগদ-নগদ হলে বিক্রি করতে দোষ নেই। এমনিভাবে ওজনী কাপড় না হলে যে কোনও প্রকার কাপড়ে তার সুতার বিনিময়ে নগদ বিক্রি (কমবেশী হলেও) জায়েয (আল-কিনয়া)।

৩৫. মাসআলা : ফুলের নির্যাস মিশ্রিত দুই কাফীয (পরিমাপ বিশেষ) তিলের বিনিময়ে অমিশ্রিত এক কাফীয তিল বিক্রি কার জায়েয। বেশীটাকে ধরা হবে সুগন্ধীর বদলে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, সুগন্ধীর কারণে যদি ওজন বাড়ে, অর্থাৎ সুগন্ধী থেকে মুক্ত করে ফেললে যদি ওজন কমে যায়, কেবল তখনই সেটাকে হিসাব করা হবে (আল-হাবী)।

৩৬. মাসআলা : বানাফশা (ফুল বিশেষ)-এর তেল ও হীরী (সুগন্ধী তেল বিশেষ) তেল দুই জাতীয়। বিবিধ তেলের মূল উপাদান যদি আলাদা হয়, তবে সেগুলোকে বিবিধ জাতেরই ধরা হবে (ফাতহুল-কাদীর)।

৩৭. মাসআলা : সিরকা ও যায়তূন তেল দুই জাতের। এমনিভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সুগন্ধী যুক্ত হলে তেলের উপাদান এক হওয়া সত্ত্বেও তেলের জাত ভিন্ন হবে। এরই ভিত্তিতে ফুকাহায় কিরাম বলেন, সুগন্ধীযুক্ত দুই কাফীয তিলের তেল সুগন্ধীহীন এক কাফীয তিলের তেল দ্বারা বিক্রি করা জায়েয। তারা অতিরিক্ত এক কাফীযকে সুগন্ধীর বিপরীতে ধরেন। পক্ষান্তরে সুগন্ধীযুক্ত এক রাতল (পরিমাপ বিশেষ) তেল সুগন্ধীবিহীন এক রাতলের বিনিময়ে বিক্রি জায়েয নয়। কেননা সে ক্ষেত্রে সুগন্ধীটা অতিরিক্ত হয়, যেন সে তেলের বিনিময়ে তেল বিক্রি করল এবং বাড়তি সুগন্ধীও পেল (যার কোন বদলা নেই আর এটাই সুদ) (আস-সিরাজুল-ওয়াহাজ)।

৩৮. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, 'বানাক্ষা'-এর নির্যাসযুক্ত এক মাকুফ (পরিমাপ বিশেষ, দেড় সা') তিলের তেল অমিশ্র পাঁচ মাকুফ তেলের বিনিময়ে নগদ-নগদ বিক্রি করলে তা জায়েয হবে। কিন্তু সুগন্ধী মিশ্র তেল অমিশ্র তেলের সমপরিমাপে হলে জায়েয হবে না। এমনভাবে ঘি ও চিনি মাখানো ছাতু যদি অমিশ্র ছাতুর বদলে বিক্রি করে সে ক্ষেত্রেও একই বিধান (আল-মুহীত)।

৩৯. মাসআলা : ছাগলের গোশতের বিনিময়ে যদি ছাগল কেনে তবে সে ক্ষেত্রে বিধান এই যে, গোশতের বিনিময়ে যদি যবাহুকৃত ছাগল কেনে, যার চামড়া ছুঁলে চর্বি ও নাঁড়ি-ভুড়ি বের করে ফেলা হয়েছে, তবে উভয়ের পরিমাণ সমান হলে জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয নয়। আর যদি গোশতের বিনিময়ে এমন যবাহু করা ছাগল কেনে, যার চামড়া ছাড়ানো হয় নি, তবে গোশত যদি ছাগলের গোশত অপেক্ষা কম বা তার সমান কিংবা অজ্ঞাত পরিমাণ হয়, তাহলে জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে ঐ গোশত ছাগলের গোশতের চেয়ে বেশী হলে জায়েয হবে। গোশতের বিনিময়ে যদি জ্যাক্স ছাগল কেনে তবে কিয়াস অনুযায়ী জায়েয হবে না। হাঁ, যদি জানা সম্ভব হয় যে, বিনিময়ে প্রদত্ত গোশতের পরিমাণ ছাগলের গোশতের চেয়ে বেশী হলে জায়েয হবে। এটাই ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইস্তিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) অনুযায়ী সর্বাবস্থায়ই সে বিক্রি জায়েয। এটাই ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪০. মাসআলা : অবশ্য উপরিউক্ত বিক্রি জায়েয হওয়ার জন্য ছাগল নির্দিষ্ট করে নেওয়া শর্ত। এরূপ বিক্রি বাকী হলে তা জায়েয হবে না (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

৪১. মাসআলা : যদি যবাহুকৃত একটি ছাগল জ্যাক্স একটি ছাগলের বিনিময়ে ক্রয় করে, তবে জায়েয হবে। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

চামড়া ছোলা হয় নি এমন একটি যবাহুকৃত ছাগলের বিনিময়ে যদি দুটি জ্যাক্স ছাগল কেনে তাও জায়েয হবে (আস-সিরাজুল-ওয়াহাজ)।

৪২. মাসআলা : যবাহুকৃত কিন্তু চামড়া ছোলানো নয়, এমন একটি ছাগলের বিনিময়ে যদি যবাহুকৃত ও চামড়া ছোলানো দুটি ছাগল ক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে। কেননা এস্থলে গোশতের বদলে গোশত বিক্রি হচ্ছে এবং দুটি ছাগলের ভেতর যে অতিরিক্ত গোশত আছে, তা অপর ছাগলের গোশত ছাড়া অন্য সব কিছুই বদলে।

যবাহুকৃত ও চামড়া ছোলানো একটি ছাগলের বদলে চামড়া ছোলানো নয় এমন যবাহুকৃত দুটি ছাগলের বিনিময়ে বিক্রি করলে তা জায়েয হবে না। কেননা বাড়তি জিনিসগুলোসহ দুটি ছাগলে অতিরিক্ত গোশত সুদ সাব্যস্ত হবে।

যবাহুকৃত ও চামড়া ছোলানো একটি ছাগলের বদলে চামড়া ছোলানো দুটি ছাগল কিনলে তাও জায়েয নয়। কেননা উভয়টাই যেহেতু গোশত সেহেতু অতিরিক্ত পরিমাণটা সুদ হবে। হাঁ উভয়টা যদি ওজনে সমান হয়, তখন জায়েয হবে (শারহুত-তাহাবী)।

৪৩. মাসআলা : গোশতের বেচাকেনার তার জন্তটা লক্ষণীয়। গরু ও মহিষ একই জাতি। কাজেই এর একটির গোশত অন্যটির গোশতের বদলে কমবেশী করে বিক্রি জায়েয নয়।

আরবী, বুখতী সর্বপ্রকার উটই এক জাতি। এমনভাবে ছাগল ও ভেড়াও সমজাতীয় (আয-যাহীরা)।

৪৪. মাসআলা : 'আল-ফাতাওয়া আল আত্তাবিয়া' গ্রন্থে আছে, আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মতে রান্না করা গোশতের বিনিময়ে কাঁচা গোশত সমপরিমাপে বিক্রি করা জায়েয, কমবেশী হলে জায়েয নয়, তবে রান্না করা গোশতের ভেতর যদি কিছু মসলা থাকে তাহলে জায়েয হবে (আত্-তাতার খানিয়া)।

৪৫. মাসআলা : উট, গরু ও ছাগলের গোশত এবং এ সবার দুধ ভিন্ন ভিন্ন জাত। সুতরাং এর একটিকে অপরটির বিনিময়ে নগদ-নগদ হলে কমবেশী করেও বিক্রি জায়েয, কিন্তু এর বাকী বিক্রি জায়েয নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৬. মাসআলা : সিনার চর্বি ইত্যাদি গোশতেরই শামিল, কিন্তু পেটের ও দুধার বাড়তি মাংসপিণ্ডের চর্বির সাথে একে ভিন্ন জাত গণ্য করা হয়। তবে এর একটিকে অন্যটির বদলে বাকী বিক্রি জায়েয নয়।

মাথা, ভুড়ি ও চামড়া নগদ-নগদ হলে একটির বিনিময়ে অন্যটি যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করা যাবে, কিন্তু বাকী জায়েয নয় (ফাতহুল-কাদীর)।

৪৭. মাসআলা : চিনির সিকার বিনিময়ে মদ্রের সিকা কমবেশী করেও বিক্রি জায়েয (আল-হাবী)।

৪৮. মাসআলা : এমনভাবে খেজুর নির্ধারিত সিকা আঙ্গুর রসের সিকার বিনিময়েও কমবেশী পরিমাপে বিক্রি করা জায়েয (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

৪৯. মাসআলা : নির্ধারিত বদলে সিকা পরিমাপে কম-বেশী বিক্রি করলে জায়েয হবে না। কেননা নির্ধারিত দ্বিতীয় পর্যায়ে সিকায় পরিণত হয় (আয-যাহীরিয়া)।

৫০. মাসআলা : ইবন সমাআ (র) বিরচিত 'আন-নাওয়াদীর' গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, দুই পাত্র ঘোল এক পাত্র দুধের বিনিময়ে বিক্রি করার দোষ নেই। পক্ষান্তরে ঘোল এক পাত্র এবং দুধ দুধ পাত্র হলে জায়েয নেই, কারণ দুধের ভেতর মাখনের পরিমাণটা অতিরিক্ত। কারো কারো মতে দুধ যদি দুই পাত্র হয় সে ক্ষেত্রে দুধ থেকে মাখন বের করে ফেলা হলে দুধের ওজন যদি কমে যায় তা হলে জায়েয হবে আর না কমলে জায়েয হবে না (আল-মুহীত)।

৫১. মাসআলা : পাখির গোশত একটির বদলে দুটি বিক্রি করলে যদি নগদ-নগদ হয়, তবে তা জায়েয আর বাকী হলে জায়েয নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫২. মাসআলা : আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি পাখির বিনিময়ে পাখির গোশত বিক্রি কমবেশী হলেও জায়েয বলতেন, এমনকি এক জাতীয় হলেও (আল-হাবী)।

৫৩. মাসআলা : যবাহকৃত দুটি মুরগীর বিনিময়ে একটি মুরগী বিক্রি করা জায়েয, তা ভূনা করা হোক বা কাঁচা (মুখতারুল ফাতাওয়া)।

৫৪. মাসআলা : দুটি মাছের বদলে একটি মাছ বিক্রি করাতেও দোষ নেই, যেহেতু মাছ ওজনে বিক্রি করা হয় না। যদি কোন মাছ ওজনে বিক্রি হয়, তবে তা সমপরিমাপ ছাড়া বিক্রি করা জায়েয নয় (আয-যাহীরিয়া)।

৫৫. মাসআলা : যে শহরে গোশত ওজনে বিক্রি হয় না, সেখানে দুই পেয়ালার বদলে এক পেয়লা বিক্রি করতে অসুবিধা নেই। এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক রীতি লক্ষণীয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৬. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে দুই মগ পানির বদলে এক মগ পানি বিক্রি জায়েয। কেননা তাদের মতে পানি যেমন ওজনী দ্রব্য নয়, তেমনি নয় কায়লীও। কাজেই কমবেশী করে বিক্রি করা হলে তা নাজায়েয হবে না।

বরফ যদি ওজনে বিক্রি হয়, তবে সমপরিমাপে হওয়ার শর্তে বরফের বদলে বরফ বিক্রি জায়েয হবে (আয-যাহীরিয়া)।

৫৭. মাসআলা : লোহা, সীসা ও তামা ভিন্ন ভিন্ন জাতের দ্রব্য (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

৫৮. মাসআলা : খাঁটি সোনা দ্বারা কারুকাজ কার কাপড় পৃথক সোনার বদলে বিক্রি করলে তা বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে পৃথক সোনার পরিমাণ কাপড়ের সোনার চেয়ে বেশী হওয়া (আল-মুহীত)।

৫৯. মাসআলা : কাপড়ের জাত বিভিন্ন হয় তার মূল (উপাদান) ও গুণের ভিত্তিতে, যদিও তার নাম অভিন্ন হয়, যেমন হারাবী (হারাত নামক স্থানের কাপড়) ও মারবী (মারব নামক স্থানের কাপড়)-এর জাত ভিন্ন। এমনভাবে মারবী কাপড় যেমন খুরাসানে প্রস্তুত হয়, তেমনি বাগদাদেও প্রস্তুত হয়, কিন্তু উভয় স্থানের এ কাপড়ের উপাদান আলাদা (আল-হাবী)।

৬০. মাসআলা : এমনভাবে কাতান কাপড় ও সুতি কাপড় এবং যান্দানীজী ও ওয়াযারী ভিন্ন ভিন্ন জাতের কাপড় (আল-খুলাসা)।

৬১. মাসআলা : আরমেনীয় জুব্বা ও তালিকানী জুব্বা আলাদা জাতের কাপড় (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

৬২. মাসআলা : কাতানের বদলে তুলার সুতা কিংবা উলের বদলে পশমী সুতা কমবেশী করে বিক্রি জায়েয, তবে একটা বাকী হলে জায়েয হবে না, যেহেতু এগুলো ওজনে বিক্রি হয় (আয-যাহীরিয়া)।

৬৩. মাসআলা : এমনভাবে তুলার সুতা দিয়ে রেশমী সুতা বিক্রিও একই হুকুম (মুহীত)।

৬৪. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, তুলার মোটা সুতার বিনিময়ে মিহি সুতা বিক্রি করলে মাপ সমান সমান হওয়া ছাড়া জায়েয হবে না (আয-যাহীরিয়া)।

৬৪. মাসআলা : বীচি দাঁড়ানো খেজুরের বিনিময়ে বীচিযুক্ত খেজুর সমপরিমাপেই বিক্রি করা জায়েয, অন্যথায় জায়েয নয় (আয-যাহীরিয়া)।

৬৫. মাসআলা : উলের বদলে যদি উলের কাপড় বিক্রি করে ~~জ~~ দেখতে হবে যে, কাপড়টি খুলে ফেললে তা উলের সুতায় পরিণত হয় কিনা, যদি সুতা ~~হয়~~ যায়, তবে উভয় উলের পরিমাণ ওজনে সমান হওয়া শর্ত। আর যদি সুতায় পরিণত না ~~হয়~~ তবে সমপরিমাপে হওয়া শর্ত নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৬. মাসআলা : সাবানের বদলে সাবান সমপরিমাপে বিক্রি করা জায়েয (আল-কিনয়া)।

৬৭. মাসআলা : গোলাম ও মনিবের মধ্যে কোন সুদ নেই। অবশ্যসেই ক্ষেত্রে, যখন গোলামের কাঁধে তার দামের সমপরিমাণ ঋণ না থাকে। যদি এ পরিমাণ ঋণ থাকে, তবে তাদের মধ্যে সুদী কারবার জায়েয নয়। আল-মুহীত গ্রন্থের 'সারফ : অধ্যায়ে' আছে গোলামের কাঁধে ঋণ থাকলেও তার ও মনিবের মধ্যে সুদী কারবার ~~জায়েয~~ হবে না (আত-তাবয়ীন)।

৬৮. মাসআলা : মুদাক্কর এবং উম্মু ওয়ালাদ-এর হুকুম গোলামেরইকত। কিন্তু মুকাতাব (নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের শর্তে যে গোলামেরই সঙ্গে তার ~~স্ব~~ আখাদীর চুক্তি সম্পাদন করেছে)-এর বিধান এর বিপরীত (আল-বাহরুল-রায়িক)।

৬৯. মাসআলা : মুফাওয়াযা (সমান পুঁজি ও মুনাফার অংশীদারি ~~ক~~ যাতে শরীকদ্বয় পরস্পরের জামিন হয়) এবং ইনান (অংশ অংশীদারি কারবার যাতে এক্ষেপরের জামিন হয় না)-এর ক্ষেত্রে এক শরীক অপর শরীকের সঙ্গে অংশীদারি কারবারের ~~জন~~ মালে বেচাকেনা করলে তার কমবেশী সুদ গণ্য করা হয় না। হাঁ, অংশীদারি কারবারে ~~অন্তর্ভুক্ত~~ নয় এমন কোন মালে তাদের মধ্যে সুদী লেনদেন জায়েয নয় (আত-তাবয়ীন)।

৭০. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর ~~মতে~~ অমুসলিম দেশে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে সুদী কারবার অবৈধ নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে অমুসলিম রাষ্ট্রেও তাদের মধ্যে সুদী কারবার জায়েয নয়।

এমনভাবে কোন মুসলিম যদি অমুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে সে দেশে প্রবেশ করে এবং সে দেশের এমন মুসলিম নাগরিকের সঙ্গে সুদী কারবার করে, যে ইসলাম গ্রহণের পর মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত না করে বরং সে দেশেই থেকে গিয়েছে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে সুদও অবৈধ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা অবৈধ। ইসলাম গ্রহণের পর সে যদি মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করে এবং তারপর ~~সে~~ সে দেশে ফিরে যায় তবে তার সাথে সুদী কারবার কারও মতেই জায়েয নয় (আল-জাওহরুল-নায়িরা)।

৭১. মাসআলা : এমনভাবে দুই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর যদি মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত না করে অমুসলিম রাষ্ট্রেই থেকে যায় তবে তাদের আপোষের মধ্যেও সুদী কারবার জায়েয নয় (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

৭২. মাসআলা : অমুসলিম রাষ্ট্রে দুই মুসলিম যদি নিজেদের মধ্যে এমন বেচাকেনা করে, আইনত যা ফাসিদ, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা জায়েয, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয নয় (আত-তাবঈন)।

সপ্তম অনুচ্ছেদ : পানি ও বরফ বিক্রি প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : কুয়া ও নদীতে বিদ্যমান পানি বিক্রি জায়েয নয় (আল-হাবী)।
২. মাসআলা : এ ক্ষেত্রে এই কৌশল অবলম্বন করা যায় যে, প্রার্থীকে বালতি ও রশি ভাড়া দেবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।
৩. মাসআলা : কুয়া বা নদী-নালা থেকে পানি তুলে নিজের পাত্রে রাখলে তা তার অধিকারভুক্ত হয়ে যায়, সুতরাং তা ভিত্তি করা যাবে। এটা ঠিক শিকার করা প্রাণীর মত (আয-যাখীরা)।
৪. মাসআলা : এমনভাবে বৃষ্টির পানিও যদি কেউ নিজ সংরক্ষণে নিয়ে ফেলে তবে তাতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।
৫. মাসআলা : কেউ যদি তার হাউয়ের ভেতর পানি জমা করে, তবে তাতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে কি? শায়খুল ইসলাম খাহার যাদে (র) 'কিতাবুল শির্ব'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, হাউয যদি চুন-সুরকির গাঁথা হয় কিংবা লোহা বা তামার তৈরি হয় তবে তার পানি সর্বাধিকার বিক্রি জায়েয। শায়খুল ইসলাম (র) যেন সে পানি হাউয়ের ভেতর রাখার কারণে হাউয়ের মালিককে সে পানির সংরক্ষণকারী সাব্যস্ত করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যে, সে হাউয়ে নতুন পানি আসার পথ বন্ধ থাকতে হবে, যাতে বিক্রিত পানির সাথে অবিক্রিত পানি সংমিশ্রিত হতে না পারে।
- হাউয যদি লোহা বা তামার তৈরি না হয় কিংবা চুন-সুরকি দ্বারা গাঁথা না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে, যেমন মতভেদ আছে যে, গ্রীষ্মকালে বরফের পাত্রের ভেতর বরফ বিক্রি জায়েয কিনা ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ মাসআলায় সঠিক মত এই যে, দরাদরির অবস্থায় যদি ক্রেতার হাতে পানি/বরফ সমর্পণ করে এবং তারপর বিক্রি করে তবে জায়েয হবে। আর যদি প্রথমে বিক্রি করে এবং তারপর সমর্পণ করে তবে জায়েয হবে না (আল-মুহীত)।
৬. মাসআলা : সহীহু কথা হচ্ছে যে, পানি ও বরফ অর্পণ করার আগেও, বিক্রি করা জায়েয-যদি তিন দিনের ভেতর অর্পণ করে কিন্তু অর্পণ যদি তিন দিন পর করে তবে জায়েয হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।
৭. মাসআলা : কেউ যদি পাত্রের ভেতর বরফ বিক্রি করে তবে তা অর্পণ করার পর বিক্রি করুক কিংবা বিক্রি করার পর অর্পণ করুক সর্বাধিকার জায়েয। ফকীহ আবু জা'ফর (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকতর সতর্কতামূলক পন্থা এটাই যে, প্রথমে তা ক্রেতার হাতে অর্পণ করবে এবং তারপর বিক্রি করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা : ফকীহ আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম আল-বালখী (র) বলতেন, অর্পণ করার পরেও এবং আগেও বিক্রি জায়েয, যদি না বিক্রির পর অর্পণে দীর্ঘ বিলম্ব হয়, যেমন বিক্রির এক/দুই দিন পরেই অর্পণ করল। যদি তিন দিন পর অর্পণ করে তবে জায়েয হবে না। 'মাওয়ারাউন-নাহর'-এর অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম এরূপই মত পোষণ করেন।

অর্পণের আগে বিক্রি করা হলে অর্পণকালে যখন ক্রেতা দেখবে তখন তার ইখতিয়ার লাভ হবে। অর্পণ যদি তিন দিনের মাথায় হয় তবে সে অর্পণকালীন দেখার ভিত্তিতে ইখতিয়ার লাভ হবে না। আর যদি তার আগে অর্পণ করে তাহলে বিক্রির সময় থেকে তিন দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ক্রেতার ইখতিয়ার বাকী থাকবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : শুধু পানি গ্রহণের অধিকার বিক্রি করা জায়েয নয়, তবে জমিসহ বিক্রি করা হলে জায়েয হবে।

যদি একটি জমি অপর জমির সেচের পানিসহ বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে কিনা সে সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র) কিছুই বলেন নি। ফকীহ আবু নাসর ইবন সাল্লাম (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তার মতে এরূপ বিক্রি জায়েয। ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) এদিকেই ইশারা করেছেন (যাখীরা)

১০. মাসআলা : কেউ যদি কোন ভিত্তিওয়ালার কাছ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মশ্ক (ভিত্তি) ফুরাতের পানি কেনে তবে সে সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, মশ্ক যদি সুনির্দিষ্ট হয়, তবে তা জায়েয, যেহেতু মানুষের মধ্যে এর রেওয়াজ আছে। বালতি ও কলসির ক্ষেত্রেও একই হুকুম। এ রায় ইস্তিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) অনুযায়ী। কিন্তু (স্থূল) কিয়াস অনুযায়ী মশকে কী পরিমাণ পানি ধরে তা জানা না থাকলে এরূপ বিক্রি জায়েয হবে না। এটাই ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : কেউ যদি বলে, তুমি আমার পণ্ডকে এক দিরহামের বিনিময়ে এতমাস পানি পান করাবে, তবে তা জায়েয হবে না। যদি বলে, প্রতি মাসে এত বালতি পানি খাওয়াবে, তবে বালতি নির্দিষ্ট করার শর্তে জায়েয হবে। কেউ যদি অন্য কাউকে বলে, আমি তোমার জমি ভরে সেচ দিয়ে দেব এবং সে মতে সে জমিটিতে খাল থেকে পানি ছেড়ে দেয়, তবে সে কিছুই পাবে না। যদি বলে, আমি তোমার পণ্ডকে আমার খাল বা আমার পুকুর থেকে পানি খাওয়াব, তবে সে চুক্তি বৈধ (আয-যাখীরা)।

অষ্টম অনুচ্ছেদ : পণ্য বা মূল্য অজ্ঞাত থাকা প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : কেউ যদি বিক্রিতে মূল্য সাধারণভাবে উল্লেখ করে, অর্থাৎ মুদ্রার পরিমাণ নির্দিষ্ট করল ঠিক, কিন্তু তার গুণ বা রকম উল্লেখ করল না, তাহলে সে অঞ্চলের সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রা ধরা হবে। মুদ্রা যদি (মানের দিক থেকে) বিভিন্ন প্রকারের হয় তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। হাঁ, যদি ব্যাখ্যা করে দেয় বা কোনও একটি অধিক প্রচলিত হয়, তবে সেটাই ধর্তব্য হবে। এটা সেই অবস্থার কথা, যখন মুদ্রাসমূহের মান সমান না হয়। মুদ্রামান অভিন্ন

হলে কেবল দিরহাম বললেই বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে এবং নির্ধারিত অংকে যে কোন মুদ্রা পরিশোধ করতে পারবে। উদাহরণত কোনও দিরহাম যদি আহাদী (যার একটি মুদ্রাতেই এক দিরহাম হয়), কোনটি ছুনাঈ (যার দুই মুদ্রায় এক দিরহাম) এবং কোনটি ছুলাহী (যার তিনটি মুদ্রায় এক দিরহাম) হয়, তখন ছুনাঈর দুটি ও ছুলাহীর তিনটির মুদ্রামান আহাদীর একটির সমান হয়। ছুনাঈর যা ছুলাহীর একটিকে দিরহাম বলা হয় না; বরং এরূপ ক্ষেত্রে দিরহাম বললে আহাদীর একটি, ছুনাঈর দুটি কিংবা ছুলাহীর তিনটি মুদ্রাকে বুঝাবে (আল-কাফী)।

২. মাসআলা : দাম উল্লেখ না করে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা ফাসিদ হবে। বিক্রেতা যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই গোলামটি বিনামূল্যে বিক্রি করলাম আর ক্রেতা বলে, আমি গ্রহণ করলাম, তবে সে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাহীরিয়া)।

৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে দশ দিরহাম পাবে। এখন সে যদি তাকে বলে, তুমি এই কাপড়টি আমার কাছে সেই দশ দিরহামের আংশিকের বিনিময়ে আর এই কাপড়টি সেই দশ দিরহামের অবশিষ্ট অংশের বিনিময়ে বিক্রি করলে আর সেও যদি বলে, হাঁ, তোমার কাছে বিক্রি করলাম, তবে তা জায়েয হবে। আর যদি বলে, আমার কাছে এটা দশ দিরহামের আংশিকের বিনিময়ে এবং এইটি দশ দিরহামের আংশিকের বিনিময়ে বিক্রি করলে, আর সে বলে, হাঁ, বিক্রি করলাম, তাহলে সে বিক্রি ফাসিদ হবে। কেননা দশ দিরহাম থেকে যা অবশিষ্ট থাকে, তার পরিমাণ অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে প্রথম অবস্থায় দশ দিরহাম হতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা : পণ্য বা মূল্যের অজ্ঞতার কারণে বিক্রয় তখনই ফাসিদ হয়, যখন তা অর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়। অজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যদি অর্পণ সম্ভব হয়, তাহলে ফাসিদ হবে না, যেমন স্তূপের পরিমাণ অজ্ঞাত। কেউ যদি নির্দিষ্ট এক স্তূপ মাল বিক্রি করে, তাহলে পরিমাণ অজ্ঞাত হলেও বিক্রি বৈধ হবে। এমনভাবে নির্দিষ্ট গাঁটের কাপড় সংখ্যা অজ্ঞাত থাকলেও বিক্রি অবৈধ হয় না (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই গমের স্তূপটি প্রতি কাফীয এক দিরহাম দরে বিক্রি করলাম, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঐ স্তূপের মাত্র এক কাফীয গম এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি বৈধ হবে, অবশিষ্ট গম বিক্রি বৈধ হবে না। তবে হাঁ, ক্রেতা মজলিস ত্যাগের আগেই যদি জানতে পারে সে স্তূপে সর্বমোট কত কাফীয গম আছে, তাহলে তার ইখতিয়ার হাসিল হবে। চাইলে সে প্রতি কাফীয এক দিরহাম হারে সবটাও নিতে পারে, আর চাইলে নাও নিতে পারে। তবে তার পক্ষ হতে এক দিরহামের বিনিময়ে এক কাফীয বিক্রি অবধারিত হয়ে যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, প্রতি কাফীয এক দিরহাম হারে গোটা স্তূপেই বিক্রি অবধারিত হয়ে যাবে, তাতে সর্বমোট কত কাফীয আছে তা তার জানা থাকুক কিংবা নাই থাকুক।

এমনিভাবে যদি বলে, তোমার কাছে এই স্তূপ বিক্রি করলাম প্রতি দুই কাফীয দুই দিরহাম বা প্রতি তিন কাফীয তিন দিরহাম হারে, তবে সে ক্ষেত্রেও একই রকমের মতভেদ রয়েছে (শারহুত-তাহাবী)।

৬. মাসআলা : উপরিউক্ত অবস্থায় যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিরোধ দেখা না দেয় এবং এ অবস্থায় বিক্রেতা গোটা স্তূপ বা তার অংশবিশেষ পরিমাপ করে ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়, তবে যে পরিমাণ বুঝিয়ে দেবে তাতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রি অবধারিত হয়ে যাবে। আর অবশিষ্ট অংশে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। যে সব ওজনী দ্রব্য ত্যাগ করলে কোন ক্ষতি হয় না তাতেও একই রকমের মতভেদ রয়েছে, যেমন মধু, তেল প্রভৃতি (আল-মুয়মারাত)।

৭. মাসআলা : যে সব জিনিসে গজের মাপ প্রচলিত, তার হুকুম নিম্নরূপ- যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই জমি প্রতি গজ এত মূল্যে বিক্রি করলাম, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে ক্ষেত্রে সবটাতেই বিক্রি নাজায়েয হয়ে যাবে। যেমন এক গজে সে বিক্রি জায়েয হবে না, তেমনি অবশিষ্ট অংশেও নয়। হাঁ, মজলিসের মধ্যেই যদি ক্রেতা জমির সর্বমোট গজ সংখ্যা জানতে পারে, তাহলে তার ইখতিয়ার লাভ হবে। আর যদি তা জানার আগেই তারা আলাদা হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, সবটাতেই বিক্রি বৈধ হবে এবং প্রতি গজের বিনিময়ে ক্রেতাকে সেই মূল্য পরিশোধ করতে হবে, যা চুক্তিতে ধার্য করা হয়েছিল আর তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না।

এমনিভাবে যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই কাপড়টি প্রতি দুই গজ দুই দিরহাম বা প্রতি তিন গজ তিন দিরহাম হারে বিক্রি করলাম, তবে সে ক্ষেত্রেও ওই একই রকমের মতভেদ।

যে সব ওজনী দ্রব্য ভাগ করলে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাতেও ওই একই রকমের হুকুম প্রযোজ্য।

গণনা নির্ভর দ্রব্যের হুকুম এই যে, যে সব দ্রব্য গুণে বিক্রি হয় তার এককসমূহ যদি কাছাকাছি হয় (অর্থাৎ খুব বেশী ছোট-বড় না হয়), তবে হুকুম কায়লী ও ওজনী দ্রব্য সম্পর্কে বর্ণিত হুকুমেরই মত।

আর এককসমূহের মধ্যে পার্থক্য যদি বেশী হয়, যেমন আমি তোমার কাছে এই ছাগলের পালটি বিক্রি করলাম এর প্রত্যেকটি ছাগল দশ দিরহাম করে, তাহলে এর হুকুম সম্পর্কেও গজী দ্রব্যের অনুরূপ মতভেদ রয়েছে।

যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই ছাগলের পালটি বিক্রি করলাম, প্রতি দুইটি ছাগল বিশ দিরহাম করে, তাহলে আমাদের ইমামত্রয়ের মতে সবটার মধ্যেই বিক্রি নাজায়েয হবে। যদি মজলিসের মধ্যেই ক্রেতা ছাগলের সর্বমোট সংখ্যা জেনে নেয় এবং বিক্রিকে গ্রহণ করে নেয়, তবুও জায়েয হবে না। (শারহুত-তাহাবী)।

৮. মাসআলা : যদি স্তূপের এক কাফীয বাদে বাকী সবটা বিক্রি করে তবে তা জায়েয আছে, পক্ষান্তরে যদি এক পাল ছাগল বিক্রি করে এবং অনির্দিষ্টভাবে তা থেকে বাদ রাখে তবে সে বিক্রি ফাসিদ হবে (আস-সিরাজুল-ওয়াহাজ)

৯. মাসআলা : যদি এক মিছকাল ওজনের কথা বলে একটি মুজ্জা বিক্রি করে, তারপর ক্রেতা তার ওজন বেশী দেখতে পায়, তবে সে বেশীটা তারই হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাফীখান)।

১০. মাসআলা : যদি প্রতি কাফীয এক দিরহাম হারে এক স্তূপ গম ও এক স্তূপ যব বিক্রি করে এবং তাতে মোট কত কাফীয আছে তা উল্লেখ না করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ক্রেতা সর্বমোট পরিমাণ না জানা পর্যন্ত সমগ্র স্তূপের বিক্রি ফাসিদ হবে। সর্বমোট পরিমাণ জানার পর ইখতিয়ার লাভ হবে। চাইলে সে কেবল গম থেকেও প্রতি কাফীয এক দিরহাম হিসেবে নিতে পারবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সমগ্র স্তূপের বিক্রি বৈধ হবে।

যদি বলে, উভয় থেকে এক কাফীয এক দিরহাম, তবে এক কাফীযের ভেতর বিক্রি বৈধ হবে, যার অর্ধেক হবে গম এবং অর্ধেক যব। অবশিষ্ট অংশে বিক্রি বৈধ নয়। যদি সর্বমোট পরিমাণ জ্ঞাত হতে পারে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার ইখতিয়ার লাভ হবে।

যদি যব ও গমের স্তূপ এই কথার উপর বিক্রি করে যে, প্রত্যেক স্তূপে দশ কাফীয আছে এবং প্রতি কাফীযের দাম এক দিরহাম, তাহলে প্রত্যেকটাতে অর্ধেক মূল্যে অর্থাৎ দশ দিরহামে বিক্রি অবধারিত হয়ে যাবে। তারপর ক্রেতা যদি কবজা করার পর তার কোন একটাতে দোষ পায়, তাহলে বিশেষভাবে সেই অংশ অর্ধেক মূল্যের পরিবর্তে ফেরত দিতে পারবে। যদি উভয় হতে প্রতি কাফীয এক দিরহাম হারে বিক্রি করে তারপর ক্রেতা তার কোন একটিকে দোষ পায়, তবে বিশেষভাবে দূষিতটাকে তার অংশের মূল্যের পরিবর্তে ফেরত দিতে পারবে। যদি গমের দাম যবের দামের দ্বিগুণ হয়, তাহলে যব ফেরত দেবে দামের এক-তৃতীয়াংশ এবং গম ফেরত দেবে দামের দুই-তৃতীয়াংশের পরিবর্তে।

যদি বলে, উভয় হতে এক কাফীয এক দিরহামে, তবে সেটা উভয় হতে প্রতি কাফীয এক দিরহামে বলার মতই।

যদি এক স্তূপ গম ও পাল ছাগল এই কথায় বিক্রি করে যে, স্তূপে আছে দশ কাফীয এবং ছাগল আছে দশটি, প্রতি ছাগল ও কাফীয দশ দিরহামে, তাহলে ক্রেতা উভয়টি যদি দশটি করে পায় বিক্রি বৈধ হবে। পালে যদি ছাগল পায় এগারটি তাহলে সবটাতেই বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি পালের ভেতর দশটি ছাগল এবং স্তূপে এগার কাফীয পায় তবে বিক্রি বৈধ হবে। যদি উভয়টিই নয়টি করে পায় তবুও বিক্রি বৈধ হবে, সে ক্ষেত্রে মূল্য হতে দশ দিরহাম কাটা যাবে এবং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি ছাগলের পালে দশটি এবং স্তূপে নয় কাফীয পায়, তবে বিক্রি বৈধ হবে এবং সে ক্ষেত্রে প্রতি দশ দিরহামকে একটি ছাগল ও এক কাফীযের মধ্যে ভাগ করা হবে আর অতিরিক্ত ছাগলটির সঙ্গে এই গম হতেই এক কাফীয যুক্ত করে দেওয়া হবে। অবশেষে সর্বমোট গমের অংশে যে মূল্য পড়েছে তা যখন

বের হয়ে আসবে, তখন তা থেকে দশ দিরহাম বাদ দেওয়া হবে। তারপর অবশিষ্ট মূল্য সবটা গ্রহণ করা বা পরিত্যাগ করার ইখতিয়ার ক্রেতার থাকবে।

যদি পালের ভেতর ছাগল পায় নয়টি আর স্তূপে পায় দশ কাফীয তবে স্তূপের এক কাফীযে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে, যেহেতু তার মূল্য অজ্ঞাত রয়ে গেছে। কেননা তার মূল্য তখনই জানা যাবে যখন তার ও অনুপস্থিত ছাগলের মধ্যে মূল্য ভাগাভাগি হবে। একই চুক্তির আংশিক পণ্যে বিক্রি ফাসিদ হলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সবটাতেই বিক্রি ফাসিদ হয়ে যায়। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সবটাতেই ফাসিদ হয় না। কাজেই তাদের মতে নয়টি ছাগল ও নয় কাফীযে বিক্রি জায়েয হবে। অবশ্য ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে (মুহীত : আস-সারাকসী)।

১১. মাসআলা : 'আল-কুদুরী' গ্রন্থে আছে, যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই গোশত প্রতি রিতল (পরিমাপ বিশেষ) এত দরে বিক্রি করলাম, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সবটাতেই বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সবটাতেই বিক্রি জায়েয এবং ক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা : প্রতি ভার এত টাকা দরে কেউ আঙ্গুর কিনল আর সে ভারের পরিমাণও তাদের কাছে পরিচিত, এ অবস্থায় ভারের সমস্ত আঙ্গুর যদি একই জাতীয় হয় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী এক ভারে বিক্রি বৈধ হওয়ার কথা, যেমন প্রতি কাফীয এক দিরহাম হারে গমের স্তূপ বিক্রি করা হলে সে ক্ষেত্রে তিনি এ কথাই বলেন।

আঙ্গুর বিভিন্ন জাতের হলে তখন ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এরূপ বিক্রি আদৌ জায়েয নয়, যেমন ছাগলের পাল বিক্রির ক্ষেত্রে জায়েয হয় না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে আঙ্গুর যদি একই জাতের হয়, তবে স্থিরীকৃত দরে সবটা আঙ্গুরেই বিক্রি বৈধ হবে। এমনভাবে বিভিন্ন জাতের ক্ষেত্রেও তাঁরা একই মত পোষণ করেন। সাদরুশ-শাহীদ (র) তার 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে এরূপই উদ্ধৃত করেছেন। ফকীহ আবুল লাইছ (র) আঙ্গুর একই জাতের হলে সে ক্ষেত্রে বিক্রি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত বলে উল্লেখ করেন, আর বিভিন্ন জাতের হলে তাঁর বর্ণনা মতে তখন জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে উপরিউক্ত মতভেদ তুলে ধরেন। ফকীহ আবুল লায়ছ (র) বলেন, সাধারণের সুবিধার্থে দাহেবায়নে মতের উপরই ফাতওয়া দেওয়া হয় (আল-খুলাসা)।

১৩. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, আমি এই জাহাজের ইটগুলো তোমার কাছে বিক্রি করলাম এর প্রতি হাজার ইট দশ দিরহাম। এ বিক্রি বৈধ হবে কি? না, এ বিক্রি ফাসিদ। পক্ষান্তরে যদি বলত, আমি এর থেকে এক হাজার ইট তোমার কাছে দশ দিরহামে বিক্রি করলাম, তাহলে যদি তাকে এক হাজার গুণে দেওয়া হয় তবে বিক্রি চূড়ান্ত হয়ে যাবে। গণনা না করা পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই বিক্রি প্রত্যাহার করার ইখতিয়ার থাকবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : 'আল- বায়যাযিয়া'-এর আদে, কেউ যদি এই কথার উপর আংগুর কেনে যে, তাতে এক হাজার মান্ন, (পরিমাপ বিশেষ) আছে, পরে দেখা গেল, আছে মাত্র নয়শ' মান্ন, তবে বিক্রেতার জন্য একশ' মান্নের মূল্যও হালাল হবে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী অবশিষ্টাংশে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-বাহরর রাযিক)।

১৫. মাসআলা : পণ্য যদি কায়লী দ্রব্য হয় এবং বিক্রেতা সর্বমোট কায়লের পরিমাণ উল্লেখ করে, তবে সে পরিমাণ উল্লেখ করবে তার সংগেই বিক্রি চুক্তি সম্পূর্ণ হবে, যেমন বলল, আমি তোমার কাছে এই স্তূপ বিক্রি করছি এতে একশ' কাফীয আছে, প্রতি কাফীয এক দিরহাম কিংবা বলল, এতে আছে একশ' কাফীয, যার দাম একশ' দিরহাম। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক কাফীযের পৃথক দাম বলুক, না বলুক হুকুম একই হবে। সর্বমোট যত কাফীযের কথা বলবে, মাপার পর যদি তাই পাওয়া যায়, তবে তো ভাল, ক্রেতাকে সবটাই নিতে হবে। তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি একশ' কাফীযের বেশী পাওয়া যায়, তবে বেশীটা বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে না। তা বিক্রেতারই থেকে যাবে। ক্রেতা কেবল সেই পরিমাণই পাবে, একশ' দিরহামের বিনিময়ে যা স্থির করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রেও তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। যদি একশ' কাফীযের কম পাওয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। উপস্থিত পরিমাণকে আনুপাতিক মূল্যে গ্রহণ করবে আর চাইলে সে নাও নিতে পারে।

প্রতি কাফীযের আলাদা দাম বলুক অথবা একই সঙ্গে সবটার দাম বলুক সর্বাবস্থায় মাপে যা কম হবে তার মূল্য অবশ্যই বাদ যাবে।

প্রথমবার মাপার দ্বারাই উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। এরপরে পরিমাপ করলে তাতে অক্ষিপ করা হবে না। উপরিউক্ত হুকুম এমন যে, কোনও কায়লী ও ওজনী দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা বিভাজনে কোন ক্ষতি হয় না (শারহুত-তাহাবী)।

১৬. মাসআলা : কেউ যদি এই কথার উপর একটি কাপড় কেনে যে, তাতে দশ গজ আছে, দাম দশ দিরহাম কিংবা এই কথার উপর জমি কেনে যে, তার পরিমাণ একশ' গজ দাম একশ' দিরহাম, তারপর মাপে যদি কম পাওয়া যায়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে যা পাওয়া গেছে তাই পূর্ণ দাম দিয়ে গ্রহণ করবে অথবা ত্যাগ করবে।

যেই পরিমাণ বলেছিল, মাপে তার বেশী পাওয়া গেলে সে বেশীটা ক্রেতার হয়ে যাবে এবং এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। কিন্তু কম হলে লোভনীয় গুণ অনুপস্থিতির কারণে ক্রেতার সম্ভ্রুটি অপূর্ণ সাব্যস্ত হয় বলে তার ইখতিয়ার লাভ হয়, তবে মূল্য থেকে কিছুই কমানো হবে না (আল-কাফী)।

১৭. মাসআলা : যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই কাপড় বা এই জমি এই কথার উপর বিক্রি করছি যে, এতে দশ গজ আছে, প্রতি গজের দাম এক দিরহাম, তারপর যদি দশ গজই পাওয়া যায়, তবে বিক্রি চূড়ান্ত হয়ে যাবে এবং ক্রেতাকে দশ দিরহাম পরিশোধ করতে হবে, তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। যদি সে তাতে পনের গজ পায়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে প্রতি গজ এক দিরহাম হারে সবটাই গ্রহণ করবে আর চাইলে পরিত্যাগ

করবে। যদি নয় গজ বা তারও কম পায়, তবে চাইলে যতটুকু আছে, তার অংশের মূল্য দিয়ে তাই গ্রহণ করবে (আল-ইয়ানাবী)।

১৮. মাসআলা : কেউ যদি এই কথার উপর একটি কাপড় কেনে যে, তাতে দশ গজ আছে, প্রতি গজের দাম এক দিরহাম এবং তারপর সে তাতে সাড়ে দশ গজ পায়, তবে চাইলে সে তা দশ দিরহামে গ্রহণ করবে।

যদি সাড়ে নয় গজ পায়, তবে চাইলে তা নয় দিরহামে গ্রহণ করবে। এ হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যদি সাড়ে দশ গজ পায় তবে চাইলে এগার দিরহামে আর যদি সাড়ে নয় গজ পায় তবে চাইলে দশ দিরহামে গ্রহণ করবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সাড়ে দশ গজ পাইলে সাড়ে দশ দিরহামে আর সাড়ে নয় গজ পাইলে সাড়ে নয় দিরহামে গ্রহণ করবে। তবে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতই সঠিক।

ফুকাহায় কিরাম বলেন, এ মাসআলা এমন গজী দ্রব্যে প্রযোজ্য, যার সকল দিক সমান হয় না, বরং পার্থক্য থাকে। যে সব গজী দ্রব্যের সকল দিক সমান, কোন পার্থক্য থাকে না, যেমন সুতি বস্ত্র, যদি তা এই কথার উপর কেনে যে, তাতে দশ গজ আছে এবং তার দাম এত, তারপর তাতে বেশী পায়, তবে সে বেশীটা ক্রেতার জন্য বৈধ হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৯. মাসআলা : এমনিভাবে কাঠ বা অন্যান্য যাবতীয় গজী বস্তুরও একই হুকুম। যে সব ওজনী দ্রব্য বিভাজনে ক্ষতি হয় যেমন- তামা, লোহা প্রভৃতি দ্বারা তৈরি পাত্র, এ সব ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত হুকুম প্রযোজ্য। যেমন কেউ কেউ বলেন, আমি তোমার কাছে এই পাত্রটি এই কথার উপর একশ' দিরহাম বিক্রি করলাম যে, এর ওজন দশ মান্ন (পরিমাপ বিশেষ)। তারপর ক্রেতা তাতে ওজন কম বা বেশী পেল, তা এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা প্রতি মান্নের আলাদা দাম বলুক বা নাই বলুক, হুকুম উপরের অনুরূপই হবে (আল-মুযমারাত)।

২০. মাসআলা : কেউ বলল, আমি তোমার কাছে এই কাপড়টি এই প্রান্ত হতে ওই প্রান্ত পর্যন্ত বিক্রি করছি। এতে তের গজ আছে। পরে দেখা গেল আছে পনের গজ। এখন বিক্রেতা যদি বলে, আমি ভুল করেছিলাম, তবে তার কথায় অক্ষিপ করা হবে না। আইনত সবটা কাপড়ই স্থিরীকৃত দামে ক্রেতা পেয়ে যাবে। তবে ধর্মত তার জন্য সেটা হালাল হবে না (আয-যাহীরিয়া)।

২১. মাসআলা : কেউ যদি রূপার কোন অলংকার/পাত্র এই কথার উপর বিক্রি করে যে, তার ওজন একশ' মিছকাল, দাম দশ দীনার। তারপর তারা উভয়ে পণ্য ও দাম কবজা করার পর পৃথক হয়ে যায় এবং তারপর ক্রেতা তা মেপে দেখতে পায় যে, তার ওজন দু'শ মিছকাল, তবে দশ দীনারের বিনিময়েই সে সবটা ক্রেতার হয়ে যাবে। দাম কিছুই বাড়তে হবে না। যদি

আশি বা নব্বই মিছকাল পায়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি প্রতি দশ মিছকালে আলাদা মূল্য স্থির করে এবং বলে, আমি তোমার কাছে এটা এই কথার উপর বিক্রি করছি যে, এর ওজন একশ' মিছকাল, দাম দশ দীনার, প্রতি দশ মিছকাল এক দীনার, তারপর তারা পণ্য ও মূল্য কবজা করে নেয় এবং তারপর ক্রেতা যদি তা মেপে একশ' পঞ্চাশ মিছকাল পায়, এ ক্ষেত্রে তারা পরস্পর পৃথক হওয়ার আগেই ক্রেতা তা জানতে পারলে তার ইখতিয়ার লাভ হবে। চাইলে সে দাম পাঁচ দীনার বাড়িয়ে দেবে এবং পনের দীনারের বদলে সবটা নিয়ে যাবে অথবা সে তা পরিত্যাগ করবে। যদি পৃথক হওয়ার পরে জানে, তবে এক-তৃতীয়াংশের ভেতর বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশে তার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে পূর্ণ দশ দিরহাম দ্বারা সেই দুই অংশ গ্রহণ করবে, অন্যথায় সবটাই পরিত্যাগ করবে এবং দীনার ফেরত নেবে। যদি পঞ্চাশ মিছকাল পায় এবং তা পৃথক হওয়ার পর বা আগে জানতে পারে, তবে তার ইখতিয়ার। চাইলে তা ফেরত দিয়ে দশ দীনার ফেরত নেবে অথবা সেই পঞ্চাশ দীনারেই রাখী হয়ে যাবে এবং মূল্য হতে পাঁচ দীনার ফেরত নেবে। এমনিভাবে যদি স্বর্ণের কোন অলংকার/পাত্র দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে তবে সে ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী হুকুম হবে (শারহুত-তাহাবী)।

২২. মাসআলা : যদি সোনা-রূপার কোন জিনিস সমজাতীয় দ্রব্যের বদলে সমওজনে বিক্রি করে। তারপর ক্রেতা তাতে বেশী ওজন পায়, তবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে জানতে পারলে তার ইখতিয়ার লাভ হবে। চাইলে মূল্য বাড়িয়ে দেবে। অথবা তা পরিত্যাগ করবে। আর যদি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে জানে তবে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বেশীটুকুর বিপরীতে কবজা পাওয়া যায় নি। আর যদি ওজনে কম পায়, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে তাতে রাখী হয়ে যাবে এবং তার বিনিময়ে যে মূল্য দিয়েছে সেই বেশী মূল্য ফেরত নেবে। আর চাইলে সে সবটাও ফেরত দিতে পারে, তাতে প্রতি দিরহাম ওজনের বদলে পৃথক মূল্য বলুক আর নাই বলুক (আল-বাহরুর-রাযিক)।

২৩. মাসআলা : গণনা নির্ভর দ্রব্যের হুকুম নিম্নরূপ- যদি তার এককসমূহ আকারের দিক থেকে কাছাকাছি হয়ে থাকে, যেমন আখরোট, ডিম প্রভৃতি, তবে তার হুকুম ওজনী ও কায়লী দ্রব্যের অনুরূপ। এ ক্ষেত্রে চুক্তির সম্পর্ক হবে তার পরিমাণের সঙ্গে, তাতে সবগুলোর সমষ্টিক মূল্য বলুক অথবা প্রতিটির আলাদা মূল্য স্থির করুক। আর যদি আকারের পার্থক্য বেশী হয়, যেমন ছাগল, গরু ইত্যাদি, তবে প্রত্যেকটির আলাদা মূল্য বলুক (যেমন বলল, এই পালে একশটি ছাগল আছে, এর দাম এক হাজার দিরহাম) অথবা আলাদা মূল্য বলুক (যেমন বলল, এর প্রতিটি ছাগল দশ দিরহাম) তবে উভয় অবস্থায় ক্রেতা একশ' ছাগল পেলে বিক্রি বৈধ হবে। আর যদি বেশী পায় তবে সবটার ভেতর বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে, যদি কম পায়, তবে সে ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটির আলাদা মূল্য না বললে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। আর প্রত্যেকটির আলাদা মূল্য বললে সে বিক্রি জায়েয হবে, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে স্থিরীকৃত মূল্য দিয়ে অবশিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করবে, নয়ত পরিত্যাগ করবে। ছোট-বড় পার্থক্য বেশী এমন যে কোনও গুণতি দ্রব্যের এমনই হুকুম।

যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই ছাগলের পাল বিক্রি করলাম প্রতি জোড়া বিশ দিরহাম এবং এতে সর্বমোট ছাগল আছে একশটি, তাহলে সে বিক্রি ফাসিদ হবে, যদিও তাতে তার বর্ণিত সংখ্যক ছাগল পাওয়া যায় (শারহুত-তাহাবী)।

২৪. মাসআলা : যদি এই কথার উপর খাদ্যের স্তূপ কেনে যে, তাতে দশ কাফীযের বেশী আছে, তারপর তাতে দশ কাফীযের বেশীই পাওয়া গেল, তবে সে বিক্রি জায়েয। যদি দশ কাফীয বা তার কম পাওয়া যায় তবে জায়েয হবে না। যদি এই কথার উপর কেনে যে, তাতে দশ কাফীযের কম আছে, তারপর তাতে দশ কাফীযের কমই পাওয়া গেল, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে। দশ কাফীয বা তার বেশী পাওয়া গেলে জায়েয হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, শেষোক্ত অবস্থায়ও জায়েয হবে। যদি এই কথার উপর বাড়ি কেনে যে, তাতে দশ গজ জমি আছে, তবে তা সর্বাবস্থায়ই জায়েয (আল-ফাতওয়া, আস-সুগরা)।

২৫. মাসআলা : যদি এই কথার উপর গমের স্তূপ বিক্রি করে যে, তাতে এক কুরুর (পরিমাপ বিশেষ)-এর কম আছে বা এক কুরুর-এর বেশী আছে, তারপর তাতে তার কথা মত এক কুরুর-এর কম বা বেশীই পাওয়া গেল তবে সে বিক্রি জায়েয হবে। যদি পূর্ণ এক কুরুর পাওয়া যায় তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে।

যদি এই কথার উপর বিক্রি করে যে, তাতে এক কুরুর বা তার কম আছে তবে যাই পাওয়া যাক বিক্রি সহীহ হবে। কেননা এক কুরুর বা তার কম পাওয়া গেলে তো কথা সে মতই ছিল। আর বেশী পাওয়া যায় সে বেশীটা বিক্রির অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং সেটা ফেরত দিয়ে দেবে এবং নির্ধারিত মূল্যে এক কুরুর গ্রহণ করবে।

এমনিভাবে যদি এই কথার উপর বিক্রি করে যে, তাতে এক কুরুর বা তার বেশী আছে, তখনও একই হুকুম, অবশ্য তার কম পাওয়া গেলে সেই অনুপাতে দামও বাদ যাবে এবং তখন তার ইখতিয়ার থাকবে (মুহীত : আস-সারাকসী)।

২৬. মাসআলা : যদি এই কথার উপর গমের স্তূপ কেনে যে, তাতে এক কুরুর আছে, কিন্তু ক্রেতা তাতে এক কাফীয পরিমাণ কম পেল, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে অবশিষ্ট পরিমাণে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে এবং এটাই সহীহ। এমনিভাবে যদি আখরোট প্রতি এক পয়সা দরে একশ' আখরোট কেনে, তারপর তাতে কিছু আখরোট সম্পূর্ণ নষ্ট পায়, তবে নষ্টগুলোতে বিক্রি জায়েয হবে না (আল-হাবী)।

২৭. মাসআলা : তারপর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে অবশিষ্ট আখরোটগুলোতেও সে অবৈধতা সম্প্রসারিত হবে। এমনিভাবে প্রতি ডিম এক দানিক (এক দিরহামের ছয় ভাগের এক ভাগ) হারে যদি একশ' ডিম কেনে তারপর কতক ডিম নষ্ট পায়, তবে নষ্ট ডিমগুলোতে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বাকী ডিমগুলোতেও তা সম্প্রসারিত হবে। এ সব মাসআলার উপর কিয়াস করলে আরও কিছু বিষয়ের সমাধান বের হয়ে আসে। যেমন, কেউ যদি নির্দিষ্ট আঙ্গুরের বাগানের নির্দিষ্ট আঙ্গুর এই কথার উপর কেনে যে, তাতে এত 'মান্ন' (পরিমাপ বিশেষ) আছে, তারপর সে তাতে সেই পরিমাণ বা তার কমবেশী পায়, তবে উপরিউক্ত নিয়মেই তার ফায়সালা হবে (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা : কেউ যদি এই কথার উপর একটি গাঁট বিক্রি করে যে, তাতে দশটি কাপড় আছে, তারপর তাতে একটি কাপড় কম বা বেশী পাওয়া যায় তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-কাফী)।

২৯. মাসআলা : যদি প্রতিটি কাপড়ের মূল্য স্থির করে দেয় তবে সে ক্ষেত্রে একটি কাপড় কম পাওয়া গেলে অবশিষ্টগুলোতে বিক্রি সহীহ হবে আর তখন ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। আর বেশী পাওয়া গেলে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। কোনও বর্ণনা মতে কমতির অবস্থায়ও ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রি ফাসিদ সাব্যস্ত হবে। তবে জায়েয হওয়াটাই সহীহ (আত-তাবয়ীন)।

৩০. মাসআলা : এক ব্যক্তির কাছে গম বা অন্য কোন কায়লী অথবা ওজনী দ্রব্য আছে। তার ধারণা চার হাজার মান্ন (পরিমাপ বিশেষ) হবে। সে তা চার ব্যক্তির কাছে বিক্রি করল। প্রত্যেকের কাছে এক হাজার মান্ন। দামও নির্দিষ্ট করল। কিন্তু পরিমাপ করে দেখা গেল তাতে কম আছে। এমতাবস্থায় তার হুকুম কী হবে? কারও মতে তাদের ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে যা আছে তাই অংশের মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে অথবা পরিত্যাগ করবে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের মতই সঠিক যারা বলেন, অবস্থাভেদে এর হুকুম ভিন্ন হবে। যদি তাদের সকলের কাছে একত্রে বিক্রি করে তবে উপরে যেমন বলা হল হুকুম তাই হবে। আর যদি পর্যায়ক্রমে বিক্রি করে তবে কমটা পড়বে সর্বশেষ ব্যক্তির পালায়, প্রথম যারা কিনেছে তাদের ভাগে তা পড়বে না। আর সে ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে যা আছে তাই তার মূল্য দিয়ে নেবে অথবা পরিত্যাগ করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩১. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) আল-জামিউস-সাগীর গ্রন্থে বলেন, কেউ যদি কারও কাছ থেকে একশ' দিরহামের বিনিময়ে এই কথার উপর এক মশক তেল কেনে যে, ক্রেতা মশকসহ তেল পাবে আর উভয় মিলে এর ওজন হচ্ছে একশ' রাতল, তারপর ক্রেতা যদি তা মেপে দেখে যে, মোট ওজন আছে নব্বই রাতল তার মধ্যে মশকের ওজন বিশ রাতল এবং তেলের সত্তর রাতল, তবে যে পরিমাণ ওজন কম হল, তা তেল থেকেই যাবে। এমতাবস্থায় মোট দামটাকে আশি রাতল তেল ও পাত্রের উপর ভাগ করা হবে। তারপর তেলের ভাগে যা পড়বে তা থেকে কমতিটুকুর মূল্য বাদ দেওয়া হবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে ক্রেতাকে তাই পরিশোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে অবশিষ্ট তেল আনুপাতিক মূল্যে রাখবে অথবা পরিত্যাগ করবে।

আমাদের অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী সবটার ভেতরই বিক্রি ফাসিদ হওয়ার কথা।

ক্রেতা যদি মেপে দেখে মশকের ওজন ষাট রাতল এবং তেলের চল্লিশ ওজন রাতল, তবে দেখতে হবে মানুষের সাধারণ লেনদেনে মশকে ওজন এতটা হয় কিনা। যদি না হয়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। সে চাইলে পূর্ণ মূল্যে সবটা রাখবে আর না চাইলে পরিত্যাগ করবে।

ক্রেতা যদি মশকের ওজন পায় একশ' রাতল এবং তেলের পঞ্চাশ রাতল, তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি মশকের ওজন পায় রাতল এবং তেলের ওজন একশ' রাতল তবে ক্রেতা পূর্ণ মূল্যে মশক এবং আশি রাতল তেল পাবে। বাকিটা বিক্রেতাকে ফেরত দেবে। এমনিভাবে যদি মশক ও তেল আলাদা থাকে এবং উভয়টা একত্রে কেনে তবে সে ক্ষেত্রেও মাসআলা উপরে বর্ণিত নিয়মেই হবে (আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে তেল কেনে যে, সে তার পাত্র দ্বারা তা মেপে নেবে এবং প্রত্যেকবারের মাপে পাত্রের বদলে পঞ্চাশ রাতল বাদ দেওয়া হবে, তবে সে বেচাকেনা ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি এই শর্তে কেনে যে, পাত্রের ওজন পরিমাণ বাদ দেওয়া হবে তবে তা জায়েয (আল-জামিউস সাগীর)।

৩৩. মাসআলা : একটি পাত্রে আছে তেল এবং অপর পাত্রে ঘি। এক ব্যক্তি পাত্র ছাড়া কেবল সেই তেল ও ঘি এই কথার উপর কিনল যে, সে তেল ও ঘির মোট পরিমাণ হবে একশ' রাতল। তারপর সে মেপে দেখল ঘি আছে চল্লিশ রাতল এবং তেল ষাট রাতল। এরূপ ক্ষেত্রে সে ক্রেতাকে দশ রাতল তেল ফেরত দেবে এবং ঘির দাম থেকে দশ রাতলের দাম বাদ যাবে।

এমনিভাবে কেউ যদি বস্তায় ভরা গম ও যব বস্তা ছাড়া এই কথার উপর কেনে যে, উভয়ের মোট পরিমাণ হবে একশ' মান্ন (পরিমাপ বিশেষ), তবে তার হুকুমও উপরের অনুরূপ হবে। এমনিভাবে তিন প্রকার কয়ালি দ্রব্যের সঙ্গে একশ'কে সম্পৃক্ত করলে প্রত্যেক প্রকার থেকে একশ'র এক-তৃতীয়াংশ চুক্তির অধীনে আসবে (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা : সুনির্দিষ্ট কোন পাত্র দ্বারা মেপে বিক্রি করা জায়েয, যার পরিমাণ জানা নেই। এমনিভাবে ওজন জানা নেই এমন নির্দিষ্ট পাথর দ্বারা ওজন করে বিক্রিও জায়েয। ইমাম আবু হানীফা (র) হতে হাসান (র) বর্ণনা করেন যে, এরূপ বিক্রি জায়েয নয়। তবে প্রথমোক্ত মতই সহীহ (আল-কাফী)।

৩৫. মাসআলা : উপরিক্ত মাসআলা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন সে পাত্রে চাপ দিলে বেড়ে বেড়ে ওঠে না কিংবা (শীত ও তাপে) সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হয় না, যেমন কাঁসার পেয়ালা, মাটির পাত্র ইত্যাদি। পক্ষান্তরে চাপ দিলে যদি ফুলে ওঠে, যেমন থলে, টুকরি প্রভৃতি, তবে এসব পাত্র দ্বারা মেপে বিক্রি জায়েয নয়। অবশ্য পানির মশক ব্যতিক্রম, যেহেতু মানুষের মধ্যে এর রেওয়াজ আছে। তাই ইস্তিহসান হিসেবে একে জায়েয রাখা হয়েছে। এমনিভাবে যে পাথর দ্বারা মাপা হবে তা যদি ভেঙ্গে ক্ষয়ে যায় তবুও জায়েয নয়। যে সব বস্তু শুকিয়ে হালকা হয়ে যায়, যেমন খিরা, তরমুজ ইত্যাদি এর দ্বারাও মাপা জায়েয নয় (আত-তাবয়ীন)।

৩৬. মাসআলা : বিশুদ্ধরূপে বিক্রি বলবৎ থাকার জন্য এটাও শর্ত যে, যে পাত্র বা পাথর দ্বারা মাপা হবে তা আপন অবস্থায় বাকি থাকতে হবে। যদি পণ্য সমর্পণের আগে তা হারিয়ে যায় তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-বাহরুর-রায়িক)।

৩৭. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তির কাছে একটি দিরহাম আছে, সে কাউকে বলল, আমি তোমার কাছ থেকে এই কাপড়টি এর বিনিময়ে ক্রয় করলাম, এই বলে

সে নিজের দিরহামটির প্রতি ইশারা করল, এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি সে দিরহামটিকে ভেজাল দেখতে পায় তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি দাসী ক্রয় করার জন্য গেল এবং বিক্রেতাকে বলল, আমি এই বাঁদীটি এই থলির বিনিময়ে ক্রয় করলাম কিংবা বলল, এই থলির ভেতর যা আছে তার বিনিময়ে। চুক্তির পর বিক্রেতা যদি দেখে থলির মুদ্রা ঐ শহরের প্রচলিত মুদ্রা নয়, তাহলে তার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সেই মুদ্রা ফেরত দিয়ে শহরের প্রচলিত মুদ্রা তার কাছ থেকে আদায় করবে। আর যদি দেখা যায় সেই শহরে প্রচলিত মুদ্রাই থলির ভেতর আছে, তবে বিক্রি সহীহ হয়ে যাবে এবং বিক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না।

যদি বলে, এই থলিতে যে মুদ্রা আছে তার বিনিময়ে এই বাঁদীটি কিনলাম। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা থলির দিরহামগুলো দেখার পর ইখতিয়ার থাকবে। এই ইখতিয়ারকে خيار الكمية (পরিমাণগত ইখতিয়ার) خيار الرؤية (দেখা সম্পর্কিত ইখতিয়ার) নয়। কেননা মুদ্রায় خيار الرؤية হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৯. মাসআলা : কেউ যদি কোন পণ্য তার গায়ের সংকেতে লেখা দামে কেনে। কিন্তু তাতে কত লেখা আছে তা তার জানা না থাকে; তবে সে বিক্রি ফাসিদ। তবে কেনার পর মজলিসের থাকা অবস্থায়ই জানতে পারলে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে। মহান ইমাম, শায়খ, শামসুল আইম্মা : আল-হানাওয়ানী (র) বলতেন, মজলিসের ভেতর থাকা অবস্থায়ও যদি পণ্যের গায়ে লেখা সাংকেতিক দাম জানতে পারে, তবুও বিক্রি জায়েয হবে না। তবে উভয়ের সম্মতক্রমে নতুন চুক্তি হতে পারে (আয-যাখীরা)।

৪০. মাসআলা : গায়ের সাংকেতিক দাম জানার আগেই যদি ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন হয়ে যায়, তবে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। এমনভাবে যদি বিক্রেতা এই কথার উপর বিক্রি করে যে, অমুকে যে দামে বিক্রি করেছে সেই দামে বিক্রি করলাম আর সে দাম বিক্রেতা জানলেও ক্রেতার তা জানা নেই, তাহলে মজলিসের ভেতরেই সে তা জানতে পারলে বিক্রি সহীহ হবে, অন্যথায় বাতিল হয়ে যাবে (আল-খুলাসা)।

৪১. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি কাপড় গায়ের সাংকেতিক দামে বিক্রি করল এবং তারপর বিক্রেতা সে দাম খুলে বলার আগেই কাপড়টি আরেকজনের কাছে বিক্রি করল, এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিক্রি বৈধ হবে কি? হ্যাঁ, দ্বিতীয় বিক্রি বৈধ হবে। পক্ষান্তরে প্রথম ব্যক্তিকে যদি সে দাম খুলে বলে এবং তার অনুমোদনের আগেই সেটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করে তবে দ্বিতীয় বিক্রি বৈধ হবে না।

প্রকৃত দাম জানার আগেই যদি ক্রেতা কাপড়টি নষ্ট করে ফেলে তবে তাকে কাপড়ের বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

সংকেত (الرم) হচ্ছে সেই চিহ্ন, যা দ্বারা জানা যায় যে পণ্যটি কী দামে কেনা হয়েছে (আয-যাখীরিয়া)।

৪২. মাসআলা : ‘আল-আসল’ গ্রন্থে আছে, কেউ যদি বলে, আমি তোমার কাছ থেকে এই মাল সেই দামে গ্রহণ করলাম যে দামে বাজারে এর বেচাকেনা হয়, তবে সে বিক্রি ফাসিদ হবে। যদি বলে, অমুক ব্যক্তি যেই দামে কিনেছে, সেই দামে কিনলাম আর অপর সেই ব্যক্তির কেনা দাম তাদের উভয়ের জানা থাকে, তবে বিক্রি জায়েয হবে আর তাদের তা জানা না থাকলে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি তারা তার পরে জানতে পারে এবং সেটা তারা মজলিসে থাকা অবস্থায় হয়, তবে সে বিক্রি বিত্ত্বতায় রূপান্তরিত হবে। অবশ্য ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। কেননা তাকে যে মূল্য পরিশোধ করতে হবে তা সে সবেমাত্র জানতে পারল এরূপ ইখতিয়ারকে ‘প্রকৃত অবস্থা উন্মোচন প্রসূত ইখতিয়ার’ বলে (আয-যাখীরা)।

৪৩. মাসআলা : ‘শারহ-শাফী’ গ্রন্থে আছে, অমুকে যে দামে বিক্রি করেছে সেই দামে বিক্রি যদি এমন পণ্যের হয় যার দামে খুব একটা পার্থক্য হয় না, যেমন রুটি, গোশত প্রভৃতি, তবে তা বৈধ হবে। যদি এক গাঁট বস্ত্র তার মূল্যে বা তার হুকুমে কেনে তবে মূল্য অজ্ঞাত থাকার কারণে সে বিক্রি জায়েয হবে না (আল-খুলাসা)।

৪৪. মাসআলা : ‘দশে এগার’ এই হারের লাভে যদি কোন পণ্য বিক্রি করে এবং ক্রেতার জানা না থাকে যে, বিক্রেতা কী মূল্যে তা কিনেছে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, পরে সে তা জানতে পারলে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে, কিন্তু তখন তার ইখতিয়ার লাভ হবে। সুতরাং তখন চাইলে রাখবে অথবা পরিত্যাগ করবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে ইব্ন রুস্তম (র) এরূপ বর্ণনা করেছেন। ক্রেতা তা জানার পর সন্তুষ্ট থাকলে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে। ইব্ন সামা‘আ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, এ বিক্রি ফাসিদ। এর অর্থ, অনুমোদনের উপর বিক্রি স্থগিত থাকবে। ক্রেতা সঠিক দাম জানার আগে যদি গোলাম আযাদ বা বিক্রি করে তবে জায়েয হবে। আর গোলাম যদি মারা যায় তবে তাকে বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যদি সে গোলাম ক্রেতার আত্মীয় হওয়ার কারণে আযাদ হয়ে যায় এবং তার কবজাটা দর না জানা অবস্থায় হয়ে থাকে, তবে তাকে বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে (আল-মুহীত)।

৪৪. মাসআলা : কোন বাড়ি বা হাম্মামখানা থেকে দশ গজ বিক্রি করলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে বিক্রি ফাসিদ। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, যদি বাড়িটির আয়তন একশ’ গজ হয় তবে তা জায়েয হবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতা ‘একশ’ গজ থেকে দশ গজ’-এ কথা বলুক আর না-ই বলুক তাতে কোন পার্থক্য নেই (আন্-নাহরুল ফায়িক)।

৪৫. মাসআলা : সর্বমোট আয়তনের উল্লেখ না করলে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত কী, যে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে ইখতিলাফ আছে। সহীহ কথা যে, তখনও তাদের মতে বিক্রি জায়েয (আল-বাহরুর রায়িক)।

৪৬. মাসআলা : শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, আমাদের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নির্দিষ্ট কোন বাড়ির দশ ভাগের এক ভাগ বিক্রি করা জায়েয। যদি বলে, এই বাড়ি থেকে এক গজ বিক্রি করলাম, তবে যে এক গজের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা লক্ষ্য করতে হবে। যদি নির্দিষ্ট করে দেয় এবং বলে, এই কোণ থেকে এক গজ, কিন্তু অন্য জমি থেকে তা পৃথক করে

না দেয়, তবে বিক্রি সংঘটিত হবে বটে, কার্যকর হবে না, যে কারণে সমর্পণ করার জন্য বিক্রেতাকে চাপ দেওয়া যাবে না। আর যদি সে এক গজের জায়গা নির্দিষ্ট করে না দেয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে বিক্রি আদৌ জায়েয হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয হবে আর তখন সে বাড়ি মেপে দেখা হবে। যদি দশ গজ হয়, তবে ক্রেতা তার এক-দশমাংশে শরীক হবে।

শামসুল আইম্মা (র) উল্লেখ করেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে সঠিক কথা হচ্ছে যে, তাদের মতে এ বিক্রি জায়েয।

যদি বাড়ির এক অংশ বিক্রি করে, কিন্তু তা নির্দিষ্ট করে না দেয়, তবে শামসুল আইম্মা আল হালাওয়ানী (র)-এর বর্ণনা মতে সে বিক্রি জায়েয হবে না।

যদি বলে, আমি তোমার এই কাপড় থেকে এক গজ বিক্রি করলাম, কিন্তু কাপড়ের কোন জায়গা থেকে তা স্থির করল না, কিংবা বলল, এই কাঠ থেকে এক গজ বিক্রি করলাম, কিন্তু কোন জায়গা থেকে তা নির্দিষ্ট করল না, তবে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন যে, এ বিক্রি জায়েয কি-না সে সম্পর্কে উপরে বর্ণিত বাড়ির অনুরূপ মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ বিক্রি সকলের সতেই জায়েয (আল-মুহীত)।

৪৭. মাসআলা : যদি কোন কাপড় বা কাঠের নির্দিষ্ট এক দিক থেকে এক গজ কেনে তবুও তা জায়েয নয়। এমনকি তা কেটে অর্পণ করলেও জায়েয হবে না, অবশ্য ক্রেতা তা গ্রহণ করলে ভিন্ন কথা। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এরূপ বিক্রি জায়েয। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এটা ফাসিদ। তবে বিক্রেতা তা কেটে অর্পণ করলে ক্রেতার তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ইখতিয়ার থাকবে না (আল-কিন্য়া)।

৪৮. মাসআলা : কেউ যদি বলে, এই বাড়ি থেকে আমার প্রাপ্য অংশ তোমার কাছে এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম, তবে প্রাপ্য অংশের পরিমাণ ক্রেতার জানা থাকলে জায়েয হবে। যদিও বিক্রেতার জানা না থাকে। হাঁ, ক্রেতা যে অংশের কথা বলবে বিক্রেতা কর্তৃক তার তাসদীক জরুরী। আর ক্রেতার যদি তা জানা না থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে বিক্রি জায়েয হবে না, বিক্রেতার তা জানা থাকুক আর না থাকুক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৯. মাসআলা : যদি বাড়ির পাঁচ ভাগের এক ভাগ বা দুই ভাগ বিক্রি করে অথবা পাঁচ অংশ থেকে এক অংশ বা দুই অংশ বিক্রি করে তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কিয়াস অনুসারে জায়েয, কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী জায়েয নয় (আল-বাহরুর রায়িক)।

৫০. মাসআলা : কেউ যদি কারও কাছ থেকে জমি বা বাড়ির চত্বর কেনে এবং বিক্রেতা তার সীমানা উল্লেখ করে, কিন্তু দৈর্ঘ্য-প্রস্থে তার আয়তন উল্লেখ না করে তবে ক্রেতার সে সীমানা জানা থাকলে বিক্রি বৈধ হবে, যদি সে প্রতিবেশীদের না চেনে। যদি সীমানা উল্লেখ না করে এবং ক্রেতারও তা জানা না থাকে তবে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে তা নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব না হলে এবং সে জমি সম্পর্কে তারা ওয়াকিহাল থাকলে বিক্রি জায়েয হবে (আল খুলাসা)।

৫১. মাসআলা : কেউ যদি মাটিতে গর্ত করে তাতে গম জমা করে এবং তা বিক্রি করে কিন্তু তার পরিমাণ কত কিংবা গর্তের গভীরতাই বা কতটুকু তা ক্রেতার জানা না থাকে, তবে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি গর্তের গভীরতা সম্পর্কে জানা থাকে কিন্তু গমের পরিমাণ জানা না থাকে তবে বিক্রি জায়েয হবে এবং তার ইখতিয়ার থাকবে না (আয যহীরিয়া)।

৫২. মাসআলা : কেউ যদি কাউকে বলে, আমি তোমার কাছে এই একশ' ছাগল ওই একশ' ছাগলের বিনিময়ে বিক্রি করলাম, প্রতিটি ছাগল একটি ছাগলের বিনিময়ে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ।

কেউ যদি বলে, তোমার কাছে এই জীবিত গরুটি বিক্রি করলাম, এর প্রতি রাত্লে এক দিরহামের বিনিময়ে, তারপর ক্রেতা যদি সেটা কবজা করে এবং তার হাতে সেটা মারা যায়, তবে তাকে জরিমানাস্বরূপ বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কাউকে বলে, আমি তোমার কাছে এই ছাগলটি বিক্রি করলাম, এর প্রতি তিন রাত্লে এক দিরহামের বিনিময়ে এবং এটা জীবিত অবস্থায়ই ওজন করা হবে, তবে সে বিক্রি বাতিল। এমনভাবে যদি বলে, এর ওজন হচ্ছে পঞ্চাশ রাত্লে এবং অনুযায়ী ক্রেতা প্রতি তিন রাত্লে এক দিরহামে কেনে, তবে তখনও বিক্রি বাতিল হবে। এমনভাবে যদি বলে, আমি এই বেদানাটি তোমার কাছে বিক্রি করলাম এর সমওজনের দিরহামের দ্বারা, তবে সে বিক্রিও বাতিল (আল-মুহীত)।

৫৩. মাসআলা : কেউ যদি কাউকে বলে, আমি তোমার কাছে এই দামে একটি গোলাম বিক্রি করলাম, কিন্তু গোলামটির নাম বলল না এবং ক্রেতা তাকে দেখলও না, তবে সে বিক্রি বাতিল। কেননা অন্যের গোলাম হওয়ার কারণে এবং তার আরও একটি গোলাম থাকায় পণ্য অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

এমনভাবে যদি বলে, আমি তোমার কাছে একটি গোলাম বিক্রি করলাম, তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে, যদি তার আরও গোলাম থাকে। অবশ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি একমত হয় যে, পণ্য এই গোলামটি, তবে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু এই জায়েয হওয়ার অর্থ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা একমত হলে প্রথম বিক্রিটি বৈধতায় রূপান্তরিত হবে আবার কারও মতে তাদের মধ্যে গোলাম ও মূল্য লেন-দেনের ফলে একটি নতুন বিক্রি সংঘটিত হবে, এমন নয় যে, বিক্রিই বৈধতায় রূপান্তরিত হবে (আয-যাখীরা)।

৫৪. মাসআলা : 'কিতাবুল ইতাক'-এর ভাষ্য গ্রন্থে আছে, কেউ যদি কাউকে বলে, তোমার কাছে এত দামে আমার একটি গোলাম বিক্রি করলাম, আর তার একটিই গোলাম আছে, তবে যদি বলে, আমার অমুক স্থানে যে গোলামটি আছে সেটি, তাহলে সে বিক্রি জায়েয হবে। 'আর অমুক স্থানে' কথাটি যদি না বলে, তবে শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র)-এর মতে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের দৃষ্টিতে বিক্রি জায়েয হবে না। আর এটাই সহীহ (আল-মুহীত)।

৫৫. মাসআলা : কেউ যদি কাউকে বলে, এই বাড়িতে গোলাম, পশু, কাপড় প্রভৃতি যা কিছু আছে সব বিক্রি করলাম আর ক্রেতার জানা না থাকে যে, বাড়িতে সর্বমোট কি কি আছে,

তবে সে বিক্রি ফাসিদ। যদি বাড়ির স্থলে ঘর বলে, এবং উপরোক্তরূপে বিক্রি করে তবে জায়েয হবে। এমনিভাবে যদি বলে, এই সিন্দুকে যা কিছু আছে বা বস্তায় যা কিছু আছে সব বিক্রি করলাম, তাও জায়েয হবে (আয যহীরিয়া)।

নবম অনুচ্ছেদঃ অন্য জিনিসের সাথে সংযুক্ত দ্রব্য বিক্রি করা এবং যে বিক্রিতে অংশ বিশেষ বাদ দেয়া হয় সে প্রসঙ্গে

১. মাসআলা : ওলানে থাকা অবস্থায় দুধ এবং গর্ভস্থ বাচ্চা বিক্রি জায়েয নয়। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ভেড়ার পিঠে থাকা অবস্থায় পশম বিক্রিও জায়েয নয় (আস সারাখসসী : আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : বিক্রি করার পর যদি পশম কেটে বা দুধ দুইয়ে সমর্পণ করে তবুও জায়েয হবে না আগের বিক্রি বৈধতা লাভ করবে না (আল-বাহরুর রাযিক)।

৩. মাসআলা : পাঠার প্রজনন বিক্রি জায়েয নয় (শরহুত তাহাবী)।

৪. মাসআলা : শীষসহ কায়ল হিসেবে বা ওজনে গম বিক্রি জায়েয, যদিও তার দানা পোক্ত না হয় (আল-কিন্য়া)।

৫. মাসআলা : 'মুযাবানা' জায়েয নয়। মুযাবানা বলা হয়, অনুমান করে গাছের খেজুরকে মেপে কাটা খেজুরের বদলে বিক্রি করাকে। এমনিভাবে 'মুহাকাল'-ও জায়েয নয়। মুহাকাল অর্থ: শীষসহ আনুমানিক গমকে মলাই গমের বদলে পরিমাপ করে বিক্রি করা (আন্-নাহরুল ফায়িক)।

৬. মাসআলা : সে গমের ভূসি ক্রয়ও জায়েয নয়। স্থপীকৃত করার পর ঝাড়ার আগে ভূসি কেনে তবে তা জায়েয (খুলাসা)।

৭. মাসআলা : 'মুলামাসা' পদ্ধতির বিক্রিও জায়েয নয়। যদি এ বিক্রির পদ্ধতি এই যে, ক্রেতা-বিক্রেতা কোন পণ্যের দরাদরি করার এক পর্যায়ে এ কথার উপর একমত হয়ে যাবে যে, ক্রেতা পণ্যটি যখন স্পর্শ করবে তখনই বিক্রেতা কর্তৃক তার কাছে তা বিক্রি হয়ে যাবে। এরূপ বিক্রি জায়েয নয় এমনিভাবে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমেও বিক্রি জায়েয নয়, অর্থাৎ বিক্রেতার সামনে কয়েকটি কাপড় রাখা আছে, এখন ক্রেতা তাতে ছোট পাথর নিক্ষেপ করবে। পাথরটি যে কাপড়ের উপর পড়বে সেটিই বিক্রিত মালে পরিণত হবে। এ ক্ষেত্রে কাপড় নির্দিষ্ট থাকা- না থাকার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, তবে প্রথম দাম সম্পর্কে তাদের উভয়ের সম্মতি পাওয়া জরুরী। এমনিভাবে মুনাবায়াও জায়েয নয়। মুনাবায়া এই যে, ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপরের দিকে আপন-আপন কাপড় ছুড়ে মারবে। তার আগে অন্যের কাপড় দেখবে না, বরং এই ছুড়ে মারাকেই তারা বিক্রি ধরে নেবে (আন্ নাহরুল ফায়িক)।

৮. মাসআলা : গম ছাড়া কেবল খড় বিক্রি করাও জায়েয (আয যহীরিয়া)।

৯. মাসআলা : যদি বিনুক কেনা এবং তাতে মুক্তার উল্লেখ না করা হয়, তবু তা জায়েয। মুক্তা ক্রেতারই হয়ে যাবে (আল খুলাসা)।

১০. কেউ যদি তরমুজের বিচি কিনতে চায় এবং বিক্রেতার তার তরমুজের ভেতর যে বিচি আছে সেটা তার কাছে বিক্রি করে এবং সে তরমুজ কেটে বিচি সমর্পণে রাখী থাকে, তবু সে বিক্রি বাতিল, আদৌ জায়েয নয় এবং এটাই সহীহ মত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

১১. মাসআলা : এমনিভাবে খেজুরের ভেতরের বিচি তিলের ভেতরের তেল এবং যায়তুনের ভেতরের তেল বিক্রিও জায়েয নয়, যদিও বিক্রেতা তা ক্রেতার হাতে সমর্পণ করে (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা : কেউ যদি কারও হাতে সুতা দিয়ে বলে, সে যেন এর দ্বারা তার নিজের টানা দিয়ে তার জন্য একটি পাগড়ি বুনে দেয় এবং সে মতে সে তা বুনে দেয়; তারপর যেই রেশমী টানায় সে তা বুনেছে পাগড়ির অর্ডারদাতা তার কাছ থেকে তা কিনে নেয়, তবে জায়েয হবে (আল-কিন্য়া)।

১৩. মাসআলা : 'আল উয়ুন' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি কোন ঘরে রক্ষিত শস্য বিক্রি করে, যা সে ঘরের দরজা ভেঙ্গে বের করা সম্ভব নয়, তবে সে বিক্রি জয়েয হবে এবং যেভাবেই হোক তা ঘরের বাইরে সমর্পণ করতে বাধ্য করা হবে। যদিও ক্রেতার জানা থাকে যে, বিক্রেতার পক্ষে তা ঘরের ভেতর সমর্পণ করা সম্ভব নয়। যদি দরজা না ভেঙ্গে তা বের করতে সক্ষম না হয়, তবে তাকে দরজা ভেঙ্গেই তা বের করতে হবে। কেউ বলেন, এ বিক্রি বাতিল (মুখতারুল ফাতওয়া)।

১৪. মাসআলা : যদি বলে, এই তুলার বিচি বিক্রি করলাম, তবে তা জায়েয হবে না। 'আল মুনতাকা' গ্রন্থে আছে যে, তা জায়েয। ফকীহ আবুল লাইস (র)-এরও মত তাই (আল-খুলাসা)।

১৫. মাসআলা : পণ্ড যবাহের আগেই চামড়া ও ভুড়ি বিক্রি করা জায়েয নয়। এভাবে বিক্রির পর যদি যবাহ করে এবং চামড়া ছাড়ায়, ভুড়িও বের করে, তবে তাতে আগের বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে না (আয যাহীরা)।

১৬. মাসআলা : যদি ছাদের কোন আড়া বা কাপড়ের নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে এক গজ কিংবা কাঠের নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে এক গজ বিক্রি করে অথবা তরবারিতে খচিত সোনা-রূপা বিক্রি করে, যা তরবারির ক্ষতি না করে আলাদা করা সম্ভব নয়, অথবা পাকেনি এমন ফসলের অর্ধেক বা যে ফসলের দুজন অংশীদার আছে, তাদের একজন অপরজনের ক্ষতি ছাড়া নিজের অংশ বিক্রি করে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ। বিক্রেতা যদি আড়া খুলতে, কাপড় বা কাঠ থেকে এক গজ কাটতে এবং তরবারির ক্ষতি হলেও সোনা-রূপা খুলে ফেলতে রাখী হয়, এমনিভাবে ফসলের সবটাই যদি বিক্রেতার হয় এবং সে তা কাটতে সম্মত হয়, তবে যতক্ষণ না সে এসব কার্যত করে ফেলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতার সে চুক্তি প্রত্যাহার করার অধিকার থাকবে। কিন্তু সে তা প্রত্যাহার করার আগেই যদি বিক্রেতা এসব করে ফেলে তবে চুক্তি অবধারিত হয়ে যাবে, ক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না (আল-হাবী)।

১৭. মাসআলা : দেওয়ালে আড়া স্থাপনের জায়গা বিক্রি বা দান করা জায়েয নয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত (মুখতারুল ফাতওয়া)।

১৮. মাসআলা : আংটির পাথর খুললে যদি আংটির ক্ষতি হয়, তবে তা বিক্রি জায়েয নয়। এভাবে বিক্রির পর ক্রেতা তা কবজা করলে আংটিটি তার হাতে আমানতস্বরূপ থাকবে। পাথর খুললে আংটির কোন ক্ষতি না হলে সে পাথর বিক্রি করা জায়েয। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার হাতে আংটিটি হারিয়ে গেলে তাকে পাথরের দাম পরিশোধ করতে হবে। আর পাথর খুললে যদি আংটির ক্ষতি হয় তবে সে ক্ষেত্রে ক্রেতার হাতে আংটি হারালে তাকে কিছুই পরিশোধ করতে হবে না (আল-খুলাসা)।

১৯. মাসআলা : ইব্ন সামাআ তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ যদি তার আংটির পাথর বা ছাদের আড়া বিক্রি করে এবং তা বিনা ক্ষতিতে খোলা সম্ভব না হয়, তবে ক্রেতা কি তার মালিক হবে, না তা স্থগিত থাকবে? তিনি বললেন, স্থগিত থাকবে এবং সে তার মালিক হবে না। বিক্রেতার ইখতিয়ার, সে তা অর্পণ করতে পারে, নাও করতে পারে। ইমাম মুহাম্মাদ মূলত এর দ্বারা তা খুলবার আগের কথা বুঝিয়েছেন। যখন তা এই অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, বিক্রেতার পক্ষে তা সমর্পণ না করে উপায় থাকে না, তখন ক্রেতা তার মালিক হয়ে যাবে। ক্রেতা যদি তা নিয়ে বিক্রেতার সঙ্গে কোনরূপ দাবি-দাওয়ায় লিপ্ত না হয়, এবং ইত্যবসরে বিক্রেতা পুরো আংটিটা রা গোটা ঘর কারও কাছে বিক্রি করে ফেলে এবং তা সমর্পণও করে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সেই দ্বিতীয় বিক্রি দ্বারা প্রথমবারে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে এ জাতীয় মাসাইলের এই মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ক্রেতার হাতে পণ্য সমর্পণ করার জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করা হয় সেসব ক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্য কবজা করার পর তার হাতে যদি সেটা নষ্ট হয়ে যায় তবে বিক্রি চূড়ান্ত হয়ে যাবে (অর্থাৎ ক্রেতাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে)। আর যেসব ক্ষেত্রে ক্রেতার হাতে পণ্য সমর্পণের জন্য তাকে বাধ্য করা হয় না, সেসব ক্ষেত্রে সে যদি তা সমর্পণ করে, তবে তাতে ক্রেতা কবজাকারী সাব্যস্ত হয় না। কাজেই তার হাতে তা নষ্ট হয়ে গেলে তাকে জরিমানাও দিতে হবে না (আয-যাখীরা)

২১. মাসআলা : কেউ যদি তার চাদর থেকে পশম বিক্রি করে কিন্তু সেলাই খুলে পশম সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে দেখতে হবে, সেলাই খুললে কোন ক্ষতি হয় কি-না ক্ষতি হলে সে বিক্রি জায়েয হয়নি। আর যদি ক্ষতি না হয়, তবে জায়েয। সেলাই খোলার ব্যাপারে তাদের মধ্যে যদি মতভেদ দেখা দেয়, তবে বিক্রেতার কর্তব্য খানিকটা খুলে ক্রেতাকে দেখানো। ক্রেতা তা দেখে যদি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ক্রেতাকে বাকি অংশ খুলতে বাধ্য করা হবে। ক্ষেত্রে গাজর বিক্রির ক্ষেত্রেও একই মাসআলা (আল-খুলাসা)।

২২. মাসআলা : দোকান ঘর বিক্রি বা মাটিতে লাগানো গাছ বিক্রি বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, তা উৎপাটন করলে বিক্রেতার নিজ সম্পত্তির কোন ক্ষতি হতে পারবে না (আল-কিন্য়া)।

২৩. মাসআলা : ইব্ন সামাআ (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী যে, আমি যদি কারও কড়ি কাঠ জবরদখল করত তা ঘরের ছাদে লাগাই, বা ইট জবরদখল করে তা দ্বারা ঘর-বাড়ি নির্মাণ করি কিংবা কীলক এনে দরজায়

লাগাই এবং তারপর সে ঘর, দরজা বা বাড়ি বিক্রি করি, তবে কি সে বিক্রি জায়েয হবে এবং জায়েয হলে সে ক্ষেত্রে কি ক্রেতার এসব ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। তিনি বললেন, বিক্রি জায়েয এবং ক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা : এক ব্যক্তির জমিতে কোন চাষীর নির্মিত গৃহ বা রোপিত বৃক্ষ আছে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যদি তার জমি বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে, যদি সে গৃহ বা বৃক্ষ জমিতে রেখে দেওয়ার শর্তারোপ করা না হয়। সে চাষী জমিতে নালা, খাল বা এ জাতীয় কিছু তৈরি করে থাকে তবে তা বিক্রি করা জায়েয হবে না (আয-যাহীরিয়া)।

২৫. মাসআলা : একটি বাড়ি বা জমির দুই এজমালী শরীকদ্বয়ের একজন তা থেকে সুনির্দিষ্ট একটা ঘর বা সুনির্দিষ্ট একখণ্ড জমি বিক্রি করলে তা জায়েয নয়, তার নিজের অংশেও নয় এবং শরীকের অংশও নয়। পক্ষান্তরে সে যদি জমি বা বাড়িটির যে পরিমাণ তার ভাগে পড়েছে তার পুরোটাই বিক্রি করত তবে জায়েয হত (শরহুত তাহাবী)।

২৬. মাসআলা : নালা বিক্রি বা দান করা জায়েয নয়, কিন্তু চলার পথ বিক্রি ও দান করা জায়েয (আত-তাবঈন)।

২৭. মাসআলা : কেউ যদি এমন কোন ক্রীতদাসী বিক্রি করে, যার পেটে সন্তান আছে এবং সন্তানটি কারও জন্য ওসীয়াতকৃত, তবে যার জন্য ওসীয়াত করা হয়েছিল সে যদি বিক্রি অনুমোদন করে, তারপর ক্রেতা 'কর্তৃক কবজা করার পর তার জন্ম হয়, তাহলে সন্তানটির বিনিময়ে কোন মূল্য পাবে না। যদি কবজার আগে জন্ম হয় তবে মূল্যের একটা অংশও তার উপরও আসবে। কিন্তু কবজার আগেই যদি তার মৃত্যু হয়ে যায় তখন আর তার উপর মূল্যের কোন অংশ বর্তাবে না। যদি বাঁদীটি কবজার আগেই সন্তান প্রসব করে এবং যার জন্য সন্তানটি ওসীয়াত করা হয়েছিল, সে বিক্রি অনুমোদন না করে থাকে অথবা সে তাকে আযাদ করে দেয়, তবে ক্রেতা বাঁদীটিকে তার অংশের মূল্য দিয়েই গ্রহণ করবে। শিশুটির জন্মের পর সে বিক্রির অনুমোদন কোন অবস্থায়ই সহীহ নয় (আত-তাতার খানিয়া)।

২৮. মাসআলা : স্বতন্ত্রভাবে যা বেচাকেনা করা যায়, তাকে যদি সমষ্টির বিক্রি হতে ব্যতিক্রম রাখা হয় তবে সে ব্যতিক্রম জায়েয, যেমন বলল, আমি তোমার কাছে শসের এই স্তূপটি বিক্রি করলাম, তবে তা হতে এক সা' পরিমাণ নয় কিংবা বলল, ঐ তেল বা সিরকার এই ব্যারেলটি তোমার কাছে বিক্রি করলাম, তবে এর থেকে দশ লিটার নয়। এমনিভাবে যদি স্বল্প ব্যবধানের গুণতি দ্রব্য হয় এবং সে ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম রেখে বিক্রি জায়েয।

২৯. মাসআলা : যা স্বতন্ত্রভাবে বেচাকেনা জায়েয নয়, সমষ্টির বিক্রি হতে তাকে বাদ দেওয়াও জায়েয নয়, যেমন গর্ভস্থ বাচ্চা বাদে ক্রীতদাসী বিক্রি করা, একটি অঙ্গ বাদ রেখে ছাগল বিক্রি করা, একটি ছাগল বাদ রেখে ছাগলের পাল বিক্রি করা কিংবা সোন-রূপার অলংকরণ বাদ রেখে তরবারি বিক্রি করা। এসব বিক্রির কোনওটিই জায়েয নয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩০. মাসআলা : যদি ঘর বা বাড়ি বিক্রি করে এবং তাতে যত কাঠ আছে, তা বাদ রাখে কিংবা তার কাঁচা-পাকা ইট বা মাটি বাদ রাখে তবে তা জায়েয, যদি তা ভেঙ্গে নেওয়ার জন্য কিনে থাকে (আল-কিন্য়া)।

৩১. মাসআলা : ফল গাছে থাকা অবস্থায় নির্দিষ্ট কয়েক রাতুল ব্যতীত গাছের ফল বিক্রি করা জায়েয নয়। যদি পারা ফল বিক্রি করে এবং তা হতে এক সা' বাদ রাখে, তা জায়েয হবে। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, (গাছের ফল সম্পর্কে) এটা হাসান (র)-এর বর্ণনা এবং এটাই ইমাম তাহাবী (র)-এর মত। যাহিরী রিওয়াযাত অনুযায়ী এটা জায়েয হওয়ার কথা। যদি খেজুর গাছের বাগান বিক্রি করে এবং তা থেকে নির্দিষ্ট কোন গাছ বাদ রাখে, তবে তাও জায়েয (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

৩২. মাসআলা : যদি একশ' দিরহামে খাদ্যের স্তূপ বিক্রি করে এবং তা হতে এক-দশমাংশ ব্যতিক্রম রাখে, তবে ক্রেতা সে স্তূপের দশ ভাগের নয় ভাগ পাবে, কিন্তু মূল্য তাকে সবটাই পরিশোধ করতে হবে বিক্রেতা যদি বলে এ শর্তে বিক্রি করছি যে, এর দশ ভাগের একভাগ আমার থাকবে, তবে ক্রেতা দশ ভাগের নয় ভাগ পাবে এবং দামও দিতে হবে কেবল নয় ভাগের, কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এ ক্ষেত্রেও পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, বিক্রেতা যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই একশ' ছাগল একশ' দিরহামে এই শর্তে বিক্রি করছি যে, ওই ছাগলটি আমার থাকবে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি বলে, এই একশ' ছাগল এক দিরহামে বিক্রি করছি, কিন্তু ওই ছাগলটি ছাড়া, তবে বাকি ছাগলগুলো একশ' দিরহামে বিক্রি হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)।

৩৩. মাসআলা : যদি বলে, এই একশ' ছাগল একশ' দিরহামের বিনিময়ে তুমি পাবে, কিন্তু অর্ধেক ছাড়া, তাহলে অর্ধেক ছাগলের দামই একশ' দিরহাম সাব্যস্ত। যদি বলে, এর অর্ধেক আমার থাকবে, তবে অর্ধেকের দাম হবে পঞ্চাশ দিরহাম (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা : যদি কয়েকটি ছাগল বা এক আঁটি কফি গাছ বিক্রি করবে এবং তা হতে অনির্দিষ্টভাবে একটি বাদ রাখে তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট একটি বাদ রাখলে জায়েয হবে (আল খুলাসা)।

৩৫. মাসআলা : বেশী ব্যবধানের যে কোন গুণতি দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই একই হুকুম (ফাতহুল কাদীর)।

৩৬. যে ক্রীতদাসীর গর্ভস্থ সন্তানকে আযাদ করে দেওয়া হয়েছে তাকে বিক্রি করা জায়েয নয়। এ রকমের এগারটি মাসআলা আছেঃ

(ক) একটি মাসআলায় চুক্তি ও ব্যতিক্রম উভয়ই জায়েয, যেমন যদি কারও জন্যে ক্রীতদাসী সম্পর্কে ওসীয়ত করে এবং গর্ভের সন্তানকে সে ওসীয়ত থেকে বাদ রাখে অথবা গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে ওসীয়ত করে এবং মাকে তা থেকে বাদ রাখে, তাহলে ওসীয়ত ও ব্যতিক্রম উভয়ই জায়েয হবে।

(খ) চারটি মাসআলায় চুক্তি ও ব্যতিক্রম উভয়ই ফাসিদ, যেমন যদি মাকে বিক্রি করে বা তার সাথে কিতাবাতের চুক্তি করে বা তাকে ইজারা দেয় কিংবা তার বদলে কোন ঋণের ব্যাপারে আপোষ-রফা করে এবং গর্ভস্থ সন্তানকে ব্যতিক্রম রাখে তবে এসব চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে।

(গ) ছয়টি মাসআলায় চুক্তি বৈধ হবে, কিন্তু ব্যতিক্রম বাতিল হয়ে যাবে, যেমন মাকে যদি দান বা সাদাকা করত হস্তান্তর করে অথবা তাকে ম্রহর হিসাবে প্রদান করে অথবা ইচ্ছাকৃত হত্যার কারণে যে কিয়াস অবধারিত হয়েছে, এই ক্রীতদাসীর বিনিময়ে তা হতে মুক্তি লাভ করে অথবা এর বদলে খুলা করে কিংবা তাকে আযাদ করে দেয় এবং এসব ক্ষেত্রে গর্ভস্থ সন্তানকে ব্যতিক্রম রাখে, তবে সে ব্যতিক্রম বাতিল হয়ে যাবে এবং চুক্তিসমূহ কার্যকর হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩৭. মাসআলা : 'আল-আমালী' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কাউকে বলে, আমি তোমার কাছে এই গোলামটি বিক্রি করলাম এক হাজার দিরহামে কিন্তু এর অর্ধেক পাঁচশ' দিরহামে, তবে গোটা গোলামের ভেতর পনের শ' দিরহামে বিক্রি সম্পন্ন হবে। তদ্রূপ যদি বলে, তবে এর অর্ধেক একশ' দিরহামে, তাহলে ক্রেতা সর্বমোট এগার শ' দিরহামের বিনিময়ে গোলামটির মালিক হবে।

৩৮. মাসআলা : 'আল আমালী' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই গোলামটি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রি করছি যে, এর অর্ধেক তিনশ' বা ছয়শ' দিরহামে আমার থেকে যাবে কিংবা বলে, এর অর্ধেক এক-তৃতীয়াংশ মূল্য বা একশ' দিরহামে আমার থাকবে, তাহলে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৩৯. মাসআলা : বিক্রেতার চলার অধিকার সংরক্ষিত থাকার শর্তে রাস্তা বিক্রি করা জায়েয হবে। এমনিভাবে যদি বাড়িওয়ালা বাড়ির নিচতলা এই শর্তে বিক্রি করে যে, নিচতলার উপর তার উপরের তলা স্থাপিত রাখার অধিকার থাকবে, তাও জায়েয (আয যহীরিয়া)।

৪০. মাসআলা : ইব্ন সামাআ তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে উদ্ধৃত করেন যে, কেউ যদি কাউকে বলে, তোমার কাছে এই বাড়িটি বিক্রি করলাম, কিন্তু এর ভেতর দিয়ে এই রাস্তাটি বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত বিক্রির বাইরে থাকবে, সেই সঙ্গে সে রাস্তাটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থও বর্ণনা করে এবং সে রাস্তাটির স্বত্ত্ব নিজের বা অন্য কারও জন্যে সংরক্ষণ করে, তবে সে বিক্রি জায়েয। ক্রেতাকে সেই রাস্তা ছাড়া বাড়ির অবশিষ্ট অংশের জন্যে ধার্যকৃত পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৪১. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে বাড়ি বিক্রি করে যে, তার ভেতর দিয়ে এই দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বিক্রেতার একটি পথ থাকবে তবে সে বিক্রি জায়েয নয় (আল-মুহীত)।

৪২. মাসআলা : কেউ যদি বলে, আমি তোমার কাছে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমার এই বাড়িটি এই শর্তে বিক্রি করছি যে, এর এই ঘরটি আমার থাকবে, তবে তা জায়েয নয়। যদি বলত, 'এই ঘরটি ছাড়া' তবে জায়েয হত।

৪৩. মাসআলা : যদি বলে, তোমার কাছে এই বাড়িটি বিক্রি করলাম, কিন্তু এই ঘরটি নয়, তবে সে বিক্রি জায়েয। সুতরাং সে ঘরটি বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি জমি বিক্রি করে এবং তা থেকে নির্দিষ্ট কোন বৃক্ষকে তার গোড়ার মাটি সহ বাদ রাখে, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে। সে ক্ষেত্রে বিক্রেতা তার জমিতে গাছের ডাল-পালা বিস্তারে বাধা দিতে পারবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

৪৪. মাসআলা : لا خلاف بين أبي يوسف وزفر (আবু ইউসুফ ও যুফার-এর মধ্যকার মতভেদ) শীর্ষক গ্রন্থে হাসান ইবন যিয়াদ (র) বলেন, কেউ যদি বলে, আমি তোমার কাছে এক হাজার দিরহামে এই বাড়িটি বিক্রি করলাম, অবশ্য এর থেকে একশ' গজ জমি বাদ থাকবে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয, যদিও সেই ব্যতিক্রম জমি দেখার পর ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে সেই একশ' গজ জমি বিক্রেতার অধিকারে থাকা অবস্থায় তার সঙ্গে বাড়িতে অংশীদার হবে, আর তা না চাইলে সে তা পরিত্যাগ করবে (আল-মুহীত)।

৪৫. মাসআলা : যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই খাদ্য এক হাজার দিরহামে বিক্রি করলাম, অবশ্য এর থেকে দশটি রুটি বাদ থাকবে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে জায়েয, যদি সেই দশটি রুটি পৃথক করার পর ক্রেতার ইখতিয়ার লাভ হবে।

৪৬. মাসআলা : যদি কোন বস্তু বিক্রি করে একশ' দীনারের বিনিময়ে, কিন্তু এক দীনার ছাড়া, তবে সে বিক্রি নিরানব্বই দীনারের বিনিময়ে সাব্যস্ত হবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

দশম অনুচ্ছেদ : এমন দুইটি পণ্য বিক্রি, যার একটি বিক্রি জায়েয নয় এবং কোন দ্রব্য বিক্রি করার পর বিক্রি মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় প্রসঙ্গ-

১. মাসআলা : কোনও লোক যদি স্বাধীন মানুষ ও গোলাম মিলিয়ে বিক্রি করে অথবা যবাহকৃত ছাগল ও মৃত ছাগল মিশিয়ে বিক্রি করে তবে উভয়ের পৃথক দাম স্থির করুক অথবা না করুক ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে বিক্রি সর্বাবস্থায় বাতিল। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে প্রত্যেকটির আলাদা দাম স্থির করলে গোলাম ও যবাহকৃত ছাগলের ভেতর কিছু বৈধ হবে (আল-কাফী)।

২. মাসআলা : এমনভাবে যদি দুটি চামড়া ছোলানো ছাগল কেনে এবং তারপর দেখে যে, তার একটি যবাহ করেছেন কোন অগ্নিপূজারী অথবা মুসলিমই যবাহ করেছেন, কিন্তু ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ বলেনি, তবে আমাদের মাযহাবে এমন ছাগল ও মৃত ছাগল সমান (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা : যদি পূর্ণাঙ্গ গোলামের সাথে মুদাব্বার বা মুকাতাব কিংবা উম্মু ওয়ালাদকে মিলিয়ে বিক্রি করে, অথবা নিজের গোলামের সাথে অন্য কারও গোলাম মিলিয়ে বিক্রি করে, তবে পূর্ণাঙ্গ গোলাম ও নিজ গোলামের ক্ষেত্রে তাদের অংশের মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি বৈধ হবে। যদি ওয়াক্ফ সম্পত্তি ও মালিকানা সম্পত্তি মিলিয়ে বিক্রি করে তবে মালিকানা সম্পত্তির বিক্রি শুদ্ধ হবে (আল কাফী)।

৪. মাসআলা : যদি দুই মটকা সিরকা কেনে এরপর তারপর দেখে যে, একটি মটকায় রয়েছে মদ, তবে দেখতে হবে প্রত্যেকটির পৃথক মূল্য স্থির করা ছিল কি-না। পৃথক মূল্য স্থির করা না হলে উভয়টিতে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি প্রত্যেকটির আলাদা মূল্য স্থির করা থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে ক্ষেত্রেও বিক্রি ফাসিদ, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সিরকার অংশে বিক্রি বৈধ (আয-যখীরা)।

৫. মাসআলা : কেউ যদি দুটি গোলাম ক্রয় করে, তারপর তার একটি কবজা করে এবং অন্যটি কবজা না করে, ইত্যবসরে সে উভয় গোলাম পাঁচশ'-পাঁচশ' করে এক হাজার টাকায় বিক্রি করে, তবে কবজাকৃত গোলামের বিক্রি শুদ্ধ হবে এবং অন্যটিতে শুদ্ধ হবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা : কেউ যদি কোন গোলাম কেনে, তারপর সেটি কবজা না করতেই নিজ গোলামের সাথে মিলিয়ে বিক্রি করে, তবে আমাদের তিনও ইমামের মতে নিজের গোলামটিতে বিক্রি বৈধ হবে (আল খুলাসা)।

৭. মাসআলা : কেউ যদি এক হাজার টাকায় একটি গোলাম কেনে এবং কবজাও করে, কিন্তু মূল্য পরিশোধ না করে, তারপর সেটিকে নিজের অপর একটি গোলামের সাথে মিলিয়ে বিক্রেতার কাছেই এক হাজার টাকায় বিক্রি করে এবং প্রত্যেকটির দাম ধার্য করে পাঁচশ' টাকা, তবে নিজের গোলামটিতে বিক্রি বৈধ হবে এবং যেটি বিক্রেতার কাছ থেকে কিনে আবার বিক্রেতার কাছেই বিক্রি করেছে সেটিতে বৈধ হবে না (আয যাখীরা)।

৮. মাসআলা : 'আল মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি একটি বাড়ি এবং মুসলিমদের জনপথ থেকে একটি রাস্তা কিনল, যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সুনির্দিষ্ট, আর বাড়ি ও জনপথ কিনল একই চুক্তির অধীনে, তারপর সে উভয়টি কবজাও করল। তারপর সেই রাস্তায় অন্যের অধিকার সম্পর্কে রায় হয়ে গেল। এখন এ বিক্রির হুকুম কী? এ ক্ষেত্রে দেখতে রাস্তাটি বাড়ির সাথে মিশ্র অবস্থায় রয়েছে কি-না। মিশ্র অবস্থায় থাকলে ক্রেতার ইখতিয়ার লাভ হবে। চাইলে সে বিক্রি রদ করবে, অন্যথায় বাড়িটিকে তার অংশের মূল্য দিয়ে রেখে দেবে। যদি বাড়িটি রাস্তার সাথে মিশ্র অবস্থায় না থাকে বরং পৃথকীকৃত থাকে, তবে বাড়ির অংশে তার ভাগের দামে বিক্রি অবধারিত হয়ে যাবে, ক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। রাস্তার সীমা যদি নির্ধারিত না থাকে এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থ অজ্ঞাত থাকে তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। রাস্তার স্থলে যদি ব্যক্তি বিশেষের মসজিদ থাকে, যাতে জুমুআ আদায় হয় না, তবে সে ক্ষেত্রেও সেই রাস্তার হুকুম প্রযোজ্য, যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ জানা আছে। সেটি যদি জামে মসজিদ হয়ে থাকে তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা জামে মসজিদ বিক্রি জায়েয নয়। তদ্রূপ সেটি এক কালে জামে মসজিদ থাকার পর যদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায় বা শূন্য চত্বর হিসেবে পড়ে থাকে, যাতে কোন ঘর দুয়ার নেই, তখনও সে বিক্রি ফাসিদ।

জমির দুই শরীকের একজন যদি সমুদয় জমি অপর শরীকের কাছে বিক্রি করে, তবে মহান ইমাম শায়খ জাহীরুদ্দীন আল-মারগীনানী (র)-এর মতে সে বিক্রিও ফাসিদ হয়ে যাবে। তিনি আরও বলতেন, কেউ যদি শরীকানা বাড়ির সবটাই নিজের বলে দাবি করে, তারপর বিবাদী কোন কিছুর বিনিময়ে তার সঙ্গে আফোষরফা করে, তবে সে আফোষরফাও ফাসিদ হবে।

কেউ যদি কোন গোলাম কেনে নগদ পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে এবং এমন আরও পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে যা তার কারও কাছে পাওনা আছে অথবা নগদ পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে এবং বাকি পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে, যা সরকারী ভাতা প্রাপ্তিকালে পরিশোধ করবে, তবে সে বেচাকেনা ফাসিদ হয়ে যাবে। ইমাম কুদুরী (র) তার ভাষ্য গ্রন্থে এ মাসআলা উল্লেখ করেছেন (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি কারও কাছ থেকে কোন বস্তু ক্রয় করে দশ দিরহাম ও এক হাজার মান্ন (পরিমাপ বিশেষ) গমের বিনিময়ে এবং সে গমের গুণাগুণও বর্ণনা করে, কিন্তু কোথায় তা পরিশোধ করবে তা বর্ণনা না করে, যদরুন ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুসারে গমের অংশে বিক্রি ফাসিদ (অবৈধ) হয়ে গেছে, এ ক্ষেত্রে সে অবৈধতা বাকি অংশে সম্প্রসারিত হওয়ার কথা নয় (আয-যাখীরা)।

১০. মাসআলা : কেউ যদি নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে বিক্রি করে, তবে তার বিনিময় মূল্য আদায়ের আগে সেই বস্তুটি ক্রেতার কাছ থেকে সমজাতীয় বিনিময় দ্বারা বিক্রিত মূল্যের কম মূল্যে কেনা তার পক্ষে জায়েয নয়, যদি পরিমাণগত কোন কমতি সে বস্তুতে দেখা না দেয়। যেমন তার নিজের পক্ষে তেমনি তার এমন কোন আত্মীয়ের পক্ষেও জায়েয নয়, যে আত্মীয় তার পক্ষে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। এমনিভাবে কেনাটা তার নিজের জন্য হোক বা অন্য কারও জন্য হোক, সরাসরি তার ক্রেতার কাছ থেকে কিনুক বা ক্রেতার ওয়ারিসদের কাছ থেকে কিংবা ক্রেতা যাকে দান করেছে বা যার জন্য ওসীয়াত করেছে তার কাছ থেকে কিনুক-এর কোনও অবস্থায়ই সে ক্রয় জায়েয নয়। এ ক্ষেত্রে দীনার ও দিরহামকে সমজাতীয়ই ধরা হবে, যেমন শুফ'আর ক্ষেত্রে সমজাতীয় ধরা হয় (আল-কাফী)।

১১. মাসআলা : এমনিভাবে যদি মূল্য পরিশোধ কিছু বাকি থেকে যায় তবুও জায়েয নয় (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা : 'আল ফাতাওয়া আল আত্তাবিয়্যা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে এবং তারপর তার কম পরিমাণ দিরহামে ক্রয় করে তাও জায়েয নয়।

যদি দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে, তারপর তার কম পরিমাণ রূপার টুকরা দ্বারা ক্রয় করে তবে তা জায়েয হবে।

পরস্যা দ্বারা বিক্রি করলে সে ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার কম পরস্যায় কেনা জায়েয নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে জায়েয হবে (আত-তাতার খানিয়্যা)।

১৩. মাসআলা : যদি ভিন্ন জাতের বিনিময় দ্বারা কেনে কিংবা পণ্যটি ক্রটিযুক্ত হয়ে যাওয়ার পর কম মূল্যে কেনে তবে তা জায়েয হবে (আত-তাহযীব)।

১৪. মাসআলা : মূল্য পরিশোধের আগে বা পরে বিক্রিত মূল্যের বেশী মূল্যে কিনলে তা জায়েয হবে। যদি বাজার দরই কমে যায় এবং সেই হিসেবে তা বিক্রিত মূল্যের কম মূল্যে কেনে তবে তা জায়েয নয়। এ ক্ষেত্রে বাজার দর বিবেচ্য নয় (আল-খুলাসা)।

১৫. মাসআলা : যদি অর্ধেক মূল্য কবজা করে এবং তারপর সে বস্তুর অর্ধেকটা অর্ধেক মূল্যের কমে কেনে তাও জায়েয নয়। এমনিভাবে যদি বিক্রেতা তার কোন পাওনাদারকে ক্রেতার কাছ থেকে তার প্রাপ্য মূল্য আদায় করে নিতে বলে (হাওয়ালা করে) এবং তারপর বিক্রয় মূল্যের কমে ক্রয় করে তখনও সে ক্রয় জায়েয নয় (আল-কিন্যা)।

১৬. মাসআলা : ক্রেতা যদি সে বস্তু অন্য কারও কাছে বিক্রি করে এবং তারপর বিক্রেতা সেই তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে তার বিক্রয় মূল্যের কমে খরিদ করে তবে তা জায়েয হবে। মাল যদি এমন কোন পন্থায় ক্রেতার কাছে ফিরে আসে, যদরুন তার ও দ্বিতীয় ক্রেতার মধ্যকার বেচাকেনা অন্য লোকের পক্ষেও বাতিল সাব্যস্ত হয়, তবে তখন আবার প্রথম বিক্রেতার পক্ষে তা বিক্রিত মূল্যের কম মূল্যে ক্রয় করা নাজায়েয হয়ে যায়। আর প্রথম ক্রেতার কাছে এমন পন্থায় ফিরে আসে যদরুন তার ও দ্বিতীয় ক্রেতার মধ্যকার বিক্রি তাদের নিজেদের পক্ষে বাতিল সাব্যস্ত হলেও অন্য লোকের দৃষ্টিতে এই ফিরে আসাটা একটা নতুন বেচাকেনারূপে গণ্য হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রথম বিক্রেতার পক্ষে তার বিক্রিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় করা জায়েয হবে (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা : 'আল ফাতাওয়া আল আত্তাবিয়্যা' গ্রন্থে আছে, বিক্রেতা মূল্য আদায়ের পর যদি ক্রেতার কাছ থেকে সেই মাল আবার কম দামে কেনে তবে তা জায়েয আছে। আদায়কৃত মুদ্রা যদি নিকৃষ্টমানের হয় এবং সে কারণে তা ফেরত দেয়, তবে সে বৈধতা বাতিল হয়ে যাবে না।

তদ্রূপ সে মূল্যের পরিবর্তে যদি একটি কাপড় নিয়ে আপোষরফা করে এবং কাপড়টি কবজা করে, তারপর বিক্রিত মালটি কম দামে খরিদ করে এবং তারপর সে কাপড়ে কোন খুঁত পাওয়ার কারণে সেটি ফেরত দেয়, তবে সে ক্রয় ফাসিদ হবে না।

যদি মূল্য আদায়ের পর ক্রেতার কাছ থেকে বিক্রিত মালটি কম দামে ক্রয় করে এবং তারপর আদায়কৃত দিরহামগুলো ভেজাল প্রমাণিত হয়, তবে সে ক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে।

বিক্রির পর বিক্রেতার জীবদশায় বা মৃত্যুর পর যদি তার পিতা বা পুত্র কম মূল্যে কেনে, তা জায়েয হবে।

মুযারিব যদি কোন মাল বিক্রি করে এবং তারপর পুঁজিদাতা তা কমে কেনে তবে তা জায়েয হবে না, যদিও তাতে লাভ হয়।

যদি কেউ একশ' দিরহামে একটি গোলাম কেনার পর সেটি কবজা করে, তারপর বিক্রেতার কাছে তিনশ' দিরহামে একটি বাঁদী বিক্রি করে এবং তারপর গোলাম ও একশ' দিরহামের বিনিময়ে বাঁদীটি খরিদ করে, তবে বাঁদীর অর্ধেকের ক্ষেত্রে তা জায়েয হবে (আত তাতার খানিয়্যা)।

১৮. মাসআলা : কেউ যদি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বাকিতে একটি গোলাম বিক্রি করে এবং তৃতীয় কোন ব্যক্তির জন্য ইখতিয়ারের শর্ত আরোপ করে, তারপর সেই তৃতীয় ব্যক্তি বিক্রি অনুমোদন করে এবং মূল্য পরিশোধের আগে সেই তৃতীয় ব্যক্তি পাঁচশ' দিরহামে

গোলামটি ক্রয় করে তবে তা জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং বিক্রেতা যদি সেটি কেনে তবে জায়েয হবে না (আস-সিরাজিয়া)।

১৯. মাসআলা : ক্রেতা যদি পণ্যটি কাউকে উপহার দেয়, তারপর সেই ব্যক্তি আবার তা উপহারদাতা তথা ক্রেতাকে উপহার দেয় এবং তারপর ক্রেতা সেটি বিক্রেতার কাছে কম মূল্যে বিক্রি করে দেয় তবে তা জায়েয হবে।

তদ্রূপ ক্রেতা যদি পণ্যটি কারও কাছে বিক্রি করে আবার তার কাছ থেকে কিনে নেয় এবং তারপর বিক্রেতার কাছে কম দামে বিক্রি করে তাও জায়েয।

২০. মাসআলা : ক্রেতা যদি পণ্যটি কাউকে উপহার দিয়ে তার হাতে অর্পণ করে এবং তারপর সে উপহার প্রত্যাহার করে নেয় এবং সেটি আবার বিক্রেতা তার কাছে কম দামে বিক্রি করে, তবে তা জায়েয নয়।

২১. মাসআলা : কেউ যদি কাউকে তার গোলামটি এক হাজার টাকায় বিক্রির জন্য প্রতিনিধি বানায় এবং সে মতে প্রতিনিধি গোলামটি বিক্রি করে দেয়, এরপর তার মূল্য আদায়ের আগেই সেই প্রতিনিধি বিক্রিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে নিজের জন্য কিংবা অন্য কারও আদেশক্রমে তার জন্য কিনতে চায়, তবে তা জায়েয হবে না।

২২. মাসআলা : মুদাব্বার, মুকাতাব বা গোলাম যদি কোন কিছু বিক্রি করে, তবে মনিবের জন্য তা তার চেয়ে কম মূল্যে কেনা জায়েয নয় (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা : কেউ কোন জিনিস বিক্রি করার পর পর অন্য কাউকে যদি উকীল (প্রতিনিধি) বানায় এবং সে তা কম মূল্যে ক্রয় করে তবে তা জায়েয হবে (আল খুলাসা)।

২৪. মাসআলা : বিক্রিত মূল্যের চেয়ে অল্প মূল্যে যে বস্তু কিনবে সেটিতে যদি অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে কেনা হয় তবে সেই নতুন বস্তুটির ক্রয় বৈধ হবে। যেমন একটি বাঁদী পাঁচশ' টাকায় ক্রয় করল, তারপর মূল্য আদায়ের আগে সেটিকে অন্য একটি বাঁদীর সাথে মিলিয়ে পাঁচশ' টাকায় বিক্রেতার কাছে বিক্রি করল, এ ক্ষেত্রে যে বাঁদীটি ক্রেতার তার কাছ থেকে কেনেনি, সেটির বিক্রয় বৈধ হবে এবং অন্যটিতে ফাসিদ হবে (আল বাহরুর রায়িক)।

২৫. মাসআলা : 'আল কুদুরী' গ্রন্থে আছে, কোন বস্তু নগদ বিক্রি করার পর সেই মূল্য দিয়ে সেই বস্তুটি বাকিতে ক্রয় জায়েয নয়।

২৬. মাসআলা : কেউ যদি এক বছরের মেয়াদে কোন জিনিস এক হাজার টাকায় বাকিতে বিক্রি করে এবং তারপর সেটি এক হাজার টাকায় দু'বছরের মেয়াদে বাকিতে কিনতে চায় তবে তা জায়েয হবে না। যদি মূল্য এক টাকা বা তার বেশী বাড়িয়ে দেয় তবে জায়েয হবে। সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্যকে অতিরিক্ত মেয়াদের বিনিময়রূপে ধরা হবে, যাতে অতিরিক্ত মেয়াদের ক্ষতিটা পূরণ হয়ে যায় (আল-মুহীত)।

দশম পরিচ্ছেদ : যেসব শর্তের কারণে বিক্রি ফাসিদ হয় এবং যেসব শর্তের কারণে বিক্রি ফাসিদ হয় না

১. মাসআলা : বেচাকেনার ভেতর যেসব শর্ত আরোপ করা হয়, তা প্রথমত দুই প্রকারঃ (ক) বেচাকেনার চুক্তিই হয়ত সেসব শর্তের দাবী করে অথবা (খ) বেচাকেনার চুক্তি সেসব শর্তের দাবী করে না।

শর্তটি যদি চুক্তিরই দাবী হয় অর্থাৎ পৃথকভাবে শর্ত আরোপ না করলেও চুক্তি দ্বারাই তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এরূপ শর্তের ক্ষেত্রে বিক্রি ফাসিদ হয় না, যেমন শর্ত আরোপ করা যে, বিক্রেতাকে পণ্য অর্পণ করতে হবে কিংবা ক্রেতাকে মূল্য বুঝিয়ে দিতে হবে।

যেসব শর্ত উপরোক্ত অর্থে চুক্তির দাবী নয়, তা আবার দুই প্রকারঃ (ক) হয়ত তা চুক্তির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে অথবা (খ) চুক্তির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে না।

যেসব শর্ত চুক্তির দাবী না হলেও চুক্তির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, অর্থাৎ তা চুক্তির দাবিকে পাকাপোক্ত করে, বেচাকেনার মধ্যে এ ধরনের শর্ত আরোপ করা জায়েয। যেমন এই শর্তে বিক্রি করা যে, মূল্য আদায়ের ব্যাপারে ক্রেতার কাউকে কাফীল (জামিন) রাখতে হবে। যদি ইঙ্গিতে সে কাফীল দেখিয়ে দেওয়া হয় বা তার নামোল্লেখ করা হয় আর সে চুক্তির মজলিসে উপস্থিত থাকে এবং কাফীল হতে সম্মত হয় অথবা চুক্তির মজলিসে উপস্থিত না থাকলেও ক্রেতা ও বিক্রেতা মজলিস ত্যাগের আগেই সে উপস্থিত হয়ে যায় এবং কাফীল হতে সম্মতি জ্ঞাপন করে, তবে ইসতিহসান অনুযায়ী বিক্রি বৈধ হবে।

তদ্রূপ যদি এই শর্তে বিক্রি করে যে, ক্রেতা মূল্যের নিশ্চয়তাস্বরূপ কোন বন্ধক রাখবে এবং বন্ধকের মাল ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয় বা নামোল্লেখ দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেয়, তবে সে বিক্রি ইসতিহসান অনুসারে বৈধ হবে। বেচাকেনার চুক্তি যদিও বন্ধকের দাবী করে না, কিন্তু বন্ধক দ্বারা চুক্তির দাবী তথা মূল্য আদায়ের ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়।

'আল মুনতাকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, বন্ধকের মাল যদি ইঙ্গিতকৃত না হয়, কিন্তু নাম দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়, তবে সেটা কায়লী বা ওজনী দ্রব্য হলে এবং কী প্রকার তাও উল্লেখ করা হলে বৈধ হবে অন্যথায় বৈধ হবে না। আর যদি তা ইঙ্গিতকৃত বা নাম দ্বারা স্থিরকৃত না হয় বরং শুধু কোন একটি জিনিস বন্ধক রাখার শর্ত করা হয় তাহলে বিক্রি জায়েয হবে। অবশ্য তারা যদি মজলিসের ভেতরেই বন্ধকী মাল নির্দিষ্ট করতে সম্মত হয় এবং তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই ক্রেতা-বিক্রেতার হাতে তা অর্পণ করে অথবা নগদ মূল্য পরিশোধ করে তবে ইসতিহসান অনুযায়ী সে বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : কাফীল (জামিন) যদি ইঙ্গিতে বা নামোল্লেখ দ্বারা স্থিরকৃত না হয়, তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। কাফীল যদি মজলিসে উপস্থিত থাকে, কিন্তু কাফীল হতে সম্মত না হয় অথবা অসম্মতি না জানালেও গ্রহণ করে না নেয় এ অবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বা অন্য কাজে মন দেয়, তবে ইসতিহসান অনুযায়ী বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে, তাতে পরে সে ব্যক্তি কাফীল হতে সম্মতি জানাক বা না জানাক (আয-যাখীরা)।

৩. মাসআলা : যদি শর্ত করে যে, এক কুরুর (পরিমাপ বিশেষ) ভাল গম বন্ধক রাখতে হবে (কিন্তু ইশারায় দেখিয়ে না দেয়) তবে জায়েয হবে। কেননা এতটুকু অজ্ঞতার কারণে বিক্রি ফাসিদ হয় না। যদি সুনির্দিষ্ট বস্ত্র বন্ধক রাখার শর্ত করে, কিন্তু তা বিক্রেতার হাতে অর্পণ করা হতে বিরত থাকে, তবে তাকে তা অর্পণ করতে বাধ্য করা যাবে না; বরং তাকে বলা হবে, হয় তুমি বন্ধকী মাল অর্পণ কর, না হয় সে মালের মূল্য বন্ধক রাখ, অথবা পণ্যের মূল্য নগদ পরিশোধ কর। আর যদি এর কোনটাই না করে তবে বিক্রি বাতিল করে ফেল (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪. মাসআলা : ক্রেতা উপরোক্ত কোনটাই করতে রাযী না হলে বিক্রেতা চুক্তি বাতিল করতে পারবে (আল বাদায়ে)।

৫. মাসআলা : যদি এই শর্তে কোন বস্ত্র কেনে যে, অমুক ব্যক্তিকে এই যিম্মাদারী নিতে হবে (কাফীল হতে হবে) যে, এ মালে কারও হক প্রমাণিত হলে বিক্রেতার কাছ থেকে সে এর মূল্য ফেরত এনে দেবে, তবে তাও জায়েয। এটা ঠিক এই শর্তে বিক্রি করার মত যে, ক্রেতা মূল্যের বদলে কোন কিছু বন্ধক রাখবে বা কাউকে কাফীল (যামিন) রাখবে। এ উভয় ক্ষেত্রে কাফীল যদি মজলিসে উপস্থিত থাকে এবং এ দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে বেচাকেনা বৈধ হয় (আস-সুগরা)।

৬. মাসআলা : যদি এই শর্তে বিক্রি করে যে, বিক্রেতা তার কোন পাওনাদারকে ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য আদায় করে নিতে বলবে (হাওয়ালার করবে), তবে কিয়াস ও ইসতিহসান উভয় মতেই সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে।

যদি এই শর্তে বিক্রি করে যে, ক্রেতা বিক্রেতাকে অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে মূল্য আদায়ের জন্য হাওয়ালার করবে, তবে কিয়াস অনুযায়ী বিক্রি ফাসিদ এবং ইসতিহসান অনুযায়ী জায়েয হবে (আয-যহীরিয়া)।

৭. মাসআলা : 'হাওয়ালার'-এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, এই শর্তে বিক্রি করে যে, বিক্রেতা ক্রেতার দেনাদারের কাছ থেকে মূল্য আদায় করবে, তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি শর্ত আরোপ করে যে, ক্রেতার কাছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে বিক্রেতাকে তার অর্ধেক মূল্য আদায়ের জন্য হাওয়ালার করা হবে, তবে তা জায়েয হবে। 'হাকিম' (র) তার 'মুখতাসার' গ্রন্থে বলেন যে, এটা সাধারণভাবেই জায়েয। আর এ মতই সঠিক (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৮. মাসআলা : বিক্রিত আরোপিত শর্ত যদি এমন হয় যে, তা চুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, কিন্তু শরীআতে তা বৈধ করা হয়েছে, যেমন ইখতিয়ার ও মেয়াদের শর্ত অথবা শরীআতে

তা বৈধ করা না হলেও মানুষের মধ্যে তার ব্যাপক রেওয়াজ আছে, যেমন কেউ এই শর্তে চামড়া ও ফিতা কিনল যে, বিক্রেতা এর দ্বারা স্যাভেল বানিয়ে দেবে, তবে ইসতিহসান অনুসারে বিক্রি জায়েয হবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে চামড়া কেনে যে, বিক্রেতা তা দিয়ে মোজা বা টুপি বানিয়ে দেবে এবং এর জোড়-পটি বিক্রেতা নিজের পক্ষ হতে দেখে, তবে লোক রেওয়াজের কারণে এরূপ বেচাকেনা বৈধ হবে (আত-তাতার খানিয়া)।

১০. মাসআলা : এমনভাবে এই শর্তে কেউ যদি ছেঁড়া মোজা কেনে যে, বিক্রেতা তা সেলাই করে দেবে অথবা এই শর্তে পুরানো কাপড় বিক্রেতার কাছ থেকে ছেঁড়া কাপড় কেনে যে, বিক্রেতা তা সেলাই করে দেবে এবং তালি লাগিয়ে দেবে, তবে তাও জায়েয হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে কাপড় কেনে যে, বিক্রেতা তা কেটে সেলাই করে দেবে, তবে লোক রেওয়াজ না থাকার কারণে জায়েয হবে না (আয-যহীরিয়া)।

১২. মাসআলা : শর্তটি যদি এমন হয় যে, শরীআতে কোন অবস্থাতেই তার বৈধতা প্রদান করেনি এবং মানুষের মধ্যে তার প্রচলনও নেই, তবে লক্ষ্য করতে হবে, সে শর্ত আরোপের ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা কিংবা বিক্রিত পণ্যের কোন উপকার হয় না এবং পণ্যটি দাবি উত্থাপনের যোগ্যতা সম্পন্ন কি-না। যদি ক্রেতা বা বিক্রেতার কোন উপকার হয় বা পণ্যটির উপকার হয় এবং সে দাবি উত্থাপনের যোগ্যতা সম্পন্ন, তবে এরূপ শর্তারোপের ফলে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে (আয-যাখীরা)।

১৩. মাসআলা : ক্রেতা শর্তারোপ করে যে, মূল্য পরিশোধের আগেই তাকে গোলাম বুদ্ধিয়ে দিতে হবে তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (আয-যহীরিয়া)।

১৪. মাসআলা : কেউ যদি বলে যে, আমি তোমার কাছে এক হাজার টাকায় আমার এই গোলামটি এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, তোমার ওই গোলামটি আমাকে দিয়ে দেবে তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা সে বিক্রির ভেতর হিবা (উপহার প্রদান)-এর শর্তারোপ করেছে। কিন্তু যদি বলে, তোমার কাছে আমার এই গোলামটি এক হাজার টাকায় এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, তুমি আমাকে তোমার এই গোলামটি অতিরিক্ত দেবে, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে গোলামটিকে মূল্যের সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোজন ধরা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে গোলাম বিক্রি করে যে, ক্রেতা যদি কখনও গোলামটি বিক্রি করে দেয় তবে তার মূল্য বিক্রেতাই তাকে রাখার অধিকার পাবে, তাহলে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

১৬. মাসআলা : যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই গাধাটি এই শর্তে বিক্রি করছি যে, তুমি এই খাল অতিক্রমের আগে আগে ফেরত দিলে আমি গ্রহণ করব, কিন্তু খালটি অতিক্রমের পর ফেরত দিলে গ্রহণ করব না, তবে বিক্রি জায়েয হবে না। এমনভাবে যদি বলে,

আগামীকালের আগে ফেরত দিলে গ্রহণ করব কিন্তু এর পরে নয়, তবুও বিক্রি বৈধ হবে না (আল কিন্য়া)।

১৭. মাসআলা : কেউ যদি বিক্রেতারই কাছে বিক্রি করার জন্য তার কাছ থেকে কেনে তবে সে বিক্রি ফাসিদ। কেউ যদি গাছের ফল কেনে এবং শর্ত করে যে, বিক্রেতাকেই তা পেরে দিতে হবে কিংবা শর্ত করে যে, ক্রেতাকে বিক্রেতা এক হাজার টাকা ধার দেবে তবে সে বিক্রি ফাসিদ (আল-খুলাসা)।

১৮. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে কিছু বিক্রি করে যে, ক্রেতা তাকে কিছু হাদিয়া দেবে বা তাকে কিছু সাদাকা করবে অথবা সে বিক্রেতার কাছে কোন বস্তু বিক্রি করবে কিংবা তাকে ঋণ দেবে তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি এই শর্তে বিক্রি করে যে, ক্রেতা তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে ঋণ দেবে তবে তা জায়েয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা : পণ্যের সাথে শর্তারোপের ক্ষেত্রে বিক্রি তখনই ফাসিদ হবে, যখন পণ্যটি দাবি উত্থাপনের যোগ্যতা সম্পন্ন হয়। আর এটা শুধু দাস-দাসী বিক্রির ক্ষেত্রেই হতে পারে, কেননা অন্য কোন প্রাণী তো দাবি উত্থাপনের যোগ্যতা সম্পন্ন নয়। কাজেই বিক্রিত পশুর স্বার্থে কোন শর্তারোপ করা হলে বিক্রি ফাসিদ হবে না। সুতরাং কেউ যদি এ শর্তে পশু কেনে যে, সে পশুটি বিক্রি করতে বা কাউকে দান করতে পারবে না, তবে সে ক্রয় জায়েয, যদিও এই শর্তে পণ্যের উপকার রয়েছে (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে দাস-দাসী বিক্রি করে যে, ক্রেতা তাকে বিক্রি করতে বা কাউকে দান করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তাকে নিজ মালিকানা হতে বের করতে পারবে না, তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-বাদায়ে)।

২১. মাসআলা : যদি এই শর্তে গোলাম বিক্রি করে যে, ক্রেতা তাকে খাদ্য দেবে, তবে সে বিক্রি জায়েয, কিন্তু যদি শর্ত করে যে, গোশত-রুটি খাওয়াতে হবে, তাহলে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা : যদি এই শর্তে গোলাম বিক্রি করে যে, ক্রেতা তাকে আযাদ করে দেবে, তবে আমাদের ইমামগণের জাহিরী রিওয়াযাত অনুসারে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। সুতরাং এভাবে কেনার পর কবজার আগেই যদি গোলামটি আযাদ করে দেয়, তবে সে আযাদী কার্যকর হবে না। যদি কবজার পর আযাদ করে তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ইসতিহসান অনুযায়ী সে বিক্রি বৈধতায় রূপান্তরিত হবে। সুতরাং এ অবস্থায় ক্রেতাকে গোলামের দাম পরিশোধ করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে না। কাজেই ক্রেতাকে গোলামটির বাজার দর পরিশোধ করতে হবে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা : আমাদের ইমামত্রয় এ ব্যাপারে একমত যে, গোলামটি আযাদ করার আগেই ক্রেতার হাতে মারা গেলে, তবে তাকে বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তদ্রূপ যদি

কারও কাছে বিক্রি করে বা কাউকে হাদিয়া করে দেয়, তাহলেও তাকে বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে (আত-তাতার খানিয়া)।

২৪. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্ত মেনে বাঁদী কেনে যে, সে তাকে রেশমী কাপড় পরাবে বা তাকে কখনও মারধর করবে না, কিংবা কোন ভাবে কষ্ট দেবে না, তবে বিক্রি ফাসিদ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা : যদি এই শর্তে বাঁদী কেনে যে, ক্রেতা তাকে মুদাক্কর বানাবে অথবা তাকে উম্মু ওয়ালাদ বানাবে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ (আল-বাদায়ে)।

২৬. মাসআলা : উপকার লাভের শর্ত যদি চুক্তির পক্ষদ্বয়ের কোন একজন এবং তৃতীয় কারও মধ্যে আবর্তিত হয়, যেমন ক্রেতা এই শর্তে কিনল যে, অমুক তৃতীয় ব্যক্তি বিক্রেতাকে এত টাকা ঋণ দেবে, তাহলে বিক্রি ফাসিদ হবে না। 'সাদরুশ শহীদ' (র) 'আল জামিউস সাগীর'-এর ভাষ্য গ্রন্থের 'ক্রেতা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ হতে বিক্রি মূল্য বৃদ্ধিকরণ' অধ্যায়ে এরূপ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম কুদুরী (র) বলেন, এরূপ বিক্রি ফাসিদ। ইমাম কুদুরী (র) বর্ণিত মাসআলাটি নিম্নরূপ, ক্রেতা যদি বলে, আমি এই শর্তে তোমার কাছ থেকে এই বস্তুটি কিনলাম যে, তুমি আমাকে ঋণ দেবে, কিংবা এই শর্তে কিনলাম যে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে ঋণ দেবে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ (আয-যাখীরা)।

২৭. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, বিক্রেতার উপর যেসব শর্ত আরোপ করলে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যায় সেসব শর্ত যদি তৃতীয় কারো উপর আরোপ করা হয় তবে তা বাতিল। যেমন কেউ এই শর্তে পশু কিনল যে, বিক্রেতা তাকে বিশ টাকা দান করবে, তবে এটা বাতিল। এমনিভাবে যদি বলে, আমি এই পশুটি এই শর্তে কিনলাম যে, অমুক আমাকে বিশ টাকা দান করবে তাও বাতিল।

আর যেসব শর্ত বিক্রেতার উপর আরোপ করলে বিক্রি ফাসিদ হয় না, তা তৃতীয় ব্যক্তির উপর আরোপ করা জায়েয। সে ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে (আল-খুলাসা)।

২৮. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে কোন দ্রব্য কেনে যে, অমুক তৃতীয় ব্যক্তি মূল্যের এই পরিমাণ তার পক্ষ হতে আদায় করে দেবে, তবে তা জায়েয। এ অবস্থায় তার ইখতিয়ার থাকবে যে, চাইলে সে পূর্ণ মূল্য গ্রহণ করবে অথবা পরিত্যাগ করবে।

ইবন সামাআ (র) আবু হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কারও কাছ থেকে এই শর্তে কোন দ্রব্য কেনে যে, বিক্রেতা তা ক্রেতার পুত্রকে বা তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে মূল্যের এই পরিমাণ দান করবে তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

২৯. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে কাপড় বিক্রি করে যে, ক্রেতা সেটি বিক্রি বা কাউকে দান করতে পারবে না অথবা এই শর্তে পশু বিক্রি করে যে, সে এটি কারও কাছে বিক্রি বা কাউকে দান করতে পারবে না কিংবা এই শর্তে খাদ্য দ্রব্য বিক্রি করে যে, ক্রেতা তা খেতে বা দান করতে পারবে না, তবে 'আল মুযারআ' (বর্গাচাষ) অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে,

এতে বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে। হাসান (র) 'আল মুজাররাদ' গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র) হতে এরূপই বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সহীহ (আল বাদায়ে)। আর এটাই মাযহাবের জাহিরী মত (হিদায়া)।

৩০. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র) হতে হাসান (র) বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি এই শর্তে পণ্ড কেনে যে, সে তাকে ঘাস খাওয়াবে না, তবে সে ক্রয় বৈধ। এমনভাবে যদি শর্ত করে যে, পণ্ডটি সে যবাহু করে ফেলবে, তাও বৈধ। যদি শর্ত করে যে, পণ্ডটি সে অমুকের কাছে বিক্রি করে দেবে কিংবা অমুকের কাছে বিক্রি করবে না, তবে সে বেচাকেনা ফাসিদ। যদি বলে, এই শর্তে কিনলাম যে, এটি বিক্রি করে দেব বা দান করে দেব, কিন্তু কারও নাম নির্দিষ্ট করল না, তবে সে বেচাকেনা বৈধ।

'আল মুনতাকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি এই শর্তে কেনে যে, সে এটি অমুকের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করবে না অথবা যদি এই শর্তে বাড়ি কেনে যে, অমুকের কথা ছাড়া সে বাড়িটি ভাঙ্গবে না বা কোন নির্মাণকার্য করবে না তবে সে বেচাকেনা ফাসিদ। ইবন সামাআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতেও এরূপ বর্ণনা করেছেন (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে কোন দ্রব্য বিক্রি করে যে, ক্রেতাকে সেটা তার নিজের জন্যই কিনতে হবে, তবে সে বিক্রি জায়েয নয়। যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই দ্রব্যটি একশ' দিরহামে বিক্রি করছি ঘুস ও উৎকোচরূপে, তবে বিক্রি বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩২. মাসআলা : যদি এই শর্তে কেনে যে, এটা বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে এর মূল্য পরিশোধ করবে, তবে তা ফাসিদ (আল-বাহরুর রায়িক)।

৩৩. মাসআলা : যদি এই শর্তে কোন বাড়ি বিক্রি করে যে, ক্রেতাকে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ। তদ্রূপ যদি এই শর্তে খাদ্য দ্রব্য বিক্রি করে যে, তা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে সাদাকা করতে হবে কিংবা এই শর্তে জমি বিক্রি করে যে, সেটাকে মুসলিম জনসাধারণের জন্য সরাইখানা বা কবরস্থান বানাতে হবে, তবে সে বিক্রিও ফাসিদ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৪. মাসআলা : 'আল ফাতওয়া আল-আত্তাবিয়া' গ্রন্থে আছে, যদি শর্ত করে যে, সে জমিতে গির্জা বানাতে হবে কিংবা এই শর্তে দ্রাক্ষারস বিক্রি করে যে, তা দিয়ে মদ বানাতে হবে, তবে সে বিক্রি জায়েয (আত-তাতার খানিয়া)।

৩৫. মাসআলা : যদি বলে, তোমার কাছে এই গোলামটি তিনশ' দিরহামের বিনিময়ে এবং একবছর আমার সেবা করার বিনিময়ে বিক্রি করছি কিংবা যদি বলে, তিনশ' দিরহামের বিনিময়ে এই শর্তে বিক্রি করছি যে, সে এক বছর আমার সেবা করবে অথবা যদি বলে, তিনশ' দিরহাম এবং এক বছর তোমার সেবা করবে এর বিনিময়ে বিক্রি করছি, তবে সে বিক্রি ফাসিদ। কেননা এমন বিক্রি যার ভেতর ইজারার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এমনভাবে যদি

বলে, তোমার কাছে আমার এই গোলামটি তোমার একবছরের সেবার বিনিময়ে বিক্রি করছি, তাতেও বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৬. মাসআলা : যদি এই শর্তে কাপড় বিক্রি করে যে, ক্রেতাকে তা ছিড়ে ফেলতে হবে অথবা এই শর্তে বাড়ি বিক্রি করে যে, ক্রেতাকে তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে, বিক্রি জায়েয হবে, কিন্তু শর্ত বাতিল হয়ে যাবে (আল-বাদায়ে)।

৩৭. মাসআলা : যদি এমন কোন শর্ত আরোপ করে, যাতে কোন লাভ-ক্ষতি নেই, তবে সে বিক্রি জায়েয, যেমন এই শর্তে খাদ্য বিক্রি করা যে, ক্রেতাকে তা খেতে হবে বা এই শর্তে কাপড় বিক্রি করা যে, তাকে তা পরতে হবে (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা : যদি এই শর্ত মেনে বাঁদী ক্রয় করে যে, তাকে তার সঙ্গে সঙ্গম করতে হবে বা তার সঙ্গে সঙ্গম করতে পারবে না, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উভয় অবস্থায়ই সে বেচাকেনা বৈধ আর এটাই সহীহ (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩৯. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি কাউকে বলে, অমুকের কাছে তোমার পাওনা এক হাজার টাকার বিনিময়ে আমি এই গোলামটি তোমার কাছে এই শর্তে বিক্রি করছি যে, অমুকের পক্ষ হতে আমার মাধ্যমে তোমার সে পাওনা পরিশোধ হয়ে যাবে, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা সেই ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করত তার প্রতি অনুযোগকারী সাব্যস্ত হবে (সুতরাং সেই ব্যক্তির কাছে সে তা দাবী করতে পারবে না)।

ইবন সামাআ (র) তাঁর নাওয়াদির গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, ক্রেতার যদি কারও কাছে এক হাজার দিরহাম পাওনা থাকে এবং সেই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রেতা তার কাছে একটি গোলাম বিক্রি করে আর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তাতে সম্মত থাকে, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে তার সে পাওনায় বিক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে (মুহীত)।

৪০. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে গোলাম বিক্রি করে যে, ক্রেতা তার মূল্যটা বিক্রেতার পাওনাদারকে পরিশোধ করবে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ। তদ্রূপ যদি এই শর্তে গোলাম বিক্রি করে যে, ক্রেতা-বিক্রেতার পক্ষ হতে তার পাওনাদারের জামিন হবে, তবে সে বিক্রিও ফাসিদ হবে (আয-যাখীরা)।

৪১. মাসআলা : কেউ যদি কাউকে বলে যে, তুমি অমুকের কাছে তোমার গোলামটি এই শর্তে বিক্রি কর যে, আমি এ জন্য তোমাকে একশ' টাকা পারিশ্রমিক দেব আর সে মতে সেই ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহামে গোলামটি বিক্রি করে, কিন্তু তার কাছে শর্তের কথা উল্লেখ না করে, তবে বৈধ হয়ে যাবে, কিন্তু পারিশ্রমিক অবশ্য সাব্যস্ত হবে না। আদেশদাতা যদি তাকে টাকা দিয়ে থাকে, তবে ফেরত নিতে পারবে। তদ্রূপ যদি বলে, অমুকের কাছে তোমার গোলামটি এই শর্তে বিক্রি কর যে আমি তোমাকে একশ' টাকা হাদিয়া দেব, সে ক্ষেত্রেও একই মাসআলা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪২. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি বলে, অমুকের কাছে আমার পাওনা একশ' টাকার বিনিময়ে এই বস্ত্রটি আমি তোমার কাছ থেকে ক্রয় করছি, তবে তা ফাসিদ হবে। যদি বলে, অমুকের কাছে তোমার পাওনা একশ' টাকার বিনিময়ে আমি এই কাপড়টি তোমার কাছে এই শর্তে বিক্রি করছি যে, অমুক তোমার থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে (আল-মুহীত)।

৪৩. মাসআলা : কেউ যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই জিনিসটি এত দামে এই শর্তে বিক্রি করছি যে, দাম থেকে এত টাকা ছেড়ে দেব, তবে সে বিক্রি জায়েয আছে।

৪৪. মাসআলা : যদি বলে, এই শর্তে বিক্রি করছি যে, এর দাম থেকে তোমাকে এত টাকা হাদিয়া দেব, তবে সে বিক্রি জায়েয নয়। যদি বলে, তোমার কাছে এত টাকায় এই শর্তে বিক্রি করছি যে, তোমাকে এত টাকা ছেড়ে দিলাম কিংবা যদি বলে, এই শর্তে বিক্রি করছি যে, তোমাকে এত টাকা হাদিয়া দিলাম, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে। কেননা মূল্য ওয়াজিব হওয়ার আগে দান করলে সেটা মূল্য থেকে ছাড় বলে গণ্য হয়। কিন্তু প্রথম অবস্থায় দানের শর্ত করেছিল মূল্য ওয়াজিব হওয়ার পর, (সুতরাং সেটা ছাড় সাব্যস্ত হবে না) (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৫. মাসআলা : কেউ যদি কোন গোলাম কেনে এবং তাতে নিজের পক্ষে ইখতিয়ারের শর্ত আরোপ করে এবং আরও যোগ করে যে, আমি যদি গোলামটি বিক্রির জন্য তুলি বা তাকে দিয়ে কাজ নেই, তবুও আমার ইখতিয়ার বলবৎ থাকবে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে।

যদি কোন ব্যক্তির অপর কারও কাছে পাওনা থাকে এবং সে তার কাছ থেকে এই শর্তে কাপড় কেনে যে, পাওনা কাটাকাটি করা যাবে না, তবে আমাদের ইমামগণের যাহিরী রিওয়াযাত অনুযায়ী বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। সুতরাং ক্রেতা সে গোলামটি কবজা করার আগে যদি আযাদ করে দেয় তবে আযাদী কার্যকর হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কবজা করার পর আযাদ করলে ইস্তিহসান অনুযায়ী বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে। কাজেই ক্রেতাকে ক্রয় মূল্য পরিশোধ করতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে বিক্রি বৈধতায় রূপান্তরিত হবে না। কাজেই তাকে বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে (আল-মুহীত)।

৪৬. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে আঙ্গুরের বাগানে ঝুলন্ত আঙ্গুর ক্রয় করে যে, বিক্রিতাকে বাগানের প্রাচীন নির্মাণ করে দিতে হবে, তবে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। বিক্রিতা যদি বলে, তুমি ক্রয় কর, আমি এর প্রাচীর নির্মাণ করে দেব, তবে বিক্রি জায়েয হবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিক্রিতাকে নির্মাণে বাধ্য করা যাবে না। সে নির্মাণ না করলে তখন ক্রেতার ইখতিয়ার লাভ হবে। চাইলে সে ক্রয় বলবৎ রাখবে, অন্যথায় প্রত্যাহার করবে (আয-যাহীরিয়া)।

৪৭. মাসআলা : যদি এই শর্তে বেচাকেনা হয় যে, ক্রেতা অল্প-অল্প করে মূল্য পরিশোধ করবে, তবে চুক্তির ভেতরই সে শর্ত আরোপ করলে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি বেচাকেনার পরে তা বলে তবে বিক্রিতা সবটা মূল্য এক সঙ্গেও আদায় করে নিতে পারবে (মুখতারুল-ফাতওয়া)।

৪৮. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে ক্রয় করে যে, সে তার নিজ বাড়িতে মূল্য পরিশোধ করবে, এ ক্ষেত্রে যদি বিক্রয় দ্রব্য যদি শহরে হয় এবং তার বাড়িও শহরে হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এরূপ শর্তের বেচাকেনা ইস্তিহসান অনুযায়ী জায়েয হবে। যদি তার বাড়ি শহরের বাইরে হয়, পণ্যও শহরের বাইরে হয়, কিন্তু বিক্রিতার বাড়ি শহরের ভেতরে হয় তবে সে বিক্রি সর্বসম্মতক্রমেই অবৈধ। এমনভাবে উভয়ে যদি শহরের বাইরে হয় তখনও একই হুকুম। যদি এই শর্তে বেচাকেনা হয় যে, বিক্রিতাকে ক্রেতার বাড়িতে মাল পৌঁছে দিতে হবে, তবে সকলের মতেই সে বিক্রি অবৈধ হবে (শারহুত-তাহাবী)।

৪৯. মাসআলা : কেউ যদি সঠিক নিয়মে কোন পল্লীতে কাঠ কেনে এবং বিক্রয়ের সঙ্গে বিক্রিতাকে বলে এই দ্রব্য তুমি আমার বাড়িতে পৌঁছে দাও, তবে বিক্রি জায়েয হবে। কেননা এটা শর্ত নয়, (ক্রেতার পক্ষ হতে) পরামর্শ কাজেই সে চাইলে পৌঁছে দেবে এবং চাইলে না দেবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫০. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্ত মেনে বাড়ি কেনে যে, অমুক ব্যক্তি তাকে বাড়ি বুঝিয়ে দেবে এবং ক্রেতা জানে যে, সেই ব্যক্তিরও এ বাড়িতে একটা অংশ আছে কিংবা তার এটা জানা নেই, তবে এ বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। হাসান (র) বলেন, যদি তার জানা থাকে যে, সে ব্যক্তিরও বাড়িতে অংশ আছে, তারপর সে বাড়িটি সমর্পণ করে তবে বিক্রি বৈধ হবে। আর যদি জানা না থাকে তবে বিক্রিতার অংশে ক্রেতার ইখতিয়ার লাভ হবে। চাইলে সে তার অংশ গ্রহণ করবে, অন্যথায় পরিত্যাগ করবে (আল-মুহীত)।

৫১. মাসআলা : যদি ক্রেতা বলে, তুমি এক হাজার টাকায় বিক্রি করলে আমি তোমাকে একশ' টাকা বেশী দেব এবং বিক্রিতা তা মেনে নেয়, তবে সে বিক্রি বৈধ হবে এবং এক হাজার একশ' টাকায় বিক্রি সংঘটিত হবে। এমনভাবে যদি বলে, আমি তোমাকে মূল্যে অতিরিক্ত দান করব, তখনও একই হুকুম (আয-যাহীরিয়া)।

৫২. মাসআলা : যদি এই শর্ত মেনে গোলাম বিক্রি করে যে, ক্রেতা অন্য কোন শহরে তার মূল্য পরিশোধ করবে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ, অবশ্য এটা সে ক্ষেত্রে যখন নগদ মূল্যে বিক্রি হয়। যদি বাকিতে এক মাসের মেয়াদে এক হাজার টাকায় বিক্রি হয় এবং শর্ত করে যে, ক্রেতা অন্য কোন শহরে মূল্য পরিশোধ করবে, তবে এক মাসের মেয়াদে এক হাজার টাকায় বিক্রি বৈধ সাব্যস্ত হবে, কিন্তু অন্য শহরে মূল্য আদায়ের শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে এক হাজার টাকায় নির্দিষ্ট মেয়াদে বিক্রি করেছে। আর অন্য শহরে পরিশোধের কথাটা বলা হয়েছে পরিশোধের স্থান নির্দিষ্ট করার জন্য, অথচ যে বস্তুর কোন বহন খরচা নেই তা পরিশোধের জন্য স্থান নির্ণয় সহীহ নয়। হ্যাঁ, যে জিনিসের বহন খরচা আছে, তা পরিশোধের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হলে তা সহীহ হয় এবং সে শর্তে বিক্রিও বৈধ হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৩. মাসআলা : নগদে নিলে এত টাকা এবং বাকিতে এত টাকা কিংবা এক মাসের মেয়াদে এত টাকা এবং দু'মাসের মেয়াদে এত টাকা, এভাবে বিক্রি করা জায়েয নয় (আল-খুলাসা)।

৫৪. মাসআলা : কেউ যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই মটকা এবং এর ভেতরের তেল এই কথার উপর বিক্রি করলাম যে, মটকার ওজন পঞ্চাশ রাতল এবং তেলের ওজন পঞ্চাশ রাতল, উভয়ের প্রতি রাতল এক দিরহামে তারপর ক্রেতা যদি মেপে দেখে মটকার ওজন ষাট রাতল এবং তেলের চল্লিশ রাতল, তবে এরূপ ক্ষেত্রে কেনা দামটাকে মটকার মূল্য ও তেলের মূল্য হিসেবে ভাগ করা হবে, তারপর মটকার ওজনে যে দশ রাতল বেশী পাওয়া গেল তদন্তে দশ রাতলের দাম যোগ করা হবে এবং তেলের মূল্য থেকে সেই দশ রাতল কমতির দাম বিয়োগ করা হবে। তারপর ক্রেতাকে বলা হবে, এখন তোমার ইচ্ছা হলে এটা গ্রহণ কর, নয়ত পরিত্যাগ কর (আল-মুহীত)।

৫৫. মাসআলা : যদি এই শর্তে তুর্কী ঘোড়া বিক্রি করে যে, এটা অত্যন্ত দ্রুতগামী, তবে সে বিক্রি বৈধ। যদি এই কথার উপর কেউ ছাগল কেনে যে, সেটি গর্ভবতী কিংবা এই কথার উপর উটনী কেনে যে, সেটি গাভিন, তবে যাহেরী রিওয়াযাত অনুযায়ী সে বিক্রি বৈধ হবে না, যেমন সঙ্গে বাচ্চা আছে এ কথার উপর বিক্রি করলে জায়েয হয় না (আয-যাখীরা)।

৫৬. মাসআলা : কেউ কারও কাছ থেকে বুখারায় এই ঋণ নিল এই শর্তে যে, সামারকান্দে তা পরিশোধ করবে অথবা এক মাসের মেয়াদে বুখারায় বসে এক হাজার টাকা এই শর্তে ঋণ নেয় যে, সে তা পরিশোধ করবে সামারকান্দে, তবে তা জায়েয হবে না (আল-মুহীত)।

৫৭. মাসআলা : যদি গাভিন হওয়ার শর্তে ছাগল বিক্রি করে তবে বিক্রি ফাসিদ হবে (আয-যাহীরিয়া)।

৫৮. মাসআলা : যদি কেউ এই কথার উপর বাঁদী খরিদ করে যে, সে গর্ভবতী, তবে ফকীহ আবু বকর আল-বালাখী (র)-এর বর্ণনা অনুসারে এরূপ বিক্রি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। কারও মতে এটা জায়েয নয়, যেমন পণ্ডর ক্ষেত্রে গাভিন হওয়ার শর্ত করলে বিক্রি জায়েয হয় না। কেউ বলেন, এ বিক্রি জায়েয। ফকীহ আবু বকর আল-বালাখী (র) বলেন, আমার দৃষ্টিতে এই মতই বিশুদ্ধতর (আয-যাখীরা)।

৫৯. মাসআলা : ফকীহ আবু জা'ফর আল-হিন্দাওয়ানী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার মতে এরূপ শর্ত বিক্রেতার পক্ষ থেকে আরোপ করা হলে বিক্রি বৈধ হবে। আর যদি ক্রেতার পক্ষ থেকে আরোপিত হয়, তবে বৈধ নয় (শারহুত-তাহাবী)।

৬০. মাসআলা : কেউ যদি বাচ্চাদের দুধ পান করানোর উদ্দেশ্যে এই শর্তে কোন বাঁদী কেনে যে, সে গর্ভবতী, তবে তা জায়েয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬১. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে কথার উপর কোন বাঁদী বিক্রি করে যে, সে গর্ভবতী নয়, অথচ তার গর্ভ আছে কিংবা সে গর্ভবতী নয়, তবে বিক্রি জায়েয হবে (আল-মাবসূত)।

৬২. মাসআলা : কেউ যদি এই কথার উপর গাভী কেনে যে, সেটি দুধেল, তবে ইমাম তাহাবী (র)-এর মতে জায়েয হবে না। ইমাম শায়খ আল-উস্তায (র)-এ রকমই ফাতওয়া দিতেন। কিন্তু ইমাম কারখী (র)-এর মতে জায়েয এবং ফকীহ (র) এটাই গ্রহণ করেছেন।

সাদরুশ-শাহীদ (র) এমনই ফাতওয়া দিতেন। আর ফাতওয়া এ মতরেই উপর (আল-খুলাসা)।

৬৩. মাসআলা : কেউ যদি এ কথার উপর কোন ধাই বাঁদী বিক্রি করে যে, তার বুকে দুধ আছে, তবে শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল (র)-এর বর্ণনা মতে বিক্রি ফাসিদ হবে। কিন্তু ফকীহ আবু জা'ফর (র) উল্লেখ করেন যে, এরূপ বিক্রি জায়েয। কেননা এটাও একটা সেবা কর্ম। যেমন কেউ যদি এ কথার উপর গোলাম বিক্রি করে যে, সে অনুলেখক বা বাবুর্চি, সে বিক্রি জায়েয হয়। এটাও তো সেই রকম। বস্তুত এ মতই সহীহ এবং এরই উপর ফাতওয়া (আল-গিয়াছিয়া)।

৬৪. মাসআলা : কেউ যদি এ কথার উপর তরমুজ কেনে যে, সেটি মিষ্টি অথবা এই কথার উপর সরিষা বা তিল কেনে যে, তাতে এত পরিমাণ তেল আছে, বা ধান কেনে যে, তাতে এই পরিমাণ চাল আছে অথবা গরু বা ছাগল কেনে যে, তাতে এই পরিমাণ গোশত আছে, তবে এর প্রত্যেকটি বিক্রিই ফাসিদ। কেননা হস্তক্ষেপের আগে তা জানা সম্ভব নয় যে, কী পরিমাণ আছে (আল-কিনয়া)।

৬৫. মাসআলা : যদি এই কথার উপর ছাগল বিক্রি করে যে, সেটি এই পরিমাণ দুধ দেয়, তবে সকল বর্ণনা মতে বিক্রি ফাসিদ হবে। এমনভাবে যদি এই কথার উপর ছাগল কেনে যে, সেটি এক মাস পর বাচ্চা দেবে, তাও ফাসিদ (আয-যাখীরা)।

৬৬. মাসআলা : ক্রেতা বলল, দুগ্ধবতী হওয়ার শর্তে আমি তোমার কাছ থেকে গাভীটি কিনছি। বিক্রেতা বলল, আমিও এই শর্তেই বিক্রি করছি। কিন্তু তারা চুক্তি সম্পন্ন করল নিঃশর্তভাবে পরে গাভীটিকে অন্য রকম দেখতে পেল তবে তার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে না (আল-কিনয়া)।

৬৭. মাসআলা : কেউ এই শর্তে একটি বাঁদী কিনল যে, সেটি এই-এই সুরে গাইতে পারে, কিন্তু নিয়ে দেখল সে গানই জানে না। এ বিক্রি বৈধ হবে কি? বৈধ হবে এবং ক্রেতার ইখতিয়ারও থাকবে না। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এ হুকুম সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন উল্লিখিত গুণের উল্লেখ করা হয় বাঁদীটির দোষ মুক্ততা বুঝানোর লক্ষ্যে। 'আল-ফাতওয়া' গ্রন্থে আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এরূপ শর্তে বিক্রি করলে সে বিক্রি ফাসিদ। ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতেও এরূপ এক মত বর্ণিত আছে। তবে প্রথমোক্ত মতই গৃহীত হয়েছে। এমনভাবে গুঁতানো ভেড়া ও লড়াকু মোরগ বিক্রিতে যদি গুঁতানো ও লড়াকু হওয়ার শর্তারোপ করা হয় এবং তার উদ্দেশ্য থাকে তাতে যে দোষ নেই সে কথা বুঝানো তবে সে বিক্রিও জায়েয (আল-গিয়াছিয়া)।

৬৮. মাসআলা : কেউ যদি এ কথার উপর আখরোট কেনে যে, তা নষ্ট, তবে জায়েয নয়। অবশ্য পরিমাণে যদি বেশী হয়, যা মানুষ জ্বালানী হিসেবে কিনে থাকে, তবে জায়েয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৯. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে কবুতর কেনে যে, তা এই-এই সুরে গাইতে পারে, তবে সে বেচাকেনা ফাসিদ। কেননা কবুতরকে তো সুরে গাইতে বাধ্য করা যাবে না। ফলে সে শর্ত তার ভেতর বিদ্যমান আছে কিনা তাও জানা সম্ভব নয়। কাজেই বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (আয-যাহীরিয়া)।

৭০. মাসআলা : 'আল-আসল' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি এই শর্তে কুকুর বিক্রি করে যে, সেটি কামড়ায় বা কবুতর বিক্রি করে যে, সেটি উড়ে বেড়ায় তবে সে বিক্রি জায়েয হবে না। অবশ্য এটাকে যদি দোষ হিসেবে দেখায়, তবে জায়েয হবে (আয-যাহীরী)।

৭১. মাসআলা : যদি বাড়ি কেনে এবং তার সাথে চত্বরের শর্ত করে তবে জায়েয হবে না। যদি জমি বিক্রিতে শর্ত করে যে, ক্রেতা সে জমিতে কোন কিছু করার পরও যদি সে জমিতে কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে বিক্রেতা সে ব্যাপারে ক্রেতার পক্ষে জামিন হবে, তবে বিক্রি জায়েয হবে না। কেননা ক্রেতা তাতে গর্ত বা এ জাতীয় কিছু করলে বিক্রেতা পক্ষে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়। সে তো কেবল খড়, গাছ ও ফসলেরই ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৭২. মাসআলা : যদি এই শর্তে বাঁদী কেনে যে, সে দৈনিক এতটা রুটি বানাতে পারে, বা এই পরিমাণ লিখতে পারে, তবে তা জায়েয হবে না (আল-খুলাসা)।

৭৩. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্ত মেনে জমির তরবারি বিক্রি করে যে, ক্রেতা তাতে তার পশু ছেড়ে দেবে ইস্তিহসান অনুযায়ী তা জায়েয হবে এবং এরই উপর ফাতওয়া, কিন্তু কিয়াস অনুসারে জায়েয নয় এবং কোন কোন ফকীহ সে মতই পোষণ করেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭৪. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে জমি কেনে যে, বিক্রেতা জমির খারাজ (কর) পরিশোধ করবে তবে সে বেচাকেনা ফাসিদ। যদি আংশিক কর বিক্রেতার উপর চাপানো হয়, তবে তার পরিমাণটা লক্ষ্য করতে হবে। তা যদি মূল করের অংশ বিশেষ হয় তখনও জায়েয হবে না। যদি মূল করের অতিরিক্ত হয় তবে জায়েয হবে।

৭৫. মাসআলা : কেউ যদি এই কথা উপর জমি কেনে যে, তার খারাজ তিন দিরহাম এবং পরে দেখা যায় তার পরিমাণ চার দিরহাম অথবা যদি বলে চার দিরহাম, কিন্তু পরে দেখা যায় তিন দিরহাম, তবে সে বিক্রি ফাসিদ। অবশ্য এ হুকুম সেই ক্ষেত্রে যখন বিক্রেতার তা জানা থাকবে। যদি তার জানা না থাকে, তবে সে বিক্রি জায়েয। তখন ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে পূর্ণ খারাজসহ তা গ্রহণ করবে, অন্যথায় পরিত্যাগ করবে।

যদি খারাজী জমি খারাজ ছাড়া ক্রয় করে, অথবা লা-খারাজী (নিষ্কর) জমি খারাজসহ করে আর তা এভাবে হতে পারে যে, বিক্রেতার একখণ্ড খারাজী জমি আছে, সে সেই জমির খারাজ এই লা-খারাজী জমিতে ধরে দিল এবং তারপর তা বিক্রি করল আর ক্রেতা তা জানে, তবে সে বেচাকেনা ফাসিদ (আল-খুলাসা)।

৭৬. মাসআলা : কেউ এই শর্তে গোলাম কিনল যে, সে চুরি করলে তার দায়-দায়িত্ব বিক্রেতার অথবা চাঁদ ওঠা পর্যন্ত তার উন্মাদনা দেখা দিলে সে দায়ও বিক্রেতার, তারপর চাঁদ ওঠার আগেই তার মধ্যে উন্মাদনা দেখা দিল এবং তার ভিত্তিতে সে বিক্রেতার কাছে গোলামটি ফেরত দিল, কিন্তু বিক্রেতা গোলামটি গ্রহণ করল না, পরে ক্রেতার হাতে সে মারা গেল, এখন তার হুকুম কী? ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, উপরিউক্ত শর্তে বিক্রি ফাসিদ। কাজেই সে যদি এভাবে ফেরত দিয়ে থাকে যে, বিক্রেতা তাকে হস্তগত করার সামর্থ্য রাখে, তবে ক্রেতা দায়মুক্ত হয়ে গেল। সুতরাং তার কাছে বিক্রেতার কোন পাওনা থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭৭. মাসআলা : কাযী ইমাম রুকনুদ্দীন আলী আস-সুগদী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একখণ্ড জমির খারাজ (কর) হচ্ছে দশ দিরহাম। মালিক সে জমি খারাজসহ পনের দিরহামে বিক্রি করল এবং তাতে অপর একটি জমির খারাজও যোগ এখন সে বিক্রির হুকুম কী? তিনি বললেন, বিক্রি ফাসিদ। এমনিভাবে যদি মূল খারাজের কম ধরে বিক্রি করে তখনও একই হুকুম। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হল, এ জমির আসল খারাজ কত তা যদি জানা না থাকে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে তার পরিমাণ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় ক্রেতা কম দাবী করে এবং বিক্রেতার দাবী বেশী। এ অবস্থায় কি সে এলাকার অনুরূপ জমির খারাজ বিবেচ্য হবে? এমনিভাবে ক্রেতা যদি চায় যে, বিক্রেতা এই মর্মে কসম করুক যে, এ জমির খারাজ এই পরিমাণ বলে তার জানা নেই, তাহলে সে ইখতিয়ার কী ক্রেতার থাকবে? তিনি বললেন, খারাজের ব্যাপারে সরকারি প্রতিনিধিই বাঁদী হতে পারে।

তাকে জিজ্ঞেস করা হল, যদি কোন অঞ্চলের জমি খারাজী হয়, কিন্তু মূল খারাজ কিতাবে আরোপ করা হয়েছিল তা জানা নেই, বাকি সে অঞ্চলের লোক সেচ অনুযায়ী খারাজ বস্টন করে থাকে এবং বহুকাল ধরেই সেখানে এটা চালু আছে, তো এ অবস্থায় কেউ যদি খারাজ ছাড়া কিংবা স্বল্প খারাজে জমি বিক্রি করে তবে কি তা জায়েয হবে? তিনি বললেন, তাদের সে রেওয়াজ শরীআতের নিয়ম বিরোধী (আয-যাহীরী)।

৭৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি এই শর্তে জমি কিনল যে, বিক্রেতাই তার খারাজ (কর) বহন করবে, তারপর সে তা কবজা করল, কিন্তু সে জমির প্রতিবেশী বিক্রি বৈধ হয়েছে মনে করে শুফআর ভিত্তিতে জমিটি তার অধিকারে নিয়ে গেল, তারপর সে জানতে পারল যে, বিক্রিটা ফাসিদ ছিল, এখন তার হুকুম কী?

কাযী ইমাম আবু আলী আন-নাসাফী (র) বলেন, এ বিক্রি ফাসিদ। আর ফাসিদ বিক্রিতে ততক্ষণ পর্যন্ত শুফআর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না, যতক্ষণ না বিক্রেতার ঐ জমি ফেরত গ্রহণের অধিকার বাতিল হয়ে যায়। শাফী (অগ্রক্রয়ের অধিকারী Preemptor) যদি তাদের উভয়ের সম্মতিক্রমে সে জমি গ্রহণ করে থাকে তবে সেটা একটা নতুন বিক্রি সাব্যস্ত হবে। শুফআ অর্থাৎ অগ্রক্রয়ের অধিকার বলে জমিটি গ্রহণকালে যদি তারা এই শর্ত করে থাকে যে, বিক্রেতাই তার খারাজ বহন করবে, তবে শাফী (অগ্রক্রয়ের অধিকারী ব্যক্তি)-এর তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে, অন্যথায় নয় (আয-যাহীরিয়া)।

৭৯. মাসআলা : যদি এই শর্তে খরিদ করে যে, প্রতিবেশিগণ তার তার বহন করবে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ। এমনিভাবে তার কাছ থেকে কোনরূপ কর গ্রহণ করা যাবে না এ শর্তে ক্রয়ও জায়েয নয়। যদি এই শর্তে কেনে যে, প্রথমবারের কর ক্রেতার দায়িত্বে থাকবে না এবং তারা উভয়ে তাতে একমত থাকে তবে সে বিক্রি জায়েয হবে (আল-খুলাসা)।

৮০. মাসআলা : যদি খারাজের উল্লেখ ছাড়াই বিক্রি করে এবং বিক্রিতে তার কোন শর্ত না থাকে তবে সে বিক্রি জায়েয। তারপর যদি দেখা যায় সে জমির খারাজ এত বেশী যে, লোকে সেটাকে একটা দোষ হিসেবেই গণ্য করে তবে সে দোষের কারণে ক্রেতার ইখতিয়ার লাভ হবে। আর যদি সে রকমের বেশী না হয় তবে তার ইখতিয়ার থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮১. মাসআলা : যদি কেউ এই বলে জমি বিক্রি করে যে, তার খারাজ এই পরিমাণ কিন্তু পরে দেখা গেল যে, পরিমাণটা আরও বেশী, তবে যদি প্রচলন হিসেবে দৃষ্ণীয় পর্যায়ে বেশী হয়ে থাকে তবে সে তা ফেরত দিতে পারবে। যদি করমুক্ত হওয়ার শর্তে বাড়ি কেনে আর পরে ক্রেতার কাছে কর দাবী করা হয়, তবে তার ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। বিক্রেতার কাছে কিংবা তার পরে ওয়ারিসদের কাছে।

এমনিভাবে যদি এই কথার উপর কেনে যে, এর খাজনা আধা-দানিক (এক দিরহামের এক-ষষ্ঠাংশ সমান এক দানিক) এবং পরে দেখা যায় তা আরও বেশী, তবে তার ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে।

যদি এই কথার উপর দোকান বিক্রি করে যে, তার আয় বিশ দিরহাম এবং পরে দেখা যায় তা পনের দিরহাম, তবে সে ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথার উপর ব্যাখ্যা জানতে হবে। সে যদি বুঝতে চায় যে, অতীতে বিশ দিরহাম আয় হত, তবে বিক্রি ফাসিদ হবে না। আর যদি বুঝতে চায় যে, ভবিষ্যতে এই পরিমাণ আয় হবে, তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। আর যদি সাধারণভাবে বলে, কোন ব্যাখ্যা না করে এবং অতীত-ভবিষ্যতের কোন খেয়ালও না থাকে, তখনও বিক্রি ফাসিদ হবে (আল-মুহীত)।

৮২. মাসআলা : কেউ যদি এই বলে জমি বিক্রি করে যে, তাতে এত সংখ্যক খেজুর গাছ আছে, কিন্তু ক্রেতা তাতে আরও কম দেখতে পায়, তবে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, চাইলে সে পূর্ণ মূল্যে সে জমি রাখবে, অথবা ছেড়ে দেবে। এমনিভাবে যদি এই বলে বাড়ি বিক্রি করে যে, তাতে এতটি ঘর আছে এবং পরে ক্রেতা তাতে কম ঘর পায়, তবে বিক্রি বৈধ হবে, কিন্তু ক্রেতার উপরের মত ইখতিয়ার থাকবে।

যদি এই বলে জমি বিক্রি করে যে, তাতে এত সংখ্যক খেজুর গাছ আছে এবং তাতে ফলও আছে। এভাবে সবগুলো ফলসহ বিক্রি করার পর যদি ক্রেতা দেখে তার কোন কোন গাছে ফল নেই, তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে।

যদি যবাহকৃত ছাগল বিক্রি করে এবং পরে দেখা যায় তার একটি পা রান থেকে কাটা তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮৩. মাসআলা : যদি এই বলে জমি বিক্রি করে যে, তাতে খেজুর গাছসহ অন্য গাছ আছে এবং পরে দেখা যায়, তবে খেজুর বা অন্য কোন গাছ নেই, তবে বিক্রি জায়েয হবে। অবশ্য ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। এমনিভাবে যদি বলে, জমিটি খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছসহ বিক্রি করলাম তখনও একই হুকুম। এমনিভাবে যদি নীচতলা দোতলাসহ বাড়ি বিক্রি করে এবং পরে দেখা যায় তার কোন দোতলা নেই তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে।

যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই বাড়িটি আড়া, দরজা, ও কাঠসহ বিক্রি করলাম এবং পরে দেখা তার আড়া, দরজা ও কাঠ বলতে কিছুই নেই, তবে তার ইখতিয়ার লাভ হবে। যদি তার দুটি দরজা ও দুটি আড়া থাকে, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে না। যদি একটি দরজা ও একটি আড়া থাকে, তবে ইখতিয়ার থাকবে।

৮৪. মাসআলা : যদি বলে, এই বাড়িতে যে আড়া, দরজা, কাঠ ও খেজুর গাছ আছে তা সহ তোমার কাছে বিক্রি করলাম এবং পরে ক্রেতা তাতে এর কিছুই না পায়, তবে তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। যদি এই শর্তে তরবারি বিক্রি করে যে, তাতে একশ' দিরাহামের অলঙ্করণ আছে অথবা এই বলে স্যাভেল বিক্রি করে যে, তাতে ফিতা লাগানো আছে কিংবা এই বলে আংটি বিক্রি করে যে, তাতে চুনি পাথর লাগানো আছে অথবা এই স্বর্ণ পাথর বিক্রি করে যে, তা সোনার বলয়যুক্ত এবং পরে দেখা যায় ফিতা, চুনি ও স্বর্ণবলয় কিছুই নেই কিংবা এর সবই ছিল, কিন্তু কবজার আগে তা হারিয়ে গেছে, তবে এর প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে অবশিষ্ট যা আছে তাই পূর্ণ মূল্যে রাখবে অথবা ছেড়ে দেবে। কিন্তু শেষের মাসআলাটি ব্যতিক্রম। অর্থাৎ স্বর্ণবলয়ের সাথে যুক্ত থাকার কথায় যদি পাথরের আংটি কেনে, কিন্তু পরে স্বর্ণবলয় না পায়, তবে এ অবস্থায় বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে।

৮৫. মাসআলা : এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, যে সব দ্রব্য বিক্রিকালে অন্য কোন দ্রব্য তার অধীন হিসেবে বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং তার অন্তর্ভুক্তির জন্য স্তম্ভভাবে তার উল্লেখ দরকার হয় না, সে সব দ্রব্য বিক্রিকালে সেই অন্য দ্রব্যটিও যদি বিক্রিতে শামিল থাকার শর্ত করা করা হয়, তারপর আসল জিনিসটি পাওয়া গেলেও অধীনস্থ জিনিসটি পাওয়া না যায়, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকে চাইলে সে মূল্যে জিনিসটি রাখবে আর নয়ত ত্যাগ করবে।

আর যে সব জিনিস বিক্রিকালে অন্য জিনিস বিনা শর্তে তার অধীন হয়ে বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হয় না, সে সব জিনিস যখন বিক্রি করা হয়, সেই অন্য জিনিসটি বিক্রির অন্তর্ভুক্ত থাকার শর্ত করা হয় এবং তা পাওয়া না যায়, তবে ক্রেতা মূল জিনিসটিকে তার অংশেই দামেই রাখবে (আল-মুহীত)।

৮৬. মাসআলা : যদি এই কথা বলে কাপড় বিক্রি করে যে, সেটা হলুদ রঙের, কিন্তু পরে দেখা যায় সেটা সাদা, তবে বিক্রি বৈধ হবে। হ্যাঁ, ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে।

তদ্রূপ যদি এই শর্তে বাড়ি বিক্রি করে যে, তাতে ঘর-দুয়ার আছে, অথচ নেই তবে বিক্রি বৈধ হবে এবং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে।

পক্ষান্তরে এই কথার উপর যদি কোন কাপড় কেনে যে, সেটি সাদা এবং পরে দেখা যায় সেটি রঙীন, তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে, যেমন ঘর-দুয়ার নেই বলে বাড়ি বিক্রির পর যদি দেখা যায়, তাতে ঘর-দুয়ার রয়েছে তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮৭. মাসআলা : যদি এই বলে বাড়ি বিক্রি করে যে, সেটি পাকা ইটের, কিন্তু আসলে তা কাঁচা ইটের, তবে 'আত-তাজরীদ' গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-খুলাসা)।

৮৮. মাসআলা : এমনভাবে যদি এই বলে কাপড় বিক্রি করে যে, সেটি হলুদ রঙের, কিন্তু পরে দেখা যায় সেটি জাফরানী রঙের, তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে।

যদি এই কথার উপর কাপড় কেনে যে, তার টানার সংখ্যা এক হাজার, কিন্তু পরে দেখা গেল তা এক হাজার একশ', তবে সে কাপড় তার জন্য বৈধ হবে।

যদি এই কথার উপর কেনে যে, সেটি ছয় সুতার কিন্তু পরে দেখা যায় পাঁচ সুতার, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে পূর্ণ মূল্যে কাপড়টি রাখবে, নয়ত পরিত্যাগ করবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৮৯. মাসআলা : যদি বলে, তোমার কাছে এই কায্য (রেশমী) অথবা খায্য' (পশমী) কাপড়টি বিক্রি করলাম, আর সে কাপড়টি রেশম ও পশম উভয় দ্বারাই তৈরি, তবে তার টানাপোড়েন লক্ষ্য করতে হবে। যদি টানা শর্ত মাফিক হয় এবং পোড়েন হয় অন্য কিছু তবে সে বিক্রি বাতিল। পোড়েন শর্ত মাফিক হলে বিক্রি জায়েয, যদিও কায্য (রেশম)-এর ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। আর খায্য (পশম)-এর ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার থাকবে না, অর্থাৎ যদি পোড়েন খায্য এবং টানা অন্য কিছু হয়।

৯০. মাসআলা : বিশ্ব বলেন, আমি আবু ইউসুফ (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ যদি এই কথার উপর কাপড় কেনে যে, সেটি কাতানের, কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তার এক-তৃতীয়াংশ সুতা, তবে তার হুকুম কী? তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশ সুতা হলে ক্রেতার তা ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। কিন্তু কেটে ফেললে ফেরত দিতে পারবে না। যদি অধিকাংশ সুতা (তুলা) হয়, তবে বিক্রি ফাসিদ (আল-মুহীত)।

৯১. মাসআলা : কেউ এই কথার উপর ছাত্ত কিনল যে, বিক্রেতা এক মান্ন (পরিমাপ বিশেষ) ঘি দ্বারা তা মাখিয়েছে ক্রয়কালে ক্রেতা তা দেখে কিনল। তারপর ক্রেতা ছাত্ত এবং বিক্রেতা দাম

১. 'খায্য'- আল-মুনজিদ, আল-মুজামুল-ওয়াসীত, আল-মাওরিদ প্রভৃতি অভিধানে الخز و القز উভয়ের অর্থ লেখা হয়েছে রেশম। সে হিসেবে আলোচ্য মাসআলাটির কোন অর্থ হয় না। লিসানুল আরব গ্রন্থে ইবনুল আছীর (র)-এর বরাতে বলা হয়েছে, প্রাচীনকালে الخز দ্বারা এমন কাপড় বুঝানো, যা পশম ও রেশম মিলিয়ে বোনা হত এবং বর্তমানকালে শব্দটি রেশমী অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 'আল্লামা আল-ফায়ুমী (র)' আল মিসবাহুল মুনীর গ্রন্থে লিখেছেন, الخز - اسم دابة ثم اطلق على الثوب المتخذ من وبرها. 'খায্য এক প্রকার পশুর নাম। পরে পশম দ্বারা তৈরি কাপড় অর্থে শব্দটির প্রচলন ঘটেছে। অনুবাদে আমি এ অর্থই গ্রহণ করেছি - অনুবাদক।

কবজা করল। কিন্তু পরে জানা গেল যে, তা মাখানো হয়েছে আধা মান্ন ঘি দ্বারা তবে বেচাকেনা বৈধ হবে এবং ক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না, যেমন এই কথার উপর যদি সাবান কেনা হয় যে, তা এত মান্ন চর্বি দ্বারা তৈরি, তারপর প্রকাশ পায় যে, তাতে চর্বির পরিমাণ কম। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি তা দেখে কিনে থাকে তবে তার ইখতিয়ার লাভ ছাড়াই বিক্রি বৈধ হয়ে যায়। এমনভাবে যদি এই কথার উপর জামা কেনে যে, তা দশ গজ কাপড় দিয়ে তৈরি এবং ক্রেতা সেটি দেখেই কেনে, তারপর যাচাই করে দেখা যায় যে, তা নয় গজ কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তবে বিক্রি বৈধ হয়ে যায় এবং ক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকে না।

বিক্রেতা বিক্রিত রেশম ক্রেতার সামনে ওজন করে দিল ক্রেতা তা নিয়ে চলে যায় এবং কিছুকাল পর বলল, সে তা মাপে কম পেয়েছে, এ ক্ষেত্রে যদি জানা যায় যে, তার ওজন কমেছে বাতাসে তবে বিক্রেতার কোন দায়িত্ব থাকবে না। তদ্রূপ কমতির কারণ যদি মাপের রকম ফের হয় তখনও বিক্রেতা দায়ী থাকবে না। পক্ষান্তরে কমতি যদি এ দুই কারণে না হয় তবে ক্রেতার স্বীকারোক্তি লক্ষ্য করতে হবে। সে যদি এ কথার স্বীকার না করে থাকে যে, বিক্রেতা যা বলছে সেই পরিমাণই সে কবজা করেছিল, তবে কমতি পরিমাণ রেশমের দাম তাকে দিতে হবে না। যদি আগেই দাম পরিশোধ করে থাকে তবে সেই পরিমাণ ফেরত নিতে পারবে। যদি সে স্বীকার করে থাকে যে, এই পরিমাণ কবজা করেছে এবং তারপর বলে যে, আমি তার চেয়ে কম পেয়েছি, তবে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কিছুই দিতে পারবে না কিংবা পরিশোধ করে থাকলে মোটেই ফেরত চাইতে পারবে না।

৯২. মাসআলা : কেউ যদি খাদ্যশস্য বিক্রি করে এবং পরে দেখা যায় তার অর্ধেকই চিটা, তবে সে অর্ধেক মূল্য গ্রহণ করতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি এই কথার উপর এক কুয়া গম বিক্রি করে যে, তাতে দশ গজ আছে তারপর তাতে তার কম পায়, তবে তার ইখতিয়ার লাভ হবে। চাইলে সে পূর্ণ মূল্যে তা রাখবে, অন্যথায় পরিত্যাগ করবে।

যদি এই কথার উপর একটি কিতাব কেনে যে, সেটি ইমাম মুহাম্মাদ (র) রচিত 'কিতাবুন-নিকাহ', কিন্তু পরে দেখে সেটি 'কিতাবুত-তালাক', বা 'কিতাবুত-তিকা' অথবা 'কিতাবুন-নিকাহ'-ই বটে, কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর রচিত নয়, বরং অন্য কারও তবে ফুকাহায়ে কিরামের মতে সে বিক্রি বৈধ হবে। কেননা বই-কিতাব বলতে সাদার উপরে অঙ্কন বুঝায়। এর সবটাই এক জাত। প্রভেদ কেবল প্রকার বা বিষয়গত আর তা বিক্রি বৈধ হওয়ার জন্য বাধা নয়।

৯৩. মাসআলা : যদি এই বলে 'শাত' (ছাগল/ ভেড়া) বিক্রি করে যে, সেটি একটা ভেড়া, কিন্তু পরে দেখা যায় সেটি ছাগল তবে বিক্রি বৈধ হবে এবং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে।

৯৪. মাসআলা : যদি এই কথার উপর উট বিক্রি করে যে, সেটি খুরাসানী, কিন্তু পরে সেটি খুরাসানী নয় বলে প্রমাণিত হয় তবে ক্রেতা সেটি ফেরত দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯৫. মাসআলা : যদি এই কথার উপর একটি লোক বিক্রি করে যে, সেটি একটি ক্রীতদাসী, কিন্তু পরে দেখা যায় সে গোলাম, তবে সে বিক্রি বাতিল। এটা ইস্তিহসান সম্মত সিদ্ধান্ত এবং আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম এটাই গ্রহণ করেছেন।

এ জাতীয় মাসআলার মূলনীতি এই যে, চুক্তিকালে যদি ইশারার সাথে নামও উল্লেখ করা হয়, তারপর দেখা যায় যে, নাম যা বলা হয়েছে ইশারার বস্তুটি তা নয়, তবে লক্ষ্যে করতে হবে পার্থক্যের ধরনটা কী? যদি পার্থক্যটা হয় জাতিগত, তবে সে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং কেউ যদি এই বলে আংটির পাথর বিক্রি করে যে, সেটি চুনি, কিন্তু পরে দেখা যায়, সেটি কাঁচ, তবে বিক্রি বাতিল। নাম ও ইশারার বস্তুটি যদি সমজাতীয় হয়, কিন্তু গুণগত দিক থেকে পার্থক্য থাকে, তবে চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে এবং সে ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। দেখে পসন্দ হলে রাখবে অন্যথায় ফেরত দেবে, যেমন চুনিটি লাল এই কথার উপর কিনল, কিন্তু পরে দেখল সেটি হলুদ (আল-মুহীত)।

৯৬. মাসআলা : ভিতরে তুলা থাকার শর্তে টুপি কিনল, কিন্তু পাওয়া গেল পশম, এক্ষেত্রে কারও মতে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। কাজেই ক্রেতা সেটি ফেরত দেবে এবং সেই সঙ্গে ছেঁড়ার ক্ষতিপূরণ আদায় নেবে। কেউ বলেন, বিক্রি জায়েয, তবে ক্রেতা দোষের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে। এ মতই বিশুদ্ধতর (আয-যাহীরিয়া)।

৯৭. মাসআলা : কেউ যদি এই কথার উপর জুকা কেনে যে, তার উপরের দিক এই কাপড়ের ভেতর দিক এই কাপড়ের এবং তার পুর এই জিনিসের, তারপর ক্রেতা তার উপরস্থ কাপড় শর্ত মারফি পেল, কিন্তু ভেতরের কাপড় ও পুর তার বিপরীত, তবে সে বিক্রি জায়েয এবং এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি উপরের কাপড় শর্ত অনুযায়ী না হয় তবে সে বিক্রি বাতিল।

৯৮. মাসআলা : যদি এই কথার উপর শেরওয়ানী বিক্রি করে যে, তার ভেতরের কাপড়টা হারাবী, কিন্তু পরে দেখা গেল সেটা মারবী কাপড়, তবে বিক্রি জায়েয, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। তদ্রূপ যদি বলে তার পুর রেশমের, কিন্তু পরে দেখা যায় তা তুলার তখনও একই হুকম (আল-মুহীত)।

৯৯. মাসআলা : ক্রেতা এই কথা বলে জমির মূল্য পরিশোধ করবে না যে, জমি এই পরিমাণ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু জমি তার চেয়ে কম। বিক্রেতা বলল, জমি যা আছে তাই বিক্রি করেছি, পরিমাণের শর্ত ছিল না। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথাই কসমের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ সে বিবাদী (অস্বীকারকারী), ক্রেতা কর্তৃক উত্থাপিত শর্তের দাবী সে অস্বীকার করছে (বাদীর দলীলের অনুপস্থিতিতে কসমের সঙ্গে বিবাদীর কথাই গৃহীত হয়)।

১০০. মাসআলা : কেউ যদি এই কথার উপর একটি গাধা বিক্রি করে যে, এটি লুটের মাল, তবে ক্রেতার সেটি ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে। এমনভাবে যদি বলে, আমি তোমার কাছে এই শর্তে বিক্রি করছি যে, এতে কারও অধিকার প্রমাণিত হলে তুমি এর মূল্য আমার কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে না, তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০১. মাসআলা : কেউ যদি এই কথার উপর অকুমারী বাঁদী ক্রয় করে যে, বিক্রেতা তার সঙ্গে সঙ্গম করে নি, কিন্তু পরে প্রকাশ পায় যে, বিক্রেতা ঠিকই তার সঙ্গে সঙ্গম করেছে, তবে বিক্রি অবধারিত হয়ে যাবে এবং ক্রেতার ফেরত দেওয়ারও অধিকার থাকবে না (আয-যাহীরিয়া)।

১০২. মাসআলা : যদি কুমারিত্বের শর্তে দাসী ক্রয় করে, কিন্তু পরে ক্রেতা তাকে কুমারী নয় বলে দাবী করে, আর বিক্রেতা বলে যে, আমি তাকে কুমারী অবস্থায়ই তুমি তাকে কবজা করে দেয় এ ক্ষেত্রে কসমের সাথে বিক্রেতার কথাই গৃহীত হবে। সে কসম করে বলবে, 'আমি তাকে কুমারী অবস্থায়ই বিক্রি ও সমর্পণ করেছি'। অন্যান্য মহিলাদেরকে দিয়ে তাকে যে পরীক্ষা করাতে হবে, এমন কথা বলেন নি, তবে 'কিতাবুল-ইস্তিহসান' এ আছে, তাকে অন্যান্য মহিলাদের দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে (আল-খুলাসা)।

১০৩. মাসআলা : ইবন সামাআ তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, কেউ যদি কারও থেকে এই কথার উপর একটি মাছ কেনে যে, তার ওজন দশ রাতুল এবং ক্রেতার সামনে তা ওজন করে দেয়। তারপর ক্রেতা তার পেটের ভেতর একটি পাথর পায় যার ওজন তিন রাতুল বা এমন কিছু আর মাছটি তখন আপন অবস্থায় আছে (অর্থাৎ রান্না হয় নি), তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে পূর্ণ মূল্য দিয়েই সেটি রাখবে আর তা না হলে ছেড়ে দেবে। যদি এ কথা জানার আগেই তা রান্না হয়ে যা, তবে আমার মতে দশ রাতুল ও সাত রাতুল ওজনের মাছে দামের পার্থক্য কত, তা নিরূপণ করা হবে তারপর সেই পরিমাণ টাকা ক্রেতা ফেরত পাবে।

যদি মাছের পেটে মাটি বা এ জাতীয় এমন কিছু পাওয়া যায়, যা মাছেরা খেয়ে থাকে, তবে বিক্রি অবধারিত হয়ে যাবে। ক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না।

১০৪. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কেউ যদি কারও কাছে এই কথার উপর পেয়লা কেনে যে, সেটির ওজন দশ মান্ন, তারপর তা কবজা করে, কিন্তু পরে মেপে দেখে তার ওজন পাঁচ মান্ন, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে চাইলে পূর্ণ মূল্য দিয়েই সেটি রাখবে, নয়ত পরিত্যাগ করবে। ক্রেতার হাতে যাওয়ার পর যদি তাতে কোন দোষ সৃষ্টি হয় এবং সে দোষের কারণে বিক্রেতা সেটি ফেরত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তবে যাচাই করে দেখা হবে যে, দশ মান্ন ওজন হিসেবে তার দাম যদি বিশ টাকা হয় এবং পাঁচ মান্ন হিসেবে দশ টাকা আর দোষের কারণে তার দাম কমে থাকে পাঁচ টাকা, তবে ওজন হওয়ার কারণে বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতা অর্ধেক দাম ফেরত পাবে আর দোষের কারণে বিক্রেতা দামের এক-দশমাংশ অর্থাৎ এক টাকা ফেরত পাবে (আল-মুহীত)।

১০৫. মাসআলা : যদি এই কথার উপর উট কেনে যে, সেটা চেচামেচি, কিন্তু পরে দেখা গেলে যে, তা চেচায়। যদি এই পরিমাণ চেচায় যা মানুষের কাছে দোষ বলে গণ্য তাহলে ক্রেতা ফেরত দিতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০৬. মাসআলা : যদি এই কথার উপর বাঁদী কেনে যে, সে এখনও পর্যন্ত বাচ্চা দেয় নি, কিন্তু পরে প্রমাণ হয় যে, সে ইতোপূর্বে সন্তান প্রসব করেছে, তবে সে ফেরত দিতে পারবে (আয-যাহীরিয়া)।

১০৭. মাসআলা : কেউ যদি অপর কাউকে বলে, তুমি তোমার গোলামটি অমুকের কাছে এক হাজার টাকায় এই কথার উপর বিক্রি কর যে, আমি ক্রেতার পক্ষ হতে তোমার জন্য জামিন থাকব, তবে যাহিরী রিওয়াযাত অনুযায়ী এরূপ বিক্রি জায়েয নয়। যদি বলে, তোমার

গোলামটি অমুকের কাছে এক হাজার টাকায় এই শর্তে বিক্রি কর যে, মূল্যের পাঁচশ' টাকার ব্যাপারে আমি তোমার জন্য জামিন থাকব, তবে বিক্রি জায়েয (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০৮. মাসআলা : যদি এই কথার উপর কেনে যে, সেটি নিশাপুরী কাপড়, কিন্তু নিয়ে দেখে সেটি বুখারী কাপড় কিংবা এই কথার উপর পাগড়ি কেনে যে, সেটি শাহরিস্তানী কাপড়ের, কিন্তু নেওয়ার পর দেখে সেটি সামারকান্দী কাপড়ের, তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-খুলাসা)।

১০৯. মাসআলা : যদি এই কথার উপর বাঁদী কেনে যে, তার জন্য কুফায়, কিন্তু নেওয়ার পর তার দেখে তার জন্মভূমি বসরা, তবে তাকে ফেরত দিতে পারবে।

১১০. মাসআলা : যদি এই কথার উপর কাপড় কেনে যে, সেটি হারাবী কাপড়, কিন্তু পরে দেখে সেটি বালখী, তবে আমাদের তিনও ইমামের নিকট সে বিক্রি ফাসিদ।

১১১. মাসআলা : বিশ্র (র)-এর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি এই কথার উপর নৌকা কেনে যে, সেটি সেগুন কাঠের তৈরি, কিন্তু পরে দেখে তাতে অন্য কাঠও আছে, তবে সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে যেখানে সে কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে সে কাঠটি অপরিহার্য কিনা। যদি তা অপরিহার্য হয়ে থাকে (যে, তাতে সেগুন কাঠ ব্যবহার করা বলে না), তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে না। তাকে পূর্ণ দামই দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) বুঝাতে চাচ্ছেন যে, অন্য কাঠ যে জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে সেগুন কাঠ সেখানে উপযুক্ত নয়, বরং অন্য কাঠই সেখানে ব্যবহার করতে হয়। যদি গোটা নৌকাই অন্য কাঠ দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে, তবে বিক্রিই বৈধ হয় নি।

১১২. মাসআলা : বিশ্র (র) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করল, এই হারাবী কাপড়টির দাম কত? আর সে কাপড়টি হারাবী কাপড়ের মতই তৈরি করা হয়েছে সে বলল, এর দাম এত। সুতরাং সেই দামে বেচাকেনা হল। তাই এই যে বেচাকেনাটি হল এ সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এটা শর্তেরই মত। অর্থাৎ 'কাপড়টি হারাবী' এই শর্তেই বেচাকেনা হল। কাজেই পরে যদি প্রকাশ পায় যে, সেটি হারাবী নয়, বরং মারবী কাপড় তবে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১১৩. মাসআলা : উপস্থিত সুনির্দিষ্ট পণ্যে মেয়াদের শর্তারোপ করলে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যায়। যদি বিনিময় মূল্যে মেয়াদের শর্তারোপ করে আর সে মূল্যে কোন সুনির্দিষ্ট বস্তু না হয়, বরং সেটা ক্রেতার দায়িত্বে ঋণস্বরূপ থাকে, তবে সে শর্ত বৈধ যদি মেয়াদটা সুনির্দিষ্ট হয়। কিন্তু মেয়াদ সুনির্দিষ্ট না হলে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে।

১১৪. মাসআলা : মেয়াদ যদি 'নওরোজ' বা 'মেহুরেজান' (পার্সিক দুটি পর্বের নাম)-এর দিবসকে ধার্য করা হয় তবে তাও অজ্ঞাত বা অনির্দিষ্ট মেয়াদের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-জামিউস-সাগীর' গ্রন্থে 'নওরোজ' ও 'মেহুরেজান' এর মাসআলা উল্লেখ করেছেন এবং সাধারণভাবেই তিনি রায় দিয়েছেন যে, এ মেয়াদে বেচাকেনা

ফাসিদ। কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিক কথা এই যে, নওরোজ দ্বারা পার্সিক পার্বন উদ্দেশ্য, না রাজার অভিষেক দিবস এটা যদি স্পষ্ট করা না হয় তবে সে বিক্রি ফাসিদ। পক্ষান্তরে বিক্রেতা ও ক্রেতা যদি এর কোনও একটা স্পষ্ট করে দেয় এবং সে দিবস কবে তা তাদের জানা থাকে, তবে চুক্তি ফাসিদ হবে না (আল-মুহীত)।

১১৫. মাসআলা : হাজী সাহেবদের আগমনকাল, ফসল কাটার মওসুম, ফসলে মলন দেওয়ার দিন, আসুর কাটার দিন, খেজুর কাটার দিন ইত্যাদি মেয়াদে বেচাকেনা করা জায়েয নয় (আল-কাফী)।

১১৬. মাসআলা : খৃস্টান সম্প্রদায়ের উপবাসকাল শুরু হওয়ার পর যদি কেউ তাদের ঈদের দিনের মেয়াদে ক্রয় করে তবে তা জায়েয। কিন্তু তাদের উপবাসকাল শুরু হওয়ার আগে তাদের ঈদের মেয়াদে ক্রয় করলে জায়েয হবে না।

অবৈধ নিয়মে ধার্যকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই যদি মেয়াদ বাতিল করে দেয় তবে ইস্তিহসান অনুযায়ী সে বিক্রি বৈধতায় রূপান্তরিত হবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র)-এর মতে বৈধতায় রূপান্তরিত হবে না। তবে প্রথমোক্ত মতই সঠিক। কেননা আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এ ধরনের চুক্তি মূলত স্থগিত থাকে। কাজেই ফাসাদের কারণ দূর হয়ে গেলে তা বৈধতা লাভ করবে। ইমাম কারখী (র) ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্য অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সহীহ। এ ছাড়া আর যত ফাসিদ বেচাকেনা আছে ইমাম কারখী (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মতে ফাসিদ হওয়ার কারণ দূর করে ফেললে তা বৈধতায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সহীহ মত হচ্ছে যে, তা বৈধতায় রূপান্তরিত হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১১৭. মাসআলা : যদি নিঃশেষভাবে বিক্রি করে এবং তারপর উপরিউক্ত মেয়াদের কোন মেয়াদ নির্ধারণ করে, তবে বিক্রি জায়েয হবে (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

১১৮. মাসআলা : বায়ু প্রবাহের কালকে মেয়াদ নির্ধারণ করলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। যদি রজব মাসে বলে, তোমাকে রজব পর্যন্ত সময় দিলাম, তবে তার অর্থ হবে পরবর্তী রজব মাস। যদি বলে, রজবের শেষ পর্যন্ত, তবে চলতি রজবের শেষ বুঝা যাবে।

যদি 'জন্মদিনকে' মেয়াদ ধার্য করা হয় তবে সে বিক্রি ফাসিদ। ইমাম মুহাম্মাদ (র) আল-জামিউস-সাগীর এ অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। যদি 'জন্মদিন' দ্বারা কোন পশুর জন্মকাল বুঝানো হয়, তবে সে ক্ষেত্রে উপরিউক্ত হুকুমই প্রযোজ্য। আর যদি হযরত ইসা (আ)-এর জন্মদিন বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তবে আল-জামিউস-সাগীর এ বর্ণিত হুকুম সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন ক্রেতা-বিক্রেতার তা জানা না থাকে (আল-মুহীত)।

১১৯. মাসআলা : যদি কেউ দশ মাসের মেয়াদে এক হাজার টাকায় কোন পণ্য কেনে এবং শর্তারোপ করে যে, পরিশোধকালে প্রচলিত মুদ্রায় পরিশোধ করবে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে।

১২০. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে এক হাজার টাকায় গোলাম বিক্রি করে যে, ক্রেতা প্রতি সপ্তাহে দামের একটা অংশ পরিশোধ করবে এবং এভাবে মাস শেষে তাকে পাঁচশ' টাকা পরিশোধ করতে হবে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২১. মাসআলা : কেউ যদি ওজনে কম্বুরী কেনে এবং পরে তাতে সীসা পায়, তবে ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা হলে সীসা ফেরত দিয়ে তার ওজন পরিমাণ দাম কম দেবে। অন্যথায় পুরোটাই বাদ দেবে। যদি ওজনে ঘি কেনে এবং তারপর তাতে গাদ পায় তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে গাছের পরিমাণ দেখতে হবে। যদি তার পরিমাণ এতটুকু হয় যে, ঘির ভেতর তেমন থাকেই এবং তাকে দোষ মনে করা হয় না, তবে সে বিক্রি অবধারিত হয়ে যাবে এবং তাকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যদি তার পরিমাণ এতটা হয় যে, লোকে তাকে দোষ মনে করে থাকে, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে পূর্ণ মূল্য তা রাখবে, অন্যথায় পরিত্যাগ করবে। আর যদি তার পরিমাণ এতই বেশী হয় যে, সাধারণত ঘির ভেতর এতটা গাদ থাকে না, তবে চাইলে যতটুকু ঘি আছে তা তার অংশের দাম দিয়ে রাখবে, নয়ত পরিত্যাগ করবে।

১২২. মাসআলা : এক ব্যক্তি কারও কাছ থেকে হারাবী বা অন্য কোন কাপড়ের একটি বস্তা কিনল অথবা খেজুরের একটি ঝুড়ি কিনল, কিন্তু তখন তা কবজা করল না। অবশেষে বিক্রেতা বস্তা থেকে কাপড় বের করল অথবা ঝুড়ি থেকে খেজুর বের করল এবং তারপর সেই বস্তা বা ঝুড়ি বিক্রি করে ফেলল আর কাপড় বা খেজুর রেখে দিল কিংবা সে বস্তা বা ঝুড়ি বিক্রি করল না, তবে নিজের কোন কাজে ব্যবহার করল। এ অবস্থায় সে বিক্রির হুকুম কী? বিক্রি অবধারিত হয়ে গেছে। কাজেই ক্রেতা সে কাপড় বা খেজুর নিতে বাধ্য। বস্তা ও ঝুড়ির অজুহাতে সে কাপড় ও খেজুর গ্রহণে অসম্মতি জানাতে পারবে না (আল-মুহীত)।

১২৩. মাসআলা : কেউ যদি নির্দিষ্ট ওজনের শর্তে মুজা কেনে এবং তা কবজা করে, সেই সঙ্গে বিক্রেতাও মূল্য কবজা করে, তারপর ক্রেতা মুজাটি ওজনে পায় এবং ইতোমধ্যে সে মুজাটি নষ্ট করে ফেলে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী বিক্রেতার কাছ থেকে সে মূল্যের কিছুই ফেরত পাবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিষয়টাকে মন্দ গণ্য করা হয়েছে, যদরূন ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতানুসারে মাসআলাটি বিবেচনা না করে বরং বিক্রেতার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ফায়সালা দেওয়া হয়েছে। কেননা ওজন কম হলে মুজার দাম অনেকখানি কমে যায়। 'ইজারা' ও 'সারফ' অধ্যায়ে আছে, এক মিছকাল ওজনের কথায় যদি মুজা বিক্রি করে এবং ক্রেতা সেটি কবজা করার পর দেখতে পায় তার ওজন দুই মিছকাল, তবে নতুন কোন মূল্য ছাড়াই সে মুজা ক্রেতার পক্ষে বৈধ হয়ে যাবে। কেননা যে বস্তা ছেদন করলে ক্ষতি হয়, সে বস্তুর ওজনকে তার গুণ হিসেবে দেখা হয় (আর গুণের কোন মূল্য হয় না) (আয-যাখীরা)।

১২৪. মাসআলা : কেউ এই কথার উপর খেজুর ও অন্যান্য গাছের একটি বাগান কিনল যে, তার আয়তন দশ জিরাব (পরিমাপ বিশেষ), কিন্তু কবজার সময় মাপ না দেয় এবং এভাবে সে

কয়েক বছর বাগানটি ভোগ করে, তারপর দেখতে পায় যে, তার আয়তন নয় জিরাব, তবে সে বাগান ফেরত দিতে পারবে না কিংবা মূল্যের কোন অংশও ফেরত পাবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুসারে এ বিষয়ে এরূপ সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে (আল-মুহীত)।

১২৫. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত আছে, কোনও জমিতে যদি খেজুর ও আঙ্গুর গাছ থাকে এবং কেউ তা এই কথার উপর কেনে যে, সে জমির পরিমাণ দশ জিরাব, তারপর সে তা কয়েক বছর ভোগ করে, সহসা প্রকাশ পায় যে, সে জমির পরিমাণ পাঁচ জিরাব, তবে যাচাই করা হবে যে, এই পাঁচ জিরাব জমি যদি বাস্তবে দশ জিরাব হত তবে তার দাম কত হত এবং সেই অনুপাতে এই পাঁচ জিরাবের দাম কত। তারপর অতিরিক্ত পাঁচ জিরাবের মূল্য বিক্রেতার কাছ থেকে সে ফেরত গ্রহণ করবে (আয-যাখীরা)।

১২৬. মাসআলা : বস্তার ভেতর দুই কাফীয গম দিল তা থেকে এক কাফীয এক দিরহামে বিক্রি করল, তারপর ক্রেতার কবজায় আগে সে অন্য কারও কাছে এক দিরহামে আরেক কাফীয বিক্রি করল, তারপর তা থেকে এক কাফীয গম নিঃশেষ হয়ে গেল। এ ক্ষেত্রে, উভয় ক্রেতা ইচ্ছা করলে অবশিষ্ট এক কাফীয অর্ধেক দামে অর্ধেক করে গ্রহণ করবে, অথবা পরিত্যাগ করবে। যদি একজন তার অংশ ত্যাগ করে এবং অপরজন পূর্ণ এক কাফীয এক দিরহামে নিতে চায় তবে বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া সে অধিকার তার থাকবে না।

দ্বিতীয় ক্রেতা যদি এক কাফীয কবজা করে এবং প্রথম ক্রেতা কিছুই কবজা না করে, তারপর দ্বিতীয় ক্রেতা কোন দোষের কারণে তার সেই কাফীয ফায়সালা ছাড়াই বিক্রেতার কাছে ফেরত দেয়, তবে সেই ফেরত দেওয়া কাফীযে প্রথম ক্রেতার কোন অধিকারে থাকবে না। তার অধিকার কেবলই অবশিষ্ট অংশে হয় সে তা গ্রহণ করবে অথবা পরিত্যাগ করবে।

বিক্রেতা যদি এক কাফীযকে অন্য কাফীযের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে, তবে প্রথম ক্রেতার সঙ্গে তার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

বিক্রেতা যদি মিশ্রিত না করে আর দ্বিতীয় ক্রেতা তা কোন দোষের কারণে কাফীয ফায়সালাক্রমে ফেরত দিয়ে থাকে, অন্য দিকে অবশিষ্ট কাফীযে কোন দোষ না থাকে, যদরূন প্রথম ক্রেতা সেই অবশিষ্ট কাফীযই নিতে অগ্রহী হয়, ফেরত দেওয়া কাফীয নিতে না চায়, কিন্তু বিক্রেতা তাতে সম্মত না হয়, তার ইচ্ছা উভয় কাফীয হতেই তাকে অর্ধেক-অর্ধেক দেওয়া, তবে সে অধিকার বিক্রেতার থাকবে।

বিক্রেতার কাছে যদি অবশিষ্ট কাফীয নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকে এবং ফেরত দেওয়া দ্বিতীয় কাফীয তার কাছে থাকে আর এ অবস্থায় প্রথম ক্রেতা ইচ্ছা করলে বিক্রি বাতিল করতে পারে, আবার সবটা নিতে পারে। এমনকি অর্ধেক রেখে অর্ধেকও নিতে পারে। দ্বিতীয় ক্রেতা দোষের কারণে যেই কাফীয ফেরত দিয়েছিল সেটাই যদি নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকে, আর যে কাফীয অবশিষ্ট আছে সেটা হচ্ছে সেই নির্দোষ গম, তবে প্রথম ক্রেতা তার অর্ধেক নিতে পারবে।

সবটা নেওয়ার তার ইখতিয়ার তার থাকবে না। এমনকি বিক্রেতা যদি তাকে সবটা বুঝিয়েও দেয় তবুও সে গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারবে (আল-মুহীত)।

১২৭. মাসআলা : সেচের সুবিধার শর্তে জমি কেনার পর দেখা গেল সেচ সুবিধা নেই এ ক্ষেত্রে ক্রেতা আনুপাতিক মূল্যে জমি নিয়ে সেচ সুবিধার মূল্য ফেরত নিতে পারে (আয-যাখীরা)।

১২৮. মাসআলা : কেউ যদি কায়লের মাপে খাদ্য দ্রব্য কেনে এবং তা কবজাও করে, তবুও পুনর্বীর মাপার আগে সে তা খেতে বিক্রি করতে বা অন্য কোন কাজে লাগাতে পারবে না। এমনভাবে বিক্রেতা যদি এই ক্রেতার সামনেই তা কারও কাছ থেকে মেপে কিনে থাকে, তবুও এই ক্রেতার জন্য সেই পরিমাপকে যথেষ্ট মনে করত পুনর্বীর না মেপেই বিক্রি করা বা খাওয়া জায়েয হবে না (আল-মুহীত)।

১২৯. মাসআলা : তবে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম এর এই অর্থ নিয়েছেন যে, বিক্রেতা যদি বিক্রির আগে মাপে এবং ক্রেতা তা দেখে, তখন সেই পরিমাপ ক্রেতার জন্য যথেষ্ট হবে না। পক্ষান্তরে বিক্রেতার সে পরিমাপ যদি বিক্রির পরে হয়, তবে ক্রেতা সে মাপের ভিত্তিতেই পণ্য ব্যবহার করতে পারবে, নতুন করে মাপা জরুরী হবে না। এরই উপর ফাতওয়া (আত-তাহযীব)।

১৩০. মাসআলা : বিক্রেতা যদি বিক্রির পর ক্রেতার অনুপস্থিতি মাপ দেয়, তবে সে সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে সঠিক মত হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে পুনরায় মাপা জরুরী হবে (আত-তাতার খানিয়া)।

১৩১. মাসআলা : কেউ যদি অন্য কারও কাছ থেকে অনুমান করে গম কেনে এবং তা কবজা করার পর পরিমাপ ছাড়াই বিক্রি করে, তবে এ ক্ষেত্রে একবার মাপাই যথেষ্ট। এমনভাবে কেউ যদি কারও কাছ থেকে এই কথার উপর এক কুরর গম ধার আনে যে, সেখানে এক 'কুরর'ই আছে, তারপর তা কায়ল হিসেবে বিক্রি করে তবে তখনও একবারের মাপই যথেষ্ট, হয় ক্রেতার পরিমাপ অথবা সেই বিক্রেতার পরিমাপ, যে তা ধার করে এনেছিল, অবশ্য দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রেতার সামনে মাপতে হবে।

১৩২. মাসআলা : কেউ যদি অনুমান করে গম কেনে এবং কবজা করার পর কারও কাছে আনুমানিকভাবে বিক্রি করে অথবা যদি নিজ জমিতে গম পায় বা কেউ তাকে হাদিয়া দেয় এবং অনুমান করে তা বিক্রি করে অথবা কোন কিছু বিক্রি মূল্য হিসেবে এই কথার উপর সে এ গম লাভ করে যে, তাতে এক কুরর আছে এবং সে তা কবজা করার পর মাপার আগেই আনুমানিকভাবে বিক্রি করে, তবে এ সকল বিক্রি জায়েয। ইবন সামাআ (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

যদি কায়ল হিসেবে কেনে এবং পরিমাপ না করেই তা কারও কাছে অনুমান করে বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে কি? ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-আসল' গ্রন্থে যা বলেছেন, তা দ্বারা বুঝা যায়, এ বিক্রি জায়েয হবে না।

১৩৩. মাসআলা : ইবন রস্তম (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যদি পরিমাপ করার আগে তা অনুমান করে বিক্রি করে তবে জায়েয হবে। পক্ষান্তরে পরিমাপ করার আগে যদি কায়ল হিসেবে বিক্রি করে তবে জায়েয হবে না। সুতরাং আলোচ্য মাসআলার দুটি পাওয়া গেল। কায়লী সম্পর্কে যে সব মাসআলা বর্ণিত হল, ওজনী দ্রব্যও তা প্রযোজ্য (আল-মুহীত)।

১৩৪. মাসআলা : কেউ যদি এই কথার উপর একটি কাপড় কেনে যে, তাতে দশ গজ আছে, তবে সে তা মাপার আগেই বিক্রি করতে বা অন্য কোন কাজে লাগাতে পারবে।

কেউ যদি কোন গুণতি দ্রব্য কেনে এবং তাতে সুনির্দিষ্ট সংখ্যার শর্ত থাকে তবে তা ব্যবহারের আগে পুনরায় গণা শর্ত কি? ইমাম মুহাম্মাদ (র) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নি। ইমাম কারখী (র) বলেন যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুসারে তা বিক্রি বা ব্যবহার বৈধ হওয়ার জন্য পুনরায় গণা শর্ত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে শর্ত নয়।

আল-কুদুরী-এর ভাষ্যগ্রন্থে আছে, গুণতি দ্রব্য এক বর্ণনা অনুযায়ী পুনরায় গণনা করা জরুরী, অন্য রিওয়ায়াত অনুযায়ী জরুরী নয়। ইমাম কুদুরী (র) শেষোক্ত রিওয়ায়াতকেই সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

১৩৫. মাসআলা : কেউ যদি ফাসিদ পদ্ধতির চুক্তিতে কায়ল বা ওজন হিসেবে কোন খাদ্যদ্রব্য কেনে, তারপর তা বিনা মাপেই কবজা করে, তারপর তা বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতা তা কবজা করে, তবে এই দ্বিতীয় বিক্রি বৈধ হবে। পুনরায় পরিমাপ করা যে শর্ত, তা বৈধ পদ্ধতির দুই বোচাকেনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (আয-যাখীরা)।

১৩৬. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কেউ যদি একশ' দিরহামের বিনিময়ে কায়ল হিসেবে এক কুরর খাদ্যদ্রব্য কেনে তারপর তা বিক্রেতার কাছ থেকে নিজের জন্য মেপে গ্রহণ করে এবং তারপর কারও কাছে তা কেনা দামে বিক্রি করে, তবে দ্বিতীয় ক্রেতার পক্ষে তা নতুনভাবে না মেপে কবজা করা জায়েয নয় যদিও প্রথম ক্রেতা তা দ্বিতীয় ক্রেতার উপস্থিতিতে নিজের জন্য পরিমাপ করে।

দ্বিতীয় ক্রেতা যদি মেপে দেখে তাতে এক কাফীয বেশী আছে, তবে বেশীটুকু তার বিক্রেতার কাছে ফেরত দিতে হবে, তাতে সে বেশীর পরিমাণটা দুইবারের মাপার কারণে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয় এমন হোক কিংবা এমন বেশী হোক যা সাধারণত দুইবারের মাপের কারণে হয় না। দ্বিতীয় ক্রেতার প্রথম ক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়ার পর লক্ষ্য করে দেখতে হবে যে সে বেশীটা কোন পর্যায়ে। যদি এমন হয় যে, দুইবারে মাপলে সাধারণত এ রকমের কমবেশী হয়েই যায়, তবে সে বেশীটুকু প্রথম ক্রেতারই হবে। তাকে তা প্রথম বিক্রেতার কাছে ফেরত দিতে হবে না। আর দুইবারে মাপলে সাধারণত যে কমবেশী হয়। এ বেশীটা যদি সে রকমের না হয়, বরং তারও বেশী হয়, তবে প্রথম ক্রেতাকে তা তার বিক্রেতার কাছে ফেরত দিতে হবে।

দ্বিতীয় ক্রেতা যদি মাপে কম পায়, তবে তজ্জন্য সে প্রথম ক্রেতাকে ধরতে পারবে, তাতে সে কমতিটা দুই পরিমাপের কারণে সাধারণত যা হয় সে পর্যায়ের হোক বা না হোক। যদি সে কমতিটা এ পর্যায়ের হয় যে, দুইবারের মাপে সাধারণত এমন হয়েই থাকে, তবে প্রথম ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছ থেকে সেই অংশের মূল্য ফেরত নিতে পারবে। আর যদি সে রকমের কমতি দুইবারের মাপের কারণে না হয় এবং সে কমতিটা সাক্ষী-প্রমাণ বা প্রথম বিক্রেতার স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে তখনও প্রথম ক্রেতা তার মূল্য বিক্রেতার কাছ থেকে ফেরত আনতে পারবে। দ্বিতীয় বিক্রি (কেনা দামে না হয়ে) যদি লাভের ভিত্তিতে (মুরাবাহা) হয়, তখনও একই হুকুম।

প্রথম ক্রেতা সে খাদ্যদ্রব্য হতে যদি এক কাফীয বিক্রি করে এবং তা ক্রেতার হাতে সমর্পণ করে, তারপর অবশিষ্ট অংশ কারও কাছে এই কথার উপর আসল দামে বিক্রি করে যে, সেখানে এক কুরুর আছে, তারপর দ্বিতীয় ক্রেতা তা মেপে দেখে সেখানে পূর্ণ এক কুরুরই আছে, তবে সে বিক্রি জায়েয। তার কোন ইখতিয়ারও থাকবে না। অবশ্য সে ক্ষেত্রে এক কুরুরের দাম এক চল্লিশ কাফীয ধরে ভাগ করা হবে এবং এক কাফীযের যে দাম হয় তা দ্বিতীয় ক্রেতা থেকে কাটা যাবে। আর সেটা হচ্ছে মোট দামের একচল্লিশ ভাগের একভাগ। এভাবে সে বিক্রি চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্রেতাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। চাইলে সে সবটা পূর্ণ দামে রাখবে, অন্যথায় পরিত্যাগ করবে। দ্বিতীয় বিক্রি যদি লাভের ভিত্তিতে হয় এবং মাসআলার রূপ উপরের মত হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুসারে ক্রেতাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। চাইলে সে মাল ফিরিয়ে দেবে, অন্যথায় পূর্ণ দামে রাখবে (আল-মুহীত)।

১৩৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি এই কথার উপর একশ' দিরহামে এক কুরুর খাদ্যদ্রব্য কিনল যে, সেখানে চল্লিশ কাফীয আছে, তারপর তা পরিমাপ দিয়ে কবজা করল। পরে তা ভিজে পঞ্চাশ কাফীয হয়ে গেল এবং পানিতে সে শস্য নষ্ট হয়ে গেল। এখন সে বিক্রি যদি সে শস্য লাভে বা আসল দামে বিক্রি করে, কিন্তু ভিজে যাওয়ার কথা ব্যক্ত না করে তবে সে বিক্রি জায়েয হবে। দ্বিতীয় ক্রেতা সে শস্য হতে চল্লিশ কাফীযই পাবে। অবশিষ্ট দশ কাফীয তার নিজের থেকে যাবে। এই দশ কাফীয যদি সে লাভে বা আসল দামে বিক্রি করতে চায়, তবে মোট দামের এক-পঞ্চমাংশ ধরে বিক্রি করবে। এ সমাধান ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুযায়ী। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুসারে এই দশ কাফীয লাভে বিক্রি করতে পারবে না।

এ শস্য যদি দ্বিতীয়বারের পরিমাপের পর এবং কবজার আগে ভিজে যায়, তবে দ্বিতীয় ক্রেতা চাইলে সবটা শস্য পূর্ণ দামে গ্রহণ করবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৩৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি একশ' দিরহামে এই কথার উপর এক 'কুরুর' গম কিনল যে, তাতে চল্লিশ কাফীয আছে। তারপর তা মাপল। দেখল চল্লিশ কাফীযই আছে। সুতরাং সে তা কবজা করল। তারপর তারা উভয়ে মিলে চুক্তি তুলে নিল (ইকাল্লা করল) এবার বিক্রেতা তা

পরিমাপ করে যদি দেখতে পায় যে, তাতে এক কাফীয বেশী বা কম হয়। কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'জনেই স্বীকার করে যে, এই কম-বেশীটা পরিমাপের বেশকমের কারণে হয়েছে, তবে মূল্যের সঙ্গে অতিরিক্তটা বিক্রেতাই পাবে। এমনিভাবে কম হলে তাও তার থেকেই যাবে। এ কারণে সে ক্রেতা হতে মূল্য কাটতে পারবে না। এমনিভাবে যদি তা পানিতে ভিজে যায় এবং সে এক কাফীয বেড়ে যায়, তখনও বিক্রেতা সে ভেজা গম গ্রহণে সম্মত থাকলে অতিরিক্ত গম তারই হবে। কিন্তু বিক্রেতার যদি তা জানা না থাকে, তবে সে দোষের কারণে তার তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে। তখন চুক্তি রহিতকরণ (ইকাল্লা) বাতিল হয়ে যাবে এবং আগের বিক্রি পুনর্বহাল হবে। এমনিভাবে বিক্রিকালে যদি গম তাজা এবং তখনকার মাপে তা পূর্ণ এক কুরুর থাকে, তারপর তা ক্রেতার কাছে গুণিয়ে কমে যায়, তারপর তারা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে চুক্তি বাতিল করে এবং ক্রেতা তা পরিমাপ করে দেখতে পায় যে, এক কুরুর-এর কম হয়, আর তার জানা থাকে যে, কম হয়েছে গুণানোর কারণে এবং তারা দু'জনেই তা স্বীকারও করে। তবে সে কমতিটা বিক্রেতার থেকেই যাবে। এ কারণে ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য কাটা যাবে না (আল-মুহীত)।

১৩৯. মাসআলা : এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, পণ্য যদি ইঙ্গিতকৃত সুনির্দিষ্ট বস্তু হয়, যা পরিমাপের শর্তে বিক্রি হয়েছে, তবে পরিমাপ করার আগে তাতে যে বৃদ্ধি ঘটে, তার মালিক হয় বিক্রেতা আর পরিমাপের পরে যে বৃদ্ধি ঘটে তার মালিক ক্রেতা। আর পণ্য যদি ইঙ্গিতকৃত সুনির্দিষ্ট বস্তু না হয়, তবে পরিমাপের পর কবজার আগে বা পরে যে বৃদ্ধি ঘটে তা ক্রেতার হয়ে যায়।

১৪০. মাসআলা : কেউ যদি এক দিরহামের বিনিময়ে এই কথার উপর কোন খাদ্যবস্তু কেনে, যে তাতে এক কাফীয আছে, তারপর তা পরিমাপের আগে ভিজে যায়, তারপর মেপে দেখা যায় যে, যেখানে সোয়া এক কাফীয আছে এবং ভেজার কারণেই সেটা বেড়ে গেছে, তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার চাইলে সে তা থেকে এক কাফীয নেবে, অন্যথায় পরিত্যাগ করবে। আর এই বৃদ্ধিটা যদি ক্রেতার সামনেই পরিমাপ করার পর এবং তার কবজার আগে ঘটে, তবে অতিরিক্তটা সেই পাবে। আর ভিজে যাওয়ার কারণে তার ইখতিয়ার লাভ হবে। কমতিটা যদি মাপার পরে ঘটে তবে পূর্ণ মূল্য দিয়েই তাকে তা নিতে হবে। আর তার আগে হলে পূর্ণ মূল্য নয়, বরং অবশিষ্ট অংশের যে মূল্য আসে কেবল তাই দিতে হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৪১. মাসআলা : যদি ক্রেতার উপস্থিতিতে তারই জন্য মাপা হয় এবং তখন এক কাফীয হয়, কিন্তু তখন সে কবজা না করে, তারপর তার সামনে আবারও মাপা হয় এবং এবার এতটুকু পরিমাণ কম বেশী হয়, যা দুইবারের মাপে সাধারণত হয়ে থাকে, তবে ক্রেতাকে তা পূর্ণ মূল্য দিয়েই নিতে হবে। কেননা পরিমাপের ফলে চুক্তিবদ্ধ পণ্য স্থিরীকৃত হয়ে গেছে এবং প্রথমবারের মাপ যে ভুল ছিল তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। হাঁ, দ্বিতীয়বারের মাপে যে কম বেশী হয়েছে, তা যদি এই পরিমাণ হয় যে, দুইবারের মাপে সাধারণত এতটা কম বেশী হয় না, তবে বেশী হলে সে বেশীটা বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দিতে হবে আর কম হলে ক্রেতা সেই পরিমাণ কম মূল্যে তা গ্রহণ করবে তাতে সে হ্রাস-বৃদ্ধিটা কবজার আগে ঘটুক বা পরে (আল-মুহীত)।

১৪২. মাসআলা : কেউ যদি এক স্তূপ শস্য হতে এক দিরাহামের বিনিময় এক কাফীয ক্রয় করে এবং বিক্রেতা তা থেকে ক্রেতার জন্য এক কাফীয মেপে আলাদা রাখে, কিন্তু তখনই তা ক্রেতার হাতে সমর্পণ না করে, অবশেষে পৃথক সেই কাফীযসহ স্তূপের শস্য পানিতে ভিজে যায় এবং প্রতি কাফীযে পোয়া কাফীয বেড়ে যায়, তবে বিক্রেতার এই অধিকার থাকবে যে, সে দুই শস্যের যেখান থেকেই হোক বিক্রেতাকে মাত্র এক কাফীয প্রদান করবে, তার বেশী নয় এবং ক্রেতারও তা গ্রহণ করা না করার ইখতিয়ার থাকবে। যদি পৃথক কাফীয এবং মূল স্তূপে ঘাটতি দেখা দেয়, যেমন তা হয়ত আর্দ্র ছিল, এখন শুকিয়ে কমে গেছে, তবে ক্রেতা পূর্ণ এক কাফীয পাবে। কারও কোনও ইখতিয়ার থাকবে না।

১৪৩. মাসআলা : যদি স্তূপ থেকে এক কাফীয শস্য কেনে এবং সেখান থেকে তা কবজা করে, তারপর কোন দোষের কারণে তা ফেরত দেয়, তবে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।

১৪৪. মাসআলা : যদি নির্দিষ্ট এক কাফীয শস্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট এক কাফীয শস্য বেচাকেনা করে, তারপর তার এক কাফীয মাপ দেওয়ার পর কবজার আগে ভিজে যায় এবং তাতে পোয়া কাফীয বৃদ্ধি পায়, তবে তা ক্রেতাই পাবে। সে ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার থাকবে, কিন্তু বৃদ্ধির কারণে বিক্রি ফাসিদ হবে না। যদি এ বৃদ্ধিটা মাপ দেওয়ার আগে হত তবে শুধু কাফীয ওয়ালার ইখতিয়ার থাকবে; চাইলে সে ভেজা এক কাফীয গ্রহণ করবে অথবা পরিত্যাগ করবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মত।

১৪৫. মাসআলা : যদি স্তূপের এক কাফীযের বিনিময়ে সুনির্দিষ্ট এক কাফীয বেচাকেনা করে এবং স্তূপের মালিক তা থেকে এক কাফীয মাপে, কিন্তু ক্রেতাকে বুঝিয়ে না দেয়, অবশেষে তার স্তূপ ও তা থেকে পৃথকীকৃত কাফীয ভিজে যায়, তবে কাফীযের মালিক ইখতিয়ার লাভ করবে। চাইলে সে ভেজা এক কাফীয গ্রহণ করবে অথবা পরিত্যাগ করবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিক্রিই ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি কেবল পৃথকীকৃত কাফীয ভিজে যায় এবং স্তূপ শুকনা থাকে তবে বিক্রেতার কর্তব্য সেই শুষ্ক শস্য থেকেই এক কাফীয সমর্পণ করা। এ ক্ষেত্রে তাদের কারও কোনও ইখতিয়ার থাকবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

একাদশ পরিচ্ছেদ : নাজায়েয বিক্রির বিধি-বিধান

১. মাসআলা : নাজায়েয বিক্রি দুই প্রকার : বাতিল ও ফাসিদ। যে বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রটি (শরীআতের দৃষ্টিতে) মূল্য সম্পন্ন মাল নয়, তাকে বাতিল বিক্রয় বলে। মদ, শূকর, হারাম শরীফের জীব-জন্তু, মৃত জন্তু কিংবা প্রবাহিত রক্ত ক্রয় করা। এরূপ বিক্রির দ্বারা মালিকানা লাভ হয় না।

২. মাসআলা : ফাসিদ বলা হয় এমন বিক্রয় চুক্তিকে যার পণ্যটি মূল্য সম্পন্ন মাল হলেও মূল্য দ্রব্যটি মূল্য সম্পন্ন মাল নয়। যেমন মদ, শূকর, হারাম শরীফের শিকার, মুদাব্বার, মুকাতাব কিংবা উম্মে ওয়ালাদের বিনিময়ে কোন বস্তু ক্রয় করা অথবা যে বিক্রিতে ফাসিদ শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। এরূপ বিক্রি পণ্যের বাজার মূল্য সংঘটিত হয় এবং কবজার মাধ্যমে তাতে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩. মাসআলা : ফুকাহায়ে কিরামদের মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, ক্রেতার হাতে এভাবে খরিদকৃত বস্তুটি জামানতস্বরূপ থাকবে না আমানতস্বরূপ? কেউ বলেন, আমানতস্বরূপ থাকবে এবং কারও মতে জামানতস্বরূপ (অর্থাৎ হারিয়ে গেলে তার বদলা দিতে হবে) (শারহুত তাহাবী)।

৪. মাসআলা : ক্রেতার কবজা বিক্রেতার অনুমতিক্রমে হওয়া শর্ত। কাজেই ফাসিদ বিক্রিতে বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া যা কবজা করবে, তা কবজাকৃত না রূপেই গণ্য হবে। 'আয-যিয়াদাত' গ্রন্থে আছে, ফাসিদ বিক্রিতে বিক্রেতার অনুমতি ছাড়া যদি ক্রেতা মাল কবজা করে, তবে লক্ষ্য করতে হবে যে, বিক্রির মজলিসে কবজা করেছে, না তার পরে। মজলিসের ভেতর কবজা করলে ইসতিহসান অনুযায়ী সে কবজা সহীহ হবে এবং তাতে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যদি তারা মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কবজা করে তবে কিয়াস ও ইসতিহসান অনুযায়ী সে কবজা সহীহ হবে না এবং তা দ্বারা মালের ভেতর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে কবজার অনুমতি দেয় তবে মজলিসের ভেতরে মজলিসের কবজা করুক সর্বাবস্থায় কিয়াস ও ইসতিহসান অনুযায়ী কবজা সহীহ হবে এবং ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য এটা এমনই মালিকানা, যা রহিত করাই সংগত এবং ফাসিদ পদ্ধতিতে কেনা বস্তুতে ক্রেতার হস্তক্ষেপ করা মাকরুহ যেমন কাউকে তার মালিকানা প্রদান বা নিজের কোন কাজে সে বস্তুর ব্যবহার, তবে ক্রেতার হস্তক্ষেপ কার্যকর হবে এবং তা বাতিল করা হবে না, বরং তার ফলে বিক্রেতার ফেরত গ্রহণের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। হস্তক্ষেপটি রহিত

করার যোগ্য হোক, যেমন বিক্রি করা বা রহিত করার যোগ্য না হোক, যেমন আযাদ করে দেওয়া। হাঁ ইজারা দেওয়া বা বিবাহ সম্পন্ন করার ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। কেননা এর দ্বারা বিক্রেতার ফেরত গ্রহণের অধিকার বাতিল হয় না (আল-মুহীত)

৫. মাসআলা : ক্রেতা যদি ফাসিদ পদ্ধতিতে কেনা গোলামকে আযাদ করে দেয় বা বিক্রি করে দেয় কিংবা তাকে মুদাক্কর বানায় (অর্থাৎ তার মৃত্যুর পর স্বাধীন বলে ঘোষণা দেয়), তবে সে বিক্রি রহিত করার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। এমনিভাবে ফাসিদ পদ্ধতিতে কেনা বাঁদীর গর্ভে যদি সন্তান উৎপাদন করে এবং সে বাঁদীটি তার সন্তানের মা হয়ে যায়, তখনও বিক্রি রহিতকরণের অধিকার বাতিল হয়ে যায়। এ অবস্থায় ক্রেতার কর্তব্য বাঁদীর বাজার মূল্য পরিশোধ করা।

এ বাঁদীর সঙ্গে সঙ্গম করার কারণে কি জরিমানাস্বরূপ মোহরানা হবে? 'আল বুয়' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, জরিমানা দিতে হবে না, 'আশ শিরব' অধ্যায়ে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে, বিত্তম মত হচ্ছে জরিমানা দিতে হবে না।

এমনিভাবে ফাসিদ পদ্ধতিতে কেনা গোলামের সংগে যদি কিতাবাত করে (অর্থাৎ এই চুক্তি সম্পাদন করে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে পারলে সে আযাদ হয়ে যাবে), তখনও ক্রেতার কর্তব্য তার বাজার মূল্য আদায় করা। গোলাম যদি চুক্তি অনুযায়ী অর্থ পরিশোধ করে ফেলে এবং সেমতে সে আযাদ হয়ে যায় তবে ক্রেতার যিম্মায় গোলামের বাজার মূল্য পরিমাণ বদলা অবধারিত হয়ে যায়, গোলাম যদি চুক্তি অনুযায়ী অর্থ আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে যায় এবং সেমতে সে গোলামীতেই ফিরে আসে, তবে তার সময়টা বিবেচনা করতে হবে, ক্রেতাকে বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে এই মর্মে রায় হওয়ার আগেই যদি গোলাম তার অক্ষমতা প্রকাশ করে, তবে তাকে ফেরত চাওয়ার ইখতিয়ার বিক্রেতার থাকবে। আর বাজার মূল্য পরিশোধের ফায়সালা দেওয়ার পরে অক্ষমতা প্রকাশ করলে সে গোলামকে ফিরে পাওয়ার কোন সুযোগ বিক্রেতার থাকবে না।

এভাবে কেনা গোলাম সম্পর্কে যদি ক্রেতা ওসীয়ত করে তবে সে ওসীয়ত সহীহ হবে। এরপর যতক্ষণ ওসীয়তকারী জীবিত থাকবে, বিক্রেতার ফেরত নেওয়ার অধিকার বহাল থাকবে। আর তার মৃত্যু হয়ে গেলে সে অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা যার জন্য ওসীয়ত করা হয়েছে, গোলামটিতে তার মালিকানা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ওয়ারিসদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মালিকানা নতুন নয়। কাজেই সে ক্ষেত্রে বিক্রেতার ফেরত গ্রহণের অধিকার বাকি থাকে। সুতরাং ফাসিদ পন্থায় ক্রয়ের পর ক্রেতা যদি মারা যায়, তবে তার ওয়ারিসদের নিকট থেকে বিক্রেতা পণ্যটি ফেরত নিতে পারবে। এমনিভাবে বিক্রেতা মারা গেলেও তার ওয়ারিসদের ফেরত চাওয়ার অধিকার থাকে (আল বাদাই)।

৬. মাসআলা : ক্রেতা যদি ফাসিদ পন্থায় কেনা কাপড় কেটে সেলাই করে ফেলে অথবা দোপাটি করে তার ভেতর পুর ঢোকায় তবে বিক্রেতার বিক্রি রহিতকরণের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি ফাসিদ পদ্ধতিতে একটি কাপড় কিনে কবজা করল। তারপর তা কাটল কিন্তু সেলাই করল না। এ অবস্থায় সে কাপড়টি বিক্রেতার কাছে আমানত রাখল। এখন বিক্রেতার হাত থেকে যদি কাপড়টি হারিয়ে যায় তবে ক্রেতাকে কাটার কারণে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাকে কাপড়ের বাজার মূল্য আদায় করতে হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা : পণ্যটি যদি কোন মুক্ত মাঠ হয় এবং ক্রেতা তাতে ঘর তোলে বা গাছ লাগায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সে বিক্রি রহিতকরণের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বাতিল হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা : পণ্যটি যদি মিছলী (সাদৃশ্য) দ্রব্য হয়, তবে ফাসিদ বিক্রির ক্ষেত্রে ক্রেতার কর্তব্য হল ঐ বস্তুটি مثل (বা সাদৃশ্য) দ্রব্য করা। আর মিছলী দ্রব্য না হলে (পরিভাষায় যাকে যাওয়াতুল কিরাম বা মূল্য নির্ভর দ্রব্য), ক্রেতার উপর তার বাজার মূল্য ওয়াজিব হয়। এটা সেই অবস্থায়, যখন ক্রেতার হাতে সেটি ধ্বংস হয় বা ক্রেতা তা ধ্বংস করে ফেলে কিংবা সে তা কাউকে দান করত তার হাতে সমর্পণ করে এবং বিক্রেতার পণ্য ফেরত চাওয়ার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। এমনিভাবে ক্রেতা যদি বন্ধক রাখে কিংবা সে অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দেয় তখনও তার অনুরূপ দ্রব্য বা বাজার মূল্য পরিশোধ অপরিহার্য। ক্রেতা যদি বন্ধক ছাড়িয়ে আনে বা দান প্রত্যাহার করে কিংবা বিক্রি করে থাকলে সেটি আবার তার হাতে এমনিভাবে ফিরে আসে যদ্বন্ধন বিক্রি রহিত হয়ে যায়, তখন বিক্রেতার আবার সেটি ফেরত চাওয়ার অধিকারও ফিরে আসবে। এই হুকুম সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন কাযী ক্রেতাকে পণ্যের বাজার মূল্য পরিশোধের আদেশ না দেয়, কাযী এরূপ ফায়সালা দিয়ে ফেললে বিক্রেতার পণ্য ফেরত চাওয়ার অধিকার থাকে না (আল খুলাসা)।

১০. মাসআলা : পণ্যটি যদি ক্রেতার বর্তমান থাকে এবং তাতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি না ঘটে, তবে ক্রেতার কর্তব্য সেটাই বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়া। এর ফলে বিক্রি রহিত হয়ে যাবে। বিক্রি ফাসিদ হওয়ার কারণটি যদি শক্তিশালী হয়, অর্থাৎ যা চুক্তির কেন্দ্রমূল তথা পণ্য বা বিনিময় মূল্যের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে কোন একজন অপরজনের উপস্থিতিতে বিক্রি রহিত করার ক্ষমতা রাখবে। পক্ষান্তরে ফাসিদ হওয়ার কারণটি যদি এত শক্তিশালী না হয়, যা চুক্তির কেন্দ্রমূলে দেখা দেয়, বরং তা এমন কোন শর্তের মধ্যে পাওয়া যায়, যার ভেতর ক্রেতা বা বিক্রেতার স্বার্থ নিহিত থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে কবজার আগে তো তাদের প্রত্যেকেরই চুক্তি রহিতকরণের ক্ষমা থাকে, কিন্তু কবজার পরে তাদের প্রত্যেকের সে ক্ষমতা থাকে না, বরং শর্তটি যার পক্ষে থাকে, কেবল সে-ই অপরজনের উপস্থিতিতে চুক্তি রহিত করতে পারে।

ক্রেতার হাতে যদি পণ্যের বৃদ্ধি ঘটে, তবে বৃদ্ধিটা হয়ত পণ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকবে অথবা পৃথক। এর প্রত্যেকটির আবার দু'অবস্থা হতে পারেঃ হয়ত পণ্যের সঙ্গে যুক্ত এবং তা থেকেই উৎপন্ন হবে, যেমন রূপ ও সৌন্দর্য এবং স্বচ্ছতার উৎকর্ষ অথবা পণ্যের সঙ্গে যুক্ত হবে বটে, কিন্তু তা হতে উৎপন্ন নয় যেমন, কাপড়ের রং, ছাতুতে মাখানো ঘি, শূন্য জমিতে তোলা ঘর প্রভৃতি। এমনিভাবে পৃথক হলে সেটা হয়ত মূল থেকে উৎপন্ন হবে, যেমন বাচ্চা, মোহরানা,

দিয়াত (জখমির বদলে প্রাপ্ত অর্থদণ্ড), গাছের ফল, পশুর পশম ইত্যাদি অথবা মূল থেকে উৎপন্ন হবে না, যেমন উপার্জন, ভাড়ার আয়, দান-সাদাকা প্রভৃতি।

পণ্যের সে বৃদ্ধিটা যদি মূলের সঙ্গে যুক্ত এবং তা থেকেই উৎপন্ন হয়, তবে তার কারণে পণ্য হতে বিক্রেতার অধিকার বাতিল হবে না। যদি মূলের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু তা হতে উৎপন্ন না হয়, যেমন রং ইত্যাদি, তবে তার কারণে পণ্য হতে বিক্রেতার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে এবং তখন ক্রেতার উপর বাজার মূল্য অথবা মিছলী দ্রব্যের ক্ষেত্রে পণ্যের অনুরূপ বদলা প্রদান ওয়াজিব হয়ে যাবে। তদ্রূপ পণ্যটি যদি তুলা হয় এবং ক্রেতা তা দিয়ে সুতা তৈরি করে বা সুতা হলে তা দিয়ে কাপড় বুনে কিংবা পণ্যটি যদি গম হয় এবং ক্রেতা তা পিষে আটা তৈরি করে, তবে তা থেকে বিক্রেতার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর তখন ক্রেতাকে তার বাজার মূল্য অথবা পণ্যের অনুরূপ বদলা প্রদান করতে হবে।

পণ্যের বৃদ্ধিটা যদি পণ্য হতে পৃথক, কিন্তু তা থেকেই উৎপন্ন হয়, তবে তা বিক্রি রহিতকরণের প্রতিবন্ধকতা না। তখন ক্রেতার কর্তব্য হবে বৃদ্ধিসহই মূল্য ফেরত দেওয়া। প্রজননের ফলে মূল্য পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে, উৎপাদন দ্বারা যেই বৃদ্ধি ঘটল, তা দ্বারা সেই ক্ষতির প্রতিকার হবে।

এসব বৃদ্ধি যদি ক্রেতার হাতে ধ্বংস হয়ে যায় তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে না। কিন্তু প্রজননের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্রেতা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এসব বৃদ্ধি বিনাশ করে তবে সে ক্ষেত্রে তাকে জরিমানা দিতে হবে।

যদি পণ্যটি নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু বৃদ্ধিটা অবশিষ্ট থাকে তবে বিক্রেতা বৃদ্ধিটা ফেরত নিতে পারবে এবং পণ্যের বদলে তার কবজাকালীন বাজার মূল্য গ্রহণ করবে।

বৃদ্ধিটা যদি মূল থেকে পৃথক হয় এবং তার থেকে উৎপন্ন না হয়, তবে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে বৃদ্ধিসহ মূল পণ্য ফেরত নিতে পারবে, কিন্তু বৃদ্ধিটা তার জন্য হালাল হবে না। বৃদ্ধিটা যদি ক্রেতার হতে ধ্বংস হয়ে যায় তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে না। যদি ইচ্ছাকৃত বিনাশ করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তখনও জরিমানা দিতে হবে না, কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জরিমানা দিতে হবে। ক্রেতা যদি পণ্যটি ইচ্ছাকৃত বিনাশ করে এবং বৃদ্ধিটা তার হাতে অবশিষ্ট থাকে, তবে তাকে পণ্যের বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং বৃদ্ধিটা তারই থেকে যাবে।

ক্রেতার হাতে যদি পণ্যের হ্রাসপ্রাপ্তি হয় লক্ষ্য হ্রাসপ্রাপ্তির কারণ দেখতে হবে। যদি আসমানী বালা-মুসীবতের কারণে ঘটে, তবে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণসহ সে পণ্যটি গ্রহণ করবে। এমনভাবে ক্রেতার কোন কাজে বা খোদ পণ্যের দ্বারা যদি কমতি ঘটে তখনও একই হুকুম।

পক্ষান্তরে পণ্যের ক্ষয় যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তির পক্ষ হতে ঘটে, তবে অর্থদণ্ড গ্রহণের ব্যাপারে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে তা সরাসরি অপরাধীর কাছ থেকে গ্রহণ করবে, এ ব্যাপারে সে ক্রেতার কাছ থেকে কিছুই নেবে না অথবা ক্রেতার কাছ থেকেই তা আদায় করে নেবে এবং ক্রেতা আদায় করবে অপরাধীর কাছ থেকে।

তৃতীয় কোন ব্যক্তি যদি এরূপ পণ্য (গোলাম হওয়ার ক্ষেত্রে) হত্যা করে তবে বিক্রেতা ক্রেতার কাছ থেকে তার বাজার মূল্য আদায় করবে। হত্যাকারীর নিকট থেকে তার তা আদায়ের কোন সুযোগ থাকবে না। ক্রেতা এ ব্যাপারে হত্যাকারীর আকিলার (তার আত্মীয় ও প্রতিবেশী)-কে ধরবে এবং তিন বছরের মেয়াদে তাদের কাছ থেকে গোলামের মূল্য আদায় করবে।

পণ্যের কমতি যদি বিক্রেতার হস্তক্ষেপের কারণে হয় তবে পণ্যটি কার্যত ব্যবহার হয়ে যাবে। সুতরাং এ অবস্থায় যদি সেটি ক্রেতার কাছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বিক্রেতার ফেরত গ্রহণের ব্যাপারে তার পক্ষ হতে কোন বাধা না থাকে, তবে তা প্রত্যাহত হয়েছে বলেই ধরা হবে এবং তার ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে বিক্রেতার মাল ধ্বংস হওয়া বলেই গণ্য করা হবে।

যদি ক্রেতার পক্ষ হতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে এবং এ অবস্থায় তার বিনাশ ঘটে, তবে তার বিনাশপ্রাপ্তির কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। যদি দেখা যায় যে, বিক্রেতার দেওয়া আঘাতের সংক্রমণেই সে ধ্বংস হয়েছে, তবে তখনও কার্যত প্রত্যাহত হয়ে যাবে। সুতরাং ক্রেতাকে কোন জরিমানা দিতে হবে না। যদি বিক্রেতার দেওয়া আঘাতের পরিণামে তার মৃত্যু না ঘটে, তবে সে ক্ষেত্রে ক্রেতাকে জরিমানাস্বরূপ গোলামের বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অবশ্য সে আঘাতের ফলে যে ক্ষতি হয়েছে জরিমানা হতে তা কাটা যাবে।

বিক্রেতা যদি তাকে হত্যা করে অথবা বিক্রেতার খোদা কুয়ায় পড়ে সে মারা যায়, তবে কার্যত সে প্রত্যাহত হয়ে যাবে এবং ক্রেতা জরিমানার দায় হতে মুক্ত হয়ে যাবে (শারহুত তাহবী)।

১১. মাসআলা : ফাসিদ ক্রয়ের ক্রেতা যদি দাসীকে কবজা করা পর লাভে বিক্রি করে তবে লাভের অংশটা সাদাকা করতে হবে। যদি তার বিক্রি মূল্য দিয়ে কোন বস্তু কেনে এবং তাতে লাভ হয় তবে সে লাভ তার জন্য হালাল হবে (আস সিরাজুল ওয়াহাজ)।

১২. মাসআলা : এক ব্যক্তি ফাসিদ পদ্ধতিতে একটি বাড়ি কিনে কবজা করল, এবং তার হাতে থাকা অবস্থায় তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, এরপর বিক্রেতা সে বাড়ির ব্যাপারে আদালতে মামলা করল। বিচারক রায় দিল, ক্রেতা যেদিন বাড়িটি কবজা করেছিল সে সেই দিনের বাজার মূল্য বিক্রেতাকে পরিশোধ করবে। এখন যদি শফী (অগ্রক্রয়ের অধিকারী) সে বাড়ি নিতে চায় তবে সে সেই মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতার কাছ থেকে বাড়িটি নিতে পারবে।

১৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি ফাসিদ পদ্ধতিকে একটি গোলাম কিনল এবং কবজাও করল, তারপর তাকে আযাদ করল বা হত্যা করে ফেলল। আযাদ বা হত্যা করার দিন তার বাজার মূল্য ছিল কবজার দিনের মূল্য অপেক্ষা বেশী। এ ক্ষেত্রে তাকে কোন দিনের মূল্য পরিশোধ করতে হবে? উত্তর হচ্ছে যে, কবজার দিনের বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা : কেউ যদি মুকাতাব, মুদাক্বার কিংবা উম্মু ওয়ালাদের বিনিময়ে গোলাম কেনে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার আপন-আপন প্রাপ্য কবজা করে, তবে গোলামের ক্রেতা গোলামের মালিক হয়ে যাবে, কিন্তু মুকাতাব, মুদাক্বার কিংবা উম্মু ওয়ালাদের ক্রেতা তার কেনা জিনিসের মালিক হবে না, যদিও সে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে কবজা করে। তদ্রূপ কেউ যদি মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্যের মাল দিয়ে কোন গোলাম কেনে তবে গোলামের ক্রেতা

গোলামের মালিক হয়ে যাবে, কিন্তু অপর ব্যক্তি তার কবজাকৃত বস্তুর মালিক হবে না, যতক্ষণ না তার মালিক বিক্রি অনুমোদন করে।

তদ্রূপ কেউ যদি কারও কাছ থেকে সেচ ব্যবস্থার বিনিময়ে বা হাওয, খাল কিংবা কুয়ায় সংরক্ষিত নয়, এমন পানির বিনিময়ে গোলাম কেনে অথবা কাটা হয়নি এমন শস্য কেনে তবে সে ক্ষেত্রেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য (শারহুত তাহাবী)।

১৫. মাসআলা : কেউ যদি ফাসিদ পদ্ধতিতে কোন বাঁদী কেনে তবে তার সঙ্গে সঙ্গম করা তার জন্য জায়েয নয়। যদি সঙ্গম করে, কিন্তু তাতে বাঁদীটি গর্ভবতী না হয়, তবে বিক্রেতা তাকে ফেরত নিতে পারবে। সে তাকে ফেরত নিয়ে ক্রেতাকে তার সাথে সঙ্গম করার কারণে সহবাসদণ্ড আদায় করতে হবে। বাঁদীটি গর্ভধারণ করলে ক্রেতাকে তার বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। জরিমানা আরোপিত হওয়ার পর শামসুল আইম্মা : আস-সারাখসী (র)-এর মতে তার উপর মোহরানা আরোপিত হবে না। শায়খুল ইসলাম (র)-এর বর্ণনা মতে এ মাসআলা সম্পর্কে দুটি রিওয়ায়াত আছে। কিতাবুল বুযু-এর বর্ণনা অনুযায়ী তার উপর মোহরানা আরোপিত হবে না, কিন্তু কিতাবুশ-শিরব-এর বর্ণনামতে মোহরানা আরোপিত হবে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা : ক্রেতা যদি ফাসিদ ক্রয়ের দাসীকে কবজা না করেই আযাদ করে দেয় এবং বিক্রেতা তার আযাদী অনুমোদন করে, তবে সে বাঁদী বিক্রেতার পক্ষ থেকে আযাদ হবে। সুতরাং ক্রেতাকে কিছুই পরিশোধ করতে হবে না।

১৭. মাসআলা : কেউ যদি ফাসিদ পদ্ধতিতে কোন গোলাম কেনে এবং তারপর তা কবজা করার আগেই বিক্রেতাকে বলে, তুমি আমার পক্ষ হতে তাকে আযাদ করে দেয়, এবং সে মতে বিক্রেতা তার পক্ষ হতে তাকে আযাদ করে দেয়, তবে সে আযাদী বিক্রেতার পক্ষ থেকেই হবে, ক্রেতার পক্ষ থেকে নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা : কেউ যদি ফাসিদ পদ্ধতিতে কোন গোলাম কিনে কবজা করে, তারপর বিক্রেতা বলে যে, সে স্বাধীন, তবে এতে সে স্বাধীন হয়ে যাবে না। যদি কবজার পর বিক্রেতা বলে, সে স্বাধীন তবুও স্বাধীনতা লাভ করবে না, যদি তা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে বলে। ক্রেতার উপস্থিতিতে বললে অবশ্য আযাদ হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৯. মাসআলা : যদি ফাসিদ পদ্ধতিতে গম কেনে, তারপর বিক্রেতাকে পেয়াই করতে আদেশ দেয় এবং সেমতে সে তা পেয়াই করে তবে সে আটা হবে বিক্রেতার। এমনভাবে যদি হাগল কিনত এবং বিক্রেতাকে তা যবাহু করতে আদেশ দিত এবং সে তা যবাহু করত, তবে গোশত বিক্রেতারই হত।

২০. মাসআলা : কেউ যদি ফাসিদ পদ্ধতিতে এক কাফীয গম কেনে এবং কবজার আগে বিক্রেতাকে আদেশ করে, সে যেন ক্রেতার খাদ্যের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে। এখন বিক্রেতা যদি

১. বিক্রেতার পক্ষ থেকে যে আযাদ বলা হয়েছে, এটা দুর্বল বর্ণনা অথবা অনুলেখকের ভুল। সঠিক কথা হচ্ছে যে, সে গোলাম ক্রেতার পক্ষ থেকেই আযাদ হবে। পরবর্তী মাসআলায় আটা বা গোশতের ক্ষেত্রেও হুকুম এমনই। কেননা আদেশদান দ্বারা তাতে আইনত ক্রেতার কবজা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাই করে তবে তাতে ক্রেতার কবজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সুতরাং ক্রেতার কর্তব্য অনুরূপ গম বিক্রেতাকে প্রদান করা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা : এক ব্যক্তি ফাসিদ পদ্ধতিতে একটি বাঁদী কিনল এবং নির্দিষ্ট মোহরানায় কারও সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন করল। স্বামী তার সাথে সহবাসও করল। ইতিপূর্বে সে কুমারী ছিল। তারপর বিক্রেতা তাকে ফেরত নেওয়ার জন্য মামলা করল এবং নিয়েও গেল। এখন তার হুকুম কী? বিবাহ বৈধ থাকবে। মোহরানা পাবে বিক্রেতা। বাঁদী কুমারিত্ব নষ্ট হওয়ার কারণে তার যে ক্ষতি হয়েছে, মোহরানা দ্বারা তা পূরণ হলে ক্রেতাকে কোন জরিমানা পরিশোধ করতে হবে না। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ মোহরানার চেয়ে বেশী হলে বিক্রেতা তা ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে নেবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা : বাকিতে দুটি ক্রীতদাসীর বদলে একটি ক্রীতদাসী বিক্রি জায়েয নয়। এভাবে কেনার পর যদি কবজা করে, এরপর তার কাছে তার চোখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়, তবে বাঁদীটি ফিরিয়ে দেবে এবং সেই সঙ্গে তার অর্ধেক মূল্যও। যদি ক্রেতা ছাড়া অন্য কেউ তার চোখ ফুঁড়ে দেয়, তবে বিক্রেতা ইচ্ছা করলে ঐ ব্যক্তি থেকে অথবা ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য আদায় করতে পারে। অবশ্য দ্বিতীয় সূরতে ক্রেতা তা সেই ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করে নেবে।

বাঁদীটি যদি দুটি সন্তান প্রসব করে, তারপর তার একটি মারা যায়, তবে ক্রেতা জীবিত সন্তানটিসহ বাঁদীটি ফেরত নেবে। মৃত বাচ্চাটির জন্য ক্রেতাকে কোন জরিমানা পরিশোধ করতে হবে না। হাঁ, প্রজননের কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তার বদলা আদায় করতে হবে। অবশ্য সন্তানটি দ্বারাই যদি সে ক্ষতির প্রতিকার হয়ে যায় তবে ভিন্ন কথা। বাচ্চাটি যদি ক্রেতার কোন আঘাতে মারা গিয়ে থাকে তবে ক্রেতাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যদি কেবল মা মারা গিয়ে থাকে, তবে ক্রেতা সন্তান দুটি গ্রহণ করবে, সেই সঙ্গে মায়ের বাজার মূল্য (আস সারাখসী : আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি ফাসিদ পদ্ধতিতে একটি গোলাম কিনল এবং ক্রেতার অনুমতিক্রমে তাকে কবজা করল। মূল্যও নগদ পরিশোধ করল। এখন বিক্রেতা যদি তার গোলাম ফেরত নিতে চায়, তবে ক্রেতা মূল্য ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত গোলামটি আটকে রাখতে পারবে। যদি বিক্রেতা মারা যায় এবং সেই গোলামটি ছাড়া তার সম্পদ বলতে আর কিছু না থাকে, তবে বিক্রেতার অপরাপর পাওনাদার অপেক্ষা এই ক্রেতারই সে গোলামে অগ্রাধিকার থাকবে। সুতরাং সে তার পাওনার বদলে গোলামটি বিক্রি করে ফেলবে। এবারের বিক্রি মূল্য যদি আগেরবারের সমান হয়, তবে ক্রেতা তা গ্রহণ করবে। যদি বেশী হয়, তবে বেশীটুকু বিক্রেতার অন্যান্য পাওনাদারের। দ্বিতীয়বারের বিক্রি মূল্য যদি প্রথমবারের চেয়ে কম হয়, তবে অবশিষ্ট পাওনার ব্যাপারে সে অপরাপর পাওনাদারকেই ন্যম্যান অধিকার লাভ করবে। বিক্রেতার যদি অন্য কোন সম্পদ প্রকাশ পায়, তবে তাদের মত তারও একটা অংশ তাতে থাকবে।

গোলামটি যদি ক্রেতার হাতে মারা যায়, তবে তাকে তার বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

ক্রেতা যদি অন্য একটি ফাসিদ বিক্রির কারণে বিক্রেতার কাছে প্রাপ্য এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে গোলামটি ক্রয় করে থাকে, তারপর বিক্রেতার অনুমতিক্রমে সে গোলামটি কবজা করে,

কিন্তু তারপর বিক্রেতা বিক্রি ফাসিদ হওয়ার কারণে গোলামটি ফেরত নিতে চায় এবং ক্রেতা তার সেই এক হাজার টাকা বুঝে পাওয়ার জন্য গোলামটি আটকে রাখতে চায়, তবে তার সে ইখতিয়ার থাকবে না। যদি বিক্রেতার মৃত্যু হয় এবং সে বিপুল পরিমাণে ঋণগ্রস্ত থাকে আর গোলামটি থাকে ক্রেতার কাছে, তবে বিক্রি ফাসিদ হওয়ার ক্ষেত্রে সে গোলামের ভেতর অপরাপর পাওনাদার অপেক্ষা ক্রেতার অগ্রাধিকার থাকবে না (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা : ফাসিদ চুক্তিতে বিক্রিত গোলামটি কবজা করার পর তারা উভয়ে মিলে সে বিক্রি বাতিল করে ফেলল। তারপর বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য হতে দায় মুক্ত করে দিল। এখন সে গোলামটি যদি ক্রেতার কাছে মারা যায়, তবে তাকে গোলামের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

যদি বলত আমি তোমাকে গোলামের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে দিলাম এবং তারপর ক্রেতার হাতে তার মৃত্যু হত, তবে সে ক্ষেত্রে ক্রেতা গোলাম থেকে দায় মুক্ত হয়ে যেত। কেননা বিক্রেতা যখন তাকে গোলামের দায়-দায়িত্ব হতে মুক্ত করে দিল, তখন তার আর কোন যিম্মাদারী থাকল না। গোলামটি তার কাছে থাকল কেবল আমানতস্বরূপ। সুতরাং তার মৃত্যু হয়ে গেলে ক্রেতাকে জরিমানা দিতে হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি ফাসিদ চুক্তিতে পাঁচশ' টাকা দিয়ে একটি গোলাম কিনে কবজা করল। তার কবজার মূল্যও পাঁচশ' টাকা, তারপর বাজার দর বেড়ে গোলামের বাজার মূল্য দাঁড়াল এক হাজার টাকা। এখন সে যদি গোলামটি হাজার টাকায় বিক্রি করে, তবে ক্রেতাকে তার পাঁচশ' টাকায় পরিশোধ করতে হবে, তার বেশী নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে কবজার দিনের মূল্যই ধর্তব্য।

কেউ কারও গোলাম জবরদখল করল, যার দাম এক হাজার টাকা। এরপর তার বাজার দাম চড়ে গেল এবং তার মূল্য দাঁড়াল দু'হাজার টাকা, তারপর সে মালিকের কাছ থেকে ফাসিদ পদ্ধতিতে গোলামটি ক্রয় করল। তারপর গোলামটি মারা গেল। এখন ক্রয়ের পর যদি গোলামটি তার হতে পৌঁছায় তবে তাকে দু'হাজার টাকা পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু তার পৌঁছাটা যদি হয় মৃত্যুর পর তবে তাকে এক হাজার টাকাই পরিশোধ করতে হবে। কেননা জবরদখলী মালের বৃদ্ধি ঘটলে সেটা আমানতস্বরূপ থাকে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে জামানত বা অর্থের বিনিময়ে দায়িত্বভুক্ত হয় কবজার মাধ্যমে আর এ স্থলে কবজা পাওয়া যায়নি (আয যহীরিয়া)।

২৬. মাসআলা : গোলামকে জবরদখল করার পর যদি তার মালিকের কাছ থেকে ফাসিদ পদ্ধতিতে ক্রয় করে এবং তারপর আযাদ করে দেয়, তবে সে আযাদী কার্যকর হবে। কেননা সে তাকে আযাদ করেছে কবজার পর (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৭. মাসআলা : ফাসিদ পদ্ধতিতে কেনার পর ক্রেতা যদি কেনা মাল বিক্রেতার কাছে ফেরত দেয় তবে বিক্রি বাতিল হয়ে যায়। তা যেভাবেই ফেরত দিক-বিক্রি, উপহার, সাদাকা বা ধার স্বরূপ কিংবা আমানত স্বরূপ। এমনিভাবে বিক্রেতার পক্ষ হতে যে ব্যক্তি ক্রয়ের উকীল হয়েছে তার কাছে বিক্রি করত যদি সমর্পণ করে তবুও সে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে।

যদি বিক্রেতার এমন গোলামের কাছে বিক্রি করে, যাকে তার মনিব ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছে এবং সে ঋণগ্রস্তও নয়, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে না, বরং এর পূর্বের ফাসিদ বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার হাতে মাল না পৌঁছা পর্যন্ত ক্রেতা দায়মুক্ত হবে না।

গোলাম যদি 'অনুমতি প্রাপ্ত' হয় এবং সে ঋণগ্রস্তও হয়, তবে তার কাছে ক্রেতার বিক্রি বৈধ হবে। এ অবস্থায় ক্রেতাকে সে মালের বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

যদি এরূপ ব্যবসার অনুমতি প্রাপ্ত ও ঋণগ্রস্ত গোলামের কাছ থেকে কোন মাল (ফাসিদ পদ্ধতিতে) কেনে এবং তার অনুমতিক্রমে তা কবজা করে, তারপর তার মনিবের কাছে সে মাল বিক্রি করে দেয়, তবে সে বিক্রি জায়েয। এ অবস্থায় বিক্রেতা তথা গোলামকে তার সে মালের বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যদি এ গোলাম ঋণগ্রস্ত না হয়, তবে দ্বিতীয় বিক্রি বৈধ নয়। অবশ্য এর ফলে প্রথম বিক্রি রহিত হয়ে যাবে এবং মনিবের কাছে মাল হস্তান্তর করার কারণে ক্রেতা জরিমানাস্বরূপ বাজার মূল্য পরিশোধের দায় থেকেও মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা মনিবের কাছে হস্তান্তর করা খোদ গোলামের কাছে ফেরত দেওয়ারই শামিল।

ফাসিদ পদ্ধতিতে কেনা মাল যদি বিক্রেতার মুযারিব (অর্থাৎ বিক্রেতার পুঁজি দিয়ে উভয়ে লাভ-লোকসান বহনের চুক্তিতে যে ব্যক্তি ব্যবসা করে)-এর কাছে বিক্রি করে তবে সে বিক্রি বৈধ হবে। এ অবস্থায় তাকে সে মালের বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং এর দ্বারা সে ফাসিদ বিক্রি রহিত হবে না। বিক্রেতা যদি অন্য কারও পক্ষ হতে ক্রয়ের জন্য উকীল হয় এবং তার মক্কেলের জন্য ক্রেতার কাছ থেকে সেই মালটি ক্রয় করে, তবে এই দ্বিতীয় বেচাকেনা বৈধ হবে। সুতরাং এ মালের দাম তার ক্রেতার (তথা এইবারের বিক্রেতার) তার কাছে সাব্যস্ত পাওনা হবে। অন্য দিকে তার ক্রেতার উপরও এর বাজার মূল্য পরিশোধ ওয়াজিব হয়ে যাবে। এভাবে উভয়ের কাছে উভয়ের পাওনা সাব্যস্ত হবে, যা তাদের মধ্যে কাটাকাটি হয়ে যাবে। কারও কাছে যদি পাওনার পরিমাণ বেশী হয়, তবে সে সেই বেশীটুকু আদায় করে দেবে (শারহুত তাহাবী)।

২৮. মাসআলা : ফাসিদ পদ্ধতিতে কেনা কাপড়ে যদি ক্রেতা লাল, হলুদ ইত্যাদি রং করে, যাদরুন কাপড়ে এক রকমের বৃদ্ধি ঘটে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে কাপড়টি গ্রহণ করবে এবং ক্রেতাকে 'বৃদ্ধির' বিনিময় দিয়ে দেবে। অন্যথায় সে ক্রেতার কাছ থেকে কাপড়ের বাজার মূল্য আদায় করে নেবে। এটাই সহীহ (আল-বাদায়ে)।

২৯. মাসআলা : ফাসিদ পদ্ধতিতে কেনা জমিকে যদি মসজিদ বলে ঘোষণা দেয়, তবে তাতে ঘর তোলা পর্যন্ত বিক্রেতার সে বিক্রি রহিতকরণের অধিকার বাতিল হবে না। এটাই জাহিরী রিওয়াযাত সম্মত রায়। যদি ক্রেতা মসজিদের ঘর তুলে ফেলে তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী রহিতকরণের অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। বৃক্ষ রোপণ গৃহ নির্মাণেরই মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা : ইবন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে উদ্ধৃত করেন যে, কেউ যদি ফাসিদ পদ্ধতিতে কোন গোলাম কেনে, তারপর ক্রেতা তাকে

ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়, সেমতে সে ব্যবসা করে এবং তাতে সে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এরপর বিক্রেতা তাকে ফেরত গ্রহণের জন্য ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করে, তবে ক্রেতা সে গোলামকে প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য থাকবে। পাওনাদারের সে গোলামের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকবে না। হাঁ, তাদের পাওনা ও গোলামের মূল্য- এ দুয়ের মধ্যে যেটা কম, ক্রেতা তা পাওনাদারদেরকে পরিশোধ করবে (আল-মুহীত)।

৩২. মাসআলা : ফাসিদ চুক্তিতে কেনা দাসীকে বিক্রেতার অনুমতিক্রমে কবজাও করল। তারপর 'ফাসাদ'-এর কারণে বিক্রেতা তাতে ফেরত নিতে চাইল, কিন্তু ক্রেতা প্রমাণ করল যে, সে তাকে অমুকের কাছ এত দামে বিক্রি করে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি ক্রেতার কথা বিশ্বাস করে তবে সে ক্রেতার কাছ থেকে বাজার মূল্য আদায় করবে। আর যদি তাকে মিথ্যুক মনে করে, তবে সে বাঁদীটি ফেরত নিতে পারবে। সুতরাং বিক্রেতা যদি তাকে ফেরত নিয়ে যায়, এরপর সেই তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে ক্রেতার কথা সত্য বলে স্বীকার করে, তবে সে বিক্রেতার কাছ থেকে বাঁদীটি ফেরত নিতে পারবে। প্রথম বিক্রেতা যদি ক্রেতার কথা বিশ্বাস করত তার কাছ থেকে বাঁদীর বাজার দাম আদায় করে নেয় এবং তারপর সেই তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তবে প্রথম বিক্রেতার আর বাঁদীটিকে প্রত্যাহার করার সুযোগ থাকবে না, তাতে সে ব্যক্তি প্রথম ক্রেতার কথা সত্য বলে স্বীকার করুক কিংবা মিথ্যা সাব্যস্ত করুক।

দি বলে, আমি এক ব্যক্তির কাছে বাঁদীটি বিক্রি করে দিয়েছি, কিন্তু তার নাম না বলে বিক্রেতা তার কথা অবিশ্বাস করে, তবে তার বাঁদীটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার থাকবে। প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর যদি কোন লোক উপস্থিত হয় এবং ক্রেতা তার প্রতি ইশারা করে বলে, আমি এর কথাই বলেছিলাম, তবে সেই লোক ক্রেতার কথা অস্বীকার করলে তো বিক্রেতার প্রত্যাহার কার্যকর হবেই, এমনকি সে লোক ক্রেতার কথা তাসদীক করলেও তার প্রত্যাহার বহাল থাকবে (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা : ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যদি মতভেদ দেখা দেয়, একজনের দাবি বিক্রি সহীহ হয়েছে এবং অন্য জনের দাবি হচ্ছে যে, বিক্রি ফাসিদ হয়েছে, তবে লক্ষ্য করতে হবে যে, যার দাবি বিক্রি ফাসিদ হয়েছে, সে কি কারণে ফাসিদ বলছে? যদি ফাসিদ শর্ত বা ফাসিদ মেয়াদের কারণে বিক্রি ফাসিদ হওয়ার দাবি করে, তবে যে ব্যক্তি বিক্রি সহীহ হওয়ার দাবি করছে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যার দাবি বিক্রি ফাসিদ হয়েছে, সে যদি সাক্ষী প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে সকল বর্ণনা অনুযায়ী তার সাক্ষ্য প্রমাণই গৃহীত হবে। আর সে যে কারণে ফাসিদ হওয়ার দাবি করছে তা যদি চুক্তি কেন্দ্রমূল (পণ্য ও মূল্য)-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়, যেমন তার দাবী হচ্ছে যে, সে এক হাজার দিরহাম ও এক রাতল মদের বিনিময়ে ক্রয় করেছে এবং অন্য জনের দাবী সে কেবল এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছে, তবে এ ক্ষেত্রেও যার দাবী বিক্রি সহীহ হয়েছে, তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ গৃহীত হবে অপর জনের ঠিক প্রথমোক্ত অবস্থার মতই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : স্থগিত বিক্রি ও দুই শরীকের এক শরীক কর্তৃক বিক্রির বিধি-বিধান

১. মাসআলা : কেউ উপযাচক হয়ে মাল বিক্রি করলে আমাদের মাযহাবে সে বিক্রি মালিকের অনুমোদনের উপর মওকুফ থাকবে। তার অনুমোদন বৈধ হওয়ার জন্য ক্রেতা-বিক্রেতা ও বিক্রিত মাল বহাল তবীয়তে থাকা শর্ত। বিনিময় মূল্য যদি মুদ্রা হলে তা বাকি থাকা শর্ত নয়, কিন্তু মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য হলে তাও বাকি থাকা শর্ত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা : যে ক্ষেত্রে বিনিময় মূল্য এমন কোন মাল হয়, যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং সে মূল্য বর্তমান থাকে, সে ক্ষেত্রে মালিকের অনুমোদন পাওয়া গেলে মূল্যের অধিকারী হবে বিক্রেতা, অনুমোদনদাতা নয়। অনুমোদনদাতা বিক্রেতার কাছ থেকে তার মূল্য আদায় করে নেবে যদি সে মালটা 'যাওয়াতুল কিয়াম' জাতীয় মাল অর্থাৎ এমন বস্তু হয়, যার পুরাপুরি অনুরূপ কোন বস্তু হয় না। আর যদি মিছলী বস্তু হয় অর্থাৎ যার অনুরূপ বস্তু পাওয়া যায়, তবে তার মিছল তথা অনুরূপ বস্তু আদায় করে নেবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : মালিকের অনুমোদনের আগে বা পরে বিক্রেতার হাতে বিনিময় মূল্য খোয়া গেলে তা আমানত বলে গণ্য হবে। ক্রেতার হাতে বিক্রিত মাল খোয়া গেলে মালিকের এ খতিয়ান, সে ক্রেতার কাছ থেকেও জরিমানা করতে পারবে, বিক্রেতার কাছ থেকেও। ক্রেতার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করলে ক্রেতা তা বিক্রেতার কাছ থেকে উসূল করে নেবে- যদি মূল্য নগদ পরিশোধ করে থাকে। আর যদি বিক্রেতার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে, তবে দেখতে হবে বিক্রিত মালটি তার কাছে কোন অবস্থায় ছিল। জামানাত (যার বদলা অপরিহার্য) অবস্থায় থাকলে বিক্রি কার্যকর হয়ে যাবে। আর যদি আমানাতরূপে থাকে, তবে আগে অর্পণ ও পরে বিক্রি করে থাকলে, তখনও বিক্রি কার্যকর হবে। আর যদি প্রথমে বিক্রি উপরে অর্পণ করে থাকে তবে বিক্রি কার্যকর হবে না। এ ক্ষেত্রে সে মালিককে প্রদত্ত জরিমানা ক্রেতার কাছ থেকে উসূল করে নেবে (মুহীত : আস-সারাক্ষী)।

৪. মাসআলা : মালিক মারা গেলে তার ওয়ারিসের অনুমোদনে বিক্রি কার্যকর হবে না। মালিক অনুমোদন করলে সে ক্ষেত্রে বিক্রির পর এবং অনুমোদনের আগে মালের ভেতর কিছু বৃদ্ধি ঘটলে ক্রেতা তা সহই মালের মালিক হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা : যদি অন্যের জন্য কিনে থাকে, তবুও সে বিক্রি ক্রেতার জন্যই কার্যকর হবে। অবশ্য ক্রেতা নাবালক বা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সাবালক হলে তখন বিক্রি স্থগিত থাকবে।

৬. মাসআলা : এই হুকুম তখনই হবে যখন তৃতীয় ব্যক্তি যার জন্য করা হচ্ছে তার সঙ্গে বিক্রিকে সম্পৃক্ত না করে, যদি তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বলে যে, এই গোলামটিকে অমুকের জন্য বিক্রি কর। আর বিক্রেতা বলে, আমি এটি তার জন্য বিক্রি করলাম, তবে সে বিক্রি স্থগিত থাকবে। তবে সঠিক মত এই যে, দুজনের যে কোনও একজন সেই ব্যক্তির সঙ্গে বিক্রিতে সম্পৃক্ত করলেই তা বিক্রি স্থগিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

৭. মাসআলা : 'আল-কারাবীসী' (র)-এর 'ফুরুক' গ্রন্থে আছে, যদি বলে, আমি এত দামে অমুকের জন্য কিনলাম আর বিক্রেতা বলে, তোমার কাছে বিক্রি করলাম, তবে বিশুদ্ধতর বর্ণনা অনুসারে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

৮. মাসআলা : বিক্রেতা যদি উপযাচকে বলে আমি তোমার কাছে এই জিনিসটি অমুকের জন্য বিক্রি করলাম আর সে বলে, আমি গ্রহণ করলাম বা আমি কিনলাম, কিংবা সেই জিনিসটি তোমার কাছ থেকে অমুকের জন্য কিনলাম আর বিক্রেতা বলে, আমি বিক্রি করলাম, তবে সে বিক্রি ক্রেতার জন্যই কার্যকর হবে এবং এটা কারও জন্য স্থগিত থাকবে না। আমি অন্য এক জায়গায় দেখছি, গোলামের মালিক যদি উপযাচদেরকে বলে, আমি তোমার কাছে এই গোলামটি এত দামে বিক্রি করলাম, আর উপযাচক বলে, আমি আমি অমুকের জন্য কবুল করলাম বা অমুকের জন্য কিনলাম অথবা উপযাচকই প্রথমে প্রথমে বলে, আমি তোমার কাছে এই গোলামটি অমুকের জন্য কিনলাম এবং বিক্রেতা বলে, আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম, তবে সঠিক কথা হচ্ছে যে, এ বিক্রি স্থগিত থাকবে। উপযাচকের পক্ষে কার্যকর হবে না (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : গোলামের মালিক নয় এমন একজনকে মালিকের উপস্থিতিতে কেউ বলল, আমি তোমার এই গোলামটি এক হাজার দিরহামে আমার নিজের জন্য কিনলাম, গোলামের মনিব বলল, আমি অনুমোদন করলাম এবং অর্পণ করলাম। এ বিক্রির হুকুম কী? ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মনিবের কথাকে তাৎক্ষণিক বিক্রয় সম্পাদন বলে ধরা হবে।

১০. মাসআলা : কেউ যদি অন্যের গোলাম তার অনুমতি ছাড়া বিক্রি করে, তারপর গোলামের মালিক বলে, তুমি ভাল করেছ বা তুমি ঠিক করেছ কিংবা তুমি উচিত কাজ করেছ তবে তার সে কথাকে বিক্রির অনুমোদন বলে গণ্য করা হবে না। সুতরাং তার সে বিক্রি প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে। কিন্তু সে যদি মূল্য গ্রহণ করে তবে সেটা অনুমোদন বলে গণ্য হবে। এমনভাবে সে যদি বলে, তুমি আমাকে বিক্রির ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছ বা তুমি ভাল করেছ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উত্তম বদলা দিন, তবে এটাও বিক্রির অনুমোদনরূপে গণ্য হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র) তুমি ভাল করেছ, ঠিক করেছ- এ জাতীয় কথাকে ইস্তিহসান অনুযায়ী বিক্রির অনুমোদনরূপে গণ্য করেছেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আর এটাই বিশুদ্ধতর মত (মুহীত : আস-সারাবী)।

১১. মাসআলা : কেউ যদি পুত্রের জমি বিক্রি করে এবং পুত্র বলে, আমি যতদিন জীবিত আছি বিক্রিতে রাখি অথবা যদি বলে, যাবত জীবিত আছি, বিক্রি অনুমোদন করলাম, তবে

সেটা অনুমোদনই বটে। যদি বলে, যতদিন জীবিত আছি আমার দখলে রাখব, তবে তাতে অনুমোদন হবে না (আল-কারদারী, আল-ওয়াজীয)।

১২. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, যদি বলে, তুমি খুবই খারাপ কাজ করেছ, তবে সেটা অনুমোদন বলে গণ্য হবে।

১৩. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বিশ্ব (র) বর্ণনা করেন, কেউ যদি অন্যের গোলাম তার অনুমতি ছাড়া বিক্রি করে এবং মালিকের কানে খবর পৌঁছলে সে বিক্রেতাকে বলে, আমি এর মূল্য তোমাকে উপহার দিলাম বা এর মূল্য তোমাকে সাদাকা করলাম, তবে সেটা অনুমোদন বলেই গণ্য হবে- যদি গোলাম বহাল ভবিষ্যতে থাকে (আয-যাহীরিয়া)।

১৪. মাসআলা : ফুযুলীর বিক্রয়ের খবর শুনে মালিকের চুপ থাকা অনুমোদন বলে গণ্য হবে না। বিক্রির খবর পৌঁছার পর দাম না জেনেই যদি অনুমোদন করে এবং তারপর দাম জেনে তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে তার অনুমোদনটাই গৃহীত হবে, প্রত্যাখ্যান নয়।

১৫. মাসআলা : ফুযুলী ব্যক্তি কিংবা যার কাছে আমানাত রাখা হয়েছে, সে যদি মালিকের অনুমতি ছাড়া মাল বিক্রি করে ফেলে, তারপর মালিক প্রমাণ পেশ করে যে, সে বিক্রি অনুমোদন করেছিল এবং তখন বিক্রিত মাল বর্তমান ছিল, তবে সে ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য হস্তগত করার অধিকার লাভ কবে না। হাঁ, সে যদি মূল্য কবজার ব্যাপারে সেই উপযাচকের উকীল হয়ে থাকে, তবে তার সে ইখতিয়ার লাভ হবে।

১৬. মাসআলা : কেউ যদি অন্যের গোলাম বিক্রি করে, তারপর সে গোলাম মারা যায়, তারপর মালিক দাবী করে যে, সে তাকে বিক্রির আদেশ করেছিল, তবে তার কথা মেনে নেওয়া হবে।

যদি বলে, আমার কাছে তার বিক্রির খবর পৌঁছলে আমি তা অনুমোদন করি, তবে সে কথা গৃহীত হবে না (ওয়াজীয : আল-কুদুরী)।

১৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি অন্যের গোলাম তার অনুমতি ছাড়া একশ' দিরহামে বিক্রি করল। তারপর ক্রেতা মালিককে জানাল যে, অমুক তোমার গোলাম এত দামে বিক্রি করেছে। মালিক বলল, তোমার কাছে একশ' দিরহামে বিক্রি করে থাকলে আমি অনুমোদন করলাম। এর হুকুম সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, সে যদি গোলামটি একশ' দিরহাম বা তার বেশী দামে বিক্রি করে থাকে, তবে তা জায়েয হবে। আর এর কমে বিক্রি করলে জায়েয হবে না। তদ্রূপ যদি একশ' দীনারে বিক্রি করে থাকলেও জায়েয হবে না। সে যেই মুদ্রার উল্লেখ করেছে সেই জাতীয় মুদ্রায় বিক্রি করলেই অনুমোদন কার্যকর হবে।

এমনিভাবে যদি বলে, তোমার কাছে একশ' দিরহামে বিক্রি করে থাকলে সেটা জায়েয, তবে তার হুকুমও উপরে বর্ণিত হুকুমের মত। যদি বলে, তোমার কাছে একশ' দিরহামে বিক্রি করলে অনুমোদন করব, তবে সেটা জায়েয হবে না। কেননা তা ক্যর্যত অনুমোদন নয়, বরং অনুমোদনের ওয়াদা। তারপর সে যদি এ দামে বিক্রি করে তবে মালিক চাইলে অনুমোদন করবে অথবা অনুমোদন নাও করতে পারে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা : কেউ যদি অন্যের কাপড় তার অনুমতি ছাড়া বিক্রি করে, তারপর ক্রেতা তাতে রং করে। এ অবস্থায় মালিকের বিক্রয় অনুমোদন করা জায়েয হবে। যদি কাপড়টি কেটে সেলাই করে ফেলে তাহলে অনুমোদন জায়েয হবে না। কেননা বিক্রিত মাল বিনাশ হয়ে গেছে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৯. মাসআলা : কেউ যদি উপযাচক হয়ে অন্যের জন্য কোন জিনিস কেনে, কিন্তু ক্রয়কে তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত না করে, যদ্বন্ধন সে ক্রয় তার নিজের জন্যই হয়ে গেছে, কিন্তু ক্রেতাও যার উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছে, উভয়ের ধারণা মালটা সেই ব্যক্তিরই, ফলে ক্রেতা যেই মূল্যে সেটি কিনেছে কবজার পর সেই মূল্যে তার কাছে তা হস্তান্তর করে এবং সেই ব্যক্তি (যার জন্য কেনা হয়েছে) তা কবুল করে, তারপর ক্রেতা যদি মালটি তার কাছ থেকে তার অসম্মতিতে ফেরত নিতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না। যদি তাদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়, যার জন্য কেনা হয়েছে বলে, আমি তোমাকে কিনতে আদেশ করেছিলাম আর ক্রেতা বলে, আমি তোমারই জন্য কিনেছিলাম, কিন্তু তোমার আদেশ ছাড়াই, তবে যার জন্য কেনা হয়েছে তার কথাই গ্রহণযোগ্য। কেননা ক্রেতা যখন বলল, আমি এটি তোমার জন্য কিনেছিলাম, তখন এর দ্বারা তার পক্ষ হতে তার আদেশ সম্পর্কেও স্বীকারোক্তি হয়ে গেল (আল-বাদায়ে)।

২০. মাসআলা : এক ব্যক্তি ফাসিদ পদ্ধতিতে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম কিনল এবং কবজাও করল। তারপর সেটি বিক্রেতার কাছে একশ' দীনারে বিক্রি করল। এখন বিক্রেতা যদি সেটি কবজা করে, তবে এর দ্বারা আগের ফাসিদ বিক্রি রহিত হয়ে যাবে। কবজা না করা পর্যন্ত রহিত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা : কেউ মালিকের অনুমতি ছাড়া এক হাজার দিরহামে গোলাম বিক্রি করল। আর ক্রেতা গোলামটি কবজা করল। এরপর আরেকজন অন্য একজনের কাছে এক হাজার দিরহামে মালিকের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করল দ্বিতীয় ক্রেতাও গোলামটি গ্রহণ করল। এ ক্ষেত্রে উভয় বিক্রি স্বগিত থাকবে। মালিক খবর পাওয়ার পর যদি উভয় বিক্রি অনুমোদন করে, তবে উভয় চুক্তি অর্ধাধর্ষি হয়ে যাবে এবং উভয় ক্রেতার ইখতিয়ার লাভ হবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা : এমনিভাবে উপযাচক ব্যক্তি একাই যদি দুইজনের কাছে বিক্রি করে, তখনও একই হুকুম। ইমাম কারখী (র) বলেন, হুকুম এক হবে সেই ক্ষেত্রে, যখন উপযাচক ব্যক্তি উভয়ের কাছে একই সঙ্গে বিক্রি করে। পক্ষান্তরে যদি একজনের কাছে আগে এবং অন্যজনের কাছে পরে বিক্রি করে, তবে দ্বিতীয় বিক্রি দ্বারা প্রথম বিক্রি রহিত হয়ে যাবে। আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে কারও কারও মতে দ্বিতীয়টি দ্বারা প্রথম বিক্রি রহিত হবে না এবং এ মতই সঠিক (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২৩. মাসআলা : ইবন সামাআ (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে উদ্ধৃত করেন যে, কেউ যদি অন্যের কাপড় তার অনুমতি ছাড়া নিজ পুত্রের কাছে বিক্রি করে, আর তার পুত্রটি নাবালক, অথচ ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হয় অথবা নিজ গোলামের কাছে

বিক্রি করে, যে গোলাম ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত এবং সে ঋণগ্রস্ত হতেও পারে, নাও হতে পারে, তারপর বিক্রেতা কাপড়ের মালিককে জানায় যে, সে তার কাপড়টি বিক্রি করে দিয়েছে কিন্তু যার কাছে বিক্রি করেছে তাকে ব্যাপারটি জানায় নি, তবে কেবল ঋণগ্রস্ত গোলামের ক্ষেত্রেই বিক্রি জায়েয হবে, অন্য দুই অবস্থায় জায়েয হবে না (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা : বিবাহ, ইজারা ও বন্ধক অপেক্ষা বিক্রি অগ্রাধিকার রাখে। কাজেই কেউ যদি উপযাচক হয়ে কারও বাঁদী বিক্রি করে দেয় এবং অন্য উপযাচক তাকে কারও কাছে বিবাহ দেয় অথবা ইজারা দেয় কিংবা বন্ধক রাখে, তারপর মনিব এক সঙ্গে উভয়ের অনুমোদন দেয়, তবে বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে, কিন্তু বিবাহ, ইজারা বা বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে।

২৫. মাসআলা : গোলামকে আযাদী দান, অর্থের বিনিময়ে তার সঙ্গে আযাদীর চুক্তি (কিতাবাত) ও মনিব কর্তৃক নিজ মৃত্যুর পর তার আযাদীর ঘোষণা (তাদবীর) এগুলো অন্যান্য চুক্তির উপর অগ্রাধিকার রাখে।

২৬. মাসআলা : রাহন (বন্ধক রাখা)-এর উপর হিবা ও ইজারার অগ্রাধিকার রয়েছে।

২৭. মাসআলা : ইজারার উপর হিবা অগ্রাধিকার রাখে। বাড়ির ক্ষেত্রে হিবা অপেক্ষা বিক্রি অগ্রাধিকার রাখে, কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে উভয়ই সমান (আল-কাফী)।

২৮. মাসআলা : যদি বলে, তোমার এই গোলামটি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমার জন্য এবং অমুকের জন্য কিনেছে, আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে গতকাল বুঝানো, আর মনীব বলে, আমি সম্মতি দিয়েছি, তবে কাছেই সে বিক্রি বৈধ হবে না।

যদি বলে, তোমার এই গোলামটি আমি গতকাল কিনেছি এর অর্ধেক পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে কিনেছি আমার জন্য এবং অর্ধেক পাঁচশ' টাকা বিনিময়ে অমুকের জন্য, তারপর মনীব বলে, আমি অনুমোদন করলাম, তবে অমুকের জন্য যে অর্ধেক কিনেছে তাতে বিক্রি কার্যকর হবে (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা : অনুমোদনের আগে ক্রেতা সে বিক্রি রহিত করার অধিকার রাখে। এমনিভাবে অনুমোদনের আগে সেই ব্যক্তিও তা রহিত করতে পারে, যার জন্য ক্রেতা কিনেছে (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)।

৩০. মাসআলা : বেচাকেনা বুঝে এমন নাবালকের উপর যদি নিষেধাজ্ঞা থাকে এবং তথাপি সে কোন কিছু বেচাকেনা করে তবে তা তার পিতা, ওয়াসী (ট্রাস্টি), দাদা বা কাযীর অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল থাকবে। এমনিভাবে বোধবুদ্ধিহীন সাবালক বা নিষেধাজ্ঞা জারি আছে এমন শিশু যদি নির্বোধরূপে সাবালকত্ব লাভ করে, তবে এদের বেচাকেনাও ওয়াসী বা কাযীর অনুমোদনের জন্য স্বগিত থাকবে।

৩১. মাসআলা : নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলাম যদি মনিবের কোন মাল বিক্রি করে বা তাকে হিবা করা হয়েছে এমন কোন মাল বিক্রি করে অথবা কোন কিছু কেনে, তবে তা মনিবের অনুমোদনের উপর মওকুফ থাকবে।

৭৩৬

৩১. মাসআলা : কেউ যদি তার ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত ও ঋণগ্রস্ত গোলামকে সে গোলামের পাওনাদের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করে, তবে পাওনাদের অনুমতির উপর সে বিক্রি মওকুফ থাকবে। মনিব ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামকে পাওনাদারদের অনুমিত ছাড়া বিক্রি করে এবং মূল্য কবজা করে, তারপর সে মূল্য নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তারপর পাওনাদারগণ বিক্রি অনুমোদন করে, তবে সে বিক্রি সহীহ হয়ে যাবে। আর যে মূল্যটা নিঃশেষ হয়ে গেল তা পাওনাদারদের পক্ষ হতেই যাবে। যদি কতিপয়ে বিক্রি অনুমোদন এবং কতিপয়ে প্রত্যাখ্যান করে আর তা করে গোলাম ও ক্রেতার উপস্থিতিতে, তবে অনুমোদন কার্যকর হবে না। বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।

৩২. মাসআলা : এটাও মওকুফ বিক্রির অন্তর্ভুক্ত যে, কোন অসুস্থ ব্যক্তি তার মূর্খ অবস্থায় তার সুনির্দিষ্ট কোন সম্পদ বিশেষ কোন ওয়ারিসের কাছে বিক্রি করল। সে ব্যক্তি যদি রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠে তবে বিক্রি কার্যকর হবে আর যদি সেই রোগেই মারা যায় এবং অন্যান্য ওয়ারিসগণ অনুমোদন না করে তবে সে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।

৩৩. মাসআলা : এমনিভাবে এটাও মওকুফ বিক্রি যে, কোন মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগী) কোন কিছু বেচাকেনা করল। সে যদি মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় অথবা এমনিতেই মারা যায় অথবা কাফির রাষ্ট্রে চলে যায় তবে তার বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ইসলামে ফিরে আসে তবে বিক্রি কার্যকর হবে।

৩৪. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে বর্গাচাষে জমি অর্পণ করে যে, চাষের বীজ চাষীকেই দিতে হবে, তারপর সে জমি কারও কাছে বিক্রি করে দেয়, তবে বর্গাচাষী সে জমি চাষ করুক বা নাই করুক উভয় অবস্থায় বিক্রি স্থগিত থাকবে। বর্গাচাষী অনুমোদন করলে তা কার্যকর হবে অন্যথায় নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৫. মাসআলা : বিক্রেতা একজনের কাছে কাপড় বিক্রি করার পর অন্য জনের কাছে আরো দশ দিরহাম বেশী দামে বিক্রি করল। তারপর ক্রেতা সে বিক্রি অনুমোদন করে, তবে সে অনুমোদন বৈধ হবে না (আল-হাবী)।

৩৬. মাসআলা : দাসীর দুই শরীকের একজন অপরজনের অনুমতি ছাড়া তাকে বিক্রি করল, তারপর ক্রেতা তাকে কবজা করত আযাদ করল। তারপর অপর শরীক বিক্রি অনুমোদন করে, তবে তার অংশে সে অনুমোদন বৈধ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৭. মাসআলা : ইব্ন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, দুই শরীকের এক শরীক যদি অবিভক্ত বাড়ির অর্ধেক বিক্রি করে ফেলে, তবে সে বিক্রি তার নিজের অংশেই কার্যকর হবে। তৃতীয় কোন ব্যক্তি যদি উপযাচক হয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যকার শরীকানা বাড়ির অর্ধেক বিক্রি করে, তবে তাদের উভয় শরীকের অংশেই প্রযোজ্য হবে। সুতরাং তাদের একজন অনুমোদন করলে সে বিক্রি তার অংশ হতে অর্ধেক কার্যকর হবে। এটা হচ্ছে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। ইমাম মুহাম্মাদ ও যুফার (র)-এর মতে বাড়ির এক-চতুর্থাংশ বিক্রি কার্যকর হবে (আল-মুহীত)।

৩৮. মাসআলা : গজের স্তূপের দুই শরীকদারের একজন সে স্তূপ থেকে এক কাফীয বিক্রি করে ক্রেতাকে মেপে বুঝিয়ে দিল। এ ক্ষেত্রে অপর শরীকদার বিক্রয় অনুমোদন না করলেও বিক্রয় বৈধ হবে। বিক্রি মূল্যের সবটাই পাবে বিক্রেতা। যদি এক শরীক বিক্রি করে এবং অপর শরীক তা অনুমোদন করে, তারপর তা ক্রেতাকে মেপে দেয় এবং তারপর স্তূপের অবশিষ্ট খাদ্যশস্য হারিয়ে যায় তবে বিক্রেতার কাছে অপর শরীকের আধা কাফীয পাওনা হয়ে যাবে। ক্রেতার কাছে তার কোন দাবী-দাওয়া চলবে না। আর শরীক অনুমোদন করার আগেই যদি অবশিষ্ট খাদ্যশস্য হারিয়ে যায় তবে ক্রেতার কাছ থেকেই সে বিক্রিত শস্যের অর্ধেক ফেরত দাবী করতে পারবে। দুই শরীকের একজন যদি শরীকানা স্তূপ থেকে এক কাফীয খাদ্য পৃথক করে রাখে এবং তারপর সে তা বিক্রি করে, তারপর শরীক তার বিক্রি অনুমোদন করে, তবে বিক্রি মূল্য তারা অর্ধেক-অর্ধেক পাবে। শরীক যদি বিক্রি অনুমোদন না করে এবং ক্রেতার কাছ থেকে বিক্রিত খাদ্যের অর্ধেক ফেরত আনে, তারপর ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছ থেকে পূর্ণ এক কাফীয বুঝে নিতে চায়, তবে সে ইখতিয়ার তার থাকবে না। তবে তার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, সে ক্রেতার কাছ থেকে অর্ধেক দাম ফেরত নেবে অথবা ক্রয় প্রত্যাহার করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৯. মাসআলা : একটি আবাসিক এলাকার দুইজন শরীক। তাদের এক শরীক যদি তা থেকে কয়েকটি বাড়ি বিক্রি করে অথবা দুই-তিনটি প্লট বিক্রি করে তবে অর্ধেকের ভেতর তা জায়েয। যদি আধা প্লট বিক্রি করে, তবে জায়েয হবে না এমনিভাবে যদি একটি কক্ষ বিক্রি করে, তাও জায়েয হবে না।

এমনিভাবে শরীকানা জমির মধ্যে এক শরীক যদি একটি রাস্তা বিক্রি করে ফেলে, তবে অপর শরীকের সম্মতি ছাড়া তা জায়েয হবে না। যদি একটি বাড়ির একটি ঘর বিক্রি করে এবং তারপর বাকি ঘরগুলোও বিক্রি করে, তবে তা অর্ধেকের ভেতর জায়েয। যদি অন্যের জমি হতে অর্ধেক ঘর বিক্রি করে তবে সে বিক্রি জায়েয নয় (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা : গম বা কোন ওজনী দ্রব্য দুজন শরীক থাকে এবং সেখান থেকে এক শরীক তার অংশ অপর শরীক বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে, তবে সে ক্ষেত্রে আমাদের রায় এই যে, সে মালে তাদের অংশীদারিত্ব যদি উভয়ের নিজ নিজ মাল ইচ্ছাকৃতভাবে মেলানোর কারণে হয়ে থাকে, অথবা তাদের ইচ্ছার বাইরে তা এমনিই মিলে নিয়ে থাকে, তবে এক শরীকের কাছে অপর শরীকের অংশ বিক্রি জায়েয হবে। তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে শরীকের অনুমতি ছাড়া বিক্রি জায়েয হবে না। অংশীদারিত্ব যদি উত্তরাধিকার, ক্রয় বা হিবার কারণে হয়, তবে অপর শরীকের কাছেও নিজ অংশ বিক্রি জায়েয এবং শরীকের অনুমতিক্রমে তৃতীয় ব্যক্তির কাছেও জায়েয।^১ কিন্তু শরীকের অংশে তার কোনরূপ হস্তক্ষেপ জায়েয নয় (আল-ফাতাওয়াস-সুগরা)।

১. এ স্থলে যদিও শরীকের অনুমতির শর্তারোপ করা হয়েছে, কিন্তু উপরের মাসআলার সঙ্গে তুলনা করলে বুঝা যায়, শরীকের অনুমতি ছাড়াও তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বিক্রি বৈধ হবে।

৪১. মাসআলা : 'আন-নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি তার শরীকের অনুমতি ছাড়া বনের জমি ব্যতীত শুধু গাছ বিক্রি করে এবং সে গাছ কাটার মত উপযুক্ত হয়ে ওঠে, তবে সে বিক্রি জায়েয। আর কাটার উপযুক্ত না হলে বিক্রি ফাসিদ।

৪২. মাসআলা : 'আল-ওয়াকিআত' গ্রন্থে আছে, দুই শরীকের একটি খেজুর বাগান আছে এবং তাতে ফলও আছে। কিংবা দুই শরীকের এক খণ্ড জমি আছে এবং তাতে ফসল রয়েছে। এখন এক শরীক কর্তৃক তা বিক্রি জায়েয কি না। আল-জামিউস-সাগীর গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। মূলনীতি অনুযায়ী জায়েযই হওয়া উচিত (আল-মুহীত)।

৪৩. মাসআলা : কেউ যদি অন্যকে বলে, আমি এই মূল্যে তোমার কাছে আমার এই বাড়ির অংশ বিক্রি করলাম, আর সে বাড়িতে তার অংশ কতটুকু তা ক্রেতার জানা আছে বটে, কিন্তু বিক্রেতার জানা নেই, তবে সে বিক্রি এই শর্তে জায়েয যে, ক্রেতা তার অংশ যতটুকু বলবে বিক্রেতা তা তাসদীক করবে। যদি ক্রেতার জানা না থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে বিক্রি জায়েয হবে না, তাতে বিক্রেতা জ্ঞাত থাকুক বা নাই থাকুক। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে বিক্রেতার তা জানা থাকলেও বিক্রি জায়েয এবং জানা থাকলেও (আল-ফাতাওয়াস-সুগরা)।

৪৪. মাসআলা : যদি দুই ব্যক্তির শরীকানায় কিছু কাপড় কিংবা ছাগলের পাল অর্থাৎ বিভাজনযোগ্য কোন মাল থাকে, আর তা থেকে এক শরীক তার অংশের ছাগল বা কাপড় বিক্রি করে ফেলে, তবে তা জায়েয। এ ক্ষেত্রে অপর শরীকের সে বিক্রি বাতিল করবার অধিকার থাকবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে এরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু হাসান ইবন যিয়াদের বর্ণনা অনুযায়ী অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া এ বিক্রি জায়েয নয়। ইমাম তাহাবী (র) এ বর্ণনাই অবলম্বন করেছেন (আল-মুহীত)।

৪৫. মাসআলা : একটি কুয়া এবং এক খণ্ড জমিতে দুই ব্যক্তি শরীক। এখন এক শরীক যদি তার কুয়ার অংশ জমিতে তার যে রাস্তা আছে তা সহ বিক্রি করে, তবে কুয়ার ক্ষেত্রে বিক্রি জায়েয হবে বটে, কিন্তু রাস্তার ক্ষেত্রে জায়েয হবে না, এ মতই সহীহ। রাস্তার ক্ষেত্রে শরীকের অনুমতির উপর বিক্রি স্থগিত থাকবে। সে অনুমতি দিলে সবটাই বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে। যদি অর্ধেক রাস্তা ছাড়া বিক্রি করে, তবে তাও জায়েয হবে (মুহীত : আস-সারাহসী)।

৪৬. মাসআলা : অর্ধেক জমিসহ যদি অর্ধেক ঘর বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে, তাতে তা শরীকের কাছে বিক্রি করুক বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে। যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা শরীকের কাছে জমি ছাড়া কেবল ঘরের অর্ধেক বিক্রি করে তবে তা জায়েয নয়। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এ বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন ঘরটি ন্যায্যভাবে তোলা হয়। অন্যায়ভাবে তোলা হলে তার অর্ধেক যেমন শরীকের কাছে, তেমনি তৃতীয় ব্যক্তির কাছেও বিক্রি জায়েয (আল-মুহীত)।

৪৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি অন্যের গোলাম বিক্রি করল। পরে ক্রেতা গোলামটি ফেরত দেয়ার জন্য বলল, তুমি তো এটি মালিকের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করেছো, কিন্তু বিক্রেতা বলল

যে, মালিকের অনুমতিক্রমেই বিক্রি করেছি। তখন ক্রেতা মালিকের অনুমতি না দেয়ার স্বীকারোক্তির পক্ষে প্রমাণ পেশ করল কিংবা ক্রেতা-বিক্রেতার এরূপ স্বীকারোক্তির পক্ষে প্রমাণ পেশ করল। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার প্রমাণ গ্রহণ করা হবে না।

বিক্রেতা যদি কাযীর কাছে স্বীকার করে যে, মালিক এ গোলাম বিক্রির অনুমতি দেয় নি, তবে ক্রেতার দাবী সাপেক্ষে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। যদি গোলামের মালিক কাযীর কাছে বিক্রির অনুমতি প্রদানের কথা অস্বীকার করে এবং তারপর সে অজ্ঞাত স্থানে চলে যায়। ওদিকে ক্রেতা সে বিক্রি রহিতকরণের দাবী করে, তবে কাযী বিক্রি রহিত করবে। ক্রেতা যদি রহিতকরণের বিষয়টাকে এই উদ্দেশ্যে বিলম্বিত করার দাবী জানায় যে, মালিক যাতে কসম করে বলে, সে এ বিক্রির অনুমতি দেয় নি, তবে তা বিলম্বিত করা হবে না। মালিক যদি উপস্থিত হয়ে কসম করে তবে সে গোলাম ফিরে পাবে, আর কসম করতে অস্বীকার করলে বিক্রি বলবৎ করা হবে। মালিক উপস্থিত হয়ে যদি কাযীর কাছে অনুমতি দেওয়ার কথা অস্বীকার করে, কিন্তু ক্রেতা অনুপস্থিত থাকে, তবে মালিক গোলামের দখল পাবে না। বিক্রেতার এ অধিকার আছে যে, সে গোলামের মালিকের কাছ থেকে এই মর্মে কসম নিবে যে, আল্লাহর কসম করে বল, তুমি আমাকে এ গোলাম বিক্রির অনুমতি দাও নি। সে কসম করতে অস্বীকার করলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে, অনুমতি দিয়েছিল। আর যদি কসম করে, তবে বিক্রেতার উপর জরিমানা আরোপ করা হবে এবং বিক্রি কার্যকর হয়ে যাবে। গোলামের মালিক যদি উপস্থিত হওয়ার আগেই মারা যায় এবং গোলামের বিক্রেতা তার ওয়ারিস হয় এবং সে মৃত ব্যক্তির অনুমতি থাকার কথা অস্বীকার করে, এমনকি সে সম্পর্কে প্রমাণও পেশ করে, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে না। যদি তার মৃত্যুর পর এই মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে, তার ক্রেতা অনুমতি না থাকার কথা অস্বীকার করেছিল, তবে সে প্রমাণ গৃহীত হবে। বিক্রেতা মৃত ব্যক্তির যদি আরো কোন ওয়ারিস থাকে; আর সে দাবী করে যে, মৃত ব্যক্তি অনুমতির কথা অস্বীকার করেছে, তবে সে দাবী শ্রবণযোগ্য হবে। এ ক্ষেত্রে এই অধিকার থাকবে যে, সে তাকে এই মর্মে শপথ করতে বলবে যে, তুমি আল্লাহর নামে বল- মৃত মালিক তাকে বিক্রির আদেশ দেয় নি বলে তোমার জানা নেই। সে এ মর্মে শপথ করতে অস্বীকার করলে 'আদেশ' প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর যদি শপথ করে, তবে গোলামের অর্ধেক সে পেয়ে যাবে। তখন ক্রেতা সেই অর্ধেকের মূল্য বিক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নেবে। আর বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে তার রাখা না রাখার ইখতিয়ার থাকবে। এ হুকুম সেই ক্ষেত্রে, যখন ক্রেতা স্বীকার করবে যে, আদেশদাতা গোলামটির মালিক ছিল। সে যদি তা অস্বীকার করে তবে আদেশদাতার কথা বৃথা যাবে যাবত না সে প্রমাণ দ্বারা স্বীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে (আল-কাফী)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : ইকাল (ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিক্রি রহিতকরণ) প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, 'ইকাল' (অর্থাৎ বিক্রেতা ও ক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিক্রি রহিত করা) ক্রেতা-বিক্রেতার পক্ষে 'বিক্রি রহিতকরণ' এবং অন্যদের পক্ষে নতুন বেচাকেনা। তবে ইকালকে যদি বিক্রি রহিতকরণ হিসেবে দেখা সম্ভব না হয়, যেমন বিক্রিত বাঁদী সন্তান প্রসব করলে তা সম্ভব হয় না, তখন ইকাল বাতিল হয়ে যাবে (আল-কাফী)।

২. মাসআলা : এক হাজার দিরহামে বিক্রি করা দাসীর ইকাল এক হাজার দিরহামে করলে সহীহ হবে। এক হাজার পাঁচশ' দিরহামে ইকাল করলে এক হাজার দিরহামেই ইকাল হবে এবং পাঁচশ' দিরহামের উল্লেখ বৃথা যাবে। যদি পাঁচ দিরহামে ইকাল করে এবং বিক্রিত মাল ক্রেতার হাতে অক্ষত ও দোষমুক্ত অবস্থায় থাকে তবে এক হাজার দিরহামে ইকাল সংঘটিত হবে এবং পাঁচশ' দিরহামের উল্লেখ অর্থহীন সাব্যস্ত হবে। সুতরাং বিক্রেতার কর্তব্য ক্রেতাকে এক হাজার দিরহাম ফিরিয়ে দেওয়া। আর যদি বিক্রিত মালে দোষ-ত্রুটি দেখা দেয় তবে পাঁচ দিরহামেই ইকাল হয়ে যাবে আর বাকি পাঁচশ' দিরহাম দোষ-ত্রুটির কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তার বদলে কাটা যাবে।

যে মূল্যে বিক্রি হয়েছে, ইকাল যদি তার বদলে না হয়ে অন্য জাতীয় বস্তুর বদলে হয়, তবে সাধারণভাবে সব কিতাবেই বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে প্রথম মূল্যেই ইকাল সংঘটিত হবে এবং অন্য জাতীয় বস্তুর উল্লেখ বৃথা যাবে।

বিক্রিত পণ্যের ভেতর যদি বৃদ্ধি ঘটে এবং তারপর ক্রেতা-বিক্রেতা তাতে ইকাল করে, তবে কবজার আগে হলে সে ইকাল সহীহ হবে, তাতে সে বৃদ্ধিটা পণ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকুক বা তার থেকে আলাদা। আর কবজার পরে হলে বৃদ্ধিটা পৃথক হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ইকাল বাতিল হয়ে যাবে। আর মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহীহ হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : ক্রেতা যদি বলে, আমার সঙ্গে বিক্রি রহিত (ইকাল) করে ফেল, আমি মূল্য ফেরতের ব্যাপারে তোমাকে এক বছরের সুযোগ দেব বা মূল্য থেকে পাঁচশ' টাকা ছেড়ে দেব, তবে ইকাল সহীহ হয়ে যাবে, কিন্তু এক বছরের মেয়াদ এবং পাঁচ টাকার ছাড় জায়েয হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তাও জায়েয।

৪. মাসআলা : এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে 'ইকাল' এমন দুইটি শব্দ সংঘটিত হয়, যার একটি অতীতবাচক এবং অপরটি ভবিষ্যতবাচক, যেমন একজন বলল, 'আমার সঙ্গে বিক্রি রহিত কর' (أفلى) অপরজন বলল, 'রহিত করলাম'

(أفلى)। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উভয় ক্রিয়া অতীতবাচক হবে। অন্যথায় ইকাল সহীহ হবে না, ঠিক বেচাকেনার মত। 'আল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতই গ্রহণ করা হয়েছে (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)।

৫. মাসআলা : কেউ কোন জিনিস বিক্রি করার পর যদি ক্রেতাকে বলে, আমার সঙ্গে বিক্রি ইকাল কর আর সে বলে, আমি তোমার সঙ্গে ইকাল করলাম, তবে যাহিরী রিওয়াযাত অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে ইকাল সহীহ হবে না, যাবত না এরপর বিক্রেতা বলবে, 'আমি গ্রহণ করলাম' (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা : যদি ক্রেতা বলে, আমি বেচাকেনা ত্যাগ করলাম এবং বিক্রেতা বলে, আমি সম্মতি দিলাম বা আমি অনুমোদন করলাম, তবে তাতে ইকাল হয়ে যাবে (আল-খুলাসা)।

৭. মাসআলা : 'আমার বিক্রি আমাকে ফিরিয়ে দাও' -এ কথার জবাবে যদি বলে, ফিরিয়ে দিলাম, তবে এতে ইকাল হবে না, যাবত না বলবে কবুল করলাম। এ মত অনুসারেই ফাতওয়া (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)।

৮. মাসআলা : বিক্রেতা যদি ক্রেতার কাছে ইকাল দাবী করে আর ক্রেতা বলে, মূল্য ফেরত দাও এবং বিক্রেতা তা কবুল করে নেয়, তবে সেটা বিক্রেতার এই কথারই মত যে, 'আমার সঙ্গে ইকাল কর' (আল-খুলাসা)।

৯. মাসআলা : নির্দিষ্ট দামের উল্লেখ ছাড়াই যদি কেউ কাউকে তার মাল বিক্রির আদেশ দেয়, সে মতে দালাল তা বিক্রির পর বিক্রেতার কাছে দাম নিয়ে আসে, কিন্তু বিক্রেতা বলে যে, আমি এ দামে দেব না, তারপর দালাল গিয়ে ক্রেতাকে সে কথা জানায় এবং তা শুনে ক্রেতা বলে, আমারও নেওয়ার ইচ্ছা নেই, তবে এতে বিক্রি রহিত হয় না (আল-কিনয়া)।

১০. মাসআলা : মুখে কিছু না বলে কার্যত লেনদেন দ্বারাও বিক্রি হয়ে যায়, এমন কি তা এক পক্ষ হতে হলেও বৈধ হয় আর এটাই সহীহ (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

১১. মাসআলা : ক্রেতা খাদ্যদ্রব্য কবজা করল এবং মূল্যের কয়দাংশ পরিশোধ করল। কিছুদিন পর বলল, দামটা খুব বেশী। ফলে বিক্রেতা তার কবজাকৃত মূল্য থেকে কিছু ফেরত দিল। এখন যার মতে এক পক্ষের গ্রহণ/প্রদান (এবং অপর পক্ষের উক্তি) দ্বারাও বিক্রি সহীহ হয়, তার মতে এ ক্ষেত্রে ইকাল হয়ে যাবে আর এটাই সঠিক (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী)।

১২. মাসআলা : কেউ রেশম কিনে কবজা করল, তারপর বিক্রেতাকে বলল, এর দ্বারা আমার কাজ চলবে না। কাজেই তুমি তোমার রেশম নিয়ে যাও এবং আমার টাকা ফেরত দাও। কিন্তু বিক্রেতা তাতে রাযী হল না। শেষে ক্রেতা বলল, আমি দাম থেকে এত টাকা ছেড়ে দিলাম। বাকিটা আমাকে ফেরত দাও। বিক্রেতা যদি তা করে তবে তা ইকাল হবে নতুন বেচাকেনা নয়।

১৩. মাসআলা : বিক্রেতা যদি ক্রেতার কাছে বিক্রি রহিত করার দাবী জানায় এবং উত্তরে ক্রেতা বলে, আমার টাকা ফেরত দাও, ফলে বিক্রেতা তাকে চেক লিখে দেয় এবং ক্রেতাও তা গ্রহণ করত পণ্য প্রত্যর্পণ করে, তবে এর দ্বারা বিক্রি রহিত হয়ে যাবে (আল-কিনয়া)।

১৪. মাসআলা : কেউ যদি কারও কাছে একটি কাপড় বিক্রি করে, তারপর ক্রেতা তাকে বলে, আমি এ কাপড়ে তোমার সঙ্গে রহিত করলাম। সুতরাং তুমি এটা কেটে জামা বানাও। সে মতে বিক্রেতা সেটা কেটে জামা বানায়, তারপর তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আর কোন কথা না বলে, তবে এর দ্বারা বিক্রি রহিত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৫. মাসআলা : ইকালার সহীহ হওয়ার জন্য একই মজলিসে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতি এবং সারফ জাতীয় বেচাকেনা হলে সে ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দখল বিনিময় হওয়া শর্ত। তদ্রূপ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রিত মালটা এমন হওয়াও শর্ত, রহিতকরণের সব রকমের উপায় যাতে প্রয়োগ করা যায়, যেমন ইখতিয়ারের শর্ত থাকলে তার ভিত্তিতে ফেরত দেওয়া যায় এবং দেখার ইখতিয়ার কিংবা দোষের কারণে ফেরত দেওয়ার সুযোগ থাকে। যদি বিক্রিত মালে রহিতকরণের এসব উপায় অবলম্বনের সুযোগ না থাকে, যেমন বিক্রিত মালে এমন কিছু বৃদ্ধি ঘটা যদ্বারা রহিতকরণ ব্যাহত হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ইকালার সহীহ হবে না।

তদ্রূপ ইকালার সময় বিক্রিত মাল বিদ্যমান থাকাও ইকালার সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। সুতরাং মাল নষ্ট হয়ে গেলে ইকালার বৈধ হবে না। অবশ্য ইকালাকালে বিক্রয় মূল্য বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়।

১৬. মাসআলা : কোন সুনির্দিষ্ট বস্তু যদি অনির্দিষ্ট বস্তুর বদলে বেচাকেনা করে, যেমন দিরহাম বা দীনারের বদলে বিক্রি, তাতে দিরহাম ও দীনার নির্দিষ্ট করুক বা নাই করুক (সর্বাবস্থায় এগুলো অনির্দিষ্ট থাকে) অথবা এমন পয়সা কিংবা কায়লী, ওজনী বা গুণতি দ্রব্যের বদলে বিক্রি, যার গুণ ও পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সত্তা নির্দিষ্ট করা হয় নি, যদ্বারা তা যিম্মায় ওয়াজিব হয় [এবং সেই গুণ ও পরিমাণের যে কোন একটা আদায় করলেই চলে], তাে এরূপ বেচাকেনার পর ইকালার বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো সুনির্দিষ্ট বস্তুটি সংরক্ষিত থাকা। বিক্রয় মূল্য বাকি থাকুক বা না থাকুক। সুনির্দিষ্ট বস্তুটি নিঃশেষ হওয়ার পর ইকালার করা হবে না। তদ্রূপ যদি তা ইকালার সময় বিদ্যমান থাকে, কিন্তু বিক্রেতার হাতে প্রত্যর্পণ করার আগে হারিয়ে যায়, তবু ইকালার বাতিল হয়ে যাবে। তদ্রূপ বিক্রিত পণ্য যদি হয় দুটি গোলাম এবং ক্রেতা-বিক্রেতা আপন-আপন মাল কবজা করে নেয়, তারপর গোলাম দুটি ক্রেতার হস্তচ্যুত হয় এবং তারপর ইকালার করে, তবে সে ইকালারও বৈধ নয়। এমনভাবে যদি ইকালার সময় গোলাম ক্রেতার হাতে থাকে এবং অন্যটি না থাকে আর এ অবস্থায় বিদ্যমান গোলামটি ইকালার করা হয়, কিন্তু ক্রেতার হাতে প্রত্যর্পণের আগে সেটিও খোয়া যায়, তবে ইকালার বাতিল হয়ে যাবে।

১৭. মাসআলা : যদি সুনির্দিষ্ট বস্তুর বদলে সুনির্দিষ্ট বস্তু বেচাকেনা করে এবং উভয়ের মধ্যে কবজা হয়ে যায়, তারপর তার একটি ক্রেতার হাতে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তারপর তারা ইকালার করে, তবে সে ইকালার সহীহ হবে। এ ক্ষেত্রে যার হাতের মাল নিঃশেষ হয়ে গেছে, তার কর্তব্য সে মালের অনুরূপ মাল না থাকলে তার মূল্য পরিশোধ করা আর অনুরূপ মাল থাকলে সেই রকম মাল পরিশোধ করা। সুতরাং সে প্রতিপক্ষের হাতে তা সমর্পণ করত তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট বস্তুটি ফেরত আনবে। উভয়ের কাছে সুনির্দিষ্ট মাল বিদ্যমান থাকা

অবস্থায় ইকালার করার পর তা প্রত্যর্পণ করার আগে যদি একজনের হাতের মাল খোয়া যায় তবে ইকালার বাতিল হবে না (আল-বাদায়ে)।

১৮. মাসআলা : যদি ইকালার পর প্রত্যর্পণের আগে উভয় দিকের মালই খোয়া যায়, তবে ইকালার বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা : খরিদা আস্রুরের বাস্তব কবজা করার পর ক্রেতা এক বছর তার ফল ভোগ করল। এখন যদি তারা ইকালার করে, তবে তা বৈধ হবে না। তদ্রূপ বিক্রিত মালে বৃদ্ধি ঘটলে তা মালের সঙ্গে যুক্ত হোক বা পৃথক, তা খোয়া গেলে কিংবা তৃতীয় কোন ব্যক্তি নষ্ট করে ফেললে ইকালার সহীহ হবে না (আল-খুল্লা)।

২০. মাসআলা : যদি গোলামের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্যে 'সালাম' জাতীয় বেচাকেনা করে (অর্থাৎ বিনিময় মূল্য নগদ ও মাল বাকি হয়), তারপর খাদ্যদ্রব্য কবজা করে, ওদিকে গোলামের মৃত্যু হয়ে যায় এবং তারপর বিক্রেতা ও ক্রেতা 'ইকালার' করে, তবে সে ইকালার সহীহ হবে। গোলাম যার কবজায় ছিল, তার কর্তব্য গোলামের মূল্য পরিশোধ করা (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২১. মাসআলা : যদি কেউ রূপার খুব অলংকার দ্বারা গোলাম কেনে, তারপর উভয় পক্ষ আপন-আপন পাওনা কবজা করে, তারপর ক্রেতার হাতে গোলাম খোয়া যায় এবং এ অবস্থায় তারা বিক্রি ইকালার করে আর ক্রেতার হাতে রূপা সংরক্ষিত থাকে, তবে সে ইকালার সহীহ হবে। বিক্রেতার কর্তব্য ক্রেতার হাতে রূপা ফেরত দেওয়া এবং ক্রেতার কাছ থেকে গোলামের মূল্য আদায় করে আনা, কিন্তু সেটা রূপার হতে হবে, সোনার নয়। যদি ইকালার সময় গোলাম বর্তমান থাকে, কিন্তু বিক্রেতার হাতে প্রত্যর্পণ করার আগে খোয়া যায়, তখন বিক্রেতার কর্তব্য রূপা ফিরিয়ে দেওয়া এবং ক্রেতার কাছ থেকে গোলামের মূল্য হস্তগত করা, তা চাইলে সোনারও হতে পারে, যেমন হতে পারে (আল-বাদায়ে)।

২২. মাসআলা : ভেজা সাবান ক্রয় কবজা করার পর ওকিয়ে যাওয়ার কারণে ওজনও কমে গেল। এখন যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা বিক্রি রহিত করতে চায় তবে তা জায়েয হবে। ওজন কমে যাওয়ার কারণে ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

২৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি গোশত, মাছ বা এ জাতীয় এমন কোন বস্তু কিনল, যা দ্রুত পঁচে যায়, তারপর সে তার মূল্য আনার জন্য ক্ষতিতে চলে গেল। তার ফিরে আসতেই এতটাই দেরী হয়ে গেল যে, বিক্রেতার আশংকা হল পঁচে যাবে। এখন সে যদি তা অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়, তবে ইস্তিহসান অনুসারে স্বীকৃত হবে। দ্বিতীয় ক্রেতার জন্যও তা বিক্রেতার কাছ থেকে কেনার অবকাশ আছে। এবার লক্ষ্য করতে হবে দ্বিতীয় বারের দামটা প্রথম বিক্রি অপেক্ষা বেশী কিনা। বেশী হলে অতিরিক্তটা সম্বল করে দিতে হবে। আর যদি কম হয় তবে সেটা বিক্রেতার পক্ষ হতেই যাবে। প্রথম ক্রেতা পক্ষ হতে নয় (ফাতাওয়ায়ে-কাযীখান)।

২৪. মাসআলা : যদি এক ব্যক্তি একটি গাধা কিনল এবং সেটি কবজা করল। চার দিন পর সে গাধাটি নিয়ে আসল এবং বিক্রেতার কাছে ফেরত দিল। বিক্রেতা মুখে সেটি কবুল করল না, কিন্তু

সে গাধাটি কিছুদিন ব্যবহার করল। এখন যদি সে মূল্য ফেরত দিতে ও ইকাল কবুল করতে অস্বীকার করে সে অধিকার তার আছে কি? হাঁ, সে অধিকার তার আছে (আয-যাহীরিয়া)।

২৫. মাসআলা : ক্রেতা যদি দাসীর ক্রয়ের কথা অস্বীকার করে, তবে বিক্রেতার পক্ষে তার সঙ্গে সঙ্গম বৈধ হবে না, যতক্ষণ না সে বিবাহ প্রত্যাহার করে নেয়, কেননা ক্রেতার অস্বীকৃতির কারণে বিক্রি রহিত হয় না। বিক্রেতা দাবী প্রত্যাহার করলে বিক্রয় রহিত হবে এবং দাসীর সঙ্গে তার সঙ্গম বৈধ হবে।

এমনিভাবে যদি বাঁদী বিক্রি করে, তারপর বিক্রি অস্বীকার করে এবং ক্রেতা ক্রয়ের দাবী করে। সে ক্ষেত্রেও বিক্রেতার জন্য সে বাঁদীর সঙ্গে সঙ্গম বৈধ নয়। ক্রেতা যদি দাবী ত্যাগ করে এবং বিক্রেতা জানতে পারে যে, সে মামলা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে তার জন্য সঙ্গম বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি কারও কাছ থেকে একটি বাঁদীর বিনিময়ে একটি গোলাম কিনল এবং উভয়ে আপন-আপন পণ্য কবজা করল। তারপর গোলামের ক্রেতা তার অর্ধেক কারও কাছে বিক্রি করে ফেলল। এখন যদি সে বাঁদীতে বিক্রি ইকাল করে তবে বৈধ হবে কি? হাঁ, বৈধ হবে এবং তার কর্তব্য গোলামের বিক্রেতাকে গোলামের মূল্য ফেরত দেওয়া। এমনিভাবে যদি সে গোলাম বিক্রি না করে, কিন্তু সে গোলামের হাত কাটা যায় এবং বিনিময়ে সে তার অর্ধদণ্ড গ্রহণ করে, তারপর বাঁদীতে বিক্রি ইকাল করে, সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম (আয-যাহীরিয়া)।

২৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম কিনল এবং মূল্যও পরিশোধ করল, কিন্তু গোলাম কবজা করল না, তারপর তার সাথে বিক্রেতার সাক্ষাত হলে বিক্রেতা তাকে বলল, আমি গোলাম ও মূল্য তোমাকে দান করে দিলাম। এর দ্বারা বিক্রি রহিত হয়ে যাবে। আর মূল্যর ক্ষেত্রে দান বৈধ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা : জাহাজের একদল যাত্রী তাদেরই মধ্যকার এক ব্যক্তি হতে কিছু মালামাল কিনল। পরে আশংকা হল জাহাজ ডুবে যেতে পারে। সুতরাং তারা একমত হয়ে গেল যে, কিছু মাল জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া চাই, যাতে জাহাজ হালকা হয়ে যায়। তখন বিক্রেতা বলল, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে কেনা মাল ফেলে দেবে তার সঙ্গে আমি বিক্রি ইকাল করলাম। সুতরাং তারা যদি সে মাল ফেলে দেয় তবে ইস্তিহসান অনুযায়ী ইকাল বৈধ হবে (আল-খুলাসা)।

২৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি গোলাম কিনল, তারপর সে দাবী করল যে, সে গোলামটি যার কাছ থেকে কিনেছিল তার কাছেই মূল্য পরিশোধের আগে আরও কম দামে বিক্রি করে দিয়েছে এবং এর ফলে বিক্রি ফাসিদ হয়ে গেছে। অন্যদিকে বিক্রেতা দাবী করল যে, সে বিক্রি ইকাল করেছে। এ ক্ষেত্রে 'ইকাল' অস্বীকার করার ব্যাপারে কসমের সঙ্গে ক্রেতার কথাই গৃহীত হবে।

বিক্রেতা দাবী করল যে, সে গোলামটিকে ক্রেতার কাছে আরো কম দামে কিনে নিয়েছে। আর ক্রেতার দাবী এই যে, সে ইকাল করেছে, তবে এ ক্ষেত্রে উভয়ের কাছ থেকে শপথ নেওয়া হবে (আয-যাহীরিয়া)।

৩০. মাসআলা : যাকে বিক্রির উকীল বানানো হয়, ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মূল্য বুঝে নেওয়ার আগে সেও ইকাল করার ক্ষমতা রাখে। পক্ষান্তরে যাকে ক্রয়ের উকীল বানানো হয় শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী (র) ও শায়খুল ইসলাম খাহার যাদে (র)-এর বর্ণনা মতে সে ইকাল করার অধিকার রাখে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩১. মাসআলা : মক্কেল নিজে বিক্রেতা বা ক্রেতার সঙ্গে ইকাল করতে পারে। ওয়ারিস ও ওয়াসী ইকাল করলে তাও জায়েয হয়। যার জন্য ওয়াসিয়াত করা হয় তার ইকাল করা জায়েয নয় (আল-কিনয়া)।

৩২. মাসআলা : কায়লী দ্রব্য পরিমাণ ছাড়াও ইকাল করা জায়েয। ইকালকে কোন শর্তের সঙ্গে যুক্ত করা জায়েয নয়, যেমন কেউ যায়দের কাছে একটি কাপড় বিক্রি করল। তারপর যায়দ বলল, তুমি এটি আরও কম দামে কিনেছিলে। সুতরাং তুমি যদি বেশী দামের গ্রাহক পাও তবে তার কাছে বিক্রি করে ফেল। এখন বিক্রেতা যদি বেশী দামের গ্রাহক পায় এবং তার কাছে বিক্রি করে তবে এ দ্বিতীয় বিক্রি জায়েয হবে না (ওয়াজীয : আল-কুরদুরী, আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ফাসিদ শর্তের কারণে ইকাল বাতিল হয় না। যেহেতু ইকালার অর্থই হচ্ছে বিক্রি রহিতকরণ (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩৪. মাসআলা : এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তির মেয়াদী পাওনা আছে। পাওনাদার তার কাছ থেকে সেই পাওনার বদলে কোন দ্রব্য কিনল এবং তা কবজা করল। এখন যদি তারা দুজন বিক্রি ইকাল করে, তবে আগের সেই মেয়াদ ফিরে আসবে না। যদি কোন দোষের কারণে কাযীর ফায়সালাক্রমে সে মাল ফেরত দেয়, তবে সে বিক্রি সর্বতোভাবেই রহিত হয়ে যাবে এবং তখন মেয়াদও আবার ফিরে আসবে। সে পাওনার যদি কোন কাফীল (জামিন) থাকে, তবে এই অবস্থার কোন অবস্থায়ই সে কাফীল পুনর্বহাল হবে না (আল-ফাতাওয়া, আল-কুবরা)।

৩৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি গরু বিক্রি করল। তারপর ক্রেতাকে বলল, আমি তোমার কাছে এটি সন্তায় বিক্রি করেছি। ক্রেতা বলল, সন্তা হয়ে থাকলে এটা আবার বিক্রি কর এবং নিজের জন্য লাভ কামিয়ে নাও আর আমার এই গরু, যা আমার কাছে বিক্রি করেছিল, এর দাম আমাকে দিয়ে দিও। সুতরাং সে গরুটি বিক্রি করে ফেলল এবং তাতে লাভও হল। এখন এ বিক্রিটা কবজার আগে হোক বা পরে, ক্রেতা যদি বলে থাকে, গরুটি তোমার নিজের জন্য বিক্রি কর, তবে তার ও বিক্রেতার মধ্যকার বিক্রি রহিত হয়ে যাবে এবং পরের বিক্রির লাভ ক্রেতারই থাকবে। আর সে রকম না বললে, বিক্রেতা ক্রেতার উকীল সাব্যস্ত হবে। সুতরাং লাভের মালিক হবে মক্কেল।

৩৬. মাসআলা : মা ও তার সাবালক পুত্র সম্মিলিতভাবে এক খণ্ড জমির মালিক। মা সে জমি বিক্রি করে দিল এবং পুত্র অনুমোদন করল। তারপর মা সে বিক্রি ইকাল করল এবং পুত্র সম্মতি জানাল। এখন মা যদি আবার সে পুত্রের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করে দেয়, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে পুত্রের অনুমতির উপর তা মওকুফ থাকবে না। কেননা ইকালার পর বিক্রিত মাল বিক্রেতার মালিকানায় ফিরে আসে, মক্কেল ও অনুমতিদাতার মালিকানায় নয়।

৩৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি সোনা দিয়ে আগুরের বাগান কিনল, তারপর সোনার বদলে গম দিল। এখন যদি তারা বিক্রি রহিত করে, তবে ক্রেতাকে বলা হবে, সে যেন গম ফেরত চায়।

৩৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি উৎকৃষ্ট দিরহামের বিনিময়ে কোন মাল কিনল তারপর তদন্তে নিকৃষ্ট মানের দিরহাম পরিশোধ করল, বিক্রেতা তা মেনে নিল। এখন তারা যদি সে বিক্রি রহিত করে, তবে বিক্রেতার কাছে ক্রেতা উৎকৃষ্ট দিরহাম চাইতে পারবে।

৩৯. মাসআলা : কেউ যদি এমন মাল কেনে, যা বহন করে আনতে হয় এবং সে জন্য বাড়তি খরচ হয়, আর সে তা বয়ে, অন্য জায়গায় নিয়েও গেল। তারপর তারা যদি সে বিক্রি রহিত করে, তবে বহন খরচা বিক্রেতাকেই দিতে হবে।

৪০. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি গাভী কিনল এবং তা কবজা করল। বিক্রেতাও মূল্য বুঝে নিল। তারপর তারা সে বিক্রি ইকালার করল। তারপরও যদি গাভীটি ক্রেতার হাতে থাকে এবং সে তার দুধ দুইয়ে খেতে থাকে, তবে বিক্রেতা তার কাছে সমপরিমাণ দুধ দাবী করতে পারবে। গাভীটি যদি ক্রেতার হাতে খোয়া যায় তবে ইকালার বাতিল হয়ে যাবে, কিন্তু ক্রেতা দুধের জরিমানা হতে দায়মুক্ত হয়ে যাবে না, যেহেতু ইকালার বর্তমান মালেই প্রযোজ্য হয়, সেটা নিঃশেষ হয়ে গেছে তাতে ইকালার কার্যকর হয় না (আন-কিনুয়া)।

৪১. মাসআলা : কেউ যদি ফসলসহ জমি কেনে এবং তার ফসল কেটে নেয়, তবে তারপর ইকালার করলে তা কেবল জমির ক্ষেত্রে তার অংশের মূল্যের বিনিময়ে কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে ফসল পাকার পর (কাটার আগে) যদি ইকালার করে, তবে সে ইকালার বৈধ হবে না (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

৪২. মাসআলা : এক ব্যক্তি কোন মাল কিনল এবং তা কবজা করল। বিক্রেতাও মূল্য বুঝে নিল। তারপর সে দিরহাম অচল হয়ে গেল। এখন যদি তারা ইকালার করে তবে বিক্রেতা সেই অচল মুদ্রাই ফেরত দেবে (আল-খুলাসা)।

৪৩. মাসআলা : কেউ যদি এমন জমি কেনে যাতে গাছ আছে এবং সে গাছগুলো কেটে ফেলে, তবে এ অবস্থায় ইকালার করলে সে ইকালার সহীহ হবে। বিক্রেতাকে সমুদয় মূল্যই ফেরত দিতে হবে। সে গাছের কোন মূল্য ফেরত পাবে না। ক্রেতার জন্য গাছগুলো হালাল থাকবে। এ হুকুম সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন ইকালার সময় গাছ কাটার বিষয়টা বিক্রেতার জানা থাকে। পক্ষান্তরে তখন যদি বিক্রেতা সে বিষয়ে অবগত না থাকে, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সমুদয় মূল্যের বিনিময়ে কেবল জমি ফেরত নেবে আর না হয় ছেড়ে দেবে (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

৪৪. মাসআলা : ইকালার পর ঐ মাল ঐ ক্রেতার কাছে আবার বিক্রি করা জায়েয হবে। অন্যের কাছে বিক্রি করলে জায়েয হবে না। বিক্রেতা বিক্রি ইকালার করার পর সে যদি আবার তার বিক্রেতার সঙ্গে ইকালার করে তবে তা জায়েয হবে। এমনিভাবে সে তার বিক্রেতার কাছে তা বিক্রি করলেও সে বিক্রি বৈধ (মুহীত : আস-সারাখসী)।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : মুরাবাহা, তাওলিয়া ও ওয়াযীআ

১. মাসআলা : মুরাবাহা অর্থ, কেনা দামের উপর নির্দিষ্ট লাভসহ বিক্রি। তাওলিয়া অর্থ লাভ অর্থ ছাড়া কেনা দামে বিক্রি, ওয়াযীআ- অর্থ কেনা দাম থেকে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ লোকসান দিয়ে বিক্রি। এ তিন প্রকারের বিক্রি জায়েয (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : যদি কোন জিনিস মুরাবাহা হিসেবে (লাভের চুক্তিতে) বিক্রি করে, তবে তার বিনিময় মূল্য অর্থাৎ বিক্রেতা যা দিলে কিনেছে সেই বিনিময় লক্ষ্য করতে হবে। তা যদি মিছলী বস্ত্র, অর্থাৎ কয়ালি বা ওজনী দ্রব্য হয়, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে- যদি লাভের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হয়, তাতে সে লাভ প্রথম মূল্যের সমজাতীয় হোক বা ভিন্ন জাতীয়।

প্রথম মূল্য যদি মিছলী দ্রব্য না হয় (অর্থাৎ যার অনুরূপ দ্রব্য আরও পাওয়া যায় এমন না হয়), যেমন বিভিন্ন রকমের আসবাব পত্র, এরূপ মূল্যের বিনিময়ে কেনা বস্ত্র মুরাবাহার চুক্তিতে যার কাছে বিক্রি করা হবে সে ব্যক্তি বিক্রেতা প্রদত্ত সেই বিনিময়ে মূল্যের মালিক না হলে এ বিক্রি জায়েয হবে না। আর সে যদি সেই জিনিসের মালিক হয় এবং তার হাতের সেই জিনিসটির বদলেই বিক্রি করা হয় আর সাথে দশ টাকা লাভ থাকে, তবে জায়েয হবে। যদি তার কাছে দশে এগার এই চুক্তিতে বিক্রি করে তবে জায়েয হবে না। অবশ্য মজলিসের ভেতরই যদি মূল্য জানতে পারে তবে জায়েয হবে, কিন্তু তখন তার ইখতিয়ার লাভ হবে। সুতরাং সে যদি চুক্তিকেই স্বীকার করে নেয়, তবে ইস্তিহসান অনুযায়ী তাকে এগার টাকা পরিশোধ করতে হবে। এমনিভাবে যদি তাওলিয়া অর্থাৎ কেনা দামের বিক্রির চুক্তি করে এবং ক্রেতার জানা না থাকে যে, তার উপর কত পড়বে, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে না যদি না মজলিসের ভেতর দাম জানতে পারে। মজলিসের ভেতর জানতে পারলে জায়েয হবে বটে, কিন্তু ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩. মাসআলা : দশ দিরহামে কাপড় কেনার পর যদি দশ দিরহামের বদলে এক দীনার বা একটি কাপড় প্রদান করে, তবে আসল দাম দশ দিরহামই ধরা হবে। সুতরাং মুরাবাহার চুক্তিতে দ্বিতীয় ক্রেতাকে মূল দাম দশ দিরহামই বলতে হবে।

যদি আঞ্চলিক মুদ্রা ছাড়া অন্য মুদ্রায় দশ দিরহামের বিনিময়ে কোন কাপড় কেনে, তারপর সেটি এক দিরহাম লাভে বিক্রি করে, তবে দশ দিরহাম হবে কেনা মুদ্রায় এবং এক দিরহাম হবে আঞ্চলিক মুদ্রায়। যদি লাভের মুদ্রাকে আসল দামের মুদ্রার সঙ্গে সমন্বয় করে দেয় এবং এভাবে বলে যে, দশে এগার হারে লাভ দিতে হবে, তবে লাভের মুদ্রাও আসল মুদ্রার সমজাতীয় হতে হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : যদি ভাল মুদ্রার স্থলে ভেজাল মুদ্রা পরিশোধ করে এবং বিক্রেতা সেটাই মেনে নেয়, তবে ক্রেতা ভাল মুদ্রাকে আসল দাম ধরেই তার উপর লাভের চুক্তি করতে পারবে (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা : যদি মূল্যের বদলে কোন মাল দেয় বা কিছু বন্ধক রাখে এবং তা খোয়া যায়, তবে দিরহামকে আসল দাম ধরেই লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৬. মাসআলা : মুরাবাহ চুক্তির ক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতাকে জানাল যে, তার আসল দাম একশ' দীনার। তারপর মূল্য পরিশোধের সময় বিক্রেতা বলল যে, আমি এটি শামী দীনারে কিনেছি, অথচ বেচাকেনা হচ্ছে বাগদাদে, তবে সে বাগদাদী মুদ্রাই পাবে। সে যদি প্রমাণ দেখাতে পারে যে, শামী দীনারে কিনেছে, তবে সে প্রমাণ গৃহীত হবে এবং তখন ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : ক্রেতা যদি তার কেনা মাল কাউকে উপহার দেয় এবং পরে সে উপহার প্রত্যাহার করে নেয়, তবে সে ক্ষেত্রেও সে তা লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে। এমনভাবে যদি সেটি বিক্রি করে দেয় এবং তারপর কোন দোষ বা ইখতিয়ারের শর্ত বা ইকালার ভিত্তিতে সে মাল তার হাতে প্রত্যাপিত হয় তখনও তাতে মুরাবাহা জায়েয। যদি সে মালে বিক্রি চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং তারপর মীরাহ বা উপহারস্বরূপ সেটি তার হাতে ফিরে আসে, তবে সে তা লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে না।

কেনা মাল যদি কায়লী বা ওজনী দ্রব্যের সমষ্টি হয় অথবা অল্প ব্যবধানের গুণতি দ্রব্য হয়, তবে সে তার অংশ বিশেষ লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে। পক্ষান্তরে সে সমষ্টি যদি বিভিন্ন রকমের হয় অথবা এমন গুণতি দ্রব্য হয়, যার এককসমূহের মধ্যে পার্থক্য বেশী, তবে অভিভাজ্যরূপে তার অংশ বিশেষ লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে। যদি নির্দিষ্ট কোন অংশ বিক্রি করে, তবে কেনা দামের অবস্থা লক্ষ্য করতে হবে। কেনা দাম সামষ্টিক আকারে হলে সে বিক্রি জায়েয হবে না। আর যদি প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দামে কেনে, তবে সেই দামের ভিত্তিতে তাতে মুরাবাহা জায়েয হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত (আল-হাবী)।

৮. মাসআলা : যদি দশ দিরহামের বিনিময়ে এক জাতীয় দুটি কাপড় 'সালাম'রূপে ক্রয় করে এবং দুটি কাপড়েই শ্রেণী, প্রকার, গুণ ও পরিমাপও বর্ণনা করে দেয় যে, সবদিক থেকেই উভয়টি সমান হবে, তারপর মেয়াদ শেষে কাপড় দুটি কবজা করে এবং তারপর সে দুটিকে পাঁচ টাকা করে লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে চায়, তবে বিষয়টি খুলে না বলা পর্যন্ত তা মাকরুহ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মাকরুহ নয় (আল-কাফী)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি একটি কাপড় কেনে এবং তার অর্ধেক পুড়ে যায়, তবে বাকি অর্ধেক অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করতে পারবে না- যদিও মাপে তা অর্ধেক কাপড় হয় (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা : গোলাম অপহরণকারীর কাছ থেকে গোলামটি পালিয়ে যাওয়ার পর যদি ফায়সালা দেওয়া হয় যে, তাকে গোলামের মূল্য পরিশোধ করতে হবে, তারপর গোলামটি পলাতক অবস্থা হতে ফিরে আসে, তবে অপহরণকারী জরিমানাস্বরূপ যে মূল্য পরিশোধ করেছে, তার উপর লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে, অবশ্য বিক্রিকালে সে বলবে, এর দাম এত পড়েছে। এমনভাবে যদি মদের বিনিময়ে গোলাম কেনে এবং কবজাও করে, তারপর গোলামটি হারিয়ে যায় এবং কাফী ফায়সালা দেয় যে, ক্রেতা-বিক্রেতাকে গোলামটির বাজার মূল্য পরিশোধের হুকুম দেয়, সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য (আল-ফাতাওয়াল-কুবরা)।

১১. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে একটি কাপড় কোন কিছুর বিনিময় শর্তে উপহার দিল এবং উভয়ে আপন-আপন উপহার বুঝে নিল। এখন সে কাপড়টি কি লাভের চুক্তিতে বিক্রি করা যাবে? ইমাম আবু হানীফা (র) সুলহ (আপোষ রফা)-এর ক্ষেত্রে যে রায় দিয়েছেন তার উপর কিয়াস করলে এরূপ বিক্রি জায়েয হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী কিয়াস করলে জায়েয হবে। কেননা উপহারের বদলা উপহারের মূল্যস্বরূপ। তবে সে বলবে, আমার এই দাম পড়েছে, 'এত দিয়ে কিনেছি' বলবে না।

এক ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে একটি গোলামের মালিক হল সে গোলামটি এক হাজার টাকায় বিক্রি করে দিল। ক্রেতা ও বিক্রেতা আপন-আপন হক কবজা করল। তারপর তারা বিক্রি রহিত করল। অথবা এ রহিতকরণ কবজার আগেই হল। এখন যদি সে লাভের চুক্তিতে গোলামটি বিক্রি করতে চায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুসারে তা জায়েয হবে না (আল-হাবী)।

১২. মাসআলা : যদি অনির্দিষ্ট দুই পাত্র-যবের বদলে এক পাত্র গম কেনে এবং উভয়ে আপন-আপন মাল কবজা করে, তারপর সে গম লাভের চুক্তিতে বিক্রি করে তবে তাতে দোষ নেই। এমনভাবে যে, কোন প্রকারের ওজনী বা কায়লী দ্রব্যকে অন্য প্রকারের বিনিময়ে বেচাকেনা করলে তার এই একই হুকুম। যদি অনির্দিষ্টভাবে দুই কাফীয যবের বিনিময়ে এক কাফীয গম কেনে এবং তারপর গমের এক-চতুর্থাংশ লাভে সে গম বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে যদি রূপার চিক্রনি কেনে এবং তারপর এক দিরহাম লাভে তা বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা : আলাদা দাম না বলে যদি এক সঙ্গে দুটি কাপড় কেনে, তবে তার একটিকে লাভের চুক্তিতে বিক্রি করা জায়েয নয়। যদি প্রত্যেকটির আলাদা দাম নির্দিষ্ট করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার একটিকে লাভের চুক্তিতে বিক্রি করা জায়েয হবে, কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয নয়।

১৪. মাসআলা : কেউ যদি স্বাভাবিক দামের চেয়ে বেশী দাম দিয়ে কোন দ্রব্য কেনে, তবে সে দামের ভিত্তিতে তা লাভের চুক্তিতে বিক্রি করা জায়েয হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, যদি এতটা বেশী দামে কেনে যে, সাধারণত মানুষ অতটা ঠক স্বীকার করে না, তবে ক্রেতার কাছে তা খুলে না বলা পর্যন্ত লাভের চুক্তিতে বিক্রি করা আমার পসন্দ নয়।

১৫. মাসআলা : দুই ব্যক্তি মিলে যদি পরিমাপ জাতীয় বা ওজন জাতীয় বা সামান্য ব্যবধানের গণনীয় দ্রব্য ক্রয় করে এবং তারপর তা ভাগ করে নেয়, তবে তাদের প্রত্যেকে নিজ-নিজ অংশ লাভের চুক্তিতে বিক্রি করে করতে পারবে। যদি কাপড় বা এ জাতীয় কোন মাল হয় এবং তা ভাগ করে নেয়, তবে তাদের জন্য নিজ-নিজ অংশ লাভের চুক্তিতে বিক্রি জায়েয হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৬. মাসআলা : যদি দিরহামের বিনিময়ে দীনার কেনে এবং সে দীনার লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে চায়, তবে তা জায়েয হবে না (আয-যাহীরিয়া)।

১৭. মাসআলা : কেউ কোন মাল কিনে যদি স্থিরীকৃত দামের বেশী প্রদান করে, তারপর সেই প্রদত্ত টাকার উপর লাভ ধরে বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে সে 'আমার এত দাম পড়েছে' এরূপ বলবে না। তদ্রূপ উত্তরাধিকার সূত্রে বা উপহার স্বরূপ যদি কোন মাল হাতে আসে এবং তার গায়ে লেখা দামের ভিত্তিতে বিক্রি করে, তাও জায়েয হবে। অবশ্য এ হুকুম তখনই হবে যখন বিক্রেতা জানে যে, 'গায়ের লেখাটা আসল নয়' তা ক্রেতা অবগত। পক্ষান্তরে বিক্রেতার যদি জানা থাকে যে, ক্রেতা মালের গায়ের লেখা ও আসল দামকে একই মনে করে, তখন এরূপ বিক্রি এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে যাবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা : যদি একশ' দিরহামে আধা গোলাম ক্রয় করে, তারপর বাকি আর্ধেক ক্রয় করে দু'শ' দিরহামে, তবে গোলামটির অর্ধেক কেনা দামের উপর লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে। যদি পূর্ণ গোলামকে তিনশ' দিরহাম দাম ধরে তার উপর লাভে বিক্রি করে, সেও জায়েয (আল-হাবী)।

১৯. মাসআলা : মূল দামের সঙ্গে ধোপা, রঞ্জক ও কারিকরের মজুরি এবং পরিবহন ভাড়া যোগ করা জায়েয এমনভাবে ছাগলের ক্ষেত্রে তা যে ব্যক্তি এনে দেবে তার পারিশ্রমিকও আসল দামের সঙ্গে যোগ করা যাবে।

২০. মাসআলা : এ ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, মুরাবাহা অর্থাৎ লাভের চুক্তিতে বেচাকেনার ব্যাপারে বণিকদের রেওয়াজ ধর্তব্য। সুতরাং যে সব খরচা মূল দামের সাথে রেওয়াজ আছে সেগুলো ধরা হবে। আর যা ধরার রেওয়াজ নেই তা ধরা যাবে না (আল-কাফী)।

২১. মাসআলা : পণ্যের আসল মূল্যের সঙ্গে খাওয়া-খরচ, পড়া ও পথ খরচ যোগ করা হবে না, যেহেতু এ সব যোগ করার বাহ্যত প্রচলন নেই (আল-মাবসূত)।

২২. মাসআলা : পণ্ডর রাখালের পারিশ্রমিক, গোলাকে কারিগরি প্রশিক্ষণ বা কুরআন, দীনী ইল্ম বা কবিতা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ব্যয় কিংবা মালের গুদাম ভাড়া কেনা দামের সাথে যোগ করা যাবে না। এমনভাবে যে ব্যক্তি গোলাম নিয়ে আসে ও হিফাজত করে কিংবা যে ব্যক্তি খাদ্য রক্ষণাবেক্ষণ করে তার পারিশ্রমিকও যোগ করা যাবে না। এমনভাবে যোগ করা যাবে না ডাক্তারের ফি, পণ্ডর প্রশিক্ষক বা চিকিৎসকের পারিশ্রমিক, পলাতক গোলামকে ধরে আনার খরচা, গাছ ইত্যাদি উপড়ানোর মজুরি, কোন অপরাধের কারণে প্রদত্ত অর্থদণ্ড এবং

রাস্তায় দেওয়া সেই সব মাশুল, যা অন্যায়ভাবে নেওয়া হয়ে থাকে। তবে এ সব যদি মূল দামের সাথে যোগ করার রেওয়াজ থাকে তবে আলাদা কথা (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

২৩. মাসআলা : তদ্রূপ শিক্ষা লাগানোর মজুরি যোগ করা যাবে না। খাদদ্রব্যের মূল্যে পরিমাপকারীদের পারিশ্রমিক বাড়ানো যাবে না (আল-হাবী)।

২৪. মাসআলা : যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী দালানের পারিশ্রমিক আসল দামের সঙ্গে যোগ করা যাবে। পণ্ডর ক্ষেত্রে তাঁর ইত্যাদির দাম যোগ করা যাবে না। গোলামের ক্ষেত্রে পোশাক ও খাবারের দাম যোগ করা যাবে। তবে যা সাধারণ নিয়মের অতিরিক্ত হয়, তা যোগ করা যাবে না। পণ্ডর ঘাসের দাম যোগ করা যাবে, কিন্তু পণ্ড হতে যা উৎপন্ন হয়, যথা- দুধ, পশম ও ঘি, এর দ্বারা খরচার যতটুকু পুষিয়ে যাবে সে পরিমাণ বাদ দিতে হবে এবং তার অতিরিক্ত মূল দামের সাথে যোগ করা হবে। পক্ষান্তরে পণ্ড, গোলাম কিংবা বাড়ি ভাড়া দিয়ে যদি তার বিনিময় গ্রহণ করা হয়, তবে খরচ থেকে তা বিয়োগ করা হবে না, বরং পূর্ণ খরচা যোগ করেই তার উপর লাভের চুক্তি করা যাবে। কেননা এরূপ আয় মূল হতে উৎপন্ন নয়। মুরগি ডিম দিলে খরচ থেকে তা বিয়োগ করা হবে এবং তারপর যা অতিরিক্ত খরচ হবে সেটা আসল দামের সঙ্গে যোগ করা হবে। বাড়ির ক্ষেত্রে প্লাস্টার, চুনকাম ও কুয়া খননের খরচা যোগ করা যাবে-যতদিন এসব স্থায়ী থাকে এসব নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এর খরচা যোগ করা যাবে না। জমির ফসলে ও আশুরের বাগানে সেচ দেওয়া বা মাটি ফেলার খরচাও যোগ করা যাবে।

২৫. মাসআলা : যদি নিজেই কাপড় ধৌত করে বা বাড়ির দেওয়ালে চুনকাম করে কিংবা উপরে বর্ণিত কোন কর্ম করে, তবে মূল দামের সাথে তা যোগ করতে পারবে না। তদ্রূপ যদি অন্য কেউ এমনভাবেই এসব কাজ করে দেয়, সে ক্ষেত্রেও একই বিধান (ফাতহুল-কাদীর)।

২৬. মাসআলা : খাল কাটা, নালা খনন করা, বাঁধ নির্মাণ, ড্রেন তৈরি ও বৃক্ষ রোপন করার খরচা মূল দামের সঙ্গে যোগ করা যাবে-যতদিন এসব স্থায়ী থাকে। তদ্রূপ ফসল কাটা ও কুড়ানোর খরচাও যোগ করা বৈধ। কিন্তু পাহারাদারের বেতন যোগ করা যাবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২৭. মাসআলা : কেউ যদি ছাগল কেনে এবং তা যবাহু করা, চামড়া ছাড়ানো ও তাতে লবণ মাখানোর জন্য কোন লোক ভাড়া করে, তবে এসবের মূল দামের সঙ্গে যোগ করা যাবে। তদ্রূপ যদি তামা কেনে এবং তা দ্বারা পাত্র তৈরি করার জন্য শ্রমিক নিযুক্ত করে কিংবা কাঠ কেনে এবং তা দ্বারা দরজা তৈরি করার জন্য মিস্ত্রি লাগায়, তবে তার মজুরি মূল দামের সাথে যোগ করা যাবে। যদি কাঠ কেনে এবং তা পুড়িয়ে কয়লা বানায়, তবে তাতে নিযুক্ত সব রকমের শ্রমিকের মজুরিও হিসাব করা যাবে (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা : গোলামকে বিবাহ করলে তার মোহরানা কেনা দামের সাথে যোগ করা যাবে না। তদ্রূপ ক্রীতদাসী বিবাহ করলে তার মোহরানা কেনা দাম থেকে কাটা হবে না।

২৯. মাসআলা : মুজ্জা ছিদ্র করানোর পারিশ্রমিক আসল দামের সঙ্গে সেটা যোগ করা যাবে। যদি চুনিতে ছিদ্র করার ফলে তার ক্ষতি হয় তবে ছিদ্র করানোর মজুরি হিসাব করা যাবে না। যদি ক্ষতি না হয়ে, বরং লাভ হয় অথবা ছিদ্র করা অত্যাবশ্যিক হয়, তবে হিসাব করা যাবে।

৩০. মাসআলা : যদি উপরের ও ভেতরের কাপড় কেনে এবং তার ভেতরে তুলার পুর দিয়ে শেরোয়ানী তৈরি করে অথবা সে এরূপ শেরোয়ানী উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে কিংবা কেউ তাকে উপহার দেয়, তবে তুলার দাম ও সেলাইয়ের মজুরি মূল দামের সঙ্গে যোগ করতে পারবে। এমনিভাবে যদি উপরের কাপড় উত্তরাধিকার সূত্রে পায় এবং ভেতরের কাপড় কিনে নেয় অথবা ভেতরের কাপড় উত্তরাধিকার সূত্রে পায় এবং উপরের কাপড় কিনে নেয়, তবে তার সাথে ভেতরের কাপড়ের মূল্য ও সেলাইয়ের মজুরি যোগ করতে পারবে। যদি দুটি কাপড়ের একটি কেনা ও অপরটি মিরাহী হয় আর উভয়টি লাভের চুক্তিতে বিক্রি করে এবং বলে, আমার এ দুটি দাম পড়েছে দশ টাকা, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে না। কেননা মিরাহী কাপড়টি তাকে কিছু দিয়েই কিনতে হয় নি। যদি মিরাহী কাপড়টি রং বের করে এবং তাতে এক দিরহাম খরচ হয়, তারপর উভয়টি লাভের চুক্তিতে এই বলে বিক্রি করে যে, এ দুটিতে আমার এত দাম পড়েছে, তবে তা জায়েয হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩১. মাসআলা : মুরাবাহা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খিয়ানত করলে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে পূর্ণ দামে মাল রাখবে অন্যথায় পরিত্যাগ করবে। যদি তাওলিয়ার ক্ষেত্রে খিয়ানত করে, তবে যে পরিমাণ খিয়ানত করেছে, মূল্য থেকে সেই পরিমাণ বাদ দেওয়া হবে। এ হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। যদি ফেরত দেওয়ার আগে মাল ধ্বংস হয়ে যায় বা তাতে এমন কোন কারণ দেখা দেয়, যা বিক্রি রহিতকরণের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে খিয়ানত প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ক্রেতাকে পূর্ণ মূল্য দিতে হবে এবং তার ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এটাই ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর প্রসিদ্ধ মত (আল-কাফী)।

৩২. মাসআলা : যদি মালে কোন দোষ থাকে, কিন্তু বিক্রেতা তা গোপন রাখে, তারপর ক্রেতা তা জানতে পারে এবং তা মেনে নেয়, তবে সে তা লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে। এমনিভাবে যদি লাভের চুক্তিতে ক্রয় করে তারপর সেটি নিয়ে তার বিক্রেতার কাছে উপস্থিত হয়, তবে তার কাছে কেনা দামের ভিত্তিতে লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে (আল-হাবী)।

৩৩. মাসআলা : বিক্রেতা বা ক্রেতার হাতে যদি মালের ভেতর কোন দোষ দেখা দেয়, তা আসমানী মনিবকেই হোক বা বিক্রেতার কিংবা খোদ পণ্যের পক্ষ থেকেই হোক, তবে পূর্ণ মূল্যের ভিত্তিতেই তা লাভের চুক্তিতে বিক্রি করা বৈধ হবে এবং সে দোষের কথা বলে দেওয়াও অপরিহার্য হবে না। আমাদের ইমামত্রয় এ ব্যাপারে একমত। যদি সে দোষটা ক্রেতার পক্ষ হতে বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির পক্ষ হতে ঘটে, তবে সে দোষের কথা উল্লেখ না করে লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে না। তদ্রূপ মালের ভেতর যদি বৃদ্ধি ঘটে এবং তা ক্রেতার হাতে বিদ্যমান থাকে। যেমন গাছের ফল, ক্রীতদাসীর সন্তান বা পশুর বাচ্চা যদি তা

ক্রেতার বা তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপে নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার উল্লেখ ব্যতীত লাভের চুক্তিতে বিক্রি জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে আসমানী কোন বিপদে নষ্ট হলে তার উল্লেখ ছাড়াও লাভের চুক্তিতে বিক্রি জায়েয হবে। খরিদা দাসী অকুমারী হলে তার সঙ্গে সঙ্গমের কথা উল্লেখ না করেও লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু কুমারী হলে তা প্রকাশ করা ছাড়া লাভের চুক্তিতে বিক্রি জায়েয হবে না (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা : যদি কাপড় কেনে এবং তা ইঁদুরে কেটে ফেলে বা আঙনে পুড়ে যায়, তবে তার উল্লেখ ছাড়াও তা লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে। যদি ক্রেতা কর্তৃক খোলা বা ভাঁজ করার কারণে কাপড়টি ছিঁড়ে যায় এবং তাতে তার দাম কমে যায়, তবে তা প্রকাশ করা অপরিহার্য (আল-মুহীত)।

৩৫. মাসআলা : যদি বাড়ি বা জমি ভাড়া খাটায় এবং তাতে তার কোনরূপ ক্ষতিসাধন না হয়, তবে তা উল্লেখ না করেও লাভের চুক্তিতে তা বিক্রি করা তার জন্য জায়েয হবে।

যদি বাকিতে কেনে, তবে সে কথা প্রকাশ করা ছাড়া লাভের চুক্তিতে বিক্রি করা জায়েয নয়। এ বিধান সেই ক্ষেত্রে যখন বিক্রিতে বাকির শর্ত থাকে। পক্ষান্তরে যদি বিক্রিতে তার শর্ত না থাকে। কিন্তু ব্যবসায়ে তার সাধারণ রেওয়াজ আছে, যেমন কিস্তির বেচাকেনা, যাতে বিক্রি মাত্রই বিক্রেতা একত্রে সবটা দাম দাবী করে না, বরং মাসে মাসে বা প্রতি দশ দিনে এক একটা কিস্তি আদায় করে নেয়, তবে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে তা খুলে বলা অপরিহার্য নয়।

বিক্রি যদি বাকির শর্তে হয়, তারপর ক্রেতা সেটা প্রকাশ না করেই কারও কাছে লাভের চুক্তি সে মাল বিক্রি করে এবং তারপর দ্বিতীয় ক্রেতা সে কথা জানতে পারে, তবে তখন তার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে তা মেনে নিয়ে মালটা রেখে দেবে অন্যথায় ফেরত দেবে (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা : ক্রেতা যদি মালটা ধ্বংস করে ফেলে বা সেটি আপনা-আপনিই ধ্বংস হয়ে যায় এবং তারপর সে বাকির কথা জানতে পারে। তবে সে বিক্রি অবধারিত হয়ে যাবে (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

৩৭. মাসআলা : যার কাছে পাওনা আছে, তার কাছ থেকে যদি বাকিতে কোন মাল কেনে এবং সেই মূল্যে অন্য কারও কাছ থেকে অনুরূপ মাল কেনা সম্ভব না হয়, তবে সে তা খুলে না বলা পর্যন্ত লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি সেই দামে তা অন্যের কাছ থেকেও কেনা সম্ভব হয়, তবে তা খুলে বলা ছাড়াও অন্যের কাছে লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে, তাতে সে তার কাছ থেকে মালটা ক্রয়ের শব্দে গ্রহণ করুক বা আপোষ রফার শব্দে। কিন্তু যাহিরী রিওয়াযাতে ক্রয় ও আপোষ রফার মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে (আয-যাহীরিয়া)।

৩৮. মাসআলা : যে সকল অবস্থা প্রকাশ করা অপরিহার্য, বিক্রেতা যদি তা প্রকাশ না করেই বিক্রি করে তাহলে ক্রেতা তা জানার পর ইচ্ছা করলে পূর্ণ মূল্যে ক্রয় বহাল রাখবে

কিংবা মাল ফেরত দেবে। যদি মাল তার হাতে না থাকে, তবে পূর্ণ মূল্যে বিক্রি অবধারিত হয়ে যাবে এবং তার কোন রূপ ইখতিয়ার থাকবে না (আল-হাবী)।

৩৯. মাসআলা : বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে দামের কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে ছাড় দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, ক্রেতা সেটাকেই আসল দাম ধরে লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে। এমনভাবে সে মালটা বিক্রি করে দেওয়ার পর যদি বিক্রেতা তাকে ছাড় দেয়, তবে সে ছাড়টা দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এবং সেই সঙ্গে ছাড়ের অংশের লাভও বিয়োগ হয়ে যাবে। যদি বিক্রিটা আসল দামে হয়ে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্রেতাও সে ছাড়ের সুবিধা পাবে।

ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে দাম কিছু বেশী দেয়, তবে সে ক্ষেত্রেও আমাদের তিনও ইমামের মতে আসল ও বৃদ্ধি উভয় মূল্য যোগ করে তার উপর লাভের চুক্তি করতে পারবে।

৪০. মাসআলা : যদি কাপড়ের দাম নগদ পরিশোধ না করে, তারপর মোট লাভের চুক্তিতে বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে। তারপর বিক্রেতা যদি তাকে এক মাসের সময় দেয়, তবে দ্বিতীয় ক্রেতাকেও সে অনুরূপ সময় দেয়া জরুরী হবে না (আল-মুহীত)।

৪১. মাসআলা : বিক্রেতা যদি তাকে সবটা দান করে দেয়, তবে সে যে মূল্যে কিনেছিল সেই মূল্যের উপর লাভের চুক্তি করতে পারবে (আল-হাবী)।

৪২. মাসআলা : খরিদা কাপড় যদি লাভে বিক্রি করে, তারপর সেটি আবার ক্রয় করে, তবে এখন আবার লাভে বিক্রি করতে চাইলে আগের বারের লাভ বিয়োগ করতে হবে। যদি সে লাভের পরিমাণ এবারের সবটা মূল্যের সমান হয়, তবে সে কাপড় আর লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে না। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে শেষবারের দামের উপরই সে লাভের চুক্তি করতে পারবে। সুতরাং যদি দশ টাকায় কাপড় কেনে এবং সেটি পনের টাকায় বিক্রি করে এবং উভয়ে আপন আপন প্রাপ্য কবজা করে, তারপর সে কাপড়টি আবার দশ টাকায় কেনে, তবে তার দাম পাঁচ টাকা ধরে সে লাভের চুক্তিতে বিক্রি করবে। এ ক্ষেত্রে সে বলবে, এর দাম পড়েছে পাঁচ টাকা, 'পাঁচ টাকায় কিনেছি' বলবে না। যদি দশ টাকায় কেনে এবং বিশ টাকায় বিক্রি করে, তারপর সেটি আবার দশ টাকায় কেনে, তবে সেটি আদৌ লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে না।

৪৩. মাসআলা : ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত কোন গোলাম যদি ঋণগ্রস্ত হয়, যে ঋণ তার নিজ মূল্যের সমপরিমাণ এবং সে দশ টাকায় একটি কাপড় কিনে যদি মনিবের কাছে পনের টাকায় বিক্রি করে, তবে সে মনিব দশ টাকা আসল দাম ধরে তার উপর লাভের চুক্তি করতে পারবে। যদি মনিব নিজেই দশ টাকায় কোন কাপড় কিনে সেই গোলামের কাছে পনের টাকায় বিক্রি করে, তবে গোলামকেও সেটি লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে হলে তার আসল দাম দশ টাকা ধরতে হবে। মুকাতাবের বিধানও অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের মত। মনিব যদি খুলে বলে যে, কাপড়টি সে তার ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত ও ঋণগ্রস্ত গোলাম বা মুকাতাবের কাছে থেকে কিনেছে, তবে সে পনের টাকা দাম ধরেও সেটি লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে (আল-কাফী)।

৪৪. মাসআলা : পুঁজিদাতা যদি তার ব্যবসায়ের পুঁজিহীন শরীকের কাছ থেকে সেই ব্যবসায়ের কোন মাল কেনে, তবে সে তার অংশের লাভের উপর তা লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে পারবে। এমনভাবে কেউ যদি এমন ব্যক্তির কাছে থেকে কোন মাল কেনে, তার পক্ষে যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে ক্ষেত্রেও একই বিধান (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪৫. মাসআলা : ব্যবসায়ের দুই শরীকের মধ্যে যদি মূলধন ও লাভ সমান সমান হওয়ার শর্ত না থাকে, তবে তাকে শিরকাতুল আনান বলে। এরূপ দুই শরীকের একজন যদি অপর শরীক হতে কোন মাল কেনে, তবে তা লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে দোষ নেই। এমনভাবে যদি কেবল শরীকেরই মালিকানাধীন হয় এবং তার কাছ থেকে তা কিনে লয়, তবে তাও লাভের চুক্তিতে বিক্রি করা জায়েয। পক্ষান্তরে মালটি যদি শরীকানা ব্যবসায়ের হয় এবং সেটি কেবল নিজের জন্য কেনে, তবে শরীকের অংশে তার কেনা দামের উপর লাভের চুক্তি করতে পারবে আর নিজের অংশ লাভের চুক্তিতে বিক্রি করতে হলে তা করতে হবে প্রথমবারের কেনা দামের উপর (আল-হাবী)।

৪৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহামে একটি গোলাম কিনল এবং উভয়ে দখল বিনিময় করল, তারপর এই দ্বিতীয় ক্রেতা জানতে পারল যে, প্রথম ক্রেতা গোলামটি কিনেছিল এক হাজার দিরহামে। সুতরাং সে কাযীর শরণাপন্ন হল এবং এ ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করল। তার বিক্রেতা বলল যে, আমি এটি এক হাজার দিরহামেই কিনেছিলাম। তারপর আমি গোলামটি আমার বিক্রেতাকে দান করে দেই এবং তারপর আবার তার কাছ থেকে এক হাজার একশ' দিরহামে ক্রয় করি। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার এ বক্তব্য গৃহীত হবে না। সে যদি এ ব্যাপারে ক্রেতার কাছ থেকে এই মর্মে কসম দাবী করে যে, সে বিষয়টা জানে এবং আমি যখন আমার বিক্রেতাকে এটা দান করি এবং তারপর আবার এক হাজার একশ' দিরহামে ক্রয় করি তখন সে সেখানে উপস্থিত ছিল, তবে সে বিষয়ে ক্রেতার কাছ থেকে কসম নেওয়া হবে। বিক্রেতা এই দ্বিতীয় ক্রয়ের দাবী না করে, বরং বলে যে, এই অতিরিক্ত এক দিরহাম খরচ হয়েছে আমি যার কাছ থেকে কিনেছি তার কাছ থেকে এটি আমার এই শহরে বয়ে আনতে এবং খাবার-দাবারের পেছনে, তবে লক্ষ্য করতে হবে লাভের চুক্তিতে বিক্রিকালে সে কী বলেছিল। 'এর দাম এই পড়েছে' এরূপ বলে থাকলে কসমের সঙ্গে তার কথাই গ্রহণ করা হবে। আর যদি বলে থাকে, আমি একে এক হাজার একশ' দিরহামে কিনেছি এবং এই কথার উপর লাভের চুক্তি করে তবে তার এই দাবী গৃহীত হবে না যে, এই একশ' দিরহাম এর খরচা পড়েছে।

৪৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি পনের দিরহামে একটি কাপড় কিনল এবং দাম নগদ পরিশোধ করল। তারপর 'দশে এগার' এই হারে লাভের চুক্তিতে সেটি বিক্রি করল এবং তার ক্রেতাকে জানাল যে, কাপড়টির দাম পড়েছে দশ দিরহাম। তারপর সে দশ দিরহাম ও তার লাভ নগদ বুঝে নিল। তারপর বলল, আমি ভুল বলেছি, আসলে এর দাম পড়েছে পনের দিরহাম, কিন্তু ক্রেতা তার কথা প্রত্যাখ্যান করল। তাে এ ক্ষেত্রে আসল দাম সম্পর্কে বিক্রেতার দাবীর পক্ষে প্রমাণ গৃহীত হবে না। যদি এ ব্যাপারে ক্রেতা তার কথা তাসদীক করে, তবে তাকে বলা হবে, তুমি বিক্রেতাকে আরও পাঁচ দিরহাম ও আধা দিরহাম পরিশোধ কর। অথবা মাল ফেরত

দাও। এ হচ্ছে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী ক্রেতাকে অতিরিক্ত টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য করা যাবে না। বরং বিক্রেতাকে বলা হবে, চাইলে তুমি বিক্রি রহিত করে ফেল এবং সে মতে কাপড় ফেরত নাও এবং যে মূল্য উসূল করেছ তা ফেরত দাও। আর ইচ্ছা হলে যে মূল্য নগদ পেয়েছ তাতেই মাল সমর্পণ কর। এর বেশী পাবে না।

ক্রেতা যদি বলে, তুমি পাঁচ দিরহামে কেনা জিনিস আমাকে দশ দিরহাম বলেছ, আর সে বিক্রেতাকে কসম করতে বলে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার কাছ থেকে কসম নেওয়া হবে না।

বিক্রেতার স্বীকারোক্তি দ্বারা অথবা সাক্ষ্য দ্বারা যদি পাঁচ দিরহাম সাব্যস্ত হয় তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ফেরত দিতে হবে না। বরং ক্রেতার ইচ্ছা, সে মাল ফেরত দিতে পারে বা পূর্ণ মূল্যেই রেখে দিতে পারে।

উভয় মাসআলায় যদি 'তাওলিয়া' অর্থাৎ আসল দামে বেচাকেনা হয়ে থাকে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে বেশী ও কম উভয় অবস্থায় মাল ও টাকা ফেরত দেওয়া-নেওয়া হবে। কমে অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র)-ও সেই কথাই বলেন। আর বেশীর অবস্থায় তাঁর মত অনুসারে এমনই হুকুম হওয়ার কথা। এমনভাবে যদি দশ টাকায় এক টাকা লাভের হারে বেচাকেনা হয়ে থাকে, তবে 'দশে এগার'-এর ক্ষেত্রে যে সব অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, সেই সকল অবস্থা এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে (আল-মুহীত)।

৪৮. মাসআলা : 'দশে এগার' এই হারে বা এ রকমেরই পদ্ধতিতে যদি কোন মাল বিক্রি করে, তবে আসল দাম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে তা রাখবে অন্যথায় পরিত্যাগ করবে। যদি চুক্তির আগে তা জানতে পারে তবে তার কোন ইখতিয়ার থাকবে না।

যদি এক ব্যক্তি পাঁচ দিরহামে একটি কাপড় কেনে এবং অপর এক ব্যক্তি ছয় দিরহামে একটি কাপড় কেনে তারপর তারা উভয়ে একই চুক্তিতে কাপড় দুটি লাভের বা লোকসানের চুক্তিতে বিক্রি করে, তবে উভয়ের মধ্যে মূলধন হিসেবে বিক্রি মূল্য ভাগ হবে (আল-হাবী)।

৪৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি দশ টাকা মূল্যের একটি কাপড় দশ টাকায় এবং অপর এক ব্যক্তি বিশ টাকা মূল্যের একটি কাপড় দশ টাকায় কিনল। তারপর প্রথম ব্যক্তিকে সেটি তার কাপড়ের সাথে বিক্রি করতে আদেশ দিল। সে মতে প্রথম ব্যক্তি কাপড় দুটি এই বলে বিক্রি করল যে, এর দাম পড়েছে বিশ দিরহাম এবং দশ টাকা লাভে তোমার কাছে বিক্রি করছি। ক্রেতা কাপড় দুটি কিনল এবং কবজাও করল। তারপর সে দেখল আদেশদাতার কাপড়ে একটি দোষ আছে এবং সে হিসেবে সে তার কাপড়টি ফেরত দিতে চাইল। সে বলল, তুমি একই চুক্তিতে বিশ টাকায় কাপড় দুটি কিনেছিলে। এখন এর আসল দাম ও লাভ তিন ভাগ করে, তার দুই ভাগের বদলে এটি ফেরত দেব, কিন্তু বিক্রেতা বলল, না; এ দুটি দুই চুক্তিতে

কেনা ছিল। কাজেই অর্ধেক দামে এটি ফেরত দাও। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে, তবে তাকে এই মর্মে কসম করতে হবে যে, আল্লাহর কসম, বিক্রেতা যা বলছে, তার জানা নেই যে, বিষয়টা সে রকমই। তারা উভয়ে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে ক্রেতার প্রমাণ গৃহীত হবে। সুতরাং সে বিক্রেতার কাছ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য ফেরত পাবে আর বিক্রেতা তার আদেশদাতার কাছ থেকে অর্ধেক মূল্য অর্থাৎ পনের টাকা ফেরত নেবে। পাঁচ টাকা তার মাল থেকে লোকসান যাবে।

যদি ক্রেতা দুই চুক্তির দাবী করে এবং বিক্রেতা দাবী করে যে, চুক্তি ছিল একটি, তবে সে ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথাই গৃহীত হবে। আর যদি প্রমাণ পেশ করে, তবে ক্রেতার প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে (আল-কাফী)।

৫০. মাসআলা : ক্রেতা যদি অদিষ্ট ব্যক্তির কাপড়ে দোষ পায়, তবে দশ দিরহামের বদলে সেটি ফেরত দেবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে ক্রেতার প্রমাণ গৃহীত হবে। যদি আদেশদাতার কাপড়ে দোষ পায়, তবে সেটি ফেরত দেবে পনের দিরহামের বদলে। কেননা ক্রেতা তাতে পনের দিরহামের দাবী করছে আর বিক্রেতা তাতে অতিরিক্ত পাঁচ দিরহাম স্বীকার করেছে। এখন সে চাইলে তার কথা তাসদীক করতঃ তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করবে আর চাইলে পরিত্যাগ করবে।

আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এ হুকুম সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন বিক্রেতা তার স্বীকারোক্তি নিয়ে পীড়াপীড়ি করবে। যদি সে তার স্বীকারোক্তি নিয়ে পীড়াপীড়ি না করে, তবে তার কাছ থেকে সে পাঁচ দিরহাম গ্রহণ করা হবে না (আল-মুহীত)।

৫১. মাসআলা : কেউ যদি কারও কাছে কেনা দামে মাল বিক্রি করে এবং বলে, এর যে দাম পড়েছে তাই দিও, কিন্তু ক্রেতার জানা না থাকে যে, তার দাম কত পড়েছে, তবে সে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। যদি মজলিসের ভেতরই বিক্রেতা তাকে তা অবগত করে তবে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে, কিন্তু ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে তা রাখবে আর চাইলে পরিত্যাগ করবে (আল-কাফী)।

৫২. মাসআলা : যদি দশ টাকায় কাপড় কেনে এবং সেটি দশ-এগার এই হারে লোকসানের চুক্তিতে বিক্রি করে, তবে মূল দামের প্রত্যেক টাকাকে এগার ভাগ করা হবে। সর্বমোট একশ' দশটি ভাগ হবে। তারপর প্রতি এগার ভাগ থেকে এক ভাগ করে বিয়োগ দেওয়া হবে এভাবে মোট দশ ভাগ বিয়োগ করা হবে। এ জাতীয় মাসাইলে এ নিয়মই জারি হবে। সুতরাং যদি দশ-বার এই হারে লোকসানের চুক্তিতে বিক্রি করে তবে প্রত্যেক টাকাকে বার ভাগ করা হবে। সর্বমোট ভাগ হবে একশ' বিশটি এবং তা থেকে বিয়োগ যাবে বিশ ভাগ (আল-মুহীত)।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : হক প্রমাণিত হওয়া প্রসঙ্গে

১. মাসআলা : পণ্যের ভেতর ক্রেতার বিপরীতে অন্য কারও হক প্রমাণিত হলে তদ্রূপ পূর্বের বেচাকেনা সেই হকদারের অনুমতির উপর স্থগিত হয়ে যায়। জাহিরী রিওয়াজাত অনুযায়ী এর ফলে সে বেচাকেনা বাতিল বা রহিত হয়ে যায় না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : সে বিক্রি কখন রহিত হবে সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। সঠিক মত এই যে, ক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত না পাবে, বিক্রি রহিত হবে না। সুতরাং হকদারের পক্ষে রায় দেওয়ার পর অথবা তার কবজার পর ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণের আগে যদি হকদার বিক্রি অনুমোদন করে তবে বিক্রি কার্যকর হবে (আন-নাহরুল ফায়িক)।

৩. মাসআলা : কেনা মাল যদি একটি হয়, যেমন একটি কাপড় বা গোলাম এবং কবজার আগে বা পরে তার অংশ বিশেষে কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে অবশিষ্ট অংশে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে অংশের মূল্য দিয়ে সে তা রাখবে, অথবা পরিত্যাগ করবে। যদি খরিদকৃত পণ্য দুটি হয়, যেমন দুটি কাপড় বা দুটি গোলাম এবং কবজার আগেই তার একটিতে কারও হক প্রমাণিত হয় অথবা একটি কবজা করার পর অন্যটিতে হক প্রমাণিত হয়, তবে অন্যটির ভেতর ক্রেতার ইখতিয়ার লাভ হবে। যদি কবজার পর একটিতে হক প্রমাণিত হয়, তবে সে ক্ষেত্রে অন্যটির মধ্যে ক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না, যদিও তাতে চুক্তি বিভক্ত হয়ে গেল।

পণ্য যদি ওজনী বা কায়লী দ্রব্য হয় এবং কবজার আগে তার অংশ বিশেষের মধ্যে কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে অবশিষ্ট অংশে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি কবজার পর তার অংশ বিশেষের মধ্যে কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) হতে এ সম্পর্কে দুটি মত বর্ণিত আছে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : এক ব্যক্তির তিন কাফীয গম আছে। সে তা থেকে এক কাফীয বিক্রি করল, তারপর অন্য এক ব্যক্তির কাছে আরেক কাফীয বিক্রি করল, তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে তৃতীয় কাফীয বিক্রি করল এবং তারপর তাদেরকে তিনও কাফীয মেপে দিল। এরপর সমুদয়ের এক কাফীযের ভেতর কারও হক প্রমাণিত হল। এরূপ ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি তৃতীয় কাফীয নিয়ে যাবে (আয-যাহীরিয়া)।

৫. মাসআলা : বিক্রিত পণ্য বা জবরদখলী মালে বিক্রি অথবা জবরদখলের পর কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে টাকা ফেরত নেবে এবং জবরদখলকারী দায় মুক্ত হয়ে যাবে।

৬. মাসআলা : কেউ যদি কাপড় কেনে বা কারও থেকে কেড়ে নেয় এবং তারপর তা দিয়ে জামা বানায় অথবা তা যদি গম হয় এবং সে তা পিষে আটা বানায় কিংবা এরূপ ছাগল যবাহ করত রান্না করে ফেলে এবং তারপর তাতে কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে ক্রেতা তার টাকা চাইতে পারবে না এবং জবরদখলকারীও দায়মুক্ত হবে না। বরং মালিক তার উপর জরিমানা আরোপের অধিকার রাখবে। যদি কাপড় সেলাই না করে এবং ছাগল রান্না না করে থাকে, তবে ক্রেতা টাকা ফেরত চাইতে পারবে এবং জবরদখলকারী দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

যদি একজন প্রমাণ পেশ করে যে, ছাগলের মাথা তার অপর একজন প্রমাণ পেশ করে যে, গোশত তার এবং আরেকজন প্রমাণ দেখায় যে, চামড়া তার, তবে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে টাকা ফেরত চাইতে পারবে না।

তদ্রূপ খরিদা কাপড় কাটার পর সেলাই করার আগে যদি কেউ প্রমাণ পেশ করে যে, হাতা দুটি তার, আরেকজন প্রমাণ পেশ করে যে, কলি তার এবং আরেকজন প্রমাণ দেখায় যে, দেহের অংশ তার, এ ক্ষেত্রেও বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতা তার টাকা ফেরত নিতে পারবে না (আল-কাফী)।

৭. মাসআলা : কবজার আগে যদি কেউ পণ্যটি তার বলে দাবি করে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা দাবি করে যে, বিক্রেতা সেই হকদারের কাছ থেকে সেটি ক্রয় করেছে এবং তারপর কবজা করতঃ ক্রেতার কাছে বিক্রি করেছে তবে তাদের প্রমাণ গৃহীত হবে। যদি তারা প্রমাণ দেখাতে না পারে, যদ্রূপ কাফী তাদের মধ্যকার বেচাকেনা বাতিল ঘোষণা করে, সেমতে বিক্রেতা ক্রেতাকে টাকা ফেরত দিয়ে দেয় এবং তারপর বিক্রেতা প্রমাণ পেশ করে, তবে বিক্রি বাতিলের রায় নাকচ হয়ে যাবে না। হকদারের হক যদি ক্রেতার মাল কবজা করার পর প্রমাণিত হয়, তবে বিক্রি বাতিলের রায় নাকচ হয়ে যাবে এবং তাতে শেষোক্ত ক্রেতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি কাফীর ফায়সালা ছাড়াই ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলে বিক্রি রহিত করে, যেমন ক্রেতা তার টাকা ফেরত চাইল এবং বিক্রেতা তা দিয়ে দিল, তবে তাদের সে রহিতকরণ কোন অবস্থাতেই বাতিল হবে না। যদি বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া ক্রেতা একাকি বিক্রি রহিত করে, তবে যাবত না কাফী সে বিক্রি রহিত করবে, তা রহিত হবে না (আল-হাবী)।

৮. মাসআলা : 'আল মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি এক হাজার দিরহামে কোন গোলাম কেনে এবং কবজার আগে বা পরে বিক্রেতা সে মূল্য ক্রেতাকে দান করে দেয় এবং তারপর তাতে কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে বিক্রেতার কাছে ক্রেতার কিছু দাবি করার সুযোগ থাকবে না। গোলামের হকদার যদি তার পক্ষে রায় হওয়ার আগেই বিক্রি অনুমোদন করে, তবে বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতা প্রদত্ত দানও বৈধ হয়ে যাবে। যদি সে দান মূল্য কবজা করার আগে হয়ে থাকে। বিক্রেতার কর্তব্য হবে অনুরূপ মূল্য গোলামের মালিককে পরিশোধ করা। কবজার পর দান জায়েয হবে না। ক্রেতা সেটা আদায় করলে গোলামের মালিক তার মালিকানা লাভ করবে (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : গোলাম কেনার পর তা কাউকে হিবা করে দিল, আর হিবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দিল। তারপর সেটা অন্য কারও গোলাম বলে প্রমাণিত হল। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্রেতা হিবাপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে মূল্য ফেরত না নেয়া পর্যন্ত প্রথম ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। দ্বিতীয় ক্রেতা ফেরত নেওয়ার পরই সে তা ফেরত চাওয়ার সুযোগ পাবে (আয-যহীরিয়া)।

১০. মাসআলা : কেউ যদি গোলাম কিনে কবজা করে এবং তারপর কাউকে হিবা (দান) বা সাদাকা করে দেয়, তারপর কোন লোক এসে যাকে হিবা বা সাদাকা করা হয়েছিল তার কাছ থেকে গোলামটিকে স্বীয় মালিকানার দাবিতে নিয়ে যায়, তবে ক্রেতার এই অধিকার থাকবে যে, সে তার বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণ করবে।

যদি গোলাম ক্রয়ের পর সেটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দেয় এবং সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে কেউ স্বীয় মালিকানার দাবিতে গোলামটি নিয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত তার (প্রথম ক্রেতার) কাছ থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণ না করবে ততক্ষণ সে তার বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : ক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় ক্রীতদাসী যদি তার ঔরস ছাড়া সন্তান প্রসব করে এবং এই অবস্থায় কেউ যদি সাক্ষ্যে ক্রীতদাসীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে, তবে ক্রীতদাসীর সাথে সন্তানটিও সেই ব্যক্তির হয়ে যাবে। আর যদি ক্রেতার স্বীকারোক্তি দ্বারা হক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে বাচ্চাটি মায়ের অনুবর্তী সেই ব্যক্তির হয়ে যাবে না। যদি কাযীর রায় হয়ে যায় যে, ক্রীতদাসীর মালিক অন্য কোন ব্যক্তি এবং কাযী বাচ্চাটি সম্পর্কে অবগত না থাকে, তবে সে রায় বাচ্চাটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এমনভাবে যদি বাচ্চাটি অন্য কারও হাতে থাকে এবং সে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে তখনও বাচ্চাটি রায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না (আল-কাফী)।

১২. মাসআলা : কোন গোলাম যদি কাউকে বলে, 'আমাকে কিনুন, আমি গোলাম' এবং সেমতে লোকটি তাকে কেনে, কিন্তু কেনার পর দেখে, সে স্বাধীন মানুষ, তবে বিক্রেতার অবস্থা লক্ষ্য করতে হবে। সে যদি উপস্থিত থাকে কিংবা অনুপস্থিত থাকলেও কোথায় আছে, তা জানা থাকে, তবে গোলামের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না। আর বিক্রেতা অনুপস্থিত থাকে এবং কোথায় আছে তাও জানা না থাকে, তবে ক্রেতা-বিক্রেতাকে পরিশোধিত তার মূল্য সেই ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করে নেবে, যে বলেছিল, 'আমাকে কিনুন, আমি গোলাম'। তারপর সেই ব্যক্তি যা পরিশোধ করল পারলে তা তার বিক্রেতার কাছ থেকে সে আদায় করে নেবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

১৩. মাসআলা : কেউ যদি কোন বাড়িতে অনির্দিষ্ট পরিমাণ হক দাবি করে, কিন্তু বিবাদী তা অস্বীকার করে, তারপর সে একশ' দিরহামের বিনিময়ে বাঁদীর সঙ্গে আপোষরফা করে এবং বাঁদী তা গ্রহণ করে নেয়, তারপর সে বাড়ির অংশ বিশেষে অন্য কারও হক প্রমাণিত হয়, তবে বিবাদী সে ক্ষেত্রে বাঁদীর কাছে তার প্রদত্ত অর্থ ফেরত চাইতে পারবে না।

যদি সে লোক সবটা বাড়িই নিজের বলে দাবি করত এবং বিবাদী একশ' দিরহাম দিয়ে আপোষরফা করত, তবে তখন সে আপোষ বাতিল হওয়া অনিবার্য।

যদি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করে, তবে সে প্রমাণ গৃহীত হবে না। অবশ্য সে যদি দাবি করে যে, বিবাদী তার কাছে তার হকের কথা স্বীকার করেছিল, তখন তার দাবি সঠিক হবে এবং তখন প্রমাণও গৃহীত হবে (আল কাফী)।

১৪. মাসআলা : যদি বাড়ির সুনির্দিষ্ট পরিমাণে স্বীয় হক দাবি করে, যেমন তার এক-চতুর্থাংশে বা এমন কিছু, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পরিমাণ তার হাতে বাকি থাকবে, ততক্ষণ তার কাছ থেকে কিছু ফেরত চাইতে পারবে না। যদি তার চেয়েও কম বাকি থাকে, তবে যে পরিমাণে কারও হক প্রমাণিত হল, সেই হিসেবে বাঁদীর কাছ থেকে সে তার প্রদত্ত অর্থ ফেরত চাওয়ার অধিকার লাভ করবে (আল-বাহরুর রায়িক)।

১৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি বাঁদী কিনল এবং তাকে কবজা করল, তারপর সে বাঁদীটি দাবি করল যে, সে স্বাধীন নারী বা সে অমুকের মালিকানাধীন বা তাকে আযাদ করা হয়েছিল অথবা সে মুদাব্বার বা অমুকের উম্মু ওয়ালাদ আর সেই ব্যক্তি তা তাসদীক করল অথবা ক্রেতার কাছে কসম চাওয়া হল, কিন্তু সে কসম করতে অস্বীকার করল, এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না। যদি প্রমাণ পেশ করে যে, যে ব্যক্তি বাঁদীটির হক দাবি করেছে বাঁদীটি তারই মালিকানাধীন, তবে সে প্রমাণ গৃহীত হবে না। যদি এই মর্মে প্রমাণ পেশ করে যে, বিক্রেতা স্বীকার করেছিল, দাবিদার ব্যক্তিই বাঁদীটির মালিক, তবে সে প্রমাণ গৃহীত হবে। যদি ক্রেতা প্রমাণ পেশ করে যে, বাঁদীটি মৌলিকভাবেই স্বাধীন আর বাঁদীটি দাবি করেছে বা প্রমাণ পেশ করেছে যে, সে অমুক ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিল, পরে সে তাকে আযাদ করে দিয়েছে বা তার মৃত্যুর পর সে স্বাধীন হয়ে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে কিংবা বিক্রির আগে তার গর্ভে সে সন্তান উৎপাদন করেছে, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে। সুতরাং ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছ থেকে বাঁদীর মূল্য আদায় করে নেবে (আল-কাফী)।

১৬. মাসআলা : খরিদা দাসীকে কবজা করে অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দিল তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে তৃতীয় কারও কাছে বিক্রি করল। তারপর বাঁদীটি নিজেকে স্বাধীন বলে দাবি করল আর সে কথার উপর তৃতীয় ব্যক্তি বাঁদীটি তার বিক্রেতাকে ফেরত দিল এবং দ্বিতীয় বিক্রেতা তাকে গ্রহণ করে নিল, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে প্রথম ব্যক্তির কাছে ফেরত দিতে চাইল, কিন্তু সে তা গ্রহণ করল না। এ ক্ষেত্রে বিধান কী? ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, বাঁদী যদি নিজেকে 'মুক্তপ্রাপ্ত' বলে দাবি করে থাকে, তবে তাকে ফেরত গ্রহণ না করার ইখতিয়ার প্রথম ব্যক্তির থাকবে। পক্ষান্তরে যদি সে নিজেকে মৌলিকভাবে স্বাধীন বলে দাবি করে, তবে বিক্রি ও সমর্পণকালে সে তা মেনে নিয়েছিল কিনা তা দেখতে হবে। যদি সে তখন তা মেনে নিয়ে থাকে, তবে তার হুকুম 'মুক্তপ্রাপ্ত' বলে দাবি করার মতই হবে। যদি সে তাকে বিক্রি ও সমর্পণ করার বিষয়টি মেনে না নেয় এবং তারপর নিজেকে স্বাধীন নারী বলে দাবি করে, তবে প্রথম বিক্রেতার তাকে ফেরত গ্রহণ না করার কোন ইখতিয়ার থাকবে না।

১৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি বাঁদী কিনল, কেনার সময় বাঁদীটি উপস্থিত ছিল না। এরপর ক্রেতা তাকে কবজা করল। কবজাকালে সে নিজেকে ক্রীতদাসী বলে স্বীকার করেনি। পরে ক্রেতা তাকে অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দিল। এই দ্বিতীয় বেচাকেনার সময়ও বাঁদীটি উপস্থিত ছিল না। দ্বিতীয় ক্রেতাও তাকে কবজা করল। এরপর সে যদি বলে, আমি স্বাধীন নারী, তবে কাযী তার কথা গ্রহণ করবে। ক্রেতাগণ একে অপরের কাছ থেকে মূল্য ফেরত নিয়ে যাবে। ক্রেতা যদি বলে, বাঁদী তার ক্রীতদাসী হওয়ার কথা স্বীকার করেছিল আর দ্বিতীয় ক্রেতা তা অস্বীকার করে, কিন্তু প্রথম ক্রেতার কাছে বাঁদীর স্বীকারোক্তি সম্পর্কে কোন প্রমাণ না থাকে, তবে দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতা হতে বাঁদীর মূল্য ফেরত নিয়ে যাবে, কিন্তু প্রথম ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাইতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা : কেউ তার গোলামের অর্ধেক বিক্রি করল, কিন্তু সমর্পণ করল না, এরপর অন্য কারও কাছে গোলামটির অর্ধেক বিক্রি করল এবং তার কাছে তা সমর্পণ করল। এখন যদি কোন ব্যক্তি এসে সে গোলামের অর্ধেকের ভেতর দলীল-প্রমাণ দ্বারা স্বীয় হক প্রমাণ করে, তবে তার সে হক উভয় বিক্রিতেই প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি প্রথম ক্রেতা গোলাম কবজা করত আর দ্বিতীয় ক্রেতা কবজা না করত, তবে সে ব্যক্তির হক দ্বিতীয় বিক্রিতে প্রতিষ্ঠিত হত, প্রথম বিক্রিতে নয়। যদি উভয় ক্রেতা কবজা করত, তবে উভয় ক্ষেত্রেই তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হত।

১৯. মাসআলা : কেউ যদি কারও কাছ থেকে এক হাজার দিরহামে দুটি গোলাম কেনে এবং কবজা করে, এরপর একটি গোলামের অর্ধেকের কারও মালিকানা স্বত্ব প্রমাণিত হয়, তবে অপর গোলামটিতে তার অংশের মূল্যে বিক্রি অবধারিত হয়ে যাবে। সুতরাং ক্রেতা তাকে নিতে বাধ্য থাকবে। আর যে গোলামটির অর্ধেকের অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে গোলামটিতে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত (আয-যহীরিয়া)।

২০. মাসআলা : যদি বিক্রেতা সে গোলামটির অর্ধেক তার কাছে বিক্রি করে এবং অপর অর্ধেক তার কাছে আমানত রেখে থাকে অথবা প্রথমে তার কাছে অর্ধেক (বৈধ ভাবে) বিক্রি করে এবং তারপর বাকি অর্ধেক মৃত জন্তু বা রক্তের বিনিমিয়ে বিক্রি করে তবে ক্রেতার বিরুদ্ধে হকদারের মামলা চলবে না। যদি এক ব্যক্তির কাছে গোলামটির অর্ধেক বিক্রি করে এবং অপর কারও কাছে বাকি অর্ধেক আমানত রাখে, তবে কেনা অংশের অর্ধেক অর্থাৎ গোলামের এক-চতুর্থাংশের ভেতর বিক্রি কার্যকর হওয়ার ফায়সালা দেওয়া হবে (আল-কাফী)।

২১. মাসআলা : এক ব্যক্তি একখণ্ড জমি কিনল এবং তা আবাদ করল। এরপর প্রমাণিত হল সেটা অন্য কারও হক। এখন আবাদের কাজে সে যা খরচ করল তা কি বিক্রেতার কাছে দাবি করতে পারবে? এ মাসআলা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেউ বলেন, দাবি করতে পারবে না।

২২. মাসআলা : শামসুল-ইসলাম আল-আযওয়াজানদী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি একটা বাঁদী কিনল। পরে প্রকাশ পেল, সে স্বাধীন নারী। ইতিমধ্যে বিক্রেতার মৃত্যু

হয়ে গেছে। সে কোনও সম্পত্তি রেখে যায়নি। তার কোন ওয়ারিস বা ওয়াসীও নেই। অবশ্য সেই মৃত ব্যক্তি যার কাছ থেকে কিনেছিল, সে জীবিত আছে। এখন এর সমাধান কী? তিনি বললেন, কাযী মৃত ব্যক্তির পক্ষে একজন ওয়াসী নিযুক্ত করবে। ক্রেতা সেই ওয়াসীর কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেবে এবং ওয়াসী তা সেই জীবিত ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করে নেবে, যার কাছ থেকে মৃত ব্যক্তি কিনেছিল (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা : কেউ যদি কোন মাল কেনে তারপর কেউ সে মালে স্বীয় স্বত্বাধিকার প্রমাণ করত তার হাত থেকে তা নিয়ে যায়, তারপর ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে টাকা ফেরত নিয়ে নেয় তারপর সে মাল যে কোন পন্থায় ক্রেতার হাতে ফিরে আসে, তবে তখন বিক্রেতার হাতে তা সমর্পণ করার জন্য তাকে বাধ্য করা যাবে না।

২৪. মাসআলা : কেউ যদি বিক্রেতার মালিকানা স্বীকার করে কোন মাল কেনে। তারপর সেটি অন্য কারও হক বলে প্রমাণিত হয় এবং সেমতে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে টাকা ফেরত নিয়ে নেয়, তারপর যে-ভাবেই হোক সে মাল ক্রেতার হস্তগত হয়, তবে তখন বিক্রেতার হাতে সেটি প্রত্যর্পণ করার জন্য তাকে আদেশ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা : খরিদা দাসীর মূল্য পরিশোধ করে তা কবজা করা হল। এরপর এক ব্যক্তি দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করল, বাঁদীটি তার। সেমতে ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে টাকা ফেরত নিতে চাইল, কিন্তু বিক্রেতা বলল তুমি তো জান যে সাক্ষ্য মিথ্যা এবং বাঁদীটি আমারই ছিল, ক্রেতাও তা স্বীকার করল। এ অবস্থায় ক্রেতার মূল্য ফেরত পাওয়ার অধিকার বাতিল হবে না। হ্যাঁ, যে-কোন দিন যে-ভাবেই হোক বাঁদীটি যদি ক্রেতার হস্তগত হয়, তবে বিক্রেতার হাত থেকে সমর্পণ করার জন্য সে বাধ্য থাকবে (আয-যহীরিয়া)।

২৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি বাঁদী কিনল এবং কবজা করল। তারপর তার কাছ থেকে অমুসলিম রাষ্ট্রের লোক সেটি কিনে নিল। তারপর আবার এই ব্যক্তি সেটি তাদের কাছ থেকে ক্রয় করল, তারপর এক ব্যক্তি দলীল-প্রমাণ দেখাল যে, বাঁদীটি তার। সেমতে কাযী বাঁদীটিকে নিয়ে যাওয়ার ফায়সালা দিল। এরূপ ক্ষেত্রে বাঁদীটির প্রথম বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণ করতে পারবে (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি বাঁদী কিনল এবং অপর এক ব্যক্তি জামিন হল যে, এতে অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হলে সে বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্য ফেরত এনে দেবে। তারপর ক্রেতা বাঁদীটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করল এবং সেও অন্য কারও কাছে বিক্রি করল এবং এরা সকলে বাঁদী ও মূল্য কবজা করল। তারপর প্রমাণিত হল বাঁদীটির মালিক অন্য কেউ। এরূপ ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত কাযীর ফায়সালা না হবে যে, বিক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিতে হবে, ততক্ষণ কোন ক্রেতাই তার বিক্রেতার কাছ থেকে টাকা ফেরত চাইতে পারবে না। এমনিভাবে প্রথম ক্রেতাও তার জামিনের কাছে মূল্য চাইতে পারবে না, যাবত না তার সম্পর্কেও ফায়সালা দেওয়া হয় যে, তাকে মূল্য ফেরত দিতে হবে। হকদারের পক্ষে রায় হয়ে যাওয়ার পর এদের কেউ যদি প্রমাণ পেশ করে যে, বাঁদীটি ক্রেতারই ছিল, তবে সে প্রমাণ গৃহীত হবে না। যদি গোলামের ভেতর অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত না হয়, বরং প্রমাণ পেশ করে যে, সে

মৌলিকভাবেই স্বাধীন অথবা অমুকের গোলাম ছিল, কিন্তু সে তাকে আযাদ করে দিয়েছিল কিংবা অন্য কেউ প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার গোলাম এবং সে ঘোষণা করেছে যে, তার মৃত্যুর পরে সে আযাদ হয়ে যাবে এবং এর যে-কোনও একটি সম্পর্কে রায় হয়ে যায়, তবে এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিতে হবে- এ মর্মে রায় হওয়ার আগেও প্রত্যেক ক্রেতা তার বিক্রেতার কাছে তার মূল্য ফেরত চাইতে পারবে। এমনিভাবে প্রথম ক্রেতা ও বিক্রেতার কাছে চাওয়ার আগে জামিনের কাছে মূল্য ফেরত চাওয়ার ইখতিয়ার রাখবে (আল-হাবী)।

২৮. মাসআলা : কেউ যদি কোন বাঁদী কিনে কবজা করে, এরপর অন্য কেউ দাবি করে যে, বাঁদীটি তার এবং তার কাছ থেকেও সে বাঁদীটি ক্রয় করে, তারপর বাঁদীর গর্ভে তার ঔরসে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং তারপর সে বাঁদীতে অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হয়, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ক্রেতা উভয় বিক্রেতার কাছ থেকেই মূল্য ফেরত পাবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয়ের সময় থেকে ছয় মাসের অধিক কাল পর যদি বাচ্চা দিয়ে থাকে, তবে সে বাচ্চা বাবদ যে অর্থ হকদারকে আদায় করবে ক্রেতা তাও দ্বিতীয় বিক্রেতার কাছে দাবি করতে পারবে। যদি সে সময় থেকে ছয় মাসের কম মেয়াদের ভেতর বাচ্চা জন্ম নেয়, তবে দুই বিক্রেতার কারও কাছেই সে বাচ্চার মূল্য দাবি করতে পারবে না।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, খরিদকৃত জমিতে অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হলে বিক্রেতাকে সে জমির ঘর, বৃক্ষ ও ফসলের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। ফসলের ক্ষেত্রে প্রথমে তার মূল্য নিরূপণ করবে এবং তারপর বিক্রেতা তা পরিশোধ করবে (আল-মুহীত)।

২৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি বাড়ি কিনে কবজা করল। তারপর অপর এক ব্যক্তি এসে সে বাড়ির অর্ধেক স্বীয় মালিকানা প্রমাণ করল, তারপর ক্রেতা প্রমাণ দিল যে, সে সেই হকদারের কাছ থেকে ক্রয় করেছে, কিন্তু তার সময় বর্ণনা করল না। এখন এর সমাধান কী? ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার কাছে মূল্যের কিছু মাত্র ফেরত চাইতে পারবে না। সে তো এমনই এক ব্যক্তি, যে একটি বাড়ি কিনল, তারপর সে বাড়িতে অন্য কেউ হক দাবি করল এবং ক্রেতা সেই দাবিদারের কাছ থেকেও বাড়িটি কিনে নিল। কাজেই এ অবস্থায় বিক্রেতার কাছে কিছুই ফেরত চাওয়ার ইখতিয়ার তার থাকবে না। ক্রেতা যদি প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, সে বাড়িতে দাবিদারের অর্ধেক হক প্রমাণিত হওয়ার পরেই সে দাবিদারের কাছ থেকে বাড়িটি ক্রয় করেছে, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে। এ ক্ষেত্রে তার বিক্রেতার কাছে অর্ধেক মূল্য ফেরত চাওয়ার ইখতিয়ার থাকবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইবন সামাআ (র)-এর দ্বারা যেসব মাসাইল লিপিবদ্ধ করান, তাতে আছে, এক ব্যক্তি খালি জমি কিনে তাতে গৃহ নির্মাণ করল। তারপর সে জমিতে অন্যের মালিকানা প্রমাণিত হওয়ায় কাযী ক্রেতাকে ঘর ভেঙে ফেলার আদেশ দিলেন। ক্রেতা ঘর ভেঙে ফেলল এবং ঘরের উপকরণ ধ্বংস করে ফেলল। তো এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে সে ঘরের কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে না।

সে যদি ইচ্ছাকৃত তা নষ্ট না করে, বরং বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যায়, যেমন হয়ত মাটির ভাল ঘর ছিল এবং বৃষ্টিতে ভিজে তা কাদা হয়ে গেল অথবা অন্য কেউ তার ঘর ভেঙে ফেলল এরূপ

ক্ষেত্রে ভাল ঘর ও ভাঙা ঘরের দামের যে পার্থক্য, সেই অতিরিক্ত মূল্য বিক্রেতাকে আদায় করতে হবে। বিক্রেতা চাইলে এমনও হতে পারে যে, সে সেই ভাঙা ঘর গ্রহণ করবে এবং তাকে নির্মিত ঘরের দাম পরিশোধ করবে আর এভাবে ভাঙার কারণে ঘরের যে ক্ষতি হল ক্রেতাকে সর্বতোভাবে তা থেকে উদ্ধার করবে। বিক্রেতা এ পন্থা অবলম্বন করলে তখন ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে তাতে সম্মত হবে অথবা তা প্রত্যাখ্যান করবে। এমনিভাবে কারও কোন দুর্ভিক্ষের কারণে ঘরের যে-কোন রকমের ক্ষতি সাধন হলে সে ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। তারা উভয়ে যে কোন এক পন্থায় একমত হয়ে গেলে সেটাই কার্যকর করা হবে। আর যদি তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তবে সে ঘর ক্রেতার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে এবং ভাঙা ঘরের চেয়ে নির্মিত ঘরের দাম যতটুকু বেশী, সেই পরিমাণ অর্থ বিক্রেতা ক্রেতাকে পরিশোধ করবে। ঘরের ক্ষতিটা যদি কোন ব্যক্তির দ্বারা সাধিত না হয়, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম; ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, ঘরটি সে রেখে দেবে এবং ভাঙা ঘর অপেক্ষা ভাল ঘরের দাম যতটুকু বেশী সে পরিমাণ অর্থ বিক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে নেবে (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি বাড়ি কিনল এবং তাতে গৃহ নির্মাণ করল। তারপর সে কোথাও চলে গেল। এই অবসরে বিক্রেতা বাড়িটি অন্য কারও কাছে বিক্রি করল। দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ব্যক্তির নির্মাণ ভেঙে ফেলল এবং তাতে নতুনভাবে নির্মাণ কার্য করল। তারপর প্রথম ক্রেতা ফিরে এসে সে বাড়িতে মালিকানা প্রমাণ করল। এ অবস্থায় দ্বিতীয় ক্রেতা যদি তার নির্মাণে নিজস্ব উপকরণ ব্যবহার করে থাকে, তবে এই নির্মিত বাড়িতে প্রথম ব্যক্তির নির্মাণের যতটুকু অংশ আছে তার মূল্য দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। আর ভেঙে ফেলা ঘরের উপকরণ যদি সংরক্ষিত থাকে, তবে তা প্রথম ক্রেতা পাবে। দ্বিতীয় ক্রেতা তা নষ্ট করে থাকলে, তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। দ্বিতীয় ক্রেতা যদি প্রথম ব্যক্তির নির্মাণ ধ্বংস করত সে উপকরণই দ্বিতীয় নির্মাণে ব্যবহার করে থাকে, তবে নতুন নির্মাণে প্রথম ব্যক্তির যে অংশ আছে তার মূল্য দ্বিতীয় ক্রেতা প্রথম ক্রেতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। এ অবস্থায় প্রথম ক্রেতা ঘরটি স্বীয় দখলে রাখতে পারবে, দ্বিতীয় ক্রেতা তাকে বাধা দিতে পারবে না। দ্বিতীয় ক্রেতা তাতে বেশী কিছু যোগ করে থাকলে প্রথম ব্যক্তি তাতে তার দাম দিয়ে দেবে, কিন্তু তাতে যে শ্রম খরচা লেগেছে তাকে তা পরিশোধ করতে হবে না (যখীরা)।

৩২. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি বাঁদী কিনল এবং তাকে কবজা করল। বাঁদীটি তার ঔরসে সন্তান জন্মাল। তারপর সে তাকে আযাদ করে দিল এবং তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করল। এরপর সে তার গর্ভে আরও একটি সন্তান লাভ করল। তারপর প্রমাণিত হল বাচ্চাটির মালিক অন্য কেউ। এ ক্ষেত্রে তাকে একটি মোহরানাই পরিশোধ করতে হবে। এমনিভাবে সে যদি তাকে আযাদ করার পর বিবাহ না করে, বরং 'আল্লাহ পানাহ' তার সাথে ব্যাভিচার করে থাকে এবং এভাবে তার গর্ভে তার কয়েকটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং এরপর প্রমাণিত হয় বাঁদীটির মালিক অন্য কেউ, তবে এ ক্ষেত্রে হকদারকে তার একটি মাত্র মোহরানাই আদায় করতে হবে। সে যে তাকে আযাদ করেছিল তা সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যাবে, যেন আযাদ করেই

নি। বাচ্চাদের পিতৃ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হবে। তাকে তাদের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যেসব বাচ্চা আযাদ করার আগে জন্ম নিয়েছিল তাদের মূল্য সে বিক্রেতার কাছে দাবি করতে পারবে। কিন্তু যারা আযাদ করার পরে জন্ম নিয়েছে তাদের মূল্য সে বিক্রেতার কাছে দাবি করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৩৩. মাসআলা : খরিদা দাসীর মালিকানা দাবি করে এক ব্যক্তি তাকে নিয়ে গেল। কিন্তু মালিকানার সূত্র উল্লেখ করল না। কাযী সেই হকদারে পক্ষেই রায় দিল যে, বাঁদীটি তার। বাঁদীটি ক্রেতার বেহাত হয়ে যাওয়ায় সে বিক্রেতার কাছে তার মূল্য ফেরত দাবি করল। এখন বিক্রেতা যদি প্রমাণ দেখায় যে, বাঁদীটি তার মালিকানায় অপর এক বাঁদীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছে। কাজেই দাবিদারের পক্ষে কাযীর রায় সঠিক হয়নি। এ অবস্থায় আমার কাছ থেকে মূল্য ফেরত গ্রহণের কোন অধিকার তোমার নেই, তবে তার সে প্রমাণ গৃহীত হবে, যদি দাবিদারের সম্মুখে সে তার প্রমাণ পেশ করে থাকে। আমাদের কোন কোন ফকীহ এটা অস্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে দাবিদারের সম্মুখেই প্রমাণ পেশ করতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। শামসুল আইম্মা আস-সারাতসী (র) ফারগানায় এরূপ ফাতাওয়া দিয়েছেন বলেও বর্ণিত আছে (আয-যহীরিয়া)।

৩৪. মাসআলা : দুই ব্যক্তি যৌথভাবে একটি দাসী খরিদ করল। এরপর তাদের একজন সে বাঁদীর গর্ভে সন্তান জন্ম দিল এবং সে বাবদ সে তার শরীককে তার অর্ধেক মূল্য এবং অর্ধেক মোহরানাও পরিশোধ করল। তারপর আবার সে তার গর্ভে সন্তান জন্ম দিল। তারপর প্রমাণিত হল সে বাঁদীর প্রকৃত মালিক অন্য কেউ। কাযী রায় দিল বাঁদীর সেই ব্যক্তিরই এবং আরও রায় দিল যে, সন্তান উৎপাদনকারীকে সন্তান দুটির মূল্য ও বাঁদীর মোহরানা পরিশোধ করতে হবে। এ অবস্থায় সন্তান উৎপাদনকারী ব্যক্তি যা কিছু অর্থদণ্ড তার শরীকের পক্ষ থেকে আদায় করবে তা তার কাছে ফেরত দাবি করতে পারবে। তারপর তারা দুজন মিলে বিক্রেতার কাছে বাঁদীর মূল্য ফেরত চাবে। আর সন্তান উৎপাদনকারী ব্যক্তি বিক্রেতার কাছে সন্তান দুটির অর্ধেক মূল্য, অর্থাৎ ক্রয়ের যে অর্ধেক তার ভাগে পড়েছে তার মূল্য দাবি করতে পারবে, বাকি অর্ধেকের মূল্য দাবি করতে পারবে না (আয-যখীরা)।

৩৫. মাসআলা : ইব্ন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি রাস্তায় পড়ে থাকা সেগুন কাঠ কারও কাছে বিক্রি করতঃ তার মূল্য কবজা করে এবং ক্রেতাকে সে কাঠ নিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়, কিন্তু ক্রেতা সেখান থেকে কাঠটি না সরায় তাতেও সে কাঠে ক্রেতার কবজা প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজেই কেউ সে কাঠ পুড়িয়ে ফেললে তাতে ক্রেতার মালই নষ্ট হবে। এরপর যদি কেউ এসে তাতে স্বীয় মালিকানা প্রমাণ করে, তবে তার ইখতিয়ার থাকবে, চাইলে জরিমানাস্বরূপ সেই ব্যক্তির কাছ থেকেও তার মূল্য আদায় করতে পারে, যদি বিক্রেতাই কাঠটি সে স্থানে ফেলে রাখে। ক্রেতা যদি কাঠটি সেখান থেকে না সরায়, তবে হকদার ব্যক্তি তার কাছে কিছু দাবি করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা : বুখারার এক ব্যক্তির হাতে একটি গাধা আছে। অপর এক ব্যক্তি স্বীয় মালিকানার দাবিতে তার হাত থেকে গাধাটি হস্তগত করল। বুখারার সে লোকটি এ ব্যাপারে একটি দলীল লিখিয়ে নিল। যার হাতে গাধাটি ছিল সে যার কাছ থেকে গাধাটি কিনেছিল তার অবস্থান সামারকান্দে। ক্রেতা তাকে সামারকান্দের কাযীর দরবারে হাযির করল এবং তার কাছ থেকে গাধাটির দাম ফেরত নিতে চাইল। সে বুখারাহ্ কাযীর লেখা একটি দলীলও পেশ করল। বিক্রেতা স্বীকার করল যে, সে তার কাছে গাধাটি বিক্রি করেছিল, কিন্তু গাধাটির হকদার যে অন্য কেউ, তা সে অস্বীকার করল। সেই সঙ্গে দলীলটি যে বুখারার কাযীর লেখা তাও সে স্বীকার করল না। বুখারার লোকটি প্রমাণ দেখাল যে, দলীলটি বুখারার কাযীরই লেখা। এখন সামারকান্দের কাযী কি সেই দলীল অনুযায়ী ফায়সালা দেবে? না বরং সাক্ষিগণ কর্তৃক এই সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে যে, বুখারার কাযী বুখারার লোকটির বিরুদ্ধে এই রায় দিয়েছে যে, সে এই বিক্রেতার কাছ থেকে যে গাধাটি কিনেছিল, সেটির প্রকৃত মালিক দাবিদার লোকটি এবং সেমতে কাযী তার হাত থেকে গাধাটি মুক্ত করত হকদারকে সমর্পণ করেছে। তারা এরূপ সাক্ষ্য প্রদান না করা পর্যন্ত উপরোক্ত দলীল অনুযায়ী রায় প্রদান করা তার জন্য জায়েয হবে না (আয-যখীরা)।

৩৭. মাসআলা : (উপরোক্ত ক্ষেত্রে) বিক্রেতা যদি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে যে, এই গাধাটি আমার বিক্রেতার মালিকানায় পয়দা হয়েছে। আমার কাছ থেকে এর মূল্য ফেরত নেওয়ার কোন হক তোমার নেই এবং এ মর্মে সে প্রমাণও পেশ করে, তবে তার সে প্রমাণ গৃহীত হবে। যদি সে তা সে দাবিদারে উপস্থিতিতে পেশ করে। গাধাটিও উপস্থিত থাকা শর্ত। ইমাম জাহিরুদ্দীন (র) বলেন, গাধাটির উপস্থিতি শর্ত নয়। একই হুকুম হবে গোলাম নিজেকে স্বাধীন বলে দাবি করার ক্ষেত্রে এবং ক্রেতা বিক্রেতার কাছে মূল্য ফেরত চাওয়ার ক্ষেত্রে।

আর গাধার মাসআলায়, যার বিপক্ষে হকের দাবি উঠেছে তার উপস্থিতি শর্ত নয়।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ : বিক্রয় দ্রব্যে এবং বিক্রয় মূল্যে অতিরিক্ত সংযোজন, মূল্য থেকে বিয়োজন, এবং মূল্য হতে অব্যাহতি দান

১. মাসআলা : যে বৃদ্ধি বিক্রিত মাল হতে উৎপন্ন হয়, তাও বিক্রিত বটে, যেমন বাচ্চা, বিভ্রমবশত সহবাসের মোহরানা, অঙ্গহানির অর্থদণ্ড, দুধ, পশম প্রভৃতি (মুহীত : আস সারাখসী)।

২. মাসআলা : এসব বৃদ্ধি যদি মাল কবজার আগে ঘটে, তবে মূল্যের একটা অংশ এসবের উপরও আসবে। আর যদি কবজার পরে এসবের বৃদ্ধি ঘটে, তবে এগুলো বিক্রিত মালের অনুবর্তীরূপে বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে। মূল্যের কোন অংশ এর উপর বর্তাবে না।

কবজার আগে যদি বিক্রেতা বিক্রিত মাল হতে উৎপন্ন বৃদ্ধিটুকু নষ্ট করে ফেলে, তবে তার অংশের মূল্য বাদ যাবে আর সে মূল্য নিরূপণ করা হবে এ হিসেবে যে, আসল মালের মূল্য তো চুক্তির দিনের বাজার দর অনুযায়ী ধরা হবে এবং বাচ্চার মূল্য ধরা হবে যেদিন সেটি ধ্বংস করল সেদিনের বাজার দর অনুযায়ী। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ক্রেতার কোন ইখতিয়ার থাকবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তার ইখতিয়ার থাকবে।

তৃতীয় কোন ব্যক্তি যদি বৃদ্ধিটা নষ্ট করে তবে তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং তা আসলের সঙ্গে বিক্রিত মাল গণ্য হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : মূল্য ও মালে বাড়তি প্রদান জায়েয। যতক্ষণ সে দুটি বলবৎ থাকবে, তা সে বৃদ্ধিটা মূল্য জাতীয় হোক বা অন্য জাতীয়। অতিরিক্ত যা দেওয়া হবে তা মূল চুক্তির সঙ্গে যুক্ত হবে। ক্রেতা অতিরিক্ত দেওয়ার ওয়াদা করার পর যদি অনুতাপ বোধ করে এবং দিতে অস্বীকার করে, তবে তাকে তা দিতে বাধ্য করা হবে। দোষ বা অন্য কোন কারণে যদি ক্রেতা মাল ফেরত দেয় তবে সে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যা দেওয়া হয়েছিল তাও হিসাব করা হবে। যেন এই অতিরিক্তসহই বিক্রি করা হয়েছিল।

ক্রেতা মূল্যে অতিরিক্ত কিছু দিলে মজলিসের ভেতর অপর পক্ষের তা কবুল করা শর্ত। কবুল করার আগেই যদি তারা মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে অতিরিক্তটা বাতিল হয়ে যাবে (আল-খুলাসা)।

৪. মাসআলা : বেশী দেওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, বিক্রিত মাল চুক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত থাকতে হবে। কাজেই ক্রেতা যদি তা ভাড়া দেয়, বা বন্ধক রাখে বা পণ্ড যবাহু করে বা কাপড়

সেলাই করে অথবা (লোহা ইত্যাদি দ্বারা) তরবারি বানায় কিংবা কেউ গোলামের হাত বেটে ফেলে এবং ক্রেতা তার অর্থদণ্ড আদায় করে নেয়, তবে তাতে অতিরিক্ত যোগ বৈধ হবে। কিন্তু সে যদি বন্ধক গ্রহীতার কাছে বা ভাড়া গ্রহণকারীর কাছে মাল বিক্রি করে ফেলে অথবা যবাহুর পর পণ্ড বিক্রি করে বা সেলাই করার পর কাপড় বিক্রি করে, তবে তাতে অতিরিক্ত যোগ করা জায়েয নয়। এমনভাবে যদি গোলাম আযাদ করে ফেলে বা তার সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করলে সে আযাদ হয়ে যাবে বা স্বীয় মৃত্যুর পর সে আযাদ হয়ে যাবে বলে ঘোষণা দেয় অথবা বাদীর গর্ভে সন্তান জন্ম দেয় অথবা গোলাম মারা যায় বা তাকে হত্যা করা হয় অথবা অন্য কাউকে তাকে দান করে দেয় বা তাকে বিক্রি করে ফেলে বা গম পেয়াই করে বা সুতা দ্বারা কাপড় বুনে বা আঙ্গুরের নির্যাস দ্বারা মদ তৈরি করে অথবা মদের ক্রেতা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে এসব অবস্থায় বিক্রিত মালে অতিরিক্ত প্রদান জায়েয নয় (আল-কাফী)।

৫. মাসআলা : বিক্রিত মাল যদি আটা হয় এবং ক্রেতা তা দিয়ে রুটি বানায় অথবা গোশত হয় এবং তা দিয়ে কাবাব বানায় বা ঝোল রান্না করে কিংবা ছাগল হয় এবং তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আলাদা করে ফেলে, এরপর মূল্যে বাড়তি প্রদান করে তবে তা সহীহ হবে না (আল-খুলাসা)।

৬. মাসআলা : মদ সিরকায় পরিণত হওয়ার পর যদি অতিরিক্ত প্রদান করে তবে তা জায়েয হবে এবং এতে কোন মতভেদ নেই (আয-যখীরা)।

৭. মাসআলা : এক হাজার দিরহামে খরিদা গোলাম একশ' দীনারে বিক্রি করল এবং এই ক্রেতা তাকে (মূল্যরূপে) পঞ্চাশ দীনার বেশী দেয়, তারপর কোন দোষের কারণে কাযীর ফায়সালাক্রমে সে ব্যক্তি গোলামটি ফেরত দিল। এ ক্ষেত্রে আসল দাম ও অতিরিক্ত দীনার সবটাই সে ফেরত পাবে। দ্বিতীয় ক্রেতা যদি অতিরিক্ত কোন মাল দেয়, যা মূল্যের অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ দীনারের সমান, তারপর প্রথম ক্রেতা তা কবজার আগেই সে মাল ধ্বংস হয়ে যায়, তবে গোলামের এক-তৃতীয়াংশের ভেতর বিক্রি রহিত হয়ে যাবে। যদি কোন দোষের কারণে গোলামটির বাকি দুই-তৃতীয়াংশ ফেরত দেয় তবে প্রথম ক্রেতা তার বিক্রেতাকে গোটা গোলামই ফেরত দিতে পারবে। যদি এক-তৃতীয়াংশের ভেতর সে ও দ্বিতীয় ক্রেতা পারস্পারিক সম্মতিক্রমে বিক্রি রহিত করে এবং তারপর কাযীর ফায়সালাক্রমে অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ ফেরত দেয়, তবে প্রথম বিক্রেতাকে সে গোলামের কিছুই ফেরত দিতে পারবে না (আল-কাফী)।

৮. মাসআলা : যে সকল স্থানে ক্রেতার পক্ষ হতে অতিরিক্ত প্রদান জায়েয, সে সকল স্থানে তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষ হতেও তা জায়েয (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : তৃতীয় ব্যক্তি যদি ক্রেতার আদেশে অতিরিক্ত প্রদান করে তবে সেটা ক্রেতার দায়িত্বে অনিবার্য হয়ে যাবে। আর যদি ক্রেতার আদেশ ছাড়াই দেয় তবে তা স্বগিত হয়ে থাকবে। ক্রেতা অনুমোদন করলে কার্যকর হবে অন্যথায় বাতিল হয়ে যাবে।

তৃতীয় ব্যক্তি অতিরিক্ত প্রদানকালে যদি ক্রেতার পক্ষ থেকে জামিন হয় অথবা তা নিজের মালের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে, তবে তা তার বিপক্ষে অবধারিত হয়ে যাবে। তারপর দেখা হবে যে, সে তা ক্রেতার আদেশে করেছে কিনা। ক্রেতার আদেশে করে থাকলে তা ক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে, অন্যথায় নয় (আল-খুলাসা)।

১০. মাসআলা : বিক্রিত মাল যতক্ষণ কায়ম থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রিত মাল হতে উৎপন্ন বৃদ্ধিকে বিক্রিতে শর্তযুক্ত বৃদ্ধির সমতুল্য গণ্য করা হবে না। কাজেই শর্তযুক্ত বৃদ্ধিকে বিক্রিত মালের সঙ্গে অতিরিক্ত যোগ করা হবে, উৎপন্ন বৃদ্ধিকে যোগ করা হবে না। মূল্যকে প্রথমে বিক্রিত মাল ও শর্তযুক্ত বৃদ্ধির মধ্যে বন্টন করা হবে। তারপর বিক্রিত মালের ভাগে যা পড়বে তা তার ও তার বাচ্চার মধ্যে বন্টন করা হবে, বিক্রিত মালের ক্ষেত্রে চুক্তির দিনের বাজার দর গণ্য করা হবে, শর্তযুক্ত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে দিন বৃদ্ধি করা হল, সেই দিনের বাজার দর এবং বাচ্চার ক্ষেত্রে কবজার দিনের বাজার দর গণ্য করা হবে।

১১. মাসআলা : এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহামে একটি বাঁদী কিনল। তার বাজার দরও এক হাজার দিরহাম। বাঁদীটি কবজার আগে একটি সন্তান প্রসব করল, যার দামও এক হাজার দিরহাম। তারপর বিক্রেতা ক্রেতাকে একটি গোলাম বেশী দিল, যার দাম এক হাজার দিরহাম। তারপর বাচ্চার দাম বেড়ে দু'হাজার হল। তারপর ক্রেতা তাদেরকে কবজা করল এবং এক হাজার দিরহাম নগদ পরিশোধ করল। এখন যদি সে বাচ্চাটির ভেতর কোন দোষ পায়, তবে সে তাকে এক হাজারের এক-তৃতীয়াংশের বদলে ফেরত দিতে পারবে। যদি মায়ের ভেতর কোন দোষ পায়, তবে তাকে ফেরত দিতে পারবে এক হাজারের এক-ষষ্ঠাংশের বিনিময়ে। আর যদি অতিরিক্ত গোলামটির ভেতর কোন দোষ পায়, তবে তাকে ফেরত দিতে পারবে অর্ধ হাজারের বিনিময়ে।

তদ্রূপ যদি বাঁদীটি সন্তান প্রসব না করে, কিন্তু বিক্রিকালে তার চোখ সাদা থাকে এবং পরে তার চোখের সে সাদা রং দূর হয়ে যায়, তারপর কোন বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় কোন গোলাম সে বাঁদীর চোখ ফুঁড়ে দেয়, ফলে গোলামের মালিক অপরাধের বিনিময়ে গোলামটিকে বিক্রেতার হাতে অর্পণ করে, তারপর বিক্রেতা ক্রেতাকে একটি গোলাম বেশী দেয়, যার মূল্য এক হাজার দিরহাম, তবে এর বিধান উপরের মাসআলারই অনুরূপ। ক্রেতা যখন তাদেরকে কবজা করবে তখন বাঁদীর চুক্তিকালীন বাজার মূল্য এবং প্রদত্ত গোলামটির প্রদানকালের বাজার মূল্য হিসেবে বিক্রয় মূল্যটি ভাগ হবে। তারপর বাঁদীর যে মূল্যবৃদ্ধি হল সেটা ভাগ হবে দাসীর চুক্তিকালীন বাজার মূল্য এবং প্রদত্ত গোলামের কবজাকালীন মূল্যের মাঝে বণ্টিত হবে। এদের কারও ভেতর যদি কোন দোষ পাওয়া যায়, তবে ক্রেতা তাকে তার অংশের মূল্যের বিনিময়েই ফেরত দিতে পারবে।

বিক্রিকালে যদি বাঁদীটির চোখ দুটি ভাল থাকে এবং তখন তার দাম থাকে এক হাজার দিরহাম, তারপর বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় কোন গোলাম তার চোখে আঘাত করে, ফলে চোখ সাদা হয়ে যায়, বিনিময়ে গোলামের মালিক গোলামটি বিক্রেতাকে দিয়ে দেয়, তারপর বিক্রেতা ক্রেতাকে একটি গোলাম অতিরিক্ত দেয়, যার দাম এক হাজার দিরহাম এবং তারপর

ক্রেতা তাদেরকে কবজা করে, তবে এ ক্ষেত্রে মূল্য প্রথমে বাঁদী এবং অতিরিক্ত দেওয়া গোলামটির মধ্যে অর্ধাঅর্ধি বন্টন করা হবে। বাঁদীটির ক্ষেত্রে চুক্তির দিনের মূল্য এবং গোলামের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হিসেবে দেওয়ার দিনের মূল্য ধরা হবে। তারপর বাঁদীর ভাগে যা পড়বে তা তার ও চোখ নষ্ট করার অপরাধে প্রদত্ত গোলামের মধ্যে অর্ধাঅর্ধি বন্টন করা হবে। তাতে গোলামের মূল্য কম হোক বা বেশী।

চোখ ফুঁড়ে দেওয়ার কারণে না হয়ে অন্য কোন কারণে যদি বাঁদীটি মারা যায়, তারপর বিক্রেতা ক্রেতাকে একটি পশু দেয়, যার দাম এক হাজার দিরহাম এবং ক্রেতা তাতে সম্মত হয়, তবে সে বেশী দেওয়াটা সহীহ হবে। ক্রেতা যখন তাকে কবজা করবে, তখন বাঁদী, বাচ্চা ও প্রদত্ত গোলামটির মধ্যে মূল্য বন্টন করা হবে। বাঁদীর ক্ষেত্রে চুক্তির দিনের এবং বাচ্চা ও পশুর ক্ষেত্রে কবজার দিনের মূল্য ধরা হবে। বাঁদীর ভাগে যা পড়বে, তা ক্রেতাকে পরিশোধ করতে হবে না, যেহেতু কবজার আগেই তার মৃত্যু হয়ে গেছে। বাচ্চা বা প্রদত্ত গোলামের ভাগে যা পড়বে তা তার অতিরিক্ত হিসেবে দেওয়া পশুটির মধ্যে বন্টন করা হবে। পশুটির ক্ষেত্রে তাকে অতিরিক্ত হিসেবে দেওয়ার দিনের মূল্য আর বাচ্চা ও গোলামের ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক কবজার দিনের মূল্য ধরা হবে। ক্রেতা যদি এর কোনওটি কবজা না করে এবং ইতিমধ্যে অতিরিক্ততার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে সেটা তার অংশের মূল্যসহই যাবে। সে ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে বাচ্চা বা চোখ ফোঁড়ার অপরাধে প্রদত্ত গোলামকে তার অংশের মূল্যের বিনিময়ে রাখবে অন্যথায় পরিত্যাগ করবে। এটা একটি পৃথক ইখতিয়ার, সেই ইখতিয়ার নয়, যা কবজার আগে বাঁদীর মৃত্যুর কারণে তার লাভ হয়েছিল।

কবজার আগে যদি বাচ্চাটি বা চোখ ফোঁড়ার অপরাধে প্রদত্ত গোলামটি মারা যায় এবং অতিরিক্তটা বাকি থাকে, তবে বিক্রেতার অতিরিক্তটা ক্রেতাকে সমর্পণ না করার ইখতিয়ার থাকবে (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা : যদি এক হাজার দিয়ে দুটি বাঁদী কেনে, তারপর তাদের একটি সন্তান প্রসব করে এবং মারা যায়, তারপর বিক্রেতা একটি গোলাম বেশী দেয় আর এদের প্রত্যেকের দাম হয় এক হাজার দিরহাম। তবে বাচ্চাটির দাম এক হাজার বেশী হয়, এরপর ক্রেতা এদেরকে কবজা করে, তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমে বাঁদী দুটির মধ্যে মূল্য অর্ধাঅর্ধি ভাগ করা হবে। মায়ের অংশে যা পড়বে, তা তার ও বাচ্চার মধ্যে তিন ভাগে ভাগ করা হবে। বাচ্চাটির ক্ষেত্রে কবজার দিনের এবং মায়ের ক্ষেত্রে চুক্তির দিনের হিসেবে। মায়ের মৃত্যু হওয়ার কারণে তার অংশ বাদ যাবে। মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ পড়বে বাচ্চার উপর। তারপর বাচ্চা ও জীবিত বাঁদীটির যে দাম আসে তার উপর অতিরিক্ত গোলামটিকে ভাগ করা হবে। এভাবে বাচ্চার ভাগে পড়বে গোলামের দুই-পঞ্চমাংশ এবং জীবিত বাঁদীর ভাগে তিন-পঞ্চমাংশ। তারপর মূল্যের যে অংশটা বাচ্চার উপর পড়ল অর্থাৎ এক হাজারের তিন ভাগের একভাগ, তা তার ও অতিরিক্ত গোলামের দুই-পঞ্চমাংশের উপর উভয়ের মূল্য অনুপাতে ছয়ভাগে ভাগ করা হবে। অতিরিক্ত গোলামটির দুই-পঞ্চমাংশের মূল্য হচ্ছে চারশ' দিরহাম এবং বাচ্চাটির মূল্য দুই হাজার দিরহাম। প্রতি চারশ'কে এক একটি ভাগ করা হবে। ফলে অতিরিক্ত গোলামের দুই-পঞ্চমাংশে হবে এক ভাগ এবং বাচ্চার ক্ষেত্রে হবে পাঁচ ভাগ। জীবিত বাঁদীর ভাগে যা পড়ল

তা তার ও গোলামের তিন-পঞ্চমাংশের মধ্যে তাদের মূল্য অনুপাতে ভাগ করা হবে। জীবিত বাঁদীর মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম আর গোলামের দুই-পঞ্চমাংশের মূল্য ছয়শ' দিরহাম। এবার প্রতি দু'শকে একটি ভাগে ফেলা হবে। ফলে বাঁদীর ক্ষেত্রে হবে পাঁচ ভাগ এবং অতিরিক্ত গোলামটির তিন-পঞ্চমাংশ হবে তিন ভাগ- সর্বমোট আট ভাগ। যদি কবজার আগে গোলামটির মৃত্যু হয়ে যেত, তবে তার ভাগে মূল্যের কোন অংশ পড়ত না। এদিকে অর্ধেক মূল্য নিয়ে মায়ের মৃত্যু হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক মূল্য পড়েছে জীবিত বাঁদীর উপর। আর অতিরিক্ত গোলামটি জীবিত বাঁদীর অধীন। কবজার আগে বিক্রিত মালে পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় ক্রেতার ইখতিয়ার লাভ হবে। গোলামটি বেঁচে থাকলে মা বাঁদীর মৃত্যুর কারণে তার এক-চতুর্থাংশ মূল্য বাদ যাবে। তার পূর্ণ মূল্য হচ্ছে এক হাজার দিরহাম। আর তার উপর এবং অতিরিক্ত গোলামের এক-তৃতীয়াংশের উপর তাদের মূল্য অনুপাতে চার ভাগে ভাগ করা হবে। গোলামের এক-তৃতীয়াংশের উপর ভাগ করা হবে এ কারণে যে, সেটিকে বাচ্চা ও জীবিত বাঁদীর উপর তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যার দুই ভাগ বাঁদীর অধীনে এবং এক ভাগ বাচ্চার অধীনে চলে গেছে। এখন সেই চার ভাগের এক ভাগ পড়বে অতিরিক্ত গোলামের এক-তৃতীয়াংশের উপর এবং তিন ভাগ বাচ্চার উপর। বাঁদীর অংশে যা পড়েছে তা তার ও গোলামের দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হবে। তিন ভাগ পড়বে জীবিত বাঁদীর উপর এবং দুই ভাগ অতিরিক্ত গোলামের দুই-তৃতীয়াংশের উপর (আল কাফী)।

১৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহামে দুটি গোলাম কিনল, যার একটির বাজার মূল্য এক হাজার এবং অপরটির পাঁচশ'। তারপর দ্বিতীয়টির দামও এক হাজার হয়ে গেল। তারপর যদি ক্রেতা কিছু টাকা বেশী দেয়, তবে বিক্রির দিনের মূল্য হিসেবে সে দুটির উপর তা তিন ভাগে ভাগ করা হবে। টাকা বৃদ্ধির দিন যদি একটা গোলামের মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে, তবে জীবিতটির অংশ পরিমাণ বৃদ্ধি বৈধ হবে এবং এ মতই সঠিক (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৪. মাসআলা : 'আল মুনতাকা' গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি এক হাজার দিরহামে একই চুক্তিতে দুটি গোলাম কিনল। এরপর বিক্রেতা মূল্য কবজা করল এবং সেও গোলাম কবজা করল কিংবা তাদের কেউ কিছু কবজা করল না। ইতিমধ্যে ক্রেতা সে দুটির বিশেষ একটিতে একশ' দিরহাম মূল্য বেশী দিল কিংবা বলল, এটা একটা গোলাম বাবদ দেওয়া হল, কিন্তু কোন্টার, তা নির্দিষ্ট করে দিল না, তবে সে বৃদ্ধি জায়েয হবে না। যদি উভয়ের প্রত্যেকটির তিন ভাগ দাম উল্লেখ করা থাকে এবং বিশেষ একটিতে মূল্য কিছু বেশী দেয়, তবে তা জায়েয হবে। এমনিভাবে যদি অনির্দিষ্টভাবে কোন একটিতে বেশী মূল্য দেয় এবং কোন্টার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করা হল, তা স্থির করার ব্যাপারে ক্রেতার কথাকেই চূড়ান্ত মনে করা হয়, তবে তাও জায়েয।

উপরোক্ত গ্রন্থের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে, যদি এক হাজার দিরহামে একই চুক্তিতে দুটি গোলাম কেনে এবং তারপর নির্দিষ্ট একটি গোলামের মূল্য কিছু বেশী দেয়, তবে ক্রয়স অনুযায়ী তা জায়েয হওয়ার কথা। সে ক্ষেত্রে মূল্য প্রথমে উভয় গোলামের মধ্যে ভাগ করা হবে

এবং তারপর অতিরিক্ত মূল্য সেই গোলামটির সঙ্গে যোগ করা হবে, যেটিতে তা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এমনিভাবে যদি অনির্দিষ্টভাবে একটি গোলামের মূল্যের সঙ্গে একটি বাঁদী বৃদ্ধি করা হয়, তবে তাও জায়েয। সে ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে কোন গোলামটির সঙ্গে বাঁদীটি যুক্ত করবে। অন্য কোন মাল বৃদ্ধি করলে সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি বাঁদী বিক্রি করল, তারপর ক্রেতা সেটি কবজা করার আগেই বিক্রেতা আরেকটি বাঁদী বেশী দিল। এখন প্রথম বাঁদীটিতে যদি অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হয়, তবে ক্রেতা অপর বাঁদীটিকে তার অংশের মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৬. মাসআলা : স্থিরকৃত মূল্যের আংশিক ছেড়ে দেওয়া জায়েয এবং ছেড়ে দিলে আমাদের মাযহাবে তা মূল চুক্তির সঙ্গেই সম্পৃক্ত হবে, ঠিক বৃদ্ধিকরণের অনুরূপ, তাতে ছেড়ে দেওয়ার সময় বিক্রিত মাল বিনিময়যোগ্য থাকুক বা না-ই থাকুক (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা : কবজার আগে যদি ক্রেতাকে আংশিক মূল্য দান করে দেয় বা তাকে তা থেকে মুক্ত করে দেয়, তবে সেটা ছাড় বলেই গণ্য হবে। বিক্রেতা যদি মূল্য কবজা করার পর আংশিক মূল্য ছেড়ে দেয় বা দান করে, যেমন বলল, আমি আংশিক মূল্য তোমাকে দান করলাম বা তোমাকে আংশিক মূল্য ছেড়ে দিলাম, তবে তাও জায়েয। সে ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ মূল্য ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া বিক্রেতার জন্য আবশ্যিক হয়ে যাবে। যদি কবজার পরে বলে, আমি তোমাকে আংশিক মূল্য হতে দায় মুক্ত করে দিলাম, তবে সে দায় মুক্তি বৈধ হবে না (আয-যখীরা)।

১৮. মাসআলা : যদি সবটা মূল্য ছেড়ে দেয় বা দান করে কিংবা সবটা মূল্য হতে দায়-মুক্ত করে দেয়, তবে মূল্য কবজা করার আগে হলে তা জায়েয হবে, কিন্তু মূল চুক্তির সঙ্গে তা সম্পৃক্ত হবে না আর যদি মূল্য কবজা করার পরে হয়, তবে ছেড়ে দেওয়া বা দান করাটা বৈধ হবে, দায় মুক্তি বৈধ হবে না (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা : ইকাল (ক্রেতা বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিক্রিরতিকরণ)-এর মূল্য হতে দায় মুক্ত হতে দায় মুক্ত করা বৈধ এবং তখন ক্রেতার হতে বিক্রিত মাল আমানতস্বরূপ হয়ে যাবে (আত-তাতার খানিয়া)।

২০. মাসআলা : এক ব্যক্তি ফাসিদ পদ্ধতিতে একটি গোলাম বিক্রি করল এবং বিক্রেতা মূল্য ও ক্রেতা মাল কবজা করল, তারপর বিক্রেতা ক্রেতাকে হতে দায় মুক্ত করে দিল এবং তারপর গোলামটি মারা গেল। এরূপ ক্ষেত্রে তাকে গোলামের বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যদি বলে, আমি তোমাকে গোলাম হতে দায় মুক্ত করে দিলাম, তবে সে দায় মুক্ত হয়ে যাবে (আস-সিরাজিয়া)।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : পিতা ও ওয়াসী কর্তৃক নাবালকের মাল বেচাকেনা প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : নাবালক পুত্রের কাছে পিতার কিছু বিক্রি করা কিংবা তার কাছ থেকে নিজের জন্য ক্রয় করা ইসতিহসান অনুসারে জায়েয। সে বেচাকেনার সব দায়-দায়িত্ব সেই শিশুর উপরই বর্তাবে। পিতা তার প্রতিনিধি হবে। এ জন্যই সে যখন সাবালক হবে তখন পিতার কাছে মূল্য দাবি করার অধিকার লাভ করবে। পিতা যদি অন্য কারও কাছে বিক্রি করে এবং তারপর শিশু বালিগ হয়, তখন সেই ব্যক্তির কাছে মূল্য দাবি করার অধিকার পিতার নিজের থাকবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২. মাসআলা : ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, এ জাতীয় চুক্তির জন্য প্রস্তাবও গ্রহণ শর্ত কিনা? সঠিক মত এই যে, তা শর্ত নয়। কাজেই পিতা যদি বলে, এ মাল আমি আমার অমুক পুত্রের কাছে এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম কিংবা বলে, আমি আমার অমুক পুত্রের থেকে এই মাল এত টাকার বিনিময়ে কিনলাম, তবে এতেই চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে। 'আমি আমার পুত্রের কাছে বিক্রি করলাম এবং গ্রহণ করলাম' এরূপ বলা শর্ত নয়। পিতা কর্তৃক এরূপ বেচাকেনা ন্যায্য মূল্যে কিংবা এতটুকু কম বেশী মূল্যে জায়েয, যে পরিমাণ কম বেশী মানুষ বেচাকেনার ক্ষেত্রে সাধারণত স্বীকার করে নেয়।

পিতার অবর্তমানে তার পিতা অর্থাৎ শিশুর পিতামহ পিতার স্থলাভিষিক্ত হবে (আল-মুহীত)।

৩. মাসআলা : পিতা যদি ন্যায্য মূল্যে তার নাবালক পুত্রের কোন জমি বা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে, তবে পিতা মানুষের কাছে একজন সৎ কিংবা নির্দোষ লোক হিসেবে পরিচিত হলে তা জায়েয হবে। আর যদি সে অসৎ লোক হয়, তবে জায়েয হবে না এবং এটাই সঠিক।

যদি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে এবং সে অসৎ হয়, তবে এক রিওয়াযাত অনুযায়ী তা জায়েয হবে না। হাঁ, যদি বিক্রি করাটা শিশুর পক্ষে ভাল হয়, তবে জায়েয হবে। এটাই বিতর্কিত মত।

পুত্র যদি সাবালক, কিন্তু উন্মাদ হয়, তবে দেখতে হবে, তার এ রোগ দীর্ঘ দিনের, না অল্প দিনের। দীর্ঘ দিনের উন্মাদ হলে তার মাল বেচাকেনা করা পিতার জন্য জায়েয। অল্প দিনের হলে জায়েয নয়। এক মাস বা তার বেশী হলেই তাকে দীর্ঘ এবং এর কম হলে তাকে অল্পকাল মনে করা হবে। এ মতই বেশী সঠিক (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪. মাসআলা : পিতা বা ওয়াসী যদি শিশুর স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে, তবে শায়খ ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল (র) বলেন, শিশুর জন্য কল্যাণকর মনে করলে কাযী তা বাতিল করতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. মাসআলা : পিতা যদি তার শিশু পুত্রের কাছে ন্যায্য মূল্যে কোন জিনিস বিক্রি করে এবং কাযী তা অনুমোদন করে তবে তা কার্যকর হবে। তদ্রূপ যদি বিক্রেতা ওয়াসী হয় এবং কাযী তার বিক্রি অনুমোদন করে তবে তাও জায়েয হবে (আল-কিন্যা)।

৬. মাসআলা : নাবালক দুই পুত্রের একজনের মাল অন্যজনের কাছে বিক্রি করা (যেমন আমি আমার অমুক পুত্রের একটি গোলাম অমুক পুত্রের কাছে এত মূল্যে বিক্রি করলাম) জায়েয হবে। তারা সাবালকত্ব লাভ করার পর এর দায়-দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তাবে। এটাই সহীহ (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : পিতা যদি তার নিজের কোন মাল তার শিশুপুত্রের কাছে বিক্রি করে, তবে কেবল বিক্রি দ্বারাই সে কবজাকারী হয়ে যাবে না। সুতরাং শিশুটি মাল প্রকৃতরূপে কবজা করার পর্যায়ে উপনীত হওয়ার আগেই যদি মাল ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তা পিতার মালই ধ্বংস হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৮. মাসআলা : পুত্রের মাল কেনার পর পিতা ততক্ষণ পর্যন্ত দায় মুক্ত হতে পারবে না, যতক্ষণ না কাযী ঐ শিশুর পক্ষে একজন উকীল নিযুক্ত করেন আর সে পিতার কাছ থেকে সে মূল্য কবজা করত আবার শিশুর আমানতরূপে পিতার হাতে প্রত্যর্পণ করে। পিতা যদি পুত্রের কাছে বাড়ি বিক্রি করে এবং সে তাতে বসবাসরত থাকে, তবে তাতে পুত্রের কবজা প্রতিষ্ঠিত হবে না, যাবত না পিতা সে বাড়ি খালি করে দেয়। সেই সঙ্গে এটাও শর্ত যে, কাযী কর্তৃক নিযুক্ত কোন ট্রাস্টির হাতে বাড়িটি সমর্পণ করতে হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা : পিতা সে বাড়ি হতে চলে যাওয়ার পর যদি আবার তাতে ফিরে আসে এবং তাতে বসবাস শুরু করে দেয় বা তাতে তার মালপত্র রাখে কিংবা তার পরিবার-পরিজনকে তাতে থাকতে দেয় অথচ তার সে ঠেকা না থাকে, তবে সে বাড়িটির জবরদখলকারী সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

১০. মাসআলা : কোন ব্যক্তি যদি তার শিশুপুত্রের জন্য একটি কাপড় বা খাদেম কেনে এবং নিজের টাকা দিয়ে তা পরিশোধ করে, তবে যতক্ষণ না পুত্রের জন্য তা ক্রয়ের পক্ষে কোন সাক্ষী রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পুত্রের কাছে সে টাকা ফেরত চাইতে পারবে না। যদি সে মূল্য পরিশোধ না করে এবং ইতিমধ্যে তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তা পরিশোধ করা হবে। এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট ওয়ারিসগণ সেই শিশুপুত্রের কাছ থেকে পরিশোধিত টাকা ফেরত চাইতে পারবে না, যদি না মৃত ব্যক্তি তার জন্য কেনার পক্ষে কোন সাক্ষী না রেখে থাকে।

যদি শিশুপুত্রের জন্য তা কেনে এবং মূল্যের ব্যাপারে নিজে জামিন হয় এবং তারপর তা নিজে পরিশোধ করে, তবে কিয়াস অনুযায়ী তা পুত্রের কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে, কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী তার সে অধিকার থাকবে না। মূল্য পরিশোধকালে যদি বলে, আমি এই হিসেবে এটা পরিশোধ করছি যে, পুত্রের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নেব তবে পুত্রের কাছ থেকে তার ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : যদি পুত্রের জন্য চাদর বা খাদ্য কেনে, তবে পুত্রের কাছ থেকে তার মূল্য ফেরত নিতে পারবে। যদিও সে সম্পর্কে সে সাক্ষী না রাখে। কেননা এসব কেনার জন্য সে আদিষ্ট। দানস্বরূপ সে এটা করেনি। পক্ষান্তরে বাড়ি স্থাবর সম্পত্তি কেনার কোন আদেশ তার উপর নেই (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১২. মাসআলা : পিতা যদি তার শিশুপুত্রের কোন মাল বিক্রি করে এবং মূল্য উসূল করার আগেই তা অর্পণ করে, তবে মূল্য আদায়ের উদ্দেশ্যে ঐ মাল সে আবার ফেরত নিয়ে আটকে রাখতে পারে (আল-খুলাসা)।

১৩. মাসআলা : কোন নারী যদি নিজের টাকায় তার শিশুপুত্রের জন্য এই শর্তে জমি কেনে যে, পুত্রের কাছ থেকে মূল্য ফেরত নেবে না, তবে ইসতিহসান অনুযায়ী তা জায়েয। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী লোকটি নিজের জন্য সে জমির ক্রেতা সাব্যস্ত হবে এবং তারপর তার পক্ষ হতে তার পুত্রের জন্য তা হিবা ও অনুদান হয়ে যাবে। এরপর পুত্রকে সে জমি না দেওয়ার কোন অধিকার তার থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা : এক ব্যক্তির একটি বাড়ি আছে। তার এক স্ত্রী আছে এবং তাদের আছে একটি পুত্র সন্তান। স্ত্রী যদি বলে, আমি তোমার কাছ থেকে এই বাড়িটি আমাদের সন্তানের টাকা দিয়ে তার জন্য কিনলাম এবং পিতা বলে, আমি বিক্রি করলাম, তা জায়েয হবে (আল-খুলাসা)।

১৫. মাসআলা : যদি সে বাড়িটিতে পিতার সঙ্গে অপর কোন ব্যক্তি শরীক থাকে এবং স্ত্রী তাদের উভয়কে বলে, আমি তোমাদের কাছ থেকে আমার পুত্রের জন্য তার টাকা দিয়ে কিনলাম আর তারা বলে, বিক্রি করলাম, তাও জায়েয হবে। কেননা পিতা যখন স্ত্রীর জন্য পূর্ণ বাড়িটি কেনা জায়েয করে দিল, তখন সে কার্যত তাকে গোটা বাড়ি ক্রয়ের অনুমতিও প্রদান করল (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা : হিশাম (র) বর্ণনা করেন, পিতা যদি ফাসিদ পদ্ধতিতে তার শিশুপুত্রের কাছ থেকে নিজের জন্য কোন গোলাম কেনে এবং তারপর গোলামটিকে কবজা করা বা কোন কাজে ব্যবহার করা বা কোন কাজের আদেশ করার আগেই যদি গোলামটি মারা যায়, তবে সে শিশুপুত্রের মাল হিসেবেই মারা যাবে। পিতা যদি ফাসিদ পদ্ধতিতে তার কোন গোলাম শিশুপুত্রের কাছে বিক্রি করে, এরপর পিতা তাকে আযাদ করে দেয়, তবে সে আযাদকরণ বৈধ হবে (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা : পিতা যদি তার পুত্রের কোন মাল নিজের জন্য কেনে এবং তারপর সে শিশুপুত্র বালগ হয়ে যায়, তবে পুত্রের পক্ষ হতে তার দায়-দায়িত্ব পিতার উপরই বর্তাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা : পিতা যদি তার কোন গোলামকে তার শিশুপুত্রের কাছে বিক্রি করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে তবে তা জায়েয হবে না, যদি সে পুত্র এতই ছোট হয় যে, নিজের বিষয়টা নিজে ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। হাঁ, পিতা যদি সে উকীলের কাছ থেকে চুক্তির প্রস্তাব

গ্রহণ করে নেয়, তবে জায়েয হয়ে যাবে, আর এ ক্ষেত্রে সঠিক মত হচ্ছে যে, চুক্তির দায়-দায়িত্ব উকীলের উপরই বর্তাবে। ফুকাহোয়ে কিরাম এ বিষয়টাও আলোচনায় এনেছেন যে, আদেশদাতা কি নিজের পক্ষেই কার্য সম্পাদনকারী সাব্যস্ত হবে, না শিশুর পক্ষে? সঠিক মত হচ্ছে যে, সে শিশুর জন্যই কর্ম-বিধায়ক হবে এবং তার প্রতিনিধি হবে। পুত্রের দিক থেকে চুক্তির যা কিছু দায়-দায়িত্ব তা পিতার উপর বর্তাবে। আর পিতার পক্ষ হতে এর যা দায়-দায়িত্ব আসে, তা বর্তাবে উকীলের উপর।

তদ্রূপ দুই পুত্রের একজনের মাল অন্য পুত্রের কাছে বিক্রির জন্য নিযুক্ত উকীল তা বিক্রি করে তবে জায়েয হবে না। যদি দুই ব্যক্তিকে উকীল বানায় এবং তারা সে বেচাকেনা সম্পাদন করে, তবে তা জায়েয হবে।

১৯. মাসআলা : পুত্রের গোলাম বিক্রির জন্য নিযুক্ত উকীল যদি পিতার কাছেই তা বিক্রি করে, তবে জায়েয হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২০. মাসআলা : ইবন সামাআ (র)-এর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে আছে, কেউ যদি তার শিশুপুত্রের গোলাম কারও কাছে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করে, তারপর সে তার মুমূর্ষ অবস্থায় বলে, আমি অমুকের কাছ থেকে মূল্য কবজা করেছি এবং তারপর তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে স্বীকারোক্তি বৈধ হবে না। যদি অসুস্থ অবস্থায় বলে, আমি অমুকের কাছ থেকে তা কবজা করেছিলাম, কিন্তু পরে তা হারিয়ে যায়, তবে তার সে কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে। যদি বলে, আমি তা কবজা করেছিলাম, কিন্তু পরে তা নিঃশেষ করে ফেলেছি, তবে তার সে কথা মেনে নেওয়া হবে না এবং ক্রেতাও তা থেকে দায় মুক্ত হবে না। ক্রেতার কাছে যদি মূল্য বুঝে নেওয়া হয়, তবে সে তা পিতার কাছে ফেরত চাইতে পারবে না কিংবা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতেও দাবি করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা : পিতা যদি তার শিশুপুত্রের কাছ থেকে নিজ টাকা দ্বারা এমন কোন গোলাম কেনে, যে তার মাহরাম আত্মীয়, তবে সে ক্রয় পিতার ব্যাপারেই কার্যকর হবে, পুত্রের ক্ষেত্রে নয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২২. মাসআলা : যদি বোধ-বুদ্ধিহীন পুত্রের জন্য এমন কোন বাদী কেনে, যার গর্ভে সে বিবাহের মাধ্যমে সন্তান জন্মদান করেছে, তবে কিয়াস অনুযায়ী ঐ ক্রয় পিতার জন্য অবধারিত হয়ে যাবে, কিন্তু ইসতিহসান অনুসারে পুত্রের পক্ষেই তা জায়েয হবে এবং সেই এক ক্রয় দ্বারাই তা হবে। কিন্তু প্রথম মতই বিত্তমত (আয-যখীরা)।

২৩. মাসআলা : যদি বোধ-বুদ্ধিহীন সাবালক পুত্রের জন্য তার টাকা দিয়ে এমন কোন গোলাম কেনে, যাকে কিনলে তার পক্ষ হতে সে আযাদ হয়ে যাবে, তবে পুত্রের পক্ষ হতে সে ক্রয় কার্যকর হবে না; পিতার পক্ষ হতে কার্যকর হবে। তারপর যাকে কেনা হল, সে যদি পিতার মাহরাম আত্মীয় হয়, তবে তা তার পক্ষ হতে আযাদ হয়ে যাবে আর যদি তার দিক থেকে সে বকমের আত্মীয় না হয়, তবে তার পক্ষ হতে আযাদ হবে না, যেমন শিশুপুত্র বা বোধ-বুদ্ধিহীন পুত্রের মা, তাদের ভাই বা তাদের বোন (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা : পিতা যদি পুত্রের কোন মাল বিক্রি করে, এরপর পুত্র দাবি করে যে, যখন আমার অনুমতি ছাড়া পিতা এটা বিক্রি করেছে তখন আমি সাবালক ছিলাম, কিন্তু পিতার দাবি, তুমি সাবালক ছিলে, তবে এ ক্ষেত্রে পুত্রের কথাই গৃহীত হবে।

যদি কোন স্ত্রী লোক মারা যায় এবং ছোট ও বড় সন্তান রেখে যায়, তারপর তার সম্পত্তি বন্টনের আগে পিতা তা থেকে কোন মাল বিক্রি করে, তবে সাবালকের অংশের সে বিক্রি কার্যকর হবে, যদি ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করে থাকে (আল-কিনুয়া)।

২৫. মাসআলা : ওয়াসী যদি ইয়াতীমের মাল নিজের জন্য ক্রয় করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা জায়েয হবে, যদি তা ইয়াতীমের জন্য মঙ্গলজনক হয়। আর অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সে মঙ্গলের ব্যাখ্যা শামসুল আইম্মা (র)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এরূপ যে, নিজের যে মাল দিয়ে তা কিনবে, সেটা যদি পনের টাকা মূল্যের হয়, তবে তার মূল্য ধরবে দশ টাকা আর নিজের জন্য যা কিনবে তার প্রকৃত মূল্য যদি দশ টাকা হয়, তবে তার মূল্য ধরবে পনের টাকা।

স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক হওয়ার ব্যাখ্যা কেউ কেউ এরূপ করেছেন যে, নিজের জন্য দ্বিগুণ মূল্যে কিনবে এবং ইয়াতীমের কাছে বিক্রি করবে অর্ধেক মূল্যে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৬. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী ওয়াসী কর্তৃক ইয়াতীমের মাল যখন নিজের কাছে বিক্রি করা জায়েয হল, তখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিক্রি সম্পাদনের জন্য কি চুক্তির একাংশ অর্থাৎ কেবল এ কথা বলাই যথেষ্ট যে, বিক্রি করলাম, বা ক্রয় করলাম, যেমন পিতার ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট হয়ে থাকে। নাকি চুক্তির উভয় দিক অর্থাৎ প্রস্তাব ও গ্রহণ উভয়ই জরুরী? ইমাম মুহাম্মাদ (র) তার কোন গ্রন্থে এ সম্পর্কে কিছুই বলেননি। 'আন নাতিফী' তার 'ওয়াকিয়াত' গ্রন্থে বলেছেন যে, ওয়াসীর জন্য চুক্তির উভয় দিকই উল্লেখ করা জরুরী, কিন্তু পিতার ক্ষেত্রে তা জরুরী নয় (আল-মুহীত)।

২৭. মাসআলা : ওয়াসী যদি ইয়াতীমের মাল ন্যায্য মূল্যে অন্য লোকের কাছে বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে। কারো কারো মতে ওয়াসীর এই বিক্রয় জায়েয হওয়ার জন্য তিনটি শর্তের যে কোন একটি পাওয়া যাওয়া অপরিহার্য। (ক) যদি দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রি করে; (খ) ইয়াতীমের বিক্রি করার প্রয়োজন হওয়া; অথবা (গ) মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকা, যা পরিশোধ করতে হলে এ মাল বিক্রি করা ছাড়া উপায় নেই। এরই উপর ফাতওয়া (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২৮. মাসআলা : ওয়াসী যদি কাউকে ইয়াতীমের কোন মাল ক্রয়ের আদেশ করে এবং সেমতে ব্যক্তি তার মঙ্গলের জন্য তা ক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৯. মাসআলা : যে শিশু বেচাকেনার অনুমতি প্রাপ্ত, সে যদি নিজের কোন মাল ওয়াসীর কাছে বিক্রি করে, তবে সেটা ওয়াসীর নিজেরই বিক্রির মত। বেচাকেনার অনুমতি প্রাপ্ত শিশু

যদি অপর কোন ব্যক্তির কাছে খুব বেশী ঠকে বিক্রি করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা জায়েয হবে (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা : ওয়াসী যদি ইয়াতীমের কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে এবং সেটা বিক্রি করার মধ্যেই ইয়াতীমের ফায়দা, কিন্তু ওয়াসী তা বিক্রি করেছে তার মূল্য নিজে ভোগ করার জন্য, তবে ফুকাহায়ে কিরামের মতে বিক্রি জায়েয হবে আর বিক্রয়ের টাকা নিজে খরচ করে থাকলে তাকে তা আদায় করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩১. মাসআলা : ওয়াসী যদি এক ইয়াতীমের মাল অন্য ইয়াতীমের জন্য ক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে না। তদ্রূপ সে যদি তাদেরকে নিজেদের মাঝে বেচাকেনার জন্য ব্যবসার অনুমতি দেয়, তবে তাও জায়েয নয়। কেননা ওয়াসী তা নিজে করলেও জায়েয হত না। আর তার নিজের জন্য যা জায়েয নয়, তার পক্ষ হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে যদি কেউ তা করে তাও তেমনি নাজায়েয হয়ে যায়। এমনভাবে তাদের দুই গোলামকে যদি ব্যবসায় অনুমতি দেয় এবং তাদের একজন অপরজনের কাছে বিক্রি করে তাও জায়েয হবে না। কিন্তু পিতার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তার অনুমতিক্রমে দুই পুত্রের কিংবা তাদের দুই গোলামের পারস্পরিক বেচাকেনা জায়েয (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩২. মাসআলা : কাযী যদি ইয়াতীমের কাছে নিজের মাল বিক্রি করে অথবা ইয়াতীমের মাল নিজের জন্য কেনে তবে তা জায়েয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা : কাযী যদি ওয়াসীর কাছ থেকে ইয়াতীমের কোন মাল কেনে, তবে জায়েয হবে, যদি এ কাযীই তাকে ওয়াসী পদে নিযুক্ত করে থাকে (আল-ফাতাওয়ায়াল কুবরা)।

৩৪. মাসআলা : এক ওয়াসী যদি অন্য ওয়াসীর কাছে ইয়াতীমের মাল বিক্রি করে তবে তা জায়েয হবে না। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৫. মাসআলা : ইয়াতীমের কাছে যদি যে ব্যক্তি ঋণী, তার কাছ থেকে যদি বিশ দীনারে ইয়াতীমের জন্য একটি বাড়ি কেনে, যার প্রকৃত মূল্য পঞ্চাশ দীনার, তারপর ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর সে বিক্রি ইকাল (রহিত) করে ফেলে, তবে তা জায়েয হবে না (আল-কিনুয়া)।

৩৬. মাসআলা : ওয়াসী যদি ইয়াতীমের মাল বাকিতে বিক্রি করে এবং বাকির মেয়াদ এত বেশী হয় যে, এ ধরনের মাল এ রকম মেয়াদে সাধারণত বিক্রি হয় না, তবে সে বিক্রি জায়েয হবে না। আর যদি মেয়াদের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়, কিন্তু এই আশংকা থাকে যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় বা বিনিময় মূল্য হারিয়ে গেলে সে ব্যক্তি ক্রয়ের কথা অস্বীকার করবে, সে ক্ষেত্রেও বিক্রি জায়েয নয়। আর যদি অস্বীকার করার বা বিনিময় মূল্য হারানোর ভয় না থাকে, তার ওয়াসীর বিক্রি জায়েয হবে।

৩৭. মাসআলা : এক ব্যক্তি ওয়াসীর কাছ থেকে ইয়াতীমের মাল এক হাজার টাকায় কিনতে চাইল এবং অপর এক ব্যক্তি সেটি কিনতে চাইল এক হাজার একশ' টাকায়, এ ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা মূল্য আদায়ে বেশী সমর্থ হয় তবে ওয়াসীর উচিত তার কাছে বিক্রি করা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৮. মাসআলা : ওয়াসী যদি মৃত কারো কাছে মৃত ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে, তবে ওয়ারিসগণ নাবালক হলে সে বিক্রি জায়েয হবে, তারা উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত এবং মৃত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হোক বা না-ই হোক। অবশ্য সে বিক্রির ন্যায্য মূল্য হতে হবে। আর কম মূল্যে হলে তার পরিমাণ লোক প্রচলনে সহনীয় পর্যায়ে হতে হবে।

শামসুল আইম্মা আল-হালওয়ানী (র) ইমাম খাস্‌সাফ (র)-কৃত 'আদাবুল-কাযী'-এর ভাব্য গ্রন্থে উপরোক্ত জবাব সম্পর্কে বলেন, এটা পূর্ববর্তীদের মত, কিন্তু পরবর্তী ফুকাহায়ে কিরামের মত হচ্ছে যে, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি বৈধ হওয়ার জন্য তিনটি শর্তের যে কোন একটি বিদ্যমান থাকতে হবে: (ক) ক্রেতা তা দ্বিগুণ মূল্যে কিনতে আগ্রহী থাকবে; (খ) সেটা বিক্রি করা শিশুর জন্য অপরিহার্য হবে অথবা (গ) মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকবে, যা পরিশোধের জন্য সে সম্পত্তি বিক্রি করা অপরিহার্য।

ওয়ারিসগণ সকলেই যদি সাবালক হয় এবং তারা উপস্থিত থাকে আর মৃত ব্যক্তিরও কোন ঋণ না থাকে, তবে ওয়াসী মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তার কাজ হবে ঋণগ্রস্তদের কাছ থেকে মৃত ব্যক্তির পাওনার তাগাদা দেওয়া এবং তা ওয়ারিসদের হাতে অর্পণ করা। মৃত ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্ত হয় এবং সে ঋণ তার পরিত্যক্ত মালের সমপরিমাণ হয়, তবে সমস্ত ফুকাহায়ে কিরামের মতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির সবটাই বিক্রি করে ফেলবে। যদি ঋণের পরিমাণ তার চেয়ে কম হয়, তবে ঋণের সমপরিমাণ বিক্রি করবে। তারপর যা অতিরিক্ত থাকবে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তাও বিক্রি করবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা বিক্রি করবে না। মৃত ব্যক্তির যদি ঋণ না থাকে, কিন্তু সে কিছু ওসীয়াত করে যায়, তবে ওয়াসীয়াত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বা তার কম হলে ওয়াসী তা কার্যকর করবে। যদি ওসীয়াত এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশী পরিমাণে হয়, তবে এক-তৃতীয়াংশের ভেতর, তা কার্যকর করবে, তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা ওয়ারিসদের অধিকার।

ওয়াসী যদি ওসীয়াত কার্যকর করার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কিছু বিক্রি করতে চায়, তবে ফুকাহায়ে কিরামের সকলেই এ ব্যাপারে এক মত যে, ওয়াসী সে ক্ষেত্রে ওসীয়াত পরিমাণে বিক্রি করতে পারবে। তার বেশী পরিমাণের ব্যাপারে উপরে বর্ণিত একই ইখতিলাফ রয়েছে। এ হুকুম সেই ক্ষেত্রে, যখন ওয়ারিসগণ তাদের মাল দিয়ে ঋণ পরিশোধ না করবে এবং ওসীয়াতও আদায় না করবে। তারা যদি তা করে ফেলে, তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিক্রির কোন ক্ষমতা ওয়াসীর আদৌ থাকবে না।

ওয়ারিসগণ যদি উপস্থিত থাকে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে যার সীমা তিন দিন বর্ণিত আছে, আর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কোন ঋণ ও ওসীয়াত না থাকে, তবে ওয়াসী অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে না। স্থাবর সম্পত্তি যদি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধতর মত হচ্ছে যে, তবুও তা বিক্রি করার ক্ষমতা তার থাকবে না।

পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে যদি ঋণ জড়িত থাকে, তবে অস্থাবর সম্পত্তি ঋণ পরিমাণ বা তার বেশীও বিক্রি করতে পারবে আর স্থাবর সম্পত্তির হুকুম উপরে যেমন বলা হয়েছে তেমনি।

ওয়ারিসদের ছোট ও বড়দের মধ্যে বড়রা যদি অনুপস্থিত থাকে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কোন ঋণ বা ওসীয়াতের দায় না থাকে, তবে ওয়াসী অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে এবং স্থাবর সম্পত্তি ও ছোটদের অংশ বিক্রি করতে পারবে। আর বড়দের অংশের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে উপরে বর্ণিত মতবিরোধ রয়েছে।

ঋণ যদি সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির সমপরিমাণ হয়, তবে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিই বিক্রি করতে পারবে। যদি ঋণ তার চেয়ে কম হয়, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হতে ঋণ পরিমাণ বিক্রি করতে পারবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তার চেয়ে বেশী সম্পত্তি বিক্রি করার ক্ষেত্রে যেমন উপরে বলা হয়েছে তেমনি মতভেদ রয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিসগণ যদি উপস্থিত থাকে এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঋণ ও ওসীয়াতের দায় হতে মুক্ত থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে ছোটদের অংশের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে। আর বড়দের অংশে বিক্রি জায়েয কিনা সে ব্যাপারে উপরের বর্ণনার অনুরূপ মতভেদ রয়েছে।

পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে যদি ঋণ থাকে এবং সম্পত্তির সমপরিমাণ হয়, তবে সবটাই বিক্রি করতে পারবে। যদি তার চেয়ে কম হয়, তবে ঋণ পরিমাণ বিক্রি করতে পারবে এবং তার বেশীর ক্ষেত্রে উপরে যেমন বলা হয়েছে তেমনি মতভেদ রয়েছে (আল-খুলাসা)।

৩৯. মাসআলা : পিতার নিযুক্ত ওয়াসী সম্পর্কে আমরা যা কিছু বিধি-বিধান উল্লেখ করলাম, সেগুলো ওয়াসী কর্তৃক নিযুক্ত ওয়াসী, পিতামহের ওয়াসী, পিতামহের ওয়াসীর নিযুক্ত ওয়াসী, কাযীর ওয়াসী এবং কাযীর ওয়াসীর নিযুক্ত ওয়াসীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাযীর ওয়াসী পিতার ওয়াসীরই মত। কেবল একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তা এই যে, কাযী যদি কাউকে কোন এক বিষয়ে ওয়াসী নিযুক্ত করে, তবে সে কেবল সেই বিষয়েই ওয়াসী হবে। পক্ষান্তরে পিতা কাউকে বিশেষ কোন বিষয়ে ওয়াসী বানালে, সে সকল বিষয়েই ওয়াসী হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪০. মাসআলা : হিশাম (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াতীমের ওয়াসী যদি ইয়াতীমের কে হাজার দিরহাম মূল্যের কোন গোলাম এই শর্তে এক হাজার দিরহামে বিক্রি করে যে, ওয়াসীর ইখতিয়ার থাকবে, এরপর ইখতিয়ারের মেয়াদের ভেতর তার মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে দু'হাজার দিরহাম হয়ে যায়, তবে সে বিক্রি কার্যকর করা ওয়াসীর উচিত হবে না। এটাই ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মত (আল-মুহীত)।

৪১. মাসআলা : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজেকে তার ওয়াসী দাবি করে তার সম্পত্তি বিক্রি করল। স্বামীর ছোট ছোট সন্তান আছে। পরে সে স্বীকার করল যে, সে তার স্বামীর ওয়াসী

ছিল না, এ ক্ষেত্রে ইমাম শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল (র)-এর মতে ক্রেতার ব্যাপারে মহিলার এই স্বীকারোক্তি বিশ্বাস করা হবেন না। বরং সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তার বিক্রি স্থগিত থাকবে। প্রাপ্তবয়স্কতার পর তারা যদি তাকে পিতার ওয়াসীরূপে তাসদীক করে তবে তার বিক্রি জায়েয হবে। অন্যথায় বাতিল হয়ে যাবে।

ক্রেতা যদি এভাবে কেনা জমিতে গোবর ফেলে, তবে সে মহিলাটির কাছে তার কোন বদলা দাবি করতে পারবে না। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন বিক্রির পর মহিলা স্বীকার করবে যে, সে তার স্বামীর ওয়াসী ছিল না। যদি কোন শিশু দাবি করে যে, মহিলাটি তাদের সে মাল বিক্রি করেছে অথচ সে তাদের ওয়াসী ছিল না, তবে শিশুর সে দাবি গৃহীত হবে। যদি সে শিশুটি ব্যবসায়ের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে কিংবা তার মামলা-মকদ্দমা চালানোর কর্তৃত্ব যার আছে তার পক্ষ হতে মামলায় লড়ার অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সে কর্তৃত্ব আছে কাযী, ওয়াসী বা সে পর্যায়ে অন্যদের। শিশুটি যদি সম্পত্তি ফেরত আনতে ব্যর্থ হয়, তবে যে মূল্যে জমি বিক্রি হয়েছিল মহিলার কাছ থেকে জরিমানাস্বরূপ তা আদায় করা হবে। এটা সেই রিওয়াযাত অনুযায়ী, যে রিওয়াযাতে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি ও সমর্পণের কারণে বিক্রেতার উপর জরিমানা আরোপ করা যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪২. মাসআলা : শিশু বা বোধ-বুদ্ধিহীন সাবালকের যদি পিতা, ওয়াসী কিংবা পিতামহ থাকে এবং এ অবস্থায় কাযী সে শিশু বা বোধ-বুদ্ধিহীনকে ব্যবসায়ের অনুমতি প্রদান করে, কিন্তু তার পিতা তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে অনুমতি বৈধ হবে। যদিও কাযীর কর্তৃত্ব পিতা বা ওয়াসীর কর্তৃত্ব হতে নিম্ন পর্যায়ে (আল-কিন্যা)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : বায়উস সালাম (দাদন বিক্রয়)

(এতে ছয়টি অনুচ্ছেদ আছে)

প্রথম অনুচ্ছেদ : 'বায়উস সালাম'-এর ব্যাখ্যা, এর রুকন, শর্তাবলী ও হুকুম সম্পর্কে।

১. মাসআলা : বায়উস সালাম-এর সংজ্ঞা : এটা এমন এক চুক্তি, যদ্বারা বিনিময় মূল্যে নগদ মালিকানা এবং বিক্রিত মালে পরবর্তীকালে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. মাসআলা : বায়উস সালামের রুকন এই যে, তুমি কাউকে বলবে, আমি এক কুরুর গমের জন্য তোমাকে দশ দিরহামের 'সালাম' করলাম বা এক কুরুর গমের বিনিময়ে তোমাকে নগদ দশ দিরহাম পরিশোধ করলাম আর সে বলবে, আমি গ্রহণ করলাম।

হাসান (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী বিক্রি শব্দ দ্বারা 'সালাম' জাতীয় চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং এটাই বিশুদ্ধতর মত (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩. মাসআলা : বায়উস সালামের শর্তাবলী দুই প্রকার। (ক) চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্ত এবং (খ) বিনিময় দ্রব্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্ত।

চুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত চুক্তি মাত্র একটি। আর তা হল চুক্তিটি ইখতিয়ারের শর্ত হতে মুক্ত হওয়া ক্রেতা ও বিক্রেতা কারো অনুকূলেই ইচ্ছাধিকারের শর্ত থাকতে পারবে না। অবশ্য হকদারের ইচ্ছাধিকারের বিষয়টি ভিন্ন। তা সালাম বিক্রয়কে বাতিল করে না। রাসুল-মাল (বিনিময় মূল্য) কবজা করে উভয়ে পৃথক হওয়ার পর যদি তাতে হকদার বের হয় আর হকদার অনুমোদন করে তবে জায়েয হয়ে যাবে। ইচ্ছাধিকারী ব্যক্তি যদি পক্ষদ্বয়ের আলাদা হওয়ার আগে নিজের ইখতিয়ার বাতিল করে দেয় এবং সালামের দ্বিতীয় পক্ষের হাতে 'মূলধন' সংরক্ষিত থাকে, তবে আমাদের মধ্যে বিক্রি বৈধতায় রূপান্তরিত হবে। যদি সে মূল্য ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে বা ইচ্ছাকৃত ধ্বংস করা হয়ে থাকে, তবে সে বিক্রি বৈধতায় রূপান্তরিত হবে না। এ ব্যাপারে সকলেই একমত (আল-বাদায়ে)।

৪. মাসআলা : যে সব শর্তের সম্পর্ক বিক্রিত মাল ও বিনিময় মূল্যের সাথে তা সাতটি-ছয়টি রাসুল-মাল অর্থাৎ বিনিময় মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং দশটি মুসলাম ফীহি অর্থাৎ বিক্রিত মালের সাথে সম্পৃক্ত।

৫. মাসআলা : যে ছয়টির সম্পর্ক রাসুল-মালের সাথে তা নিম্নরূপ-

এক. জাত বর্ণনা করা অর্থাৎ তা দিরহাম, না দীনার, নাকি গম, যব প্রভৃতি কয়ালি দ্রব্য?

দুই. প্রকার বর্ণনা করা, যেমন তা গিতরীফিয়া বা উদালিয়া দিরহাম অথবা মাহমুদিয়া বা হারাবিয়া দীনার। এটা সেই ক্ষেত্রে যেখানে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা চালু আছে। যেখানে একই প্রকারের মুদ্রা চলে, সেখানে জাত বর্ণনাই যথেষ্ট।

তিন. গুণগত মান বর্ণনা করা যে, তা উৎকৃষ্ট মানের, না নিম্ন মানের, নাকি মাঝামাঝি স্তরের (আন-নিহায়া)।

চার. রাসুল-মাল-এর পরিমাণ বর্ণনা করা, যদিও তা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেওয়া হয়। এটা সেই ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে বস্তুর পরিমাণের সঙ্গে চুক্তির সম্পর্ক হয়, যেমন কয়ালি, ওজনী ও গুণতি দ্রব্য। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার পর পরিমাণ জানার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং কেউ যদি কাউকে বলে, আমি এক কুরুর গমের বিনিময়ে তোমাকে এই দিরহামগুলো সমর্পণ করলাম, কিন্তু সে দিরহামের ওজন জানা নেই, কিংবা বলে, এত মান্ন (পরিমাপ বিশেষ) জাফরানের জন্য আমি তোমার কাছে এই গমগুলো সমর্পণ করলাম, কিন্তু সে গমের পরিমাণ জানা নেই, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা বৈধ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বৈধ হবে (আল-কাফী)।

৬. মাসআলা : রাসুল-মাল যদি এমন হয় যে, চুক্তির সম্পর্ক তার পরিমাণের সঙ্গে হয় না যেমন গজী দ্রব্য এবং বেশী ব্যবধানের গুণতি দ্রব্য, তবে তার পরিমাণ উল্লেখ করা শর্ত নয়, বরং ইশারাই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে সকলেই একমত (আল-বাদায়ে)।

৭. মাসআলা : যদি মুসলাম ফীহি সালাম দ্রব্য দুইটি হয় এবং রাসুল-মাল (সালামের মূলধন) কয়ালী বা ওজনী দ্রব্য হয়, তবে প্রতিটির ভাগে রাসুল-মালের কতটুকু অংশ থাকবে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তাও নির্ণয় করা শর্ত, অন্যথায় বিক্রি জায়েয হবে না। তবে বিনিময় মূল্য কয়ালী বা ওজনী দ্রব্য না হলে পৃথকভাবে উভয়ের অংশ বলার প্রয়োজন নেই। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে উভয় ক্ষেত্রে সর্বস্বায়ী বিক্রি বৈধ (আল-হাবী)।

৮. মাসআলা : যদি দুই জাতীয় মূলধন দ্বারা সালাম বিক্রয় সম্পন্ন করে, কিন্তু তার একটির পরিমাণ উল্লেখ না করে, যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ গমের জন্য দিরহাম ও দীনার প্রদান করল এবং দিরহামের বা দীনারের পরিমাণ উল্লেখ করল, কিন্তু অন্যটির পরিমাণ বলল না, তবে সে বিক্রি কোনটির ক্ষেত্রেই সহীহ হবে না (আল-বাহরুর-রাইক)।

পাঁচ. পঞ্চম শর্ত হচ্ছে দিরহাম ও দীনার নগদ হওয়া। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রি বৈধ হওয়ার জন্য পরিমাণ বর্ণনার সঙ্গে নগদ হওয়াটাও শর্ত (আন-নিহায়া)।

ছয়. সালাম চুক্তির মজলিসেই 'মূলধন' কবজা করাও শর্ত, রাসুল-মাল দায়ন হোক বস্তুর পরিমাণটাই শুধু নির্ধারিত, বস্তুর সত্তা নির্ধারিত নয় অথবা আয়ন (অর্থাৎ এমন সুনির্দিষ্ট বস্তু যে, ঠিক সেটাই ব্যক্তির যিম্মায় ওয়াজিব হয়)। ইস্তিহসানের দৃষ্টিতে প্রায় সকল ফকীহই এ মত পোষণ করেন। কবজাটা মজলিসের শুরুতে হওয়া বা শেষে হওয়া একই কথা। কেননা মজলিসের

সবগুলো মুহূর্তকে একই হিসেবে গণ্য করা হয়। এমনিভাবে যদি মজলিসের ভেতর কবজা হওয়ার আগেই তারা একত্রে উঠে পড়ে এবং একই সঙ্গে হাটতে থাকে আর একে অন্য হতে দৈহিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে এ অবস্থায় কবজা করে, তাতেও বিক্রি বৈধ হবে (আল-বাদায়ে)।

৯. মাসআলা : 'আন-নাওয়াদির' গ্রন্থে আছে, সালাম চুক্তি করার পর যদি উভয়ে হাটতে থাকে এবং অনিচ্ছিন্ন অবস্থায় বহুদূর চলে যায়, তারপর মূলধন অর্পণ ও গ্রহণ করে তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে তাতেও সে বিক্রি বৈধ হবে (আয-যাখীরা)।

১০. মাসআলা : যদি উভয়ে বা একজন বসা অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে এটাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মনে করা হবে না। কেননা এটা থেকে বেঁচে থাকা কঠিন। পক্ষান্তরে যদি তারা শোয়া অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে তবে সেটা বিচ্ছিন্ন হওয়াই গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : 'আন-নাওয়াযিল' গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়ে দশ কাফীয গমের ভেতর বায়উস সালাম করল, কিন্তু দিরহামগুলো তার হাতে ছিল না। কাজেই সে দিরহাম আনার জন্য ঘরে ঢুকল- এখন তার প্রবেশ যদি সালামের দ্বিতীয় পক্ষের দৃষ্টির ভেতর হয়, তবে সে বিক্রি বাতিল হবে না। যদি দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, তবে সে বিক্রি বাতিল হবে না। যদি দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়, তবে বাতিল হয়ে যাবে (আল-খুলাসা)।

১২. মাসআলা : যদি একজন পানির ভেতর নেমে ডুব দেয় এবং পানি এতটা স্বচ্ছ হয় যে, ডুব দেওয়ার পরও তাকে দেখা যায়, তবে তাদের ভেতর বিচ্ছিন্নতা সাধিত হবে না। পানি যদি অপরিষ্কার হয়, যদ্বন্ধন ডুব দেওয়ার পর তাকে দেখা না যায় তবে বিচ্ছিন্নতা সাধিত হবে (মুখতারুল-ফাতাওয়া)।

১৩. মাসআলা : বিক্রেতা যদি মজলিসে বিনিময় মূল্য কবজা করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে প্রশাসন তাকে তা কবজা করতে বাধ্য করবে (আল-মুহীত)।

১৪. মাসআলা : মুসলাম ফীহি (বিক্রিত মাল)-এর সাথে সম্পৃক্ত শর্তাবলী নিম্নরূপ-

এক. মুসলাম ফীহি (বিক্রিত মাল)-এর জাত, অর্থাৎ তা গম, না যব কিংবা অন্য কিছু তা বর্ণনা করা।

দুই. তার প্রকার বর্ণনা করা, যেমন তা কি সেচের পানিতে উৎপন্ন, না জোয়ারের পানিতে। এমনিভাবে তা পাহাড়ি জমির গম, না সমতল ভূমির।

তিন. গুণগত মান বর্ণনা করা, অর্থাৎ তা উত্তম গম, না নিম্নমানের, নাকি মধ্যম পর্যায়ের (আন-নিহায়া)।

১৫. মাসআলা : যদি উৎকৃষ্ট গমে বায়উস সালাম করে কিংবা বলে, ভাল গম বা খাঁটি (নির্ভেজাল) গম, তবে জায়েয হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধ মত এবং এটাই ফুকাহায়ে কিরামের কাছে গৃহীত হয়েছে (আল-গিয়াছিয়া)।

চার. কয়াল, ওজন, গণনা কিংবা গজের মাপে সালাম দ্রব্য-এর পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে হবে (আল-বাদায়ে)।

১৬. মাসআলা : সালাম দ্রব্যের পরিমাণ এমন মাপ দ্বারা সুনির্দিষ্ট হতে হবে, যে মাপ মানুষের হাত থেকে বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা নেই। যদি নির্দিষ্ট কোন পাত্র দ্বারা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে, যেমন বলল, ঠিক এই পাত্র দ্বারা বা এই থলে দ্বারা মেপে দেওয়া হবে কিংবা বলল, এই পাথরের ওজনে দেওয়া হবে, তবে সে পাত্রে কী পরিমাণ ধরে বা সে পাথরের ওজন কী পরিমাণ তা অজ্ঞাত থাকলে বিক্রি জায়েয হবে না (আল-জাওয়াহিরুল-আখলাতী)।

১৭. মাসআলা : গজী দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এমন ফিতার পরিমাপে নির্দিষ্ট করতে হবে। যা মানুষের হাত থেকে বিলুপ্ত হওয়ার ভয় নেই। যদি সুনির্দিষ্ট কোন কাঠ দ্বারা তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে, যার মাপ জানা নেই অথবা তার নিজের হাত দ্বারা কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির হাত দ্বারা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে, তবে তা জায়েয হবে না (আয-যাখীরা)।

১৮. মাসআলা : নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির পাত্র অথবা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির গজ দ্বারা পরিমাণ নির্দিষ্ট করলে জায়েয হবে না, যদি সেই ব্যক্তির পাত্র ও গজ অন্যদের পাত্র ও গজ অপেক্ষা ভিন্ন হয়। আর যদি তার পাত্র ও গজ অন্যদের মতই হয়, তবে সেই ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত করাটা অহেতুক সাব্যস্ত হবে এবং বায়উস সালাম জায়েয হয়ে যাবে (আল-ইয়ানাবী)।

১৯. মাসআলা : পাত্রটি এমন হতে হবে, যা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হয় না, যেমন কাঁসা বা তামার পাত্র। ঠাসা দিলে আরও বেশী ভরে ওঠে এমন পাত্র দ্বারা পরিমাণ ঠিক করলে জায়েয হবে না, যেমন ঝুড়ি ও থলি। কেননা এর দ্বারা পরিমাণ স্থির করা হলে বিবাদের আশংকা থাকে। অবশ্য পানির মশক (এ জাতীয় পাত্র হলেও)-এর দ্বারা বায়উস সালাম জায়েয, যেহেতু মানুষের মধ্যে এর রেওয়াজ আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে এরূপ বর্ণিত আছে (আল-হিদায়া)।

পাঁচ. সালাম দ্রব্য পরিশোধের জন্য সুনির্দিষ্ট মেয়াদ থাকতে হবে। নগদ-নগদ বায়উস সালাম জায়েয নয়। যে সর্বনিম্ন মেয়াদের কমে সালাম বিক্রিয় জায়েয নয়, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে এক মাসের কথা বর্ণিত আছে, এরই উপর ফাতওয়া (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা : রাক্বুস সালাম (ক্রেতা)-এর মৃত্যুর কারণে মেয়াদ বাতিল হবে না, কিন্তু মুসলাম ইলায়হি (বিক্রেতা)-এর মৃত্যুর কারণে বাতিল হবে। কাজেই তার মৃত্যু মাত্রই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বিক্রিত মাল আদায় করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

ছয়. চুক্তির সময় হতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কাল পর্যন্ত মুসলাম ফীহি (বিক্রিত মাল) বর্তমান থাকতে হবে। সুতরাং যদি চুক্তির সময় তা বর্তমান না থাকে, কিন্তু মেয়াদ উত্তরণকালে থাকে বা এর বিপরীত হয় কিংবা মধ্যবর্তী সময়ে না থাকে এবং চুক্তি ও মেয়াদ উত্তরণকালে থাকে তবে জায়েয হবে না (ফাতহুল-কাদীর)।

২১. মাসআলা : বর্তমান থাকার অর্থ হচ্ছে বাজার থেকে উঠে না যাওয়া আর বর্তমানে না থাকার অর্থ বাজারে না পাওয়া যাওয়া। যদিও বাড়িতে পাওয়া যায় (আস-সিরাজুল-ওয়াহাজ)।

২২. মাসআলা : মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় যে মাল পাওয়া যায়, তাতে যদি বায়উস সালাম করে, কিন্তু কবজা না করে, ফলে তা বাজার থেকে উঠে যায়, কারো হাতে না থাকে, তবে বিক্রি আপন অবস্থায় সহীহ থাকবে আর এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। চাইলে সে চুক্তি রহিত করবে অথবা পরে আবার বাজারে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে (আল-ইয়ানাবী)।

সাত. মুসলাম ফীহি এমন মাল হতে হবে, যা সুনির্দিষ্ট করা হলে সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং দিরহাম ও দীনারে বায়উস সালাম জায়েয নয়। নোনা-রূপার টুকরায় কি বায়উস সালাম জায়েয? 'বায়উস-সারফ'-এর রিওয়াযাতের উপর কিয়াস করলে নাজায়েয সাব্যস্ত হয় আর 'কিতাবুশ শিরকা'-এর রিওয়াযাত অনুসারে জায়েয বুঝা যায় (আন-নিহায়া)।

আট. মুসলাম ফীহি চার জাতীয় মালের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে- কয়ালি দ্রব্য, ওজনী দ্রব্য, অল্প ব্যবধানের গুণতি দ্রব্য ও গজী দ্রব্য (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা : সুতরাং জীব-জন্তু, পত্তর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন মাংস, পায়া ইত্যাদিতে বায়উস সালাম জায়েয নয়। এমনভাবে গোলাম ও বাঁদীতেও বায়উস সালাম জায়েয নয়, যেহেতু এদের বুদ্ধি ও আখলাক-চরিত্রে প্রভেদ থাকে (আস-সিরাজুল ওয়াহাজ)।

নয়. যে দ্রব্যের পরিবহন ব্যয় আছে তা হস্তান্তরের স্থান নির্ধারণ করাও শর্ত। আর এটাই সহীহ মত (আন-নাহরুল ফাইক)।

২৪. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এটা শর্ত নয়। তবে এরূপ শর্ত আরোপ করলে তা সহীহ হবে। আর যদি এরূপ শর্ত আরোপ না করে, তাহলে চুক্তির স্থানই হস্তান্তরের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে (আল-কাফী)।

২৫. মাসআলা : সালামের প্রথম পক্ষ যদি নির্দিষ্ট কোন শহরে হস্তান্তরের শর্ত আরোপ করে তাহলে তাই করবে এবং তাতে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। অন্য কোন স্থানে তা সমর্পণ করার জন্য ক্রেতা তাকে বাধ্য করতে পারবে না (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা : কারও মতে উপরিউক্ত মাসআলা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন শহর বড় না হয়। পক্ষান্তরে শহর যদি বড় হয়, যার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত এক ফারসাখ (প্রায় আট কিলোমিটার)-এর ব্যবধান, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিশেষ কোন স্থান নির্দিষ্ট না করবে, চুক্তি বৈধ হবে না। কেননা তা অজ্ঞাত থাকলে বিবাদের আশংকা থাকে (মুহীত : আস-সারাকসী)।

২৭. মাসআলা : যে সব দ্রব্যের কোন বহন খরচা নেই, যেমন কস্তুরি, কর্পুর ইত্যাদি, তার পরিশোধ স্থান নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। এক্ষেত্রে কি সমর্পণের জন্য চুক্তি সম্পাদনের স্থানটাই নির্দিষ্ট হয়ে যাবে? 'আল-বুয়' ও 'আল-জামিউস-সাগীর' এর

বর্ণনানুসারে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে আর এ মতই বিশুদ্ধতর। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র) এ মতই পোষণ করেন (মুহীত : আস-সারাখসী, আল-ইয়ানাবী)।

২৮. মাসআলা : 'আল-ইজারাত' অধ্যায়ে বলা হয়েছে, চুক্তির স্থানটি নির্দিষ্ট হয়ে যাবে না। বিক্রেতা চাইলে যে কোন স্থানে তা পরিশোধ করতে পারবে আর এ মতই বিশুদ্ধতর (আল-কাফী, আল-হিদায়া)।

২৯. মাসআলা : যদি কোন স্থান নির্দিষ্ট করে, তবে কারও মতে তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে না। কেননা তার কোন ফায়দা নেই, যেহেতু তার স্থানান্তরে পয়সা খরচ হয় না এবং স্থানভেদে তার মূল্যমানেও পার্থক্য হয় না। কেউ বলেন, নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর এটাই বিশুদ্ধতর মত (আল-ইয়ানাবী)।

৩০. মাসআলা : যে দ্রব্যের বহন খরচা আছে, তাতে যদি সাগর বক্ষে বা পাহাড়ের চূড়ায় বায়উস সালামের চুক্তি করে, তবে সেখান থেকে সর্ব নিকটতম স্থানে তা সমর্পণ করতে হবে (আল-ইয়ানাবী)।

দশ. সমজাতীয় বস্তুর বেচাকেনায় সুদের যে দুটি কারণ আছে, অর্থাৎ সমজাতীয়তা ও ওজন বা কয়ালের মাপ, বায়উস সালামের উভয় বিনিময় অর্থাৎ পণ্য ও মূল্যের ভেতর সে দুই কারণের একটি কারণ বিদ্যমান না থাকা শর্ত। আর এটা বায়উস সালামের যে কোন দ্রব্যেই প্রযোজ্য, শুধু সোনা-রূপা বা তার তৈরি মুদ্রা ব্যতিক্রম। কেননা মানুষের ব্যাপক প্রয়োজন হেতু এর বিনিময়ে ওজনীয় দ্রব্য বায়উস সালাম করা বৈধ রাখা হয়েছে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩১. মাসআলা : বায়উস সালামের হুকুম : সুনির্দিষ্ট বা বিবরণ দেওয়া রাসুল-মাল (বিনিময় মূল্য)-এর ভেতর মুসলাম ইলায়হি (বিক্রেতা)-এর নগদ মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিপরীতে মুসলাম ফীহি (বিক্রিত মাল)-এর ভেতর রাব্বুস সালাম (ক্রেতা)-এর পরবর্তীকালীন বা বাকি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়াই হচ্ছে একরূপ বেচাকেনার হুকুম (আন-নিহায়া)।

৩২. মাসআলা : বায়উস সালাম যখন বিশুদ্ধভাবে সম্পাদিত হবে এবং তারপর বিক্রেতা (মুসলাম ইলায়হি) মাল উপস্থিত করবে, তখন তাতে ক্রেতা (রাব্বুস-সালাম)-এর কোন ইখতিয়ার থাকবে না। হাঁ, সে যদি দেখে মাল শর্তানুরূপ নয়। তখন সে বিক্রেতাকে বাধ্য করতে পারবে, যাতে সে যে রকম মালে চুক্তি হয়েছে, তাই উপস্থিত করে (আল-ইয়ানাবী)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : কোন্ দ্রব্যে বায়উস সালাম জায়েয এবং কোন্ দ্রব্যে জায়েয নয়

১. মাসআলা : যদি হারাবী কাপড়ের বিনিময়ে হারাবী কাপড়ে বায়উস সালাম (অগ্রিম ক্রয়), তবে তা জায়েয হবে না। এমনভাবে যদি এক কাফীয গমের বিনিময়ে এক কাফীয গমে এ জাতীয় বেচাকেনা করে তাও জায়েয হবে না (আয-যাখীরা)।

২. মাসআলা : কায়লী দ্রব্যের বিনিময়ে ওজনীয় দ্রব্যে বায়উস সালাম জায়েয- যদি সে ওজনীয় দ্রব্য এমন হয়, যা বায়উস সালামের পণ্য হতে পারে, যেমন তা এমন পণ্য যাকে

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

গুণাবলীর উল্লেখ দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং যদি গমের বিনিময়ে সোনা-রূপায় বায়উস সালাম (অগ্রিম ক্রয়) করে, তা আমাদের মতে জায়েয হবে না; বরং চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধতর মত। ওজনীয় দ্রব্যের বিনিময়ে কয়ালি দ্রব্যে বায়উস সালাম জায়েয (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা : চুক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায় এমন ওজনীয় দ্রব্যের বিনিময়ে ওজনীয় দ্রব্য বায়উস সালাম জায়েয নয়, যেমন লোহার বিনিময়ে জাফরান। কিন্তু দিরহাম ও দীনার দ্বারা যদি ওজনীয় দ্রব্যে বায়উস সালাম করে, তবে তা জায়েয হবে। যদি একখণ্ড রূপা বা এক টুকরা সোনা কিংবা এর অলংকার দ্বারা জাফরানের ভেতর বায়উস সালাম করে, তবে ইমাম ইউসুফ (র)-এর মতে তা জায়েয হবে।

যদি অপরাপর ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে ওজনীয় দ্রব্যে বায়উস সালাম করে, তবে জায়েয হবে। কিন্তু ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে সমজাতীয় মুদ্রায় বায়উস সালাম জায়েয নয়।

যদি তারা পাত্রের বিনিময়ে ওজনীয় দ্রব্যে বায়উস সালাম করে, তবে দেখতে হবে সে তাম্র ওজন দ্বারা বিক্রি হয় না গণনা দ্বারা ওজন দ্বারা বিক্রি হলে জায়েয হবে না আর গণনা দ্বারা হলে জায়েয হবে। তবে উপরে যেমন বলা হয়েছে, ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রে এটা জায়েয হবে না (শারহ-তাহাবী)।

৪. মাসআলা : কয়ালি দ্রব্যের বিনিময়ে কয়ালি দ্রব্যে বায়উস সালাম জায়েয নয়।

যে সব বস্তু কায়লী বা ওজনীয় নয়, তার দুই জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে বায়উস সালাম দৃশ্যীয় নয়, তার একটির বদলে দুটি নগদ-নগদ হলেও জায়েয হবে এবং বাকিতে হলেও দোষ নেই, যদি মুসলাম ফীহি (পণ্য)-কে গুণাবলীর উল্লেখ দ্বারা এভাবে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় যে, গুণাবলীর উল্লেখ করার ফলে তা মিছলী দ্রব্য (যে দ্রব্যের হুবহু অনুরূপ দ্রব্য পাওয়া যায়)-এর শামিল হয়ে যায়। সুতরাং যদি হারাবী কাপড়ের বিনিময়ে কোন মুক্তার ভেতর বায়উস সালাম করে, তবে তা জায়েয হবে না। এমনভাবে জীব-জন্তুর ক্ষেত্রেও আমাদের মতে একই হুকুম।

যে সব বস্তু কয়ালি বা ওজনীয় নয়, তা যদি একই জাতীয় হয়, তবে তার একটিকে দুটির বদলে নগদ-নগদ বিক্রি করলে কোন দোষ নেই। যদি বাকি হয়, তবে আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মতে জায়েয হবে না। সুতরাং যদি দুটি হারাবী কাপড়ের বিনিময়ে একটি হারাবী কাপড়ে বায়উস সালাম করে, তবে আমাদের নিকট জায়েয হবে না (আল-মাবসূত)।

৫. মাসআলা : যদি কয়ালি দ্রব্যের বিনিময়ে কায়লী ও ওজনীয় দ্রব্যে সালাম করে, তদ্রূপ যে কোন দ্রব্যের বিনিময়ে তার সমজাতীয় ও ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের সমষ্টিতে যদি সালাম করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সবটার ক্ষেত্রেই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে যথাক্রমে ওজনীয় দ্রব্য ও ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের অংশে চুক্তি বৈধ থাকবে (আল-হাবী)।

৬. মাসআলা : একই প্রকার কয়ালি বা ওজনীয় দ্রব্যে বিভিন্ন অংশের জন্য আলাদা মেয়াদের শর্তে সালাম করা দোষের নয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির অংশ আলাদাভাবে বর্ণনা করা অপরিহার্য

নয়। যদি মুসলাম ফীহি (বিক্রিত মাল) কবজা না করে এবং এক সময় তা শেষ হয়ে যায় আর তার অনুরূপ মাল পাওয়া না যায়, তবে আমাদের তিনও ইমামের মতে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে না, বরং ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। সে চাইলে অনুরূপ মাল পাওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং তখন তা থেকে তার পাওনা বুঝে নেবে আর চাইলে সে সময় পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে অস্বীকার করবে এবং তার দেওয়া বিনিময় মূল্য ফেরত নেবে (শরহত-তাহাবী)।

৭. মাসআলা : দিরহামের বিনিময়ে জাফরানের বায়উস সালাম করলে জায়েয হবে। লোহা, সীসা বা এ জাতীয় দ্রব্যে ধাতব মুদ্রা (ফুলুস) দ্বারা বায়উস সালাম করলে দোষ নেই। তামার ভেতর ধাতব মুদ্রা দ্বারা বায়উস সালাম জায়েয নয়। ধাতব মুদ্রা বলতে চালু মুদ্রা বুঝানো হয়েছে। অচল হয়ে গেলে লোহা ও সীসাতেও তার বিনিময়ে বায়উস সালাম জায়েয হবে না। বর্ষা ইত্যাদির ফলার বিনিময়ে লোহাতে এরূপ বেচাকেনা জায়েয নয়। এমনিভাবে জায়েয নয় তরবারির বিনিময়েও। তরবারির বিনিময়ে যদি এভাবে তামা কেনে তবে তা জায়েয হবে, যদি তরবারি গুণতি হিসেবে বিক্রি হয়; ওজনে বিক্রি হলে জায়েয হবে না (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : আমাদের মাযহাবে বাকি দিরহামের ভেতর নগদ গম দ্বারা বায়উস সালাম জায়েয নয়। আর যখন জায়েয হল না, ঈসা ইব্ন আবান (র)-এর মতে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। শামসুল আইন্মা আবু বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আবু সাহল আস-সারাখসী (র) বলেন, এটাই সঠিক (আয-যাহীরিয়া)।

৯. মাসআলা : কয়ালি দ্রব্যে যদি ওজনে সালাম করে, যেমন গম ও যব কিনল ওজনে, তবে এ সম্পর্কে দুই রকম বর্ণনা আছে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা এটাই যে, জায়েয হবে। ওজনী দ্রব্যকে কয়াল হিসেবে ক্রয় করার ক্ষেত্রেও একই মতভেদ (আল-বাহরুর রাইক)।

১০. মাসআলা : যখন দুধ পাওয়া যায়, তখন যদি নির্দিষ্ট কয়াল বা ওজনে নির্দিষ্ট দুধ কেনে, তবে তা জায়েয হবে। সিরকা ও আসুরের রসের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। দুধের ক্ষেত্রে যে মওসুমের শর্তারোপ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে শামসুল আইন্মা আস-সারাখসী বলেন, এটা বিশেষ অঞ্চল হিসেবে। কেননা কোনও কোনও অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ মওসুমে মানুষের কাছে দুধ থাকে না। কিন্তু আমাদের অঞ্চলে দুধ সব সময়ই পাওয়া যায়। কখনই নিঃশেষ হয় না। কাজেই আমাদের অঞ্চলে সব সময়ই জায়েয হবে। সিরকা সর্বদাই পাওয়া যায়। কাজেই এতে মওসুমের কোন শর্ত নেই। দ্রাক্ষা নির্যাস সর্বদা পাওয়া যায় না। কাজেই তাতে বায়উস সালাম জায়েয হওয়ার জন্য মওসুমের শর্ত রয়েছে (আয-যখীরা)।

১১. মাসআলা : ঘি-এর মধ্যে ওজন বা কয়াল হিসেবে সালাম জায়েয। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে একটি বর্ণনায় আছে যে, ওজনে জায়েয হবে না। তদ্রূপ যা কিছুই রাতুল (কৌটা) দ্বারা বিক্রি হয়, তাতে কয়াল ও ওজন উভয় পদ্ধতিতেই সালাম জায়েয হয় (আত-তাতার খানিয়া- আল-ফাতাওয়া আল-আত্তাবিয়া-এর বরাতে)।

১২. মাসআলা : নতুন গম উৎপন্ন হওয়ার আগেই যদি তা ক্রয় করে তবে আমাদের মাযহাবে জায়েয হবে না। কেননা বর্তমানে নেই এমন দ্রব্যে সালাম করা হয়েছে। এ হিসেবে সিদ্ধান্ত বের হয়ে আসে যে, বিশেষ কোন স্থানের গমে যদি সালাম করে, যে স্থানে গম কখনও দুষ্প্রাপ্য হওয়ার আশংকা থাকে না, সেখানে সর্বদাই তাতে বায়উস সালাম জায়েয। যেমন খুরাসান, ইরাক বা ফারগানা। এসব অঞ্চলে যে কোন সময় এভাবে গম কেনা জায়েয। এমনিভাবে যদি সমরকন্দ, বুখারা বা কাশানের মত বৃহৎ নগরের খাদ্য দ্রব্যে সালাম করে, তাও জায়েয। আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে কেউ কেউ বলতেন, এটা জায়েয নয়। সমগ্র দেশের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করলে কেবল তখনই জায়েয হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিক কথা এই যে, খাদ্যের উল্লিখিত স্থান যদি সাধারণত খাদ্য শূন্য না হয়, তবে তাতে সালাম জায়েয হবে, সেটা কোন দেশই হোক বা বড় নগর হোক। যদি সে স্থানের খাদ্য শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে তার সাথে সম্পৃক্ত করে সালাম করা জায়েয হবে না, যেমন নির্দিষ্ট কোন জমি বা নির্দিষ্ট কোন পল্লী (আল-বাদায়ে)।

১৩. মাসআলা : কোন পল্লীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার উদ্দেশ্য যদি থাকে খাদ্যের গুণ বর্ণনা করা, স্থান নির্দিষ্ট করা নয়, যেমন বুখারার খুশমুরানী, তবে তা জায়েয হবে। কেননা তা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎকৃষ্টতা বুঝানো (আল-কাফী)।

১৪. মাসআলা : যদি 'হারাত'-এর গম নির্দিষ্ট করে বায়উস সালাম করে, তবে তা জায়েয হবে না। কিন্তু হারাতের কাপড়ের ক্ষেত্রে জায়েয হবে, যদি বায়উস সালামের যাবতীয় শর্ত পূরণ করা হয়ে থাকে (শারহত-তাহাবী)।

১৫. মাসআলা : ইব্ন সামাআ (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণনা করেন, মারবের মারবী বস্ত্রে বাগদাদের মারবী বস্ত্রের বিনিময়ে বায়উস সালাম করা জায়েয। এমনিভাবে বাগদাদের মারবী বস্ত্রের বিনিময়ে আহওয়ায়ের মারবী বস্ত্রেও জায়েয, যেমন জায়েয ওয়াসিতের মারবী বস্ত্রে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা : যদি হারাবী তুলার বিনিময়ে হারাবী বস্ত্রে বায়উস সালাম করে, তবে জায়েয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা : যদি পশমের বিনিময়ে পশমী কম বলে বা জিনের নিচে ব্যবহৃত শ্বেদ শোষক কাপড়ে কিংবা রেশমের বিনিময়ে রেশমী কাপড়ে বায়উস সালাম করে, তবে দেখতে হবে সে কাপড় আবার খুলে সুতায় পরিণত করা যায় কিনা। সুতায় পরিণত করা না গেলে জায়েয হবে আর যদি খুলে সুতায় পরিণত করা যায়, যেমন শ্বেদ শোষক খুললে আবার পশমী সুতায় পরিণত হয়, তবে জায়েয হবে না। সুতার বিনিময়ে সুতি কাপড় কিনলে জায়েয হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১৮. মাসআলা : যে সব গুণতি দ্রব্যে ব্যবধান বেশী তাতে গুণতি হিসেবে বায়উস সালাম জায়েয নয়, যেমন তরমুজ, আনার প্রভৃতি (আল-হাবী)।

১৯. মাসআলা : অল্প ব্যবধানের গুণতি দ্রব্য সালাম জায়েয। সুতরাং আখরোট ও ডিমে গুণতি, কয়াল কিংবা ওজন হিসেবে বায়উস সালাম জায়েয হবে 'আয-যিয়াদাত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, আখরোট ও ডিমে বায়উস সালাম জায়েয হবে, যদি ডিমের ক্ষেত্রে বলে দেয়, তা মুরগির ডিম না হাঁসের; ভাল মন্দ স্থির করা অপরিহার্য নয়। কেননা এ ক্ষেত্রে পরিমাণগত ব্যবধান ধর্তব্য নয়, তখন গুণগত ব্যবধানও যে ধর্তব্য হবে না, সে তো বলারই অপেক্ষা রাখে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২০. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন বস্তুর এককসমূহের দামে পার্থক্য থাকলে তাকে তারতম্যপূর্ণ গণনা দ্রব্য বলে। আর যে বস্তুর এককসমূহের দামের পার্থক্য নেই সেগুলোকে নিকট গণনা দ্রব্য বলে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে আরও বর্ণিত আছে যে, যদি মুরগির ডিমের বদলে হাঁসের ডিম বা উট পাখির ডিমের বদলে মুরগির ডিম কেনে, তা জায়েয হবে। যদি মুরগির ডিম দ্বারা উট পাখির ডিম বা মুরগির ডিম দ্বারা হাঁসের ডিম কেনে, তবে লক্ষ্য করতে হবে সে সময়টা এমন কিনা যে, মুসলাম ইলায়হি (বিক্রেতা) তখন তা পরিশোধ করতে সক্ষম? সক্ষম হলে জায়েয হবে অন্যথায় জায়েয নয় (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা : কাগজে গুণতি হিসেবে বায়উস সালাম জায়েয। যদি ওজন হিসেবে কেনে, তবে 'আল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে দেখেছি, তাও জায়েয হবে (আল-মুযম্মারাত)।

২২. মাসআলা : ফুলস (ধাতব মুদ্রা, সোনা, রূপা ছাড়া)-এর মাঝে যাহিরী রিওয়াযাত অনুযায়ী গুণতি হিসেবে বায়উস সালাম জায়েয। 'আল-ইয়ানাবী' গ্রন্থে এরূপ বলা হয়েছে এবং এটাই সহীহ (আন-নিহায়া)।

২৩. মাসআলা : বেগুন, পেয়ারা ও মিষ্টি আলুতেও গুণতি হিসেবে বায়উস সালাম জায়েয। যানদাবীসতী (র) এরূপ উল্লেখ করেছেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৪. মাসআলা : হাসান (র) বর্ণনা করেন যে, পিয়াজ ও রসুনে কয়াল হিসেবেও সালাম জায়েয। গণনা হিসেবেও জায়েয। কেননা এগুলো নিকট গণনা দ্রব্য (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২৫. মাসআলা : সীসা ভাঙ্গা না হলে তাতে বায়উস সালাম জায়েয নয়। ভাঙ্গা হলে তখন সুনির্দিষ্ট ওজনে জায়েয হবে। সীসার মুজাও সুনির্দিষ্ট ওজনে ক্রয় করা জায়েয। কেননা এটা ওজনী দ্রব্য (আল-মাবসূত)।

২৬. মাসআলা : 'আল-ইয়াতীমা' গ্রন্থে আছে, স্বর্ণের বিনিময়ে যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে বায়উস সালাম করে, তবে তা জায়েয হবে না (আত-তাতার খানিয়া)।

২৭. মাসআলা : কাঁচের পাত্রে বায়উস সালাম জায়েয নয়। কেননা এটা এমন গুণতি দ্রব্য যার এককসমূহের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। এভাবে কড়াই কেনা জায়েয যদি স্থির করে দেওয়া হয় যে, তা কোন প্রকারের হবে। মাটির পাত্রে বায়উস সালাম জায়েয, যদি স্থির করে দেওয়া

হয় যে, তা কোন প্রকারের হবে এবং মানুষের কাছে সেই সে প্রকারটা সুপরিচিত হয়। কলসের একই হুকুম (আয-যাহীরিয়া)।

২৮. মাসআলা : ফর্মা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হলে কাঁচা-পাকা ইটে বায়উস সালাম জায়েয হবে। ফর্মা সুনির্দিষ্ট হবে যখন তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও গভীরতা প্রচলিত মাপে ঠিক করা হবে। কোন অঞ্চলে যদি একই রকমের ফর্মা চালু থাকে, তবে ফর্মা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন থাকবে না (আল-ইয়ানাবী)।

২৯. মাসআলা : প্রচলিত মাপে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নির্দিষ্ট করা হলে বস্ত্রেও বায়উস সালাম জায়েয হবে তা সুতি বস্ত্র হোক বা রেশমী। সুতি বস্ত্রে ওজন উল্লেখ করার শর্ত নেই। রেশমী বস্ত্রের ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ওজন স্থির করা শর্ত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা : যদি ওজন ঠিক করা হয়, কিন্তু কত গজ হবে তা বলা না হয়, তবে জায়েয হবে না। শায়খুল ইসলাম খাহারযাদে (র) তাঁর ভাষ্য গ্রন্থে বলেন, রেশমী বস্ত্রে যদি ওজন নির্দিষ্ট করা হয়, কিন্তু গজ নির্দিষ্ট করা না হলে সালাম জায়েয হবে না সেই ক্ষেত্রে, যখন প্রতি গজের পৃথক মূল্য নির্ধারণ না করা হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রতি গজের আলাদা মূল্য স্থির করা হলে জায়েয হবে (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা : যদি রেশমী কাপড়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও জমিন বর্ণনা করে কিন্তু ওজন বর্ণনা না করে তবে তাতে সালাম সহীহ হবে। আর যদি ওজন বর্ণনা করে, কিন্তু দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও জমিন বর্ণনা না করে তবে জায়েয হবে না।

এক বর্ণনা মতে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও জমিন বর্ণনা করলেও ওজনের বর্ণনা ছাড়া বিক্রি বৈধ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩২. মাসআলা : যদি সাধারণভাবে শর্ত করে যে, এত গজ দিতে হবে, তবে উভয় দিকের স্বার্থ রক্ষার্থে মাঝারি পর্যায়ের গজ দেওয়া হবে। মাঝারি পর্যায়ের গজ বলতে কী বুঝানো হয়েছে এর ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, এর দ্বারা ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ গজ দ্বারা মাপা, বিশেষ্য অর্থাৎ গজ কাঠি বুঝানো হয় নি। সুতরাং বাক্যটির অর্থ হবে, মাপার সময় কাপড় সজোরে টানা হবে না এবং বেশী টিলাও দেওয়া হবে না, বরং মাঝারি গোছের মাপ দেওয়া হবে। কেউ বলেন, এর দ্বারা গজের কাঠি বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা বাজারে গজের কাঠি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কোনওটি হয় বেশী খাট এবং কোনওটি বেশী লম্বা।

শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, সাধারণভাবে গজের শর্তরূপ করলে উভয় অর্থ হিসেবেই মাঝারি গজ বুঝানো হবে, অর্থাৎ মাপের ধরনও হবে মাঝারি গোছের এবং কাঠিটিও হবে মাঝারি। যাতে উভয়ের স্বার্থ রক্ষা পায় (আয-যাহীরী)।

৩৩. মাসআলা : 'আল-আসল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সুনির্দিষ্ট কয়াল বা সুনির্দিষ্ট ওজনে ভূসিতে বায়উস সালাম করলে জায়েয হবে। যদি বস্তা দ্বারা পরিমাপ করা হয় এবং তার মাপ জানা থাকে, তবে জায়েয হবে, আর মাপ অজ্ঞাত হলে জায়েয হবে না।

এ মাসআলায় ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কারও মতে ভূমি সর্বাবস্থায়ই কয়ালি দ্রব্য। কেউ বলেন, প্রচলনের ভিত্তিতে ওজনীও হতে পারে, কয়ালিও হতে পারে (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা : স্বর্ণাকারদের মাটি বিক্রি জায়েয নয়, এমনিভাবে খনির মাটিও বিক্রি নাজায়েয (আত-তাতার খানিয়া-আল-আত্তাবিয়া-এর বরাতে)।

৩৫. মাসআলা : ফরাশ, চটাই ও চটে বায়উস সালাম জায়েয, যদি তার গজ, মান ও বুনান নির্দিষ্ট করা হয় (আল-হাবী)।

৩৬. মাসআলা : সর্ব প্রকার কম্বলে বায়উস সালাম জায়েয, যদি দার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও জমিন বর্ণনা করা হয়। কেননা এ সব বর্ণনার মাধ্যমে কম্বলকে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। চামড়ার পোশাকে বায়উস সালাম জায়েয নয়। যেহেতু তা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩৭. মাসআলা : উট, গরু ও ছাগলের চামড়ায় বায়উস সালাম জায়েয নয়। এর বিশেষ কোন প্রকার যদি বর্ণনা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়, তবে জায়েয হবে (আয-যাখীরা)।

৩৮. মাসআলা : 'আল-মাবসূত' গ্রন্থে আছে, চামড়া ও পাতায় বায়উস সালাম জায়েয নয়। অবশ্য বিশেষ কোন প্রকারের চামড়া ও পাতার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও মান নির্দিষ্ট করা হলে, তখন কাপড়ের মত তাতে বায়উস সালাম জায়েয হবে। এমনিভাবে চামড়া যদি ওজনে বিক্রি হয়, তবে তাতে ওজন হিসেবেও বায়উস সালাম জায়েয হবে। আর সে ক্ষেত্রে এমনিভাবে ওজন স্থির করতে হবে, যাতে সমর্পণ ও গ্রহণে কোনরূপ বিবাদ সৃষ্টির সুযোগ না থাকে (আয-যাহীরিয়া)।

৩৯. মাসআলা : পশুর মাথা ও পায়ে বায়উস সালাম জায়েয নয় (আল-খুলাসা)।

৪০. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে গোশতের ভেতর বায়উস সালাম জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে যদি জাত, প্রকার, বয়স, দেহের স্থান গুণ ও পরিমাণ স্থির করা হয় তবে জায়েয হবে, যেমন এরূপ বলা যে, দু'বছর বয়সী স্বাস্থ্যবান তোলানো ছাগলের সীনা বা রান থেকে একশ' রাতল। হাড় ছাড়ানো গোশতে এরূপ বেচাকেনা জায়েয কিনা সে ব্যাপারে দু'রকম বর্ণনা আছে। বিশুদ্ধতর বর্ণনা অনুযায়ী জায়েয নয়। 'আল-হাকাইক' ও 'আল-উয়ূন' গ্রন্থদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, শিষ্যদ্বয়ের মত অনুসারেই ফাতওয়া দেওয়া হয়। প্রশাসন যদি জায়েয বলে রায় প্রদান করে তবে সর্বসম্মতিক্রমেই বৈধ হবে (আল-বাহরুর রাইক)।

৪১. মাসআলা : দুধার চাকতিতে বায়উস সালাম জায়েয। চর্বিতেও এরূপ বেচাকেনা বৈধ। এটা সকলেরই মত (আয-যাহীরিয়া)।

৪২. মাসআলা : মাছের ভেতর বায়উস সালাম করা হলে, দেখতে হবে সেটা তাজা মাছে করা হয়েছে, না লবণ দেওয়া মাছের এমনিভাবে গুণতি হিসেবে না ওজনে? গুণতি হিসেবে

করলে তাজা মাছ বা লবণ দেওয়া মাছ কোনওটাতেই বায়উস সালাম জায়েয হবে না। আর যদি ওজনে বায়উস সালাম করে, তবে লবণ মাখানো মাছে তো জায়েয হবে। আর তাজা মাছ হলে সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে চুক্তি ও মেয়াদ মাছের মওসুমে হয়েছে কিনা। যদি মওসুমে হয়ে থাকে এবং মধ্যবর্তী সময়ে মাছ দুঃপ্রাপ্য হওয়ার আশংকা না থাকে, তবে জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না (শারহ-তাহাবী)।

৪৩. মাসআলা : ছোট মাছে কয়াল বা ওজনে সালাম করা জায়েয (আল-ইয়ানাবী)।

৪৪. মাসআলা : বড় মাছের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) হতে দু'রকম বর্ণনা আছে। যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী জায়েয আর এটাই সাহেবানের মত (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪৫. মাসআলা : 'আল-আসল' গ্রন্থে বলা হয়েছে, কোন রকম পাখিতে বায়উস সালাম জায়েয নয় (আল-মুহীত)।

৪৬. মাসআলা : যে সব জীব-জন্তুতে তেমন কোন পার্থক্য হয় না, যেমন চড়ুই পাখি, এক বর্ণনা অনুযায়ী তাতে বায়উস সালাম জায়েয নয়। এটাই বিশুদ্ধতর মত।

পাখির গোশতে বায়উস সালাম জায়েয নয়। বলা হয় যে, এটা এমন সব পাখির গোশতে যা চাষের উদ্দেশ্যে পোষা ও বন্দী করা হয় না। কেননা তা না থাকারই মত। পক্ষান্তরে যে সব পাখি চাষের উদ্দেশ্যে পোষা হয় ও খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয় ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তাও এভাবে বেচাকেনা জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয। কেউ বলেন, তিনজনের মতেই জায়েয। এটাই বিশুদ্ধতর মত (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪৭. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে রুটিতে ওজনে বা গণনায় কোন হিসাবেই সালাম জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ওজনে জায়েয। পরবর্তীকালের ফুকাহায়ে কিরাম মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম ইউসুফ (র)-এর মতেই ফাতওয়া দিয়েছেন। তবে বায়উস সালামের শর্তাবলী অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তারপরও কবজার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে চুক্তিকালে স্থিরীকৃত জাতের রুটিই কবজা হয় এবং এভাবে কবজার পূর্বে মুসলাম ফীহি (বিক্রিত মাল) পরিবর্তন করে ফেলার অপরাধে অপরাধী না হয় (আল-মুহীত)।

৪৮. মাসআলা : রুটির বিনিময়ে গম ও আটায় বায়উস সালাম জায়েয নয়। শিষ্যদ্বয়ের মতে জায়েয এবং এরই উপর ফাতওয়া (আত-তাহাবী)।

৪৯. মাসআলা : রুটির ভেতর কয়াল বা ওজনে বায়উস সালাম জায়েয (আয-যাহীরিয়া)।

৫০. মাসআলা : মণি-মুক্তায় বায়উস সালাম জায়েয নয়। অবশ্য ক্ষুদ্রাকারের মণি-মুক্তা, যা ওষুধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং ওজনে বেচাকেনা হয়, তাতে ওজন হিসেবে বায়উস সালাম জায়েয আছে। আস্ত ও গুঁড়া চুনায় কয়াল হিসেবে বায়উস সালাম করলে দোষ নেই। কেননা এটা কয়াল দ্বারা নির্দিষ্ট করা সম্ভব এবং যে কোনও সময় সমর্পণ করাও সম্ভব (আল-মাবসূত)।

৫১. মাসআলা : যদি বিশেষ প্রকারের তেলে বায়উস সালাম করে, তবে জায়েয হবে। এ ব্যাপারে সাধারণ তেল ও সুগন্ধী তেলের একই হুকুম। এটাই বিশুদ্ধ মত (জাওয়াহিরুল-আখলাতী)।

৫২. মাসআলা : পশমের ক্ষেত্রে ওজনে বায়উস সালাম জায়েয। যদি শর্ত করে যে, বিনা ওজনে এত বেল দিতে হবে, তবে জায়েয হবে না। নির্দিষ্ট ভেড়ার পশমে সালাম করা জায়েয হবে না। তদ্রূপ নির্দিষ্ট ছাগলের দুধ ও ঘিতেও বায়উস সালাম জায়েয নয়। নতুন ঘি, নতুন তেল ও নতুন গমে সালাম করলে দোষ নেই। নতুন বলতে এ বছরেরটা বুঝানো হয়েছে। তরবারির ফলায় বায়উস সালাম দৃশ্যণীয় নয়, যদি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও মান নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।

ভেড়ার পশমের বিনিময়ে ছাগলের লোমে বায়উস সালাম জায়েয নয়, যেহেতু উভয়টি ওজনে বিক্রি হয়। শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, এটা সেই ক্ষেত্রে যখন বেচাকেনা না হয়, যদি ওজনে বেচাকেনা না হয়, তবে এরূপ বাকী বিক্রি নিষিদ্ধ হবে না (আল-মুহীত)।

৫৩. মাসআলা : দুই যিম্মী যদি মদের ভেতর বায়উস সালাম করে, তবে তা জায়েয হবে, কিন্তু শূকরে জায়েয হবে না। যদি এর কোন একটাকে সালামের বিনিময় মূল্য বানায় তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। শুধু মদ ছাড়া সকল ক্ষেত্রে মুসলিম ও খৃস্টানের জন্য বায়উস-সালামের বিধি-বিধান একই (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৫৪. মাসআলা : তুলা, কাতান, রেশম, তামা, সোনার অশোধিত টুকরা, সীসা, কাঁসা ও পিতলে বায়উস সালাম জায়েয। এগুলো সবই মিছলী দ্রব্য।

মেহেদী, ওয়াসামা (wood) ও শুকনা তুলসী পাতা উপরিউক্ত ওজনসমূহেরই মত। কাঁচা তুলসী পাতা, তরি-তরকারি ও জ্বালানি কাঠ মিছলী দ্রব্য নয়। কাজেই এতে বায়উস সালাম জায়েয নয়। পনির ও ছানা যদি কারবারীদের কাছে এমনভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে যে, তার মধ্যে কোন তারতম্য হয় না, তবে তাতে বায়উস সালাম বৈধ হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত (আল-মুহীত)।

৫৫. মাসআলা : নির্দিষ্ট রকমের কড়ি কাঠের দৈর্ঘ্য, ঘনত্ব, পরিশোধের মেয়াদ ও পরিশোধের স্থান নির্ধারণ করা হলে তাতে বায়উস সালাম বৈধ হবে। সেগুন ও অন্যান্য কাঠ এবং বাঁশের ভেতর বায়উস সালাম জায়েয। বাঁশের ঘনত্ব নির্ধারণ করা হবে রশি প্রভৃতি দ্বারা মেপে যে, তা এক বিঘত মোটা, না এক হাত। তখন কোনরূপ বিবাদের আশংকা থাকবে না (আল-মাবিসূত)।

৫৬. মাসআলা : কাঁচা ঘাসে বায়উস সালাম করলে তা জায়েয হবে না (আয-যাখীরা)।

৫৭. মাসআলা : শামসুল আইম্মা আস-সারাখসী (র) বর্ণনা করেন যে, সুতা মিছলী দ্রব্য। ইমাম তাহাবী (র) বলেন, যে কোন ওজনী দ্রব্যই মিছলী (আল-মুহীত)।

৫৮. মাসআলা : তশতরি, চিমনি, মোজা বা এ জাতীয় দ্রব্যে বায়উস সালাম বৈধ, যদি মানুষের মধ্যে এর রেওয়াজ থাকে। রেওয়াজ না থাকলে বৈধ নয় (আল-হিদায়া)।

৫৯. মাসআলা : কাত (এক প্রকার দানা, বেদুইনেরা যা পেষণ করার পর রান্না করে খায়)-এর ক্ষেত্রে বায়উস সালাম জায়েয (আল-খুলাসা)।

৬০. মাসআলা : যদি ওজনে পানিতে বায়উস সালাম করে এবং কোন ঘাটের পানি তাও নির্দিষ্ট করা হয়, তবে জায়েয হবে। আর পানিতে জায়েয হলেও বরফের জায়েয হবে বৈ কি? (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : রাসুল-মালা (বিনিময় মূল) ও মুসলাম ফীহি (পণ্য) কবজা সংক্রান্ত মাসআল

১. মাসআলা : সালামের দ্বিতীয় পক্ষের জন্য প্রথম পক্ষকে মূলধন আদায়ের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান জায়েয নয়। যদি অব্যাহতি প্রদান করে এবং ক্রেতা তা গ্রহণ করে তবে সালামের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর ক্রেতা যদি অব্যাহতি প্রত্যাখ্যান করে, তবে চুক্তি বাতিল হবে না (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : বিনিময় মূল্যের বদলে অন্য জাতীয় কোন বস্তু গ্রহণ করা জায়েয নয়। যদি স্থিরীকৃত বিনিময় মূল্য অপেক্ষা একই জাতের উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্য কিংবা আরও নিম্নমানের দ্রব্য প্রদান করে, তবে নিম্নমানের ক্ষেত্রে তা বিক্রেতা রাযী থাকলে জায়েয হয়ে যাবে আর উৎকৃষ্ট মানের ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। ইমাম যুফার (র)-এর মতে তাকে বাধ্য করা যাবে না, বরং তার সম্মতিক্রমেই তা গৃহীত হবে। আর এ মতই সঠিক (আস-সিরাজুল-ওয়াহাজ)।

৩. মাসআলা : সালাম দ্রব্য বদল করা জায়েয নয়। বাকি বিক্রেতা যদি মন্দের স্থলে উত্তম মাল প্রদান করে তবে আমাদের মতে ক্রেতাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। যদি ভালোর স্থলে মন্দ মাল দেয় তবে তা গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।

উৎকৃষ্ট কাপড় সম্পর্কে চুক্তি হওয়ার পর বিক্রেতা যদি তদস্থলে মন্দ কাপড় দিয়ে বলে, এটা গ্রহণ কর তোমাকে এক দিরহাম ফেরত দেব, তবে এ সম্পর্কে আটটি মাসআলা আছে; চারটি গজী দ্রব্য সম্পর্কিত এবং চারটি কায়লী ও ওজনী দ্রব্য সম্পর্কিত। গজী দ্রব্য সম্পর্কিত মাসআলাসমূহ নিম্নরূপ-

(ক-খ) যদি কাপড়ে বায়উস সালাম করা হয়, তারপর বিক্রেতা গুণগত মানে চুক্তি অপেক্ষা উত্তম অথবা পরিমাণে বেশী কাপড় উপস্থিত করে এবং বলে, তুমি এটা গ্রহণ কর এবং আমাকে এ জন্য এক দিরহাম বেশী দাও, তবে তা জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দিরহামটি কাপড়ের উৎকৃষ্টতা বা অতিরিক্ত অংশের বিনিময়ে হবে।

(গ-ঘ) যদি নিকৃষ্ট মানের কাপড় বা মাপে ছোট কাপড় উপস্থিত করে এবং বলে, এটা গ্রহণ কর, আমি তোমাকে এক দিরহাম ফেরত দিচ্ছি আর ক্রেতা তা মেনে নেয়, তবে তা জায়েয হবে না। যদি নিকৃষ্ট কাপড় দিয়ে বলে, এটা গ্রহণ কর, কিন্তু এক দিরহাম ফেরত দেওয়ার কথা না বলে, আর ক্রেতা তা মেনে নেয়, তবে জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ হতে বিক্রেতাকে গুণগত মানের দিক থেকে ছাড় দেওয়া হবে।

কায়লী ও ওজনী দ্রব্য সম্পর্কিত মাসআলাসমূহ নিম্নরূপ-

ক. যদি দশ দিরহামের বিনিময়ে দশ কাফীয গমে সালাম করা হয়, তারপর বিক্রেতা উৎকৃষ্ট গম হাযির করে বলে, এটা গ্রহণ কর এবং আমাকে এক দিরহাম বেশী দাও. তবে জায়েয হবে না।

খ. যদি এগার কাফীয গম উপস্থিত করে এবং বলে, এটা গ্রহণ কর এবং আমাকে এক দিরহাম বেশী দাও এবং ক্রেতা তা গ্রহণ করে তবে তা জায়েয হবে।

গ. যদি নয় কাফীয গম উপস্থিত করে এবং বলে, এটা গ্রহণ কর, আমি তোমাকে এক দিরহাম ফেরত দেব, তবে তাও জায়েয হবে।

ঘ. যদি নিকৃষ্টমানের দশ কাফীয গম হাযির করে এবং বলে, এটা গ্রহণ কর, আমি তোমাকে এক দিরহাম ফেরত দেব, তবে তা জায়েয হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণনা আছে যে, উপরে বর্ণিত সবগুলো পদ্ধতিই জায়েয (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, আয-যাহীরিয়া)।

৪. মাসআলা : বিনিময় মূল্যের জন্য হাওয়ালা, কাফালা ও বন্ধক রাখা জায়েয। যদি কবজার আগে ক্রেতা-বিক্রেতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে, যদিও কাফীয এবং মুহতাল আলায়হি (জামিন) মজলিসে থাকে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা মজলিসে থাকে, তবে কাফীল-ও মুহতাল আলায়হির মজলিস ত্যাগে তাদের কোন ক্ষতি হবে না।

যদি সালামের মূলধনের বদলে বন্ধক রাখে এবং সে বন্ধক হাতে থাকা অবস্থায় তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। বন্ধকী মাল যদি মজলিসের ভেতরই খোয়া যায়, তবে চুক্তি বহাল থাকবে।

যদি সালাম দ্রব্য এর বদলে বন্ধক রাখে, তারপর সে বন্ধকী মাল খোয়া যায়, তবে সালাম দ্রব্য উসূল হয়ে গেছে ধরা হবে। যদি বন্ধক খোয়া না যায়, কিন্তু বিক্রেতার মৃত্যু হয়ে যায় এবং সে প্রচুর পরিমাণ ঋণ রেখে যায়, তবে সে বন্ধকী মালে রাখে সালামেরই অগ্রাধিকার থাকবে। তবে সে বন্ধকী মালকে তার পাওনার বদল গণ্য করা হবে না, বরং তার প্রাপ্য জাতীয় মালের বিনিময়ে সেটা বিক্রি করে দেওয়া হবে, যাতে কবজার পূর্বে সালাম দ্রব্য পরিবর্তনকারী সাব্যস্ত না হয় (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : বিক্রেতা যদি ক্রেতার কাছে এসে তার জন্য মাল বুঝে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়, তবে সেই সুযোগ দানের দ্বারাই তাতে ক্রেতার কবজা প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে, যেমন অন্যান্য পাওনার ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা : মুসলাম ফীহি (বিক্রিত মাল)-এর জন্য হাওয়ালা জায়েয। এমনিভাবে কাফালাও জায়েয। বাকি হাওয়ালার ক্ষেত্রে বিক্রেতা দায়মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু কাফালার ক্ষেত্রে দায়মুক্ত হবে না। ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে- সে চাইলে বিক্রেতার কাছেও মাল চাইতে

পারবে, যেমন চাইতে পারবে কাফীলের কাছে। ক্রেতার পক্ষে কাফীলের সঙ্গে মাল বদল করা জায়েয নয়। কিন্তু কাফীল বিক্রেতার সঙ্গে তা বদল করতে পারবে- যখন সে ক্রেতার প্রাপ্য মিটিয়ে বিক্রেতার কাছে তা ফেরত দাবী করবে (আল-বাদায়ে)।

৭. মাসআলা : বিক্রিত মালের জন্য যদি কাফীল রাখা হয় এবং বিক্রেতার কাছ কাফীল সে মাল পরিশোধের জন্য উসূল করে আনে, তারপর তা বিক্রি করে দেয় এবং তাতে তার লাভ হয়, তবে তার জন্য তা হালাল হবে, যদি ক্রেতাকে সে অনুরূপ মাল পরিশোধ করে। মাল পরিশোধের মাধ্যমে তাতে কাফীলের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। বাকি এই ক্ষেত্রে মতভেদ আছে যে, বিক্রেতা নিজেই যদি ক্রেতাকে তার পাওনা মাল মিটিয়ে দেয় এবং তারপর কাফীলের কাছ থেকে দেওয়া মাল ফেরত নেয়, তখন কাফীলের জন্য লাভের টাকা হালাল হবে কিনা। উপরিউক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে, কাফীলের জন্য অর্জিত লাভ হালাল হবে এবং এটাই ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইমাম মুহাম্মাদ আবু হানীফা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমার মতে উত্তম হচ্ছে সে তা পরিশোধকারী (অর্থাৎ বিক্রেতা)-কে ফিরিয়ে দেবে। অবশ্য বিচারে তাকে তা করতে বাধ্য করা যাবে না। কিতাবুল-কাফালায় বলা হয়েছে, লাভের অংশটা সাদাকা করে দেবে। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন কাফীল আদায়ের তাগাদা স্বরূপ তা কবজা করে। যদি বার্তাবাহকরূপে কবজা করে, যেমন ক্রেতা তার কাছে এই উদ্দেশ্যে গম অর্পণ করল যে, সে তা ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে তার পক্ষ হতে বাহক হবে মাত্র, তবে সে ক্ষেত্রেও সে তা বিক্রি করে লাভবান হলে ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে লাভ তার জন্য হালাল হবে না (আল-মাবসূত)।

৮. মাসআলা : ক্রেতা যদি বলে, আমি তোমার কাছে যে মাল পাব, তা মেপে তোমার বস্তায় রাখ বা তা মেপে তোমার ঘরে আলাদা করে রাখ এবং সে মতে বিক্রেতা তা করে, তবে তাতে ক্রেতার কবজা প্রতিষ্ঠিত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা : কেউ যদি সালাম চুক্তিতে কুরর গম কেনে, তারপর বিক্রেতাকে আদেশ করে, সে যেন তা মেপে ক্রেতার বস্তায় রাখে, আর বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তাই করে, তবে তাতেও তার কবজা প্রতিষ্ঠিত হবে না। সুতরাং তা খোয়া গেলে বিক্রেতার মাল খোয়া যাবে (আল-হিদায়া)।

১০. মাসআলা : ক্রেতা যদি সেখানে উপস্থিত থাকে, তবে সকলেরই মতে তার কবজা প্রতিষ্ঠিত হবে, তাতে বস্তা তার হোক বা বিক্রেতার (হিদায়ার ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল-কাদীর ও আল-আয়লী)।

১১. মাসআলা : ক্রেতা যদি তার মাল ভরা বস্তা বিক্রেতাকে দিয়ে বলে, তোমার কাছে আমার পাওনা গম মেপে এ বস্তায় রাখ, আর বিক্রেতা ক্রেতার অনুপস্থিতিতে তাই করে, তবে এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ মত অনুসারে ক্রেতা তার কবজাকারী সাব্যস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা : বিক্রেতা যদি ক্রেতার আদেশে সে গম পেষাই করে, তাতেও ক্রেতা কবজাকারী হয়ে যাবে না (আল-হাবী)।

১৩. মাসআলা : সুতরাং ক্রেতা সে গম গ্রহণ করলে তার জন্য তা হারাম হয়ে যাবে (আত-তাতার খানিয়া)।

১৪. মাসআলা : বায়উস সালামের পদ্ধতিতে কেনা গম সম্পর্কে ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে আদেশ করে যে, সে যেন তা নদীতে ফেলে দেয় আর সে মতে বিক্রেতা তাই করে, তবে তাতে বিক্রেতারই মাল ধ্বংস হবে (আল-ইনায়ী)।

১৫. মাসআলা : ক্রেতা যদি বিক্রেতার গোলাম বা তার পুত্রকে মাল কবজার আদেশ দেয় এবং সে মতে সে তা করে, তবে তা জায়েয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা : সালামের মূলধন অর্পণের জন্য সরবে সালামের পক্ষ হতে ওসীর নিযুক্ত করা জায়েয হবে, যদি উকীল তা অর্পণ করে এবং তারা উভয়ে মজলিসে উপস্থিত থাকে, তবে সে সমর্পণ সহীহ হবে। যদি সমর্পণের আগে উকীল মজলিস থেকে উঠে চলে যায় এবং তারা দুজন মজলিসেই থাকে, তবে বায়উস সালাম বাতিল হয়ে যাবে না। যদি উকীল কর্তৃক তা সমর্পণের আগে রাব্বুস-সালাম (ক্রেতা) মজলিস থেকে চলে যায় কিংবা বিক্রেতা নিজে মজলিস ত্যাগ করে, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এমনভাবে যদি মুসলাম ইলায়হি (বিক্রেতা) বিনিময় মূল্য কবজার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, সে ক্ষেত্রেও কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

কেউ যদি বায়উস সালামের পদ্ধতিতে কে কুরর গম ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিক্রেতার হাতে দিরহাম সমর্পণ করে, তারপর বিক্রেতা একই পদ্ধতিতে কারও কাছ থেকে এক কুরর গম কেনে এবং স্বীয় ক্রেতাকে তা বিক্রি মালরূপে পরিশোধ করে দেয়, তবে তা বিক্রি ভোগ বা এ জাতীয় কিছু করতে হলে ক্রেতাকে তা দু'বার পরিমাপ করতে হবে। এক মাপ হবে তার বিক্রেতার জন্য এবং এক মাপ তার নিজের জন্য। বিক্রেতার জন্য যে পরিমাপ করা হবে, ক্রেতার জন্য সেটাই যথেষ্ট হবে না, যদিও সে মাপের সময় ক্রেতা উপস্থিত থাকে। এমনভাবে মুসলাম ইলায়হি (বিক্রেতা) যদি ক্রেতাকে তা কবজা করার আদেশ দেয় এবং সে মতে সে তা কবজা করে, তখনও তাকে তা দু'বার মাপতে হবে। প্রথমবার মুসলাম ইলায়হির প্রতিনিধিরূপ তার জন্য এবং দ্বিতীয়বার তার নিজের জন্য। একবারের পরিমাপ যথেষ্ট হবে না।

এমনভাবে যদি বিক্রেতা ক্রেতার হাতে কিছু দিরহাম দেয় এবং সে তা দিয়ে বিক্রেতার জন্য কয়াল হিসেবে গম কেনে এবং তা মেপে কবজা করে, তারপর স্বীয় প্রাপ্য উসুলের জন্য কবজা করে, তবে তখনও তাকে নিজের জন্য আবার তা পরিমাপ করতে হবে (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা : বিক্রেতা আনুমানিকভাবে গম কেনে অথবা তার জমি লাভ করে কিংবা উত্তরাধিকার, দান বা ওসীয়ত সূত্রে পায় এবং ক্রেতার সামনেই তা মেপে তাকে পরিশোধ করে, তবে একবারের মাপই যথেষ্ট হবে (আন-নিহায়ী)।

১৮. মাসআলা : বিক্রেতা যদি ধার করে মেপে গম আনে এবং তা রাব্বুস-সালামকে অর্পণ করে, তবে পুনরায় মাপ দেওয়ার দরকার হবে না (আল-হাবী)।

১৯. মাসআলা : কয়ালি দ্রব্যের ক্ষেত্রে যে সব মাসাইল উল্লেখ করা হল, ওজনী দ্রব্যের ক্ষেত্রেও সে সব মাসাইল একইভাবে প্রযোজ্য (আল-মুহীত)।

২০. মাসআলা : রাসুল-মাল (বিনিময় মূল্য) যদি সুনির্দিষ্ট বস্তু হয় এবং বিক্রেতার কাছে তাতে অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হয় বা বিক্রেতা তাতে কোন দোষ পায়, তবে প্রকৃত হকদার যদি তা অনুমোদন না করে কিংবা বিক্রেতা দোষসহ তা রাখতে সম্মত না হয়, তবে সালাম বাতিল হয়ে যাবে, তা তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে হোক বা পরে। প্রকৃত হকদার যদি অনুমোদন করে অথবা দোষসহ রাখতে বিক্রেতা রাযী হয়ে যায়, তবে বিক্রি বৈধ হবে এবং এ ক্ষেত্রেও রাসুল-মাল কবজার আগে তাদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে বা পরে হওয়া একই কথা। আর এ অবস্থায় কবজাকৃত মাল ফেরত পাওয়ার কোন সুযোগ হকদারের থাকবে না। হ্যাঁ, মিছলী দ্রব্য হলে, সে অনুরূপ মাল রাব্বুস সালামের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে (আল-বাদায়ে)।

২১. মাসআলা : সালামের মূলধন যদি অনির্দিষ্টতা গুণ সম্পন্ন হয় (মুদ্রা ও সোনা-রূপা) এবং বিক্রেতা তা কবজা করে, তখন তাতে যদি অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হয়, বা তা জাল অথবা ভেজাল প্রমাণিত হয়, তবে তা হয়ত মজলিস থেকে তাদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে হবে অথবা পরে। যদি মজলিসের ভেতরই প্রমাণিত হয় যে, তার প্রকৃত মালিক অন্য কেউ এবং সেই মালিক তা অনুমোদন করে তবে বিক্রি বৈধ হবে। অবশ্য তার অনুমোদন বিনিময় মূল্য কায়েম থাকা অবস্থায় হতে হবে। আল-জামিউস-সাগীরে এটা স্পষ্ট বলা হয়েছে। মালিক অনুমোদন না করলে সেই পরিমাণে কবজা বাতিল হয়ে যাবে, যেন সে কবজা করেই নি। যদি মজলিসের ভেতর সমপরিমাণ মূল্য কবজা করে তবে চুক্তি বৈধ হবে। অন্যথায় বৈধ হবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

২২. মাসআলা : যদি চুক্তির মজলিসেই প্রমাণিত হয় সেটা জাল মুদ্রা, তবে বিক্রেতা তা মেনে নিলেও বিক্রি বৈধ হবে না। হ্যাঁ, সে যদি তা ফেরত দেয় এবং মজলিসের ভেতরই তদস্থলে বৈধ মুদ্রা কবজা করে, তবে বৈধ হবে (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা : যদি ভেজাল বা নিকৃষ্টমানের মুদ্রা বলে প্রমাণিত হয় এবং সেটা চুক্তির মজলিসেই হয়, তবে বিক্রেতা সেটা মেনে নিলে বিক্রি বৈধ হবে। মজলিসের মধ্যে তা পালটে নিলেও বৈধ হবে। কিন্তু পরিবর্তন করার আগেই মজলিস থেকে আলাদা হয়ে গেলে সালাম বাতিল হয়ে যাবে (আয-যাখীরী)।

২৪. মাসআলা : যদি সে বিনিময় মূল্যের আংশিকের ভেতর অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হয় এবং সেটা মজলিস থেকে তাদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে হয়, তবে প্রকৃত হকদার যদি তা অনুমোদন করে এবং সে বিনিময় মূল্য কায়েম থাকে, তবে জায়েয হবে। আর সে যদি তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে সেই অংশের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। যদি তার অংশ বিশেষ জাল প্রমাণিত হয় এবং সেটা মজলিস

ত্যাগের পরে হয়, তবে সেই অংশের বায়উস সালাম বাতিল হয়ে যাবে, তাতে তার পরিমাণ বেশী হোক বা কম, বিক্রেতা তা গ্রহণ করে নিক বা প্রত্যাখ্যান করুক এবং সেটাকে অন্য মুদ্রা দ্বারা পরিবর্তন করুক বা নাই করুক। মোদাকথা মজলিসের পর খাটি মুদ্রা কবজা করলেও কোন অবস্থায় চুক্তি বৈধতায় রূপান্তরিত হবে না (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা : যদি মজলিস ত্যাগের পর তার কিয়দাংশ নিকৃষ্টমানের দেখতে পায় এবং বিক্রেতা তা মেনে নেয়, তবে জায়েয হবে। যদি মেনে না নিয়ে তা ফেরত দেয়, তবে এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম একমত যে, ফেরত দেয়ার মজলিসেই যদি তার বদলে ভাল মুদ্রা কবজা না করে, তবে সেই অংশের সালাম বাতিল হয়ে যাবে। যদি ফেরত দেওয়ার মজলিসে তদন্তে ভাল মুদ্রা কবজা করে, তবে ইস্তিহসান অনুযায়ী চুক্তি বাতিল হবে না। অবশ্য এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন ফেরত দেওয়া মুদ্রার পরিমাণ অল্প হবে। আমাদের ইমামগণ এ মতই গ্রহণ করেছেন। যদি ফেরত দেওয়া মুদ্রার পরিমাণ বেশী হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে আর সাহেবাইনের মতে ইস্তিহসান অনুযায়ী চুক্তি বাতিল হবে না (আয-যাখীরা)।

২৬. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র) হতে প্রসিদ্ধ রিওয়ায়াতসমূহে বলা হয়েছে, অর্ধেকের অতিরিক্ত হলে সেটাই বেশী বলে গণ্য হবে। অর্ধেক হলে সে ক্ষেত্রে দুই ব্রকম বর্ণনা আছে। এক বর্ণনায় আছে যে, এক-তৃতীয়াংশ হলেও সেটাকে বেশী ধরা হবে। এটাই বিশুদ্ধতর মত এবং অধিকতর সতর্কতার পরিচায়ক (মুহীত : আস-সারাকসী)।

২৭. মাসআলা : 'আল-হাবী' গ্রন্থে আছে যে, নাসীর (র) বর্ণনা করেন, শাদাদ (ব) বলতেন, বিক্রেতা যদি মজলিস ত্যাগের পর কিছু দিরহাম ভেজাল দেখতে পায়, তবে তার উচিত প্রথমে তার বদলে ভাল দিরহাম কবজা করা এবং পরে ভেজালটা ফেরত দেওয়া। ফকীহ (র) বলেন, এটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। যদি প্রথমে ভেজাল দিরহাম ফেরত দেয় এবং পরে বদলা গ্রহণ করে, তবে আমাদের ইমামগণের মতে তাও জায়েয হবে- যদি পরিমাণ অর্ধেকের কম হয় (আত-তাতার খানিয়া)।

২৮. মাসআলা : সালামের দ্বিতীয় পক্ষের কাছে যদি প্রথম পক্ষের মূলধন পরিমাণ পাওনা সাব্যস্ত হয়, তবে কি সে পাওনার বদলে তার পাওনা টাকা কাটাকাটি হয়ে যাবে, না তা হবে না? এ ব্যাপারে প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে বিক্রেতার কাছে সে পাওনা কখন কিভাবে সাব্যস্ত হয়েছে? কবজা দ্বারা, না চুক্তি দ্বারা? সালাম চুক্তির আগে না পরে? যদি চুক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হয় এবং তা সালামের আগেই যেমন রাব্বুস-সালাম (ক্রেতা) হয়ত মুসলাম ইলায়হি (বিক্রেতা)-এর কাছে দশ দিরহামে কোন কাপড় বিক্রি করেছিল, কিন্তু তখন সে দিরহাম কবজা করে নি, ইতোমধ্যে দশ দিরহামের বদলে সে তার সঙ্গে গমের ভেতর বায়উস সালাম করেছে, তো এ ক্ষেত্রে তারা যদি চুক্তিটাই পাওনার কাটাকাটির মাধ্যমে করে কিংবা পরে কাটাকাটিতে রাখী হয়ে যায়, তবে কাটাকাটি হয়ে যাবে। যদি তাদের একজন কাটাকাটিতে অসম্মতি জানায়, তবে কাটাকাটি হবে না। এটা ইস্তিহসান সম্মত সিদ্ধান্ত।

যদি বিক্রেতার কাছে ক্রেতার পাওনাটা এমন চুক্তির মাধ্যমে হয়, যে চুক্তি বায়উস সালামের আগে হয়েছিল, তবে পাওনা কাটাকাটি হবে না, যদিও তারা কাটাকাটি হিসেবেই পরের চুক্তি সম্পন্ন করে। এতো গেল সেই পাওনার কথা, যা চুক্তির কারণে সাব্যস্ত হয়েছে।

যদি পাওনা সাব্যস্ত হয় কবজার কারণে, যেমন গসব (জবরদখল) ও কর্জ (অর্থাৎ বিক্রেতা হয়ত ক্রেতার কাছ থেকে কোন মাল গসব করেছিল বা কর্জ নিয়েছিল), তবে সে পাওনা বায়উস সালামের পরে হয়ে থাকলে উভয় পাওনার মধ্যে কাটাকাটি হয়ে যাবে, তাতে তারা কাটাকাটি রূপে চুক্তি সম্পাদন করুক বা নাই করুক। এ কাটাকাটি হবে সেই ক্ষেত্রে, যখন উভয় পাওনা সমান হয়। যদি উভয় পাওনার মধ্যে তারতম্য থাকে, যেমন একজন যেটা পাবে, তা উত্তম এবং অন্যের প্রাপ্য বস্তু তার চেয়ে নিম্নমানের আর এ অবস্থায় তাদের একজন সে নিম্নমানেরটায় রাখী থাকে, কিন্তু অন্যজন অসম্মতি জানায়, তবে লক্ষ্য করতে হবে, কে রাখী এবং কে নারায়। যদি উত্তম মালের পাওনাদার অসম্মতি জানায়, তবে কাটাকাটি হবে না। আর যদি নিম্নমানের মালের পাওনাদার অসম্মতি জানায়, তবে কাটাকাটি হয়ে যাবে (আল-বাদায়ে)।

২৯. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আয-যিয়াদাত' গ্রন্থে বলেন, এক ব্যক্তি কারও সঙ্গে একশ' দিরহামের বিনিময়ে মধ্যম স্তরের এক কুরুর গমে নির্দিষ্ট মেয়াদে বায়উস সালামের চুক্তি করল এবং সে একশ' দিরহাম তাকে বুঝিয়ে দিল। তারপর সে ব্যক্তি বিক্রেতার কাছে মুসলাম ফীহি (বিক্রিত মাল)-এর মত মধ্যম স্তরের এক কুরুর গমের বিনিময়ে একটি গোলাম বিক্রি করল, এবং সে গম কবজা করল কিন্তু গোলাম সমর্পণ করল না। ইতোমধ্যে এ বিক্রি বাতিল হয়ে গেল। তা হয়েছে হয়ত গোলামটির মৃত্যুর কারণে অথবা গোলামটির ক্রেতা কর্তৃক শর্তজনিত ইখতিয়ার বা দর্শনজনিত ইখতিয়ারের ভিত্তিতে ফেরত দেওয়ার কারণে অথবা এই কারণে যে, কোন দোষ থাকার ফলে সে কবজার পূর্বে কাযীর ফায়সালাক্রমে বা তার ফায়সালা ছাড়া গোলামটি ফেরত দিয়েছে অথবা কবজার পরে কাযীর ফায়সালাক্রমে ফেরত দিয়েছে এবং এর ফলে সমগ্র মানুষের পক্ষে সর্বতোভাবে সে বিক্রি রহিত হয়ে গেছে। তো এ ক্ষেত্রে রাব্বুস-সালামের কর্তব্য হবে গোলামের মূল্য বাবদ যে গম কবজা করেছিল, গোলামের ভেতর চুক্তি রহিত হয়ে যাওয়ার কারণে তা ফেরত দেওয়া। যদি গোলামের বিক্রেতা অর্থাৎ রাব্বুস-সালাম বলে, কবজাকৃত গম আমি রেখে দেব এবং তার অনুরূপ গম ফেরত দেব, তবে সে ইখতিয়ার তার আছে। সে যদি গোলামের মূল্য বাবদ গৃহীত গম ফেরত না দেয় এবং ইতোমধ্যে বায়উস সালামের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায়, তবে বায়উস সালামের গমের বদলে তা কাটাকাটি হয়ে যাবে, তারা কাটাকাটি করুক বা নাই করুক। এমনভাবে তাদের মধ্যে গোলামের বেচাকেনা যদি বায়উস সালামের আগে হয়ে থাকে, কিন্তু গোলামের মূল্যপূরণ যে গম ধার্য করা হয়েছিল তা বায়উস সালামের পরে কবজা করা হয় এবং তারপর উপরে বর্ণিত কারণসমূহের কোন কারণে বিক্রি রহিত হয়ে যায়, তবে বায়উস সালামের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে গোলামের মূল্যস্বরূপ গৃহীত গম দ্বারাই মুসলাম ফীহি পরিশোধ হয়ে যাবে।

গোলামের ক্রেতা অর্থাৎ মুসলাম ইলায়হি যদি গোলাম কবজা করার পর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আবার ফেরত দেয় অথবা তারা গোলামের ভেতর চুক্তি রহিত করে ফেলে এবং

বাকি সব অবস্থা উপরের অনুরূপ হয়, তবে গোলামের মূল্যস্বরূপ গৃহীত গম দ্বারা মুসলাম ফীহি উভয় অবস্থার কোন অবস্থায় পরিশোধ হয়ে যাবে না, তাতে কাটাকাটি করুক বা নাই করুক।

যদি গোলামের বিক্রি ও মূল্যস্বরূপ ধার্যকৃত গমের কবজা বায়উস সালামের আগে হয় এবং বাকি সব অবস্থা আগের মতই হয়, তবে তারা কাটাকাটি করলেও গোলামের মূল্যস্বরূপ গৃহীত গম দ্বারা মুসলাম ফীহি উসুল হয়ে যাবে না (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা : অবশ্য পরিশোধ কোন বস্ত্ত কবজা করার কারণে রাক্বুস-সালাম (ক্রেতা)-এর উপর যদি পাওনা সাব্যস্ত হয়, যেমন সে হয়ত মুসলাম ইলায়হি (বিক্রেতা)-এর কোন মাল জবরদখল করেছে বা তার কাছ থেকে কর্ত্ত গ্রহণ করেছে, আর এটা যদি বায়উস সালামের পরে হয়, তবে এর দ্বারা তার পাওনা কাটাকাটি হয়ে যাবে। যদি বায়উস সালামের আগে তার কাছ থেকে এক কুরর গম জবরদখল করে থাকে এবং তা তার হাতে বায়উস সালামের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকে, আর এ অবস্থায় সে তার পাওনার বদলে একে কাটাকাটি করে নেয়, তবে কাটাকাটি হয়ে যাবে, তা উভয়ের সামনে থাকুক আর নাই থাকুক।

বায়উস সালামের আগে বা পরে যদি রাক্বুস-সালামের কাছে মুসলাম ইলায়হির পক্ষ হতে এক কুরর গম আমানত রাখা হয় এবং মুসলাম ইলায়হি (বিক্রেতা) তার বদলে মুসলাম ফীহি কাটাকাটি করে, তবে কাটাকাটি হবে না। হাঁ, সে গম যদি তাদের সামনে থাকে অথবা রাক্বুস-সালাম (ক্রেতা) তা ফেরত গ্রহণের জন্য বিক্রেতাকে সুযোগ করে দেয়, তখন কাটাকাটি বৈধ হবে।

যদি বায়উস সালামের পর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে বিক্রেতার কাছ থেকে এক কুরর গম জবরদখল করে এবং তারপর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়, তবে কাটাকাটি হয়ে যাবে।

জবরদখল যদি বায়উস সালামের আগে হয়ে থাকে, তবে সে ক্ষেত্রেও কাটাকাটি হয়ে যাবে।

উপরিউক্ত মাসআলাসমূহ সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন জবরদখলের মাল প্রাপ্য মালের অনুরূপ হবে। যদি তার চেয়ে উত্তম বা মন্দ হয়, তবে উত্তমের ক্ষেত্রে বিক্রেতার সম্মতি এবং মন্দের ক্ষেত্রে ক্রেতার সম্মতি ছাড়া কাটাকাটি হবে না (আল-হাবী)।

৩১. মাসআলা : এক ব্যক্তি একশ' দিরহামের বিনিময়ে কারও সঙ্গে এক কুরর গমে বায়উস সালামের চুক্তি করল। তারপর মুসলাম ইলায়হি তার কাছ থেকে দু'শ দিরহামের বিনিময়ে বাকিতে অনুরূপ এক কুরর গম কিনল এবং তা কবজা করল এখন সে গম যদি তার হাতে থাকে এবং এ অবস্থায় রাক্বুস-সালাম মুসলাম ফীহি হিসেবে সে গম কবজা করতে চায়, তবে তা জায়েয হবে না। যদি কবজা করে এবং তা ভাঙ্গিয়ে আটা বানায়, তবে তাকে জরিমানাস্বরূপ অনুরূপ গম পরিশোধ করতে হবে। এর দ্বারা বায়উস সালামের পাওনা কাটাকাটি হয়ে যাবে না, যদিও তারা উভয়ে তাতে সম্মত থাকে।

মুসলাম ইলায়হি যদি জরিমানার গম কবজা করে, তারপর তা দ্বারা বায়উস সালামের গম পরিশোধ করে, তবে তা জায়েয হবে। রাক্বুস-সালাম যদি তা না ভাঙ্গায়, কিন্তু তার হাতে তাতে কোন দোষ দেখা দেয়, তবে মুসলাম ইলায়হি চাইলে তাই গ্রহণ করতে পারে এবং

চাইলে তার উপর জরিমানাস্বরূপ অনুরূপ গম ধার্য করতে পারে। জরিমানা আরোপ করলে, তা দ্বারা মুসলাম ফীহি কাটাকাটি হয়ে যাবে না। হাঁ, যদি তা গ্রহণ করে এবং তারপর তা পরিশোধ করে, তবে তা জায়েয হবে।

যদি সেই দূষিত গমই গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু তা ফেরত না নিয়ে, বরং তা দ্বারাই মুসলাম ফীহির গম কাটাকাটি করে, তবে উভয়ে সম্মত থাকলে জায়েয হয়ে যাবে।

মুসলাম ইলায়হি দূষিত গম গ্রহণ বা তার বদলা আদায়, কোনটারই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই যদি তারা কাটাকাটিতে আপোষ-রফায় আসে তবে তা জায়েয হবে কিনা এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ (র) তাঁর গ্রন্থে কিছুই বলেন নি। তবে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন যে, তা জায়েয হবে। যদি তা কাটাকাটি না করে এবং মুসলাম ইলায়হি সেই গমই ফেরত নেয়, তারপর রাক্বুস-সালাম তা জোরপূর্বক নিয়ে যায় এবং সে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তবে কাটাকাটি হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে মুসলাম ইলায়হি রাযী কিনা সে দিকে লক্ষ্য করা হবে না।

তৃতীয় কোন ব্যক্তি যদি মুসলাম ইলায়হির কাছ থেকে বিক্রিত গম জবরদখল করে, তারপর মুসলাম ইলায়হি রাক্বুস-সালামকে জবরদখলকারীর উপর হাওয়াল্লা করে যে, সে যেন তার বায়উস সালামের পাওনা হিসেবে সে গম তার কাছ থেকে কবজা করে নেয়, তবে তা জায়েয হবে না এবং হাওয়াল্লা বাতিল হয়ে যাবে। যদি সেই তৃতীয় ব্যক্তির কাছে তা দোষযুক্ত হয়ে পড়ে এবং রাক্বুস-সালাম তা গ্রহণে সম্মত থাকে, তবে তা জায়েয হবে।

এমনিভাবে যদি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে তা আমানত থাকে এবং রাক্বুস-সালাম তা গ্রহণে রাযী হয়, তাও জায়েয হবে। তবে জবরদখলের ক্ষেত্রে কবজার আগে যদি বিক্রিত গম খোয়া যায়, তবে হাওয়াল্লা বাতিল হবে না, কিন্তু আমানতের ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৩২. মাসআলা : এক ব্যক্তি কারও সঙ্গে এক কাফীয তাজা খেজুরে বায়উস সালামের চুক্তি করল এবং ফলের মওসুমের ভেতর তার মেয়াদ ধার্য করল আর এভাবে সে চুক্তি বৈধ সাব্যস্ত হল। তারপর মুসলাম ইলায়হি তাকে তাজা খেজুরের স্থলে এক কাফীয শুকনা খেজুর দিল। অথবা বায়উস সালামের চুক্তি ছিল এক কাফীয শুকনা খেজুরে এবং তদস্থলে সে আদায় করল এক কাফীয তাজা খেজুর। এখন রাক্বুস-সালাম যদি তা মেনে নেয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা জায়েয হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে মুসলাম ফীহি যদি এক কাফীয রুতাব তাজা (খেজুর) হয় এবং তদস্থলে শুকনা খেজুর আদায় করে তবে কোন অবস্থায়ই তা জায়েয হবে না। এটা ঠিক এই রকম হবে যে, কেউ এক কাফীযের তিন-চতুর্থাংশে বায়উস সালাম করল এবং উসুল করল পূর্ণ এক কাফীয খেজুর। যদি এক কাফীয শুকনা খেজুরে বায়উস সালাম করে থাকে এবং তদস্থলে আদায় করে এক কাফীয তাজা খেজুর, তবে সেটা তাদের মতে দুই রকমের হতে পারে। হয়ত সেটা উসুলের পদ্ধতিতে কবজা করবে, যেমন মুসলাম ইলায়হি রাক্বুস-সালামকে বলবে, এটা তোমার পাওনা হিসেবে গ্রহণ কর বা তোমার পাওনা পরিশোধ হিসেবে গ্রহণ কর কিংবা এ জাতীয় কিছু বলবে অথবা তা কবজা করবে আপোষ রফা ও দায় মুক্তি হিসেবে। যেমন বলবে, তুমি তোমার পাওনার

বদলে এটা নিয়ে আপোষ কর বা তোমার পাওনা পরিশোধের জন্য এই শর্তে গ্রহণ কর যে, আমার কাছে তুমি যা পেতে তা থেকে আমি মুক্ত হয়ে যাব। প্রথম অবস্থায় সে গ্রহণ বাতিল হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ আপোষ-রফা ও দায়মুক্তি হিসেবে কবজার অন্ত্রায় লক্ষ্য করতে হবে যে, সে তাজা খেজুর শুকানোর পর কি পরিমাণ কমে। সেটা যদি জানা থাকে, তবে এ খেজুরকে হিসাবেই ধরা হবে। আর যদি তা জানা না থাকে, তবে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ কমে সেই অনুযায়ী ধরা হবে। যদি জানা থাকে যে, শুকালে এক-চতুর্থাংশ কমে কিংবা যদি জানা থাকে যে, চার ভাগের এক ভাগের বেশী কমে না এবং তিন ভাগ অবশিষ্ট থাকে, তবে এরপর বিবেচনা করা হবে যে, এক কাফীয তাজা খেজুরের দাম যদি এক কাফীযের তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ শুকনা খেজুরের সমান বা তার কম হয়, তবে আপোষ রফা জায়েয হবে। আর যদি এক কাফীয তাজা খেজুরের দাম এক কাফীযের তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ শুকনা খেজুরের বেশী হয়, তবে আপোষ-রফা বাতিল হয়ে যাবে।

৩৩. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সাথে এক কাফীয গমে বায়উস সালামের চুক্তি করল। এখন বিক্রেতা যদি তাকে তদস্থলে এক কাফীয তাজা খেজুর দেয়, তবে তা কারও নিকটেই জায়েয হবে না।

এমনিভাবে যদি খেজুরের মওসুমে এক কাফীয সবুজ কাঁচা খেজুরে বা কাঁচা হলদে খেজুরে বায়উস সালামের চুক্তি করে এবং বিক্রেতা তদস্থলে তাকে এক কাফীয জ্বালানো খেজুর দেয় বা এক কাফীয গমে চুক্তি করে এবং বিক্রেতা তদস্থলে এক কাফীয জ্বালানো গম দেয় কিংবা এক কাফীয গমে চুক্তি করে এবং বিক্রেতা তদস্থলে এক কাফীয আটা দেয়, তবে তা জায়েয হবে না।

যদি এক কাফীয গমে বায়উস সালামের চুক্তি করে এবং তাতে এমন এক কাফীয গম দেয়, যা পানিতে পড়ে গিয়েছিল ফলে তা ভিজে ফুলে গেছে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সেটা জায়েয হবে, কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে জায়েয হবে না। যদি যায়তুন ফলে বায়উস সালামের চুক্তি করে এবং বিক্রেতা তদস্থলে যায়তুনের তেল পরিশোধ করে, তবে তা জায়েয হবে না, যদিও জানা যায় যে, যায়তুনের ভেতর যে তেল আছে এটা তার চেয়ে পরিমাণে কম (আল-মুহীত)।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ রাব্বুস-সালাম ও মুসলাম-ইলায়হির মধ্যকার বিরোধ প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : যদি মুসলমান ফীহির জাত সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয়, যেমন ক্রেতা বলল, তোমার সঙ্গে দশ দিরহামের বিনিময় এক কুরুর গমে চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু বিক্রেতার কথা হচ্ছে যে, দশ দিরহামের বিনিময়ে এক কুরুর যবের ভেতর চুক্তি করেছিলে, তবে ইসতিহসান অনুযায়ী উভয়কে শপথ করতে বলা হবে। যদি তাদের কারও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে প্রথমে শপথ করবে বিক্রেতা। এটা তাঁর প্রথম মত। তাঁর দ্বিতীয় মত হচ্ছে যে, প্রথমে শপথ করবে ক্রেতা (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : উভয়ে যদি কসম করে, তবে কাফী তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের ইচ্ছা কী? তারা যদি বলে, চুক্তি রহিত করতে চাই, কিংবা তাদের একজন এ কথা বলে, তবে

কাফী চুক্তি রহিত করবে। তারা যদি বলে, চুক্তি রহিত করতে চাই না, তবে তাদেরকে এই আশায় ছেড়ে দেবে যে, তাদের একজন হয়ত স্বীকার করবে যে, অপরজনের কথাই সত্য (আয-যখীরা)।

৩. মাসআলা : তাদের মধ্যে কোনও একজন কসম করতে অস্বীকার করলে তার বিপরীতে তার প্রতিপক্ষ যা দাবি করে সেই অনুযায়ীই রায় দেওয়া হবে (শারহুত তাহাবী)।

৪. মাসআলা : তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হবে, তার প্রমাণ গৃহীত হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে এবং তারা তখনও চুক্তির মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দুটি চুক্তির ফায়সালা দেওয়া হবে। সুতরাং রাব্বুস-সালামকে বিশ দিরহাম পরিশোধের এবং মুসলাম ইলায়হিকে এক কুরুর গম ও এক কুরুর জব আদায়ের আদেশ দেওয়া হবে। আর যদি চুক্তির মজলিস থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে থাকে, এবং রাব্বুস-সালাম দশ দিরহাম পরিশোধ করে থাকে, তার বেশী নয়, তবে রাব্বুস-সালামের প্রমাণ অনুযায়ী একটি চুক্তি হয়েছে বলেই রায় দেওয়া হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সর্বাবস্থায় রাব্বুস-সালামের প্রমাণ অনুসারে একটি চুক্তি হয়েছে বলেই সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

৫. মাসআলা : যদি মুসলাম-ফীহি-এর পরিমাণ সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয়, তবে এটা জাত সম্পর্কে বিরোধের মতই। উভয় ক্ষেত্রে মাসআলা একই রকম।

যদি মুসলাম ফীহি-এর গুণ সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয়, এবং তাদের কারও কাছে প্রমাণ না থাকে, তবে কিয়াস অনুযায়ী উভয়ই কসম করবে। কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী উভয়ের উপর কসম আসবে না। আমরা এ বিষয়ে কিয়াসকেই গ্রহণ করি।

যদি তাদের একজনের প্রমাণ থাকে, তবে তার প্রমাণ অনুযায়ী ফায়সালা হবে, তাতে সে বাদী হোক বা দিবাদী।

যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী নিঃসন্দেহে রাব্বুস-সালামের প্রমাণ অনুযায়ী একটি চুক্তি হয়েছে বলে রায় দেওয়া হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে কোথাও কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুটি চুক্তির রায় দেওয়া হবে। কিয়াসেরও দাবি তাই। সুতরাং আমরা এটাই গ্রহণ করি (আয-যখীরা)।

৬. মাসআলা : কেউ যদি কারও দশ দিরহামের বিনিময়ে এক কুরুর গমের ভেতর বায়উস সালামের চুক্তি করে, এরপর বিক্রেতা দাবি করে যে, আমি মন্দ গমের শর্ত করেছিলাম এবং ক্রেতা তা অস্বীকার করে এবং বলে, তুমি কোন শর্ত করনি, তবে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি এর বিপরীত হয়, তবে সে সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুসারে ক্রেতার কথা এবং শিমস্বয়ের মত অনুসারে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয় (আল-হিদায়া)।

৭. মাসআলা : যদি তাদের মধ্যে রাসূল-মাল অর্থাৎ বিনিময় মূল্য সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয় এবং বিনিময় মূল্য এমন বস্তু হয়, যা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না, তবে লক্ষ্য করতে হবে সে বিরোধ কি নিয়ে? যদি জাত সম্পর্কে বিরোধ হয়, যেমন রাক্বুস-সালাম বলল, আমি দশ দিরহামের বিনিময়ে তোমার সঙ্গে এক কুরুর গমে বায়উস সালাম করেছি আর মুসলাম-ইলায়হির কথা হচ্ছে, তুমি এক দীনারের বিনিময়ে এক কুরুর গমে চুক্তি করেছিলে, কিন্তু তাদের কারও হাতেই প্রমাণ নেই, এ অবস্থায় কিয়াস অনুযায়ী উভয়ের কাছ থেকে কসম নেওয়া হবে না, বরং রাক্বুস-সালামের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী তারা উভয়ে কসম করবে।

যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত অনুযায়ী দুটি চুক্তির ফায়সালা দেওয়া হবে। সুতরাং রাক্বুস-সালামকে বলা হবে এক দীনার ও দশ দিরহাম পরিশোধ করতে এবং মুসলাম ইলায়হিকে বলা হবে দুই কুরুর গম পরিশোধ করতে। অবশ্য এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন তারা চুক্তির মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন না হবে। এ অবস্থায় আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর রায় কি? সে সম্পর্কে 'আল-কিতাব'-এ কিছুই বলা হয়নি। ইবন সামাআ (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, তাদের মতে দুই ব্যক্তির ফায়সালা দেওয়া হবে। ইমাম আল-কারখী (র) উল্লেখ করেন যে, মুসলাম ইলায়হির প্রমাণ অনুযায়ী একই চুক্তির ফায়সালা দেওয়া হবে এবং এটাই সहीহ।

বিরোধ যদি বিনিময় মূল্যের পরিমাণ ও গুণ নিয়ে হয়, তবে তার সমাধান 'মুসলাম-ফীহি'-এর গুণ ও পরিমাণ সম্পর্কিত বিরোধের যে সমাধান বর্ণিত হয়েছে তার অনুরূপ (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : এ ব্যাপারে মূলনীতি এই যে, বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে যখন বিক্রিত মালের জাত, পরিমাণ ও গুণ অথবা বিনিময় মূল্যের জাত, পরিমাণ ও গুণ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং তারা উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তখন ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে যতক্ষণ সম্ভব একই চুক্তি সম্পর্কে দেওয়া হবে। অপারক ক্ষেত্রে রায় দেওয়া হবে যে, চুক্তি দুটিই হয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দুটি চুক্তি হয়েছে বলে রায় দেওয়া হবে। আর তা সম্ভব না হলে তখন রায় হবে একটি চুক্তির পক্ষে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা : যদি বিক্রিত মাল ও বিনিময় মূল্য নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় আর বিনিময় মূল্য এমন বস্তু হয়, যা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না, তখন দেখতে হবে বিরোধ ঠিক কি সম্পর্কে? যদি বিক্রিত মালের জাত ও বিনিময় মূল্যের জাত নিয়ে বিরোধ হয়, এবং তাদের কারও প্রমাণ না থাকে, তবে কিয়াস ও ইসতিহসান অনুযায়ী উভয়কে কসম করতে হবে।

যদি একজন প্রমাণ পেশ করে, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, এবং তারা চুক্তির মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে থাকে, তবে রায় দেওয়া হবে যে, চুক্তি দুটি হয়েছে। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

যদি মুসলাম-ফীহি ও রাসূল-মাল উভয়ের পরিমাণ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং তাদের কারও সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তবে উভয়কে কসম করতে বলা হবে। যদি একজন প্রমাণ পেশ

করতে পারে, তবে তা গৃহীত হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে দুটি চুক্তি হয়েছে বলে ফায়সালা দেওয়া হবে, যদি তারা চুক্তির মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে একটি চুক্তির পক্ষে ফায়সালা দেওয়া হবে।

যদি মুসলাম ফীহি ও রাসূল-মালের গুণ (মান) সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয়, তবে প্রমাণ না থাকার ক্ষেত্রে তো কিয়াস ও ইসতিহসান অনুসারে তাদের উভয়কে কসম করতে হবে। আর প্রমাণ থাকার ক্ষেত্রে কেবল মুসলাম-ফীহি বা কেবল রাসূল-মালের গুণ (মান) সম্পর্কিত বিরোধের যে সমাধান বর্ণিত হয়েছে, এ স্থলেও সেই একই সমাধান প্রযোজ্য (আয-যখীরা)।

১০. মাসআলা : রাসূল-মাল (বিনিময় মূল্য) যদি এমন কোন বস্তু হয়, যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয়ে যায়, যেমন আসবাব-পত্র, আর বিরোধ দেখা দেয় 'মুসলাম-ফীহি'-এর জাত নিয়ে, তবে প্রমাণ না থাকার ক্ষেত্রে কিয়াস অনুযায়ী উভয়ের উপর কসম আসবে না, বরং মুসলাম-ইলায়হির কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী উভয়কেই কসম করতে হবে। এরপর সমাধানের অবশেষ উপরের বর্ণনার অনুরূপ।

যদি তাদের একজন প্রমাণ পেশ করতে পারে, তার প্রমাণ গৃহীত হবে এবং সে অনুযায়ী ফায়সালা দেওয়া হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে তিনও ইমামের মতে একটি চুক্তির পক্ষেই ফায়সালা দেওয়া হবে।

১১. মাসআলা : যদি তাদের মধ্যে 'মুসলাম-ফীহি'-এর পরিমাণ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে প্রথম অবস্থায় কসম ও প্রমাণ সংক্রান্ত যে নিয়ম বর্ণিত হয়েছে, এ স্থলেও সকলের মতে সেই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

যদি তাদের মধ্যে 'মুসলাম-ফীহি'-এর গুণগত মান নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, এবং তাদের কারও সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে, তবে পূর্বের মাসাইলের উপর কিয়াস করলে এ স্থলেও উভয়ের উপর কসম আরোপিত হওয়ার কথা। ইসতিহসান অনুযায়ী উভয়ের উপর কসম আরোপিত হবে না। আমরা কিয়াসকেই গ্রহণ করি।

যদি তাদের কোনও একজন প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে সে অনুযায়ী ফায়সালা দেওয়া হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে সকলেরই মতে একটি চুক্তির পক্ষে ফায়সালা দেওয়া হবে (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা : যদি রাসূল-মালের জাত নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় এবং তাদের কারও প্রমাণ না থাকে, তবে কিয়াস অনুযায়ী তাদেরকে কসম করতে হবে না। ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। ইসতিহসান অনুযায়ী উভয়কে কসম করতে হবে। যদি কোনও একজন প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে তার প্রমাণ অনুসারে রায় দেওয়া হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুসারে দুটি চুক্তির পক্ষে ফায়সালা দেওয়া হবে এবং ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে একটি চুক্তির পক্ষে রায় দেওয়া হবে। ইমাম কারখী (র) তাদের থেকে একরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এটাই বিত্তমত।

যদি রাসূল-মালের পরিমাণ সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয় এবং তাদের কারও প্রমাণ না থাকে, তবে কিয়াস অনুযায়ী রাক্বুস-সালামের কথাই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত এবং তাদের উপর কসম আসবে না, কিন্তু ইসতিহসান (-বিল আহার) অনুযায়ী তারা উভয়ে কসম করবে। যদি তাদের একজনের পক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তার প্রমাণ অনুযায়ী ফায়সালা হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে, তাদের সকলের মতে একটি চুক্তি হয়েছে বলে রায় দেওয়া হবে।

যদি গুণগত মান নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং তাদের কারও পক্ষে প্রমাণ না থাকে, তবে কিয়াস ও ইসতিহসান অনুযায়ী তারা কসম করবে না, বরং এ ক্ষেত্রে রাক্বুস-সালামের কথাই গৃহীত হবে। যদি একজনের পক্ষে প্রমাণ থাকে, তবে তার সে প্রমাণ অনুসারে রায় দেওয়া হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে এ ক্ষেত্রেও তাদের সকলের মতে একটি চুক্তি হয়েছে বলে ফায়সালা দেওয়া হবে।

যদি মুসলাম-ফীহি ও রাসূল-মাল উভয় সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয় এবং তাদের সে বিরোধ দেখা দেয় উভয়ের জাত নিয়ে এবং সে ক্ষেত্রে কারও কোন প্রমাণ না থাকে, তবে কিয়াস ও ইসতিহসান অনুযায়ী উভয়ে কসম করবে। যদি একজনের পক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তার প্রমাণ অনুযায়ী ফায়সালা দেওয়া হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে তিনও ইমামের মতে একটি চুক্তির পক্ষে ফায়সালা দেওয়া হবে এবং অতিরিক্ত পরিমাণ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে উভয়ের প্রমাণ গৃহীত হবে।

তারা যদি মুসলাম-ফীহি ও রাসূল-মালের গুণগত মান নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হয়, এবং তাদের কারও পক্ষে প্রমাণ না থাকে, তবে কিয়াস ও ইসতিহসান অনুযায়ী উভয়ে কসম করবে। যদি একজনের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তার প্রমাণ অনুযায়ী রায় দেওয়া হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে একটি চুক্তির পক্ষে ফায়সালা দেওয়া হবে এবং অতিরিক্ত গুণের পক্ষে উভয়ের প্রমাণ গৃহীত হবে (আয-যখীরা)।

১৩. মাসআলা : যদি পরিশোধের স্থান নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মুসলাম-ইলায়হির কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাদেরকে কসম করতে হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তাদের উভয়ের থেকে কসম নেওয়া হবে। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তাদেরকে কসম করতে হবে এবং শিষ্যদ্বয়ের মতে তাদেরকে কসম করতে হবে না। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনাই বিত্তমতর (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা : উপরোক্ত মাসআলা সেই ক্ষেত্রে, যখন তাদের কারও কাছে প্রমাণ না থাকে। যদি কোনও একজনের পক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সে বাদী হোক বা বিবাদী সর্বাবস্থায় তার প্রমাণ অনুযায়ীই ফায়সালা দেওয়া হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে বর্ণিত আছে যে, বাদীর প্রমাণ অনুযায়ী রায় দেওয়া হবে এবং ফায়সালা দেওয়া হবে যে, চুক্তি একটিই সম্পন্ন হয়েছিল (আল-মুহীত)।

১৫. মাসআলা : যদি বয়উস সালামের মেয়াদ নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে সে বিরোধের কারণে উভয়ের উপর কসম অব্যাহত হবে না এবং চুক্তি প্রত্যাহার করতে হবে না। এ ব্যাপারে আমাদের তিনও ইমাম একমত (শারহত তাহাবী)।

১৬. মাসআলা : যদি মূল মেয়াদ সম্পর্কেই বিরোধ দেখা দেয়, (যে মেয়াদ ধার্য করা হয়েছিল কিনা), তবে রাক্বুস-সালামের কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদি সে মেয়াদের দাবিদার হয়। আর যদি মুসলাম-ইলায়হি মেয়াদের দাবিদার হয় এবং রাক্বুস-সালাম তা অস্বীকার করে, তবে মুসলাম-ইলায়হির কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ইসতিহসান অনুযায়ী চুক্তি সর্হীহ থাকবে। শিষ্যদ্বয়ের মতে রাক্বুস-সালামের কথা গৃহীত হবে এবং চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

১৭. মাসআলা : উপরোক্ত মাসআলা সেই ক্ষেত্রে, যখন কারও পক্ষে প্রমাণ থাকবে না। যদি কোন একজনের পক্ষে প্রমাণ থাকে, তবে তার প্রমাণ গৃহীত হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে যে ব্যক্তি মেয়াদ থাকার দাবি করে, তার প্রমাণ গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

১৮. মাসআলা : যদি মেয়াদ থাকার ব্যাপারে উভয়ে একমত থাকে, কিন্তু মেয়াদের পরিমাণ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তবে কসমের সঙ্গে রাক্বুস-সালামের কথা গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা : এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন কারও সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে। যদি কোনও একজনের পক্ষে প্রমাণ থাকে, তবে তার প্রমাণ অনুসারে ফায়সালা দেওয়া হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে বিবাদীর প্রমাণ গৃহীত হবে আর তিনও ইমামের মতে এ ক্ষেত্রে দুটি চুক্তি হয়েছিল বলে রায় দেওয়া হবে না (আয-যখীরা)।

২০. মাসআলা : মেয়াদ এক মাস থাকার ব্যাপারে উভয়ে একমত থাকার পর তা পূর্ণ হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে যদি মতভেদ দেখা দেয়, তবে যার বিরুদ্ধে দাবি করা হবে, তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (আত তাহযীব)।

২১. মাসআলা : যদি একজনের হাতে প্রমাণ থাকে, তার প্রমাণ গৃহীত হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে দাবি যার বিরুদ্ধে, তার প্রমাণই গৃহীত হবে (আল-মুহীত)।

২২. মাসআলা : যদি মেয়াদের পরিমাণ ও তা পূর্ণ হওয়া-না হওয়া, উভয় নিয়েই বিরোধ দেখা দেয়, তবে পরিমাণ সম্পর্কে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং পূর্ণ হওয়া-না হওয়ার ব্যাপারে বিক্রেতার কথা। যদি উভয়ে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে তবে বিক্রেতার প্রমাণ গৃহীত হবে এবং পূর্ণ হয়নি বলে সে যে অতিরিক্ত কাল দাবি করেছে সেটাই সাব্যস্ত করা হবে (শারহত তাহাবী)।

২৩. মাসআলা : যদি মজলিসে রাসূল-মাল (বিনিময় মূল্য)-এর কবজা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং রাক্বুস-সালাম (ক্রেতা) প্রমাণ পেশ করে যে, বিনিময় মূল্য কবজার আগেই তারা মজলিস থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মুসলাম-ইলায়হি (বিক্রেতা) প্রমাণ দেখায় যে, তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই সে রাসূল-মাল কবজা করেছিল, তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে যে, রাসূল-মাল বিক্রেতার হাতে আছে কিনা। তা তার হাতে থাকলে তার প্রমাণই

গৃহীত হবে এবং বায়উস সালাম জায়েয হয়েছিল বলে রায় দেওয়া হবে (আয যখীরা : আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা : যদি ঠিক চুক্তির দিরহাম গুলোই ক্রেতার হাতে সংরক্ষিত থাকে এবং বিক্রেতা বলে, আমি এগুলো কবজার পর তার হাতে আমানত রেখেছি অথবা সে এগুলো জোর করে নিয়ে গেছে, তবে কবজা সম্পর্কে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলে তার কথাই গৃহীত হবে এবং দিরহামগুলো ফেরত দেওয়ার ফায়সালা দেওয়া হবে (আল-হাবী)।

২৫. মাসআলা : যদি একজনের পক্ষে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেটা রাক্বুস-সালামের পক্ষে হয়, তবে তা গৃহীত হবে না আর মুসলাম-ইলায়হির পক্ষে হলে গৃহীত হবে। যদি কারও পক্ষেই প্রমাণ না থাকে এবং দিরহামগুলো বিবাদীর হাতে থাকে, তবে বাদীর দাবির প্রকৃতি লক্ষ্য করতে হবে। সে যদি তার বিরুদ্ধে জবরদখল বা আমানতের দাবি না করে, বরং বলে আমি রাসূল-মাল কবজা করিনি, তবে তাদের কারও উপর কসম আরোপিত হবে না।

যদি বাদী দাবি করে যে, তার কাছ থেকে দিরহামগুলো সে জোর করে নিয়ে গেছে বা তার হাতে সে তা আমানত রেখেছে, অথচ এর আগে মজলিসের ভেতর সে তা কবজা করার কথা অস্বীকার করেছিল, তবে এ ক্ষেত্রে বিবাদীর কথা গৃহীত হবে। দিরহাম যদি রাক্বুস-সালামের হাতে থাকে আর যার বিরুদ্ধে দাবি, সে কবজার দাবি করে এবং তারপর বাদীর বিরুদ্ধে জবরদখল বা আমানতের দাবি না করে, তবে তাদের কারও উপর কসম আসবে না।

পক্ষান্তরে বিবাদী মজলিসে রাসূল-মাল কবজার দাবি করার পর যদি তার কাছ থেকে বাদী কর্তৃক তা জবরদখল করার বা তার হাতে তা আমানত রাখার দাবি করে এবং বাদী তা অস্বীকার করে, তবে আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এ সম্পর্কে ইখতিলাফ আছে। কেউ বলেন, এ ক্ষেত্রে কসমের সঙ্গে বিবাদীর কথা গৃহীত হবে। সে কসম করলে বায়উস সালাম বৈধ প্রমাণিত হবে এবং তখন সে রাক্বুস-সালামের কাছ থেকে রাসূল-মাল গ্রহণ করবে। কেউ বলেন, মাসআলা এরূপ হবে সেই ক্ষেত্রে, যখন বাদী কবজা না করার কথা পৃথকভাবে বলে, যেমন সে বলল, আমি তোমার সঙ্গে বায়উস সালাম করেছি, তারপর চুপ থাকল, তারপর বলল, কিন্তু তুমি রাসূল-মাল কবজা করনি। অথবা বলল, তোমার সঙ্গে আমি বায়উস সালাম করেছি এবং তুমি রাসূল-মাল কবজা করনি, অর্থাৎ কিন্তু, তবে বা এ জাতীয় শব্দে নয়, বরং এবং (সংযোজক অব্যয়)-এর দ্বারা পৃথক বাক্যে বলল। পক্ষান্তরে যদি 'কবজা করিনি' কথাটি মিলিতভাবে বলে আর বিবাদী দাবি করে, কবজা করেছি, তবে সে ক্ষেত্রে বাদীর কথাই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত বিবাদীর কথা নয় (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা : মজলিস হতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মুসলাম-ইলায়হি (বিক্রেতা) যদি বিনিময় মূল্যের অর্ধেক নিয়ে আসে এবং বলে, এগুলোকে ভেজাল পেয়েছি, তবে সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে ক্রেতা তাকে তাসদীক করে কিনা। ক্রেতা তাকে তাসদীক করলে সেগুলো ক্রেতাকে ফেরত দেওয়ার অধিকার তার থাকবে। যদি ক্রেতা তার কথা প্রত্যাখ্যান করে এবং সেগুলোকে তার দিরহাম বলে স্বীকার না করে, কিন্তু বিক্রেতার দাবী যে, সেগুলো

তারই দিরহাম, তবে লক্ষ্য করতে হবে ইতিপূর্বে বিক্রেতা উত্তম দিরহাম কবজা করার কথা স্বীকার করেছিল কিনা। যদি স্বীকার করে থাকে এবং বলে যে, আমি ভাল দিরহাম কবজা করলাম বা আমার হক বুঝে পেলাম বা বিনিময় মূল্য কবজা করলাম কিংবা দিরহামগুলো পুরোপুরি উসূল করলাম, তো এ চার অবস্থায় তার পরবর্তীকালীন এ দাবিতে কর্ণপাত করা হবে না যে, 'আমি এগুলোকে ভেজাল পেয়েছি'। কাজেই ক্রেতার কাছেও সে কসম দাবি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে পূর্বে যদি কেবল এতটুকু বলে যে, দিরহামগুলো কবজা করেছি, তবে এ ক্ষেত্রেও কিয়াস অনুযায়ী রাক্বুস-সালাম (ক্রেতা)-এর কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী বিক্রেতার কথা গৃহীত হবে। যদি কেবল এতটুকু বলে থাকে যে, কবজা করেছি, তবে সে ক্ষেত্রে তার (বিক্রেতার) কথাই গৃহীত হবে (আয-যখীরা)।

২৭. মাসআলা : যদি প্রথমে দিরহাম কবজা করার কথা স্বীকার করে এবং তারপর দাবি করে যে, তা জাল, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি কবজা করে, কিন্তু কিছুই স্বীকার না করে এবং তারপর সেগুলো জাল বলে দাবি করে, তবে তা গৃহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা : রাসূল-মালের কতক নিকৃষ্টমানের পায় অথবা তাতে অন্য কারও মালিকানা প্রমাণিত হয়, তারপর তা নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, রাক্বুস-সালামের দাবি, তার পরিমাণ রাসূল-মালের এক-তৃতীয়াংশ এবং মুসলাম-ইলায়হির দাবি, তা অর্ধেক। তবে এ ক্ষেত্রে কসমের সাথে রাক্বুস-সালামের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি জাল মুদ্রা বা শিসা হয়ে থাকে, এবং সে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবে মুসলাম-ইলায়হির কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল-হাবী)।

২৯. মাসআলা : যদি কাপড়ে বায়উস সালামের চুক্তি হয় এবং শর্ত করা হয় যে, কাপড় উৎকৃষ্টমানের হতে হবে। তারপর কাপড় উপস্থিত করে এবং দাবি করে যে, সেটা উৎকৃষ্টমানের। কিন্তু বাদী তা অস্বীকার করে, তবে কাযী কাপড়টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ দুজন লোককে দেখাবে। আর এটাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। একজনকে দেখালেও চলবে। সে যদি বলে, কাপড়টি উৎকৃষ্ট তবে সেটি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে (আল-খুলাসা)।

৩০. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে দশ দিরহামের বিনিময়ে এক কুরর গমে বায়উস সালাম করেছিলে, কিন্তু আমি দিরহামগুলো কবজা করিনি, কিংবা 'সালাম'-এর স্থলে সালাফ শব্দ ব্যবহার করল (উভয় শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়), তবে লক্ষ্য করতে হবে যে, 'কিন্তু আমি তা কবজা করিনি' কথাটি পূর্বের বাক্যের সাথে মিলিতভাবে বলেছে, না পৃথকভাবে। যদি মিলিতভাবে বলে থাকে, তবে কিয়াস ও ইসতিহসানের দৃষ্টিতে তার কথা সত্য বলে স্বীকার করা হবে। আর যদি পৃথকভাবে বলে থাকে, যেমন সে ক্ষণিক চুপ থাকার পর বলল, কিন্তু আমি তা কবজা করিনি, তবে কিয়াস অনুসারে তার কথা সত্য মনে করা হবে, কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী নয়।

ইসতিহসান অনুযায়ী যখন তার কথা বিশ্বাস করা হল না এখন প্রশ্ন হচ্ছে সন্ধটের সমাধান হবে কিভাবে? তো বলা হয়েছে যে, কসমের সঙ্গে বাদীর কথা গৃহীত হবে। এটা সেই ক্ষেত্রে

যখন লোকটি বলবে, দশ দিরহামের বিনিময়ে আমার সঙ্গে বায়উস সালাম করেছ। কিন্তু সে যদি বলে, আমার হাতে দশ দিরহাম অর্পণ করেছ বা নগদ দিয়েছ, কিন্তু আমি তা কবজা করিনি, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তার কথা শুনে নেওয়া হবে না, তা মিলিতভাবে বলুক বা পৃথকভাবে। যেমন সে যদি বলত কবজা করেছিলাম এবং তারপর বলে কবজা করিনি। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মিলিতভাবে বললে তার কথা বিশ্বাস করা হবে এবং পৃথকভাবে বললে বিশ্বাস করা হবে না (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা : যদি পরিশোধের স্থান নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়, যেমন রাক্বুস-সালাম বলল, তুমি শর্ত করেছিলে যে, অমুক মহল্লায় আমাকে মাল বুঝিয়ে দেবে এবং মুসলা-ইলায়হি বলল, আমি সে মহল্লা ছাড়া অন্য মহল্লায় তোমাকে তা দেব, তবে রাক্বুস-সালামকে তা গ্রহণে বাধ্য করা হবে (আয-যখীরা)।

৩২. মাসআলা : যদি চুক্তিতে শর্তারোপ করা হয় যে, অমুক স্থানে মাল পরিশোধ করা হবে, তারপর মুসলাম-ইলায়হি বলে, তুমি অন্য জায়গায় মাল গ্রহণ কর এবং শর্তের স্থানে পৌঁছাতে যে ভাড়া লাগে তা আমার কাছ থেকে নাও, আর সে অনুযায়ী সে মাল কবজা করে, তবে তা জায়েয হবে, কিন্তু ভাড়া গ্রহণ করা জায়েয হবে না। ভাড়া গ্রহণ করে থাকলে তাকে তা ফেরত দিতে হবে। হাঁ তার এই ইখতিয়ার থাকবে যে, চাইলে সেখানে তা কবজা করবে, অন্যথায় তা ফেরত দেবে এবং শর্তের স্থানে তাকে তা পরিশোধ করতে বলবে। যদি সেই অপর স্থানে কবজা করে থাকে এবং তার হাতে তা খোয়া যায়, তবে সে আর কিছু পাবে না (আল-মাবসূত)।

৩৩. মাসআলা : প্রথমে কোন মহল্লায় মাল সমর্পণের শর্ত করার পর যদি তার বাড়িতে সমর্পণের শর্ত আরোপ করে, যেমন বলল, তোমার সঙ্গে এই শর্তে বায়উস সালাম করছি যে, সমরকান্দের প্রধান ফটকে মাল সমর্পণ করতে হবে, তারপর তা সমর্পণ করবে আমার কালাবায়ের বাড়িতে, তবে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে কিয়াস ও ইসতিহসান অনুযায়ী তা জায়েয হবে না। ফকীহ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম (র) বলতেন, ইসতিহসানের দৃষ্টিতে তা জায়েয হবে (আল-মুহীত)।

৩৪. মাসআলা : যদি প্রথমেই শর্ত করে যে, তার বাড়িতে মাল সমর্পণ করতে হবে, তবে আমাদের কোন কোন ফুকাহায়ে কিরামের মতে কিয়াস অনুযায়ী তা জায়েয হবে না, কিন্তু ইসতিহসান অনুযায়ী জায়েয হবে। হাকিম শহীদ (র) বলেন, এই কিয়াস ও ইসতিহসান সেই ক্ষেত্রে, যখন এটা বলে না দেবে যে, তার বাড়ি কোথায় এবং মুসলাম-ইলায়হিরও জানা না থাকে যে, বাড়িটি কোন মহল্লায়। যদি তা বলে দেয় বা মুসলাম-ইলায়হির তা জানা থাকে, তবে কিয়াস ও ইসতিহসানের দৃষ্টিতে জায়েয হবে (আয-যখীরা)।

৩৫. মাসআলা : যেই শহরে মাল সমর্পণের শর্ত ছিল মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর সে শহর ছাড়া অন্য কোথাও বিক্রেতার সঙ্গে ক্রেতার সাক্ষাত হয়ে যায়, তবে সেখানেও সে মাল দাবি করতে পারবে, যদি মালের দাম সেখানে শর্তের স্থান অপেক্ষা কম বা তার সমান হয়। আমাদের যুগের কোন কোন মুফতী ফাতওয়া দিয়েছেন যে, সেখানে বসে সে মালের দাবি করতে পারবে না।

আমার কাছে এ জবাবই বেশী পসন্দ অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনের কথা আলাদা যেমন মুসলাম-ইলায়হি হয়ত অন্য কোন শহরে অবস্থান করছে, যেখানে রাক্বুস-সালামের পক্ষে মান আদায় করা সম্ভব নয় (আল-কিন্য়া)।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : বায়উস সালামের ইকাল (রহিতকরণ), অন্য কিছুর বিনিময়ে আপোসরফা ও দোযজনিত ইখতিয়ার

১. মাসআলা : (সাধারণ বিক্রয়ের মত) সালাম বিক্রয়ের বিক্রয় প্রত্যাহার জায়েয আছে (আল-মুহীত)।

২. মাসআলা : যদি সালাম দ্রব্যের সমুদয়ের ব্যাপারে ইকাল করে, তবে তা জায়েয হবে, চাই তা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে হোক বা পরে। তদ্রূপ সালাম মূল্য বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় হোক বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর।

এখন ইকাল বৈধ হওয়ার সালাম মূল্য যদি নির্দিষ্টতা গুণ সম্পন্ন বস্তু হয় এবং তা বিক্রেতার হাতে বাকি থাকে, তবে হুবহু নেটাই সে ফেরত দেবে। যদি তা বাকি না থাকে, তবে সেটা মিছলী দ্রব্য হলে তা মিছল বা সাদৃশ্য দ্রব্য পরিশোধ করবে, আর যদি সাদৃশ্য দ্রব্য না হয়, বরং মূল্য নির্ভর দ্রব্য হয় তবে তার বাজার মূল্য ফেরত দেবে।

যদি বিনিময় মূল্য এমন দ্রব্য হয়, যা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না, তবে তা বাকি থাকুক আর না-ই থাকুক সর্বাবস্থায় তাকে তার অনুরূপ দ্রব্য ফেরত দিতে হবে।

এমনিভাবে যদি রাক্বুস-সালাম যদি মাল কবজা করে এবং এরপর তারা পরস্পরের সম্মতিক্রমে চুক্তি রহিত করে আর কবজাকৃত মাল তার হাতে বাকি থাকে, তবে সে রহিতকরণও জায়েয। সে ক্ষেত্রে রাক্বুস-সালামের কর্তব্য কবজাকৃত মাল হুবহু ফেরত দেওয়া।

যদি সালাম দ্রব্যের আংশিকের ক্ষেত্রে ইকাল করে, এবং তা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে করে, তবে সেই অংশের ক্ষেত্রে ইকাল জায়েয হবে। তবে শর্ত এই যে, ইকালার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এ ধরনের সুনির্দিষ্ট অংশ হতে হবে। অবশিষ্ট অংশে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কাল পর্যন্ত সালাম চুক্তি বহাল থাকবে। এ ব্যাপারে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরাম একমত।

আর যদি ইকাল মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে করে এবং অবশিষ্ট অংশে নগদ পরিশোধের শর্ত না করে, তবে সে ইকালও জায়েয হবে। অবশিষ্ট অংশে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কাল পর্যন্ত চুক্তি বহাল থাকবে। আর যদি ইকালয় অবশিষ্ট মাল নগদ পরিশোধ করার শর্ত আরোপ করে, তবে ইকাল সহীহ হবে বটে, কিন্তু শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুযায়ী। কেননা তাদের মতে ইকাল-এর আসল অর্থ চুক্তি রহিতকরণ (আল-বাদায়ে)।

৩. মাসআলা : রাক্বুস-সালাম যদি ইকালার পর বিনিময় মূল্য দ্বারা অন্য কিছু গ্রহণ করতে চায়, তবে ইসতিহাসানের দৃষ্টিতে তা জায়েয হবে না। আমাদের তিন ইমামও এ মতই পোষণ করেন (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : তারা এ ব্যাপারে একমত যে, বায়উস সালামের ক্ষেত্রে ইকালার সহীহ হওয়া জন্য ইকালার মজলিসে বিনিময় মূল্য কবজা করা শর্ত নয় (আত-তাতার খানিয়া : আস সুগনাকীর বরাতে)।

৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি একটি দাসীর বিনিময়ে এক কুরুর গমে সালাম চুক্তি করল। বিক্রেতা বাঁদীটি কবজা করল। এখন তারা যদি ইকালার করে এবং তারপর বিক্রেতার হাতে বাঁদীটি মারা যায়, তবে ইকালার সহীহ হয়ে যাবে এবং বিক্রেতার কর্তব্য হবে, দাসীটির কবজার দিনের বাজার মূল্য ক্রেতাকে প্রদান করা। যদি বাঁদীটির মৃত্যুর পর ইকালার করে, তবে তাও জায়েয হবে, তখনও তাকে বাঁদীর বাজার মূল্য আদায় করতে হবে (আল-জামিউস সাগীর)।

৬. মাসআলা : ইবন আহমাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাক্বুস-সালাম যদি মুসলাম ফীহি কবজা করার আগে রাসূল-সালাম বা তার বেশী দিয়ে বিক্রেতার কাছ থেকে কিনে নেয়, তবে তদ্বারা কি বায়উস সালামের চুক্তিতে ইকালার হয়ে যাবে? তিনি বললেন, এ ক্রয় সহীহ হবে না এবং এর দ্বারা ইকালারও হবে না (আত-তাতার খানিয়া)।

৭. মাসআলা : রাক্বুস-সালাম যদি মুসলাম-ইলায়হির কাছে রাসূল-মাল বা তা বেশী দিয়ে মুসলাম-ইলায়হি বিক্রি করে ফেলে, তবে তাতেও ইকালার হবে না (আল-কিন্যা)।

৮. মাসআলা : ক্রেতা ও বিক্রেতা মিলে বায়উস সালামের চুক্তি রহিত করার পর যদি রাসূল-মাল নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হয়, তবে যার বিরুদ্ধে দাবি, তার কথাই গৃহীত হবে। রাক্বুস-সালাম কর্তৃক মাল কবজা করার পর যদি ইকালার করে এবং তার সে মাল বাকি থাকে, এরপর তাদের মধ্যে রাসূল-মালের পরিমাণ নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে উভয়কে কসম করতে হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৯. মাসআলা : আবুল লাইস (র)-এর 'ফাতওয়া' গ্রন্থে আছে, এক 'কুরুর' গমের ক্ষেত্রে সালাম চুক্তি করার পর ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে বলে যে, তোমাকে অর্ধেক মাল থেকে দায় মুক্ত করে দিলাম আর বিক্রেতা সেটা গ্রহণ করে, তবে তাকে অর্ধেক সালাম মূল্য ফেরত দিতে হবে। কেননা এতদ্বারা অর্ধেক মালের ভেতর ইকালার হয়ে গেছে। আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবন সাল্লাম (র) ও ফকীহ আবু বকর আল-ইসকাফ (র)ও এরূপ বলেছেন (আয-যখীরা)।

১০. মাসআলা : রাক্বুস-সালাম যদি মুসলাম-ইলায়হিকে বিক্রিত মাল হিবা (দান) করে দেয়, তবে তদ্বারা বায়উস সালামের ইকালার হয়ে যাবে। সুতরাং মুসলাম-ইলায়হির কর্তব্য হবে বিনিময় মূল্য ফেরত দেওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : 'আল-ফাতাওয়াল-আত্তাবিয়া' গ্রন্থে আছে, বিক্রেতা ও ক্রেতা মিলে যদি চুক্তি রহিত করে এবং বিনিময় মূল্য আসবাব-পত্র জাতীয় কিছু হয় আর ক্রেতা তা বিক্রেতার

কাছে বিক্রি করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে। অন্য কারও কাছে বিক্রি করা জায়েয হবে না। এ গ্রন্থে আরও আছে, কোন খৃস্টান যদি মদের ভেতর বায়উস সালাম করে, এবং তারপর তাদের একজন ইসলাম গ্রহণ করে, তবে এটা ইকালারই মত। সুতরাং এরপর রাসূল-মাল দ্বারা অন্য কিছু গ্রহণ জায়েয হবে না (আত-তাতার খানিয়া)।

১২. মাসআলা : ইবন রুসতম (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি দশ দিরহাম বিনিময়ে কারও সঙ্গে এক কুরুর গমের সালাম করে এবং সেই ব্যক্তির কাছে তার এক বছরের মেয়াদে আরও এক কুরুর গম পাওনা থাকে, এরপর তার সঙ্গে এই শর্তে সালাম চুক্তির ইকালার করে যে, সে বাকি গমগুলো নগদ পরিশোধ করবে, তবে ইকালার জায়েয হয়ে যাবে, কিন্তু বাকি গমে এক বছরের মেয়াদ বলবৎ থাকবে (আল-মুহীত)।

১৩. মাসআলা : সালাম দ্রব্য যদি গম হয় এবং সালাম মূল্য একশ' দিরহাম হয়, এরপর এই শর্তে আপোষরফা হয় যে, বিক্রেতা তাকে দু'শ' অথবা একশ' পঞ্চাশ দিরহাম ফেরত দেবে, তবে সে বাতিল হবে। যদি বলে, রাসূল-মালের এক দিরহামের বিনিময়ে তোমার সঙ্গে মুসলাম-ফীহির ব্যাপারে আপোষ করছি, তবে তা জায়েয হবে।

এমনিভাবে যদি বলে, পঞ্চাশ দিরহামের বিনিময়ে, তাও জায়েয হবে। কেননা বায়উস সালামের ক্ষেত্রে রাসূল-মালের বদলে আপোস করলে তাতে ইকালার হয়ে যায়। এরপর ফুকাহায়ে কিরামে মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, সে যে বলল, তোমার সঙ্গে রাসূল-মালের পঞ্চাশ দিরহামের বিনিময়ে মুসলাম-ফীহির ব্যাপারে আপোষ করছি, এর দ্বারা কি সমুদয় মুসলাম-ফীহির ভেতর ইকালার হয়ে যাবে? নাকি অর্ধেকের ভেতর?

যদি বলে, আমি রাসূল মালের দু'শ' দিরহামের বিনিময়ে মুসলাম-ফীহির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আপোষ করছি, তবে তা জায়েয হবে না। 'জায়েয হবে না' মানে অতিরিক্তটাদিতে হবে না, বরং রাসূল মালের যতটুকু ঠিক ততটুকুর বিনিময়েই ইকালার হবে। শায়খুল ইসলাম (র) তার ভাষ্য গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন। শামসুল আইম্মা (র) তার ভাষ্য গ্রন্থে ইঙ্গিত করেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইকালারই বাতিল হয়ে যাবে (আয-যখীরা)।

১৪. মাসআলা : দুই ব্যক্তি যদি এক ব্যক্তির সঙ্গে কোন খাদ্য শস্যে বায়উস সালাম করে, তারপর তাদের একজন তার রাসূল মালের বিনিময়ে তার সঙ্গে আপোষরফা করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে আপোষরফা স্বগিত থাকবে। অপরজন অনুমোদন করলে জায়েয হয়ে যাবে। তারপর রাসূল মালের যে অংশ কবজা করবে তাতে তারা দুজন শরীক থাকবে এবং খাদ্য শস্যের যে অংশে চুক্তি বলবৎ থাকবে তাতেও তারা দুজন অংশীদার হবে। অপরজন অনুমোদন না করলে আপোষরফা বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে আপোষকারী সালামের দ্বিতীয় পক্ষের মালে আপোষ জায়েয হবে। এমনিভাবে যদি মুসলাম-ফীহির জন্য কোন কাফীল (জামিন) থাকে এবং ক্রেতাও একজন তার রাসূল মালের বিনিময়ে কাফীলের সঙ্গে আপোস করে, তবে বিক্রেতার সঙ্গে তাতে আপোষরফা হয়ে যাবে কিনা সে ব্যাপারেও একই মতভেদ রয়েছে (আল-মাবসূত)।

১৫. মাসআলা : উপরোক্ত মাসআলা সেই ক্ষেত্রে, যখন দুই ব্যক্তি তাদের যৌথ দশ দিরহামের বিনিময়ে এক কুরুর গমের ভেতর কারও সঙ্গে বায়উস সালাম করে। যদি সে দশ দিরহাম যৌথ না হয়, বরং প্রথমে তারা দশ দিরহামের বিনিময়ে চুক্তি করে এবং তারপর প্রত্যেকে পাঁচ দিরহাম পরিশোধ করে, তবে সে ক্ষেত্রে বিধান কি হবে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) তা 'বেচাকেনা' অধ্যায়ে উল্লেখ করেননি। কতক ফুকাহায়ে কিরাম 'বেচাকেনা' অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন যে, এ ক্ষেত্রে তিনও ইমামে মতে আপোষরফাকারীর অংশেই ইকাল হাবে। কারও মতে এটা ঠিত নয়। 'আল-আসল' গ্রন্থের 'সুল্হ' (আপোসরফা) অধ্যায়ে এ মাসআলা বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত বলা হয়েছে প্রথমোক্ত মাসআলারই অনুরূপ। দুই রাক্বুস সালামের একজন যদি তার অংশের চুক্তি ইকাল করে তবে তার হুকুম কি হবে? সে সম্পর্কে প্রাচীনদের কোন কিতাবে কিছুই বর্ণিত হয়নি। পরবর্তীকালীন ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রথমোক্ত মাসআলার অনুরূপ মতভেদ রয়েছে (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা : সালাম চুক্তিতে মাল ক্রয় করার পর রাক্বুস সালাম যদি ঐ মালে জন্য কোন কাফীল (জামিন) গ্রহণ করে, আর সেই কাফীল ক্রেতার সঙ্গে বিনিময় মূল্যের বদলে আপোষ করে, তবে তা বিক্রেতার অনুমোদনের উপর স্থগিত থাকবে, কাফালাত বিক্রেতার আদেশক্রমে হোক বা তার আদেশ ছাড়া। বিক্রেতার অনুমোদন করলে আপোষরফা জায়েয হবে এবং অনুমোদন না করলে বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং এ অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে বায়উস সালামের চুক্তি বহাল থাকবে।

যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি বিনিময় মূল্যের বদলে ক্রেতার সঙ্গে আপোষ করে সে ক্ষেত্রেও একই বিধান।

উপরোক্ত মাসআলা হল সালাম মূল্য মুদ্রা বা মুদ্রা শ্রেণী হলে। পক্ষান্তরে তা যদি নির্দিষ্টতা গুণ সম্পন্ন কোন বস্তু হয় যেমন গোলাম, কাপড় ইত্যাদি, তবে সকলেরই মতে বিক্রেতার অনুমোদনের উপর আপোষরফা স্থগিত থাকবে। যদি কাফীল ইকাল করে এবং ক্রেতা কবুল করে, তবে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, এটা আপোষরফারই মত। কেউ বলেন, তিনও ইমামের মত অনুসারে এটা স্থগিত থাকবে (আয যহীরিয়া)।

১৭. মাসআলা : ক্রেতা যদি মুসলাম-ফীহি কবজা করে এরং সে কবজাকৃত গমে তার কাছে দোষ দেখা দেয়, সেই সঙ্গে তাতে পুরানো কোন দোষও খুঁজে পায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিক্রেতা নতুন দোষসহ তা ফেরত গ্রহণে রাযী থাকলে তো ইকাল হাবে। আর সে যদি তা গ্রহণ করতে না চায়, সে ইখতিয়ারও তার আছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, সে যদি দোষযুক্ত গম গ্রহণে সম্মত না থাকে, তবে তার কাছ থেকে যেমন গম কবজা করেছিল সেই রকমের গম ফেরত দেবে। এবং বিনিময় মূল্য হিসেবে যা দিয়েছিল তা ফেরত গ্রহণ করবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সে তা গ্রহণ করতে না চাইলে দোষের

কারণে যে পরিমাণ মূল্য কম হওয়ার কথা ছিল তা রাসুল-মাল থেকে ফেরত গ্রহণ করবে (আল কাফী)।

১৮. মাসআলা : সালাম দ্রব্য কবজা করার পর তাতে যদি দোষ পাওয়া যায় তাহলে রাক্বুস-সালাম তা ফেরত দিতে পারবে। যদি তাতে নতুন কোন দোষ সৃষ্টি হয়, তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার। ইচ্ছা করলে সে অতিরিক্ত দোষসহ তা ফেরত নেবে এবং ক্রেতাকে নির্দোষ সালাম দ্রব্য বুঝিয়ে দেবে অথবা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। যদি অস্বীকৃতি জানায় তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ক্রেতার হক বাতিল হয়ে যাবে। তার তা ফেরত দেওয়ার বা দোষের কারণে সেই পরিমাণ মূল্য ফেরত গ্রহণের অধিকার থাকবে না। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন রাক্বুস সালামের নিকট অতিরিক্ত দোষটা আসমানী কোন মসীবতের কারণে বা রাক্বুস-সালামের কোন কর্মের কারণে দেখা দেয়। যদি সে দোষ তৃতীয় ব্যক্তির কর্মের কারণে দেখা দেয়, এবং রাক্বুস সালাম সে কারণে তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে, তবে তার আর দোষের কারণে সেটি ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে না। এমনভাবে মুসলাম-ইলায়হি (বিক্রেতা)-এর জন্যও সেই অর্থদণ্ডের কারণে অতিরিক্ত দোষসহ তা ফেরত নেওয়া জায়েয হবে না। দোষের কারণে যে ইখতিয়ার ক্রেতার ছিল এ ক্ষেত্রে তা বাতিল হয়ে যাবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত (শারহুত তাহাবী)।

১৯. মাসআলা : হিশাম (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে বলেন, আমি ইমাম আবু ইউসুফ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন ব্যক্তি যদি দশ দিরহামের বিনিময়ে একটি কাপড়ে বায়উস সালাম করে, তারপর সেটি কবজা করে কেটেও ফেলে, তারপর তাতে কোন দোষ পায়, তবে কি সে ঐ দোষ পরিমাণ মূল্য ফেরত নিতে পারবে? তিনি বললেন, না পারবে না। হিশাম (র) বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি সালাম চুক্তিতে কারও হাতে দুটি দিরহাম অর্পণ করল— একটি গমের জন্য, অন্যটি চাউলের জন্য। এখন যদি বিক্রেতা একটি দিরহাম জাল দেখতে পায়, তবে তার হুকুম কি? তিনি বললেন, যদি দিরহাম দুটি একত্রে অর্পণ করে থাকে, তবে অর্ধেক গম ও অর্ধেক চাউলে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে প্রতিটি দিরহাম আলাদাভাবে অর্পণ করলে সাক্ষ্য প্রমাণ দেখতে হবে। যদি উভয়ে প্রমাণ পেশ করে, তবে বিক্রেতার প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি কারও পক্ষেই প্রমাণ না থাকে, তবে গম ও চাউল উভয়ের মধ্যে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

২০. মাসআলা : ইব্রাহীম ইব্ন রুসতম (র) হতে বর্ণিত যে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কেউ যদি কারও সঙ্গে পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে পাঁচ কাফীয গমে এবং পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে পাঁচ কাফীয জবে বায়উস সালামের চুক্তি করে এবং গম ও জবের জন্য পৃথক পৃথক পাঁচ দিরহাম পরিশোধ করে, এরপর তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তারপর বিক্রেতা একটি দিরহামকে জাল দেখতে পায় আর তখন ক্রেতা দাবি করে যে, সেটি গমের বিনিময়ে প্রদত্ত দিরহামের ভেতর ছিল আর বিক্রেতার কথা হচ্ছে সেটি ছিল জবের বিনিময়ে প্রদত্ত দিরহামের ভেতর, তবে সে ক্ষেত্রে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি তারা উভয়ে স্বীকার করে যে, সেটি কোন দিরহামের ভেতর ছিল তা তাদের জানা নেই,

তবে বিক্রেতা ক্রেতাকে আরেকটি দিরহাম ফেরত দেবে এবং হিসেবে গম ও জব উভয় হতে এক-পঞ্চমাংশ কমে যাবে।

২১. মাসআলা : বিশ্ব ইবনুল ওয়ালীদ (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কারও সঙ্গে দশ দিরহামের বিনিময়ে এক কুরুর গম ও পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে এক কুরুর যবের জন্য সালাম চুক্তি করে, তারপর তাকে গমের জন্য দশ দিরহাম এবং তারপর যবের জন্য পাঁচ দিরহাম পরিশোধ করে, তারপর তারা পৃথক হয়ে যায়, তারপর বিক্রেতা তাতে একটি দিরহাম জাল দেখতে পায় আর দাবি করে যে, সেটি গমের জন্য প্রদত্ত দিরহামের মাঝে ছিল এবং ক্রেতা দাবি করে যে, সেটি যবের জন্য প্রদত্ত দিরহামের মাঝে ছিল। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে যে, বিক্রেতা বিনিময় মূল্য উসূল হয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছিল কিনা। যদি তা স্বীকার করে থাকে, তবে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে আর যদি বিনিময় মূল্য উসূল করার কথা স্বীকার না করে থাকে, তবে বিক্রেতার কথাই গৃহীত হবে। যদি উভয়ে স্বীকার করে যে, সে দিরহামটি কোন ভাগের ভেতর ছিল তা তাদের জানা নেই, তবে তার অর্ধেক দশ দিরহামের মধ্যে এবং অর্ধেক পাঁচ দিরহামের মধ্যে ধরা হবে। সুতরাং সে হিসেবে গমের দশ ভাগের এক ভাগ এবং যবের বিশ ভাগের এক ভাগ কমে যাবে। ক্রেতা যদি একই চুক্তির অধীনে পনের দিরহাম পরিশোধ করে থাকে, তবে গমের দশ ভাগের এক ভাগের দুই-তৃতীয়াংশ এবং জবের পাঁচ ভাগের এক ভাগের এক-তৃতীয়াংশ কাটা যাবে (আল-মুহীত)।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ বায়উস সালামের ক্ষেত্রে উকীল নিয়োগ প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : কেউ যদি দিরহামের বিনিময়ে এক কুরুর গমের সালাম চুক্তি করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে আর সে সালামের শর্তাবলী রক্ষা করে সালামের চুক্তি সম্পাদন করে, তবে তা জায়েয হবে (শারহুত তাকমিলা)।

২. মাসআলা : চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে উকীলই-বিক্রেতার কাছে মাল অর্পণের দাবি করবে এবং সে-ই মূল্য বুঝিয়ে দেবে। উকীল যদি মুয়াক্কিলের দেওয়া দিরহাম পরিশোধ করে থাকে, তবে মাল বুঝে নেওয়ার পর তা মুয়াক্কিলের হতে অর্পণ করবে। আর যদি নিজের থেকে দিরহাম পরিশোধ করে থাকে তাহলে মুয়াক্কিলের কাছ থেকে তা আদায় করে নেবে (আয-যখীরা)।

৩. মাসআলা : শেষোক্ত ক্ষেত্রে উকীল পরিশোধিত উশূল করার উদ্দেশ্যে সালাম দ্রব্য আটকে রাখতে পারবে। এখন সে মাল যদি তার হাতে খোয়া যায়, তবে আটকের আগে খোয়া গেলে তো আমানত হিসেবেই যাবে আর আটকের পরে গেলে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সেটা বন্ধকী মাল হিসেবে খোয়া যাবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে এ ক্ষেত্রে উকীলের পাওনা মিটে যাবে, ঐ মালে দাম পাওনা অপেক্ষা কম হোক বা বেশী। শামসুল-আইম্মা আস-সারাখসী (র) বলেন যে, এটাই ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা : উকীল যদি বিনিময় মূল্য মক্কেলের টাকায় পরিশোধ করে এবং মুসলাম-ফীহির জন্য কোন কাফীল (জামিন) বন্ধক রাখে তা জায়েয আছে। যখন চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে, তখন যদি উকীল বিক্রেতাকে সময় বাড়িয়ে দেয়, অথবা তাকে মাল পরিশোধের দায়িত্ব হতে মুক্ত করে দেয়, তবে তা জায়েয হবে এবং এ ক্ষেত্রে তার কর্তব্য মক্কেলের টাকা পরিশোধ করে দেওয়া। এমনিভাবে যদি বিক্রেতা সচ্ছল বা অসচ্ছল কোন ব্যক্তির উপর মুসলাম-ফীহি আদায়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করে এবং উকীলের ভার কাছ থেকে তা বুঝে নিতে বলে আর উকীল সেমতে বিক্রেতাকে দায় মুক্ত করে দেয়, তবে বিশেষভাবে তার জন্য তা জায়েয আছে। এ ক্ষেত্রে মক্কেলের খাদ্য শস্য তাকেই আদায় করতে হবে। উকীল যদি শর্তের চেয়ে নিম্নমানের গম গ্রহণ করে তবে তাও জায়েয আছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে মক্কেলের এই অধিকার থাকবে যে, সে জরিমানাস্বরূপ উকীলের কাছ থেকে শর্তানুরূপ গম আদায় করে নেবে। উকীল যদি মুসলাম-ফীহি ছেড়ে দেয়, তাও জায়েয হবে। তখন তার দায়িত্ব হবে মক্কেলকে নিজের পক্ষ হতে খাদ্য শস্য আদায় করে দেওয়া। ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতানুযায়ী এটাই সাব্যস্ত হয় (আল-হাবী)।

৫. মাসআলা : উকীল যদি সালাম চুক্তি ইকাল করে, তবে তা জায়েয হবে। তখন সালাম দ্রব্যের অনুরূপ দ্রব্য তাকেই মুয়াক্কিলকে প্রদান করতে হবে। এটা আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা : সালাম চুক্তি সম্পাদনের পর উকীল যদি মুয়াক্কিলকে সালাম মূল্য পরিশোধের আদেশ দিয়ে চলে যায়, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে বিক্রেতা যদি কাউকে রাসূল-মাল কবজার জন্য উকীল বানায় এবং উকীল তা কবজা করার আগেই সে মজলিস থেকে চলে যায়, তখনও চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে (আয যখীরা)।

৭. মাসআলা : উকীল যদি মক্কেলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাকে যে মালে বায়উস সালামের জন্য উকীল বানানো হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য মালে চুক্তি সম্পাদন করে, তবে মক্কেল জরিমানাস্বরূপ উকীলের কাছ থেকে তার টাকা আদায় করে নিতে পারবে এবং চাইলে বিক্রেতার উপরও জরিমানা আরোপ করতে পারবে। উকীলের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করলে উকীল কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি তার নিজের জন্য বলবৎ থাকবে। আর যদি বিক্রেতার উপর জরিমানা আরোপ করে, তবে দেখতে হবে কখন জরিমানা আরোপ করেছে। যদি উকীল ও বিক্রেতা মজলিসে থাকা অবস্থায় জরিমানা আরোপ করে এবং উকীল বিক্রেতাকে অন্য দিরহাম পরিশোধ করে তবে বায়উস সালামের চুক্তি বৈধ থাকবে। আর যদি তারা মজলিস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর জরিমানা আরোপ করে, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে (আল-মুহীত)।

৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি কাউকে এই উদ্দেশ্যে দশ দিরহাম দিল যে, সে তা দিয়ে বায়উস সালামের পদ্ধতিতে খাদ্য শস্য কিনবে। উকীল এক ব্যক্তিকে পেয়ে গেল এবং তার সঙ্গে বায়উস সালামের চুক্তি করল। এ ক্ষেত্রে সে যদি মক্কেলের দিরহামের সঙ্গে চুক্তিতে সম্বন্ধযুক্ত করে থাকে, তবে মক্কেলের পক্ষেই চুক্তি হবে। আর যদি নিজের দিরহামের সঙ্গে

সম্বন্ধযুক্ত করে, তবে তার নিজের পক্ষেই চুক্তি হবে। যদি সম্বন্ধযুক্ত না করে, বরং সাধারণভাবে দশ দিরহামে বিনিময়ে চুক্তি সম্পাদন করে এবং তারপর মক্কেলের জন্য নিয়্যত করে, তবে মক্কেলের পক্ষেই চুক্তি হবে আর যদি নিজের জন্য নিয়্যত করে তবে চুক্তি তার নিজের পক্ষে হবে। যদি মনে কোন নিয়্যত না থাকে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে নিজের দিরহাম পরিশোধ করলে চুক্তি তার পক্ষে হবে এবং মক্কেলের দিরহাম পরিশোধ করলে মক্কেলের পক্ষে হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে চুক্তির সময় মুয়াক্কিলের জন্য নিয়্যত না করলে সে চুক্তি উকীলের নিজের পক্ষেই হবে। উকীল ও মুয়াক্কিল যদি নিয়্যতের ব্যাপারে মতবিরোধ করে, তবে সকলেরই মতে যার দিরহাম দিয়ে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে, খাদ্য শস্য তারই হবে (আল-মাবসূত)।

৯. মাসআলা : যদি কাউকে এই মর্মে উকীল বানায় যে, সে তার জন্য খাদ্যশস্যের বিনিময়ে দিরহাম গ্রহণ করে, সে মতে উকীল তা গ্রহণ করে এবং তার তা মক্কেলকে দেয়, তবে খাদ্য শস্য উকীলকেই পরিশোধ করতে হবে আর মক্কেলের কাছে সে দিরহামগুলো ঋণস্বরূপ তার পাওনা সাব্যস্ত হবে। যদি তার উকীল খাদ্য শস্য বায়উস সালাম করে এবং মক্কেল সে শস্য কবজা করে কিংবা বিক্রেতার সঙ্গে সে চুক্তি রহিত করে, তবে ইসতিহসান অনুযায়ী তা জায়েয হবে। বিক্রেতা সে খাদ্য শস্য মক্কেলের হতে সমর্পণ করতে না চাইলে সে ইখতিয়ারও তার আছে (খাযানাতুল আকমাল)।

১০. মাসআলা : সালাম চুক্তির জন্য দুজনকে উকীল নিযুক্ত করা হলে তাদের এককভাবে চুক্তি করা জায়েয হবে না। যদি উভয়ে একত্রে চুক্তি করার পর তাদের একজন বিক্রেতার সঙ্গে আপোষরফা করে, তবে ইমামত্রয়ের মতে তা অবৈধ হবে (আল-হাবী)।

১১. মাসআলা : দুজন কাউকে উকীল নিযুক্ত করল, যেন সে উভয়ের জন্য আলাদা আলাদা দশ দিরহামের বিনিময়ে খাদ্য শস্যের সালাম চুক্তি করে। এখন সে যদি একই চুক্তিতে তাদের জন্য বায়উস সালাম করে, তবে তা জায়েয হবে। যদি তাদের দিরহাম মিলিয়ে ফেলে এবং তারপর বায়উস সালাম করে, তবে সে চুক্তি তার নিজেরই জন্য হবে। এবং মেলানোর কারণে তাকে তাদের দিরহামের জরিমানা আদায় করতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা : যদি তাদের প্রত্যেকের দিরহাম দ্বারা একই ব্যক্তির সঙ্গে পৃথক বায়উস সালামের চুক্তি করে, এরপর কিছু মাল আদায় করে এবং তখন উভয় মক্কেল দাবি করে যে, সে আদায়কৃত মাল তারই প্রাপ্য, তবে সে ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথা গৃহীত হবে। সে যদি উপস্থিত না থাকে, তবে উকীলের কথা গ্রহণযোগ্য। তারপর বিক্রেতা উপস্থিত হয়ে যদি উকীলের কথা প্রত্যাখ্যান করে, তবে বিক্রেতার কথাই গৃহীত হবে।

যদি দিরহামের বদলে কাপড় বিক্রির উকীল বানায় এবং উকীল সে কাপড় দিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্য শস্যের ভেতর বায়উস সালামের চুক্তি করে, তবে সে চুক্তি তার নিজেরই পক্ষে হবে। যদি কাপড় বিক্রির উকীল বানায় এবং কিসের বিনিময়ে বিক্রি করবে তা স্থির করে না

দেয় আর এ অবস্থায় সে, তার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্য শস্যের ভেতর, বায়উস সালাম করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে সে চুক্তি মক্কেলের পক্ষেই হবে, কিন্তু শিষ্যদ্বয়ের পক্ষে জায়েয হবে না (আল-মাবসূত)।

১৩. মাসআলা : যদি তার দিরহাম দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির সঙ্গে বায়উস সালামের আদেশ দেয় এবং উকীল তার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি করে, তবে তা জায়েয হবে না (খাযানাতুল আকমাল)।

১৪. মাসআলা : সালাম চুক্তি সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত উকীল যদি চুক্তিতে এমন কোন শর্ত যোগ করে যার ফলে সালাম ফাসিদ হয়ে যায়, তবে সে জন্য উকীলের উপর জরিমানা আসবে না (আল-হাবী)।

১৫. মাসআলা : যদি কাউকে দশ দিরহামের বিনিময়ে খাদ্য বায়উস সালামের জন্য উকীল বানায়, তবে ইসতিহসান অনুযায়ী আমাদের কাছে আটা ও গমকেই খাদ্য শস্য বুঝানো হবে। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এ মাসআলা সেই ক্ষেত্রে যখন দিরহাম বেশী হয়। যদি কম হয়, তবে খাদ্য বলতে রুটি বুঝাবে। আটার ক্ষেত্রে দুটি রিওয়াযাত আছে। এক রিওয়াযেত অনুযায়ী আটা গমের পর্যায়ে গণ্য, অন্য রিওয়াযাত অনুযায়ী রুটির পর্যায়ে। এ কিয়াস প্রযোজ্য হবে সেই ক্ষেত্রে, যখন সাধারণ ক্রয়ের জন্য উকীল বানানো হয়। পক্ষান্তরে যদি দিরহামের বিনিময়ে বায়উস সালামের পদ্ধতিতে খাদ্য ক্রয়ের উকীল বানানো হয়, আর সে জব বা অন্য কোন দ্রব্য বায়উস সালামের চুক্তি করে, তবে সেটা অন্যথাচারণ বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে মক্কেল তার দিরহামের জন্য উকীলের উপর জরিমানা আরোপ করতে পারবে। চাইলে সে তা বিক্রেতার কাছ থেকেও আদায় করতে পারে (আল-মাবসূত)।

১৬. মাসআলা : সালাম চুক্তি সম্পাদনের জন্য কোন যিম্মীকে উকীল নিযুক্ত করা হলেও তা মাকরুহ হবে (খাযানাতুল আকমাল)।

১৭. মাসআলা : বায়উস সালামের উকীল যদি অতি মাত্রায় ঠকে চুক্তি সম্পাদন করে, তবে তা জায়েয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৮. মাসআলা : উকীল যদি কাউকে বিক্রেতার কাছ থেকে মাল কবজার উকীল নিযুক্ত করে এবং সে তা কবজা করে, তবে বিক্রেতা দায় মুক্ত হয়ে যাবে। উকীলের উকীল যদি তার নিজ গোলাম বা তার এমন পুত্র হয়, যে এখনও তার পোষ্যধীন রয়েছে কিংবা তার কাজের লোক হয়, তবে তা জায়েয হবে এবং সে কবজা মক্কেলের পক্ষেই হবে। আর সে যদি তৃতীয় কোন লোক হয়, এবং তার হাতে মাল খোয়া যায়, তবে প্রথম উকীলকে তার দায় বহন করতে হবে। আর মাল যদি প্রথম উকীলে হাতে পৌঁছে যায়, তবে সে ও তার উকীল উভয়ে দায় মুক্ত হয়ে যাবে (আল-হাবী)।

১৯. মাসআলা : সালাম চুক্তি সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত উকীল অন্য কাউকে উকীল বানাতে পারে না, যদি না মুয়াক্কিল তাকে বলে থাকে যে, তোমার যা ইচ্ছা করতে পার (খাযানাতুল আকমাল)।

২০. মাসআলা : বায়উস সালামের উকীল যদি তার নিজের মাল কেনে কিংবা তার এমন যৌথ কারবারের শরীকের কাছ থেকে কেনে, যে তার ব্যবসায় সমান অংশীদার, তবে তা জায়েয হবে না। নিজ গোলামের কাছ থেকে কেনাও জায়েয নয়। বিশেষ কোন যৌথ ব্যবসায়ের শরীকের কাছ থেকে যদি সেই ব্যবসার মাল ছাড়া অন্য মাল কেনে, তবে জায়েয হবে। যদি সন্তান, স্ত্রী বা পিতা মাতার কাছ থেকে কেনে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে জায়েয হবে না, শিষ্যদ্বয়ের মতে জায়েয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা : যদি বলে, আমি তোমার কাছে যা পাব তার বিনিময়ে এক কুরুর গমে বায়উস সালাম কর, তবে সুনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির কথা বললে, তিন ইমামেরও নিকট উকীল নিযুক্ত জায়েয হবে আর কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে না দিলে শিষ্যদ্বয়ের মতে তখনও জায়েয হবে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উকীল নিযুক্তি জায়েয হবে না (আল ইয়ানাবী)।

২২. মাসআলা : উকীল যদি মক্কেলের কথা মত বায়উস সালামের চুক্তিতে কাউকে দিরহাম প্রদান করে, কিন্তু বিক্রেতা যে দিরহাম বুঝে পেল সে মর্মে কোন সাক্ষী না রাখে, তারপর বিক্রেতা কিছু নিকৃষ্টমানের দিরহাম ফেরত দেওয়ার জন্য নিয়ে আসে এবং বলে, এগুলোকে ভেজাল পেয়েছি, তবে তার কথা গৃহীত হবে। যদি দিরহাম উসুল হওয়া সম্পর্কে সাক্ষী রেখে থাকে, তবে বিক্রেতার এ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না যে, সে দিরহামগুলো ভেজাল পেয়েছে। এমনভাবে যদি বিক্রেতা প্রথমে স্বীকার করে যে, সে উৎকৃষ্ট দিরহাম বা তার প্রাপ্য কিংবা রাসুল মাল বুঝে পেয়েছে, তবে এরপরে ভেজাল বলে দাবি করলে সেটা পরস্পর বিরোধী দাবি হবে। সুতরাং তার সে দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তার প্রমাণও গৃহীত হবে না। আর এ অবস্থায় তার প্রতিপক্ষের উপর কসমও আরোপিত হবে না। যদি সে দিরহাম উসুলের কথা স্বীকার করে থাকে, তবে দিরহাম বলতে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সব রকমের দিরহামকেই বুঝায়। কাজেই পরে যদি বলে, আমি তা নিকৃষ্টমানের পেয়েছি, তবে সেটা পরস্পর বিরোধী কথা হবে না (আল-মাবসূত)।

২৩. মাসআলা : তুলার ক্ষেত্রে সালাম চুক্তি হলে তার স্থলে 'অশোধিত' তুলা দেওয়া যাবে না, সাধারণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন দেয়া যায় না। আমাদেরকালের ফুকাহায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত।

২৪. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বিশ্র (র) 'আল ইসলা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে এক কুরুর গমের ভেতর একটি গোলামের বিনিময়ে সালামের চুক্তি করল এবং গোলামটি তাকে সমর্পণ করল। মুসলাম-ইলায়হি সে গোলাম কারও কাছে বিক্রি করে ফেলল, এবং ক্রেতার হাতে তাকে সমর্পণ করল। তারপর ক্রেতা সে গোলামের ভেতর কোন দোষ পেয়ে কাযীর ফায়সালা ছাড়াই তাকে গোলামের বিক্রেতার কাছে ফেরত দিল। তারপর রাক্বুস-সালাম চাইল যে, মুসলাম-ইলায়হির সঙ্গে চুক্তি রহিত করবে। এখন সে যদি মুসলাম-ইলায়হিকে বলে, আমার গোলাম আমাকে ফেরত দাও, আমি তোমাকে

মুসলাম-ফীহি আদায়ের দায়িত্ব হতে মুক্তি দিলাম, অথবা বলে, গোলামের বিনিময়ে আমি তোমাকে মুসলাম-ফীহি আদায়ের দায়িত্ব হতে মুক্তি দিলাম কিংবা বলে, গোলামটির বিনিময়ে তুমি আমার সঙ্গে চুক্তি রহিত কর, তবে এ সবই বাতিল। যদি বলে, আমার সঙ্গে রহিত কর আর গোলামের কথা উল্লেখ না করে অথবা বিক্রেতা বলে, আমাকে মুসলাম-ফীহি আদায়ের দায়িত্ব হতে মুক্তি দাও এবং তোমার রাসুল মাল গ্রহণ কর, গোলামের কথা কিছুই না বলে, তবে এর দ্বারা বায়উস সালাম রহিত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় রাক্বুস-সালাম তার গোলামের মূল্য ফেরত পাবে (আল-মুহীত)।

২৫. মাসআলা : কেউ যদি কারও কাছে একটি কাপড়ের বিনিময়ে গোলাম বিক্রি করে আর কাপড়টির গুণ ও মান নির্দিষ্ট করে দেয়, যা সে পরে আদায় করবে, তবে এটা দু'রকম হতে পারে। হয়ত কাপড় পরিশোধের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হবে অথবা নির্দিষ্ট করা হবে না। নির্দিষ্ট না করা হলে বিক্রি জায়েয হবে না এবং নির্দিষ্ট করা হলে জায়েয হবে। যদি কবজার আগে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তাতে চুক্তি বাতিল হবে না (আল-ওয়াকিআতুল হুসামিয়া)।

২৬. মাসআলা : রাক্বুস-সালাম যদি বিনিময় মূল্য বাড়িয়ে দেয়, তবে সেটা নগদ হলে জায়েয হবে বাকি হলে জায়েয হবে না। যদি তা মজলিসে নগদ পরিশোধ হয়, তবে সে অতিরিক্ত যোগ জায়েয হবে। যদি তা কবজার আগে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে মুসলাম-ফীহি হতে সে অতিরিক্ত পরিমাণ বিনিময় মূল্যের বদলে যা আসে তা বাদ যাবে। যদি বিক্রেতা মালের ভেতর বৃদ্ধি করে, তবে লক্ষ্য করতে হবে বিনিময় মূল্য কি এমন বস্তু, যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয়, নাকি নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয় না— এমন বস্তু। যদি নির্দিষ্ট বস্তু হয়, এবং তা বিক্রেতার হাতে বাকি থাকে, তবে বিক্রেতা কর্তৃক নগদ বা মেয়াদে বৃদ্ধিকরণ জায়েয হবে। আর সালাম মূল্য যদি অনির্দিষ্টতা গুণ সম্পন্ন বস্তু হয় তাহলে বিক্রেতা কি জাতীয় দ্রব্য বৃদ্ধি করেছে তা দেখতে হবে। যদি নির্দিষ্টতাগুণ সম্পন্ন বস্তু বৃদ্ধি করে, তবে সে বৃদ্ধিকরণ নগদ ও বাকি উভয় অবস্থায় জায়েয। আর যদি অনির্দিষ্টতাগুণ সম্পন্ন বস্তু হয়, যেমন দিরহাম ও দীনার (টাকা-পয়সা), তবে সে বর্ধিত অংশ মজলিসের ভেতর কবজা করা শর্ত (মুহীত : আস-সারাখসী)।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ : ঋণদান ও গ্রহণ এবং অর্জারে মাল তৈরি প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : মিছলী দ্রব্য (যে সব দ্রব্যের অনুরূপ দ্রব্য আরও পাওয়া যায়) যেমন কয়লা, ওজনী ও অল্প ব্যবধানের গুণতি দ্রব্য, এর ক্ষেত্রে ঋণ জায়েয। যে সব দ্রব্য মিছলী নয়, তাতে ঋণ জায়েয নয়, জীব-জন্তু, বস্ত্র ও বেশী ব্যবধানের গুণতি দ্রব্য। অবৈধ ঋণের মাধ্যমে কবজাকৃত মালে কবজাকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা অবৈধ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ঋণদাতা অজ্ঞাত বদলের বিনিময়ে কবজাকারীকে মালের মালিক বানিয়ে দেয়। বদল অজ্ঞাত থাকায় সে মালিকানা ফাসিদ হয়ে যায়। ফাসিদ বেচাকেনায় কবজা দ্বারা যেমন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, এ মালিকানা ঠিক সেই রকমের। সুতরাং ফাসিদ ঋণের মাধ্যমে কবজাকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে ঠিক সেই জিনিসটিই ফেরত দেওয়া কর্তব্য। পক্ষান্তরে বৈধ ঋণের ক্ষেত্রে কবজাকৃত বস্তুটি ঋণগ্রহীতার হাতে সংরক্ষিত থাকলেও ঠিক সেটাই ফেরত দেওয়া আবশ্যিক নয়; বরং তার ইখতিয়ার থাকে— চাইলে সেটাই ফেরত দেবে অথবা তার অনুরূপ বস্তু ফেরত দেবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।
২. মাসআলা : যে সব ক্ষেত্রে ঋণ বৈধ হয় না, তাতে কবজাকৃত বস্তুর ব্যবহার জায়েয নয়, কিন্তু তা বিক্রি করা জায়েয (আল-ফুসুলুল-ইমাদিয়া)।
৩. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে রুটি ওজনে কর্জ গ্রহণ জায়েয, গুণতি হিসেবে নয়। এরই উপর ফাতওয়া (আল-কাফী, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, আয-যাহীরিয়া)।
৪. মাসআলা : হিশাম (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, গম ও আটা ওজনে কর্জ করার কোন প্রয়োজন ও বৈধতা নেই। এমনভাবে খেজুরও, এমনকি যেখানে এগুলো ওজনে লেনদেন হয়, সেখানে নয় (আল-মুহীত)।
৫. মাসআলা : 'আল-আসল' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যদি ওজনে আটা কর্জ করে, তবে তা ওজনে ফেরত দেবে না, বরং তারা মূল্যের বিনিময়ে আপোষ করবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে এক বর্ণনায় আছে যে, জনগণের মধ্যে রেওয়াজ থাকলে ইস্তিহাসের দৃষ্টিতে ওজনে তার কর্জ জায়েয হবে। এরই উপর ফাতওয়া (আল-গিয়াছিয়া)।
৬. মাসআলা : জ্বালানি কাঠ, গৃহ নির্মাণের কাঠ, বাঁশ এবং কোন রকমের তাজা সুগন্ধি মসলা কর্জে আনা জায়েয নয়। মেহেদি, ওয়াসমার ও শুকনা মসলা, যা কয়াল হিসেবে লেনদেন হয়, এসব কর্জ করলে দোষ নেই (আল-ফুসুলুল-ইমাদিয়া)।
৭. মাসআলা : গুণতি হিসেবে কাগজ ধার করা জায়েয আছে (আল-খুলাসা)।

৮. মাসআলা : কয়াল হিসেবে আখট্রোট এবং গুণতি হিসেবে বেগুন ধার করা জায়েয (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : 'আল-ফাতাওয়াল-আজাবিয়া' গ্রন্থে ইবন সাল্লাম (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কাঁচা ও পাকা ইট, যদি মাপে প্রভেদ না থাকে, তবে গুণতি হিসেবে ধার করা জায়েয (আত-তাতার খানিয়া)।

১০. মাসআলা : গোশত ধার করা জায়েয। এটাই বিদ্বতের মত (মুহীত : আস-সারাখসী)।

১১. মাসআলা : গোশত যদি ওজনে হিসেবে কর্জ করে, তবে জায়েয হবে (আস-সুগরা)।

১২. মাসআলা : আমাদের দেশে ওজনে ঝামীর ধার করা জায়েয। এটাই গ্রহণযোগ্য মত (মুখতারুল-ফাতাওয়া)।

১৩. মাসআলা : জাফরান ওজনে ধার করা জায়েয, কয়াল হিসেবে জায়েয নয় (আত-তাতার খানিয়া)।

১৪. মাসআলা : ওজনে বরফ ধার করা জায়েয। যদি গ্রীষ্মকালে বরফ ধার করে এবং শীতকালে পরিশোধ করে, তবে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। বরফ মিছলী দ্রব্য নয়। যদি বরফের মালিক বলে, আমি এ বছর তোমার কাছ থেকে ফেরত নেব না। আবু বকর আল-ইসকাফ (র) বলেন, এ ব্যাপারে এ ছাড়া কোন কৌশল আমার জানা নেই যে, ধারণহীতা সম-ওজনের বরফ ধারদাতার বরফ পায়ে ফেল দেবে। এতেই সে দায় মুক্ত হয়ে যাবে। কাযী ইমাম ফাখরুদ্দীন (র) বলেন, আমার মতে উপায় এটাই যে, সে বিষয়টা কাযীর আদালতে উত্থাপন করবে, যাতে কাযী সমপরিমাণ বরফ গ্রহণে তাকে বাধ্য করে, যেমন কেউ যদি কারও কাছ থেকে ধারে গম আনে তারপর তার বাজার দর হ্রাস পায় এবং তখন সে সমপরিমাণ গম পরিশোধ করে, তখন কর্জদাতাকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় (মুখতারুল-ফাতাওয়া)।

১৫. মাসআলা : সোনা-রূপা ওজনে ধার করা জায়েয, গুণতি হিসেবে জায়েয নয় (আত-তাতার খানিয়া)।

১৬. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আল-জামিউস-সাগীর' গ্রন্থে বলেন, যদি দিরহামের এক-তৃতীয়াংশ রূপা ও দুই-তৃতীয়াংশ তামা হয় এবং কোন ব্যক্তি তা গুণতি হিসেবে ঋণ নেয়, আর অঞ্চলে গুণতি হিসেবে তার প্রচলন থাকে, তবে তাতে দোষ নেই। মানুষের মধ্যে তার প্রচলন যদি কেবল ওজনেই থাকে, তবে ওজনেই ধার করা জায়েয হবে, অন্য কোনভাবে নয়। যদি দিরহামের দুই-তৃতীয়াংশ রূপা ও এক-তৃতীয়াংশ তামা হয়, তবে ওজনে ছাড়া অন্য কোনভাবে তার কর্জ জায়েয নয়, যদিও মানুষের মধ্যে গুণতি হিসেবে তার লেনদেন চালু থাকে। যদি দিরহামের অর্ধেক রূপা এবং অর্ধেক তামা হয়, তখন তার কর্জ কেবল ওজনেই জায়েয (আল-মুহীত)।

১৭. মাসআলা : যে গোবর বেচাকেনা জায়েয, সে সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, তা ধার করা কি জায়েয, নাকি তা মিছলী দ্রব্য নয়? তিনি বললেন, এ জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে যা বিক্রি জায়েয, তাতে কর্জও জায়েয।

হুসামুদ্দীন (র)-এর 'ওয়াকিআত' গ্রন্থে আছে, গোবর মিছলী নয়। কেউ তা নষ্ট করলে তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হয়। এ হিসেবে এর কর্জ জায়েয নয়।

'আত-তাজরীদ' গ্রন্থে আছে, যদি মেয়াদ ধার্য করে ঋণ দেয় অথবা ঋণ দানের পর মেয়াদ ধার্য করে, তবে সে মেয়াদ বাতিল। সুতরাং ঋণের মাল নগদই পরিশোধ্য। পক্ষান্তরে যদি মৃত ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে কাউকে এক মাসের মেয়াদে ঋণ দেওয়ার ওসীয়াত করে যায়, তবে সে মেয়াদ অবধারিত হয়ে যাবে (আত-তাজার খানিয়া)।

১৮. মাসআলা : ধারগ্রহীতাকে পরিশোধের মেয়াদ ধারের মাল নিঃশেষ করে ফেলার পর ঠিক করে দেওয়া হোক বা তার আগে একই কথা। এটাই সঠিক (ফাতহুল-কাদীর)।

১৯. মাসআলা : ঋণের মেয়াদ অবধারিত হওয়ার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে যে, ঋণ গ্রহীতা তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব কারও উপর (হাওয়ালা) ন্যস্ত করবে আর ঋণদাতা সেই হাওয়ালা গ্রহণকারী ব্যক্তিকে সময় দান করবে। এ ক্ষেত্রে প্রদত্ত সময়টা ঋণদাতার পক্ষে অবধারিত হয়ে যাবে (আল-বাহরুর রাইক)।

২০. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আস-সারফ' অধ্যায়ে বলেন, যে সব ঋণে প্রকারের উপকার অর্জিত হয়, ইমাম আবু হানীফা (র) তাকে মাকরুহ মনে করতেন। ইমাম কারখী (র) বলেন, এটা সেই ক্ষেত্রে যখন সে উপকার লাভের বিষয়টাকে ঋণদানের সময় শর্ত করে দেওয়া হয়, যেমন কাউকে এই শর্তে শস্য কর্জ দিল যে, সে তাকে আরও ভাল শস্য ফেরত দেবে বা এ জাতীয় অন্য কোন আরোপ করল। পক্ষান্তরে সে লাভের বিষয়টা যদি চুক্তিতে শর্তযুক্ত করে দেওয়া না হয়। বরং ঋণগ্রহীতা নিজের পক্ষ থেকেও আরও ভাল মাল পরিশোধ করে, তবে তাতে কোন দোষ নেই। এমনিভাবে যদি কাউকে এই শর্তে দিরহাম বা দীনার ঋণ দেয় যে, ঋণ গ্রহীতা তার কাছ থেকে চড়া দামে কোন মাল কিনবে, তবে সেটা মাকরুহ। যদি মাল কেনা বিষয়টা ঋণ দানের সময় শর্তযুক্ত করা না হয়, বরং ঋণগ্রহীতা ঋণ নেওয়ার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কাছ থেকে উচ্চমূল্যে কোন মাল কেনে তবে ইমাম কারখী (র)-এর মতানুসারে তাতে কোন দোষ নেই।

ইমাম খাস্সাফ (র) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ঋণদাতার পক্ষে আমার মতে সেটা পসন্দনীয় নয়।

শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) বলেন, এটা হারাম। ইমাম মুহাম্মাদ (র) 'আস-সারফ' অধ্যায়ে বলেন, পূর্ববর্তী মনীষিগণ এটা মাকরুহ মনে করতেন। কিন্তু খাস্সাফ (র) মাকরুহ হওয়ার বিষয়টা উল্লেখ করেন নি। তিনি কেবল এতটুকুই বলেছেন যে, আমার মতে সেটা পসন্দনীয় নয়। এটা মাকরুহের কাছাকাছি সমান নয়, একটু নিচে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) এটাকে কোন দোষ মনে করেন নি। কেননা তিনি 'আস-সারফ' অধ্যায়ে বলেন, ঋণগ্রহীতা

যদি ঋণদাতাকে কোন কিছু উপহার দেয় তাতে দোষ নেই। তিনি এটা বলেছেন শর্ত থাকা ও না থাকার পার্থক্য ছাড়াই। এটা প্রমাণ করে যে, তিনি পূর্ববর্তী মনীষীদের মত পরিত্যাগ করেছেন।

শায়খুল ইসলাম খাহারযাদে (র) বলেন, পূর্ববর্তী মনীষিগণ থেকে যা বর্ণিত আছে, তা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন লাভের বিষয়টা চুক্তিতে শর্ত থাকে এবং ঋণদাতার কাছ থেকে গ্রহীতার ক্রয়টা হয় চড়া দামে। আর এটা যে মাকরুহ সে সম্পর্কে কোনরূপ মতভেদ নেই। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র) যা বলেছেন, তা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন উপকার বা উপহারের বিষয়টা চুক্তিতে শর্তযুক্ত থাকে না এবং সেটা মাকরুহ নয় আর এ সম্পর্কেও কোন মতভেদ নেই।

উপরিস্তি মাসআলা সেই ঋণের সাথে সম্পৃক্ত, যা বিক্রির পূর্বে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি আগে বিক্রি ও পরে ঋণের লেনদেন হয়, যেমন এক ব্যক্তির অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে একশ' দীনারের লেনদেন করতে চাইল। সে হিসেবে অপর ব্যক্তি তার কাছে বিশ দীনার মূল্য মানের একটি কাপড় চল্লিশ দীনারে বিক্রি করল, তারপর তাকে ষাট দীনার ঋণ দিল। এভাবে ঋণগ্রহীতার কাছে দাতার এক দীনার পাওনা সাব্যস্ত হল কিন্তু ঋণগ্রহীতার প্রকৃতপক্ষে হাতে আসল আশি দীনার, তা এ সম্পর্কে ইমাম খাস্সাফ (র) বলেন যে, এটা জায়েয এবং এটাই বালাখের ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র)-এর মত। কেননা তিনি বর্ণনা করেন যে, তার কিছু পণ্য ছিল। কেউ যখন তার কাছে ঋণ চাইত তিনি প্রথমে তার কাছে উচ্চ মূল্যে সে পণ্য বিক্রি করতেন, তারপর তাকে ঋণ দিয়ে তার প্রার্থিত ঋণের অংক পূরণ করতেন। কিন্তু ফুকাহায়ে কিরামের অনেকেই এটাকে মাকরুহ মনে করতেন। তারা বলতেন, এটা এমনই এক ঋণ, যা স্বার্থ সিদ্ধ করে (এবং এরূপ ঋণ সুদের শামিল)। কোন কোন ফকীহের মতে উভয়টা একই মজলিসে হলে মাকরুহ হবে আর তিন তিন দুই মজলিসে হলে মাকরুহ হবে না।

শামসুল আইম্মা আল-হালাওয়ানী (র) ইমাম খাস্সাফ (র)-এর মত অনুসারে ফাতওয়া দিতেন, যা কিনা মুহাম্মাদ ইবন সালামা (র)-এরও অভিমত (আল-মুহীত)।

২১. মাসআলা : যার কাছে পাওনা থাকে, তার হাদিয়া (উপহার) গ্রহণে দোষ নেই। যদি জানা যায় যে, ঋণের কারণেই সে তাকে হাদিয়া দিচ্ছে, তবে সে ঋণ গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। যদি জানা থাকে, সে তা ঋণের কারণে দিচ্ছে না, বরং আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের কারণে দিচ্ছে, তবে তা পরিহার করে চলার প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে ঋণগ্রহীতা যদি দান-খয়রাতে খ্যাত হয়, তখনও তার হাদিয়া গ্রহণে কোন রকমের অসুবিধা নেই (মুহীত : আস-সারখসী)।

২২. মাসআলা : উপরে বর্ণিত কোন অবস্থা পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায়। কাজেই যতক্ষণ স্পষ্ট না হবে যে, সে ঋণের কারণে তা দিচ্ছে না, ততক্ষণ তা থেকে বেঁচে থাকাই শ্রেয়।

ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যার কাছে পাওনা আছে, তার দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) গ্রহণ করলে দোষ নেই। শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, এটা হচ্ছে কানুনী রায়। কিন্তু তাকওয়ার দৃষ্টিতে এরূপ দাওয়াত গ্রহণ না করাই উত্তম, যে সম্পর্কে জানা থাকে যে, সে ঋণের কারণেই তা দিচ্ছে বা বিষয়টা পরিষ্কার না থাকে।

শামসুল আইম্মা (র) বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ (র) যা বলেছেন, তা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন ঋণ দানের পূর্বেও সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাকে দাওয়াত করার প্রচলন থাকে। পক্ষান্তরে যদি এমন হয় যে, ঋণ দেওয়ার আগে সে তাকে দাওয়াতই দিত না, কিংবা দিলেও তা প্রতি বিশ দিনে একবার দিত, কিন্তু ঋণ দেওয়ার দশ দিন পর পর দাওয়াত দিচ্ছে অথবা আতিথেয়তার উপকরণ বৃদ্ধি করেছে, তবে তা হালাল হবে না, বরং হারাম হয়ে যাবে। ঋণ যদি গ্রহীত মাল অপেক্ষা উত্তম মাল দ্বারা পরিশোধ করা হয় আর কর্ত্তের সময় তার শর্ত না থাকে, তবে তাতে কোন দোষ নেই (আল-মুহীত)।

২৩. মাসআলা : এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তির কিছু দিরহাম পাওনা আছে। এখন পাওনাদার যদি কোনওভাবে সেই ব্যক্তির দিরহাম পেয়ে যায় এবং সে দিরহাম তার প্রাপ্য দিরহাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হয়, সেই সঙ্গে পাওনা পরিশোধের জন্য কোন মেয়াদও ধার্য করা না থাকে, তবে পাওনাদার সে দিরহামগুলো কবজা করতে পারবে। যদি কোনওভাবে তার দীনার পায়, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী তা কবজা করতে পারবে না। এটাই সहीহ।

২৪. মাসআলা : ঋণগ্রহীতা যদি তার ঋণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাল পরিশোধ করে, তবে পাওনাদারকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না, যেমন তদপেক্ষা নিকৃষ্ট মাল পরিশোধ করলেও বাধ্য করা যায় না। আর যদি গ্রহণ করে নেয়, তবে জায়েয হবে। যেমন অন্য জাতীয় মাল দিলে তাও গ্রহণ করা জায়েয হয়। এটাই সঠিক।

ঋণ পরিশোধের জন্য যদি মেয়াদ ধার্য থাকে এবং মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই তা পরিশোধ করে, তবে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে।

ঋণগ্রহীতা যদি ঋণের চেয়ে ওজনে বেশী মাল পরিশোধ করে এবং সে বেশীটুকু এই পরিমাণের ভেতর হয় যে, দুবারের মাপে ততটুকু পরিমাণ পার্থক্য হয়ে যায়, তবে তা জায়েয হবে। ফুকাহায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, একশ' দিরহামের ভেতর এক দানিক পরিমাণ পার্থক্য দুবারের মাপে হতেই পারে। আর এক-দুই দিরহাম পরিমাণ পার্থক্য হলে সেটা অতি বেশী সাব্যস্ত হবে, যা দুবারের মাপের কারণে সাধারণত ঘটে না। কাজেই এ পরিমাণ বেশী জায়েযও হবে না। আধা দিরহামের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। আবু নাসর আদ-দাবুসী (র) বলেন, একশ' দিরহামের ভেতর এক দিরহাম পরিমাণ বেশী হলে, সেটা অতি বেশী হয়ে যায়, কাজেই তা ঋণ গ্রহীতাকে ফেরত দিতে হবে। বেশীটা যদি এই পরিমাণ হয়, যা দুইবারের মাপে সাধারণত ঘটে না আর সে বেশীটা সম্পর্কে পরিশোধকারী জ্ঞাত না থাকে, তবে তাকে তা ফেরত দিতে হবে। পরিশোধকারীর যদি তা জানা থাকে এবং জেনেও নেই ইচ্ছাকৃতভাবে সে বেশীটা সে দিয়ে থাকে, তবে গ্রহণকারীর জন্য কি তা বৈধ হবে? যদি পরিশোধকৃত দিরহাম রেজগি হয় কিংবা আস্ত হলেও তা ভাগ্যে কোন ক্ষতি না হয়, তবে দাতা ও গ্রহীতা জ্ঞাত থাকা অবস্থায় সে বেশীটা জায়েয হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা : যদি দিরহামগুলো আস্ত হয় এবং ভাগ্যে ক্ষতি হয়, তবে লক্ষ্য করতে হবে দিরহাম ছাড়া সে অতিরিক্ত পরিমাণ পৃথক করা সম্ভব কিনা, যদি সম্ভব হয়, যেমন তার

মধ্যে একটি হালকা ওজনের দিরহাম আছে, যা অতিরিক্ত পরিমাণের সমান, তবে কবজাকারীর জন্য তা বৈধ হবে না। আর যদি সে অতিরিক্ত পরিমাণ এমন হয় যে, দিরহাম ভাগ্যে ছাড়া পৃথক করা সম্ভব হয় না, তবে কবজাকারীর জন্য হিবাস্বরূপ তা জায়েয হবে। যদি এই শর্তে কুফায় বসে দেয় যে, সে তা বসরায় পরিশোধ করবে, তবে তা জায়েয হবে না (আল-মুহীত)।

২৬. মাসআলা : সুফতাজা (হন্ডি) মাকরুহ, তবে যদি নিঃশর্তভাবে ঋণ গ্রহণ করে এবং বিনা শর্তে তা অন্য শহরে পরিশোধ করে, তবে জায়েয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৭. মাসআলা : 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে ইবরাহীম (র) ইমাম মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কাউকে বলে, তুমি আমাকে এই শর্তে এক হাজার টাকা ঋণ দাও যে, আমি তোমাকে আমার এই জমিটা চাষাবাদ করতে দেব। যদি তুমি তোমার টাকা আমার হাতে থাকবে ততদিন তুমি জমি ভোগ করবে, তারপর ঋণদাতা সে জমি চাষাবাদ করে, তবে তাকে কিছুই সাদাকা করতে হবে না। কিন্তু তার জন্য আমি এটা মাকরুহ মনে করি (আল-মুহীত)।

২৮. মাসআলা : যদি তাম্র মুদ্রা বা উদালী মুদ্রা ঋণ নেয়, তারপর তা অচল হয়ে যায়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অনুরূপ অচল মুদ্রা পরিশোধ করবে, তাকে তার প্রকৃত মূল্যের দায় বহন করতে হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তাকে তার কবজার দিনের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সেই দিনের বাজার মূল্য পরিশোধ করতে হবে, যেদিন পর্যন্ত তা চালু ছিল। এরই উপর ফাতওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৯. মাসআলা : আমাদের যুগের কোন কোন মুফতী ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে ফাতওয়া দেন। আমাদের যুগ হিসেবে এটাই বেশী সঠিক মনে হয় (আল-মুহীত)।

৩০. মাসআলা : এক ব্যক্তি বুখারায় বসে বুখারী দিরহাম ঋণ দিল। পর ঋণ গ্রহীতার সঙ্গে তার এমন এক শহরে সাক্ষাত হল, যেখানে বসে একরূপ দিরহাম পরিশোধ করতে সে সক্ষম নয়। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তাকে বুখারায় আসা-যাওয়ার সময় দেওয়া হবে এবং গ্যারান্টিস্বরূপ তার পক্ষ হতে কোন কাফীল (জামিন) রাখা হবে। পাওনাদার তার কাছ থেকে বুখারী দিরহামের মূল্য আদায় করতে পারবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতও এটাই। কেউ বলেন, এ মাসআলা সেই ক্ষেত্রে, যখন সেই শহরে বুখারী দিরহামের প্রচলন থাকে, কিন্তু সেখানে তা পাওয়া যাচ্ছে না। তখন তাকে আসা-যাওয়ার সময় দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে সেই শহরে যদি বুখারী দিরহাম নাই চলে, তখন তার কাছ থেকে সে দিরহামের মূল্যই আদায় করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩১. মাসআলা : কোন খৃস্টান যদি অপর খৃস্টানকে মদ কর্ত্ত দেয়, তারপর কর্ত্তদাতা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে মদের পাওনা বাতিল হয়ে যাবে। যদি কর্ত্তগ্রহীতা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তখনও পাওনা বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর থেকে অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এটাই ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মত (আল-বাহরুর রাইক, বিবিধ অধ্যায়)।

৩২. মাসআলা : কোন ওজনী বা কয়ালি দ্রব্য কর্জ করার পর তা যদি মানুষের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে কর্জদাতাকে ফসল পাকা পর্যন্ত সময় দিতে বাধ্য করা হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। এটাই গ্রহণযোগ্য এবং এরই উপর ফাতওয়া (মুখতারুল ফাতাওয়া)।

৩৩. মাসআলা : কারও কাছে যদি কারও উৎকৃষ্ট দিরহাম পাওনা থাকে এবং তার কাছ থেকে সে নিকট বা খাদযুক্ত কিংবা জাল দিরহাম গ্রহণ করে এবং তাতে সে রাযী থাকে, তবে তা জায়েয হবে। সে যদি তা খরচ করে, তবে মাকরুহ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, নিকটমানের বা খাদযুক্ত দিরহাম কর্জ নেওয়া মাকরুহ। এরূপ দিরহাম কর্জ নিলে পরিশোধও এরূপ দিরহামই করতে হবে। যদি অচল হয়ে যায়, তবে মূল্য পরিশোধ করবে।

৩৪. মাসআলা : কেউ যদি এমন কোন শহরে কারও কাছ থেকে খাদ্য শস্য কর্জ করে, যেখানে খাদ্যের দাম সস্তা, তারপর কর্জদাতা এমন এর শহরে তার সঙ্গে মিলিত হয়, সেখানে খাদ্যের দাম খুব বেশী। পাওনাদার তাকে পাওনা পরিশোধের জন্য পাকড়াও করল। এখন সে কি তাকে আটক রাখতে পারবে? না, তাকে আটক রাখতে পারবে না, বরং কর্জগ্রহীতাকে আদেশ করা হবে, সে যেই শহরে কর্জ গ্রহণ করেছিল, সেখানে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত সময়ের জন্য যেন গ্যারান্টির ব্যবস্থা করে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে এক হাজার দিরহাম ঋণ দিল। গ্রহীতা তা কবজাও করল। তারপর ঋণদাতা গ্রহীতাকে বলল, তোমার কাছে আমি যে দিরহাম পাব তা দীনারের বিনিময়ে বিক্রি কর অর্থাৎ বায়উস-সারফ (Barter) কর। এখন সে যদি কোন লোক নির্দিষ্ট করে বলে যে, অমুকের সাথে বায়উস-সারফ কর, তবে তিনও ইমামের মতে জায়েয হবে। যদি কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে না দেয় এবং সে মতে সে বায়উস সারফ করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নিকট কর্জদাতার পক্ষে তা জায়েয হবে না। শিষ্যদ্বয়ের মতে জায়েয হবে। ঋণদাতা যদি গ্রাহকের কাছ থেকে দিরহামের বদলে দীনার গ্রহণ করতে চায় এবং গ্রাহক তা স্বেচ্ছায় প্রদান করে, তবে তা জায়েয হবে। তিনও ইমাম এ ব্যাপারে একমত (আল-মুহীত)।

৩৬. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে, যা তার কাছ থেকে সেই ব্যক্তি ঋণ নিয়েছিল। এখন সে যদি ঋণের মেয়াদের সাথে একশ' দিরহামের বদলে তার সঙ্গে আপোষ করে, তবে তার সে ছেড়ে দেওয়াটা বৈধ হবে। কিন্তু ঋণ গ্রহীতাকে একশ' দিরহাম নগদই পরিশোধ করতে হবে। ঋণগ্রহীতা যদি ঋণের কথা অস্বীকার করে থাকে, তবে একশ' দিরহাম মেয়াদ শেষেও পরিশোধ করতে পারবে।

৩৭. মাসআলা : কেউ যদি কাউকে এক কুরর গম কর্জ দেয়, তারপর কর্জগ্রহীতা সে গম তার কাছ থেকে দিরহামের বিনিময়ে কিনে নেয়, তবে তা জায়েয হবে, তাতে কর্জের গম তার হাতে বাকি থাকুক বা নাই থাকুক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৮. মাসআলা : উপরিক্ত ক্রয় যখন জায়েয হল, তো এখন চুক্তির মজলিসে যদি দিরহাম পরিশোধ করে, তবে সে ক্রয় বৈধ হিসেবে কার্যকর থাকবে। আর মজলিসে পরিশোধ না করলে বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কর্জ দাতার কাছে যদি কর্জ গ্রহীতার এক কুরর গম পাওনা সাব্যস্ত হয়, তারপর তাদের প্রত্যেকে অপরের কাছে যা পাবে তার বদলে নিজের পাওনাটা তার কাছে বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে, যদিও তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি মজলিসের ভেতর দিরহাম পরিশোধ করে এবং তারপর গমের ভেতর কোন দোষ দেখতে পায়, তবে তা ফেরত দিতে পারবে না। বরং যা কবজা করেছে সেটাই তার জন্য অবধারিত হয়ে যাবে, হাঁ দোষের কারণে যে পরিমাণ দাম কম হবে, তা সে প্রদত্ত মূল্য থেকে ফেরত নিতে পারবে। যদি কর্জের গম গ্রহীতার কাছে নিঃশেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তখনও সকলের নিকট মাসআলা একই রকম হবে। দিরহাম-দীনার ও অন্যান্য ধাতব মুদ্রা ছাড়া যে কোনও কয়ালি ও ওজনী দ্রব্য কর্জ হিসেবে থাকলে সে ক্ষেত্রে একই মাসআলা প্রযোজ্য (আল-মুহীত)।

৩৯. মাসআলা : কর্জগ্রহীতা যদি তার কাছে পাওনা গম অনুরূপ গমের বদলে কিনে নেয়, তবে সুনির্দিষ্ট গমের বিনিময়ে হলে জায়েয হবে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট না হলে জায়েয হবে না। অবশ্য কর্জদাতা যদি তা মজলিসেই কবজা করে নেয়, তবে জায়েয হয়ে যাবে। কর্জের গমে যদি কোন দোষ পায়, তবে তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারবে না (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪০. মাসআলা : যদি এক কুরর খাদ্য শস্য কর্জ দেয় এবং কর্জ গ্রহীতা তা কবজা করে, তারপর সে হুবহু সেই গম কর্জদাতার কাছ থেকে কিনে নেয়, তবে সে বেচাকেনা বাতিল। এর দ্বারা ঋণ বাতিল হয়ে যাবে না। পক্ষান্তরে কর্জগ্রহীতা যদি কর্জের গম কর্জদাতার কাছে বিক্রি করে, তবে তা জায়েয হবে (খাযানাতুল আকমাল)।

৪১. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তি এই কথার উপর একশ' দিরহাম ঋণ দিল যে, সেটা উৎকৃষ্ট দিরহাম। ঋণ গ্রহীতা তা কবজা করল। এখন সে যদি দশ দীনারের বিনিময়ে তা ঋণদাতার কাছ থেকে ক্রয় করে, তবে তা জায়েয হবে। এখন সে বিনিময় মূল্য অর্থাৎ দীনার কবজার পূর্বেই যদি তারা মজলিস থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে সে বেচাকেনা (বায়উস সারফ) বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে দীনারগুলো কবজা করে নেয়, তবে বৈধ হিসেবেই সে বিক্রি কার্যকর হবে। ঋণগ্রহীতা যদি কর্জের দিরহামগুলো ভেজাল বা খাদযুক্ত দেখতে পায়, তবে সে তা ফেরত দিতে বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারবে না। যদি দেখে তা সম্পূর্ণ জাল বা সীসামাত্র, তবে ঋণদাতাকে তা ফেরত দেবে। তারপর তারা যদি মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় এবং সে দীনার পরিশোধ করে থাকে আর মজলিসের ভেতরই উৎকৃষ্ট একশ' দিরহাম উসুল করে লয়, তবে চুক্তি বৈধ থাকবে। আর যদি মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তবে বায়উস সারফ বাতিল হয়ে যাবে। এখন ঋণগ্রহীতার এ অধিকার থাকবে যে, সে তার দীনার ফেরত চেয়ে নেবে (আল-মুহীত)।

৪২. মাসআলা : ঋণগ্রহীতার কাছে দাতার পাওনা যদি দীনার বা অন্য কোন ধাতব মুদ্রা হয়ে থাকে এবং দিরহামের বিনিময়ে সে তা কিনে নেয়, তারপর তা খাদযুক্ত নিকটমানের

কিংবা সম্পূর্ণ জাল দেখতে পায়, তবে দীনারের ক্ষেত্রে তো সর্বাবস্থায় দিরহামের ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হবে। আর অপর ধাতব মুদ্রা যদি নিকৃষ্টমানের বা খাদযুক্ত হয় তখনও একই হুকুম। কিন্তু তা যদি সম্পূর্ণ জাল হয় এবং তারা দিরহাম কবজার পরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তবে চুক্তি বৈধই থাকবে (আল-মুহীত)।

৪৩. মাসআলা : 'আল-ফাতাওয়া-খুলাসা' গ্রন্থে আছে, কবজার পূর্বে কর্জের মালে কর্জ গ্রহীতার অধিকার প্রয়োগ বৈধ। এটাই সঠিক (আত-তাতার খানিয়া)।

৪৪. মাসআলা : ব্যবসায়ী গোলাম, মুকাতাব, শিশু ও বোধ-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি কর্তৃক ঋণ দেওয়া জায়েয নয়। কেননা এটা এক প্রকার দান। আর তারা দান করার ক্ষমতা রাখে না। কেউ যদি কোন শিশুকে বা বোধবুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে কিছু ঋণ দেয় আর সে তা নষ্ট করে ফেলে, তবে তার উপর কোন জরিমানা আসবে না। আবু হাফস (র)-এর কপিতে বিধানটি এভাবেই সাধারণভাবে বলা হয়েছে। আবু সুলায়মান (র)-এর কপিতে বলা হয়েছে, এটা ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে শিশু ও বোধ-বুদ্ধিহীন ব্যক্তির উপর তার জরিমানা আসবে। এটাই সঠিক। যদি এমন গোলামকে ঋণ দেয়, যার উপর ব্যবসা করার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আছে, আর সে গোলাম তা নষ্ট করে ফেলে, তবে যতক্ষণ না সে মুক্তি লাভ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে জন্য তাকে ধরা যাবে না। এক্ষেত্রে উপরের বর্ণনার অনুরূপ মতভেদ আছে। যদিও তা কোথাও স্পষ্ট বলা হয় নি। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তাকে নগদই সে পণ্য পাকড়াও করা যাবে, যেমন আমানতের ক্ষেত্রে এমনই বিধান। কর্জদাতা যদি উপরিউক্ত ব্যক্তিদের কাছে তার দেওয়া মালই পেয়ে যায়, তবে তাতে তারই অধিকার থাকবে (আল-মাবসূত)।

৪৫. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, আমাকে অমুকের কাছ থেকে দশ দীনার ঋণ এনে দাও। আদিষ্ট ব্যক্তি ঋণ করল এবং তা কবজাও করল। তারপর সে বলল, আমি তা আদেশদাতার হাতে সমর্পণ করেছি, কিন্তু আদেশদাতা অস্বীকার করল, এরূপ ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তির কাছে পাওনা সাব্যস্ত হবে। আদেশদাতার বিরুদ্ধে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

কেউ যদি কোনও লোককে কারও কাছে পত্রবাহক করে পাঠায় এবং চিঠিতে লেখা থাকে যে, তুমি আমার কাছে দশ দিরহাম পাঠাও, যা আমার কাছে তোমার ঋণ বলে গণ্য হবে। সে মতে পত্রের প্রাপক পত্রবাহকের মাধ্যমে তার কাছে দশ দিরহাম পাঠাল। আবু সুলায়মান (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র) এরূপ ক্ষেত্রে বলেন, যতক্ষণ সে দিরহাম আদেশদাতার হাতে না পৌঁছবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা তার মাল বলে গণ্য হবে না।

কেউ যদি কারও কাছে এই বলে কোন লোক পাঠায় যে, তুমি আমার কাছে ঋণস্বরূপ দশ দিরহাম পাঠাও, তারপর যার কাছে পাঠানো হল, সে তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করত সেই লোক মারফত তার কাছে দশ দিরহাম পাঠায়, সে দিরহামের জন্য আদেশদাতাই যিম্মাদার হবে, যদি সে এ কথা স্বীকার করে থাকে যে, প্রেরিত ব্যক্তি সে দিরহাম কবজা করেছিল (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৬. মাসআলা : যদি কাউকে কারও কাছে পাঠায়, যাতে তার জন্য এক হাজার দিরহাম কর্জ আনে এবং সেই ব্যক্তি তাকে ঋণ দেয়, কিন্তু প্রেরিত ব্যক্তির হাত থেকে তা খোয়া যায়, তবে দেখতে হবে ঋণদাতাকে প্রেরিত ব্যক্তি কী বলেছিল? যদি বলে থাকে, অমুক প্রেরককে ঋণ দাও, তবে সে ঋণ প্রেরকেরই হবে এবং তার উপর তার দায়-ভার বর্তাবে। প্রেরিত ব্যক্তি যদি বলে, অমুক প্রেরকের জন্য আমাকে ঋণ দাও এবং সে মতে সে তাকে ঋণ দেয়, তারপর তার হাতে তা খোয়া যায়, তবে তার দায়-ভার প্রেরিতের উপরই বর্তাবে।

৪৭. মাসআলা : মোদাকথা ঋণ দেওয়ার জন্য উকীল (প্রতিনিধি) নিয়োগ জায়েয, কিন্তু ঋণ গ্রহণের জন্য জায়েয নয়। আর আদেশদাতার জন্য ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাউকে বার্তাবাহকরূপে প্রেরণ করা জায়েয।

ঋণ গ্রহণের জন্য নিয়োগকৃত উকীল যদি ঋণ চাওয়ার বিষয়টাকে বার্তাবাহকের ধারায় পেশ করে, তবে ঋণ আদেশদাতার জন্যই নিষ্পন্ন হবে আর যদি উকীলের ধারায় পেশ করে, যেমন সে ঋণকে নিজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করল, তবে সে নিজেরই জন্য ঋণ গ্রহীতা সাব্যস্ত হবে এবং ঋণ হিসেবে যে দিরহাম সে গ্রহণ করবে তা তারই হবে। সুতরাং সে তা মক্কেলের হাতে সমর্পণ করা হতে বিরতও থাকতে পারে। মক্কেল যদি বন্ধক রাখার জন্য তাকে কোন বস্তু দেয়, তবে উকীল তার নিজের ঋণের বদলে দাতা সাব্যস্ত হবে। সে বন্ধকের জন্য তাকে দায়ী হতে হবে না (আল-ফুসূলুল-ইমাদিয়া)।

৪৮. মাসআলা : এক ব্যক্তি দশ দিরহাম ঋণ চাইল এবং ঋণদাতার কাছ থেকে তা গ্রহণ করার জন্য স্বীয় গোলামকে পাঠাল। তারপর ঋণদাতা বলল, আমি তার কাছে তা দিয়ে দিয়েছি। গোলামও তা স্বীকার করল এবং তারপর বলল, আমি তা আমার মনিবকে বুঝিয়ে দিয়েছি, কিন্তু মনিব গোলাম কর্তৃক দশ দিরহাম কবজা করার কথা অস্বীকার করল। এক্ষেত্রে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং তাকে কিছুই পরিশোধ করতে হবে না। এমনকি ঋণ দাতা গোলামের কাছেও চাইতে পারবে না (আল-বাহরুর রাইক)।

৪৯. মাসআলা : কেউ যদি কারও কাছে এক কুরুর গম কর্জ করে এবং তাকে আদেশ করে, সে যেন তা কর্জগ্রহীতার জমিতে বুনে দেয়, তবে এতে কর্জ সহীহ হয়ে যাবে এবং তার মালিকানাধীন জমিতে পৌঁছার দ্বারা তাতে তার কবজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে (আত-তাতার খানিয়া)।

৫০. মাসআলা : কেউ যদি কারও কাছে দিরহাম কর্জ চায়, সে মতে ঋণদাতা তার কাছে দিরহাম নিয়ে আসে এবং তখন ঋণপ্রার্থী তাকে বলে, এগুলো পানিতে ফেলে দাও, আর সে তা পানিতে ফেলে দেয়। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, ঋণপ্রার্থীর উপর এ জন্য কোন দায়-ভার বর্তাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫১. মাসআলা : যদি এই শর্তে ঋণ দেয় যে, অমুকে কাফীল (জামিন) হবে, তবে তা জায়েয, সে উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত, এমনভাবে সে ব্যক্তি কাফীল হওয়াকে গ্রহণ করুক বা নাই করুক (আল-ফুসূলুল-ইমাদিয়া)।

৫২. মাসআলা : এই ব্যক্তি এই স্বীকারোক্তি দিল যে, আমি অমুকের কাছ থেকে এক হাজার নিকুষ্টমানের দিরহাম বা ভেজাল দিরহাম ঋণ নিয়েছি এবং সে তা খরচ করে ফেলল, কিন্তু ঋণদাতা বলল যে, দিরহামগুলো উৎকৃষ্ট ছিল। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে ঋণগ্রহীতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে যে, তা নিকুষ্টমানের বা ভেজাল ছিল। তবে নিকুষ্টমানের বা ভেজাল হওয়ার কথাটা ঋণ সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির সঙ্গে মিলিয়ে বলতে হবে। যদি পৃথকভাবে বলে, তবে তার কথা গৃহীত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৩. মাসআলা : কেউ যদি কারও কাছ থেকে নির্দিষ্ট এক কুরুর গম কেনে, তারপর বিক্রেতাকে বলে, আমাকে এক কাফীয গম ধার দাও কিংবা বলে, এই এক কাফীয গম ধার দাও এবং তোমার কাছ থেকে আমার কেনা গমের সঙ্গে এটা মিলিয়ে ফেল, সুতরাং সে তাই করে এবং কেনা গমের ভেতর ধারের গম বা ধারের গমের ভেতর কেনা গম ঢেলে দেয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এর ফলে ক্রেতা উভয় গমের কবজাকারী সাব্যস্ত হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে (আল-ফুসুলুল-ইমাদিয়া)।

৫৪. মাসআলা : যে সব বস্তুর ঋণ জায়েয, তা ধার (আরিয়া) করলে তাতে ঋণই হয়, আর যে সব বস্তুর ঋণ জায়েয নয়, তার ধার (আরিয়া) ধারই বটে (মুহীত : আস-সারাকসী)।

৫৫. মাসআলা : এক ব্যক্তির কাছে অপর এক ব্যক্তির এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। সে পাওনাদারকে কিছু দীনার দিয়ে বলল, এগুলো খরচ কর এবং এর থেকে তোমার পাওনা বুঝে নাও। পাওনাদার তা গ্রহণ করল। এখন যদি খরচ করার আগেই তা খোয়া যায়, তবে সেই ব্যক্তির অর্থই খোয়া যাবে, পাওনাদারের নয়। এমনিভাবে যদি তা খরচ করে ফেলে এবং দিরহামও কবজা করে, তারপর তা থেকে স্বীয় প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার আগেই তার হাত থেকে তা খোয়া যায়, তবে তখনও সেই ব্যক্তির অর্থই খোয়া যাবে, যে তা দিয়েছিল। পক্ষান্তরে সে যদি তা থেকে স্বীয় প্রাপ্য বুঝে নেয় এবং তারপর তা খোয়া যায়, তবে সে ক্ষেত্রে গ্রহণকারীর অর্থই খোয়া যাবে। ঋণগ্রহীতা যদি পাওনাদারকে দীনার দিয়ে বলে, তোমার পাওনা পরিশোধ হিসেবে এগুলো গ্রহণ কর আর সে মতে সে তা গ্রহণ করে, তবে সে দীনার তার দায়িত্বে চলে যাবে। সে ব্যক্তি যদি পাওনাদারকে দীনার দিয়ে বলে, তোমার প্রাপ্য উসুলের নিমিত্ত এগুলো বিক্রি করে দাও, আর সে তার পাওনার সমপরিমাণ দিরহামের বিনিময়ে দীনারগুলো বিক্রি করে দেয় এবং তা কবজা করে, তবে এই বিক্রির পর কবজার দ্বারা তার পাওনার ভেতর কবজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৬. মাসআলা : কর্জদাতা যদি গ্রহীতার কাছ থেকে হবহ তার প্রদত্ত গমই গ্রহণ করতে চায়, তবে সে অধিকার তার নেই। কর্জগ্রহীতা তাকে অন্য গমও দিতে পারবে (খাযানাতুল আকমাল)।

৫৭. মাসআলা : বিশজন লোক এসে এক ব্যক্তির কাছ থেকে কর্জ গ্রহণ করল এবং তাকে আদেশ করল, ঋণের টাকাটা যেন তাদেরই এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করে। আর সে মতে এক ব্যক্তির হাতে সে তা অর্পণ করল। এ ক্ষেত্রে তার কাছে সে কেবল তার অংশের ঋণই ফেরত চাইতে পারবে। এর দ্বারা অন্য একটি মাসআলারও সমাধান পাওয়া গেল। তা এই যে, ঋণ

কবজা করার জন্য কাউকে উকীল বানানো যাবে কি? এর দ্বারা বুঝা গেল বানানো যাবে, যদিও ঋণ চাওয়ার জন্য কাউকে উকীল বানানো জায়েয নয় (আল-কিন্যা)।

৫৮. মাসআলা : যে সব বস্তু অর্ডারে তৈরি করানোর (ইস্তিসনা) রেওয়াজ আছে, যেমন টুপি, মোজা, তামার পাত্র ইত্যাদি। এ সব ইস্তিহসান অনুযায়ী ফরমায়েশ (ইস্তিসনা) জায়েয (আল-মুহীত)।

৫৯. মাসআলা : যে সব জিনিসে প্রচলন আছে, তাতেও ইস্তিসনা জায়েয কেবল সেই ক্ষেত্রে, যখন এমনভাবে তার বিবরণ প্রদান করা হয়, যদ্বারা তার সুনির্দিষ্টকরণ হয়ে যায়। যে সব জিনিসে প্রচলন নেই, তাতে ইস্তিসনা জায়েয নয়, যেমন কোন তাঁতিকে অর্ডার দেওয়া যে, সে নিজ সূতা দ্বারা তার জন্য কাপড় বুনে দেবে (আল-জামিউস সাগীর)।

৬০. মাসআলা : রেওয়াজী দ্রব্যে ইস্তিসনার পদ্ধতি এই যে, মোজার ক্ষেত্রে মুচিকে নিজের পা দেখিয়ে বলবে, তুমি এত টাকার বিনিময়ে আমার পায়ের মাপে তোমার পক্ষ হতে চামড়া দিয়ে মোজা বানিয়ে দাও অথবা স্বর্ণকারকে বলবে, তোমার রূপা দিয়ে আমার জন্য এত টাকার বিনিময়ে এই ওজনের ও এই নমুনার একটি আংটি বানিয়ে দাও।

৬১. মাসআলা : এমনিভাবে যদি ভিত্তিওয়ালাকে বলে, আমাকে এক পয়সার পানি দাও বা বৈদ্যকে দিয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিঙ্গা লাগায়, তবে প্রচলন থাকার কারণে তা জায়েয হবে। যদিও কী পরিমাণ পানি পান করবে বা পিঠের কতটুকু স্থানে শিঙ্গা লাগাবে তা জানা না থাকে (আল-কাফী)।

৬২. মাসআলা : ইস্তিসনা (মালের অর্ডার) দ্বারা প্রথমত ঠিকা বা কাজের চুক্তি অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিণতিতে, মাল সমর্পণের পূর্ব মুহূর্তে বেচাকেনা সাব্যস্ত হয়। এটাই সঠিক কথা (জাওয়াহিরুল-আখলাতী)।

৬৩. মাসআলা : কারিকরের কোন ইখতিয়ার থাকে না, বরং তাকে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কারিকরের ইখতিয়ার থাকে (আল-কাফী)। এই শেষোক্ত মতই গ্রহণযোগ্য (জাওয়াহিরুল-আখলাতী)।

৬৪. মাসআলা : অর্ডারদাতার ইখতিয়ার থাকে যে, সে চাইলে মাল গ্রহণ করবে, অন্যথায় পরিত্যাগ করবে, কিন্তু কারিকরের কোন ইখতিয়ার নেই। এটাই বিদ্বতের (আল-হিদায়া)।

৬৫. মাসআলা : চুক্তি যার উপর সম্পাদিত হয়, সেটা কী? এ বিষয়ে বিদ্বতের মত হচ্ছে যে, চুক্তি হয় অর্ডারী মালে। কাজেই সে যদি তৈরি মাল পেশ করে, হোক না তা তার নিজের বানানো নয়, কিংবা নিজের বানানো হলেও তা চুক্তির পূর্বকার, তবুও জায়েয হবে (আল-কাফী)।

৬৬. মাসআলা : ফরমায়েশকারী যতক্ষণ না মাল পসন্দ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে না। কাজেই সে দেখার আগেই যদি কারিকর তা বিক্রি করে ফেলে তবে তা জায়েয হবে। এটাই সঠিক মত (আল-হিদায়া)।

৬৭. মাসআলা : রেওয়াজী দ্রব্যে যদি ইস্তিস্নাকালে পরিশোধের জন্য মেয়াদ ধার্য করে দেয়, তবে বায়উস সালাম হয়ে যাবে। সুতরাং তা বায়উস সালামের শর্তাবলী ছাড়া জায়েয হবে না। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। আর এ ক্ষেত্রে কোন ইখতিয়ার থাকবে না। শিষ্যদ্বয়ের মতে সেটা ইস্তিস্নাই থাকবে। আর তখন মেয়াদ ধার্য করার উদ্দেশ্য হবে শীঘ্র পরিশোধের তাগাদা দান। যে সব বস্তুতে ইস্তিস্না-এর প্রচলন নেই, তাতে যদি মেয়াদ ধার্য করা হয়, তবে তিনও ইমামের মতে সেটা বায়উস সালাম হবে (আল-জামিউস সাগীর)।

৬৮. মাসআলা : উপরিউক্ত মাসআলা সেই ক্ষেত্রে, যখন মেয়াদের উল্লেখ সময় সুযোগ দানের পদ্ধতিতে করে, যেমন এক মাস বা এ রকমের কিছু বলল। পক্ষান্তরে যদি শীঘ্র সরবরাহের উদ্দেশ্যে মেয়াদ উল্লেখ করে, যেমন বলল, আগামীকাল কাজ শেষ করতে হবে বা পরন্তর মধ্যে, তবে তাতে বায়উস সালাম হয়ে যাবে না। এ ব্যাপারে তিনও ইমাম একমত (আস-সুগরা)।

৬৯. মাসআলা : এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কোন কিছুর জন্য অর্ডার দিল। তারপর সে জিনিস নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। অর্ডারদাতা বলল, আমার কথামত তৈরি কর নি। কারিকর বলল, যেমন বলেছি, তেমনই করেছি। ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এরূপ এরূপ ক্ষেত্রে তাদের একজন অপরজনের উপর কসম আরোপের হকদার হবে না।

যদি কারিকর কারও কাছে দাবী করে যে, তুমি আমাকে অমুক জিনিস তৈরির অর্ডার দিয়েছিলে আর সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে, তবে সে ক্ষেত্রেও কসম আসবে না (আল-বাহরুর-রাইক)।

বিশতম পরিচ্ছেদ : মাকরুহ বেচাকেনা ও নাজায়েয মুনাফা প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : যে আরিয়্যা বৈধ, সেটা এক প্রকার দান, বিক্রি নয়।

২. মাসআলা : 'আরিয়্যা'-এর ব্যাখ্যা এই যে, কেউ তার বাগানের কোন একটি গাছের খেজুর কাউকে দান করল, তারপর তার বাগানে সেই ব্যক্তির প্রতিদিনের যাতায়াত তার কাছে বিরজিকর মনে হল। কারণ সে ঐ বাগানে সপরিবারে বাস করে। কিন্তু সে ওয়াদা খেলাফী বা দান প্রত্যাহার করতেও প্রস্তুত নয়। অগত্যা সে তার বদলে অনুমান করে তাকে পাড়া খেজুর দিয়ে দিল এবং এভাবে নিজের অসুবিধা দূর করল, ওদিকে ওয়াদা খেলাফী থেকেও বেঁচে গেল। আমাদের মায়হাবে এটা জায়েয (আল-মাবসূত)।

৩. মাসআলা : 'ঈনা' সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ঈনা কাকে বলে, এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, ঈনার ব্যাখ্যা এই যে, কোন অভাবী ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির কাছে এসে দশ দিরহাম ঋণ চাইল, কিন্তু ঋণ দিলে মুনাফা পাওয়া যায় না। তাই মুনাফা লাভের আশায় সে তাকে ঋণ দিতে আগ্রহী নয়। কাজেই সে তাকে বলল, আমার পক্ষে ঋণ দেওয়াটা সহজ নয়। তার চেয়ে বরং তুমি চাইলে আমি তোমার কাছে এই কাপড়টা বার দিরহামে বিক্রি করতে পারি। বাজারে এর দাম আছে দশ দিরহাম। তুমি এটি বাজারে নিয়ে দশ দিরহাম বিক্রি করতে পারবে। ঋণপ্রার্থী তাতেই রাযী হয়ে গেল এবং সে মতে ঋণদাতা কাপড়টি তার কাছে বার দিরহামে বিক্রি করল। তারপর ক্রেতা সেটি বাজারে নিয়ে দশ দিরহামে বিক্রি করল। এভাবে বিক্রেতা তাতে দুই দিরহাম মুনাফা হল আর ক্রেতার দশ দিরহাম ঋণ অর্জিত হল। কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নরূপ-

ঋণদাতা ও গ্রহীতা তাদের মাঝখানে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে ঢোকাবে। ঋণদাতা ঋণপ্রার্থীর কাছে বারো দিরহামে তার কাপড়টি বিক্রি করবে এবং তার কাছে তা অর্পণ করবে। তারপর ঋণপ্রার্থী সেটি সেই তৃতীয় ব্যক্তির কাছে দশ দিরহামে বিক্রি করবে এবং সে তার কাছে কাপড়টি অর্পণ করবে। তারপর সেই তৃতীয় ব্যক্তি কাপড়টি আসল মালিকের কাছে দশ দিরহামে বিক্রি করবে এবং তার কাছে সেটি অর্পণ করে তার কাছ থেকে দশ দিরহাম কবজা করবে এবং তা ঋণপ্রার্থীকে দেবে। এভাবে ঋণপ্রার্থীর দশ দিরহাম কর্জ লাভ হবে এবং কাপড়ওয়ালার বার দিরহাম অর্জিত হবে (আল-মুহীত)।

৪. মাসআলা : আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, ঈনা জায়েয এবং যে তা করবে সে পুণ্যের অধিকারী হবে (মুখতারুল-ফাতওয়া)।

৫. মাসআলা : আমাদের যুগের লোকে সুদের কৌশলরূপে যে এক ধরনের বেচাকেনার প্রচলন ঘটিয়েছে, যাকে তারা বায়-বিল-ওয়াফা' নামে অভিহিত করে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সেটা বন্ধক। ক্রেতার হাতে এরূপ বেচাকেনার মাল বন্ধকগ্রহীতার হাতের বন্ধকী মালের মত। সে এর মালিক হয় না এবং আসল মালিকের অনুমতি ছাড়া তার পক্ষে এর ব্যবহার বৈধ নয়। এভাবে কেনা গাছের ফল খেলে বা গাছ নষ্ট করলে তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তার হাতে এরূপ মাল নষ্ট হলে তার পাওনা বাতিল হয়ে যাবে, যদি সে মালের মূল্য পাওনা বরাবর হয়। যদি সেটি তার কারণে নষ্ট না হয়ে থাকে, তবে তাকে নিজের থেকে পাওনার অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। এভাবে বিক্রি করার পর বিক্রেতা তার মাল ফেরত নিতে পারবে, যদি সে পাওনা মিটিয়ে থাকে। আমাদের মতে কোন একটি বিধানেও এরূপ মাল ও বন্ধকী মালের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই (আল-ফুসুলুল ইমাদিয়া)।

৬. মাসআলা : সাযিদ আবু শুজা সামারকান্দী (র) ও কাযী আলী সুগদী (র) বুখারায় এরূপই ফাতওয়া দিয়েছেন। এ ছাড়া আরও বহু ফুকাহায়ে কিরাম থেকে এরূপ ফাতওয়া রয়েছে (আল-মুহীত)।

৭. মাসআলা : 'বায়-বিল-ওয়াফা'-এর পদ্ধতি নিম্নরূপ বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, আমার কাছে তোমার পাওনার বদলে এই মাল তোমার কাছে এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, আমি যখনই তোমার ঋণ পরিশোধ করব, তখন এ মাল আমার হয়ে যাবে। অথবা বলবে, এই মাল তোমার কাছে এত টাকায় এই শর্তে বিক্রি করলাম যে, যখনই তোমার টাকা ফেরত দেব তুমি মাল আমাকে ফেরত দেবে (আল-বাহরুর রাইক)।

৮. মাসআলা : সঠিক কথা এই যে, তাদের মধ্যকার চুক্তিতে যদি 'বেচাকেনা' শব্দে সম্পাদিত হয়ে থাকে, তবে সেটি বন্ধক নয়। তারপর দেখতে হবে তারা চুক্তিকালে রহিতকরণের শর্ত আরোপ করেছে কিনা। সে রূপ শর্তারোপ করলে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। আর চুক্তির ভেতর যদি সেরূপ শর্তারোপ না করে এবং 'ওয়াফা' (টাকা ফেরত তো মালও ফেরত)-এর শর্তে 'বেচাকেনা' শব্দ উচ্চারণ করে অথবা 'জায়েয বেচাকেনা' শব্দ উচ্চারণ করে, আর তাদের দৃষ্টিতে এর দ্বারা বিক্রি সংঘটিত হয়, তা অবধারিত হয়ে যায় না, তবে এরূপ বিক্রিও ফাসিদ হয়ে যাবে।

যদি নিঃশর্তভাবে 'বেচাকেনার' কথা বলে এবং তারপর ওয়াদাস্বরূপ শর্তের উল্লেখ করে, তবে বিক্রি বৈধ হবে এবং ওয়াদাপূরণও অনিবারণ্য হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা : 'আন-নাসাফিয়া' গ্রন্থে আছে [ইমাম নাসাফী (র)-কে] জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মূল্যে 'বায়উল-ওয়াফা'-এর পদ্ধতিতে নিজ বাড়ি বিক্রি করে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা আপন-আপন প্রাপ্য কবজা করে, তারপর সে যথাযথ শর্তাবলীর সাথে ক্রেতার কাছ থেকে বাড়িটি ভাড়া নেয়, ও সেটি কবজা করে এবং তারপর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তখন কি তাকে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে? তিনি উত্তর দিলেন, না (আত-তাতার খানিয়া)।

১০. মাসআলা : এক ব্যক্তি বায়উল-ওয়াফা-এর পদ্ধতিতে কারও কাছে তার আঙ্গুরের বাগান বিক্রি করল, তারপর ক্রেতা ও বিক্রেতা আপন-আপন হক কবজা করল, তারপর সেটি অন্য কারও কাছে অবধারিতভাবে বিক্রি করে দিল এবং তার কাছে হস্তান্তরও করল, তারপর সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতা দ্বিতীয় ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করতে এবং তার কাছ থেকে আঙ্গুর বাগানটি ফেরত নিতে পারবে। তদ্রূপ যদি বিক্রেতা ও উভয় ক্রেতা মারা যায় এবং তাদের সকলের ওয়ারিস থাকে, তবে মালিকের ওয়ারিসগণ দ্বিতীয় ক্রেতার ওয়ারিসদের হাত থেকে সেটি ছাড়াতে পারবে এবং দ্বিতীয় ক্রেতার ওয়ারিসগণ বিক্রেতাকে পরিশোধকৃত মাল বিক্রেতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তার ওয়ারিসদের কাছ থেকে ফেরত নিতে পারবে। প্রথম ক্রেতার ওয়ারিসগণ সেটা ফেরত চাইতে পারবে এবং তারা তাদের মৃত আত্মীয়ের ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে তা আটক রাখা যাবে (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

১১. মাসআলা : আবুল ফায়ল (র)-এর 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে আছে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন আঙ্গুর বাগানে যদি এক পুরুষ ও এক নারী অংশীদার থাকে এবং নারীটি তার অংশ সেই পুরুষের কাছে এই শর্তে বিক্রি করে যে, সে যখনই মূল্য ফেরত দেবে, তখন সে তার অংশ তাকে ফেরত দেবে। এরপর যদি সে পুরুষ তার অংশ বিক্রি করে ফেলে, তবে স্ত্রীলোকটির কি তাতে গুফআ (অগ্রক্রয়ের অধিকার) থাকবে? তিনি বললেন, যদি স্ত্রীলোকটি মুআমালার পদ্ধতিতে বিক্রি করে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটি গুফআ থাকবে, তাতে তার অংশের বাগান তার হাতে থাকুক বা পুরুষ লোকটির হাতে (আল-মুহীত)।

১২. মাসআলা : 'আল-ফাতাওয়াল-আস্তাবিয়া' গ্রন্থে আছে, বায়উল-ওয়াফা ও বায়উল-মুআমালা একই জিনিস (আত-তাতার খানিয়া)।

১৩. মাসআলা : 'আত-তালজিয়া' (বিক্রির অভিনয়) বলা হয় এমন চুক্তিকে যা বিশেষ কোন প্রয়োজনে সম্পন্ন করা হয়, যেন তাকে এরূপ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এটা তিন প্রকার-

ক. খোদ মালের ভেতরই এমন চুক্তি করা, যেমন কাউকে বলল। আমি যেন বাড়িটি তোমার কাছে বিক্রি করেছি, কিন্তু বাস্তবে সেটা কোন বিক্রি নয় এবং এ ব্যাপারে সাক্ষীও রাখল, তারপর প্রকাশ্যে সে বাড়িটি বিক্রি করল। এ বিক্রি বাতিল।

খ. বিনিময় মূল্যের ভেতর তালজিয়া হওয়া, যেমন ক্রেতা ও বিক্রেতা গোপনে একমত হল যে, মূল্য হবে এক হাজার টাকা, কিন্তু প্রকাশ্যে দেখাল দুহাজার টাকায় বিক্রি করছে। এ ক্ষেত্রে গোপনে যা ঠিক করা হবে সেটাই প্রকৃত মূল্য। বেশীটার ব্যাপারে তারা যেন পরিহাস করেছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রকাশ্যে যা উল্লেখ করা হয় সেটাই মূল্য।

গ. গোপনে তারা দুজন একমত হবে যে, মূল্য এক হাজার দিরহাম, কিন্তু প্রকাশ্যে চুক্তি করবে একশ' দীনারে, ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, কিয়াস অনুযায়ী বিক্রি বাতিল হয়ে যাওয়ারই কথা, কিন্তু ইস্তিহসান অনুযায়ী একশ' দীনারের বিনিময়েই বিক্রয় সম্পন্ন হবে (আল-হাবী)।

১৪. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তালজিআ তথা অভিনয়মূলক বিক্রি হুগিত থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি তা অনুমোদন করে, তবে কার্যকর হবে, অন্যথায় বাতিল হয়ে যাবে (আত-তাহযীব)।

১৫. মাসআলা : বিক্রি না হওয়া সত্ত্বেও যদি দুজন বেচাকেনার স্বীকারোক্তি প্রদানে একমত হয় এবং সে সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রদান করে, তবে সে বিক্রি বাতিল। তাদের অনুমোদনের ফলে তা জায়েয হয়ে যাবে না (আল-হাবী)।

১৬. মাসআলা : একজন যদি তালজিআ বা অভিনয়মূলক বিক্রির দাবী করে এবং অন্যজন তা অস্বীকার করে তবে দাবীদারের কর্তব্য প্রমাণ পেশ করা অন্যথায় অস্বীকারকারী কসম করবে (আত-তাহযীব)।

১৭. মাসআলা : খৃস্টানদের কাছে টাই বিক্রি এবং পার্সিকদের কাছে ধর্মীয় টুপি বিক্রি মাকরুহ নয়। পুরুষের কাছে রূপার নূপুর বিক্রি মাকরুহ হবে, যদি জানা থাকে যে, সে তা নিজে ব্যবহারের জন্য কিনেছে। যার সম্পর্কে জানা আছে যে, সে আল্লাহ তা'আলার নাকরমানী করবে, তার কাছে বালক গোলাম বিক্রি করা মাকরুহ (আল-খুলাসা)।

১৮. মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি রাস্তায় বসে বেচাকেনা করে এবং রাস্তা প্রশস্ত হওয়ার কারণে তাতে মানুষের অসুবিধা না হয়, তবে তাতে দোষ নেই। যদি মানুষের অসুবিধা হয়, তবে সঠিক মত এই যে, তার কাছ থেকে কেউ কিনবে না। কেননা ক্রেতা না পেলে সে আর সেখানে বসবে না। কাজেই তার কাছ থেকে কিনলে তাতে অন্যায় কাজে সহযোগিতা হবে (এবং সেটাও এক প্রকার অন্যায়) (আল-গিয়াছিয়া)।

১৯. মাসআলা : কেউ যদি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে জিনিস কেনে, তবে তাতে কি জিজ্ঞেস করে নিতে হবে যে, সেটা বৈধ মাল, না অবৈধ? ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, এ ক্ষেত্রে দেখা হবে যে, সে যে শহরে এবং যে সময়ে কিনছে, সে শহর ও সময়ে বাজারের অধিকাংশ পণ্যই বৈধ, সে ক্ষেত্রে ক্রেতাকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে না যে, মালটা বৈধ, না অবৈধ। বাহ্য অবস্থার উপরই বিষয়টা ধর্তব্য হবে। পক্ষান্তরে বাজারের অধিকাংশ পণ্যই যদি হারাম হয় অথবা বিক্রেতা এমন কোন ব্যক্তি হয়, যে হালাল-হারাম নির্বিচারে সব কিছুই বিক্রি করে, তখন জিজ্ঞেস করে নেওয়াটাই সতর্কতার পরিচায়ক।

২০. মাসআলা : মৃতের উপার্জন যদি অবৈধ হয়, তবে তার ওয়ারিসদের উচিত মালের প্রকৃত মালিক অনুসন্ধান করা এবং পাওয়া গেলে তাদেরকে মাল ফেরত দেওয়া। আর মালিক না পাওয়া গেলে তারা তা সাদাকা করে দেবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা : কেউ যদি কোন মাল বিক্রি করতে চায় এবং তাতে কোন দোষ আছে বলে তার জানা থাকে, তবে তার উচিত ক্রেতাকে তা খুলে বলা। যদি খুলে না বলে, তবে আমাদের কতক ফুকাহায়ে কিরামের মত হচ্ছে যে, সে ফাসিক (পাপিষ্ঠ) সাব্যস্ত হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। সাদরুশ শাহীদ বলেন, আমরা এ মত গ্রহণ করি না (আল-খুলাসা)।

২২. মাসআলা : কেউ যদি ক্ষুদ্র দশ দিরহামে কোন মাল কেনে এবং দিরহামগুলো বিক্রেতার হাতে অর্পণ করে, তারপর বিক্রেতা দেখে যে, তাতে ক্রেতার অগোচরে কয়েকটি বড় দিরহাম এসে গেছে, তবে বিক্রেতার পক্ষে তা গ্রহণ করা এবং নিজ প্রয়োজনে খরচ করা জায়েয হবে না।

২৩. মাসআলা : বালার ফুকাহায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যে মাটি খাওয়া যায়, তা কি বিক্রি করা যাবে? তারা বলেন, কেবল খাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপকারে না আসলে তা বিক্রি করা উচিত হবে না। কেননা তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এমনকি মৃত্যুরও কারণ হতে পারে (আল-মুহীত)।

২৪. মাসআলা : ইমাম আস-সারাখসী (র)-এর 'আল-আশারিশ' (পানীয় দ্রব্য) অধ্যায়ে আছে, যে ব্যক্তি মদ তৈরি করে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার কাছে আঙ্গুরের রস বিক্রি মাকরুহ নয়। শিষ্যদ্বয়ের মতে মাকরুহ বটে, কিন্তু বিক্রি জায়েয হবে।

২৫. মাসআলা : যে ব্যক্তি মদ তৈরি করে, তার কাছে আঙ্গুর বিক্রি সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ আছে (আল-খুলাসা)।

২৬. মাসআলা : যারা ছাগল যবাহু করে না, বরং শ্বাসরোধ করে বা পিটিয়ে হত্যা করে খায়, এমন কাফিরদের কাছে ছাগল বিক্রি করলে ফুকাহায়ে কিরামের মতে কোন দোষ নেই। এক ব্যক্তি একটি মালের দাম বলল, অপর এক ব্যক্তি এসে আরও বেশী দাম বলল, অথচ তার কেনার ইচ্ছা নেই, ক্রেতাকে বেশী দামে কিনতে উৎসাহিত করাই উদ্দেশ্য। তার এ কাজ মাকরুহ। এটাই সেই দালালী, যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি দাম বলেছিল, তার উদ্দেশ্য যদি হয় প্রকৃত মূলের চেয়েও কম দামে সে মালটি কেনা, তবে অন্যদের জন্য তার দাম বাড়ানোতে কোন দোষ নেই, যাতে সে ব্যক্তি দাম বাড়াতে প্রস্তুত হয় এবং পূর্ণ দাম দিয়ে সেটি কেনে। এ ক্ষেত্রে দাম বাড়ালে পুণ্য লাভ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৭. মাসআলা : কেউ যদি নিজ প্রয়োজনে তার কোন মাল বিক্রি করতে চায় আর অন্য কেউ সেটি বিনা দামে নিতে চায়, তবে এ ক্ষেত্রে কেউ তার দাম বললে এবং আসল দাম পর্যন্ত তা বৃদ্ধি করলে কোন দোষ নেই, বরং এটা প্রশংসিত কাজ হবে, নিন্দনীয় নয় (আস-সিরাজুল-ওয়াহাজ)।

২৮. মাসআলা : নিলাম পদ্ধতির বিক্রিতে কোন দোষ নেই। এটা গরীব গোরাবা ও এমন সব লোকের বিক্রি, যাদের দোকানের মাল পুরানো হয়ে গেছে।

২৯. মাসআলা : অন্যের দামের উপর দাম বলা মাকরুহ।

৩০. মাসআলা : নিলাম ও দামের উপর দাম বলার মধ্যে পার্থক্য এই যে, মালের মালিক যখন বিক্রির জন্য ডাক দেয় এবং কেউ সেই ব্যক্তি যে দামে নিতে চেয়েছে, তাতেই তাকে দিতে আগ্রহী হয়, তবে অন্য কারও জন্য তার দাম বাড়ানো জায়েয নয়। এটাই হচ্ছে অন্যের

দামের উপর দাম বলা। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি ডাক বন্ধ না করে, তবে অন্য কেউ বেশী দাম বললে দোষ নেই। এটাই নিলাম বা ডাকের বিক্রি, একের দামের উপর অন্যের দাম বলা নয়। যে ব্যক্তি বিক্রির জন্য ডাক দেয়, সে যদি স্বয়ং দালাল হয়ে থাকে এবং যে কোন ব্যক্তি কিনতে আগ্রহী হয়ে তার দাম বলে আর দালাল তখন বলে, আমি মালিককে জিজ্ঞেস করে দেখি, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কেউ আরও বেশী দাম বললে তাতে দোষ নেই। দালাল যদি তা মালিককে জানায় এবং মালিক তাকে বলে, এ দামে বিক্রি করে দাও এবং মূল্য গ্রহণ কর, তবে এরপর আর কারও পক্ষে তার দাম বাড়ানো জায়েয হবে না। করলে সেটা দামের উপর দাম বলা সাব্যস্ত হবে (আল-মুহীত)।

৩১. মাসআলা : গ্রাম্য ব্যক্তির পক্ষে শহরে ব্যক্তির বিক্রি মাকরুহ। এটা সেই ক্ষেত্রে, যখন শহরে মালের আকাল দেখা দেয় এবং সে ব্যক্তি চড়া দামের আশায় তাদের কাছে বিক্রি করে, এমন না হলে সেটা মাকরুহ হবে না (আল-কাফী)।

৩২. মাসআলা : কেউ কেউ 'গ্রাম্য ব্যক্তির পক্ষে শহরে ব্যক্তির বিক্রিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, গ্রামের কোন লোক শহরে খাদ্য শস্য নিয়ে আসবে এবং শহরের কোন লোক তার পক্ষ হতে সে মাল উচ্চ মূল্যে বিক্রির জন্য উকীল হবে। 'আল-মুজতাবা' গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাকেই বেশী সঠিক বলা হয়েছে (ফাতহুল-কাদীর)।

৩৩. মাসআলা : জুমুআর আযানকালে বেচাকেনা করা মাকরুহ। এ আযান দ্বারা সূর্য পশ্চিমে ঢলার পরে যে আযান দেওয়া হয় (অর্থাৎ প্রথম আযান), সেই আযানকে বুঝানো হয়েছে (আল-কাফী)।

৩৪. মাসআলা : কেউ যদি ফাসিক পদ্ধতিতে কোন বাঁদী কেনে এবং সেটি কবজা করে আর বিক্রেতাও মূল্য কবজা করে, তারপর বাঁদীটি বিক্রি করে দেয় এবং তাতে মুনাফা হয়, তবে সে মুনাফা সাদাকা করে দিতে হবে। বিক্রেতা যদি সেই মূল্য দ্বারা কোন মাল কেনে এবং সেটি বিক্রি করে লাভবান হয়, তবে সে লাভ তার জন্য হালাল হবে। কেননা বাঁদী এমন পণ্য, যা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং দ্বিতীয় বিক্রির চুক্তি সেই ফাসিদ পদ্ধতিতে কেনা বাঁদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে এবং এভাবে সে লাভে অপবিত্রতা সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে দিরহাম ও দীনার (মুদ্রা) নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না। কাজেই দ্বিতীয় চুক্তি হুবহু সেই দিরহামের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় নি। তাই প্রথম চুক্তির অপবিত্রতা এ লাভকে আক্রান্ত করে নি। এ মাসআলা সহীহ রিওয়াযাত অনুসারে সঠিক হয়। অর্থাৎ যে রিওয়াযাতে বলা হয়েছে যে, দিরহাম ও দীনার নির্দিষ্ট হয় না (আল-ইনায়া)।

৩৫. মাসআলা : উপরিউক্ত পার্থক্য সেই অপবিত্রতার ক্ষেত্রে, যা মালিকানা ফাসাদের কারণে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে যে অপবিত্রতা দেখা দেয় মালের স্বত্বহীনতার কারণে; যেমন জবরদখলী মাল বা আমানতের খেয়ানতী মাল এরূপ অপবিত্রতা উভয় প্রকারকেই শামিল করে অর্থাৎ যা নির্দিষ্ট হয় ও যা নির্দিষ্ট হয় না উভয়ের ক্ষেত্রেই দেখা দেয়। এটাই ইমাম আবু হানীফা (র) ও মুহাম্মাদ (র)-এর মত (আত-তাবয়ীন)।

৩৬. মাসআলা : কেউ যদি অপরের কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে বলে দাবী করে এবং সে ব্যক্তি তাকে তা পরিশোধ করে। তারপর দাবীদার ব্যক্তি তা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে লাভবান হয় এবং তারপর উভয়ে স্বীকার করে যে, সেটা মিথ্যা দাবী ছিল, তবেই লাভের অর্থ তার জন্য হালাল হবে (আল-কাফী)।

৩৭. মাসআলা : কেউ যদি এই শর্তে কারও কাছ থেকে এক হাজার দিরহাম ঋণ নেয় যে, ঋণদাতাকে প্রতি মাসে দশ দিরহাম দিবে। তারপর ঋণগ্রহীতা এক হাজার দিরহাম কবজা করে এবং তা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে লাভবান হয়, তবে সে লাভ তার জন্য হালাল হবে।

৩৮. মাসআলা : হিশাম (র) তার 'নাওয়াদির' গ্রন্থে বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন ব্যক্তি যদি কারও কাছে গম বিক্রি করে এবং তারপর অন্য কারও কাছে বিক্রি করে, তারপর দ্বিতীয় ক্রেতা সে গম কবজা করে এবং তা নিঃশেষ করে ফেলে, তখন তো প্রথম ক্রেতার ইখতিয়ার থাকে চাইলে বিক্রি রহিত করে করতে পারে এবং চাইলে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পাকড়াও করতে পারে। এখন সে যদি তার কাছ থেকে অনুরূপ গম গ্রহণ করে এবং আসল দামের চেয়ে বেশী দামে বিক্রি করে তবে সে লাভ কি তার জন্য হালাল হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হালাল হবে। আমি বললাম, আবু ইউসুফ (র) তো বলেন, সে লাভ তাকে সাদাকা করে দিতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র) তা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, লাভের অংশটা সাদাকা করতে হয় সেই সময়, যখন গমের বদলে তার মূল্য হিসেবে দিরহাম গ্রহণ করে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, কেউ যদি খরিদা গোলাম কবজা করে, তারপর তার কাছে গোলামটির মৃত্যু হয় এবং তারপর কেউ প্রমাণ পেশ করে যে, গোলামটি এর আগে সে কিনেছিল, তবে সে জরিমানা স্বরূপ গোলামটির বাজার মূল্য তার কাছ থেকে আদায় করতে পারবে এবং সে যে দামে কিনেছিল এ মূল্য তার চেয়ে বেশী হয়ে থাকলে বেশীটা সাদাকা করতে হবে।

৩৯. মাসআলা : ইব্ন সামাআ (র) তাঁর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবু ইউসুফ (র)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কেউ যদি কাউকে তার জন্য এক হাজার দিরহামে কোন মাল কিনতে বলে আর সে ব্যক্তি শহরে প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা তা কেনে, তারপর আদেশদাতা তাকে বিত্ত দিরহাম প্রদান করে, কিন্তু সে ব্যক্তি মালের দাম স্বরূপ শস্য আদায় করে, তবে অতিরিক্ত দিরহাম কি তার জন্য হালাল হবে? ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, আদেশদাতা যদি তা মেনে নেয়, তবে হালাল হবে। আর সে যদি না জানে, তবে এ ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ আছে। তিনি এর আর কোন জবাব দেন নি (আল-মুহীত)।

৪০. মাসআলা : কেউ যদি জবরদখল করা গোলাম অন্য গোলামের বিনিময়ে বিক্রি করে তারপর দ্বিতীয় গোলামটি অন্য কোন মালের বিনিময়ে বিক্রি করে এবং তারপর সে মাল বিক্রি করে দিরহামের বিনিময়ে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত অনুযায়ী জবরদখলকৃত

গোলামের জরিমানাস্বরূপ যে মূল্য আদায় করেছিল, তার চেয়ে যা অতিরিক্ত লাভ হবে, তা সাদাকা করে দিতে হবে। তদ্রূপ যদি এক হাজার দিরহাম জবরদখল করে এবং তা দিয়ে কোন গোলাম ক্রয় করে, তারপর সেটি দুহাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে, তারপর তা দিয়ে কোন মাল কেনে এবং তা আরও বেশী দামে বিক্রি করে, তবে কাযী (র)-এর মতে উভয় ক্ষেত্রে লাভ হালাল হবে।

৪১. মাসআলা : যদি ফাসিদ পদ্ধতিতে কোন বাঁদী কেনে এবং সেটি অন্য কোন বাঁদীর বিনিময়ে বিক্রি করে, তবে তার জন্য এই দ্বিতীয় বাঁদীর সঙ্গে সঙ্গম করা বৈধ হবে। কিন্তু প্রথমটির সঙ্গে বৈধ হবে না। কাযী (র) বলেন, এই দ্বিতীয় বাঁদীটি যদি বিক্রি করে দেয়, তবে বিক্রি ফাসিদ হওয়ার কারণে প্রথমটির যে বাজার মূল্য সে পরিশোধ করেছিল, তার চেয়ে যা বেশী লাভ হবে তা সাদাকা করে দিতে হবে। ফাসিদ বিক্রির ক্ষেত্রে তিনি ইমাম সাহেব (র)-এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। সুতরাং তিনি বলেন, কেউ যদি ফাসিদ পদ্ধতিতে কোন মালের বদলে মাল বিক্রি করে, তারপর বিক্রি ফাসিদ হওয়ার কারণে সে তার যে বাজার মূল্য পরিশোধ করেছিল, তদপেক্ষা বেশী দামে সে মাল বিক্রি করে, তবে অতিরিক্ত টাকা সাদাকা করে দিতে হবে। তিনি ফাসিদ বিক্রিকে জবরদখল অপেক্ষাও গুরুতর সাব্যস্ত করেছেন (জাওয়াহিরুল-আখলাতী)।

৪২. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি বিক্রেতার ইজারা দেয়া বাড়ি ক্রয় করে, তারপর ক্রেতা বলে যে, ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব, তবে সে বিক্রি বৈধ হবে। ভাড়া বিক্রেতারই হবে, তবে সে তা সাদাকা করে দেবে (আল-হাবী, নাজায়েয লাভ অধ্যায়ে)।

৪৩. মাসআলা : কেউ যদি সুনির্দিষ্ট পাঁচটি ডিমের বিনিময়ে একটি মুরগি কেনে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা কবজা না করে, তারপর মুরগিটি পাঁচটি ডিম দেয়, তবে ক্রেতা ডিমসহ মুরগি পাবে। তাকে কিছুই সাদাকা করতে হবে না। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি ডিমগুলো নিঃশেষ করে ফেলে এবং মুরগিটির দাম হয় দশটি ডিমের সমান, তবে ক্রেতা তিনটি ডিম ও একটি ডিমের এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে মুরগিটি গ্রহণ করবে।

যদি অনির্দিষ্ট পাঁচটি ডিমের বিনিময়ে মুরগিটি কিনে থাকে এবং কবজার আগে মুরগিটি পাঁচটি ডিম দেয়, তবে ক্রেতাকে সেগুলো সাদাকা করতে হবে। বিক্রেতা যদি ডিমগুলো বিনাশ করে ফেলে, তবে ক্রেতা তিনটি ডিম ও একটি ডিমের এক-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে সেটি গ্রহণ করবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪৪. মাসআলা : কেউ যদি অনির্দিষ্ট এক মুদ (পরিমাপ বিশেষ) তাজা খেজুর দ্বারা একটি খেজুর গাছ কেনে, কিন্তু কবজা না করে, তারপর সে গাছে খেজুর আসে, তবে গাছ ও নতুন খেজুরের মধ্যে বাজার মূল্য হিসেবে ক্রেতার দেওয়া দাম ভাগ করা হবে। তারপর ক্রেতা প্রদত্ত দামের যতটুকু অংশ নতুন খেজুরের ভাগে পড়েছে, সেই অনুপাতে নতুন খেজুরের অংশ ক্রেতার জন্য হালাল হবে। অতিরিক্ত খেজুর সাদাকা করে দিতে হবে। যদি সুনির্দিষ্ট খেজুরের

বিনিময়ে গাছটি কিনত, তবে নতুন খেজুরের সবটাই তার জন্য জায়েয হত। তার কিছুই তাকে সাদাকা করতে হত না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৫. মাসআলা : বিশ্ব বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কোন ষ্টানের কাছে দুই দিরহামের বিনিময়ে একটি দিরহাম বিক্রি করে, তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে সম্পর্কে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন যে, সেই ব্যক্তিকে চিনতে পারলে অতিরিক্ত এক দিরহাম তাকে ফেরত দেবে, আর চিনতে না পারলে তা সাদাকা করে দেবে।

৪৬. মাসআলা : কেউ যদি ফাসিদ পদ্ধতিতে কেনা দাসী কবজা করে বিক্রি করে দেয়, তারপর কাযী রায় দেয় যে, তাকে বাঁদীটির বাজার মূল্য প্রথম বিক্রেতার কাছে প্রত্যর্পণ করতে হবে, সে মতে সে তা প্রত্যর্পণ করে এবং প্রথম বিক্রেতা তাকে মূল্য পরিশোধের দায় হতে মুক্তি দান করে, তবে এ ক্ষেত্রে সে বাঁদীটি যে মূল্যে বিক্রি করেছিল তার পরিমাণ যদি প্রথম বিক্রেতাকে প্রদত্ত বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশী হয়ে থাকে, ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে বেশীটুকু সাদাকা করতে হবে। মিসকীনদের জন্য সেটা লুকুতা (পড়ে পাওয়া মাল) হিসেবে হালাল হবে। কিন্তু ক্রেতার জন্য সেটা হালাল হবে না, যদিও সে মিসকীন হয়। কেননা সে এটা উপার্জন করেছে নাজায়েয পন্থায়। কিন্তু মিসকীনেরা যেহেতু নাজায়েয পন্থায় উপার্জন করে নি, তাই তাদের জন্য এটা হালাল হবে, এমনকি লুকুতা অপেক্ষা এটা তাদের পক্ষে বেশী উত্তম মাল হবে।

ক্রেতা যদি লাভের অংশটা সাদাকা না করে, ইতোমধ্যে সে বিক্রি মূল্য কাজে লাগায় এবং তাতে তার মুনাফা অর্জিত হয় এবং তা দ্বারা আরও ব্যবসা-বাণিজ্য করে আর সবগুলোতেই তার লাভ হয়, তবে সবগুলো ক্ষেত্রেই তাকে অতিরিক্ত পরিমাণটা সাদাকা করতে হবে।

কেউ যদি কোন মাল জবরদখল করে অথবা আমানত বা মুদারাবার মাল আত্মসাৎ করে এবং তা দিয়ে বেচাকেনা করত লাভবান হয়, তবে লাভের অংশটুকু সাদাকা করতে হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে তার জন্য মুনাফাও হালাল হবে। যদি জবরদখলী মাল ছাড়া অন্য কিছুর বিনিময়ে কেনে, কিন্তু জবরদখলী মাল দ্বারা মূল্য পরিশোধ করে অথবা জবরদখলী মালের বিনিময়ে কেনে, কিন্তু অন্য মাল পরিশোধ করে, তবে সে ক্ষেত্রেও ইমাম ইউসুফ (র)-এর মতে মুনাফা হালাল হবে এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা সাদাকা করতে হবে (আল-মুহীত)।

৪৭. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে, এক হাজার দিরহামে ক্রয় করা দাসীটি যদি বিক্রেতার কাছে থাকা অবস্থায় সন্তান প্রসব করে, তারপর ক্রেতা বাচ্চাসহ সেটি কবজা করে আর উভয়ের মূল্য তার প্রদত্ত মূল্য অপেক্ষা ঢের বেশী হয়, তবে তার জন্য তা হালাল হবে। বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় যদি মা ও শিশু নিহত হয় এবং ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করত বিক্রেতার কাছ থেকে তাদের বাজার মূল্য গ্রহণকেই বেছে নেয়, তবে তার প্রদত্ত মূল্যের চেয়ে যা বেশী অর্জিত হবে, তা সাদাকা করতে হবে। যদি কেবল বাচ্চাটি নিহত হয়, তবে প্রদত্ত মূল্যের যে অংশ তার ভাগে পড়ে সে অনুপাতে বিক্রেতার কাছ থেকে গ্রহীত

মূল্যের অতিরিক্ত পরিমাণ সাদাকা করতে হবে, যেহেতু অতিরিক্ত পরিমাণটা তার যিম্মায় সাব্যস্ত হয় নি (আল-হাবী)।

৪৮. মাসআলা : যদি এক হাজার দিরহামে একটি গোলাম কেনে এবং কবজার আগে অন্য কোন গোলাম তাকে হত্যা করে, ফলে সে গোলামটি নিহত গোলামের বদলে অর্পণ করা হয় এবং ক্রেতা তাকে কবজা করে, আর নিহত গোলাম বাবদ প্রদত্ত মূল্য অপেক্ষা এর দাম বেশী হয়, তবে সে বেশীটুকু সাদাকা করতে হবে না। যদি এ গোলামটি তার প্রদত্ত মূল্য অপেক্ষা বেশী দামে বিক্রি করে, তাতে তা গোলামের প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বেশী হোক বা তার কম হোক, সর্ববস্থায়ই বেশীটুকু সাদাকা করতে হবে, অবশ্য গোলামের প্রকৃত যা মূল্য, তার অতিরিক্ত করতে হবে না। বরং কবজা করার দিন গোলামটির যে বাজার মূল্য ছিল, বিক্রি মূল্যে তার চেয়ে অতিরিক্ত লাভ হয়েছে, সাদাকা তার চেয়ে কম পরিমাণে করতে হবে। এই গোলামটিই যদি কোন মালের বিনিময়ে বিক্রি করত, তবে মুনাফা হলেও তাকে কিছুই সাদাকা করতে হত না। সেই মাল যদি দিরহাম বা দীনারের বিক্রি করে এবং তাতে লাভ হয়, তবে অপরাধের কারণে প্রদত্ত গোলামটির কবজা করার দিনের বাজার মূল্য লক্ষ্য করা হবে। সেদিন যদি এর মূল্য নিহত গোলামটির ক্রয় মূল্য অপেক্ষা বেশী না হয়, তবে কিছুই সাদাকা করতে হবে না। যদি সে দিন এর মূল্য নিহত গোলামের ক্রয় মূল্য অপেক্ষা বেশী হয়, তবে সেই অতিরিক্ত মূল্য এবং ক্রেতার হাতে থাকা মালের বিক্রি মূল্যে অর্জিত লাভ এ দু'য়ের মধ্যে যার পরিমাণ বেশী সেটা সাদাকা করতে হবে (আল-মুহীত)।

৪৯. মাসআলা : ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে হাসান (র) 'বুয়ু' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কারও কাছ থেকে পঞ্চাশ দিরহাম মূল্যের এক কুরুর গম জবরদখল করে, তারপর তা একশ' দিরহামে বিক্রি করে, তারপর গমের মালিক তার কাছ থেকে সমপরিমাণ গম আদায় করে নেয়, তবে জবরদখলকারীকে লাভের অংশটা সাদাকা করতে হবে। এটা যদি কাপড় হত তবে লাভ তার জন্য হালাল হত (আত-তাতার খানিয়া)।

৫০. মাসআলা : কেউ যদি দু'হাজার দিরহাম বাজার মূল্যের কোন গোলাম এক হাজার দিরহামে কেনে, তারপর বিক্রতার হাতে সে গোলাম নিহত হয়, আর সে ক্ষেত্রে ক্রেতা গোলামটির বাজার মূল্য গ্রহণকেই বেছে নেয়, যার পরিমাণ দু'হাজার দিরহাম, তারপর তা থেকে এক হাজার দিরহাম সাদাকা করার আগেই এক হাজার দিরহাম খোয়া যায় এবং এক হাজার বাকী থাকে, তবে কিছুই সাদাকা করতে হবে না। যদি সে দিরহাম খোয়া না যায়, বরং তা দিয়ে অন্য কিছু কেনে এবং তাতে লাভ হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে দু'হাজারের এক হাজার এবং তার লাভের অংশটা সাদাকা করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে সে এক হাজারে যে লাভ হয়েছে তা সাদাকা করতে হবে না। সে দিরহাম কাজে লাগানোর পর যদি এক হাজার দিরহাম খোয়া যায়, তবে এক হাজার সাদাকা করতে হবে। যদি হত্যাকারীর সঙ্গে এভাবে আপোষরফা হয় যে, সে (গোলামের বাজার মূল্য) দু'হাজারের পরিবর্তে একটি গোলাম দেবে এবং ক্রেতা সে গোলামটি আদায়

করে দেয়, তবে কিছুই সাদাকা করতে হবে না। যদি তাকে অর্থের বিনিময়ে আদায় করে অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায়ের শর্তে তার সঙ্গে আদায়ের চুক্তি হয়, তখনও কিছুই সাদাকা করতে হবে না। কিন্তু গোলামটির কবজা করার দিনের বাজার মূল্য যদি ক্রয় মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় এবং মুক্তিদানের পরিবর্তে নেয়া অর্থ যদি সেই বাজার মূল্যের সমান বা তার বেশী হয়, তবে ক্রয় মূল্য অপেক্ষা বাজার মূল্য যতটুকু বেশী, সেই বেশীটুকু সাদাকা করতে হবে (আল-মুহীত)।

অনুচ্ছেদ : মজুদদারী প্রসঙ্গ

১. মাসআলা : গুদামজাত করা মাকরুহ। অর্থাৎ কোন শহরে খাদ্য সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে খাদ্য শস্য কিনে রাখা এবং তা বিক্রি না করা, এটা মাকরুহ (আল-হাবী)।

২. মাসআলা : খাদ্যশস্য মজুদ করা দ্বারা শহরবাসীর কোন অসুবিধা না হলে সেটা দৃষ্ণীয় নয় (আত-তাতার খানিয়া, আত-তাজনীসের বরাতে)।

৩. মাসআলা : যদি শহরের নিকটবর্তী জায়গা থেকে খাদ্যশস্য কিনে শহরে নিয়ে আসে এবং গুদামজাত করে আর এর ফলে শহরবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে সেটাও মাকরুহ। ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতেও এরূপ এক বর্ণনা আছে। আর এটাই গ্রহণযোগ্য (আল-গিয়াহিয়া)। 'আল-জাওয়াহিরুল-আখলাতী' গ্রন্থে এটাকেই সঠিক বলা হয়েছে।

৪. মাসআলা : 'জামিউল-জাওয়ামি' গ্রন্থে আছে, যদি শহর থেকে দূরের অঞ্চল হতে মাল কিনে এনে গুদামজাত করে, তবে তা নিষিদ্ধ নয় (আত-তাতার খানিয়া)।

৫. মাসআলা : যদি এক শহরে খাদ্যশস্য কিনে অন্য শহরে নিয়ে যায় এবং সেখানে গুদামজাত করে, তবে মাকরুহ হবে না (আল-মুহীত)।

৬. মাসআলা : তদ্রূপ নিজের জমি ফসল গুদামজাত করা দ্বারা মজুদদার সাব্যস্ত হবে না (আল-হাবী)।

৭. মাসআলা : তবে মানুষের প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠলে নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত শস্য বিক্রি করে ফেলাই হচ্ছে উত্তম (আত-তাতার খানিয়া, আল-মুযমারাত)।

৮. মাসআলা : অল্প দিনের জন্য গুদামজাত করলে তাতে মজুদদারী হয় না, বরং মেয়াদ দীর্ঘ হলেই মজুদদারী হয়। আমাদের ফুকাহায়ে কিরামের মতে দীর্ঘ মেয়াদ হলো এক মাস। এর কম হলে সেটা অল্প মেয়াদ। তদুপরি বেশী দামের অপেক্ষায় মজুদদারী ও দুর্ভিক্ষের অপেক্ষায় মজুদদারী— এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয় অপরাধ গুরুতর। মোদাকথা খাদ্য নিয়ে এভাবে ব্যবসা করা প্রশংসনীয় নয় (আল-মুহীত)।

৯. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে মানুষের ক্ষতি হয় এমন যে কোন জিনিসের মজুদদারী নিষিদ্ধ। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, মানুষ ও গবাদি পশুর খাদ্য সামগ্রীতেই মজুদদারীর হুকুম প্রযোজ্য (আল-হাবী)।

১০. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, নগরবাসী বিপন্ন হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিলে সরকার মজুদদারকে বাধ্য করবে যেন সে তার মাল সাধারণ বাজার মূল্যে বা যতটুকু বেশী দাম মানুষ সাধারণত নেয় সে দামে বিক্রি করে ফেলে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা : এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, সরকার পণ্যের দর বেধে দেবে না। তবে ব্যবসায়ীরা যদি অতিরিক্ত মূল্য নেয় এবং এ ব্যাপারে এতটাই সীমালঙ্ঘন করে যে, দর বেধে দেওয়া ছাড়া মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা সম্ভব না হয়, তখন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের পরামর্শক্রমে পণ্যের দর নির্ধারণ করলে সেটা দৃষণীয় হবে না। এটাই গ্রহণযোগ্য এবং এর উপর ফাতওয়া (আল-ফুসুলুল-ইমাদিয়া)।

১২. মাসআলা : বিক্রেতা যদি সরকারের বেধে দেয়া মূল্যের চেয়ে বেশী দামে বিক্রি করে, তবে তার বিক্রি বৈধ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা : আর যে ব্যক্তি সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে, তার বিক্রিও জায়েয (আত-তাতার খানিয়া)।

১৪. মাসআলা : মজুদদার সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করা হলে প্রশাসক তাকে তার ও পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য বিক্রির আদেশ দেবে এবং তাকে মজুদদারী করতে নিষেধ করবে। যদি সে মেনে নেয় তো ভাল হবে, আর যদি বিরত না হয় এবং তার সম্পর্কে পুনরায় অভিযোগ আসে, তবে তাকে উপদেশ দেয়া হবে এবং সতর্ক করা হবে। তারপরও যদি তার সম্পর্কে অভিযোগ আসে, তবে তাকে জেলে ঢোকাবে এবং উপযুক্ত শাস্তি দেবে।

১৫. মাসআলা : কুদুরী (র) তাঁর ভাষ্যগ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কাযীর যদি আশংকা হয় যে, খাদ্যভাবে নগরবাসী ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে মজুদদারদের থেকে খাদ্য নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে। তারপর যখন তাদের অভাব মোচন হবে, তখন সমপরিমাণ খাদ্য ফেরত দেবে, এটাই সহীহ (আল-মুহীত)।

১৬. মাসআলা : 'আল-মুযমারাত' গ্রন্থে আছে, কাযীর কি এ অধিকার আছে যে, মজুদদারদের সম্মতি ছাড়াই তাদের মজুদ করা খাদ্য বিক্রি করে দেবে? কেউ বলেন, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। কারও মতে সে তা বিক্রি করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম একমত।

১৭. মাসআলা : 'আল-মুলতাকাত' গ্রন্থে আছে, যদি আশংকা হয় মানুষ অনাহারে মারা পড়বে, তবে মজুদদারের মত আমদানীকারকদেরকেও মাল বিক্রির আদেশ করা হবে (আত-তাতার খানিয়া)।

১৮. মাসআলা : শহরের বাইরে গিয়ে সরবরাহকারী ও আমদানীকারকদের কাছ থেকে মাল কেনা মাকরুহ যদি সেটা নগরবাসীর জন্য ক্ষতিকর হয়। আর নগরবাসীর জন্য ক্ষতিকারক না হলে মাকরুহ হবে না, তবে সে ক্ষেত্রেও শর্ত হচ্ছে, আগত ব্যবসায়ীদেরকে শহরের দাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা যাবে না এবং তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না, বরং শহরের দাম সম্পর্কে তাদেরকে সত্য কথা বলতে হবে যে, শহরে এ মাল এই দামে বিক্রি হচ্ছে। সুতরাং তাদেরকে শহরের দাম সম্পর্কে যদি বিভ্রান্তিকর কথা বলে, তবে সে ক্রয় মাকরুহ হবে (আল-মুহীত)।

১৯. মাসআলা : ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, বেদুঈন শ্রেণীর লোক যদি কূফায় এসে রসদ কিনতে চায় এবং সেটা কূফাবাসীর জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে তাদেরকে তা কিনতে বাধা দেওয়া হবে, যেমন নগরবাসীকেও এভাবে কিনতে নিষেধ করা হয়।

২০. মাসআলা : সরকার যদি রুটি বিক্রেতাদেরকে আদেশ করে যে, তোমরা প্রতি এক দিরহামে দশ মান্ন (পরিমাপ বিশেষ) বিক্রি করবে, এর কম দেবে না আর এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি তাদের কারও কাছ থেকে এক দিরহামে দশ মান্ন রুটি কেনে এবং রুটিওয়ালার ভয় থাকে যে, এর কম দিলে সরকারের পক্ষ হতে তাকে শাস্তি পেতে হবে, তবে ক্রেতার জন্য তা খাওয়া হালাল হবে না। কেননা তাকে এ দামে বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছে বলেই গণ্য করা হবে।

২১. মাসআলা : এরূপ ক্ষেত্রে বৈধকরণের উপায় এই যে, ক্রেতা রুটিওয়ালাকে বলবে, তোমার যে দামে খুশী আমার কাছে বিক্রি কর। তখন বিক্রিও শুদ্ধ হবে এবং সে রুটি খাওয়াও হালাল হবে। যদি সরকারী আদেশ অনুযায়ী এক দিরহামে দশ মান্ন কেনে এবং তারপর রুটিওয়ালার বলে, আমি বিক্রি অনুমোদন করলাম, তবে তখনও বিক্রি বৈধ হবে এবং ক্রেতার জন্য তা খাওয়া হালাল হবে (আল-ফাতাওয়াল-কুবরা)।

২২. মাসআলা : কোন রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা তামার রং সাদা করে তারপর রূপা হিসেবে তা বিক্রি করা জায়েয নয়। এমনভাবে টাকশালের বাইরে রৌপ্য-মুদ্রা (যে কোন মুদ্রা) তৈরি করাও জায়েয নয়, যদিও তা উৎকৃষ্টমানেরই হয়। পক্ষান্তরে যদি রূপার অলংকার তৈরি করতে গিয়ে তাতে তামা মেশানো হয়, সেটা দোষণীয় নয়।

২৩. মাসআলা : কাপড় বিক্রেতা যদি কাপড় মোলায়েম করার জন্য তাতে পানির ছিটা দেয়, সেটা জায়েয হবে। এটা ঠিক সেই রকমের, যেমন কেউ বাঁদী বিক্রি করার জন্য তার চেহারা ধুয়ে নিল এবং তাকে সাজিয়ে পরিয়ে নিল।

২৪. মাসআলা : ভাল মালের সাথে মন্দটা মেশানো মাকরুহ। এমনভাবে গোশতে জাফরানের রং মেশানোও মাকরুহ।

২৫. মাসআলা : যার ভেতর অন্য কিছু মিশ্রণ আছে, তা বিক্রি করা জায়েয, যদি মিশ্রণটা সুস্পষ্ট হয়, যেমন মাটিযুক্ত গম। কিন্তু তা যদি পেঁয়ানো হয়, তবে না বলে বিক্রি করা জায়েয হবে না।

২৬. মাসআলা : রুটিওয়ালা, ধোপা বা এ রকম কোন পেশাজীবীর কাছে টাকা রেখে তার থেকে ইচ্ছামত কিছু কিছু নেওয়া মাকরুহ। বরং তার কাছে তা আমানত রাখবে এবং যা ইচ্ছা তা নির্দিষ্ট অংকে গ্রহণ করবে। তার কাছে যদি ব্যবসায়ের চুক্তিতে তা রাখা হয়, তবে সে টাকার দায়-ভার তার উপর বর্তাবে।

২৭. মাসআলা : পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধি করার জন্য কসম করা উচিত নয়। আবু বকর আল-বালখী (র) হতে বর্ণিত আছে যে, শরাব ব্যবসায়ী তার শূড়িঘর খোলার সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়লে গুনাহ্‌গার হবে। তদ্রূপ গ্রহরী পাহারাদারীর সময় লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু বলে হাক-ডাক করলেও গুনাহ্‌গার হবে (আত-তাতার খানিয়া)।

২৮. মাসআলা : কোন শিশু যদি পয়সা বা রুটি নিয়ে মুদীখানায় আসে এবং লবণ, সাবান বা এ জাতীয় ঘরের প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য চায়, তবে তার কাছে তা বিক্রি করা জায়েয হবে। যদি পেঁস্তা, বাদাম বা এ জাতীয় এমন কোন জিনিস চায়, যা শিশুর সাধারণত নিজেদের জন্য ক্রয় করে, তবে তার কাছে তা বিক্রি করবে না।

২৯. মাসআলা : কোন বালক যদি নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক দাবী করে বেচাকেনা করে, তারপর প্রাপ্তবয়স্ক নয় বলে স্বীকার করে তবে দেখতে হবে যে, দাবী করার সময় প্রাপ্ত বয়সভার সম্ভব না তার মাঝে ছিল কি না। যেমন বার বছর বা ততোধিক বয়স হওয়া। যদি সেরূপ সম্ভাবনা থাকে, তবে তার অস্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি তখন তার বয়স এর নিচে হয়, তবে তার নিজেকে সাবালক বলে প্রচারের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। সুতরাং তার অস্বীকৃতি গ্রহীত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. মাসআলা : এক ব্যক্তির হাতে একটি কাপড় আছে, সে বলল, অমুক ব্যক্তি আমাকে এটি বিক্রির উকীল বানিয়েছে এবং শর্ত দিয়েছে, যেন দশ দিরহামের কমে না দেই। এখন কেউ যদি সেটি নয় টাকায় কিনতে চায় এবং তার ধারণা হয় যে, সে তা বলেছে কাপড়টি দশ দিরহামে চালানোর জন্য, তবে নয় দিরহামে কেনার অবকাশ তার থাকবে। আর মনে যদি এমন ধারণা না জন্মায় তবে কেনা উচিত হবে না (আল-খুলাসা)।

৩১. মাসআলা : যদি শিশুর খেলার জন্য মাটির ষাঁড় বা ঘোড়া কেনে তবে সে ক্রয় শুদ্ধ হবে না। তার কোন দাম নেই এবং নষ্ট করলে জরিমানাও দিতে হবে না (আল-কিন্য়া)।

৩২. মাসআলা : যদি হারাম উপায়ে অর্থোপার্জন করে এবং তারপর সে অর্থের মালিকের কাছ থেকে কিছু ক্রয় করে, তবে দেখতে হবে, অবৈধ উপায়ে অর্জিত সেই দিরহাম (টাকা)

প্রথমে বিক্রেতার হাতে অর্পণ করে তারপর তার কাছ থেকে তা দ্বারা ক্রয় করেছে না আগে কিনে তারপর দিরহাম অর্পণ করেছে? যদি আগে দিরহাম অর্পণ করে থাকে এবং তারপর সেই দিরহাম দ্বারা কিছু ক্রয় করে তবে সে মাল তার জন্য হালাল হবে না, বরং তা সাদাকা করে দিতে হবে। আর যদি আগে কেনার পর বিক্রেতাকে সে দিরহাম দেয়, তবে ইমাম কারখী (র) ও আবু বকর (র)-এর মতে সে ক্ষেত্রেও একই হুকুম। কিন্তু আবু নাসর (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন।

যদি সে দিরহাম দেওয়ার আগে তা দ্বারা কোন মাল কেনে এবং তারপর অন্য দিরহাম পরিশোধ করে অথবা সে দিরাহামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা ছাড়াই সাধারণভাবে কেনে এবং মূল্য পরিশোধ করে সেই দিরহাম দিয়ে, অথবা অন্য দিরহাম দ্বারা কেনে এবং সেই দিরহাম প্রদান করে, তবে আবু নাসর (র)-এর মতে সে মাল তার জন্য হালাল হবে। তার জন্য তা সাদাকা করা ওয়াজিব হবে না। এটাই কারখী (র)-এর মত। কিন্তু উত্তম হচ্ছে আবু বকর (র)-এর মত। যদিও বর্তমানকালে কারখী (র)-এর মত অনুযায়ী ফাতওয়া দেওয়া হয় (আল-ফাতাওয়াল-কুবরা)।

৩৩. মাসআলা : কেউ যদি ঘর কেনে এবং তার আড়ার ভেতর টাকা-পয়সা পায়, তবে কারও মতে তা বিক্রেতাকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। যদি বিক্রেতা গ্রহণ না করে, তবে সাদাকা করতে হবে। এটাই বেশী সঠিক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৪. মাসআলা : কেউ যদি কা'বা শরীফের কোন খাদিমের কাছ থেকে কা'বার গেলাফ কেনে, তবে তা জায়েয হবে না। যদি তা কিনে নিজ দেশে নিয়ে আসে, তবে তা গরীবদের মধ্যে সাদাকা করে দেওয়া কর্তব্য।

৩৫. মাসআলা : মসজিদের চাটাই জরাজীর্ণ হয়ে গেলে তবে তা বিক্রি করা জায়েয। তার বিক্রি মূল্যের সাথে অতিরিক্ত টাকা মিলিয়ে নতুন চাটাই কিনবে।

৩৬. মাসআলা : কেউ তার বন্ধুর বাগানে ঢুকে আঙ্গুর খেল, এদিকে বন্ধুটি সে বাগান বিক্রি করে দিয়েছে, যা তার জানা নেই। এক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, তার কোন গুনাহ্‌ হবে না। তবে তার উচিত ক্রেতার কাছ থেকে বলে দায় মোচন করে নেওয়া অথবা তাকে তার দাম দিয়ে দেওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৭. মাসআলা : ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এটা আমাদের পসন্দ নয় যে, কেউ বাজারে ফল কেনার জন্য যাবে আর মূল্য আছে এ পরিমাণ ফল বিনা অনুমতিতে খাবে (আত-তাতার খানিয়া)।

৩৮. মাসআলা : এমন দুই মাহরাম আত্মীয়, যাদের একজন শিশু ও অপরজন সাবালক বা উভয়ে শিশু, এদের মধ্যে বিক্রি, হিবা (দান) বা এমন কিছুর মাধ্যমে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা মাকরুহ। তথাপি একজনকে রেখে অপরজনকে বিক্রি করলে বিচারে বিক্রি বৈধ হয়ে যাবে।

দু'জনের মালিক বিক্রেতা নিজে এবং অপরজনের মালিক তার শিশুপুত্র বা তার গোলাম কিংবা তার মুকাতাব হলে মাকরুহ হবে না। যদি উভয়ের মালিক সে হয়, আর একজনকে তার শিশুপুত্রের কাছে বিক্রি করে, তবে মাকরুহ হবে (আল-খুলাসা)।

৩৯. মাসআলা : এমনিভাবে যদি একরূপ উভয় গোলামের মালিক তার কোন সন্তান হয়, তখনও তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি মাকরুহ হবে। যদি প্রত্যেকটি গোলামের মধ্যে তার নিজের একটা অংশ থাকে, তবে তার যে কোন একটির অংশ বিক্রি করা ও অন্য অংশ রেখে দেওয়াকে আমি মাকরুহ মনে করি না (আল-মাবসূত)।

৪০. মাসআলা : দুজন যদি আত্মীয় হয়, কিন্তু মাহরাম না হয়, যেমন দুই চাচাত ও মামাত ভাই, অথবা মাহরাম হয়, কিন্তু সেটা বংশের কারণে নয়, বরং দুধপানের কারণে বা বৈবাহিক কারণে, তখনও তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো মাকরুহ হবে না।

মালিকানাধীন দুই গোলাম বাঁদী যদি স্বামী-স্ত্রী হয়, তবে তাদের একজন রেখে অপরজনের স্বত্বত্যাগ মাকরুহ হবে না। এমনিভাবে এদেরকে ক্রয়ের পর একজনকে দোষের কারণে ফেরতও দেওয়া যাবে। কিংবা এদের একজন অপরাধ করে থাকলে তার দায়ে তাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা যাবে। ঋণের পরিবর্তেও একজনকে পাওনাদারের হাতে সমর্পণ করা যাবে।

যদি একজনকে উম্মু ওয়ালাদ বানানো হয় (অর্থাৎ তার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করা হয়) বা মুদাক্বার বানানো হয় (স্বীয় মৃত্যুর পর সে আযাদ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়) তবে অপরজনকে বিক্রি করা মাকরুহ হবে না।

একজনের সঙ্গে কিতাবাত-এর চুক্তি (অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায়ের শর্তে মুক্তিদানের চুক্তি) করলেও দোষ নেই। এমনিভাবে যদি একজনকে তার নিজের কাছে বিক্রি করে, যেমন বলল, তোমাকে যদি কিনি, তবে তুমি আযাদ, তারপর সে নিজের কাছে গোলামটিকে বিক্রি করল, তবে সেটাও জায়েয (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪১. মাসআলা : একরূপ দুই গোলামের একজন তার নিজের ও অপরজনের যদি কার স্ত্রীর বা তার মুকাতাবের হয়, তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধনে দোষ নেই। এমনিভাবে যদি একজনের তার এমন কোন গোলাম হয়, যে ব্যবসায়ী ও ঋণগ্রস্ত, তখনও বিচ্ছেদ ঘটানো যেতে পারে। যদি একটি গোলাম মুযারিব (ব্যবসায়ের চুক্তিতে যাকে পুঁজি দেওয়া হয়েছে)-এর হয়, তবে সে তার গোলামটি বিক্রি করে দিতে পারে, তাতে দোষ হবে না (আল-মাবসূত)।

৪২. মাসআলা : তারা দুজন যদি মা সন্তান হয় আর মালিক মাকে এই শর্তে বিক্রি করে দেয় যে, তার ইখতিয়ার থাকবে, তারপর সে ক্রেতা সন্তানটিকে বিনা শর্তে কেনে, তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধন জায়েয হবে না। যদি মাকে ইখতিয়ারের শর্তে কেনে আর সন্তান তার মালিকানার আগে থেকেই থাকে, তবে সকলেরই মতে মাকে ফেরত দিতে পারবে (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

৪৩. মাসআলা : অমুসলিম দেশের কাফির যদি দুই ভাইকে দেশ থেকে বের করে দেয়, তবে তাদের ভেতর বিচ্ছেদ ঘটানো জায়েয আছে। পক্ষান্তরে তাদেরকে যদি কোন যিম্মীর কাছ থেকে কেনে, তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো জায়েয হবে না, বরং তাদের দুজনকে একত্রেই বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৪৪. মাসআলা : যদি তাদের মালিক কোন অমুসলিম হয়, তবে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধন মাকরুহ হবে না, তাতে সে মালিক স্বাধীন ব্যক্তি হোক বা মুকাতাব কিংবা ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম, যার উপর ঋণ থাকুক বা নাই থাকুক, এমনিভাবে সে সাবালক হোক বা নাবালক, এমনিভাবে গোলাম দুটিও মুসলিম হোক বা কাফির কিংবা একজন মুসলিম ও অপরজন কাফির, সর্বাবস্থায় একই হুকুম।

৪৫. মাসআলা : অমুসলিম দেশের কাফির যদি নিরাপত্তা নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে আসে এবং তার সাথে দুটি শিশু গোলাম বা একটি শিশু ও একটি সাবালক গোলাম থাকে অথবা সে এদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রে বসেই তার এমন সঙ্গীর কাছ থেকে কেনে, যে সঙ্গী তার সাথেই মুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করেছে, তারপর সে যদি তাদের একজনকে বিক্রি করতে চায়, তবে কোন মুসলিমের পক্ষে তাকে কেনা দৃশ্যীয় নয়। সে লোকটি যদি গোলাম দুটি কোন মুসলিমের কাছ থেকে কেনে বা এমন কোন অমুসলিমের কাছ থেকে কেনে, যে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করলেও, সে নিরাপত্তা অন্য কোন এলাকার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিয়েছে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নেয় নি, তবে তার কাছ থেকে একটি গোলাম কেনা মুসলিম ব্যক্তির জন্য মাকরুহ হবে (আল-বাদায়ে)।

৪৬. মাসআলা : যদি কারও মালিকানায় একরূপ তিনজন গোলাম থাকে, যাদের একজন শিশু, তবে বড় দুজনের যে কোন একজনকে বিক্রি করা জায়েয হবে (আন-নাহরুল-ফায়িক)।

৪৭. মাসআলা : যদি শিশুর সঙ্গে আত্মীয়তার দিক থেকে সমস্তরের দুজন আত্মীয় থাকে যদিও আত্মীয়তার সূত্র ভিন্ন হয়, যেমন পিতা-মাতা বা খালা ও ফুফু, তবে বিক্রি করলে তাদের সকলকেই একত্রে বিক্রি করতে হবে, তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম। বাপ শরীক বোন এবং মা শরীক বোনের ক্ষেত্রেও একই বিধান। আর তারা দুজন আত্মীয়তার স্তর ও সূত্র হিসেবে সমান হয়, যেমন আপন দুই ভাই ও আপন দুই বোন, তবে ইস্তিহসান অনুযায়ী তাদের একজনকে বিক্রি করা জায়েয। যদি তাদের একজন অপরজন অপেক্ষা বেশী নিকটাত্মীয় হয়, যেমন আপন বৈমাত্রেয়ী ও বৈমাত্রেয়ী বোন অথবা মা, ফুফু ও খালা, তবে দূরের আত্মীয়কে বিক্রি করা দৃশ্যীয় হবে না আর সে জন মা ছাড়া ও আপন বোন ছাড়া অপর যে কোনও একজন। দাদী, ফুফু ও খালার ক্ষেত্রেও ফুফু বা খালাকে বিক্রি করলে দোষ নেই।

৪৮. মাসআলা : একটি বাঁদীর দুজন মালিক। বাঁদীটির একটি সন্তান আছে। তারা দুজনই তার পিতৃত্বের দাবিদার আর এরা সকলেই অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির। এখন তারা যদি বন্দী হয়ে মুসলিম ব্যক্তির গোলামে পরিণত হয়, তবে দুই পিতার একজনকে বিক্রি করা যাবে না।

৪৯. মাসআলা : একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে একটি মেয়ে আছে যাকে সে তার সন্তান বলে দাবী করছে। এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো মাকরুহ হবে, যদিও তার বংশ-পরিচয় প্রতিষ্ঠিত না হয় (মুহীত : আস-সারাখসী)।

৫০. মাসআলা : স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষে যাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো মাকরুহ, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো মুকাতাব ও ব্যবসায়ী গোলামের পক্ষেও মাকরুহ হবে (আল-হাবী)।

৫১. মাসআলা : কাফির মালিকের পক্ষে এরূপ বিচ্ছেদ ঘটানো মাকরুহ নয় (আল-ইনায়া)।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

ইফা/((উন্নয়ন)/২০০৩-২০০৪/অঃসঃ/৪৪০৫-৩২৫০

pdf By Syed Mostafa Sakib